	লেখক	পৃষ্ঠা
	ধ্বনিতত্ত্ব	৪১৫
...ধর	শ্রীকালিদাস রায়	৮৪১
...ঘোষ (গল্প	শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	৭২৩
...ঘোষ (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৩১
...কবিতায় যতি-নির্ণয় (প্রবন্ধ)	শ্রীহেমেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়	৪৩৩
...মধু (গল্প-কথা)	ইন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১
...ভারতীয় (প্রবন্ধ)	কবিতত্ত্ব	
...মেলা (প্রবন্ধ)	শ্রীহরিপদ ঘোষ, বি-বিএল্ (রিটায়ার্ড), বি-বিটি (প্যারিস্)	১৩৯, ২৬৮, ৪১৫, ৭২৮, ৮৫৯, ৯৯০
...ধান (প্রবন্ধ)	শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম.এ, পি-এইচ্-ডি	
...আঁধার (কবিতা)	শ্রীহরীন্দ্রনাথ দেবশর্ত	
...ইতিহাস (প্রবন্ধ)	শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম.এ, পি-এইচ্-ডি	৫৭
...পাতা (কবিতা)	শ্রীহরীন্দ্রনাথ দেবশর্ত	৭৩৭
...বিবহন (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	১৮০
...বৈজ্ঞানিক (কবিতা)		৬১৩
...মালী (কবিতা)	শ্রীহরীন্দ্রনাথ [illegible]	৬৫১
...বিন্দু (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৪৭৩
...বাহিনী (প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	১৩৮
...বাতী (কবিতা)	শ্রীসুরাচরণ দত্ত	৮৭৭
...-পরিচয়া —		
...সমাজের কথা	শ্রীবাণীবিলাস বসুমল্লিক	
...অনুবাদ		
...কবি		
...ভিধারী ভাষা	শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পি-এইচ্-ডি	
...আলোচনার ইতিহাস	শ্রীবাণীবিলাস বসুমল্লিক	

জো...	লেখক
জ্ঞানার্জন	অনুবাদ — সম্পাদক ...
ডার্বাণিজম্ ও	শ্রীললীমোহন
উজ্জয়ের কীর্তি	বঙ্কিমচন্দ্র
তাপাস (গল্প)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
তারা-হারা (কবি-কাহিনী)	অনুবাদ — সম্পাদক
দান-প্রতিদান (কবিতা)	অনুবাদ — শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল ...
নববর্ষের অভিনন্দন (কবিতা)	অনুবাদ — শ্রীযোগিলাল মজুমদার ...
নবাগতদের প্রতি (প্রবন্ধ)	শ্রীসাবিত্রকুমার ঘোষ ...
নর্তকী (গল্প)	শ্রীশৈলীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
নেশা (গল্প)	বঙ্কিমচন্দ্র ...
পত্র-রচনা (প্রবন্ধ)	অনুবাদ — শ্রীযোগিলাল মজুমদার
পিপড়ার-বাসরে (গল্প)	অনুবাদ — শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল
পূজার বাজার (রঙ্গ-রচনা)	সম্পাদক
'বউ কথা কও' (কবিতা)	অনুবাদ — শ্রীমুরেন্দ্র বর্মী, এম-এ ...
বহু-কবির বিবাদ (কবিতা)	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বৃক্ষ-দর্শন	শ্রীহেমেন্দ্র রায়
	শ্রীকালিদাস রায় ...
	৮৫, ১৮৯, ২১৬, ৩৫১, ৪৮৪,
	৬১৬, ৭৪৪, ৮০৫, ৮৯৭,
বঙ্গভাষা (প্রবন্ধ)	শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়
বসন্তের পিপি (কবিতা)	শ্রীযোগিলাল মজুমদার
বাস (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বাঙালীর দুর্গোৎসব (রঙ্গ-রচনা)	অক্ষয়লাল বসু
বাহুবল ও বাক্যবল (প্রবন্ধ)	বঙ্কিমচন্দ্র
বাংলাভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
বৈশাখীর বাংলা (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়
ভক্তি (প্রবন্ধ)	শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়
ভাষা-সেতু (কবিতা)	শ্রীসতীন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ...
ভাগ্যবন্ত (গল্প)	শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ...
ভারত-মহা-সাহিত্য-সম্মেলন ও বাঙালী	শ্রীযোগিলাল মজুমদার ...
ভীরু (গল্প)	অনুবাদ : শ্রীমুরেন্দ্রনাথ বর্মী, এম এ ...
ভূত (গল্প)	শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী
মণি-অনুরা	৫৫, ১৩৫, ২০১, ৩১৬, ৪৫
	১৯৮, ৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অতর	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪১৫
অনুভব কি ? (প্রবন্ধ)	ঋষিকল্প	৮৪৯
অনাময়া (কবিতা)	শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	১৭১
অহিংসার মুক্তি (প্রবন্ধ)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	৫৮৮
অহোরাত্র (কবিতা)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	৮
অন্ত-পুরাণ (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১২
আজুকথা —		
প্রেমের পূর্বরাগ .	গোপেশ্বরাইয়ের	৮১৭, ১৪১
আলো-অন্ধকার	বিদেশী	৭৪, ১৪৬
শিল্পী ও সমালোচক	অসুস্থার আইন্ড ...	৩৪৭, ৪৪৫, ৫৪১, ৬৫১, ৭৩৮, ৮২৭
সভ্যতা	হাইড্, মেড্	৪৬৬, ৫৫৮, ৬৮০, ৭৪০, ৮৩৯
রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজী কবিতা ও অনুবাদ		১৭
রবীন্দ্রনাথ ও বৃত্তিপুরা (প্রবন্ধ)	শ্রীঅমিয়নাথ সেন	১৮
রবীন্দ্র অন্তর্ধানে (প্রবন্ধ)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	৭৩৯
নগর অন্তর্বিধি (প্রবন্ধ)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	১৬
শিবের মাথা (কবিতা)	শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক	৬৯১
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	২৩, ১৮৩, ৩৪৯, ৪১৫, ৫১৩, ৬২৫, ৭৬৯, ৮৮৪, ৯৭৯
প্রতি-স্মৃতি —		
ইংলণ্ডের সাহিত্য-প্রীতি	ইন্দুমতী গুপ্ত	৭৪২
আহিরের	অমলচন্দ্র সরকার	৯২৭
দুর্গাপূজা	ঋষিকল্প	২৪২
পশ্চিমবঙ্গ	ঋষিকল্প	৪১
পরবিদ্যা	অতুলচন্দ্র বসু	৩২১
পরাধীনতা	রাধেশ্রেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী	৭৮২
পর্দাপ্রথা ও আধুনিক সমাজ	বিপিনচন্দ্র পাল	৪১৪
পাহাড়ীয় সমাজবিজ্ঞান	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬৩
পাহাড়ীয় শিক্ষা ও জীবিকা	অতুলচন্দ্র বসু	৩৪১
পাহাড়ীয় স্ত্রীশিক্ষা	বিপিনচন্দ্র পাল	৪৪
পাহাড়ীয় স্বাস্থ্য	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১১১
[illegible]	অতুলচন্দ্র বসু	৮৩৯, ৯১০
[illegible]	প্রভাতচন্দ্র উপাধ্যায়	৪২২
[illegible]	প্রভাতচন্দ্র উপাধ্যায়	৯৪৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
সপ্তর্ষি (কবিতা)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	৪৩৬
সরস্বতী (প্রবন্ধ)	উমেশচন্দ্র বটব্যাল	৫৮৫
সুখ (প্রবন্ধ)	বঙ্কিমচন্দ্র	৭৩৪
সৌন্দর্য্য (প্রবন্ধ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৭৩
সোনা-সোকা	অনুবাদ : অনুরূপাদেবী	৫০৪, ৬৪৭
স্নেহ-ভিখারী (কবিতা)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষদস্তিদার	১৩৮
স্বপ্নে ! (কবিতা)	শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩৯৭
স্বপ্ন	বঙ্কিমচন্দ্র	৮৫৫
স্বাধীন ভারত (প্রবন্ধ)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	১৪৩
স্বাধীনতা ও পরাধীনতা (প্রবন্ধ)	বঙ্কিমচন্দ্র	৩৬৮
স্বাধীনতা-হীনতায় (প্রবন্ধ)	শ্রীনটরাজ ঘোষ, ডি-লিট্ (বিউটিস্), ডি-ফিল্ (প্যারিস্)	৮১৭
হরণে (কবিতা)	শ্রীরাজশেখর বসু	৫৭৯
হরগৌরী কামাখ্যাতন্ত্র		১৪৭
হাতি-চরণ (প্রবন্ধ)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	১৮৭
হিন্দু-আর্ট (প্রবন্ধ)	বঙ্কিমচন্দ্র	৫৭১
হিন্দুত্ব ও অহিংসা (প্রবন্ধ)	শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত	১৩২
হিন্দুত্ব ও ভারতসঙ্ঘ (প্রবন্ধ)	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	৭৩৪,
হিন্দুর বাধা (কবিতা)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৭৮
হোলি (প্রবন্ধ)	অমলকুমার মৈত্রেয়	৭৭৫
ক্ষেমেন্দ্রের অবদান (গল্প)	শ্রীবকুলীন গুপ্ত	১৪৯

'মণি-মঞ্জুষা'র কবিতা ও [illegible]

কবিতা	কবি	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। বাংলার কবি	[illegible]	৩৫
২। উপকথা	ঐ	৩৬
৩। মনোহারিকা	[illegible]	৩৭
৪। কিশোরী	[illegible]	৩৭
৫। বালকী	[illegible]	৩৮
৬। বিপ্রহরে	[illegible]	৩৯
৭। সন্ধ্যা	[illegible]	৪০

কবিতা	কবি	পৃষ্ঠাঙ্ক
	ভাদ্র	
১। নারী-প্রশস্তি	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১০২
২। তুমি ও আমি	অক্ষয়কুমার বড়াল	১০৪
৩। 'বউ কথা কও'	শ্রীঠাকুরনাথ সেনগুপ্ত	১০৫
৪। আহ্বান	অক্ষয়কুমার বড়াল	১০৬
৫। নারী-স্তোত্র	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	১০৮
	আশ্বিন	
১। প্রেম	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	
২। প্রাণের ফুল	বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	
৩। মনোমোহন	শ্রীযোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	
৪। জ্যোতির্ম্ময়ী-প্রেম	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	
৫। মহামায়ী	শ্রীঠাকুরনাথ সেনগুপ্ত	
৬। ঋষি	অক্ষয়কুমার বড়াল	
৭। দুষ্ট কথা	দেবেন্দ্রনাথ সেন	
৮। একটি চুম্বন	ঐ	
৯। আদি-রহস্য	অক্ষয়কুমার বড়াল	
	কার্ত্তিক	
১। জাগরণী	বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	
২। প্রিয়-প্রবাসিনী	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	
৩। লাজ-ভাঙ্গানো	দেবেন্দ্রনাথ সেন	
৪। আবদারের আবদার	কিরণধন চট্টোপাধ্যায়	
৫। মুখ-শশী	দেবেন্দ্রনাথ সেন	
৬। লুকানো ছবি	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	
৭। মন্ত্রহীন	শ্রীঠাকুরনাথ সেনগুপ্ত	
	অগ্রহায়ণ	
১। গৃহলক্ষ্মী	বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	৪০৮
২। নারী-মঙ্গল	দেবেন্দ্রনাথ সেন	৪০৯
৩। ছায়া-সঙ্গিনী	অক্ষয়কুমার বড়াল	৪১১
৪। লক্ষ্মীপূজাধিকা	শ্রীকালিদাস রায়	৪১২
৫। শেষ বাসরে	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৩
৬। নব-পরিচয়	শ্রীঠাকুরনাথ সেনগুপ্ত	৪১৩
	পৌষ-মাঘ	
১। বিদায়-চুম্বন	দেবেন্দ্রনাথ সেন	... ৪১৯
২। ক্ষমাবে	অক্ষয়কুমার বড়াল	৪২০
৩। প্রার্থনা	ঐ	৪২১

	কবিতা	কবি
৮।	বাধার স্মৃতি	বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫।	স্বপ্নলোক	শ্রীসুন্দরজন মল্লিক
১০।	সরলা ও প্রেমদা	গোবিন্দচন্দ্র দাস
	ফাল্গুন	
১।	জন্মভূমি	অক্ষয়কুমার বড়াল
	পল্লীশ্রী-জন্মভূমি	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
	কবির দ্বা	শ্রীসুন্দরজন মল্লিক
	বর্ষপুরী	ষতীন্দ্রমোহন বাগচি
	দেশের মাটী	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
	চৈত্র	
	হিমালয়ে সূর্যোদয়	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
	তাজমহলে	শ্রীকালিদাস রায়
	জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী	ষতীন্দ্রমোহন বাগচি
	লক্ষ্মীশ্রীর প্রতি	শ্রীকালিদাস রায়
	সৌন্দর্যবাণী	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
	বৈশাখ	
	'ছোটো নদী মোরে একটি পরশ…'	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (অনুবাদ)
	অশোক	দেবেন্দ্রনাথ সেন
	চম্পা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
	দু'ইচাপা (১)	শ্রীসুন্দরজন মল্লিক
	দু'ই-চাপা (২)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৮।	বাংলার ফুল	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
৭।	ফুল-সাজি	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
	জ্যৈষ্ঠ	
১।	গঙ্গা	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
২।	গঙ্গা-স্তোত্র	শ্রীষতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৩।	গঙ্গার প্রতি	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৪।	গঙ্গা	শ্রীকালিদাস রায়
৫।	গঙ্গাতীরে	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
	আষাঢ়	
১।	প্রণয়	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
২।	ফুল	শ্রীকালিদাস রায়
৩।	উড়ো-চিঠি	বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪।	বাদলের প্রেরণায়	শ্রীসুন্দরজন মল্লিক
৫।	উদ্বোধন	শ্রীকালিদাস রায়

সেই নবশিক্ষার আলোকের রেখা যাহাতে ব্যর্থ না হয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণ-মন ও প্রতিভার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া, এই পত্রিকার সাহায্যে তাহাই রক্ষিতে চাহিয়াছিলেন। বাংলার নবজাগরণ ও নব-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্রিকা এখনও একটা সমুজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কালের পথে আমরা যতই নিরন্তর অগ্রসর হই না কেন — অতীত ইতিহাসের কীর্তিগুলির দিকে মাঝে মাঝে ফিরিয়া চাহিতেই হয়; সমবিশেষে তাহাদের কোন একটী হইতে নিজস্ব প্রেরণা বা পথনির্দেশের বাণী লাভ করিতে পারি। আজ বাংলাদেশে যে যুগান্তর আসিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগপ্রবর্তকদের পুরোধারাও তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই — বাঙালীজাতির এমন সর্বস্বনাশ যে এত শীঘ্র হইতে পারে তাহা বোধ করি কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। আজ এই প্রলয়-প্লাবন মহাপ্রলয়ের ধারণ করিতে পারে এমন বিরাট পুরুষ বাঙালীর মধ্যে কে আছে! ইহাও সত্য যে, আজিকার সমস্যা যুগের সমস্যা নয়, যুগশিক্ষা বা চিত্ত-কর্ষণের দ্বারা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার সময়ও আর নাই; এখনে প্রত্যেক মুহূর্তই যুগান্তর, এবং যেখানে যেটা উদ্ধার-কার্য করিতে হইবে, তাহা যুগান্তে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র নয়।

তথাপি আজিও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রয়োজন আছে— সেই প্রয়োজন, বঙ্কিম যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইতে খুব স্বতন্ত্র নয়। জ্ঞান ও কর্মকে যদি এখন পৃথক ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিতে হয় — যদি জ্ঞানের উপরে কর্মকে প্রাধান্য দিতে হয়, তাহা হইলেও সেই কর্মক্ষেত্রে যাহারা বিচরণ করিবে তাহাদের চক্ষুও যেন, অন্ধও যেমনই, একটু দীপ্তি থাকা চাই। কেরাণীর পক্ষাতে কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি নাই, যে উদ্যমের মূলে আবেগের প্রাণবত্তা নাই, তাহা সহজেই পরাস্ত হয়। বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, ঐতরেয়ই বাঙালীর সম্বন্ধে একটী বড় সত্য কথা বলিয়াছিলেন, এ দিনে তাহাই পুনরুল্লেখ করি। তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙালীজাতির সম্বন্ধে আমার কারণ এই যে — "The Bengalee has ceased to think" — অর্থাৎ বাঙালীর চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়াছে। আজ এ জাতির এই যে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কারণ আছে — সেই কারণ চিন্তা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সঙ্কটকাল আসন্ন বুঝিয়া তাহা নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন — তাঁহার চিন্তা ছিল যেমন কালজয়ী, তেমনই বস্তুনিষ্ঠ। বাঙালীজাতিও তখন চিন্তা করিতে চাহিত। ইহাও সত্য যে, ঐ জাতির বর্তমান দুর্দশা হইলেও তাহা অমর — চিন্তা করিলে সে মরে; মরণ জাতিরও সেই শক্তি হ্রাস পায় নাই, তাহার স্বভাবের সেই সংস্কার এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বর্তমান যুগ যুগতঃ মননশীল চিন্তা-নাশকের যুগ নয় — কর্মকুশল ও দৃষ্টচেষ্টা জননাশকের যুগ। তথাপি চিন্তারও প্রয়োজন আছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য এখনও নিরর্থক নহে, বরং এ যুগের ঐ কর্ম-গ্রহকে সফল করিবার জন্য আত্ম-পরীক্ষা ও চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন এইজন্য আরও অধিক যে, বাঙালীর স্বভাব-ধর্ম, এমন কি ঐতিহ্যও বিপ্লব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আগে সাহিত্যিক; যাঁহারা আরও সাক্ষাৎ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতির কল্যাণসাধনার ব্রত লইয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরাও আমাদের শক্তি অনুসারে সেই কল্যাণের আর একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছি, এবং তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেই তদ্রূপে স্মরণ করিতেছি — তাঁহারই সেই প্রাণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আমরা তাঁহারই ব্রত ধারণ করিতেছি — তাই এই পত্রিকারও নাম দিয়াছি 'বঙ্গদর্শন'।

নামটী যাঁহাদের তেমন পরিচিত নয় (পাঠক-সাধারণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'ও পত্রিকার খুব বেশি না থাকিবারই কথা) তাঁহারা হয়ত' এই নামের মর্য্যাদা বুঝিবেন না ; যাঁহারা উহার সহিত পরিচিত (বাংলার শিক্ষিতমণ্ডলীর সকলেই) তাঁহারা ঐ নাম গ্রহণ করায় আমাদের স্পর্দ্ধা দর্শনে বিস্মিত হইবেন। ঐ নামটীর আরও গৌরব আছে — রবীন্দ্রনাথও একবার ঐ নামটীর সহিত নিজ নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ, বাংলার তখন নবজাগরণের আর এক পর্ব্ব সুরু হইয়াছে ; সেই কালে রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নিজস্ব চিন্তা ও ভাবধারা যেমন হোক, তিনি ঐ 'বঙ্গদর্শন'কেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। অতএব 'বঙ্গদর্শন' নামটীর সহিত বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ কবি-মনীষীর স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। আজ সেই নামটীকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে এ কোন্ তৃতীয় মহাপুরুষ ! এরূপই একটা বিরূপ-বিদ্রূপের উচ্চনাদ কোন কোন স্থানে উত্থিত হইতে পারে, অতএব ইহারও একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক।

প্রথমতঃ, আমরা ইহা অনুভব করিয়াছি যে, অধুনা বাঙালীর যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি যতই ভিন্ন হউক — কিন্তুরে বাঙালীর মানস-জীবন বড়ই অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, চিত্তের নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ইহার প্রমাণ তাহার ভাষা ও সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতা, বা সর্ব্বজনহীনতায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয়তা-বোধের এমন অভাবও লক্ষণ আর নাই। আজ ঠিক এই সঙ্কট চিন্তা করিলে কোন্ একজন বাঙালী মহাপুরুষকেই মনে পড়ে ? শক্তি থাক বা না থাক, প্রাণে সেই বেদনা যদি একটুও অনুভব করি, এবং যদি জাতির প্রতি কর্ত্তব্যবোধে স্থির থাকিতে না পারি, তবে আজ কোন্ বাঙালী — জাতীয়তা-মন্ত্রের আদি-ঋষি সেই মহামনীষী ও মহাকবিকে স্মরণ না করিবে ? আজিকার 'বঙ্গদর্শন' সেই 'বঙ্গদর্শন' নিশ্চয় নহে, তথাপি তাহা 'বঙ্গদর্শন' না হইবে কেন ? ঐ নামের সাহায্যে আমরা সেই প্রেরণাই অনুভব করিতে চাই ; বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষতা নহে — তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে, তাঁহাদিগকেই গুরু করিয়া, ঐ নামের যে মন্ত্র তাহাই জপ করিতে চাই। বাঙালীর মনীষা ও প্রতিভা — বিশ্বে করিয়া তাহার সাহিত্যিক কৃতি ও সম্ভোগ — যে-সুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে, সাহিত্যের কোন আদর্শই বড় করা চলে না — সাহিত্যকেই ধর্ম্মসাধনের সহায় করিয়া পত্রিকা-প্রচার এ যুগে যে কিরূপ হাস্যকর, অথবা অতিরিক্ত নিদারুণ — এমন কি, শাস্তিযোগ্য, তাহা আমাদের মত কে জানে ? সে শাস্তিও আমরা ভোগ করিয়াছি। তথাপি এইকালে ও এই সমাজে 'বঙ্গদর্শন' নামটীই যে আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার কারণ, ঐ নামটীই সকল শিক্ষিত ও সর্ব্ববৃত্তিসম্পন্ন বাঙালীকে স্মরণ করাইবে, আজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা অচিন্ত্য মিথ্যা অভিমানে আমরা কোন্ মহাপঙ্কে পতিত হইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, এ যুগের বাঙালী আমরা, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সেই প্রতিভা ও সেই সাধনার ধারার ত' বটেই। সে গৌরব আমরা ত্যাগ করি নাই : শক্তি ও মনীষায় আমরা তাঁহাদের পদনখের তুলাও না হইতে পারি, কিন্তু যে-আদর্শ তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই আদর্শের জ্ঞান ও তৎপ্রতি যে নিষ্ঠা আমাদের আছে, তাহারই স্পর্দ্ধায় আমরা গুরুর পরিত্যক্ত ঐ উত্তরীয়খানি বহন করিয়াছি ; যদি তাঁহাদের সেই ধর্ম্ম কিছুমাত্র পালন করিতে পারি, তবে তাঁহারা যে স্বর্গ হইতে প্রসন্নমুখে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 'বঙ্গদর্শন' নামটী এ পত্রিকার ললাটে অঙ্কিত করা শুধু স্পর্দ্ধাই নয়, একটা সমবায়ও বটে ; কারণ, আমরা ইহাও জানি যে, ঐ নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার মত উন্নাসিকের সংখ্যা এ সমাজে অল্প নহে।

এবারে এই পত্রিকার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় নীতি স্থির করিয়াছি তাহাতেও এখানে জানাইয়া রাখা কর্তব্য। 'বঙ্গদর্শন'-নামের দ্বারাই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শকেই এই যুগের উপযোগী করিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিতে—সাহিত্যের সত্য ও সাহিত্যের ধর্ম রক্ষা করিতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে ইহার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, এ কালে সে পদ্ধতির প্রয়োজন নাই। অবস্থার পরিবর্তনের একদিকে যেমন সমস্যা অনেক জটিলতর হইয়াছে, তেমনই অন্য দিকে কিছু সুবিধাও হইয়াছে: যাবৎ, গদ্যসাহিত্যের—অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের—দৃষ্টান্তে, বাংলাভাষার সাহিত্যসৃষ্টির যে একটি ধারা ও নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে তাহার সাহায্যে, আর কিছু না হোক, রস ও রুচির একটা মোটা আদর্শ স্থাপন করা দুরূহ হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র চালিয়াছিলেন নব্য বাঙালীসাহিত্যের চিত্ত-পত্তন করিতে; আমরা চাই, সেই চিত্তের উপরে যে সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, সেই সৌধের আয়তন বৃদ্ধি করা যদি বর্তমানে অসম্ভব হয়, তবে অন্তত সেই চিত্তটিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে। বঙ্কিমচন্দ্র চালিয়াছিলেন তৎকালীন নবশিক্ষিত বাঙালীকে সেই শিক্ষার অনুরূপ আস্বাদন করাইতে: তাহা দ্বারা বাঙালীর মনুষ্যত্ব উদ্বোধন করাই ছিল তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র অভিপ্রায়। আমরাও আজ এই 'বঙ্গদর্শনে'রই সাহায্যে বাঙালীর সাহিত্য-নীতিকে সঞ্জীবিত করিতে চাই, সাহিত্য-সম্ভোগকেই মনুষ্যত্ব-সাধনার একটা অঙ্গ বলিয়া তাহার প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চাই। এই শ্রদ্ধাই সকলের বড় কথা, আমরা সর্ববিষয়ে শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে শ্রদ্ধা ছিল, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রতি সেকালের বাঙালীর একটা প্রাণগত আকর্ষণ ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সেই সুপ্রবৃত্তির সুযোগে বাঙালীকে, তাহার ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকার করাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতেই বাংলাসাহিত্যেরও সৃষ্টির যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ, আত্ম-সাক্ষাৎকার বা আত্মশক্তির উপলব্ধি না হইলে সৃষ্টি-প্রতিভার উন্মেষ হয় না—যতদিন জাতি বা ব্যক্তি আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন না হয়, ততদিন সে জড়বৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে, বা হয় পরানুচিকীর্ষায় আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন আমরা বিজাতীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি হারাই নাই; তাই নবশিক্ষাকে আত্মসাৎ করিয়া সেই জাতীয় সংস্কৃতিকেই পুষ্ট করিবার বৃহৎ সম্ভাবনা তখন ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমরা সেই সংস্কৃতি হারাইতে বসিয়াছি, বোধ হয় সেই কারণেই সর্ব বিষয়ে প্রত্যহীন হইয়াছি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র-পরিকল্পিত সেই 'বঙ্গদর্শন' যদি আজ আবার বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রও যাহা করিতেন আমরা আমাদের অতিক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাহারই কিঞ্চিৎ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। সেই প্রথা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সাহিত্যের ধর্মঘটে জাতির আত্মারই ধর্ম, সে ধর্ম পালন করিলে জাতি আত্মস্থই হয়; সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ morality—সেই morality জীবনেরও প্রধান জীবনীয়, ইহা বুঝিয়া চলিলে, আজ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদিগকে কোন্ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা কাহারও অনুমান করা দুঃসাধ্য হইবে না। বঙ্কিমের ব্রত ছিল সাহিত্য-সৃষ্টি, আমাদের ব্রত—সাহিত্যসৃষ্টি নয়, সাহিত্যের আপদ্রক্ষা।

ইহার জন্য আমাদিগকে প্রথমে একটা বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে—অতি-আধুনিক প্রেমোন্মাদ পরিহার্য করিয়া চলিতে হইবে; অর্থাৎ, এখন যে-রকমের সাহিত্যসৃষ্টি হইতেছে আমাদের পত্রিকা তাহার

যাইবে না। কারণ, সে-সাহিত্যের আদর্শ এখনও স্থির হয় নাই। এ যুগ বিপ্লবের যুগ—বিপ্লবের একটা আদর্শ বা চিন্তাধারা আছে। সেই সকল মতবাদের মূল্যোচিত প্রেরণা দেশসমূহের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহার মূল্যও যথেষ্ট। সেই সব মতবাদ না প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ রাষ্ট্রকাঠামো সমাজ তাহাকেই জীবনের পরমতত্ত্ব বলিয়া, সেই উদ্ভ্রান্ত অবস্থাকেই সৌষম্যান্বিত করিতে চায়। ঐরূপ মহাবিপ্লবের যুগসন্ধিকালে আমরা ঐ সকলের মর্মমূলীয় গতিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া স্থির করি, বিচিত্রকে—প্রত্যেকে নিজস্ব বলিয়া উড়াইয়া দেই। তাই এখনে সাহিত্যে জীবনের যে-রূপকে ধরা হইতেছে তাহার মূলে সর্বজনসমকারী ফলের প্রয়োজনই আছে; তাহাতে বর্ণ নাই, দৃষ্টি নাই, দৃষ্টির স্নিগ্ধতা নাই; কেবল বিদ্রোহ ও উত্তেজনা, অন্তর্বাসের প্রাণান্ত হুংকার এবং বৈরাচারের বহ্নিবিষ জ্বালা আজিকার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার জন্যদাবী দাবী করিতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে ইহাই স্বাভাবিক। আর যাহাই হউক, ইহা অস্বীকার করা চলিবে না যে, এ-যুগে মানুষের মনের রাস্ত ও দেহের রাস্ত উৎপাত হইতে চলিয়াছে; সৈন্যিক ক্ষিধা যখন আর মানুষকে আহার দিতেছে না, তখন সে শিল্প-সাহিত্যের সেই প্রাচীন জীবনকে ধরিয়া থাকিবে কেন? নূতন সমাজবিধি ও নূতন রাষ্ট্রবিধি যতদিন না গড়িয়া উঠিতেছে ততদিন এই বিদ্রোহ ও উত্তেজনা বিরত হইবে না। কিন্তু ঝড়ের ভিতরে অথবা উর্ধ্বে, কোন একটি স্থানে মানুষকে কিছুক্ষণও স্থির হইয়া থাকিতে হইবে; সাহিত্যই সেই থাকিবার স্থান, এবং যাহাকে 'রস' বলা হইয়া থাকে তাহাই সেই থাকিবার বস্তু। 'রস'কে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। কবির ভাষায়—"স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু ঘূর্ণির মাঝখানে"; সাহিত্য সেই স্থির-বিন্দু; ঘূর্ণিও যেমন সত্য, বিন্দুও তেমনিই সত্য—ঘূর্ণিবায়ুর জন্য একটা কেন্দ্র-বিন্দু চাই। কিন্তু আজিকার বাংলাসাহিত্যে কেন্দ্রচ্যুতি হইয়াছে—ইহার কোন স্থির বা সুকল্পিত আদর্শ নাই, 'রস' ইহার উপজীব্য নহে। এইজন্য 'বঙ্গদর্শন' এ সাহিত্যের মুখপত্র হইবেনা।

তাহা হইলে ইহার কাজ কি হইবে? পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ যে-সত্য সাহিত্যের সত্য, সেই সত্যকে পাঠক-পাঠিকার অন্তরঙ্গোচর করিয়া তাঁহাদের রসপিপাসা ও রসবোধ জাগ্রত করিবে। ইহার জন্য প্রথমতঃ, এ পর্যন্ত যেখানে যেটুকু সত্যকার রসসৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই নূতন ভাবে সাজাইয়া সকলের সম্মুখে ধরিবে; তাহা উৎকৃষ্ট, তাহা অল্প হইলেও রসপিপাসা তৃপ্ত করিবেই, এবং তাহা ঐ দুর্দিনের ধূলিঝঞ্ঝার আড়ালে পড়িয়া আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না—তাহাকেই বহুল পরিমাণে সুনির্বাচিত করিয়া বাংলাসাহিত্যের আসরে উপস্থিত করিবে। সাহিত্যের জন্মিবার অপেক্ষা এইরূপ রস-পরিবেষণই যে যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনা—ইহাই যে সত্যকলের, তাহা মনীষিগণও স্বীকার করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শন' এইরূপ রস-নিবেদনের দ্বারাই বাংলাসাহিত্যের সমালোচনা করিবে। এইরূপ নির্বাচন ও পরিবেষণই সম্পাদকের গুরুতর কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব 'বঙ্গদর্শনে'র প্রধান কাজ হইবে—প্রতিসপ্তাহে রস-নিবেদন, এবং সেই সঙ্গে, যাহারা রসপিপাসু অথচ রসজ্ঞ নহেন, তাঁহাদিগকে সাহিত্যজ্ঞানসম্পন্ন করা। এজন্য আরও দুই একটি উপকরণ আয়োজন থাকিবে। প্রথমতঃ, অনুবাদের সাহায্যে বিদেশী সাহিত্য হইতে সাহিত্যরস-আহরণ; দ্বিতীয়তঃ, বাংলাসাহিত্যের পূর্বগামী আচার্যগণের, তথা বিদেশী সাহিত্যাচার্যগণের উৎকৃষ্ট টীকা বা তত্ত্বচিন্তার মূলবিষয়ক সঙ্কলন।

এতদ্ব্যতীত, সাময়িক সাহিত্যের যাহা অবিচ্ছেদ অঙ্গ তাহাও যথাসম্ভব কৌশলে রক্ষা করিয়া 'বঙ্গদর্শনে'র পুনরুদ্বোধন করিবে। আমাদের এই আদর্শকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন সেই মুদ্রাযন্ত্রজীবী সাহিত্যিক যে কয়জন এখনো বাংলা সাহিত্যের মায়া কাটাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের কৃপায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইবে; প্রাচীনের সহিত নবীনের এই সম্মিলনে ইহা প্রমাণিত হইবে যে, কালের রথ পশ্চাতের দিকে চিরকাল ধাবিত হইলেও তাহার গতি একই।

সম্পাদক নিজে যে কাজ করিবেন তাহাতে আশা করি কেহ নিরাশ হইবেন না; প্রতি সংখ্যায় সাহিত্যের সুবিচারক সমালোচনা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে; এবং সম্ভব হইলে, একটি করিয়া প্রবন্ধালোচনা-মূলক প্রবন্ধও থাকিবে। এই অংশটা নূতন।

আর একটী কথা বলিলে 'বঙ্গদর্শনে'র পরিকল্পনা যেমন মনে আছে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে। প্রতিমাসে কিছু করিয়া 'বঙ্গদর্শন'ও থাকিবে। 'বঙ্গদর্শন' অর্থে কেবলই বাংলাসাহিত্য-দর্শন নহে; বাংলা ও বাঙালীর নানা মানসিক ব্যাধির সম্বন্ধেও যেমন, তেমনই বর্ত্তমান সমাজ ও তাহাতে বাঙালীর দুর্গতি, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি সম্বন্ধেও সম্পাদকীয় আলোচনা বা মন্তব্য থাকিবে। আমাদের পত্রিকা মুখ্যতঃ সাহিত্যিক পত্রিকাই বটে, তথাপি ইহা বিশেষভাবে সাময়িক বলিয়া, বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করা চলিবে না। তাই দেশের ইলামীজন অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতেই হইবে; তাহাতে যেটুকু 'পলিটিক্স্' আসিয়া পড়া অনিবার্য্য, সেটুকুমাত্রই থাকিবে। কিন্তু আমরা তাহাকেও পলিটিক্স্ বলিব না, সে অভিমান আমাদের নাই; কারণ, আমরা সম্বন্ধজ্ঞানে ও সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝি, যাহা সত্য বলিয়া মনে করি—কোন দল বা মতবাদের আনুগত্য না করিয়া, তাহাই মুক্তচিত্তে প্রকাশ করিব। তাহাকে নিশ্চয় 'পলিটিক্স্' নাম দেওয়া যাইবে না, কারণ, পলিটিক্স্ অতি গভীর পদার্থ, তাহা এমন সরল ও বুদ্ধিহীন নহে।

'বঙ্গদর্শন' নাম হইতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করিতে হয়, তেমনই যিনি উহার 'নব-পর্য্যায়' সম্পাদন করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথকেও আমরা স্মরণ করিতেছি। স্মরণ করিবার আরও কারণ আছে, এই দ্বিতীয় নব-পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা যে মাসে প্রকাশিত হইতেছে, সেই মাসই রবীন্দ্র-তিরোধানের মাস, তাই আমরা পত্রিকারম্ভে সেই বাণীবরপুত্রকে একটু বিশেষ ভাবে স্মরণ করিব।

সর্ব্বশেষে, 'বঙ্গদর্শনে'র যিনি জন্মদাতা এবং যিনি এখনও তাহার গুরু—সেই বঙ্কিমচন্দ্রের জবানিতেই এই 'পত্র-সূচনা' সমাপ্ত করিলাম।——

"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিবার যত্ন করিব। যত্ন করিব এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা অসত্যাধীন। এই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য।

"দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতদূর অভাব আছে। এই অভাব নিবারণই এই পত্রের এক উদ্দেশ্য।

"এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা সম্প্রদায়বিশেষের মনঃ সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

"আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থে যত্ন পাইব বলিয়া কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহা সুশিক্ষিত, যাহার পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না।

যারা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা সরল রাখিব।

"আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু যত সহজে বলা যায় তত সহজ নহে। পত্রলেখকমাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। আমাদের পূর্ব্বসূরিরা এইরূপ এক একবার অকাল-পর্য্যন্ত করিয়া লইয়াছেন।

"কালে আমাদের অদৃষ্টে যে রূপ আছে তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয় তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। এই 'বঙ্গদর্শন' কালস্রোতের নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ আসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিত্রাণ-মুক্ত অথবা হাস্যাস্পদ হইব, বা। ইহার জন্য কষ্টই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে কর্ম্মমাত্রই বিফল বা নিষ্ফল নহে।"

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির-রাতে
একাকীখানি বাহিয়া।
অরুণ আজি উঠেছে,
অশোক আজি ফুটেছে,
না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া।

রবীন্দ্র-স্মৃতিতর্পণ

( )

মহাপ্রয়াণ

(২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)

শেষ হ'ল কবে ?—
তোমারে না জানিবে ?
দুই ভেবে আজ মোরা ফেরি অন্ধকারে !

তোমারে তো শেষ নাই ! বাণী তব, সুর তব
সকলির শতদলে রয়েছ ভরিয়া।
মহান্ আত্মার সেই সহজ-শীতল ছায়া
ধরণীর চিত্তক্ষেত্রে রবে আবরিয়া।
তোমারে যেমন-দেখা দেখিয়াছে সর্বজন দেশে ও বিদেশে,
এখনো তেমনি ভাবে দেখা দিবে তব রূপ —
সত্যের আলোক চোখে, সুন্দরের স্বপন-আবেশে।
তোমার সে দিব্যমূর্তি — সুন্দর প্রশান্ত ভব্য,
সে নয়ন, ললাট উদার
দিবে রেখে গেছ তুমি বিশ্বের মানস-পটে
যে তুলিতে, রঙ যেথা তার
হইবে না কভু ক্ষীণ কোন চিরাবন ;
তেমন আঁকিতে তুমি, আজিও তেমনি রবে চির-সমুজ্জ্বল।
তোমারে ত' হয় নাই শেষ,
রহিয়ে রহিবে শুধু এ বিশ্ব — নিখিল শুধুই শেষ।

তুমি ছিলে আমাদের দূর ভাগ্য, হে নবীন রবি,—
সুদূর আকাশে নয়, এ দীন কুটীরতলে ফিরিবের বেশ-ধরেছিলে !
সেই মুখে যারে যারে চাহিয়াছি নাশল দুঃস্বপ্ন হ'তে জাগি,
ভরি নাই মহাভয়ে, ওই নাম লয়েছিনু — নিরাশারো আশা নিল আগি'।
চরিতের মহাযোগে মিলিয়াছি তব সুকৃতির,
তোমার দীর্ঘায়ু: ছিল শুভাশিস আমাদেরি শিরে।
সেই তোমা হারায়েছি, সর্ব্বহারা হইয়াছি মোরা —
এতদিনে খসি' গেল মণিবন্ধ হতে সেই
চির-রক্ষা-রাখীটির ডোরা।
জাতের — জগতের — যত পূজা এসেছিল এতদিন সেই ঠিকানায়,
সে যে ছিল আমাদেরি এই গৃহ — আজ আর তুমি সেথা নাই !

মোদের গগনে যবে হয়েছিল তোমার উদয় —
উৎসবের দিন সে যে, আনন্দের কোলাহলময় !
তার পর এল নিশা, দুঃখময় দুর্যোগ-নিশীথ,
সে তিমির-চিরজিনী পার হ'লে একা তুমি
কণ্ঠে ধরি' আলোকের গীত।
তারো পরে নিভে' গেল একে একে দুই কূলে সব দীপাবলী,
তবু সে তমিস্রামাঝে তোমারি ও প্রাণশিখা জ্বলে অনুক্ষণ উঠেছিল জ্বলি'।
আজ যবে নাই আর কোনখানে এতটুকু আশার আলোক,
আরো ঘন, আরো দুরু-মান যবে — হতাশার অন্ধকারলোক
ঘেরিয়েছে সর্ব্বদেশ, সেইকালে শেষ-অস্তে অস্ত গেল রবি :—
বলিবার নাই কিছু, শক্তি নাই কাঁদিবারো, জগতের দ্বার রুদ্ধ সবি।

শুধু জানি, যে-জীবন যেমেছিল এইদেশে সতরথ আগে,
যে মহা-যজ্ঞটি হোমা-জ্বেলেছিল ভারতের এই পূর্ব্বভাগে—
এতদিনে নির্ব্বাপিত তার সেই দীপ্ততম শিখা,
মোদের ললাট হ'তে মুছে গেল যজ্ঞ-শেষ জ্যোতির্ম্ময় টীকা।
ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর সেই মহাযজ্ঞ-অবসান
শেষ হ'ল এতদিনে, তোমা সাথে হ'ল তারি চির-অবসান !"

"চাকা বেরাজ-বেত্রের সৌজন্যে

(২)

স্মৃতি-তর্পণ

(২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৪)

উপরের ঐ কবিতাটির সম্বন্ধে কোনো বিলাপ-ধ্বনি আছে—আর কিছু আছে কিনা জানি না। যখন প্রথম আসিল রবীন্দ্রনাথ আর যাই, তখন প্রাণের মধ্যে যে বিহ্বলতা ও পুলকতা অনুভব করিয়াছিলাম ঐ শ্লোক-কয়টিতে তাহাই যেন অনেক বাক্ত হইয়াছিল। হয়ত উহা কবিতা হয় নাই—না হউক, উহাই জীবনের একটা দারুণ মুহূর্তকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আজ ছয়বৎসরের পরে যখন উহা পুনরায় পাঠ করি, তখন এই ছয়বৎসরের ইতিহাস মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথের জন্য শোক করিতে আর ইচ্ছা হয় না। রবীন্দ্রনাথের মত পুরুষ এ জাতির মধ্যে জন্মিয়া যে দীর্ঘ আশা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার মত উচ্চত্ব তখন আর কাহারও ছিল না। যে বেদনা প্রকাশ করিতে গেলেও তাহার মর্যাদাহানি হয়। তাই তিনি যখন বড় বাথা পাইতেন তখন প্রাণের সেই আর্তস্নিগ্ধকে নিবারণ করিবার জন্য নিজের আত্মাতেই শরণাপন্ন হইতেন, সেই আত্মাই ছিল তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। কবি-গণের আত্মজীবন-কথা তাঁহাদের কাব্যেই প্রচ্ছন্ন ও গভীর হইয়া থাকে, কবি-ব্যক্তি ও কবি-পুরুষ এক নহে। রবীন্দ্রনাথের সেই গভীর-গোপন বেদনার অন্তরক্ত শোণিত মাঝে মাঝে বাহিরেও প্রকাশ হইয়া পড়িত, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি একটি কবিতাই বারবার স্মরণ করি; আরও বহু কবিতার বহুতর ছত্র-বেদনায় আকাশ আছে, কিন্তু ঐ একটি কবিতায় যে বেদনা যেমন [illegible] হইয়া উঠিয়াছে এমন আর কোথাও নয়। আমরা তাহার অর্থ বুঝি নাই, আজ তাহা আপামর-সাধারণে বুঝিবে। তাই আজ যখন তিনি আর শরীরে বিদ্যমান নাই, তখন আমরা তাঁহাকে এক অসীম বেদনার সাথী-রূপেই প্রাণের আরও নিকটে পাইব। সেই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
নিখিলের আঁখি,
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই গগনে, ওগো,
আমরা খাঁচার পাখী।—
করুণাবন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়-রাত্রি ঘোর?
চিরদিনের আলোক ফেল কি মুছিয়া?
চিরদিনের আশ্বাস ফেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি?—
তোমা পানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী।

* * *

করুণাবন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি মুকুল বাঝে অতি সুকঠোর!
আজি পিঞ্জর দুলাবারে কিছু নাহিরে,
তার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে,
মরীচিকা লয়ে' ছলনা বলনা,
আপনারে দিব ফাঁকি—
সে আশাটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখী।

* * *

করুণবন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চক্ষে নাহি ত' লৌহডোর।
সকল দেখার ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
দেখা হলো তব বিমল পুচ্ছ ঝুড়িয়া—

রবীন্দ্রস্মৃতিতর্পণ

[বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩৩৪]

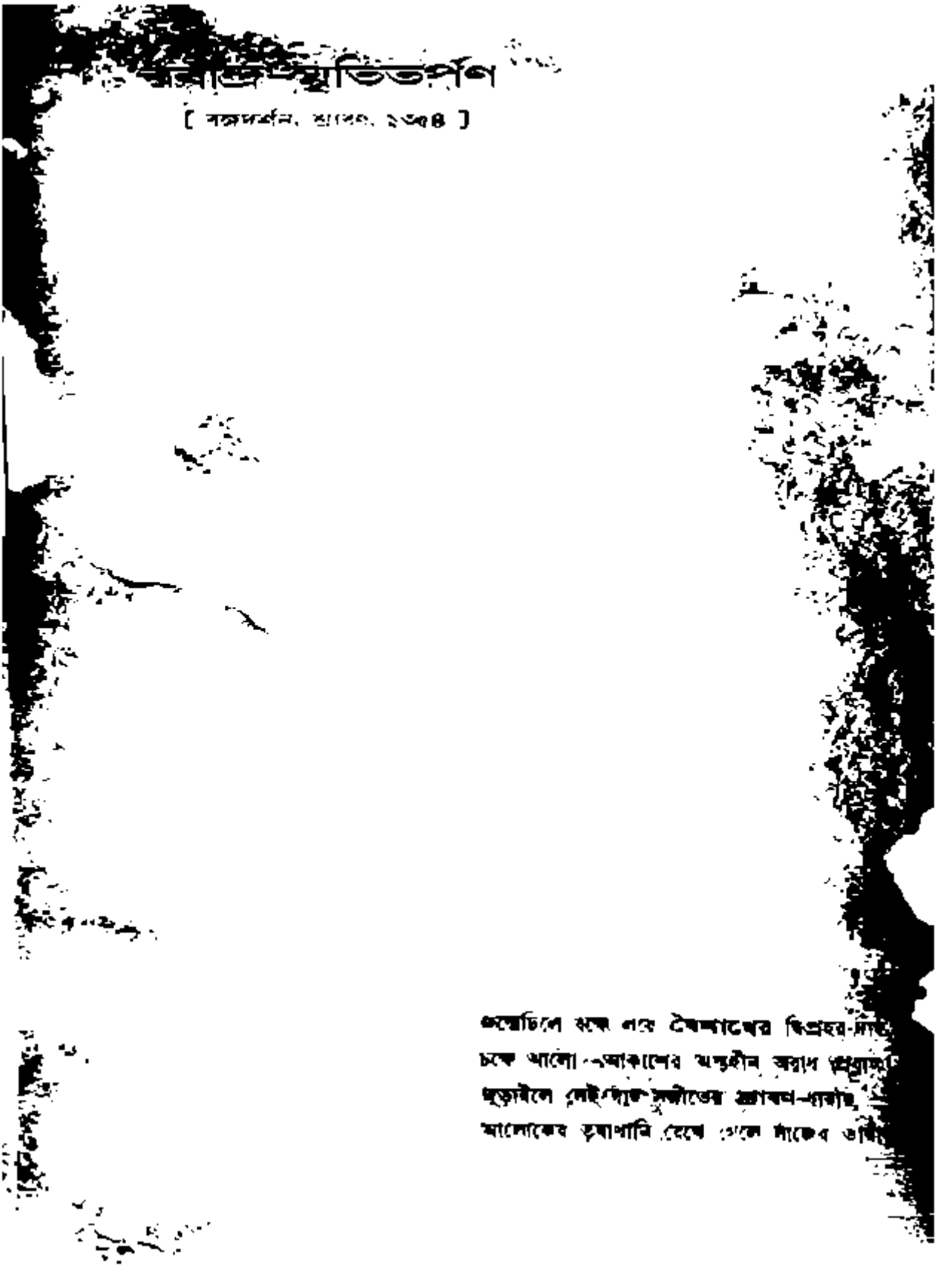

অন্ধেরিলে বসে এক বৈশাখের দ্বিপ্রহর-দা
চক্ষে আলো-আকাশের অন্তহীন অবাধ প্রসা
দূরান্তরালে সেই দীপ্ত সঙ্গীতের প্রাবণ-ধারা,
আলোকের তৃষাখানি রেখে গেলে দাকের তা

'দেখেনি, দেখেনি প্রভাতের রবি!'
কহ 'আমাদের ডাকি';
যুমিয়া যাহার তুমি সেই গান
আমরা বাঁচার পাখী।"

ভারতবর্ষ এখনও সেই বাঁচা, আমরা এখনও সেই বাঁচার পাখী; তফাৎ এই যে, স্বাধীনতার মরীচিকা লইয়া অপর পাখিগণ আপনাকে ফাঁকি দিতে পারিতেছে, এই বাংলাদেশে বাঙালী আমরা সে আশাটুকুও হারাইয়াছি। তাই এ আর্তরবটি আজ সমগ্র বাংলার বাঙালীর হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের আর কোন কবি ত' এমন আর্তনাদ কখনও করে নাই, করিবে না। বাঙালীও এতদিন ইহার মর্ম বুঝে নাই, আজ বুঝিতেছে। এই কবিতার শেষ স্তবকটিতে কবি তাঁহার 'জনবন্ধু'কে সম্বোধন করিয়া যে আকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন তাহার অর্থ আমরা এখন বুঝি, কিন্তু সে সামর্থ্য কি আমাদের আর আছে? 'জনবন্ধু'-মাঝে কবি তাঁহার নিজ আত্মাকেই ডাকিয়াছেন; মানুষের চরম সঙ্কটে এই আত্মা ছাড়া আর কে তাহাকে উদ্ধার করিবে? তিনি সেই আত্মাকে — সকল ভয়, সকল বন্ধনের অতীত যে তাহাকে — উদ্বুদ্ধ করিয়া নিজেকে আশ্বস্ত করিতেছেন। "তোমার চেয়ে আমি ত' শ্রেষ্ঠতর"— ইহাই যদি বুঝি ও বিশ্বাস করি, তবে আমাকে নিরাশ্বাস করিবে কে! সেই বিশ্বাসই ত' মহাশক্তির নিদান। মানুষ তাহার সেই স্বরূপকে সহজে চিনিতে পারে না, কিন্তু ভয়-নিরাশের ঘোরান্ধকারে, বজ্রানলশিখার চকিত আলোকে তাহাকে দেখিতে পায়। কবিও সেই অন্তরঙ্গ বাসনার নিষ্কেতন হইয়াই এই বিশ্বচেতনার অধিকারী হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই দেশে এই জাতির অন্তরে জন্মিয়া এক মহাদেবতার তপশ্চরণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। সেদিন রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে যত শোকার্ত হইয়াছিলাম। আজ! রবীন্দ্রনাথ এখনও বাঁচিয়া থাকুন — এ কামনা করিতে পারি? আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার সেই জরাজীর্ণ জীবন-ক্লান্ত দেহে তিনি যে বেদনা অনুভব করিতেন — তাহা কি আমরা কল্পনাও করিতে পারি? কল্পনা করা দূরে থাক্, আমরা সে চিন্তাই করি না। আমরা যদি সে চিন্তা করিতাম, যদি সেই আত্মার পরিচয় রাখিতাম, তবে আজ বাংলার এই অন্ধকার-আকীর্ণ মহাশ্মশানে রবীন্দ্রনামের নামে যে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরবের জয়-কোলাহল করিয়া থাকি — দূরবর্তী পথের অবস্থানেও আমরা রবীন্দ্র-পূজার যে তামসিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহাতে কি আমাদের প্রবৃত্তি হইত? সেই উপলক্ষে দেশে যে অসংখ্য সভা-সমিতির এপিডেমিক পড়িয়া যায় তাহাতে কাহারা পূজা পায়! এই সকল সভা-সমিতির উদ্যোক্তা যাহারা তাঁহাদের ভক্তি কি তামসিক ভক্তি নহে! সেই তামসিক ভক্তির মুখোশে যাহারা সভার শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাঁহারাও কি রবীন্দ্র-পূজা অপেক্ষা আত্মপূজা বা আত্মপ্রচারের প্রতি অধিকতর মনোযোগী নহেন? কেহ কেহ সেই উপলক্ষে এমনই পূজনীয়তার অধিকারী হন যে, কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় —

"দেবতার সেরা কী দেবতা এঁরা
পূজা-জনেরও পূজ্য?
যাহাদের পিছে পড়ে স্নেহ নীচে —
'রবি' হয়ে স্নেহ উহ!"

আমরা কি তখন সত্যই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি? যদি করিতাম এবং রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ও বাঙালীর কি ছিলেন — বিশ্বকবি হইলেও তিনি যে কতখানি বাঙালী ছিলেন, তাহা যদি বুঝিতাম — তবে আজ জাতির এই আসন্ন মহা-নিপাতের দিনে আমরা তাঁহার অবস্থা কল্পনা করিয়াও শিহরিয়া উঠিতাম। দেখিতাম, রবীন্দ্র-

নহের সেই কবি দূর ও কবি নির্ভীক কণ্ঠও চিরদীর্ঘ হইয়াছে। তিনি কি তখনও তাঁহার সেই দরাজ-গলার কণ্ঠস্বরের বীণাতন্ত্রীতে, বিশ্ব-মানবতার বিজয়-গানের গান গাহিতেন? রবীন্দ্র-নাথ মরতে বসি হইল, যত উচ্চাঙ্গের ভাবুক হইল, তাহাদের তথা বিশ্বের আনন্দে ততই অনুপ্রাণিত হইল, তিনি চিরদিন মানুষ: তাঁহার প্রাণ যদি মানুষের প্রাণ না হইত তবে তিনি মানবতার মাঝখানে হাতে পারিতেন না। সেই মানুষের অন্তরঙ্গ কি? — প্রেম। সেই প্রেমের মূল থাকে কোথায়? — আপন স্বজাতে, আপন সমাজে, আপন দেশের ভালবাসায়। সে-ভালবাসার মহত্তর প্রেরণা কি? — সেই জাতির, সেই সমাজের সাধনা ও সংস্কৃতি, তাহার গর্ব ও মর্মান্তিক উজ্জীবিত ও উত্তীর্ণ করা, ও তাহা রক্ষা করার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। আজ রবীন্দ্রনাথ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে কি দেখিতেন? তিনি কি দেখিতেন না — তাঁহার সেই আজন্মের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার সেই স্বদেশীয় প্রেম ও সুমহতী সাধনা আজ কাহার অট্টহাসে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে! বাংলার সেই দুর্ভিক্ষও তিনি দেখিতেন — সে-দুর্ভিক্ষ বাঙালীজাতির মহাপাপের সাক্ষ্যস্বরূপ চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিবে। তারও পরে তিনি বাঙালীর এই চরম দুর্গতিও দেখিতেন। আরও দেখিতেন, এই দুর্ভিক্ষ ও এই দুর্গতিই সরোজে যাহাদের সহায় হইয়াছে — অতি-চতুর চতুষ্পান যাহারা এক জটিলের ধর্ম-পলিটিক্সের দ্বারা জনসমাজকে বশীভূত করিয়া, সেই সুযোগে নিজ নিজ ব্যবসায় বজায় ও ফলাও করিয়া তুলিয়াছে — তাহারাই রবীন্দ্রনাথের নামটাকেও খাতিরবৃদ্ধির কাজে লাগাইয়াছে! দোকানে দোকানে — পণ্যের মূর্তির মত — তাঁহার মূর্তিটিরও পূজা হইতেছে!

তাই রবীন্দ্রনাথের জন্য সেদিন যে শোকে কাতর হইয়াছিলাম — আজ সে শোক পরিহার করিয়াছি। যদি শোকের কারণ এই হয় যে, তিনি আর বাঁচিয়া নাই, থাকিলে আমরা কত বড় সহায়ই না পাইতাম — তবে সে শোক মিথ্যা; কারণ, কোন জাতির বাঁচিবার অধিকারই নাই, আচার ও চরিত্রের জন্য যে দাসত্ব তাহাদের অস্থিমজ্জা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ঐ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জন্যই রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতেন না। এতদিন যেটুকু আশাও তাঁহার ছিল, এই কয় বৎসরে বাঙালীর যে স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে — তাহাতে তিনি আর তিলার্ধ বাঁচিতে চাহিতেন না। বড় সময় বুঝিয়াই তিনি অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। তিনি যে-যুগের বাঙালী, তাঁহার সঙ্গেই সেই যুগেরও অবসান হইয়াছে — জাতিরও সোহাগের, ধর্মান্তর হইয়াছে। এ যুগে এ জাতির সেবা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবে কে?

আজ রবীন্দ্রনাথের সেই মহাযাত্রার অর্থ যখন অতিমাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তখন কবি টেনিসন-রচিত সেই আর্থার-প্রয়াণ-গাথা (Morte d'Arthur) স্মরণ হয়। মহাভারতের ভাবুক, মহাবীর, মহাপ্রাণ নৃপতি আর্থারের সেই ধর্মরাজ্যশাসন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; রাজসভায়, এমন কি রাজ-সংসারে পর্যন্ত কলি প্রবেশ করিল। শেষে নৃপতি আর্থার স্বজন-দ্রোহে আহত হইয়া, ও শেষ যুদ্ধে বিদ্ধ আহত হইয়া, অবশিষ্ট একমাত্র বীর-কক্ষ ও বিশ্বস্ত অনুচর সার বেডিভিয়ার (Sir Bedivere) কর্তৃক সমুদ্রতীরে নীত হইলেন। এইবার তাঁহার মহাযাত্রা; তাঁহার আবির্ভাবও যেমন রহস্যাবৃত, তিরোভাবও তেমনই। গভীর রাত্রে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে কোথা হইতে একখানি ঘুমন্ত তরণী সেই সমুদ্রকূলে আসিয়া ভিড়িল; মরণাহত আর্থারকে কাহারা আসিয়া সেই তরণীতে তুলিয়া লইল। বেডিভিয়ার সেই দৃশ্য অবাক

হইয়া দেখিলেন। তখন মহর্ষি আর্থার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি এখনে খুব সহজ-আবহাওয়া মধ্যে-দীপে যাত্রা করিতেছি—সেখানে ওলন্দাজ দ্বারা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইব। আমি আর ফিরিব না।" এই কথা শুনিয়া বীর বেডিজিয়ার আর্তকণ্ঠে কহিলেন—"স্বামিন্! প্রভু! তুমিও না থাকিলে আমি কোথায় দাঁড়াইব? অতঃপর কে-মুল আরম্ভ হইবে, কে-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে, কে-সমাজের সকলেই যে আমার অপরিচিত, তাহাদের মনই যে জিনি!" তখন মহর্ষি আর্থার তাঁহাকে যে-ভাষায় সান্ত্বনা দিলেন, কবির রচিত সেই বাণী অমর হইয়া আছে। তিনি বলিলেন, "দুঃখ করিও না, এমনই হয়; জগতের কোন সুনিয়ম, কোন সুবিধিই চিরস্থায়ী নয়; যাহা এক-কালে কল্যাণকর ছিল তাহাই অপরকালে অহিতকর হইয়া উঠে; তাই বিনি স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ তিনিও একই বিধির দ্বারা নিজেকে বাঁধিয়া রাখেন না—নব নব বিধানের দ্বারা তাঁহার সেই এক মঙ্গল-অভিপ্রায় পূর্ণ করেন; এই জগৎ-সংসার যতই ঘুরিতে থাকুক—তাঁহারই পদপ্রান্তে সুবর্ণের বৃন্তে তাহা চির-সংলগ্ন হইয়া আছে। এই বিশ্বাস তুমি ত্যাগ করিও না, তাহা হইলেই সকল দুঃখ, সকল নৈরাশ্য দূর হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের সেই মহাযাত্রার দিনে কেন কোন ভক্ত-নারী তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিল কি? প্রায় অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল তিনি এ সমাজে আমাদের সমোরমধ্যে যে ধর্ম ও নীতির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যে সংস্কৃতিকে নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যখন ভাঙন ধরিল, ক্রমে যখন একটা মহা-অরাজক আসর হইয়া উঠিল, তখন এমন একজনও কি অবশিষ্ট ছিল—যে তাঁহার জীবনব্যাপী তপস্যার সেই পরিণাম দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবে? সংসারেই বাঙালী বর্ষীয়ান প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে। যদি এমন কেহ থাকিত, তবে আর্থারের মত রবীন্দ্রনাথ তাহাকে এরূপ সান্ত্বনা দিতেও পারিতেন না; কারণ, সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্তন হয় সত্য, কিন্তু সেই সমাজেও জীবিত থাকা চাই। তাই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ কতকটা আর্থারের মহাপ্রয়াণের মত হইলেও, এই মরণের আরও বড়। রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত মানুষের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারান নাই; জগতের অন্তরালে সৃষ্টিকেই দেখিয়াছিলেন, বৈদিক ঋষির সেই অপৌরুষের মন্ত্রবাণী তিনিও শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালীর তাহাতে কি? জগৎ যদি ধ্বংস না হয়, মানুষও ধ্বংস হইবে না—জাতির বিনাশ হইলেও মহামানবের বিনাশ নাই। কিন্তু মহামানবও কতকগুলি সমাজের সমষ্টিমাত্র; ঐ সমষ্টির জন্য মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে হয়, এমন কি, কালবিশেষে কোন এক ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন আরও অধিক। মহাপুরুষেরা সেই মহামানবেরই জন্মে জন্মিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই বাণী ও মনের আধার হয়—কোন একটি বিশেষ জাতি বা বিশেষ সমাজ। রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী বিশেষ করিয়া ভারতেরই বাণী; আমরা তিনি বাঙালী বলিয়া সেই বাণীর সাক্ষাৎ বা অব্যবহিত অধিকার এই বাঙালী জাতি—যে-বাণীর ভাষা বাংলা তাহার উৎসমূলে যে বাঙালীর সাধনা ও বাঙালীর সংস্কৃতিই আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাই সেই মহাপ্রয়াণের কালে যে-প্রশ্ন তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই সে-প্রশ্ন কি তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই? কে বলিবে? বেডিজিয়ারকে আর্থার যাহা বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ কি তাহা বলিতে পারিতেন?

রবীন্দ্রনাথের চিত্তাকাশে শেষ ও ভাবির কি ছবি উঠিয়াছে, তাহা বুঝিবার শক্তিও এখনো আমাদের নাই, তাই সেটাকেও কোন অর্থ হয় না, এই লক্ষণ সম্বন্ধেই উপরে ইঙ্গিত করিয়াছি। তথাপি বাংলা-সাহিত্য এখনও একেবারে মরে নাই, মরিলে আমরা আজ এত কথা বলিবার অবকাশই পাইতাম না। রবীন্দ্র-সাহিত্য এখনও আমাদের প্রধান উপজীব্য হইয়া আছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা তাঁহার সেই ভাষা-মন্দাকিনী হইতে এমন দুই-এক অঞ্জলি তুলিয়া ধরিলাম, যাহা এখন নিত্যই পান করিতে হয়।

---

(৩)

স্মরণীয় কাব্য-পংক্তি

'হৃদসমর'

রচিও শয্যা আসিছে মৃত্যু মন্থরে,
সব সঙ্গীত ক্রমে ক্ষীণতর থামিয়া,
রচিও শয্যা নামিছে নিদ্রা অন্তরে,
ধরিও ছাতি আসিছে অন্ধ যামিনী।
যদি আসন্ন সন্ধিছে মৌন মন্ত্রণা,
নিঃ-নিঃস্ব অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা॥

ওরে ভয় নাই, নাই নেই-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বুঝা ব'লে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ক্ষুধা-শেষ-অন্ন না।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
ঊষা-নিরাহারা, নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা॥

'রাজা ও রাণী'

[দেবদত্তের প্রবেশ]

দেবদত্ত। জয় হোক্!

সুমিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল?

দেবদত্ত। শোন কেন, মাতঃ! শুনিলেই কোলাহল!
সুখে থাক, রুদ্ধ কর কান। অন্তঃপুর,
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল ত এখনি সৈন্য ল'য়ে
তাড়া ক'রে দিয়ে যাই পথ হ'তে পথে
দীর্ঘটীর কুৎসিত কুৎসিত কোলাহল!

সুমিত্রা। বল দেব কি হয়েছে?

দেবদত্ত। কিছু না—কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, ধরিত্রীর ক্ষুধা।
অন্তহীন অনন্ত ঘৃণ্য বর্বরের দল
ধরিছে চিৎকার করি' ক্ষুধার ভাজন
ভর্ৎসন কাহায়। রাজকুক্ষে ওরে সৌম
কোকিল পালিয়া বড়।

সুমিত্রা। আমা কে কুৎসিত?

দেবদত্ত। অভাগার দুরদৃষ্ট!—হীন প্রজা বড়!
চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার

আজো তার অবসর হ'ল না অত্যন্ত,
এমনি আশ্চর্য্য !

সুমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কি তুমি ?
রাজপুর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে ?

দেবদত্ত। রাজা তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
বজ্রকুমে কুকুরের মত, লোলজিহ্বা —
এক পাশে পড়ে থাকে ; পায় আসাজমে
কভু মুষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
যদি হয় যদি, নহে ত' কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

সুমিত্রা। কি বলিলে,
রাজা কি নির্দ্দয় তবে ! শোন অরাজক ?

দেবদত্ত। অরাজক কে বলিবে ! সহস্ররাজক !

সুমিত্রা। রাজকার্য্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি ?

দেবদত্ত। দৃষ্টি নাই ? সে কি কথা ! বিলক্ষণ আছে।
গৃহশক্তি নিদ্রাগত, তা' বলিয়া শুনে
চোরের কি দৃষ্টি নাই ? সে যে শশি-দৃষ্টি !
তাদের কি বোধ ! এসেছে বিদেশ হতে
ফিরে হতে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আর্ত্তনাদ করিবারে ছই হাত তুলে' ?

সুমিত্রা। বিদেশে ? কে তারা ? তবে আমার
আত্মীয়।

দেবদত্ত। রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমী।

সুমিত্রা। রাজসেন ?

দেবদত্ত। আজ তিনি প্রজা-সুখাসনে।
প্রথম শাসনে তাঁর সিংহাসন ঘেরে
যত উপদর্গ ছিল অরাজক আদি
সব ঘেরে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম্ম !

সুমিত্রা। বিলাসিতা ?

দেবদত্ত। তাঁর দুটি সান্ধ্যের প্রতিমা।
মন্দিরের ঘণ্টার ঝঙ্কার করিয়া শ্রবণ
নিত্যক্ষণে করেন বরণ।

সুমিত্রা। সুরাজিৎ ?

দেবদত্ত। নিতান্তই অল্পলোক, অতি ক্ষীণজীবী,
থাকেন বিজনকোটে, দুখে ভেসে আছে
বাপু বাছা, আকণ্ঠকে চারেন চৌদিকে,
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে—
যাহা কিছু হাতে ঠেকে ধরে তুলি।

'গান্ধারীর আবেদন'

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। মহাস্থির
প্রতীক্ষা করিয়া থাক নিখিল নিথিরে
ধৈর্য্য ধরি'। যে দিন দুর্লভ রাত্রি পরে
সন্ত জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন লাগুক দুঃখনিশি।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু, জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার স্তব্ধতার 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ ক্রুদ্ধিতের মতো
তীব্রবেগে আছড়িয়ে হানে অবিরত
দীর্ণ বজ্রমুষ্টি—সেইমত কাল যবে
জাগে, তারে সবলে অকাল করে সবে।
ফুটাও ফুটাও শির, প্রলয়ো, রুদ্রাণী,
সেই মহাকালে ; তার রুদ্রবজ্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে যজ্ঞ-বর্ষহিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত্ত ঝঙ্কারিত
ধনু পাতিয়া মাথা, তার পরতলে,
চির দিন কংসিতের রক্ত-পঙ্কতলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক জাগিয়া নীরবে,

চাহিয়া নিমেষহীন। তার পরে ধরে
গগনে উঠিবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে পুরে ক্রন্দনের ধ্বনি,
হায় হায় হা রমণী হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার!—তখন দুইটি
ধূলায় পড়িয়া লুটি' অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নমঃ
সুনিশ্চিত পরিণাম নিশাক নির্মম
নিরুদ্যম নিষ্ফলতা। নমো নমো নমঃ
করুণ কঠোর-কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিচ্ছেদের তীব্রতা নিবৃতি,
শ্মশানের ভস্মসাধ পরমা নিষ্কৃতি।

'এবার ফিরাও মোরে'

ওরে তুই ওঠ আজি!
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি'
জাগাতে জগৎ-জনে? কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
মুহুর্মুহু? কোন্ অন্ধ-কারা মাঝে বন্দিনীর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? শীতকার অপমানে
অন্তরের রক্ত হ'তে রক্ত তুলি' কলিঙ্গের পানে
লক্ষমুখ দিয়া। বেলাবারে করিতেছে পরিহাস
বার্থোদ্ধত অবিচার। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকায়েছে ছদ্মবেশে। তাই যে ধাত্রীর নন্দিনী
মূক মুখে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত-শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, বক্ষে যত চাপে ভার
বহি' চলে কণ্ঠগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি',
নাহি তর্কে অনুযোগে, নাহি চিত্তে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় সমস্ত নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে তার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আসে,
ধরিত্রীর তলবানে যারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ-কুকুরের মতো সঙ্কোচে সভয়ে যাবে মিশে।

'ধর্মশেষ'

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিন-ক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উধাও পথিক।
মুহূর্তে করিব পান দুরন্ত যৌবন উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি',
দিন শীর্ণ জীবনের সব লজ্জ বিফলতা লাঞ্ছনা
উপার্জন করি'।

শুধু বিলাসীর, শুধু প্রাণহীনের গ্লানি,
শুষ্কতার ত্রাসি,
নিশি-দিশি রুদ্ধ ঘরে ঘুমাবিনা তিমিরে দীপের
ধূমায়িত কালি!
লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র অঙ্ক-অংশ-ভাগ,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে,—
সহে না সহে না আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি'
মৃত্যু মৃত্যু ভয়।

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট পুরুষ
দূর-দূরান্তের।

হেরিব অকস্মাৎ ছিন্ন হ'য়ে ঊর্ধ্বে সরে যায়
শতকুণ্ড ঘনে,
মহান-দুয়ার মাঝে মুখামুখি হ'য়ে যায় মোরে
রুদ্রের আলোতে।

রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজী কবিতা ও বাংলা অনুবাদ *

[বাংলার যুবজনের উদ্দেশে কবির স্নেহ-বাণী]

Fear not, for thou shalt conquer.
thy doors will open, thy bonds break.

Often thou losest thyself in sleep.
and yet must find back thy world
again and again

The call comes to thee from earth and
sky, the call from among men,
the call to sing of gladness and pain,
of shame and fear.

The leaves and the flowers,
the waters that fall and flow,
ask for thy note to mingle with
their own,
the darkness and light
to tremble in the rhythm of thy song.

হবে তব জয়, করিও না ভয়—
টুটিবে শিকল, ভাঙ্গিবে যে কারা খুলে ;
মূর্ছাঘোরে তুমি কেবলি যে পড় ভুলে'
আপনারে যাও ভুলে'—
তবু ফিরে পাও আপন ভুবনে আপনার পরিচয়।

আকাশ ধরণী ডাকে যে তোমারে,
ডাকে তোমা লোকালয়—
তোমার কণ্ঠে চায় শুনিবারে
যত সুর আছে হাসি-ধ্বাহাকারে,
জয় লাঞ্ছনা—সেও হ'বে সুরময়।

ফুল উঠে দুলি', পাতায় কাঁপন লাগে,
ঝরে নির্ঝর, নদী যে বহিয়া যায়—
তোমারি সুরে সবাই গাহিতে চায়,
আলো আর কালো তব সঙ্গীত-রাগে
পুলকিতে চায় ছন্দের সুষমায়।

* ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ-পরিচালিত ইংরেজী মাসিকীর জন্য রচিত, এবং সেই পত্রিকার থোলমুখে প্রকাশিত। অনুবাদটি আমাদের, ইহাও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও স্মৃতি-পূজা

ক্ষিতিমোহন সেন

১৯২০ সালে এপ্রিল মাসে মহাত্মাজী গুজরাটে সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে কবিগুরুকে সভাপতি হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভ না হইলেও মহাত্মাজী রাজনীতির ক্ষেত্রেও একচ্ছত্রী।

কবিগুরু গুজরাটে গেলেন, সঙ্গে কর্মীর দিঃ এণ্ড্রুজ, সন্তোষ মজুমদার ও আমি চলিলাম। এপ্রিল মাস, তখনও গরম খুব বেশি হইবার কথা নয়। কিন্তু পথে বেশ গরমই পাইলাম। বোম্বাই পৌঁছিয়াই দেখা গেল, অভ্যর্থনা ও বিশিষ্ট জনসমাগমে কবির আর বিন্দুমাত্র অবসর নাই। বোম্বাই হইতে আমরা আমেদাবাদ পৌঁছিলাম। আমাদের স্থান হইল সহরের উপকণ্ঠে শাহীবাগ পার্কে, শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাইর বাড়ীতে। সেখানে একজন অপূর্ব সাহিত্যিক মহীয়সীর দেখা পাইলাম, তাঁহার নাম পণ্ডিত রমাবাঈর ভূবেরকী বহিন। তিনি এখন পরলোকগত।

সাহিত্য-পরিষৎ-সভা হইয়া গেল। কবিগুরুর অভিভাষণে সকলে মুগ্ধ হইলেন। কবিগুরু দেখিলেন, তিনি আমেদাবাদে শাহীবাগ পার্কেই আছেন। "শাহীবাগ" একটি প্রাচীন নবাবী প্রাসাদের নাম। 'শাহী' কথার অর্থ রাজকীয়, 'বাগ' অর্থ উদ্যান। অর্থাৎ রাজকীয় উদ্যানের প্রাসাদ। মুঘল আমলে বহুকাল হইতে এই উদ্যান ও প্রাসাদে জেলার জজ বাস করেন। কবিগুরুর দেবেন্দ্রনাথ কর্মীর সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর আমেদাবাদের জজরূপে এই বাড়ীতেই দীর্ঘকাল ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথের কাছে কবি এই বাড়ীতে কিছুকাল ছিলেন। এখানেই তিনি সুরসহ তাঁহার প্রথম গান রচনা করেন। শাহীবাগ নাম শুনিয়াই কবির সেই সব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সেই পুরাতন প্রাসাদটি আবার দেখা যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই সময় যে সিভিলিয়ান জজটি ঐ বাড়ীতে ছিলেন তিনি একজন উদার ও অভিজাত সজ্জন ও সাহিত্য-রসিক। তিনি আগ্রহের সহিত কবিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কবির সঙ্গে আমরাও সেই প্রাসাদে দেখিতে গেলাম।

এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি, কবিগুরু তাঁহার পুরাতন সব স্থানের অক্ষয়চিহ্ন রাখিবার ঘোর বিরোধী। উপনয়ন হইয়া গেলে যার বৎসর বয়সে, যখন কবি তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন একটি ছোট নারিকেল গাছের ছায়ায় বসিয়া এখানি খাতা হইয়া যায় বহুরের বালক-কবি 'পৃথ্বীরাজ-পরাজয়' নামে একটি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। নাটকখানা বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তাহার কিছুটা স্মৃতিকাহিনী কবিগুরুর 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে পাই। ১৯০৮ সালে আমি যখন আশ্রমে আসিলাম তখন শুনু নামে একটি ত্রিবেদনি গম্ভীর ও চিন্তাশীল বালকস্বভাব বিদ্যালয়ে পড়িত। একদিন কবিকে শুনু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি নাকি কবিতা লেখো?" কবি বলিলেন "হাঁ, লিখি।" তখন গম্ভীরভাবে শুনু বলিল "আমিও কবিতা লিখি।" কবি তাহাকে শুনুকে স্নেহের সহিত আদর করিলেন।

শুনু কোথায় শুনিতে পাইল, কবি বাল্যকালে ঐ নারকেল-গাছের তলায় কবিতা রচনা করিতেন। সেও মাঝে মাঝে খাতা লইয়া ঐ গাছের তলায় আসিয়া রচনা করিতে বসিত। ক্রমে আরও অনেকে ঐ

নারকেল-ডাঙার আসিয়া সহরের সহিত গাছটিকে দেখিত। কবির ভয় হইল, ক্রমে ঐ গাছটি একটা পুরা বন হইয়া যাইবার। একদিন তিনি আমাদের কাছে গাছটি কাটিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করিলেন। আমরা তাঁহাকে রাজী করাইতে তিনি আর তখন কিছু বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরে এক দীর্ঘনিশ্বাসে বাড়ী হইতে আসিয়া দেখি, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে দা'ওয়ালা মজুর লাগাইয়া কবিগুরু গাছটি ছেদন করাইয়াছেন এবং তাহার মূলদেশও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন।

কাজেই যখন কবিগুরু তাঁহার পুরাতন দিনের স্মৃতি-চিহ্ন দেখিতে চলিলেন তখন মনে ভাবিলাম, তিনিই তো নিজের সৌন্দর্য-চেতনায় গাছটিকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন, আমরা তিনিই চলিয়াছেন তাঁহার কৈশোরের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে। তাই একটি বিশেষ ভাবের আগ্রহে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সহিত শাখীবাস দেখিতে গেলাম। অবনীন্দ্রনাথের বাড়ী হইতে সেই বাড়ীটি দূরে নহে। শাখাবহুলা নদীর উপরেই পুরাতন মহাবীর প্রাসাদ।

শাখীবাস প্রাসাদের নীচের তলাগুলি একরকম রহস্যময় অন্ধকারে ঘেরা। সেই অন্ধকারের মধ্যে নানা অলিগলি, বারান্দা চারিদিকে গিয়াছে। বারান্দাগুলির চারিদিকের পাষাণপ্রতিবেশে পাথরের গায়ে কত মূর্তি, কত কাজ! মনে হয়, যেন আমরা উপন্যাসের এক স্বপ্নপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ভয়াবিষ্টের মত কবি সেই সব অলিগলিতে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "এই সব কারুকার্যময় শিলাস্তম্ভ ও ভিত্তিগুলি সেইযুগে আমার কাছে জীবন্ত ছিল। আমি সারাদিন এই স্বপ্নপুরীর মধ্যে পুরাতন দিনের সুখের জীবনলীলা দেখিতাম। আমার 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে, ও 'শিল্পশাস্ত্র' প্রভৃতি কবিতায়, তাহার কিছু পরিচয় আমি রাখিয়া দিয়াছি। সারা অন্ধকার কাটিত আমার এই স্বপ্নপুরীতে। সেজদাদার লাইব্রেরীতে অনেক চিত্তরঞ্জন ইংরেজি গ্রন্থ ছিল। ছবির সাহায্যে ও নিজের চিন্তার সৌন্দর্য দ্বারা কতক বুঝিতাম, কতক বা কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতাম। আমার সবটা শিক্ষা আমি অক্ষরবদ্ধ পুঁথি হইতে পাই নাই; আমার শিক্ষা বহুপরিমাণে স্পর্শ ও দেখার কাছেও ঋণী। সেই স্পর্শ ও দেখা শুধু পুঁথির নহে। আকাশে, গাছে-পালায়, পশুপক্ষীর দেহে, পুরাতন মন্দির ও প্রাসাদে, নানাস্থানে নানা রেখা ও বর্ণের খেলা নিরন্তর আমার চেতনাকে জাগাইয়াছে।"

পণ্ডিত ভরদ্বাজস্বামী বলিলেন, "আপনি অক্ষয় সাহিত্য বিশ্বে অক্ষয়ের গুরুর দক্ষিণা পরিশোধ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার স্পর্শ ও রেখাগুরুর দক্ষিণা তো আপনি পরিশোধ করেন নাই।"

তাহাতে কবি একটু হাসিলেন। সেই হাসির ভাবটা এখন যেন মনে হয় ওইরূপ, "সেই দক্ষিণা দিবার আয়োজনও আমি করিতেছি, কিন্তু এখনও তাহা সর্বজনসমক্ষে রাখিবার মত সময় অবসর হয় নাই। ক্রমে একদিন আমার সেই গুরুদক্ষিণার খবরও সকলে জানিবে।" অবশ্য তখন তাঁহার কথার মর্ম আমরা বুঝি নাই।

তাহার পর কবি বলিলেন, "ছাদে চলুন।" সকলে গিয়া দেখিলাম এক প্রকাণ্ড ছাদ। শাখীবাসের এই বাড়ী ও ছাদের কথাও কবির 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে।

সেই অপূর্ব ছাদের এক পাশে আসিয়া বসিলাম। কবি তাঁহার পুরাতন সব কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "এই সব স্থান দেখিলে কিরূপ সুখের কত কথাই মনে পড়ে!"

তখন আমি বলিলাম, "স্মৃতিচিহ্নগুলির যে মূল্য আছে তাহা তো আপনি এখন স্বীকার করিলেন, তবে আপনি কেন নির্মমভাবে শান্তিনিকেতনের

সেই মাহিষ্যদাসটি সবলের অত্যাচারে কাটিয়া ফেলিবে।"

তবি হাসিয়া বলিলেন, "এই সব মূর্তিচিহ্নের দাম কিছু মূল্য তাহা আমারই কাছে। অন্যের কাছেও হয়তো কিছু মূল্য হয়, যখন তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের আপন করিয়া জানেন। কিন্তু এই চিহ্ন মূর্তিকে যদি আমরা ক্রমে ক্রমে পূজা দিতে প্রবৃত্ত হই, তবে মানবাত্মার সেই অপমান তো অল্প। দেশের আমি কবি ও শিল্পী সেখানে আমার কাছে প্রত্যেকটি রেখার ও বর্ণের অপরিমিত মূল্য আছে। কিন্তু যখনই সেই রেখা ও বর্ণগুলি আমাদের কাছে ভক্তির অর্ঘ্য রচি তরে তখন তাহা অন্য। এইসব চিহ্নগুলি যদি শুধু চিত্রশালা বা মিউজিয়মের বস্তু হইয়া থাকিত, তবে তাহাতে কিছু আসিত যাইত না, কিন্তু যেই তাহারা আমাদের ভক্তির মন্দিরে ঢুকিয়া দেবতা হইয়া বসিতে চাহে তখন তো আপত্তি না করিয়া পারিনা। আপনারা তো জানেন, আমার পিতৃদেব কোথাও তাঁহার মূর্তি বা চিত্রাদির প্রতিষ্ঠা স্থাপনের বিরুদ্ধে কিরূপ কঠিন ভাবে নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন। হয়তো অনেকের কাছে মনে হইবে ইহা বাড়াবাড়ি, কিন্তু একথা নিশ্চয় জানিবেন আমরা যদি সাবধান না হই তবে একদিন ঐ ভক্তির দুর্বলতার ভার আমাদের সকল সাধনাকে চাপিয়া মারিবে। যাঁহারা এখন আছেন আচার্য, ক্রমে তাঁহারাই তখন হইয়া দাঁড়াইবেন পাণ্ডা বা মোহন্ত। তখনই "রাজা ও রাণীর" বিদেশীর মত আমরা কেশাক্ষের পূজা করি, কিন্তু তাহা পড়িয়া দেখিবার মত শক্তি যাবাই। সিন্দুরে-চন্দনে তখন বেদবেদান্তের অক্ষরগুলা ঢাকা পড়িয়া যায়। আমাদের দেশের যে পোষাকগুলি যখন মন্দির হইয়া উঠিল, তখনই যখন পাণ্ডা হইলেন, তখনই তাহার হইল পরাধীন। তখন সোমনাথের মত এই সব মন্দিরের অভ্যর্থনা অর্থরাশিই বিদেশ হইতে লুব্ধের দলকে আকর্ষণ করিয়া আনিল, আমাদেরই অর্থ দিয়া আমরা আমাদের স্বাধীনতার অপহারীদের পুরস্কৃত করিলাম।

মুক্তির তপস্যা আজ আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার দেহ-ধাতু লইয়া যে সব অর্থের ঐশ্বর্য — তাহাই আজ আমাদের দেশের মুক্তির উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া আছে। এই বিষয়ে বৈদিক ঋষিদের সরল সহজ ব্যবস্থাই ভাল। শ্রাদ্ধাদনে তপস্যাই ছিল মন্ত্র — মন্দিরের ঐশ্বর্য তাহার ছিল না।

আজ যখন ফিরাতে তবে আমার দেহের পঞ্চভূত প্রকৃতির পঞ্চভূতে মিলিয়া যাউক; মাটি মাটিতে মিলুক, জল জলে মিলুক, বায়ু বায়ুতে মিলুক। যাহা থাকিবার তাহা আমার কৃত সাধনা ও তপস্যা। তাই ঈশোপনিষদ বলেন —

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।"

এই সব কথাতে মনে হইল, রবীন্দ্রনাথ আপনাকে কবিমাত্র মনে করেন না। তিনি যে ভারতীয় সাধকদের সন্তান, সেই দায়িত্ব তিনি কখনো বিস্মৃত হইতে পারেন না। তাই ইয়োরোপ-প্রবাস এই সব মূর্তিচিহ্ন-পূজার কথায় তিনি চিন্তিত হইয়া উঠেন।

তখন এণ্ড্রুজ সাহেব বলিলেন, "তবে কি আপনি ফোরা সব মূর্তি-চিহ্নকে কিছুতেই প্রশ্রয় না দিয়া ছাড়িবেন না?"

কবিগুরু বলিলেন, "পতিব্রতা নারীর পক্ষে তাহার স্বামীর ফুলমালাও পালনীয়। কিন্তু যদি কোনো ফুলমালা তাহার প্রভুর হাত দাবি করিতে আসে তখন তাহাকে মার্জনা করা যায় কেমন করিয়া? ইয়োরোপে আমার আর একটা বিড়ম্বনা আমাদের দেশে আসিয়াছে—মৃত্যুর পর মুখমেহের ছবি তুলিয়া রাখা। আমার মতে এমন কুৎসিত ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না।"

আমাদের দিকে চাহিয়া তখন তিনি বলিলেন, "প্রাচীনেরা যে প্রয়াণকালে লোকজন ডাকিয়া

করিবেন তাহার মধ্যে একটি সুন্দর ভাব আছে। চোখের অন্তর বিশ্লেষণ বাহির প্রকৃতির গন্ধ হইতে মুক্তি দিয়া মুক্ত আকাশের তলে আমাকে যদি রাখে তবে যাইবার দিনেও আমি শান্তিতে প্রাণ ত্যজিব। আর মৃত্যুর পরে যদি আমার চিত্রিত কেহ অঙ্কিত বিশেষের ঘরে, তবে আমার দুঃখের অবধি থাকিবে না।"

তাঁহার মতে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি হইল—যখন যেখায় তাঁহাদের সাধনাকে অগ্রসর করিয়া লইয়াছেন। প্রতিচ্ছবি-রক্ষা নহে, ঐ সাধনা তো সাঙ্গ নহে।

আজ নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু ঘরে তব ওকলায়;
এসে এসে ভরা বরষায়।
এসে গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসে গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি' যে গান বাজায়ে—
সে গান তোমায় কব নাই,
আজি জলভরা বরষায়।

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে;
সূর্য্য যেথায় অস্ত যায়ে—
ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই—
তোমার তোমা আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তবে পাব ত' তবু;
চিত্তায় তোমে হতাশ মনে
হৈব না আর কভু।

বঙ্গ-কবির বিদায়

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর।

বিদায় দিল লুকোচুরি শিউলি-ঝরা ঘাসের তলে,
বিদায় দিল সকল ভোরে ন'বছরের ক'নে।
বিদায় দিল কাঁসরোতলা-ফুটন, বরষে ভাদর,
মাকটি হ'তে মেয়েক-মোতি, চরণ হ'তে মল।
বিদায় দিল কুমীর-ভীতা শঙ্কিতা বধূ—
হরণ করা তরুণ চোখের চাউনি সুমধুর,
সুবাস-ভরা টেকো-খোঁপায় চরু-চিকন ছবি,—
তাহার সাথে বিদায় দিল কবি।

বিদায় দিল অঞ্জনা-ঘা'র অঞ্জনা খাল,
পান-সুপারি নিছনি আর গুরু-বরণ-ডালা।
বিদায় দিল রায়বেঁশের বির দেবার কথা,
বিদায় দিল লক্ষী-ঘরের চরণ-আলিপনা।
বিদায় দিল পিতল-কাঁসার সোণা-রূপার প্রভা,
চাঁদনী-সাঁঝে আঙিনমাঝে উপকথার সভা।
বিদায় দিল লুকনা তুলসী, জাহ্নবী,—
তাহার সাথে বিদায় দিল কবি।

বিদায় দিল টুসটুসে সেই আদুড়-রাঙা পা,
বিদায় দিল লঘু-বেশন গামছা-মাজা গা'।
বিদায় দিল আদুরতীর লোহা-সিঁদুর-শাঁখা,
পথের ধারে কলসী-কাঁখে সিনান ফিরে থাকা।
রাঙা ঠোঁটে শাঁখ-বাজানো, এয়োর হুলুধ্বনি,
বিদায় দিল পীরির-ঘাটের চটুল আলাপনী।
চাকার সিঁদুর উড়িয়ে যখন নিচ্ছে বিদায় রবি,—
তাহার সাথে বিদায় দিল কবি।

বিদায় দিল পুকুর-ঘা'র চণ্ডীমণ্ডপ ঘাট,
সেজ-শিমুরে প্রাচীর-ধারে কালী-বাড়ের পট।
ধান-দুর্ব্বায় আশিস্ গেল—মায়ের হাতের ফোঁটা,
ছড়াছড়ির পাপড়ি গেল, রইল শুধু বোঁটা।
ঘুমের হাওয়া বহুল গেল, নিছিরে দিল ঘর
সাঝী-সতীর আগন-আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যাহা পুঁজি-পাটা বিদায় দিল সবি—
তাহার সাথে বিদায় দিল কবি।

আমি হব না ভাই নবঘনের
নবদুর্বার চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুপ্তজনার আলোক।
আমি নদী-ধারার ধারে,
ফোয়াড় অশ্রুক-নীলের হারে,
আমি ফোটো জলে পারি হ'তে
ব্রজের গোপ-বালক,
ওরে চাইনা হ'তে নবঘনের
নবদুর্বার চালক।

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

মোহিতলাল মজুমদার

"One may appeal from fiction unto fact. From the soul there is no appeal."—OSCAR WILDE

শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" অনেক দিন আগে পড়িয়াছিলাম, খণ্ড খণ্ড ভাবে—কতক পত্রিকার পৃষ্ঠায়, কতক পুস্তকাকারে। শেষ দুইখণ্ড আরও পরে পড়িয়াছিলাম। এজন্য ঐ উপন্যাসখানির ভাব-সৌন্দর্য বা রচনা-কৌশল একটা সমগ্র-ধারণা হয় নাই; কতকগুলি চরিত্র, কোন কোন বর্ণনা এবং কয়েকটি ঘটনামাত্র মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল; উপন্যাস হিসাবে উহা কিছিৎ অসংবদ্ধ-সম্বন্ধ, এবং উহার প্রথম পর্বটিই শ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

সম্প্রতি, কিছুদিন হইল শ্রীকান্তের চারিটি খণ্ডই এক সঙ্গে পড়িবার অবকাশ হইয়াছিল তাহাতে সহসা ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে যেন একটা নূতন দৃষ্টিলাভ করিলাম, সাহিত্য-শিল্পকলারও একটা অভিনব রূপ যেন চাক্ষুষ করিলাম, এই অর্থে যে—কবি ও কাব্যের মধ্যে যে ব্যবধান সম্বন্ধ আছে, তাহার অনেক কথাই জানিতাম, কিন্তু একটা বড় তত্ত্ব যেন এইবার এই বইখানিতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিলাম; কবি-মনীষিগণ, আধুনিক শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ যাহার একাধিক উল্লেখ করিয়াছেন তাহার এমন দৃষ্টান্ত পূর্বে আর দেখি নাই। 'শ্রীকান্তে'র এই আলোচনায় আমি সেই কথাটি বলিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব, পাঠক-পাঠিকাগণের যদি শুনিতে থাকে, তবে হয় তো আমি আমার সেই দৃষ্টিটিকে তাঁহাদের চক্ষেও ধরাইয়া দিতে পারিব।

এই দ্বিতীয়বার শ্রীকান্ত পাঠ করিয়া আমার যে কথাটি সর্বাগ্রে মনে হইয়াছে তাহা এই যে, যাঁহারা কবি-শিল্পী—বিশেষ কবিরা যাঁহারা কাব্যের জগতে তাঁহাদের নিজ-জীবনের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন—তাঁহাদের জীবন-চরিত কি ঐ রূপ কাব্য হইতে পৃথক? অথবা আমরা সাধারণ অর্থে যাহাকে জীবনবৃত্ত বলিয়া থাকি, তাহা কি এইরূপ কবি-শিল্পীর প্রকৃত জীবনবৃত্ত হইতে পারে? মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথও একদা এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, ঐরূপ জীবনবৃত্ত কবিজীবনের কাহিনীহিসাবে অতিশয় মূল্যহীন। কবিদের জীবনই স্বতন্ত্র, তাঁহাদের জীবনের যে ইতিহাস, তাহা বাহিরের ঘটনাগত ইতিহাস নহে; কালে, কর্ম বা আচরণের মধ্য দিয়া যে চরিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা ঐরূপ মানুষের পরিচয় নয়, বাহিরের সহিত তাহার যোগ অকিঞ্চিৎকর। একে ত' শিল্পীমাত্রেই জগৎ ও জীবনকে কতকটা অন্যমনস্কভাবে দেখিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের জীবনাবলীতে সেই অন্তর-বাসী রসিক-পুরুষের যে পরিচয় পাই তাহাই তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয়, অন্য যে পরিচয় সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সাংসারিক বা

দামাজিক নানা ব্যবহারে তাঁহাদের যে পরিচয় সকলে পাইয়া থাকে, তাহা তাঁহাদের নিজ নিজা তুচ্ছ। তাঁহারা যে জীবন যাপন করেন তাহা যদি সাধারণের মতই হইত, তবে তাঁহাদের দ্বারা ঐরূপ রচনাসৃষ্টি সম্ভব হইত না। অতএব তাঁহাদের জীবনের ঐ বাহিরের দিকটাকে যদি সেই ভিতরের দিকটার সহিত খুঁজিয়া দেখা হয়, এবং উভয়ের মধ্যে একটা সঙ্গতি-স্থাপনের চেষ্টা করা হয়, তবে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করাই হইবে। এইজন্যই বোধ হয়, একজন ইংরেজ লেখক কবিদের জীবনচরিত-রচনাকারীকে ভূতের দেহসন্ধি-সংগ্রহকারী Undertaker, যা মৃতদেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সেই পুরুষের দেহ-জীবন-সম্বন্ধীয় যতগুলি টুকরা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহারা যে বিশ্লেষাত্মক জীবন-বৃত্ত রচনা করে, তাহাতে আর সকলই থাকে, থাকেনা কেবল সেই আত্মাটি — যে অচিন নির্জনে আপনাকে আপনি অনুভব করিয়াছিল, আপনার সেই অন্তরতম সত্তাকে পৃথক করিয়া দেখিবার জন্য বাহিরের ঘটনাভূমিতে তাহাকে প্রসারিত করিয়াছিল। তাহার সেই আত্মদর্শন এতই যে, সাংসারিক ও সামাজিক বহু-ঘটনা তথ্য বা অতর্কের কাহিনীরূপে তাহাকে লিপিবদ্ধ করা যায় না। বলা বাহুল্য, এ আত্মদর্শন দেহের আত্মদর্শন নয়— ব্যক্তি-পুরুষের আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শনই তাহাদের জীবন — জীবনের গতি সেই অনুভূতিকে জিজ্ঞাসিল করে, তাহাকে সূচতর ও গভীরতর করিয়া তোলে। সে-পুরুষের জীবনই অন্তরূপ, তাহাকে সাধারণ জীবনবৃত্তের দ্বারা একটা মিথ্যা পরিচয়ে পরিচিত করা হয় মাত্র।

তবে কি কবিদিগীরের সেই জীবন একেবারেই দুর্জ্ঞেয়? সাহিত্যে আমরা ত' অনেকের আত্ম-কাহিনী বা Confession পড়িয়া থাকি; সেগুলি প্রায়ই বিশ্লিষ্ট আত্মপ্রকাশের মত মনে হয়। যে অনুভূতি বা উপলব্ধি সম্পূর্ণ আত্মগত বলিয়াই পরের নিকটে প্রকাশযোগ্য নয়, তাহা ঐরূপ আত্মকাহিনীতে পাওয়া যাইবে না; লেখকের লেখক অচিন সন্ধান অভিপ্রায়ের মধ্যে আপনাকে যে-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা অপরোক্ষ নয়, পরোক্ষ — পরে যেমন দেখিতে চায়, যা পরকে যেমন দেখাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা সেইরূপ দেখা। তাই লেখকের ব্যক্তি-জীবনের বহিরঙ্গটাই বড় হইয়া উঠে, অন্তরতম সত্তাটি হারাইয়া যায়। কোন কোন লেখক ডায়েরী বা উপন্যাসে তাঁহাদের আত্মচরিতের একটা অংশ যোজনা করেন। সেই চরিত-চিত্রণও আংশিক, এবং তাহাও সেই আত্মপরিচয় নহে — যাহাকে লেখকের আত্ম-সাক্ষাৎকার বলা যাইতে পারে; কারণ, তাহারেও সেই পরমুখাপেক্ষিতা আছে। ইহাই কবি-শিল্পী-গণের আত্মকাহিনী-রচনার দুইটি উপায় বা দৃষ্টান্ত। এইরূপ আত্মকাহিনী তাঁহাদের আত্মার কাহিনী নয়। তাই সাহিত্যের তত্ত্ববেত্তাগণ হতাশ হইয়া একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র কবি-কীর্তিকে কবির আত্মপঞ্জির বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কবিরা তাঁহাদের সেই আত্মকাহিনী কাব্যের রূপকল্পনে নিজেরাই রচনা করিয়া থাকেন, কাব্যের সেই পুষ্প-মালিকার মধ্যেই তাহার ডোর-রূপে সেই জীবন-সূত্র প্রসারিত হইয়া আছে। কথাটা সত্য, কিন্তু সকল কাব্যকার কাব্যসৃষ্টিতে এমন আত্মসচেতন বা আত্মনিষ্ঠ নহেন, অনেকে আত্মবিস্মৃতি বা আত্ম-বিলোপেই কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা পাইয়া থাকেন।

আসল কথা, ঐরূপ কবি-জীবনের জীবনবৃত্ত-রচনা সম্ভব নহে, 'জীবনবৃত্ত' বলিতে যারা বুঝায় তারা ঐরূপ পুরুষের সত্তাকার পরিচয় বহন করে না। কবিগণ তাঁহাদের রচনার ফাঁকিতে, ইঙ্গিতে-ইসারায়, চাঁছে-ছোলে যে আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন তাহা প্রায়ই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। এটুকু পরিচয়ও তাঁহারাই দিতে পারেন—যাঁহারা বাণীকে বশ করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিতে পারেন,

যাহা অন্তর্দৃষ্ট তাহাকে অপরের দৃষ্টিগোচর করিবার শক্তি যাহাদের আছে। তাঁহারা, আত্মার সহিত আত্মার সেই নিভৃত সাক্ষাৎকারকে—সেই অতি-বিচিত্র মিলন-বিরহের নিত্য-নূতন অভিসারকাহিনীকে যদি কোথাও ব্যক্ত করিতে পারেন, তবেই আমরা কবির সেই অন্তরতর আত্মপরিচয় কতক পরিমাণে বুঝিতে পারি। শ্রীকান্ত পাঠ করিয়া ইহাই মনে হইয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার কি কোন প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন নাই, তবে এদিকে কবির জীবন-বৃত্ত-রচনার এত সুযোগ কেন? জগতের অন্য মহা-কবির জীবনবৃত্ত নাই; কাব্যের দায়ে কবি-ব্যক্তিটি যেন এক হইয়া গেছে, অর্থাৎ কাব্য হইতে কবির কোন পৃথক সত্তা নাই। তাহাতে আমরা বিশেষ অভিযোগ করি না—আমাদের যেন তাহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। শেক্সপীয়রের কবি-ব্যক্তির না থাকাই তাঁহার কাব্যের গৌরব। তাঁহার ব্যক্তিজীবনের যেটুকু কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা না থাকিলেও চলিত। আমাদের রবিমণ্ডলের জীবনবৃত্ত এখনও অলিখিত আছে, এবং তাহাই থাকিবে; যাহা কবিতাতে রচিত হইবে তাহা ঐ Undertaker-এর কাজ, তাহাতে শিব বামন হইয়া উঠিবে, এমনই তাহা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্ত-রচনার প্রয়াস হইতেছে, উপকরণের অভাব নাই, বরং বাহুল্যই আছে। কিন্তু সেই জীবন-চরিত রবীন্দ্রনাথের কোন সুস্থ পরিচয় থাকিবেন না, কবি তাঁহার অমল জ্ঞানালোকিত যে আত্ম-পরিচয় যে-ভাবে ও ভঙ্গীতে এবং নানারূপে দিয়াছেন, ঐ জীবন-চরিত তাহারই একটা মুদ্রাদোষ প্রতিলিপিমাত্র হইবে; তাহাও কবির অলিখিত আত্মকাহিনীর মত হইবে—যদি না হয়, তবে সেই কাহিনী ব্যর্থ বা মৃষা হইবে। কিন্তু সে চরিত-কথাও কবিচরিত-কথাই হইবে, ব্যক্তি-মানুষের পরিচয় তাহাতে থাকিবে না। সাধারণ জীবনসূত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও সেই বিষয়টা অতিশয় গৌণ হইয়া থাকিবে।

কিন্তু যদি কোথাও কোন কবি-শিল্পীর মধ্যে ব্যক্তি ও কবি দুইই সমান বা অধিক হইয়া উঠে; ব্যক্তিকে কবি আচ্ছন্ন করে নাই বরং আরও অন্তরঙ্গ করিয়া দাঁড়াইয়াছে; ব্যক্তি-জীবনের যাহা-কিছু তাহা কবি-জীবনে রূপান্তরিত হইয়েছে না—এমনই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব আকারে ব্যক্তি-চিত্তকে বিদ্ধ করিয়েছে যে, তাহার মধ্যে যে কবি আছে, তার-অতিরিক্ত কোনও সত্তা আছে, তাহা ঐ ব্যক্তির নিকটে, ঐ ব্যক্তির নিকটে আত্ম-সমর্পণ করে—কবিরও যেমন, ব্যক্তিরও তেমনই স্বতন্ত্র জীবন থাকে না, তবে এমন পুরুষের পক্ষে আত্মকাহিনী-রচনা যে অর্থে আত্মকাহিনী-রচনা, তেমন আর কাহারও পক্ষে নয়। সেই কাব্য এমন একটি রসে অতিরিক্ত হইবে যাহা কাব্যরসও বটে, অথচ ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব-অনুভূতির অপূর্ব ক্ষমতা সেই রসকে তীব্র তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে। কবি ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইলেও এখানে যেন এক হইয়া আছে।

ইহা সত্য যে, সেইরূপ আত্মকাহিনী-রচনাতে লেখককে একেবারে আত্মহারা হইতে হইবে, অর্থাৎ এমন আত্ম-তন্ময়তার ভাবাবেশ চাই যে, নিজ হৃদয়ের সেই গভীরোৎকণ্ঠা যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই উৎসারিত হইতে পারে। আপনাকে দেখার নামই আপনাকে প্রকাশ করা; যাহা অন্তর্মূলে লুকাইয়া আছে তাহার পাক খুলিয়া যাওয়ার একটা গভীর আত্মসুখও আছে। কবির সকল রচনাতেই এইরূপ একটা আত্মসুখ থাকে বটে, ভাবাবেশের গুরুভার লাঘব করিয়া কবি একরূপ আরাম পান; কিন্তু যে ভাবাবেশে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় তাহা তাঁহারও জীবনে দুইবার হয় না; কবির অন্যান্য কাব্যসৃষ্টির তুলনায় এই ভাবাবেশের যে কাব্য তাহা অতিশয় স্বতন্ত্র, তাহাতে ভাবনার মূলকতা তত নাই, যত আছে অনুভূতির আকুলিকতা। এক

বিশ্বাসে সেই কাজ করিতে সেই শক্তি, কারণ তাহা আত্মার আত্মগত। তাহাকে বেশী বেশী লেখা, অনেক লেখা। কবিজীবনের প্রথম অধ্যায় কাহিনী রচিয়াই কাটিয়াছে।

* *

উপরে যে কথাগুলি বলিয়াছি, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পুস্তকের পাঠ করিয়া তাহাই মনে হইয়াছে। উপন্যাস-খানির ভিতর দিয়া লেখকের আত্মচরিত যে ধারা-বাহিক বিবরণ চলিয়াছে, সে যে কিরূপ আত্মকথা তাহাই সহজ বিশ্লেষণের উপর্যুক্ত করিলাম। সাধারণ পাঠকের মনে 'শ্রীকান্ত' সম্বন্ধে যে ধারণা আছে — তাঁহারা ঐ উপন্যাসকে যে-কারণে ও যে-অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনের দিনী বলিয়া মনে করেন, — বলা বাহুল্য, এ আলোচনাতে সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার মত মানুষ যে অভিজ্ঞতা নিজের অন্তর তীব্র চেতনায় জীবন যাপন করে — তাহাকে ধারণ করে; যে-জীবন তাঁহারই, আর কাহারও নয়; সমাজে বা সাহিত্যে যাহা সুস্থ বা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, — অথচ, যাহা একটা স্নেহমাত্র-বর্জিত অপার্থিব ভাব-জীবনও নয়, বরং বাস্তবেরই অতি তীব্র অনুভূতি যে-জীবনকে শক্তিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে — সেই জীবনেরই ইতিহাসকে যে-ভাষায় ও যে-ভঙ্গিতে ঐ সমাজবহির্ভূত মানুষের চিত্রণোচর করা সম্ভব — ইহা যেন তাহাই। প্রত্যেক মানুষেরই একটা আত্ম-জীবন আছে, চিরকাল ব্যক্তি-মানুষের একটা পৃথক পরিচয় আছে; কিন্তু সে পরিচয় দুই কারণে অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাহা সাধারণ অভিজ্ঞতারই একটা ব্যাপার, তাহার ব্যক্তিটা সত্য হইলেও খুব বিশিষ্ট নয় — যেমন বৈশিষ্ট্যকেও মনোবিজ্ঞানের কয়েকটী তত্ত্বের অধীন করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় — তাহাতেই রহস্যের সমাধান হয়। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে তাহা সাধারণের একটু উপরে উঠিয়া থাকে, সেখানে 'সত্য' ব্যক্তির সেই আত্মজীবনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তাহার নিজের নিকটেও তেমন সুস্পষ্ট নয় — আপনাকে আপনি দেখার মত দৃষ্টি তাহার নাই; তাহার জ্ঞান — সেই অনুভূতিও তেমন গভীর বা তেমন সত্য নয় যাহাতে সে নিজেও চমৎকৃত হয়। আবার, শুধু চমৎকৃত হইলেই হইবে না, সেই অনুভূতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার মত প্রকাশ-শক্তিও চাই — এই শক্তিই কবি-শক্তি, বাক্‌নির্মাণের শক্তি, বাক্যের আকারে সেই আত্মানুভূতিকে রূপ দিবার শক্তি। এখনও বলা যাইতে পারে যে, সেই আত্মসাক্ষাৎকার যদি ঐরূপ অনুভূতি-ধর্মে সত্যই হইয়া থাকে — 'আত্মা'টা যেমন অভিনব বিশিষ্ট, 'সাক্ষাৎকার'টাও তাহার অনুরূপ হয় — তবে তাহার বাণী বা expression-ও অসম্ভবভাবী; যাহা বাক্যের রূপ গ্রহণ করে নাই, তাহা কিছুরই হয় নাই। সকল উৎকৃষ্ট কাব্যরচনার মূলে এই তত্ত্বটি আছে, কবির চিত্তে সকল বস্তুই ভাবরূপে ঐরূপ সাক্ষাৎ-দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়াই তাহা এক একটি বাক্যের সৃষ্টিতে পরিণত হয় — আমরা যাহাকে কাব্য বলি। কিন্তু এখানে আমি যে-সৃষ্টির কথা বলিতেছি তাহা একটু বিশেষ রকমের সৃষ্টি — সেই শক্তি এখানে বিমুক্ত হইয়াছে কবি-ব্যক্তির যে নিজস্ব জীবন — কোন ভাবমাত্র নয়—তাহাকেই বাঙ্ময়রূপ দান করিতে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-উপন্যাসে আমি এইরূপ একটি আত্মজীবন-কথা পাঠ করিলাম।

এই কাহিনীর সহিত যদি তাঁহার বহির্জীবনের ঘটনা-কাহিনীর মিল না থাকে, তবে অবশ্যই আমরা তাহাকে তাঁহার 'আত্মমৃত' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। অন্ততঃ, অন্তর্জীবন যেমনই হৌক, বহির্জীবনে তাহার একটা আভাস থাকিবেই, কারণ যে-অন্তর বাহির হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন তাহা কখনো ব্যক্তির অন্তর হইতে পারে না, — ব্যক্তি যতই মৌন তাহা দেহহীন 'আত্মা' বা 'নির্গুণ পুরুষ' নয়; যদি তাহাই হয়, তবে তাহার ব্যক্তিত্বই

না কি! অতএব 'শ্রীকান্ত' যদি কোন অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী হয়, তবে সেই কাহিনীর অন্তরালেই আমরা তাঁহার বহির্জীবনের কোন একটা রূপ দেখিতে পাইব। ইহাই সাধারণ বুদ্ধি-সঙ্গত; কিন্তু আমাদের কি সেই দৃষ্টি আছে? তা ছাড়া যে-কাহিনী মানুষের নিজস্ব আত্মার কাহিনী, তাহার সত্য কিসের দ্বারা যাচাই করিবে? "One may appeal from fiction unto fact. From the soul there is no appeal"—ইহা অতিসত্য সত্য। তথাপি উহারও প্রমাণ আছে, সে প্রমাণ বাহিরের তথ্য প্রমাণ নয়, তাহা আর একজনের সহানুভূতিতে হইয়া থাকে: আত্মার সংবাদ আত্মাই পাইতে পারে—"Deep calls unto deep."। সাধারণ মানুষের ভিতরকার সত্য পরিচয় আমরা কতটুকু পাই! "Every man is an enigma to his fellow"—ইহাই কি সত্য নয়? যাহার সহিত বহুকাল একত্রে বাস করিয়াছি, যাহার সকল কথা সকল কার্য, দোষ ও গুণ সকল প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায়, বহুদিন ধরিয়া লক্ষ করিয়াছি—সেই সকল হইতে যদি তাহার একটি চরিত্রকথা রচনা করি, তাহা কি সেই ব্যক্তির যথার্থ পরিচয়-কাহিনী হইবে! অনেকেই সেই স্পর্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই আত্মীয় ব্যক্তিটি নিজের সম্বন্ধে যে গর্ব অথবা দীনতা প্রকাশ করে, তাহাও কি সত্য! তাহাকে যে অবস্থায় যে আচরণ করিতে দেখি তাহাতে কি তাহার আরও সত্যটি আছে বলিয়া মনে করিতে পারি? মানুষ কি সর্বদা অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে আত্মগোপন করে না? বাহিরের শরৎচন্দ্রকে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়াছিলেন, জানিতেন বলিয়া তাঁহাদের সেই জ্ঞানের একটু গর্বও করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি তাঁহার ভিতরের জীবনটাকেও দেখিয়াছিলেন? সে কোন্ জীবন? 'শ্রীকান্তে'র কাহিনীতে এবং তাঁহার সেই বহির্জীবনের কাহিনীতে তাঁহারা কি কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষ করিয়া থাকেন? যাহার যে-কাহিনী তাঁহারা অবশ্য জানেন, তাহাতে 'শ্রীকান্ত' একটা পৃথক কবি-কাহিনী যায়, উহাতে ব্যক্তি-শরৎচন্দ্র নাই, কবি-শরৎচন্দ্রই আছেন—অর্থাৎ উহার fact গুলা কোন অর্থে তাঁহার জীবনের fact নয়, উহা একটা কবিকল্পিত fiction মাত্র—ইহাই তাঁহাদের মত হওয়া সম্ভব। বাহিরে কোন 'রাজলক্ষ্মী'ও ছিল না। 'অন্নদা', 'কমললতা'ও বাস্তব হইতে পারে না। যাঁহারা মৃত্যুবিচারশীল তাঁহারা এমন কথাই বলিবেন; যাঁহারা তত্ত্বানু ও অতি-বিশ্বাসী, তাঁহারা শরৎচন্দ্রের জীবনটাই রোমান্সময় বলিয়া মনে করিবেন—তাঁহার একটা গোপন দিক ছিল, তাহা গোপনেই রহিয়া গিয়াছে। এই দ্বিতীয় অনুমানটিই যেমন কৌতূহলপ্রদ, তেমনই অর্থপূর্ণ—উহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, 'শ্রীকান্তে'র কাহিনীতে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এমন একটা কিছু অনুভব করে, যাহাকে তাঁহারা নিছক কল্পনা বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারে না। আমি ইহার কোনটারই প্রতিবাদ করিব না, কেবল এই 'শ্রীকান্তে'র কথাবস্তুতে শরৎচন্দ্রের যে আত্মকাহিনী পাঠ করিয়াছি, তাহাই একটু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহকারে বিবৃত করিব; যদি বাহিরের ঘটনার সহিত তাহা মিলে—শরৎচন্দ্রের ভিতরটার পরিচয় যাঁহারা কিছুও পাইয়াছিলেন, তাঁহারা যদি এই ব্যাখ্যা যথার্থ মনে করেন, ভালই, না করেন তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, এই মূলসত্যের চরিত্রোদ্ঘাটন বিফল হইবে না। আমি পূর্বে বলিয়াছি, একজন আমার বলিতেছি যে, শরৎ-চন্দ্রের অন্য দুইটা মানুষ ছিল না, তাঁহার জীবনে শিল্পী-কবি ও ব্যক্তি-মানুষের অন্য কোন ব্যবধান ছিল না। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—খুব বড় মনের প্রতিভাবে অধিকারী না হইয়াও তিনি যে বাংলাসাহিত্যে একটা অনন্যসুলভ আসন অধিকার করিয়াছেন, রবীন্দ্র-প্রতিভার অ্যাস্ট্রোফিয়ারকেও প্রতিহত করিয়া

তিনি যে স্বতন্ত্রভাবে নীতিজ্ঞান হইতে পারিয়াছেন, তার কারণ—তাঁহার কবি-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনের ঐ অভিন্নত্ব সম্ভব। 'ঐতিহ্য'-পাঠকালে এই কথাটা বিশ্লেষকের মত আমার অন্তরে উদ্ভাসিত হয়; গল্পের আকারে, কাহিনীচ্ছলে, তিনি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের এমন সকল অনুভূতি ও মানসিক সত্য যেন প্রাণের অন্তস্তল উন্মুক্ত করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা তা' নহেই, বরং ব্যক্তির হৃদ্‌গত নিত্য-ভাবে তাহা নিজেও পরাস্ত করিয়াছে। এই কথাটা এখানেই আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি—কবি ও কাব্যের মধ্যে, শিল্পী ও তাহার শিল্পবর্ণের মধ্যে, যে একান্তিক সম্পর্ক থাকে—সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

* * *

ব্যক্তি-মানবের জীবনে কবি-প্রতিভার আবশ্যকীয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেখানে কবি নৈর্ব্যক্তিক। যে শিল্পী যত নৈর্ব্যক্তিক তিনিই তত বড় কবি। নাটক ও লিরিক, এই দুই জাতীয় কাব্যে, ব্যক্তির সম্পর্ক প্রায় বিপরীত হইলেও, লিরিক-কবিও এক অর্থে নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠেন, নিজের বুকের বেদনাকে তিনি এমন একটি সুর-মূর্ছনা দান করিতে পারেন যে, সেই বেদনা আর সকলের মনেও বাজিয়া উঠে; এই অর্থে তাঁহার কাব্যও নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু সেই নৈর্ব্যক্তিকতার লক্ষণ নাটকের মত নয়, কারণ, নাটকীয় কল্পনা নৈর্ব্যক্তিক হইলেও, তাহা কেবল নির্বিশেষ ভাব-রসের সৃষ্টি করেনা—অসংখ্য অনন্যসদৃশ ব্যক্তি-বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াই নিজের নৈর্ব্যক্তিকতা সপ্রমাণ করে। লিরিক কাব্যের মন ব্যক্তিকে (কবির নিজ-স্বরূপকে) আশ্রয় করিয়া এমন ভাব-সত্তায় উঠে যে, সেই সত্তীয়তার দ্বারাই সে যেন সর্বসাধারণের হৃদয়ের তন্ত্রীতে স্পর্শ করে, একের বেদনা সকলের বেদনা হইয়া উঠে; ইহাতেই নাম রস; ইহা যেমন নৈর্ব্যক্তিক তেমনই নির্বিশেষ। কিন্তু নাট্যকার যে রস সৃষ্টি করেন তাহা একাধারে বিশেষ ও নির্বিশেষ; অভিব্যক্তির বিশেষ বলিয়াই তাহা একটি অনন্য কারণে নির্বিশেষ রসপর্যায়ে আরোহণ করে, অর্থাৎ ব্যক্তিনির্বিশেষে সর্বসাধারণের হৃদয়-গোচর হয়। তাঁহার কল্পনায় এক-একটি ব্যক্তি (নাটকীয় চরিত্র বা পাত্র-পাত্রী) এমন প্রবলভাবে ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, যে, মনে হয়, তিনি এক একটি পৃথক মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন—সে মানুষ ভাব-বিগ্রহ নয়, ব্যক্তি-বিগ্রহ; তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক দেহ আছে। এই সৃষ্টিরই দরকার সৃষ্টি বলে; ইহা যেন পঞ্চভৌতিক সৃষ্টি—ভাবের সূক্ষ্ম বায়বীয় উপাদানে যেরূপ সৃষ্টি হয়, তাহা নয়। ইহার জন্য চাই সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ। লিরিক-কবি আপনাকেই অন্তরের অন্তস্তল হইতে যাহা ব্যক্ত করেন, তাহাতে দেহটা বাদ যায়, কেবল একটা ভাব-মূর্তি নানাছন্দে, গানের আকারে—গড়িয়া উঠে না, কেবল উৎসারিত হয়। নাট্যকার যে ব্যক্তি-বিগ্রহ সৃষ্টি করেন—লিরিক-কবি সেইরূপ দেহবিশিষ্ট বাস্তব-আকার-আয়তনযুক্ত মূর্তি গড়িয়া দিতে পারেন না; তার কারণ, তিনি আপনাতেই অন্য হইয়া থাকেন, এবং সেই নিজেকেও একটা পৃথক মূর্তিরূপে গড়িয়া দিতে পারেন না; নিজেকে দেখেন করিয়া কেহ দেখিতেও পায় না। কিন্তু পরের অন্য একের করিয়া তাহার রূপ ধারণ করা যে সম্ভব তাহার প্রমাণ শেক্সপীয়রের নাটক। কিন্তু শেক্সপীয়রও কি কোন একটি চরিত্রে আপনাকে হুবহু রূপ দিতে পারিয়াছেন? ইহা অসম্ভব, মানুষের সৃষ্টিশক্তির একটা সীমা আছে; তাই সেই নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা লইয়া, শত চরিত্র-সৃষ্টিতেও কোন কবি আপনাকে প্রতিমূর্ত করিতে পারেন নাই। যে সকল কাব্যে বা উপন্যাসে কবির আত্মশক্তির আছে বলিয়া একটা প্রসিদ্ধি আছে, সেখানে কিছু-পরিমাণ ঐ লিরিক-আত্মনিবেদনই আছে, নাটকীয় চরিত্রগুলি যাই—

অর্থাৎ যে পক্ষির কবির আত্মনিরপেক্ষ আত্ম-পক্ষির নহে। সেইরূপ খাঁটি আত্ম-প্রতিমূর্তি গঠিতে হইলে কবিকে যেমন যথার্থ নির্লিপ্ত-আত্মনিমগ্নতার অধিকারী হইতে হইবে, তেমনিই, সেই মুহূর্তের, উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, আপনা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

'শ্রীকান্তে' এই নিয়মের যেন একটু ব্যতিক্রম দেখি, সেটুকু ব্যতিক্রম সেইটুকুই আশ্চর্যের বিষয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ঐ কাহিনী একটি বিশেষ অর্থে আত্মকাহিনীই বটে — উহার মূলে আছে অতিপ্রবল নির্লিপ্ত প্রেরণা। কিন্তু লেখক নিজের সেই অন্তরতম অনুভূতিকেই এমন একটি রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মনে হয় তাহাতে একটি পরম বৈরাগ্য বা অনাসক্তিও রহিয়াছে, না থাকিলে তিনি তাহাকে এমন করিয়া রূপ দিতে পারিতেন না। যেন, তিনি যাহাকে দেখিয়াছেন (অনুভব করিয়াছেন) তাহার সঙ্গে তিনি জড়াইয়া যান নাই; তাহাকে অতি সতীর ভাবেই অনুভব করিয়াছেন, অথচ তাহারই সঙ্গে একটা নির্বেদ বা ঔদাসীন্যও আছে। শোনা যায়, যোগী তিন্ন আর কেহ অন্যের নিজের মূর্তি দেখিতে পায় না; বাহিরে অপর ব্যক্তিকে যেমন দেখি, তেমনই নিজের চোখের সম্মুখে নিজেকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে না; যোগীই যেন দৃষ্ট দেখে। মনে হয়, শরৎচন্দ্রও সেইরূপ যোগীর দৃষ্টিতে আপনার মূর্তিটিকে দূরস্থরূপে দেখিয়াছিলেন — সমগ্র 'শ্রীকান্ত'-খানি সেই স্বয়ং, তিনি আপনাকে যেন দেখিয়া সেই স্বয়ংই আত্ম-প্রতিমূর্তির পঙ্ক্তির এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সেই আত্মকাহিনী — উহা কেবল উপন্যাসই নহে। প্রথম আত্মকাহিনীও উপন্যাস হইয়া উঠে, তার কারণ, উহার নায়ক এখানে 'আমি'ও বটে, 'সে'ও বটে। লেখক যেন আপনাকেই, বাহিরে একটু তফাতে রাখিয়া দেখিতেছেন; তাই করিয়া দেখিবার জন্য যেরূপ সাজান ও পশ্চাৎ-পট আবশ্যক তাহা উপন্যাসে সংযোজন করিয়া লইয়াছেন। সেই পশ্চাৎ-পট ও নানা সন্ধান (situation) গুলি — সামাজিক ও সাংসারিক সম্পর্কগুলি এই অর্থে কাল্পনিক নহে যে, তাহা তাঁহার সেই অন্তরের অনুভূতিকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিতে পারিতেছেন; এজন্য তাহার সন্ধানে তাঁহার সত্যে অতিরিক্ত করিয়াছেন, তাহাতে কল্পনার বিকাশ হয় নাই; তথা বটে ক্ষুণ্ণ ও সংকুচিত হয়, লেখক তাহাকেই নিজ আত্মার বা জগতের সম্পর্কনির্দেশ অর্থে নিজ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন — সেগুলি তাঁহার সেই অন্তর-অনুভূতির symbol বা সঙ্কেত-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে; এমনই করিয়া বাহির ও ভিতরের যোগরক্ষা হইয়াছে। যত বা তত্ত্ব বলিয়াই কোনটা তাঁহার পক্ষে মিথ্যা হয় নাই, তবে সেই অপূর্ণ বা খণ্ড ক্ষুদ্র বস্তুগুলিই তাঁহার আত্মকে বিকশিত করিয়া নিজেরাও একটা বৃহৎ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; তাই ঐ তথ্যগুলির সত্যই সেই জীবনের সত্য নয় — অথচ সেই তথ্যগুলিও মিথ্যা নয়। আমি 'শ্রীকান্তে'র অবতারিকে শরৎচন্দ্রের সেই আত্ম-কাহিনী বুঝিবার চেষ্টা করিব, ইহাই হইবে এই প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য; সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস হিসাবেও ইহার আকৃতি ও প্রকৃতির বিচার করিব।

[ক্রমশঃ]

ভাগ্যবন্ত

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধেবেলার আকাশে সাঁওতাল পরগনার প্রাকৃতিক অবস্থা বড়ই মনোরম হয়। কোনও তাপক্লিষ্ট মুমূর্ষু সহরবাসীর অপরাহ্ণে জলে স্নান করিবার পর দেহে ও মনে যেরূপ একটি শুচিস্নিগ্ধ লঘু প্রফুল্লতা অনুভব করেন, এ যেন কতকটা সেইরূপ।

দিবা চলিয়া গিয়াছে, রাত্রি এখনও আসে নাই, মাঝের সন্ধিক্ষণটি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে শান্ত সোনালী একটি নিশ্চিন্ততা। এমনি সময়ে সাঁওতাল পরগনার নির্জন কঙ্করাকীর্ণ পথ দিয়া এক পথিক চলিয়াছিলেন। মাইলখানেক দূরে একটি সহর আছে, পথিকের গতি সেইদিকে। তাঁহার বয়স অনুমানে পঞ্চাশ বৎসর; পরনে সেকেলে আলখাল্লা, মুখে প্রচুর পাকিয়েছে, মাথায় রুক্ষ দীর্ঘ চুল—চোখের দৃষ্টিতে একটি মিষ্ট ধাঁদা লাগিয়া আছে।

চলিতে চলিতে তিনি গুন্‌গুন করিয়া গান গাহিতেছেন—

"আমার—কাছ হুহলো দূরেতে রে মোর চিত্ত!
এবার আমি পাইব রে মন
নাচব তাদিন্ দিন্তা।
কাজের বোঝা, ভাবনা-ভাবার ধার
ঠাকুর—ঐ হইল তোমার পার,
এখন থেকে—থাকিবে তুমি, ভাবনে তুমি,
আমি—নাচব তাদিন্ দিন্তা।"

তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার গান শুনিয়া মনে হয়, ঐ শরৎ-সন্ধ্যার মত তিনিও অন্তরে একটি লঘু নিশ্চিন্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন।

পথের চৌপাশে খালবন। সহরের এলাকা এখনও আরম্ভ হয় নাই। পথিক মন্থরপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার গানও থামিল। খালধনের ধারে অপ্রত্যাশিত একটি বাড়ী—পাঁচিল দিয়া ঘেরা ছোটখাট সুন্দর একটি বাংলো।

বাংলোর সম্মুখে যাইবার ঢালুতলের উপর দুইটি ইজি-চেয়ার পাতা রহিয়াছে, তাহার একটিতে মাঝবয়সী টাক-মাথা একজন ভদ্রলোক বসিয়া নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

পথিক অনেক দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন। তাঁহার পা দুটি ক্লান্ত, আজ সমস্তদিন হাঁটিয়াছেন; যদি রাত্রির মত এইখানেই আস্তানা মিলিয়া যায় হয় কি? তিনি কটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহস্বামী খবরের কাগজে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ সম্মুখে আগন্তুক দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—'কে? কি চাই?'

পথিক বিনয়ে গলিয়া গেলেন,—'আজ রাত্রির জন্যে আশ্রয় দেবেন কি? কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

গৃহস্বামী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে পথিকের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই কয়েকটি কথা শুনিয়াই তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আগন্তুক ভেকধারী হইলেও আসলে তাঁহারই সম্প্রদায়ের বাঙালী ভদ্রলোক। বহুদিন অজ্ঞাতবাসের ফলে সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মেলামেশার সুযোগ তাঁহার ঘটে না। তিনি সাগ্রহে বলিলেন,—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আসুন—বসুন! আপনি তো দেখছি ভদ্রলোক, মশাই; সাধু-সন্নিসিদের মধ্যে ভদ্রলোক বড় দেখা যায় না। আসে—'

সন্ন্যাসী ঝুলি নামাইয়া তক্ত পোষ্টটির গায়ে হেলিয়া বসিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, 'অন্ধলোক ছিলাম অনেকদিন আগে, এখন এসব ঘ্রাণেই বুঝে নেই।'

গৃহস্বামী একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, পুনশ্চ উপবেশন করিয়া বলিলেন,—'হেঁ হেঁ—ও ঘ্রাণেই জানা। তা চায়ের অভ্যাস আছে কি?'

'এখন আর নেই—তবে আপনি দিলে খাব।'

'বেশ, বেশ। ওরে বকুলা—'

গৃহস্বামীর হাঁকের উত্তরে, বকুলানামক সাঁওতাল ভৃত্যের পরিবর্তে একটি স্ত্রীলোক বাংলো হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আগন্তুক স্ত্রীলোক, আদিবাসী গঠন; সুখশান্তি মোলায়েম, বড় বড় তীক্ষ্ণ-চাহনি-যুক্ত চোখে লক্ষিত হয়, কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের ফোঁটা। তাঁহার গায়ে ভারি ভারি সোনার গহনা, পরণে চওড়া-পাড় শান্তিপুরে শাড়ী। তিনি যৌবনকালে তন্বী ও রূপসী ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্তমানে স্নেহ ও যত্নের তলায় রূপ-লাবণ্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

বাড়ীর বাহিরে পা দিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তারপর দ্রুত ফিরিয়া গিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন। দরজার আড়াল হইতে রুদ্ধ কণ্ঠে স্ত্রীকণ্ঠে শোনা গেল,—'এসব আপদ কি! মাথায় চুল নেই, কপালে কেলেঙ্ক। সাধু-সন্নিসি নিয়ে চল, আমরা হয়েছে—'

গৃহস্বামীর চোখ ও মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, তিনি বাহিরে আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী বসিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিলেন, যেন তিনি মনে মনে বলিতেছেন—কৌতুকবহ বটে সংসারটা।

খানিক পরে গৃহস্বামী ফিরিয়া আসিতেই সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ বিনয়ের সুরে বলিলেন,—'আপনার যদি অসুবিধে হয় আমি যাচ্ছি। সহর যেতে দূরে নয়, কোথাও বাস নিয়ে যেতে পারব।'

গৃহস্বামী ঘাড় নাড়িয়া গৃহস্বামী বলিলেন, 'না, আজ এখানেই থাকুন।—চা আসছে।'

সন্ন্যাসী আবার বসিলেন। মনে মনে আমোদ অনুভব করিলেও গৃহস্বামীর প্রতি তাঁহার অন্তরে একটু সহানুভূতিরও সঞ্চার হইল। বেচারা সংসারী লোকটি সন্ন্যাস, কিন্তু অন্তরমহলের প্রবল শাসনে নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া মাথা তুলিতে চান, এই পর্যন্ত। লোকটি অবস্থাপন্ন তাহা দেখিলেই বোঝা যায়, তবে কেন লোকালয় ছাড়িয়া নির্জনে বাস করিতেছেন কে জানে। জীবনসঙ্গিনীটি সম্ভবতঃ দ্বিতীয়া স্ত্রী—তাহা বেচারা।

সোনালী সন্ধ্যা ক্রমে ধূসর রাত্রে পরিণত হইল। আজ বোধ হয় শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি, মাথার উপর আধখানা চাঁদ নীচের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

গৃহস্বামী শুদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। ভৃত্য আসিয়া দুই পেয়ালা চা ও পানপাত্রের ট্রেটায় জলখাবার রাখিয়া গেল। এতক্ষণে ইষৎ সহজ হইয়া গৃহস্বামী একটা পেয়ালা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—'নিন, জলযোগ করুন।'

নীচের জলযোগ ও চা-পান চলিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরে তখন কেরোসিন-আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ ভিতর হইতে বৈ বৈ শব্দে কে গান গাহিয়া উঠিল। প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া সন্ন্যাসী বুঝিলেন, সহসা মানুষের গলা নয়, কলের গান। অন্তরালবর্তিনী গ্রামোফোন বাজাইয়া বোধ করি নিজের চিত্তবিনোদন করিতেছেন।

অন্ধকারের জ্যোৎস্না-নিষিক্ত নীরবতার উপর এ যেন পাশবিক চীৎকার। ওর চেয়ে ঝোল-ডাকও শতগুণে—অন্ততঃ স্থানত্যাগের অধিক উপযোগী। সন্ন্যাসী আড়চোখে চাহিয়া দেখিলেন, গৃহস্বামীর মুখ হতাশাপূর্ণ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে;

সম্বন্ধে প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে এই কেরওসীন তাহাকে শুনিতে হয়।

একটু কুণ্ঠিতভাবে তিনি বলিলেন,—'কৈ, আপনার বাড়ীর কেরোসিন—?'

'কেরোসিন নেই—আমি নিঃসন্তান'—গৃহস্বামী ডাবের খানি পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া নিজের চোখ সন্ন্যাসীর দিকে একটু সরাইয়া লইয়া বলিলেন, একটু অবজ্ঞাভরে প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি করলিন এই—মানে—গৃহত্যাগ করেছেন?'

সন্ন্যাসী চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'তা প্রায় বছর পঁচিশ হ'তে চলল।'

'কিছু পেয়েছেন কি?'

সন্ন্যাসী একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'রোগশিবি বা বিভূতির কথা যদি বলেন, তাহলে কিছু পাইনি। তবে একটা জিনিষ পেয়েছি—শান্তি।'

দুর্ভাগ্য নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহস্বামী ইজিচেয়ারের উপর চিৎ হইয়া চোখে পাখা চালিতে লাগিলেন। অনুমান পঁচিশ বছর আগে তাঁহার জীবনেও একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তবে তাহা সন্ন্যাসগ্রহণের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারপর প্রথম কিছুদিন মন্দ কাটে নাই। কিন্তু ক্রমে এই পঁচিশ বছরে পুষ্পমালা শিথিল হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি! জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি শান্তি পাইয়াছেন কি? হঠাৎ গৃহস্বামী হা হা করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। হা, শান্তি তিনি পাইয়াছেন বৈ কি! শান্তি-বাস্তবাদিনী একটি রমণী মত পঁচিশ বছর ধরিয়া এমন ভূকভাবে তাঁহার বুকে আরোহণ করিয়া আছেন যে, যে বলিবে তিনি শান্তি পান নাই। 'অদৃষ্ট এমন ইতর পরিহাসও করিতে পারে!

ঘরের মধ্যে তখন গ্রামোফোনের খোলা আওয়াজে কীর্তন-রস পালা অভিনয় হইতেছে।

গৃহস্বামী উঠিয়া বসিয়া বাঙ্গ-তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'শুনতে পাচ্ছেন? ওদিকে কীর্তন-রস সুরু হয়েছে। এদিকে আমি যে সারাজীবন ধরে' কীর্তনরস ঢালি তা কেউ বুঝল না। কিন্তু আপনি দেখ্‌ছি বৈরিগি লোক, আমার পাপতাপের কথা শুনিয়ে আপনার শান্তি নষ্ট করব না। তার চেয়ে আপনার কথাই বলুন শুনি। আপনি কেন সংসার ছাড়লেন, কি করে শান্তি পেলেন, যদি বাধা না থাকে আমায় বলুন।'

সন্ন্যাসী হাসিলেন, 'বাধা এখন আর কিছু নেই, বরং মনে পড়লে হাসি পায়। আপনি শুনতে চান বলছি। হয়তো আমার সংসারত্যাগের কাহিনী শুনে, আমি কত বড় আঘাত কাটিয়ে উঠেছি জেনে, আপনার কিছু উপকার হতে পারে।'—

সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'আজ মনে হয়, উমেশ নিয়োগী বুঝি আর কেউ ছিল; আমিই যে উমেশ নিয়োগী একথা এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দুটো মানুষ আলাদা হয়ে গেছে।

'উমেশ ছিল বাকে বলে মধ্যবিত্ত লোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিল, তাই একটা কলেজে দেড়শ টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছিল। কলকাতাতেই থাকত।

'উমেশের বাড়ীতে এক বুড়ি মা ছিলেন। তিনিও বেশীদিন টিঁকলেন না, উমেশ চাকরি পাবার কিছুদিন পরেই মারা গেলেন।

'তারপর এক সম্ভ্রান্তবিংশের মেয়ের সঙ্গে উমেশের বিয়ে হল। বংশ সম্ভ্রান্ত হলেও অবস্থা পড়ে গিয়েছিল, তাই বোধ হয় মধ্যবিত্ত উমেশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটি সুন্দরী বিদুষী—তখনকার দিনের পক্ষে আধুনিকা। একদল অভিজাত-ঘরীয় তরুণ বন্ধু সর্বদা তাকে ঘিরে থাকত।

'উমেশের মনে আনন্দের শেষ নেই; এমন স্ত্রী অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায়। স্ত্রীর বন্ধুরা তারও বন্ধু হয়ে দাঁড়ালো। যাওয়া-আসা খাওয়া-খাওয়া পার্টি-পিকনিক চলতে লাগল। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে

বলে' উমেশের স্ত্রীর হাত তারি ধরাত; বাজারে উমেশের কিছু ধার হল। কিন্তু উমেশ তা গ্রাহ্য করলে না। এমনিভাবে আর কয়েকবছর কাটল।

'তারপর হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল; এমজন তরুণ বন্ধু উমেশের স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হলেন।'

সন্ন্যাসী সহজকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। গৃহস্বামী গালে হাত দিয়া শুনিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,—'তারপর?'

সন্ন্যাসী বলিলেন,—'তারপর কিছুদিনের জন্যে উমেশ যেন পাগল হয়ে গেল, একটা ছুরি নিয়ে বন্ধুদের বাড়ী-বাড়ী তোরাই দাল খুঁজে বেড়াতে লাগল। মজাটা এই যে, কে তার বৌ চুরি করেছে জানতে পারলেই তাকে খুন করবে। কিন্তু অভিজাত কালীর লোকদের মধ্যে তারি একটা আছে, তাই কেউ কাউকে ধরিয়ে দেয় না। উমেশ তার বৌ-চোরকে খুঁজে পেলে না।

'ক্রমে তার মনের গতি বদলে গেল। এদিকে পাওনাদারেরা টাকার তাগাদা আরম্ভ করেছিল। মানুষ আটটার উপরেই উমেশের মন বিষিয়ে গেল; মনে হল, এদের নিষ্ঠুর পাপি হাত আর নেই। একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে লোটা কম্বল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? পঁচিশ বছর ধরে' সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেক সাধু-মহাজনের দর্শন পেয়েছি। সাধন ভজন বিশেষ কিছু করিনি, কিন্তু তবু বড় আনন্দে আছি। অভাব যে মানুষের কতটুকু, তা সংসার না ছাড়লে বোঝা যায় না। এতটুকু সংযমের বিনিময়ে কতখানি আনন্দ পাওয়া যায়, একলোটা আত্মত্যাগের বদলে কী বিপুল শান্তি পাওয়া যায়—তা আপনাকে কি করে' বোঝাব? আমার কোন অভাব নেই—আমি বড় আনন্দেই আছি। গৃহী-জীবনের কথা আর মনে পড়ে না—পড়লেও আর কষ্ট হয় না।'—

আহারাদির পর সন্ন্যাসী একটি ছোট কুটুরীতে শয়ন করিলেন। বিছানাটি তাঁরি নিজস্ব, এত সময় বিছানায় সন্ন্যাসী অনেকদিন শয়ন করেন নাই; তিনি অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন, শয্যার পাশে একটি চিঠি রাখা রহিয়াছে। তিনি চিঠি খুলিয়া পড়িলেন—

ভাই উমেশ,

তুমি জান যে গল্প বলেছিলে তাতে একটু ভুল ছিল। তোমার স্ত্রীকে কেউ চুরি করেনি, তোমার স্ত্রীই তোমার এক বন্ধুকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছিলেন। সে বন্ধুটি আমি।

তুমি আমাদের চিনতে পারনি, তাতে আশ্চর্য্য হইনি, আমাদের সকলেরই চেহারা বদলে গেছে। পরে শুনে তোমাকে চিনতে পারলুম। তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

তোমার স্ত্রীর মতন এমন অনেক, লজ্জাশীলা, সচ্চিন্তমনা, স্বামীপর স্ত্রীলোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা আমি জানিনা, কারণ অন্য কোনও স্ত্রীলোকের প্রকৃতি জানবার সুযোগ আমার ঘটেনি। দুনিয়ার লোক আমাকে লম্পট দুশ্চরিত্র বলেই জানে, তবের চোখে আমি পরস্ত্রীহরণকারী। কিন্তু ভগবান জানেন, আমার মত একনিষ্ঠ সচ্চরিত্র পুরুষ আর নেই। জীবনে একটা ভুল করেছিলুম, তার জন্যে সমাজ ছেড়েছি, সংসার ছেড়েছি, সন্তানসুখের আশা ছেড়েছি, আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছি। সর্বস্বান্ত হয়ে সন্ন্যাসের আলায় এই মনের মধ্যে বাস করছি। তাই, আমার যথেষ্ট

প্রার্থিত হয়েছে, আর না। যে সম্পত্তি তুমি নাও। আমি চলনুম।

তোমাকে দেখে তোমার কথা শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে তুমি শান্তি পেয়েছ; তাই আমারও লোভ হয়েছে, তোমা হতে যদি শান্তি পাই। পরিশেষে তোমার 'শান্তি'কে বহন করবার শক্তি ও অধিকার আমার জন্মেছে — আশা করি তুমি স্বীকার করবে।

তোমার আলখাল্লা আর ঝুলিটা নিয়ে চলনুম, কিছু মনে কোরো না।

হেলাফে হারা দিনের আগে
যিনি কথা চানি'
বলিতে আমি পারিবনা ত'
ভয়ভার বাণী!
উচ্ছলিত রক্ত আনি'
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি',
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানা হানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে,
ভবাত্মার গভীরাবে
শান্তি নাহি মানি।

— রবীন্দ্রনাথ।

আগামী আশ্বিন হইতে
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
অভিনব উপন্যাস
"চি ত্র গৃ হ"
ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া খাঁটি কারাদল বিতরণ করা হইবে—যে-সব সহৃদয় পাঠকের রসিকসমাজ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাদেশের কারাবলও বটে। একালের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার সেই কবিদলের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সত্যকার পরিচয় নাই। সেজন্যই আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে বর্ণ-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

(১)

বাংলার কবি

এক যে কবিরা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মূরতি মোর হৃদয়েতে রাজে;
পাটল অধরে তার,
চঞ্চল ঘুমের ঘোরে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি,—
আমি ক্ষুদ্র বাংলার কবি।

এক যে সবরা আছে, কোলে-পিঠে যার
শিশু-চয় রেখে গেছে ফুল-ছবি তার;—
সীমন্ত-সিন্দূরে তার,
চরণ-অলক্তরাগে,
ফলাইয়া নব-রাগ, আঁকি আমি ছবি,—
চির-দুঃখী বাংলার কবি।

এক যে দেশালী আছে, হেরি যার হাসি
যৌবন-নিকুঞ্জে মোর চির-মধুমাস —
হারায় চটুল বাঁশী
দেকালির তলে আসি,
ওগো চেনে সেই হাসি ? —আঁকি সেই ছবি,
দীন-দুঃখী, বাংলার কবি।

প্রাণের এ কূলে কূলে, প্রাণের অকূল-মূলে,
যতদিন বহিবে আহ্নী,
সোহাগে লইয়া বুকে,
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে, বুকে পুরি' রবির এ রবি—
সুখ আমি, বাংলার কবি।

তোমরা সকলে মেলে,
আমারে একেলা ফেলে,
পরদেশে আছ ভুলে !—অরণ্য-মটবী
এখনো এ দেশ নয়,
—এখনো আহ্নী বয়,
পরতে চাঁদনি হাসে —আঁকি সেই ছবি,
দীনদুঃখী বাংলার কবি।

রূপতৃষ্ণা

যৌবন সোনার-চাঁপা বিলায় বসন্তে,
গলে পরাইয়া দিয়ু মালতীর মালা,
সিঁথিটি অশোক-পুষ্প বিলায় লাজরে,
দু'করে পরায়ে দিনু অতসীর বালা ;
দুইটি কদম্ব দিয়ে বর্ষে দিনু দুল,
তারপর ধীরে ধীরে যোগা-ফুল দিয়া
সুন্দরীর চাক অঙ্গ দিনু সাজাইয়া—
লোভন-অমরদুলে করিয়া আকুল !
আমার এ রূপতৃষ্ণা হইয়া যামিনী
বাসকের মধ্যভাগে বসিল, আপিনী।

---

(৩)

মনোহারিকা

বনফুলের বরণ-মালা
পাখীর কোলে দুলিয়ে যে,
বল্ যে তুই বল্ আমারে
কোন্‌খানে সে লুকিয়েছে?
ঐ নারিকেল-গাছের ঘন
দুরবনের আবছায়ে,
বল্, কোথা তার ফুলমালা
পথের ধূলায় লুটিয়েছে?

দেখেছি তার লোকের ভিড়ে,
হাল-ফেশনে দাঁড়িয়ে সে —
কথা-পেড়ে শাড়ীর কোণা
তর্জনীতে জড়িয়েছে:
একমনে সে অন্যমনে
কাহুর গানের মমরা—
প্রজাপতির পোষন সুখে
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।

সে যে আমার খানের বধূ,
মানস-বনের অপ্সরী,
ছুটিয়ে গেছে আলোক রোষ
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী!
কোন্ সে বেগে হাওয়ার ভেসে
কোথায় সে যে লুকিয়েছে—
কতদিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্বরী!

---

(৪)

কিশোরী

তার অলমুটিনীর অলতরঙ্গে
অলস হাওয়ার দীঘির জল,
তার আলতা-পরা পায়ের সোহে
ফলফুলা মরার বল!
ফরফরা-ডাল দাঁড়ল ঘরে,
ডোঙ্গা তারে পাগল করে,
'মাঝরাতা চায় কিনার ভুলে,
ঘুরে ফিরে অবশেষে;
তার সন্ধ্যালী ঘুমের ছোঁয়া
বুকে থাকে দীঘির জল।

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
সিঁড়ি ভরে লাখে লাখে,
ঘুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে,
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।
জলের কোলে কোলের তলে
ডাহুকীকা-বৌ আলাক জলে,
সুর ক'রে সুর ক'রে
বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে;
আর ঘাসা-বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।

তার সিঁথায় মাখা সিঁদুর রেখা
রাঙা হ'ল বরন-চুল,
তার সিঁদুর-টিপে খয়ের-টিপে
কুঁচের পাখে জাগল ফুল!
সীমন্তিনীর বাহার দেখে
কবির ছিয়াল লাগল চোখে,
তার কোঁকড়া-চুল্ দেখে তার
কুসুমে-ভরা খোলার চুল;
তার এক সাঁথার সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল বরন-চুল!

সে ঘোমটা খুলে তালাই বিছায়
অল্প দুরে সাঁঝের আগে,
পূর্ণিমা-চাঁদ ঘুম দিয়ে যায়,
চাঁদ-খানা তার জাগতে থাকে!
জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে দুধাল-ঢেরে,
কস্তরী-লতা বাতাস বায়
বাতির পাশে বাঁকতে তাকে;
তার রূপের ছটি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো জাগতে থাকে!

সে ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়,
বিনি-সুতায় হার সে গড়ে,
খোলন-চাপার নবীন গায়ে
আলোর দোহাগ গড়িয়ে পড়ে।
কানড়া-ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
সিঁথি-কাঁপা তার লুটায় কাঁধে,
তার কাজল দিয়ে চক্ষে আলো
চোখের পাতায় শিশির নড়ে;
সে বেণীতে মেয় বকুলমালা
বিনি-সুতায় হার সে গড়ে।

সে মায়ালে চোখ আকাশতরা
দিনের আলো বিদায় আসে,
সে কাঁদলে পরে ঘুকা ঘরে
হাসলে পরে মাণিক হাসে!
কেরল-কাঠের নৌকাখানি
জলে নাকো তুফান-পানি,—
ঘুন্‌ঘুনিয়ে ঢেউগুলি যায়
ঘুইয়ে মাথা আশে-পাশে;
যদি সেইতি 'পরে চরণ পড়ে —
হয় সে সোনা অনায়াসে!

(৫)

মালতী

মালতী ফুটিল একটি বালিকা
আসে মোর মনে মেহে,
মালতী তাহার নামটিও বটে
—ফলবহুলের মেয়ে।
চাঁপার বরন বরণ ছিপ্‌ছিপে,
—চোখ দুটি টানা-টানা,
জানিনা বিধাতা কেন ভুলিলেন
দিতে তারে দুটি ডানা।

মাতুল-বাড়ীতে মালতী ফুটিলে
আসিত সে ছুটে ছুটে,
ভরিত আঁচলে, পরিত খোঁপায়,
সব ফুল নিত লুটে।
জানালায় বসে দেখিতাম আমি
তাহার চঞ্চলতা,
উহাই করিত ফুলবন, মুখা
পূজারীর তৎপরতা।

জানি না, বালতী কোথা আছে আজ,
সেই মেয়েটির ঘরে,
তাহার মেয়ের মেয়েটী হয়ত'
ঘরঘরেরি হবে।
হয়ত' সে আছে স্বামীর সোহাগে,
স্বজন সংসার,
নয়ত বিধবা, দুঃখের বোঝা
বহিতেছে অনিবার।
হয় ত সে পীনা প্রৌঢ়া প্রবীণা
দীঘা পল্লীর মাঝি,
নয় ত বা কবে তারিয়েছে তারে
বৈতরণীর বাজি।
যেথা সে থাকুক, আমার মনে সে
ঘরঘরেরি বালা,
জানে না দুঃখ, সংসার-পীড়া,
জরা, যৌবন-জ্বালা—
বাল্য-জীবনে যবে পড়িয়াছে,
পথহারা হ'য়ে মোরে
আমার মনের বালতী-বনের
'গোলক-ধাঁধা'য় পড়ে'।
বাগানে বালতী ফুটিলে বালতী
আমার মনেও ফুটে—
পল্লী-জীবন স্বপ্ন-মধুরী তার সনে
জেগে উঠে।

চকিত নয়নে, তরল চরণে
সোনার ত্রিদিবে
ছুটিয়া বেড়ায় বালতী, মনের
বালতী-বিতানে রহ।

দ্বিপ্রহরে

স্বপ্ন-স্মৃতি আমার আজি
তাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে—
লাজুক মেয়ে উঁচল মেয়ে
চুলের খোঁপা ছড়িয়ে পিঠে।
নীলাম্বরীর ডিমির ফুঁটে,
রঙটি তোমার উঁচল ফুটে'—
কাদিনী-বন ফুটিবে যেন
নয়ন তোমার রূপের ছিটে!

কালের পিঠে তিলটি তোমার
এড়াবনি এই মুখ-চোখ—
দীঘির ঘাটে ওই যে তাঁরা
দীপ্ত তোমার অলক্তক।
নারিকেলের কুঞ্জ-শিরে,
পল্ল-কোটা দীঘির নীরে,
তালটি পুলে' ছড়িয়ে প'ল
পল্লীর পাখার স্বর্ণালোক!

তোমায়, সখি, দেখেছিলাম,
সবার-রাঙা মধুর মুখ —
অন্তরাত্মা উঠ্‌ল কেঁপে
কণ্টকিয়া উঠ্‌ল বুক।
কৌতূহলের গুণ্ঠনে
ভাসল প্রাণা কুতূহলে —
কালো-চোখের রৌদ্র-পানে
চাইল যখন নেত্রটুকু!

স্বয়ম্বর তার কাহিনী—
আজকে প্রিয়ে জিজ্ঞাসিনু;
মোনা-আঁচার সোণার গায়ে
রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে।
ধূম্র-ছায়ল নিম্নতল,
দীপ্ত-নভ নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাসে
গাঙের বুকে স্তরে স্তরে!

সখবা

বিধবা সে, আমি তারে ভাল ক'রে চিনি;
সবে করে উলুধ্বনি ছাদ্‌লাতলায়,
'এয়ো'গণ হাসিমুখে কৌতুকে দাঁড়ায়;—
উৎসব ছাড়িয়া, গৃহে চলিল রমণী।
পথে যেতে যেতে, এক অশোকের তলে
চমকি থমকি বালা দাঁড়াইল আসে!
"হে সখবা, কোথা যাও?" কে যেন গো বলে,
জ্যোৎস্নার আবছায়ে মধুর সম্ভাষে!
জ্যোৎস্না কহিল হেসে শ্রীঅঙ্গ জড়ায়ে,
"চল্ আলি, আমি তোর বারানসী সেলি;"
নীরার কহিল, ঘরে চরণে লুটায়ে,
"আমি তাই খেলিব অকাল ঝিলিমিলি!"
অশোক পড়িল ঝরি' সীমন্ত-উপরি;
বালার আসিতে হবে কিরিল সুখদা।

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে; জাতির প্রতিভা ও মনীষা—জ্ঞান ও প্রেম ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গতযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

(১)

পলিটিক্স্

[বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের পত্র' হইতে। এমন শিক্ষিত বাঙালী কেহ নাই যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' পড়েন নাই, কিন্তু অনেক আধুনিক পাঠক আছেন যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের হেঁয়ালী তেমন মনোযোগের সহিত পাঠ করেন নাই। বর্তমান প্রবন্ধটি অতিশয় সুপরিচিত হইলেও, ঠিক এই সময়ে আর একবার পাঠ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পলিটিক্স্ করেন নাই — গুরুও ছিলেন না, নেতাও ছিলেন না। কিন্তু পলিটিক্স্ কি বস্তু তাহা জানিতেন, তাই কমলাকান্তের জবানিতে তিনি বাঙালীকে সেই পলিটিক্সের একটা সার-মর্ম্ম শুনাইয়াছিলেন, তাহা এই যে — পলিটিক্স্ কেবল দুইরকমের হইতে পারে; তৃতীয় কোন রকমের পলিটিক্স্ নাই। যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন নাই, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।]

শ্রীচরণেষু, আফিঙ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ পাঠাইয়াছেন — শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু — আরও কিছু আফিঙ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কিরূপ হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নব আইনে অঙ্ক কিছু পলিটিক্স্ কম পড়িবে— তুমি কিছু পলিটিক্স্ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্স-সম্বন্ধেইতরপী দ্বারা ইট মারাব মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্স্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর বটে—আফিঙ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই। আমার উপর পলিটিকের চাপ কেন? আমি রাজা না খোসামুদে, জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আপনি আমার কখন পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন বুদ্ধিবৃত্তির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আফিঙের জন্য আপনার খোসামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলি-

টিক্স্ লিখি। কিন্তু আপনার সম্পাদকতায়! কিন্তু আপনার অধিকারে! আপনি আজও বুঝিতে পারেন নাই যে, কমলাকে যত শ্রদ্ধা উচ্চারণ করি, কমলাকান্ত তত বড় পলিটিক্স্ নহে।

আপনার এই আদেশ শ্রবণে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, এক পরিত্যক্ত তুষের কাতোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের দুর্ব্বিবেচনাই ভাবিতেছিলাম। কি করি, ভরিটাক আফিম গলাধঃকরণের আয়োজনে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে নিজ-কলুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটি বলদ বাঁধা আছে—বাটীতে পোতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তনির্ম্মিত খইলবিশান লালিত বিড়ালিদুর্গ যোগে দুষ্টিত নয়নে সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্স্ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে যোগে পলিটিক্স্-বিকারগ্রস্ত অন্তরিদ্রিয় সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু সুস্থ হইলাম। তখন অহিফেন-প্রলাপ-প্রসূতির লোকের এই পলিটিক্স্প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

> সোনার ইচ্ছা কথা ফুটে,
> খোঁপার ইচ্ছা মেঘের ছুটে,
> তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে,
> ইচ্ছা বটে, ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স্—হপ্তায় হপ্তায় রোখ রোখ পলিটিক্স্; কিন্তু সোনার বাক্যোচ্চারণ কামনার মত, খোঁপার ক্রতসম্বরণ আকাঙ্ক্ষার মত, অঙ্গের চিত্তহারিণী-লালসার মত, বিদ্যু বিধবার স্বামি-প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত হাজাশ্বাস, ফলিবার নহে। তাই পলিটিক্স্ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার যখন বাড়ী আসে, তখন লগুড়ধর অন্যান্যেহী হায় যে আস্তিকে বন্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদিগের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাহে বলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইতাবসরে দেখিলাম, বিধু কলুর গৌর বর্ণবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি হাতে আমিয়া উঁহাকে বলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটী খেতচক্ষু কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চারিদা ঘুরিয়া বিস্ময় বর্দ্ধিত করিল। অবল-বরল অন্ত্রাদি কাংস্যপাত্রে কুক্কুর-কাশ্যপ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক একবার কলুর পুত্রের অন্ন-পরিপূরিত বদন প্রতি আড়-নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রলাপে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স্, এই কুক্কুর ত পলিটিক্স্! তখন মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিকের চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক,—কুক্কুর কাছে গিয়া খাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোষ মুখপানে চাহিয়া বা হা করিয়া হাঁপায়। তাহার কাঁসে কলেবর, পাকলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল; তাহার পলিটিকেল এজিটেশান সফল হইল—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ-সহকারে আনন্দে উদ্বত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বণ, লেহন,

পেলমুট্রুবং হজম-করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মহত্তকটক সম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উদ্যাপনে সমাপন হইল, তখন সেই ক্ষুদ্রকুল পলিটীশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিক্স্ আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুরু তেঁতুল খাইয়া ঘোর-রবে ভোজন করিতেছে—কুকুর পানে আর চাহে না। তখন কুকুর একটি bold move অবলম্বন করিল, আর পলিটিক্স—না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিৎ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর একবার ঘাই বুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুকুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, বলিতেছিলেন, "হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঁঠালের সেট তবে নাই।" তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর বাক্য নাই, এক মুষ্টি তাজা কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরুষ যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধাপান করেন, কার্ডিনেল উল্সী বা কার্ডিনেল রেয়েস যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অমৃত ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে কলুপুত্রিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ছেলের কাছে একটা কুকুর ঘ্যাক ঘ্যাক করিয়া ভাত খাইতেছে দেখিয়া, কলুপত্নী রোষ-কষায়িত লোচনে এক ইটকণ্ড লইয়া কুকুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া লাঙ্গুল সংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ বাগ্‌বাগিনী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা সংঘটিত হইল। যতক্ষণ রাজনীতি কুকুর উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোল-বিচালি পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং মুখ কায় দেখিয়া মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার নৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুকুরকে সংহারে কলুপুত্রিণী এই বৃষরাজ দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গো-ভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন।

কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না, এবং কলুপুত্রিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাহার জঘন্যদেশে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন ক্রোধ ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বৃষ অবকাশ পাইয়া নিঃশেষ করিয়া খেলিতে খেলিতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স্। দুইপ্রকারের পলিটিক্স্ দেখিলাম,—এক কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্‌মার্ক এবং পর্ণীকক্, এই বৃষের ঘরের পলিটিক্স্; আর উল্সী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুকুরের ঘরের পলিটিক্স্।

(২)

বাংলার বৈশিষ্ট্য

[কবির মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের একটি অভিনব উপলব্ধির ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ — 'বঙ্গবাণী'-পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। এই লেখাটি আজিকার দিনে বাঙালীমাত্রের অবশ্যপাঠ্য। বাঙালীর সাধনা, ... কৃষ্টি ও ভাষা ... তাহারা যে ভারতীয় অন্যান্য হিন্দু জাতি হইতে স্বতন্ত্র — এইজন্যই সে একদিন একটি বিশিষ্ট ও বিশেষ সংস্কৃতির কথা ভাবিয়াছে এবং আজ তাহার সেই বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান দুরূহ বলিয়া জাতিবিদ্বেষের ... মধ্যেও বিশেষ হইয়াছে — লেখক এই প্রবন্ধে তাহাই উপলক্ষে আলোচনা করিয়াছেন।]

বাঙালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার যে-সকল মনীষিগণ বাংলার যে চিন্তা ও ভাবের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজিকার বাঙালী যুবকেরা কেবল নহেন — অনেক বৃদ্ধেরা পর্যন্ত সে বাংলাকে দেখেন না। বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিষ্পন্দ; তাহার স্রোত বন্ধ। বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনও আছে, সে বৈশিষ্ট্য আমাদের ভারতবর্ষের সর্বজনীন চিন্তা, ভাব ও কর্ম-ভাণ্ডারে বাংলার আর কিছু দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙালী কেবল ভুলিয়াছেন তাহা নহে, তাহার ইতিহাসকে তাঁহারা অস্বীকার করিয়া চলেন। তাঁহারা বলেন, আমরা কি প্রাদেশিকতাকে আবার বাড়াইয়া তুলিয়া ভারতের বিরাট জাতীয় জীবনের ঐক্যকে বিনষ্ট করিয়া দিব? বাঙালী যদি বাঙালীত্বের অভিমানে ফুলিয়া ওঠে, মারাঠা ও পাঞ্জাবী যদি আপন আপন প্রাদেশিক ইতিহাসের গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারতে আবার বিচ্ছেদ সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, রাজপুত যদি পাঠান হইতে, তামিল যদি তৈলঙ্গী হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিতে চায়, তবে ভারতে আমরা যে বিরাট জাতীয় জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহার সফলতার সম্ভাবনা কৈ? প্রাদেশিকতার ভূত চলিয়া গিয়াছে, জাতীয়তার ভূত আসিয়াছে; এ যুগে আবার বাংলার কথা লইয়া অত বাড়াবাড়ি কেন?

যাঁহারা একালে কালের নূতন জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারা যেমন বাংলাকে চিনেন না, সেইরূপ ভারতবর্ষকেও চিনেন না। তাঁহারা এখনও য়ুরোপের ইতিহাসের ঘোরে পড়িয়া আছেন। য়ুরোপ যে পথে তার আধুনিক জাতীয়তা বা Nationalism গড়িয়া তুলিয়াছে, যাঁহারা সেইভাবেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও নানা জাতিকে ভাঙিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া একটা নূতন ভারতীয় জাতি বা Indian Nation গড়িয়া তুলিতে চাহেন। যাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের এই কালের মধ্যে ইয়োরোপের ভাবই অনুকূল হইয়াছে। ইংরাজ বলেন, ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, কিন্তু একটা মহাদেশ। ভারতবর্ষের এক পর্যায়ে আমরা ইতালী বা জার্মানী, ইংলণ্ড বা জার্মানীকে বসাইতে পারি না; ভারতবর্ষের এক পংক্তিতে বসাইতে হইলে গোটা য়ুরোপকেই বসাইতে হয়। য়ুরোপের মধ্যে যেমন ইংলণ্ড আছে, ফরাসী আছে, ইতালী আছে, অষ্ট্রিয়া আছে, জর্মানী আছে, রুষ আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষে বাংলা আছে, গুজরাট আছে, পাঞ্জাব আছে, অন্ধ্র আছে, রাজপুতানা আছে, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ আছে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যতটা পার্থক্য ও প্রভেদ আছে, য়ুরোপে ভিন্ন ভিন্ন

রাষ্ট্রেও প্রায় সেইরূপই প্রভেদ আছে। এমন ইতিহাসে, ভাষা, সাহিত্য, প্রকৃতি, এমনকি সমাজ-গঠন পর্যন্ত পরস্পর হইতে যত-বিস্তর বিভিন্ন। মোটা রকমের হিন্দুদিগের মধ্যে মোটামুটি ধর্মের একটা ঐক্য আছে বটে; ঐরূপ ঐক্য য়ুরোপেও আছে। তুরস্ককে বাদ দিলে য়ুরোপের সর্বত্র একই খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর প্রোটেস্টেন্ট, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ বা রাশিয়ান চার্চ, এ সকলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, মাদ্রাজের শার্ত ও বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের শৈব ও গাণপত্য, বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব,—এছাড়া নানকপন্থী, কবীরপন্থী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা কম নহে। এ সকলের উল্লেখ করিয়া ইংরাজ বলেন, যাহাকে জাতি বা নেশন বলে, তার উপাদান ভারতে এখন বিদ্যমান নাই। ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি হইয়া এক শাসনসূত্রে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বাঁধিয়া, একধারে ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রবাহকে চালাইয়া, ভারতে এই সর্বপ্রথম একটা জাতীয় জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এই পথেই, যদি সম্ভব হয়, ভবিষ্যতে একদিন য়ুরোপের মত ভারতবর্ষেও একটা বিরাট জাতির সৃষ্টি হইতে পারে, হইবেই যে এমনও বলা যায় না। এই অনুহাতেই ইংরাজ এ পর্যন্ত আমাদের আধুনিক জাতীয়তার স্পর্ধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শাসনযন্ত্রকে সর্বদাই নানাভাবে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ইংরাজ বলেন, আমরা চিরদিনের জন্য তোমাদের শাসনভার বহন করিতে আসি নাই। আমাদের চেষ্টা যেমন এক হইয়াছে, এক শাসনে শাসিত, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক ভাবের ও ঐতিহাসিক গৌরবের বন্ধনে আবদ্ধ, তোমরা যেদিন সেইরূপ হইবে, অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ এক ভাষা প্রচলিত, এক ধর্ম প্রবর্তিত, এক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, মোটের উপর, একই আচার-পদ্ধতি, একই রীতিনীতি, একই আদর্শের প্রেরণা গড়িয়া উঠিবে, সেদিন তাহার জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে, সেদিন তোমাদের স্বেচ্ছাচারের দাবী মাথা হেঁট করিয়া মানিয়া লইতেই হইবে, সেদিন আমরা অম্লান বদনে তোমাদের দেশ ও তোমাদের জাতীয় জীবনের ভার তোমাদের হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। কিন্তু যতদিন না তোমরা একটা জাতি হইয়াছ ততদিন আমরা যদি তোমাদের ছাড়িয়া যাই, তোমরা পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া শেষপর্যন্ত সর্বস্বে যেসে যে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইবেই তাহা তুমিসাৎ করিয়া ফেলিবে; এবং আমাদের পরিত্যক্ত রাজদণ্ড অন্য কোনও প্রবলতর প্রতিবেশী আসিয়া নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আমার তোমাদিগকে নূতন পরদেশী শাসনের অধীন করিবে।

যাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক জীবনকে পঙ্গু করিয়া, ভারতের একত্বের নামে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিয়া, য়ুরোপের ছাঁচে ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করেন, তাঁহারা ইংরাজের এ আপত্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা ভারতেরই হউক, আর অন্যত্রেরই হউক, ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনে, য়ুরোপে যে-আদর্শে আধুনিক 'জাতীয়তা বা Nationality'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের য়ুরোপ-বিদ্বেষ যতই প্রবল হউক না কেন, এই বিদ্বেষের ভিতর দিয়াই তাঁহারা সজ্ঞানে 'অজ্ঞাতসারে' য়ুরোপকেই সাধন করিয়া—য়ুরোপকেই পাইতেছেন। তাঁহারা বলেন বটে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই ভারতের নূতন জাতীয়তার লক্ষ্য, কিন্তু ভারতের বৈশিষ্ট্য কি,—এ প্রশ্নটা সম্যক অনুধাবন করিয়া দেখেন না।

(২)

কি ধর্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে—এ ভারত হিন্দুরাষ্ট্র ছিল—ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সা

জীবনের সকল বিভাগে সকলেই সমষ্টির ঐক্যের ভিতরে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কোথাও কোনও পক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে নাই যে সমষ্টির অন্তর্গত ব্যক্তি বা বিভাগ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করে নাই. ভারতের দেবতা এক নহেন, বহুও নহেন, কিন্তু তিনি সেই 'একের' যোগে বহুর মধ্যে একের সঙ্গে বহুর সম্বন্ধ — এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের মত খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্মের মতন ঠিক একটা ধর্ম নহে; এ ধর্মের কোনও এক অনন্য পন্থা, কোনও একটা সাধন, কোনও একটা মাত্র প্রমাণ নাই. কোনও একজন মাত্র ঈশ্বরের অবতার বা গুরুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এ ধর্মে বহু পন্থা, সকলেই নিজ নিজ অধিকারে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত; বহু পন্থা, কিন্তু সকলের যেন এক লক্ষ্যের দিকে যাইয়া পড়ে. সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন পন্থা, বিভিন্ন "দৃষ্টয়ঃ এবো গন্তব্যঃ" তাহারই পরমের দিকে নিয়া মিলিয়াছে। এ ধর্মের বহু অবতার, নিজ নিজ যুগে সকলেই অনন্তলক্ষ্যকে রক্ষা করিয়া সেই একের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। এ অবতার-ধারা সৃষ্টির অনাদি কাল হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এ ধর্ম অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তক নিজ জীবনের প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধির পরই মানবকে লইয়া যাইতেছেন। এর বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন অপূর্ব একত্ব, এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এরূপ বিরাট উদার সমতা. বাহিরে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করিয়াও সমষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য — এমনভাবে রক্ষিত আর কোথাও দেখিতে পাই না। আর সর্বত্রই প্রায় মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া একাকারের উপর ঐক্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা সফল হয় নাই; মানুষের প্রকৃতির এরূপ নিষ্পেষণ সহ্য হয় না; এইজন্য বারংবার মানুষ ধর্মের এই কঠোর শাসনকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ভারতের মনীষী সকলেই কাল হইতে মানবপ্রকৃতির মর্মজ্ঞ ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্মের শাসনে ও সমাজের বন্ধনে বাঁধিয়াও বৈচিত্র্যের মধ্যেই সাম্য, বাহিরের মধ্যেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

(৩)

ভারতের সমষ্টিগত সমাজ ও চরিত্রের, এবং সাধারণ ভারতীয় সাধনার যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাধনা ও সভ্যতার তুলনায় বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যেমন একটা বিশেষত্ব আছে, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে বাংলার সভ্যতা ও সাধনারও সেইরূপ একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই বাঙ্গালীকে ভারতের অপরাপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্মে, বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলায়, বাংলার সমাজজীবনে — সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশেষত্বটা ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বটা আধুনিক নহে, অতিপুরাতন; যখনি বাঙ্গালীর সৃষ্টি হইয়াছে তখনি হইতে এই বিশেষত্ব ধীরে ধীরে ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া, এই বিশেষত্বের মধ্যে যাহা সার্বজনীন তাহাকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার দ্বারা ভারতের সাধারণ সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ সাধন করাই বর্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্তব্য। বাংলা পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ, গুজরাট বা অন্য নহে বলিয়াই বিভিন্ন ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানটী হইলে ভারতবর্ষকে বাংলার কিছু দিবার থাকিবে না; আর, যাহার বিশেষ কিছু দেয় থাকে না, সে প্রাচীনের স্মৃতিচিহ্নরূপে পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার অধিকার থাকে না। বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারও আর

জীবনের উপর কোন দাবী থাকিবেনা — সে বাঁচিল কি মরিল ইহাতে, কি আসিবে, কি যাইবে, কিছুই আসিয়া যাইবেনা। এই কথাটাই আজ বাঙ্গালীকে সকলের আগে বুঝিতে হইবে।

(৪)

বাংলা সম্বন্ধে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। আধুনিক বাংলাকে ইংরাজী গড়িয়া তুলিয়াছে— ইংরাজের এ অভিমান তো আছেই, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও এইরূপ একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যেও যে এ সংস্কার নাই, এমন নহে। এ সকল বাঙ্গালী, সহসা প্রাচীনের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ, ভারতচন্দ্রের পরে রাজা রামমোহনের সময় হইতে বাংলার যে নূতন সাহিত্য ও সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে ইংরাজের অনুচিকীর্ষার ফল ভাবিয়া অত্যন্ত হেয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা কল্পনা করেন যে, এই আধুনিক বাংলা সত্যকার বাংলা নহে, সে বাংলা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সুতরাং এ বাংলার কথা লইয়া অত বাড়াবাড়ি কেন?

কিন্তু বাংলা কি ইংরাজী শিখিয়া সত্যই আত্মহত্যা করিয়াছে? এই ইংরাজী-শিক্ষা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাংলা দেশ সকলের আগে ইংরাজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাধনার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সে সাহিত্য ও সে সাধনা সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে, অথচ, একই ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্য প্রদেশের ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী সেভাবে ত ফুটিয়া উঠে নাই — এমনটা কেন হইল? এ সমস্যার ও সমাধান করা চাই।

যখন হিন্দুর নিজের অধিকারে রাষ্ট্রশক্তি ছিল তখন রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনেও হিন্দু নীতিজ্ঞেরা এবং রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিন্দু মহারাজচক্রবর্ত্তীরা, রোমান বা আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিদিগের মত, এক একটা সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই; কিন্তু প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সকলের অভিমতানুযায়ী তাঁহাদের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। কাহারও সঙ্গে বিরোধ হইলে, তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, পরাজিত রাজ্য আত্মসাৎ করিতেন না, কিন্তু পরাজিত রাষ্ট্রপতির কোনও উপযুক্ত দায়াধিকারীকে মুক্ত সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারই হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেন, এবং তাঁহাকে আপনার সখা বা সামন্তরূপে গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে কি বলে, কি কৌশলে, কি ভাবে, সর্ব্বত্র হিন্দু বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়াই সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রীয়ত্বকে বজায় রাখিয়াই ঐক্যের, ব্যষ্টির বা ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মচরিতার্থতার পথ অবাধ রাখিয়াই সমষ্টির — ঋষিবিধিরা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিলেন তখনও ভারতীয় সাধনার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই। মহাবাদের বিরোধসত্ত্বেও হিন্দু মুসলমানসাধনার সার্ব্বজনীন সত্যকে আপনার করিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমে, বিশেষতঃ এই বাংলাদেশে, এমনও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, হিন্দুরা অকুণ্ঠিতভাবে মুসলমানের দরগায় সিন্নি দিতেন, এবং মুসলমানেরাও সকল অভিপ্রায়ে হিন্দু দেবদেবীর নিকট বলি আনিয়া দিতেন। মুসলমানযুগে এইরূপে হিন্দু-মুসলমানের একটা সমন্বয়সাধনের মহত্তর চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানকে হিন্দু করিতে চাহে নাই — নিজেও মুসলমান হয় নাই, কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সার্ব্বজনীন সাধনে, এবং ব্যবহারের ঐক্যে দাঁড়াইতে, হিন্দু-মুসলমানের একটা ঐক্য স্থাপন করিতে

চেষ্টা করিয়াছিল, আর সে চেষ্টা যে নিষ্ফল হয়, এমনও বলা যায় না। আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তা এই আদর্শকেই Federalism-নামে অভিহিত করিয়াছে। আধুনিক একতা এবং সাধনাও এই আদর্শের অনুসরণে চলিয়াছে; ঐ আদর্শে স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধুত্বের, স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বয়ের সাধন হইতেছে; ঐ আদর্শের সন্ধান পাইলে সব ঘরে ফিরিতে আরম্ভ করিবারে। এ পথ ভারতের চির-পরিচিত পথ।

ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই যদি ভারতের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব সাধকেরা তাঁহাদের সাধনায় ঐ সনাতন প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা যাঁহারা বোঝেন এবং সর্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা সমগ্র ভারতের ঐক্য-সাধনের ঝোঁকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। আজ বাঙালী প্রত্যক্ষ বাংলাকে তুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ ভারতবর্ষ নামে যে কল্পিতবস্তু, তাহার পশ্চাৎ ছুটিতে চাহে।

এই প্রশ্নটা তুলিলেই আমরা দেখিতে পাই, আধুনিক বাংলার এই বিপ্লবের কেবলই ইংরাজী শিক্ষার ফল নহে. কিন্তু বাংলার পুরাতন সাধনা ও মনীষার উপরে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার জ্যোতি পড়িয়া তাহার সেই প্রাচীন প্রাণ-বস্তুকে অভিনবভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা বাংলায় একটা নূতন যুগ আনিয়াছে, এ কথা মানিতেই হইবে; কিন্তু বাংলার চরিত্র ও ইতিহাসের অনুসন্ধান করিলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙালী-চরিত্র ও সাধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র—কেবল রূপের পরিবর্তন হইয়াছে, মূল-বস্তু নষ্ট হয় নাই; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।

(৫)

সে মূল বস্তুটি—স্বাতন্ত্র্য। বাঙালী চিরদিন, কি সমাজে, কি ধর্মে—সকল প্রকার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে; প্রাচীন শাস্ত্র মানিয়াও তাহারা অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্রবন্ধনকে সর্বদা শিথিল করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ যেকালে পুরাতন পুঁথির পৃষ্ঠদেশে বাঁধা পড়িয়াছিলেন, তখনও স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন নূতন স্মৃতি রচনা করিয়া বাংলার হিন্দুসমাজকে প্রাচীনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; ভারতের হিন্দু-সমাজের আর কোথাও এরূপভাবে এত বড় বিপ্লব সাধিত হইয়া যায় নাই। ব্যবহার-শাস্ত্র এবং অর্থ-নীতি সম্বন্ধেও বাংলা প্রাচীনকাল হইতেই আপনার একটা নিজের পথ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজী একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে, আমাদের সুলতনী শাসনে, কৌলীন্যপ্রথের বন্ধনের ব্যবহারশিরোমণি ও স্মার্তশিরোমণি জীমূতবাহনে বাঙালী হিন্দুর ব্যবস্থাধিকার নির্দিষ্ট করিয়া দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। ঐ দায়ভাগ কেবল বাংলার হিন্দু-সমাজেই প্রচলিত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ মিতাক্ষরার অধীন; মিতাক্ষরার বশীভূত নিজের ধনের উপরে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার নাই। দায়ভাগে ধনীকে, তাঁহার মৃত্যুর পরে বা পূর্বে, যেব্যক্তির নিজের ধন সম্পর্কিত বা অসম্পর্কিত যাহাকে ইচ্ছা দান করিবার অধিকার দিয়াছে। এ বিষয়ে কোন প্রকারের বাধাবাধি নাই। জীমূতবাহন-ই যে বিধি ইহা সৃষ্টি করিলেন, এরূপ কল্পনা করা যায় না; সমাজে যাহা প্রচলিত ছিল, সমাজের গতি ও প্রকৃতি যেদিকে চলিয়াছিল, তাহার উপরেই তিনি আপনার নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। জীমূতবাহনের চারি-শতাধিক বৎসর পরে স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন দায়ভাগ রচনা করিয়া জীমূতবাহনের দায়ভাগকেই কোনও

কোনও বিষয়ে নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা আরও উদার করিয়া তোলেন। পিতৃসম্পত্তি অনুসারে, সম্পত্তি সমগ্র পরিবারে সমষ্টিভাবে আবদ্ধ থাকে; পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা পারিবারিক সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পরিবারের অন্যান্য অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তরিত করিতে পারেন না। দায়ভাগ অনুসারে, বাঙালী হিন্দু এ অধিকার আছে। ইহাতে বাংলার হিন্দুসমাজে অর্থসম্বন্ধে এমন একটা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা মিতাক্ষরার অধীন হিন্দু-সমাজে হয় নাই। মেইন (Maine) সাহেব বলেন যে, বাংলা অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যপ্রধান দেশ ছিল বলিয়াই, মিতাক্ষরার ব্যবস্থাদি নিজের তাহাতে সহ্য হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শত শাস্ত্র-বচনের দ্বারাও বস্তুর পরিবর্তন সম্ভব নহে। ইহাতেই বাংলার মনীষার স্বাধীনতা-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমান সভ্যতা ও সাধনার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে অনেক নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। নানক, কবীর প্রভৃতি যে সাধন প্রবর্তিত করেন, তাহা হিন্দু-সাধনার অন্তর্গত হইলেও, ঠিক সে-সাধনার ধারাকে অনুসরণ করে নাই। শিখেরা ত সম্পূর্ণরূপেই পৃথক হইয়া পড়েন। কিন্তু ঐ যুগেই, মহাপ্রভু বাংলাদেশে যে যুগধর্মের প্রচার করেন, তাহাতে হিন্দুসাধনাকে অনুসরণ করিয়াই এক নূতন সরলতার সন্ধান করিয়া তাহাকে সে-যুগের উপযোগী এক নূতন আকার প্রদান করেন। ফলতঃ বাংলার বৌদ্ধযুগের অবসান হইতে বাঙালী — ধর্মসাধনে, শিক্ষায়ে, মতবাদে ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে এমন একটা বাক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনও হিন্দুসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধক এবং সিদ্ধ-পুরুষেরা নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল সাধনের লোকেরা সমাজের মধ্যে থাকিয়াই, আপনাদের অন্তরঙ্গ ধর্মজীবনে, প্রাচীন শাস্ত্র কিংবা আচার-বিচারের বন্ধন মানিয়া চলেন নাই। সমাজও ইঁহাদিগকে এই স্বাধীনতা দিয়া আসিয়াছে। কুল-গুরুর সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে বাক্তিগত ধর্মসাধনের কথা আর কোথাও শুনি নাই। "লোকের কাছে লোকাচার, সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার" — ইহার অনুরূপ কথা অন্যত্র নাই। আপাততঃ কথাটা যেমন সেমন শোনায় বটে— অনেকে ইহাকে বিশ্বাচারও বলিতে পারেন, কিন্তু ইহার ভিতরে যে স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, ইহাতে সমাজের বহুতার সঙ্গে বাক্তিগত স্বাধীনতার যে একটা সঙ্গতির চেষ্টা হইয়াছে — একথাও অস্বীকার করা যায় না। ব্রাহ্মণাদী ব্রাহ্মণদের মুখে কোনও প্রকারের আচিত্তের মানা হয়না: "প্রথমে বৈষ্ণবীকে নমস্কার: দ্বিতীয়তঃ" — বৈষ্ণবীকে বলিতে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের সমান হন, তখন চণ্ডালের মুখের অন্ন ব্রাহ্মণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার মধ্যে কোনও লুকোচুরী ছিল না। অন্যান্য সম্প্রদায়েও সমন-মণ্ডলীতে জাতিবর্ণের বিচার হয় নাই। ইহা বাংলার বিশেষত্ব। এ সকলের দ্বারা, স্বাধীনতা-প্রিয় বাংলার প্রকৃতির ভিতরে কতটা যে বলবত্তা, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার — মন্দিরের শ্রীশঙ্করাচার্যের মত — সমগ্র হিন্দুসমাজের কোনও অধিনায়ক ছিলেন না এবং নাই। বাংলায় কুলগুরু আছেন, সদ্‌গুরু আছেন, কিন্তু সর্বাভিধায়ী ব্যক্তিত — "জগদ্‌গুরু" বলিয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষ নাই। বাংলায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আছেন, কিন্তু মাদ্রাজ বা মারাঠাদেশের মত সেরূপ ব্রাহ্মণ্য প্রভাব নাই। বাংলার চণ্ডালেরা মাদ্রাজ বা মহারাষ্ট্রের 'পারিয়া'দিগের মত একান্তভাবে কখনও "অস্পৃশ্য" বলিয়া বিবেচিত হন নাই। "পারিয়ারা" হিন্দুর দেব-মন্দিরের ছায়ার নিকটেও যাইতে পারেন না, মন্দির-সংলগ্ন জলাশয় স্পর্শ করিতে পারেন না, মন্দির-পার্শ্ববর্তী পথে বিচরণ করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বাংলার চণ্ডালেরা

পূজার সময়, দেবতার দোল-রাস-ঝুলন-কালে, তোল করাইয়া থাকেন। ইংরাজীতে 'ইনকার্নেট' বলা হয় অর্থাৎ মানবের দেহের উপরে ঈশ্বরের অবতরণ হইলে তাহা অবতার হইয়া যায়। বাংলায় ঈশ্বরের বলিয়া কোনও শব্দ নাই। এইজন্য, কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্মসাধনে, বাঙালার সাধনার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য হইতেই এতটা অপূর্ব স্বাধীনতার প্রেরণা আসিয়া আছে। ইহাই বাঙালার প্রধান বিশেষত্ব।

ইহারই বাঙালার অবতার-বাদ। অবতার-বাদকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ ঈশ্বরের অতি-মানবত্বের প্রভাব মানবদেহের সীমা হইতে, মানুষের আয়ত্তের বাহিরে দেবতাকে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক অবতারবাদের আশ্রয়ে পরমদেবতা মানবদেহ ধারণ করিয়া মানবের ভূমিতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমে এবং পশ্চিমাশ্রয়ে, এইরূপে খ্রীষ্টানদের উপাস্য-দেবতাকে মানবের ভূমিতে আনিয়াছে। কিন্তু বাঙালার সৌত্রীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে এই অবতারবাদ যে অদ্ভুত বিকাশলাভ করিয়াছে সেরূপ আর কোথায়ও নাই। ভারতের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা আছে। কিন্তু এ সকল কৃষ্ণোপাসকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়াই জানেন। কেবল বাঙালী বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতাররূপে নহে, কিন্তু "অবতারী"রূপে—অর্থাৎ যাহা হইতে সকল অবতার-প্রবাহ প্রবাহিত হয়—সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"; আমরা যে-শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি, তিনি স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমৎ জীবগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, যদুসম্ভূত যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি অংশ। শ্রীভগবানের অনন্তলীলা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি অনন্তভাবে লীলা করিতেছেন; কিন্তু—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।"

এমন কথা ভাগবতের অন্যত্র কেন, জগতের আর কেহ বলিয়াছেন বলিয়া জানিনা। এই সিদ্ধান্ত ও সাধনার বলেই বাঙালার কবি চণ্ডীদাস দুনিয়ার মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,—

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

আধুনিক যুগের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কবি ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন,—

"কি আর বলিব রে, কে করিবে প্রত্যয়
এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য চিদানন্দময়।"

* * *

অতি সংক্ষেপে এবং সামান্যভাবেও বাঙালীর চিন্তার ও সাধনার ইতিহাস লক্ষ করিয়া দেখিলে এক দুর্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা, এবং সাধনের দ্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা, এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা — ইহাই বাঙালীর পুরাতন সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে পাই। এই স্বাধীনতার ভাব ও এই মানবত্বের আদর্শ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া আছিল বলিয়াই, ইংরাজ যখন তুরোপের এই নূতন যুগের নূতন স্বাধীনতার ও নূতন মানবত্বের সাধনা লইয়া আমাদের নিকট আসিল, তখন আমাদের সেই সুপ্ত বৃত্তিকে জাগাইয়াই তাহার সেই নূতন শিক্ষা আমাদিগকে এমনভাবে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যদি এই নূতন শিক্ষা আমাদের পুরাতন প্রাণের বস্তুকে না জাগাইত, তাহা হইলে কখনও আমরা ইহাকে এমন করিয়া প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিতাম না। একই ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া বাংলার যেভাবে ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যত্র সে ভাবে হয় নাই, ইহার

কারণ আর কিছুই নহে, কেবল বাংলার পুরাপর সাধনার বৈশিষ্ট্য। বাহিরে নূতন হইলেও এই শিক্ষার মূলমন্ত্র আমাদের নিকট নূতন ছিল না বলিয়াই প্রাক্তনসংস্কারের মত ইহা আমাদের জন্যে এমন অপূর্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

'গদ্'-ধাতু তোর দেহে ধাতু — সদ্ধাদি নামটি মো,
গতির সুখে চলিস্ সুখে, বাংলা! সোনার তুই দুখ।
মরুর কাঠি জীবন-কাঠি দেখছি মো তোর হাতেই দুই—
তারণ দিয়ে তারিস্, আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই!
বাহিরাতে তোমায় কভু কয়তে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস্, হিন্দু নহিস্— নবীন হওয়া তোর ব্রত।
যেসে যেঁষে সাহিয়ে নেয়ে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
বন্ধু তোরে মন্দ বলে তা' তুই গায়ে মাখিস্ নে।

—সত্যেন্দ্রনাথ

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হোতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য রূপি' উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে নম্রে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

—রবীন্দ্রনাথ

আমার সাধ

[লেখকের রচিতত্ত্ব গ্রন্থকারের নাম নাই, লেখক সম্ভবতঃ—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; 'বঙ্গবাসী'র সৌজন্যে সম্ভব হইতে পারেন। এ ধরণের রসিকতা একালের পাঠক-পাঠিকার রুচিসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু, হাসিটা খুব ঠিকল না হউক নয়। তথাপি, ইহার ছাত্রসমে যে একটি খাঁটি বাঙালীয়ানা ও সরল হাস্যরসিকতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ভাষাও এ-অঞ্চলার ষ্টাইল হিসাবে অনবদ্য। কিন্তু বাঙালী এখন হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, হাসাইবার চেষ্টা বৃথা।]

সবই সাধ পূর্ণ হইয়াছে, সকল অভাবই দূর হইয়াছে—তার আর কিছুই নাই। আমার জীবন-যাত্রা-পথের ছোট-বড় সমস্ত পূর্ণ হইয়াছে। বাকি কেবল আছে, একটী। সেটী হইলেই, আমার পূর্ণ কামনা-সাগর পরিপূর্ণ হয়।

কি বল, বন্ধুলোক। তাহার সম্মুখ আমার হইয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়াছি, হাতীতে চড়িয়াছি, সিংহে চড়িয়াছি। সিংহের উপর চড়িলে, পায়ে কামড়াইবে কে, সেইজন্য দুর্গাপূজার সময়, সিংহী খড়ের সিংহ গড়িলেই, আগে আমি তাহাতে একবার চড়িয়া লইতাম। গাড়ীর ত অভাবই নাই।—ইক্কড় গোমাড়ী, ঠেলাগাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া, বাবাইর উটের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী পর্যন্ত চড়িয়াছি। পাল্কী চাপিয়াছি; কাঁধে চাপিয়াছি; যৌবনে ছটাচাপিয়ার ঘোলাতেও চাপিয়াছি; কতবার পাল্কীর-কোলা করিয়া উদ্বোলিত হইয়াছি। একবার আগ্রায় গিয়া, আগ্রা-দুর্গে নিজীর বাদসাহের যে কালো প্রকাণ্ড সিংহাসন আছে, সেই নীলাঞ্জনিভ-সর্ব্ববিশ্লিষ্ট কমল সিংহাসনে বসিয়া লইয়াছি, বন্ধুকে বসিয়াছি,—তবু আকবর-বাদসাহের ও আমাতে ফোৎ কি?

আমি মুড়ি খাই বলিয়া তুমি হাসিতেছ, নয়? কিন্তু হাতের কোন হেতু নাই। দিগ্বিজয়ী বড়মানুষ হইয়াও, আমি নানা কারণে মুড়ি খাইতে পারি। প্রথম ধরুন,—বউ-বাজারের ঔচাগোলা খাইয়া আমার মুখ পচিয়া গিয়াছে; বাগ্‌বাজারের রসগোল্লায় মুখ ফেকো হইয়াছে; বড়বাজারের রাবড়ীতে জিব হাজিয়া গিয়াছে; কৃষ্ণনগরের সরভাজায় পেটায় ফোস্কা হইয়াছে; অনাইয়ের রসকরায় তালুতে ঘা হইয়াছে;—কাজেই আমি কি করি, পুনরায় মুড়ির আশ্রয় লইয়াছি। আরও ধরিয়া লউন, অনেকগুলি খৈচুর খাইয়া আমার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে; মজিলপুরের মোওয়া খাইয়া দাঁত নড়িতেছে; বর্দ্ধমানের সীতাভোগ খাইয়া আমার চুল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে; ইস্কাপের খাজা খাইয়া ফুসফুসে কামড়াইয়াছে; মানবজনের কদমার জ্বান ওঠ্‌ওঠ্ করে; আর দুবরাজপুরের বদ্যা-মহোপাধ্যায় বাতাসায় ইপোমি-রোগ হয়;—কাজেই মুড়িকেই শেষ-আশ্রয় করিতে হইয়াছে। এখন কি কেহ দেখ নাই,—পশ্চাতে চাবিঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে,—বাবু আগে আগে পদব্রজে যাইতেছেন। কেন যান? গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া, বাবুর পায়ের খিল বন্ধ হইবার যো হইয়াছে;—কাজেই ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে, তিনি এখন পদব্রজে চলিতে যান। আমারও সেই রকম। ঠিক পশ্চাতে পালকের গাড়ী; চাহিয়া দেখ, কত লক্ষ, কত মুড়ি, কত মোঠাই, কত কীর প্রভৃতি আসিতেছে। নিমন্ত্রণ ও বরাই আছে, গিয়া খাইয়া আসিলেই হয়। কিন্তু আমি ত তা খাই না। গুরুর উপদেশে এখন কেবল মুড়ি খাইতেছি। মুড়ি-খাওয়া সম্বন্ধে আর এক মুক্তি এই, অমনে বড়ই মুখ আসা করে,—মুড়িতে আর দমন হয়। কবিরাজের আজ্ঞাতেও মুড়ি খাইতেছি।

আহার সম্বন্ধে সবরকম সুখই করিয়া লইয়াছি। কোথাও কোথাও নিরম্বু উপবাসে গিয়া, এমন আহার করিয়াছি যে, তাহার পর, তিন দিন শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল। দিবসে গায়ে কিম্বা গামছা জড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া থাকিতাম; রাত্রে ধড়াচূড়ি করিয়া শুইয়া, কুটপাতে মাদুর বিছাইয়া আমাকে শোয়াইত; আর, একজন অন্তর, বসিয়া বসিয়া, আমার মুখ টিপিয়া একটু একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াইত। আমার এগিয়ে, সর্ত লিটনের রাজত্ব কালে, বেথার সিটীর সভ্যপদ হয়,—যাত্রাতে যাইবার সুবিধা হয়,—বজে বিলক্ষণ অসুখই হয়,—সেবার পরম সুখে, চারুশ্বাস ব্রত করিয়া কাটাইলাম। এখনও যে দিন মনিবা হয়, সেদিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকি। কোনদিন বা তৃতীয় প্রহরে অর্ধ-সের একাদশী করি। একটু সুবিধা হইলেই হইল। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে শিবরাত্রি, মহাষ্টমী এবং অন্যান্য পর্বদিনে, যতগুলি উপবাস আছেন, তাহাদের সবগুলিই আমি করিয়া থাকি। তবে তফাৎ এইটুকু যে, দিনের দিন হয় না।—বহুত পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন শিবরাত্রির উপবাস করিলাম; ১লা বৈশাখ মহাষ্টমীর উপবাস করিয়া বসিলাম।—এটুকু যা ঘটে, তা কেবল আলস্যবশতঃ। ঘরে-ঘরে ইটুকুল সমান জল।

সংসারে পদার্পণ করিয়াই স্নাত্ত বাড়ি হইতে হইলে বেলা থাকা আবশ্যক। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি বেলা করিতে পারি নাই। দেখে, মুরির ঊঁচলা খাইয়া, ধারে ঘড়ী কিনিয়া, ধারে ছুরি রোজ করিয়া, ধারে সোণার বোতাম কিনিয়া,—তিন মাসের মধ্যে বিলক্ষণ দেনা করিয়া ফেলিলাম। মুরি তাগাদায় আসিলে বলিলাম, "বাপ্পুরে! এ টাকা ত আমার শোধ দিবার যো নাই,—দেনা করাই আমার উদ্দেশ্য, এবং সেই দেনা চিরদিন জমা করা আমার মহাসঙ্কল্প।"

মুরি। সে কি মশাই! বলেন কি! এই তিন মাসে দি-বল্লম, তেল-সুনে, চাল-ডালে আপনি প্রায় পঞ্চাশ টাকার ডিগ্রি লইয়াছেন। আমার ছোট দোকান, পুঁজি অল্প।—আপনি টাকা না দিলে, দোকান যে উঠিয়া যাইবে, এবং আমিও যে কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া দাদা পড়িব।

আমি। তোমার দোকানই উঠিয়া যাউক, তোমার কাচ্চা-বাচ্চাই মারা পড়ুক, অথবা তুমিই মরিয়া যাও,—টাকা আমি দিব না, এবং উহা দিতে নাই।

মুরি। এমন কথা ত' আমি শুনি নাই! উঁহুঁ বাইয়াছেন,—টাকা দিবেনই না বা কেন, আর দিতে নাই বা কেন?

আমি। আরে মূর্খ! তুই আমার কথার মারাদ্য কি বুঝবি?

মুরি। আমরা গরীব মানুষ, আপনার কথার মারাদ্য কেমন করিয়া বুঝিব? কিন্তু অমন ধার করিয়া জিনিষ আমরা কখন খাইনা।

আমি। ও-ও-হো! দয়া সহাই তোমাকে ঈশানের খাজা-আহমক বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি কি আজও চীনের ইতিহাস পড় নাই? মিলের Three Essays on Religion আজও অভ্যাস কর নাই? এসব না পড়িয়া থাক,—সংস্কৃত কুসুমাঞ্জলি ত অবশ্যই পড়িয়াছ, তবে বল দেখি, ধার কোন শা—র নাই। তাই! তবে বল দেখি, ধার লক্ষ্মী-শ্রীর লক্ষণ কিনা? ধার যত বেশী ধার, লক্ষ্মী-শ্রী তার তত অধিক। এই যে, মহা প্রতাপশালী ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট,—যাহার কুটীল কটাক্ষে সময় সময় মরুভূমি হয়, মরুভূমি বলে হয়,—যাঁহার অঙ্গুলি-হেলনের ইঙ্গিত পাইয়া, একত্রকালে তিনলক্ষ সৈন্য সেনা ধারিত হয়, বল দেখি, সেই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ধার কত কোটী টাকা! আজ চীন-সম্রাট ইউরোপের দ্বারে দ্বারে টাকা ধার চাহিয়া বেড়াইতেছেন কেন? নিয়াজউদ্দৌলা জগৎশেঠের নিকট টাকা কর্জ লইয়াছিল কেন! যে

ঘুষে! প্রণিধানপূর্ব্বক একবার কাটলেশ-তত্ত্ব বুঝিয়া দেখ। দেখিবে, যে যত বড়লোক, তার তত ধার। অথবা যার যত ধর্ম্ম, সে তত বড়লোক।

কুসুমাঞ্জলিতে লিখিত আছে,—

ঋণকর্ত্তা যাতি পুণ্যাদ্ধনস্য।—
ধনেশ: সর্ব্বৈ: ঋণবান্, যাবেণ জিনতে হরী।
ধারেণৈব ভবেদ্রাজা, যাবৎ ঘূর্ণনি বর্ত্ততে॥

ধারহীনং মনুষ্যাণাং নাস্তি কুত্র সমাগম:।
কালে তু ইংরাজ-রাজো ধার: ধার: মহাধন:॥

চলতি সংসারচক্রং ধারেণৈব অনুক্ষণং।
গৃহিণী-রহনা জানী ধারে পড়য়তি সদা॥

ত্রিলোকে বিনা সূর্য্য: শক্র: বা শশিকং বিনা।
ন তু ধার-বিনা কেহে স্থিরো তু মম জীবনম্॥

বুদ্ধি। মশাই — আজ্ঞা, ব'লোক, আপনি! ধারে খেতে, লেতে টাকা দিবার সময় বড় সোল। ফলিকাল কিনা! চাহরে কলি! আমি এমন টাকা ছাড়িতে;—টাকা দেওয়া দূরে থাক্—উনি কিনা, সিঁড়ি সিঁড়ি ক'রে ইংরেজীতে গাল দিতে আরম্ভ করিলেন। আমি কি আর ইংরাজী বুঝি না!

বুদ্ধি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি সহজে টাকা না দেন, আমি নালিশ করিব।"

আমি আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া হাসি-হাসি মুখে উত্তর দিলাম, "বুদ্ধে! উহাই আমি খুঁজিতেছিলাম, উহাই আমার একান্ত সাধ ছিল! বুদ্ধে! ভাই! তুই আমার আর-জন্মে কেউ ছিলি রে! নৈলে আমার জন্য তোর প্রাণ এত টানিবে কেন? নৈলে, তুই আমার এত মনের কথা বুঝতে পারবি কেন? আহা — বুদ্ধে! যেমন বুদ্ধি না হইলে, বুদ্ধার খাতার খুলে না, কাঁচের গ্লাস না হইলে, বন্ধকের খাতার খুলে না, — সেইরূপ নালিশ না হইলে, দেনার খাতায় খুলে না। যেমন জোয়ারের জল না থাকিলে, বনাজের খাতায় খুলে না, যেমন রং না আসিলে, বাজার খাতায় খুলেনা, যেমন অসুর বাল্পড়া-কলহ বাটীর গার্হস্থ্য-সুখের খাতায় খুলে না,—রে বুদ্ধে! সেইরূপ জানিবে, নালিশ না হইলে, আমার দেনার খাতায় খুলিবে না। এ সংসারে আসিয়া যে ঘর খাতায় খুলাইতে পারিল, তাহারই তত জয়-জয়-কার হইল, জানিবে। ৺বিদ্যাসাগরের খাতায় খুলে — বিধবা-বিবাহে; ৺বঙ্কিমচন্দ্রের খাতায় খুলে — কৃষ্ণ-চরিত্রে; ৺কেশবসেনের খাতায় খুলে — কোচ-রাজ্যে। শকুন্তলা-তত্ত্বের রজনাথের খাতায় খুলিয়াছে, — পাঁচা-পুরাণে; ইজনাথের খাতায় খুলিয়াছে,— টীকিতে; অমরচন্দ্রের খাতায় খুলিয়াছে, — টাকেতে; আর, যোগেন্দ্রচন্দ্রের খাতায় খুলিয়াছে, — কালো অক্ষরে। শিশিরকুমার ঘোষের খাতায় — বৈরাগ্যে; কালীপ্রসন্ন ঘোষের খাতায় — জন্মেবপুত্র-স্বর্গে; সুরেন্দ্রনাথের খাতায় — রাজনীতি-মার্গে; লালমোহনের খাতায়— পার্লামেণ্ট-দুর্গে। তর্কালঙ্কারের খাতায় — বুধ-গয়ায়; ভূদেবের খাতায় — বহরমপুরে; হারাণচন্দ্রের খাতায় চাকায়। নবীন সেনের খাতায় — এখনও-লেখায়; হেমচন্দ্রের খাতায় — আর-না-লেখায়; গিরিশচন্দ্রের খাতায় — নাট্যাচার্য্য-নামে। সঞ্জীবনীর খাতায়— কুলি-মজুরীর ক্রন্দনে, হিতবাদীর খাতায়,— ভূয়ো-ভাষণীর গানে; বঙ্গবাসীর খাতায় — নিরামিষ আহুনি-রন্ধনে। সমাজপতির সাহিত্যের খাতায়— মুহুটি সম্বন্ধে।

বুদ্ধি। লাখো মন্তরের মতন আপনি, হিজিবিজি কি যে বলছেন, আমি তার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমি চলিলাম। তবে শেষ একটা কথা বলিয়া যাই, আপনি ভদ্রলোক, আপনার নামে নালিশ করাটা কি ভাল দেখাইবে?

আমি। খুকি-ভাই!

সংসারের রহ-চক্র
মনে কি তব আছে!

তবে এখন গল্প প্রণিধান করিয়া শুন,—

আমার নামে নালিশ করিলে, আমার অপরাধ হ্রাস কিছুমাত্র হইবে না। বরং অপরাধটি, গুরুপক্ষের শশীর ন্যায়, দিনদিন বাড়িতে থাকিবে। এ ধরাধামে কোন্ সাম্রাজ্ঞের নামে নালিশ না হয়? এই যে মহামেঘ, ঘনাচ্ছ, ঘনঘটা, অপ্রমত্ত ঐট-সেক্রেটারী দাদাৎ আসেন, ইহার নামে এই তাপহরণে, কতগুলি মোকদ্দমা হাকিমের আছে বল দেখি? পাঁচ শতের কম নহে। কিন্তু সাম্রাজ্ঞের কি তাহাতে অপরাধ কিছু কমিয়াছে! খুকি-ভাই! মুখে হাত দিয়া ভাব:— এই, বর্ত্তমানের রাজত্বের নামে কি নালিশ হয় না? ব্রায়তাব্রাব রাজার নামে কি নালিশ হয় না? কুচবিহারের রাজার নামে কি নালিশ হয় না? মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী অন্নদাকালী, রাণী হেমন্ত-কুমারী,— নালিশ কাহার নামে না হইতেছে? বড় বাড়া এবং ছাদ দেখিতেছ, সকলেরই উপর নালিশ হইয়াছে, হইতেছে, অথবা হইবে।

খুকি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া, ভাব-বিহ্বল হইয়া, অনেকক্ষণী অলকণায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতে করিতে, মরালগমনে প্রস্থান করিল।

তাই বলিতেছি, কোনও কার্য পূর্ণ হইতে আমার বাকী নাই।

যদি বল, লেখক, গ্রন্থকার বা সম্পাদক, সে সাধও পূর্ণ হইয়াছে। জননী-জঠরে বালকাল হইতেই আমি লেখক; এবিদ্যা লইয়া ভূমণ্ডল-ভোগার ধূলিসম অন্যে অন্তরেণ হইয়াছে। অন্তরেণ হউক, তাহাতে আমার নিজের কোন ক্ষতি নাই, ক্ষতি যাহা তাহা অন্তরেণের। ঠিক কোন্ তারিখ হইতে আমি লেখক, তাহা আমিই বলিতে পারিতেছিনা, অন্যে কি বলিবে! প্রকৃত কথা এই, আমি আজন্ম লেখক। মহিমাপুর চাদে-খাড়া লইয়া একেবারে ঝুলিয়া ছিল; আমি মোরাদ-কলম-কাগজ হাতে লইয়াই, অবতরণ করিয়া-ছিলাম! গুরুদেব মোরাদীর সন্ধান এই যে, তিনি উপরে থাকিয়াই দর্শকদের পারলৌকিক হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই বেহেস্তাদ-নন্দন উপন্যাসাকারে অবস্থিতি করিয়া, গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। গুরুদেব যাহাতে অক্ষম হইয়াছেন, আমি তাহাতে সক্ষম হইয়াছি।

যখন আমি হাতাখড়ি দিতে শিখিয়াছি, তখনকার একটি কবিতা উদ্ধৃত-স্মরণে চাপা হয়। সম্পাদক বিশেষভাবে ফুটনোট করেন,— "কোন একটি হাতা-খড়ি-লেখা শিশুর লেখা কবিতা।"

যখন আমার একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেইকালে, আমি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলিয়াছি। শুনিয়াছি, গ্রন্থ রচনা করিবার পর, সম্পাদকগণের পাশে ধরিয়া, গ্রন্থের সমালোচনা করাইয়া লইতে হয়। চিরন্তনের প্রথা, প্রাচীন আর্যশাস্ত্রসম্মত প্রথা, পিতৃ-পিতামহ-সংরক্ষিত প্রথা;— তাহাই আমি সে প্রথা লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। আমি চিকার খুলি কাঁধে করিলাম; কপালে একটা ফোঁটা কাটিলাম; এবং কৌপীন পরিয়া, গ্রন্থ লইয়া, সম্পাদকের নিকট চলিলাম। সম্পাদকীয় গুদামে আমাকে তদবস্থ দেখিয়া, সম্পাদকের কি হইলেন,—"এ বাড়ী নয়, এ বাড়ী নয়,—এখানে এখন ভিক্ষে হবে না। —অন্য বাড়ী যাও।" আমি কহিলাম, "আমি সাহিত্য-শ্রীবৃন্দাবন হইতে ছুটী লইয়া আসিয়াছি; একবার তোমাদের কুবুদ্ধা-বিনোদন সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিব। এবে রাজা হ'য়ে কেমন সুখে আছেন, একবার দেখিব।—হাত ছেড়ে দেবে বাবা আর ত দাঁড়াতে নারি, তোদের যুবরাজকে একবার নয়ন-গোচরে হেরিব।"

কি করিলেন "যা যা ফিরে। এখানে আমার রস করতে এসেছে!" আমি কহিলাম, "আমি

বিনয়ে না,—প্রভুত্বে। প্রভুত্বে হইলেই সম্পাদক একটি চাই। প্রভুত্বের-নেশা সম্পাদক-সাহেবদিগের সদাই থাকিত। বঙ্গভূমির এই যে অসংখ্য প্রভুত্বের নেশা, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জলটুকু সম্পাদক-সাহেবের মুখে ঢালিয়া দিয়েছেন। হা ধি! এ ঘরে কি তোমার আফিও যোর নাই? সম্পাদকের ঘরে আছে, তোমার এত দিন সম্পাদিকা হওয়া উচিত ছিল; উচিত ছিল বা বলি কেন? হয়তো, এতদিন তুমি সম্পাদিকা হইয়াই আছ!"

কি যে আমি, উত্তরে এইরূপ বকিতেছি, এমন সময় সম্পাদক ডাকিয়া বলিলেন, "কি! ও কে?" লিখে আর উত্তর দিতে হইল না। আমি বলিলাম, "আমি প্রভুত্বার আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক্।" আমি সম্পাদকের নিকট উপনীত হইয়া, কোনরূপ ভূমিকা, মুখবন্ধ বা অবতরণিকা না করিয়াই, সম্পাদকের—

বিনয়ে করুণা করে ধরিয়া,
জড়িমায় কত করুণা করিয়া।
ক্ষমা করহে, — ধরহে, — ফিরহে!
এ নহে গ্রন্থ তোমার খোসা নহে হে!
তুমি মাকড়সা বড় পণ্ডিত হে!
ওকথা বল, যা কর পীড়িত হে!
তুমি গুণাকর সম্পাদকবর হে!
ছল না কর, ছল না কর বলহে।

সেই দিন হইতেই বঙ্গদেশে, এমন কি ভারতবর্ষে এমন কি সমগ্র পৃথিবীময়ে, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইলাম। সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্রি হইলাম; সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হইলাম; সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ও জীবন-চরিত-লেখক হইলাম; এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক হইলাম। সেইদিন হইতেই আমা দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি হইতে লাগিল; সেই দিন হইতে আমা দ্বারা মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন হইতে লাগিল; সেই দিন হইতে অলঙ্কারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে লাগিল।

তাই বলিতেছি, সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে; বাকী আছে কেবল একটী সাধ। সেই সাধটী পূর্ণ হইবার পর যদি আমি মরি, তাহা হইলে মরিয়া সুখ আছে হয় না।

সে সাধটী কি? বলিব কেন? আগে বলুন যে, সাধ পূর্ণ করিব; তাহা হইলে আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি।

কিন্তু হায়! সে সাধ কি কখন পূরণ হইবার? পশু বিধি সকল করিতে পারে; কাঁঠালের আমসত্ত্ব হইতে পারে; চোঁড়াসাপের মাথায় মাণিক জন্মিতে পারে; কিন্তু হায়, সে সাধ বুঝি পূরণ হইবার নয়।

না, বলা হইল না। আগে সিরিসেট কর,—সে সাধ পূর্ণ করিবে, তবে সে কথা বলিব। নচেৎ ভাঁড়ি দিয়া যে, সেই সাধ-কথাটী শুনিয়া লইবে, তাহা হইবে না।

আকাশ হইতে দৈব-বাণী হইল, "বলুন, বলুন,—দেব-কল্পনাসম আর উৎকণ্ঠায় থাকিতে পারিতেছেন না। নন্দনকাননে পারিজাত-ফুল আর ফুটে নাই। দেবী-অধরে হাসি দেখা দেয় না; সরস্বতীর বীণায় তার বাজে না; দেবগণ স্তম্ভিত, বলুন, বলুন—আপনার কি সাধ বাকী আছে?"

আবার ঐ দেখ, মর্ত্যভূমে নদীর জল বিপরীত দিকে বহিতেছে; হিমালয় মস্তক নত করিয়াছে; সমুদ্রের জল শুকাইয়াছে; মানব-চক্ষু পলক-হীন হইয়া রহিয়াছে; পাখিরা রবহীন হইয়াছে; সে-সব স্তম্ভনরূপ ধারণ করিয়াছে; হাসিরা যেমের মৈত্রাতা-লোক আসে মাঝে মিলিতেছে এবং মাঝে মিলিতেছে; আর ও শ্রোতা যারা সকলেই প্রকাশ করিতেছে, — বলুন, বলুন কি সাধ আপনার!

পাতাল হইতে বলিরাজ ও নরীরাজগণ প্রতিধ্বনি মুখে যারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, — বলুন, বলুন!

অনন্তনাগ যারা ফণাইয়া প্রকাশ করিতেছেন, — বলুন, বলুন!

আমি বলিব না। কেউ তখন একটা কাগাকড়ি দিয়া আমার উপকার করিয়াছিলে কি?

এখন তক্ত-নবর উপস্থিত হইয়াছে কিনা — সংসার-আদর বেশ জমাইয়া লইয়াছি কিনা, তাই সকলেই বলিতেছে, — বলুন, বলুন!

তখন যে মুক্তির উপর একটু শুদ্ধ পাই নাই, — কেহ দেখিয়াছিলে কি?

আমি বলিব না।

ইতিহাসের ইন্দ্রপ্রস্থ

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো এম এ, পি-এইচ-ডি

[সম্পাদকীয় ভূমিকা:—এই প্রবন্ধে পাঠক অতীতের সহিত বর্তমানকে, এবং বর্তমান, ও আগত ভবিষ্যৎকে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। লেখক স্পষ্টভাবে সেই তুলনা না করিলেও, হিন্দুস্থানে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ব-ইতিহাস ও তাহার পরিণাম-কাহিনী ইহাতে আছে। ইন্দ্রপ্রস্থের দ্বারা কলিকাতা-নগরীর উপরেও পড়িয়াছে]

(১)

বঙ্গদেশীয় পর্যটক ইবন্ বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন, সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে 'নব দিল্লী'র অন্তর্গত 'নূতন নগর' বা 'সিরি'র অনতিদূরে 'ইন্দ্রপ্রস্থ পাল্লম' নামে একটী গ্রাম ছিল। মঙ্গোল বা মিত্র যখন আলাউদ্দীনের হুমুখে মস্ত হইয়া গেল, এই ইন্দ্রপ্রস্থ-পাল্লমের সহিত তখন রাজধানীর একটা ঘোরাই কারবার চলিত। চাষারা দলকে দলকে শরাব আনি করিয়া গ্রামখানিল আলানি-কাঠে-বোঝাই গরুর গাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া তুর্কী আমীরদের জন্য বরাবর যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিত। সুতরাং ইন্দ্রপ্রস্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ অনাবশ্যক। যদ্যপি আমি এমন কথাও দিল্লী-অঞ্চলের গ্রামবাসীর মুখে শুনিয়াছি। দিল্লীর নিকটবর্তী তুগলাও জিলা নাকি যুধিষ্ঠির অন্যতম দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা করিয়াছিলেন। নির্বাসিত পাণ্ডবদলকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিতে দুর্যোধন যখন অস্বীকৃত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের শান্তির বাণীকে হস্তস্থ কর্ণ হৈয়া বলিয়া উপহাস করিল, দ্বিপ্রহর রাত্রের তখন পাণ্ডবগণের জন্য পঞ্চগ্রামমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"দেহি তাতঃ তবানুজে রাজ্যাং পঞ্চগ্রামান্ বিসর্জন।"

—এই পঞ্চগ্রামের নামোল্লেখ মহাভারতে আছে কিনা জানিনা। লোকে বলে, বর্তমান তুঘলকাবাদ—বাগপত, শোনপত্ ইত্যাদি পঞ্চপ্রস্থ উক্ত পঞ্চগ্রাম। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরী তখনকার মত বিশ বাইশ হাত মাটির নীচে গিয়াছে, কিংবা যমুনার কুক্ষিগত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই; যেহেতু ঐখান হইতে দক্ষিণে, পশ্চিমে শুধু কালাপাথরের ছোট ছোট পাহাড়, পূর্বে যমুনা নদী আজ পর্যন্ত বরাবর পূর্বমুখে চলিয়া গিয়াছে। দিল্লীর প্রাচীনতম হইতে যেমন পর পর সাতটী দিল্লী-নগর মুসলমান আমলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, পরিত্যক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরীরও সেই দশা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে।

প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে সেই হইতে নবাগত, গিরীর মামলে তাহাকে আমার সহকর্মী, সাহেবের অন্যতম প্রীতির ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তিনি পঞ্চপাণ্ডবের শিবলিঙ্গ এবং দুর্গীশ্বর-শিব দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া ও দিনে পারিলাম, সেদিন তিনি কুতবমিনারের পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই; পথিকেরা প্রাচীন ইষ্টকের সন্ধান পাইয়া পঞ্চপাণ্ডবের শিবালয়ের সন্ধান-দর্শিত করিয়া আসিয়াছেন। শিবালয়ের বাহিরে আসিয়াই কাহারা দুইটি কলসী : তিনি সেখানে "ঐ অপবিত্র মন্দিরে" না" বলিয়া এবং বাহিরে আসন গ্রহণপূর্বক, মন্দিরে পশ্চিমমুখ হইয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আসনে বসিয়া, সান্ধ্যিবন্দন জপ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণপার্শ্বে ভীমার্জুন এবং বামে নকুল সহদেবের আসন; মন্দিরের পশ্চিম প্রাচীরের গায়ে খোদাই-করা — কৃষ্ণ কাকুবাহী-যোজিত পাঁচটি শিবলিঙ্গবাহনের কৃষ্ণমূর্তি বাদি পড়িয়া আছে, মুসলমানেরা বিকৃতি করিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, যুধিষ্ঠিরের আসনের বিকট দীনভাবের প্রস্তর-বেদিকা; এবং মন্দিরের ভিতরে চারিকোণে ছাদ হইতে ঝুলন্ত এক একটা প্রস্তরগ্রন্থির 'বন্ধনী' দেখিয়া আসিয়াছেন। সর্বত্র পদ্ম, কমল, উলুকাণ্ড ইত্যাদি মঙ্গলচিহ্ন চিহ্ন হিন্দু-স্থপতি-শিল্পের নিদর্শন; কেবল মন্দিরের চূড়া ভাঙিয়া মুসলমানেরা একটি গম্বুজ বসাইয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণের বাকো শেষে, মুখে অপরিসীম তৃপ্তি এবং আনন্দের ছাপ দেখিয়া কোনপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিবার সাহস আমার হইল না। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কুতীশ্বর শিব এখনও একটি বৃক্ষছায়া আশ্রয় করিয়া আছেন; মন্দিরনির্মিত মন্দির নাই; সেইদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে ঐখানে যাত্রীর ভিড় হইয়াছিল, ইত্যাদি। নরেনবাবু ইন্দ্রপ্রস্থ-দর্শনের পূর্বে দুই বৎসর দিল্লীতে থাকিয়া আমি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সমূহ একাধিকবার দেখিয়াছি; আমিনাহার সাহেব কোথাও এইরূপ মন্দিরের উল্লেখ করেন নাই, অথচ নরেনবাবুর চাক্ষুষ বর্ণনা অবিশ্বাস করিবার যো নাই। স্থানের দূরত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া অবশেষে বুঝিতে পারিলাম, দিল্লীর 'বাবা-গুলতান' শের-শাহ যেখানে নমাজ করিতেন সেইখানেই আমার নবাগত বন্ধু সান্ধ্য-সন্ধ্যা সারিয়া আসিয়াছেন; ভাগ্যে বাহিরে চৌবাচ্চার 'ওজু'র পানোদক ছিলনা! তিনি যে প্রস্তরবেদিকাকে সন্ধ্যাহ্নিক দীপাধার মনে করিয়াছিলেন — উহার উপর উঠিয়া নমাজের পর মোল্লা 'খুৎবা' পড়িতেন, অর্থাৎ উহা মসজিদের 'মিম্বর'। কিন্তু গাছতলায় শিবলিঙ্গ এবং ঐ স্থানে হিন্দুবাজী-সমাগম সম্বন্ধে আমি তখন কোনও সদুত্তর দিতে পারি নাই, হয়ত এখনও পারিব না। খ্রিষ্ট-বিজীবিকা-গ্রস্ত আওরঙ্গজেব-বাদশাহের পিতামহ প্রপিতামহ যে পুরাতন দিল্লীতে বাস করিতেন সেখানে কখন এবং কি প্রকারে হিন্দুগণ কুতীশ্বর-শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছিল?

(২)

ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরীর তাম্রাশিপর্যন্তের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নহে। আলমগীর-শাহী আমলে পঞ্চনদ-প্রদেশের অন্তর্গত হটালা-নিবাসী সুজানরায় ভাণ্ডারী, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারোহণ-কাল হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত,—ইন্দ্রপ্রস্থের সম্রাট, সুলতান এবং শাহান্‌শাহ-গণের সাধিক ইতিহাস, ফার্সি ভাষায় তাঁহার Khulasat-ut-tawarikh-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। খুষ্টিকার লিখিয়াছেন, সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস এবং বর্ণগ্রন্থ তিনি ফার্সি ভাষায় পড়িয়াছেন। আকবর এবং তাঁহার গুরুর কৃপায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তর্জমা হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অসুবিধা হয় নাই। ইংরেজী আমলে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত না করিলে প্রাচীন ইতিহাসের সেবকেরা চলিতে পারেনা, মোগল আমলে ফার্সি না

পড়িলে সম্রাট হিন্দুর জীবিকা কিংবা জাতিধর্ম্মে চলিত না। যাহা হউক, বুদ্ধিবা হইতেই আমরা মুসলমানদের অত্যাচার মূলা যাচাই করিতে পারি। মুসলমানদের পুরুষানুক্রমে প্রায় অর্দ্ধসহস্রাধিক পরে জয়চন্দ্রের রাজ্য। বসন্তলিখিত পুর পৃথ্বীরাজ-জাঠ মোগল-ইতিহাস, অর্থাৎ সেকালের 'পুরানা দিল্লী' অধিকার করিয়া রাজত্বপ্রস্থে পরিণত করিয়াছিলেন; তখন হইতে কেবল উহার অন্তর্ভেদী প্রাকার, হোরস্ত পেঁচালী মসজিদ্ এবং হুমায়ুনের পাঠাগার মাত্র অবশিষ্ট আছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় জাঠ কুরুক্ষেত্র উহার মালিক হইয়া বসিয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ সময় হইতে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের স্মৃতিরক্ষার্থ "জাঠ-দেবতাগণ" কর্ত্তৃক কুরীশ্বর-শিব স্থাপিত হইয়া হিন্দুর পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তাল বা মন্দ—জাঠের অন্যান্য কর্ম্ম কিছুই নাই। মোগল আমলে জাঠ-জাতির উপর যে লোমহর্ষণ অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতার ইত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল, উহাতে ঐ জাতির বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়।

কিন্তু জাঠ-জাতি কেবল হিন্দুর ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা উদ্ধার করে নাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানের উপর পূর্ণ অত্যাচারের অমানুষিক ও নিষ্ঠুর ভাবের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছে। হিংসায় দ্বারা হিংসায়, অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের অবসান হয় নাই। জাঠপণ্ডিত গুরু-যদুনাথের টীকা লিখিয়াছেন; পীলা-জাঠ কবির-সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অহিংসা এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনমন্ত্র প্রচার করিয়াছে। রামেশ্বর-জাঠ আওরঙ্গজেবের আমলে সেকেন্দ্রা লুট করিয়া আকবর বাদশাহের অস্থি আগুনে নিক্ষেপ করিয়াছিল; তাজমহল জাঠের হাতে অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়াছে। ভজ-গোবিন্দের 'অমৃত' পান করিয়া শিখ-জাঠ এখনও অমর হইয়া আছে। ইতিহাস-পাঠে জানা যায়, আহমদশাহ দুরানী অমৃতসরের অকালকুণ্ড বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; অনেক বৎসর পরে রঞ্জিত সিংহের পুণ্যকর্ম্মীগণের দ্বারা ঐ কুণ্ড পরিষ্কার এবং স্বয়ার-চক্রের দ্বারা পরিশোধিত করিয়াছিল। যাহা হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমল্ল যদুনাথী জাঠ-জাতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার—কংসরূপী মোগলের মহাকাল-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পূর্ব্বেই দুর্বা-জাঠা এবং দিল্লীপ্রদেশে হিন্দু মন্দির ও মূর্ত্তিপূজা হইয়াছিল; তিনি পরবর্ত্তিগণের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখেন নাই। তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করায় হিন্দুগণ নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সাহসী হয় নাই। মন্দিরের অভাবে উক্ত প্রদেশের জাঠ, আহীর এবং গুজর-কৃষক ও পশুপালকগণ পর্ব্ব-উপলক্ষে বট ও অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা করিত। এই ভাবে বট অশ্বত্থবৃক্ষের আশ্রয় করিয়া হিন্দুর রোমানী বাড়িয়া চলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, বট-অশ্বত্থরাজ কাটিয়া ফেলিবার মোগলাই হুকুম হইয়াছিল।

মহম্মদ-শাহের পুত্র আহমদ-শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে, দীন-বন্ধুই লালাবত খাঁ পবিত্র রমজান মাসে (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৭৪৯খৃঃ) জাঠার রাজার বৌজ ও তোপখানা লইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী নারনোলের নিকটবর্ত্তী একস্থানে জাঠের তাঁবে পড়িয়া তিনি মুসলমানের সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধির অন্যতম সর্ত্ত ছিল মোগল সরকার জবিয়াতে কোন সিপল গাছ (অশ্বত্থ) কাটিতে পারিবেন না, কিংবা উহার পূজায় বাধা জন্মাইতে পারিবেন না।* এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের দুর্দ্দশার জন্য উদাহরণ অনাবশ্যক, অথচ মোগল সাম্রাজ্য তখন "যাবদ্ভূতো নিরাপদঃ।"

* Sarkar's Fall of the Mughal Empire Vol. I. p. 309.

(৩)

মহম্মদ শাহ্ দিল্লীর উজির-মন্ত্রী নাজী এক নর্তকীকে বিবাহ করিয়া, যে সোহাগটা তাঁহাকেই নজর করিয়াছিলেন; কিন্তু যে দিল্লিশ্বরী, 'কুদসিয়া বেগম' খেতাব পাইতেন, সম্মানে হস্তা করিতে পারে নাই। ইহার গর্ভে তাঁর ও উজিরিআলীর আহমদ-শাহের জন্ম হয়। সম্রাটকে বসিবার পূর্বে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই, কোন পুরুষমানুষের মুখও দেখেন নাই; সর্বসমক্ষে যাহার মুখ দেখিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি—তাঁহার মাতার ক্রীতদাস খোজা জাবেদ। আহমদ শাহের সঙ্গে বাল্যকালে ভাল খেলিতেন কুদসিয়া বেগম, এবং খাঁ-উজিরিআলী তাহাকে। তাঁহার সময়ে 'ইরানী' এবং 'তুরাণী' আমীরদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। বয়োধর্মে নবাব সফদর জঙ্গ প্রধান উজীর, কিন্তু খোজার উজীরী করিতে তিনি নারাজ। আহমদ শাহ্, দিল্লীর উপকণ্ঠে চারি-বর্গ-মাইল-ব্যাপী, প্রাচীরবেষ্টিত, লাক্ষ্ণৌসোভিত পরীর শহর আবাদ করিয়াছিলেন: দিল্লীর কোলাহল এবং পুরুষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তিনি মাসের পর মাস এই নারীরাজ্যে কুচবিহার করিতেন। * *

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন সকালবেলা নবাব-উজীর সফদরজঙ্গ অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুইয়াছিলেন—চক্ষু মুদ্রিত, অথচ ঘুম নাই। বেগমসাহেবার আওয়াজ পাইয়া তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছায় উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু চোখ খুলিলেন না। শব্দের গৌরবে নবাবী পাইয়াছেন, কাজেই তিনি বেগমসাহেবাকে বিলক্ষণ সমীহ করিয়া চলিতেন।' বেগমসাহেবা নিদ্রার ভেদ ভাঙাতে নবাব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, চোখ মেলিয়া হইবে কি? আলো কই? চতুর্দিকে অন্ধকার! মোগল রসাতলে, আফগান বাদ-বাকী; ফরাক্কাবাদের আহমদ খাঁ বঙ্গ ও আজিমি-রোহিলা-পাঠানে মিলিয়া দক্ষৌ, এলাহাবাদ-দুর্গ অবরোধ করিয়া আছে, শীঘ্রই হয়ত দিল্লী আক্রমণ করিবে। কৌজ নাই, তহবিল খালি, হিসাব টুটিয়া গিয়াছে। ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বেগমসাহেবা বলিয়া উঠিলেন, "সাবাস উজীর-ই-আলা! চোখ বুজিয়া তস্বী জপিলেই বুঝি তামাম দুনিয়া হাতের মুঠায় আসিবে! আমার তহবিলের নগদ পাঁচ লাখ, হীরা-জহরতে দশ লাখ টাকা—নবাব সাহেবের খেদমতে হাজির। আজই চিঠি লিখিয়া মালবের মারাঠা কৌজ ও গুজরাটের জাঠ কৌজ তলব করিতে হইবে; মক্কের হিসাব, খোদার বরকত।"

নবাব-উজীর সফদরজঙ্গের সহধর্মিণী ছিলেন খুদেজা-উল্-খুদুক নবাব দাতে-খাঁর কন্যা। পিতার ন্যায় তাঁহার তীক্ষ্ণ মেজাজ ও অটুট সাহস; হুকুম খাটাইবার সহজাত অবজ্ঞা; বিপদে ধৈর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কূটনীতিজ্ঞানে পিতা এবং স্বামী হইতে চতুর্গুণ শ্রেষ্ঠ। বেগমসাহেবার পরামর্শ অনুসারে তাল করিয়া, নবাব-উজীর কয়েক মাসের মধ্যেই মারাঠা এবং জাঠ-সেনার সাহায্যে বঙ্গ এবং রোহিলা-গণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া সেপাল-তল্পাই সমেত তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আবেদ খাঁ-র বদলে মারাঠাগণ উজীরের পক্ষ ত্যাগ করাতে, তিনি রোহিলাশক্তিকে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া নবাব সফদরজঙ্গ সর্বপ্রথম আবেদ খাঁ-কে বধ করিলেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। সফদরজঙ্গ পদচ্যুত এবং রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইলেন। দিল্লীর বাহিরে শিবির সংস্থাপন করিয়া নবাব সফদরজঙ্গ স্বজনবর্গকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। কনৌজ হইতে পঞ্চশত সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া কুমার সুজাদ্দৌল নবাব-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। এই বাহিনীর পশ্চাতে ছিল

* Tarikh-i-Ahmadi (Pers. text) O. P. Ghulam Ali, Imad-us-Saadat (Pers. text)

আচরণ-ব্যবহার সর্বশ্রেণীর সর্বলোকের মুখরক্ষা দিত। সুরজমলের এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী 'রামরস' নামে পরিচিত ছিল। জাঠরা বীরশ্রেষ্ঠ সুরজমলকে, কৃষ্ণাবতারের মত মহত্বাংশে অবতীর্ণ পার্থসারথি বলিয়া মনে করিলেও, তিনি স্বয়ং রাম-নামেই সমস্ত কার্য করিতেন। পাঠান সাবিত খাঁ-র সাবিতগড় দুর্গ জয় করিয়া তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন রামগড়। মারাঠা আমল পর্যন্ত উহা রামগড় নামেই পরিচিত ছিল, বর্তমানে ঐ দুর্গই সুপ্রসিদ্ধ ভরতপুর। যাহা হউক, সুরজমলের 'রামরস' শাহজাহানাবাদ-দিল্লী হইতে অম্বিকা-নির্মল পর্যন্ত মজ্জ করিয়া দিল। চারিদিকে লুঠতরাজ, রাজধানীতে যাহারা পড়িয়া রহিল। আহমদ-শাহের নূতন উজীর ইমাদ-উল্-মুলুক, সাহারানপুরের কলিদার নাজিব-খাঁ রোহিলা, এবং মাদব হইতে মলহার রাও হোলকর-কে রাজধানী-রক্ষার জন্য মোটা টাকার লোভ দেখাইয়া স্বপক্ষে আহ্বান করিয়াছে শুনিয়া, নবাব সফদরজঙ্গ সুরজমলকে পুরাণা দিল্লী-সহর লুট করিবার হুকুম দিলেন।

(৪)

সুরজমলের সভাকবি সুখন তাঁহার বীরত্বপ্রধান হিন্দী কাব্য 'সুজান-চরিতে', ইন্দ্রপ্রস্থ-বাসীদের চমৎকার বর্ণনা নানা ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিজেও সুরজমলের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—এইরূপ ইঙ্গিত কাব্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। মুসলমান ইতিহাসে ইন্দ্রপ্রস্থ-বাসীদের ব্যাপারকে নাগরিকাদী ব্যাপার অপেক্ষা জনাব—"জাট-লড়ী" বলা হইয়াছে। বর্তমান পুরাণা কিল্লা (Qila Kohna) তখনকার বাহিরে, আকবর আমলের সময় পর্যন্ত, বহুবিস্তৃত, সমৃদ্ধ এবং প্রাচীরবেষ্টিত জনবহুল সহর ছিল। পাঠান এবং আকবরী আমলের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবার এই প্রাচীন সহরে বাস করিতেন; ব্যবসা-বাণিজ্য পুরাণা সহরেই ছিল বেশী। মোট কথা, বর্তমান New Delhi এবং Old Delhi-র মধ্যে যে তফাৎ, সেকালে নূতন-পুরাতনের মধ্যে প্রায় অনুরূপ পার্থক্য ছিল। এই প্রাচীন সহর খাসের হিন্দু জাঠের হাতে কখনো যায় নাই। মুঘলের কাছে জাঠ চিরকালই পাকা ওস্তাদ, ব্যবসাবুদ্ধিওয়ালা ছোট-বড় কোন জিনিষ ছাড়িবার পাত্র নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর যমুনা-কূলের ভোজ-প্রসাদন, গৃহস্থালীর ছবি, আচার-মিঠাই, হুঁকা-কিলা, ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ কবি-বর্ণিত লুটের লিষ্টিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই লিষ্টিটির টীকা-টিপ্পনী প্রয়োজন, উহাতে একটি শতাব্দ প্রবন্ধের উপকরণ আছে।

জাঠদের লুটের কায়দায় একটু বৈচিত্র্য ছিল, যাহার যাহা সে তাহাকে তাহা যাতে করিয়া কিংবা গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া নিশ্চিন্তে স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। তাহারা স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ কিংবা অকারণ রক্তপাত করিত না; গ্রামে আগুন লাগাইত না, কারণ ইহাতে অধিক খাটুনি দরকার ছিল না। উপরন্তু আশঙ্কা হইতে, অযথা মত ঘুঁটে-খড়ের গুদামে আগুন, পথিক চারপাই পর্যন্ত পুড়িয়া যাইত। মুসলমানেরা লুটের খেয়াল করিত না; আগেই তাহারা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-নির্বিশেষে সকলের মাথা কাটিয়া আনিত, স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিত। নাগরিকাদী 'ফতহ্ ই-আম' বা পাইকারী লুঠতরাজ,—এবং জাঠ-জয়ের ব্যাপারে আহমদশাহ-দুরাণীর সেনাপতি জাহান খাঁ-র যমুনা-কূলবাসের অন্তর বীভৎস তাণ্ডব-হোলি-খেলা ইহার প্রমাণ। সুরজমল কতদিন ধরিয়া পুরাণা দিল্লী লুট করিয়াছিলেন জানা যায় না। দিল্লী এবং আওরঙ্গজেবের বংশধরদের প্রতি জাঠজাতির পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। প্রতিহিংসার যে আগুন এতদিন উৎপীড়িত জাঠের হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল উহার জ্বালাময়ী শিখা এইবার ইন্দ্রপ্রস্থকে গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। কবি সুখনের উল্লাস তাঁহার নায়ক সুরজমলের কার্যের মাত্রাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, যথা—

অতঃপর ছত্রপতি ঐ দেশের উদ্দিষ্ট হরি
অতঃপরই পুরুষাহুতি চতুরা মূল ধূর হৈ।
ঔর তী আদিরে, ঐন্দ্রপুর সো'। অধিবসু ও
হোতা শ্রীসুজান তনয়ন যনয়ন হৈ।
[সুজান-চরিত]

অর্থাৎ, যমুনাতীরে ধর্মপুর-ধামে এক স্বর্গমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। এই যজ্ঞে ঋষি অতঃপর ছত্রপতি যেজ্ঞ প্রাপ্তিমূল এবং ঐন্দ্রপুর, ইহার পূর্বাহুতি যমুন 'চতুরা' অর্থাৎ চাতুরালী-যৌবন দান। তথা অর্থাৎ জাতি-যৌবন এই যজ্ঞের অগ্নি, ঐন্দ্রপুর হোতমু ও হোতা শ্রীসুজান, এবং যজমান যনয়ন (আবুল যনয়ন খাঁ নবাব সুজার ভ্রাতা)।

কবি লিখিয়াছেন, যজমান যনয়ন হোতা সুজান-অনুজ যৌবন পরিমাণ দেখিয়া আনন্দযুক্ত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া সুজতা হইতে ঐন্দ্রপুর কাব্যের এই স্বয়ংজন্মলাভের উদ্যম তাণ্ডব বন্ধ করিবেন। কবি স্বয়ং এই ঐন্দ্রপ্রস্থ-কাহিনীকে পৌরাণিক-রূপ দান করিয়া সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বপুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদৈত্যরূপে নির্বাসিত ও অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। সেই আক্রোশে 'যজ্ঞেশ'—যদুনসিংহের পুত্র যজমান—ঐন্দ্রপুর লুণ্ঠন ও দাহন করিলেন। তাহা হইতে ইহার নাম, পুরানা দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মী এক মাত্রই ব্রহ্মভূমিতেই আশ্রয় লইলেন। এই সময় হইতে ছত্রপতি, যৌন প্রভৃতি নবপ্রতিষ্ঠিত জাতি-দুর্গ ঐশ্বর্য ও যৌবন আকবর বাদশাহের আগ্রা এবং শাহজাহানের দিল্লীকে উপহার করিয়া অর্থলক্ষ্মী যাবৎ হিন্দুস্থানের অন্নুর যাবিয়াছিল। কবি সত্য বলিয়াছেন—

"যেন্ যেন্ তজি লছিমী দিল্লী বিয়ো নিবাস।
অতি অবশ লখি দুষ্ট বিন্ চলী করন্ ব্রহ্মবাস॥"

অর্থাৎ, লক্ষ্মী যেসব পাপ যেন তাহা করিয়া দিল্লীতে আশ্রয় করিয়াছিলেন; অবশ প্রবল দেখিয়া ছলছলে তিনি ব্রহ্মবাস করিতে চলিলেন।"

অবশিষ্ট শব্দ দুটি করিয়া সুজানের তাঁহার ছলনায় কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। কবির উল্লাসে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা আছে, যাদবতার যাদাত্মা নাই।

(৪)

অহেতুকী হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, জাতির অসংযত, শোণিত-তৃষ্ণা, মুর্বিরের ইন্দ্রপ্রস্থ-বাসী অভিশপ্ত ভূমি। প্রাণভয়ে পলায়ন-ক্লান্ত জীবকুলকে বধ করিয়া অধিষ্ঠান—যাদ-বৃত্তি, ক্ষাত্র-ধর্ম নহে। অজাতশত্রু শাশ্বতকে অগ্নির নিষ্ঠুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাত্রার ব্যাকুলতা—ঋষিতা-বজ্রপাতের সেই রোমহর্ষণি—কাল-চক্রকে ডাকিয়া আজিও জীবের শাশ্বত যেদনার সহিত সুর মিলাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য-মাধবের শাশ্বতকে দেবতা ও মানুষ সমান দোষী, সমান পাতক-গ্রস্ত। ক্ষমা করিতে না পারিলে অগ্নিদেব যার বৎসর যজ্ঞ-ভাগার যজ্ঞ কি খাইতে যেমন কেন? অগ্নি দেবতাগণের মুখস্বরূপ; যজ্ঞের খাদ্যাদ্য ঘৃত, সোম, যজ্ঞস্থলকে পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ। অন্ন

* লক্ষ্মীর চাঞ্চল্যের একটি সুন্দর অনুযোগ দেখাইয়াছেন বৈয়াসকীর সূত, হিন্দীভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, খান্ খানান্ অব্দুর রহিম—

"কমলা থির্ ন রহি কহত সব্ কোয়।
পুরুষ পুরাতন-কী বধূ চঞ্চলা কাহে ন হোয়॥"

[সকলেই বলে, কমলা স্থির থাকেন না, পুরুষ-পুরাতনের (এক অর্থে নারায়ণ, অন্য অর্থে অথর্ব বৃদ্ধ) স্ত্রী কেন চঞ্চলা হইবেন না?]
—"রহীম-সতসই।"

কোন দেবতার দেহের অঙ্গুষ্ঠ হইল না, অথচ অস্থির অস্থিসাধ্য! নিরীহ লোকেরা বলে "শয়াকণ্ঠ কী রোটী" বা শরিষা খানা — যে যাহাকে পারে ঠকাইয়া খায়; অস্থিদেব কি তাহাই করিয়াছিলেন! বাপরের শেষে অস্থিদেব একটা আসুরিক চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিলে — যাগ-যজ্ঞহীন, হবি-র্ভাগ কলিকালে স্বভাব-চিকিৎসার নিশ্চয়ই আরোগ্য-লাভ করিবেন। দেবতার পাণ্ডবের সহায়কারী কৃষ্ণার্জুন খাণ্ডব দাহন করিয়া অমরাবতীর আসন হইতে প্রকৃত মানবের পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছেন; ইতিহাসের আদালতে, আপত্তিক ব্যাপারে দেবতাকেও মানুষ-হিসাবে বিচার গ্রহণ করিতে হইবে।

ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডব-কৌরব কেহই ভোগ করিতে পারেন নাই। ঐ স্থানে ময়াসুর 'দিব্য সভা' নির্মাণ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই; রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির ত্রয়োদশের অন্তে ঐখানেই পুরুকলালা হইতে নামিবার সময় পা পিছলাইয়া পড়াইতে পড়াইতে দ্রুপদীর অগ্রে পাণ্ডবেরা চলিয়া গিয়াছিলেন। ঐখানে আকবরকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া যাওয়ায় বার্থ হইয়াছিল। ইহার পর, শাহজাহানাবাদ-দিল্লী (বর্তমান পুরাণা দিল্লী) নির্মাণের প্রাক্কাল পর্যন্ত, মোঘল সম্রাটদের রাজধানী ছিল — আগ্রা-নগর। ইন্দ্রপ্রস্থ-দিল্লীতে আকবরের একমাত্র স্মৃতি — ইহার অর্ধচন্দ্রের বিশাল তোরণের উপরিভাগে, প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, সূর্যদেবের প্রস্তরমূর্তি; একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে দুইটি চক্ষু এবং দুপাশে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটার ভোতক রেখাগুচ্ছ; ঐ প্রস্তরের দুই পার্শ্বে খোদিত এক একটি ছোট সিংহ — এক বহুব্যাপী পুরুষ সিংহের মুখের মধ্যে স্বর্বাকলক প্রবেশ করাইয়া দন্তে ধরিয়া আছে। ঐ সমস্ত কারিগরীর নিশানা আদল আলমগীর এবং পরবর্তীকালের অপরিচিত নকল আওরঙ্গজেবের নেক্-নজর হইতে কেমন করিয়া পারের হইয়াছে — খোদা-তালাই জানেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ পরিণতি — আরাবল্লীগিরিশৈল ভারতবর্ষে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান। খাণ্ডব-প্রস্থের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংরেজের ইন্দ্রপ্রস্থ; ঐখানেই সভাপর্ব পুনরায় অভিনীত হইয়াছে। এই সভাতেও বর্ণ-নির্বিশেষে শিশুপাল-রক্তলুব্ধ, ভীমার্জুন, বাসুদেব-যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাসুদেবের নিদান চতুর্ভুজ চেম্বারলেন যুধিষ্ঠিরকে শাসাইতেছেন, কিন্তু ভীম-পিত্তাদহ কই? অন্তরালে অন্তরবাণী শুনাইবে কে! 'মাভৈঃ ভূরুশার্দূল বা সিংহঃ হ্রদমিচ্ছতি'।

যজ্ঞবিঘ্নকারী রাজন্যগুলীকে অনায়াসে, হেলায় উপেক্ষা করিয়া, ধাত্যাভিহত সমুদ্রের ন্যায় যজ্ঞকর্তা, তাঁহাদের উৎসাহদাতা দুর্বুদ্ধি চেম্বারলেনকে সম্বোধন করিয়া সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবে কে! —

ত্রিয়তাং ধূর্তি, যো ভক্তঃ সর্বৈঃ সকলশত্রুভিঃ।
এষ ত্রিলোকি গোবিন্দঃ পুণ্ডরীকোঽহমিত্যুতঃ॥

[অন্বয়ার্থ—তুমি যদি চেম্বারলেন তবে কি আমি,
অর্থাসনে আজি মোরা পুণ্ডি নারায়ণ।
পর নিন্দা করি আমি সদাকাল স্থিরে।
যার ভক্ত ইচ্ছা আছে আইস সমরে॥]

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি—প্রথম, যে রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায় অতিশয় মৌলিক, এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী—বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিব্য-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

(১)

লায়লা-মজনুঁ

[ফারসী কবি নিজামীর বিখ্যাত কাব্য 'লায়লা-মজনুঁ'র ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে। য়ুরোপীয় কাব্যে শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও-ও-জুলিয়েট'-র স্থান যেমন, এশিয়ার সাহিত্যে 'লায়লা-মজনুঁ'র স্থান তেমনই। সেখানে তাহা নাটক, এখানে তাহা খাঁটি গীতি-কাব্য। উহার আখ্যানবস্তুও একটি গীতিকাহিনী, শুধু তাহাই নয়, এই কাব্যের অন্তরালে একটি নিগূঢ় ভাব-সঙ্কেত আছে, পাঠকালে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।]

লায়লা! এযেন নিশীথের শুক্লাবিন্দু লায়লা!

সন্ধ্যাদেবীর পূর্ণিমা চাঁদ যেমন, লায়লার রূপ ছিল তেমনই। সাইপ্রেস-তরুর মত ছিল তার সুকুমার দেহলতা—রাতের বাতাসে দুলে ওঠে, তারার আলোয় সর্বাঙ্গ চিক্‌মিক্ করে। চুল ত' নয়—যেন একরাশ জমাট অন্ধকার! চোখদুটি ছিল আলোয় কালো, সেই আলোই যেন চাহনিখানির উপর ছায়া করে' রয়েছে। উষার অরুণিমার মত তার হাসি—ঠোঁটদুখানিকে আরও রঙীন করে দিত। দেহে যেন তার যৌবনের দুয়ারে প্রেম এসে দাঁড়াল দুঃখের পশরাটি আড়াল করে', তখন তার সেই রূপ ছুটে উঠেছে—স্বর্গের পুষ্পোদ্যান থেকে তোলা একটি গোলাপ-ফুলের মত! সেই প্রেমই যেন তাকে ছুঁয়ে ফেলে দলে' ছিঁড়ে ফেলবে; যেন আত্তিয়ানের হাত থেকে সেই গোলাপ কেড়ে নিলে গুলন্দম, তাই সে নীরব বিমর্ষ হয়ে শুকিয়ে গেল।

লায়লা এসেছিল রাত্রির বেশ ধরে — রাত্রির মতই ছিল তার অপরূপ রূপ ; সে ফিরে গেল আলোর দেশে। তার কবরের উপর যে সাইপ্রেস-গাছটি ছিল, তার কানে বৈশ-সমীরণ যখন সেই প্রেম-কাহিনীর সুর মর্ম্মর তুলত, তখন আকাশের তারারাও যেন আরও উজ্জ্বলতরো নীচের পানে চাইত, আর জেগে বলত — "লায়লা ত' হারিয়ে যায়নি ; সে আমাদের থেকেই জন্মেছিল, আমাদের মাঝেই ফিরে এসেছে। একবার ঊর্দ্ধে চাও — আরও ঊর্দ্ধে, যেখানে বড় আকাশের ধরে উঠেছে সেইখানে লায়লা বসে' আছে, লায়লা আজের বলেই ওখানটায় এত আলো !"

যেমন চাঁদের ছায়া সকল নদীর বুকেই পড়ে, চাঁদ কিন্তু একটাই — তেমনই, লায়লার রূপ সকল পুরুষকে সমান পাগল করেছিল। তার পিতা ছিলেন একজন বড় সর্দার বা কুলপতি ; লায়লার রূপের কথা শুনে' কত রাজা কত রাজপুত্র তাঁর দ্বারস্থ হ'ল, কিন্তু কাউকে মনে ধরল না লায়লার। ধন-দৌলত রাজ-ঐশ্বর্য্যও যাকে জয় করতে পারল না, তাকে জয় করলে শেষে এক তরুণ যুবা, নাম তার কায়েস। তার বাপ ছিল ইমেন-দেশের সর্দার ; সেই কায়েসকে সে তার তনু-মন আপনা হ'তেই সমর্পণ করলে।

লায়লার বাপের সঙ্গে ঐ ইমেন-কুলপতির সদ্ভাব ছিল না, দুই কুলে ছিল বহুকালের বিবাদ। যদিও এখন আর তা বাইরে প্রকাশ পেত না, তবুও কোথাও কোন উপলক্ষে দেখা হ'লে, পরস্পর অভিবাদন করবার সময় চোখের দৃষ্টিতে সেই শত্রুতা ঢেকে রাখা যেত না। এর ব্যতিক্রম হয়েছিল শুধু একবার — যখন ঐ কায়েস এক উৎসবের দিনে লায়লাকে প্রথম দেখতে পায় ; দু'জনেই দু'জনের পানে চেয়ে রইল, দুজনেই বাকহারা ; চোখের সাথে চোখ মিলতেই দুজনেরই প্রাণ থর থর করে' কেঁপে উঠল।

সেই মুহূর্ত্ত থেকে কায়েস যেন একেবারে বদলে গেল। সে আর ঘোড়ায় চড়ে' শিকারে বেরত যায় না ; যখন তাকে যেতে হয় সকলে মিলে, কিম্বা যখন সলাপরামর্শের দরবারে হাজির থাকতে হয়, তখন সে কারো সঙ্গে কথা কয় না, দূরে একধারে বসে' থাকে ; তার চোখে দেখেই যেন বোঝা একটা আলো। তাকে কোন খেলায় যোগ দেওয়াতে পারে না তার বন্ধুরা, কোন তরুণী তাকে আর খুসী করতে পারে না। তার প্রাণ এখন যে বাড়ীতে বাস করছে, সে তার নিজের বাড়ী নয়।

আর লায়লা ! সেও তখন তার সখীদের মাঝখানে বসে' থাকে, কারো সঙ্গে কথা কয় না, চোখদুটি মেলে থাকে মাটীর পানে। একদিন এক তরুণী লহরী তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে, বীণা তুলে নিয়ে একটি গান গাইলে ; এ সেই কোয়ারার গান, যেটীর অঙ্গনের মাঝখানে যে ফোয়ারা আছে ; ধরে ধারে চাঁদনী-রাতের রূপালী জোৎস্নায় প্রেমিকের সাথে প্রেমিকার মিলন হয়। গান শেষ হ'লে সে একবার মাথাটি তুলে সখীর পানে চাইলে, সেই গান আবার গাইতে বললে, তারপর আবার। এর পর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায়, সূর্য্য পাটে বসতেই, সে বেরিয়ে পড়ত তার পিতার প্রাসাদ-ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানটিতে ; যত দিন যায় ততই তার ভ্রমণের পরিধিটাও বড় হ'তে থাকে ; শেষে একদিন—সে দিন জোৎস্নায় যেন ঝিলিক ফুটছে — সে বেড়াতে বেড়াতে একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে এসে পড়ল, তার পরেই মরুভূমি। কিন্তু জোৎস্নার যে শেষ নেই, যতদূর চাও জোৎস্না ! সেইখানে দাঁড়িয়ে সে চেয়ে রইল সামনের দিকে বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে ; হঠাৎ তার চোখে পড়ল, দূরে একটা খোলা-জায়গায় চাঁদের আলো পড়েছে, তার ঠিক মাঝখানে এক কোয়ারা — সেই আলোয় তার সর্ব্বাঙ্গ ঝক ঝক করছে। তখনই মনে পড়ল তার সেই সখীর গান, এ সেই কোয়ারা — গানের কথার বীণার সুরে যা' অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ! ঐখানে কতকাল হ'তে কত প্রেমিক-প্রেমিকার

যে'পন-দিনে হয়ে, তারা পরস্পরকে চির-প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সে কি তা হ'লে না-জেনে এরি সন্ধানে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে? মনে হ'তেই তার লায়লের একটা বিহ্বল হ'ল, গাল দু'খানি কেন ছেয়ে উঠল, বুকের ভিতর দুরদুর করতে লাগল। তখনই সে ফিরে দাঁড়াল, তারপর ছুটে চলে গেল তার পিতার সেই প্রাসাদে—বড় লজ্জা হ'ল তার।

সে প্রাসাদ যেমন বড়, তেমনই উঁচু, সে যেন কোন সুলতানের রাজপ্রাসাদ। তারই একটা উচ্চ কক্ষে একটি জানলার ধারে প্রায়ই বসে' থাকে লায়লা; তার নীচে দালানের গম্বুজগুলির কেবল মাথাই দেখা যায়। সেই ঘরে সে থাকত, আর থাকত এক-জোড়া বড় সুন্দর সাদা রঙের পায়রা। এই কপোত-কপোতী তার অনেকদিনের সাথী; তারা কখনো তার কাঁধের উপর বসে' আস্তে আস্তে ঠোঁট দিয়ে তার গালে ঠোকা দিত, আর মোহাগভরে ডাকত—কু-কু-কু; কখনো বা ঐ কাঁধের উপরেই কত রকম করে' তাদের ডানা ঝরত, আর ঐ এক সুরে সুর করত—কু-কু-কু। তাহলেই তারা হাতের উপর এসে বসে, হাত থেকে খাবার খুঁটে নেয়। লায়লা যখন একটিকে বুকে চেপে চেপে অপরটিকে জানলা দিয়ে বাইরে উড়ে দিত, তখন সেই ছাড়া-পাখীটা ঘুরতে পারত, এবার তাকে উড়ে দিয়ে বন্ধুর হবে ঐ গাঁয়ের ডালটিতে। সেখান থেকে সে তার বন্দী সাথীটির উদ্দেশে যখন কাতর কণ্ঠে কু-কু করে' ডাকত, তখন অপর পাখীটি লায়লার বুকের কাছে ছটফট করত; লায়লা আরও কিছুক্ষণ তাকে ধরে' রেখে' শেষে আর পারত না—ছেড়ে দিত। কপোতী সেই তার সাথীর পায়ে উড়ে দিয়ে বসত, অমনই লায়লা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে' উঠত—"আহা! প্রেমের যদি পাখা থাকে তবে এমনি করেই একজন অপর জনের কাছে উড়ে যায়। আমার যে পাখা নেই!" তবু ঐ পায়রার পায়ে বেঁধেই একদিন যে আকুল-করা প্রেম-লিপি পাঠিয়েছিল তার মনোচোর, তাতেই সে আশায় আশায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছিল সেই বিজন-তীর্থে—সেই নির্জন ফোয়ারার ধারে।

কায়েস এখন কেবলই নির্জনে বসে' চিন্তা করে, সে চিন্তায় শেষ নেই। একদিন হঠাৎ তার মনে পড়ল লায়লার সেই পাখা পায়রাদুটির কথা—সে কথা শুনেছে সকলেই জানত। মনে পড়তেই, সে কনুইএর উপর ভর করে' উঠে বসল তার পালঙ্কে, তারপর আপন মনে বলতে লাগল "আমি যদি নিজেই তার বাপের কাছে গিয়ে বলি, আমার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তার কি জবাব পাব আমি? যদি নিজে না গিয়ে আর কাউকে দূত করে পাঠাই, তবে তারই বা অভ্যর্থনা হবে কি রকম—কে জানে? তার চেয়ে যদি ওই পায়রা-দুটির একটিকে—শোনা যায়, তারা জানলা দিয়ে লায়লার ঘরের ভিতরে উড়ে যায়, একেবারে তার বুকের কাছটিতে বেঁসে বসে।" পায়রার কথা একমনে চিন্তা করতে করতে কায়েস একবার তার অনুচর বৃদ্ধা জাফেরকে ডেকে পাঠালে। জাফের বড় প্রভুভক্ত, তাকবাধাত্র ছুটে এল।

তখন কায়েস বললে, "জাফো, জাফো, তুই ত' জানিস — বসরা-সওদাগরের ঘরে একজোড়া সাদা পায়রা আছে? তাদের একটা, মনিব-দুলারীর আদেশে বাইরে উড়ে যায়, তারপর যখন সে দূর থেকে ক্রমাগত কু-কু করে ডাকতে থাকে তখন ঘরের ভিতরে সেই আরেকটাও ছাড়া পায়, উড়ে চলে যায় তার সাথীর কাছে।"

"খুব ভালো করেই জানি হুজুর! সে দুটি যে লোভা পায়রা, তারা ঐ মনিব-কন্যার হাতের উপরে আপনি এসে বসে।"

"তোর হাতেও অমনি করে উড়ে এসে বসবে বলে' মনে হয়?"

জানে চাকর হ'লেও মনিবের বন্ধুর মত ছিল : কাজেরও সেই মোটর ঘাঁটা সে জানত, তাই এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে নিজেই মনে একটা প্রশ্ন করল।

"ঐ পায়রা দুটী কি আপনার চাই, হুজুর! আমোর বাপ ছিল একজন ধনকর, আমিও মনে-মনেই যাদুর করেছি ; পায়রার চেয়ে অনেক দূর-দূরান্তের পাখী আমি ধরেছি গাছে গাছে ফাঁদ পেতে ; একেবারে হাতে ধরে ধরার বিদ্যাও আমি জানি।"

"তা' হ'লে তুই ওর একটাকে ধরে' এনে দে—দেখিস, খুব সাবধান! যেন তার কোথাও একটুও না লাগে—একখানি পালকেও না।"

জানে শিখা বড়াই করে নি ; ঠিক-দিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় সে লায়লার সেই পায়রার একটাকে ধরে' এনে তার প্রভুর হাতে দিল। জানের তার গায়ে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে পাখার তলা তল্লাস করে দিলে। তারপর জানেকে বলতে বলল, তার একটা পায়ে, একটুখানো কাগজ জড়িয়ে দেয়ে দিলে। তাতে এই কবিতাটি লেখা ছিল—

অমল-কোমল কপোতী এ নভ—তোমারি মনখানি
ধরা দিল বুঝি? আজ পাইয়াছি তাকে ;
আনিয়াছে বহি' সবটুকু প্রেম, তোমার কুজন বাণী—
বলেছিল সে যে অনুর তরুর শাখে।

কিবে আর তুমি পাবে না তাহারে, দিব না ফিরায়ে আর,
আমারি আলয়ে চিরদিন যেন থাকে ;
তবু সে পশিবে শ্রবণে তোমার কাতর কূজন তার!
কে ঐ কাঁদিছে অনুর তরুর শাখে!

প্রেমের তীর্থ আছে এক ঠাঁই—বিজনে তোমার ঘরে,
আমি যার দেখা আঁকিনু নিশির তাকে ;
এসো মোর পাশে উড়ে এসো প্রিয়া—প্রেমেরি পাখায় ভরে,
কপোতী যেমন অনুর তরুর শাখে।

এদিকে লায়লা সেই জানালাটিতেই বসেছিল—বসবার আগেই বাহির হয়ে কপোত-কপোতীর একটিকে ছেড়ে দিয়ে, অপরটিকে বুকের 'পরে চেপে ধরে' বসেছিল সে ; কান পেতে শুনছিল দূর থেকে সেই কূজনের আসে কি না। কিন্তু গাছের সেই ডালটি থেকে আজ আর কেউ ডাকলে না, বুকের পাখীটা ছটফট করছে ; লায়লা একটু আশ্চর্য হ'য়ে জানলার বাইরে মাথা বাড়িয়ে শুনতে লাগল, তবে কেউ ত' ডাকে না! এ কেমন হ'ল? কোথায় গেল সে? এমন ত' আগে কখনো হয় নি! পাখীটা গাছের ডালের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ল না কি?

চাঁদ তখনই পাহাড়গুলোর মাথা ছাড়িয়ে আকাশের মাঝেও উপরে উঠছে, চারদিক জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে। লায়লা বসেই আছে, তবুও পায়রার সেই ডাকের কূজন ফেলে এল না। শেষে এর ভাবও বুঝতে না পেরে, সে তার সেই বুকের পায়রাটিকে ধীরে ধীরে চাপড়াতে লাগল, তার মিষ্টি কথা বলতে লাগল তাকে। তারপর তাকেও ছেড়ে দিলে সেই রাত্রির আকাশে, যেন তার সাথীকে খুঁজে আনতে পাঠিয়ে দিলে।

পাখীটা সোজা গাছের দিকে উড়ে গেল। সেই ডালটির উপর বসে সেও তার সাথীর উদ্দেশে কাতর স্বরে ডাকতে লাগল—কূ-কূ-কূ। তবু কোন সাড়া নেই। শেষকালে পাখীটা সেখান থেকে উঠে প্রাসাদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। কতবার সে লায়লার সমুখ দিয়ে যেন একটা চুম্বকের মত মিশিয়ে গেল, কেবল পাখার সনসনটুকু শোনা যায়। কতক্ষণ পরে আবার ফিরে এল জানলা দিয়ে, লায়লা তখনই তাকে বুকের উপর চেপে ধরলে : তার মনে হ'ল পাখীটার বুক বড় কাঁপছে—লড়াই করছে, তার বুকখানি যেন ছেড়ে দিচ্ছে!

তখন লায়লা তার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বললে—"আহা, বড় ব্যথা! যাকে ভালবাসি সে যদি আর না বাসে তার বাড়া কষ্ট নেই ; কিন্তু সে

হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায় যে তাই যে আমরা অনুভব করি এমনি করে' নায়লা তাকে সাধনা দিতে লাগল। এমন সময় এ কি! সেই পলাতক পায়রাটা পাখার শব্দ করে' ঘরে এসে ঢুকল, ঢুকেই তার কাঁধের উপর এসে বসল। লায়লা একটি অস্ফুট আনন্দধ্বনি করে, ছুটে সেই পায়রাকে বুকে নিয়ে বেশে বসল। তার পক্ষপুটে হাত বুলিয়ে আদর করছে সে, এমন সময় আঙুলে কি একটা ঠেকল সেই পলাতক পায়রাটার পায়ে। এক টুকরা কাগজ! কাগজখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সে তা খুলে পড়ে দেখলে,—সে তার প্রিয়তমের সেই চিঠি। এখন কি করবে সে? সেও কি তবে সেই কোয়ারার ধারে, যেখানে চিরদিন চাঁদের আলোয় প্রেমিকারা প্রেমাস্পদের সঙ্গে দেখা করে? যখন কিছুই ঠিক করতে পারছে না, তখন হঠাৎ একে একে সেই পায়রাগুলোকে ধরে সে চুমু খেলে। তাদের ছেড়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা খুব বড় আয়নার সম্মুখে গিয়ে, নিজেকে সিঁদুরিয়া পায়রা ক'রে, নীচের নেমে সে প্রাসাদের একটা পাশ-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। গ্রেন তাকে নিয়ে গেল পথ দেখিয়ে—সেই যেখানে বনতলের অন্ধকার নির্জন কোয়ারার ধারে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয়। বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে জোৎস্না পড়েছে মাটির উপর—যেন কোয়ারের উপর আলোর জোড়া। তারই উপর দিয়ে একটি চলন্ত ছায়া ক্রমে দূর হয়ে চলেছে—আলোয় দেখা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। এমনি চলতে চলতে একটা ফাঁকা জায়গার কিনারায় এসে পৌঁছল সে; সেই জায়গার ঠিক মাঝখানে একটি কোয়ারা খেলছে চন্দ্রালোকে। একটি জলের স্তম্ভ উঠেছে আকাশপানে, তার রং ঠিক রূপোর মত; ছেড়ে পড়বার মুখে সেই রূপোর গায়ে যেন অসংখ্য হীরা মাণিক চমকে' উঠছে। সেই কোয়ারার চারিধারে অনেকখানি জমি মেহগনির জরে' গেছে—যেন একখানি সবুজ মখমলের বিছানা পাতা রয়েছে, তারি উপর রাশি রাশি চূর্ণ-জলকণা নূপুরের মত শব্দ করে' ঝিরিয়ে পড়ছে।

সেই ছায়াবীথির মাঝখানে এসে লায়লার পা দুখানি থেমে গেল। যে তার পায়রাটিকে চুমি করেছিল, পরে তাকেই তার দূত করে পাঠিয়েছিল—সে কোথায়? হঠাৎ চোখ পড়তেই বলে' উঠল—

"তুমি কে? কে গো তুমি?"

তার পর দুজনেই চোখে চোখে চেয়ে রইল,—দু'জনের দুজোড়া চাঁদের আলো, তখা সেই কালো মুখে।

সকলের সবখানী আকাশের সেই আদিকালের চাঁদ ছাড়া আর কেউ তাদের হঠাৎ-আলিঙ্গন দেখতে পায় নি—চাঁদ এমন কত জিনিষ কতবার দেখেছে। কোয়ারার জলো যে পরী বাস করে সেই পরী ছাড়া আর কেউ তাদের প্রেম-বিহ্বল কলকথা শুনতে পায় নি; সেই পরীই ত' কোয়ারার প্রথম কুলুকুলু-ধ্বনিতে প্রেমিক-কণ্ঠের সকল গল-কাহিনি ক'রে রেখেছে, সেই আদি-কাল থেকে!

কায়েস আর লায়লা এমনি ক'রেই সেই পরীর মনে নির্জন কোয়ারার ধারে দেখা করতে লাগল; তাদের ভালবাসা কখনো ফিকুরে যায় যাবে না এই কথাই তারা বার বার পরস্পরকে জানাতো। দেখে একদিন যখন বিদায় নেওয়া আর শেষ হয় না—কায়েস লায়লাকে বললে—

"আমার প্রাণ যে কি করে কেমন করে বলব? ওগো আমার প্রাণ-প্রতিমা! লোকালয় থেকে দূরে যদি কোন মরুপ্রান্তরে আমাদের ঘর হ'ত; বালিতে আপনি জমায় যে নানা জাতি ঘাস তৈরী করে দিতে তুমি নিজহাতে, ফলার জল ছাড়া আর কিছুই থাকত না পান করবার, আর, কোন গাছতলায় তরে আমরা রাত কাটাতাম—সেও আমার পরম সুখ। তোমার আত্মীয়-স্বজনের শত্রুতা ভুলে' তোমাকে সাথী করে', তোমায় ভালবেসে, আমি

সারাজীবন কাটিয়ে দিতাম একটা একটানা স্বপ্নের মত।"

"আমিও তাই, প্রিয়তম!"

"তবে এসো, আমরা পালিয়ে যাই সেই মরুপ্রান্তরে—"

"আজ, এখনই?

"না না, এখনই নয়। তোমাকে একটু তৈরী হয়ে নিতে হবে। কাল ঠিক এই সময়ে এইখানে আমি দুটি দিগ্বিজয়ী ঘোড়া নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তারপর, ঘোড়া যেমন ছুটবে তার পুরের ধুলো ঝেড়ে ফেলে — আমরাও তেমনি দু'জনে চলে যাব এই সংসারটাকে ঝেড়ে ফেলে।"

সে রাতে লায়লা স্বপন দেখলে, যেন সে তার প্রিয়তমের সঙ্গে চলে গেছে এক বিজন মরুপ্রান্তরে সেখানে তারা গাছের তলায় গিয়ে বসে দুজনে, পান করে কর্ফার জল: আর, মনে আপনা হ'তে জন্মায় যে গল্প, তারি কটি সে তৈরী করে আপন হাতে তার প্রিয়তমের জন্য। শুধু তার সঙ্গে, তার বুকের কাছটিতে থাকতে পাওয়া — তার মত সুখ কি রাজপ্রাসাদেও আছে?

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই হয়ে গেল। লায়লার পরিজনদের মধ্যে একজন ছিল — তার কাপড় যেমন একজোড়ায় বেশী, চোখও ছিলতেমনি শিরনিতে আর একজোড়া। সে ছিল ইবনে সালামের গুপ্তচর। ইবনে সালাম ঐ দেশের আর এক সর্দার, চতুর দুষ্টু ছেলে-ও— লায়লাকে পাবার জন্যে অধীর। তার সেই চর একদিন লায়লার পিতার কাণে কি একটা সংবাদ দিলে তারি চুপিচুপি। পরদিন কেউ টের না সেই প্রাসাদে; গৃহপতি, তাঁর কন্যা লায়লা, আর যত পরিজন — সব একসঙ্গে যাত্রা করলে এক দূর পার্বত্য নিবাসের দিকে। সেইখানে থাকলে লায়লার শরীর নাকি সেরে উঠবে পাহাড়ের আলো হাওয়ায়; তার স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। লায়লার পিতার এই কথা কেউ বুঝতে পারলে না, কারণ, লায়লার এমন রূপ এমন স্বাস্থ্য এর আগে কেউ কখনো দেখেনি।

কারোর এখন ক'দিন এ খবর পায়নি, তাই ফোয়ারার ধারে এসে ফিরে যেতে লাগল সে। ক্রমে যখন তার জল ফেরে পড়ছে, তখন একদিন সে শুনলে— ইবনে সালামই খবরটা সেন চরে পাঠিয়ে দিয়েছিল— লায়লা আপন ইচ্ছায় চলে গিয়েছে সেই দূর পাহাড়দেশের বাড়ীতে, আর সঙ্গে গেছে তার প্রেমাস্পদ ইবনে সালাম। কায়েস তাই শুনে পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই পাহাড়ে গেলিকে তারই পানে মুখ করে' সে সারা দিন শুকতুমির বিশালহীন শূন্যতার ধারে। মুখে কেবল এক শব্দ—লায়লা! লায়লা! সমস্তদিন সমস্ত রাত সেই নাম প্রতিধ্বনিত হ'ল প্রত্যেক গাছ, পাথর, প্রত্যেক ঝরণার থেকে। ভোরের বেলায় দেখা গেল, সে পড়ে আছে অবসন্ন হয়ে এক তৃণহীন শুষ্কহীন বালুভূমির বুকে।

তার সেই দুঃখ আরো, আর তার মনিবের কয়েকজন বন্ধু, বহু সন্ধানের পর তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে সেই অবস্থায়: শোকে কাতর, আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কেবলই ভুল বকছে। তাকে বাড়ীতে নিয়ে গেল সবাই মিলে, সেবা-যত্নে ঘরে একটু সুস্থ করে' তুললে। কিন্তু যেই একটু সুস্থ হয় অমনি সে আকুল হয়ে ডাকতে থাকে — লায়লা! লায়লা! তখন সবাই বুঝতে পারলে, সে পাগল হয়ে গেছে। তাই তার নাম হ'ল — 'মজনু' অর্থাৎ 'প্রেমে-পাগল'; এর পর ঐ হ'ল তার একমাত্র নাম।

তার পিতা তাকে অনেক বোঝালেন, স্বপ্নের মেয়েকে ভালবাসা একটা মোহ — তাকে ত্যাগ করাই উচিত। যখন দেখলে ঐ একটা ছাড়া তার আর কোনও রোগই নেই, তখন স্থির করলেন — ক্ষতি কি! যদি তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে ছেলেও বাঁচে, সেই সঙ্গে বহুকালের শত্রুতাও দূর হয়, সেই ত' ভালো। বহু ধনরত্ন নিয়ে

তিনি তাঁর চিন্তার সেই বন্ধুকে বের পাহাড়-পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

অনেক পথ চলে' তাঁরা পিতার প্রাসাদে পৌঁছলেন তিনি। ইয়েন-সর্দারের সঙ্গে দেখা করে', বেশ একটু ইতস্ত তারপরে তিনি তাঁর মেয়েটিকে চাইলেন নিজের ছেলের জন্য; সম্মতি ও অসম্মতির ফল কি হবে তাও জানিয়ে দিলেন তাকে। সাহসার পিতাও তেমনি উৎফুল্লভাবে সে প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন—

যত শীঘ্রই হোক, এক সময়ে এসে পৌঁছায় তাঁর কাছে ইয়েন-সর্দারের পুত্র যে উদ্বাহ হয়ে গেছে, এ সংবাদ তিনি পূর্বেই পেয়েছেন। আমে সে আরোগ্য লাভ করুক, পরে এ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে।

যদুর পিতা ইয়েন-সর্দারের ব্যবহার ছিল যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি ছিল তেমনি তীব্র। তিনি ফিরে গেলে দূত তাঁর সাক্ষাৎ নিয়ে; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন এবার আসবেন সৈন্যসহ, বলপ্রয়োগ করে চূর্ণ করবেন তিনি।

এ সংকল্প কিন্তু কার্যে পরিণত হ'ল না—দেশে ফিরে এসে তিনি শুনলেন, যদুর তাঁর দূতের জামাইকে সঙ্গে করে' নিজের দেশে চলে গেছে। শুনে তিনি বলে' উঠলেন, "ঠিক বটে! কাজের মধ্যিখানে নজরাজ হয়ে প্রার্থনা করলে, আর শত্রুর জলপাত্রের জল পান করলে, সকল সাধি আপনা হয়ে যায়। ঐ জলের মত আর কি আছে? নীচ মক্কার বুক ফেটে উথলে উঠেছিল যে জল হাজেরা ও হাজেরা-তনয়ের জীবন-রক্ষার জন্য, সে জল যে আমার ছেলেকেও বাঁচিয়ে তুলবে, তাতে সন্দেহ কি? তিনি নিজেও যাত্রা করলেন সেই মক্কার উদ্দেশে, তিনিও ছেলের পাশে নজরাজ হয়ে তোমার আশিস প্রার্থনা করবেন।

কিন্তু পথে ঘটল আরেক ঘটনা। রাত দু'দিনের পথ পার হয়েছেন, এমন সময়ে তাঁর দেখা হ'ল সেই মরুদেশের এক বেদুইন সর্দারের সঙ্গে, তার নাম, নুকেদ। তার মুখে শুনলেন, যদুর ঐ পথে যেতে যেতে হঠাৎ আবার জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল, সে-ই তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে রেখেছে। সে যে তাঁরই ছেলে যদুর, তা সে বুঝতে পেরেছিল তার মুখের সেই ক্রমাগত 'লায়লা-লায়লা' ডাক শুনে, কারণ, রূপের খবর আর ভালবাসার খবর ঐ নিঃসাহারার দেশেও কিছু পৌঁছয় দূরে দূরান্তরে।

"এখন তা হলে কি করতে বল, নুকেদ?"

"আমি বলি, ছেলেকে যদি বাঁচাতে চাও, এসো আমরা দুজনে মিলে সেই মরুদ্যান-সর্দারকে গিয়ে বলি, তার মেয়েকে আমাদের চাই-ই। যদি না দেয়, কেড়ে নেব দুজনে মিলে; তাতে তোমার ইজ্জত আরও বেড়ে যাবে। যদি দেয়, আমাদের মধ্যে আর বিবাদ থাকবে না। তখন তিন জনেই সমানভাবে এই মরুরাজ্য ভোগ দখল করব।"

যদুর পিতা রাজি হলেন, বললেন, 'তুমি আগে যাও, মরুদ্যান-সর্দারকে তুমিই গিয়ে বল, তার মেয়েকে দিতে হবে। আমি তোমার শিবিরে থাকব; যদি দেখি, তুমি লায়লাকে নিয়ে ফিরে আসছ নিরাপদে, তা'হলে ত' চুকেই গেল, নইলে একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করব। তার ব্যবস্থা এখনই করে' রাখা যাক। তাক দাও তোমার সৈন্য-সামন্তদের; জমায়েত হবার একটা জায়গা ঠিক করে খবর পাঠাও চারদিকে; আমিও এখনই পাঠাচ্ছি আমার সৈন্যদলকে ডাক দিতে।" নুকেদ তখনই চলে গেল; ইয়েন-সর্দার সেইখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন, যতক্ষণ তাঁর দূতেরা ফিরে না আসে।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

সভ্যতা

[ফ্রাইজ বেল-বিখ্যাত ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা সংক্ষিপ্তসার অনুবাদে। বাংলা সভ্যতা শব্দটি ইংরেজী Civilisation-এর প্রতিশব্দ ; ঐ অর্থে ঐ শব্দ আমাদের ভাষায় কখনো প্রচলিত ছিল না ; এখনে আমরা উহার সকল প্রয়োগ করিয়া থাকি। অথচ উহার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। ইংরেজলেখকও ঐ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ঐ দেশেও সভ্যতা বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা বলা কঠিন। এই প্রবন্ধে তিনি একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সংজ্ঞা অনুসারে আমাদের সমাজেও ঐ 'সভ্যতা' কথাটির প্রয়োগ বুঝিয়া লইবার সুবিধা হইবে। এই কারণ, প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকা ইহাতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাইবেন।]

কোনগুলি সভ্যতার লক্ষণ নয়

একের সম্পত্তিতে অপরের অধিকার নাই —এই নীতি যে সভ্য-সমাজেরই নীতি এমন কথা বলা যায় না। এ কথা সত্য যে, পশুদের মধ্যেও এমন নীতি নাই, কিন্তু তাহারা কোনরূপ অস্ত্র ব্যবহারও করে না ; আদিম অসভ্য সমাজের মধ্যে দুয়েরই প্রচলন আছে — তাহাতে পশু হইতে তাহারা পৃথক বটে, কিন্তু তবুও তাহারা সভ্যতা দাবী করিতে পারে না। প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রাদি ব্যবহার এবং ঐ সম্পত্তি-জ্ঞান সভ্যতার সোপান হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ দুইটাকে সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ বলা চলে না। অনেক ধনী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার মত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এমন বহুতর অসভ্য জাতি আছে যাহাদের নিজস্ব ও পরস্ব-বোধ একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা হৃদয়হীন নূন নহে। উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ যে চুরি করিতে জানিত না—এমন কথা বলা যাইতে পারে, অন্তত যতদিন না তাহারা শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল ; এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে যে, এই শ্বেতজাতিরাই উহা সংশোধনের চেষ্টাও করিয়াছে। যে পাপ তাহারাই যেমন সংক্রামিত করিয়াছিল তেমনই তাহারাই আবার উহা নিবারণ করিবার জন্য বিদ্যালয়ও খুলিয়াছে — অসভ্যদের সম্পর্কে কঠিন আইনটি লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অন্যূন জরিমানা ভোগ করিতে হইবে, ঐ সকল জাতিকে তাহা জ্ঞাপন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহাও মনে করা ভুল হইবে যে, ভগবানে বা পরলোকে বিশ্বাস করা কেবল সভ্যজাতিদের মধ্যেই আছে ; — সভ্যতার আদি লক্ষণও ইহা নহে। বরং অধিকাংশ অসভ্য জাতির ভগবানে বিশ্বাস কেবল কথাতেই নয়, কার্য্যেও প্রকাশ পাইয়া থাকে : তাহারা একটা ভগবান তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে ভয় না করিয়া নিরস্ত হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার 'বুশমান' — যাহারা অসভ্য জাতির মধ্যেও অসভ্যতম, তাহাদের বিশ্বাস, একজন সর্ব্বোচ্চ পুরুষ আছে যে স্বর্গ-অন্তরালের নিয়ন্তা ও বিচারকর্ত্তা। এমন কি, এই পুরুষকে তাহারা পিতা বলিয়া ডাকে, এবং একজন প্রবীণ বন্ধু ব্যক্তির রূপে তাঁহার কল্পনা করে। অসভ্য মানুষেরা প্রায় নাস্তিক হয় না, আমাদের মতই তাহারা "সকল নিয়মতন্ত্রের উপরে একটা সকলতান্ত্রিক আশা রাখে।

সভ্য-সমিতিতে আমি প্রায় প্রতিযোগিতায় বলিতে শুনি যে, যে-সমাজে নারীর সম্মান যত অধিক সেই সমাজ তত সভ্য — এই সম্মানের অনুপাতেই সমাজের সভ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন, যে সকল জাতি বর্বরতার অবস্থায়, যেমন, মুসলমান, আফ্রিকান-দ্বীপের অধিবাসী এবং রেড-ইণ্ডিয়ান — যাহাদের মধ্যে পশুপ্রকৃতি মানুষ দেখা যায় না, তাহাদের মধ্যেও স্ত্রীজাতি যেরূপ মর্যাদা পাইয়া থাকে, আথিন্সের সময়ে গ্রীসদেশীয় সমাজের নারীগণও সেরূপ মর্যাদা পায় নাই। একদিকে যেমন বন্য অসভ্য জাতি বলবান হইলে কি হয় — তাহাদের স্ত্রৈণ-স্বভাব পুরুষেরা স্ত্রীলোককে গৃহ পিঞ্জরের সমান বলিয়া গণ্য করে, তেমনই অন্যদিকে, চীনের তাও, ও গ্রীস-রোমীয় রাজত্বের রাজত্বকালে — যেই অতি-প্রাচীন সভ্যতার যুগেও, চীন-জাতি নারীকে গৃহস্থের গোধন অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দেয় নাই। অসভ্য জাতির সভ্যতাপ্রিয়তাও অনেক ব্রহ্মচারীকে বিচলিত করিয়াছে। সিংহলের ভেদ্দা জাতিকে সভ্যতাপ্রিয়তার আদর্শ বলা যাইতে পারে; অপর পক্ষে, মুসলমান গ্রীক ও স্লাভ-বাসীদের এ বিষয়ে বরং একটা অখ্যাতিই ছিল, আবার য়ুরোপ-মহাদেশের অধিবাসিগণ ব্রিটিশ-দ্বীপের জনগণকে "রোমের মিথ্যাচারী" — এই বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে। কেবল সভ্যবাদীই নয় — অনেক অসভ্য জাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও বটে, তাহারা দিনে দুই তিনবার স্নান করে এবং স্নানকালে সর্বাঙ্গ উত্তমরূপে মার্জিত করে। অক্ষ, রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইতে রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন-আরোহণ পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল, সেইকালে অসভ্য য়ুরোপীয় সভ্যসমাজ বৎসরে একবারও সর্বাঙ্গ ধৌত করিয়াছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

ইন্দ্রিয়-সংযম যত একটা এতবড় ব্যাপারেও অসভ্য জাতিদের আচরণ আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিতে পারে। ব্রেজিলের অসভ্য অথবা কাফি-কোবিয়ার এমন অনেকগুলি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রায়শঃও একাধিক বিবাহ করিবে না। কার্ক বাসে যে জাতি আছে তাহারা তাহাদের কুলপত্নিকে দুই বিবাহের অধিকার দেয় না; ইহাদের মধ্যে যাহারা ধনী তাহারা সাধারণ অপেক্ষা দামী কিনিয়া খুব রাখিতে পারে, কিন্তু একাধিক স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিয়া নিজের জাতি হারাইতে চাহিবে না। কার-নিকোবার দ্বীপের অধিবাসীদিগকে এ বিষয়ে সভ্যই নিষ্কলঙ্ক বলিতে হইবে। কিন্তু সভ্যজাতির আচরণ ইহার বিপরীত। অতিরিক্ত ভদ্রতা ও চাতুরতার জন্য বিখ্যাত যে সকল জাতি ইতিহাসের এক এক যুগ আলোকিত করিয়াছে তাহারাও পরস্ত্রী-দমনের ঘোরতর পাতককেও তুচ্ছ মনে করিত। দার্শনিকপ্রবর প্লেটো নারীজাতিকে সাধারণের সম্পত্তি করিবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মনে হয়, চীন-জাতি যখন সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখনও তাহাদের আচরণ এ বিষয়ে অধিকতর প্রশংসনীয় ছিল না। অতএব কার-নিকোবারের ঐ অসভ্যজাতি ব্যভিচারকে যখন এতবড় একটা পাপ বলিয়া জ্ঞান করে — তখন এমন সিদ্ধান্ত করিতেই হয় যে, সতীত্ব সভ্যতার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ নহে।

স্বদেশ-প্রেম যে কেবল সভ্যজাতিরই ধর্ম এমন দাবীও আমরা করিতে পারি না। পশ্চিম আফ্রিকার ইওরুবা জাতির সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌গ্রেগর লিখিয়াছেন — "কোন জাতিই ইহাদের তুল্য স্বদেশভক্ত নহে" — অথচ ইহারাও বিদেশীদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে। মিঃ উইলিয়ম লিখিয়াছেন, একদা এক ফিজি-দ্বীপবাসী বর্বর আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে, তাহার স্বজাতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, ঐ দেশের মানুষ কোন্ কোন্ গুণে তাহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সে যখন একে একে গুণগুলি বলিয়া যাইতে লাগিল, তখন

তাহার স্বজাতীয়গণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাদের নিকটে আধুনিক সভ্যজাতির এ বিষয়ে শিক্ষা করিবার কিছু থাকিতে না পারে, কিন্তু সুসভ্য প্রাচীন জাতিগণ ঐ অসভ্য জাতির শিষ্য হইবার যোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কনফুসিয়াসের আমলের চীনা-সমাজ তাহাদের ধর্মগুরুর নিকটে এই শিক্ষা পাইয়েছিল যে, জগতের সকল মানুষকে সমভাবে ভালবাসিতে হইবে: হিন্দুদের পক্ষতন্ত্রে আছে—যাহারা কুব্রুচেতা তাহারাই এমন চিন্তা করিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি আপন, ঐ ব্যক্তি পর (অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্)।

আমার মনে হয়, অতঃপর আর কোন সংশয় রহিল না যে, নিষ্ঠুর ও পরুষ-বোধ, সভ্যবাদিতা, দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, জগবানে ও পরকালে বিশ্বাস, নারীজাতির প্রতি সম্মান, সহীর এবং স্বাস্থ্যপ্রেম—ইহাদের কোনটাই সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ নহে। সভ্যতা নিশ্চয়ই এমন একটি বস্তু যাহা আদিম বর্বর-সমাজ দাবী করিতে পারে না; অতএব যে সকল গুণ আদিম অবস্থাতেও বর্তমান তাহা সভ্যতার অঙ্গ হইতে পারে না। গত দুইশত বৎসর যাবৎ সভ্য ও অসভ্য বলিয়া যে ভেদ আমাদের মনের একটা সংস্কারে হইয়া আছে, তাহাতে এই কথাটি মানিয়া লইতে হয় যে, সভ্যতা একটা আকস্মিক বস্তু নহে। উহার সহিত সেই দুইটি বস্তুর নিশ্চয় সম্পর্ক আছে — যাহা মানব-জাতি অনেক বিলম্বে অর্জন করিয়াছে; তাহার একটি আত্ম-চেতনা, অপরটি — বিচার-বুদ্ধি: শিক্ষার দ্বারাই উহা লাভ করা সম্ভব। সভ্যতা একটি তৈয়ারী-করা বস্তু।

একদল অর্ধশিক্ষিত, ধার্মিক মতবাদী আছে — তাহারা বিজ্ঞানের যুক্তির কিছু কিছু মুখস্থ করিয়াছে, ইহাদের মতে সভ্যতা বলিতে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা বুঝায়; 'সব প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দাও'—ইহাই তাহাদের মন্ত্রস্বরূপ। বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীই আদর্শ জীবন যাপন করে। যোগাভ্যাসের উদ্দেশ্যে যাহা নিষিদ্ধ মানুষ তত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। যতদিন না আমরা দুর্বলকে রক্ষা করিবার চেষ্টা ত্যাগ করি এবং শক্তিমানের অধিকারকেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার না করি, ততদিন আমরা সভ্য হইতে পারিব না। যাহারা যোগাভ্যাস তাহারাই সৃষ্টিকর্তা ভোগ করিবে, কথাটা সত্য; কিন্তু যোগাভ্যাসের অর্থ কি! সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃশ ও দুর্বল যে মানুষ, সেই ত' প্রাচীন অধিকার অন্য অপেক্ষা জীবনযুদ্ধে অধিকতর জয়ী হইয়াছে। এমন যেন দেখা যাইতেছে — যদি মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গের নিত্যকর্ম হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেই সকল দুর্বল ও দুর্ধর্ষ জাতিগণই টিকিয়া থাকিবে যাহারা যুদ্ধে না যাইবার কবি-কিবির মত উত্তমরূপ উদ্ভাবন করিতে পারিবে। আমাদিগকে — সেই দুর্বলদিগকে তখন এই বিজ্ঞান-সর্দারা বলিবে—"তোমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছ;" আমরাও উত্তরে বলিব—"এরূপ লঙ্ঘন করাই আমাদের প্রকৃতি।" তখন হাসিয়া গিয়া তাহারা চরিত্র-নীতি বা কর্তব্য-জ্ঞানের পরমাপত্র হইবে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে 'হয়' মাত্র আছে, 'হওয়া উচিত' বলিয়া কিছু নাই। তাহারা বলিবে, ঐ নিয়ম যদি পালন না কর তবে শাস্তিস্বরূপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের উত্তর এই যে, যদি বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় বংশবৃদ্ধি এবং তাহা দ্বারা যদি কোন উপকার না হইয়া সমষ্টির উপকার হয়, তবে আমার তাহাতে কি যায় আসে? হয় বল, যাহা যেমন আছে — ঠিক আছে, তাহার কোন ভাল-মন্দ বিচার নাই, নয় স্বীকার কর, মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা জ্ঞানী। যদি প্রথম কথাটা সত্য হয়, তবে অভিযোগ করিয়া লাভ নাই; যদি দ্বিতীয়টা সত্য হয়, তাহা হইলে জীববিদ্যা-বাগীশেরা তাঁহাদের অভিযোগের কারণ আরও ভালো করিয়া নির্দেশ করুন।

আরও এখন দুই একটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করা যাইতে পারে, যাহা সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ নহে। যথা,

অতিনিপুণ যন্ত্রবিজ্ঞানবিদ্যা — ইহাও সভ্যতার প্রমাণ নহে। এমন কথা কেহ বলিবে না যে, প্রাচীন এথেন্স-নারী অপেক্ষা আধুনিক মেসোপোর্ট সহর সভ্যতার উচ্চতর; এমন কি, টক বিজলী-পাখালোকিত, ধাপীয়-রথচ ও বৈদ্যুতিক-ট্রাম-পরিসেবিত মহানগরীর এক বিদ্যাধান অধিবাসীরাও সে ভুল করিবে না।

যে কথা-আখ্যান দুই দেশ হওয়ার পরেই আমি সোহো (Soho)-র একটি সেলুনে আহার করিতেছিলাম; ঐ স্থানে প্রতি সপ্তাহে জন-কয় অভিজিত্ত বুদ্ধ, ব্রিটিশ সেনাবিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহিত আলাপ করিতে আসিত। ভদ্রলোকটির বয়স যে বড়ই অল্প ছিল, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি অতি শৈশবকাল এথেন এক জগতে বাস করিয়েছেন, যেখানে সকল চিন্তাশক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধি বর্জন করিতে পারাই তাঁহার কর্তব্য — যখনও যে বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য যাহা সেই বিষয়েই আমরা সেদিন আলোচনা করিতেছিলাম — "সভ্যতা তাহাকে বলে?" আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, যে সমাজে ধনিদ্র, চিররোগী ও বাতুলদের ভরণ-পোষণের জন্য যৌক্তিক ব্যবস্থা নাই তাহাকে সভ্য বলা যাইতে পারে না; অপর কেহ (সভায় দুই একজন মহিলাও ছিলেন) বলিলেন, সভ্যসমাজে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ভোটাধিকার থাকা অত্যাবশ্যক। কাহারও বিশ্বাস — সেই সমাজই সভ্য, যেখানে প্রত্যেক কবি ও শিল্পী মাসিক পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি পাইয়া থাকেন, এবং যাহাদের প্রত্যেক অবসর সময়ে একটি করিয়া চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের সৈনিক বন্ধু বলিলেন "সভ্যতা কি বস্তু তাহা আমার জানা নাই বটে, কিন্তু কোন্ দেশ সভ্য হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি। যাহারা এবিষয়ে পারদর্শী তাহাদের মুখে শুনিয়াছি, শত শত বৎসর ধরিয়া জাপান অতিশয় ও শ্লেষ চিত্র-শিল্পের সাধনা করিয়াছে, তাহার দারিদ্র্য নিতান্ত তুচ্ছ নহে, তথাপি আমাদের সংবাদপত্রগুলি কখনও বলে নাই যে, জাপানীরা অতিশয় সভ্য জাতি। কিন্তু যেমন তাহারা একটি অতি সভ্য ও শক্তিমান য়ুরোপীয় জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিল, অমনি সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইল।" ইহার মধ্যে যে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা অতিশয় যথার্থ হইলেও, সেই বীর সেনাধ্যক্ষও কখনই স্বীকার করিবেন না যে, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতাই সভ্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাহারা মানুষের দুঃখদুর্দশা-মোচনের স্পৃহা এবং তদনুযায়ী কার্যকেই সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতি ও তদ্বারা মানুষের দুঃখ-সাধনকেও উদ্ভট মনে করিতে বাধ্য হইবেন। যাঁহারা সমাজের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারীর ভোটাধিকারকেই সভ্যতার পরিচয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এ মত আলোচনার যোগ্যও নহে; স্ত্রীর বিধিব্যবস্থার সহিত সভ্যতার একটা ঘনিষ্ঠের যোগ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, কিন্তু উহাদের মূলে সভ্যতার কোন যোগাযোগ নাই — শাসন-প্রণালীর প্রকার-ভেদ যে কারণে হইয়া থাকে, সভ্যতার মূল তদপেক্ষা গভীর।

সভ্যতার বিশেষ লক্ষণ কি?

এতক্ষণ আমি যেই সকল ভ্রম ও লক্ষণের তালিকা পৃথক করিতে পারিয়াছি যেগুলিকে অনেক সময় সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন। কোন্‌গুলি সভ্যতার লক্ষণ নয় তাহা বলিয়া, এইবার আমি কোন্‌গুলি সভ্যতার লক্ষণ সে বিষয়ে আলোচনা করিব, এবং ইহার জন্য জগতের ইতিহাসে যে সমাজগুলিকে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকল পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীকার করেন, সেই কয়েকটি সমাজের মধ্যেই ঐ লক্ষণগুলির সন্ধান করিব।

ওঁহাদের মতে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে এমন তিনটি মাত্র সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

প্রথমটি আখেন্স-নগরীর গ্রীক সমাজ, এবং দ্বিতীয়টি ফ্লরেন্স-পুরের ইতালীয় সমাজ; এবং তৃতীয়, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ফরাসী সমাজ।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে—পেরিক্লিসের সময়ে সমাজ-জীবনের সৌন্দর্য প্রায় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও, কেহ কেহ ঐ শতাব্দীর এথেন্সকেও সেই গৌরব দান করিয়া থাকেন; যদিও ইহা সত্য যে, ঐ কালে (ঐ শতাব্দী) ভাস্কর্য-কলায়, গ্রীকজাতির রূপ-সৃষ্টির প্রতিভা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং ঐ সময়ে তাহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধিরও চরম উন্মেষ হইয়াছিল; এবং আধুনিক কালের যত-কিছু গভীর তত্ত্ব-চিন্তার জন্ম হইয়াছিল ঐ যুগের ঐ সমাজে। তথাপি উহার পূর্ববর্তী কালের সমাজই সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল — এমন কথা বলাই সঙ্গত। এরূপ উক্তির একটি গভীর অর্থ আছে; কোন যুগের সভ্যতার পরিমাপ করিতে হইলে কেবল তুঙ্গতম কলাকীর্তি অথবা বিস্ময়কর চিন্তা-সম্পদকেই প্রাধান্য দেওয়া যাইবে না। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের এথেন্স, ফ্লরেন্সের ইতালি, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সকেই আমরা সভ্যতার লীলাভূমি বলিয়া গণ্য করিব। বর্বর অবস্থা হইতে সভ্যতার আরোহণ করিবার সর্বপ্রথম সোপান — আত্ম-চেতনার উন্মেষ, ও সেই সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি। ইহাই সত্য যে, আত্ম-চেতনার ও বিচার-বুদ্ধির ঐকান্তিক অভাবই বর্বরতা ও সভ্যতার মধ্যে নিরতিশয় ভেদ-রেখা। সভ্যতার পূর্ণতম অবস্থার দুইটি লক্ষণ বিকাশ হইতে দেখা যায় — একটিকে বলা যায় বিবেকবুদ্ধি, বা শ্রেয় ও প্রেয়, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে প্রথমটিকে গ্রহণ ও দ্বিতীয়টিকে বর্জনের একটি সহজ প্রবৃত্তি — অর্থাৎ, অভ্রান্ত মূল্য-জ্ঞান, যেমন, অশোচ্য ও শুচিসম্ভবকে লাভ করিবার জন্য অন্তরের ঐকান্তিক ও অটলসঙ্কল্পকে ত্যাগ করিতে পারা। যাহারা কুসংস্কারের বশে বা স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে নয় — কেবল সৌন্দর্য-নিষ্ঠার জন্য দেহ-সুখ বিসর্জন দিতে পারে, তাহাদেরই এই মূল্য-জ্ঞান আছে। কোন প্রকার স্বার্থকরী শিক্ষার পরিবর্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য যে শিক্ষা, অর্থাৎ কেবল সম্পদবৃদ্ধি করিবার যে শিক্ষা তাহার পরিবর্তে যে-শিক্ষার সাহায্যে মানুষ জীবনকে পূর্ণ-উপভোগ করিতে পারে সেই শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগ, তাহা এই সভ্যতম মনোবৃত্তির ফল। সভ্যতার আর একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ — যুক্তি-পরায়ণতা। সমাজে ইহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা তখনই হয়, যখন প্রায় সকলেই এমন মত পোষণ করে যে, প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্যের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই — তাহাদের মূলে ঔচিত্যবোধ থাকা চাই। অসভ্য সমাজের জীবন-যাত্রায় এইরূপ যুক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহার কতকগুলি কারণ আছে, — একটি কারণ সহজেই অনুমান করা যাইবে — উহাদের জীবন-ধারণ সর্বদাই সঙ্কটপূর্ণ, তাহার জন্য এত কষ্ট করিতে হয় যে নিজের ও পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষার যে পশু-সুলভ সহজাত প্রবৃত্তি তাহার উপরে উহারা উঠিতে পারে না, যুক্তি-বিচারের অবকাশ কোথায়! যেখানে জীব-সংস্কারই প্রবল, সেখানে বিচারশীলতা জন্মিতেই পারে না। কিন্তু এই কারণে, বর্বর-জাতির কোনরূপ সূক্ষ্ম মূল্যজ্ঞানও নাই; কোন এথিনো কখনও ধারণা করিতেই পারিবে না যে একটা সমগ্র ত্রিদেব তুলনায় একটি সনেট বহুগুণে মূল্যবান। ঐ ত্রিদেব তাহার নিকটে অতিশয় প্রত্যক্ষ, তাহার তৎকালীন প্রয়োজনীয়তা আরও সত্য। যে সত্য-সুন্দর সুখ মনেরই আস্বাদনযোগ্য — তাহার জন্য দেহটা নিরাপদ হওয়া চাই। যে অসভ্য মানুষ নিজ সমাজের আচার-প্রথার দোষ-গুণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে হয় আর বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিতে

পারিবে না, নব ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে — সভ্যতার পথে সে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। যে জন্য মহিলার মনস্তত্ত্বের ভাবেও অনুভব করিতেছে যে, বস্তুতন্ত্রের প্রকৃত মূল্য বস্তু বলিয়াই নহে, তাহাদের দ্বারা যেটুকু সত্য সুখ উৎপন্ন হয় তাহাই,— সে জ্ঞানেরও অবস্থা ঘুচিয়াছে। কিন্তু যতদিন মানুষ প্রকৃতির সন্তান হইয়া প্রকৃতির সংসার সংস্কারগুলি পালন করে ততদিন সে সভ্যতার অভিমুখে কোনমতে অগ্রসর হইতে পারে না। সভ্যতা শিক্ষাসাপেক্ষ — উহা আত্ম-চেতনা ও আত্মচিন্তার ফল, উহা স্বাভাবিক নয় — কৃত্রিম।

[ক্রমশঃ]

এত আঁধারমাঝে তোমায়
এনেই অকস্মাৎ!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাকো—"দাঁড়াও পথে,
সূর্য্য আসে স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি এ নয়, বন্ধু।"
এত আঁধারমাঝে তোমায়
এনেই অকস্মাৎ!

এ দুর্ভাগা দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ-ভার
এই চিত্তশতধা-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, লজ্জা পলে পলে
এই আত্ম-অবমান অন্তরে বাহিরে.....
চূর্ণ করি' দূর করো।

গ্রন্থ-পরিক্রমা

বাংলাদেশের ইতিহাস — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ্‌ডি

'বঙ্গশ্রী' গ্রন্থ-পরিচয়ের যে ভার লইয়াছি তাহাতে প্রথমেই এই গ্রন্থখানির পরিচয় দিতে হয়। যে-মহিলাচক্রের পরাক্ষ অনুসরণ করিয়া — তাঁহার কামনা করত ধারণ করিয়া, তাঁহার দেওয়া নামে পত্রিকার সূত্রপাত করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি — তিনিও এমন গ্রন্থের সন্ধান করেন নাই, বরং বাংলার একখানি ইতিহাসের জন্য আজীবন ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, যথা —

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই ... নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না. বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।...

"কে লিখিবে? আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। আমাদের সর্ব্বসাধারণের যা জন্মভূমি এই বাঙ্গালাদেশ, ইহার গান করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই?"

শেষে আক্ষেপ করিয়াছিলেন —

"অন্যকে প্রবন্ধ করিবার জন্য 'বঙ্গশ্রী' বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। যেমন কুলি-মজুর পথ খুলিয়া দিলে, দুর্গম কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি

ইতিহাসের সকল প্রবেশের পথ খুলিয়া দিতে করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে যেই মজুরদিগের মত এই কয়েকটি প্রবন্ধ কিন্তু কই. আমি যা কুলি-মজুরের কাজ করিতে এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনের

ভনিলাম না।"

অতএব আক্ষেপের

ইতিহাসের সন্ধানে

কি?

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার নাই"— ইহাও রবিমণ্ডলের একটি করিয়া কা... এই পরিচয়ের অভাবে বাঙ্গালী ... কুল হারাইয়া বসিয়াছে, তাহা ... অতি করিয়াছেন মহৎ সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিচয়ের অভাবে যে আজ তাহার আত্মার আত্মমর্যাদা-বোধও হারাইতে বসিয়াছে, মরীচিকা ও ধাতুপিণ্ড আজ তাহার আত্মাপ্রতিষ্ঠার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, ইহার একমাত্র কারণ — সে তাহার পূর্ব্ব-ইতিহাস জানে না। এতদিন তাহার হউক, অন্ততঃপক্ষে যেই পূর্ব্বচেতনা টুকুও

বিজয়ের ছিল, তাহাও ঐতিহাসিকদের উদাসীনতায় সে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কামনা সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই। এই সময়কাল হইতেই বাঙালী তাহার নিজ-জাতি ও দেশের ইতিহাস-উদ্ধারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছে। আজ এতদিন পরে একজন পণ্ডিত বাঙালী সেই সকল পরিশ্রমের ফল একত্র করিয়া বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক কাহিনী বহুদূর গাঁথা করিয়া দিয়াছেন। সত্য বটে, এইরূপ ইতিহাসের একটা বৃহৎ পূর্ণ-কলেবর ইতিপূর্বে ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল — তাহারও পূর্বভাগে, অন্য সকলের সহিত বর্তমান গ্রন্থকারও পরিশ্রমের অংশ লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সাধারণ বাঙালী পাঠকের জন্য নহে; তাহা পণ্ডিতী-কলেবরে অথবা বা পক্ষমলেন-সূত্রে; তাহাতে সূক্ষ্ম-বিচার ও যুক্তি-বিন্যাসের একদেশ আছে, কিন্তু তাহা যেমন বাংলা নহে, তেমনই সাধারণ বাঙালীর পাঠযোগ্য ইতিহাসও নহে। অতএব এই গ্রন্থখানিতে একটা বড় অভাব দূর হইয়াছে — প্রাচীন বাংলাদেশ ও বাঙালী-জাতির সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ও সুলভ তথ্য-সংকলন ইহাতে আছে; তজ্জন্য গ্রন্থকারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অতঃপর এই গ্রন্থ হইতে আমাদের যে জ্ঞানলাভ হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞান হইতেই আমাদের মনে যে প্রশ্নগুলির উদয় হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিপিবদ্ধ করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে, ইহা বাংলাদেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে, অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান-আগমনের পূর্ব-পর্যন্ত বাংলাদেশের যে পরিচয় অজ্ঞাত ছিল, ইহাতে তাহারই একটি — বহুদূর জানা গিয়াছে — তথ্য-প্রমাণযুক্ত কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক বিভাগ, প্রাকৃতিক পরিবর্তন, বাঙালী-জাতির উৎপত্তি, বিভিন্ন প্রাচীন রাজ্য ও তাহাদের বিস্তার, এবং বাঙালীজাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইহাতে সংগৃহীত ও সুসংবিন্যস্ত হইয়াছে। সব চেয়ে বড় কথা — বাঙালীর আদি কুলপঞ্জির সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অতিশয় চমৎকার; যথা —

"এই সকল জাতিকে (আদিবাসী অস্ট্রিক বা নিষাদ-জাতি, এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি জাতিকে) পরাভূত করিয়া বাংলাদেশে যাঁহারা বাস-স্থাপন করেন, এবং যাঁহাদের বংশধরেরাই এখনকার, অর্থাৎ বর্তমানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্ব-পুরুষ, তাঁহারা যে বৈদিক আর্য হইতে ভিন্নজাতীয় ছিলেন, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। ... প্রাচীন বাঙালীজাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই, ইহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত, ... মস্তকের গঠন-প্রণালী হইতে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙালী একটা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জাতি; এমন কি, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের সহিত অপর কোন প্রদেশের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, বাংলার কায়স্থ, সদ্গোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সহিত অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ।"

এই সিদ্ধান্তটি অতিশয় গুরুতর, কারণ ইহা দ্বারা বাঙালীর বর্তমান সমাজ-গত জাত্যভিমানের কতকগুলি মিথ্যাধারণার দূরীভূত হইবে। আমরা যে ভারতবর্ষের অন্যান্য হিন্দু জাতি হইতে স্বতন্ত্র, ইহা যেমন সত্য, তেমনই আজিকার দিনে বাংলাদেশে বর্ণহিন্দু বলিয়া যাঁহারা পৃথক সম্মান দাবী করেন তাঁহারাও মনে রাখিবেন যে, বহু সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম-বিপ্লবের ফলে, বাংলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক জাতিসকলের মধ্যে, ঐ শ্রেণী আসল — বৈদিক আর্য হইতে স্বতন্ত্র — একটা সত্যজাতি এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, পরে নব্য ব্রাহ্মণ্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাবসরে যে কৃত্রিম জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা — সেই সমাজ-বিধানের নীতি অনুসারে — প্রকৃত-বাস্তবকে লঙ্ঘন বা অস্বীকার করিয়াই করা হইয়াছিল।

বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"পরবর্তীকালে তাহারা (সেই আদি বাঙালী-সমাজ) নবাগত আর্য্যগণের সহিত (সেই বৈদিক আর্য্যজাতি, যাহারা অনেক পরে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল) এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের পৃথক সত্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। কিন্তু আর্য্য-উপনিবেশের পূর্বে এই বাঙালী-জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ—যেমন, কর্ম ও জন্মান্তরবাদ, যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজা-প্রণালী, এবং শিব-শক্তি প্রভৃতি দেব-দেবীর আরাধনা এবং পুরাণ-কথিত অনেক কথা ও কাহিনী তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।"

এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ; তাহা এই যে, বাঙালী জাতির সেই আদি-ধর্ম ও সংস্কৃতি আর্য্য-সংস্কৃতির বহিরাবরণের তলে এখনও লুপ্ত হয় নাই; বরং সেই অনার্য্য-সংস্কৃতির প্রভাবে আর্য্য-সংস্কার ও সংস্কৃতিই বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাংলার তন্ত্র ও বৈষ্ণব-ধর্মই এখনও বাঙালীর মস্তিষ্কের অ্যাড্রেনীন পুষ্ট করিতেছে, ইহাই তাহার জাতিগত সাধনাকে একটি অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ও গৌরবময় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এই জন্য বাঙালী এখনও অবশিষ্ট হিন্দুস্থানের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গ্রন্থকার বাংলার প্রাচীন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিবরণ যাহা দিয়াছেন, তাহাও অনুধাবনযোগ্য। নদ-নদীর গতি-পরিবর্তনে বাংলার ভূ-পৃষ্ঠের যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তারপর, তিনি সেই প্রাচীন ভূ-ভাগের বিভিন্ন অংশের নাম, এবং পরে তাহাদের রাষ্ট্রীক ইতিবৃত্ত খণ্ডে খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকালে একথা আমরা সর্বদা মনে রাখিয়াছি যে, এ সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাই ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণ সাহায্যে যতটুকু নিশ্চিত করিয়া লওয়া যায়, তাহার অধিক বলিবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহাই মনে রাখিয়া, আমরা গ্রন্থকারের গবেষণা ও মতামত কিছু স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করিতে চাই; ইতিহাস তাঁহারই, আমরা পাঠকমাত্র।

তথ্য-সংকলনে তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত পণ্ডিতের উপযুক্ত বটে। কিন্তু দুইটি বিষয়ে তিনি আর একটু সতর্ক হইতে পারিতেন। প্রথম, বিভিন্ন জনপদগুলির তিনি যে নাম নির্দেশ করিয়াছেন, সেই নামগুলির ব্যাপ্তিও যেমন, তেমনই সংকোচও কালে কালে ঘটিয়াছে; এজন্য কোন কালের কোন ঘটনা, অথবা রাষ্ট্রীক গৌরব বা অগৌরবের সম্বন্ধে কোন প্রদেশের উল্লেখ করিতে হইলে, ঐ নামগুলির উপর জোর দেওয়া চলে না। ঐ নাম-নির্দিষ্ট প্রদেশগুলির সীমানা সকল কালে একরূপ ছিল না; দুই-একটি প্রধান বিভাগের নাম ছাড়া অপর নামগুলি সব সময়ে একই সীমানাযুক্ত দেশকে বুঝাইত না,—এই ইতিহাসসম্মতি তাঁহারই বলে। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসের নাম এবং কাব্য-পুরাণের নাম এক হইলেও, ঐ শেষোক্ত রচনাগুলির নাম-নির্দেশ বিষয়বস্তু বা বহুকাল-প্রচলিত একটা রীতি বা প্রসিদ্ধি-সম্মত হওয়াই স্বাভাবিক; অতএব কাব্য-বর্ণিত কীর্তি-গৌরবে, কোন একটি নামমাত্রকে প্রমাণ করিয়া, কোন বিশেষ প্রদেশকে গৌরবান্বিত করা যায় না। এইরূপ অসতর্কতার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে আছে—প্রদেশ-বিশেষের প্রতি পক্ষপাত বিশেষই ইহার কারণ নহে।

এই প্রাচীন নামগুলির মধ্যে 'বঙ্গ'ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, এবং ইহাও মনে হয় যে, গৌড়, বরেন্দ্রী, রাঢ়া, সুহ্ম প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ 'বঙ্গ' পরবর্তী কালে যতখানি বিস্তার লাভ করিয়া থাকুক, আদিকালে এই বাংলাদেশেরই

দক্ষিণ ও পূর্ববাংলা — এদেশের সমুদ্র ও অপর সকলদিকে নদীবেষ্টিত যে অংশ — তাহাই একটা অতিশয় বিশিষ্ট ভৌগোলিক অংশে অতি পূর্বকালেই পরিচিত হইয়াছিল। এই ভূ-ভাগকে, প্রাকৃতিক নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও, এখনও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। ঐ 'বঙ্গ' বাঙালীর বা আদি-বাঙালীর বাসভূমি; ঐ অঞ্চলেই সেই জাতি বাস করিত — যাহারা অবশিষ্ট ভারত হইতে সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র ছিল। সুতরাং সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি নামগুলির প্রয়োজন যেমনই হউক, ঐগুলিকে পৃথক রাখিয়া দিলে আমরা 'বঙ্গ'কেই বারবার হারাইয়া ফেলিব। 'বঙ্গ' বলিতে আমরা একটা সমগ্র দেশই বুঝিব; এই 'বঙ্গ'ই বাকি ভারতবর্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল, কারণ, ইহা যে যতদিনই পৃথক হউক না কেন, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব তাহাকেই প্রথম বরণ করিতে হইয়াছে। এই বিশাল বর্ধিষ্ণু বাঙালী-জাতির একটা অংশকে বহুকাল পরের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহার সুপ্রাচীন স্বকীয়তাকে বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আজ যে ঐ নামেই সমগ্র-দেশের নামকরণ হইয়াছে তাহারও ইতিহাস-দেবতা দুই হইয়াছেন।

এই গ্রন্থে বাংলার প্রাচীন রাজবংশ ও তাহাদের কীর্তি-কাহিনী সযৌক্তিক বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আধুনিক বাঙালী মনীষিগণ পর্যন্ত সকলেই এ সম্বন্ধে কিছু বেশী সচেতন; বাঙালী যে যুদ্ধ করিয়াছে, রাজ্যজয় করিয়াছে, সাম্রাজ্যস্থাপন করিয়াছে — এ গৌরব আজ গৌরব নহে। কিন্তু এই ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা সে বিষয়ে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না, বরং এরূপ গৌরব অনেকটা মিথ্যা বলিয়া মনে হইয়াছে। ঐ সকল রাজবংশ (যেমন পালবংশ, সেনবংশ) বাঙালী নহে, এমন কি, তাঁহারা যে বাঙালী সৈন্য লইয়াই রাজ্যজয় করিতেন এমন প্রমাণও নাই; বরং উল্টা প্রমাণই আছে। এই গ্রন্থ হইতেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

(১) খৃষ্টীয় ৪র্থ-শতাব্দীর প্রথমার্ধে গুপ্ত-সম্রাটগণ হীনবল হইয়া পড়েন।...এই সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ অধীনরাজাগণ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। ...তাম্রশাসনে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিন জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ... তাঁহারা শক্তিশালী স্বাধীন রাজা ছিলেন। পূর্বোক্ত স্বাধীন বঙ্গদেশের রাজগণই এগুলি (স্বর্ণমুদ্রা) প্রচলিত করিয়াছিলেন। রাজার নাম আছে ... একটি পৃথ্বীর, অপরটি সুচন্দ্রাদিত্য (পৃ: ৭১)। [এই রাজারা কোন্ জাতি বা কোন্ বংশ তাহা জানিবার উপায় নাই। স্বাধীনতার অর্থ এখনও হইতে পারে, যেমন—বাংলার পাঠানরাজগণ মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিলে, বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাজ্য বলা যাইতে পারে।]

(২) বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। তাঁহার বংশ বা বাল্য-জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত, এবং তিনি গুপ্তরাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন (পৃ: ২৩)। [প্রথমতঃ এই মত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তার কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই।]

(৩) গোপালের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ... কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পালরাজগণ বঙ্গনিবাসী রাজা রাজরাজটের বংশধর (পৃ: ৩৪)। [ইহারাও অনেক রাজা বলিয়াই বাঙালী, এই অনুমান ছাড়া গত্যন্তর নাই।]

(৪) ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (পৃ: ৩৯)।

রাজ্যেশ্বর গর্জ্জরাজ তাঁহার পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন (পৃঃ ৪১)।

বিগ্রহপাল কলচুরি অথবা হৈহয় রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (পৃঃ ৫০)। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পাল-সম্রাট রাজা-পালের মাতা সম্ভবতঃ কাম্বোজ-বংশীয়া রাজকন্যা ছিলেন (পৃঃ ৫২)। [পালরাজগণ যদি আদিতে খাঁটি বাঙালী ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে রাজা হওয়ার পর তাঁহারা যে অচিরেই তাঁহাদের রক্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।]

(৫) সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ণাট-বাসী ছিলেন (পৃঃ ৭৩)।

রাজবংশ সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট, এখন রাজনৈতিক সম্বন্ধে দুই একটী তথ্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যথা—

(১) পালরাজগণ ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিতেন (পৃঃ ৫২)। [তথাপি গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালীর বাহুবলে আর্য্যাবর্ত্তে বিশাল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজত্বের প্রধান ঘটনা। বাঙ্গালীর জাতীয়-ইতিহাসে ইহার অনুরূপ শক্তির ও সমৃদ্ধির পরিচয় ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও পাওয়া যায় নাই।" (পৃঃ ৪৬)। ইহাও যদি বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের ঘটনা হয়, তবে আমরা ইহাই বুঝিতেছি যে, 'পূর্ব্বে বা পরেও' নয়—কোন কালেই এরূপ ঘটনা ঘটে নাই।]

(২) একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে... পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মন-উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ... এই বংশীয় জাতবর্ম্মা ... কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণের অধীনস্থ সামন্তরাজরূপে, তাঁহাদের সঙ্গে গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করেন ... ও যযেন্দ্র বৈদ্যবর্ম্মাকে বিক্রমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন বিক্রমের কুলবল হস্তী করিয়াছিলেন। (পৃঃ ৭২)। ["সামন্তরাজরূপে তাঁহাদের সঙ্গে"—ইহাতে ঐ সামন্তবাদের ব্যাপারের সম্বন্ধে খুব বড় কথা বলা হয় না। গ্রন্থকার ইঁহার দ্বারা বৈদ্যবর্ম্মা বিক্রমের গৌরবহানির যে উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে পরে বলিব।]

এই সকল বিদেশী রাজবংশের বা রাজন্যবর্গের সহিত বাঙালী-প্রজাসাধারণের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তাহা অনুমান-মাত্র করা যায়—পরবর্ত্তী ইতিহাসে এইরূপ রাজবংশের সহিত যেরূপ ছিল, তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার সেই সম্পর্কের বিষয় কিছু বলেন নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, বাংলার ইতিহাস লিখিতে বসিয়া বাঙালী গ্রন্থকার বেশ একটু ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, অন্যান্য আমরাও তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এইরূপ ভাবাবেশের একটু বিপদও আছে। ক্রমওয়েলের সেই আদেশ—"Paint me as I am: if you leave out a single scar, I will not pay you a shilling." অথবা অথেলোর সেই উক্তি—

"Speak of me as I am; nothing extenuate,
Nor set down aught in malice;"—

—আমরা সরল করি; আমরাও তেমনই বলি, আমার জাতির যাহা যথার্থ গৌরব তাহার অধিক আবশ্যক নাই; আমি যাহা নই, তাহা যদি স্বীকার করি, তবে আমার যাহা বৈশিষ্ট্য তাহাও অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। সেই বৈশিষ্ট্য কি, তাহা এইরূপ ইতিহাসের মুখ্য বিষয় নয় বটে, তথাপি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বাহিরের যতকিছু কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি হইতেই

আমরা জাতির চরিত্র, প্রতিভা, ও বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া লইব। এই ইতিহাসের প্রত্যেক লেখক সেই সকল বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে আবদ্ধ বলিয়া, তিনি সেগুলির গুরুত্ব নিরূপণে কিরূপ ভুলকরিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি রাষ্ট্রিক উত্থান ও বিবর্ত্তনের দিকেই বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ — সমাজ, ধর্ম্ম, ও সাহিত্য তাহার আনুষঙ্গিকরূপেই আলোচনায় যোগ্য হইয়াছে। সে পক্ষে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি বাঙালী জাতি অপেক্ষা রাজবংশ ও উচ্চবর্ণের অভিজাত সমাজের প্রতি যে পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে যে একটি খাঁটি বাঙালী রাজা ও রাজবংশের সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটুকুও তিনি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দাহজ-বিদ্রোহই সেই একটি-মাত্র ঘটনা যাহাতে বাঙালীর বীর্য্য ও সংগ্রামের সন্ধান নিঃসংশয় হওয়া যায়। বহুকাল-প্রতিষ্ঠিত কৈবর্ত্ত রাজবংশের (পালবংশ) এক কলঙ্কের যখন ঘর অন্ধকার করিয়াছে, তখন প্রজাসাধারণের মধ্য হইতে এক বিদ্রোহী-বীরের আবির্ভাব হইয়াছিল — ইঁহার নাম দিব্য। ইনি সেই রাজাকে নিহত, এবং সেই বিদেশী রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়া, নিজে রাজশাসনের ভার গ্রহণ করেন। পরে এই কৈবর্ত্তেই রাজা ভীমকে যুদ্ধে পরাস্ত ও কূটকৌশলে হত্যা করিয়া পালবংশীয় রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এই কাহিনী লিখিবার কালে গ্রন্থকার ঐ কৈবর্ত্ত-রাজবংশের প্রতি অতিশয় অবিচার করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'কেই তিনি সর্ব্বপ্রধান প্রামাণ্য করিয়াছেন, যদিও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ কবি দিব্যের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন, — তাহারও কারণ, সন্ধ্যাকর পালরাজারই আশ্রিত ছিলেন। তথাপি, আর কোন ইতিহাস না থাকায় তাহার কথাই মানিতে হইবে। এই যুক্তি বড়ই বিস্ময়কর। ঘটনাটা অবশ্যই মানিতে হইবে, কিন্তু সে বিষয়ে ঐ একজনের সাক্ষ্যই বেদ-বাক্য হইবে কেন? দিব্য হত্যাকারী ও দস্যু — রামচরিত-কারের এই গালিই সত্য, দিব্য যে "কৈবর্ত্তবাহুদণ্ডে বিদ্রোহী হইয়া মহীপালকে হত্যা করিয়াছিলেন" এরূপ মত গ্রাহ্য হইতে পারে না! এ যেন একজন ইংরেজ সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতেছেন। গ্রন্থকারের মতে, দিব্য প্রভুহত্যা করিয়া মহাপাতক করিয়াছিল। কিন্তু রামপাল তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে হত্যা করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া, কোন পাপের ভাগী হন নাই; কারণ বোধ হয় এই যে, প্রভুহত্যা যত বড় পাপ, ভ্রাতৃহত্যা তত নহে — বিশেষতঃ, রাজবংশের পক্ষে। যে-ভীমকে হত্যা করিয়া রামপাল তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন, সেই ভীম একজন কর্ম্মবীর ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে এখনে একজন প্রকৃত রাজবংশীয় পুরুষ রাজা হইলেন, ইহাই গৌরব ও সান্ত্বনার হেতু; প্রজার কি ক্ষতি হইল তাহা ধর্ত্তব্য নহে। এই কাহিনী লিখিবার কালে গ্রন্থকার এমন একটি মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন যাহা তাঁহার মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে আদৌ শোভন হয় নাই; বস্তুতঃ, গ্রন্থকার যে যুক্তি আশ্রয় করিয়াছেন তাহার মত একতরফা বিচার আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা এই বিষয়টির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, এই ইতিহাসালোচনায় গ্রন্থকারের যে একটি বিশেষ পক্ষপাতের কথা বলিয়াছি, এখানে তাহা বড়ই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এই গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং ইহার যথোচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আরও দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। আমরা বর্ত্তমানে তাহা পারিলাম না; তথাপি, এইখানেই, বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যে মনোভাব পোষণ করি, সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিব।

আরম্ভেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থ নানাকারণে অতি-শয় মূল্যবান হইয়াছে; গ্রন্থকার ইহাতে বাংলার পুরাবৃত্ত যে-ভাবে সংকলন ও সুগ্রথিত করিয়াছেন তাহাতে, অতঃপর বাঙালী তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবে। রাষ্ট্রিক ঘটনা ও রাজবংশের কাহিনী ছাড়াও ইহাতে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও শিল্পকলা, এবং সমাজের বিভিন্ন লক্ষণ সম্বন্ধে পাঠক বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি যেমনই হৌক, তিনি এই তথ্য-সংকলনে কোথাও কার্পণ্য বা আলস্য করেন নাই, এবং অতিশয় বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার কর্তব্য সমাধা হইয়াছে। তারপর, পাঠক তাঁহার স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সাহায্যে বাংলা ও বাঙালীর সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন; তাঁহার চিত্তে বহু প্রশ্নের উদয় হইবে, যেমন আমাদের হইয়াছে। এতদিন যে-সংশয় মনের মধ্যে থাকিলেও বাহিরে প্রকাশযোগ্য ছিল না—এই ইতিহাসখানি পাঠ করিয়া তাহাই আরও দৃঢ় হইয়াছে। এই গ্রন্থে যেমন অনেক নূতন কথা শিখিলাম, অনেক সংশয় দূর হইল, তেমনই ঐ একটা সংশয় আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

সংশয়টি এই। সকল জাতির ইতিহাস ঠিক একই ছকের পরিশোষক নয়। বাঙালীজাতির যেমন একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি ইহার ইতিহাসের ধারাও অনন্যরূপ। এখানে দেশের ইতিহাস ও জাতির ইতিহাসে একটা বড় পার্থক্য আছে। জাতির ইতিহাস যে দেশ-নিরপেক্ষ, এমন কথা অবশ্যই অগ্রাহ্য; কিন্তু বাঙালীর বাসভূমির প্রাকৃতিক লক্ষণও যেমন, তেমনই তাহার বহু-বিস্তৃত মনোধারায় এমন একটা কিছু আছে, যাহার জন্য সে অপর সকল জাতির মত বৃহৎ রাষ্ট্র বা সংঘ-গঠনে উন্মুখ হয় নাই। যাহাকে খাঁটি পল্লী-জীবন ও পল্লীসমাজ বলে—সে চিরদিন সৌষম্য ক্ষুণ্ণ করিয়া ও স্বয়ংপূর্ণ সমাজে আপনার জাতি-ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। ইংরেজীতে যাহাকে ডিমোক্রেসি বলে, তাহার এমন বিশুদ্ধ প্রকৃতি বোধ হয় আর কোন জাতির জীবনে ও সমাজে এমন রূপে দেখা যায় নাই; কারণ, ঐ ডিমোক্রেটিক পোলিটিক্যাল আইডিয়ার আকাঙ্ক্ষা নহে। রাজ্যের উত্থান-পতন, রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজা ও রাজবংশীয় ইতিহাস—এ জাতির ইতিহাস নয়; বহু শতাব্দী, জাতিও তাহার এই অতি-পোড়নীয়, প্রায় মুমূর্ষু অবস্থাতেও এমন একটা জীবনযাত্রা-প্রণালী, সামাজিক আদর্শ ও ইন্টিগ্রিটি-যোগে তাহার সংস্কারগত হইয়া আছে, যাহার উপরে রাজার বংশের ইতিহাসও কোন রূপ অঙ্কিত করিতে পারে নাই, এতদিন যে ঐ প্রকার ইতিহাসকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছে। ইহার কারণ, এ জাতির 'sense of values' অতিশয় অন্তর্মুখ। যে রাষ্ট্রিক উত্থানপতনের দ্বারা আমরা অপর কোন জাতির গৌরব নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি, বাঙালীর ইতিহাসে তাহার সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে না—পাইতেই হইবে মনে করিলে, সে ইতিহাসে জাতিটাই উহ্য হইয়া যাইবে। বাঙালীর ইতিহাস মূলতঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। দেশের বহিঃপ্রকৃতি যেমন, এ জাতির অন্তঃপ্রকৃতিও তেমনই—প্রত্যেক ইতিহাসকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। রাজধানীর প্রাকারে বা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে যে রাজা বা রাজবংশের জয়ঢক্কা যেমনই নিনাদিত হউক—যাহারা বাংলার মাটিতে ঘর বাঁধিয়াছে তাহারা তাহাতে কখনও কর্ণপাত করে নাই। দেশের সেই ইতিহাস-স্রোতে কত বিচিত্র-বিলাস ও ঐশ্বর্যের রাজ-চরণী নানা বর্ণের পতাকা উড়াইয়া সোতাযাত্রা করিয়াছে, বাঙালীজাতি তাহাতে যোগ দেয় নাই। এখনও যেমন—তখনও তেমনই, বুদ্ধিযোগে

যা চাকুরীর মোহে বহু পল্লীবাসী নগরবাসী হইয়াছে; যাহারা শিল্পজীবী তাহারা হাতের আয়ত্তে শিল্পচর্চা ও শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিচয়ও দিয়াছে; তাহাতে ভাবপ্রবণতা ও অনুভূতিতীব্রতা — এ জাতির এই দুইটি গুণের কথা বিদেশের লোকও স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার জাতিগত সংস্কার ও সংগঠন প্রবৃত্তি কখনও বিকশিত হয় নাই; রাজসভায় সে যে-বেশে, যে ভূষিতভাবে ও পটুতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা কেবল প্রশংসারই যোগ্য, তাহাতে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে না। বাংলাদেশের ইতিহাসও যেমন চাই, তেমনই বাঙালীজাতির সেই অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে; একটি না হইলে অপরটি সম্পূর্ণ হইবে না।

হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও!
* * *
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের ভিন্ন ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
ভক্তির হ'য়ে রও!
আমা হাও তারে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও!

ভ্রম-সংশোধন

১৪ পৃঃ, বাম দিকের ১ পংক্তি — 'ঘরে তুলি' স্থলে 'ঘরে লব তুলি' হইবে।

২০ পৃঃ, — লেখকের নামের পূর্বে 'শ্রী' বসিবে।

বঙ্গ-দর্শন

আরম্ভে আমরা শুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কথা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব, তাহাতেই পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের মনোভাব, আদর্শ ও মতামত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। একদা, বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতবাদ আলোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ ক্রমে নিম্নলিখিত কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন —

> "কোন মত অবলম্বন করিয়া তাহা গোপন করিলে কপটাচরণ করা হয়। যদি প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে পরের অহিতজনক কোন কার্য্যই না হয়, তবে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করিলে তাহাকে নিবারণ করা অবৈধ হইতেছে। ··· নূতন মত ভ্রান্ত হইলে তাহা নিবারণ করা যে অহিতজনক একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। যতদিন অভ্রান্ত কেবলমাত্র না হউক, ততদিন কেহই এমন স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না যে, আমার ভ্রম নাই, এবং আমার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে কাহারও বাধা নাই।"

আমরাও এই বিশ্বাসে আমাদের মতামত অসঙ্কোচে প্রকাশ করিব; বিশেষ করিয়া — দেশ ও জাতির অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত যাহা সত্য মনে করি, তাহাই বলিব। আমরা যে অভ্রান্ত এমন স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, কেবল সেইটুকু ত্রুটা থাকিবে যাহা সকল আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে থাকা স্বাভাবিক ও সহজ; তাহারও কারণ, আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে দেশের ও জাতির মঙ্গল কামনা করি, সেখানে কোন কপটতা নাই। অতএব পাঠক-পাঠিকাগণ, আমাদের কথায় অসহিষ্ণু হইবেন না, মতের অনৈক্য ঘটিলেও তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে, কারণ, আমাদের কথার প্রতিবাদে তাঁহারা নূতন করিয়া চিন্তা করিবার সুযোগ পাইবেন, যা করিতে বাধা হইবেন। যাঁহারা অসহিষ্ণু হইবেন তাঁহারাই ঠকিবেন, তাঁহাদের জন্য আমরাও দুঃখিত হইব।

অতীতের বর্ত্তমানে আর সকল কথা ডুলডুবী রাখিয়া বাংলার এই দু'-তাগ-হওয়ার কথাই বলিতে হয়। এই যে ব্যবস্থা ইহাকে আমরা যদি বিধাতার বিধানের মতই অখণ্ডনীয় মনে করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা সত্যই আশাহীন ভরসাহীন হইয়াছি, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভকে সত্য মনে করিয়াই বাংলার এই অবস্থাটাকেও তাহার আনুষঙ্গিক মনে করিয়াছি। ভারতের স্বাধীনতাও যেমন আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, বাংলা-বিভাগও ঠিক সেই অনুপাতে একটা সঙ্ঘ-সংঘটিত, অবশ্যম্ভাবী বিপদ মাত্র। এই বিপদের অবসানে মিলন হইতে পারে, যতদিন তাহা না হয় ততদিন দুঃখ পাইতে হইবে — ক্ষতিও কম নহে। এই বিপদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াছি, তাহার কারণ, যে-রাজনীতিকে আমরা আশ্রয় করিয়াছিলাম (এখনও ত্যাগ করি নাই) তাহার পরিণামে দুই-এর একটাই হইবার কথা, এবং

তাহার কোনটাই শুভ নহে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলেও ঐ রাজনীতির আর এক পাকে আমরা ঘোল খাইতাম — ভাগ-হওয়ার মনে হইতেছে ঘটে, বিশেষ কিছু করিল না — কিন্তু হয়ত' কিছু করিল, আরও জটিল হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাই চিরদিনের জন্য হইয়া যাইবে, ইহা যে নিতান্তই মত অসঙ্গত, এই অনোরাজ্যের কারণ কি? তাহার কি এই নয় যে, আমাদের নিজেদের প্রতি আমরা সকল আস্থা হারাইয়াছি? একটু তলাইয়া ভাবিলে, অর্থাৎ নিজেদের অবস্থা চিন্তা করিলে, ভয় অনেক কমিয়া যায়, কারণ, বাংলা-বিভাগের রাজনৈতিক সার্থকতা যেমনই হউক, ইহার মূলে আছে বাঙালীর বুদ্ধিভ্রংশ, বলহীনতা ও শক্তিহীনতা।

• • • •

এখন সাক্ষাৎ — অর্থাৎ অতিতের বর্তমান — বিপদের কথাই বলি। এই বিপদ যে কিরূপ বিপদ তাহা সকল জ্ঞানবান বাঙালীই বুঝিতে পারিতেছেন। ঘরে যেমন আগুন লাগে, ইহা সেইরূপ; আগুনটা যেন সর্বগ্রাসে না ওঠে, — তাহার বিস্তারটা রোধ করিবার, এবং যতটুকু ঘরের পোড়াইবার তাহাই যখন একমাত্র কাজ। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে বলহীনতার আক্ষেপ ও বিক্ষোভ দাঁড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, আমাদের বুদ্ধিভ্রংশই হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করিয়াছি, বাংলার একভাগ বাঙালী বুঝি সত্যই হারাইল। তথাকার বাঙালীর যে কারণে সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে তাঁহারা ভবিষ্যৎ-এর আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সেজন্য অতিতের বিরুদ্ধ হইয়াছেন। ইহা যে অতিতের স্বাভাবিক তাহা স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও বুঝি যে, আমাদের ভিতরে আর শক্তি নাই, সাহস নাই। ইহার কারণ — প্রথমতঃ, আশাভঙ্গ; দ্বিতীয়তঃ, গত দশ বৎসর, বিশেষ করিয়া, শেষ এক বৎসরে যে অত্যাচার আমরা দেশভাগের সঙ্গে করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহাতে অতিতের শক্তিমান পুরুষও demoralised অর্থাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের যাঁহারা — বিশেষতঃ কলিকাতা-অঞ্চলের অধিবাসীরা — ঐ শেষ এক বৎসরের যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এখনও যে অবস্থায় প্রত্যবরোহণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদেরও কেবল আপাত-পরিত্রাণটা সর্বাপেক্ষা কাম্য হইয়াছে। তাঁহাদের আশাভঙ্গ হইয়াও, আর এক দিকে যেন একটা নূতন আশার সঞ্চার হইতেছে। তাঁহারা ইহাই ভাবিয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইতে চান যে — "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উভয়ই বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞান আমাদের সত্যই লোপ পাইয়াছে। যাহারা কেবল বর্তমানটুকুই এত বড় করিয়া দেখে — আবার সে বর্তমানও এত অনিশ্চিত — তাহারা যে শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিও হারাইয়াছে, সেবিষয়ে সন্দেহ কি? কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, কাল্পনিক এখনই হাহাকার করিয়া উৎসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমি এখন সে কথাও বলিব না। কেবল এই ব্যাপারে বাঙালীর জাতিগত চরিত্র ও প্রবৃত্তি যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব; যদি ইহা সত্য হয়, তবে এ জাতির ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার।

• • • •

উপস্থিত বিপদের কথা বলিয়াছি। বলিয়া লইলাম বিপদটা অস্থায়ী নয় — স্থায়ী, অর্থাৎ বাংলার এক-অংশে হিন্দু বাঙালী আর বাস করিতে পারিবে না, চিরতরে আমরা ঐ পূর্বরাগ হারাইলাম। অতঃপর আমরা তাহাই মানিয়া লইয়া দেখিব, বাংলা বিখণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালী নিজের জাতির একতা বা অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কিরূপ আগ্রহ হইয়াছে। কারণ, এতত্ত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, কিতরে যাহারা এক থাকে — প্রাণটা যদি খণ্ডিত না হয়, তবে বাহিরের আঘাত যত বড়ই হউক, শেষ পর্যন্ত তাহারা বাঁচিয়া যাইবেই। কিন্তু যাহা

দেখিতেছি, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। এই বিপদ আমাদের ভিতরকার পাপটাকেই টানিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। বাংলা ভাগ-হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব ঘনাইয়া উঠিতেছে। আমরা জানিনা, ইহাই সাধারণ মনোভাব কিনা—কিন্তু ইতি-মধ্যেই একটা রব উঠিয়াছে, তাহা যে অমূলক এমনও মনে হয় না। হয়ত ইহারও পশ্চাতে একটা প্রবীণ রাজনীতি আছে, দল-বিশেষের প্রয়োজন আছে। পলিটিক্সের মত পাপ আর নাই; উহার দ্বারা দল ও দলপতির স্বার্থ-সাধন হয়—জাতির সর্বনাশ হয়।

* * *

বাংলার এই ভাগ-হওয়ায় সমগ্র জাতির সম্মতি ছিল কি না? আমরা কি উহার ফলাফল উত্তমরূপে চিন্তা না করিয়া—ভাগ-হওয়া বাস্তবেই কোথায় কাহার কি অবস্থা হইবে তাহা না বুঝিয়াই—ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম? ইহাকে কি আমরা একটা আপদ্ধর্ম বলিয়াই গ্রহণ করি নাই? এই-যে অর্দ্ধেক ছাড়িয়া বাকি অর্দ্ধেক আমরা আগ্রহ লইয়াছি—ইহা কি কেবল পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য? যাহারা পূর্ববঙ্গে থাকিবেন—থাকিতে বাধ্য হইবেন, অথবা থাকাই কর্তব্য বোধ করিবেন—এই পশ্চিমবঙ্গ কি আবশ্যক হইলে তাঁহাদেরও বাসভূমি হইতে পারিবে না? এক কথায় এই পশ্চিমবঙ্গ কি অতঃপর হিন্দু-বাঙালীমাত্রেরই স্বাধীন স্বদেশ হইবে না? জানি, সেই অধিকার দাবাস্ত করিবার জন্যই দলে দলে তাঁহারা ছুটিয়া আসিবেন-না, এক সে পক্ষে বৈষয়িক বাধাও অল্প নহে; তথাপি মনে-মনেও সেই অধিকার-বোধে বাধা হয় কেন? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, এই বাহিরের ভাগ-হওয়াটাই দুঃখের একমাত্র কারণ নয়, আমরা ভিতরেও এক হইতে পারি নাই। তবে, এতদিন যে জাতীয়তাবোধের সাধনা আমরা করিলাম, তাহা বাঙালীর স্বাজাত্য-বোধ নয়? বরং সেই বোধকে দমন করিয়াই আমরা মহা-জাতীয়তার সাধনা করিয়াছি? যাহারা ঘরে এক নহে তাহারা বাহিরে মহাজাতি হইতে চায়! স্বজাতির প্রতি পুরুষ মমতা বড়ই লজ্জার কথা—তাহাই মহাজাতিতে পরিণত হইবার প্রধান বাধা, সেই বাধা দূর করিতে গিয়া বাঙালী স্বজাতি-প্রীতিকে প্রশ্রয় দেয় নাই, এবং সেই জন্য জাতির মধ্যে যত রকম বিচ্ছেদ ছিল সেগুলিকে ঘুচাইয়া ফেলিতেও সে বিন্দুমাত্র দুঃখ বোধ করে নাই। বরং ঐ মহাজাতীয়তার অনুষ্ঠানে সে নিজের দেশে ঈর্ষা ও দলাদলি বৃদ্ধি করিয়া দলগত ও সমাজগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিয়াছে। ঘরে আমরা এক-জাতি নই—সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক দলপ্রথার জেরকে আমরা অতিমাত্র বিশ্বাসকোরে লালন করিয়াছি—এখন এই মহাসঙ্কটে সেই পাপই যে আমাদিগকে গ্রাস করিবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় কি? মনে হয়, এই নব-পলিটিক্স্ বাঙালীকে স্বজাতির প্রতি আরও প্রেমহীন করিয়াছে। আজ এত মার খাইয়াও যদি চৈতন্য না হয়, তবে আর কখনও হইবে না। দুর্গতির চরম হইয়াছে, এখন কেবল নিপাটটাই বাকি আছে; সেটাকেও কুৎসিত করিয়া না তুলিলে এ জাতির পাপের ভরা কি পূর্ণ হইবে না?

*

ঐ পলিটিক্স্ অপরের পক্ষে যেমন হউক, তোমার পক্ষে উহা পরধর্ম। উহা যদি তোমার স্বধর্মই হইবে, তবে আজ তোমার এমন অবস্থা হইল কেন? যাহারা ঐ পরধর্মে বিশ্বাসী তাহারা বলে, ঔষধের দোষ কি? রোগটাই দুঃসাধ্য, দোষ বাঙালীর! আমরা বলি,—রোগটাকে স্বীকার করি, এবং ঔষধটাও যে বড় ঔষধ তাহাও মানি; কিন্তু এ রোগীর পক্ষে উহা বিষ। যদি ঐ ব্যাধি জাতিগত হয়, তবে তাহার ঔষধও ঐ ব্যাধি হইতেই প্রস্তুত করিতে হইবে—ব্যাধিও সেখানে, ঔষধও সেইখানে সন্ধান করিতে হইবে। ঐ ঔষধের গুণে যদি রোগ বৃদ্ধি পায়—উপসর্গগুলা আরও জটিল হইয়া উঠে, তবে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ঔষধ সেবন

করিতে হইবে, এক উহাকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা দুটাই বাহুনীয়— এমন কথা যদি কেহও বলিয়া? যাহারা বলে তাহারা নিশ্চয়ই দেশের আত্মীয় নয়। উহাদের কথা ত' কিছুই বলি না। ঐ উক্তি যদি তোমার বুদ্ধির উপযোগী হইত, ঐ বাক্য যদি তোমার অন্তরে প্রবেশ করিত তবে তুমি আত্মহারা হইতে না? তোমার প্রাণ যদি সত্যই কাঁদিয়া থাকে, তবে এত ঘোরপ্যাঁচ, এত ঘোরাঘুরি কেন? প্রাণ-কান্নার লক্ষণ এ নহে— সেই প্রেম কোথায়? যদি সেই প্রাণ জাগিত, তবে আমরা আজ কি দেখিতাম? তোমার স্বরাজের উপায় এই যে এতবড় আঘাত, ইহাতে তুমি কি এক লেখে একটা জবাব দিতে না? একদিকে দকলের ঘৃণা, এবং পাশুকে সকলের লাভ বলিয়া মনে করিতে না? তবুও এক, আশাও এক হইত না! সে লক্ষণ ত' দেখিতেছি না; ধরঃ উল্টাই দেখিতেছি। গত ডিসেম্বরে বাঙালী যে অনুরাগের পরিচয় দিয়াছে, পরে নোয়াখালির সেই পৈশাচিক নির্যাতনেও সে যে গৌরব ও প্রাণধর্মের দৃষ্টান্ত ভারতবাসীকে দেখাইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ইহারাই আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে! এই জাতি নাকি স্বাধীন হইতে পারে!

* * *

যাহারা বলে— হিন্দুস্থানের খণ্ডিত বাংলা অপেক্ষা পাকিস্তানের অখণ্ড বাংলাই ভালো ছিল, কারণ এইরূপ ভাগ-বখরার ফলে, একটা অঙ্গ চিরতরে অবশ হইয়া গেল, বাঙালী শক্তিহীন হইয়া পড়িল; অপর পক্ষে, এক হইয়া থাকিলে শক্তিশালীরূপেও শক্তিমান হইয়া থাকিতাম, এমন কি, পরে সকলকেও বশে আনিতে পারিতাম; — তাহাদের এ যুক্তির জবাব আমাদের দিবার নাই, আমরা কোন যুক্তি-তর্কের কথা তুলিব না। জাতির জন্য প্রাণ কাঁদিলে সকল যুক্তি-তর্কই আসিয়া যাইত, তর্কের অবকাশই থাকিত না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বাঙালী যদি সত্যই শক্তিমান ও প্রাণবান হইত তাহা হইলে, প্রথমতঃ, এই ভাগ কখনই হইতে পারিত না — এমন কি, ভারতের ভাগও হয়ত অন্যরূপ হইত। দ্বিতীয়তঃ, এই যে ভাগ হইয়াছে, তাহা ভাল হউক আর মন্দই হউক, তাহার জন্য এত কোরেমি হইত না। যদি ইহা ভুল হইয়া থাকে, যদি ইহাতে কোন পক্ষের স্বার্থবিহ্বলতা হইয়া থাকে, তথাপি আমরা বিচলিত হইতাম না। আর ঐ অখণ্ড হওয়ার কথা? পূর্বে বলিয়াছি, বাঙালী যদি একই একতাবদ্ধ ও একতা-কাঙ্ক্ষী হয়, তবে বাংলাদেশে এত দলাদলি কেন? অন্য প্রদেশের মত বাংলায় এক-নেতৃত্ব নাই কেন? বাঙালী সর্ববিষয়ে কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী কেন? অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যে পাকিস্তান — তাহা ত' পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সেই বারো-আনা পাকিস্তানে বাঙালী হিন্দু যে একতা, সাহস ও ধর্মবোধের পরিচয় দিয়াছে, ষোল-আনা পাকিস্তানে তাহারা যে কিরূপ ভোলপাড় খুলিবে — অনুমান করা কি এতই দুঃসাধ্য? সেই অখণ্ড বাংলাদেশে আবার যখন নোয়াখালির পর নোয়াখালি হইতে থাকিবে, তখনও বাংলার বীরনেতাগণ কেবল দূর হইতে অনুকূল দর্শন এবং বক্তৃতা ও বিবৃতির প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে হারাইয়া দিবার পুরাতন্ত্রী ছাড়া আর কিছুই করিবেন না; দায়িত্বহীন জন করেন্ট-অ্যাপীলে কেহ কাহাকেও অধিকতর গৌরবহানি হইতে দিবেন না; মোটর এবং এরোপ্লেন তাঁহাদের সেই দায়িত্বহীনতাকে তেমনই মহিমান্বিত করিবে। অকুস্থলে যাহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবেন; সেই সময় নোয়াখালিতে যেমন, দাঙ্গা কেন্টাতেও তেমনি, আর কিছুই করিবার থাকিবে না। আবার যখন হাজারে হাজারে বাঙালীর কুলকন্যারা ছাদী ও মুরুদ্দীতে পরিণত হইবে, তখন অবশ্যম্ভাবী — সেই বাক্যের — ধার্মিক সন্তানেরা অহিংসার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্তন করিবে

যে, মাঝের সেই রোদনস্বর আর শোনাই যাইবে না। পাকিস্তানের অবশ্য বাংলাই বটে! নহিলে নেতা হওয়া যায় না যে! সব হলওলাই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, এখন নূতন খোতান খুলিতে হইলে একটা নূতন সাইনবোর্ড চাই!

• •

বাংলা-বিভাগ বাঙালীর পক্ষে বাঁচা মরা — কোন-রূপে ধড়ে-নিশ্বাসে, সর্বনাশের পরিবর্তে অর্ধ-নাশের একটা আশ্বাসবাক্যে। তাহাও নিশ্চিত নয় — কতটুকু বাঁচিবে তাহাও বলা যায় না, এবং সেটুকু নিরাপদ হইবে কিনা, তাহাই বা কে জানে? উপরের দিকে কি যে হইয়া গেল, এবং আগেও চতুর্দিকে যাহা হইতেছিল, এখনও হইতেছে — তাহার অর্থ কে-ই বা বুঝে, কে-ই বা বুঝিতে চায়? সেই সকল দুর্ঘটনার ঘাউড়ামী বক্ষিসনের নিকটে কত গালীই খেল করিয়াছে। কত ছায়ের তর্ক, কত কাই-কাইকি যা করিয়াছে। বাঙালী তাহাতেই কত আশ্বাসিত হইয়াছে! — এখনই, কাহারও সৌভাগ্য, কাহারও সর্বনাশ ভাবিয়া পরস্পর কাছে দুঃখ করিয়াছে। এ জ্ঞান তাহার নাই যে, ঐ সীমানা-নির্দেশ যা তুমি-বাটোয়ারা সেই আর এক বাটোয়ারারই মত — ইহাও সেই এ্যাওয়ার্ড; এখানেও দুইপক্ষ একমত না হইলে তৃতীয়পক্ষ যাহা আদেশ করিবে তাহাই শিরোধার্য করিতে হইবে; সেই তৃতীয় পক্ষ যে কোন্ পক্ষ, তাহা কে না জানে? অতএব হিন্দুর ভাগে কতটুকু পড়িবে, তাহা জানাই আছে। কলিকাতা সহরও চাই — অন্ততঃ তাহা পুরাপুরি হিন্দুর হইতে পারিবে না; কলিকাতার ইহুদে বণিক — কলিকাতার কেন, সারা ভারতের খেচাল বণিকসমাজ — প্রাণান্তেও তাহা ঘটিতে দিবে না। কলিকাতায় এখনও যে হুহু করিয়া ধনরত্ন ও সৌভাগ্য সমানে চলিতেছে তাহার কারণ কি? আপোস করিতে হইবে তোমাদিগকেই, দয়া করিয়া যারা দিবে তাহাই চোখের জল মুছিয়া হাসিমুখে গ্রহণ করিতে হইবে, নহিলে — নহিলে — কি তাহা ত' তোমাদের নেতারা ভালরূপ জানেন।

• • •

আর যদি কাহারও হইয়া থাকে তাহা হিন্দুর নয় — মুসলমানের। বিরূপ করিয়া, যদি দিয়া বা অধিকারের ভয় দেখাইয়া তোমার ঐ সাম্রাজ্যের চেয়ে আরও সম্ভ্রান্তর। হিন্দুর জয় হইয়াছে তাই তাহার কংগ্রেসের জিন্নাসাহেবের মুসলমানকেও প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে বলিয়াছেন? ব্রিটিশজাতিও কংগ্রেসের এই জয়লাভে পার্লামেন্টে উৎসব করিয়াছে। এই সকলই ত' হিন্দুর জয়লাভের নিঃসংশয় প্রমাণ। ইংরেজ যাহা করিয়াছে তাহা ইংরেজের পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক, কিন্তু জিন্না-সাহেবের ঐ আদেশ? তিনি যে এমন মনোরঞ্জক রসিকতা করিতে পারেন তাহা জানিতাম না। না হয়, হিন্দু-ভারতেরই জয় হইয়াছে, তাহাতে বাঙালীর কি? তাহার এত উল্লাস কেন? ঢাকার যখন ঐ অবস্থা, তখন সে কোন্ প্রাণে কোন্ মুখে কলিকাতায় বিজয়োৎসব করিবে! তবিষ্যতে উৎসব করিবে বটে, কিন্তু অন্ধকারে; আলো জ্বালাইতে হইবে না। তবু উৎসব চাই। এ যেন একদিকে মাতৃহত্যা, আর একদিকে ভরণপুরের অন্নপ্রাশন। এ কেলেঙ্কারী কি না করিলে নয়? অনেক পাপ তুমি করিয়াছ, কলিকাতার প্রায়শ্চিত্ত এখনও অনেক বাকি, আবার এই নূতন পাপ কেন!

•

হা ধর্মাবতার! তোমার একটু লজ্জাও নাই! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, অর্ধেকের অধিক বঙ্গভূমে তোমার পিতৃপুরুষের অন্নজল বন্ধ হইয়া যাইতেছে! তুমি কি দেখিতেছ না, তোমার আদিপুরুষের চিতাগ্নে হিন্দুর শ্মশানে, সেখানে অপবিত্র বলিয়া নিষিদ্ধ হইতে চলিয়াছে! তুমি কি শুনিতেছ না, দিকে দিকে, তোমার সমাজের যাহারা সেরেস্তে, সেই অসহায় মুক

মুক্ত প্রাণবায়ুর নিঃশ্বাসের মহাসুখে দিকে দিকে আর্তনাদ করিতেছে।' তাহারা তোমার কেহ নয়! তুমি পশ্চিমবঙ্গে নিরাপদ হইয়াছ, তাই কলিকাতার বিক্ষোভসংঘের এত ঘটা! সে আন্দোলনের আবেগ যে কেমন, তাহার একটু নমুনা দিই।—

"নিখিলের মন স্বভাবতই এখন বহুবিক্ষিপ্ত, বহুদিকে নিজের প্রতি ধাওয়া করিতেছে, সেদিন পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সকল দাবির অবসান হইবে।...সেই শুভদিন সমাগত—যে-দিন আমাদের চক্ষুশ্চিন্তাহারিণী নিবৃত্তি পতাকা কোটি উৎসিক্তের শিখরদেশে শত শত করিয়া উড়িতে থাকিবে, কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসের গম্বুজশিরে 'বন্দেমাতরম'-সঙ্গীতের (\"বন্ধ-মাতরমে'র কি মহিমময়ী মূর্তি!) উদাত্ত সুর গমগম করিবে, এবং গান্ধীজীর আমরণে গলের মাঠে আমরা একলো'-আট কামান দাগিব (মোরাখানি তাহা পারিবে না—হা:! হা:! হা:!), আরও কি কি করিতে পারিব, তাহার তালিকা পেটে গদ গদ করিতেও বলিতে তবে ফুরাইতেছে না।"

ইহার পরেও একটু আছে। লেখক এত উৎফুল্ল হইয়াও, কলিকাতার লড়াই এখনও অবসান হইতেছে না দেখিয়া, স্বস্তি পাইতেছেন না—বুঝি এখন সুখ কল্পনায় বাধা! তাই কলিকাতার ঐ অবস্থা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছেন; যথা—

"বাংলাদেশে পনেরই আগস্ট নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে। সেদিন মায়ের দুটীরে শঙ্খ বোধ হয় বাজিবে না, প্রদীপ বোধ হয় জ্বলিবে না," ইত্যাদি।

ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ঐ কলিকাতাই বাংলাদেশ—ঐখানে বসিয়া বহুদূর নির্দ্বিঘ্নে হাত বাড়ানো যায়, তাহাতেই যথেষ্ট; বাকিটা পাকিস্তান, তাহার জন্য কোন ভাবনা আর নাই।

যে-পত্রিকায় ইহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের পক্ষে শোভন নয়; উদ্ধৃত করিলে হইল এইমাত্র যে, আমরাও পশ্চিমবঙ্গবাসী—অবশ্য কলিকাতা সহরে আমাদের বাসাবাড়ী নাই, তথাপি লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেছে। হায় বাঙালী! হায় বাংলাদেশ!

* *

বর্তমানের কথা এবার এই পর্যন্ত, অতঃপর ভবিষ্যতের আশার কথা কিছু বলিব। পাঠক-পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন, আমরা পলিটিক্স্ জানি না, বুঝিও না—যাহা কিছু বলি, তাহা নির্দ্বোষে প্রাণের তাড়নায়। এইবার যাহা বলিব তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, তাই পূর্বের সহিত মিলাইয়া কেহ যেন আমাদিগকে অর্দ্দিনা না করেন। ইহাতেও পলিটিক্সের সামগন্ধ নাই, কেবল দুইটা আর একদিকে মিলাইয়াছি মাত্র। তাহাতে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—এই বঙ্গ-বিভাগ ভাল হউক বা মন্দ হউক—ইহার জন্য দায়ী কে? উত্তরে বলি, দায়ী বাঙালী—হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই। হিন্দু-বাঙালী যদি ভুয়া জাতীয়তাবাদের মোহে না মজিত, এবং মুসলমান বাঙালীও যদি দীপের প্রয়োজনায় এমন আত্মহারা না হইত, তবে এমন কখনও ঘটিতে পারিত না। শুধু তাহাই নয়, এই বাংলাদেশ হইতেই সেই সত্যকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হইত, যাহা সমগ্র ভারতকে একতাবদ্ধ করিয়া শক্তি ও সামর্থ্যে দুর্জয় হইয়া উঠিত; এমন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া বাঙালার ভবিষ্যতের আসন অন্ধকারকে ঘনাইয়া তুলিত না। এ বিশ্বাসের কারণ, বাঙালী এমনই একটা যন্ত্র আছে যে শিক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্য ছাড়া এ দেশে হিন্দু-মুসলমানে আর কোন তফাৎ নাই; সেই বৈশিষ্ট্যই একটা গুরুতর ঐক্যের ভিত্তি হইয়া আছে। বাঙালীর এই এক-জাতির ভারতীয় এক-জাতির অপেক্ষা বহুগুণে বাস্তব, অর্থাৎ তাহা জীবন-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা পোলিটিক্যাল জাতীয়তাবাদ নহে। এখনকার হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা ভারতের অপর সকল প্রদেশের মত কঠিন

না ; কারণ এ দেশ সর্বত্র একজাতির বেশ, ভাষাও এক। বাঙালী হিন্দু বটে, কিন্তু সেই হিন্দুরে বাঙালীরই প্রথম ; বাঙালী মুসলমান বটে, কিন্তু সেই মুসলমানের বাঙালীরই প্রথম। বাংলার মাটির যে শক্তি তাহা হিন্দু ও মুসলমানের মজ্জাগত। তা' ছাড়া, ইসলামের কালে বাঙালী যে একটী নূতন কাল্‌চার তাহার ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব শক্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার উত্তরাধিকার হইতে কেহ তাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারিবে না—সে সংস্কৃতি কেহ নষ্ট করিতেও পারিবে না। বাংলাভাষা—হিন্দু ও মুসলমান-বাঙালীর মাতৃভাষা—সেই কাল্‌চারের বাহন হইয়া যে প্রজ্ঞা ও প্রতাপ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে এমন ঔদ্ধত্যবান বাঙালী আজ নাই। একদিন হিন্দু বাঙালী ইংরেজীর মোহে পড়িয়াছিল, মুসলমান বাঙালী সে দিন সে মোহে পড়ে নাই—তাহার সে সৌভাগ্য হয় নাই। আজ হিন্দু বাঙালী ইংরেজীর নিকট হইতে শক্তি ও সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া, নিজের মাতৃভাষার প্রসাধন করিয়াছে ; দুর্ভোগ সেই বুঝিয়াছে, কিন্তু সাপের মাথা হইতে যে-মণিটি কাড়িয়া লইয়া সে আপনার ঘরে আনিয়া তুলিয়াছে—মুসলমান বাঙালীও তাহার বাঙালীত্বের অধিকারে সেই সম্পদের সমান অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ ও বাংলাভাষাকে সে প্রথম হইতেই প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া আছে, সে কখনও উর্দুর সেবা করে নাই ; আমি বাঙালী-মুসলমানের কথা বলিতেছি না, মুসলমান-বাঙালীর কথা বলিতেছি। সেই মুসলমান বাঙালীরা একদিন এই কাল্‌চারের পরিচয় পায় নাই, কিন্তু বহু প্রাণ দুঃখপূর্ণ করিয়া, বিধাতার আশীর্বাদে সে তাহার মাতৃভাষার প্রসাদ লাভ করিয়াছে। বাহিরে সে তাহার স্বজাতি-হিন্দুর উপরে যে-কারণেই যত আক্রোশ-অভিমান করুক না কেন, ভিতরে, নিজের অজ্ঞাতসারেও, সে তাহার বাঙালীত্বের মর্য্যাদা অনুভব করিতেছে। এই ভাষাই সকল জাতির বাঙালীত্বের নিদান ; কেহ-পারেআমা উহাকে ধ্বংস দিতে পারে, উহার অপমান করিতেও পারে, কিন্তু উহার শক্তি যেমন শাশ্বত, তেমনই অক্ষয়। তাই মুসলমান-বাঙালী দুর্বুদ্ধিবশে আর যাহাই করুক, উর্দুকে মাতৃভাষা করিতে পারিবে না—"মুতপশে না হয় বিজয়, বাংলাদে নাহি হারে মাতার হৃদয়।" কোনকালে তাহা সম্ভব ছিল কিনা জানি না, এখনে তাহা আর সম্ভব নয়। ঐ সাহিত্য এখনও প্রধানতঃ হিন্দুর সাহিত্য হইলেও, উহার ভিতরে যে বাঙালীর রহিয়াছে, তাহার অতি বড় শত্রুও প্রবল প্রতাপে সে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না ; ঐ ভাষাই তাহার অন্তরের দুয়ার খুলিবার একমাত্র চাবি ; তাহাতে উর্দু মিশাইলে তাহার একটা বিশুদ্ধতিষ্ঠার্থে হইবে বটে, কিন্তু প্রাণ পাওয়া যাইবে না। মানুষ ইচ্ছা করিলে আত্মহত্যা করিতেও পারে কিন্তু একই কালে বাঁচিবার ইচ্ছা ও আত্মহত্যা অসম্ভব।

৮

বাংলা-ভাগ হওয়ায় বাঙালীর কি হইল, তাহা হিন্দু-বাঙালী বুঝিতেছে, মুসলমান এখনও বুঝে নাই, কারণ, হিন্দু অনেক আগে জাগিয়াছে, মুসলমান এখনও জাগে নাই। কিন্তু এইবার সে জাগিবে ; হিন্দুর গলায় ফাঁস দিতে গিয়া সেই ফাঁস তাহারও গলায় বাঁধিয়াছে। নিজের বাঙালীত্ব অস্বীকার করার যে শাস্তি—এইবার সে হাতে হাতে তাহা পাইবে। বাঙালী-হিন্দুকে ত্যাগ করিয়া সে যেটাকে ভাগ করিয়া লইয়াছে, এখন ভোগ করিতে গিয়া বুঝিতে পারিবে, সে কাহা কাহার। সে ত' নিজের স্বাধীনতা চাহে নাই, চাহিয়াছিল—সমস্ত বাংলাদেশটাকে ধর্মের নামে অ-বাঙালীর পদানত করিতে। সে-ও যে বাঙালী, তাহারও যে স্বাধীনতা এবং আত্মমর্য্যাদা চাই—এ চিন্তা সে একবারও করে নাই ; মুসলিম ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়া হিন্দুকে দমন করাই ছিল তাহার অন্ত-

আক্রোশের আক্রমণটা থাকিবে। ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য হওয়ায় বাঙালী মুসলমানের (শ্রেণীর নয়) যেটুকু ক্ষতি হইবার তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া হইয়া যাইবে। অধিকন্তু পাকিস্তানে যে-সব প্রাদেশিকতা গড়িয়া উঠে, কিংবা যেটুকু সত্য-সত্য বজায় থাকে—তাহা ঐ মুসলিম-নির্বিশেষে সকলেরই এবং অ-বাঙালী এবং বাঙালী হিন্দুর সাধারণভাবে সমান হইয়া দাঁড়াইবে। স্বাধিকার যেটুকু ঘোষণা হইয়াছে, পূর্ব-পাকিস্তানের তেমনই উর্দুর সঙ্গে বাংলারও মর্যাদা সম্প্রসারের একটি ঘোষণা করিতে হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী-মুসলমান যখনই অ-বাঙালীর চতুর শাসন-সত্তা চূর্ণ করিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে, সে নিজের কি সর্বনাশ করিয়াছে। তখনই সে বুঝিবে যে, ভারতীয় হইলেও সে বাঙালী—আর ঐ মুসলমান অপেক্ষা বাঙালী হিন্দু তাহার অধিকতর আত্মীয়। ইহাও বোঝা যাইবে যে, ঐ অ-বাঙালীকে ঠেকাইতে হইবে হিন্দু-বাঙালীকেই চাই; অন্যথায় তাহাকে বাঁচাইবে না, অন্যান্যকেই বাঁচাইবে।

মুসলমান-বাঙালীর এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, এই কি সে দেখিতে পাইতেছে না? তাহা হইলে তাহার ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। আজ আমরা যাহার আশঙ্কা করিতেছি, হয়ত সেটুকুও তাহারই বিরাট ভবিষ্যতের বিরাম বলিয়া মনে করিতেছে। কিন্তু এখনও তাহার বিলম্ব আছে। এ প্রকৃতি এত শীঘ্র দূর হইবে না, বাঙালী মুসলমানেরও — বিশেষতঃ, অধিকিন্তু বাঙালী মুসলমানের চেষ্টা দূরে হইলেও, তাহারাই পাকের প্রধান বল। বিভিন্ন বিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহারা স্থির কোন ফল হইবে না; তাহা এখনও কিছুকাল অধিক-পক্ষের দ্বারা অপরপক্ষকে দাবাইয়া স্বকার্য বজায় রাখিবে। ঐ পক্ষ হিন্দু-মুসলমানের সমাজে—উহা শ্রেণী-বিভেদ নহে। এজন্য আমরা এখনই যেন অত্যধিক আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বর্তমানের আশঙ্কায় শিহরিত হইয়া, আবার নেতৃ-বিশেষকে কুটনৈতিক ভাবে বাতিল হইয়া না যাই। পূর্ববর্তী মুসলমান আক্রমণ যেমন ধীরে ধীরে সিদ্ধ হইয়া থাকুক, তখন দ্রুত পর্যায় বদল হইয়া আসিবে, তখন আর কিছুই করিতে হইবে না, সমগ্র বাংলাদেশে বাঙালীর দেখা হইয়া যাইবে, কোন রাজনীতি বা অন্যান্যের প্রয়োজন হইবে না। বাঙালীই আপনার ব্যবস্থা আপনি করিয়া লইবে।—কিন্তু সাবধান! ঐ ভাস ফ্লেয়ে-কোকুয়েট কোন চতুরার বা সেডিমেন্টের বলে—এখনই উড়াইয়া দেওয়া না হয়। বাঙালী হিন্দুকে অবশ্যই কিছুদিন দুঃখ পাইতে ও সহ্য করিতে হইবে।

[১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৪]

শত্রু যার আত্মীয়-স্বজন,
আত্মা তার নিত্য-শত্রু, ধর্ম শত্রু তার,
অন্যে তাহার শত্রু।

—রবীন্দ্রনাথ

---

৮ নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট "প্রবাসী প্রেসে" সিপলস্ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যাহারা অন্ত উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করা প্রভৃতি এই প্রবন্ধটিতে সেই কথা বলা যাইতে পারে।

যাহা অশ্লীল, কদর্য্যকর, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে লেখা, সে সকল প্রবন্ধ কখনও বিস্তৃত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিত্যাজ্য। **সত্য ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা পাপ।**

যাহা লিখিবেন, তাহা ছাপাইবেন না। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইতে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাটা, ছাঁটা, উপযুক্ত দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়মটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অনুচিকর।

যে বিষয়ে যাঁহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ অকর্ত্তব্য। এই লোভা কথা, কিন্তু সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

বিজ্ঞাপন-প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনি প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অধিক বিদ্যাকিতর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জর্ম্মান কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা রঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে, লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজনমতে আপনিই আসিয়া যোগাইবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে দাসী খুঁজিলেও আসিবে না। অসময়ে বা অপ্রয়োজনে অলঙ্কার-প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্যও আর কিছুই নাই।

যে স্থানে অলঙ্কার বা রঙ্গ বড় সুন্দর বসিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটী প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারিবার পড়িলে লেখকের নিজেই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরেজি, বা সংস্কৃত, বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

যে কথায় প্রমাণ দিতে পারিবে না তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

(২)

সাহিত্য কি জন্য? এবং কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক আমি আমি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ

প্রণীত হওয়া উচিত। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, জনসাধারণের জ্ঞানবুদ্ধি বা চিত্তোন্নতি তিন জনার জন্য উদ্দেশ্য নাই; জানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সেই সর্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি লেখনের ধরুক মাত্র।

বিষয় অনুসারেই জনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। জনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে জনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট জনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ-ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি তদপেক্ষা সংস্কৃতবহুল ভাষায় অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে; তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, প্রাকৃত, বঙ্গ, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অরীতি ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষা অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের জনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যাই সাধারণের শিক্ষার মূল।

* * * *

বিজ্ঞান বা ধর্ম্মোপদেশ, মনুষ্যের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি ভিন্নের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।

* * *

যাহারা কবিতা প্রণয়ন করিয়া পদের চিত্র অনুচিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তন্তুবায়দিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু। এবং তাহাদিগকে তন্তুবায়দিগের ন্যায় শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করা বিধেয়।

শরৎ—জন্মতিথি

[৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৪]

বাংলার ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া গত একশত বৎসরের ইতিহাসে, অমরীয় বাঙালী মহাপুরুষের অভাব নাই; তবু সে সেই অমরীয়দের অধিকাংশই যে কবি, সাহিত্যিক, মনস্বী চিন্তানায়ক, ভাবুক ও প্রেমিক, ইহাই তাঁদের জাতি বাঙালীজাতির প্রতিভা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই অমরীয় নাম-মালার মধ্যে শরৎচন্দ্রের নামও সাহিত্যিক প্রতিভা ও কীর্তিমহিমায় আর একটি নাম। এখানে অমরীয় কথাটিরও একটি অর্থ আছে, কারণ, এমনতর পুরুষ তখনও বিস্মৃত হন না—শুধুই ইতিহাসে নয়, জাতির জীবনে-ধারায়, তাহার সমাজের ভাব-জীবনে মৃত্যুর প্রভাব লুপ্ত হয় না। তথাপি, বর্তমানের সহিত অতীতের যেমন একটা অবিচ্ছেদ যোগ আছে, তেমনই বর্তমানে এক অর্থে অতীতের প্রতিক্রিয়াও ঘটে; ঐ যোগ এবং এই বিয়োগ এই দুয়েরই প্রয়োজনও আছে, এই দুই শক্তিই কালের ধারায় সৃষ্টিকে ও সংহারকে অতিক্রান্ত করিয়া থাকে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এই যে সঙ্ঘর্ষ, ইহারই ফলে কালের সেই নিত্য নব নবোন্মেষশালিনী—যাহাকে আমরা ভবিষ্যৎ বলিয়া থাকি।

যে জাতির ভবিষ্যৎ নাই, অর্থাৎ যাহার ঐ বিকাশ-সম্ভাবনা রুদ্ধ হইয়াছে, সে নিজেই অতীত ইতিহাসের গতিচক্রকে বিশ্রাম দান করে, সে নিজে আর কিছুই সৃজন করে না। কবি-মনীষিগণকে, জাতির গুরুস্থানীয়দিগকে স্মরণ করার প্রয়োজন এই যে—মাঝে মাঝে একদিন, একবারও আধুনিক জীবনের এই ধাবন-বেগের মধ্যে একটু স্থির হইয়া, আমরা কি এবং কে, তাহাই স্মরণ করা; কারণ, ঐ সকল পুরুষ জাতির জন্মক্ষণ, তাহার সাধনা ও সংস্কৃতির এক একটি মাইলস্টোন। সাধারণতঃ জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথি সেইরূপ দুইটি উপলক্ষ যাহা, এবং সে উপলক্ষ আমাদের চিরাগত সংস্কারের বড়ই অনুকূল; মানুষের জীবনকে আমরা এই দুইটি প্রান্তবিন্দুর দ্বারাই কোনরূপে ঐ অবিচ্ছিন্ন কালপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লই—জন্ম-মৃত্যুর দুই ধারের একটিতে প্রবেশ ও অপরটিতে তাহার নিষ্ক্রমণ আমাদের মনকে যেমন সাহায্য করে এমন আর কিছুতেই নয়। যখন তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন কে-সংবাদ বাহিরের কেহ পায় নাই; সেই আদি জন্মতিথিতে কেহ উৎসব করে নাই, কারণ তখনও জাতির চিত্তে তাঁহাদের জন্ম হয় নাই; বিধাতা তাঁহাদের ললাটে যে জয়পত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তখন কেহ তাহা পড়িতে পারে নাই। তেমনই যখন সেই মানুষ চলিয়া যান তখন আরেকটি দিন, আরেকটি লগ্ন আমাদের চিত্তে মূক মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকে, সে লগ্ন কীর্তিময় জীবনের অবসান-লগ্ন; আমরা সেই অপর লগ্নটিকেও অমরা চিহ্নিত করিয়া রাখি। কীর্তির পশ্চাতে সেই ব্যক্তিটিকে স্মরণ করিবার ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক রীতি।

জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথি—দুই তিথিই সমান মূল্যবান। আমার জাতির পিতৃস্থানীয় বলিয়া সকল মহাপুরুষ সমান স্মরণীয় হইলেও, এক এক যুগে বা যুগসন্ধিক্ষণে কোন কোন জন একটু বিশেষ কারণে, বিশেষ অর্থে স্মরণীয় হইয়া উঠেন। যাঁহার তাৎপর্যদৃষ্টি যেমন, তাঁহাকে তেমন ভাবেই স্মরণ করিতে হয়, মহিমে কয়েকটি বাঁধা মন্ত্রের উচ্চারণ বা একই প্রথার অনুবর্তন করিলে অনুষ্ঠান অতিশয় রূঢ়ত্বে ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে, কিম্বা একটা তামসিক যাদুমন্ত্রে পর্যবসিত হয়। বোধ হয়, এই কারণেই, এইরূপ

কৃত্রিম আবেগ-উচ্ছ্বাসের ক্লান্তিকর উপদ্রব হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য, কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃত মহাপুরুষদের প্রতি অতি গভীর কৃতজ্ঞতাবশতঃই ঐ মৃত্যুতিথিটা পালন করিবেন না। কিন্তু জন্মতিথি? তাঁহাদের যুক্তিটা এই যে, যাঁহারা অমর হইয়াছেন, তাঁহাদের আর মৃত্যু-কল্পনা কেন? কথাটা অতিশয় উচ্চ এবং গভীর বটে, কিন্তু যুক্তও নয়, সম্পূর্ণ সত্যও নয়। অমর যাঁহারা তাঁহারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া আছেন—ঐ মৃত্যুকে বরণ করিয়াও অমর হওয়াই তাঁহাদের গৌরব। যদি মৃত্যুই না হইয়া থাকে তবে অমরত্বের গৌরব কি? অতএব যে মৃত্যুকে তাঁহারা জয় করিয়াছেন, সেই মৃত্যুকেই উড়াইয়া দিলে ঐ জয়ের কোন অর্থ হয় না। আবার এমনও বলা যাইতে পারে যে, যে-অমরের মৃত্যু হয় নাই তিনি কখনও মানবরূপে অবতীর্ণ হন নাই, তাঁহার সহিত আমাদের মনুষ্যসাধারণের সম্পর্ক কি? অতএব ঐরূপ উক্তির কোন অর্থ হয় না।

(২)

এই ভাদ্রমাস শরচ্চন্দ্রের জন্ম-মাস; আমরা সেই উপলক্ষে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। তিনি তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে বসিয়া যাহা প্রাণ দিয়া যে দেবতার পূজা করিয়াছিলেন সে দেবতা প্রীতির দেবতা, সেই দেবতার আনন্দেই তিনি তাঁহার জাতির ধনিত-মর্মের এক অপরূপ করুণ-কোমল সৌন্দর্যজ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহারই অপূর্ব সুরে, সেই বিশ্বপ্রেমের বেদনা-রসে বিভোর হইয়া তিনি যে সুরে যে গান গাহিয়াছিলেন—বাঙালী তেমনটি পূর্বে আর শোনে নাই। সে সুর যে হারাইয়া গিয়াছিল, বহুদিন তেমন সুরে কেহ তাহাকে ডাকে নাই। এ গীত যেন কোন্ অন্তরাত্মার গহনার হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে; এ ব্যথা কাহার ব্যথা? এ সুর কে আবার কোথা হইতে ফিরাইয়া আনিল? কুলিরা যেমন এ যে তাহারই প্রাণের সুর! ইহাই ত' চিরদিন তাহাকে পাগল করিয়াছে, যেখানকার নিবিড় নিশ্চিন্ত কানন-পথে ইহারই আকুল আহ্বানে তাহার অন্তর-বাসিকা ঘরের বাহির হইয়াছে—কালিন্দীর কালো-জলে অন্তর মাতাল করিয়াছে।

আজ তাহার জীবনে সেই মধুর মেঘমেদুর রাত্রি; বিদ্যুতের ঝিলিক আছে, মেঘের গর্জন-স্পর্শ নাই; নদীতে কল্লোল আছে, কলরোল নাই; ঘুমন্ত-পুরীতে আছে, সেই রাধা-বিনোদিনী কোথায়? সে প্রাণ নাই, সে গানও নাই; সে পিপাসা নাই; পানীয়ও নাই। সে সব ভুলিয়াছে, রাধাকে রাধা বলিয়াও জানে না; তাহার পিপাসাও অন্তরের পিপাসা; সে আর ঘরে যায় করে না, ঘাটে-বাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। এমন সময়ে সে ঐ গান শুনিল, শুনিয়া চমকিয়া উঠিল—সে সুর তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। সে যেমন আবিষ্ট, তেমনই অবাক হইয়া গেল।

হইবারই কথা, কারণ, এমন করিয়া তাহার হৃদয়ের সত্যকে আর কেহ মনের গোচর করিতে পারে নাই। শরৎ-সাহিত্যের যদি একটি অসাধারণ লক্ষণ থাকে তবে তাহা এই যে, উহা বাঙালীর আত্ম-হৃদয়-কাহিনী; ইহা কেবল প্রতিভা বা মনীষার কীর্তি নয়। একালে বাঙালী তাহার মেধা ও মনঃশক্তি লইয়া বিশ্বিজয় করিয়াছে, সাহিত্যেও সে আজ শুধু ভারতের নয়—সারা এশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে সে অতিউচ্চ শৃঙ্গচূড়ায়, এমন কি নক্ষত্রলোকে বিচরণ করিয়াছে, রাজবেশ পরিয়া প্রতিভার রাজসভায় গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই সেই অতিউচ্চ ভাবের ভারাক্রান্ত হইয়া সে আপনার গৃহকোণের নিরালায়, তুলসী-মঞ্চ, বাসকশয্যার সুখসংগোপন, এবং সর্বোপরি, তাহার স্নেহের দুঃখবিলাস উপরে সেই যে মহা-মানবের

উৎসব-গীত — সে সকলই সে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু মুগ্ধ করিলেও সে বশ হ' নাই আনিবে না; সে বৃন্দাবন-বাসীকে সকলেই তাহার 'মনের মোহের মাধুরী দিয়া' সৃষ্টি করে নাই, বাস্তবে পরিচিত করিয়াছিল, সে যেন কল্পলোক-স্থিতির মত তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছে। সেই ব্যাকুলতা ঐ একজনকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাই সে সমাজ-সংসারের কুলহাস করিয়া, মধুরার রাজপুরী ত্যাগ করিয়া, গোকুলের ঘরে ঘরে মাধুকরী করিয়া বেড়াইল, ব্রজের দুর্গম বিপিনে অভিসারিণী আহিরিণীর পদচিহ্ন খুঁজিতে লাগিল। এমনই করিয়া সে বাঙালীর পরিত্যক্ত ভক্ত-বৃন্দাবনে নূতন করিয়া কদম্বকানি তুলিল। প্রেমের যে একটী অপরূপ সাধনা জগতের আর কোন জাতি করে নাই, যে সাধনায় নর-নারী, চিরকিশোর ও চিরকিশোরীর বেশে দুর্গম পথের যাত্রী হয়, সর্ব-ত্রাস করে — ভয়, দুঃখ, লোকলজ্জা কিছুই থাকেনা; যাহাতে ইন্দ্রিয়ের লোভ নাই, বুদ্ধি যুক্তি-কল্পনাও নাই — সেই অতিলৌকিক অন্ধ অতিদুর্গমের সাধনা— বাঙালীর হৃদয়ের সেই সাধনারই সমাজ ও শাস্ত্রশাসন-বিধির যে দুরবগম তাহাই উদ্ঘাটন করিয়া, শরৎচন্দ্র তাঁহার কাব্যমুকুরে বাঙালীকে তাহার মুখ-প্রতিবিম্ব দেখাইলেন। এই বৃন্দাবন-সাধনার সম্বন্ধে তিনি নিজেও লিখিয়াছেন —

> "শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটী কিশোর-কিশোরীর লৌকিক-লীলা চিরনিশি এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে বুঝিয়া না পারিয়া, তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ,—কেহ নীতির, কেহ রুচির দোহাই পাড়িল,—আমার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সময় গতী যাওয়া-আসা বিলাইয়া যাইয়া হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, মাতিয়া উঠিল, গান গাহিয়া, নৃত্য একাকার করিয়া দিয়া, সংসারটাকে যেন একটা পাগলা-গারদ বানাইয়া রাখিল। তখন যাহারা বসে বসিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন জন্মের উদ্দেশ কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিল খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল—এই পাগলের মেলাই ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।
>
> সেই যে সর্বকালের পুরাতন, অথচ চিরনূতন বৃন্দাবনের মনে মনে দুটী কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা— যেখানে যাহার কাছে ক্ষুদ্র,— বুদ্ধিবল যাহার তুলনায় বালকের কাছে বালিকিলুর মতই তুচ্ছ,—তাহার যে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়া যায় না।"

"তাহারাও স্বীকার করিল"; স্বীকার যাহারা মুখে করে নাই — অনেকে হয়ত' এখনও করিতে লজ্জা পায়, তাহারা যে অন্তরে করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙালীজাতির নিবিড়তম আত্মপরিচয়ের সেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়কটী তাহার হাতে তুলিয়া দেওয়াই শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সেই দান স্মরণ করিয়া, আজ আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদের চির-কৃতজ্ঞতার প্রণতাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

(৩)

তাঁহাকে এমন করিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আমাদের দিনে আরও অধিক এই জন্য যে, বাঙালী আবার একটা আত্মহারার পিছনে ছুটিয়া আবার একটা পরমার্থের মোহে তাহার সর্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে। শরৎচন্দ্র নিজের, তাঁহার বাঙালীসুলভ সরল ও প্রবল হৃদয়াবেগের বলে, এই আত্মনাশের বন্যাস্রোতে বাঁধ দিয়াছিলেন, সেই তাঁহার সেই বাঙালী-প্রাণই তাঁহাকে সিদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার সেই মোহ ও মোহভঙ্গের কথা বাদিয়ে যেটী লোক

জানে না। কিন্তু সোশিলিজমের ঘরা-মুখের চাড়ুনীতে পড়িয়া সীতা যাহাতেই মুখ তখন এমন নিশ্চিত হইয়া গেছে নাই, এবং শরৎচন্দ্রও পলিটিক্স্ বুঝিতেন না। তার কারণ, তিনি তাঁহার দেশকে ও জাতিকে ভালবাসিতেন, এজন্য দেশের ও জাতির সর্বনাশ করিয়া যাহারা পরাধীনতার পুষ্ট হইবার জন্য পলিটিক্স্ করে, দেশের আপামর-সাধারণকে ভুলাইয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধনের জন্য যাহারা বাংলাদেশে ছোট-বড় নেতা হইয়া বসে, এবং আরও যাহারা সেই সকল নেতাদের তল্পিবাহী করিয়া মনোরঞ্জন নিবিড় করিতে চায়—শরৎচন্দ্র তাহাদের দলে ভিড়িতে পারেন নাই, সে প্রয়োজনও তাঁহার ছিলনা। তাঁহার সেই দোষগুণের কারণ যাহাই হৌক, তিনি বাংলা-সাহিত্যে বাঙালীর যে প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙালীকে যেটুকু আত্মসচেতন করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙালী যদি একালেও তাহা অনুভব করিয়া তাহার সেই বাঙালীত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সে অতীত পরিবাদের ঐ আদেয়ার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবে; ঐ ভরসাই এখন একমাত্র ভরসা।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলিবার স্থান ইহা নয়। তথাপি, এই উপলক্ষ্যে, আমরা অন্যত্র যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া, 'স্বধর্মনে'র অপর কর্তব্যও সম্পাদন করিব।

> "শরৎচন্দ্র জীবনকে একটা কেন্দ্রে মুখামুখি দেখিয়াছিলেন—সেই দেখারও একটা ব্যক্তিগত ভঙ্গি আছে। যে প্রবল কল্পনাশক্তি ভঙ্গিকে বৈষয়িক করিয়া তোলে, শরৎচন্দ্রের তাহা ছিল না,—কল্পনা অপেক্ষা অনুভূতির প্রবলতাই ছিল তাঁহার অধিক, তাই তাঁহার সৃষ্টির ভাব-রূপ বড় পরিস্ফুট, তাহার পরিধি তেমন বিস্তৃত নয়। মূলবিষ্ট বৃদ্ধির যেমন ভাবনার আপনার দেহ আপনি রচন করে, সে রচনে আত্মবশতাই প্রবল—শরৎচন্দ্রও তেমনই আমাদের এই সমাজের সহিত একাত্ম হইয়াই তাহার বেদনা পরম মমতার সহিত নিজদেহে ভোগ করিয়াছেন। তিনি বিচারক নহেন, সংস্কারকও নহেন—কেবল এই ব্যথার ব্যবসায়ী। তিনি আগামী সভ্যতা ও সমাজ-নীতির ভাবনা ভাবেন নাই, যেমন ভাবিয়াছেন—এক যুগের সমাজ-ব্যবস্থার ফলে এক শ্রেণীর মানব-মানবীর অন্তর-মথিত অমৃত-গরলের কথা। সেই সমাজ-ব্যবস্থার দোষ ও গুণ তিনি সমভাবে গ্রহণ করিয়া নিবেন—সকল ত্রুটিসত্ত্বেও তাহার প্রতি অসীম মমতার ফলে, তিনি বাংলা সাহিত্যে সেই বাঙালী-জীবনের চারণ-কবি হইতে পারিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের অন্তর্নিহিত যে রস, যাহা বাংলার প্রাচীনতর শাক্ত ও বৈষ্ণব-সাধনার মূল-ধারায় সিঞ্চিত, ও রঙ্গমঞ্চের পাশ্চাত্য ছন্দে গঠিত, শরৎচন্দ্র তাহাকেই সাহিত্যে একটি রূপ-রূপ দান করিয়াছেন। তিনি ইহার দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করেন নাই, অথচ অপরোক্ষভাবে ইহাকে অনুভব করিয়াছেন, এবং সেই অনুভূতির মধ্যে যেন তাঁহারও অজ্ঞাতসারে, ইহার প্রতি এক সুগভীর মমত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎ-সাহিত্যের যাহা উৎকৃষ্ট অংশ, যাহা খাঁটি শরৎবর্মী, তাহা একটা বিশেষ যুগের বিশেষ কালচারেরই ফল। আধুনিক সভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার আঘাতে এই কালচারেরই একটা আন্তরিক শক্তি তাঁহার সেই নরনারীর চরিত্র ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে যে সকল সমস্যার আবির্ভাব দেখা যায়, সমস্যাহিসাবে আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাহাদের মূল্য খুবই কম। এই সকল সমস্যার দ্বারা সেই প্রাচীন প্রাণ-মনের তলদেশ যে ভাবে

অংকিত হইয়াছে — প্রতিভিন্নার মুখে তাহার যে শক্তি ও দম্ভ প্রকাশ পাইয়াছে শরৎচন্দ্র তাহারই আরতি করিয়াছেন। ইহাই যে সাহিত্যের রস। যাঁহারা সে রসের রসিক নহেন, এবং যাঁহারা সেই বাঙালী-জীবনের সেই ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা সেই একান্ত বাঙালী-প্রাণ ও বাঙালী-প্রতিভার সৌরভে নির্ভাবন হবেন — বিদেশী সাজার ও বিদেশে টিয়াপক্ষির আদর্শে। তাঁহারা বুলিয়া যান যে, যাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের দোষ ও দুর্বলতা বলিয়া তাঁহারা মসীকুঞ্চিত করেন, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকার চরিত্র-মহিমার মূলে আছে সেই সাহিত্যের প্রেরণা স্বরূপ। সকল জাতির মানুষের পক্ষেই সামাজিক বা নৈতিক সংস্কার একটা সাধারণ রূপ আছে; কিন্তু প্রাণের দিক দিয়া যাহা সার্বভৌমিক, প্রাণের দিক দিয়া তাহা এক নহে। এই প্রাণের দিকই সাহিত্যের দিক; শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা সমস্যা-পীড়িত আন্তর্জাতিক নরনারী নয়; তাহা যদি হয়, তবে তিনি সাহিত্য রচনা করেন নাই — সমাজতত্ত্ব লিখিয়াছেন; এজন্য যাঁহারা Karl Marx ও Bertrand Russell, Bernard Shaw ও Aldous Huxley-র মাপকাঠির নীলমোহরের ছাপ দিয়া শরৎ-সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করেন, তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়াই তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বক্তব্য ইহাও নহে; বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই একটি কথাই বলিতে চাই যে, আধুনিক যুগ-সঙ্কটের ছায়ায় পর যুগের বাঙালী-সমাজের একটি প্রাণবান পরিচয় শরৎ-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র প্রাণে-মনে সেই যুগ-যুগেরই মানুষ; তাঁহার রচিত সাহিত্যে আমরা একটা বিশেষযুগের বাঙালী-সমাজ এবং সেই সমাজের শক্তি ও অশক্তির যে মর্মান্তিক লিপিচিত্র পাইয়াছি, তাহাই বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।"

এই উপলক্ষ্যে আমরা একটি কবিতাও উদ্ধৃত করিলাম, কবিতাটি তাঁহার জীবিত-কালে একই জন্ম-তিথি উপলক্ষ্যে রচিত ও তাঁহার সমক্ষেই পঠিত হইয়াছিল, তাই ইহার সহিত ব্যক্তিগত স্মৃতিও জড়িত হইয়া আছে, আজ পুনরায় তাহা পাঠ না করিয়া পারিলাম না। এই কবিতাটি পড়িবার সময়ে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহাও স্মরণ করিবেন যে, বাংলার তারিখে 'ভরা ভাদরের মাস' হইলেও, এই মাসের শেষেই শরতের আবির্ভাব হয়, শরৎচন্দ্রের জন্মতিথিও এই মাসের শেষ-দিন।

আজ তব জন্মমাসে শরতের প্রথম আকাশ
কি নির্মল, গাঢ়-নীল, শুভ্র-শুভ্র মেঘ-অন্তরালে!
জল-ভরা পাকে ধেনু, জল ভরে রক্ত-আলোকাশে,
শুধু রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী — এবে রাখী-পূর্ণিমার মাস!
ধানেও ফুটেছে ফুল, ভরে ভরে ফুটিয়াছে কাশ,
স্বচ্ছ সরসীর জলে পদ্ম হতে উঠিয়া মৃণাল
ফুটিছে পূজার পদ্ম! — তার মর্ম তুমিই শিবাণে,
দিকে দিকে হেরি আজ তোমারি যে বাণীর বিকাশ!

ঋতির — বসন্ত-বিধু, রবি — সে ত' সর্ব-ঋতুময়,
তুমি চন্দ্র শরতের; রশ্মি তব মর্মান্তিক-হায়
এই পৃথ্বী-ধূলিকায়! তব করে লভিয়াছে জয়
তুচ্ছ ফুল — অঙ্গে তার উঠিয়াছে কামনা-পবন!
চন্দ্রালোকে স্নেহে তব বিরহের পূর্ণ পরিচয়—
মানুষের সর্বগ্লানি তব স্পর্শে শুচি ও সরস।

মনোরমা

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

(১)

তোমারি মাঝে তবে যে আমি
হারায়ে তোমারে !
নিজন তব গহন মনে
হারায়ে মনোরমারে।

নিবিড়-নীল স্বচ্ছ-স্নেহে
খুঁজিয়া ফিরে তাহার আঁখি,
কোথায় হায় মেলিয়া পাখা
গিয়া'ও মোর সে নীলপাখী !
ছাড়িয়া কণ্ঠ তার
গিয়াসী কানে পশে না আর,
চেনা-জানা মনও যত
বিদায় মেহ-ভেরায়।

গভীর মমতা-মায়ার-হ্রদে
হায়রে স্নেহ-মরীর ছায়া,
কত-অজানারীতি-ভানে
হারায় মরীচিকার মায়া,—
তেমনি আমি হারায়ে তোমারে,
নিবিড় তব গহন মনে
আমার মনোরমারে।

(২)

কিসির আজ ছন্দবেশে—
তব যামি' চাচর-কেশে,
লুণ্ঠিত করি ললিত তনু,
মিথ্যা টানি' লাটসেশে ;
মেলরা করি' চীনাম্বুক,
ছত্রাকে ভরিয়া বুক,
উদাস করি মায়ামু প্রাণ
কঠিন করি' কোমল হিয়া।

মোরে তাই নয়ন মুদি'
তোমারি মাঝে তোমারে খুঁজি,
খেয়াল-খেলা খেলিতে বুঝি—
দিয়েছে খোয়া কবির প্রিয়া।

(৩)

তব এ লীলা নিঠুরতম,
ফিরায়ে দাও প্রেয়সী মম—
তোমারি সংগোপন মনে
নির্বাসনে কাঁদিছে সে.
ঘনঘা-ঘন বিরহ-ভরে
যে-প্রিয়া তার কবিরে ছলে,
বিরহ-বলা কালে
কবরী নাহি বাঁধিছে সে;
ফোটা ও ঝরা তরুর-কেয়া
বাঁধিছে যার দুখের খোঁপা,
পূরব-বায়ে স্মৃতির খেয়া
গাহিছে যার ব্যথার গান,
তোমারি নিতি ছলছলে
ঝরোয় ছবি-পরশনে
শুধরে মধু মরিয়া তার
ভ্রমর-মুখে মাধবী-পান।

ফিরায়ে দাও সে মনোরমা
যে তব মনে নির্বাসিত,
ডুবিয়া বিস্মরণী-নীরে
মরণে আজও মরেনি সে ত !

(৪)

জানি গো জানি, কবির প্রীতি—
চেউএর বুকে আকাশী চাঁদ,
জানি যে তার প্রিয়ার প্রীতি
রোদের মুখে বাদির বাঁধ।

হেথা যে হবে একা ও একা,
কাহারো সাথী হ'ব না কেহ,
তাহার আগে যাবেক দেখা,—
আমি সে আমি হলনা আর।

হয়ে যে সেই খেয়ার তরে
স্বাপ্‌লা-আঁখি ঘুমিয়া ঘরে,
নিমেষহারা নিমেষ লাগি
তাহারা হ'বে তারকা খুঁজি.

হাজারো যার দেখেছি যারে
আবারো চাই দেখিতে তারে,
স্নেহের দেখা যদি বা থাকে —
খেয়ার শেষ নাই সে বুঝি !

(৫)

দাঁড়া'য় তাই স্টেশন-ফুলে
অকূল দেখা তরোদিয়ে,
পাখর-ভাঙা পাষাণ-ঘাটে—
ভাসিয়ে ঢেউ ঢেউয়ের পিয়ে।
সন্ধ্যাদিদি, তোমারে যেরি
সন্ধ্যা উঠে শিহরিয়া,
লুপ্ত-কাক অন্ধকারী
স্টেশন — সে কি খুনাখেনী !
দুয়ার খোলো, প্রদীপ জ্বালো,
দেখিবে কবি কবির প্রিয়া,—
তোমারি আছে তোমারে, আর
হারালো অনোয়ারের তরে।

খেয়ার খেলার স্নেহ-বিদায়ের রূপটি এ ত' নয়—
সে যে আরো অনেক বয়স — অধিক পরিচয় !
এ যেন সেই আশা-চাওয়া বিশ্ব অভিমানী —
প্রথম-প্রেমের মূল-কাঙালের সোহাগ-সুখের বাণী !
এ যেন সেই কিশোর-কালের বুলাবেলার সাথী,
—ভরা-ফুলুর ছিল যখন পূর্ণিমারি রাতি !
ছিল যখন বুকের মাণিক যাদুর হাতে গাঁথা,
পাল দু'খানি বদলে হাতে বুজত চোখের পাতা ;
মুখখানিতে আঁচল দিয়ে দু'পিয়ে-ওঠা একটু অভিমানে—
ফুটত হাসি কেন্‌মি আবার একটী চুমার পরে।
এ যেন সেই দীঘির জলে দকালবেলার ফুল,
যৌটায় যেন তার সহে না—পাপ ছিঁড়ে আকুল !

— বিশ্বরথী

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

Certainly nearly every great book of any feeling is largely autobiographical, not in precise detail, but in its manifestation of the author's attitudes and reactions to life

— ETHEL MANNIN.

ভূমিকায় বলিয়াছি, শ্রীকান্ত ও শ্রীকান্তের লেখকের মধ্যে একটি গূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ আছে; ইহাও বলিয়াছি, ঐ উপন্যাসখানি এক অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনীই বটে। কিন্তু তাহা ঘটনাবিন্যস্ত জীবন-বৃত্তের মত নয়। পাঠকগণের জন্য উপন্যাসের আকারে লিখিত হইলেও, উহা কতকটা আপনার মনোই আপনাকে দর্শনের মত। এই আত্মদর্শনের ভঙ্গিটি সাহিত্যে অভিনব নূতন—আপনাকেই দেখা বটে, কিন্তু তাহাতে এমন একটা আত্মনিরপেক্ষতা আছে যে, সে যেন অপর কাহাকে দেখার মত; উপন্যাসের অপর সকল নরনারী সম্বন্ধে একটা অতি তীব্র ঘাতন-সচেতনতা আছে, কিন্তু শ্রীকান্ত নিজের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য অকপটতা ও বিচারবিমুখতা—এমনকি, যেন সজ্ঞানতার অভাব রক্ষা করিয়াছে। সে যে নিজে কি—কেমন মানুষ, নিজের শক্তি ও অশক্তি, দোষ ও গুণ মিলাইয়া একটা কেমন ধারণা দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কোনরূপ আত্মপ্রচার নাই, কোন কৈফিয়তও নাই। আত্ম-চেতনা আছে, আত্মপ্রকাশ বা আত্মোদ্ঘাটন আছে, কিন্তু তাহার কোন ব্যাখ্যা বা মর্মসন্ধানের প্রবৃত্তিমাত্র নাই। ইহা যেইরূপ confession, যাহাতে মানুষ শুধুই ইহাই বলে, আমার জানেশুনে আর যা যা দোষ ছিল, আমার অন্তরের ভাব-অভাবগুলা আমি যতদূর সম্ভব খোলসাভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাতে পরে বুঝিয়া লও, আমি কেবল আমাকে তোমাদের সম্মুখে ধরিয়াছি—আমি নিজেকে যেমন দেখিয়াছি অর্থাৎ অনুভব করিয়াছি, তেমনই দেখাইয়াছি; বুঝিবার চেষ্টা করি নাই,—সে চেষ্টা করিলে বুঝানো হইত, দেখানো হইত না। ইহাকে যদি আত্মকাহিনী বলা যায়, তবে শ্রীকান্ত সেইরূপ আত্মকাহিনী। এইবার ঐ উপন্যাসখানির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ভূমিকা করিয়া রাখিব।

প্রথমতঃ ইহাতে গল্প বা উপন্যাসের মত কোন আখ্যানমূলক প্লট নাই; লেখক ইহাতে তাঁহার নানাবের জীবন-ঘটিত কতকগুলি বিভিন্ন স্মৃতিকথার একটা সংকলনমাত্র বলিয়াছেন, সেই বৈসদৃশ-বিভিন্ন স্মৃতিগুলির কালক্রমিক একটা সূত্রে নূতন করিয়া গাঁথিয়া দিয়াছেন। এই সূত্রটি কি? যেন বুঝিতে পারা যায়, একটি অতিশয় স্পর্শকাতর এবং তীব্রভাবে মানব-মন ও মানবজন্ম একটি বিশিষ্ট প্রকৃতির

ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবন-পথে যাত্রা করিয়াছে; বাহিরের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা এবং ভিতরের কতকগুলি বাসনার দ্বন্দ্বের মধ্যে, সেই যাত্রা—জীবনের দ্বন্দ্ব-সঙ্কটে সেই যে ক্রমবর্ধমান অভিঘাত—তাহা ক্রমশঃ ঘটনা ও পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, ইহাই ঐ কাহিনীকে একটি বেগবান গতিময় রূপ দান করিয়াছে। দ্বন্দ্ব সঙ্কটের হয়, তাহার সমাধান হয় না—ইহাও আমাদিগের মনকে উৎসুক করিয়া রাখে। সুতরাং কতকগুলি ঘটনা ও চরিত্র; আমাদিগকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণগুলি কাব্যের মত উপভোগ্য; রস থাক বা নাই থাক্, এগুলি উপন্যাসেরই উপাদান বটে, এবং পৃথকভাবে চমৎকৃত করিয়া থাকে। তবু না থাকিলেও ঐ নায়ক-চরিত্রের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাই একখানি ছোটের মত অবিন্যস্ত ঘটনারাশিকে একটি মালার আকার দান করিয়াছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হইয়াছে এই যে, ঐ নায়কের চরিত্র খুব স্পষ্ট ও সুদৃঢ় আকার লাভ করে নাই, তাহার কারণ পূর্বে বলিয়াছি। অন্যান্য চরিত্রগুলি যেমন তাহাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিধির মধ্যে আপনাপন পক্ষিতা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে—তার কারণ লেখক সেগুলিকে আপনার বাহিরে অভিনয় সজ্ঞান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়াছেন—নায়কের চরিত্র তেমনই আমাদের দৃষ্টিকে ক্রমাগত এড়াইয়া যায়। সুতরাং কাহিনী হিসাবে ইহার অন্তরালে যে একটি ঐতিহ্য আছে তাহাও নায়কের চরিত্র নয়। একটা বিশিষ্ট সমাজ, কতকগুলি নূতন সংস্কার, এবং তাহারই কারণে বা তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে—সেই সমাজেরই শক্তি ও অশক্তিসূচক যে কয়েকটি নারনারী নায়কের জীবনপথে আবির্ভূত হইয়াছে—তাহাদের পরিচয়ে বা সংঘাতে তাহার যে চিত্রমূল্য—এই কাহিনী তাহারই কাহিনী। নায়কের কোন কার্য বা ঘটনাটির চরিত্র নয়—তাহার সেই বিষয়, তাহার শ্রদ্ধা, তাহার ক্রোধ এবং তাহার দুর্বলতা দয়াদৃষ্টি—দুঃখের রসে ও বিষাদ—এই কাহিনীকে একটি বিশিষ্ট রূপদান করিয়াছে। সেই সকল বিষয়ে নায়কের এমন কোন নিজস্ব বিশ্বাস, বা দৃঢ়তা, বা নীতিনিষ্ঠা প্রকাশ পায় নাই, তাহার জীবনে এমন কোন স্বার্থ বা নিঃস্বার্থের প্রাবল্য প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে একটা চারিত্রিক ব্যক্তির ফুটিয়া ওঠে। যেখানে তাহার যেটুকু কর্মোদ্যম দেখা যায় তাহা সেই অংশের সেটুকুর জন্য; তাহার প্রতি গভীর অনুকম্পার মধ্যেও একটা বৈরাগ্য রহিয়াছে। অতএব, এই কাহিনী যদি একটা ব্যক্তি-চরিত্রের কাহিনীও হয়, তাহার কোন চরিত্র-গৌরব নাই। এই জন্যই, ইহার নায়ক যেমন একদিকে কাহিনী-কল্পিত নায়ক নহে, তেমনই আত্মকাহিনীবিশ্লেষণের সেই নায়ক বা লেখক আপনাকে একটা চরিত্ররূপে দেখে নাই; অন্য চরিত্রগুলির সম্বন্ধে যেমনই হোক, নিজ চরিত্রকে সে সেরূপ সজ্ঞানতা বা সমালোচনা হইতে মুক্তি দিয়াছে। কাহিনীর এই ত্রুটিটি সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়। পরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই কাহিনীর মধ্যে লেখক নিজেও কিছু কিছু সজ্ঞান আত্ম-সমালোচনা করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, এগুলি নায়ক শ্রীকান্তের কথা নয়, শ্রীকান্তের নামে লেখক শরৎচন্দ্রের কথা। এগুলি যে-কালের মধ্যে লেখকের শ্রীকান্ত-জীবন গড়া হইয়াছে—লেখক তখন সেইগুলির মধ্যে দৃষ্টিপথে বিচরণ করিতেছেন। তখন অন্তরের সেই সাক্ষাৎ-অনুভূতি ও বর্তমানের এই সমালোচনার মধ্যে একটা ব্যবধান রচিয়াছে—দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু তবুও সেই স্মৃতিগুলি এমন সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আমরা ছবিটিকে পৃথক করিয়া লইতে পারি, মূল শ্রীকান্ত ও লেখক শ্রীকান্তকে—একজনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং

অন্যের পরোক্ষ চিন্তা বা তর্ক-সংশয়গুলিকে — বিযুক্ত করিয়া লওয়া দুরূহ নয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, এই আত্মকাহিনীরও দুইদিক বা ধারা আছে, একটি — অজ্ঞান বা প্রত্যক্ষীভূত আত্মোদ্‌ঘাটন; অপরটি — সজ্ঞান সমালোচনা। আমরা দেখিতে পাইব, আত্মকাহিনী হিসাবে ঐ প্রথমটিই মূল্যবান, সেইখানেই লেখক নিজের অজ্ঞাতসারে আত্মপরিচয় দিয়াছেন; অপরটিতে যে সজ্ঞানতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আমাদের পরিচিত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক আত্ম-পরিচয় — তাহা অন্যান্য বিধি ও রাজনীতির শরৎচন্দ্র নয়; যদিও সে শরৎচন্দ্র কখনো ঘরে নাই, কেবল অন্তরের অন্তরতমে নির্বাসিত হইয়াছে, এবং সেইখানে সে এক অজ্ঞান-সুপ্ত আত্মচৈতন্যের নেপথ্য বিধাতা হইতেছে। কখনো রাজলক্ষ্মী কখনো কমললতার পানে চাহিয়া সে বুঝিতে পারিতেছে যে, সে চিরদিনই একটা 'অঘটনের'; তাহার কোন বন্ধন নাই, তাহার হৃদয় কখনও সত্য-কার আশ্রয় চাহে নাই, সর্বপ্রকার জীবনকে সে ক্ষয় করিয়াছে; তাহার বাসনা-কামনায় একাগ্রতা নাই, জিজ্ঞাসারও আদি-অন্ত নাই। এক কথায় সে কিছুরই শেষ চায় না — অন্ধকারেরও নয়, সংসারেরও নয়। শেষ মানেই অস্থিরতার অন্ত, একটা কোন স্থানে বসিয়া পড়া। ইহাই তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এ কাহিনী অসমাপ্ত থাকিয়া যাওয়ার কারণ এই যে, শ্রীকান্ত হইতে শরৎচন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়ার সেই ইতিহাস — অবচেতন হইতে সজ্ঞানে, অতৃপ্তি হইতে তৃপ্তিতে, সমাজ-সংসারের বহির্দেশ হইতে তাহার ভিতরে — সেই যে গভীরতর, তাহা আর শ্রীকান্তের কাহিনী নয়, — তাহা নিশ্চয়ই থাকিবে, তাহা শরৎ-চন্দ্রের জীবনবৃত্ত হইতে পারে, শ্রীকান্তের নহে। কিন্তু এখানে সেরূপ কথা অপ্রাসঙ্গিক।

আমি বলিয়াছি, এই কাহিনীতে দুইটি ধারা বা ধারা আছে; একটা লেখকের আত্মজীবন বা আত্মচরিত, আর একটা সেই জীবন সম্বন্ধে চিন্তা বা তাহার সমালোচনা। প্রথমটি আত্ম-প্রকাশ, দ্বিতীয়টি আত্মচিন্তা; আত্মপ্রকাশের মধ্যেই যে আত্মদর্শন আছে তাহাই আরও সত্য, আরও গভীর; আত্মচিন্তায় সেই চেতনা আর নাই, সেই অপরোক্ষ অনুভূতি আর নাই। আমি ভূমিকায় বলিয়াছি, যে-মুহূর্তে মানুষ আপনাকে সজ্ঞানে চিন্তা করিতেছে সে মুহূর্তে সে আপনাকে সাক্ষাৎ-দর্শন করিতেছে না, সে আর সে নাই; অথচ ঐ রূপ সজ্ঞান বিচারবুদ্ধি বাহিরেকে মানুষ আপনাকে বুঝিবে ও বুঝাইবে কেমন করিয়া! এইরূপ প্রকৃত আত্ম-পরিচয় দেওয়া একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এই গ্রন্থে তাহা সম্ভব হইয়াছে একটি বৈত কারণে, একটি ধারার নিম্নে যে আর একটি ধারা বহিতে পারিয়াছে, তাহাতেই ঐ ধারা কতকটা অপসারিত হইয়াছে। নায়ক শ্রীকান্ত ও লেখক শ্রীকান্ত সর্বত্র এক হইয়া নাই, তাই মনটা একদিকে এবং প্রাণটা — অজ্ঞান আত্মানুভূতিটা — আর দিকে থাকিয়া পরস্পরকে স্বাধীনতা দিতে পারিয়াছে। এজন্য এই কাহিনীর অন্তরঃ একটা অংশে আমরা সেই মূল শ্রীকান্তকে কতকগুলি সত্যের চিনিয়া লইতে পারিব। শক্তি ও অশক্তি, মোহ ও দুর্বলতা, লোভ ও ত্যাগ, সংস্কারের বশ্যতা এবং তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এ সকলই তাহাতে অকপটে প্রকাশ পাইয়াছে; এই যে স্ববিরোধী মনোভাব, দুই বিরুদ্ধ আদর্শের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, ইহার জন্য কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই। এই সকল কারণে সন্দেহ মনে থাকে না যে, ঐ কাহিনী লেখকের নিজেরই অন্তরঙ্গ-জীবনের কাহিনী, উহা পরের কাহিনী নয়, শ্রীকান্ত একটা ঔপন্যাসিক চরিত্র নয়।

তাহা হইলে, অপর চরিত্রগুলিও কি কিছুমাত্র কল্পিত নয়! এ সম্বন্ধে পূর্বে ভূমিকায় কিছু বলিয়াছি। বাস্তবের চক্ষু ও হৃদয়ের দৃষ্টি যখন পরস্পর পরিপূরক হয়, অথবা যখন বাস্তবকেই জোর করিয়া তাহার অন্তর্গত সেই ভাব-সত্যকে আত্মা

জীবনের সেই গভীর নিগূঢ়তার কথা জানে। সে যে আসলে 'অন্তর্মুখী', তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই—কোন ঘটনাই যে তাহার জীবনে সহজভাবে বাহির হইতে পারে না, অন্তরে সে-জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি—তাহার আভাস ঐ নারীর মুখে পাইয়া সে কিছুতেই প্রতিবাদ করে নাই; সে তাহা স্বীকার করিয়াই লইয়াছে। এ সকল তাহার জীবনের পক্ষ হইতে ন হিন্দে না, অন্তের বক্ষ বা আটের বিষয় হইয়া থাকিবে। রাজলক্ষ্মী তাহার জীবনব্যাপী খেলার এক অন্তিম মুহূর্তে ঐ যে অবিশ্বাসী করিল, তাহা কাহার প্রতি শেক্সপীয়রের সেই অভিশাপ-বাণী নয়; তাহার কোন অভিমান বা অভিযোগ নাই; সে কেবল নিজ জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিকে যেন বাহির দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছে—শ্রীকান্ত সেই নিয়তিরই একটা অবয়বরূপ; খেলার হিসাব-চেতনায় সে কেবল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে মাত্র—"like some bold seer in a trance, seeing all his own mischance"। তাহার তলানীন্তন মনোভাবে বিশ্লেষণ করিলে আরও কত কি পাওয়া যাইবে: শ্রীকান্তের প্রতি একটি অপূর্ণ মমতাও তাহাতে আছে; তার কারণ, নিজ জীবনের কোন পরিণাম-চিন্তা শ্রীকান্তের নাই বলিয়া যে ব্যর্থতাবোধও নাই, রাজলক্ষ্মী সে বোধ আছে, তাই এই মানুষটির প্রতি তাহার মমতার অন্ত নাই। এই যে একটি দৃশ্য বা ঘটনা এই কাহিনীর একস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা ঔপন্যাসিক প্রয়োজনে ও নহেই, কোন প্রয়োজনেই নহে—এ চরিত্রও যেমন, ঐ দৃশ্যটিও তেমনই, একটা অবাধ এবং অকারণ আবির্ভাব—কল্পিতও নয়, ঐতিহ্যও নয়; বাস্তবতার সেই পূর্ণ-লক্ষণ ইহাতে আছে। অকারণ এই জন্য যে, শ্রীকান্তের এত অন্তরঙ্গ হইয়াও, এ কাহিনীর এতখানি অংশ গ্রহণ করিয়াও, নায়কের চরিত্রে বা জীবনে রাজলক্ষ্মী কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই। তবে ঐ চরিত্র, রূপে রঙে ও রেখায় এত দূরে এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কেন? তাহার কারণ, শ্রীকান্ত ইহাতেও দেখিয়াছে; অন্নদাদিদি ও কমললতার মত এ চরিত্র, আর একদিক দিয়া আর এক প্রকারে তাহার অন্তর্দর্শনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

তাই এইরূপ আত্মজীবনসংলগ্ন নয়, অপেক্ষাকৃত নিঃসম্পর্কিত অনেক নরনারীর কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে—কতক দেখা, কতক শুনা বা শোনা। সেখানে শ্রীকান্ত দর্শকমাত্র। ইহার অধিকাংশ যদি অভিজ্ঞতা-প্রসূতও হয়, তথাপি সেই আত্মকাহিনীর অন্তর্গত নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সেখানে মানুষ শ্রীকান্ত অপেক্ষা লেখক শরৎচন্দ্রকে আমরা বিশ্লেষণে পাইয়া থাকি। অনেক স্থলে তিনি বাস্তবকে নিজ ভাবুকতা ও ভাবপ্রবলতার বলে হয় ত অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, আবার কোথাও বস্তু ও চরিত্রবিশ্লেষণে দুর্বলতা বা ইপ্সিতের বিকৃতি, আমাদের অন্তশ্চক্ষুর গোচর করিয়াছেন। এ সকলই এ কাহিনীর সেই আর এক দিক বা রহস্যের কথা আমি যাহার উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে শ্রীকান্তের আত্মহারা আত্মপরিচয় নাই—পরবর্তীকালের লেখক শরৎচন্দ্রের, শিল্পী শরৎচন্দ্রের মানসিক আত্মবিবেচনা আছে। এই আলোচনায় আমি সেই দুই দিক দেখিব, কিন্তু দুইটিকে সর্বদা পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিব।

এতক্ষণে, বোধ হয় আমি শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কি বুঝি ও বুঝাইতে চাই তাহার কিছু আভাস দিতে পারিয়াছি। আমি যে খাঁটি সাহিত্যিক প্রমাণের উপরই নির্ভর করিয়া ঐ শ্রীকান্তবর্তী শরৎচন্দ্রের আত্মপরিচয় কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য; এই প্রমাণ ঘটনা বা তথ্য-প্রমাণের মত অকাট্য হইবে না—হইতে পারে না। ইংরেজীতে যাহাকে internal evidence বলে ইহা কতকটা সেইরূপ, তথাপি ইহা তত্ত্বখানিও যুক্তি-সিদ্ধ নহে, কারণ প্রমাণটা মূলে তাহলেও, চিরাগত

নহে। পাঠক-পাঠিকাদিগকে সেই ভাবভূমিতে একটু তুলিয়া ধরিতে পারিলেই আমাকে আর বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। এজন্য, আমি নিজে যেমন করিয়া, কি ভাবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম, সে কথা বলিব। সমস্ত কাহিনীর প্রায় শেষে আসিয়া সহসা বিহ্যুৎচমকের মত ঐ সত্য আমার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তখন আমার আর সন্দেহ রহিল না যে, এ কাহিনী আত্মকাহিনীই বটে; উপন্যাসের আবেষ্টনে একটী স্থানে সেই আবরণ মুক্ত হইয়া গেল, আমার এমন একটি আর্ত্তস্বর এমন গভীর অথচ এমন ম্রিয়মাণস্বরে আর কোথাও ধ্বনিত হইতে শুনি নাই। তখন বুঝিলাম, এই উপন্যাসের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বর্ণনা, সকল ঘাত-প্রতিঘাত, সকল ঘটনা ও সকল দৃশ্যের অন্তরালে একটি মানুষই দাঁড়াইয়া আছে; সে মানুষ কেবল একটি কথাই বলিতে চায়, কিন্তু কিছুতেই বলিয়া উঠিতে পারিতেছে না,—সেজন্যই পারেও নাই, হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। পরের কথা সে ভাল করিয়া বলিতে পারে—আপনার কথা তেমন করিয়া বলা যায় না; তাই উপন্যাসের ভঙ্গিতে সে সেই কথাটাই নানা ছলে বলিয়াছে—পরের কাহিনীতে নিজের প্রাণকেই মুক্ত করিয়াছে। তথাপি এই শেষ পর্ব্বে সেই আবরণ আর নাই, এখানে আত্মকথা ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহারই একস্থানে ঐ আর্ত্তস্বরে আমি চমকিত হইয়াছিলাম—এক নিমেষে সমগ্র মানুষ ও তাহার সমগ্র জীবনকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহা এমন একটা human document যে, ইহার মাঝখান হইতে পারে না। আমি সেই স্থানটিও উদ্ধৃত করিতেছি, জানিনা পাঠক-পাঠিকাগণ ইহাতে আমার মতই সেই চমক অনুভব করিবেন কি না। কমলের জীবনে কোথাও হৃদয়ের আশ্রয় মিলিল না; কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, অথচ একটা কিসের যেন শূন্যতা, একটা বিরাট নৈরাশ্যের বেদনা তাহাকে বিধুর করিয়া তোলে। জীবনের সর্ব্বত্রই নিষ্ফলতা, সর্ব্বত্রই ফাঁকি; ধর্ম্ম ও চর্চ্চা, কণ্ঠের আত্মপ্রকাশ এবং মহতের আত্মনিগ্রহ, স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের সকলই পরাস্ত—জীবনের বাস্তব রূপ ও চাহি। শ্রীকান্ত একদিন হঠাৎ তাহার জীবনের সেই দুঃখকে যেন প্রত্যক্ষ করিল; একটা বৃহত্তর বিচ্ছেদ, সার্থকতম নিষ্ফলতা সেই শূন্যতা-বোধকে এমনই তীব্র তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিল, যে সহসা তাহার চতুর্দ্দিকের সর্ব্বস্ব সেই হাহাকারের প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। বাহিরে সেই অচিন্ত্য বাক্তিসত্তার অনুভূতি যেন বিষাদে হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু ঐ ভাবটাই নয়, উহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ, তাহা বাস্তব; উহাতে ভাব-কল্পনার লেশ নাই—প্রাণের সহজই আছে। এইবার আমি সেই স্থানটি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

> রাত্রি সাড়ে আটটা-নয়টার পরে একটু খোলা জায়গা, অন্ধকার হয়ত' একটু গাঢ় হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃত-প্রায় পরিচিত ভাবি একটা মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিকে ওদিকে চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল; বাঃ! এরে আমাদের সেই বকুল-বৈকালীর আটশ ফুলের গন্ধ!...উহার নীচে ছিল বকুলের স্বামীর সমাধি। এই আটশ গাছের একটা শুকনো ডালের উপর কাপড় দিয়া ছাকিয়া করিয়া বকুল সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত।...
>
> চোখে পড়িল গাছের একধারে আর একটি ছোট মাটির ঢিপি—বোধ হয় বকুলেরই হইবে,...বিছুটি ও বন-চাঁড়ালের মাঝে মাঝে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, যত্ন করিবার কেহ নাই।
>
> দেখি, সন্ধ্যা-দেওয়া সেই পাঁশটে আছে নীচে পড়িয়া, এবং তাহারই উপরে সেই শুকনো ডালটি আছে আজও তেমনি হেলে-ছেলে কালো হইয়া।

কুড়ি-পঁচিশ বর্ষ পূর্বের কত কথাই মনে পড়িল। কবির বেড়া দিয়া ঘেরা, নিকানো-নুছানো উঠান, আর সেই বয়বাবি। সে আজ এই হইয়াছে! কিন্তু এর চেয়ে ঢের বড় ঝড় তখনও দেখা বাকি ছিল। অকস্মাৎ সেই ঘরের মধ্যে হইতে ভাঙা-চালের নীচ দিয়া একটি কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল।...

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস? প্রত্যুত্তরে সে কেবল মলিন চোখদুটা মেলিয়া অতীব নিরুপায়ের মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে হোসেন কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। মুখ-কাটা রাঙা পাতের সেলাই-করা বক্লস এখনও তার গলায়। নিঃসন্তান রহমীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত বস্তিটার মধ্যে কি পাইয়া যে আজও টিকিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। অর্দ্ধাশনে অনশনে এখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে — যে তাহাকে একদিন ভালবাসিত!" মনে মনে বলিলাম, এই কি এমনি? এ প্রভাশা বুকিয়া বেলা সংসারে এমনই কি সহজ?...

যাবার পূর্ব্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটা একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম।...পাশের কুলুঙ্গিতে তেমনি ধুলিমায় পড়িয়া আছে সেই ভাঙ্গা হাঁড়িটি।...মনে হইল, বাড়ীর একতোলে এ যেন মৃতপিতার পরিত্যক্ত খেলাঘর।...

কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আসিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম, সে বেচারা একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, স্নেহও এইখানে, তবু আজ বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বস্তুহীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙাঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উহাদের কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অত্যল্প সময়ের জন্য কুকুর ছিতরটা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চোখের জল আর লামলাইতে পারি না, এমনি দশা।

এখানে আমরা কাহাকে দেখিতেছি? ঐ শ্রীকান্ত যে? ঐ বিজন বনে মনুষ্য-শিশুর ঐ পরিত্যক্ত খেলাঘর, মানুষের মধ্যেই যাযাবর হতভাগ্য ঐ কুকুর পশু — এই সকলের মধ্যে যে নিজ জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আর আত্মগোপন করিতে পারিতেছেনা, সে এখানে কাহার জবানীতে কথা কহিতেছে! ঐ দৃশ্য, ঐ ঘটনা কি একটা ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য কবির উদ্ভাবনা মাত্র! না, ঠিক ঐ প্রতিবেশ এবং ঐ মুহূর্ত্ত একটা পরমক্ষণের মত, অদৃষ্টের মত আবির্ভূত হইয়াছে? ঐ যে কুকুর ছিতরটা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ঐ কান্নার জন্য ঘটনাটি উদ্ভাবিত হয় নাই, ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বলিয়াই এমন কান্না সম্ভব হইয়াছে। আমি উহাই চকিতে অনুভব করিয়াছিলাম; এখানে যে একান্ত ব্যক্তিগত বেদনা কলমুখে নোঙ্গরের মত অনিবার্য্যবেগে নির্ণয় হইয়াছে তাহাকে সন্দেহ করিবার উপায় নাই; সমগ্র 'শ্রীকান্ত' যে বিরহ-ব্যথায় কাঁদা, সেই বিরহ যাহার— সেই মানুষ ঐ একটি মুহূর্ত্তে, ঐ পরিবেশের মধ্যেই আপনার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছে। এই প্রসঙ্গের আরম্ভে লেখক নিজেও শ্রীকান্তের জবানীতে বলিয়াছেন — "একটা নিজেও তীব্রতায় তীব্রতায় সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিতে পারে;" আমরা বলি, অতিক্রম নয় — উদ্ভাসিত করিতে পারে। কথা-উপন্যাসের

যদ্যে কবি যেমন সময়ে সময়ে নায়কের মারফতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করিয়া লন, তাহাতেও একরূপ তৃপ্তি হয়,—ইহা তেমন নয়, কারণ সেই নাটকীয় আট এখানে নাই; ইহা একান্তই আত্মনিবেদন, এবং তাহাও যেন অপরের নিকটে নয়, নিজেরই নিকটে—এ জন্যই নিঃসঙ্গ আত্মার নিরন্তর আর্তরব।

(ক্রমশঃ)

নিশি কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিষয় কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা পুরু মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্মের প্রেরণা আমাদের নাই; সকাই করিয়া হাটে-পুকুর করিয়া, সংসারের শতলক্ষের ঘাড়ে চড়িয়া ঘরিবার সাধও নাই। শুধু কবি একটা বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ, কলমের ডগায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে—সে ঐ দুরাগীপুরের দশটা দিনের দৃষ্টির আলোকনে।

শরৎচন্দ্র (শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব)

মৎস্য-পুরাণ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

ঝিঙেকে তাড়াতাড়ি কাশী হইতে ফিরিতে হইল। অবশ্য বেশী দিন থাকিবার উপায় ছিল না; কন্যা দুবলাকে শ্বশুর বাড়ী হইতে আনিয়াছে, আট মাস অন্তঃসত্ত্বা; দাবকা হইয়াছিল, এই পূর্ণিমা, আসের পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণ, দাদাটা সারিয়া আসিবেন, খবর গেল দুবলা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে।

খুব খানিকটা হৈ-চৈ লাগাইয়া দিলেন। প্রথম ঝোঁকটা গিয়া পড়িল স্বামীর উপর,—"কেন, খবরটা এখন না দিলে চলত না?—বয়স হয়েই গেল। মাঠে তো পড়ে নেই, বৌমারা রয়েছেন, পাশের বাড়ীতেই অমরের মা আছে।···তা নয়, ও কুটুম্বৈলনা···কষ্ট! তিথি বসবে? সেরেস্তান? ···করো সেরেস্তান!···"

স্বামী অমৃতলাল হাসপাতালা লোক, খানিকটা প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বাইরে পেয়াদা-চাপরাশীর দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

ঝোঁকটা গিয়া মেয়ের উপর পড়িল—"তোরেও বেন ধাপু ভর সয় না. দুলোর মাস্ দুটো মাস, একটা মাসও তো সবুর করে থাকতে হয়—, না হয় দিন কুড়িও···" মেয়েটা বলিল—"ঠাকুরঝির কি দোষ মা? হাত তো নেই নিজের···"। "হাতের কথা হচ্ছেনা, মা, আক্কেলের কথা হচ্ছে। যাবার সময় দিলে দুলে—'তুমি বসছ, তবে আমার হাত পা আসছে না মা'।···যাও, কলল তো পিছু ডাকো।" কন্যা বলিল—"তা সেরেস্টা বয় তেরোই আসছে···" "সেরেস্টা তো ওদিকে আসত না মা আমার কখনো, আসত কি?—বলো না।"

মার তর্ক কেউ করে না, তবু শরীরটা দুর্বল আর অবস্থাটা অসহায়-গোছের, মেয়ের চোখটা ছলছল করিয়া উঠিল। মিনি বলিলেন—"ঐ যাও, চোখ জলভরিয়ে উঠল মেয়ের। তর্ক করতে জানবা যখন তর্ক করতে এল কেন বা? কি অন্যায়টা বলেছি? মিনি মেয়ে তোমার লম্বা লম্বা পা ফেলে দশ মাসের পথ আট দশ দিনে হেঁটেছেন বলে' আকাশের দেরীও তো কই পাও।"

বকাবকির মধ্যেই সব গুছাইয়া সুছাইয়া কাপড় ছোপড় ছাড়িয়া আসিয়াছেন, চোখের জলে ঠাণ্ডাও হইয়াছেন, আদুরুদরের ঘোরের মাঝে বলিয়া হাত দুইটা বাড়াইয়া বলিলেন—"দাও দিকিনি, দেখি।"

কন্যা কাঁখার জড়াইয়া তুলিয়া দিল।

নাতনি হাতে পাইয়া মনটা সরসও হইল। "এলেন দাদীন আমার! একটু যে তিথি-ধম্ম করব তা আর সইলনা! কেন, এবার তো তিথি-ধম্মই পলো আমার; নতুন সোহাগ নিয়ে নতুন বাবনী এলেন, আর কি আমার ঠাঁই আছে!···তা রূপ নিয়ে জন্মেছে তোর মেয়ে দুবু, বাপের, কী রঙের ছুসুন! কী চোখ! কী নাক! তোর মায়ের অমলল এবার মঙ্গলে দুবু···"

কন্যা পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল, একটু লজ্জা-সরমের দৃষ্টিতেই আঁচে চাহিয়া লইয়া ভাসিনেয়র সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"অত ভবর করে না মাতনির; আমার মায়ের পায়ের মধ্যে সমানও যদি হোত তবু!···"

"দেখিস্, দেখিস্, আসে বড় রোগে যে মাতনিকে আমার, তখন বলিস। মা তখন বেঁচেই থাকবে না যে মাতনির ঘরে কলকা করবার ঘরে!...কোথায়, সে দিকিনি হেলের বাটিটা, বাখিয়ে দিই কেন; ছকলে ভেলা, তবুও যেন খড়ি উঠছে গায়ে মেয়ের! এখন

মেয়েই আছনিকা হয়েছেন। সৌখিনী!...দেখাচ্ছি এই সৌখিনী তোমায়"

মেয়ে বলিল—"তেল কোথায় পাবে লোকে মা?"

"তেল কোথায় পাবে মানে!"—গিন্নি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কর্ত্তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

"ওমা, তুমি যে খানেকটা দিন বাইরে গিয়ে নতুন লোক হয়ে এলে গো! তেল কোথায় দেবে?"

"সে কি! তেল পড়ছে না গায়ে!...কচি শিশু, তাও আবার আটমাসে, সুদ্ধো দশটা মাস মায়ের পেটে থাকতে পেলে না, গায়ে একটু তেল না পড়লে বাঁচবে কি করে? তোরা অবাক করলি যে গো!...বউমা!"

মেজ বউ আসিয়া দাঁড়াইল।

"এদিকে শুনছি? মেয়ের মাথায় নাকি তেল নেই?

"তেল তো সহরে নেই মা, দেশে নেই; তুমি মাথার মুখে শুধু দিটে-কৌটা পাওয়া যাচ্ছিল, এখন যাও..."

গিন্নি স্থির হইয়া উঠিলেন আবার, ভালো করিয়া বুঝিয়া বলিয়া বলিলেন—"এমন একটু তেল পাওয়া যাচ্ছে না যে শিশুর গায়ে দেওয়া যায়? কেন, মারা তো হচ্ছে সবার স্বাস্থ্যের জন্যে, তার জন্যে তো তেলের অভাব হয় না!..."

"কোথায় মা? চিনের তেলে একটু দাঁতলে কোন রকমে চালানো হচ্ছে। জাজাবুড়ি, যাক—এসব তো একেবারে বন্ধ।"

"উফ করছে জানলা খুলে তাও কোরনা বাছা; মারা হচ্ছে বলে ঐ একরত্তি শিশুর গায়ে আমি চিনের তেল তো মাখাতে পারি না, শক্ত নয় তো! ডাকো ডাক্তার, তেল আমার চাই যেখান থেকে হোক..."

মেজছেলের ছোটমেয়ে গিন্নির ছুটিয়া গিয়া কর্ত্তাকে খবর দিল—"ঠাকুরদা ডাকছেন।"

বাহির হইতে প্রত্যেকটি কথা শোনা যাইতেছিল, কর্ত্তার ঘুম ঢিপ-ঢিপ করিতেছিল, ঘন ঘন তামাক টানিতেছিলেন, নাতনির ডেটা করিয়া যাক দিয়াইয়া চোখ পাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কে ডাকছে!... ইস্!"

"ঠাকুরদা। যাঃ, আমি কি করব?"

"যা, এখন আসতে পারবে না, তামাক খাচ্ছে। ইস্!"

গিন্নিটি ঘুরিয়া ছুটিতেই আদিলেন—"কোথায় চললি? শোন্।" কলিকাটা নামাইয়া হাতে দিয়া বলিলেন—"একটু তামাক সেজে রাখ্, একটু বেশি করে'।...বলনাম তো অমনি ছুটলেন মেয়ে মালিশ করতে!" মুখের পরিণামের জন্য এই যাবতীয় করিয়া গরগর করিতে করিতে উঠিলেন—"ইস্' তীর্থ কেউ করে না! যেন মাথা কিনে"

—চৌকাঠ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলা মিলাইয়া গেল।

গিন্নি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"কি বলছে এরা? খুকিকে মাখাবো এমন একটু নাকি তেল নেই—এ কি কাণ্ড!"

মেজবৌ কাছে দাঁড়াইয়া, কর্ত্তা যতটা সম্ভব গাঢ়স্বর করিয়া লইলেন, বলিলেন—"নেই তেল তো বলবে আছে"

—অবশ্য স্বরটা তুলিতে পারিলেন না।

গিন্নি বলিলেন—"শোন বউমা, উত্তরটা শুনে রাখ একবার।...ঐ কথার ঐ উত্তর হোল? নেই তেল তো তার ব্যবস্থা করতে হবে না!"

"কোথায় করব!"

গিন্নি ক্ষেপে-বেক্ষনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তাও যদি আমারই বলে দিতে হয় তো তুমি বাড়িতে ঘোস ঘোসটা টেনে, আমি কাজা কোঁচা এঁটে বেরুই।...ওসব কথা শুনব না, তেল চাই; নৈলে ঐ দশদিনের মেয়ে শুদ্ধ, পোয়াতিকে পাঠিয়ে দাও তার বাপের বাড়ি, তাদের মেয়ে তারা ব্যবস্থা করবেই একটা; 'কোথায় পেব' বলে পেয়ারাতলায় বসে বসে

তামাক টানবে না। দাও পাঁইরে, ছেলের অন্নপ্রাশনে আমি ছেলেটাকে মেরে ফেলতে পারব না।"

সেজবৌ বিরক্ত হইল,—বিজ্ঞানের হাসি, প্রশ্ন করিল—"কি, হয়েছে কি? ছেলের কথা কি হচ্ছে?"

"কচি মেয়ের পায়ে তেল পড়বে না একটু, সমস্ত দরটোর নাকি এক ফোঁটা ছেলে নেই, আমার এই কথা বিশ্বাস করতে হবে! কেন, তোরাও তো হয়েছিস, পাবিস না একটু তেল জোগাড় করতে?"

শুধু বিজ্ঞানের হাসি নয়, সিনেমারও উজ্জ্বল,—বিরক্ত একটা ঠোক্কর দিয়া হাড়াইল, বলিল—"তেল! ঐটুকুর আবার তেল মাখাবে? এমনই ঘাসার মতন হয়েছে হয়ে রয়েছে..."

"না, সাবান ঘষে গুপরকার ছালটা তুলে দিই। বলাস নে আমায় বাপু! যদি তেল না মাখালে কচি ছেলের ছাড়ী পুষ্টু হয় না, সেই তেল আজ পর্য্যন্ত এক ছটাক জোগাড় হোল না..."

"সেই তেল যখন জোগাড় হবে কোথা থেকে। তা তুমি এত কষ্ট করোনা, বেশি করে রোদে ছেলে রাখোনা; এমন জিনিস নেই যা তুমি সকালবেলাকার রোদে পাবে না, বেশ ভাল করে গা খুলে দিয়ে।"

সিঁড়ি আবার জলিয়া উঠিলেন—"তুমি কচ্ছ যখন জানিস না, তুমি কচ্ছে আসিস্ নি যিমে—সকালবেলায় রোদে নাকি সবচের তেল আছে!—আমরে নিগমে কেউ যে কথা শোনেনি। আছে তো মা, বাপে-ঠেটায় মিলে খানি ঘুমিয়ে রোদ থেকেই তেল বের করে যে আমায়, তেল আমার চাই।"

(২)

অনেক কষ্টে জোগাড় হইল একটু তেল। বাড়ির পাচক-ঠাকুর একটা পাইন্ট-বোতলের এক বোতল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল, বলিল, তাহার দূর সম্পর্কের এক ভাই তেল আজিমের ব্যবসা বাড়িতে রাঁধে, সেই বাবুকে বলিয়া-কহিয়া জোগাড় করিয়া দিয়াছে, তেলের খানিক খাঁটি তেল।...ইচ্ছা হইল ঠাকুরেরই খানি টানাইবার ব্যবস্থা করিতে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে দুইটি টাকা দিয়া তেলটুকু লইতে হইল। যাই হোক, নাচনির হাতের গোটাই শাইয়া সিঁড়ি ঠাণ্ডা হইলেন, সবার হাতে ঘাতাস লাগিল। বোতলটা রহিল মেয়েরই জিম্মায়, আদুর-ঘরের অন্তচিতার দুর্ভেদ্য দুর্গে। সকালে সিঁড়ি নিজেই ছোট মেয়ের আটয়াসী দুমেটা পরিয়া মাতনীকে উলটাইয়া পালটাইয়া তেল মাখান, তৈল-কীর্ত্তনের সঙ্গে আদু-নিকালের সাবান-ফেনের দুওপাত করেন; তাহার পর নাচনিকে রোদে শোওয়াইয়া স্বামীকে ডাকাইয়া তৈলসঞ্চয়ের কথা মনে করাইয়া দেন,—ওটুকু তেলের আর কতটুকুই বা পরমায়ু? ফুরাইয়া যাইবার আগেই যেন হাজির হয় তেল—যাতে কথা শোনা হইবে না। কর্ত্তা হাতে হুঁকা এবং মাথায় দুশ্চিন্তা লইয়া পোয়াতলাটিতে গিয়া বসেন। এই করিয়া দিন চারেক কাটিল।

পঞ্চম দিনে ঐ সাদাস্ত তেলটুকুরও খনি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সকাল বেলা। জলে পড়িয়া সিঁড়ি তাহাকক্ষয় ভোগেন, কিছুদিন সন্ধ্যার পর। কর্ত্তা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া পাড়ার কয়েকজন সমবয়সীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন। একাল আর সেকালের গল্প, প্রায় সমস্তটাই সেকালের তেল আর একালের তেল লইয়া, এমন সময় একটি সোর-হুলুকের হাত বারান্দায় আসিয়া পড়িল।

পাড়ার সমবয়সী মজলিসের বাহেরার শব্দ অত্যন্ত প্রবল, মাথাটা ছকের উপর ঝুঁকাইয়া ফেলিয়া সবার বিস্মিত মুখের পানে বিজয়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"খাঁটোয়ার সা'জেবের পুকুরের মাছ; মাছ কোথায় তার ঠিক নেই—সোর-হুলুকও হবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু কী মাজেহালটা করে ছাড়লে—দুটি ঘণ্টা—এক মিনিট কম নয়! খরসি ঠোঁটে ভরে সমস্ত পুকুরটা চষে ফেললে, মেয়েরা মনে করলেন বুঝি

আবদুল একটা কাৎলা পেয়েছে! ঘাটোয়ার সা'জেদের পুকুরের মাছের ঐ পিকিউলিয়ারিটি কিনা —আমাদের ডিভিশনের পর্যন্ত মাছ আছে—একটা আধটা নয়, কিন্তু সের চারেকের বেশী কেউ তুলতে পারেনি আজ পর্যন্ত—জানেন ফেলোয়াড়—প্রত্যেকটি মাছ ..."

মাছ ধরিতে পারুক না পারুক, বেশ ঢাস দিয়া গল্প করিতে পারে মাছের। এর পরে ঘাটোয়ার সা'জেদের পুকুরের মাছের স্বাদিষ্টতার কথা তুলিল—ওস্তাদটি অবশ্য সুবাহু মাংস নাকি খায় না। মণিলালের ঘুম ফুরাইয়া আসিলে অক্রেরও বেশ দিল—মাছ কি করিয়া রান্নার উপযোগী করিয়া তোলা যায়...এই যে মাছটা, ছ'সেরের একটা হই—এটা কাটার কি রকম হইবে, ভাজে কিরকম, ঝালে কি রকম, ভাসিয়ার কি রকম, অম্বলে কি রকম। মাসাবধি প্রায় কাহারও মাছের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নাই—অভিমুন্যু, তাহার উপর আবার এদিকে ভৈলাভাব। মণিলালের মাছটিকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা মুখর হইয়া উঠিল। এক সময় মণিলাল বলিল—"তাতো হোল, এখন কে কতটা নেবেন বলুন, কেটে পৌঁছে দিই। আমার তো দোষখানেক হলেই চলে যাবে। আর—মাছ ঘরে' এনে যদি একলাই খাব তো কেমন মাছ ধরার পরকার?...আমি তো এই বলি।"

গোবিন্দলাল কখনও হাত তুলিয়া কাহাকেও কিছু দিয়াছিলেন এমন মনে পড়ে না কাহারও, তাঁহার ছেলে মণিলালও বাপের মুখের মর্যাদা রাখিয়া আসিয়াছে। আজ যে সে হঠাৎ উদার হইয়া উঠিল কেন, সবাই বুঝিলেন। সবার সঙ্গে মাতি-ঠাকুরদাদার সম্বন্ধ, ছই চক্রবর্তী একটু মুখকোড়ও, বলিলেন—"সব তো বুঝলাম ভায়া, কিন্তু যার অভাবে তুমি মাছটিকে একলা খেতে পাচ্ছ না, তিনি যে আমাদেরও ক'দিন পুষ্ট করে রেখেছেন, যাহ বাক্সিতে ঢুকিয়ে কি করব বলো! কাঁচাও খেতে পারব না, সেদ্ধ করেও খেতে পারব না; একদিন হিসেব চেয়ে চেয়ে দেখে-ছিলাম—অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। লোভ তো হচ্ছে, অন্নপূর্ণা যার মুখে এত জল এনেছে যে হুঁকোয় টান দিতেও পারছেন না,—দেখছি তো মনে তখন থেকে, কিন্তু করা যায় কি?...কি তো অবস্থা, তাঁকে উপটুকে বেরুলে এক আধ কৌটা! তাহলে দেখো একবার, নাড়ি আগুন করে আনলে এমন নজরানাটা। আমার তাঁস্কাতো কাটছে।"

সব তাঁস্কাতেই এক অবস্থা, সবার মুখেই এই-রকম ধরণে প্রত্যাখ্যানের কথাই বাহির হইল, মাছটি আদিনিবেদন করিতে আসিয়া এমন ভাবে ফিরিয়া যাওয়ার পর আসরও বেরকম জমিল না আর, সবাই একে একে উঠিয়া গেল।

(৩)

মাছটা সামনে হইতে সরিয়া যাইতে কর্তার মুখের জলটা অনেকখানি শুখাইয়া আসিল, চিন্তিত ভাবে খানিকক্ষণ ধীরে ধীরে তামাক টানিলেন, তাহার পর টানগুলা দ্রুত হইয়া আসিল, ক্রমে আরও দ্রুত, তাহার পর এক সময় উঠিয়া পড়িলেন।

লোক লজ্জা ভয় কুণ্ঠা সব জড়াজড়ি করিয়া এক সঙ্গে কখনও এমনভাবে আসিয়া পড়ে নাই জীবনে এর আগে। চায়ের আসর তো ছইপা পিছাইল, এই করিয়া করিয়া মিনিট পাঁচেক পরে ছেলের আতুড়ঘরের সামনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গলাটা পথেই পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন; নিম্নলিখিত কথাবার্তা হইল—

"কি গো বধূ, আছিস কেমন মা!

"ভাল আছি বাবা।"

"গিন্নি নেই কিনা, তাই ভাবলাম দেখে আসি একবার। ঐ এক বেয়াক্কেলে মানুষ; এই তীর্থে যাবার সময় হলো তোমার? তীর্থ তো পালাচ্ছিল না।"

"বেশ ভরেছেন দাদা, একটু ঘুমে আসুন, খাটি ঘি তুমি — ন'তুমি — নাতনি নাতনি বেশ বানান হয়না!

"আসলের মেয়ে মুখ মিষ্টি তো? তোরা কত কি বুঝবি! আসে হোক নাতি নাতনি।···তা আসেন কেমন ইনি? ···ইস্ ছপ হয়েছে দেখো শালীর! একেবারে রূপকথার পরী!"

বুবু একবার আড়চোখে লজ্জিত-নয়নে ভগ্নীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"আসেন ভালোই, তবেলা মিশিরের হাতে খাবলা খাবলা তেল খাদিম হচ্ছে, অন্ত সময়ে একটু ভাজা-চচ্চড়ির জন্যে তেল জোটে না কারো—এত তোমাদেরও যদি ভালো না খাবেন···"

"এই দেখো! ভুলেই গেছলাম, তোর ছেলের কথায় মনে পড়ে গেল,—তেল আর আছে কতটুকু ঘর মিশিন।"

মেয়ে মাথা নিচু করিয়া মৃদু একটু হাসিল।

"হাসছিস যে!"

মেয়ে গলা খাটো করিয়া বলিল—"তেল এখনও আছে বাবা, তুমি ভেবো না, তবে চেষ্টাটা করতে ভেকো। খুকিকে যে তেল মাখান সেটা খাঁটি সরষের তেল ভেবেছ নাকি?

—বাপের মুখের পানে চাহিয়া মিটি-মিটি হাসিতে লাগিল।

"তবে!"

মেয়ে গলাটা আরও খাটো করিল—"তবে মেয়ে আবার খাঁটি সরষের তেল যোগ করে নিতে। তোমার রোজ বরাদ্দ, আর আমি তোলটুকু এদিকে সেব করে দিই আর কি। কোথায় তেল পাবে তুমি শুনি—কলুর মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে!"

—বাপের মেকথা টাটুকু করিয়া মেয়ে আবার মিটি মিটি হাসিতে লাগিল, কর্তা একটু আগাইয়া গেলেন, গলা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—"শুধে করিল কি তুমি!"

"খানিকটা তিসের তেল ঘ দিয়ে দেখছি চুপি চুপি, বাইরে সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিই, বেশিটা তিসের; ঝালটা আদিই দিই তবে, আর টের পাবে না।"

কর্তা একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"তিসের তেল যে ঠাণ্ডা, খাবে ধরবে যে মেয়েকে যে পাগলি!"

"হিং চাটাই যে ভেবেছি!"

মিশির হাল ছাড়িয়াছে, মেয়ে যা এই জানেই কর্তাও একটু হাসিয়া ফেলিলেন, তাহার পর গম্ভীর হইয়া একটু যত্নের সুরেই বলিলেন—"না, অমন পাগলামি করবি না। মেয়ের শরীরের কথা, তেল না হলে হাড় পুষ্ট হয় না, সরষের তেলই দিতে হবে···"

"ওমা, তুমিও যে মার মতন অবুঝ হলে বাবা! পাব কোথায় অত সরষের তেল আমি যে ···"

"পাবি; সে-ভাবনা তোর নয় তো, সে-ভাবনা আমার। তেল একটু বেশি খরচ হবে, না তো এ-হাঙ্গামটা করলাম কেন!"

মেয়ে মুখের পানে একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল, বাবার প্রকৃতিটা জানে, একটু ভীতভাবেই প্রশ্ন করিল—"হাঙ্গাম আবার কি করলে বাবা!"

"হাঙ্গাম বৈ আর কি করব? মধিলাল ধাঙড়ের সা'জেলের পুকুর থেকে একটা রুইমাছ ধরে এনেছে—দু'সেরের···"

একবার আড়চোখে মিশিরা চাহিলেন, মেয়ের দুষ্টু বুদ্ধিতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে···

"পাকা দু'সেরের মাছ! সা'জেলের পুকুরের মাছ আবার অমনক মিষ্টি কিনা···কিন্তু তেল কোথায়?···"

"ও বাবা, তুমি নিলে না অমন মাছটা!"

"মোন ঝিন্ হয়ে সবটা। মণিলাল বললে—ঠাকুর্দা, কত্তাটা কি? আমি বললাম—মাছ তো দেবে, কিন্তু ছেলে কোথায়? মাছ তো আর কাঁচা খাওয়া যাবে না, তা সে সা'জেদের হাজার ডাকসাইটে মিষ্টি মাছ হোক।...তখন মণিলালই বললে—ছেলের ভাবনা? কত চান আপনি!...বললাম—তা যদি জোগাড় হয়, তো গণ্ডা দেড় পনেরো মাছ কেটে; তাই দেবে কেটে নিয়ে আসছে।"

মেয়ে একটা ঢোঁক গিলিল, লজ্জিত মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"একটা কথা বলব বাবা?"

"বল্না, কথা বলবি তার আবার এত ভয় কেন?"

আবদারে মুখটা মেয়ের ভার হইয়া উঠিল, মাথাটা একটু দোলাইয়া বলিল—"আমিও একটু খাব বাবা, হুঁ...আমায় মা খালি উপোস করিয়ে রেখেছেন—এটা খেলে এই হবে, ওটা খেলে তাই হবে—শুধু কালজাম্, আর ছিঁড়েরাজা খেয়ে থাক্,—না, আমি খাব মাছ।"

"তা খাবি, মাছ আর কি হয়েছে? রোজ তো মাছ পাওয়া যায় না, ছেলের অভাব, তাই হয় না, নৈলে মাছে আর কি রোজ হচ্ছে?"

"আর একটা কথা, বাবা।"

"কি বল্ না।"

"আমায় খান কতক ভাজা মাছ বেশি করে দিও, লুকিয়ে রেখে দেবো, কাল পর্যন্ত হবে আমার।"

"তা দোব। এ আর এমন ভারি কথাই বা কি, দোষেরই বা কি?"

মা কন্যা মিলিয়া বাপের-মেয়ের এ রকম লুকাচুরি নূতন নয়, দুজনার হাসি-হাসি ভাবটা আবার ফিরিয়া আসিল; পরে কহিল—"তা তোর কত্তাটা গেলে যাবা?"

বাপের মুখের হাসি-হাসি ভাবটা বিলুপ্ত হইয়া গেল মুহূর্তে, যার দুয়েক ঢোঁক্ গিলিতে হইল, তাহার পর আবছা আবছা করিয়া বলিলেন—"তোর পেলুম মনে—তা সে পাওয়াই সার্লি—মণিলাল যখন বলেছে, বড়িবাজ ছেলে—অন্তত সের-দেড়েক ছেলে তো কত্তবেই জোগাড়...তাল ছোট, পরত হোক।"

"এখনও যদি জোগাড়? তাহলে বিয়ের তত্ত্বতে মাছ নিয়ে বসে আছ বাবা? একুনি তো আসছে নিয়ে।"

কর্তা অনেক মহলা দিয়া অনেকবার গলা পরিষ্কার করিয়া আসিয়াছিলেন, মোক্ষম তখনই কিন্তু মুখ দিয়া আর কোনমতেই বাহির করিতে পারিলেন না। দুই তিনটি ঢোঁক গিলিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। মেয়ের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া ফুটিয়া মিলাইয়া গেল, প্রশ্ন করিল—"একটা কথা বলব বাবা—রাখবে?"

"কি বল্ না, একটা কথা বলবি তার আবার এত আড়ম্বর কেন!"

"দুদিন মাখবার তেলটুকু কিনে রেখে করে; কাল পরশু পর্যন্ত তো এরই মধ্যে বলা চলে। কথাটা কিন্তু কাউকে জানিয়ে কাজ নেই।"

কর্তা একটু হাসিয়া উঠিলেন—"হাঁরা, জানিয়ে তোকে বকুনি খাওয়াই আর কি, আমার তো অম্বল নেই! বললেই হবে, মণিলাল জোগাড় করে দিয়েছে। কিন্তু কচি মেয়ের মাখবার তেল...তা বে, কাল তো আসছেই সের-খানেক; মোক্ষ, তিন-চিনেকের হাতে রেখে দিবি, ছেলেমানুষি করবি নি।"

একটু হাসিয়া মাথিয়া বোতলটা সন্তর্পণে আড়ির করিয়া দিতে দিতে কন্যা আবার আবদার করিয়া বলিল—"খানকতক কিন্তু আমার জন্যে মাখবার করে দিতে হবে বাবা। তুমি আবার যাও কুলে যাও।"

(৪)

মণিলালের কাছে ছেলের কথা প্রথমটাই চলিল না। তাহার বাসার বাহিরে সেই বটে এক মেয়ের আঙ্গিনায় মোড়ায় বসিয়া মাছ পরাইয়া দিয়া, একটু লজ্জিত-

তারপরই প্রশ্ন করিল—"কিন্তু কেন কোথায় পেলেন ঠাকুর্দা? সিন্দুকে আমার টাকাগুলো থাকলে, যেমন অবস্থা দেখছি, একটাকে ছেড়ে আধলাটারও মায়া ছাড়া চলবে না বলছিলুম; তেমন নিতেও তো চাইছে না—মাছ যেন একে ঘেন্না হয়েছে..."

নিতান্ত হৈ-চৈ-ছিন্নায় আমা সাঁজের পুকুরের ডাকগুলোর মতন ঠাকুর্দা কত খুঁজিল ঠিক বোঝা গেল না; তবে মাছ খাইয়া যে শক্তিটুকু হইয়াছিল অথবা হইবার কথা, তাহার বিপুল শক্তি হৈ-হল্লোড়ে ব্যয়িত হইয়া গেল। কোথাও ছেলে পাওয়া গেল না, বেহদ্দ ঘুমের মধ্যে আছে বেশ বলিয়া তাহাদের ঘরে পাওয়া গেল. কেবল ঘুমে প্রবেশ করিবার মন্ত্র অমৃতলালের মতো মানুষের জানা থাকিবারই কথা।

পরদিনের সকালটি বেশ আমাইয়া আসিতে লাগিল. কর্তার হাতগুলা ছুটই পেটের মধ্যে সাঁধাইয়া যাইতে লাগিল। মাতৃকুলের শিকটাই ছাড়িয়া গিয়া বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া দিলেন।

রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় গিন্নি তারকেশ্বর হইতে ফিরিলেন। চতুর্দিকে কর্তা আজ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মনে মনে একটা প্ল্যান আঁটিয়া ফেলিয়াছেন. অনেকটা নিশ্চিন্ত। সোয়াস্তির বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন. একটু বাদের ঘরেই প্রশ্ন করিলেন—"ছোল তীর্থ?"

বেশ বোঝা যায়, যেন গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করার ভাবটা, অন্তত এ সময়ে কর্তার যত একটা হয় না। গিন্নি বাড়ির প্রবেশের মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ এরকম ভাবনা? —একটা মানুষ সমস্ত দিন পরে ফিরল।... আর তিথি নিয়ে ঠাট্টা কি?"

"ঠাট্টা নয়, একটা মেয়ে ঝাতুড়ে পড়ে মরেছে, তা হলে আমিই বা কি দোষ করেছি, যাই না একবার বদ্যিনাথ থেকে আসি না ঘুরে।"

গিন্নি গলা ছাড়িয়া দিলেন "যা যাও, এসো ঘুরে! ঘুরে বসিস্থি, কখনও তো নাম শুনলাম না মুখে ছিখেন, আমার হিংসের যদি হয়েই থাকে যুবতি, যাওনা! কে মানা করছে—আর অত দেখানোরই বা কিসের?..."

ঝগড়াটা মুখে করিয়াই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

গিন্নির সহিত সমানে ঝগড়া করিয়া যান, এমন ক্ষমতা নাই কর্তার, তবে মাঝে মাঝে জোরন দিয়া একতরফা ঝগড়াটা জিয়াইয়া রাখিলেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা এমনই দাঁড়াইল যে, সবাই যুক্তি একজন নাস্তিপ্রিয় লোকের এ গল্পমার মধ্যে কাল-কাটানো একেবারে অসম্ভব।

ছেলেরা একটু চাপা গলায় মাকে একান্তে বলিল—"একটা সামান্য কথা নিয়ে অত বকাবকি করছ কেন মা, সেরেফাসে বাবা যেমন হয় মনের সুখে লড়িয়ে যাবেন বেরিয়ে।"

বৌরেরা একটু চাপা গলায় শ্বশুরকে একান্তে বলিল—"না হয় আপনি একবার ঘুরেই আসুন বাবা, নইলে ওঁর বহুনি এমন চলবে এই রকম; যান, বাবা বৈদ্যনাথ নিশ্চয় টেনেছেন, নেশে ঘুম দিয়ে যেরকম না কথাটা।"

সময় এই অমৃতটুকু গ্রহণ করিয়া লইয়া কর্তা তাহার পরদিন সকালেই—গিন্নি পা ছড়াইয়া মাতনির হৈহৈরৈরৈ বসিবার পূর্বেই—বৈদ্যনাথ-যাত্রা করিলেন।

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, সভ্যযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জ্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

(১)

বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য

[গতবারে আমরা 'বাঙালীর বৈশিষ্ট্য' নামে যে মূল্যবান প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, এবারে তাহার অনুরূপবিষয়ে আর এক মনীষীর, ঐ একই বিষয়ে, কয়েকটি চিন্তা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রবন্ধটি অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, লেখক — স্বর্গত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠক-পাঠিকাগণ বাঙালীর জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য ও তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। বাঙালী এককাল তাহার পরিচয় জীবনে ও সমাজে — তাহার ধর্ম্মে-কর্ম্মে, আচারে-অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে দান করিয়াছিল, আজ সেই জীবনও ইতিহাসগত হইতে চলিয়াছে; ইতিহাসই যে তাহার পিতৃ-পরিচয় বুলিতেছে, বুলিতেছে বলিয়াই এক অতিথির পরম্পরা তাহাকে গ্রাস করিতেছে, এবং ভারতীয় সমাজে সে অস্পৃশ্য হইয়া উঠিতেছে। বাঙালী জাতির ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই, — এইবার সেই ইতিহাসের বড় প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু লিখিবে কে? সেই দৃষ্টিই বা কোথায়? তাই এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতির আমাদের প্রধান উপজীব্য হইবে বলিবার মানুষ বাংলাদেশে ক্রমেই বিরল হইয়া উঠিতেছে।]

(১)

বাঙালী যে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতি সকল হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র, বাঙালীর যে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, ইহা ঠিকমত বুঝিতে হইলে—

(১) বাংলার উপাসক-সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে। (২) বাংলা ভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে হইবে। (৩) জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত প্রায় সাতশত বর্ষকাল কোন্ সিদ্ধান্তের উপর বাঙালীর স্মৃতি ও ব্যবস্থার বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে। (৪) বাঙালীর জাতি এবং কুল-পরিচয়ের পূর্ব্বরূপ লইতে হইবে। এই কয়টা বিষয় ঠিকমত ব্যাখ্যাত হইলে তবে বাঙালীর বিশিষ্টতা-অবলম্বন করিতে পারিব।

বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য বাঙালীর বিশিষ্টতার মূল উপাদান। এমন কি দৈনিক ক্রিয়া-কাণ্ডে, পঞ্জিকায় বাঙালী তন্ত্রোক্তের পদ্ধতি মাত্র করিয়া চলে, অন্য কোন আর্ষ পদ্ধতিকারকে গ্রাহ্যই করে না। শাস্ত্রের জীমূতবাহন বাঙালীকে অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দিয়া

দিয়াছেন; সমস্তটা বাংলার হিন্দু-নীতে অনেকটা Territorial বা দেশের ও জাতির করিয়া রাখিয়াছে। অন্যেরা, ইহা শক্তি-প্রমুখ সাধক করিলেন, বুদ্ধিগত তত্ত্ব-প্রমুখ দিয়াছেন, পরম ভক্তিবাদ-প্রমুখ ভাক্তিক আচার্যেরা বাঙালীকে এক অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়া দিয়াছেন। বাংলার উপাসনা-পদ্ধতি, তর্ক-পদ্ধতি, সাহিত্য, ভাষা এবং জাতি ও মূল পরিচয় লক্ষ্যে, ইংরেজী-মূলে ইংরেজিনবীশ পণ্ডিতমূলের দ্বারা যথোচিত আলোচিত হয় নাই, তাই ইংরেজিনবীশ বাঙালী সমাজের ও স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় রাখেন না। ইহার কি কারণ তাহা, বোধহয় বহু-কথা, শিক্ষা ও আচারে হইয়া বাঙালী মানসের পদ্ধতি হইতে সরিয়া হইয়াছিল। বাংলাই বস্তুবাদের আলিখান; আমার সে বস্তুবাদ সহজিয়া মত এবং চৈতন্য-মতের দ্বারা এমনই ওতপ্রোতভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, পরে ইংরাজী সভ্যতা হইতে উহা পূর্ণরূপে সরিয়া হইয়াছিল।

(২)

"যত জীব তত শিব" এই মহাবাক্য বাংলা-দেশেই প্রথম উচ্চারিত হয়; এই মহাবাক্য অনুসারে মনুষ্যসমাজে নতুন জাত হওয়া সম্ভবপর হইয়া বাংলা-দেশেই বাঙালী জাতির মধ্যে হইয়াছিল। বাংলার সহজ-মত, তন্ত্রধর্ম, এবং পরবর্তীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম এই মহাবাক্যের দৌত উপরে বিস্তৃত। এমন কি, বাঙালীর ভক্তিপন্থাও এই মহাবাক্যের দ্বারা একটাই সঞ্জীবিত যে, উহা রামানুজ শঙ্করাচার্যপ্রমুখ দক্ষিণের আচার্যগণদের ব্যাখ্যার ভক্তিধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

"যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে;
তাই আছে দেহভাণ্ডে!"

—ইহাও বাংলার একটি মহাবাক্য। ব্রহ্মাণ্ড—Macrocosm, দেহভাণ্ড—Microcosm; একটা আছে, অন্যটা সঞ্চিত; একটা বিরাট, অন্যটা ছোট। তাই তন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, "ব্রহ্মাণ্ডে যে ভাণ্ডে সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে" — ব্রহ্মাণ্ডে যে ভাণ্ডাদির খেলা হইতেছে, দেহভাণ্ডে জীবমাত্রেরই কলেবরে — সেই ভাণ্ডাদির ক্রিয়া হইয়া থাকে। দেহভাণ্ডকে বুঝিতে পারিলে, আয়ত্ত করিতে পারিলে, ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্ত করা যায়। এই সিদ্ধান্ত, এই অপূর্ব generalisation বাঙালীর একটা বড় বিশিষ্টতা। এই সিদ্ধান্তের উপরে সহজিয়া-মত এবং বৈষ্ণবদিগের "দেহতত্ত্ব" প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর "দেহতত্ত্ব" বাঙালীর নিজস্ব; উহা বাংলার বাহিরে যায় নাই; বাংলার বাহিরের কারুকর্ম উহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। বাঙালীর সাহিত্য, ভাষা, মহাজনী পদ ও কীর্তন, শ্যাম-শ্যামার গান, সবই এই দেহতত্ত্বের সিদ্ধান্তাদির দ্বারা যেন অনুপ্রাণ — অনুপ্রাণিত। এই দেহ-তত্ত্বই বাঙালীর Anthropomorphism বা নরমূলার — নরদেবতামূলার — দেখা। তাই বাঙালীর দেবতা বিষ্ণুমুরলীধর, চিন্ময়-শ্যামসুন্দর, সচ্চিদানন্দ-মূর্তি। তাই বাঙালীর দেবী বিষ্ণুমুরলীধারিণী, একান্ত-কানন-বিহারিণী, উমামুগ্ধরী, চিন্ময়ী চিন্ময়-শ্যামাঙ্গিনী। বাঙালীর 'আগমনী' বাঙালীর নিজস্ব; 'আগমনী'-গান ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই, আর কোন জাতি তখন গান করে নাই, গান করিতে জানেও না। তাই বাংলাদেশেই শ্যামে-শ্যামায় সম্বন্ধ-সাধন অপূর্ব-ভাবে হইয়াছিল। এই সম্বন্ধের মহাকবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ; তাঁহার রচিত 'কালীকীর্তন' এই সম্বন্ধের অপূর্ব পরিচায়ক। বাঙালীই একা মনুষ্যদেহা এবং নারীদেহীকে পূজা করিতে শিখিয়াছিল। বাংলা-দেশেই প্রেমের ধর্মের প্রথম বিকাশ হয়। বিষ্ণুপুরাণে একা ভাগবত, তাহার সঙ্গীতরাশিতে, পরাকাষ্ঠের দেহতা বিষ্ণু-মুরলীধারীর পূজা ও কথনা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন; পরন্তু এই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা

বাংলাদেশে বাঙালী ব্রহ্মণদের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিব।

বেদই অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, সোম, অগ্নি আদি দেবতাদলের পূজা করিতে হইবে; ইহাদিগকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে, জগৎ প্রসন্ন থাকিবে; পূজক—ব্যক্তিগত প্রসন্ন হইবেন, সিদ্ধমনোরথ হইবেন। বেদের যজ্ঞাদি সকল কার্য্যই বাহিরের দেবতার পূজার নামান্তর মাত্র। সে দেবতা মানুষ নহে, অতিমানুষ শক্তি-সম্পন্ন জীব-বিশেষ—"জরায়ুজ অণ্ডজ জীবজ জীবানাং, প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্,—" সে দেবতা মানুষ-দেহের অতীত বিশ্বসৃষ্টির উপর বিরাজ।

বেদের এই দেববাদের প্রতিবাদ বাংলার তান্ত্রিকগণ সার্থকভাবে করিতে পারিয়াছিল। অবশ্য অনুপ-জন্তু বাদের উক্তিতে—'দেহীদেকে' ইহার প্রথম ঘোষণা থাকিলেও, ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঙালীই বেদের দেববাদের, বহির্দেবতা-পূজা-পদ্ধতির প্রতিবাদ করে। বাংলার উক্তিই আছে,—

"আত্মানং দেবতাং ত্যক্ত্বা
বহির্দ্ধেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা
ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥

অর্থাৎ, হাতের মুঠার কৌস্তুভমণিকে ফেলিয়া দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি কাচখণ্ড অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি যেমন অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তেমনি যে ব্যক্তি দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মরূপী দেবতাকে অবহেলা করিয়া বাহিরের অন্য দেবতার পূজায় ব্যস্ত হয়, সে তদপেক্ষা মূর্খ। সোজা কথা এই, বাহিরের দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া যাগ-যজ্ঞাদি পরিহার করিয়া পরমাত্মার পূজায় আত্মস্থ হও। ইহাই বাংলার তান্ত্রিকগণের আদেশ, ইহাই বাংলার সকল শাস্ত্রপ্রণেতা উপাসকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপরে বাঙালীর উপাসনা-তত্ত্ব বিরাজ। বাঙালীর দেহতত্ত্ব বেদের বহির্দেব-পূজার (Deism) প্রতিবাদ। বাঙালীর দেহতত্ত্বের প্রভাবে বাংলার বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি লোপ পাইয়াছিল; আমাদের মনে হয়, বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এবং বহির্দেব-পূজা কোন কালেই বঙ্গদেশে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

এই দেহতত্ত্বের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড Philosophy বা দর্শনশাস্ত্র নিহিত আছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বার্ষিক-পত্রের সম্বন্ধে সম্ভবপর নহে। তথাপি মোটামুটিভাবে এই সম্পর্কে দোটাকয়েক তত্ত্ব বলিয়া রাখিব। সহজিয়া সিদ্ধাচার্য্যদের মধ্যে অনেকের দোহাবলীতে এই তত্ত্বটী সিদ্ধান্ত আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আমার মনে হয়, এই তত্ত্বটী সিদ্ধান্তই বাংলার সাহিত্যে, ভাষায়, গানে, কীর্ত্তনে, সাধনে-ভজনে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

(১) 'ঈশ্বরসিদ্ধেঃ'—যুক্তিতর্কের দ্বারা, চাক্ষুষ বা পরোক্ষ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা যখন বহির্দেবতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধি করা যায় না, তখন তাঁহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া প্রয়োজন নাই, অতএবাং তিনি এখন যথাস্থানে থাকুন।

(২) ঈশ্বর অনন্ত, অজ্ঞেয়; তাঁহার অনাদি সৃষ্টিও অনন্ত এবং অজ্ঞেয়। তবে একটা ব্যাপার—আমরা দেখিতে পাই—আমাদের আত্মতত্ত্বের মধ্যে অবস্থিত, এবং চেষ্টা করিলে ও সাধনা করিলে হয়ত তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। ক্ষুদ্রের এবং ব্যষ্টির ক্রিয়া এবং ক্রিয়াফলের পরিচয় পাইলে হয়ত আমরা মহানের, জ্যেষ্ঠের, এবং সাকল্যের পরিচয় পাইলেও পাইতে পারি।

(৩) মানুষ হইতে মানুষের সৃষ্টি একটা অসম্পূর্ণ ব্যাপার নহে কি? জীব হইতে জীবের

উৎপত্তি বিষয়ীর আংশিক একটা অসম্পূর্ণ বিশ্লেষক ছাড়া আর কি? কেমন শক্তি দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছে যাহার প্রভাবে নূতন জীবের উৎপত্তি ঘটিতেছে? সেই দেহের শক্তির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ড বা'র অসম্পূর্ণতা বহুটা পরিমাণে পরিচয় পাইতে পারা যায়, সেই দেহতত্ত্ব বুঝিলে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝিবে।

(৬) দেহের এই শক্তিই কুলকুণ্ডলিনী;—"কি-ভবনী দেবী সর্ব্বদেহপ্রসারিণী"—পদের মানের সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তি জীব-দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত রহিয়াছেন। ইহা হইতেই সৃষ্টি, ইনিই ভবজননী। ইনিই পুরুষের চারিধারে, অনাদিনিধনের সর্ব্বাঙ্গে, সর্পের ন্যায় জড়িত হইয়া আছেন।

(৫) দেহের এই পুরুষ এবং প্রকৃতির শক্তির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পুরুষ-প্রকৃতির পরিচয় পাইবে। তার ও তত্ত্বে সাহায্যে ইহাদের পরিচয় পাইতে হয়। এই মনুষ্যদেহের একজন প্রভাবের আসক্তি হইতে নির্দ্দিষ্ট। তার জীবের বিষয়-আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভেদলাভ করিয়াছে। একটা অজ্ঞের অতৃপ্তিই জীবকে সচল। কি-যেন নাই, কি-যেন হারাইয়াছি, কি-যেন পাইলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি;—এই অতৃপ্তি ও পালনাই ভাবের জননী। রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন—"মুখে যে মা কালী বলে', কবি-রত্নাকরের অপমান করে"; দেহতত্ত্বের বৈষ্ণব কবি গান করিয়াছেন,—"যখনে জন্ম যে কেবল যাদুকরণ দেখিয়াছে, সে যে অন্য মানুষ সেই না থাকে, যদিতে মন হায় মোহিছে।"

এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে,—নাম, রূপ, ভাব, রস এই চারি পদার্থকে বুঝিতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ষট্‌চক্রভেদ ব্যাপারটা বুঝিতে হইবে। নহিলে বাংলা-সাহিত্যের অর্দ্ধেকটা বুঝিতে পারিবে না, বাঙালীর বিশিষ্ট ভাবের অর্দ্ধেকটা অনুভব করিতে পারিবে না; এই যে বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের (কি রামপ্রসাদের রচিত, কি ভারতচন্দ্রের রচিত) কালী-পক্ষের ব্যাখ্যা আছে, উহার মহিমা আগে পরিষ্কার করিতে পারিবে না। চণ্ডীদাস-রচিত অনেক পদাবলীর অর্থ ব্যাখ্যা করিতে এখন অনেকে পারেন না, কেন না আজকালকার শিক্ষিত-সমাজ দেহতত্ত্ব বুঝিয়াছে, ষট্‌চক্রভেদ জানে না। মান, মাথুর, সুতীসংবাদ, রাসকলহ প্রভৃতি লীলাকীর্ত্তনে রোদনের অবসর কোথায় আছে? অথচ আবহমান বাঙালী এই সকল কীর্ত্তনের পালা শুনিয়া কাঁদে কেন? উহা ত তরল ভাবের উদ্বেল নহে। উহা কি? দেহতত্ত্ব বুঝিলে বাঙালীর রোদনের বিশিষ্টতাটুকু বেশ বুঝিতে পারিবে, হৃদয় স্নেহ দিকে কাঁদিয়া আকুল হইবে। কর্ত্তব্যাধনা ত করিতে বসি নাই, বাঙালীর বিশিষ্টতাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। তাই সামান্য ইঙ্গিত করা ছাড়া আর কিছু এ সম্বন্ধে বলিব না।

(৩)

আসল কথা এই, বাঙালীর বাক্তিত্ব তাহার আবিষ্কৃত সকল ব্যাপারে যেন সজ্ঞানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কেবল মিথিলায় ন্যায়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙালী ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। তাঁহারা ছাত্রমুখে মিথিলার একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলার কাণাভট্ট শিরোমণি-রঘুনাথ মেধার এই ইতিহাসটুকু করিলেন যে, তিনি জেদ করিয়া উঠিলেন। তিনি মিথিলায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন,

দেশে আসিয়া একচক্র রঘুনাথ তাহার গ্রন্থের লিপিবদ্ধ করিলেন. সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব মনীষা-প্রভাবে নব্য-ন্যায়ের উদ্ভাবনা করিলেন। ফলে. মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্বরূপ হইল, ইহাই বাঙালীর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। আবার মজার কথা, বাঙালী ন্যায়ের এই অস্ত্রশস্ত্র-দ্বারা চারিশত বৎসরকাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবদ্বীপকে নব্য-ন্যায়ের অধিষ্ঠান কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বাঙালী সকল বিষয়ে চূড়ান্ত করিয়াছে।

কয়েক উদাহরণ দিব :—

(১) রাজতন্ত্র ও জীবনবিন্যাসে বাঙালী স্মার্ত্ত যে সমাজের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইংলণ্ডের ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কল্পনামাত্র ছিল। জীমূতবাহনের সিদ্ধান্তসকল পুরামাত্রায় এখনও ব্রিটিশজাতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" বিশ্লেষণের প্রকৃত প্রতিবাদ. Feudalism-এর বিরুদ্ধে বিষম Protest। সহস্রবর্ষের পূর্ব্বে, সকল সভ্য-জাতির আগেভাগে বাঙালী এই প্রতিবাদটি করিয়া দিয়াছেন।

(২) স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন একজন বিষম Protestant ছিলেন। তিনি গোঁড়ামির প্রতিষ্ঠাতা নহেন, বরং বলিব, ভারতবাসীর বৈধিক গোঁড়ামীর অপসারকর্ত্তা। তিনি ব্রাহ্মণের জাতিসমূহের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব এবং অতুল্য। তাঁহারই প্রভাবে বাংলার আচারী-বিচারে "হুংমার্গ" দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই। রঘুনন্দনকে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইদানীং বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, অজ্ঞানবশে তাঁহার প্রতি অনেকে কটাক্ষ করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন বাঙালীর বিশিষ্টতা-উন্মেষের একজন প্রধান সাধক পুরুষ।

(৩) শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বাঙালীর বিশিষ্টতার আর একটা উপাদান। রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের আচার্য্য-সম্প্রদায় যে নানাবিধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সে সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃন্দাবনে, মথুরায়, নাথদ্বারায় হরিকীর্ত্তন শুনিয়াছি, ভজন শুনিয়াছি, — এই সকল হিন্দুস্থানী ভজনে ও কীর্ত্তনে খঞ্জনী অস্পৃশ্য জাতিসকল সঙ্গীর বাহিরে স্থান পাইয়া থাকে। বাংলার হরি-সঙ্কীর্ত্তনে সে বাধা নাই, উচ্চনীচ সকল জাতি সমান ভাবে কীর্ত্তন-আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; কীর্ত্তনের ক্ষেত্রে খঞ্জনী সম্পূর্ণ বাঙালীর জাতি যায় না। কেবল এইটুকুই নহে, সেই কীর্ত্তন-ক্ষেত্রে সকল জাতির কীর্ত্তনীয়ার পদরজের উপরে সোপবীত ব্রাহ্মণও জাবাবেশে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন; সেই কীর্ত্তন-মণ্ডলীর উপরে হরিনামের বাতাসা ছড়াইয়া দিলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সবাই তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখে দেয়। এটা বাঙালী ছাড়া আর কেহ, কোন প্রদেশের বৈষ্ণব, করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সঙ্ঘের কীর্ত্তনেও এমন ব্যাপার হইয়া থাকে।

(৪) আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ গিরি বাঙালীর বিশিষ্টতা-উন্মেষের আর দুইজন সাধক। ইঁহারাই "বামাচার পদ্ধতি" অবলম্বন করিয়া বাংলায় "শৈব বিবাহের" প্রচলন করিয়াছিলেন। ইহারা বাহুমাংস ত্যাগের কাল পর্য্যন্ত বাংলার

পাক-তান্ত্রিক সমাজে স্বৈর-বিবাহের খুব প্রচলন ছিল। রাজা রামমোহন নিজেও স্বৈর বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বৈর-বিবাহে নারীর জাতি-বিচার করিতে হয় না। যৌবনের পূর্ণ উদয় না ঘটিলে স্বৈর-বিবাহ হইতে পারে না। এই স্বৈর-বিবাহের প্রভাবে বাংলার নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, এমনকি মগ, আরাকানী, পর্তুগীজ, ফিরঙ্গী, পাঠান-রমণী বাংলার পাক ব্রাহ্মণের গৃহলক্ষ্মী হইয়াছিলেন। কুলজী-গ্রন্থকার ঘাঁটিলে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। স্বয়ং রঘুনন্দন বিধি এক পাঠান রমণীকে শক্তির রূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শাক্তের যেমন স্বৈর-বিবাহ, বৈষ্ণবের তেমনি "বড়ইবদল" ছিল। সহজ-মতের প্রচলন-প্রভাবে, বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে "পরকীয়া-অভিসার" খুব প্রচলন ছিল।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অথবা বিক্রমপুরের নাস্তিক তট্টাচার্য্য, বাঙালীর বাক্তিত্বের একজন প্রধান সহায়ক। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাই ইঁহাকে নাস্তিক তট্টাচার্য্য বলিত। দীপঙ্কর তুর্কীস্থানে, তিব্বতে, চীনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বাংলার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; চীনে তাহার বুঝি বুঝি প্রমাণ পাওয়া যায়। নেপালে বাঙালীর কীর্ত্তির অনেক পুঁথিপত্র আছে। ছিল দিন যখন বাঙালী বৈবাহিক সূত্রে তিব্বত, চীন, নেপাল, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল দিন যখন বাংলার অনেক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত আসিয়া বাস করিত এবং বাঙালী রমণীকে, স্বৈর বিবাহের সাহায্যে, পত্নিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থ হইয়া থাকিত। "ভরার মেয়ে বিবাহে" বাংলা-দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-প্রভাবের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; পাক কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং কুলাচারী অন্য জাতির মধ্যে পাকস্পর্শের দিনে নব-বধূর জাতিকুলের পরিচয় লওয়া হইত না। ইহা একটা বড় কথা।

(৬) বাংলার প্রবন্ধ ও মহাকাব্যের সাহিত্যেও একটা অপূর্ব্বত্ব আছে। কবিকঙ্কণ, অন্নদা প্রভৃতি সকল কবিই ব্রাহ্মণ; পরন্তু তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের Hero এবং Heroine, নায়ক-নায়িকা — ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে। ধর্ম্মমঙ্গল, মনোপাল, কৈবর্ত্ত, ডোম্বো-সোয়াসী প্রভৃতি জাতীয় পুরুষদেরই এই সকল কাব্যের নায়ক। আরও দেখা যায়, অষ্টাদশের পূর্ব্ব-কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের দেখা পাই। চণ্ডীর ঘট-স্থাপন ব্রাহ্মণ নিজেই করিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। ভাদুদত্ত, পুনাদত্ত, ইহাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতিপ্রমুখ নায়কগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন? ইঁহারা যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে অন্ত্যজ বলি কোন্ হিসাবে? কাজেই বলিতে হয় — শূদ্র-অন্ত্যজের, জল-আচরণীয় এবং জল-অনাচরণীয়ের মধ্যে এমন অজ্ঞাত কোন তত্ত্ব আছে, যাহা এখনও আমরা বলিতে পারি নাই। "অ-শূদ্র-প্রতিগ্রাহী" শব্দটা তত্ত্ববিচারকালে তাহার আলোচনাও এইস্থলে করিতে হয়।

(৭) এই সঙ্গে বাঙালীর ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বাংলা ভাষা বাঙালীকে অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সেই শক্তির পাইতে হইলে প্রায় সহস্র বৎসরের বাংলা ভাষার ইতিহাস-পদ্ধতি বুঝিতে হয়; সিদ্ধাচার্য্যগণের গীত ও দোহাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'

পর্যাপ্ত সমগ্র বাংলাসাহিত্যের অনুশীলন প্রয়োজন। এই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী জাতির ইতিহাস লুকান আছে। মুসলমী-সাহিত্যও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঘনানন্দ মিশ্রের "মহাবংশ" অসম্পূর্ণ কাব্যও বটে, ইতিহাসও বটে। ইহা ছাড়া, বাংলার লৌকিক-সাহিত্যও অসম্পূর্ণ এবং অনুসন্ধানসাপেক্ষ। কবির গান-পাঁচালীর গান, শ্রামাবিষয়ক গান, কীর্তন, গাথা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের লৌকিক-সাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই, অথচ বাঙালীর সামাজিক ও ঘরোয়া সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় বিদ্যমান আছে।

(৪)

কত আর উল্লেখ করিয়া বলিব! বাঙালীর বিশিষ্টতা এবং আকৃতি সমাজ-শরীরের সর্বাবয়বে, শিল্পকলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্মাণে, নৌকাপ্রস্তুতিতে, কথকতায়-ব্যাখ্যায়, বসন-শিল্পে, উত্তর-প্রদেশের বসন-প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে, সজ্জা-জাতির সকল বসন-বিন্যাসে যেন সবাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। মনীষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, বাংলার মুসলমান হইতে যত প্রতিমা বাহির হইয়াছে, যত বোধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের Technique ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙালীর ভাস্কর্য্য অপূর্ব্ব ও স্বতন্ত্র। বাংলার বাস্তুশাস্ত্রের মধ্যেও খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে; বাংলার কবিওয়ালাদের ঢোলবাজানো অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ। এমন ভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোনও জাতি পারে না। বাঙালীর গৃহনির্মাণ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র; এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, তুর্কি বা পৃথিবীর, আর কোনও জাতিতে পারে না; বাংলার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপসকল সবাই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাইও। বাংলার "পদ্মের কাজ" বাঙালীর নিজস্ব; উহা বাংলার বাহিরে ছিলনা,—নাইও। এখন সে "পঞ্চশিল্পের" নমুনা গভর্ণমেণ্ট হাউসের পোটাকেয়েক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি, বাংলার জনার্দন, বিশ্বকর্ম, জনমেজয় প্রভৃতি কর্মকারেরা যেমন ঢোল কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিগরেরা তেমনটি পারিত না; ফরাসডাঙ্গার, ফরমাস, কাঁসে-খাঁ প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙালীর নৌ-শিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল। এখন নৌকা বানাইতে, জাল বুনিতে ভারতের আর কোন জাতি পারিত না। বাংলার "ঘাট মৈত্রের ছিপে" চড়িয়া মীর কাসেম একবারে গোপীগিরি হইতে মুঙ্গের গিয়াছিলেন। বাংলার আর একটা শিল্প ছিল—কুসুম-শিল্প। নানা ফুলের অলঙ্কার ও অলঙ্কার বাঙালী যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত না। আওরঙ্গজেব-পুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"কি আর বলি-বুদ্ধা, তুমি-পাঞ্জাব লোক দেখ্‌তে পিতা, বাংলার কুসুমালঙ্কার দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কারসকলকে হেলায় পরাজয় করে। এখনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

(৫)

আসল কথাটি কি জান? বাঙালী আর্য্যাবর্তের আর্য্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাংলায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সমৃদ্ধ-সমাজ বিদ্যমান ছিল, প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাংলার বৈদিক যজ্ঞ, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার কিছুই বিকৃত পাটিয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে, ঘরে ঘরে পশ্চিম দেশ

হইতে আরব কলোনি আসিয়া কবিয়াও বাংলার বাক্-প্রকৃতির তেমন প্রভেদ হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙালীজাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল. উপরন্তু আগন্তুকদলকে বাংলার বিশিষ্টতায় দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিল। স্বীকার করি বটে যে, বাঙালী আর্য্যাবর্ত্ত হইতে, আর্য্যদের নিকট হইতে অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সে সকলকে বাঙালীর প্রতিভা যেন বাংলার কোমল শ্যামল পলিমাটির আবরণ দিয়া, এই মধুর, এই স্নিগ্ধ, এই চমৎকার করিয়াছিল যে, পরে উহা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলার বৈষ্ণব-পদাবলীর অনেকটা অংশ হিন্দুস্থানী কবি ও ভক্ত সুরদাস ও তুলসীদাসের অনুকরণে রচিতেও ছিল; পরন্তু বাঙালীর যাহারা সে সকল ভাবের গানে এমন "আখর"—এমন স্ফুটোক্তি মিশাইয়াছেন যে, কেবল তাহারই বাঙালীর পদাবলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উপাদেয় হইয়াছে। বাঙালী আর্য্যাবর্ত্তের অনুযায়ী হয় নাই বলিয়াই মনে হয়, আর্য্যাবর্ত্তের পণ্ডিতগণ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করিলে, "পুনর্মূষিকো ভব" যেন না বাংলায় দীর্ঘকাল বাস করিলে মোছলমানী, গোর আর্য্যগণের জাতিনাশ ঘটিত, তাহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট হইত। বাংলায় জৈন-ধর্ম্মের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মহাবীর রাজমহলের কাছে কোন গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া, জীবনের অর্দ্ধেকটা কাল বর্দ্ধমান-বিভাগে বা রাঢ়দেশে কাটাইয়াছিলেন; বাসুপূজ্য উত্তর রাঢ়ে ও কামরূপের কোন পূর্ব্বাংশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জৈনধর্ম্ম বাঙালীর বিশিষ্টতার পুষ্টিপক্ষে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথের "মাণী ধর্ম্ম" বাংলার উত্তর-রাঢ়ে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। এক পক্ষে জৈন তীর্থঙ্করগণ, অন্য পক্ষে গোরক্ষনাথের যোগী সিদ্ধগণ, বাঙালীর বিশিষ্টতার পুষ্টিপক্ষে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আবার বলিব, বাঙালী বঙ্গবিলাসী, পঞ্চনদে পটু, গোদাবরী আর্য্য নহেন। বাংলাই কলিঙ্গ-কপাট; বাংলাই অহিংসা-পরমধর্ম্মের দেশ; বাংলাই জৈনাচার্য্যগণের লীলা-ক্ষেত্র। বাংলার সিদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাব এখনও ধর্ম্ম-কর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে পরিস্ফুট। চিনিতে পারি বা, চিনিতে ভুলিয়াছি বলিয়া,—বাঙালীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাধনতন্ত্র, ভাবের ভাষা, সুরের ভাষা প্রভৃতি সব ভুলিয়াছি। আমরা বাঙালী হইয়াও বাংলার প্রাণের আর প্রাণবোধ করি না। একবার তাকাও, বাঙালী-বৈচিত্র্য-পরিকৃত বাঙালীর নিজ নিকেতনের প্রতি সমেহে একবার তাকাও; তাহার অতীত ইতিহাসের মুকুরে আপনার—স্বীয় সমাজশরীরের—প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবশিষ্টের গভীরতা একবার বুঝিয়া লও। তাহা হইলে আবার যেমন ছিলে তেমনই হইবে, হারানিধি তোমাদের ফিরাইয়া পাইবে, তাহা অমরভূমি তোমাদেরই হইবে।

( )

জাতি-বৈর

[স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত 'হেমচন্দ্র' নামক পুস্তক হইতে। এই প্রবন্ধে লেখকের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অতিশয় রক্ষণশীল হিন্দু-মনোভাব, অথচ ইহাতে গভীর চিন্তাশীলতারও অভাব নাই। আধুনিক যুগের উপযোগী না হইলেও, স্বাধীনতা-বোধ সম্বন্ধে হিন্দু-চিত্তার যে বিকৃতি ইহাতে আলোচিত ও বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমাদের জানিয়া রাখা কর্তব্য। এই মনোভাবের একটা নিজস্ব মূল্য আছে, তাই ইহার সহিত প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুর পরিচয় থাকা আবশ্যক। অক্ষয়চন্দ্র পূর্ণদাদার 'সমাজী' ছিলেন, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। আর একটা কারণে এই কথাগুলি উপযোগী হইয়াছে; ইহাতে লেখকের দেশের নব-জাতীয়তাবাদকে যে কারণে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, আজ মহাত্মা গান্ধীর প্রসাদে তাহা মিথ্যা হইয়াছে। তথাপি এই জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁহার যে মূল আপত্তি—উহা যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মসংস্কারের বিরোধী, তাহা সত্য। জনসাধারণ এখনও উহাকে সম্যক আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণও স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। আফ্রিকার এই স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী জনগণ যে জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহার স্বরূপ তাহারা নিজেরাই এখনও জানে না; তাহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা একটা অন্ধ গুরুভক্তিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং তাহার কোন রাজনৈতিক চেতনা—ব্যক্তির ও সমাজের স্বাধিকার লাভের কামনাও যেমন সুস্থিত হইয়া আছে, তেমনই ব্যক্তি ও স্বধর্মস্বত্বে কোন ভাবনা আর নাই। ইহার কারণ কি এই যে, এ জাতির মজ্জাগত সংস্কারই অন্যরূপ? এই জন্যই বঙ্কিম যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকেও তিনি হিন্দুর ধর্ম-সংস্কারের অনুযায়ী করিয়া পলিটিক্সকে ধর্মের সঙ্গে শোধন করিয়া লইয়াছিলেন।]

(১)

বঙ্কিম বাবুর কথায় জাতি-বৈর কি, তাহা বলিব।

"সাধারণ বাঙ্গালির অপেক্ষা সাধারণ ইংরেজ যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যদি শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শঙ্কিত-মন হইয়া থাকিতে পারেন, নিম্নপক্ষ তাঁহাদের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্ হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ের প্রীতির সম্ভাবনা। * * * অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদিগের প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শঙ্কিত-মন হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আজ্ঞাকারী ও ভক্তিমান্ হইতে পারি, তবে জাতি-বৈর দূর হইতে পারে।

আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি, হইতেও পারিব না। কেন না, আমরা প্রাচীন জাতি। অস্মাপি রামায়ণ মহাভারত পড়ি, মনুযাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুলা জায়ার ঈশ্বর-আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিষয় হইতে না পারি, তত দিন বিনীত হইতে পারিব না। মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতি-বৈর আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল।

"যতদিন ভেদ-বিদ্বেষে বিজিত-ভেদ-সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিশ্চই হইলেও, পূর্ব-গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতিবৈর-সমতার সম্ভাবনা

নাই ; এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সহযোগিতা না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি-বৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যেদিন জাতি-বৈর থাকে, সেদিন প্রতিযোগিতা থাকে। বৈরতারণের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাঁহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না — কেননা, সে প্রণয়ের আশা থাকিবে না। বিদ্বেষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা হয়, অপমানের সঙ্গে নহে। ইংরেজ শত্রু ইংরেজির ইংরেজ। ইংরেজ বন্ধু আমাদের আদর। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।" *

এই যে জাতি-বৈর ঘটিয়াছে ইহার প্রমাণ ঘটক — হেমবাবু। হেমবাবুই কখন ডুবুরে, কখন ডুকুরে, ক্রন্দনের সহিত বলিয়াছেন যে, আমরা তোমাদের চক্ষে বড়ই হেয় নিন্দ্য হইলাম, আমরা আমাদের পূর্ব-গৌরব খুঁজি নাই — খুঁজিয়া পাইব না।

দেখ্, চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বঙ্গে,
তোর সমতলে পড়িয়ে কি দেশে,
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ পাই বলিয়া।

আসে ছিল রাণী — ধরা-রাজধানী,
সকলে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে ছুঁচিনী
বসিয়ে দম্ভ ক'রো না গণিয়া।

তোমারো ত বুকে কত শত বার —
বিধু-পদাঘাত কঠোর প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার,
এই কথা সদা করিও ধ্যান।

আরে অরে লিখি, কি লিখিব আর,
বহিলে তুমিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গজলি — উথলি আবার
উঠিত আকাশে বাঙ্গির প্রাণ।'

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, —"আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।" সেই "সৌভাগ্যের" সূত্রপাত হেমবাবুর কবিতা হইতে। জাতি-বৈর ছিল, জাতি-বৈর একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ ছিল না ; কাজেই জাতি-বৈরের ভাঁক ছিল না। জাতি-বৈর ব্রাহ্ম-পত্রিকের ছিল — চৌদের জাহাজের ; ইংরাজি-নবীশের হইয়াছিল — রাজগোপাল ঘোষের বক্তৃতা শুনিয়া, বিদ্যু পেট্রিয়টের পঠন সময়ে, আর হরলালের গল্পে। কিন্তু জাতি-বৈর তখন ভাঁকাইয়া উঠে নাই, চকাইয়া পড়ে নাই।

কার্তিকের কোজাগরে লক্ষ্মীর, সংক্রান্তিতে বাহনের, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর, জামাই-সংক্রান্তিতে গণেশের, পূজা হইত ; কিন্তু দশভুজা-দেবীর পার্শ্বে কার্তিক, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী খাড়া করিয়া মহাষ্টমীতে মহাদেবীর মহাপূজার আরম্ভ হয় নাই। মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা মহাকবি হেমচন্দ্রই করেন। যৌবনের সেই কটাক্ষমণি, কোটি-কণ্ঠ-নিঃসৃত "বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্ সুজলাং সুফলাং' — জগতের সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস, চারিদিকের সেই কোলাহল, বালক-কণ্ঠের হুলহুলা — সকলই মনে পড়িতেছে। — হাকিম, কেরাণী, মুহুরী, আমলা, — উকিল, মোক্তার, মাষ্টার, পণ্ডিত, ছাত্র, —

* সাধারণী — ১১ই কার্তিক ১২৮০।

নামের, পেশার, যোগ্যতা—সকলেই এক প্রাণে গান ধরিয়াছেন, আর—

"শিখরে হাঁকারে গরে নাগাবলি,
নয়ন-জ্যোতিতে হাসিয়া বিজলী,
দেখিতে লাগিল অনেক যুবা ;

আর—

"আয়ত লোচন উন্নত ললাট,
মুখোয়াজ তহু সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে হাঁকারে গরে নাগাবলি,
নয়ন-জ্যোতিতে হাসিয়া বিজলী,
মনন আকুল অতুল আভা।"

সেই যোগল প্রাদুর্ভাব-সময়ের, মারাঠা-ভয়ের জাতি-বৈর নির্যাস বাঙ্গালির খুন-কলেজে, কোর্টে-আদালতে, জমীদারি কাছারী-ঘরে, সওদাগরি অফিস-ঘরে—ছড়াইয়া পড়িল। হেমবাবুর প্রতিভা আমাদের সৌভাগ্যের পরিসরস্বরূপ হইল।

কিন্তু ঐ কাছারী-কলেজ পর্যন্ত। হাটে বাটে, ঘাটে ঘাটেও কথা পৌঁছে নাই। হাটে হাটুয়া জানেনা, হেমবাবু কে? মাঠে চাষা হেমবাবুর নামগন্ধ শুনে নাই। ঘাট-বাটের পল্লীবধূরা জানেনা যে, 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়'। বাটে লম্বা লাঠিতে ভর লোক চলিয়াছে—জানে না, 'ভারত' তাহাকে বলে। দাশরথির প্রসাদ হেমবাবু পান নাই। তবে তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি হইয়াও, অনেক অর্দ্ধ-শিক্ষিত, 'অশিক্ষিত' অজ্ঞাতসারেই এই একরূপ বিচিত্র শিক্ষায় শিক্ষিতের সর্দ্ধাধিক করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

'ভারত-সঙ্গীতে' কাছারী-কলেজে একরূপ 'জাতীয় জীবন' সংগঠিত, উৎসারিত, মৃষ্ট, প্রতীত হইয়া উঠে। কিন্তু এই যে দৃষ্টি, এই যে উৎসাহ—সমস্তই বাসরের। তবে বাসরের দ্বারা সীতা-উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, সীতাহারা হইয়া শ্রীরামের বাসরে আসর।

"আমরা ছিলাম ভাল, তোমরা কেন আমাদের পর করিলে?" এই দুইটী কথা লইয়া কোন জাতিই জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারেনা। ভারত-বাসীর ও জাতীয় জীবন নাই।

(২)

'বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন'—এই কথাটাই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। 'ভারতীয় জাতীয় জীবন' কংগ্রেস-কর্ত্তারা বুঝিয়া থাকিবেন, আমরা কিছুই বুঝি না। সেই ভারতীয় জাতীয়-জীবনের অংশ যদি বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন হয়, তাহা হইলে সে ত আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তা না বলিয়া, যদি হিন্দু-জীবনের অংশ বলিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন বুঝিতে চেষ্টা করি—তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হয় না। সে কতটুকু অংশ? ঘটটুকু বাঙ্গালার ভূগোলের মধ্যে? বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে? তবে কালী কি আমাদের জাতীয় জীবনের কিছু নয়? রাম-লক্ষ্মণ? তাঁরাও কি কিছু নন? সে আবার কিরূপ জাতীয়-জীবন হইল? তা'ত বুঝিলাম না।

আসল কথা—'জাতীয়তা', 'জাতীয়-জীবন', 'সেন্টিমেন্টবিদ্যা' প্রভৃতি বাক্যগুলি একটু বুঝিয়া সুঝিয়া ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। নতুবা 'কার্য্যকালে'র মত সকলেই ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিবে, কেহ কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিবে না। সেটা কিছু নয়। ধরা-কথার ওরূপ ব্যবহারে চলে তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু 'জাতীয়তা' বলিয়া যদি কিছু জীবন্ত জিনিষ করিতে, রাখিতে বা বুঝিতে চাও, তাহা হইলে 'কার্য্যকালে'র মত করিলে চলিবে কেন? আর একটী কথা—সেন্টিমেন্টবিদ্যা। সে কিরূপ পদার্থ? সেন্টিমেন্টবিদ্যা কি মনে যে, কালী, পুরী, শ্রীরাম হইতে মালদা, মুর্শিদাবাদ ভাল? তা'ত আমরা বুঝিব না। তবেই হইল, আমরা হইলাম বর্ণাশ্রমধর্ম্মী, অধিকারভেদবাদী হিন্দু। কাজেই ঐ কথাগুলি আমাদের জন্য নহে। আমরা

ব্যবহার করি — ছোঁয়াছুঁয়ির মত। সে ব্যবহারে কোন কষ্ট হয় না।

কামাদের কথা — কর্ম্ম হয় বর্ম্ম। সংস্কার হয় বর্ম্মচর্ম্মে। কিন্তু ইংরাজীতে ধর্ম্মের শেষ নাই। ধর্ম্ম ইংরেজের পরকালে স্বর্গপিয়া অবস্থিত। সেই ধর্ম্ম রক্ষা করাই সকলের কর্ত্তব্য। আমাদের আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই। তাহাতে জাতীয়তা আসে আসুক, স্টেট্‌হইল্‌ পড়ে পড়ুক। বাস্তবিক সকলই উহাতে আসে। মনুষ্যত্বের সকল উপাদানই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের সিদ্ধি ও পুষ্টি হয়। বহুকাল হইতে চীনারাও চীন অর্থাৎ আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে নাই। ফলে, চীন কখনও কন্‌ফুশীয়, কখন তান্ত্রিক, কখন বৌদ্ধ — অথচ কনিকীট-প্রসি'-চেকী। জাতিতে চীন দুন — তুরস্ক — মোগল — মিশ্র। কিন্তু লেজ — খাস চীন; এলাকা মহাচীন। এ একরকম স্নেহিষ্টেরিডা।

ধর্ম্ম আছে, জাতি আছে, পুরাণ আছে, শাস্ত্র আছে, দেশ নাই — দুঃখ। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই স্বেচ্ছাচারী হইয়াও দুখী, জ্ঞানে জ্ঞানবান্‌, ধনে ধনবান্‌, বীর্য্যবান্‌, বলবান্‌, সবল, সুন্দর। দুখী পারোটারনের হাত হইতে সমাটনিগকে রক্ষা করে। দুখী সঙ্গীত-পটু, ভাস্কর্য্য-নিপুণ, চিত্র-বিশারদ।

পার্শীরও দেশ নাই, — পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার নাই। যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম রাখিয়াছে ও সম্পূর্ণ জাতি রাখিয়াছে বলিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়াও পার্শী — জীজীভাই, রাস্টাম, নওরোজী, টাটার জন্ম দিতেছে। দুখী ও পার্শী হিন্দুর মত বটে, তবে স্বেচ্ছাচারিত।

মুসলমানের জাতি নাই। কত জাতি মুসলমানের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মুঘ, তাজীক, কিপ্‌চাক, হাবসী, আরবী, পার্শী-তুর্কি, হিন্দুস্থানী, সাতারী, মালয়ী — এই সকল মিলিয়া মুসলমানের জাতি নাই, রক্তের মিল নাই। কিন্তু ইসলামের ধর্ম্ম-বন্ধন আছে। সেই বন্ধনের বলে মুসলমান এখনও জগতে কথঞ্চিৎ রাজা। নতুবা ইউরোপের জাতিবিদ্বেষে এতদিন কোন্‌ কালে কবের সহিত কবের রাজা ভাসিয়া যাইতেন; 'লেজের তলকার যাহা' হইত।

জাপানের অদ্ভুতান বিজাতি-বিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয়ের অনুকরণে। জাপানীর জাতির ঠিক নাই, ধর্ম্মের ঠিক নাই, ইতিহাস নাই — কিছুই নাই। আছে এক দিকে অনুকরণ, অন্য দিকে বিদ্বেষ। অনেকটা আমরা দুনিতে পারি, তাই চারিদিকে এরূপ 'জাপান জাপান'-শব্দ হইতেছে।

ব্যবহারে-ব্যবস্থায় কবের সাম্রাজ্য। কব বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম হস্তার্পণ করে না, কেবল রাজস্ব-বন্দোবস্তের শুটিকত মূল কথা চালায়, আর দুর্গ ও সেনার ব্যবস্থা করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করে।

আর ইংরাজ? ইংরাজের তাবার সোহাই দিয়া ইংরাজের পদার-প্রতিপত্তি, জাঁকজমক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যত লোক ইংরাজিতে কথা বলিত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার শতগুণ অধিক লোক ইংরাজি বলিতেছে, আর এই শতাব্দীতে কত গুণ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ থাকিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, কানাডা ও যুক্তপ্রদেশে ইংরাজিই সবল। ভারত-সাম্রাজ্য, তাহার দক্ষিণে বাবে ধর্ম্ম-কেতু ইংরাজি আয় আয় প্রাণ করিতেছে। আর আপনার লেজ ত আছেই। একজাতীয় মধ্যে একতা হইবে, এক-শাসন হইবে, ইহাই গুরুর ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম্‌। একজাতীয় মধ্যে যে সাম্রাজ্য, সেই সাম্রাজ্যই — সাম্রাজ্য। সিসিল-রোড্‌স এই সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে কোটি কোটি টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

চীনের গৌরব — দেশ: দুখীর গৌরব — জাতিগত ধর্ম্ম; ইংরাজের গৌরব — ভাষা; আর আমাদের? আমরা কি লইয়া থাকিব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের স্বধর্ম্ম-রক্ষা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। শিবাজী যে মারাঠার মধ্যে জীবনী যোগ করিয়াছিলেন — সে গুরু-ভক্তি-মূলে, রামদাস স্বামীর মন্ত্রপাঠে। মন্ত্রাপ্রতাপ যে

আকবরের বিক্রম ও কৌশল ব্যর্থ করিয়াছিলেন, সে কেবল স্বধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত। অম্বা-যোধপুর বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে, তাই দেখিয়াই না মহারাণার টনক নড়া।

স্বধর্ম-রক্ষা ব্যতীত হিন্দুর দ্বিতীয় উন্নতির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। তবে এই স্বধর্ম রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের সকল দিক দিয়াই রক্ষা করিতে হইবে। ভারত কর্মক্ষেত্র; অন্যান্য ভোগভূমি। ভোগে আমাদের ধর্ম নয়, ধর্ম — কর্ম। ভোগ আপনা আপনি হয়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আমাদের থাকা আবশ্যক। আমার, ভারত পুণ্যভূমি — তীর্থক্ষেত্র। গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী, কাশী-কাঞ্চী, শ্রীপুরী-শ্রীধাম — এ সকল তীর্থ হিন্দু বুদ্ধিতেও পারে না, ছাড়িতেও পারে না; সুতরাং ভারত আমাদের ভরসা, ভারত আমরা ভালোবাসি। আমরা পেট্রিয়ট। আমরা চীন বা জাপান। অন্তরিক্ষে আমরা ফ্রান্স অপেক্ষাও জাতীয়ত্বের গৌরব করি। জানি ও মানি যে, জাতি-সম্বন্ধে ধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম-রক্ষার জন্য জাতিরক্ষা আবশ্যক।

আমরা যত্ন জানি, অর্থাৎ দেবভাষার গৌরব করি। তুমি ম্যাপ দেখাইয়া বল, 'ঐ দেখ, ইংরাজি কত দূর বিস্তৃত।' আমি ইতিহাস খুলিয়া দেখাইয়া দিই — যদি, 'ঐ দেখ, বৈদিকী সংস্কৃতা ভাষা কত দূর হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।' তোমার দেশ বিস্তৃতি, আমার কালে বিস্তৃতি। আমার দেবভাষার গৌরব তুমিও ত করিতেছ।

দেশ, জাতি, ভাষা, আচার, ব্যবহার, সকলই সনাতন ধর্মের অন্তর্গত। ধর্ম রক্ষা করিতে হইলে সকলই রক্ষা করা আবশ্যক। যে স্বধর্ম-প্রতিপালক, সেই আমাদের দেশের প্রকৃত পেট্রিয়ট; স্বদেশ, স্বজাতি, সনাতন আচার-ব্যবহার — সকলেরই সে অনুরাগী। কেবল লেখক হওয়ার অর্থ নাই।

এই স্বধর্মানুরাগ দেশে যখন প্রবল ছিল, তখন স্বদেশ-ভক্তি, স্বজাতি-বৎসলতা বলিয়া হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এখন বোধ করি হইয়াছে, কেন না —

"সীতা-হারা হ'য়ে রামের ধীরের আপন।"

আবার এই বানরের সাহায্যেই হয় ত আমার সীতার উদ্ধার হইবে। দেশভক্তির, জাতি-ভক্তির দোহাই দিতে দিতে হয় ত আমরা ক্রমে স্বধর্মানুরাগী হইব।

এই বানর আমিয়াছেন, যা কোণে কাণে ছিল, তাহাদের বাহির করিয়াছেন, লাফাইতে শিখাইছেন — হেমবাবু। ইহাকেই বলে, "অবলম্ব জাতীয়-জীবনে উৎসাহের সঞ্চার।" এই বানর কাজে লাগাইতে পারে, তবেই সীতার উদ্ধার হইবে। নতুবা বানরের লাফালাফিই সার।

আত্মরক্ষার ন্যায়, ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম: কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরন্তুরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অবলুপ্তিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাশ্চিম জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশ-রক্ষণ কর্তব্য।

* *

আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism-অর্থের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের ভাঙ্গিয়া অন্নের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম না লিখেন।

— বঙ্কিমচন্দ্র

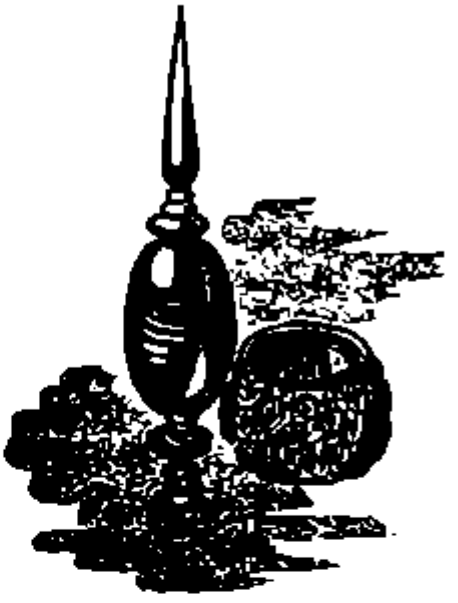

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া খাঁটি কাব্যরস বিতরণ করা হইবে—যে-রস সর্ব্বকালের রসিকসমাজ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাভাষার কাব্যরসও বটে। একালের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সত্যকার পরিচয় নাই। 'প্রবর্ত্তনে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই ; পরে বর্ণ-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

(১)

নারী-প্রশস্তি

জগতে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাহো জীত খুশি' জানি-গান —
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার !

* * * *

সবিলাস বিশ্বের মানস-সুষমায়,
আনন্দের প্রতিমা আত্মায়,
সাকার সাকার যেন ধ্যান কবিতায়,
মূর্ত্তিমতী মূরতি মায়ার ;

যত কামা হৃদয়ের
সংগ্রহ সে সকলের,
কি সুষমা তার রমণীর —
মণি-মন্ত্র-মহোষধি সংসার-কণীর !

বিকচ-পঙ্কজ-মুখে নতি-পরিচিত
　　লজ্জায় লোচন চলচল,
চাঁচর-চিকুর চারু চেপে-চুম্বিত,
　　কি সীমন্ত রবল নরল !
কাতর কলেবরে,
　　স্বল্প-মুক্তা-কলেবরে
চলচল লাবণ্যের জল,
পাটল কপোল কম্প-চঞ্চলের তল !

পুথিবার ভয়ে ফুল ক'রে পড়ে পায়,
　　ভূমি-কল পরশে পাখীরে ;
মুহুমুখে কুরঙ্গিনী মুখ মুখ চায়,
　　যায় অলি অধরে বসিতে !
স্পর্শে শত ঘাস-ভরা
　　অশোক লভিল ধরা ;
এলোকেশে কে এল জননী ! —
কোন্ কমলুল, কোন্ গগনের শশী !

সহজাত লাজে ত্রাসে চক্ষু বাঁকা যায় —
　　চকিতে চিকুর নিকঞ্চিত,
আলোকিত সীমন্ত বিম্ব পা'ক-পা'ক,
　　তুঙ্গ তনু-শিরি তরঙ্গিত ;
মৃদু ভরে নাসিকায়,
　　তুলাতুল ঝিকে পায়,
ফেরে নয় ভয়ে পালিতল,—
মত্ত-করি-করলাত ভূয় শতদল !

লতা-পর্ণ-পরবে বিচুম্ব মনোহর
　　ভূচ্ছ নয় — বালয়ের ঘর ;
ভূয় ভয়ে কামিনীর ভূল-কলেবর !
　　ভূলভরে পুরুষ কাতর !
নরপশু বনচারী,
　　ভূরন্ত কঠিন নারী ; —
ধরা'পরে করিল রোপণ
সমাজ-তরুর বীজ — ধর্ম্মতি-বিলন ।

প্রতিভার চারুবাসে চেতন-চকোর,
　　ভাবভরা বিশাল আখির,
শোভিত সলজে অর্দ্ধবিহ অলঙ্কার,
　　আবরিত ভূয়ের শরীর ; —
পেয়ে হেনরূপ ছবি
　　মানব হইল কবি, —
ধরিত্রী সবিতা কবিতার !
বর্ণা-ছুঁড়ে বিকশিল ভূমুখ সভার !

সীমন্তিনী-সহবাসে শোভিত শরীর,
　　সীমন্তিনী-সংশোভিত মন,
'অনুপমা' বিচিত্র চরিত্র রচনার
　　পেলে নর প্রকৃতি নূতন ।
স্বার্থপর, অকাতর,
　　স্বভাবের পশু নর,
শিখাইলে শিষ্ট — এই ভূল,
শিক্ষাদাত্রী ভূশিক্ষিতা আচার্য্যা নিভূল !

কামিনী-কিরাত ভূল-জাল বিস্তারিয়া,
　　চক্ষুরূপে তীক্ষ্ণ সমর্পিয়া,
ধরণী-অঞ্চলে নর-বানর ধরিয়া,
　　বান্ধি তারে প্রেমভূতি দিয়া,
যান-ভূষা দিয়া অঙ্গে
　　নাচাইয়া নানা রঙ্গে,
নির্ম্মাণিছে সংসার-ব্যাপার ; —
ছেড়ে দিলে ভূরী হত বানর আবার !

বাকো ভূল কি বর্ণিব, ললনা, তোমার !
　　ভাবিয়া না ভবে পায় পার !
যেন বিশ্ব কেবা, যে ধরিবে চীৎকার
　　বিবিধ বিচিত্র কবিতায় !
তুমি লক্ষ্মী নিলয়ের,
　　বান্ধি ভাব-বান্ধবের,
ভ্রূ-বিলাসী বী-মূর্ত্তি ভূর্গার, —
রাসলক্ষ্মী ভারা প্রেমিক আত্মার !

সেই প্রেম চরম — সেই পরমা পুরিতা ;
তাহা প্রেম — নারী-বর্ণনায় ;
সেই পূর্ণ — ছন্দে যার নারী বিরচিতা ;
পরিবার — নারী তুষ্টা যাঁর ।
অন্যায়-বিচার দায় —
রীতি-জ্ঞান অজানায় ;
নারী-তত্ত্ব — ধর্ম এ সংসারে ;
সেই ধন্য পুরুষ — আপনে নারী যারে ।

নারী-মুখ সংসারের সুখময় দায়,
সেই গতি — নারীর গমন ;
জ্যোতির প্রধান — লোক-মাঝি সমুদায়,
আত্মা-মঠ-মূর্তা-নিকেতন !
নারী-বাক্য নীত মানি,
নারী-কার্য অনুযায়ি —
সকলের লীলা বিধাতার ।
মর্ত্যে মূর্তিমতী মায়া অজে অমরার ।

---

(২)

তুমি ও আমি

নারী,
তুমি বিধাতার সৃষ্টি,
কঠোরে কোমল সৃষ্টি,
তব জড়-জগতের নিত্য-নব লীলা ;
উপরে দয়তা,
অন্তরে বিনম্রতা,
মায়াময়ী মায়াময়ী সংসার-বিহ্বলা ।

আমি জগতের ত্রাস —
বিধ্বংসী মহোল্লাস,
মাথায় মঠতা-স্রোত, নেত্রে জ্বালাময় ;
শ্মশানে-মশানে টান,
গরলে অমৃত-জ্ঞান —
বিষকণ্ঠ, মুণ্ডমালি, প্রলয়-পাগল ।

তুমি হেসে ঘরে' যাবে,
সাজাইয়া তুলসীরে,
তুলসিতে দিবালো, দিবে, হইতে প্রণয় ;
তোমারি প্রণয়-মেহ
বাঁধিল কৈলাস-গেহ
পাগলে করিলে গৃহী, ভুলে মহেশ্বর !

---

(৩)

'বউ কথা কও'

কথা কও, বউ, কথা কও!
চিরবঞ্চিত বাহিরে এসে—
দুয়ার খুলিয়া ডেকে লও।
ঘরকন্নার এতই কি কাজ—
সাঁঝের আঁধারে এত বা কি লাজ!
কত যতনের কবরীর সাজ
খসিলে কেন ফেলে দাও?
অশ্রু-ভরা প্রাণে অভিমান কাঁপি'
ব্যাকুলিত বাথা কেন সও—
বউ, কথা কও।

কথা কও, নারী, কথা কও!
কত কবির কবি-কল্পিত
কাহিনীর সার কেন নও?
লজ্জা-জড়ানো অতীত বাসে
ইঙ্গিত শুধু কাঁপিছে আকাশে;
শত কবি গাহে সহস্র ভাষে—
জন মনে ভেসে সারা হও।
কেন ইঙ্গিত? সুখে ও দুখে
কী তার অর্থ! কথা কও—
নারী, কথা কও।

কথা কও, মোনী, কথা কও।
আকুল বাঁশরী কাঁদিয়া সাধিছে—
কেমনে এমন স্থির রও?
গাছে গাছে ওই কলি ফুটে,
নদীতে নদীতে কাকলী ছুটে!
তব প্রাণে বহা প্রাণ হয়ে উঠে—
মুখরী প্রাণে জিনে লও।
কত মোহাগের কুকের ধন যে
চরণে লুটায়, কথা কও—
রাই, কথা কও।

কথা কও, দেবী, কথা কও!
কত পূজারীর পূজা সেবা হ'ল—
পাষাণী, পাষাণী কবে লও।
কত না কুসুম চন্দনে চর্চিত,
চন্দন ঘরে ঘ'ষে নিজ-ভাল;
ধূপ-দীপ কত ঘ'রে ঘ'রে যায়,
মৌন তুমি যে সেই রও!
নিয়া বলি পূজা, পূজা আয়োজন,
মুখ ফুটে সেই কথা কও,—
দেবী, কথা কও।

কথা কও, সতী, কথা কও!
চতুরার নিকষায় ঘ'ষে
চতুরার আজে নাহি লও।
বিরাট বিরাগী শোকে সারা হয়ে,
ধরার ভোগা দিল ছড়ায়ে;
খুঁজে ফিরে আজ মহা-উল্লাসে,
জননী তাহারে চেনে লও।
নিরাশ আশিয়া যোগকেশ শুধু
রণে বনে খুনি, কথা কও—
সতী, কথা কও!

কথা কও, বউ, কথা কও।
বিষমন্ত্র-অন্তঃপুরিকা,
শাসন আজি তুলে লও।
মোনী তারে ওই, কবি সাধে গানে;
একই কথা জপে যোগী প্রাণে প্রাণে;
ফুল-ফুলায় ফুকারিল কত!
চির-মৌন ত তুমি নও!
সতী, সুমুখী, দেবী, বধূ, নারী,
বিবিধ ছন্দে কথা কও—
'বউ-কথা কও'।

(৪)

আত্মজ্ঞান

হের প্রিয়ে, এই ধরা — তৃণ-লতা-পুষ্প-ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা —
নভোপরে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে —
নাহি শঙ্কা, নাহিক ছলনা।

ঘিরে পৃষ্ঠ, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি-তুমি —
কত-কথা বিকাশ-বারতা!
আছে স্নেহ — আছে কথা, আছে ভক্তি — খুঁজি
সুখা,
আছে দুখ — চাহি অমরতা।

বুঝিছ কি এ আলেখ — এত আলো, এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতি-গান!
কত তৃণ-তুচ্ছ দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্য মিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান!

চিত্রে দিনু আঁকো প্রাণে যখন তোমার পানে,
তুচ্ছ করি কালের গরিমা!
পাষাণে পাষাণে লেখা — তোমার প্রণয়-লেখা,
মহা-ভূতে অমর-মহিমা!

এস এ জগতে সখি, অমৃত চরিতার্থ,
প্রেমে দিয়ে, স্বর্গ ভরপুর! —
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসফলতা, অক্ষমতা
ভরায়ে — ভুলায়ে আপনায়!

লহে প্রেম-সুধারাশি এস দেবী, এস রাণী,
এস সখী, এস প্রাণ-প্রিয়া!
এস সুখ-দুখ-ভুলে ভক্ত-চুম্বা ভেসে চুলে',
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বাপিয়া!

---

(৫)

নারী-স্তোত্র

এ ধরায় মরুমাঝে তুমি কি গো প্রণয়-প্রতিমা —
পূজাসন বিশ্বের প্রথমা মূরতি ভৈরবী!
অন্তরে অমৃত হাসি — মানবের প্রতিকায় দীপা,
প্রজ্ঞা ও পৌরুষ-বহ, অন্তরে আকাশ — শশি
উপহাসি' চিরদিন আছ মুক্ত বিকাশের ছবি
মুমূর্ষুর বালুকা-কলাপে! কত রাত্রি অবসান,
কত ঘোর অন্ধকারে কত নব অরুণের-রবি! —
তুমি চির-প্রহেলিকা, আজও তার নাই সমাধান,
দেব, দৈত্য, নর—কেহ পায় নাই কভু তব মহত্ত্ব-সন্ধান।

তুমর্দের অরি তুমি, ধরা-স্নেহে নিত্য-সকাম —
তোমারি অলকা ভালে অরুণাভা পুণ্যকলাবতী;
তুমি উষা আশাময়ী, অকস্মাৎ অনল-উদয়ে —
তুমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস — তোমারি সে প্রকট মূরতি।
গৃহকোণে দীপ তুমি — আঁধারের মধুর আরতি,
মনে তুমি ধ্যানাসন — নিদ্রেরও স্বপ্ন-উপবন।
হোম-ধূমারুণ-আঁখি বধূ তুমি, ধ্রীড়া মূর্ত্তিমতী!
তুমি বন্যা বারোজলা, নব অঙ্গ অনঙ্গ-যৌবন —
অয়ি পিপাসা-পাণ্ডু, নয়নে আবেশ হাস আবেশ-গহন!

তাই প্রেম-দুলালবনে, তুমি তরু কল্প-তরুলিকা —
ঘাট হ'তে চল পথে, নীল শাড়ী নিঙাড়ি' নিঙাড়ি',
পরাণ তাহারি সাথে — তুমি সখী পরাণ-অধিকা,
নগর-বিলোলী প্রিয়া, পল্লীবালা-বধূ বনমালী !
ক্ষেত্রের ধরণী তরু, সতী তুমি, দেবের রিয়সি —
রমণ্যবিদ্যা-রূপা — ধৃতাবতী, যোড়শী, কমলা !
তুমি শক্তি লক্ষ্মণের, শিব নমে চরণে তোমারি —
অন্নপূর্ণাশিনী চণ্ডী, কালী তুমি কপালকুণ্ডলা !
তুমি মায়া মায়েশ্বরী, সিদ্ধিদা-সাবিত্রী
তুমি মোহিতকুন্তলা !

তুমি সে আকাশপ্রদীপ প্রবাসী আলোকে, হে সন্ধ্যাদী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছ তব বাণী,
স্বর্গের আকূতি।
সুদূর তারার তাপে শুদ্ধ আছে যে অমৃত-বারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হ'য়ে দেখা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু' বাহু বাড়ালে।

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে ছুটিল অর্ঘ্যদল
খেয়ার খেয়ে,
মানস-তরঙ্গদলে ভাষার সঙ্গীত-সঙ্গল
নেচে ওঠে ধেয়ে।
মৃত্তির তিমিরবক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে ;
ধীরের গম্ভীর হতে মুক্তিমন্ত্র বজ্র করে যদ —
অসত্যেরে হানে।

— রবীন্দ্রনাথ

গণ-সাহিত্য

শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী

গত কয়েক বৎসর হইল বাংলা সাহিত্যে গণ-সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে তাহা গণ-সাহিত্য হওয়া দূরে থাকুক, গণ-সাহিত্যও হইতেছে কিনা সন্দেহ। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে বিশ্লেষ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহার প্রধান উপজীব্য হইতেছে আন্দোলন, দেশের সাম্প্রতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ, কিম্বা জনগণের আর্থিক দুঃখ-দুর্দশা। উপজীব্যের আলোচনায় ও বিচারে যদি কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, লেখকদের কল্পিত বা পরিকল্পিত দুঃখ দুর্দশা ও সাধনাটাই গণ-সাহিত্যের স্বরূপ, তবে তাহাকে অবিচারে দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ, গণ-সাহিত্য কি বস্তু সে বিষয়ে লেখকদের মনেই যেন সন্দেহ আছে, তাই পাঠকদের সন্দেহের নিরসন হইতে চায় না। তাঁহাদের রচনা পড়িয়া গণ-সাহিত্য কি বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই গণ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়, মোটামুটি বুঝি। সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া যদি বা তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারি, বস্তু-নির্দেশ করিয়া তাহার রূপ দেখাইয়া দেওয়া আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু গণ-সাহিত্য কি বস্তু? গণ বলিতে বুঝি অখণ্ড, সমগ্র সমাজ; আর গণ-সাহিত্য বলিতে বুঝি, যে-সাহিত্যের রস অখণ্ড সমগ্র সমাজ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে, সাহিত্য কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন প্রষ্টার হাতে গণ-সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। সাহিত্য যদি হয় রসাত্মক বাক্য, গণ-সাহিত্য এমন সর্বাঙ্গসুন্দর রসাত্মক বাক্য যাহার রস সর্বজনের পক্ষে অনায়াসলভ্য।

গণ হইতেছে সর্বজন—যাহাকে পূর্বে আমরা অখণ্ড সমষ্টি সমাজ বলিয়াছি; কাজেই গণ-সাহিত্য গণ-সাপেক্ষ। সমাজের অখণ্ডতা বা সর্বজনের একতাই এই সাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা। কোন কারণে কোন সমাজের অখণ্ডতা যদি নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে সেই সমাজের বা সেই সময়ের লেখকের পক্ষে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব কি না? আমাদের বিশ্বাস তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা যে-সমাজে বাস করিতেছি তাহা কি গণ-সমাজ? তাহা কি অখণ্ড? তাহাকে কি সমগ্র বলা চলে? যদি তাহা অখণ্ড ও সমগ্র না হয় তবে এই সমাজের লেখকের পক্ষে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব?

এ-কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গত কয়েকশত বৎসর ধরিয়া ইতিহাসের হাতুড়ির আঘাতে আমাদের সমাজ ক্রমশঃ কাটিয়া ছোটো হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা ভূতপূর্ব অখণ্ড সমাজের অনুভূতপূর্ব এক এক খণ্ডের উপরে বসিয়া আছি, মধ্যে দুস্তর বাধা। আমি যে খণ্ডে আছি আমার সেই খণ্ডের লোকই আমার কথা বুঝিতে পারে—অন্য খণ্ডের অধিবাসীরা আমাকে দেখিতেছে বটে, আমি তাহার কাছে ঐকদিক জীববাস, অর্থাৎ তাহার আমি খরিদ্দার, বা মক্কেল, বা জমিদার বা তাড়াটিয়া মাত্র, কিন্তু তদতিরিক্ত আর কিছুই নয়; তাহার সহিত আমার যে-যোগ তাহা দৈনন্দিন অভাবের সূত্রে; তাহার সহিত আমার ভাব-সূত্র বহু কাল হইল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই বিচ্ছেদের ছবিটা সহরে যেমন প্রকট, পল্লী-অঞ্চলে তেমন নয়। কিন্তু তাই বলিয়া পল্লী-সমাজও আজ আর অখণ্ড নয়, সহরের বন্যা পল্লীতে গিয়া ঢুকিয়াছে। একদিনে পল্লী যখন লক্ষ্মীর ও দেশের আত্মকেন্দ্র ছিল তখন পল্লীই ছিল দেশের ভাব-জীবনের সূত্রধার। এখন সহর হইতেছে দেশের ভাব-নায়ক। সহরে একটা হাওয়া উঠিলে—কালক্রমে তাহা পল্লীতে গিয়া পৌঁছায়। এমন কি সহরের হলকে কোন নাটক সার্টিফিকেট না পাইলে পল্লীগ্রামে তাহা অভিনীত হয় না। আগে সহর, পরে পল্লী; আগে কলিকাতা, পরে বোয়াখালি। কলকথা, দুই-ই আজ সমভাবাপন্ন—কোনখানেই সমাজের অখণ্ডতা আর আজ নাই। এ-হেন খণ্ড-সমাজে বসিয়া অখণ্ড সমাজের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসকে কি বলিব? লেখকদের আন্তরিকতার অভিযোগ নাই করিলাম, কিন্তু জীবনের মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে যথোপযুক্ত জ্ঞান আবশ্যক। জ্ঞান-বিবর্জিত আন্তরিকতার দ্বারা বিভ্রান্তকারী বস্তু আসিয়া যায়।

গণ-সাহিত্যিকগণ বা তাঁহাদের ফিলসফার-গণ বলিতে পারেন যে, গণ নাই বটে কিন্তু ওই গণ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই গণ-সাহিত্যের সৃষ্টি। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, গণ-সাহিত্য রচনা করিয়া সমাজকে সর্বজনীনতার উদ্বোধিত করিবেন এবং উদ্বোধনের ফলে খণ্ড-সমাজ আবার জাগিয়া অখণ্ড হইয়া উঠিবে। একথা যদি তাঁহারা বলেন, তবে অন্তত তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইবেন যে বর্তমান সমাজ আর গণ-সমাজ নয়—তাহা সমাজের অপমৃত্যু খণ্ডাংশ মাত্র। এইবারে আর একটা জটিল তর্কের সৃষ্টি হইল। সমাজ-রচনার উপরে, রাষ্ট্র-সৃষ্টির উপরে লেখকদের কতখানি প্রভাব? লেখকগণ সমাজেরই সৃষ্টি—এই সত্যকে গণ-সাহিত্য-তাত্ত্বিক কারণে অকারণে সর্বদাই ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজকে লেখকগণ কি পরিমাণে সৃষ্টি করিতে সক্ষম? সমাজ ও রাষ্ট্র মুখ্যতঃ সংগঠক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রবীরদের সৃষ্টি; গৌণতঃ ধর্ম, সাহিত্যিকগণ তাহাকে প্রভাবিত করিতে পারেন। তলস্টয়, টলস্টয়, ও বার্নার্ড-শ প্রভৃতি পরিমাণে তাঁহাদের সমাজকে গঠন ও প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন—একথা সত্য, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইঁহারা তিন জনেই কেবল মাত্র সাহিত্যিক নহেন। ইঁহারা তিনজনেই সমাজ-সংগঠক ও ধর্ম-সৃষ্টি-সম্পন্ন Prophet। ইঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি না করিলেও নিজেদের মনীষার দ্বারা স্বকালকে ও স্ব-সমাজকে প্রভাবিত করিয়া যাইতে পারিতেন: আমার তো বিশ্বাস—ইঁহারা যদি সাহিত্যিক না হইতেন, তবে স্ব-সমাজ ও স্বকালের উপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইতে পারিতেন। সাহিত্যিকগণ পরোক্ষভাবে স্বদেশকে প্রভাবিত করেন, সেইখানেই তাঁহাদের সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠা, তাহাতেই তাঁহাদের সাহিত্য-ধর্ম। যদি দেখি যে, কোন সাহিত্যিক প্রত্যক্ষভাবে স্ব-জনকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তবে বুঝিব, সাহিত্যিক-শক্তি ছাড়াও তাঁহার বিশেষ কোন শক্তি আছে, নতুবা বুঝিব এই চেষ্টার দ্বারা তিনি নিজের বিশিষ্ট-ক্ষমতার অপলাপ ঘটাইয়া নিজের ও সাহিত্যের ক্ষতি করিতেছেন। বাংলা দেশের গণ-সাহিত্যপ্রচারকের অবশ্য তো তলস্টয়ের টলস্টয়ের সকলে কাহাকেও দেখিনা। আর এত সূক্ষ্ম বিচারেই বা প্রয়োজন কি? তাঁহাদের সৃষ্ট তথাকথিত গণ-সাহিত্যের দিকে তাকাইলেই মুহূর্তে সব সন্দেহের নিরসন হইবেন। এই সাহিত্যসৃষ্টির মূলে প্রকৃত গণ-সাহিত্যের সর্বজনীন প্রেরণার আভাস মাত্র নাই আছে উপরলীয় তড়বড়ি মাত্র; এই তীব্র বিধাতদি

উপকরণের প্রাচুর্যের বাতাসে মনিয়া উঠিয়াই মিলিয়া যায়; আকাশের তারার শাশ্বত দীপ্তি ইহাদের নাই — আছে ক্ষণীয় বাষ্পের বিষ-নিশ্বাসে কলুষিত সন্ধানের অক্ষিমুখে আকর্ষণ-করা ক্লান্তিতে সকলকারী আলেয়ার চোখের ইঙ্গিত; আর সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে বহু বাঙালী লেখক সেই দিকেই প্রধাবিত। বাংলা সাহিত্যের এই দুর্যোগের রাত্রি প্রভাত হইলে গল্প-সাহিত্যের একদল বাঙালী সাহিত্যিকের হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বকাণ্ড পরিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কে ইহাদের নিন্দা করিবে? তাহাদের এক কালে উপকরণীয় বুক-তন্ত্রের তাত্ত্বিকতা, আর অপর কর্মে জ্ঞান-বিবর্জিত কায়ক্লিকতা নিরন্তর ঘুলাইতেছে। আলোচ্য-মুখ পথিকের চোখে তাহার দীপ্তি অবাস্তব বলিয়াই মনে হয়।

গল্প-সাহিত্যিকগণ একটি ভুল সত্য বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজ প্রভৃতির যেমন বিশিষ্ট দাবী আছে, তেমনি শিল্পেরও একটি দাবী আছে। সেই দাবী উপেক্ষা করিলে সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পেই শিল্পের শেষ বা সার্থকতা, এমন কথা বলিতেছি না। শিল্পের জন্যই জীবন নয় জানি — আরও জানি যে, জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যই শিল্প। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিবার পক্ষে সহায় হইতে পারে এমন বহৎ শিল্প সৃষ্টি করিতে গেলে তাহার দাবী পূরণ করিয়া তাহার নিয়মানুগ হইয়া চলিতে হইবে। ক্ষণীর ধারা বহন করিবার উদ্দেশ্যে, ছকুমিঞার ডাকরা-গাড়ীতে স্বর্গের অশ্বিনীকুমার-যুগলকে জুড়িয়া দিলে চলিবে না। বাংলাসাহিত্যে আজ সেই চেষ্টা ব্যাপকভাবে প্রকট। বহৎ শিল্প জীবনকর্ম-সাধনার উদ্বোধক। বহৎ শিল্পের মুখে মানুষ মানুষের কথা চায়। মনিষ্যের কথা, নিশীথিনীর কথা, ভিক্ষুকের ছিন্নকন্থার তাহার কোন আগ্রহ নাই। কিন্তু জীবনই ছিন্নকন্থা পরিয়া — ভাঙ্গনের ভীষণমূর্তি ধরিয়াই বহুতর বাণীর মন্থনে আবির্ভূত হয়; আর শিল্পলক্ষ্মী — তপস্বিনী উমার — দৃষ্টি তাহার আপাত-দারিদ্র্য ও ক্ষয়ার অন্তরালে নিত্য-যৌবন, অনন্ত-ঐশ্বর্য, শিব-সত্তাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। এইখানেই তো শিল্পলক্ষ্মীর তপস্যার সার্থকতা। জীবনে দুঃখ দারিদ্র্য, দুর্নীতি, মহামারী, অবক্ষয় আছে — কিন্তু যে-শিল্প কেবল ওইটুকুই দেখিল, তদতিরিক্ত মহত্ত্বের আর কিছু দেখিতে বা দেখাইতে সমর্থ হইল না — তাহার কি এমন সার্থকতা? দৈনন্দিন বাস্তবকে জানা-ই যদি সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য হয় — তবে সংবাদপত্র পড়িলেই চলে। পুস্তকাকারে মুদ্রিত সংবাদহীন সংবাদপত্র পড়িতে যাইব কেন? দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের মতো শিল্প মানুষের দৃষ্টিশক্তির বিবর্ধক। কিন্তু যে-শিল্প শাদা-কাচের চশমা, যাহার মধ্যে সেই বাস্তব বাস্তবই থাকিয়া যায় — তাহাকে নাকের সহিত আঁটিয়া রাখিবার কি যুক্তি? শিল্পের দূরবীক্ষণে যদি গ্রহ-তারা নিত্য-রসে উদ্ভাসিত না হইল, অণুবীক্ষণের মধ্যে বস্তুকণিকা-পুঞ্জের কুরুক্ষেত্র সম্পন্ন যদি না ঘটিল — তবে এত যন্ত্র করিবার সার্থকতা কোথায়?

শিল্প মানব-জীবনোপলব্ধির সহায় বলিয়াই মানুষ শিল্পের মধ্যে সেই মানুষের কথাই শুনিতে চায়। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি প্রকৃত গল্প-সাহিত্যের মূলকথা মানুষের কথা। ইহাদের সবগুলিই প্রথমে চরিত্র — সম্রাট, রাজা, সামন্ত-বীরপ্রকৃতি; অর্থাৎ, গল্প-সাহিত্যিকদের ভাষায় aristocrat। রাজা-বাদশাহের কাহিনী লিখিত হওয়া সত্ত্বেও এই সব মহাকাব্য রাজার রাজার বলিয়া লোকে — এবং সর্বশ্রেণীর লোকে — কেন আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়া আসিতেছে — ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? তাহার একমাত্র কারণ, ব্যাস,

বাল্মীকি ও হোমার মহৎ-শিল্পের স্বাভাবিক নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাস্তবের কথা লিখিয়াছেন, আর সেই টানে জীবনের দুঃখ-দৈন্যও আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা জানিতেন, কবিতাকে বর্ণিতব্য মতো করিয়াই আকর্ষণ করিতে হয়। পাণ্ডবগণের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ সত্য হইয়াছিল — কেননা তাঁহারা বাস্তবটিকে চাহিয়াছিলেন। দুঃশাসন বৃথা তাহার বসন ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে পায় নাই — বরঞ্চ ক্রুদ্ধ ক্রোধের ফলে তাহাকে মরিতে হইয়াছিল। গদ্য-সাহিত্যিকগণ সেই দুঃশাসনের লীলায় নিযুক্ত। শিল্পলক্ষ্মীর বসন আকর্ষণ করিয়া তাহারা তাহাকে পাইতে চায়! হোমার যদি মুখ্যতঃ দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা লিখিতেন তবে তাঁহার কাব্য আজ কেহই পুস্তিকাবদ্ধ করিয়া রাখিতনা — এমন কি, তাঁহার নিজেরও তিলমাত্রই ত্রুটি কিনা সন্দেহ। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার মহৎ-শিল্পের নিয়মজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টিকে বিলুপ্ত বাধা দিতে পারে নাই, না রাজার ঐশ্বর্য্য, না দরিদ্রের কথা — সর্ব্বত্রই তাঁহারা বাস্তবকে আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কবিত্ব গদ্য-সাহিত্যিকদের এমনই দুর্ভাগা যে, একটা আস্ত বাস্তব পাইলে তখনই তাহার ঘরোয়ার দুর্গত ঐকদেশিক বাস্তবটাকে তাহারা আবিষ্কার করিতে না পারে ততক্ষণ তাহাদের স্বস্তি নাই। পুরাকালের এক রাজা যাহা স্পর্শ করিতেন, সোনা হইয়া যাইত। গদ্য-সাহিত্যিকগণ যাহা স্পর্শ করে অমনি তাহা লোহা হইয়া যায়। বাস্তবের ঐকদেশিক কঙ্কালটাকে আবিষ্কার করাই তাহাদের শিল্প-ধর্ম্ম। রক্তমাংসের সজীব বাস্তব ছাড়া আর কিছুতেই শিল্পের চিরন্তন আগ্রহ নাই। সে ঔপন্যাসের গল্পের কাঙ্কালের মতো জীবন্ত বাস্তব ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করে না। আমাদের গদ্য-সাহিত্যিকদের সাহিত্য কঙ্কালের কারখানা। তাহাতে কঙ্কালের কৌতূহল আছে, চিরকালের সহানুভূতি নাই।

[২]

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গদ্য-সাহিত্য বলিতে কোন্ শ্রেণীর রচনা বুঝি, প্রসঙ্গতঃ আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখানে অধিকতর দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

হোমারের কাব্য গদ্য সাহিত্য; তাঁহার কাব্য-দ্বয়কে গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। গ্রীক ট্র্যাজেডি-লেখকগণের রচনা কেবল আংশিক গদ্য-সাহিত্য। গ্রীক ট্র্যাজেডি বিশেষ একটা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের একান্নভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হোমারের কাব্যের প্রতিষ্ঠা অধিকতর বিস্তৃত ভূমির উপরে। তাহাদের উপভোগের জন্য কোন বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাসের ঘটকালির প্রয়োজন হয় না।

আবার ইংরাজি সাহিত্যে চসারের কাব্য ও শেক্সপীয়রের নাটক গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শেক্সপীয়রের পরে ইংলণ্ডে গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। ফরাসী সাহিত্যে অনেক মহারথ সাহিত্যিক আছেন, ফ্রান্সই তো আধুনিক ইউরোপের কবি-কুল-গুরু। তৎসত্ত্বেও ফরাসীর ভাষায় যে গদ্য-সাহিত্য রচিত হয় নাই, তাহার কারণ, বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্যের অনুদয় হয় এমন একটা সময়ে — যখন ফরাসী-সমাজ খণ্ডিত হইয়া রহিয়াছিল। মার্টিন লুথারের নব ধর্ম্মমত-প্রচারের ফলে ফরাসী সমাজে, তথা পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রেরই সমাজ-জীবনে প্রকাণ্ড একটা ফাটল দেখা দিয়াছিল। ফরাসী-সাহিত্যে গদ্য-সাহিত্যের সন্ধান করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে যাইতে হইবে। ফরাসীর পুরাণে ও রূপকথায় গদ্যসাহিত্যের উপাদান নিশ্চয় আছে। কিন্তু যখন হইতে সে-সাহিত্য ইউরোপীয় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ গ্যয়টের পরবর্ত্তী যুগ —

তখন আর প্রকৃত গল্প-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই।

গল্প-সাহিত্য আরও আধুনিক। টলষ্টয় পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহার War and Peace আধুনিক জীবনের মহাকাব্য। তৎসত্ত্বেও তাহা গল্প-সাহিত্য-নয়। বস্তুত তাঁহার Twenty-Three Tales কিয়ৎ পরিমাণে গল্পসাহিত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ফরাসী-দেশের সমাজ গল্প-সাহিত্য-রচনার পক্ষে অধিকতর অনুকূল ছিল। কারণ সেখানে ধর্মবিষয়ক কটিল ধারে নাই — আর রাষ্ট্রীয় একাত্মভূতি ফরাসী-বিপ্লবের আগে অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তথাপি সে দেশে গল্প-সাহিত্য বিরল। ফরাসী গল্পসাহিত্যের নমুনা সংগ্রহ করিতে হইলে Chanson de Roland-জাতীয় রচনার নাম করিতে হয়। ফরাসী দেশে কর্নেই, রাসিন প্রভৃতি মহাযশ নাট্যকার আছেন। কিন্তু ইঁহারা ক্লাসে'ক-সমাজের জন্য নাটক লিখিয়াছিলেন — সমগ্র সমাজের রস-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নহে। মলিয়েরের নাটকে গল্প-সাহিত্যের উপাদান অধিকতর পাওয়া যায় বটে।

ভারতীয় ভাষাসমূহে গল্প-সাহিত্যের দৃষ্টান্ত অবিরল নহে। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত গল্প-সাহিত্য। হিন্দী তুলসীদাসী 'রামচরিত-মানস' গল্প-সাহিত্য। বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামী মহাভারত গল্প-সাহিত্য। চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের গীতি-কবিতা গল্প-সাহিত্য। বাংলার পাঁচালী ও যাত্রা (নিতান্ত আধুনিক কালে লিখিত যাহে) গল্প-সাহিত্য। ময়মনসিংহ-গীতিকার অনেকগুলি পালা (আধুনিক গবেষক-গণের তুলহস্তাবলেপের চিহ্ন ছাড়িয়া দিলে) গল্প-সাহিত্য। কালিদাস ভারতীয় লৌকিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাঁহার কাব্য ও নাটক গল্প-সাহিত্য নয়। দৃষ্টান্ত আরও বাড়ানো যাইতে পারে — কিন্তু ইহাই যথেষ্ট মনে করি।

যে-সব রচনার নামোল্লেখ করিলাম তাহাদের কথা ভেদ, কাল ও রসোত্তীর্ণতায় প্রভেদ বিস্তর। হোমারের কাব্য ও বাংলা পাঁচালীর একত্র উল্লেখ এই বোধ হয় প্রথম — কিন্তু তাহাতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। আমার কালিদাসের কাব্যকে যে-শ্রেণীর ধ্যান করিতে পারি নাই, সেই শ্রেণীর যাত্রাওয়ালা ও পাঁচালীওয়ালাদের আসরে জুটিল — ইহাকেও অনেকে অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারেন।

কিন্তু কেবল স্মরণ রাখিলেই চলিবে যে, গল্প-সাহিত্য আর উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সর্বত্র এক বস্তু নয়। কোন রচনা গল্প-সাহিত্য হইয়াও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য না হইতেও পারে — আবার কোন রচনার পক্ষে একাধারে গল্প-সাহিত্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হওয়া অসম্ভব নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও গল্প-সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রসোত্তীর্ণতার বিচারে ওডিসি বা রামায়ণের চেয়ে উৎকর্ষ — কিন্তু বাংলা যাত্রা-পাঁচালী কিছুই নয়। রসোত্তীর্ণতার বিচারে শকুন্তলা চেয়ে উৎকর্ষ — কিন্তু তবু তাহা গল্প-সাহিত্য নয়। যে-সব রচনার উল্লেখ আমরা করিয়াছি — পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের মাঝার ছোট-বড় সহজেই চোখে পড়িবে — কিন্তু তবুও তাহাদের মধ্যে একটা ঐক্য আছে, তাহাদের পাত্রের নীচের ভিত্তিটা একই সমতলে অবস্থিত। আর একই সমতলে দণ্ডায়মান বলিয়াই হোমারের ও অন্যান্য বাঙালী পাঁচালীকারের মাথার উচ্চনীচতা অতি অনায়াসে লক্ষ্য হইয়া ওঠে।

গল্প-সাহিত্য বলিয়া উল্লেখিত রচনাসমূহের আপাত-বৈসাদৃশ্যের অন্তর্গত সামান্য ধর্ম বা লক্ষণটি কি? গল্প-সাহিত্য সমাজের সেই অবস্থায় রচনা

যখন সংঘবদ্ধ সমাজ অক্ষুণ্ণ ছিল। যখন লেখক ও তাঁহার পাঠকসমাজ একই বিশ্বাস, একই সংস্কার (অনেক সময়ে কুসংস্কারও বটে), একই স্বর্গ-নরক ও পরিত্রাণে আস্থাবান ছিল। অর্থাৎ হোমার ও একজন নবদ্য গ্রীক একই সমতলে অবস্থিত ছিল; তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষী ও অন্যান্য পাঁচালী-কার একই বিশ্বাসের আবহাওয়ায় বিচরণ করিত। হোমার ও তৎকালীন সাধারণ একজন গ্রীকের মধ্যে যে-প্রভেদ তাহা কেবল ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রভেদ। তাহাছাড়া অন্য প্রভেদ ছিল না। শেক্সপীয়রের সহিত Tudor-ইংলণ্ডের সাধারণ অধিবাসীর মৌলিক কোন প্রভেদ নিশ্চয় ছিলনা। শেক্সপীয়রের নাটকে অনেক অতিপ্রাকৃত ব্যাপার আছে। সেই সব অতিপ্রাকৃতে শেক্সপীয়র নিজে বিশ্বাস করিতেন কি না এমন একটা বিতর্ক শুনিতে পাওয়া যায়। শেক্সপীয়র বিশ্বাস করিতেন কিনা জানিনা — তবে একথা বলিতে পারা যায় যে, তিনি ও তাঁহার সমাজের সমস্তরের ব্যক্তি অতিপ্রাকৃতে একই প্রকার বিশ্বাস পোষণ করিতেন। সকলকথা তাঁহার ও তৎকালীন অন্যান্য, অজ্ঞাত একজন ব্যক্তির মধ্যে যে-পার্থক্য তাহা তুলনাত্মক নয়, বিভাজাই ধরণাগত। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কালের একজন অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তির-মধ্যে যে পার্থক্য তাহা আর ধারণাগত নয়, একেবারে তুলনাত্মক। তিনি ও উক্ত-ব্যক্তি এক সমতলে অবস্থিত নহেন। পায়ের তলাকার মাটিতে উঁচুনীচু ঘটিয়া গিয়াছে। গল্প-সাহিত্য-সৃষ্টির যে সমাজ তাহার ভূমি একটানা সমতল, আর আধুনিক সমাজের ভূমি অনেকটা ঢেউখেলা সোপান-পরম্পরার মতো। এমন লেখক যে-সোপানে, পাঠক সে সোপানে নয়—সব পাঠক এক সোপানে নয়; এই ভাবে ক্রমোন্নয়ন বলিয়াই অনেক সময়ে সকলকে হাসার সমান দেখায় — তাহাকেই আমরা গল্পস্তরের সুফল বলিয়া মনে করি, কিন্তু পায়ের তলাকার মাটির দিকে তাকাই না। তাকাইলে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিতাম।

সমতল সমাজ যে সোপানীকৃত সমাজ হইয়াছে, অথচ বিশ্বাসের বন্ধন যে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, একই সমাজ যে বহু সমাজের স্তরে পরিণত হইয়াছে — ইহার মূলে দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক হাতুড়ির আঘাত আছে। সে-সব বিচারের সময় এখন নয়। কিন্তু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা ইতিহাসের হাতুড়ি যতক্ষণ না সোপানীকৃত সমাজকে এক সমতলে পরিণত করিতেছে — ততক্ষণ গল্প-সাহিত্য-রচনার পটভূমি প্রস্তুত হইবে না। গল্প-সাহিত্যের পটভূমি যা আবহাওয়া রচিত হইলে লেখকগণ অনায়াসে গল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন, তজ্জন্য কোন ছেনী-বাটম বা আলোকনের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু সেই পটভূমি রচনা কোন সাহিত্যিকের সাধ্যায়ত্ত নয়। যে-সব ঐতিহাসিক কারণে ইতিহাস সৃষ্টি হয়—তাহার উপরে সাহিত্যিক-দের প্রভাব অতিসামান্য। যতদিন না সমাজে সেই অবস্থার উদ্ভব হইতেছে ততদিন লেখকগণ 'দুর্যোধন'-সাহিত্য রচনা করিলে শক্তির অপব্যয় করা হইবে — নিজের পক্ষে তোরা-কাদবার বালাই নামিয়া পড়িলেও অধিকতর সুফল পাইবার আশা।

(৩)

গল্প-সাহিত্যের একটি প্রধান অন্তরায় গদ্যছন্দ। কথাটা একটু বিচার করিয়া দেখা যাক্। গল্প-সাহিত্য বলিয়া যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের প্রায় সবগুলি কবিতায় লিখিত। গল্প-সাহিত্যের বাহন ছন্দ। এই অত্যাবশ্যক তথ্যটি সর্বদা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সাহিত্য গল্প-সাহিত্য হইয়া উঠিতে গেলে প্রথমে তাহাকে ছন্দ-বাহন আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সে আশা গদ্যস্তরের সুদূর-অস্তে হলিয়া মনে করা। গদ্যস্তরের ভাষা গদ্য, গদ্য চিন্তার বাহন। গদ্য অনুভূতির বাহন। চিন্তার

বাহুতে বাহুতে যাওয়া; অন্তরিন্দ্রিয়ে অন্তরে মানুষে ঐক্য। এই তান্ত্রিক সমাজ মানুষ হইতে মানুষ ক্রমেই অধিকতর পৃথক হইয়া পড়িতেছে। সেই ক্রমবর্দ্ধমান দূরত্বকে জোড়াতালি দিয়া ঢাকিবার চেষ্টায় গদ্য-সাহিত্য নেহাৎ প্রোপাগ্যাণ্ডা করিয়া মরিতেছেন। গদ্য-সাহিত্যের যাহারা পদ্য হওয়াতে মানুষকে একাত্মভূতির অনেক বন্ধনে যে কেবল দূর সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাই নয়; সে সংকুচিত হো সমাজের অখণ্ডতাতেই সম্ভব হইয়াছে; ছন্দ সমাজের সেই মৌলিক অখণ্ডতাকে রক্ষা করিতেছে — সমাজ যাহাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতেছে। হোমার গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেন, ইহা বাস্তব তথ্য কি না জানিনা। তবে ইহার ভাবগত সত্যে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। হোমারের ভিক্ষাবৃত্তি কেবল কবিত্বের গুণ হইতে আসিত না, তাহাতে ধনীর ভাণ্ডারের দানও ছিল। অর্থাৎ ধনীর হইতে দরিদ্রতম — সমাজের সুরসপক্ষ — সকলেই তাঁহার গানে জাগিয়া উঠিত। এই খানেই তাঁহার গানের সর্ব্বজনীনতা। এখন আমরা কি করি? ভিক্ষুক আসিয়া জানালার বাহিরে গান ধরিলে তাহাকে গান থামাইতে বলিয়া তবে ভিক্ষাবৃত্তি দান করি। তাহার গানকে আমরা স্বীকার করিনা। অর্থাৎ একটা ভিক্ষুক আমাদের কাছে আজ বিতাড়িত একটা 'ইকনমিক জীব' মাত্র — তত্ত্বোক্তিক কিছু নয়। কিন্তু হোমার তাঁহার সমাজে ভিক্ষুক ছিলেন না — তিনি বৈশ্বানী বিতরণ করিয়া ফিরিতেন। তখনকার সমাজ অখণ্ড ছিল — ছন্দ অখণ্ড সমাজের বাঁধুনি ছিল, সমাজের অখণ্ডতা বজায় রাখার তাহার হাত ছিল। ছন্দ যুগপৎ অখণ্ড সমাজের সৃষ্টি, আবার অখণ্ড সমাজের রক্ষক। আধুনিক সমাজ বহুখণ্ডিত, ছন্দ এখানে একেবারেই পঙ্গু।

আধুনিক খণ্ডিত সমাজের সাহিত্যিক রাজপথ উপন্যাস। অখণ্ড সমাজের রাজপথ ছিল মহাকাব্য বা নাটক। উপন্যাস একক-পাঠকের পাঠ্য, মহাকাব্য বা নাটক যৌথ-পাঠকের প্রাপ্য। আধুনিক পাঠক নিঃসঙ্গ — সে একাকী বসিয়া ফলপের ধনের মতো উপন্যাসের রসাস্বাদন করে। গদ্য-সাহিত্যের যেযে পাঠক বলিয়া কিছু ছিল না — তাহারা সকলেই ছিল শ্রোতা। যৌথভাবে, সমবেতভাবে তাহারা কাব্যরস উপভোগ করিত। লোকে যেমন দল বাঁধিয়া মেলা দেখিতে যায়, দেবদর্শনে যায় — তেমনি যাত্রা শুনিতে, পাঁচালি শুনিতে বা কথকতা শুনিতে যাইত। তখন লেখকের সহিত শ্রোতার, শ্রোতার সহিত শ্রোতার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ছিল। এই অনিবার্য্য 'সহিতের' সম্বন্ধে সাহিত্য তখন সত্যই সাহিত্য ছিল। এখন সাহিত্য আর সাহিত্য নয়। সেই অনিবার্য্য 'সহিত' মুছিয়া দিয়া সাহিত্য এখন তাহার মৌলিক অর্থ ত্যাগ করিয়াছে। যতদিন সাহিত্যের মধ্যে 'সহিতে'র ভাব ফিরাইয়া আনা সম্ভব না হইতেছে — ততদিন গদ্য-সাহিত্য কেমন করিয়া সম্ভব?

তবে কি ছন্দ অবলম্বন করিয়া ছড়া লিখিলেই গদ্য-সাহিত্য হইয়া উঠিবে? তাহাও হইবার নয়। যে-হেতু ছন্দ সমাজের একটা বিশেষ অবস্থার লক্ষণ, সেই বিশেষ অবস্থা যতক্ষণ না ফিরিতেছে ছন্দ ফিরিবে কেমন করিয়া? তেমন বৃথা চেষ্টা করার চেয়ে বরঞ্চ গদ্যে লিখিয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তাহাতে গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টি হইবে না বটে — তবে গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

বর্ত্তমান যুগ সাহিত্যকে কান হইতে চোখে ঠেলিয়া দিয়াছে, সাহিত্য আর শ্রাব্য নয়। গদ্য-সাহিত্যের একটা লক্ষণ যেমন ছন্দ, তেমনি আর একটা লক্ষণ — তাহা শ্রাব্য। বোধ করি, ছন্দযুক্ত বলিয়াই শ্রাব্য হওয়া সম্ভব হইয়াছে, বোধ করি অখণ্ড সমাজে

শ্রাব্য হওয়াই স্বভাব-সঙ্গত, কিন্তু বর্তমান সাহিত্য পাঠ্য। চোখের সাহিত্য মস্তিষ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। কানের সাহিত্যের সে বাধা নাই। অর্থাৎ চোখে-পড়া সাহিত্যের আদরে অধিকাংশ লোকের স্থান নাই — কানে-শোনা সাহিত্যের অভাব আসর। সাহিত্য অক্ষর-গত হইয়া পড়াতে তাহার সীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টির পক্ষে ইহাও একটা অন্তরায় বটে। কোন-কালে সাহিত্য যদি আবার শ্রাব্যের লাভ করে, তবেই গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির পথ সুগম হইবে। যন্ত্রের বহু-প্রচলনের ফলে সাহিত্য কিয়ৎ পরিমাণে শ্রাব্য হইয়াছে। রেডারের প্রচার সর্বজনীন হইলে, তাহার অপব্যবহার বন্ধ হইলে, শুধু দুনিয়ার সহযোগে তাহার সদ্ব্যবহার হইলে — তবে হয় তো সাহিত্যের শ্রাব্যত্বের আবার ফিরিয়া আসিলেও আসিতে পারে। শ্রাব্যত্ব ও দৃশ্য — গদ্য-সাহিত্যের দুই প্রধান লক্ষণ। কিন্তু লক্ষণ ফিরিয়া আসিলেই যে বস্তুটি ফিরিয়া আসিবে এমন মনে করিবার হেতু নাই। গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চাই সমাজের অখণ্ডতা। সেই অখণ্ডতা যতদিন না সাধিত হইতেছে — ততদিন গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির কিছুমাত্র আশা নাই।

বর্ষার বন্যা বেলায় বেড়েছে,
খালি শোন, 'শন্ শন্' —
ডুবে ডুলেগুলো তার বা খাদিয়ে
প্রলয়ের গর্জন!
বিশ্রাম নাই, 'পড়্', 'পিছ্',
বন ঘুরে ঘুরে' ফিরে',
'মোরাও জোছনা' — কপিতা করিয়া
জপে যেন বাকী ঝুরে।

হেসে বাণী কন্—"যেন টলমল
কমল-লোচন ওরে!
খোলাটে রাতের অপচায় ওরা—
প্রভাতেই যাবে সরে'।
হবে অমৃত, তাতাতে হবে না
কিটিরের ভাঁড়া দিয়া,
হবে না তা' ছাড়া, মধুর ভাষাকে
জোছনায় ম্যালেরিয়া।"

— সুচোত্রনাথ

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি—প্রথম, যে-রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায়, অতিশয় মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী—বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিব্য-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

(১)

লায়লা-মজনুঁ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এদিকে তার পিতার সেই পর্ব্বতনিবাসে বড় দুঃখে দিন কাটছিল লায়লার। তার পিতার পরম স্নিগ্ধ-শান্ত ইবনে সালাম ভক্তিপূত লায়লার পাণিপ্রার্থনা করে' তার বাপের কাছে যাওয়া-আসা করছিল। কেবল মেয়ের মুখপানে চেয়ে, তার অনিচ্ছা আর ভাষা দেখে, তিনি অনুমতি দিতে পারছিলেন না—তাকে কেবল এই বলে' আশ্বস্ত করছিলেন যে, লায়লার এখনও বয়স হয় নি, আর কিছুদিন যাক্, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ তরুণ যুবাটির উপরে, তরুণী-সর্দ্দারের একটু বিশেষ নজর ছিল, এর কারণ, তার ধনসৌষ্ঠবও যেমন প্রচুর, তেমনই তার অধীনে সৈন্যও ছিল অনেক। লায়লা দিনের আলোয় আর বার হত না, রাত্রে নক্ষত্ররা আকাশের ছাদে এসে বসত, মনে মনে বলত, "আমি চিরকুমারী থাকব সেও ভাল, তবু মজনুঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি পতিত্বে বরণ করব না; আহা, মজনুঁরও অবস্থা আমারই মত, সেও পাগল হয়ে গেছে।"

লায়লার পায়রাটুটি এখন আর তার কাছে নেই—তারা সেই তার পেতের বাড়ীতে সেই গাছটির ডালে বাস করছে; বাড়ীর কর্ত্রীরাই তাদের দেখাশোনা

করে। তবু তাদের দেখেও সে প্রাণে একটু শান্তিবোধ করত, তাদের একটিই ত' একদিন তাদের প্রেমের দূতিয়ালী করেছিল। এখানে তার জন্যে একটা ছোট বাদের খাঁচা গোথা হয়েছে — একটা কাঠী ক্রীতদাসী ছাড়া আর কাউকে সে যানে না; কিন্তু পাহারাদের মত সে তো আর তার সঙ্গে প্রেমের কথা বলতে পারবে না। একদিন এক বাঁদী তাকে একটা ময়না-পাখী এনে দিলে, বললে — "জাহাজে যে এক বাদক-প্রবাসী আছে, সে পাহাড়ের বন থেকে এটাকে ধরে' এনেছে, তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর বলে' এটা তোমাকেই দিতে বলেছে।"

সেই নির্জন-বাসে এই পাখীটা লায়লার বড় আদরের বস্তু হয়ে উঠল; দুদিন পরেই দেখলে, পাখীটা তার গলার স্বর অবিকল নকল করতে পারে। অমনি সে তাকে একটি মাত্র কথা শিখিয়ে দিলে — একটি মাত্র। তারপর পাখীটাকে হাতের উপর বসিয়ে সে কতবার পর কতবা কাটিয়ে দিত — সেও অতি সুকোমল স্বরে সেই একটি শব্দ উচ্চারণ করত — মজনুঁ। বারবার সে ওই একটি নাম — তাদের তার কাছে সবচেয়ে যা মিষ্টি — সেই নামের সুধা তার কানে বর্ষণ করত — মজনুঁ, মজনুঁ। তখন তার প্রাণখানি যেন মেহ ছেড়ে জনহীন দিশাহীন মরুপ্রান্তরে খুঁজে বেড়াত সেই একজনকে — সেই তার মজনুঁকে।

যখন তার প্রাণ-মনের অবস্থা এমনই, তখন একদিন ভোরের বেলায় মুবারক তার বিরাট সৈন্য-বাহিনী সঙ্গে করে' সেই দেশে উপস্থিত হ'ল, তাদের প্রাসাদের কবাটে তালোয়ার হেনে সে কলরাপত্তিকে ডাক দিলে তার সামনে এসে দাঁড়াতে।

যখন দূরে পাহাড়তলায় পিছনে প্রভাত-সূর্যের আলো ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই সময়ের মধ্যে দুইপক্ষে সংক্ষেপে কথাবার্তা হ'ল। সূর্য্য যখন হঠাৎ একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠে সূর্যের প্রাকার-দ্বারে করাঘাত করলে তখন মুবারক কথা শেষ করে' সদলবলে ফিরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে — পিছনে যে সৈন্যদল আসছিল ইয়েন-সর্দারের, তার সঙ্গে যোগ দিতে। সূর্য্যকে আড়াল করে' সেই যে ধূলার মেঘ উঠল, ময়না-সর্দার তার পানে চেয়ে বুঝতে পারলেন যে, এ যুদ্ধই নিশানা, বড় অস্বস্তিতে বাস এই বুদ্ধ।

ইবনে লায়লের ছাড়া ঠিক পাশেই। যেমন সে শুনল যে তাকেই কল্লাশাহ করবে বলে' ময়না-সর্দার মুবারকের প্রস্তাবে রাজী হয়নি, সেই জন্যই হঠাৎ মহম্মদের অভাস মেহের ঝড় উঠেছে, তখনই সে ময়না-সর্দারকে সাহায্য করবার জন্যে এক হাজার বোদ্ধা পাঠিয়ে দিলে — ঐ হাজার জন কিন্তু তার মোট সৈন্য-দলের এক তৃতীয়াংশ হবে না।

দূরে না হতেই ইবনে লায়লের অশ্বারোহী সৈন্য দলে দলে এসে পৌঁছল। তারপর তার জনাকোটিকে বলে দেখলে তাদের সেই বীরবেশ ও বীর-ভঙ্গি। তারপর দূর মরুপ্রান্তরের দিকে চেয়ে সে দেখতে পেলে এক বিরাট সেনাবাহিনী এইদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে — তাদের ঘোড়ার খুরে আকাশ ধূলিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

তাই দেখে লায়লা কেঁদে উঠল, "হা অদৃষ্ট আমার! ঐ কলিজাটার যে বড় রাজা দিচ্ছে তারই কারণে এই বিপত্তি! একদিকে পিতা আর দিকে মজনুঁ, আমার প্রাণ যে কাউকেই ছাড়তে চায় না! আমাই এ দুয়ের মধ্যে যাকে হয় একজনকে বলী করবে।"

তারাও তারি বিপরীত খেলা খেলতে লাগল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তার কাণে পৌঁছতে লাগল ঢাকের ঘুমের ঝঙ্কার — আশা ও হতাশার মধ্যে তার প্রাণখানি ক্রমাগত দুলতে লাগল, পরে সে স্পষ্টই দেখতে পেলে ইবনে লায়লের সৈন্য হটতে সুরু করেছে। তার পিতার পক্ষবল ক্রমাগত তাদের হতবল করে দিচ্ছে, শেষে হতাশস্থিতির ফল হর্ষের ভিতরে এসে আশ্রয় নিলে। দুর্গের দরজাও বেজে গেল, এবার সবই বুঝি যায় — অথবা সব রক্ষা হয়!

একজন দূত এগিয়ে এসে জানিয়ে দিলে, কি সর্তে তারা আত্মসমর্পণ করতে পারে। লায়লা তার সেই জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে শুনতে লাগল। প্রথমে কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, শেষে এই পরাজয়েও অপরাজিত তার পিতার স্নেহোদ্বেল উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে এল, তিনি বলছেন —

"আমি যদি নিজে হাতে আমার কন্যাকে তোমাদের হাতে সমর্পণ না করি, তবে তোমরা তাকে জোর করে' কেড়ে নেবে। বেশ; কিন্তু তোমরা তাকে জীবিত পাবে না। আমার সব গেছে, তবু আমার কৃতাগণ আমার আদেশ পালন করবে। আমি যদি হুকুম করি, তবে তার দুজনেই তোমরা চাইবামাত্র পাবে।"

এই কথা শুনে ইমেন সর্দার তাঁকে এমন ভয়ানক কাজ করতে নিষেধ করলেন, বললেন,

"শোন, বাহরা-সর্দার, আমি তোমাকে একদিনের সময় দিচ্ছি, তুমি চিন্তা করে' দেখ। দুই বিকল্প দেখবার আছে, — এক, তুমি আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবার জন্য তোমার কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করবে, তা'তে উভয়ের অবশ্য বন্ধুত্ব স্থাপন হবে; আর এক — তুমি তোমার কন্যাকে আপন অধিকারে রাখ, কিন্তু তোমার রাজ্য ও রাজধানী আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, তোমাকে আমার অধীন হয়ে থাকতে হবে।"

এই বলে' ইমেন-সর্দার নাক্কলকে নিয়ে সরে' গেলেন, পরদিন রাত্রি-প্রভাতে বাহরা-সর্দারকে জবাব দিতে হবে।

এদিকে ইব্‌নে সালামও চুপ করে' বসে' ছিল না, সে একটা বড় কৌশল করেছিল। সে চারিদিকে যে সব চর পাঠিয়েছিল তাদের একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, সে যেন খানিক দূর পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বলে যে, সে ইমেন থেকে আসছে, সে দেখে এসেছে, হুকুম পেয়ে এক জায়গায় জড় হয়ে পড়ে রয়েছে— রাত্রিকালে সে তার রক্ষীদের পাহারা এড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো লায়লার সন্ধানে। কথা সত্যি না হলেও নেহাই সত্যি হবে উঠবে, কারণ, ইব্‌নে সালাম তাকে খুব ভরসার কথা অনেক বলে পাঠিয়েছিল। এই খবর খুব শীঘ্র প্রচার হওয়া দরকার; সেই সঙ্গে সে বাহরা সর্দারকে সাহায্য করবার জন্যে আরও বড় একদল সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব মুহম্মদের করে' পাঠাবে; তাতে দুই কাজই হবে, মক্কার চতুর্দ্দিকে লায়লার যাবি হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না; লায়লার পিতাও এই বিপদে আমার ঐ রকম সাহায্য পেলে তাঁর প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করতে আর বিলম্ব করবেন না।

বিজেতার বল যেই দূরে সরে' দাঁড়াল, ঠিক সেই সময়ে ইব্‌নে সালামের সেই দূত উচ্চ শব্দকে ভবিষ্যৎ রূপে সেই সংবাদ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে দিলে। ইমেন-সর্দার তাই শুনে শোকার্ত্ত হয়ে রোদন করতে লাগলেন। নাক্কল বললে, "এখন আর লায়লাকে আমাদের কি প্রয়োজন? কাল ভোরে আমরা আমাদের দাবী আরও বেশি করে জানাবো।" কেবল লায়লার পিতা আর ইব্‌নে সালাম এই সংবাদে কাতর হল না; ইব্‌নে বললে, 'এখন আর তোমার কন্যার সম্বন্ধে কোন বাধা রইল না; নারীর পক্ষে হৃদয়ের চেয়ে জীবিতই অধিক বাঞ্ছনীয়। আমি তোমাকে একবার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছি, আবার তার তিনগুণ সৈন্য আমি তোমার পক্ষে দাঁড় করাতে পারি, আমার হুকুম পেলেই তারা মরুভূমি থেকে বেরিয়ে আসবে—কেবল তোমার কন্যার ঐ একটি কথা পেলেই আমি তা' করব। অর্দ্ধেক তোমার এইখানে থেকে যুদ্ধ করবে, বাকি অর্দ্ধেক মরুভূমির দিক থেকে এসে পিছন থেকে ইমেনের সেনাদলকে আক্রমণ করবে। তা হলেই তোমার ঐ শত্রুসৈন্য ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে যাবে। এখন তবে তোমার মেয়েকে গিয়ে বল যে, মাত্র তার একটা কথায় তুমি সর্ব্বনাশ থেকে রক্ষা

পাবে, শুধু তাই নয়, তোমার মান-মর্য্যাদা আগের চেয়ে আরও বেড়ে যাবে।"

বসরা-সর্দ্দার তাঁর স্নেহের কারণ জেনেন; মারীচক্রের হাহাকার-রব শুনে ইব্‌নে সালাম বুঝতে পারলে যে, মঞ্জুর বিদ্যা দুষ্ট্রাস-রোগে কাজ হচ্ছে—লায়লা বিষাদ করেছে। বসরা-সর্দ্দার তাকে কতরকম করে' বোঝাতে লাগলেন, কাতরভাবে অনুনয় করতে লাগলেন। ইব্‌নেকে বিবাহ করলে তাঁর প্রাণ ও মান দুইই রক্ষা পায়, নইলে আর রক্ষা নেই, একসঙ্গে সব যাবে। লায়লার চক্ষু দুটি জলে ভেসে যেতে লাগল, সে বুঝতে পারলে তার পিতার হাতে এই আত্মবলি তাকে দিতে হবে; সে কর্ত্তব্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ইবনে সালামকে পতিরূপে বরণ করতে সম্মত হ'ল—তাতে প্রেমের লেশমাত্র রইল না।

এর পর যা' হবার তাই হ'ল। ইবনে সালাম যা স্থির করেছিল, সে সুযোগ সে কৌশল করেছিল, তার সবই ফলে' গেল। পরদিন সকালে বসরা-সর্দ্দার যখন বিস্তর সাক্ষ্যে বিপক্ষের কোন সাক্ষী গ্রাহ্যযোগ্য করলে না, তখন তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল; কিন্তু কিছুরই চক্রান্ত না জানতে পেরে তারাও নিজেদের অজ্ঞাতে মিঃসংশয় হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। এ পক্ষের সেনাদল বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধ যেন কঠিন হয়ে উঠল, তেমনই উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। শুধু স্যাকল ও ইবনের হৃদয়ও অজ্ঞাতে মিশ্চিন্ত; পরে যখন প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করে বসরা-সর্দ্দারকে প্রায় সম্পূর্ণ পরাজিত করবে, সেই শুভক্ষণ দেখে, হঠাৎ পিছন থেকে অসংখ্য সওয়ারের অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল, এবং তার কিছু পরেই সেই নূতন সেনার প্রচণ্ড আক্রমণে তারা যেন নিমেষে বিধ্বস্ত হয়ে গেল — যারা বাকি ছিল তারা ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতই উড়ে গেল।

ইবনে-সর্দ্দার মুগ্ধ হয়ে হাসলেন। স্যাকল বিদ্যুৎবেগে পর্য্যন্ত সকল পশ্চাদ্ধাবনকে তুচ্ছ করে, ঘোড়ার উপর বসেই আত্মহত্যা করলে—জীবনেও সে যেমন ঘোড়ার পিঠ কখনো ত্যাগ করেনি, মরণেও তা' করতে হলনা।

বসরার জয় হ'ল। সেই রাত্রেই লায়লাকে তার পিতা ইব্‌নে সালামের হাতে সঁপে দিলে। বসরা-সর্দ্দারও সেই রাত্রে মারা গেলেন—যুদ্ধে তিনিও বিশেষ আহত হয়েছিলেন। এখন থেকে ইব্‌নে সালাম তিনটি রাজ্যের অধিপতি হ'ল—ঐ রাজ্যের সেও যেন রাজা, লায়লাও তেমনি রাণী হল।

বছরের পর বছর যায়। ইব্‌নে আর লায়লার মাঝে আর কোন অসাম্য নেই। লায়লা তার পিতার সেই প্রাসাদেই বাস করে, সেই বহুশাখাবীথি আর তার সেই ছুটী বাগা পায়রা এখনো তার সাথী। যে-প্রেম সে কখনও ভুলতে পারবে না, যাকে সে চিরজীবনের মত হারিয়েছে—এরা সেই প্রেমের সাক্ষী, এরাই তার স্মৃতিকে জীইয়ে রেখেছে। মঞ্জুর সেই প্রভুভক্ত ভৃত্য আজো তার মনিবের সন্ধান করেছিল অনেকদিন, শেষে তাকে না পেয়ে সে এখন লায়লার কাছে থেকে তারি সেবা করছে।

একদিন আহ্লেদের কাছে খবর এল, যাকে মৃত মনে করে' এতদিন তারা শোক করেছে সেই মঞ্জু ফুরেশ থেকে ফিরে এসেছে সওদাগরের বেশে; সে ঐ মরুস্থানের এক প্রান্তে সূর্য্যাস্তের সময়ে আহ্লেদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রতীক্ষা করে' আছে। তার কর্ত্রীকে সে এ সংবাদ জানালে না, বরং তার আজ্ঞানুসারেই সেই পায়রাদুটির একটিকে দিয়ে সে যথাস্থানে দেখা করতে গেল; পায়রাটিকে সঙ্গে নেবার কারণ—তার মনে হয়েছিল, একবার তাকে দিয়েই কাজ হয়েছিল, আর একবার তা না হবে কেন? সূর্য্য যখন ডুবে যাচ্ছে সেই সময়ে তাদের দুজনের আবার দেখা হ'ল; বড় আনন্দ হ'ল দুজনেরই।

এদিকে লায়লা যখন সন্ধ্যাকালে তার সেই উচ্চ কক্ষে প্রবেশ করে' দেখলে একটী পায়রা নেই,

তখন আশ্চর্য্য বোধ হল তার। সে তখনই আপাটকে সেই গাছটার দিকে উঁকির দিতে, তারপর, একসঙ্গে ছুটতে ফিরে আসতে। কিন্তু তা' হল না, কিছুক্ষণ পরে সেই একটাই ফিরে এল। তখন, কিছু বুঝতে না পেরে সে কেমন একটু অন্যমনা হয়ে, সেই জানলাটিতে বসে' অতীতের ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল। তার মনে পড়ল, তিন বৎসর আগে আর একদিন এমনি করেই তার একটা পায়রা হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই আবার ফিরে এসেছিল মঞ্জুর প্রেম-চিঠি নিয়ে; মনে পড়ল, কতদিন কতবার তারা দুজনেরা সেই কোয়ারার ধারে অভিসার করত—প্রেমের বিশ্ব-তীর্থ সেই কোয়ারা! হায়, সে সব কোথায় কি হয়ে গেল! মঞ্জু বেঁচে নেই, সে-ও অপরের বিবাহিতা। তার চোখদুটি জলে উঠল, বাহুর উপরে মাথা রেখে সে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ এমনি কেটে গেল। হঠাৎ একসময়ে একটা শব্দ শুনে তার সেই ধ্যান ভেঙ্গে গেল। এ সেই হারানো কপোতটিরই কূজনধ্বনি—সেই কু-কু-কু; সেই গাছের ডাল থেকেই সে ডাকছে। তখনই কপোত পায়রাটি উড়ে চলে' গেল তার সাথির পাশে—তার পাখার হাওয়ায় লায়লার চুল কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। তাই দেখে লায়লার প্রাণে আবার সেই কামনা অধীর হয়ে উঠল—অমনি করে' সেও তার প্রেমাস্পদের কাছে উড়ে যায়।

একটু পরেই ছুটী সাথীই কটমট করে' আমলা গলিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। ওমা! ওটা আবার কি! আর এক দিনের সেই সন্ধ্যার মতন, আজও তেমনি—তার গায়ে এক টুকরো কাগজ জড়ানো রয়েছে। খুলতে গিয়ে তার আঙুল কাঁপতে লাগল, চিঠিখানা সে পড়লে। মঞ্জুর লেখা! সে বেঁচে আছে, ভাল আছে। আগের মতই সে তাকে ভেবে বসেছে সেই কোয়ারার ধারে — ঠিক চার প্রহরের সময়ে।

এই আচম্বিত চুম্বনাঘাতের আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। মঞ্জু বেঁচে আছে, এর কাছে আছে সে! লায়লা সব ভুলে গেল। আকাশের কিনারায় চাঁদ সবে উঠেছে,—এখন সময়ে সে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে' প্রাসাদের সিঁড়িগুলি নিঃশব্দে পার হয়ে নেমে গেল; পিছনের খিড়কি সেই দরজায় এসে দাঁড়াল—কেউ দেখতে পায়নি তাকে। তারপর দরজা খুলে সে বেরিয়ে পড়ল। তার প্রাণ যেন মেহটাকে পিছনে ফেলে ছুটে যেতে চায় মঞ্জুর পাশে। যেতে যেতে হঠাৎ বুকটায় যেন কিসের ব্যথা লাগল, মুখের স্পন্দনও যেন থেমে গেল। তার পা কাঁপতে লাগল, একটা গাছের ডাল ধরে' সে নিজেকে সামলে নিলে। তার স্বামী! তার সন্তান! একদিন সে ত' সর্ব্বস্ব দান করে দিয়েছে তার পিতার অনুরোধে—তার ত' আর কিছু নেই; জীবনের যা-কিছু — সে ত' আর একজনকে নিঃস্ব হয়ে দান করেছে, এখন কি সেই দান সে ফিরিয়ে নিতে পারে! তা'ও এমনি করে'! সে কেমন দেখাবে? মঞ্জুর হাতদুটি যখন তার গলা জড়াবে, তখন কি তার আর কোন জ্ঞান থাকবে? তখন যে তার স্বামী, তার পুত্র, তার সমাজ —সব ভেসে যাবে, আর ত' সে ফিরে আসতে পারবে না! এ ত' বিবাহিতা পত্নীর কাজ নয়; প্রেমের রাণীর কাজও এ নয়। গাছের শাখাটি ধরে' সে তার মুখের সেই হাহাকার চাপতে চেষ্টা করলে, তারপর যখন তার সেই ফিরাট দুঃখকে স্বীকার করে' বরণ করে' নেবার সংকল্পই স্থির করলে, তখন প্রাণের রুদ্ধ আবেগে তার দেহটিও টলতে লাগল।

সেই কোয়ারার ধারে— চিরপ্রেমের সেই তীর্থ-স্থানে—মঞ্জু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে' রইল, তারপর যখন তাদেরই দুখে শুনলে যে, লায়লা পথে বেরিয়ে অনেকদূর এসে আবার ফিরে গেছে, তখন সেও চলে' গেল সেখান থেকে। যে-প্রেম একটি চাহনিতেই সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলে, আর কিছু থাকে না তার সেই প্রেমকে সে মনে মনে প্রণাম করলে। তার কারণ, তাদেরই কথা শুনে সে সবই বুঝতে

পেরেছিল। লায়লাও যেন তার বুকটাকে আরও দৃঢ়ভাবে করে' নীরবে সেই রাজপ্রাসাদেই ফিরে গেল, মজনুঁও তেম্‌নি দূর দেশান্তরের উদ্দেশে যাত্রা করলে। তার একমাত্র কামনা হ'ল এই যে, কালে যেন লায়লার দুঃখের শান্তি হয়। স্নেহের সেই দীপ্তশিখা অকূল আনন্দ যদি তাদের নাই থাকে, এই অসীম দুঃখের জ্বালা যেন তাদের শান্ত হয়।

আরও দু'বছর কেটে গেল, এইবার তাদের দেবতা স্বয়ং দেখা দিলেন। ইবনে সালাম জরা-রোগে আক্রান্ত হয়ে যেন মারা গেল। সংবাদটা বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল। একদিন এক অতিদূর নগরে মজনুঁর কানে গেল—ইবনে ও বসরার রাণী লায়লা এখন মুক্তপুরুষ হয়েছে—সে এখন একা। অচিরের দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে ইয়েমেনে এসে পৌঁছল। কিন্তু তার স্মরণ হ'ল, লায়লা দু'দুবার ধর্ম ও কর্তব্যের বশে কতবার আত্মত্যাগ করেছে, তাই বৈধব্য-পালনের যে কাল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তা' পালন করতে হবে তাকে — চান্দ্র মাসের সাড়ে-চার মাস। ঐ সময়টা সে একা অজ্ঞাতভাবে কাটাবার জন্যে এমন একটি স্থানে বাস করেছিল যেখান থেকে লায়লার প্রাসাদ-কক্ষের বাতিগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তার প্রাণের ব্যাকুলতা এত বেড়ে উঠল যে, তাতে যেন সে জড় হয়ে যেতে লাগল; যে অবস্থায় তার নাম হয়েছিল মজনুঁ — এ যেন তারও চেয়ে অসহ্য। সেবারেও যেমন সেই যন্ত্রণা তাকে একেবারে ভেঙে ফেলতে পারে নি, এবারেও — মর্ম্মের দ্বারে এসেও এমনি ভাবে বসে থাকায় — এই দীর্ঘ যাতনা সে অচিরের ধীরভাবে সহ্য করে রইল।

এতদিন আরবে লায়লার সব সংবাদ মজনুঁকে এনে দিচ্ছিল, কিন্তু মজনুঁর কোন সংবাদ সে লায়লাকে দিতে পারে নি। কিন্তু যেদিন সেই নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হয়ে গেল সেইদিনই সে লায়লাকে গিয়ে জানালে যে, মজনুঁ তার সঙ্গে সেই দিন দুপুর তার প্রাসাদে এসে দেখা করবে, কিম্বা সূর্য্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে সেই ঘোড়ায়ার দ্বারে তার জন্যে অপেক্ষা করবে—সেটা তার পছন্দ হয়।

আরবের এ জবাব নিয়ে এল অনেক বিলম্বে; লায়লা বলে' পাঠিয়েছে—"দুঃখ এবারকার মত অতীত হয়েছে, কিন্তু আবার আসবে—রাত্রি-আঁধারের পর।"

এই ভাষাতে প্রেমিক-যুগলের প্রেম-কাহিনীর বর্ণনামিক অংশটুকুই বলতে এখনো বাকি আছে। সূর্য্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে মজনুঁ তার কথা অনুসারে সেই সঙ্কেতস্থানে এসে হাজির হ'ল; লায়লাও সূর্য্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে সেই আগের মত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করে' প্রাসাদের পশ্চাৎ-দ্বার খুলে বেরিয়ে এল—তার চোখে বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রুবহ্নির একটা অস্বাভাবিক আভা যেন ফুটে বেরুচ্ছে। চাঁদ ওঠেনি সেদিন, কেবল তারাগুলোর অস্ফুট কোমল আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের গাছপালার উপর। গাছগুলার ফাঁকে ফাঁকে সে চলেছে, তার বুক দুরদুর করছে—নিঃশ্বাস পড়ছে বড় ঘন ঘন। তার পা' দু'খানির সেই গতিতে যেন তার সারাজীবনের গতিবেগ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে — পা' দু'খানি যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। অনেক বেগানে আসর সেইখানে এসে সে দাঁড়ালো, দুই হাতে বুকখানা চেপে ধরলে সে। মজনুঁকে জানতে দেওয়া হবে না, সে কি রকম আকুল হয়ে ছুটে এসেছে। একটু মন স্থির করে নিয়েই সে আবার তেমনি ছুটে চলল। যেটুকু স্থির হয়ে নিয়েছিল, তা আর বেশিক্ষণ রইল না, বুকের কাঁপুনি আরও বেড়ে উঠল। এ সেই ঘোড়ায়া, যার ঘরে তিরদিন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয়েছে,—গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, তারার আলোয় তার সেই জলতরঙ্গির ঝকমকানি। এইবার সে এসে দাঁড়াল সেই খোলা জায়গাটার এক প্রান্তে; তার বেশবাস বিস্রস্ত হয়ে গেছে, কাকের পালকের মত তার কালো চুলের রাশ খুলে পড়েছে, তার বুক দুলছে ঢেউয়ের মত।

কোয়ারার পাশ থেকে একটা মূর্তি বেরিয়ে এল তীরের মত। লায়লার পা দুখানা, তার পা ঠিক থাকছে না। মজনু যখন তাকে পাগলের মত বুকের ভিতর চেপে ধরলে তখন তার বুক থেকে কেবল একটা দীর্ঘ অন্তর-ধ্বনি বেরিয়ে এল।

সে কি একটি মুহূর্ত-কাল, না শতসহস্র যুগ? প্রেমে কি কালের মাপ আছে! কিন্তু সেই অনন্ত মুহূর্ত — সূর্যাস্তের পূর্ব ঘণ্টা পরের সেই ঘণ্টা — তাদের জীবনের চরম-ক্ষণ হয়ে উঠলো, তাদেরই সব শেষ হয়ে গেল। অধরে অধর স্পর্শ করতেই মজনুর চৈতন্য লোপ হল, সে পাগল হয়ে গেল। লায়লাও সেই একটি চুম্বনে মজনুর বাহুপাশের মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। মজনু তখন তাকে মাটীর উপর ফেলে দিয়ে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল বন পার হয়ে মরুভূমির মাঝে; বহুদূর পর্যন্ত তার সেই চীৎকার শোনা যেতে লাগল — সে লায়লার নাম ধরে ডাকছে!

লায়লা! লায়লা! লায়লা! তার সেই উন্মাদ-রব চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল, শেষে মরুভূমির সেই নৈরাশ্য-ভীষণ নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্যে সে লুটিয়ে পড়ল অবসন্ন হয়ে। আরেব তার সেই ডাক শুনে অনুসরণ করেছিল — শেষে সে-ই তাকে খুঁজে বার করলে। কত দিন কত রাত তার সেবা করলে সে; কিছুতেই কিছু হল না। দুধ যা কছতে পারে নি, আরব তাই করলে — এইবার সে সত্যিই পাগল হয়ে গেল।

লায়লার মৃত্যু হল। মরুভূমির বুক ঘুরাস্তর থেকে তার নাম করে' উঠছে অনবরত সেই চীৎকার যখন সে শুনতে লাগল, তখন সেও এর আসল কারণ বুঝতে পারলে — শেষে লোকে ঘুমে মগ্ন হয়ে সেও ধীরে ধীরে ফিরে গেল তার প্রাসাদে।

মাঝে মাঝে আরেব লায়লাকে মজনুর খবর এনে দিত — পাগল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার প্রেম যে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি — এই সংবাদই সে পাঠাতো।

দিনদিন লায়লার দেহযষ্টির দীপ্তি যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি তার গাল-দুখানি পাণ্ডুর হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সে শুকিয়ে যেতে লাগল, শেষে একদিন তার প্রাণ বেরিয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বে সে মজনুকে তার শেষ কথা জানাতে বলেছিল, সে কথা — মৃত্যুহীন প্রেমের কথা; এই যে উঁচু-পড়া সুন্দর প্রেমের ঘরে সে বড় সুখই পা'ক, প্রেমের মৃত্যু নেই। লায়লা বলে —

"তাকে বোলো, আমার শেষটাকে সেই কোয়ারার ধারে কবর দেওয়া হবে — সেই খেখানে সে আমায় প্রথম তার দুই বাহু দিয়ে বুকে বেঁধেছিল। আর, ঠিক এই কথাগুলি তাকে ভালো করে' শেখে বোলো — 'মজনু, ঐ উপরের পানে চোখ তুলে চাও, ঐ দেখ, হোথায় আলোর দেশ! আর ঐ দেখ পূর্বাগোরে ঐ যে কোয়ারা উঠছে উঁচুতে, ওর জলেরও যেমন শেষ নেই, তেমনই ওর ধারে প্রেমিক-প্রেমিকাদের যে মিলন হয় সে মিলনে বিচ্ছেদ নেই। ঐখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে'।" এই তার শেষ কথা, এই কথাই গান করতে করতে তার আত্মা চলে' গেল সেই প্রেমের তীর্থে, সেই আরেক কোয়ারার ধারে যার থেকে নিরন্তর উৎসারিত হচ্ছে চির-বিজয়ের অমৃতনিঃস্রাবী বারিধারা।

* * *

মরুভূমিতে তখন ভোর হয়ে আসছে — এমন সময়ে তার উপর দিয়ে কারা দুজন ছুটে চলেছে ওই? দুজনেরই হাতে হাত বাঁধা; একজনের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, প্রেমের আতিশয্যে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। শেষে মজনু আরেবকে পিছনে ফেলে দৌড়তে লাগল — দৌড়ে গিয়ে প্রবেশ করলে সেই গভীর অরণ্যে। একটু পরেই সে পৌঁছে এসে সেই খোলা জায়গাটিতে যেখানে কোয়ারা হ'তে জলধারা উৎসারিত হচ্ছে। ঠিক যেখানটিতে সে লায়লাকে

প্রথম যুদ্ধ শেষ হয়েছিল তার খুবই কাছে ছিল সে জায়গাটি ; এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি লম্বনির্মিত ঘর। এই ঘরটির উপরে সে আঘাতে পড়ল মুখ নিয়ে, — এতদূর ছুটে আসায় ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে, এর কারণ — তার উন্মাদ-স্বামি, আর তার অসীম দুঃখ। "লায়লা! লায়লা!" — বুক-ফাটা স্বরে ক্রমাগত ডাকতে লাগল। "আমি যাচ্ছি — এই যাই! রাত্রির মতো কালো পর্দা দিয়ে তুমি তোমার দর্শনকে ঢেকে রেখো না। আমার অসীম প্রার্থনার তুমি তোমার সুন্দর দেহ লুকিয়ে রাখো — দেখ, আমি তোমাকে খুঁজে পাই কি না।"

ক্রমে সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে এসে দাঁড়াল সেই ঘরটির পাশে — তার চোখ জলে ভরে উঠেছে, সেই চোখ-ভরা জলের ভিতর দিয়ে সে দেখে নীল মাটির উপর লুটিয়ে-পড়া তার প্রভুর পানে। লম্বন ঘরে জল পড়ছে তার দুই চোখ বেয়ে — সেই দুঃখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রাত্রি গোধূলি ভরে।

সভ্যতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

যুক্তজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি এই দুইটিকে সভ্যতার আর সকল লক্ষণের মূল বলা হইয়াছে। এই দুইটি লক্ষণও প্রাচীন সমাজ — আথেনীয় সমাজে বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। গ্রীকদিগের জীবনে, তাহাদের আর্ট ও চিন্তাধারায়, একটি অবাধিক সুবুদ্ধিশীলতা (sweet reasonableness) এবং শ্রদ্ধা (appropriate seriousness) এই দুইটি সমুজ্জ্বল লক্ষণেরই সৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। উহার একটি অন্য কিছুই নহে — যুক্তজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিচারবুদ্ধি ; অপরটি—বিচারবুদ্ধি দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত যুক্তজ্ঞান। প্রাচীন গ্রীক-সমাজের এই ভাবটি যে যতদূর অন্য আমরা দেখিতে পাই, তাহাকেই 'ক্লাসিকাল' আখ্যা দিয়া থাকি ; ঐ শব্দটির দ্বারা কেবল দুইটি লক্ষণ বুঝায়—ঔচিত্যবোধ এবং মাত্রাজ্ঞান।

মূল্য-জ্ঞান

আথেনীয় সমাজে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার যে আদর ছিল তাহার খ্যাতিই সর্বাধিক। যে-কোন বিষয় তাহাদের চিন্তাকে অধিকার করিত তাহাকেই অভিনব যুক্ত ও স্বাধীন চিত্তে, অতি সূক্ষ্ম ও নির্মল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার দ্বারা মীমাংসা করিয়া লওয়াই ছিল তাহাদের প্রধান কর্তব্য। লাইসিস্ট্রাটা (Lysistrata) নামে সেই নাটকখানির কথা কে না স্মরণ করিবে? তখন আথেন্স-স্পার্টা যুদ্ধে অভিনব বিভ্রাট, প্রায় জীবন-মরণ সমস্যা বলিলেও হয় — চারিদিকে হাহাকার। সেইকালেও গ্রীক-সমাজ এমন এক-খানি নাটকের জন্য ক্ষেত্রের-নির্মাণে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইল না — যে-নাটক শেষ-প্রেমকে পরিহাস করিয়াছে, যুদ্ধ-জ্বরকে গালি দিয়াছে।

তার কারণ, এরিস্টটলের বিরোধের যাহাই হউক না কেন, ইহা নাটকরিসাবে উৎকৃষ্ট কিনা, ইহাই ছিল তাহাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য। ইহাকেই বলে—সামাজিক মনোভাবের অতিমাত্র মূল্যজ্ঞান। আবার যে-সমস্ত এমনি অনাবৃত্ত বিলাসিতাহীন জীবন যাপন করিত—যাহা একালের কোন বিশিষ্ট কালচারের মানুষও ধর্মবাহ্যিকতা বলিয়া মনে করিবে—তাহারাই নাটক-অভিনয়ের জন্য অকাতরে অর্থদান করিত। পূর্ব-পরিচ্ছেদে কোন্‌গুলি লক্ষণের লক্ষণ তাহা বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে একটা বস্তুর উল্লেখ করা হয় নাই—তাহা দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-পিপাসা। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, দৈহিক কষ্ট করিবার ইচ্ছাটাই সভ্যতার লক্ষণ। যে আথেন্স-বাসীরা অতি সুকুমার রসবৃত্তি এবং গভীরতর চিন্তাশক্তির এমন পরিচয় দিয়াছে—তাহাদের জীবনেও বিলাসিতার অভাব প্রায় গ্রীসীয়-প্রায় পৌঁছিয়াছিল! সভ্যতা বলিতে আমুনিক বিলাসি-বিহারীরা যাহা বুঝে, আথেন্সীয়দের তেমন সভ্যতার বালাই ছিল না। মনোবিদের জন্য ইতালিদেশে রেনেসান্স সম্ভব হইয়াছিল তাহাদেরও অতিউচ্চ মানস-বিলাস এবং সর্ববিষয়ে একরূপ বহির্মুখ-প্রীতি ছিল, কিন্তু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যসুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। একালে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তুটি দেখা দিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলাবীর অভিজাত-সমাজেও ইটালি বা অন্য-রীতির পুরাতন আদর্শ লোপ পায় নাই, তাহারাও ইংরেজী-রুচির স্বাচ্ছন্দ্য-নিষ্ঠাকে দূরে পরিহার করিয়াছিল। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যসুখের জন্য এই যে হাইল-ত্যাগ বা-করার সভ্য-মনোবৃত্তি, ইহারও মূলে আছে খাঁটি মূল্যজ্ঞান।

আথেন্সীয় সমাজের ঐ সত্য-পিপাসা ও সৌন্দর্যসাধনার সঙ্গে তুলনায় ইতালীয়দের চরিত্রে একটা গুণ কম প্রশংসনীয় নয়। তাহাদের সমাজে কবি ও চিত্রকর, বিদ্বান ও ভাস্কর যে সম্মান ছিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ষোড়শ শতকের আরম্ভ সময়ে, রাফায়েল ও মিকায়েল-আঞ্জেলোর প্রতিভাকেই, অন্ততঃ রোম ও ফ্লোরেন্সবাসীরা তাহাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া মনে করিত। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সে কালের ইতালীয় সমাজের ঐ প্রতিভা-পূজা অতিমাত্র ছাড়া ও অকপট হইলেও, কিন্তু অতিরিক্ত বটে। এক একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহারা প্রায় দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি ব্যক্তি-মানবের মহিমা-ঘোষণায় এই যে বাড়াবাড়ি, ইহা সেকালের পক্ষে স্বাভাবিক বলিতে হইবে। ইতিপূর্বে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপকে এমন একটি ধর্ম-মতের দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহার ফলে মানুষকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, মানুষ পাপী; সত্য-চিন্তা, সত্য অনুভূতি, ও সত্য আচরণ তাহার সেই পাপ-প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। তাহার ঐ অসুস্থতাই ধর্মাই, তাহার ব্যক্তিত্ব-বিজ্ঞানও একটা ঘোরতর পাপ। এমনে গ্রীক শিল্পকলা ও গ্রীক-দর্শনের সহিত আকস্মিক পরিচয়ের ফলে তাহাদের প্রতীতি হইল যে, মানুষের তুলনায় আর সকলেই ক্ষুদ্র, মানুষের উপরে আর কিছুই নাই। সত্য-বিশ্বাস একমাত্র বিচারকর্তা মানুষ; মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা, মানুষই সকল শাস্ত্র ও সকল নিয়মের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা; বিশ্বের যে-নিয়ম অবশ্যমান্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, মানুষই তাহা ইচ্ছাশক্তির বলে খণ্ডন করিতে পারে। এইরূপ রেনেসান্স-যুগের ইতালীয়দের পরিণাম ও প্রতিভাবান মানুষের এমন পূজা করিয়াছিল। মূল্যজ্ঞানের যে আধি ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন—কলাবিদ্যা ও উচ্চচিন্তার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি, তাহাতে ঐ যুগের ইতালীয়রা আথেন্সবাসীর সমকক্ষ ছিল।

কলাবীর অষ্টাদশ শতাব্দী এইরূপ চিত্তোৎকর্ষ-বিষয়ে রেনেসান্স অথবা পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনীয় হইলেও, একটা বিষয়ে সাদৃশ্যের অভাব

লক্ষিত হয়। ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর সৃষ্টিপ্রতিভা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, যত তাহার পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতাব্দী এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল। ইহা হইতে সভ্যতার আর একটি অলক্ষিত লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা এই যে, প্রকৃত সভ্য-সমাজ তত্তটা সৃষ্টিমূলক নয়, যতটা রসগ্রাহী; অন্যের জাতিগত জীবন থেকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজ আর্টের মূল্য বুঝিত; ধনীগণ সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায়, শুধু অর্থ নয়— সময় ও শ্রম নিয়োগ করিত, নর-নারী নির্বিশেষে সৌন্দর্য্যবোধের অনুশীলন করিত। দরিদ্র বলিতে যে অশিক্ষিত ও স্বেচ্ছাশক্তিহীন সমাজ বুঝায়, তাহাদের সহিত সভ্যতার এইটুকুমাত্র সম্পর্ক যে, তাহারা কায়িক পরিশ্রমের ভার না লইলে সভ্যতার অবকাশই মিলিত না, ইহাই তাহাদের সাক্ষাৎ সহায়তা; একরূপ সৌন্দর্য্যবোধের তাহারা সহায়তা করে, কারণ, তাহাদের আচারে-ব্যবহারে, আলাপে-বিলাপে, এবং তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাসে সভ্যতার যে রং লাগে, তাহাতেও সভ্যতার সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়। আফ্রেদের ঔপন্যাস অথবা ব্রাঙ্কের কৃষি-জীবনের মধ্যে খাঁটি সভ্যতার কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর্টের আদর থাকিলেও, বিশুদ্ধ তত্ত্বপিপাসাই ঐ কালের প্রধান লক্ষণ। এইরূপ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ঐকান্তিকতা— মূলজ্ঞানের এই অত্যুৎকৃষ্ট পরিণতি — হইতেই যে ফলশ্রুতি হইয়াছিল, তাহাতেই ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-সমাজ জগৎ-বরেণ্য হইয়াছে। ঐ সমাজের সকল মার্জ্জিত-রুচি ও অধ্যয়নশীল নরনারী সাহিত্যে দুইটি দোষ ক্ষমার অযোগ্য করিতেন না—উচ্ছৃঙ্খল রীতি ও পাণ্ডিত্য-বিস্তার। সে সমাজে সকল বিষয়ে একটা উৎকর্ষ-প্রমাণ, যা উৎকর্ষেরও একটা সীমাজ্ঞান ছিল, তাহা অতিক্রম না করাই ছিল বাঞ্ছনীয়। ইহা কেবল গদ্যরচনাতেই নয়, — জীবনের সকল ব্যাপারেই একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত ছিল। এমন কি কেহ দেখে নাই যে, অতিথির অভ্যর্থনা-কক্ষের অতি-সজ্জিত ভোজনাগারে, বহু-আলোকিত তলে, অতিথির দুর্লভ এবং প্রচুর আহার্য্যে আসন পূর্ণ করিয়া, এবং তাহাতেই কৃতার্থ মেজবান করিয়া, কোন ব্যক্তি যখন ভোজন শেষ করিয়াছে, তখন তথাকার এক কর্পর্দ্দিকের বেসরকারী ভৃত্য চুকটের পাত্র হইতে সবচেয়ে বড় চুরুটটি তুলিয়া দিলে সে বলিয়া উঠিল—"হাঁ উহাতেই হইবে, বাজারে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমি কেবল তাহাই চাই"? মানুষ যখন সকল বিষয়ে উৎকর্ষের যাচ্ঞাজ্ঞান হারায় তখনই তাহার এমন অবস্থা ঘটে। যে-ব্যক্তি তাহা হারায় নাই, তাহার নিকটে, দোকানে যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, তাহার নিজস্ব একটা পছন্দ আছে; সে জানে ঠিক কেমনটি তাহার চাই, তাহা ভিন্ন আর কোনটাই সে লইবে না। আধুনিক ইংরেজ ভদ্রলোকের এ বালাই নাই; সবচেয়ে বাহার-করা দোকানে প্রবেশ করিয়া সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি ক্রয় করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাড়ীর গৃহিণীরা কোথায় কোন্ জিনিষটি ভাল পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান রাখিতেন, এবং সেই জিনিষ সেখান হইতেই ক্রয় করিতেন। এখন সে প্রথাই উঠিয়া গিয়াছে। একালের গৃহিণী তাহারা তাঁহারা আর সে খবর করেন না— 'ষ্টোরস্' নামক বিশ্ব-পণ্যশালার শরণাপন্ন হন। এখন আর কেহ যাহা পছন্দ করেন তাহাই ক্রয় করেন না, যাহা ক্রয় করেন তাহাই পছন্দ করেন; এখনকার ধনি-বাসিদের পছন্দের বালাই নাই। ঐ পথই বর্ব্বরতার পথ।

সভ্যমূলের মানুষেরা শিল্পকলা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রাচীনের ধারাটিকে রক্ষা করিয়া চলে। অবশ্য এই ধারা রক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময় কতকগুলি প্রথার লাঘব করিতে হয়। প্রাচীন ধারা আর কিছু নয় — বহুকালব্যাপী ক্রমোন্নতির অভিজ্ঞতা-প্রসূত কল্যাণকর পদ্ধতি; আর ঐ প্রথা সম্পূর্ণ অকল্যাণ নয়—কোন

এক অর্থহীন পুরাতনী তত্ত্বকথা যে হুড়ো ও সহজলভ্য অভিজ্ঞতার উপর হইয়াছিল তাহাই বহুলোকের অজ্ঞাত হইয়া উঠিয়াছে। সভ্য-সমাজে বসবাসের এইরূপ লোকপ্রচলিত অভ্যাসাদিকে এখনকার লোক সেই সমাজে দিবেন না যাহা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রেমী। তাঁহারা জানী ও রসজ্ঞ তাঁহারা পুরাতনের প্রতি প্রভাবহীন হইতে পারেন না, উহা তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। পুরাতনের প্রতি আক্রোশ হল-চেতনারই অন্তরায়; যাহারা প্রথম হইতেই উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে তাহাদের হল-চেতনা ক্রমেই জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। যে সমাজ সভ্যতার শৈশবে আবেগের বশে সে সমাজের শিল্পী ও রসিকজন ঐ প্রাচীন ধারাকে অস্বীকারও করেন না, উহার বিরুদ্ধে কোন বিরুদ্ধ-ভাবও পোষণ করেন না; বরং তাহা হইতেই অনেক সুযোগ ও সুবিধা করিয়া লন। যে-সমাজে স্বার্থ মূলাজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃত হইতেছে করিয়াছে, সে-সমাজ শিষ্টাচারকেও একটি আবশ্যক সুখসাধন বলিয়া মনে করে। কিন্তু শিষ্টাচার শুধুই মূলাজ্ঞানের নয় — উহা সেই সহজ বিচারবুদ্ধিরও একটি অবশ্যম্ভাবী ফল। কারণ, বীরবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে প্রাণও উদার হয়, এবং উদারতার ফলে মানুষ অপরের মত ও মনোভাব বাঁচ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করে, তাই আত্মম্ভরী হইতে পারে না — অপরের উপরে জোর করিয়া নিজ মত চাপাইয়া দিবার প্রবৃত্তি হয় না।

যে-সমাজে মানুষকে এইরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, সে সমাজের মূলাজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অতি নিম্নস্তরের হইয়া থাকে, অর্থাৎ সে সমাজ প্রকৃত সভ্য নয়। এমন সমাজে, যে সকল ব্যক্তির প্রকৃতি কিছু উচ্চ তাহারা খাবড়া-খাবড়া হয়। ঐ জন্য ইংরেজের মধ্যে যে নারী বা পুরুষ একটু উচ্চমনা হয় তাহাকেই ঐ প্রতিকূল সমাজের মধ্যে বাস করিয়া, নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। ফরাসী জাতির মধ্যে এখনও সভ্যতার একটা সংস্কার আছে — অন্ততঃ সে বিষয়ে একটা চক্ষুলজ্জা আছে, তাই সেখানকার সমাজে ঐরূপ ব্যক্তিকে কোনরূপ প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হয় না, তাহাকে একক বা সহায়হীন হইতে হয় না। ইংরেজের পক্ষে সে সুবিধা নাই, তাই যেমন মানুষ বালক বয়স হইতেই অতিশয় আত্মসচেতন ও ব্যক্তি-সচেতন হইয়া উঠে। ফলে সে অতিশয় খেয়ালী ও একরোখা হয়, সেই কারণে আর সকলের নিকটে সে একটি 'কিম্ভূত চরিত্র' বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইংরেজী-সভ্যতা — অর্থাৎ যাহাকে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা — এমনই দোষ-গুণের ও কৃত্রিমতাপূর্ণ, এমন কৃত্রিমতায়, এবং স্থলে স্থলে এমন হিংস্র ও নিষ্ঠুর যে, প্রত্যেক উদারস্বভাব ইংরেজ অল্পলোককে সমাজের আশ্রয়হীন হইয়া বাস করিতে হয়। এজন্য, যে-ব্যক্তির সৌন্দর্যজ্ঞান ও রসবোধ আছে, সামাজিক শিষ্টতা-সুখের স্পৃহা যাহার আছে, যাহার গায়ের চর্ম কঠিন নহে — তেমন মানুষের পক্ষে ইংলণ্ডে বাস সুখকর নহে। আবার ঠিক ঐ কারণেই, এ জাতির অন্য এমন মহনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, যাহার ফলে অনেকটি বিশিষ্ট প্রতিভাবান পুরুষ ঐ জাতির সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, এবং আধুনিক কালেও, অনেকটি নূতন, দৃঢ়, ও গভীর চিন্তা-রসকে আরও বিস্তারিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যে ব্যক্তির মূলাজ্ঞান, অর্থাৎ ভোগ-বিষয়ে উচ্চাবচ-অপকৃষ্টের জ্ঞান খুব উচ্চ, সে ব্যক্তি কখনও ফুলচেতা (Philistine) হইতে পারে না। সে কলাশিল্প, উচ্চচিন্তা প্রভৃতির যে আদর করিয়া থাকে তাহাতে ব্যাবহারিক প্রয়োজন-বোধ নাই, নিঃস্বার্থভাবেই করিয়া থাকে। অর্থাৎ, তাহাদের কাছে ঐ সকল বস্তুর একমাত্র মূল্য এই যে, উহাদের দ্বারা একরূপ চিত্তপ্রসাদ জন্মে; ঐ চিত্তপ্রসাদ — মনের একটি সুখকর অবস্থা, উহাই একমাত্র ইষ্ট, আর সকলই উপকরণ মাত্র। যাহাদের প্রকৃত মূলাজ্ঞান হইয়াছে

তাহারা সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আর কোন প্রয়োজনে করে না, একমাত্র প্রয়োজন — মনের ঐ সুখকর পুষ্টিসাধন। অবশ্য সে-সকলের ব্যাবহারিক মূল্যও আছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারাই মোটর-কার নির্ম্মাণ এবং তাহা-পা মেরামত করা যায়। সভ্যপদবীর মানুষ যাহারা তাহারা জ্ঞানকে অতিরিক্ত মানস-সুখসম্ভোগের উপায় বলিয়াই ভুল, তাহার এই সুখ-দান-সামর্থ্যকেই তাহারা মূলতম প্রয়োজনসাধনের উপরে স্থান দিয়া থাকে। ক্ষুদ্রচেতা বর্ব্বরেরাই এমন প্রশ্ন করে যে, আর্ট, তত্ত্বচিন্তা, বা বিজ্ঞান-চর্চ্চার ব্যাবহারিক মূল্য কি? তাহাতে মনুষ্যসমাজের কি প্রত্যক্ষ হিতসাধন হইয়া থাকে? ইহাদের মূল্য-জ্ঞান নাই; ইহারা, লক্ষ্য ও উপলক্ষ, উপায় ও উদ্দেশ্য, এমন কি বিভিন্ন উপায়গুলার মধ্যেও উদ্দেশ্যসাধন-হিসাবে যে তারতম্য, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

গ্রীকগণ যে তত্ত্বচিন্তা ও সত্যসন্ধান করিত তাহাতে কোন ইতর উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়া, যাহারা ঐরূপ ক্ষুদ্রচেতা তাহারা গ্রীকজাতির নিন্দা করিত। গ্রীকগণ রাষ্ট্রীয় শকট নির্ম্মাণ করে নাই, বাষ্প আবিষ্কার করে নাই, এমন কি সুতা কাটিবার যে চরকা তাহাও গ্রীকজাতির উদ্ভাবনা নয়। তাহারা কেবল চিন্তার দ্বারা তত্ত্বসন্ধান করিয়াছিল, তাহাও ঐ তত্ত্বকে জানিবার জন্য, চিত্তোৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য, — শক্তিলাভ বা সুখসম্পৎ-বৃদ্ধির জন্য নহে। আথেনীয়গণ যাহা-সম্পদ কামনা করে নাই, তাহারা অন্তরে ধনী হইতে চাহিয়াছিল। এই কারণেই তাহারা ইতিহাসে সভ্যতম জাতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ঐ আথেনীয়গণও সময়ে সময়ে এমন চিন্তা করিয়াছিল যে — সৌন্দর্য্য ছাড়াও সুখবস্তুর উপলব্ধির জন্য কারণ থাকা উচিত। ইহার কারণ, ঐ জাতি ছিল সর্ববিষয়ে কারণ-সন্ধানী। হেলেনাস-যুগের ইতালীয়গণ এত চিন্তাপ্রবণ ছিল না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, খৃষ্টীয় সপ্তদশীয় ফরাসীয় সভ্যতার মূলে সৌন্দর্য্যপ্রীতি অপেক্ষা তত্ত্বানুরাগ ছিল কিছু বেশী। ইহা রেনেসান্সের ঠিক বিপরীত। তথাপি স্বার্থলেশ-হীন বিশুদ্ধ জ্ঞান-সাধনার প্রতি ঐ ছেলেমানুষী সমাজের ভক্তিও ছিল অকৃত্রিম। ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া ব্রাউনিং একটি ছোট কবিতা লিখিয়াছিলেন, যথা —

"ছোটলোক যারা ছোট কাজই শুধু চায়, —
বোঝেও যেমন, সাধিতেও তথা পারে;
বড়লোক শুধু বড়রই পিছনে ধায় —
বুঝিতেও যথা, সাধিতেও তথা নারে।
ছোটলোক যারা — একটি একটি করি'
গড়িয়া তাহার ফলক পূরিয়া লয়;
বড়লোক যেই — রচিবে কোটি-কে ধরি,'
নারে সে করিতে গোটিকেরো সঞ্চয়।
একজন, তার সবই ইহকালে; তারো লাগি' পরকাল
আছে কিনা, লোকে ভাল করে' তাহা জানে;
আরজন, সে যে পরমের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল হাল, —
সে যা' খুঁজেছিল, তারী ছিঁড়ে সেইখানে।"

— সে বস্তু আর যাহাই হোক, নীচ বিষয়াসক্তি নহে। সেই যে অন্বেষণ, সেই যে জ্ঞানের সাধনা তাহাতে কোন বৈষয়িক লাভের লোভ নাই। তথাপি কোন একটিমাত্র বিদ্যার অনন্য-সাধনাও ভাল নহে, ঐরূপ বিশেষজ্ঞ যাহারা তাহারা পূর্ণ-সভ্য নহে।

এই যে মূলজ্ঞান ইহার ফলে আর একটি বাসনা জাগে, আর একটির প্রতি গভীর আস্থা জন্মে, তাহার নাম — স্বাধীন-শিক্ষা, অর্থাৎ কোন বাঁধাবাঁধি রকমের শিক্ষা নয়, প্রত্যেকের মনের ক্ষুধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষালাভ। সকল সভ্যযুগেই ঐরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল। সভ্যমানুষেরা সেইরূপ শিক্ষাই পাইতে চায় — যাহা সোণারূপার নয়, যুগের সেই পরম বস্তুর সহায়, সেই একমাত্র ইষ্ট-লাভ যাহাতে হয়। অপর পক্ষে, যাহারা ক্ষুদ্রচেতা (Philistine), যাহাদের

মূল্যজ্ঞান নাই, উপায়ও এমন শিক্ষাই চলে যাহা হয় অথবা প্রত্যক্ষভাবে কোন নিজেই পরমার্থ না—পরমার্থ-লাভের একটা উপায় মাত্র। স্বাধীন-শিক্ষা আমাদিগকে একেবারে সেই সার্বজনীন জ্ঞানসমূহের অধিকারী করে; প্রয়োজনমূলক শিক্ষা তাহার উপকরণগুলি আহরণ করিবার সামর্থ্য দেয় মাত্র, কিন্তু আহরণকারী নিজে তাহার সার্থক ভোগ না করিতেও পারে, অপরকেও করিতে পারে।

ইংরেজি শিক্ষার একটা প্রাচীন ধারা চলিয়া আসিতেছিল, সেই শিক্ষা স্বাধীন-শিক্ষারই মত। শিক্ষার সেই ধারা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল; যদিও লেখাপড়া জানে, উহাতে জ্যামিতি ও গণিতের চর্চা রীতিমত ভোগ করিয়া—অথচ উহার জাহির না করিয়া, উহাকে কালোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে উহার উপরে অনেকগুলি ধাক্কা আসিয়া লাগিল। ঐ কালে যন্ত্রশিল্পের প্রভাবে একটা বড় বিপ্লব ঘটিয়া গেল, তাহাতে মধ্যবিত্ত নামে একটা নূতন সমাজের অভ্যুদয় হইল, এবং 'কর্মী বনু' এই নূতন অভ্যুদয়ে অর্থোপার্জনই একমাত্র পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইল। ইহার ফলে, শিক্ষার ঐ আদর্শ ভাঙিয়া পড়িতে সুরু হইল। হেন্রি, ডিং প্রীচ, জি. ওয়েল্স্ যাহাকে "পত্র করেক বৎসরের শোকাবহ ঘটনা" বলিয়াছেন, এবং যাহাকে সকল স্বাধীন-শিক্ষিত নরনারী "যুদ্ধ" বলিয়াই জানে, তাহার প্রভাবে আমাদের ঐ শিক্ষা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল।

যাহার মূল্যজ্ঞান আছে, এবং সেই কারণে যে, উপায় ও উপেয়, সাধ্য ও উপলক্ষ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারে—যেমন ব্যক্তি অপর সকল হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র বোধ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সে শুদ্ধা-শিক্ষা-বৃত্তি আশ্রয় করিবে না। সভ্যতার যে জন্ম হেতু, যাহার নাম দিয়াছি—বিচার-বুদ্ধির বশ্যতা, তাহাতেও একরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্বের গৌরব-বোধ আসে। ইহার অতি উচ্চস্তরের সভ্যতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অতএব, ইহার সম্বন্ধে এইখানেই কিছু বলা আবশ্যক। মানসিক সুখ বা চিত্তপ্রসাদই যদি মনুষ্যজীবনের ইষ্ট হয়, তবে সেইরূপ চিত্তোৎকর্ষ-জনিত সুখ যে 'ব্যক্তির' জীবনেই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা যে একটা সাধারণ-ভোগ্য বস্তু নয়, তাহা যে ব্যক্তিগত—সমষ্টিগত নয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য; কারণ, সকল মনই ব্যক্তির মন, বহুজন-মানস নামে কোন মানস-সত্তা থাকিতে পারে না, সেটা একটা কল্পনামাত্র। অতএব ঐ যে মানবজীবনের মহত্তম ইষ্ট উহা ব্যক্তিবিশেষের একক উপলব্ধিই ঘটে। ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে ইহা স্মরণ না রাখা একটি গুরুতর অপরাধ যে, আমরা যে সকল 'তত্ত্ব' বা সাধারণ নিয়মের স্থাপনা করি তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যাকে কোন এক ব্যক্তিরই অভিজ্ঞতায়। তাই হেলেনাস্-যুগের ইতালীয়-সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-মহিমাকেই শ্রেষ্ঠ পূজা নিবেদন করিয়াছিল,—একটু বাড়াবাড়িও করিয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহার কুফলও আছে; উহাতে ব্যক্তির অহমিকা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাহাও বর্বরতার নামান্তর মাত্র। পেরিক্লিস (গ্রীস) বা অগস্টাসের (রোম) যুগ যে সভ্যতম তাহার কারণ এই যে, ঐ দুই যুগে সামাজিক বিচারের এবং আদান-প্রদানের পরস্পর-সহিষ্ণুতা এমনই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার দ্বারাই ঐরূপ ব্যক্তিগত ছটা বা আত্মম্ভরিতা সংযত হইয়া থাকিত। গ্রীক সমাজের ব্যক্তি-বোধ তাহাদের চিন্তারাজির মধ্যেই প্রকাশ পাইত; অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীস সমাজও এই ব্যক্তি-সাধনাকে যে মতবাদ ও যুক্তি-বিচারের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছিল তাহাতেই ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন হইয়া ওঠে; উহার মূলে ছিল—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতার দাবী, মানবহিসাবে তাহার একটি বিশেষ মর্যাদার অনুভূতি।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান হইতেই আর একটি যে মনোভাবের জন্ম হয়, তাহার নাম — বিশ্বনাগরিকতা, বা বিশ্বনাগরিকতা (Cosmopolitanism)— তাহার সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। কোন স্বাতন্ত্র্যকামী বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্ব-সমাজ বা স্ব-রাষ্ট্রের প্রতি অন্ধভক্তি-সম্পন্ন হইতে পারে না, ঐরূপ হওয়াকে সে বড় জোর একটা বিপজ্জনক আপদধর্ম বলিয়াই মনে করিবে। সভ্যতার উন্নতি ও তাহার পরাকাষ্ঠার লক্ষণ এই যে, ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই ক্রমে বিশ্বনাগরিকতার দিকে প্রসারিত হইতে থাকে, মানুষ ক্রমে দল বা গোষ্ঠি-চেতনার পশু-সুলভ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। প্রাচীন জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের মতন হইতে এমন অনেক মতবাদ উদ্ভূত করা যাইতে পারে যাহাতে ঐ বিশ্বনাগরিকতা-বোধের স্পষ্ট ঘোষণা আছে। আবদেরা (Abdera)-বাসী ডিমোক্রিটাসের সেই বাক্য স্মরণ কর — "কোন দেশই জ্ঞানীর একেবারে নিষিদ্ধ নয়, যাহারা সাধু ও মহাপ্রাণ সমস্ত পৃথিবীই তাহাদের পিতৃভূমি।" হেলেনাস-যুগেও ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল; তার কারণ, মানুষ যেমনই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে সুরু করে অমনই তাহার আজাত্য-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। আথেন্সীয় গণ যে স্বদেশবৎসল ছিল তাহা সত্য; কিন্তু তাহাদের সেই স্বদেশপ্রীতি কোন কুসংস্কারের দ্বারা কলুষিত হয় নাই; তাহারা যে আথেন্সকে ভালবাসিত তাহা আথেন্সের সভ্যতার মহিমার জন্য — কেবল তাহাদের বাসভূমি বলিয়াই নহে, সেরূপ পশু-মনোভাব তাহাদের ছিল না। সেই দেশপ্রেমেরও মূলে ছিল কতকগুলি বিশেষ ও মহনীয় গুণের প্রতি বুদ্ধিসঙ্গত শ্রদ্ধা; একটা নাম বা একটা পতাকার প্রতি নির্মোহের অন্ধভক্তি নহে। অতিশয় উগ্র স্বাজাত্য-বোধের আক্রমণে সভ্যতা যখন বিপন্ন হয় তখন এই বিশ্ব-জাতিবোধই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

সভ্যতার আরও একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ, হাস্যরস-রসিকতা। এই রসিকতারও মূলে আছে অতিশয় মূল্যজ্ঞান। আমি অবশ্য ঠাট্টামি বা ভেংচানোর কথা বলিতেছি না; সিংহলীদের ছেলে-জাতিও সেরূপ রসিকতা করিতে জানে — তাহারা বলিবার আসনে কাঁটা গুঁজিয়া রাখে; পশ্চিম আফ্রিকার ইয়োরুবা জাতিও অতিশয় অশ্লীল গ্রাম্য রসিকতার দ্বারা পরস্পরের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। ইহা সেই হাস্যরস-চেতনা — যাহার জন্য, কোন-কিছুকে অতিরিক্ত গুরুত্ব বড় করিয়া তুলিলে হাস্যোদ্রেক হয়; এইরূপ মনোভাব তাহাদেরই আছে যাহারা সৌন্দর্যকে মূল্যের উপরে স্থান দেয় না। বেঁটা আসলে একটা উপায় মাত্র, অর্থাৎ যাহার নিজস্ব পৃথক মূল্য নাই, তাহাকেই সর্বস্ব করিয়া তুলিলে ব্যাপারটা অতিশয় হাস্যকর হইয়া উঠে। যেহেতু মানুষ কখনই তাহার মনোলোক উচ্চ অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণ সফল করিয়া তুলিতে পারে না, এ জন্য একজন সুস্থ ব্যক্তির চক্ষে সর্ব-প্রকার মহৎ প্রচেষ্টা কিঞ্চিৎ হাস্যকর ঠেকে বটে, তথাপি প্রেম, সৌন্দর্য বিদ্যা প্রভৃতির প্রতি প্রাণান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া যাহারা কেবলই উচ্চহাস্য করে, তাহারা যে ভোগের মূর্খ তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহারা মহৎ জীবনের মহৎ বাসনা বুঝিতেই পারে না। প্রেমিকের ভাবোচ্ছ্বাস, শিল্পীর সৌন্দর্যসন্ধান অথবা ধ্যানীর ভূমানন্দ-পিপাসা, এ সকলের বাহ্যিক ব্যবহার বস্তুই হাস্যোদ্দীপক — এবং সেইজন্য দুর্ভিক্ষে লোক, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ; আমরা তাহাদের সেই উপলক্ষ্য বা উপকরণগুলাকে যদি অযোগ্য বলিয়া মনে করি, সে ভুল আমাদেরই। ইহার পর, ঐ অন্তীষ্টের জগৎ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া একবার উপায় ও উপকরণের — অর্থাৎ, যে সকল বস্তু মূল্য নয়, গৌণ— তাহাদের জগতে দৃষ্টিপাত কর। কেহ বা ধাবনায়, কেহ বা দেহ-সুখ, কেহ বা খ্যাতি ও প্রতিপত্তির জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; উহাদের একটাও মূল্য বা অন্তীষ্ট নয়, প্রত্যেকটাই অন্তীষ্টলাভের উপায় বা উপকরণমাত্র। উহারা

সেই চিত্তপ্রসাদের সৌরভ করিয়া — উৎকৃষ্টকে ভালবাসিয়া — নিকৃষ্টকে জীবনের সম্বন্ধ করিয়াছে। ছোটকে এমন বড় করিয়া তোলা, ইহা দেখিয়া যে একটি বৃহৎ ব্যাপারের উদ্রেক হয় — সভ্যতার সুন্দরতম স্বরূপ, সমাজস্থলী তাহা উপভোগ করিতে পারে।

ঐ যে বিলাসীয়তা, এবং ঐ যে ব্যক্তিরস-রসিকতা, উহা ব্যক্তিগত সভ্যতার লক্ষণ—সমাজগত নয়, সে কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। আমি পরে দেখাব করিব যে, সভ্য-সমাজ বলিতে সেই সমাজ বুঝায় — যে-সমাজ বাস করেকটি বিশিষ্ট সভ্য-মানুষের সংস্পর্শে এরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদেরই সভ্যতায় অনুরঞ্জিত হইয়াছে। আমার উপস্থিত কাজ তাহা নয়; এখনে আমি সভ্য নর ও সভ্য নারীর স্বভাববর্ণনা করিতেছি না, কেবল যে তিনটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমাজকে সভ্যতার আদর্শস্থল বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছি তাহাদের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেছি। যে গুণি মূলগুণের আনুষঙ্গিক, এতক্ষণে তাহাদের আলোচনা শেষ করিয়া এইবার আমি সেই লক্ষণগুলি নির্ণয় করিব যাহাদের মূলে আছে অচিন্তনীয় বিচারবুদ্ধির শাসন।

(ক্রমশঃ)

চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম। ... অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু অন্য কারণে তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল খাইব, আমার গুণি ভাল খাইবে, এই বাসনা উচ্চৈস্তরের মনে বড় প্রবল। ... পরার্থপরতা কিন্তু চিত্তশুদ্ধি নাই। এই চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যনিষ্ঠের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল।

— বঙ্কিমচন্দ্র

গ্রন্থ-পরিক্রমা

অতীতের কথা — স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন বসু

এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলাইবে না, তবে যে নামে ভরিয়াছি, তাহার কারণ, ইহার বিষয় অতি উচ্চ তত্ত্বকথা হইলেও, ভাষাজ্ঞান ও রচনাভঙ্গিতে ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যপদবীতে পৌঁছিয়াছে। যাহা সাহিত্য তাহাতে সকলেরই অধিকার আছে সেই অধিকারে, আমি ইহার সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ সাহিত্যিক প্রবাহে, কিছু বলিতে অগ্রসর হইয়াছি — বাঙ্গালাসাহিত্যের পক্ষ হইতেই এইরূপ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। যাঁহারা পণ্ডিত, শাস্ত্রব্যবসায়ী ও দার্শনিক তাঁহাদের নিকটে ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার সম্বন্ধে যে একটি কথা বলিয়াছিলেন প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিব। তিনি ইহার কোন সমালোচনা বা বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নাই, কেবল, গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের অনন্য আগ্রহে একটি কথা বলিয়াছেন — "বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার জোড়া দেখি নাই।" তিনি যে কোন্ অর্থে, এই কথা বলিয়াছিলেন তাহার সবটুকু বুঝি বা না বুঝি, আমিও আমার

[illegible] সহিতে সহাই ইহার

[illegible] কেন, অনুরূপ আর

[illegible] এমন কি, শেষ [illegible] গ্রন্থের সম্বন্ধে সাহিত্যে, এই অতি-প্রাচীন মহা-চিন্তাপূর্ণ তত্ত্বকথাকে

[illegible] ভাষায় আর কেহ সাধু-লিখিত গদ্যের ছন্দোবোধে বাঁধিতে পারেন নাই।

এই গ্রন্থের নাম "অতীতের কথা" শুনিলেই মনে হইবে, 'অতীত' নামক কোন ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী বুঝি আছে। এমন যে কত কাহিনী সাহিত্যের আকারে সাহিত্যের চক্ষু হরণ করিয়াছে। কিন্তু এই 'অতীত' এরূপ ব্যক্তি না হইলেও, এমন একটি বস্তু — যাহা মনুষ্যমাত্রের অতি পরিচিত ও প্রিয়; একটি পরম-তত্ত্বকে [illegible] সকলের জ্ঞানের [illegible] বিশেষভাবে করিয়াছেন; যেখানের ভিতরে যে মানুষের প্রাণের — যে জীব-জীবনের — উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন। এইজন্যই, মূলে যেখানে গ্রন্থ হইলেও, ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে আমরা মানুষের

জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে নানাভাবে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখি; যে-সংজ্ঞা মানুষের প্রাণের গভীরতম আকুতিকে যত নিখুঁতভাবে অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়া তোলে সেই সংজ্ঞাই তত বড়। আধুনিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবিদ্‌গণের মতে —

> "মানব-জন্ম-বিদ্যের যাহা ও গভীরতা যাহার মধ্যে যতখানি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে — Mind ও Soul, উভয়ই হইতেছে পূর্ণ করিয়াছে; যে-রচনার অভিনব ভঙ্গীর বিচিত্র-রস যেমন সুন্দর আকারে পরিণত হইয়াছে, তেমনই colour ও mystic perfume রহিয়া গেছে; এবং যাহার মধ্যে 'soul of humanity' — বিশ্বমানবের হৃদয়-স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই Great Art, সুতরাং তাহাই শ্রেষ্ঠ হইল।"

ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই গ্রন্থখানি অনেকাংশে সেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত; ইহাতেও Mind এবং Soul, অর্থাৎ, জ্ঞান এবং প্রেম দুইই আছে। ইহার বিষয়বস্তুও এক অর্থে অভিনব ও জটিল — জগতের বিচিত্র রূপের বিরাট বহুমুখী চিত্রধারাকে একটি সুন্দর রূপে পরিণত করা হইয়াছে; colour ও mystic perfume, অর্থাৎ নেত্রসুখকর বর্ণবাহুল্য (রূপ-রস) এবং অজানা জগতের পুষ্প-সৌরভ (অরূপ-রস) ইহাতেও আছে; এবং সর্বাপেক্ষা বড় যাহা — সেই নিখিল মানব-প্রাণের চিরন্তন আকুতি ইহাতেও এক গভীর সুরে ধ্বনিত হইতেছে।

কেদারমোহনের জীবন-কথা জানিবার উপায় নাই, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত ভূমিকায় যেটুকু জানিবার তাহার অধিক জানিবার চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য হই নাই। হয় ত' না জানিলেও ক্ষতি নাই — একটা কৌতূহলনিবৃত্তি বই ত' নয়। আরও কারণ, এই গ্রন্থেই তাঁহার ব্যক্তি-স্বরূপটি অভিনব সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া আছে। প্রথম জীবনে তিনি কাব্য-নাটক-উপন্যাসের রসরাজীর রস আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন — এই গ্রন্থে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে; শুধু তাহাই নয়, তিনি যে কত বড় জীবন-রস-রসিক ছিলেন, বাস্তব-অভিজ্ঞতাও যে বিপুল ছিল, তাহার পরিচয়ও এই গ্রন্থে আছে। এই দুইটি কারণেই তিনি বেলাকেও এমন সর্বাঙ্গসুন্দর-রূপে সম্ভার করিতে পারিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাগণ আরও একটা বিষয় লক্ষ করিবেন, গ্রন্থকার যেন অতি পরিচিত প্রিয়জনের মত আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, এ যেন গ্রন্থপাঠ নয়, সেই আলাপ-প্রসঙ্গ। এই অভিনব ব্যক্তিগত ভঙ্গিটি এই গ্রন্থের একটা বড় সাহিত্যিক লক্ষণ।

তথাপি 'অজানার কথা' বেলাকে-কথা হইয়াও এমন রসগ্রাহী হয় কেন? তাহার কারণ, এই গ্রন্থের মূল প্রেরণা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞান নয় — প্রেম। গ্রন্থকার নিজে জ্ঞানমার্গী নহেন, তিনি প্রেমিক। যে-অমৃত তিনি নিজে আস্বাদন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রাণের তীব্র পিপাসা শান্ত হইয়াছে, তিনি অপরকেও তাহা পান করাইতে চান। একটা উচ্চ আসন হইতে মানুষকে জ্ঞান-বিতরণ করা নয় — এ যেন তাহাদিগকে বুকে জড়াইয়া, পাশে বসিয়া সেই রস পান করাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা; তিনি যেন নিজের সেই বেদনা অপরের মধ্যেও অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং, এখানে শুধু রস নয়, সেই রস-পরিবেষ্টনের ভঙ্গিটিও ইহার সাহিত্যিক ঐশ্বর্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

ইহার বিষয়ও — মানুষের সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা — যে জিজ্ঞাসা হইতে বেদান্তের জন্ম হইয়াছে, যে-জিজ্ঞাসা মানবসমাজের জ্ঞান-শোধিতে বাসা বাঁধিয়াছে। সেই এক জিজ্ঞাসার বশে মানুষ যেমন বেদান্ত রচনা করে, তেমনই, কাব্য-নাটক, চিত্র-সঙ্গীত, মূর্তি-প্রতিমূর্তি, স্তব ও স্তোত্র — কত কি সৃষ্টি করিয়াছে! লেখক

বেলাস্ত-আলোচনার মধ্যে যে সমস্যাটির প্রতি প্রথম হইতেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। মানুষ যত বড় বীর হোক, যত বড় জ্ঞানী ও নাস্তিক হোক, তাহার প্রাণের সেই একটি জায়গাকে সে ক্ষুব্ধ করিতে পারে, ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। সেই যে দুঃখ, এবং সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি-লাভের শত চেষ্টা ও শত পরাজয়—সুখলাভের জন্য তার কোলাহল, শক্তি ও প্রতিভার তার প্রাণান্ত প্রয়াস,—তবু সে যে অধিক বিরতি-সুখ যাচে, সে সুখ আত্মপ্রবঞ্চনার সুখ, এমন কি সে একপ্রকার নেশা, ইহা কোন্ মানুষ অস্বীকার করিবে? পৃথিবী বৃদ্ধ হইয়াছে, মানুষের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার অন্ত নাই; তবু ঐ নেশার ঘোর একটু কাটিলে মানুষ এক দণ্ড বাঁচে না। এক বিদেশী কবি সেই যে বলিয়াছেন, "Be drunk, always drunk and with anything — money, wine, women, poetry; কিন্তু দেখিও, যেন একবারও চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে না হয়—কটা বাজিল!" ইহাই সত্য—সুখী হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। গ্রন্থকারও যেন তাহা বুঝিয়াছেন, সেই নেশার খবরই তিনিও খুঁজিয়াছেন। সুখ তিনিও চান, কিন্তু সুখের মূল্য যেমন বেশি, তেমনই তাহা যে দুঃখেরই ছদ্মবেশ! ঐ দুঃখনিবৃত্তি করাই মানুষ আদিকাল হইতে চেষ্টা করিতেছে, ইহাই মানুষের চিরন্তন ব্যবসায়। তাই আড়াই হাজার বা দুই হাজার বৎসর আগেও যেমন, আজিও তেমনই—মানুষ সেই এক বাণী শুনিয়া বিমর্ষ হইয়া পড়ে, তার চেয়ে বড় আশ্বাস যে আর নাই! সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এমন অমৃত কথা কি আর আছে?—

> "Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden, and I will give you rest."

আহা, এমন কথা কি সত্য! গ্রন্থকারও তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনিও আমাদের সমক্ষে হইয়া সেই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সুখই চাই, কিন্তু আছে কি? কেহ তাহা দিতে পারে? যদি না পারে, তবে কোন তত্ত্বকথার আমার প্রয়োজন নাই। তাহাতেই এই তত্ত্বকথার সূচনায় হইয়া গেছে, তিনি সেই সকল প্রায় সবগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং আমাদিগকেও দেখাইয়াছেন। তাহাতে দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত 'সুখ' বলিয়া কোন বস্তুরই সন্ধান মেলে না, মানুষের দুঃখনিবৃত্তিই হইতে পারে—বেদান্তও তাহার অধিক কিছুর আশ্বাস দেয় না। সাক্ষাৎ সুখ বলিয়া কিছুই নাই।

পাঠক-পাঠিকারা, এখনে বুঝিতে পারিলেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কি কারণে সাহিত্যহিসাবেও এমন উপাদেয় হইয়াছে। ইহা শুধু তত্ত্বের জন্যই তত্ত্বালোচনা নয়—ইহাতে মানবাত্মার সেই জিজ্ঞাসা রহিয়াছে, যে জিজ্ঞাসা পিপাসারই নামান্তর; সেই পিপাসা ও পানীয় দুই-ই তাহার গাঁই।

এইবার গ্রন্থখানির বিষয় একটু প্রবেশ করিব। প্রথম ভাগের নাম 'অদ্বয়ের কথা', ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যা। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিজেই একস্থানে লিখিয়াছেন—

> "তাহার ছাড়া অন্য কোন দেশে ইহার চর্চা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। যাঁহারা সংস্কৃত পড়িতে নারাজ, তাঁহাদের আমার এই অসংস্কৃত সংসার অবতারণা গ্রহণ করিতে হইবে। জিজ্ঞাসার তৃপ্তি না হয়, পাঠক-পাঠিকাকে নূতন পুস্তক উদ্যমে সংস্কৃত গ্রন্থাদি হাতে লইয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।" (পৃঃ ১৬১)

গ্রন্থকার অতি সত্য কথা বলিয়াছেন। যাহারা রীতিমত শাস্ত্রালোচন করিতে চান, এ গ্রন্থ তাঁহাদের জন্য নহে; মূল বা ভাষ্যের অনুবাদে যে জ্ঞানলাভ হইবে, তাহার পরিমাণও অভিপ্রায় স্বতন্ত্র, সে অবকাশ বা ধৈর্যখানি শূন্য যাঁহাদের নাই তাঁহাদিগকে "আমার এই অসংস্কৃত সংসার অবতারণা গ্রহণ করিতে হইবে।"

ইহার অর্থ আমি এই বুঝিয়াছি যে, ঘাসোড়াদের আর কোন সুস্থত নাই বলিয়া সাহেবে এই ছুতা ধরিয়া সাধারণ-শিক্ষিত পাঠক এমন মুখরোচকে ঠকিবে পারে। কথাটা বেশ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিবেন না, এমনটা হইতে বাধা। আর কেহ ঠিক এইরূপ গ্রন্থ-রচনা করিতে পারিতেন না, তাহাও নয়। ইহা শুধু পণ্ডিতের কথা নয়; ইহা একটি বিশিষ্ট মনের ভঙ্গি, একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ব্যাপার, এবং সর্বোপরি একটা এমন ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা রাখে, যে-সকলের যোগাযোগে সাহিত্যেও একবার যা হইবার হয় না। সেই ব্যক্তিত্বের একটা বিশিষ্ট রূপ বা সৌষ্ঠব আছে, তাহা অনন্যসুলভ, অনন্যসাধারণ। এই বৈশিষ্ট্য-রক্ষার যে এমন মূল্যবান লাভ করিয়াছে তাহার কারণ, ইহার বক্তা একজন পরম বৈষ্ণব, অথচ যোগেশের সেই বিশুদ্ধ, অতিশয় অবৈষ্ণব চরিত্রটির প্রতিও তাঁহার প্রদ্ধার অন্ত নাই। একজন বিশ্বাসী ও ভক্তিমান বৈষ্ণবের পক্ষে এইরূপ মুক্তপ্রাণে যোগেশের ওকালতি করা অবশ্যই বলিতেই হয়। লেখক যে মাঝে মাঝে তাঁহার বৈষ্ণব-মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলেন নাই এমন নয়, তথাপি তিনি সেই 'অন্ধ-রঙ্গ'কে যবনিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকেও ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। 'অন্ধের কথা' শেষ করিয়া 'ঠাকুরাণীর কথা'য় আসিয়া তিনি এমন কথা বলিয়াছেন বটে যে—

> "'আমি'-নামের সন্ধিনাশক অন্ধ-রঙ্গের ওকালতি করিয়াছি। ব্রহ্মদাসের নির্গুণ 'বলিয়া কিছুই পারিশ্রমিক দেন নাই, পারিতোষিক ত' দূরের কথা।"

রহস্যজনক হইলেও ইহার একটা ভেদ-অর্থ আছে, তাহা এই যে, অন্ধের-রঙ্গের উপাসনায় শেষ পর্যন্ত সুখই লাভ হইয়া থাকে—অন্যথা সাধারণের কোন প্রশ্নই নাই। কোন বৈষ্ণবিক অন্ধত এমন কথা বলিবেন না, গ্রন্থকারও বৈষ্ণবিকহিসাবে এ কথা বলেন নাই।

এই যে অনাসক্তি, ইহা একান্তই ব্যক্তিগত; এই রস-রসিকতাও পণ্ডিতসাধারণের আয়ত্ত নহে। সেই ব্যক্তিত্বের যে আর একটি দিক সম্পদ ইহাতে মুক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি—লেখক কারাবাস-জ্ঞানেও প্রবীণ। একাধারে এতগুলি গুণ দুর্লভ বলিয়াই এই গ্রন্থ এমন অসাধারণের লাভ করিয়াছে।

এইবার 'অন্ধের কথার' সাহিত্যিক সৌষ্ঠব, তাহার ভাষা ও রচনাভঙ্গির কথা বলিব। প্রথমে ভাষার কথাই ধরি। সকল মৌলিক রচনার যেমন, ইহাতেও তেমনই, ভাষার একটি নিজস্ব রূপ ও ভঙ্গি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার আরও কারণ আছে; এত বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক হইয়াও গ্রন্থকার পূর্বে আর কখনও লেখনী ধারণ করেন নাই। যাঁহার রসনায় ভাষ চিন্তা ও রসের উপযোগী শব্দরাশি ভিড় করিয়া আসে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কখনও রচনার বাধ্যবাধ্য করেন নাই, তাই তাঁহার ভাষায় এক প্রকার অনভ্যস্ত-পটুতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সহিত যোগও ঘটিয়াছে। লেখক নিজেও সে বিষয়ে পূর্ব-সচেতন, নিজেই বলিয়াছেন—

> "বিদেশী পুরোহিত ডাকিলে বিদ্যা-কাঙ্গালী যজমানের বিপদ, অধিকন্তু যজমান যদি যদি হয় তবে ত ব্যাপারটা প্রহসনবাদে পর্যবসিত হয়।···লেখক কিন্তু একটু ভোজবিদ্যা, শব্দবিজ্ঞানে তাহার অনায়ত্ত। এইমাত্র ভরসা যে, বর্তমান কালের পাঠক-পাঠিকাগণি শ্রদ্ধাবান ও শিক্ষিত। যদি যজমানের ত্রুটি অনেক করিয়াছে। এখনে যজমানদের ভোজনার কথার ত্রুটি নিজ নিজ শিক্ষার গুণে পূরণ করিয়া লয়—'পার্সনীয়ত্বলব্ধোদয়' গুলিয়া 'পাক বিদ্যা মুতা লঘা' করিতে প্রবৃত্ত হয় না।" [পৃঃ ৩০]

উপরি-উদ্ধৃত বাক্যে আমরা লেখকের যে বাক্-পটুতা ও রসিকতার পরিচয় পাই, তাহা সত্ত্বেও ঐ

বিশেষ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আমি পরে কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করিব তাহাতে দেখা যাইবে যে, অনন্তাচার্যের ভাষার যে সৌন্দর্য, — যে একটি অভিনব ঢাঁদের এই ভজনাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাহা মোটেই বিষয়কর। ভাষার ঐ বৈশিষ্ট্য অবশ্য এক কারণে ঘটিয়াছে, বিষয়টির গৌরব এবং তাহার ভাব-মণ্ডল অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, লেখক অতিপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি-ভাষার প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই এ ভজনার যথার্থ ঢাঁদ বলিয়া বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের পক্ষে এই ভাষা এতরূপ সাহিত্যিকের সহায় হইবে। গ্রন্থকার তাহা জানেন, তাই গ্রন্থারম্ভেই ইহার ভাষার পরিচয় নিজেই দিয়াছেন, যথা —

"বাগ্‌দেবীর একটি চরণকমল অর্থযুক্ত শব্দের উপর, অন্যটি ধ্বনির উপর প্রতিষ্ঠিত।...সরস্বতীর প্রাচীন বরপুত্রগণ তদ্বংশজ কবির শক্তি-যোজনা করিয়া নানা দৃষ্টান্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে উক্ত মূল্যবান শব্দ ও দৃষ্টান্তগুলি পাইয়াছি। ইহা আমাদের কম সৌভাগ্য নহে।... অতিশয় জটিল বোধ-কথা সেই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে।... কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে, অনেক সময়ে মনের ভাব শব্দ সাহায্যে প্রকাশ করা দুরূহ। কিন্তু ভাষা নিজের দুর্বলতা জানিয়াও ... সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলিকে অস্ফুটশব্দের সাহায্যে শ্রোতৃবর্গের গোচর করিবার চেষ্টা করে, ও সময়ে সময়ে কৃতকার্যও হয়।... বাগ্‌দেবীর দ্বিতীয় চরণ-কমল — এই ঔচিত্য-পুষ্ট কুসুমর, রস-ভাবক, ও অলিঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত।" [পৃ: ২-৩]

—এ উক্তির যাথার্থ্য গ্রন্থকার নিজেও সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমি এইবার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

(১) শিবের গলে সর্প, নিকটেই সর্পভুক্ মযূর ; মস্তকে শীতল গঙ্গা, ললাটে প্রজ্বলিত বহ্নি ; ভীষণস্বরূপ ভূতের ভয়ঙ্কর-কান্তি, তবে মনঃ-চিত্ত বিনোদিনী। খাদ্য বলদের খাদ্যে নিত্য ; বোলা লক্ষ্মী, সোহাগী সরস্বতী ; জনপতি কুবের দুয়ো, অথচ নিরুদ্বেগ ; বহ্নি যম, অথচ ঔদরপূর্ত কার্তিকের ; অন্নপূর্ণা গৃহিণী, ভিক্ষাজীবিকা ভিক্ষা। [পৃ: ১১]

(২) ঈশ্বরের ঘনাভাব ইচ্ছায়, ইচ্ছাশক্তি নানা নট-নটীরূপে আপনাকে বিখণ্ডিত করিয়া ঈশ্বরসঙ্গে নানা কৌতুকময় বিচিত্রলীলা প্রকট করে। কখনও প্রকৃতিবিদ্ সাজিয়া, নিজে স্বয়ম্ভূ হইয়াও, ধাতু, পল, বংশের বা পশ্বাদীকে তুচ্ছ করিয়া, সময়ের দূরং মাপকাটি সাহায্যে ক্রমিক প্রকৃত করে ... কুসুমের স্বয়নির্ধারণ-দীর্ঘকালকে পরিমাপকে লইয়া দীর্ঘায়ু ব্রহ্মাণ্ডের যথাক্রম স্থির করিবার উদ্যম করে। কখনও বা সপ্তর্ষিচিত্রে লক্ষ্যাতীত প্রাচীর বিস্তৃতানতা প্রতিপন্ন করিয়া বিষয়রসের অবতারণা করে। কোথাও বা অনন্ত আকাশে সাজিয়া নিরবচ্ছিন্ন অন্বেষণে আশ্চর্য-দীপাধার-সন্ধানে জীবন কাটাইয়া দেয়। কোথাও বা সর্বজ্ঞতাসকাশে মহাকাশ অণ্ডিকে ক্ষুদ্র নীচল দীপশলাকা-কোটায় নিরাপদে ধরিয়া রাখে। ... অচিন্ত্যে ঈশ্বরের সুখই হয়, দুঃখ হয় না ; দুঃখ অজ্ঞানের ধর্মিয়া রসশোষক, দুষ্টরাং হেয়রূপই। [পৃ: ১৪১]

(৩) কৃষ্ণ আসিয়া উঁহার পার্শ্বে দেখিলেন পীত বসন ; সোনার পীত বসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন, তাহা বসন নহে — তাহা ছবি মাত্র, ছলাকিনী ভালবাসা-ঠাকুরাণি।

"ঠাকুরাণি বলেন যে, পরাক-ঈক্ষা তুমি, তোমাকে আমি ভালবাসি।...আমি ব্রহ্ম-মহারাজ হইয়া তোমার জন্য হাটবাজারে ঘুরিব, এবং বস্তোদারাণী হইয়া তোমার লালন-পালন

ও শাসন করিবে। স্নেহ হইয়া তোমার সঙ্গে ফিরিবে, মন মনুষ্য তোমাকে পথ দেখাইবে, কবি হইয়া তোমার সাথের সাথী-নাম পাইবে; তোমাকে আমার নয়নতারা করিয়া রাখিবে; আমি তোমার কণ্ঠলগ্না হইয়া তোমার বনমালা হইব; তদ্ভবহ হইয়া প্রীতির সুনীতল ছায়ার মধ্যে তোমাকে রাখিব; মনঃপবন হইয়া, মধুমার মধু হইয়া তোমাকে আপ্যায়িত করিব; মন-পরিমলে তোমাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নাহিতে তরঙ্গী হইব করিব।...নানা মধুর বৈচিত্র্য স্বীকার করিব; তোমার পুষ্প, পুষ্প মধু মধুময় করি, লতাবিতানে — লতাবিতানে আমাদের সুখশয্যা, মাল্যচন্দ্র, রামধনী, মধুমাসের মৃদুতা, কোকিলের সঙ্গীতাদি — কলা-বিদ্যা সকলই হইব; তুমি সকল রকম সুখের মধ্যে কোনটাতেই বঞ্চিত হইবে না।"

[পৃঃ ২১৭, ২২০]

আর দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এ পরিচয় শেষ করিব — একটিতে রসিকতা ও অপরটিতে প্রেমে কামারসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। —

(১) বঙ্গপি-রাম মহাশয় বৎসরোমাদি ভ্রমে, সমুদ্রবন্ধনাদি অলৌকিক অসাধারণ উদ্যোগে, পুনরায় সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তথাপি প্রজারঞ্জনাদি নিরাধিকারের বিধিবাধ্য থাকায়, সীতাদেবীকে আদর রাখিতে পারেন নাই। তিনি এখনও অজ্ঞাতবাসেই নিবিষ্টা আছেন। রামজী স্বর্ণ-সীতাকে আসনের প্রতিবিম্বি স্বীকার করিয়া, সকল ফেলিয়া চাঁদা চাহিয়া, হাসরায় নামে অন্যাবধি পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। [পৃঃ ৭৪]

(২) আমার জীবন-স্বরূপ আত্মা স্বয়ংবরা করিয়া জগৎ হইয়াছেন। এই জগৎকে আমি ভালবাসিব — আমাকে আমার মত, প্রভুকে প্রভুর মত, প্রিয়তমাকে দেবী বা সখীর মত, পিতাকে পুত্রের মত, সন্তানকে মাতার মত, পঞ্চমখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে অমরনাথকে লক্ষ্মণরাম মত, এবং যদিচ কি, হয়তো ষোড়শ পরিচ্ছেদে উপেনকে ইন্দিরার মত; হয় তো বা আরও বেশি। ভালবাসাটা সর্বতোভাবে দিবে; ইহার সীমা নাই, তৃপ্তি নাই। [পৃঃ ১২২]

প্রেমের ভাষা, ভাব, ও চেনোতন্ত্রির পরিচয় ইহার অধিক আবশ্যক নাই। কেবল কয়েকটি বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণকে পূর্ব হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া কর্তব্য মনে করি। প্রথমতঃ, মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার যে বিষয় তাহার মূলে আছে একটি সুপ্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারা একটি বিশিষ্ট ভাষা ও বাক্‌পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হইয়া আছে। লেখক প্রথমকারকে, যতটুকু আবশ্যক, সেই ভাষার সাহায্য লইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ সেই ভাষাকে যতদূর সম্ভব লঘু করিয়া, তাহার বিশিষ্ট শব্দ ও বাক্যগুলিকে যেরূপ নিপুণ ভাবে এই গ্রন্থে রক্ষা করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে আমাদের সংস্কারে ঘনাইয়া দিবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ঐ ভাষার সহিত বাংলাভাষার যোগস্থাপন না হওয়ায়, ঐ চিন্তার এতদিন আমাদের সাহিত্যিক সংস্কারের পরিপন্থী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে গ্রন্থকার ঐ দার্শনিক চিন্তাগুলিকে আমাদের ঘরোয়া করিবার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন সেখানে তিনি ভাষার সাহিত্যিক সৌষম রক্ষা করিতে পারেন নাই; তাহা সম্ভবও নয়। যাহা বিষয়টিকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য তিনি যে উপায় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই অনিবার্য হইয়াছে। তিনি একই শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ, এবং পর্যায়-শব্দের প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। আবার, বাক্য-গুলিকে অর্থ-গাঢ় করিবার জন্য যেমন দীর্ঘ, তেমনই

ভাবের দিক দিয়া লাভবিত করিয়াছেন; তাহাতে আমাদের একটু মনোযোগের প্রয়োজন হইবে মাত্র। ঐরূপ দীর্ঘ-বাক্য হয়ত আরও সরল হইতে পারিত; হয় নাই তাহার কারণ দুইটি, এক — গ্রন্থকার ঐ রীতিই উপযুক্ত মনে করেন; দুই — ভাষাসংস্কার ও শব্দযোজনায় অনভ্যাসের অপটুতা। কিন্তু এ ভরসায় রইল এলেই যে, পাঠকের তাহাতে বিশেষ বাধা ঘটিবে না, সেটাই অভ্যাস হইয়া যাইবে।

সর্বশেষে এই গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই পত্রিকার শেষ করিব। গ্রন্থবস্তুতে যে তত্ত্বের প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহার সমালোচনা করি এমন স্পর্ধা আমাদের নাই। আমি সাধারণ পাঠক-পাঠিকারই একজন। সেই সাধারণ মানব-মনের যে জিজ্ঞাসা ও আকুতি, তাহাই এই গ্রন্থের প্রতি আমাকে অতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। আমরা গ্রন্থকারের মত পণ্ডিত নহি, কিম্বা তাঁহার মত কোন আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার বা ধর্মোপলব্ধির অধিকারীও নহি। গ্রন্থকার তাহা জানেন। তিনিও আমাদিগকে কোন শাস্ত্র-মতে বিশ্বাসী হইতে বলেন নাই; সেই উদারতা — খাঁটি বিশ্বপ্রেমের যাহা লক্ষণ — তাহা যদি গ্রন্থকারের না থাকিত, তবে তিনিও বেদান্ত-আলোচনার অধিকারী হইতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগকে কেবল ভাবিতে বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, এবং ইহাই আশা করিয়াছেন যে, এইরূপ আলোচনা-প্রসঙ্গে, আর কিছু না হইলেও, আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হইবে। হইবারই কথা; কারণ এই গ্রন্থের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় তাহার মত মহিমা যে আর কিছুরই নাই। তারাখচিত নিশীথ-আকাশের সুগভীর মহিমা আমাদের চিত্তকে যেমন শান্ত ও নির্মল করে, অন্তরের সেই জ্যোতির্ময় বিস্তারকল্পনে আমরা যেমন অন্তরে একটি মহিমা বোধ করি, এই গ্রন্থের বিষয়টিকে চিন্তা করিয়া — আমার বিরাটকে এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া — আমাদের চিত্তের কিঞ্চিৎ সমুন্নতি অসম্ভব নয়। আমরা যদি কোন জ্ঞানমার্গ করি, আমাদের বিশ্বাস বা আত্মিক-বুদ্ধি যদি দৃঢ়তর নাও হয়, তথাপি এই গ্রন্থ-পাঠের ফলে আমাদের মনের দ্বারা যে কিছু বৃদ্ধি পাইবে, একটা মানু-পরিবর্তনের মত ফললাভও যে হইবে, আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ সে বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন।

তথাপিও যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার মত পাঠক ইহার ঐ তত্ত্বালোচনা হইতেও কি কোন উপকার পায় নাই? তাহার উত্তরে আমি এ স্থলে বিস্তারিত ভাবে কিছু বলিব না — সে সমালোচনার স্থান এ নহে। আমি জানি, আজিকার দিনে তত্ত্বের কোন মূল্য নাই; কোন চিন্তা, কোন সত্যই এখন বাকি বা পৌঁথিক-বিদ্যের উপাদেয় হইলেই চলিবে না; পাণ্ডিত্যের কথা স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে আমি গ্রন্থের ভূমিকায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাহার স্থান বা অবকাশ নাই। গ্রন্থ-পরিচয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য, এবং পাঠক-পাঠিকা-গণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য, (কারণ, আমি তাঁহাদেরই একজন) কেবল ইহাই বলিব যে, গ্রন্থের যৌবনে এই গ্রন্থের সহিত যখন আমার পরিচয় হয় তখন ইহার মধ্যে আমি যে এত নূতন চিন্তা ও ভাবের জন্য উদ্ঘাটিত হইতে দেখি, আমার ভাব-জীবনে তাহা চিরদিন আধিপত্য করিয়াছে। ঐ তত্ত্ব যেমনই হৌক, উহা সেইভাবেও আমার চিন্তাকে কোন একটা দিকে চালিত করিয়া থাকিবে — আমার নিজস্ব ভাব-চিন্তাকে স্বাধীন ও সক্ষম করিয়া থাকিবে। সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থের — বিশেষতঃ সাহিত্য-গ্রন্থের ইহাই প্রধান কাজ; এইজন্যই তাহাকে Literature of Knowledge না বলিয়া Litera-ture of Power বলাই সঙ্গত। 'অন্তরের কথা' আমার নিকটে মুখ্যতঃ ঐরূপ সাহিত্য-গ্রন্থই বটে, উহার ভাষা এবং রচনাভঙ্গিও আমাকে অন্য মুগ্ধ করে

যাই — সেখিত সিদ্ধান্তে উহার নিকটে আসি কখনো। যৌবনে ইহাতে অধিক প্রয়োজন ছিল না, আজ বৃদ্ধ হইয়াছি, তাই হৃদয়ের পিপাসাও বড় হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরে, এই গ্রন্থপ্রকাশন-কালে আমি ইহার একটি টীকাও রচনা করিয়াছি, তাহাতে গ্রন্থকারের গূঢ়ার্থ-বচন বুঝিবার চেষ্টাই করিয়াছি; তথাপি 'অন্তরের কথা' বা অন্তর-কোষের শেষ সিদ্ধান্তে গ্রন্থকারের যাহা স্থান নাই, আমিও তাহা পাই নাই — কিন্তু অন্য কাহাকে। গ্রন্থের শেষে যে 'উপসংহার কথা' আছে, তেমন তাহা-কথা মানব-সাহিত্যে অল্পই আছে।

শেষ করিবার পূর্ব্বে আমার সেই কথারই পুনরুক্তি করি। এই গ্রন্থ জ্ঞানীর জ্ঞান বা ভক্তের ভক্তি যেটুকু যেমনই বৃদ্ধি করুক, সাধারণ পাঠকও যে ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারও বেশি কিছু আশা করেন না, কেবল এইটুকু মাত্র বলেন যে, ইহার দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে। সে অধিকার তাঁহার আছে। তদ্ভিন্নাবে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মূল্য যেমনই হোক, উহার দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তিলাভ না হোক, এই গ্রন্থের একটা নিজস্ব গৌরব আছে। মানুষের চিন্তা ও কল্পনা যাহার ইর্দ্ধে এপর্য্যন্ত উঠিতে পারে নাই — জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন — গ্রন্থকার সেই সুদূর ও দুরধিগম্যকে এই গ্রন্থের পাঠান-পথে আমাদের একেবারে সম্মুখে আনিয়া দিয়াছেন। উহার দ্বারা দিব্য আমরা মানব-মানসের সেই উচ্চতম শিখর — অকল্পা-লোকরশ্মির কাঞ্চনরঙ্গকে দেখিতে পাই; অথবা আরও দুরধিগম্য সেই স্বর্গীয়রশ্মোদ্ভাসিত মানস-সরোবরকে প্রত্যক্ষ করি — যাহার গরিমির আকাশ-মার্গে, ব্রহ্মতারাকে বেষ্টন করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডল বিচরণ করিতেছে। সে দৃশ্য দর্শন করিয়া আমাদের দৃষ্টির প্রসার হয়, হৃদয় বিস্তারিত হয়, এবং তদ্বারা অন্তরের পিপাসাও জাগে। এত লালসা ও নৈরাশ্যের মধ্যে, মানুষ আমরা, কল্পিকের জন্যও অনুভব করি যে, যাহা দেখিতেছি তাহাই সব নয়, দৃষ্টির যেপারেও কিছু আছে, বিরাটতর কিছু আছে, এবং মানুষই তাহার সংবাদ পায়। এ দৃশ্য ঠিক এমন করিয়া বাঙালীকে কেহ দেখাইতে পারেন নাই; যে পরলোকগত মহাত্মা নিজে এমন করিয়া দেখিয়াছিলেন, এবং অতি গভীর প্রেম ও বিশ্বাসের বলে, আমাদিগকেও সেই দৃষ্টির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে বারবার প্রণাম করি।

জানি না কেন এ সব, কোন্ কলাকল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্মকোলাহল, —
জানি না কি হবে পরে, রবি অস্তাচল
আমি অন্ত এ সংসারে; নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-মুকুলের
মিষ্টি কি না চির-আয়ু। পণ্ডিতের ঘরে
চাহি না এ জনম-রহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ঘোর,
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

— রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গ-দর্শন

অধর্ম্মাগত সুখ-সাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার একতিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না ; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজ-বিপ্লবের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

—কৃষ্ণচরিত্র, পঞ্চমখণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

গত সংখ্যায় আমরা যে, 'বঙ্গ-দর্শন' লিখিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের মতামত যেমনই হৌক, দুঃসাহসের অন্ত ছিল না ; কেন না, আমরা যে সকল আশঙ্কা তুলিয়াছিলাম, এবং অন্ততঃটা জোরের সহিত যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাকে মেম অট্টহাস্য করিয়া এমন সকল ঘটনা ঘটিয়াছে যে, আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। কিন্তু লজ্জা আমরা পাই নাই, কারণ, আমরা ভবিষ্যৎবক্তা নহি, এবং কোন ঘটনার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তকেই সত্য বলিয়া মনে করি না — ঘটনায় যাহা সত্য সত্য ধরা দেয় না, তাহাকেই বুঝিবার চেষ্টা করি ; এবং তাহাও যে অভ্রান্ত হইবে এমন স্পর্দ্ধা করি না। তা ছাড়া, যাহা শুভ ও কল্যাণকর তাহাই আমরা আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করি, আমাদের আশঙ্কা মিথ্যা হইলেই সুখী হই ; আমরা কোন দল বা পোলিটিক্যাল মতকে জয়ী করিতে চাই না, দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করি।

•

আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে একটা কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে বলি, তাহা এই যে, 'বঙ্গদর্শন' মুখ্যতঃ সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তার চর্চা করে, পলিটিক্সের সঙ্গে তাহার সেরূপ সম্পর্কও নাই। তথাপি আমরা যে — পলিটিক্স না হউক — তৎসম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করি, তাহা কেবল নিতান্তই প্রাণের তাড়নায় ; বাংলা দেশ ও বাঙালীর যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাতে আমাদের মত অতিবড় অরাজনৈতিক ব্যক্তিকেও বাধ্যে হইতে হইয়াছে — ইহা এক প্রকার আকুলি-ব্যাকুলি ব্যাপার। অতএব যাঁহাদের কোন পোলিটিক্যাল বর্ম্ম-বিশ্বাস আছে, তাঁহারা আমাদের এই নিতান্তই প্রাণান্ত উৎকণ্ঠার অকুণ্ঠিত নিবেদনে ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমরা জানি, আমাদের অতিশয় প্রিয় এবং প্রকাশ্যজন সুহৃদ্‌গণও আমাদের সহিত একমত নহেন, তথাপিও আমরা নিরস্ত হইতে পারিতেছি না।

•

যাঁহারা পলিটিক্স-চর্চ্চা করেন তাঁহারা অবশ্যই বিশ্বাস করেন যে, গোটা-ভারতের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি। গোটা-ভারত বলিতে এক্ষণে যাহা বুঝায় তাহার যদি সত্যই মুক্তি হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই বাংলাদেশেরও হইয়াছে। বাংলাদেশ বলিতেও এখন আর একটা গোটা-বাংলা দেশ বুঝায় না — খণ্ড-বাংলাই বুঝায়, তথাপি যেহেতু পাকিস্তানও একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করিয়াছে, অতএব দুই খণ্ড দুই রূপে মুক্তিলাভ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে মুক্তি কথাটা অর্থহীন হইয়া পড়ে ; পলিটিক্স ইহাই বলে, আমরা পলিটিক্স বুঝিনা বলিয়া তাহা বলি না ; আমরা বলি, মুক্তি কাহারও হয়

নাই। তাহাতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে তবে ঐ কথাটা লইয়া তুমা বাদ-বিসম্বাদ করিয়া লাভ নাই; আমরা উহা স্বীকার করিয়া লইয়া এই স্বাধীনতার যে প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করিতেছি তাহাকে মুক্তি-ফল না বলিয়া স্বফল বলিয়াই বুঝিব। সেই স্বফলের বিষয় পাঠক হইয়া উঠিতেছে— বিশেষতঃ মাতৃভাষার পক্ষে— তাহারই আমরা চিন্তা করিব।

• • •

ঐ যে মুক্তি বা স্বাধীনতালাভের কথা বলিয়াছি, উহা ভারতের স্বাধীনতাই বটে; মনে-মনে উহা ছোটা-ভারতের হইলেও, উহার বহুদূর সীমানা বহুখানি আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া লইতে হইয়াছে— তাই দুর্বলকে প্রবলের তুমা মিটাইয়া আত্মাহুতি দান করিতেই হইবে। এইজন্য ভাবের দিক দিয়া যেমনই হউক, বাস্তবের দিক দিয়া আমরা ঐ ভারতের স্বাধীনতা ও বাংলার স্বাধীনতাকে এক বস্তু বলিয়া মনে করি না; কিন্তু উহা বাঙালীরই স্বফল— মুক্তিফল নহে, উহাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

সেই স্বফলের কথা ভাবিয়াই, ১৭ই আগষ্ট হইতে নিকট হইতেছিল, আমরা তাহাই উৎসুক হইয়া উঠিতেছিলাম— এমনই আমাদের দুরদৃষ্ট। দেশবাসীরা — পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা — সবাই বিজয়োৎসবের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন আমরা তাহাই, পথে-পথে, ঘরে ঘরে উড্ডীয়মান চক্রাঙ্কিত ত্রিবর্ণ-পতাকার পরিবর্তে অপর যে একটী বস্তুর (তেমনই চিত্র-বিচিত্র কিন্তু ভূ-সূচিত) রূপ-দর্শনের আশায় উন্মুখ হইয়াছিলাম— তাহা বাউণ্ডারী-কমিশনের তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বঙ্গদেশের রক্তাক্ত মানচিত্র। আমরা সর্বাগ্রে সেই ম্যাপখানির দিকে চাহিলাম, চাহিয়া এক পলকেই বুঝিতে পারিলাম, হিন্দু বাংলার অস্তোষ্টি-কর্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে।

• • • •

সত্যসত্যই এইরূপ আশঙ্কাই করিয়াছিলাম, তথাপি বাংলা-ভাগের এই বাস্তব-রূপ কল্পনা করিতে পারি নাই; দৃষ্টিটা ছিল কলিকাতার দিকে, তাহারি ছিলাম একটা মায়া আসিয়ে সেই দিক দিয়াই। যদিও কলিকাতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা এখনও নিঃসংশয় হইতে পারি নাই (পরে তাহার কারণ উল্লেখ করিব)। তথাপি, এইবার যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে সত্যসত্যের আশাটুকুও নির্মূল হইয়াছে, বুঝিলাম সবটাই এবার আর রক্ষা নাই। ইহাও বুঝিলাম, এ ব্যবস্থার মূলে এমন ফোক্কা-পড়া আছে, যাহার আর কিছুমাত্র নড়-চড় হইবে না, হইলে সোটা-ভারতের বুঝিবা বিপদ হইবে।

• •

ঐ ম্যাপখানির দিকে চাহিয়া দেখ, উহাই স্বাধীন বাংলা— বাঙালীর স্বদেশ। এতদিন যে-ভূমির নাম ছিল বঙ্গদেশ, যে দেশের মাতৃকোটিকে লইয়া তোমার গর্বের অবধি ছিল না, যে-দেশের চতুঃসীমা প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার চারণ-কবিগণ বর্ণনার ভাষা পাইত না— সেই "যার হাতে ধান দুর্বার ফুল, তাহিনে মধুকমালা" আরও কত কি। — এখন সেই দেশের ঐ একটি ক্ষুদ্র টুকরার দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারো? বাংলার সেই নবনীগুলির মধুরী নামমালা স্মরণ কর। আবার, "বিস্তৃত কবরীতুকে সাজ অন্ধকার," "সরীর সুন্দরবনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী," "ঘরির মধুকবনে ঘান জোছনা-মাতন"— তাহার সেই নব-নবরূপ ভাবিয়া দেখ, আর ঐ মূর্তি নিরীক্ষণ কর— উহাই কি বাঙালীর মাতৃভূমি? সহস্র বৎসর বাঙালী যাহাকে আপন বলিয়া জানিত, আজ এতদিন পরে সে ভূমি আর তাহার নহে! বাঙালী-মুসলমানেরও নহে, সেও সেখানে দাসত্ব করিবে— অবশ দাসত্ব।

• •

না, আমরা তুধা ভাবোচ্ছ্বাসের বশবর্তী হইয়া অহেতুক বিলাপ করিতেছি না। — জানি, আমরা এতদিন স্বাধীনতা লাভ করি নাই বলিয়াই দেশটার সর্বত্র সকলের সমান-অধিকার ছিল; এখন বাঙালী স্বাধীন হইল, সেই স্বাধীনতার বিনিময়ে তাহাকে তাহার রাজ্যের অর্ধেক ত্যাগ করিতে হইবে — ইহাই সর্বজনস্বীকৃত যে পলিটিকস্ তাহার অবশ্য-পালনীয় ধর্মাচার। অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা সেই পলিটিকস্ করিতে পারে না, তাহাতে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, কাজেই বাঙালীকে তাহার কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। এই জন্যই, এই অবশ্যম্ভাবী কর্মফল ভোগ করিবার জন্যই, তাহাকে মোটা-ভাতের মুক্তি-মুখে ভোগ দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এখন যে যাহা পাইল, তাহাও বাকি পাইত না, ইহাও অনেক যুক্তি-বিবেচনা ও তর্ক-বীকারের ফল। এখন ঐটুকু ভোগ করিবার যে শক্তি তাহাও বাঙালীর আছে কি? অতএব হে বাঙালী, তুমি আর দোদোগ করিও না, তুমি স্বাধীন হইয়াছ, এবং ইহার আর কোথাও নাই, এই ছুইটী বেদ-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তোমার কর্মফল ভোগ করিতে থাক।

কিন্তু উহা কি সেই অর্ধেক? এবং এক তৃতীয়াংশও কিনা সন্দেহ! — হইলেও উহাতে আসে কি? যাঁহারা ঐ জেলার অধিকাংশ ভূমির সহিত পরিচিত — যেমন আমরা — তাঁহারা জানেন, উহার অর্ধেকেরও অধিক জলহীন রুক্ষ-ভূমি, তুমির অবস্থা; এবং আরও অনেক অংশ ম্যালেরিয়ায় জনহীন। আয়া অথবা তুমি, দিয়া ছইএই দিক দিয়া ঐ ভূমি বর্তমানে শুদ্ধ বাংলার উষ্ণ-ভূমি। তাহার উপর, উহার পরিমাণ দেখিলেও মনে হইবে, উহা যেন পাকিস্তানের একটা বাড়ী বা উদ্বৃত্ত অংশ। হিন্দু বাঙালীর ভাগে ইহাই পড়িয়াছে।

* * * *

ভূমির ভাগ ও ভোগে দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু উহার অন্তরালে যে আর একটি ভাগ রহিয়াছে তাহা যেমন সূক্ষ্ম, তেমনই আরও বীভৎসময়ক। ঐ যে সীমানা-নির্দেশ উহার জন্য অভিপ্রায় আছে, বোধ হয় সেই অভিপ্রায়টাই গুরুতর। পূর্বভাগের ঐ বিপুল বিস্তারের দ্বারা বাঙালী হিন্দু-সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে বেড়াজালে যেমন করিয়া ধরা হইয়াছে; যাহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু তাহাদের প্রায় অধিকাংশকেই পাকিস্তানের কোরানী শাসনের অধীন করা হইয়াছে — কেন যে করা হইয়াছে তাহা কথায় এবং কাজে ইতিপূর্বেই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। পশ্চিম-বঙ্গের বা পূর্ববঙ্গের হিন্দু-নেতা অথবা রাষ্ট্রনেতৃ-সম্পাদক যতই সেদিকে চক্ষু বুজিয়া উপেক্ষা অথবা মৈত্রীর আশ্বাসে বাঙালীকে আশ্বস্ত করুন না কেন (এখনই তাহা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে), উহার ফল একরূপ সুনিশ্চিত। ঐ সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুই একদিন হিন্দুসমাজের নেতৃত্বও, ঐ নেতৃত্বও ভাসিয়া গেলেই বাঙালী-হিন্দু বলিতে কোন জাতি আর থাকিবে না। একদিন ইহারাই একরূপ ঘরে গিয়া বর্ণহিন্দু অর্থাৎ বাবু-হিন্দুদের যে পলিটিক্স করিবে, তাহাতে একই সঙ্গে তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সকলই লাভ হইবে। তাহা হইলে, অবস্থা যে অবস্থায় কি দাঁড়াইল, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। ঐ যে বাংলা-ভাগ উহাতে হিন্দুসমাজের হস্ত পদ উদর ও বক্ষ কাটিয়া লইয়া কেবল সেই মুণ্ডটি ফেলিয়া রাখা হইয়াছে — যে-মুণ্ডের বহিতে এ যুগে বাঙালীর পাপবুদ্ধি ঘনীভূত হইয়া আছে।

নূতন ব্যাপক-নির পানে চাহিয়া ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের এই বিষাদ যে-সকল কারণে অভিশপ্ত হইয়াছে তাহা খুলিয়া বলিবার সময়

এখনও আসে নাই। কখনো মানুষকে যে সহজ বুদ্ধি দিয়াছেন, এবং চতুষ্পদে পরিণত হইবার যে চৈতন্য লুপ্ত হইয়া উঠে, আমরা তাহার বেশি দাবী করিতেছি না; প্রকৃতির নিয়মকে আমরা ভগবানের নিয়ম বলিয়াই মানি, সেই নিয়ম না মানিবার মত স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। এবং সুর্দ্ধাপরি আমরা বাঁচিতে চাই, আত্মহত্যাকে একটা বড় নাম দিয়া, পরের মরিবার জন্য নিজেরা সকলে বিপদ হইতে চাহিনা। এখন সমস্ত ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিতেছি, আর সকলেই যেমন করিয়া হোক শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া যাইবে, মরিবে কেবল বাঙালীই, তখন ছোটা-ভারতবর্ষের হিতার্থে আমরা এমন করিয়া মরিতে প্রস্তুত নহি। শ্লোকবাক্য অনেক থাকিতেছে, কেন তাহা জানি। বাঙালীর জন্যে একটা কথাই ব্যবহার ধ্বনিত করা হইয়াছে যে, এমন প্রেম, এমন আত্মত্যাগ বাঙালীই করিতে পারে, বাঙালী মরিলে সারা ভারতের ক্ষতি হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত সেই দেখাইবে বটে; কিন্তু অপরাপর ভারতবাসী তাহার অনুসরণ করিবে কেন? তাহাদের ত প্রয়োজন নাই। তাহারা কি কখনো বাঙালীর মত নিজের চিতা নিজে সাজাইবে?

* * *

কিন্তু পাপ আমাদেরই, পরের বিরুদ্ধে আমাদের কোন নালিশ করিবার থাকিতে পারে না। বাংলাদেশে বাঙালীর যে সর্বনাশ ঘটিয়াছে, যে-বর্তমান ও যে-ভবিষ্যৎ প্রতিদিন সর্বসাধারণে প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহা কিছুতেই আমরা বুঝিব না বা বুঝিতে দিব না। যে পলিসির ফলে বাংলাদেশের আজ এই অবস্থা, সে পলিসিও আজ কাজে ও কথায় গোপন থাকিতেছে না, যাহা চতুর্দিকে ঘটিতেছে তাহার একটা ছাড়া আর কোন অর্থই হয় না। ইহার জন্য দায়ী কে? বুদ্ধিনাশ নয় — বাঙালী পাপে অর্জরিত হইয়াছে। পরকে দোষ দেওয়া বৃথা। পর যদি আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, বাংলা ও পাঞ্জাবকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহা বুঝিয়া বাঙালী আর কিছু না পারুক, আত্মস্থ হইতেও পারে। বাংলা ও পাঞ্জাব সম্বন্ধে আমি যে কথা বলিলাম উহা আমার কথা নহে, আজ যিনি বাংলার শাসন-তন্ত্রীর কর্ণধার নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহারই কথা, এবং সেই কথাই যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে তাহা এ দেশের সংবাদপত্র-সম্পাদকেরাও বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু যে-বাঙালী পলিটিক্স করে, এবং যাহারা সেই পলিটিক্সের হোলসেল নেতা, তাহারা ঐ সত্যকে কিছুতে উচ্চারণ করিতে দিবে না; ইহারাই খণ্ডিত বাংলার সেই উন্মাদ — যাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহাদের দ্বারা বাংলাকে যেমন করিয়া হোক ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলে ভারতরাজ্য নিরাপদ হইতে পারিবে, ইহাও অচিন্তনীয় নয়।

*

বাঙালীর পাপের কথা বলিতেছিলাম। এ কথা আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না যে, বাঙালী ভদ্রলোক, যা যাঁহাদিগের নূতন নাম হইয়াছে বর্ণহিন্দু, তাঁহারা দেশকে অর্থাৎ গ্রাম-সমাজকে এবং তদুপরি বর্তমান বাঙালী-হিন্দুর যে একমাত্র বল — সেই নিম্ন শ্রেণীকে বরাবর বর্জন করিয়াছেন। যাহারা দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধিত হইয়া উঠে — তাহারা অপরাধ ভারত-ভক্ত না হইয়া পারে না। বাবু-বাঙালী এ জাতির পরমাত্মা বলিলেই হয়। রাজনীতি-সাধনায় যে সফলতা করিয়াছে তাহার শাঁসটুকু (যদি কিছু থাকে) ঐ বাবুরাই ভোগ করিবে, আসল বাঙালী যাহারা তাহাদের ভাগে খোসাও জুটিবে না। ঐ ঘাটোয়ারার ফলে তাহারাই মরিবে, কেহ তাহাদিগকে দেখিবে না; কি পূর্ব কি পশ্চিম, দুইভাগেই বাবু-বাঙালীরা —

নেতৃত্ব করিবার জোরে, এখন হইতে কেবলই মৈত্রীর মহিমা-কীর্তন করিবে, এবং 'চাচা আপন বাঁচা'-নীতিই — যে যেমন পারে — ভাল করিয়াই পালন করিবে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-বাঙালীরা এখনও কিছু সবল বলিয়া দোলবাদ করিতেও সক্ষম। এখানে আর কিছুকাল প্রেমের ধ্বজা বহাইতে পারিলেই, সব ঠাণ্ডা — বাংলার 'all quiet on the Hindu front' হইতে বিলম্ব হইবে না, বাঙালী হিন্দুসমাজ লোপ পাইবে। তার পর, ওই বাকুলের কেহ গান্ধী-টুপি ও জহর-কোর্তা, কেহ বা কেজ-পায়জামা পরিয়া বাঙালীদের সকল ব্যয় হইতে মুক্ত হইবেন।

* * *

মাউন্টব্যাটেন-ফর্মুলের ঐ হজাগে লইয়া যে একটু কোলাহল হইয়াছিল তাহা ইতিমধ্যেই প্রায় শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উহাকে শুদ্ধ করিবার জন্য যে প্রাথমিক প্রচেষ্টা আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে বিস্মিত হই নাই — বাঙালীর যে কি হইল, তাহা বুঝিবারও অবসর তাহাকে দেওয়া হইল না; চোখ-কাণ একটু খুলিবার অবকাশও তাহারা পাইল না। যাহারা দেশকে বিকাইয়া দিয়া, স্ব-সমাজ ও স্বজনকে ভাসাইয়া দিয়া কিছু সুবিধা করিয়া লইতে চায়, তাহারা ঐ বাংলা-ভাগ সম্বন্ধে আগে চিন্তিত নহে; তাহাদের বুদ্ধি অন্য দিকে, তাই তাহারা ঐ কথা তুলিতে না দিয়া কেবল ইহাই শুনাইতে পারিলে বাঁচে যে, বাংলার পাকিস্তানে যোগের কারণ নাই,— অবস্থা ক্রমেই ভালর দিকে।

* *

হিন্দু বাংলার রাজধানী কলিকাতা। অথচ কলিকাতায় বাঙালী ভাড়াটিয়া মাত্র, বাড়ীওয়ালা ও মহাজন বিদেশী। আমরা গতবারে এই কলিকাতা হস্তান্তর হওয়ায় আশঙ্কায় অধীর হইয়াছিলাম — একটা অজ্ঞাত ভাবালুতার বশে। কিন্তু আসলে কলিকাতা বাঙালীর শক্তিপীঠ নহে — মৃত্যুপীঠ। কলিকাতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙালীর ভাবালুতা তৃপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দু বাংলায় কি লাভ হইয়াছে? উহার যে রাজধানী বা মনোৎপাদন-শক্তি তাহার কতখানি বাঙালীর? উহার প্রাসাদগুলিতে যে বাঙালী বাস করে তাহাদের সহিত বাংলার পল্লীসমাজের নাড়ীর যোগ আছে? আজকাল যে ব্যাঙ্কার্কেট—যে দরিদ্র-হত্যাকারী দানবধর্ম বস্তুতা — চলিতেছে তাহার কেন্দ্রস্থল ঐ কলিকাতা। ঐখানে বসিয়া যাহারা সর্বদিকের নেতৃত্ব করে তাহারাই চতুরতায় ও স্বার্থপরতায়, ধনলিপ্সায় ও বিলাসীতায় অগ্রণী। বাকি যাহারা ঐ স্থানে বাস করে, তাহারা ধনহীন দাসবর্গ, তাহাদের মন চুরাশা কেহ নাই। এখনকার ঐ কলিকাতা সেই কলিকাতা নয়, যে কলিকাতা হইতে একদা সারা বাংলাদেশে নবজীবনের সঞ্জীবনী প্রভাবিত হইয়াছিল।

* * *

কিন্তু ঐ দাগের দিকে চাহিয়া, একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমাদের মনে আর একটি সন্দেহ জাগিয়াছে, সেই পর্যন্ত তাহাই বলা হইলে অন্যায় হইবার কারণ নাই। সকলেই একটা ব্যাপারে চমকিত হইয়াছেন — ঐ খুলনা-জেলাকে পাকিস্তানে যুক্ত করা। উহাতে একটা ঘোরতর অবিচার মনে করিয়া সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে — কিন্তু উহার মূলে যে একটা গভীর উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন থাকিতে পারে, তাহা এ পর্যন্ত কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। আমরা করিয়াছি। খুলনা-জেলাটিকে উপলক্ষ করিয়া বাধা হইয়াছে — কলিকাতার ভাগ বসাইবার জন্য। উহা কেবল পাইতে হইলে অপর পক্ষের সহিত আপোস করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেই আপোষের কথাটা আর একটু ঘোরালো ও জোরালো করিয়া তুলিতে পারিলেই, অপর-পক্ষের সহিত মৈত্রী-রক্ষার জন্য, ঐ জেলাটির বদলে কলিকাতায় একটা ভাগ হকের অধিকার এ পক্ষকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে।

তুলা যাইবে, অপর পক্ষ খুলনার বিনিময়ে আর কোন জেলার আর কোন অংশ লইতে চাহিবে না। খুলনাকে ঐরূপ ভাবে ভাঙিয়া রাখার ইহাই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। অন্য যে কারণ থাকিতে পারে, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল।

* * *

বাউণ্ডারী-কমিশন কর্তৃক ঐ বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে আমাদের যাহা মনে হইয়াছে তাহা অকপটে লিখিলাম, আশা করি, তাহাতে কোন বাঙালীই ক্ষুব্ধ হইবেন না। এবারকার 'বঙ্গ-দর্শনে' এই বিষয়ে আমাদিগকে এই যে কথাগুলি বলিতে হইল, তাহাতে কোন দল বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আমাদের আহেতুক বিদ্বেষ আছে, আশা করি, এমন কেহ মনে করিবেন না। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে ব্যাপারটি বাঙালী-জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে দিকে সকল চিন্তাশীল ও স্বজাতি-প্রেমিক বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, ঐ আলোচনা করিতে বসা হইয়াছি। আরও, আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি এই দেখিয়া যে, এতবড় একটা ঘটনাকে যেন দৃষ্টির আড়াল করিবার জন্যই সমস্ত রাষ্ট্রিক একটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যিক তাৎপ্রবণতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। এ সময়ে আমাদের কথা অনেকেই ভাল লাগিবেনা জানি, তথাপি, আমাদের অন্তরে যে কুটিলতা বা পাপবুদ্ধি নাই — তাহা হইলেও আমরা যে স্বজাতি ও স্বদেশের মঙ্গলকামনাই করি — পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহাদের বাঙালী প্রাণেরই একটি শুদ্ধ তাহা বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে পারিবেন।

* *

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে কিছু বলিবার আছে। সকলেই জানেন, বাংলার পশ্চিম-সীমান্তের কিয়দংশ একদা অতিশয় অতর্কিতে বিহারের সীমানা-ভুক্ত করা হইয়াছিল। আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, আজ যখন তাহার একটা মীমাংসা স্থাপিত হইয়াছে, তখন বাংলার ঐ নূতন বাউণ্ডারী-নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অংশ বিনা বাক্য-বিসম্বাদে বাংলাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। এ বিষয়ে কোন বাধা-প্রত্যুহের প্রশ্নই উঠিবে না। বাংলা যাহা হারাইয়াছে তাহা যদি একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই হইয়া থাকে, এখানে সেইরূপ বাধাও ত' নাই, বরং রাজনীতি-পালনের একটি অতি সহজ ও সুন্দর সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা যে হইবে না, ইতিমধ্যেই তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই ব্যাপারটি, শুধুই প্রত্যক্ষ লাভ-ক্ষতির জন্যই নয় — আরও গুরুতর কারণে সকল বাঙালীর বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কেন যে তাহা সম্ভব হইল না, বা হইবে না — তাহা আমরা প্রত্যেক বাঙালীকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। ঐ একটি তথ্যঘটিত প্রমাণ, শত তত্ত্ব বা উচ্চভাবের যুক্তিকে ধূলিসাৎ করিতে পারে। এমন কি, যদি মাত্র ঐ একটি ব্যাপারে আমরা আমাদের দৃষ্টিকে স্থির-নিবদ্ধ করি, তবে নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং ভারত-স্বাধীনতার প্রয়োজনে হিন্দু-বাঙালীর যে কি লাভ হইল, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না; অবশ্য, যাঁহারা অতিউচ্চ ভাবমার্গে বিচরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

এবারকার লেখা শেষ হইবার পূর্বে আমরা সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি পাঠ করিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত, এমন কি স্তম্ভিত হইয়াছি। বিবৃতিটি কয়েকজন সাহিত্যিকের নামে প্রচারিত হইয়াছে। ইহার সারমর্ম এই যে, অতঃপর যাহাতে বাংলাদেশের কেহ কোন প্রকার হিন্দু বা মুসলমানের বিরুদ্ধ-আলোচনা করিতে না পারে, তজ্জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হউক। যদিও এই প্রস্তাবটিকে একটা বহৎ উদ্দেশ্যের আবরণে আবৃত করিবার চেষ্টা

করা হইয়াছে, তথাপি একটু খুঁটি করিলেই বুঝিতে পারা যায়, উহাতে একটা লক্ষ্যের স্থৈর্য-স্মরণ-সূত্র উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। সেই এক মোক্ষম কৌশল ইহাতেও আছে — মহাত্মাজীর প্রতি অনন্যের ভক্তিকে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহার করা। বাংলাদেশে নাকি একদল দুর্বৃত্ত (শহীদ সাহেব ও ওসমান-সাহেবকে অভ্রান্ত করিয়া) দেশের সর্বনাশ করিবার জন্য, অর্থাৎ, সাধু-সজ্জনের ভাত মারিবার জন্য, বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে — এমন সকল কথা লিখিতেছে যাহা দেশের প্রত্যেক ও কুমার-কুমারীদের অশ্রাব্য, অপাঠ্য। ইহাদের ঐ সকল কথা যে কত মিথ্যা এবং কুযুক্তিপূর্ণ, তাহার একটা প্রমাণ — উহারা মহাত্মাজীর অসম্মান করিয়া থাকে। ঐ একটা প্রমাণই যথেষ্ট, অতএব উহাদিগকে শুধুই নিরস্ত নয়, আবশ্যক হইলে বিনাশ করিতেও হইবে, যথা —

> "বাংলার সুধী সকল সুধশক্তির কাছে, এবং যাহার কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের কঠোর শাসন দাবী করছি।"

— "সকল সুধশক্তির কাছে কঠোর শাসন" — সে যে কিরূপ শাসন, তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, একেবারে স্পষ্ট! — ইহাকেই বলে, "incitement to violence"। মহাত্মার প্রতি অতি-ভক্তি যে কোথায় গিয়া পৌঁছে, এবং কি কারণে — তাহা আমরা একটু স্পষ্ট ভাষায় বলিলেই, ঐ দুর্বৃত্তের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া 'কঠোর শাসনে'র আওতায় আসিয়া পড়িব। কথাগুলি পড়িয়া আমাদের অন্তর-বিদ্ধ মহাত্মার সেই আর এক কাহিনী মনে পড়িল — স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে যাহারা হত্যা করিয়াছিল তাহারাও ঠিক এই মনোবৃত্তির বশেই করিয়াছিল। আজ শুধু কংগ্রেসী নয় — সাহিত্যিক বাঙালীর মুখেও ঠিক সেই এক অন্ধ ধর্মোন্মাদের চীৎকার শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইয়াছি। ইংরেজীতে একটা কথা আছে — "Do not take God's name in vain", উহার মত পাপ আর নাই। মহাত্মাজীকে যাহারা ভক্তি করে না, যাহারা তাঁহার "অসম্মান করে," তাহারাও এতখানি পাপ করে না; কারণ, তাহারা অসম্মান, যা মহাত্মার বোঝাই শিং নিজেদের হিংসু চরিতার্থ করে না; তাহারা যাহা করে তাহা যদি অন্যায় অধর্মও হয়, তবু তাহার জন্য কোন অসম্মান যা মহাত্মাকে টানিয়া আনে না। এই বিবৃতিতে আর যাহা আছে তাহা এমনই নয় ও আত্মচরিতার্থ-পূর্ণ (যেন জাতির কর্মবুদ্ধির উহারাই একমাত্র পাহারাদার, দেশে আর মানুষ নাই!) যে, সেই উক্তি আলোচনা বা প্রতিবাদের নিতান্তই অযোগ্য। "আমরা বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সম্প্রদায় এই বিষয়ে জনসাধারণের কাছে আমাদের সাধ্যানুযায়ী এতদিন আত্মনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের বুঝি একটা বিরাট দল গঠিত হইয়াছে! ইহারাই সেই দলের নেতা ও মুখপাত্র! বাংলা-সাহিত্যিকের কি গৌরবময় ব্রত! সাহিত্যও একদে রীতিমত পলিটিক্স হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সাহিত্যিকেরা এইবার লেখনীর পরিবর্তে ছুরি ছোরা ব্যবহার করিবেন।

•

পূর্বেই বলিয়াছি, ঐ বিবৃতিটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহা দেশ, জাতি, এবং মহাত্মার নামে একটি দলের (ব্যক্তিগত কিনা জানি না) মুখ-বোলা। আমরা ইহার প্রতিবাদে কিছুই লিখিতাম না, কিন্তু দুইটি কারণে লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রথমতঃ, মহাত্মার নামে যাহাই বলা হউক — বাংলা সাহিত্যের নামে উহাতে যে বস্তু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বাংলার সকল সাহিত্য-সেবীকে অপমান করা হইয়াছে। সাহিত্যিক প্রতিভা ও সাহিত্যিক কারবার এই দুইটি বস্তু এক নহে। সাহিত্যিক প্রতিভা থাকিলেও

সাহিত্যিক ভাণ্ডার নাও থাকিতে পারে। যাহাদের সাহিত্যিক ভাণ্ডার আছে, তাহারাই দেশের সাহিত্যবৃদ্ধি ও সাহিত্যবৃদ্ধিকে বাধা করিয়া থাকে — তাহাদের সেই বুদ্ধি ও ভাণ্ডারের উপরেই লেখকদলের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁহারাই সাহিত্যের প্রভু নহেন; যাঁহারা ঐ সাহিত্যের রসগ্রাহী তাঁহারাই সাহিত্যের প্রকৃত রক্ষক ও নিয়ামক; প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরাও তাঁহাদের বিচারাধীন হইয়া থাকেন — তাঁহাদেরই মনস্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিরূপ গুরু-পুরুষার গ্রহণ করিতে হয়। এ কথা কালিদাসের বেলাও পুরাতন, এঁ'র বেলাতেও বলিতে হইয়াছে — 'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং' ইত্যাদি। অতএব, ঐরূপ সাহিত্যিকেরা সবল হইয়া সহজ লেখার সাহিত্যিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন না। ঐরূপ সাধন যাহারা করেন তাহারা সাহিত্যিক হইতে পারে, কিন্তু ভাণ্ডারহীনতার পক্ষিল দিয়া সকল সাহিত্যবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির চক্ষে ছাড়াইয়া যায়। যাঁহারা সত্যকার সাহিত্যরসী তাঁহারা কোন মত বা ধর্মবিশ্বাস, বা কোন লেখকের প্রতি ভক্তি উপাসনা হয় না, তেমনই কোন মহৎ-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'সুর সবল মুখলহরি' করা পছন্দ হয় না; তাঁহাদের লেখনীই সবই, লেখনী-কর্মের বহির্ভূত যাহা তাহা তাঁহাদের বশীই নহে। অতএব আমরা সকল সাহিত্যরসী বাঙালীকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন কোন পোলিটিক্যাল মতবাদের সঙ্গে সাহিত্য ও এইরূপ মুকুরবৃত্তিকে এক করিয়া না লেখেন।

সর্বশেষে, ঐ বিবৃতি সম্বন্ধে আমাদের শুক্তিসহ সন্দেহের কথা বলিব, যদি সুসংহত মিথ্যা হয় তবে অবশ্য অতিশয় দুঃখিত হইব। ঐ বিবৃতির স্বাক্ষরকারীদের সর্বাগ্রে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেখিতেছি। তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধি ও সাহিত্য-ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার নামটাকে ঐরূপ স্থানে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু বিস্মিত হই নাই — কারণ, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর ও সামাজিক তারাশঙ্কর একটু যে ভিন্ন হইবেন, তাহা বুঝি। তথাপি ঐ নামটা ঐখানে না থাকিলেই সুখী হইতাম।

[২২শে ভাদ্র]

ভ্রম-সংশোধন

গতবারে আমরা 'রবীন্দ্রসৃষ্টি-কর্ণন' উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের যে ইংরেজী কবিতাটি প্রকাশিত করিয়াছিলাম, উহার একটা ভুল থাকা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহারই ইংরেজী অনুবাদ করিয়া ছাত্রদলকে পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তাহা লক্ষ্য করি নাই। তথাপি, ঐ ইংরেজী কবিতাটিকেই আমরা ছাত্রদলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সম্ভাষণ বলিয়া গ্রহণ করি — কবিতাটি পূর্বে লেখা হইলেও তাহার ঐ ইংরেজী অনুবাদটিকেই, সেই উপলক্ষে তাঁহার বিশেষ বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

---

৮ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট "ভবানী প্রেসে" সিসলস্ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সহসা মূর্ত্তি বাহে অন্তর্হিত হইল — দিগন্তরে প্রভাতারুণোদয়বৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডল অন্ধকারে বিকীর্ণ হইল — কিন্তু মন্দ পবন বহিতে — সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম, — সুবর্ণপ্রতিমা ঐ সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, অন্ধকার বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি — এই দুর্গা — প্রতিমাস্বরূপিণী — অনন্তরত্নপূরিতা এবং কালরূপে নিহিতা। অষ্টভুজে অষ্ট অস্ত্র — অষ্ট দিক্ — অষ্ট দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু নিপীড়িত — পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না — আজি দেখিব না, কাল দেখিব না — কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না — কিন্তু একদিন দেখিব — সিংহস্কন্ধা, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী — দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানরূপিণী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, — আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, ঐই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

তোমায় দূর পাইলাম, বলিতে পারি না — কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম — ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! জন্তোঃ ত্রাসত্রাণকুশলাস্বিকে! ধর্ম্ম-অর্থ সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি, প্রীতি, বুদ্ধি, শক্তি তোমা পাইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেছি, তুমি অন্তরজনমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জনসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগ-রঞ্জিনি, নবরসধারিণি, নবহর্ষ দায়িনি, নবসুখ-দায়িনি! — এসো মা, গৃহে এসো — তব কোটি সন্তান একত্রে এক কালে, ভক্তি কোটি কণ্ঠ যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। তব কোটি মুখে ডাকিব, মা এসেছি কহিবে! বাহু বাড়াইয়া ধরিতে যাইবে, মনোমোহিনি অন্তর্হিতা হইবে! সহস্র-মূরতি চারপুর্ণচন্দ্রাননে! ডাকিব, — সিংহ-পৃষ্ঠে সিংহমূর্ত্তিতে সিংহ-বাহনকারিণি! শত্রুনাশে শত্রুকে শস্ত্রপ্রহরণধারিণি! অনন্তশক্তি অনন্তকাল-ধারিণি! শক্তি শত সন্তানে, অনন্তশক্তি-প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা! এই তব কোটি মুণ্ড ঐ পাদপদ্মে লুণ্ঠিত করিব — এই তব কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া তোমায় ডাকিব, — তব কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব — যা পারি, এই বাহু কোটি তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো — তাহার তব কোটি সন্তান, তাহার তোমা বিনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না — সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, কলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন মুক্তকণ্ঠে, সজলনয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব — তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবাসুরধাত্রি! — এবার আপনা ভুলিব — ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব — অর্থ, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব — উঠ মা, এত তোমায় ডাকিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল যা! উঠ, উঠ, উঠ মা, জগজ্জননি!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, আজিও কার্ত্তিকের উত্তর করিয়া অকালবোধনবাদ্যে শৈল-শীকর বিক্ষিপ্ত করিয়া বঙ্গবাসীর মহাপূজা আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া

নবদ্বীপ হইতে রাজধানী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া কাঁপিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীরা অন্ধকার ঘরিয়া পড়িল; কুক্কুরেরা পথিপার্শ্বে শয়ন করিল; গৃহমধ্যস্থিত অর্দ্ধরাত্রে কেহবা অপরার্দ্ধ আর কাটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পক্ষীশিকার শ্রেণীমালা নিবিয়া গেল, পুরাণপুরে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতের অন্তর্ধান পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। মূর্খের সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনাপ্রয়োগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে বিশ্ব ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজপথ, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—ভূজতীরভূমি, নবীনকেতু, নবীনতরু সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি, আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে, ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিম্বুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই লোকলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

কবির নিমন্ত্রণ

শ্রীকালিদাস রায়

নিউনিয়নের খোকারে আজ যে মেয়ে দিবে,
সইএর দুয়ে এসেছে ঘর ঠোপর মাথার দিবে।
টিনের কোটোয় চড়ুর্দোলাতে, বাজছে ক্যানেস্তারা ;
হয়েছে এলো হ'য়ে পেটিয়ে এসে পাড়া।
হাটের ভরে কাঠের গুঁড়ায় ছোলের আয়োজন ;—
কবি, তোমার যেথায় নিমন্ত্রণ।

আজকে, কবি, পোলাম প্রথম হ'মার অধিকার,
বৌদি' হাতে, তবুও ব'লে যা তাদারক তার।
কোমর বেঁধে আঁচল বাঁধা, তাপ লাগে মোর গালে,
অনেক ভুলই হ'য়ে গেল মনটা ভুলে কালে।
শাক হ'তে টক — পঞ্চাশজন ভোজন আয়োজন ;—
কবি, তোমার আজকে নিমন্ত্রণ।

পুবিপুকুর বাদ হ'লো হ'লো পুকুরনী আজ,
পাঁচটা মাঁথে চুকে গেছে সিকিবেলা কাজ।
ছড়া শোনার ঠাকুরমা আর নন্দর পড়ে পিসি,
আসর ঘিরা জমায় পুতো চলছে খোরিসি।
ঘোলা-ঘড়ে ছোলা ঘণ্টায় ছোলের আয়োজন :—
কবি, তোমার যেথায় নিমন্ত্রণ।

আজকে আমার বিয়ে, কবি, বাজে সানাই বাজে,
রাঙা চেলি পরনে গায়ে এক্কেলোপে ঘই লাজে।
শুনছি নাকি হ'লো এবার নতুন জীবন সুরু,
বাঁ-চোখ নাচে, তবু জমলাম বুকটা দুরদুরু।
দেনার টাকায় শোলা-সুচির চালাও আয়োজন —
কবি, তোমার আসেই নিমন্ত্রণ।

ভাই-বিতীয়ার শঙ্খ বাজে আলতে পাড়ায়ায়,
ফোঁটা দিতে দিতে মনে, দিনের বারোটা বয়।
ভাইটুটার কোঁটা দেব, মনের ঘরে কাঁটা,
নেমে গেছে চুল এলিয়ে বয়ন হাতে বাটা।
পান-সুপারি পায়স-পিঠাই ভোজের আয়োজন ;—
কবি, তোমার রইল নিমন্ত্রণ।

কবি, আমি বাংলা দেশের ঘরছাড়া অভাগা মেয়ে,
আমার 'আপন' বলতে কেউ নেইক তোমার চেয়ে।
পুতুলখেলার বয়স হ'তে তোমায় আমি চিনি,
জানিনা কি গুণে হ'লাম তোমার আপনি।
ছেলে কেঁদে ঘরকন্না পাততে বেন মন,—
খেয়ো তোমার রইল নিমন্ত্রণ।

নদীর ছেলে কেলেন ছিয়া —
বাংলা-দেশের মেয়ে,
স্বর্ণ-পুরীর স্বর্ণ বেটি
তোমার পানে চেয়ে।
তোমার আঁখি জলে ভরে
তারা-লতায় দুকা ঝরে ; —
বন্ধ হ'ল শাঁখের স্বর
তোমার চুপা পেয়ে।

দেবীপুজার ফুলের সাজি,
যে নির্মলা বালা।
ফুলার ফুরে যাও ঘরণীর
দুখের গরল-জ্বালা।
তোমার সরল ভক্তি-বসুর
অন্তরিতে প্রাণের ঠাকুর
আপনি এসে পরেন গলে
মনপুত মালা।
— করুণানিধান।

ভারত-মহা-সাহিত্যসম্মেলন ও বাঙালী

দিল্লীতে যে একটি নিখিল-ভারত-সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে সম্ভবতঃ তাহার অধিবেশন পিছাইয়া গিয়াছে; আশা করি, সেই নব-ব্যবস্থামত অচিরে সমারোহ সহকারে সুসম্পন্ন হইবে।

আমরাও ঐ সঙ্ঘে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, সেজন্য যথাস্থানে ধন্যবাদ জানাইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। কারণ, অনেক বাহিরের বাধা থাকিলেও অন্তরের বাধাই দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। বাংলার অনেক প্রতিষ্ঠাবান ও যশোভিলাষী সাহিত্যিক ঐ যজ্ঞে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়া বাংলাসাহিত্যের দাবী ও তাহার স্থায্য সম্মান আদায় করিবেন — তাহাকে অপরাপর সাহিত্যের পিছনে পড়িয়া থাকিতে দিবেন না, এইরূপ সংকল্পের কথা শোনা যাইতেছে; এমন কি, তাঁহারা নাকি যেন একটু বলে নাকি হইয়াই যথাসময়ে রাজধানী অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। আমরা 'ঘুঘে-খোর', তাই আমাদের 'তিন সোঠ' — বাংলাসাহিত্যের এর বড় একটা সঙ্কটকালেও কিছু করিতে পারিলাম না; কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সেবা, বিশ্ব আমাদের সাহিত্যিক-মনে! কিন্তু ঐ 'তিন সোঠ' বলিয়াই নহে — দোষও নহে; আমরা ভারতীয় সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যের স্থানটা একটু ভিন্ন চক্ষে দেখি — ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এই তিনের যেটুকু জ্ঞান আমাদের আছে, তাহাই আমাদিগকে নিবারণ করিয়াছে; কেন, তাহাই বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। কিন্তু তৎপূর্বে এই ভারত-মহা-সাহিত্যসম্মেলনের অর্থ বা উদ্দেশ্য আমরা যেমন বুঝিয়াছি তাহাই বলি।

দিল্লীতে ইহার অধিবেশন হইবে, যেহেতু দিল্লীই ভারতের রাজধানী — মহাভারতের রাজধানী; অর্থাৎ ভারতের সর্বপ্রদেশে আজ যে একজাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে — দিল্লী তাহারই সুদূর-ভবিষ্যৎ। ইহার প্রথম অধিবেশনের উপলক্ষ্য হইয়াছে একজন হিন্দী সাহিত্যিকের মৃতি-রক্ষা। ইহার অভিপ্রায় যথার্থ হইয়াছে, কারণ, হিন্দীই ভারত-রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ-ভাষা, উহাই রাষ্ট্রভাষা বা রাজ-ভাষা; অতএব ভারত-সাহিত্যের মঙ্গলাচরণ বা মঙ্গলঘট স্থাপন করিতে হইলে ঐ রাজভাষার যিনি গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহার নামেই উহা করা উচিত। এই যে অধিবেশন ইহা হইতেই একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইবে, তাহার নাম Indian Academy of Literature, অর্থাৎ 'ভারত-সাহিত্য-পরিষৎ'; এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সুমহৎ অভিপ্রায় হইবে — "to establish cultural contact and to build up a common Indian culture," অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, মাধ্যমের যোগস্থাপন, এবং একটি একমুখী ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা। একটি সঙ্ঘ-হিতসাধনের অভিপ্রায়ও আছে, যথা, — "to obtain State patronage for literary men," অর্থাৎ সাহিত্যিকদের জন্য রাজ-অনুগ্রহ লাভের ব্যবস্থা।

অভ্রগুলি যেমন হউক, ঐ শেষেরটি বড়ই আশাপ্রদ, উহার জন্য সর্বপ্রদেশের মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক-মণ্ডলীর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা পড়িয়া যাইবে, তাহা cultural contact-এর পক্ষেও আশাজনক। সেই প্রতিযোগিতায়, অনুগ্রহের পাত্র ও তাহার পরিমাণ অবশ্যই ঐ Indian Academyই স্থির

করিবেন,—যাহার বিচারাসনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ও তাঁর ভিন্নমতাবলম্বিগণ থাকিবেন। এক কথায়, উহা বাঙালীর সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মর্যাদা যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে—সেরূপ করিয়া থাকে আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদিগের—অর্থাৎ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠদিগকে বাছিয়া বাহির করিয়া একটি ছাপমারা সার্টিফিকেট বানাইয়া দিবে।

ঐ সম্মেলন যে কিরূপ সাধনা-সাপেক্ষ, ঐরূপ আসন-লাভে যাহাতে ভবিষ্যতে বঞ্চিত হইতে না হয়, সেজন্য এখন হইতেই বাঙালীর কিরূপ উদ্যোগী হওয়া উচিত, এবং এই অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া কিরূপ অত্যাবশ্যক—তাহাই শ্রীযুক্ত নেপেন্দ্রের দাদা মহাশয়ের আকুল আবেদন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

> "বাঙালী সাহিত্যের জন্য যে সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করিতে, তার উপযুক্ত আসন ও সম্মান এই সম্মেলনের মধ্যে থাকে, সেজন্য এখনই আমাদের উহাতে যোগ দেওয়া প্রয়োজন।
>
> 'নিখিল ভারত' ও 'আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে' বাংলাসাহিত্যের সম্মানের আসন হওয়া আপনাদের উপরেই নির্ভর করছে।"

ঐ কথাগুলি লইয়াই আমরা আলোচনা করিব; কারণ, উহাতে যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। ঐ সম্মেলনে বাঙালী যদি তটস্থ হইয়া যোগ দিতে না পারে, তবে সে সম্মানের আসনে হারিয়া যাইবে; কেন না, একদেশ শুধুই সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভা থাকিলেই চলিবে না, তাহার সহিত পলিটিক্স্-জ্ঞান থাকাও একান্ত আবশ্যক; যদি তাহা না থাকে, তবে যত বড় সাহিত্যিকই হোক—"নিখিল ভারত বা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে" তাহা কণিকা পাইবে না। কেন না, পলিটিক্স্-এর পূর্ব্বরূপ ছিল ধনিয়াই ত' আজ হিন্দী নিখিলভারতের সাহিত্য-গুরু হইতে পারিয়াছে—শুধু রাষ্ট্র-ভাষা নয়, সাহিত্যেও সে সর্ব্বোচ্চ সম্মান দাবী করিয়াছে; তাহারই এক লেখকের স্মৃতি-পূজার সহিত ঐ অধিবেশনটি কেমন সঙ্গত হয়া উঠিয়াছে! অতএব বুঝিতে, শিখিতে, এমন কি, কবিতুল্য মনীষীকেও রাষ্ট্রনেতাগণের অনুগ্রহলাভে যত্নবান হইতে হইবে। বাঙালী কবি আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্মদাতাও হয়, তথাপি তাহাকে সৌভাগ্য মহাজনগণের হাতে মধুর-বাক্য পাইতে হইবে, যাহারা রাষ্ট্রনীতির দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা ছাড়া আর কিছুতেই বিশ্বাস করে না!

কথাটা একটু রূঢ় হইয়া গেল, স্বীকার করি, কিন্তু কেন, তাহা বুঝাই কাহাকে? নহিলে, যে-কথাটা অতিশয় ভদ্রভাবে এবং বন্ধুভাবেরও ঘোরতর করিয়া যুক্তিসহকারে বলা যাইতে পারে, তাহাতে এমন বৈধী-ভাতি হয় কেন? বলিলই বা কাহাকে! বাঙালী কি আর ও চিনা আছে! বলিতে গেলেই ঘর-ভুলো হইয়া আসে, বলে,—বিলক্ষ, বিল্ ইট্, ঘর মু—ঘরোয়া-মীমাংসা যে ভারত, সেই ভারতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কুৎসা-রটনা, জঘন্য এবং লজ্জাকর বাঙালার আত্মকলহ শুধুই হাস্যকর নয়—ঘৃণ্যও। উহার মূলে একটা চক্রান্ত আছে, বাঙালীকে প্রেম-সুখ ও শক্তি-সুখ হইতে বঞ্চিত করিবার একটা পৈশাচিক প্রচেষ্টা আছে।

তার পর, "বাঙালী সাহিত্যের জন্য যে সাধনা ও ত্যাগ করিয়াছে"—আমাটা যেন কেমন হইল না! ও যেন অনেকটা "বাঙালী স্বাধীনতার জন্য যে সাধনা ও ত্যাগ করিয়াছে"—সেইরূপ। তাহাও বাঙালী বোধ হয় কিছু বেশী করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেই বা সে কি পাইয়াছে! কিন্তু সাহিত্যের জন্য যাহারা 'সাধনা ও ত্যাগ' করে, তাহারা সাহিত্যের জন্যই করে, কোন পদ-মর্য্যাদা বা পুরস্কার-লাভের জন্য নয়, কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য তাহাতে থাকে না—থাকিলে

খাঁটি সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। কবি ও মনীষিরা যে সাধনা ও ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহাও ব্যক্তিগত ভাবেই করিয়া থাকেন — জাতির একত্ব এবং স্বতন্ত্রত্বের; সমাজের মুখ চাহিয়াও নহে, কোন পুরস্কারের লোভেও নহে। বাঙালী যদি সাহিত্য-সাধনায় কোন ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকে এবং সে সাধনায় যদি সিদ্ধিলাভও হইয়া থাকে, তবে তাহার সৌভাগ্যও সে লাভ করিয়াছে, — সে বিশ্বসাহিত্যে একটু সম্মানের আসন অধিকার করিতে পারিয়াছে, আর কোন ভারতীয় সাহিত্য তাহা পায় নাই। সে আসন হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে এমন 'ভারত-সাহিত্য-পরিষৎ' এখনও গঠিত হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। অতএব 'নিখিল ভারত' বা 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে' আসন-বন্টনের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে দুইটুকি করিতে হয় না; এমন কি, 'নোবেল প্রাইজ' না পাইলেও কোন সাহিত্যের মানহানি হয় না।

তবে এই দুর্ভাবনা কেন? আমরাই বা এই কল্পিত অন্ত ও দ্বিধাভারাক্রান্ত প্রস্তাবের এমন অন্তর আলোচনা করিতেছি কেন?

আমরা ঐ 'Indian Academy of Literature' এবং ঐ 'Common Indian Culture'-এর অন্তরালে একটা গূঢ় পোলিটিক্যাল উদ্দেশ্যের গন্ধ পাইতেছি। আমাদের সন্দেহ যে মিথ্যা নয়, অন্ততঃ অহেতুক নয়, তাহার একটা প্রমাণ দিতেছি। এই প্রবন্ধ লেখার অনেক পরে — প্রেসে পাঠাইবার সময়ে, অন্তকার সংবাদপত্রের এক স্থানে, এইরূপ একটি বক্তৃতা বিলাতীপত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিলাম; আমরা সেইটিকে এইখানেই তুলিয়া দিলাম। বক্তৃতাটি এই —

> "If all the different languages are to continue to flourish in India, what chance will there be of maintaining the unity of the country? ... Thus India faces a dilemma. Culture pulls one way, political safety another."

অর্থাৎ, ভারতের সকল ভাষাগুলিই যদি সজীব ও শ্রীবৃদ্ধিশালী হইতে থাকে, তবে ঐ দেশের একতা-সাধন হইবার আশা কোথায়? ... অতএব ভারতবর্ষের একটা ঐতিহাসিক হইয়াছে — কালচার বা সংস্কৃতির দিকে তাকাইলে রাষ্ট্রিক তত্ত্ব ঠিক হয় না, আবার রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইলে, কালচার বিসর্জন দিতে হয়।

সমস্যা বটে। অতএব এই যে ভারতীয় সাহিত্য বা ভারতীয় সংস্কৃতির হিতার্থে ঐরূপ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার অর্থ আমরা ভালরূপই বুঝিয়াছি। অন্ত কোন ব্যাপারেই পোলিটিক্যাল পরিস্থিতি হইতে পৃথক করিয়া দেখা চলে না। এই ব্যাপারে State যে কেন এত বলবান হইবেন — "Indian Academy of Literature" একটু বড় করিয়াই স্থাপন করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কিছু মাত্র বিলম্ব হয় না। সকল সাহিত্যকেই এবং সকল ভাষাকেই ঐ কিল্লীর শাসনে আসিতে হইবে — তাহাতেই নাম সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবিধান, নহিলে রাষ্ট্রিক এক-শাসন চলিতে পারিবে না।

(২)

আমরা দেখিতেছি, সর্বভারতীয় এক-জাতীয়তা মনে যে রাষ্ট্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রদেশগুলির প্রকৃত স্বাধীনতাও যেমন, তাহাদের মধ্যে সদ্ভাবের সম্ভাবনাও তেমনি লুপ্ত হইয়াছে। যাহারা কোন একটি প্রভুত্বের শাসন মানিতে বাধ্য হয়, তাহাদের দাস-মনোভাব ঘুচে না, এবং সেখানে সেইরূপ অনেকগুলি দাস পাশাপাশি বাস করে, সেখানে মাসে মাসে কখনও সদ্ভাব জন্মে না, এমন কোনরূপ

cultural contact-এর ফলে দিয়া হইয়া থাকে। ভারতের প্রাদেশিক ঐক্য সম্বন্ধেও যদি সমালোচকের স্বাধীনতা থাকিত, তবে তাঁহারা পঞ্জাবের এবং দক্ষিণের মধ্যে কোথায় ঐক্যের চিহ্ন দেখিতে না পাইতেন? অথচ তাহা হইত; এবং ঐ যে পঞ্জাবের সাংস্কৃতিক বিশেষ উহাও সম্ভব হইত। আজ যখন আমরা বাঙালীত্ব, তাহার ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য, তাকাইয়া দিতে চাই: উঁচিয়া বাঙালীর শ্রেণি ঐ একই অভিধে বিশিষ্ট হইয়া উঠে; অন্ধ যখন ও মিলকে বর্ণিত করিতে অক্ষমপ্রকৃতির; মহারাষ্ট্র ও মহাকালের যখন কেহ কাহাকেও গ্রহণে পেয়ে না; তখন নিশ্চয়ই ঐ ভারতীয় সংস্কৃতি-পরিচয়ের প্রয়োজন কেন?

না হয়, রাষ্ট্রিক একতা একজন কেরোসেনের দ্বারা কতকগুলিনাদে সাধিত হইতে পারে; কিন্তু ভারতের ও বিভিন্নতি যে এক নয়, ভাষাও এক নয়, এবং ঐ ভাষাই প্রাদেশিক জাতির ভাষাগত বিশেষ, এ সত্য চাপা দেওয়া কি সম্ভব? এতদিন যে ভাষা ও যে সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া একটা সর্বভারতীয় ঐক্য বিরাজমান ছিল, আজ সেই সংস্কৃতভাষাও যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনই সেই সংস্কৃতির যাহা প্রাণ সেই হিন্দুত্বকে অস্বীকার করা হইয়াছে—সংস্কৃতের স্থানে হিন্দী এবং হিন্দুত্বের স্থানে একটা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বকে উদ্ভাসন দেওয়া হইয়াছে,—ইহার কোনটাই সংস্কৃতিগত ঐক্যের সহায় নহে। কারণ, হিন্দীর সে শক্তি নাই; এবং ঐ রাষ্ট্রনীতির তত্ত্ব এমন বস্তু যে, সংস্কৃতি তাহার সহযোগিতার মূলে অবস্থান করে। সংস্কৃতির প্রাণবস্তু যাহা সেই Tradition তাহাকে পরিত্যক্ত হইয়াছে—'হিন্দু' নামটাও রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তবু ভারতীয় সংস্কৃতি চাই! ঐ যে নূতন ও অদ্ভুত রাষ্ট্রিক সংস্কৃতি উহা ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে পারে না, তাই কেবলমাত্র 'ভারতীয়তা'র সেন্টিমেন্ট কেহ দাড়া দিবে না। মুখ যদিব ভারতীয় সংস্কৃতি—কিন্তু আচারে, ব্যবহারে, ধর্মে, কর্মে কোথাও দেশব্যাপ্ত ভারতীয়তা নাই; আছে কেবল, অতিশয় প্রতিষ্পর্ধী অন্যান্যের মনোভাব—অনুকরণের সংস্কার বা উদারতা। ইহা সাময়িকভাবে পোলিটিক্যাল উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে হইতে পারে, কিন্তু ইহার উপরে স্থায়ী কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না।

এই যে পলিটিক্স, ইহার ফলে সর্বত্রই বিদ্যা বা কীর্তির সাধনা চলিতেছে। ঐ যে হিন্দু-মনে-বর্জন—কোন হিন্দুই যাহা অন্তরে স্বীকার করে না, অথচ কবির রাষ্ট্র-প্রভুদের আদেশে মানিয়া লয়। অন্যদিকে ঠিক তাহাই হইতেছে; হিন্দুর হিন্দুর এক জাতি অপরের প্রতি যোলআনা বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে, অথচ রাষ্ট্রিক একতার জয়গানও করে। দৃষ্টান্তের যত কংগ্রেস-ভক্ত যে বিহার-প্রদেশ, যে-বিহার রাষ্ট্রনেতাদের সর্বাপেক্ষা জোগান—সেই বিহার প্রথম হইতেই যে সর্বভারতীয় প্রেম এবং ভাবমিলার পরিচয় দিয়াছে ও দিতেছে, তাহা কে না জানে? এমন কেন হয়? এ রোগের মূল কোথায়? বিশ্লেষণে অন্ত করা করে না।

ঐ এক কারণে, আজিকার এই পোলিটিক্যাল পরিস্থিতিতে সর্বভারতের রাষ্ট্রিক একতার যদি বা একটা অর্থ হয়, সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক একতা একটা অভিধার বিষয়বস্তু বা হইয়া পারে না।

এখানেও কাজ-বিরোধ আছে। যে রাষ্ট্রনেতাগণ জাতি বা সমাজ-বিশেষের Self-determination অর্থাৎ 'স্বাতন্ত্র্যের অধিকার' এমন সুস্পষ্টভাবে মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই যদি এই 'common culture'-এর প্রতিষ্ঠায় এমন আগ্রহান্বিত হন, তবে তাহা কি 'ভাবের ঘরে চুরি'র মত হয় না? সকল 'ভাবনার'ই মূলে, তাহার যে অংশটী common তাহাই তাহার সবচেয়ে দুর্বল অংশ। ঐ যে Self determination-এর অধিকার—উহা মূলে ঐ কালচার-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার। ভারতবর্ষে একদিন হয়তো

সর্বজাতির মধ্যে কালচার-লাভের চিহ্ন, কিন্তু আজ এই অতিরিক্ত পোলিটিক্যাল অধিকার-লাভের লোভে সেই কালচারের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। তাই এখন ঐ আশার জল-ঢালার কোন অর্থ হয় না। একমাত্র যে অর্থ হয়, তাহার কথাই বলিতেছি।

(৩)

অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাও একটা সাহিত্য — তাহার জাতিগত সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের বলে গড়িয়া তুলিয়াছে। দেখা গিয়াছে, বাঙালীর প্রতিভা এমনই অনন্যসাধারণ যে, সে তাহার সেই জাতিগত সংস্কার সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও, ভারতীয় সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়াছে। এ কাজ একালে তাহার আর কোন ভাষার দ্বারা আর কোন ভাষায় সম্ভব হয় নাই। সেজন্য তুলিকিত অ-বাঙালীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠস্থান এই বাংলা — কলিকাতা নয়ে তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে; মাদ্রাজ নয়, বোম্বাই নয়, দিল্লীও নয়। তাহারও পরে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শান্তিনিকেতনে আরও বিশেষ করিয়া একটা সংস্কৃতি-কেন্দ্র নির্মাণ করিতে তাঁহার প্রাণ-মনের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। আজ যাহারা ভারতের শাসন-প্রভুর হস্তগত করিয়াছে — একটা সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক সঙ্ঘ-শক্তির বলে, যাহারা আজ ভারতের — হিন্দু-ভারতের — ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছে, তাহারা যদি ভারতীয় সংস্কৃতিকেই রক্ষা করিত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বাংলার স্থানে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার গৌরব দান করিত না। জানি, সে পক্ষে যুক্তি আছে — যুক্তি যে খুব বড় তাহা নহে, তবু আছে; কিন্তু সে যুক্তি সংস্কৃতির পক্ষে নয় — রাজনীতির পক্ষে।

বেশ, মানিলাম যে, এই সম্মেলনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা বা রাজনীতির কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই; তাহা হইলে ঐ অধিবেশন, অন্তত ঐ প্রথম অধিবেশন, দিল্লীতে না হইয়া কলিকাতায় হইল না কেন? তাহাতে রাষ্ট্রের গৌরব খুব হইলেও, সংস্কৃতির গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত না কি? কলিকাতায় না হইয়া শান্তিনিকেতনেও হইতে পারিত। আর, ঐ যে এক হিন্দী-সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার সঙ্গে এই সর্বভারতীয় সাহিত্য, তথা সংস্কৃতি-সম্মেলনের একটা সম্বন্ধ-বন্ধন, ইহা কি নিতান্তই একটা দৈব-ঘটনা! ইহারও স্থান-কাল-পাত্রের একটা গূঢ়তর যোগাযোগ নাই? যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির একতা বা সর্বাঙ্গীন বিকাশ কামনা করে, তাহারা যদি সেই ভাবের ভাবুকই হয়, তবে তাহারা প্রথমেই একটা বিরাট সঙ্গঠন (Organisation), এবং তাহারই কেন্দ্রীয় শাসন-বিধির জন্য উদ্গ্রীব হইত না। ঐ সম্মেলন এবং তৎপশ্চাৎ ঐ Indian Academy — সেই এক রাজনৈতিক প্রয়োজনে আবশ্যক হইয়াছে, আমি পূর্বোক্ত হিন্দী সাহিত্যসম্মেলনের সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহি।

সকল সংস্কৃতিই স্বতন্ত্র, — তাহাদের কোন একটা কেন্দ্রে একমুখী হইবার প্রয়োজন নাই; তাহা হইতেও পারে না; হওয়াটাই তাহার স্বাতন্ত্র্যের বা স্বাধীন-বিকাশের অন্তরায়; যদি তাহা হয়, তবে বুঝিতে হইবে সেই সংস্কৃতির চূড়ান্ত অবনতি। ভারতের জাতিসকল যে স্বতন্ত্র, তাহা ঐ রাষ্ট্রনায়কগণ মানিয়া লইয়াছেন, স্থির করিয়াছেন। রাষ্ট্র-ব্যাপারেই কেন্দ্রীকরণ চলিতে পারে, সংস্কৃতির ব্যাপারে তাহা যে একেবারে অসম্ভব কেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। প্রত্যেক প্রদেশের আপনাপন কালচারের পক্ষে স্বাধীন আত্ম-প্রকাশই স্বাস্থ্যকর — এক ছাঁচে ঢালাই হওয়ার কোন অর্থই হয় না। অতএব এই যে অনুষ্ঠান, ইহার একটা অর্থও নিশ্চয় আছে, সেই অর্থটির সন্ধান আমাদিগকে অতিশয় দুঃখের সহিত করিতে হইতেছে।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে—হউক, তাহাতে বাঙালী আমার কোন আপত্তি নাই; থাকিলেও তাহা নিরর্থক। যতদিন আমি ভারত-রাষ্ট্রের ছাত্রমণ্ডলে আশ্রয় ভিক্ষা করিব, ততদিন ঐ ভাষাকে

ষাঁড়ামারাতে হাত করিতেই হইবে। তাহলে ঐ ছাতে-ছাতে মিলিতে যে একটি বিশেষ হাত বুঝায়— তাহারও একটি বিশেষ সংজ্ঞা, এবং সেই সমাজের বিধি আমাকে পালন করিতেই হইবে। আজ ভারতের চাইতেও বাঙালীর ঘরে সর্বনিম্নে। বাঙালী আপন ঘরেরও স্বাধীন নয়। ইহার জন্য সে-ই দায়ী, তাহার দুর্মতি ও দুর্গতির কারণও সে করিয়েছে, তারা মানি। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ অবস্থা ত' চিরদিন নয়! এখানে আমি বাঙালীর আজের বিশেষের সকল কারণ ও কারণের কথা তুলিব না, এখানে তাহা অবান্তর না হইলেও প্রীতিকর হইবে না। সে যখন প্রতিদিন স্বাস্থ্যকরের ছাপ করিতে চায়, এবং সেজন্য দৈনিক বেদ পড়ে (ইংরেজীতে যাহাকে 'making virtue of necessity' বলে) তখন এ হাল করিবে কাহার কাছে? তাহাই বিদেশী মাতৃভাষা হইলে, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু যখন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কথা উঠে, এবং যখন তাহাও আমার সর্বনাশের হইবার সাথী করে, তখন আমি—রবিন-হরীন্দ্রনাথের বাঙালী—চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। এ যুগের ভারতীয় সাংস্কৃতিক যে-জাতির ভাষা ও সাহিত্য সরলপথ করিয়া তুলিয়াছে, সেই জাতি এখন হতই হীন-অবস্থায়, সর্বনাশ হইক না কেন, তাহাকে সম্মান-আসনের জন্য ছুটিতে হইবে তাহাদের দরজায়—যাহারা ঐ হিন্দীকেই ভারতীয় সংস্কৃতির আধার করিতে, তাহাকেই সকল ভারতীয় সাহিত্যের মুক্ত-দর্পণ করিতে চিরতরে চিরতরে লালায়িত হইয়াছে!—যাহারা সেইরূপ ঐ অভিপ্রেতম করিতেছে হিন্দীকে, এবং যাহারা ঐ রাজভাষা-হরণের রাজসেবতা করিয়াছে একমাত্র হিন্দী-সেবাদের? ইহাদের পশ্চাতে পৃষ্ঠপোষক রূপে রহিয়াছে তাহারা—যাহারা এশিয়ার আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের নামটাও উচ্চারণ করে নাই! ইহাদের মূলে যদি সেই পোলিটিক্যাল প্রযুক্তির আর এক প্রকাশ না থাকে, ইহার কারণ যদি এই না হয় যে, যেহেতু বাঙালীই—অন্যুন এই অন্যূন, সর্বভারতের অনুপ্রেরণার বাঙালী—যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরব করিয়া থাকে, তাহাদের সেই সাহিত্যকেও দলের সঙ্গে একাসনে বসাইয়া, সেই দর্প চূর্ণ করিতে হইবে—তবে আমার এই অতি-নীচ অন্তরঙ্গনোচিত সন্দেহের জন্য আর কেহ না করুক, যে আমার বাঙালী ভাই-ভগিনীরা, তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও; আমি জানি, আমার এবং তোমাদের সেই পূর্ব পিতা ও পিতামহগণ আমার এই অপরাধ মার্জনা করিবেন।

(৪)

ভারতরাষ্ট্রে বেদের গৌরব, অথবা তাহাতে ঐক্য রক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে যেমনই ফলবতী হউক—সে-চিন্তা বাঙালীর নয়, বাঙালীর ভাবিতে অধিকার নাই। সেজন্য আমি অ-বাঙালী ভারতীয় সেচ্ছাসেবকে যোগ দিয়েছি না। আমি আর বার বার স্বীকার করিয়েছি যে, অপরাধ আমাদেরই, আমরা মনুষ্য-পদবী হইতেও নামিয়া গিয়াছি। কিন্তু তেমনি বাঁচিয়া আছি (বোধ হয় আর বেশী দিন নয়), ততদিন আবার উঠিবার একটু চেষ্টাও ত' করিতে হইবে। যাহার নিজের কোন হিসাব নাই, সে পরের হাসব করিতে পারে,—কিন্তু দাস কখনও আত্মীয়তার দাবী করিতে পারে না, করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। আমার যাহা যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আত্মসাৎ বা আত্মোৎসর্গ নয়,—নিজের দৈন্য ঢাকিবার জন্য বড় বড় কথা বেলিয়া লাভ কি? আর যদি বল, আমি বড় ছোট, বড় অসহায় বলিয়াই বড়লোকের আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারিব না—তবে স্বীকার করিতেছি যে, তোমার আর কোন উপায়ই নাই। উপায়হীনতা বা বলহীনতা তাহারই সাজে—যাহার শক্তি আছে, সম্বল আছে। যাহার সেই শক্তি বা সম্বল কিছুই নাই

তাহার শেষ স্বপ্ন — আত্মবিশ্বাসের; তাহাও যদি লোপ পায়, তবে সে দাঁড়াইবে কি লইয়া? এই আত্মবিশ্বাসবোধকে যাহারা মন্ত্র বলে, এবং যাহারা সেই মন্ত্রের পরিবর্তে অস্থি-বিলাসের শিক্ষাচারকেই শ্রেয়োজ্ঞান করে, তাহারা সম্মান কোথাও পাইবে না — কৃপাবিলিত অনুকম্পাই পাইবে। যদি মানিয়াও লই যে, ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ তেমন কোন কু-অভিসন্ধি পোষণ করেন না, তাঁহারা অতিশয় সরল ও সাধুচিত্তে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যও অতি মহৎ — তথাপি বাঙালী আমি, আমার ত' অবশ্য-বোধ আছে, ঐ সম্মেলনে আমার যোগদান করিতে বাধে; সে বাধা আমারই, তাহার জন্য পরকে দায়ী করিব না। সেই বাধা দম্ভের বাধা নয়, তাহা দায়িত্বের বাধা — ভারতীয় সমাজে আজ যে-কারণে বাঙালীর যেরূপ ঘটিয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার ও তদনুযায়ী কার্য করিবার সময় আসিয়াছে।

বর্তমান যুগে, বা এই যুগের পূর্বভাগে, বাঙালী যেমন করিয়া, অন্ততঃ তাহার ভাব-জীবনে, ভারতকেই আবিষ্কারের মত করিয়াছিল, এমন আর কোন ভারতীয় জাতি করে নাই, ইহা অতিশয় সত্য। আজ যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয়তার গৌরব-বোধ জাগিয়াছে, তাহার কবি, ঋষি ও শিল্পী এই বাঙালী জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেকালে বাঙালী আপন আত্মাটিকেই সারা ভারতে বিলাইয়া দিয়াছিল, তাহার প্রমাণ — স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, এবং আর এক ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনৈতিক সেই অন্যতমেনী বীর-বিগ্রহ — নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা যে, অপর বাঙালী মহাপুরুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঐ তিনজনের একেকজনের মতও, প্রেম বা প্রতিভার — জ্ঞান বা কর্মের — ঠিক সেই আদর্শ — যে-আদর্শ যেমন মহান্, তেমনি মানবিকতার সমুজ্জ্বল — আর কোন ভারতবাসীর মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে নাই। আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না, আমি অতি-মানব আদর্শের কথা বলিতেছি না; মানুষের স্বভাবকে অস্বীকার বা লঙ্ঘন করে না যে-আদর্শ — যে-আদর্শ মানুষের চলনকে, মানুষের মনুষ্যত্বগত জ্ঞান-বুদ্ধিকে বর্ধন করিয়া, যে অভয়ং নিদেশন, নব উদ্যমের মত মানুষকে সৃষ্টি করে না — মানুষের মনুষ্যত্বকেই, সেই ও আরার নির্দিষ্টরেখাকে শুদ্ধি ও শ্রী-সম্পন্ন করিয়া তোলে, — সেই আদর্শের কথাই বলিতেছি। বাঙালী নবযা ভারতে এই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ছিলেন ইহারই অবতার। তখন বাঙালী আত্ম-পরিচয়ে ভয় পায় নাই; তাহার ধর্মে, সাহিত্যে এবং শিল্প-সাধনায় সে গোটা-ভারতের জন্যই করিয়াছে, নিজের পৃথক বাঙালীত্বের কথা সে ভাবে নাই — সে তখন ভারতকে শুধুই একটা দেহ নয়, একটা আত্মা বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল, সেজন্যই বাঙালীর সাহিত্যের সেই আদর্শে ইহার প্রমাণ এখনও জাজ্বল্যমান হইয়া আছে। কিন্তু আজ বাঙালীর সে দিন গিয়াছে: কেন, কি দোষে গিয়াছে তাহা বলিব না; কিন্তু গিয়াছে ইহা সত্য। সে আজ হেয়ে শত্রু, প্রাণে দুর্বল, অনাহারে নির্ধন; তাহার বাস্তব জ্ঞানপ্রায়, তাহার শিক্ষায় পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। আজ সে ভারতের কথা ভাবিতে পারে না, বরং ভারতেরই তাহার কথা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। আজ তাহার সকল শক্তি, সকল বুদ্ধি — ধ্যান ও জ্ঞান — আত্মরক্ষার জন্য নিয়োগ করাই তাহার একমাত্র ধর্ম, মহত্তম কর্তব্য হইয়াছে। ঠিক এমন দিনেই তাহাকে স্মরণ করিতে হইবে যে, সে আসে বাঙালী, পরে আর কিছু; আজ কোনরূপ ভাব-বিলাসের অবকাশ তাহার নাই। শুনিতে পাই, বাঙালী নাকি বড় শাস্তিক, বাঙালী অপর সকল জাতিকে বড় ঘৃণা করিয়া থাকে, সে তাহার স্বভাব ও চরিত্রের দোষে সকলের সহানুভূতি হারাইয়াছে। এ কথার সওয়াল-জবাবে কিছু বলিব না, বলিতে

দেশে অনেক অবান্তর কথা বলিয়া থাকে; বাঙালী জাতির চরিত্র এবং তাহার ইতিহাসেও তেমন, তেমনই ঐ জাতের-মনের অমূলক-কল্পিত এক দূষিত মনের-ছবির কথাও তুলিতে হয়। আমি বাঙালীর দোষ কালন করিবার চেষ্টা করিব না, বাঙালীর চিরন্তন স্বাস্থ্য-পূজা, তাহার সজ্ঞাগত অ-ভারতীয় সংস্কারের কথাও বলিব না। সে একই কালে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় — ইহাই তাহার অপরাধের কারণ; এইজন্য সে চিরদিন থাকি জাতের অস্পৃশ্য হইয়া আছে। বাঙালীর প্রতি অ-বাঙালীর যে অনাস্থাটুকু — তাহার মূল অতি গভীর, তাহা নূতনও নহে; আজ তাহার কতকগুলি অনুষঙ্গ বিলিয়াছে মাত্র, এবং পোলিটিক্যাল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহা অতিশয় উগ্র ও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙালীর সেই পুরাতন পাপটাই যদি বড় হয়, তথাপি আধুনিক কালে সে কি কিছু পুণ্যের কাজও করে নাই? বাঙালী বড়ই ধার্মিক, ও পরজাতি-অসহিষ্ণু বটে, কিন্তু এই বাঙালীই কি গত একশত বৎসরে ভারতে নবযুগ ও নব-জীবনের ঘরে উজ্জীবন আনে নাই? অন্যতঃ, ভাষা, চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে কি মোটা-ভারতকে অনেক অংশে জয় করে নাই? সেই বঙ্গ যাহারা স্বীকার করে না, বরং আজ তাহার এই দুর্দশায় যাহারা পরম-পরিতৃপ্তি বোধ করে — তাহারাই নহে? আমি ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদিগের কথা বলিতেছি না, সমগ্র অ-বাঙালী জাতের কথাই বলিতেছি। আমি বাঙালী, আমি সকল অনুযোগ, বড়ই ধার্মিক — কিন্তু, তুমি, হিন্দুস্থানী, তুমি যদি সৎ হইতে, তবে তুমি সেই ঋণ স্মরণ ও স্বীকার করিয়া, আজ তাহাকে, তাহার এই জীবন-মরণ-সঙ্কটে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে না? তবু একটা বড় দোষ, সে দোষ গুরুও থাকিতে পারে, — কিন্তু ঈর্ষা তাহার কম?

আমি আমার বক্তব্যের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে ঐ কথাগুলিও বলিতে হইল — নিশ্চয় ঐ সাহিত্যিক রাজসূয়ের অনুষ্ঠানকারীদের উদ্দেশে নয়, — যাহারা সর্বভারতীয়-তার অতিশয় অনাবশ্যিক আত্মঘাতী মোহে আজ্ঞন্ন হইয়াছে, এবং এখনই ভারতীয় একরাষ্ট্রতন্ত্র আয়োজনে লঙ্কা জয় করিয়া তাহারই পাকাতে ছুটিয়াছে; যাহারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও, অজ্ঞতা ও বিদ্যা সেটিমেন্টের বশে, ঐক্যের নামে একটা এক-শাসনের — হিন্দীর একাধিপত্যের — রাষ্ট্রীয় প্রভাবান্তরে আনিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে — আমি সেই প্রাদেশিকতা-ভীরু বাঙালী-সাহিত্যিকগণকে এই সকল কথা স্মরণ করিতে বলি। সর্বশেষে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের সেই সতর্ক-বাণি পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া এই অপ্রীতিকর আলোচনা শেষ করিলাম। —

"বাংলা — পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ, গুজরাট, বা অন্ধ নহে বলিয়াই, বিচিত্র ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে ভারতবর্ষকে বাংলার কিছুই বিধায় থাকিবে না। আর, যাহার বিশ্বকে কিছু বিধায় থাকে না, সে প্রাচীনের স্মৃতি-চিহ্ন-রূপে পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার গড়িবার অধিকার থাকে না। বাঙালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের উপর কোন দাবী থাকিবে না — সে বাঁচিল, কি মরিল, তাহাতে কি আসিবে, কি যাইবে, কিছুই আসিয়া যাইবে না।"

তাপিলা বিন্দুর বিধি স্বাধুর ললাটে,
পড়ি' কি তুহলে শত যান গড়াগড়ি
ধূলায়!

ক্ষেত্রনাথের অমরত্ব

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

যাকে-হরিসুন্দর ক্ষেত্রনাথ দত্ত বাঁচবেন বলে আর আশা নেই। এই অসুখই তাঁর শেষ অসুখ, এই শয্যাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, তা' তিনিও জানেন, সবাই জানে। ক্ষেত্রনাথের বয়স এখন সাতষট্টি; মৃত্যুর বয়সে তিনি পৌঁছেছেন বলে' তাঁর নিজের ধারণা; কিন্তু তাঁর প্রতি ভক্তিবশতঃ এবং আত্মীয়বশতঃ বাড়ীর আর কারোরো সে-ধারণা নয়—তাঁরা তাঁর অসময়ে মৃত্যুর সম্ভাবনায় মনে মনে ভীষণ।

ক্ষেত্রনাথ চিরকাল উপার্জনক্ষম ছিলেন—এখনো পেন্‌সন্ পান; অনেকগুলি কৃতজ্ঞ আর আনন্দোজ্জ্বল মুখ-চোখের পরিমণ্ডলের অন্তরালে থেকে তাঁর সারাজীবন কেটেছে; সেবায় তাঁকে পরিতুষ্ট করতে সবাই আগ্রহবান্ আর ব্যস্তসম। যাদের পশ্চাতে রেখে তিনি পা বাড়িয়েছেন তারা তাঁকে যাবার অনুমতি দিয়েছে বলে' ক্ষেত্রনাথের মনে হয়—তারাই উপযুক্ত হয়ে তাঁর পথ কণ্টকশূন্য এবং উজ্জ্বল, এবং তাঁকে নিরুদ্বিগ্ন করেছে। নিজের সন্তানগণ এবং তাদের সন্তানসন্ততির জন্যে তিনি মুক্ত আর গর্বিত, আচরণে পরিতৃপ্ত; তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। এই সব ঘটেছে বলেই ক্ষেত্রনাথের মনে হয়, তাঁর মৃত্যুর দিন অকালে আসেনি'—কাল পূর্ণ হবার পর যথোচিত সময়েই এসেছে। নিজের কর্তব্য তিনি যথাপযুক্তভাবেই সম্পাদন করেছেন; সেই কর্তব্যের সংস্কারে সার্থকতার তৃপ্তিতে তিনি আজ পরলোকে যেতে তারি প্রস্তুত—কোথাও তিলমাত্র বাধা বা ভয় নেই।

ক্ষেত্রনাথ প্রস্তুত হ'য়ে, আর, পরম নিশ্চিন্তে ধীরে ধীরে পরলোকে প্রবেশ করছেন; কিন্তু ভগবানের নাম তিনি স্মরণ করছেন না। শুধু যে-জিনিষটাকে আত্মা নাম দিয়ে ইহলোকের একটা স্থানের সঙ্গে যুক্ত করে' রেখে দিয়েছে, আর, সাবধানে রক্ষা করতে বলে, তাঁকে তিনি চিনতে পারেন নাই বলেই ভেবে এসেছেন—আত্মানামক মৌলিক একটা সত্তা বা ভগবানের আবাস মানুষের ভিতর কিছু নাই; বিশ্বাসের সংস্কার আছে মানুষের মধ্যে—যে মানুষ আমার কল্যাণ করে, আর, যে আমার হাতে লাঠি হ'তে চায়। ক্ষেত্রনাথ চিরকাল মানুষকেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসেছেন। তা' ছাড়া মানুষের চিহ্নের যা' আছে, যার জোরে হাতে পা নেড়ে' একস্থানে হ'তে অন্যস্থানে গমন করা যায়, সে হ'চ্ছে খানিকটা হেমোগ্লোবিন যাদু—ঐ যাদু যার মাথায় গুঠে, বিশ্লেষিক বুদ্ধি লোপ পেয়ে সে হ'য়ে যায় পাগল, আর, নির্জনে যাকে বলে: আর, যার পায়ের দিকে নামে সে বেরোয় ভগবদ্বরূপ তীর্থে। ঐ যাদুকে ক্ষেত্রনাথ সুস্থির করে' রেখে জীবনের যষ্টি—যষ্টি নই হ'লে সেই যাদুর চাপে মানুষের মুক্তির অনুভবও দেখা দিতে পারে।

পরলোককে প্রত্যাশিত আত্মা দিয়ে জয়িত করে' তৃপ্তানন্দলাভের জন্য প্রত্যাশিত তিনি কখনো হন্ নি—এ পৃথিবীর আদুরেপনাই তাঁর আনন্দলাভের পক্ষে যথেষ্ট। প্রতিবেশীগণ সজন, স্ত্রী, পুত্র আর জ্ঞাতিবর্গ অনুগত, অকপট, আর, প্রেমপরায়ণ. ইহাই পরম প্রাপ্তি; তাদের অতিক্রম করে' আর কোনদিকে দৃষ্টি প্রেরণ করবার দরকার আছে বলে' তাঁর মনে হয় নি। তুলসী অন্নের প্রতিই যার আসক্তি আর প্রবল মোহ, আর, তা'তেই যার পরম সার্থকতা, তার সন্তোষের সীমা কোথায়! অজস্র অন্নকেই

যান আর দাদা আর উপেক্ষা করে' ক্ষেত্রনাথ এখন বৃদ্ধটির প্রবাসে ত্যাগ করবার যৌক্তিকতা অনুভব আর আয়োজন করছেন।

ক্ষেত্রনাথের জীবনে সুখতর স্মরণীয় ঘটনা তত ঘটতে তার বাকী নাই।

জামাই মোক্ষদাকে এবার চিঠি লিখ্‌ল: "মেসি মাহাঠাকুরাণী এখানে যে চিঠি লিখেছেন তা' পেয়েছি। তত দিনে আপনার সম্বন্ধে ছাওয়াল দেখে' আমাদের মন অতিশয় চঞ্চল হ'য়ে আছে। আপনার জন্যও খুব উদ্বিগ্না হয়েছেন। আপনাদের কুশল সংবাদ পত্রপাঠ 'ছাড়' করুন"।

এই চিঠি পড়ে' মেসি ক্ষেত্রনাথ তেমন নাড়ুয়ে বাকি রেখেছিলেন। কন্যা-জামাতার অন্তর তিনি খুবই বিচলিত ক'রেছেন—এত টান ওঁর উপর! 'রায়' ও ক্ষেত্রনাথ অবিলম্বে করলেনই; উপরন্তু মেসীর দিয়ে তাদের দেখা দিয়ে এলেন, এবং ফেরে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হ'য়ে মিষ্টান্ন এবং কাপড় জামা উপঢৌকন দিলেন এত যে, ধরের দিলেন তারা বুঝিবই হ'ল।...

তারপর বাড়ী ফিরে ছাওয়ালকে কৌতূহলের এই খবরটা জানানোই হ'ল যত একটা উৎসাহের আর উৎসবের আজ ওঁর।

পথ দিয়ে কেউ মিষ্টি কণ্ঠে গান গেয়ে গেলে ধরে বসে' ওঁর সেই রোমাঞ্চ জাগে; সুখের আনন্দে তিনি বহুক্ষণ বিহ্বল হ'য়ে থাকেন—একটি তপ্তি সানের সুখ বহু দিন ওঁর মনে থাকে।

পথে যেতে যেতে ছেলেমেয়েদের ক্রীড়াচঞ্চলতা তিনি মুগ্ধচক্ষে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন; ওঁর মনে হয়, পৃথিবীর সঙ্গে যখন ছাওয়াল আর বিচ্ছেদ করে এসেছি।

কিন্তু আসী সুখ, একেবারে অনির্বচনীয় সুখ, নিয়েছিল একদিন একটি শিশু: ক্ষেত্রনাথ যাত্রা দিয়ে চলেছেন—সামনের দিক থেকে এল চাকরের কোলে ছেপে' একটি শিশু—অতি সুন্দর নবরত্ন সুকোমল শিশুটি; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, চাকরের কোল থেকেই শিশুটি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাস্‌ল'—কি তারপর কে জানে, কিন্তু হাস্‌ল'; সে হাস্‌তেই ক্ষেত্রনাথ বেসামাল হ'য়ে পড়লেন; তিনিও খুব বিগলিতভাবে হাস্‌লেন; হাতের ছাতা তাড়াতাড়ি মাটিতে ফেলে' দিয়ে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন; বল্‌লেন, আসুবে?—এস;—শিশুটি ঝাঁপিয়ে ওঁর কোলে এল।

ক্ষেত্রনাথের মনে হ'ল, বৈকুণ্ঠলাভের চেয়ে এ-লাভ বড় লাভ। পৃথিবীর সকল উৎসবের আর আনন্দ-বস্তুরার আর সুচারু সম্ভার মাঝে এই ঘটনাটি যদি কখনও ওঁর কাছে সর্বাপ্রধান অর্থে অনুপম হ'য়ে দিল—পরটি শোনেনি' ক্ষেত্রনাথের পরিচিত এমন লোক পাওয়া যাবে না।

এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে।

এই সব সুখের ছোট ছোট ফুল যে ভগবানের স্নেহ-প্রণোদিত মন বা মনুষ্যের পুরস্কার-সম্মান এ-বিশ্বাস ওঁর ছিল না—এখনো নাই। ভগবান্ যদি থাকেন তবে তিনি সৃষ্টি করে' সৃষ্টিকে চালু করে' দিয়ে, অর্থাৎ একটা মাত্রা এবং ওজন বেঁধে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' আছেন——মানুষ কি পেলে আর না পেলে সেদিকে ওঁর দৃষ্টি নেই; ওজন আর মাত্রা নাড়িক বেঁধে আর সেধার ভার মানুষের বিচারবিবেচনাবলম্বন বিবেকের উপর রে'খে আছে।

জীবনোপভোগের সুখ নির্ভর করে নিজেরই শারীরিক স্বিচ্ছতার উপর, সুবিবেচনা আর কর্তব্য-পালনের উপর; কর্তব্যপালন তিনি কড়াকড়ায় করেছেন; যে-কথাটা বল্‌লে ঝগড়া বাধে সেই কথাটা ক্ষেত্রনাথ কোনোদিন উচ্চারণ করেন নাই—মনে মনে তোলাপাড়া করেও আগুন জেলে রাখেননি'—বল্‌তে যে বিবেকের বাধা পেয়েছেন এই হল ওঁর অতুল আনন্দের হেতু। জীবাত্মা, ভূতাত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দগুলি ওঁর জানা আছে, শুনে তিনি

দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের নিমন্ত্রণে আজও তিনি মুখাগ্নিরও যাবেন নাই, সন্ধ্যার ঘুমটিতে পরাণটিতে মধু হওয়া ঢের সুখের কথা। চড়ুইকে কেউ বলে ঘুঘু—নিজে পায় ঘরে' নিতে সে আসে; কেউ বলে বাহোলাটিন; কেউ বলে দুঃখোদ্ভোজন। কিন্তু কেদারনাথ বল্‌তেন, আমি ক্রুর ছলনায় ধরাপায় এই চড়ুই; শরীর যা'তে সুস্থ হয়, আর, মতি যা'তে বিনষ্ট হয় তার তুল্য অবাঞ্ছনীয় আর কি থাকতে পারে? কিন্তু এ-কথা সত্য কেবল চড়ুইয়ের বেলায়; যে পরের দুঃখ বোঝে নি, আর, নিজের কাজ করে নি, চড়াকালে অনুতাপে জর্জ্জর হয় সেই অকপট সংসার-পরাঙ্মুখ মানুষ। কেদারনাথ তা' নন্; চড়ুয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করতে তিনি প্রস্তুত।

কেদারনাথ চিরকাল অর্থোপার্জ্জন করে' এসেছেন—কর্ত্তব্য করেছেন ঠিক্ পরিমাপ-মতো; তাঁর পুত্র এখনই তাঁর চাইতে বেশী উপার্জ্জন করে; বড় পৌত্রটি কৃতী হ'য়ে বেরুবে তার লক্ষণ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। তাঁর চড়ুয়াতে পরিজনবর্গ আশ্চর্য্যিত হবেন পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিস্ময়ের কিছু ঘটবে না—অত্যাচারে বিস্ময়ের যে আগুন জ্বলে ধরে ধরে, নিস্পৃহ হ'য়ে সে আগুন তাদের ঝাড়তে হবে না। তারা যেমন আছে তেম্‌নি থাকবে—ভেতর থেকে তিনি চুপ্ করে' খসে পড়বেন; তখনকার মতো সদ্যপ্রস্তুত একটি ছিদ্র দেখা দেবে—তারপর আর তা' থাকবে না। এই যখন সমাগত সর্ব্বজনীন নিয়ম, তখন তার জন্যে ভাবা কেন? যে ছাড়া মানুষের দিন চলে না, বড়টা ঠিক্ রেখে সে সরে' যায়, তাঁর বেলায় তা' ঘটবে না। তিনি এরকম দেখেছেন, স্বামী যোড়শোপাচার কিছু রেখে' যায়নি বলে তাকে গলে দিয়ে নিয়ে স্ত্রী কাঁদছে আর শোক করছে, আর, মানুষকে ডেকে ডেকে পরলোকগতের কৃতজ্ঞতার কাহিনী শোনাচ্ছে। কিন্তু ঐ রকম শোচনীয়ভাবে স্মরণ করবার কারণ সব ছেড়ে যাবে না—তাঁর সঙ্গেও যাবে না। ছেলেটি তাঁর বুদ্ধিমান্, কাজের লোক; পৌত্রটি সুন্দর; তাদেরকে শিক্ষিত দীক্ষিত করেই তিনি তাদের ছেড়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে—

চড়ুয়ার উৎসব আরম্ভ আচ্ছাদিত করে যেন দাঁড়ান একটা ছায়াবলয় দেখা দিল; এই সময়ে সুখ আস্বাদন করে' এবং সুখ বিতরণ করে' আর কয়েকটি বছর অবস্থানই যদি তাঁদের ভোগবিলাসের ফল হয় তবে তাঁর পরিণতি কোথায়! পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে হবে—তাঁরা জানেন তাঁকে, তাঁরা থাকতে তাঁকে; কিন্তু তাঁকে মনে রাখবার জন্যে পৃথিবীর আশ্রয় আছে কি! নেই বোধ হয়

হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর ভয় আর হাহাকারপূর্ণ শূন্যতা উদ্ভাসিত হয়ে কেদারনাথের মুখে ফুটিয়ে গেল—

ভীত হ'য়ে ডাকলেন,—নিশীথ!

—কি, ঠাকুর্দ্দা! এই যে আমি এখানেই রয়েছি। কিছু বল্‌বে? বলে' নিশীথ উঠে এল।

কেদারনাথ বল্‌লেন,—আমার কাছে বসো'।

নিশীথ এসে তাঁর বিছানায় বস্‌ল'—তাঁর হাতে হাত বুলোতে লাগ্‌ল'

কেদারনাথ ম্লান চক্ষে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—ভাই, আমি মরবই। কোনো দুঃখ তা'তে নেই। এমনটি বেশ ভালোরকম যাই সুখকর নয়। কিন্তু আমাকে তোরা মনে রাখ্‌বি?

—রাখ্‌ব বই কি, ঠাকুর্দ্দা!

—না, তা' কেউ রাখে না; মরলেই মানুষ তা'কে ভুলে' যায়। কিন্তু আমাকে তোরা মনে রাখ্‌বি?—কেদারনাথকে উত্তেজিত দেখা গেল।

নিশীথ বল্‌ল,—রাখব'

—আমাকে স্পর্শ করে' বল্‌ছিস মনে রাখবি?

নিশীথ বল্‌ল,—হাঁ।

—বেঁচে অন্ততঃ একবার করে' স্মরণ করবি?

— তবে', ঠাকুরুণ।

— সুকুমারীর বলে' নয়; সুতা-উপর আমি চাইনে। কেবল ছিলেম বলে' মনে রাখবি?

— হাঁ, ঠাকুরুণ, শপথ করছি। তুমি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে চিরদিন থাকবে

— তোর ছেলেকে আমার নামটি শিখিয়ে দিয়ে যা'বি — সুকুমারীরা আমার নাম চলবে। মনে থাকবে ত'?

— থাকবে।

ক্ষেত্রনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলে' বল্লেন, — নিশ্চিন্ত হ'লাম।

নিশীথ খুব বিহ্বল হ'ল।

থাকব না তাই থাকব না কেউ,
থাকবে যা তাই কিছু।
সেই জানাকে যাও রে চ'লে
কালের পিছু-পিছু।
অধিক নিয়ে ত' যাইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান।
মালা বটে শুকায়ে ঝরে —
যে জন মালা পরে
সেও ত' নয় অমর, তবে
দুঃখ কিসের তরে?

আর্যোদয় *

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ, ডি-ফিল্ (মিউনিক্), ডি-লিট্ (প্যারিস্)

[এই প্রবন্ধটি আমাদের পাঠক-পাঠিকার পক্ষে কিছু গুরুপাক হইবে জানিয়াও আমরা 'বঙ্গদর্শনে' ইহাকে সাদরে প্রকাশিত করিতেছি। তাহার কারণ, — প্রথমতঃ, ইহার দ্বারা বিবাদগ্রস্ত সেই সমস্যাটির সমাধানে নব নব সিদ্ধান্তের অন্ত নাই; অথচ সে প্রশ্ন এমনই যে, স্বদেশীয় ইতিহাসের ছাত্রমাত্রকেও তাহার একটা জবাব লিখিয়া রাখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ দেখা দুষ্কর, এ রচনা তাহাই বটে, কিন্তু তাহা আত্ম-বিজ্ঞাপনের পাণ্ডিত্য নয়, সমস্যার মীমাংসাই ইহার লক্ষ্য; সুতরাং যে প্রমাণ ও তথ্যাদির অত্যাবশ্যক, তাহাই ইহাতে সংকলিত হইয়াছে; পাঠককে জব্দ করিবার জন্য, ও বিদ্যেটিকে আরও দুরূহ করিবার জন্য পাণ্ডিত্য-বিস্তার করা হয় নাই। এই প্রবন্ধ যাঁহারা একটু ধৈর্য-সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা যে অনেক নূতন তথ্য ও তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইবেন, এবং আধুনিক গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-দর্শনে চমৎকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠক-পাঠিকাগণ ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, ঐরূপ পুরাকালীন ঘটনার অলিখিত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে কত দিকের প্রমাণ একত্র করিয়া, এবং একের দ্বারা অপরের দুরুহতা সম্পাদন করিয়া, তবে প্রকাশযোগ্য করিতে হয় — আধুনিক কালে জ্ঞানের নানাবিভাগে নানা তথ্য-সংগ্রহের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে; এজন্য এখন ঐরূপ সমস্যার সমাধানে কল্পনা বা আগুবাক্য একেবারেই অচল। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় প্রবন্ধ এখনও খুব অল্প, তার কারণ, পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন, নির্মিত-চর্চণ, ও স্বকপোল-কল্পনা এই তিনের একটী বা সবগুলিই আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যের গৌরব বর্ধন করিয়া থাকে। 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণ এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা সেই জাতীয় প্রবন্ধ নয়।]

(১)

আর্য জাতি আজ অপর সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। যে-সব দেশ আর্য জাতির দ্বারা অধিকৃত হয় নাই সে-সব দেশও দ্রুতী ও সভ্যতায় আর্য ভাষাপন্ন। কোনরূপেই যাহারা আর্যরূপে গণ্য হইতে পারে না তাহারাও আজ আর্যত্বের দাবী করিতেছে। বাঙালীর দেহে আর্যরক্ত বিন্দুমাত্র আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তথাপি কোন্ বাঙালী নিজেকে আর্য বলে করিয়া গৌরব অনুভব না করে! কিন্তু আর্য বলিতে বুঝায় কি? — জাতি (race), দ্রুতী, না ভাষা! বৈদিক সাহিত্যে যুদ্ধরত বর্বর আর্যবর্গ রূপে অভিহিত হইত এবং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ যুগে 'আর্য' বলিতে — জাতি, দ্রুতী ও ভাষা এই তিনই বুঝাইত। ভারতীয় অর্থানুসারে 'আর্য' বলিতে বুঝাইত যাহা আধুনিক যুগে 'হিন্দু' বলিতে বুঝায়। বর্তমান যুগে কিন্তু 'আর্য' শব্দটির বিজ্ঞানসম্মত অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। সংস্কৃত, পারসিক, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি কয়েকটী নিদিষ্ট ভাষার বিশেষরূপেই কেবল বৈজ্ঞানিক মহলে 'আর্য' কথাটির প্রয়োগ আজিকার দিনে দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক জাতি ও দ্রুতীর বিশেষরূপে 'আর্য'-কথাটির ব্যবহার আজো বাঙালীর

* বঙ্গীয়-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রবোধচন্দ্র বসু-মল্লিক-বক্তৃতা, নং ১।

যায়। মহামতি পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্স্ মুলর (Max Mueller) এই ভাষায় বলিয়াছিলেন: — "বিজ্ঞানের ভাষায় 'আর্য'-শব্দটি জাতির সম্বন্ধে আদৌ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই শব্দটির দ্বারা বুঝায় কেবল ভাষা, এবং ভাষা ছাড়া আর কিছুই এতদ্বারা বুঝায় না।" (১)

আধুনিক যুগে ম্যাক্স্ মুলরই বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে 'আর্য' কথাটি চালু করেন, এবং তিনিই — প্রথম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে না হইলেও — শব্দটির প্রকৃত অর্থকে বিশদভাবে নির্দেশ করিয়া যান, কিন্তু তথাপি জনসাধারণ ও পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই ইহার এই স্পষ্ট ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিল। কারণ, ভাষা ও জাতি, এবং জাতি ও জাতি পরস্পর এতই নিবিড়ভাবে জড়িত যে এতদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা এক প্রকার অসম্ভব। ভাষা মানুষেই সৃষ্টি করিয়াছে না কোন উচ্চতর শক্তি মানুষকে যন্ত্রস্বরূপ মাত্র ব্যবহার করিয়া তাহার প্রচলন করিয়াছে — এই প্রশ্ন প্রাচীনকালেই ভারতে ও গ্রীসে বহুবার আলোচিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সর্বসম্মত কোন সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সুতরাং জাতির ন্যায় ভাষাও মানুষের স্বেচ্ছাসৃষ্ট নহে, এবং জাতি ও ভাষা উভয়ই প্রত্যেক দেশে কোন এক লোকোত্তর শক্তির দ্বারা অজ্ঞাতীয়রূপে নির্মিত হইয়াছে — এই ধারণা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই সকলে মাক্স্ মুলরের বিশ্লেষণেও জাতির আদত ধরিল যে আর্যভাষার মূলে আছে আর্য রক্ত। এই অনৈতিহাসিক মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন পেশা, যাঁহার একটি বিখ্যাত বচন হইল: "ভাষা জৈব (organic) নিয়মের অধীন জৈব কর্তার দ্বারা উৎপাদিত জৈব দ্রব্য।" (২)

কিন্তু পেশার এই মত কি সম্পূর্ণ নির্ভুল? ভাষা ও জাতির মধ্যে কি একেবারেই কোন জৈব সম্বন্ধ বর্তমান নাই, — যাহার ফলে ভাষা হইতেই জাতি সম্বন্ধে একটা আংশিক অনুমান সম্ভব হইতে পারে? আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণের কেহই প্রায় জাতি ও ভাষার মধ্যে এরূপ কোন জৈব সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। কথাও সত্য, কারণ চোখের সামনেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে নিগ্রোগণ আমেরিকার ঠিক ইয়াঙ্কিদের মতই ইংরাজী বলে, স্পেনদেশের অধিবাসীরা ঠিক ফরাসীদের মতই ফরাসী বলিতে পারে, দক্ষিণ আমেরিকা ও স্পেনের ভাষার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, দক্ষিণ আমেরিকার ভাষা অপেক্ষাকৃত সরলশীল, এবং সোভিয়েট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কত বিভিন্ন জাতি যে আজ ঠিক রুশদের মতই রুশ ভাষা বলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে যাহা হইতে মনে না হইয়া পারে না যে জাতি ও ভাষার মধ্যে কোন জৈব সম্বন্ধ নাই, এবং পেশা ও তদনুযায়ীগণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কিন্তু ভাষা ও জাতির মধ্যে কোন জৈব সম্বন্ধ-বিজ্ঞমান না থাকিলেও ভাষা হইতে জাতি সম্বন্ধে যে একেবারেই কোন অনুমান সম্ভব নয় — এ কথাও ঠিক নহে। আধুনিক নৃতত্ত্বে জাতিগত সম্বন্ধ বিচারে ভাষার সাক্ষ্য যে অগ্রাহ্য করা হয় না তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ যদি দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের ও অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা অভিন্ন, তবে তাহা হইতে তিনটি অনুমান সম্ভব হইবে: —

(১) ইংল্যাণ্ডের লোক অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছে;
(২) অষ্ট্রেলিয়ার লোক ইংল্যাণ্ডে আসিয়াছে; অথবা

১। Max Mueller, *Collected Works* (New Impression), 1898, Vol. X (The Home of the Aryas), পৃঃ ১০।

Origines Aricae, পৃঃ ৬।

(৩) তৃতীয় কোন দেশের লোক ইংলাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া এই দুই দেশেই গিয়াছে। ইংলাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া সংক্রান্ত এই ত্রিবিধ অনুমানের বিরুদ্ধে অবশ্য ইচ্ছা করিলে বলা যায় যে, ইংলাণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় কোন লোক আসে নাই, আসিয়াছিল কেবল ইংরাজী ভাষার কতকগুলি ধ্বনিসমষ্টি ও অভিধান, যাহা হইতে অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা ঠিক ইংরাজের মতই ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছে। শুধু যুক্তির দিক হইতে এই আপত্তি অকাট্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ঐরূপ আপত্তি প্রাচীন যুগের ভাষা প্রসার সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে না। যে-যুগে ইংলাণ্ডের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার পণ্যবিনিময় হয় সেই যুগে, এই দেশদ্বয়ের ভাষাগত ঐক্য, মানুষ স্বশরীরে ভাষা বহন করিয়া না আনিলেও হয়তো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যে-যুগে পণ্যাদি বিনিময়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না — সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই যদি বিপ্রকৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই বা অনুরূপ ভাষা কথিত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেই প্রাচীন কালেই ঐসকল দেশ সমভাষী জনসঙ্ঘের বাসভূমি ছিল। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারত, ইরান, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে যখন আর্য ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে এই সকল দেশে সেই প্রাচীন কালেই আর্যভাষী জনতা অন্তত কিয়ৎপরিমাণে স্বদেশে বসবাস করিত।

আর্যভাষা ও আর্যভাষীর পরস্পর সম্বন্ধ যদি এইরূপই হয় — যদি আর্যভাষীর শারীরিক উপস্থিতি ব্যতিরেকে প্রাচীনতম যুগে আর্যভাষার প্রচার ও প্রসার সম্ভব না হইয়া থাকে —তাহা হইলেই কি প্রমাণিত হইল যে, আর্যভাষা ও আর্যভাষীর মধ্যে একটা গূঢ় জৈব সম্বন্ধ বিদ্যমান? তাহা অবশ্যই নহে, কারণ আমেরিকায় যেমন বিভিন্ন জাতির লোকে একই ইংরাজি ভাষা বলে, তেমনি আর্য-ভাষীরাও যে বিভিন্ন জাতির লোক ছিল না তাহার প্রমাণ কি? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই, তবে একটা অনুমান করা যাইতে পারে। ভাষা সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকেই কবিন্‌সন্ ক্রুসো হইলে কখনই সাধারণবোধ্য কোন সাধারণ ভাষার উৎপত্তি সম্ভব হইত না। সুতরাং প্রত্যেক ভাষাই যে একটি সুনির্দিষ্ট নরসমাজের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ; এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, প্রাচীনতম যুগে — যখন ভূকণ্ড সমুদ্র ভিন্ন অপর কোন সমষ্টির কথা মানুষের জানাই ছিল না — ভূখণ্ডীয়তাই ছিল সমাজ-সংহতির ভিত্তি। সুতরাং নরসমাজের এই প্রাচীনতম অবস্থাতেই যদি ভাষার জন্ম হইয়া থাকে (৩), তবে এক একটি ভাষা যে এক একটি বিশিষ্ট জাতির ক্ষেত্রেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেক মূল ভাষার সহিত একটি বিশিষ্ট জাতির একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্বীকার করা তাহা হইলে শুধু সম্ভব নয়, প্রয়োজন। তবে এই সম্বন্ধ যে দেহা প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষিত কোন জৈব সম্বন্ধ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এক একটি বিশিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে এক একটি মূল ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভাষা ও জাতির জন্মগত সম্বন্ধ যে আজও অক্ষুণ্ণ আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। কারণ যে-জাতির মধ্যে একটি বিশেষ ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেই জাতি এখনও সেই ভাষারই কথা না-ও বলিতে পারে। জাতির পক্ষে ভাষা-পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আদৌ বিরল নহে। অবশ্য যে ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে, ভাষাটি থাকিয়া গিয়াছে,

৩। অনেকে মনে করেন যে প্রাক্-মানব যুগেই ভাষার জন্ম হয়।

কিন্তু যে-জাতি তাহাদের অঞ্চলে অধিবাসিগণ জাতি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্বন্ধেই দৃষ্টান্ত বোধ হয় আধুনিক গ্রীস্। উত্তর গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসীদের প্রায় নির্মূল হইয়া গিয়াছে; সেখানকার অধিবাসীদের এখন জাতিতে পুরাপুরি স্লাভ, কিন্তু তাহাদের ভাষা এখনও গ্রীক্; কাজেই প্রত্যেক ভাষা এক একটি বিশিষ্ট জাতির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও আধুনিক ও অনতিপূর্ব কালের জাতি ও ভাষাবলী পর্যালোচনা করিলেই যে প্রত্যেক ভাষার জন্মদাতা জাতিটির সন্ধান পাওয়া যাইবে—এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক।

(২)

এই আলোচনা হইতে বোধ হয় খানিকটা আভাস পাওয়া যাইবে, আর্যভাষার জন্মস্থল ও জন্মদাতা জাতির সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও অনুসন্ধান কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাষার পশ্চাতে একটি বিশিষ্ট জাতির নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও বর্তমান অবস্থায় কোন্ জাতির দ্বারা কোন্ ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা যেন নির্ধারণ করার উপায় নাই তখন ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃ-তত্ত্বের আর্য ভাষা ও আর্যজাতির সম্বন্ধে যে-টুকু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়—সেটুকুই এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গৃহীত হইতে পারে। জাতি ও ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ জৈব না অজৈব এই ধরণের প্রশ্নই এক্ষেত্রে অবান্তর। কেবল মাত্র তথ্য সংগ্রহ করিয়াই কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনা শেষ হইবে না, সংগৃহীত তথ্যাবলী কোন্ পন্থায় সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক রূপে সমন্বিত হইতে পারে তাহা নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য একটি থিয়োরীও প্রয়োজন। বিজ্ঞানে সর্বত্র এই থিয়োরীই হইল চরম লক্ষ্য। থিয়োরীর দ্বারা সুসংবদ্ধ না হইলে অবিচ্ছিন্ন তথ্যাবলী প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে সাহায্য দান করিতে পারে না। কাজেই আর্যভাষী জাতির আদি জন্মভূমির আলোচনায় ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতিতে এই জাতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিলেই গবেষকের কার্য শেষ হইবে না; গবেষকের আরও কর্তব্য — এমন একটি দেশ আর্যদিগের আদি জন্মভূমি রূপে নির্দেশ করিয়া দেওয়া, যাহা স্বীকার করিয়া লইলে ভাষাতত্ত্বাদিতে সংগৃহীত তথ্যাবলী আপনা হইতেই সুযোজ্য হইয়া উঠিবে। ইহাই হইল এ-ক্ষেত্রে সেই থিয়োরী—যাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সর্বত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, থিয়োরী খাড়িলেই গবেষকের কার্য সমাপ্ত না হইলেও থিয়োরী কখনই প্রকৃত সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। সংগৃহীত তথ্যাবলীর অবলম্বনের উদ্দেশ্যেই যখন থিয়োরী স্বীকার করা, তখন নূতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে আবার নূতন থিয়োরী স্বীকার করিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সেইজন্য থিয়োরীকে অবজ্ঞা করা যাতুলতা। কোন পদার্থবিদকে যদি আজ জিজ্ঞাসা করা হয়—পদার্থ কি, তবে তাঁহাকেও বলিতে হইবে, "পদার্থ কি তাহা জানি না, তবে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে এই থিয়োরী আজকাল প্রচলিত," এবং কোন ব্যক্তিই পদার্থবিদকে এই ধরণের উত্তরের জন্য উপহাস করিতে সাহস করিবে না। তাঁহাকে বড়জোর আরও অনুরোধ করা যাইতে পারে, যে-তথ্যাবলীর উপর ঐ-রকম থিয়োরী প্রতিষ্ঠিত তাহা যেন তিনি ফুরাইয়া দেন। আমাদের এই বর্তমান গবেষণাতেও সেইরূপ তথ্যালোচনার পর আর্যদিগের আদি জন্মভূমি সম্বন্ধে একটি থিয়োরী স্থাপন করিতে হইবে, যদিও থিয়োরীটিকে সত্যরূপে গ্রহণ করা কখনই সমীচীন হইবে না, এবং বিভিন্ন থিয়োরীর সম্ভাবনা সত্ত্বেও একটি বিশেষ থিয়োরী গ্রহণ করারই বা কারণ কি, তাহাও সেই সঙ্গে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে বলাই বাহুল্য, তথ্যাবলী যথাসম্ভব সংগ্রহের পর তবে থিয়োরীর সাহায্যে সেইগুলির সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা সম্ভব হইতে পারে। পূর্বেই থিয়োরী করিয়া

পরে তথ্যের সাহায্যে সেটি পাল্টা করাইবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

ভাষা ও জাতির মধ্যে কোন গুঢ় বৈজ্ঞানিক-সম্বন্ধ যখন স্বীকার করা যায় না তখন যদৃচ্ছ পন্থায় অগ্রসর হওয়া ভিন্ন এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অপর কোন উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাউক, আর্যভাষাভাষী কোন্ কোন্ দেশে এখনও কথিত হয়, তাহা বিচার করিতে বসিলে পার্থক্য কি চোখে পড়ে। চোখে পড়ে, ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই আর্য-ভাষার প্রচলন; কিন্তু ইউরোপের বাহিরে (আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কথা অবশ্য বাদ দিতে হইবে) আর্যভাষী দেশগুলি (যথা পারস্য, আফ্‌গানিস্তান) আয়তনে সঙ্কীর্ণ, যদিও ভারতবর্ষে আমরা—প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত জুড়িয়া—বিবিধ আর্য-ভাষা কথিত হইতেছে। একদিকে ইউরোপ অপর দিকে ভারতবর্ষ—কেবল এই দুইদেশে আর্য-ভাষা প্রধানতঃ প্রচলিত বলিয়াই, আর্যভাষার অপর নাম ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষা। ইউরোপ ও ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তী যে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এখন আর্য-ভাষা প্রচলিত, তাহার উত্তরভাগ বিবিধ আল্‌তাই-উরালিক ভাষার দ্বারা, এবং দক্ষিণভাগ বিবিধ সেমিটিক ভাষার দ্বারা অধিকৃত। কাজেই আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আর্য জাতি ও ভাষার উৎপত্তিস্থান হয় ভারতবর্ষ, না হয় ইউরোপ। তাহার উপর যদি আরও বিবেচনা করা যায় যে, ইউরোপ প্রায় পুরাপুরি আর্যভাষী, কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও আর্যেতর ভাষা বহু অংশে প্রচলিত, তখন বোধ হয় মনে হইবে যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপেরই আর্যদিগের জন্মস্থান রূপে পরিগণিত হইবার অধিকার আছে বেশী।

কিন্তু ভারতবর্ষ বা ইউরোপ এই দুইটি দেশের কোন একটিকে আর্যদলের আদি-জন্মভূমি মনে করার বিরুদ্ধেও গুরুতর যুক্তি আছে। যাঁহারা মনে করেন যে, অ্যা-ইউরোপ (প্রাগৈতি) বা আদিনিবাসী আর্যদলের আদি-বাসস্থান, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এই অঞ্চলে আর্যেতর ভাষা প্রচলিত। অথচ বাহির হইতে কোন জাতি যে কখনও এখানে আসিয়া বাসস্থাপন করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই। এই-মতের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি আছে তাহা পরে দেখানো হইবে। ভারতবর্ষকে আর্যদলের আদি জন্মস্থানরূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল, সমগ্র ভারতবর্ষ যে একালে অনার্যভাষী ছিল, তাহা সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই। অধিক ভারত এখনও অনার্যভাষী, উত্তর-ভারতে আর্যভাষা যে সবত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নহে, এবং বালুচিস্তানের ব্রাহুই-দল এখনও এক দ্রাবিড়-ভাষার কথা বলে। ইহা হইতে স্বভাবতই মনে হইবার কথা যে, দক্ষিণ-ভারতের ন্যায় উত্তর-ভারতও এক সময়ে সমগ্রতঃ অনার্যভাষী ছিল। উত্তর-ভারত হইতে নির্গত হইয়া আর্যদল ইংলণ্ড পর্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশ প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, (৪) আর্যভাষী করিয়া তুলিল, অথচ

৪। যে-ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতিরেকেও যে সেই ভাষার প্রসার হয় না তাহা নহে। আফগানগণ ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করিল, তাহাদের নিকট হইতে আবার সেই ভাষা গ্রহণ করিল পারসীকগণ: তাহাদের নিকট হইতে আবার বিবিধ অন্তর্বর্তী জাতির দ্বারা দিয়া ভারতীয় ভাষা ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল—এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। ভাষার প্রসার এইভাবে হইলে তাহা "পরোক্ষ"; এবং আদিভাষিগণ স্বশরীরে ভাষার প্রসার সাধন করিলে, তাহা "প্রত্যক্ষ"।

কিনা ভারতে আর্যভাষা প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইল না —এ-কথা বিবাদযোগ্য নহে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বিবাদযোগ্য বলিয়া মনে হয় না, তাহা তখনও ঘটে না কি? অবশ্যই ঘটে, এবং অহরহঃ ঘটিতেছে। এমন কি ভারতবর্ষেই অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। হিন্দি-ভাষীর আদি বাসস্থান ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। দুইশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহারা এখন সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। (৫) কাজেই আপাত-দৃষ্টিতে ভারতবর্ষই যে আর্যদের আদি-বাসস্থান ছিল, এ-কথা বিবাদযোগ্য মনে না হইলেও, একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না—যতক্ষণ না ভবিষ্যতে আরও প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। এই প্রমাণ আছে।

এখন প্রমাণ হইল, ভারতীয় আর্যভাষা অপর সমস্ত আর্যভাষা হইতে এমনই পৃথক্ যে, এইটিকেই মূল-আর্যভাষার প্রকৃত বংশধর রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব। মূল-আর্যভাষা কিরূপ ছিল তাহা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে খানিকটা বুঝিতে পারা গিয়াছে; এবং সেই ভাষাতে যে মূর্ধন্য বর্ণের (ট ঠ ড ঢ ণ) কোন বর্ণ ছিল না তাহা নিশ্চিত। ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি পর্যালোচনা করিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই মূর্ধন্য বর্ণগুলি মূলের জিনিস। সর্বপ্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (অর্থাৎ, বেদের ভাষার) প্রথম চারিটি মূর্ধন্য-বর্ণের প্রয়োগ অত্যন্ত কম, এবং পরবর্তী যুগে যতই আসা যায় ততই দেখা যায় যে, ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে মূর্ধন্য-বর্ণের প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইরানের প্রাচীনতম আর্যভাষার নিদর্শন অবস্তুর ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তী শিলালেখের লিখিত ভাষাগুলি হইতে পাওয়া যায়। এই অবস্তুরীয় ভাষা ও বেদের মন্ত্র ভাষায়, ও ছন্দে, এতই অনুরূপ, যে অনেকে মনে করেন যে, ভাষিলাসের ভাষা অপেক্ষা অবস্তুরের ভাষা বেদের ভাষার সহিত অধিকতর সাদৃশ্যসম্পন্ন। (৬) লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অবেস্তার এই সাধার ভাষাতেও মূর্ধন্য-বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং পরবর্তী যুগের ইরানীয় ভাষাগুলিতেও মূর্ধন্য-বর্ণের অস্তিত্ব নাই। এখন ভারতের মূর্ধন্য-বর্ণবিশিষ্ট প্রাচীন আর্যভাষাই যদি মূল-আর্যভাষা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতের বহির্ভূত আর্যভাষাগুলির মধ্যেও মূর্ধন্য বর্ণের প্রয়োগ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা যখন পাওয়া যায় না তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্যগণ বাহির হইতে ভারতে পৌঁছিবার পর তবে ভারতীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য-বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল। কি কারণে কেবল ভারতীয় আর্যভাষাতেই মূর্ধন্য-বর্ণের উদ্ভব হইল, ভারতের বহির্ভূত অন্য কোন আর্যভাষায় হইল না—তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভারতের প্রাক্-আর্য অধিবাসীদের ভাষায় মূর্ধন্য-বর্ণের বহুল প্রচার চিরদিনই ছিল, এখনও আছে। খুব সম্ভব এই প্রাক্-আর্য অধিবাসীদের সহিত সংস্পর্শের ফলেই ভারতীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য-বর্ণের বর্ণ উদ্ভূত হইয়াছিল। আর্যগণের আদি-বাসস্থান যে ভারতে ছিল না, সেই পক্ষে ভাষার দিক হইতে ইহাই হইল প্রধান প্রমাণ। ভাষার দিক হইতে এই পক্ষে অন্য প্রমাণও আছে, কিন্তু সেগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক, ইতিহাস হইতে এ-সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৫। অনেকের মনে করিত যে জিপ্সিরা, মিশর ('ইজিপ্ট') হইতে আসিয়াছে। এই 'ইজিপ্ট' হইতে ইহাদের নাম হইয়াছে 'জিপ্সি'।

৬।* আমার নিকট ইহা অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হয়। সাদৃশ্য খুবই আছে, কিন্তু এতটা নহে।

(৩)

পূর্বে ভারতের যে-কোন ইতিহাসের প্রারম্ভে ঋগ্বেদের উল্লেখ থাকিত। এখন কিন্তু ভারতের প্রায় সকল ইতিহাসের প্রারম্ভেই ঋগ্বেদেরও পূর্বে মহেঞ্জো-দড়োর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্ট-জন্মের দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বেকার এই মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতা ঋগ্বেদীয় সভ্যতার পূর্ববর্তীও মহেঞ্জো-দড়োতে আবিষ্কৃত লিপির এখনও পাঠোদ্ধার করা যায় নাই, কাজেই মহেঞ্জো-দড়োর ভাষা ঋগ্বেদের ভাষার অনুরূপ ছিল কি না তাহা বলা যায় না। যদি পরে প্রমাণিত হয় যে, মহেঞ্জো-দড়োর ভাষাও একটি আর্য-ভাষা ছিল, তাহা হইলে সব আপত্তিকেরও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, ভারতবর্ষই আর্যদিগের আদি জন্মভূমি। কারণ, প্রথমতঃ, আর্যভাষার এত প্রাচীন নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় নাই; এবং দ্বিতীয়তঃ, মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতা যে ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমে প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহারও প্রাত্নতত্ত্বিক প্রমাণ আছে। মেসোপটেমিয়ায় আবিষ্কৃত একটি বেলনাকার মুদ্রার (cylinder seal) আলোচনায় প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ক্রামরিশ বলিয়াছেন: "এ-সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, আমাদের এই বেলনাকার মুদ্রাটি খৃষ্ট-জন্মের আনুমানিক ২৫০০ বৎসর পূর্বে সিন্ধু-উপত্যকা হইতে প্রস্তুত-প্রণালী আমদানি হইয়াছিল।" (১) কাজেই, ক্রামরিশের কথা যদি সত্য হয়, তবে মহেঞ্জো-দড়োর ভাষা আর্যভাষা-রূপে প্রতিপন্ন হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের সিন্ধুপ্রদেশই সর্ব-প্রাচীন আর্যভূমি। এবং মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতার প্রতীচ্যাভিমুখী প্রসারেরও যখন প্রাত্নতত্ত্বিক প্রমাণ রহিয়াছে, তখন আরও নির্ভয়েই বলা যাইবে যে, ভারতবর্ষ হইতেই আর্যভাষা ক্রমে ক্রমে ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মহেঞ্জো-দড়োর ভাষা সম্বন্ধে কিছুই যখন জানা নাই, তখন এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করা চলিবে না। উপরন্তু মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে যাহা বলিতে পারা যায় তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই সভ্যতা আর্য-সভ্যতা ছিল না। মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতার সহিত ঋগ্বেদীয় সভ্যতার যে নিকট সম্বন্ধ ছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা অনার্য-সভ্যতা ছিল না। সুতরাং ঋগ্বেদ ও মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার সমৃদ্ধ আলোচনা করিয়া যদি কোন অনুমান সম্ভব হয়, তবে তাহা ইহাই হইবে যে, মহেঞ্জো-দড়োর সভ্যতাও ছিল অনার্য সভ্যতা।

বৈদিক-সাহিত্য হইতে মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতা সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা হইতেও এই সিদ্ধান্তই সূচিত হয়। বেদে অবশ্য মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নাই। কিন্তু বৈদিক ধর্মের একটি দেবতা যে মহেঞ্জো-দড়োতেও পূজিত হইতেন তাহার প্রাত্নতত্ত্বিক প্রমাণ আছে। এই দেবতা হইলেন — রুদ্র, যিনি পশুপতি, মহাদেব, শিব প্রভৃতি নামেও পরিচিত। মহেঞ্জো-দড়োতে নানা পশু পরিবেষ্টিত একটি ধ্যানী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, এই শিব-পশুপতির মূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন বৈদিক-ধর্মে এই রুদ্র-দেবতাটির স্থান অতি অদ্ভুত। অন্যত্র দেবতাকে যজ্ঞে আসিতে বলা হয়, কিন্তু রুদ্রকে বলা হয়, তিনি যেন দূরে থাকিয়া দূরে থাকেন। অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, কিন্তু রুদ্রের যাহা প্রাপ্য তাহা নানা বিষম স্থানে, যা পড়ে

১। দ্রষ্টব্য — *Annual Bibliography of Indian Archaeology for the year 1932.*

মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় (৮)। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের (৩।৩৯।১০) প্রস্তাবে এই দেবতার নামোচ্চারণে প্রথমেই যার পরিচয়ে যে 'পশুপতি' — এই নামটি বুঝাইবার জন্য তাহাকে বলিতে হইয়াছে, "যে-দেবতার নামের মধ্যে 'পশু' শব্দ আছে"; সেইরূপ 'রুদ্রপতি' — এই নামে বুঝাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন "যে নামের মধ্যে 'রুদ্র' শব্দ আছে।" 'রুদ্র'-শব্দবিশিষ্ট ঐরূপ নামের ব্যবহার করিবার সময় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের মতে ইচ্ছাপূর্বক ঐ শব্দটি বিকৃত করিয়া 'রুদ্রি'-রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে; এবং "অতি নয়" (অর্থাৎ "আমাদের অতিমুখে") বলিয়া যে-মন্ত্রের আরম্ভ, রুদ্রের প্রতি প্রযোজ্যের সময়ে সেই মন্ত্র অবশ্যই এমন ভাবে পরিবর্তিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ দেবতা সেই মন্ত্র শুনিয়া তৎক্ষণে ছুটিয়া আসিতে প্রস্তুত না হন।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের মত প্রাচীন গ্রন্থেও রুদ্র সম্বন্ধে এই সব বিস্ময়কর বিধান দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে রুদ্র আর্যদিগের দেবতা ছিলেন না। গ্রীসের আর্য-গণ যেরূপ সেই দেশের আদিম অধিবাসীদিগের কোন কোন দেবতা নিজেরা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের সেইরূপ, আর্যগণ খুব সম্ভব প্রাক্-আর্য মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতা হইতে কোন কোন দেবতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল দেবতার মধ্যে রুদ্রই প্রধান। আদিবাসীদের দেবতা ও আর্যদিগের দেবতার পূজায় গ্রীসেও অনুরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রুদ্র-দেবতার উদ্দেশে যেমন অগ্নিতে আহুতি না দিয়া নানা বিজন স্থানে আহুতি দেওয়া হয়, গ্রীসেও সেইরূপ অনার্যদিগের নিকট হইতে গৃহীত দেবতা হেকাটে-র উদ্দেশে আহুতি অগ্নিতে নিক্ষেপ না করিয়া চৌমাথার উপর অন্ধকার রাত্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত। এবং আরও নিয়ম ছিল, যিনি হেকাটে-র উদ্দেশে আহুতি এই ভাবে বিজন স্থানে নিক্ষেপ করিবেন, তিনি যেন নিক্ষেপ করিবার সময়ে মুখ ফিরাইয়া থাকেন। (৯) অবশ্য ভিন্ন জাতির দেবতা হইলেই যে তাঁহার পূজা রুদ্র-পূজার অনুরূপ পন্থায় করা হইত তাহা নহে। গ্রীক-ধর্মে আপোলো ও আর্তেমিস্ দুইজন প্রধান দেবতা, জুপিটারের পরেই তাঁহাদের স্থান; তাঁহারা যে প্রথম হইতেই গ্রীক আর্য-দের দেবতা ছিলেন না তাহা পূজাদির পদ্ধতি হইতে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, এই দুই দেবতা প্রথমে অনার্যদের দেবতা ছিলেন, এবং এই জন্যই নাকি ট্রয়-যুদ্ধের কালে আপোলো ও আর্তেমিস্ ট্রয়বাসীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছিলেন। (১০) মোটের উপর কিন্তু গ্রীসে দুই শ্রেণীর দেবতার পূজা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই রীতিতে সম্পাদিত হইত তাহা বিস্ময়কর। ওলম্পস্-পর্বতের অধিবাসী জুপিটার প্রভৃতি দেব-গণকে পূজার দ্বারা আহ্বান করা হইত, এবং তাঁহা-দিগের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইত অগ্নিতে, যাহাতে তাহা ধূমের আকারে তাঁহাদের নিকট গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রীতিতে সম্পাদিত আর এক শ্রেণীর দেবতার পূজা গ্রীসে প্রচলিত ছিল, যাঁহা-দিগকে গ্রীক-সমাজ Theoi apopompaioi (অর্থাৎ, 'পরিহরণীয় দেবগণ') এই নামে অভিহিত করিতেন, এবং যাঁহাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে প্রমাণ

৮। দ্রষ্টব্য — Keith, *Religion and Philosophy of Veda and Upanishads*, পৃ: ১৪৫।

৯। দ্রষ্টব্য — Nilsson, *A History of Greek Religion*. Translated from the Swedish by F. J. Fieldon. 1925, পৃ: ২০৪।

Nilsson, পৃ: ১৪৪।

করা যায় যে, তাঁহারা গ্রীসের আদিম অনার্য অধিবাসীদের দেবতা ছিলেন। (১১)

গ্রীসের এই Theoi apopompaioi বা নির্বাসিত ভারতের রুদ্রদেবতাগণের অনুরূপ তাহা সন্দেহ করিবার উপায় নাই। সুতরাং গ্রীসের এই সকল দেবতা সম্বন্ধে যখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রথমে অনার্যদের দেবতা ছিলেন, তখন ভারতের রুদ্র-দেবতা সম্বন্ধেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না। এই রুদ্র আবার মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতার দেবতা। সুতরাং এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াও যদি কোন সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তবে তাহাও ইহাই হইবে যে, মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতা আর্য-সভ্যতা ছিল না।

অনেকে হয়তো আপত্তি করিবেন, রুদ্র-সম্বন্ধে বৈদিক আর্যদের ভক্তি অপেক্ষা ভীতিই যদি বেশী ছিল, তবে ঋগ্বেদের মধ্যেই সেই ভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না কেন? বাস্তবিক রুদ্র সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত ভীতি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সর্বপ্রাচীন বেদ ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে মনে হয় না যে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ রুদ্রের নামোচ্চারণে ভয় পাইতেন। সুতরাং সর্বপ্রাচীন বেদ ঋগ্বেদে যখন রুদ্র ভিন্নজাতীয় দেবতা-রূপে বর্ণিত হন নাই, তখন পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া রুদ্রকে অনার্য-দিগের দেবতা বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে কি? এই প্রশ্নটী জার্মানীর মনীষী Arbman তাঁহার রুদ্রবিষয়ক গ্রন্থে সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে আমরা যে ধর্মের পরিচয় পাই তাহা আদৌ জনসাধারণের ধর্ম নহে। ঋগ্বেদের ধর্ম প্রধানতঃ অত্রি, পুরুমেল, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি কতকগুলি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বংশের ঋষিকুলের ধর্ম,—যাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস বহু বিষয়ে জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস হইতে পৃথক ছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এই সকল ঋষিকুলেরই গোত্রপ্রবর্তক বা পূর্বপুরুষ। ইঁহারা কখনও রুদ্র-দেবতার নামোচ্চারণে ভয় পাইতেন না; বরিঞ্চ ঋগ্বেদের যুগেও জনসাধারণ এই দেবতাকে ভক্তি অপেক্ষা ভয়ই করিত বেশী। সুতরাং রুদ্রসম্বন্ধে ঋগ্বেদের সাক্ষ্য পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে পৃথক বলিয়া ঐতরেয়-ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে রুদ্র-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অবজ্ঞা করা চলিবে না।

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত যে, মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতা আর্য-সভ্যতা রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। এখন এই মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতাই যদি ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা হয়, তবে আর কিরূপে বলা যাইবে যে, ভারতবর্ষই আর্যদিগের আদি-জন্মভূমি? ভারতের প্রাচীনতম আর্য-সভ্যতার—অর্থাৎ ঋগ্বেদীয় সভ্যতার—ঐতিহাসিক যদি ভারতের অন্য কোথাও হইত, তাহা হইলেও হয়তো বলা যাইত, মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতার যুগেই ভারতে অন্যত্র আদি-আর্যসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই উভয় সভ্যতার ভৌগোলিক ঐতিহাসিক অস্তিত্ব কাল, মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতার ন্যায় ঋগ্বেদীয় সভ্যতাও সেই সিন্ধু-উপত্যকাতেই একদা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই দুইটী সভ্যতা সমকালীন হইতে পারে না। মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতার কাল মোটামুটি জানা আছে,

১১। Jane Ellen Harrison, *Prolegomena to the Study of Greek Religion*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৭-৮, ৬৪।

সৌন্দর্য্য

[এই প্রবন্ধটি ১২৯১, কার্ত্তিক সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল — লেখকের নাম নাই। প্রবন্ধটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে, তাহার কারণ, একটি সুন্দর সুবক্তব্য বা ভাব-সন্তারকে লেখক বড় সরল ভাবে ও সহজ ভাষায় এবং স্বল্পপরিসরে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাকে একটি খাঁটি সাহিত্যিক প্রবন্ধ, অর্থাৎ, স্বাধীন ভাবুকতা-পূর্ণ রসসৃষ্টিমূলক গদ্য-রচনা বলা যাইতে পারে। বাংলাসাহিত্যে এই জাতীয় প্রবন্ধের অভাব আছে।]

এক স্থানে স্বর্গের প্রান্তদেশ আছে, সেখানে গবাক্ষদ্বারে স্বর্গের পরপারে কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সে স্থানটা এমন সঙ্কট-স্থানে অবস্থিত, যে উহাকে স্বর্গের প্রান্ত বলিব, কি স্বর্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা যায় না — অর্থাৎ উহাকে দুই বলা যায়। সেই প্রান্তভূমি কোথায়! পৃথিবীর আপিসের কাছে প্রান্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই স্বর্গের বাহু দেখন করিতে যাই!

স্বর্গ কি, আগে তাহাই দেখিতে হয়। কেহ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। আমার স্বর্গ — আমার সৌন্দর্য্য-কল্পনার চরম তীর্থ। পৃথিবীতে যত কি আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য ছাড়া এখানে মানুষ এমন আর কিছু দেখে নাই, যে তাহা দিয়া সে তাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য্য যেন স্বর্গের জিনিষ — পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এইজন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে, সৌন্দর্য্যকেই পাঠাইতে হয়। এইজন্য সুন্দর জিনিষ যখন ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কবিরা কল্পনা করেন — দেবতারা স্বর্গের অভাব দূর করিবার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া সৌজন্য-বিধান দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না। এইজন্য অন্ধ ও ইন্দ্রিয়হীন মুক্তাদের-খালী, পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত।

আমার মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ভ, সেই প্রান্তটি যেন সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য থাকে না থাকিলে যেন স্বর্গ-মর্ত্তে চিরবিচ্ছেদ হইত। সৌন্দর্য্য স্বর্গে-মর্ত্তে উভয়-প্রসারিত সেতু — সৌন্দর্য্যের মায়াছায়া তাই, নহিলে সৌন্দর্য্য কিছুই নয়।

সমুদ্রকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান তুলিতে পারে না। উহা কাহার কাছে রব, উহা হইতে কবিগ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান ধ্বনিতে থাকে। কেবল যাহার তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে — পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়; প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই; ফুলের কবিতার কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য্য-মন্দিরের চীরভূমি চোখের সম্মুখে খেলার মত পড়ে।

এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্যকে এত ভালবাসি। পৃথিবীর চারিদিকে

হোক, সৌন্দর্য্য উপরে থাকুক। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ বেশ ধরিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হউক, সৌন্দর্য্য তাহা করে না — সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত জন্মভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-যাদুকরের বলিয়া আমরা সুদূর আকাশের নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদূর পুষ্পের গন্ধ পাই। স্বর্গের সূর্য্য-কিরণ সেইখান হইতেই আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি। এই যাদুকরের বলিয়া অনন্ত আকাশের জন্য আমাদের প্রাণ যেন হা হা করিতে থাকে, দুই বাহু তুলিয়া সর্ব্বান্তিকরণে উহাকে ধরিতে ইচ্ছা যায়, এই সৌন্দর্য্যের শেষ কোথায়, অথবা এই সৌন্দর্য্যের আরম্ভ কোথায়, তাহাই অন্বেষণে ঐ সুদূর নিরন্তের অভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেঁকে না। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়; কবিতা যাদুকরে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্যমাত্রেই তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়।

স্বর্গে-মর্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্ত্তা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।

যাহার এমন হয় না, তাহার আশা যদি বা না হয়, ভাল হইবেই। আর সকলে অনেক যাবা অবিরত নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য্য কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর কিছুই করে না। সৌন্দর্য্যের কি অসীম ধৈর্য্য! এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে, পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, শোনে নাই। যাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য্য উপস্থিত হইয়াও প্রতিদিন ব্যর্থমুখে অন্তর্হিত হইত। তাহারা গানের শব্দ 'শুনিত' মাত্র, ফুলের ফোটা 'দেখিত' মাত্র। সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনামাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা ফুল 'দেখিতে' পাইল, গান 'শুনিতে' পাইল। ধৈর্য্যই সৌন্দর্য্যের মন্ত্র। পুরুষের ক্ষমতা আছে, তাই এতকাল ধরিয়া প্রকৃতির উপরে অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। প্রকৃতি আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া ধৈর্য্যসহকারে সাজিয়া আসিতেছিল। অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন শ্যামল-বল সৌন্দর্য্য-সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। দক্ষতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে তখন বর্ব্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাদ্বারা পূজা করিবে না। তখন এই মোহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আত্ম-বিসর্জ্জন, এই মধুর সৌন্দর্য্য বিনা উপদ্রবে মহত্ত্বসহকারে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিপ্লবের সময় কাল ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্ত্তা আনিতেছে। যে যতই, ক্রমশঃ তাহার বধিরতা দূর

হইয়াছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটী গান পাইয়াছি, তাহাই তান করিয়া ঘুরিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।

ঘুরণী তরাও উপদেশ।
যে ছন্দে যে রাগি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ ছন্দে বাজে বাঁশী অতি অনুরাগ।
কোন্ ছন্দে রাধা বলে ডাকে আমার নাম।
কোন্ ছন্দে বাজে বাঁশী ললিত রাগিনী।
কোন্ ছন্দে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিনী।
কোন্ ছন্দে বসালে ছুটয়ে পারিজাত।
কোন্ ছন্দে কম্প ছুটে যে প্রাণনাথ।
কোন্ ছন্দে বড়ঋতু হয় এককালে।
কোন্ ছন্দে নিধুবন হয় ফুলে ফলে।
কোন্ ছন্দে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়।
জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি।
"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী।

সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটী বাঁশী। ইহার ছন্দে ছন্দে তিনি নিঃশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার ছন্দে ছন্দে নূতন নূতন সুর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি করে থাকে! তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাঁহার প্রধান আহ্বান-গান, সৌন্দর্যই সেই বৈষম্যী। কখনও তাঁহার বাঁশীর সুর, বসন্ত কভু তাঁহার বাঁশীর সুর, কোকিলের পঞ্চম তান তাঁহার বাঁশীর সুর। সে বাঁশীর সুর কিন্তু বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার" — আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অবাক কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন — "তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস।" এই জন্য, আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন-কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই — সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন আর দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চিরবিরহে কাল কাটাই। কাণে একটী বাঁশীর শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না, সেই মিলনের মধ্যে একটী চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

এই বাঁশীর ডাক শুনিয়াই যুগিয়েছিলাম সৌন্দর্যের স্বর্গ-মর্ত্যের উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়।

আমরা এক এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে। তাঁহার বাঁশী লইয়া তাঁহাকেই ডাকে।

আজু কে গো মুরলী বাজায়!
এ ত কভু নহে শ্যামরায়,
ইহার গৌর বরণ করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কে বা দিল,
ইহার বামে হেরি চিকণ-বরণী,
নীল উতলি নীলমণি।

জগতের সৌন্দর্য অসীম সৌন্দর্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই আজ জগতের সৌন্দর্যের

অভাবের অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস দেখিয়াছি। আমাদের হৃদয়ও যদি মুক্ত না হয়, তবে তিনি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন?

অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই সৌন্দর্য্যের মালা লইয়া, মালা-বদল করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্য স্বর্গ-মর্ত্যের বিবাহ-নিবন্ধন।

তুমি গ্রাম, তাই তোমার ধরণী এত শ্যামে শ্যামে ভরা।
নয়নাভিরাম তুমি, তাই আঁখি জুড়ায় তোমায় ধরা॥
বাজাইলে বাঁশী তাই তান দিয়া,
এই নিখিলের হৃদয়ে পশিয়া,
কূজনে গুঞ্জে ভরিলে আজো মানবের মনোহরা।
রাগে রাগে তুমি খেলিছিলে খোল,
ফাগুনের বনে তাই হিল্লোল,
রাগে রাগে তাই অশোক পাটল শোভা লালে-লাল-করা।
গোকুলের ধূলি তরিলে হরষে,
তাই এত স্নেহ চুরি যায় মনে,
তাই গেহে গেহে ঐ পায়ে পায়ে প্রেমের শিঞ্জনি পরা॥

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া খাঁটি ভাণ্ডারস বিতরণ করা হইবে—যে-রস সর্ব্বকালের রসিকসমাজ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা মানুষের জীবনের এবং বাংলাভাষার ভাবারসও বটে। একালের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সম্ভাবের পরিচয় নাই। 'রঙ্গদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই: পরে সূচি-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

(১)

প্রেম

যে প্রেম — হে সুধার প্রবাহ-আধার!
অবিচিন্ত্য অবিতর্ক্য মহিমা তোমার!
আনন্দ-বাসন-ভয়-আকর্ষণী-প্রায়! —
যার ঘোরে মর্ত্য পরে,
স্বর্গসুখ পায় করে;
যার আকর্ষণ-বলে কেহ না এড়ায়; —
কি বাহুল্য-পাশ! — বিশ্ব বাঁধা যার বাঁধে!

কেন ওতপ্রোত লোত মাঝি দেখি আর,
গড়ায়ার সমভাবে সমকালে যার; —
দান-প্রতিদান দেখি অকৈ-লক্ষণ;
যার দাস হয়ে রই,
তার আমি প্রভু হই;
দেখি, দেখা নেই — দুই অস্তিত্ব কেমন! —
পরস্পরে দেখামুখ মুকুরে যেমন!

হেন যোগাযোগ কে বা না করে আশ,
নিজ দেহে খাতি, তরি পরদেহে বাস।
এককালে দুদেহে মুকুলে অধিষ্ঠান! —
এত প্রয়োজন যাহা,
অন্তের কামনা তাহা;
এতে দিতে, নিতে অন্তে আশ্রয় সমান।
মা উঠিবে পিপাসা সহসা আজিকার!

---

(২)

প্রাণের ভুল

জ্যোতির প্রবাহমাঝে
বিশ্বচিত্তবাহিনী তরঙ্গ!
কে তুমি লাবণ্যলতা ঘূর্ণি-ঘূর্ণিমা!
চল চল হাসি হাসি,
বিলাও অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা!

আচম্বিতে এ কি খেলা!
নিবিড় নীলমালা!
হা হা রে লাবণ্য-বালা লুকাল, লুকাল!
এমন ঘুমের ঘোরে
জাগালে কে জোর করে',
সাধের স্বপন আহা ফুরাল ফুরাল!

বসন্তের অবসান,
ঘুমের স্বপন ভাল,
মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন-সুন্দরী,
মনের মুকুরতলে
পশিয়ে হৃদয় ছলে,
কত কত নীলা-খেলা, কতই লহরী!

কেন এ কি আলো এল!
কই কই কোথা গেল!
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার?
কে আমারে অবিরত
খেপায় খেপায় যত,
জীবন-কুসুম-লতা কোথা রে আমার!

তবে কি সকলি ভুল,
নাই কি প্রেমের মূল,
বিচিত্র স্বপন-ভুল কল্পনা-লতায়?
যবে কেন জনে জানে,
প্রাণ কেন প্রাণে টানে
আদরে পশিতে গলে সেই দুরাশায়?

শত শত নর-নারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি, —
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি?
হেরে ছায়া-নিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি!

ফুটিলে প্রেমের ফুল,
ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল ;
সেই স্বর্গ-সুধা-পানে
কত যে আনন্দ প্রাণে,
অবাধিক প্রেমিকে তা জানেন কেবল।

কি এক তারেতে জোর,
কি যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে চলিয়ে পড়ে নয়ন নয়ন ;
গলে গলে বাহুলতা,
ভঙ্গিমা-ভূষিত কথা,
মোহে মোহাবেশে-ভাসে গদ-গদ মন !

এ ফুল প্রাণের ফুল,
স্বর্গে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-ঝরণী ;
এ এক নেশার ফুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্র-ভূষা দেবী যোগেশ্বরী !

(৩)

মনোমোহন

আমি বুঝি, তুমি কেন ধরণী-প্রভাতে
আনমনে শখ তুলি' গিয়া, —
আমারি আঙিনা-মাঝে আসি যাও চলি'
ক্ষণকাল, মুহূর্ত থাকিয়া।
তুমি নাহি বুঝ, প্রিয়, সে শুভ-প্রভাতে
মুখটি সে নিভৃত তখন, —
কখন-সখেতে যেন পাখী উঠে গাহি' —
"আসিলে কি হে মনোমোহন !"

আমি বুঝি, তুমি কেন, হে চির-সুন্দর !
মিছামিছি ফুল-তোলা ছলে,
বিনত, বচন-হারা, আসি যাও দেখা
এ বিজন তমালের তলে।
তুমি নাহি বুঝ তব কুসুম-চয়নে,
হৃদয়ের সত্য করিবারে —
বহনে কে দিল কেবা এ মন-হরণে
প্রণয়ের পাগল-নিঝরে ?

মন-মেঘে ভরা নভ, আমি জানি তার
মন আজি করিছে কেমন —
কে কারে খেলিয়া ভ্রমে মনে-উপবনে,
কে করিছে মীরবে রোদন !
তুমি শুধু জান সখে, সহকার-সাথে
মাধবীরে দিতে জড়াইয়া —
মন হ'তে মনান্তরে ঘুরিতে-চকিতে
ফিরিবারে বেণু বাজাইয়া !

(৪)

রুক্মিণী-প্রেম

সে এক রুক্মী বড় দুঃখী! —
নদী-তীর-পথ ধরি'
ধর-বস্ত্র ভাসি' চলে' যায় কবি,
সাথে তার সহচরী।

শান্ত আকাশে তারকার-বেশে
তাকায় ইন্দুলেখা,
অদূরে তার পূর্ব-প্রান্তীয়
তমর-বরণে আঁকা!

ঘোর শ্যাম নীর দ্বারে
কাঁপিছে নদীর জলে,
প্রান্তর যেন স্থির-সুপ্ত
চন্দ্রকলার তলে।—

কল্পনা-রাণী খুলে দিল কোন্
স্বপনের ভাণ্ডার,
তাই-বীথিকার ছন্দ-মাধুরে
ভুলেছিল আবার।

কেন অকাজ — তন্দ্রিমা-ভরে
কোন্ দুঃখ-বিভোরী
রজনীর সেই চাঁদেরো তলে,
ফুকারিল বাঁশরী!—

কেন্দে উঠে দূরে অরণের রথ
নিশীথের আঙ্গনায়!
ধীরতা যেন মূরতি ধরিয়া
নিহরিল বাঁশীতায়!

সেই মুহূর্তে পশ্চাৎ হ'তে
ডাকে কারে রুক্মিণী —
'আর কেন দেরী? ফিরে চল ঘরে,
পোহায় যে বিভাবরী!'

'কেন ডাক মোরে! যাব কোন্ ঘরে?
ঘর নাই? এ যে পথ!
পথের জোছনা ভুলায় আমারে —
কাঁদে প্রাণ-পারাবত।

এস সহচরি, এস ত্বরা করি',
ধরিব না পথে আর —
তোমাতে আমাতে তরুণ বিভাতে,
অপার হইব পার।

কামা-তাপের শেষ-নীমানাতে,
সুন্দর পরিবাতে,
আত্মানের সাধনা-স্রোতে
সাঁতারিব হাতে হাতে!

কল্পকালের ধরণ ধরি'
নিবেদিব অঞ্জলি,—
সবিতা বাঁধিবে পক্ষ-প্রদীপ
ঘরে চির-উজলি'!

এখনি অরুণ পূর্ব-উদিত
রক্ত-অর্ঘ্য-ভূলে —'
বলিতে বলিতে রুক্মিণী-পাণি
নিল কবি করে তুলে'।

নিরিল তাহার অলক-প্রান্ত
অপরূপতম জ্যোতি,
তারকা-খচিত আকাশের পটে,
দাঁড়ায়ে রহিল সতী।

(৫)

বরনারী

পুরু ঘুম ঘন
পুরু জীবন ঘন
কাঁধে তুলে নদীকূলে এলে, বরনারী ; —
কেন বাঁধিলে না বাঁধে ?
বেলা পড়ে' এল বাঁধে,
চলিয়াছ ঘরে ফিরে' ভরি' আঁখিবারি।
না মোরে ডুবালে জলে,
না জাগালে লীলাছলে,
বুকে চাপি' কুতূহলে নিলে না সাঁতার।
কেঁদে' কেঁদে' গলা ধরে'
তুলিয়া তুলিলে মোরে
চাপিলে এ খালি-বুকে অশ্রুর পাথার।
পল্লীবধূর সাথি
আসে, হাসে, ভরে মাটি,
বাতাস ভরিল জল-তরঙ্গের সুরে, —
কূলে বসি' অধোমুখ
তোমারি ঘুচিছে দুখ,
কি সুখে ও কালো-আঁখি সারাবেলা ঝুরে ?

এখন চলেছ ফিরে, —
সম্মুখে আঁধার ঘিরে,
পিছনে সজল ছায়া বহে খর বহ ;
ঝিল্লীরা ঝঙ্কারে,
জোনাকী জ্বলছে ঘরে,
ব্যাঙা কাঁকালের তালে নূপুর দুখর।
আঁধারে খুঁজিতেছি মা —
এখনো কাঁদিছ কিনা,
ভরা এ কলস-ভারে মন ঝরে যায় ;
তোমারি চলন-ঘায়,
মোর জল ছলকায়,
ভিজিয়া ভিজাই হায় তব অভিবাস।

পথতলে পথরেখা
যায় কি না যায় দেখা,
এ পথে চলিতে এত ভয় কেঁপে উঠে ;
না ছোঁড়, লতায় বেঁধে
অপথে পড়িনু ফেরে,
না জানি কোমল পায়ে কত কাঁটা ফুটে !

আঁধারের ঝাঁকে ঝাঁকে
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদের কলসী-কাঁখে চলে বিভাবরী ;
বন-বাদু ফিরে পাশ,
হাস্নুহেনার ছুটে বাস,
বকুল কেলিয়া বাস ধীরে পড়ে ঝরি' ;
তুমি ও নূপুর-ধ্বনি
পথ ছেড়ে দেয় ননী,
পেচক উড়িয়া বসে পাশের শাখায় ;
থামি' দাঁড়ায় সরি'
দু'চোখে প্রদীপ ধরি',
বাদুড় ঝুলিয়া ডালে ঘুরিয়া তাকায়।
সুন্দরী, বল বল —
এ পথে কোথায় চল ?
মনে এ অছলা কারে মনে পড়ে ?
তোমারি জীবনে-বাঁধা,
তোমারি বাঁধনে-বাঁধা
কলস নামায়ে বল চল তার ঘরে ?

চিরদিবসের ক্ষেমা —
সে ঘরে কি ফিরিবে না ?
সন্ধ্যা কাঁদিয়া যেন কুটীরে যে তব ;
কাহারে চরণে চালি'
কামারে করিবে খালি ?
আজি রাতে তাকে তোমা কোন্ অভিনব !

যে-দূর ঐশ্বর্যের তরে
ওই ঘুরে চৈ-চৈ,
সে-ধনে কিনিতে হয় কাহার বিশ্বাস ?
চলিয়াছ বাঁধি' মোরে
ভাগ্যরথে যাদুডোরে
কাহার ভরসায় তোমা' সুজনের পাশ ?
যদি সে সুজন হয়
ও আঁখি আবার নয়,
যদি ও-বিশ্বাসে কাঁপে ক্রন্দন, —

তবে, নারী, যাও যাও
মোরে রেখে ফেলে যাও,
পথমাঝে খুলে নাও বন্ধবন্ধন।
আছে ছুটো পুরো হই,
যেথা সেথা পড়ে রই,
সে মোর বেদনাযদি, সহিতে তা পারি।
তোমার অন্তরায়
যায় যায় যদিবায়
শকতি নাহি যে আর — শোন, বরনারী !

(৬)

যদি

আমি যদি হ'তেম ভূপতি,
তুমি হতে অনাথা রমণী ; —
হাকালে আমার দ্বারে,
দিতাম যে একেবারে
তোমার চরণতলে সমগ্র ধরণী !

আমি যদি হ'তেম দেবতা,
তুমি যদি কেঁদে একবার
চাহিতে আকাশ-পানে ! —
আমি যে বিকল-প্রাণে
পড়িতাম স্বর্গ হতে চরণে তোমার !

তুমি যদি হইতে সুরূপ,
আমি যদি হইতাম নারী ; —
দেখিলে ও ম্লান-মুখ
পলকা হইত বুক,
শতকণ্ঠে বলিতাম, — 'আমি যে তোমারি !'

(৭)

দুটি কথা

কেহ বলে, পূর্ণশশী বিরাজে আকাশে,
তুলনা তাহার কোথা হিমাংশু-বিহনে ?
কেহ বলে, প্রিয়া-মুখ বিম্বাধর-রসে,
সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিম্বাধর-বিনে ?

কেহ বলে, প্রিয়া-মুখ ফুল্ল-কমলিনী,
শ্রীহার বিক্ষেপ হায় কমলে কোথায় ?
কেহ বলে, উষাসম উজ্জ্বল-বরণী,
অরুণী চাহনি কোথা গোধূলী উষায় ?

সবোপরি লোক আমি, উপমার ধটা
নাহি জানি ; নাহি জানি বর্ণনার ছটা ;
যদি মোর থাকে কিছু কবিত্ব-বড়াই,
অবাক্ ও মুখ হেরে — সব ভুলে যাই !
এই দুটী কথা আমি বুঝিয়াছি সার —
'চুম্বন-আশ্লেষ' মুখ প্রিয়ার আমার !

---

(৮)

একটি চুম্বন

দাও দাও একটি চুম্বন ! —
বিজনের উপকূলে সাগর-সঙ্গনে,
দুর্জ্জয় বাসনার মুখে　　ভাসাইয়া দিব সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন !

আর এক — এইটি-চুম্বন !
তোমার ও ওষ্ঠদুটি আসন্নী যামিনী জাগি'
পাঠিয়াছে কুসুমমা বল গো কাহার লাগি ?
দাও দাও একটি চুম্বন !
নববধূ আজো মোর　　লাজুক লাজুক ঘোর ! —
চক্ষু বুজি মাথা গুঁজি করিবে শয়ন।

পুলকের থরথর তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-রহস্যময় নীরব ভাষার ভাষা !
কপোত কপোতী-সনে
মম মধু-কুঞ্জবনে
থাকে যদি, সেইরূপ পরামর্শ করি' —
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠ উঠুক শিহরি' ।

---

(৯)

আদি-রহস্য

তোমার মধুর হাসে
তুচ্ছ জ্ঞান ছিলবাসে
চকিতে আসিয়া পথে নিহিতা অবনী।
আনুখানু কেশপাশ,
মুখে হাসি, চোখে ত্রাস,
লাজে টানে বক্ষোবাস আজীবন ধরি'।
সেই চাঁদ আধ চাঁদ,
সেই ফুল অরেণু'র,
আলোকে-আঁধারে সেই দূরে জড়াজড়ি!

তোমার কোমল স্পর্শে
পরাণ মুকুরে হর্ষে —
সহস্র নয়ন 'পরে ফোটায় উর্ব্বশী!
কিবা মুখ অভিরাম,
কিবা তনুলতা-ঠাম!
মুরছিয়া পড়ে আঁখি উহে পরশি!
কোথা উষা অতলস,
নির্জ্জন সন্ধ্যার-জল,
কোথা মন্দাকিনী-জল — স্বরগ আরসী!

তোমারি বিরহে কাঁদি'
ফেলে আমি কত সাধি,
খুঁজি কত পল্লবন, ডাকি দেবতারে;
চাঁদে ঘিরে' ঘিরে চাই,
হৃদয়ে আভাস পাই,
বাহুবন্ধে ছুটে যাই লতা-আলিঙ্গনে।
অন্তরহ হেরি ক্রোধে
ধরি বহু ভৈরবোধে;
অর্জ্জুন শনিগ্রহ ব্রহ্মি মনে মনে।

হে দেবি,
তোমারি চরণ-তলে
আজি আমি বিশ্ব ভুলে'!
আমারে না হেরে' রাধা কাঁদে উতরায়!
মধুবালা নিজ আঁখি
হেরে যম রূপরাশি,
রত্নাবলী লতা-কাঁসী গলে দিতে ধায়!
মহাশ্বেতা আসি' ঘরে
চির-ব্রহ্মচর্য্য তরে,
সাবিত্রী আমারে ঘরে' যমেরে তাড়ায়!

মূর্ছাতে চমকি' চাই,
বায়ু জল, নাই — নাই!—
পতিবিরহ-শোকে সতী জ্ঞানেরে ভুলল।
স্কন্ধে ল'য়ে মৃতদেহ
ভ্রমে ল'য়ে স্নেহ-স্নেহ,
শ্মশানে শ্মশানে ছুটি উন্মত্ত পাগল!
তালের কুটীর চিতে
পড়ে অঙ্গ পীঠে পীঠে —
পতি-প্রেমে দেবী তুমি, পীঠ তীর্থস্থল।

বিরচি' জগত-মাঝ
মমতায় মমতায় —
বুকভরা নিরাশার স্বপন-রচনা !
অশ্রু দিয়া যাদ দিয়া,
মনঃপ্রাণ নিঙাড়িয়া
তোমারি প্রীতার্থে, প্রিয়া, তোমারি কল্পনা !
সে তপস্যা সেরি' সেরি'
ঘুমে তব আঁখি-ঢেরী,
মরণ মধুর ভরি' — জীবন ছলনা।

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল-প্রেমের স্রোতে,
অনাদি-কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।
আমরা দু'জনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের
সাথে,
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে মিলন-মধুর রাতে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

আজি সেই চির-দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হ'য়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি —
একটি প্রেমের মাঝারে মিলেছে সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যার 'মণি-মঞ্জুষা'য় এই দুইটি ভুল আছে :— ১৩৩ পৃঃ, ডানদিকের ৮ পংক্তি — " মর্ত্য-ভূঁকে " স্থানে " মর্ত্য হুঁয়ে " হইবে। ১৩৬ পৃঃ, ডানদিকে ১১ পংক্তি — 'এল' স্থানে 'এল' হইবে।

বাঙালীর দুর্গোৎসব

এই রচনাটি স্বর্গীয় অনুরূপা দেবীর। ঠিক ২৫ বৎসর পূর্বে ইহা "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পূজা-সংখ্যা 'বঙ্গশ্রীতে' এই রচনাটি আমরা যে কেন পুনরায় প্রকাশিত করিলাম, তাহার কৈফিয়ৎ,—এই লেখাটি পাঠ করিয়া, পাঠক-পাঠিকারাই দিবেন।

আবার পূজো এসেছে; আশ্বিনের বাতাসে যেন পূজো মাখানো, শরতের নূতন রৌদ্র যেন পূজা ছড়িয়ে দিচ্ছে, মনের ভিতর সব ভাবনা, সব চিন্তা, সব কষ্ট-বন্ধের ভিতর থেকেও যেন কেমন একটা পূজা উঁকি-ঝুঁকি মেরে উঠছে। আবার পূজা — বাঙলা দেশের।

এ পূজা, শরতের এ দুর্গাপূজা, বাঙলার নিজস্ব পূজা, এ উৎসব — বাঙালীর নিজের। যেখায় বাঙালী, সেখায় দুর্গাপূজার এ আনন্দ। বাঙালী পাঞ্জাবে থাকলে পাঞ্জাবে দুর্গাপূজা, মাদ্রাজে থাকলে মাদ্রাজে দুর্গাপূজা, বলতে বাস্‌রাহ্ বিলাত যেখানেই বাঙালী থাকুক, সেখানেই দুর্গাপূজার সময় একটু আনন্দ না ক'রে থাকতে পারবে না। পূজার সময় বাঙলায় সবলেই বাঙালী; পূজায় বাঙলার মাড়োয়ারী বাঙালী, হিন্দুস্থানী বাঙালী, ভাটিয়া গুজরাটী বোম্বাই বাঙালী, বাঙলার মুসলমানও পূজায় আনন্দ করে, ইংরাজও আনন্দ করে। তাই বলছি, আবার পূজা এসেছে — আবার বাঙালা এসেছে। ইহাকে কেউ চাপিয়ে রাখতে পারবে না। তুমি হাজার দরিদ্রতার কাণ কর, হাজার নকলের অবতারণা কর, হাসির সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিলাতী হ'ক্ বাঙালার মুখে চোখে ফুটে যে আশ্বিন-হাসি শিশিরসিক্ত শেফালীর মত — শরতের পরের মত প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা-আপনি ফুটে উঠে, তার একটি পাপড়িও ছিঁড়ে ফেলবে, সেই বর্ষাধৌত নূতন জ্যোৎস্না-মাখান হাসি ঘুচে ফেলবার সাধ্য তোমার নাই।

ঐ শুন আবার বেজে উঠল পূজার ঢোল, আবার ঘরে ঘরে আনন্দরোল। বাজারে বাজারে কেনা-বেচার কি ভীষণ গোল! বাপের যত টানাটানি, কি-বহুরেই টানাটানি, পূজায় ভাবনা, পূজায় কষ্ট; কিন্তু ছেলে-মেয়েরা এসে আবদার ক'রে যদি না বলে — "বাবা, এবার আমার নূতন জামা, নূতন কাপড়, নূতন জুতা, নূতন চুড়ি হবে!" তাতে যেন আবার আরও কষ্ট। পূজায় কেনা-বেচা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে একটু খিটি-মিটি, একটু মান-অভিমান, একটু হাসি-কান্না, একটু দরদা-দরজা না হ'লে যেন সে মিষ্টি-কষ্ট আরও মিষ্টি হয় না।

জগদম্বাময়ী মা আমার, বাঙালীর ঘরকে মিষ্টি করতে, তুমি এই আশ্বিনে আশ্বিন মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিতে এসে দেবীরূপে, — জননীরূপে — কন্যারূপে বাঙালীর মনের মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ো।

কিন্তু এসে দিন, সেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, এই পূজার বাঙালার যে আনন্দের বাজার বসত, বাঙালার সহরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রান্তরে অট্টালিকায় পর্ণকুটীরে ঘাটে ঘাটে মাঠে মাঠে আনন্দের যে মেলা চলত, তার তুলনায় আজকালকার উৎসব উৎসবই নয়। সে সব উৎসবের উপর ভক্তি তুলে মনী-মক্ষ আলোড়িত ক'রে খেয়ে ফেলে; এখন ফেরের হিসাবে গোটাকতক ছোট-খাট ঢেউ উঠে যায়। এখন টাকার দাম কমে গিয়েছে, তখনকার চার আনার জিনিষে এখন দেড় টাকা দিতে হয়; ভক্তির পরিমাণও ক'মে পড়েছে। মনে এখন কেউ সন্তুষ্ট নয়; যে বছরে নূতন কাপড় নূতন জুতা পেয়ে আমরা ছেলেবেলায় আহ্লাদে আটখানা হয়েছি, এখনকার অনেক চাকর-ও সে রকম কাপড় পেলে মুখ সিঁটকায়। তার উপর আবার বেল-অবসেসনে আফিস ধরিয়ে মৌরাসে জমিয়ে দিয়েছে, এখন ষষ্ঠীর সকাল হতে না হতেই বাস ছেড়ে অনেক বাঙালী ছুটে বেরোয়; অষ্টমীর খিচুড়ীভোগ আনন্দ ক'রে খাওয়ার চেয়ে হাওয়া-খাওয়া এখন ওদের বেশী মিষ্টি লাগে; টেলিগ্রামে থাকে পাঠান বিজয়ার প্রণাম — পরিবারকে আনিবেন।

হায়-রে সেকাল! সত্য সেকালের সবই কিছু ভাল নয়, কিন্তু এই পূজার খেলায় সত্যি সত্যিই বলি, হায়-রে সেকাল! তখনকার পূজা এক একটা দিক থেকে দেখলে জাতির প্রাণে এক একটা ভাব যেন ফুটে উঠ্‌তে দেখা যেত। মধ্যমী-পূজার কাল-ঘাটিতে আর বিজয়ার লাঠি-খেলোয়াড়-খেলাতে বাঙালীর প্রাণের বীরভাব বর্দ্ধিত হ'ত; আমমনী-গান শুনলে ও অন্নপূর্ণার পালে চাইলে বঙ্গ-নারীর প্রাণে মাতৃভাবের যে মধুর বিকাশ একটির হ'ত, আর সাদর আপ্যায়নে আদান-প্রদানে অন্যকে আনন্দ প্রদান ক'রে নিজে আনন্দিত হবার যে অতুল সুখ, তা ঘরে ঘরে অনুভূত হ'ত।

আহা, সে কি আয়োজনই ছিল! কি সে সব বড় বড় মহাসমারোহের সাজান, ঘড়ি-ঘণ্টা-ঠেসের কি সে ভক্তিমাখা ঝনঝনা! বাজারে বাজারে ঢাকি-ঢুলিদের কি সে উন্মাদ নাচন! ধূপ-ধুনার গন্ধে মুখরিত পল্লীতে পল্লীতে কি সে খাওয়া-খাওয়া, দাওয়া-দাওয়া! কলায়ের ও পশ্চিমের ব্রাহ্মণের আনন্দ, নূতন কাপড় প'রে ঘুরে ঘুরে ছেলেদের আনন্দ, নৈবেদ্য বইতে বইতে পাড়ার ছেলেদের বুকে-ভরে চাকরদের আনন্দ, দোকানে দোকানে পরিচয় বাবার আনন্দ, বাড়ি তোলে ক'রে ঠাকুরদালানে আনন্দ, বাড়ী বাড়ী খই-মুড়কী, নারিকেল-নাড়ু, পেয়ে ভিখারীর আনন্দ, মদ খেয়ে মাতালের আনন্দ, বড়বাজারে গাঁট কেটে চোরের আনন্দ, তাকে কেউ ধরিয়ে দিলে পাহারাওয়ালার আনন্দ, সে হাড় কখানা পালিয়ে গেলে, নিজের যে ধরিয়ে দিয়েছিলো, তাকে ধরেও পাড়েজীর মহা আনন্দ। আর, এক এক পূজা-বাড়ীতে এক এক রকম আনন্দ; কোন কোন বাড়ীতে অনেকের ছোটো কত রকম মজার ছড়া ঘটে গেছে; সেই রকম একটা মজার গল্প মনে পড়েছে, শোন তা বলি :—

জেলা ঠিক মনে আছে — পাবনা, কিন্তু গ্রাম-খানির নামটি ভুলে যাওয়াই সুবিধা মনে করছি। তবে গ্রাম সহর থেকে বেশী দূরে নয়; বরাবর পাকা রাস্তা। ইউনিয়ন অনেক লোকের বসতি। ব্রাহ্মণ কায়স্থ তিলি প্রভৃতি অনেক লোকের বাস থাকলেও গ্রামখানি বৈদ্য-প্রধান। গ্রামে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বৈদ্য থাকিলেও আমি যাঁহাদের কথা বলিতেছি, ইদানীং তাঁহাদের কেহ-ই জাতি-ব্যবসায় করিতেন না। সকলেরই কিছু জমী-জমা ও তেজারতী ছিল। আর 'বড় বাড়ী' 'ছোট বাড়ী' 'উত্তরের বাড়ী' ও 'পূবের বাড়ী'র মালিকেরা রীতিমত জমীদার ছিলেন। বড় বাড়ী ও ছোট বাড়ীর বাবুরা রায়-উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, আর উত্তরের ও পূবের বাড়ীর

কর্তারা তেমন-ই সহজ ছিলেন। তৈজসে সকলেই শক্তি-উপাসক, মদ্যপায়ী বৈকি; তবে বছরের পুর্ণ-পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ও-অঞ্চলে একটা কথা প্রচলিত আছে; সে কথাটা এখনও তখনকার লোকে তার মহাপুরুষদের বাটীর একটা কথা উপলক্ষ করিয়া ঐ অঞ্চলে তৈলমুখো-সাহেব ও অলৌকিক শক্তির অনেক গল্প করিত। সকল বাড়ীতেই দুর্গোৎসব ও জামাপুজা হইত, তাহাদের বড়-বাড়ীর দুর্গার সর্জাপেক্ষা বেশী। নবমীর দিনের চাউলের পরিমাণ দুই মণ, নৈবেদ্যের বিভিন্ন-সংখ্যক আনাজপত্রের ওজন প্রায় দশ সের; তদ্ভিন্ন উপকরণের তালিকা বৃহৎ। মোটা পুঁথির পিতায় নৈবেদ্যখানি বসাইয়া, পিতাটি একটি বাঁশের মাচে ঝুলাইয়া দুই জন জোয়ান ছেলেরা বাঁশের দুই দিকে কাঁধ দিয়া ঐ নৈবেদ্য পুজাস্থানে তার মহাশয়ের ভরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত। বলিদানের জন্য সরকারী বরাদ্দ ছিল, পাঁঠা দুটী ছাগল এবং পাঁচটি মহিষ — এ সকলের, বংশের মধ্যে বাড়ীর জ্যেষ্ঠের পাঁঠারোধ্য ও জোড়কলা-চিরের মালিক-স্বরূপ আর দশ বারোটি ছাগও ঐ দিন বলিদানের পথিক হইত; প্রসাদের জোড়ের অংশস্বরূপেও প্রতি বৎসর পনেরো ষোলটি ছাগও হাড়কাটের সাহায্যে বাঁড়ি-লোক প্রাপ্ত হইত। পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে দুইদিকে বারোটি করিয়া চব্বিশটি ডাব রক্ষিত হইত। ডাবগুলির অর্দ্ধেক ডাবীদের নিজের জন্য, আর অর্দ্ধেক জামাই বাড়ি। কর্তারা প্রত্যহ-ই ডাবের জল করিয়া উপাসনা করিতেন; বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে, অনেক উপাসক মিলিত হইয়া ডাবের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিতেন; আর দুর্গোৎসব ও জামাপুজার সময় ডাবের ঢেউ উঠিত। ছেলেছোকরাও সে সময়ে ডাবপানে আঙুল ডুবাইয়া জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিত, নিদেন কপালে-ও টিপ করিয়া পরিতে হইত।

দেবী-পক্ষারম্ভ ষোধনের দিন হইতে ডাবপান ও আগমনী-গানের ঘটা আরম্ভ। সকলেই গান করিতে ও গান গাহিতে পারিতেন। বাটীর কর্তা ও অন্যান্য বয়স্ক পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া, চাকর-বাকর, খানসামা, সর্দ্দার, পাইক, বরকী, দুঁইমালী, চাষী, চুলী সকলেই খাওয়া-পানে ও ভক্তি-ভরে আনন্দে উন্মত্ত হইত।

ষষ্ঠীদেবীর বোধনে পুজার সকল ইঁহাদের ভুলপ্রথা, সুতরাং দেবীকে বরাবর অনুযোগ দেওয়া হইত; এবং ভক্ত-ভক্তি, খাটির বা লোভে ব্রাহ্মণাদি প্রায় সকলেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ইঁহাদের বাড়ী প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন; কিন্তু অত পরিমাণ মহাপ্রসাদ তখনকার কালে সর্ব্বত্র সকলের ভাগ্যে ঘটিত না। কর্তার হুকুম ছিল যে, এমন বড় বড় পাঁঠা কিনে আনবি যেন তার পিঠে চড়ে বাড়ী আসতে পারিস। সে পাঁঠার লোভ পরিত্যাগ করা অনেক চাটুয্যে চক্রবর্ত্তী গাঙ্গুলি লাহিড়ী মহাশয়ের পক্ষে-ও দুষ্কর হইয়া উঠিত।

সে রকম ভূরিভোজন এখন আর দেখা যায় না; সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত সেই অভ্যর্থনা আপ্যায়ন, সেই সাদরে সুস্বাগত। তখন দুয়েকটি পূজাবাড়ী ভিন্ন গ্রামের অন্যান্য সকল বাড়ীতেই তিন দিন উনুন জ্বলিত না।

ঐশ্বর্য্যাভিমানে ও জাতিগর্ব্বে রায়মহাশয়েরা সকল সময়ে বড় বাড়া বাড়ি নহেন, মাথাটা সকল সময়ে একটু উঁচু করিয়া থাকিতেন; কিন্তু এ তিন দিন অন্য ভাব; এ তিন দিন গলবস্ত্র, জোড়-হস্ত, প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি, গুরু-পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণদের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত অতিথি কিঙ্করীদিগের সম্মুখেও কৃতাঞ্জলি। আমাদের জাতিভেদ আছে, কিন্তু সে জাতিভেদ পাতের, আতের নয়; এক পংক্তিতে আহার করিতে আমাদের আপত্তি, কিন্তু সর্ব্বজাতিকে অন্নদান করা আমাদের প্রকৃতি। তাই ব্রাহ্মণাদি নিম্নের নিমন্ত্রণে ভুলে-কাওরা, হাড়ী-বাগ্দী সকলেই

নিমন্ত্রিত, সকলেই এসময় পাইতে আসিত এবং শুভদিন ভক্তকাঞ্চন-কাত্তি ষড়ঐশ্বর্যমহাশয় নিজে জোড়হাত করিয়া তাহাদিগকে বলিতেন, "বাবা তোদের ঘর—এ কয়দিন নিজের বাড়ীতে গিয়ে যদি কেউ কিছু খাবি, তা হ'লে এ ঘরে আর তোদের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি থাকবে না।"

পূজার তিন রাত্রেই যাত্রা হইত; এক বায়নার অধিক কিছু হইবে বলিয়া মণ্ডপের সম্মুখে অঙ্গনে এক দলের গাহনা চলিত, আর বাহিরের বাগিচাবাগানের পার্শ্বে চালা বাঁধিয়া আর এক দলের গাহনা বসিত। যাত্রা শুনিতে কত লোক যে জমায়েত হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; দূর হইতে বড় বড় মহাজনেরা বিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। উকীল, মোক্তার, ডেপুটী, মুন্সেফ, এবন কি, জজ, কালেক্টার, ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব ও পুলিসসাহেবেরাও আসিয়া আমোদ করিতেন।

নবমী-পূজার দিন গ্রাম-মহিষকে অঙ্গন প্রাবিত হইয়া যাইত, অধিক রাত্রির 'কালন' পান করিয়া সকলে আনন্দে মত্ত হইয়া উঠানে গড়াগড়ি দিতেন এবং হক্ক মারিয়া কাশ-মাটী করিতেন। রক্তবর্ণ চক্ষু, রক্তসিক্ত বস্ত্র, রক্তাক্তদেহে রক্তচণ্ডী-মূর্ত্তিতে গভীর নাদে হুর্গানামে গাহিতে গাহিতে সকলে নদীতে স্নান করিতে যাইতেছেন; স্নানান্তে যেন একটু অবসাদ আসিত। আজ শেষ-পূজা, তাই সকলেরই মন যেন একটু ভারা-ভারা; কিন্তু সেই ভোজনের পাত পড়িত, পরিবেষণের সময় আসিত, অমনি আবার সেই আগেকার উৎসাহ, আগেকার আগ্রহ, আগেকার আনন্দ।

বিজয়ার প্রাতে যাত্রা-তাড়ার পর বাড়ী যেন একটু নিঝ'-নিঝ,' সব যেন কেমন একটু মলিন; মা'র মুখখানিও যেন একটু মলিন। যাত্রাওয়ালারা গোসা সাজ করিয়া শেষ বিজয়া-গান গাহিতেছে;—

"নবমীর নিশি বুঝি হ'ল অবসান;
আজি কেন হেরি মা তোর মলিন বয়ান॥"

অপরাহ্নে বিসর্জনের মুহূর্ত্ত। মণ্ডপ হইতে প্রতিমা উঠানে নামান হইয়াছে — সধবা স্ত্রীলোক, অন্তঃপুরিকাগণ বিবাহের পূর্ব্বে যেমনটি বরণ করিতেছেন, ঢাকঢোলে বহুলের বাজনা বাজিতেছে। বাটীর সম্মুখস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে পাইকেরা লাঠি খেলিতেছে, সেই লাঠিখেলায় অনেক ভদ্রলোক যোগ দিয়াছেন; বাটীর ছোটবাবু একজন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়, তিনি বৃদ্ধা হীরকর্দ্দিয়ের নাকরেন, এবং বেয়ান মহাশয় স্বয়ং তাঁহাকে অনেক তাক-তোক পাঁচ বাতলাইয়া দিয়াছেন। আর এক পাশে খেলোয়াড় ছিলেন পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভু ঠাকুর। সে লাঠিখেলায় কি ফুর্ত্তি, কি মত্ততা, কি আনন্দ! তিন চার জন পাঁকের সঙ্গে ছোটবাবু বাটীর পুরাতন বরকন্দাজ অবধ্যা নিস্তিরের সঙ্গে যোঝার খেলিতেন। সেই মেজ-বাবুমহাশয়, সেই ছোটবাবু, সেই শম্ভুঠাকুরের বাবুমহাশয়া এখনও বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু বোধ হয় বর্ত্তমানে কলা চট্টগ্রাইতেও তাঁহাদের আজুনে খিল হয়।

বাজনা বাজাইতে বাজাইতে, লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, নৃত্য করিতে করিতে, "জয় মা, জয় মা" বলিতে বলিতে, প্রতিমা নদীতীরে নীত হইত, সেখানে গ্রামের আরো অনেক প্রতিমা আনা হইত; বাজনাওয়ালা লোকজন লইয়া যে যার প্রতিমা নৌকায় উঠাইতেন; নদীবক্ষে ভাসমান নৌকাশ্রেণীর উপর সেই সকল সুসজ্জিত প্রতিমার প্রোজ্জ্বল দৈবশ্রী ভক্ত-বক্ষ ভক্তির বন্যায় প্লাবিত করিয়া দিত। বিসর্জনান্তে ঢোলে যেন জোরের চোল তুলিয়া শানাইয়ের করুণ সুরে সুর মিলাইতে মিলাইতে বাড়ী-প্রত্যাগমন, অনন্তরে বিজয়ার হুর্গানাম-লিখন, শান্তিজল-গ্রহণ, পরে পরস্পরের প্রণাম, নমস্কার, আলিঙ্গন। আঃ! কি মধুর সেই কোলাকুলি! জগতের কত ভিন্ন জন সেই দিনে মিলিয়া যাইত, কত বিবাদ-বিসম্বাদের মামলা-মোকদ্দমা, লাঠালাঠি, মারামারি বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গালী যেন শান্তির কাঙ্গালী হইয়া সেই শুভদিনে

একে ওকে সকলকে কুক টাকিয়া বকশা ভড়াইয়া ধরিত।

হালদারহাজরা বাড়ীর বেকারের পূজার কথা এখনও অনেক লোকের মনে আছে। এখনও তাঁদের ছিটার পূজা হয়, কিন্তু সে মুখরাগও নাই — সে আমোদও নাই, আর সকলে সেই প্রতিমার শোভাও নাই, অনেকদিন হইতে বটবাগনা করিয়াই পূজা চলিতেছে, কেন বন্ধ পূজা হইতেছে, তাহার কথা একটু পরে বলিতেছি, আপাততঃ এখন একটা হজুগের কথা বলি।

সকল হয় বলিয়াছি যে, নবমীপূজার দিন-ই সর্বাপেক্ষা মুখরাগ বেশী, সেই দিবসে বাজনা খুব উঁচুদরের অধিকারীরা বসিত। ঐ দিন সকল হইতে ইয়ার-বাক্সী হাকিমেরা এবং বড় বড় উকীল মোক্তার, সেরেস্তাদার পেস্কার মাঝীর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসরে উপস্থিত থাকিতেন। একবার নবমীপূজার দিনে কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ কোন অধিকারীর দল সন্ধ্যেবেলায় পালা গান করিবে। মণ্ডপের সম্মুখে উঠান আসর হইয়াছে, সারিবাদার বাঁধ সব গাঁথা হইয়াছে, চারিদিকে খাসে খাসে রোশনাই। আজ আর বেলের আলো নাই, সব মোমবাতির বাদ্যা; থালাদের সাজনের ছক ও তিনদিকের দারাদার অজাগত বিমন্ত্রিতগণ বসিয়াছেন, বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেরা কেহ বা অভি-মখমলের পোষাক পরিয়া, কেহ বা কোমরে কোঁচ-মারানো কাপড় জড়াইয়া, গায়ে ছিটের জামা আঁটিয়া গান আরম্ভমাত্রই আসরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সব আদিলে জাগিয়া উঠিবে। উঁহাদের একপাশে কয়েকখানি কেদারা পাতা, তাহাতে জজ, কালেক্টর, পুলিসসাহেব, ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি রাজপুরুষেরা বসিয়া আছেন, তাঁহাদেরও পান-আহারের বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং সকলেরই হাস্যবদন। যাত্রা খুব জমিয়া গিয়াছে, একজন ছোকরা মহিলা পোষাক পরিয়া মাথায় বিনা হাত নাড়িয়া গান গাহিতেছে, দুইদিকে দুইজন চমরধারী ছোকরাদের মুখের সম্মুখে দুইটিকে চমর ধরিয়া আছে; এখন যেমন থিয়েটারে অভিনয়কালে বড় বড় অভিনেতাদের মুখের উপর 'লাইম লাইট' নিক্ষেপ করে, সেকালে সেইরূপ যাত্রার গায়কদিগের মুখের কাছে মশাল ধরা হইত। ছোকরারা গাহিতেছে :—

"হরে আমারও মনস্ক যায় পঞ্চরাজ বলদে যাত্রার"

চারিদিক হইতে রুপাতে-বাঁধা সিকি, আধুলি, টাকা প্যালা পড়িতেছে, — বাহবা বাহবা! কেহ কেহ শব্দে অট্টালিকা মুখরিত, সাহেবরাও প্যালা দিতেছেন, কালেক্টরসাহেব-ও মাঝে মাঝে এক এক টাকা দিতেছেন; কিন্তু তাঁর মুখভাবে যেন অন্যমনস্কতা বৈরাগ্যের ভাব দেখা যাইতেছে। প্রথমে আসিয়াই যাত্রা শুনিবার জন্য তিনি যেরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও আমোদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন যেন ক্রমেই তাহা নিবিয়া যাইতেছে। সকল সম্প্রদায়ের দৃষ্টিই কালেক্টরসাহেবের মুখের উপর স্থাপিত, তিনি খুশী হইলে কর্মকর্তার জিনা সার্থক, তেমনি সকল লোকই তাঁহার খুশীতে খুশী; কিন্তু তাঁহার মুখে হাসি না দেখিয়া কি বড়-মানুষমহাশয়, কি বাড়ীর বাবুরা, কি জেলুটী-উকিল-মোক্তার ও অন্যান্য লোক, সকলেই যেন মনমরা হইয়া যাইতেছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। তিনি যখন অল্পেটরূপে দুইবার সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন সেখানে একবার বারোয়ারী পূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া নিমাই বাবুদের 'ব্রাস্ক-বন্ড' যাত্রা শুনিতে যান। সে যাত্রায় তিনি বস্তুতঃ মানুষ দেখিয়া আশ্চর্য্য হন। মাথায় উপর একখানি থালা বাজিয়া তাহার উপর একটী প্রজ্বলিত প্রদীপসমেত পিলসুজ বসাইয়া ছোকরার অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া খুব আকৃষ্ট করেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা খুশী হন, যাহিরা দুইপেগ খান ও প্যালা বৃষ্টি করিতে থাকেন — সেই সময় হনুমানের লেজ ও লম্ফ-ঝম্প দেখিয়া। পরবার পূজা-কালেক্টার

হইয়া তিনি প্রায় সাত আট মাস আসিয়াছেন এবং শুনিয়াছিলেন যে, বাজের বাড়ী পূজার সময় যাত্রা শুনিবার জন্য সাহেবের প্রতিবৎসর নিমন্ত্রণ হয়; সেই অবধি তিনি হনুমান দেখিবার আশায় মনে মনে বড় আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং হনুকে বখ্‌শিস দিবার জন্য আজ অনেকগুলি টাকা পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু বেহ্‌লার উপর গাহনা চলিতেছে, এখনও হনু আসিল না দেখিয়া, তিনি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মেজবাবু আসিয়া চেয়ারের পাশে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন ও হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "হুজুর! হামি যাত্রা, ইস্‌ ইট্ ফিল্ ইজ্ দর্জিলিঙ্!" সাহেব বলিলেন, "ওয়েল, ওয়েল, তোমার ইজ্ হনু?"

মেজবাবু কথার ভাবার্থটা ঠাস বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময়ে একদল পোষাকপরা খানসামা একখানি বড় ছপায় খাবার করিয়া শুটকতক ফরাসী 'ফারণ'-পূর্ণ কাচের গ্লাস আনিয়া সাহেবদের সম্মুখে রাখিল, সকলেই এক এক চুমুক পান করিলেন; কালেক্টার সাহেব যেন একটু বেশী করিয়াই গলায় ঢালিয়া দিলেন, তখন আবার গানবেনো হাসি-গল্প চলিতে লাগিল। অনেক পরেই কালেক্টার সাহেব জোর গলায় বলিলেন, 'বহু, ভরো, বহু, ভরো!' অকস্মাৎ কালেক্টার সাহেবের হুকুমে প্রেসিডেন্সি প্রসব-বেদনা বন্ধ হয়, এ ত' যাত্রা! একটা ছোকরা তান তানে হাত দিয়া তান ধরিয়াছিল, "বসন্তী — ই — ই — ই — ই — ই —" সে তানে দীর্ঘ ই তুলিতে তুলিতে, নিজে চুপ-টি হইয়া বসিয়া পড়িল। গাওনা বন্ধ হইল, সকলেই স্তম্ভিত — শঙ্কিত!

চুপ-চেম্‌ড়ী তাড়াতাড়ি বালাম হইতে নামিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধ হয়েছে?" সাহেব বলিলেন, "হনু কাঁহা — হনু লাও।"

চেম্‌ড়ী বলিলেন, "এ বল-ধরন্তরীর পালা, ইহাতে হনু নাই।"

সাহেব বলিলেন, "বাবু, তোম ঝুট বোলতা। নাসেরাইমের হাম নেই মালুম — হনু লাও, হনু বেগর যাত্রা হোতা? হনু লাও!"

চেম্‌ড়ীবাবু তখন রায়মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "মশাই, সাহেব ত' বড় চটে' গেছেন, হনুমান না হ'লে ওঁর কোন মতেই চলবে না।"

রায়মহাশয় বলিলেন, "উপায়? এমন জানলে রাম-যাত্রার পালা যারা গায় তাদেরই আনাতুম, এখন কি করা যায়?" চেম্‌ড়ী মুহুরী প্রভৃতি পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থির হয় না। যাত্রা বন্ধ; সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় বোসজোবিন্দ মোক্তার পরামর্শ দিলেন যে, "এর আর ভাবচেন কি, বলুন না অধিকারীকে একটা বাকে রোঁয়া লাগে টাগে, পরিয়ে মুখে একটা মুখোস দিয়ে আসুক, খানিকটা হুপ্ হাপ্ ক'রে লাফিয়ে টাফিয়ে চ'লে যাবে, সাহেবও খুসী হবে — সব দিক বজায়ও থাকবে।"

অধিকারীকে ডাকা হইল, তিনি বলিলেন, "এত রাত্রে হনুমান পাই কোথায়?" কর্ত্তা বলিলেন, "যাকে হোক একটাকে খাও না লাগিয়ে, আমি না হয় তাকে আলাদা বখ্‌শিস্ দেব, বুঝ না, — কালেক্টার সাহেবের হুকুম।"

অধিকারী বলিল, "আজ যা হয় একটা লঙ্কা-টঙ্কা দিয়ে বা কাপড় পাকিয়ে ক'রে দিন্, কিন্তু মুখোস পাই কোথা? আমাদের পালায় ত মুখোসের দরকার হয় না।"

মোক্তার বোসজোবিন্দ বলিলেন, "আরে, টিকে — টিকে! মুখে টিকের গুঁড়ো মাখিয়ে-তার উপর চুন-সিঁদুরের মোটাকতক ফোঁটা দাও, দিব্যি হনুমান হবে।"

কি করে? যে মুটেটা যাত্রাওয়ালাদের সাজের ঝাঁকা মাথায় ক'রে এনেছিল, অধিকারী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকেই হনুমান সাজিয়ে দিলে। এ বাড়ীতে যাত্রার দলের অন্যে অনেকেই কিছু কিছু

তাহার প্রাণে সুখ দিতে কিংবা দুঃখিত করিতে বড় একটা দেখা যায় না। দুইবার কে যেন হাত ধরিয়া আর কেহটা টানিল না, হপ্-হাপ করিয়া লম্ফ-ঝম্ফে বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল ও সুখ বিতরণে লাগিল। কালেক্টার সাহেব আড়ালে আউরাণা, — টাকার উপর টাকা পালা দিতে লাগিলেন। হুজুর যখন খুসী হইয়া পালো দিয়েছেন, তখন বাড়ীর কর্ত্তা ও বাবুদিগেরও সঙ্গে সঙ্গে পালা দিতে হইল, মেয়েদের ঝিকের ঝিকের হইতেও উঠানে পালা পড়িতে লাগিল। সাহেব বা কিতে লাগিলেন, "আউর হুনু, আউর হুনু দাও।" মেজোবাবু সোৎসাহে বলিলেন, "অধিকারী, আর একটা হনুমান বের কর, সাহেব বলছেন।" তার পর আর একজন হনুমান সাজিয়া আসিল। সাহেব হাঁকিতে লাগিলেন, "আউর হুনু, আউর হুনু দাও"। ক্রমে দুটো তিনটে, পাঁচটা; বল চাপকান খুলিয়া হনুমান সাজিল, সবারই বাড়ী ফেরিয়া লাফ পড়িল, নাচিয়েদের আর ঘুঙুর খুলিতে অবসর হইল না, মুখে কালি মাখিয়া লাফাইতে লাগিল; বেহালাওয়ালা বেহালা ফেলিয়া, চুলী ঢোল রাখিয়া, দুটী ফেঁড় পরিয়া হনুমান হইল, আর সাহেবরা "আউর, আউর" করিতে লাগিল; শেষে অধিকারী নিজে হনুমান সাজিয়া উঠানের এক কোণে স্থিত একটী পেয়ারা গাছ হইতে এমন এক লাফ মারিল যে, একেবারে হুপ্ করিয়া পুলিস সাহেবের কোলে পড়িয়া গেল, কালেক্টার সাহেব তার হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। কোথায় বা মনের মনমন, কোথায় বা মনমন্ত্রীর রোল, কোথায় বা সেই গান —

"মহারাজা বল লক্ষ্মণ হারাল, রাজ্যও হ'ল —" উঠানময় কেবল কালো মুখ, হাঁড়ির ন্যায় আর হপ্-হাপ।

সাহেবরা খাদ্যের উপর রাত্রি চারিটা কাটাইয়াছেন, হনুমানদলের লাফ দেখিয়া, "পূর্ব্বকথা স্মরি" তাঁহারাও লাফাইতে আরম্ভ করিলেন। সাহেবের বাড়ে আর আমাদের দাড়ে প্রভেদ বড় কমই; তাহার উপর দেশী বিলাতী কাহার আহারে রীতিমত চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে আফ্রিকার ন্যায় লম্ফ-ঝম্ফে সকলকেই পরাজয় করিল — উঠানে কেবল লাফ। পঞ্চাশ পঞ্চাশটা হনু লাফাইতেছে, হাতে হাত তুলিয়া সাহেবরা লাফাইতেছেন, শামলা মাথার বেতুলী লাফাইতেছে, ধুঁচি দুলাইয়া দরোগা লাফাইতেছে, হাসিবার ঠেলা করিয়া মুন্সেফ লাফাইতেছে, সেরেস্তাদার পেস্কার নাজির মহাশয় পেয়াদা আর্দ্দালী বাড়ীর কর্ত্তা বাবুরা — পাক-ধর্ত্তার খানসামা সবাই লাফাইতেছে, আর দুলী ঢাকীরা বাজাইতে বাজাইতে উচ্চ-লম্ফে নৃত্য করিতেছে। ছেলেগুলা আগেই উঠিয়া যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল; লজ্জা অনেক মানা করিলেও স্ত্রীলোকেরও ত একটা সহ্যের সীমা আছে, কে সে মানা শোনে! ঝিকের কাঠির ঝাঁক শিরা বাহাকটের তলহাত প্রকাশ্য ভাবে প্রচারিত হইল। এ বাড়ীতে প্রায় ৭০ বৎসর পূজা হইয়া আসিতেছে, প্রতি বৎসর বাজনাও হইতেছে, কিন্তু এমন ডিমোক্রাটিক বাজনা কখনও হয় নাই।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সাহেবরা আমোদ শেষ করিয়া বিদায় হইলেন। সেরস্তাদের ছোটে বড় রায় মহাশয়ের ভাবে ভঙ্গীতে মাথা ধরিয়া গেল, যাইবার সময় কালেক্টর সাহেব বৃদ্ধকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি তাঁহাকে ইয়ার রাখিবেন।

তখনও যোহদে যাল ছিল, দুইবার দেশী বাকির ও উকীল মোক্তারদের মধ্যে অনেকেই ভোর পর্য্যন্ত সাহেবের কৃতার্থ করিলেন।

এখনও বোধ হয় পাথনায় দু-পাঁচজন প্রাচীন লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা ইয়াক-বাঙ্গালী-হনু-পিক্‌নিকের এই আনন্দোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এবারকার সাহেবের বাড়ীর পূজার গল্প এক বৎসর ধরিয়া চলিল। পর বৎসর আবার পূজা। মহীপালে মুখার্জ্জের বাড়ী, সেইখানেই প্রতিমা প্রস্তুত হইয়া হু-

নেওয়া ও সাজ পরানো হয়। এঁর নিজ গ্রামে বাটীর কর্ত্তা, গুরুদেব, পুরোহিত, আত্মীয়-স্বজন, বাড়ীর গ্রভৃতি সঙ্গে লইয়া গাঙে যান ও তথা হইতে নৌকায় উঠাইয়া প্রতিমা বাটীতে আনেন, ইহাই ইঁহাদের কুল-প্রথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রতিপদে বোধন আরম্ভ হইতেই ঢাকের চলিতে আরম্ভ হয়; ক্রমশঃ বাদ্য মাত্রা বাড়ে; গভীর রাত্রে কেহ আর শয্যাগ্রহণ করেন নাই। ভোর অবধি আগমনী গান ও কীর্ত্তন চলিয়াছে; প্রাতে মুখপ্রক্ষালনাদির পরে আবার সকলে বীরাসনে বসিয়াছেন; গুরুদেবের পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, স্কন্ধে উত্তরীয়, মস্তকে বৃহৎ রক্তাক্ষের মালা, চক্ষু রক্তবর্ণ, কেশ, দীর্ঘ-কেশ, দীর্ঘ-গোঁপ পাকান। তিনি বোধন করিয়া দিয়াছেন, সকলে পাত্রের পর পাত্র গলাঃকরণ করিতেছেন। এরূপ বেলা দশটা বাজিল, পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, আর সময় নাই; তখন কাঁ কাঁ ভড়্ ভড়্ কাঁ কাঁ ভড়্ ভড়্ সিঙ্গা সিঙ্গাড়্ সিঙ্গা সিঙ্গোড়্ সিঙ্গা সিঙ্গোড়্, তাব্ তাব্ সাঁই, তাব্ তাব্ সাঁই—ঢাক-ঢোল কাড়া-নাগরা একসঙ্গে ঊর্দ্ধে বাঁশী বাজিয়া উঠিল; ভ্যাং ভ্যাং ভ্যাংোং ভ্যাংাং ভ্যাংোং ভ্যাং; ঢং — ঢং — ঢং ঐসের বাজিতে লাগিল; অম্বরে শব্দধ্বনি উঠিল :—

"গা তোল গা তোল বাঁধ মা ঝুঁটি,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী"

বাজিতে বাজিতে সকলে প্রতিমা আনিতে যাত্রা করিলেন।

বাহুদের প্রতীক্ষায় প্রতিমাকার আপন বাটীর উঠানে এক খানা আল্পনা চাঁদোয়া তাহার নীচে সতরঞ্চি মাদুরাদি পাতিয়া রাখিয়াছে। ঢুং-শিল্পী জানিত যে, অধিবাসী মেয়েরা কর্ণ নাসিক করিয়া বাজাজি মহাশয়ের হাত হইতে প্রতিমা ও অন্যান্য কুমার-মহাশয়ের দাম-বন্দরী আদি ঘরে নিয়া আসার করিতে ঢ'ঘণ্টার ভিন ঘণ্টার লাগিতে পারে বটে, কিন্তু আজিকার পাওনাতেই তাহার যথেষ্ট লাভ। আজ তাহার জন্য প্রত্যেক প্রকার তরকারী ও হাঁড়ি করিয়া দৌহিত্র দিয়া আসিবে; চাউল, ডিম, চার রকম দাইল, ছাতার মসলা, তরকারী, আনাজ, লবণ, ঘৃত, তৈল, চিনি, গুড়া, দধি সহ তাহার নিজের ও পরিবারের সকলের কাপড় আর নগদ আটটী টাকা; সে আরও জানিত যে, বাজাদের প্রথানত এই উঠানে আজ একটি ছোটখাট মজলিস বসিবে, বাজনা বাজিবে, আগমনী গান হইবে, কাজও চলিবে এবং সেও তাহার প্রসাদ পাইবে। এজন্য সে তুলিটি লইয়া প্রতিমার চক্ষের নিম্নেরেখাটি আরও পরিষ্কার করিয়া দিল, মস্তিষ্কবিনির্ম্মিত অলঙ্কারগুলির উপর যে সোনার পাতলা পাত বসাইয়াছিল, শুষ্ক বস্ত্রখণ্ডের খোপ দিয়া দিয়া তাহা ভাল করিয়া বসাইয়া দিল, এবং সেই সময়ে তাহার মূর্ত্তি চোখ-চকোর মেলে প্রবেশ করিয়া তাহার দুই-মুখ-ভরা শুঁটকির আশা ও আনন্দের হাত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। বাজনার শব্দ অতিক্রম করিয়া "মা" "মা" রব করিতে করিতে ছায়-বাড়ীর কন্যা শিল্পীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে তুমিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাকার সকলকে প্রণাম করিল। "কেমন জলধর্, সব মঙ্গল ত"? বলিয়া কর্ত্তা তাহার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জলধর্ জোড়হস্তে উত্তর করিল, "আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে ছেলে-পিলে নিয়ে একরকম বেঁচে আছি"। চালার ফিরিয়া গিয়া সকলে প্রতিমা দেখিতে লাগিলেন এবং বাঃ! বাঃ! চমৎকার! চমৎকার! বলিয়া উঠিলেন; অম্বিকা ভক্ত বলিলেন, "দেখেছ এরই মধ্যে মা'র মুখখানি হাসছে!" নিতাই ভক্ত বলিলেন, "আরে এ ঠাঁ আর ছোট-বাড়ীর মত বিবিয়ানা মুখ নয়, আমাদের বড়-বাড়ীর প্রতিমার চিরকালই দেখীমুখ হয়ে থাকে।" বনমালী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ওরে বাপু ভক্তি — ভক্তি, ভক্তি চাই, বড়বাড়ীর ভক্তি কত! সেই ভক্তির জলধরের হাত

দিয়ে তখনকার অবস্থার পরিচয়টুকু শেষ দিয়েছেন ;—

(দূরে) "এল বুঝি তারা যারা এল গিরিরাজ
নিমন্ত্রণে।
অনুনয়ে তার যারা এল গিরিরাজ
আজ ঘরে"।

কর্ত্তার দু-বচনে অভ্যর্থনা বিলম্বিত হইল। গুরুদেবের মতলবটুকু বিলিয়া উঠিল, সকলে গিয়া উঠানে উপস্থিত হইলেন ; ইতিমধ্যে একটি কুম্ভ একটি ছোট কলসী সেইখানে রাখা হইল, কর্ত্তা সকলকে গুরুদেবের সঙ্গে করিয়া বলিলেন, "প্রভু, নিবেদন ক'রে দিতে আজ্ঞা হোক্।"

গুরুদেব গম্ভীরভাবে একটি নারিকেলের মালার কাছে চালিয়া ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিলেন এবং সেই নিবেদিত সুরা কিঞ্চিৎ নিজে পান করিয়া প্রসাদ কর্ত্তার হাতে চালিয়া দিলেন ; তারপর সকলেই প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। তখনও অক্ষয় গিয়া পৌঁছায় নাই গিয়া চাঁচড়ার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, মিতাই দত্ত বলিলেন "আরে পাল মশাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? এ প্রসাদ নাও, আজ যে তুমিও সজ্জন।" পাল মশাই একটি কাল-পাথরের বাটি আসেই জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, কর্ত্তা তাহে একেবারে প্রায় আধসোরা হাল ঢালিয়া দিলেন। পাল আবার গুরুদেবের ও কর্ত্তার পদধূলি গ্রহণ করিয়া এক চুমুকে তাহাটুকু কণ্ঠাধঃকরণের জন্য উপরমুখো প্রেরণ করিল। বেড়ার বাহিরে গাবতলায় লোক-জনের ও বাদুকরেরা আসর জমাইয়াছে, কর্ত্তার হুকুমে তাহারাও একটা কলসী পাইয়াছে। আজ আনন্দের দিনে আনন্দময়ীর সম্মুখে আনন্দের মেলা ; তখন যাহারা অন্যকে আনন্দিত করিয়া নিজে আনন্দিত হইতে জানিত, অন্যের সুখ দেখিয়া আপনি সুখী হইতে পারিত, অপরকে হাসিতে হাসাইয়া আপনি হাসিতে সক্ষম হইত। আজ ধনিলার প্রজা কেহ নাই, সবাই জগন্নাতার সন্তান, জগন্মাতার চক্ষের সম্মুখে সবাই সমান, আজ আর ভয় পরিচয় নাই। দিনটা মেলা-মেলা ছিল, পানে গানে যে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, কাহারও হুঁস নাই। "ও দাদা, বেলা গড়িয়ে এল, আজ কি তুমি নাবা খাবা না ?" বলিয়া জগন্নাথের একটি ছোট নাতনী আসিয়া তাহাকে জাপ্টাজাপ্টি করাতে বয়স্যদী চক্রবর্ত্তীর হুঁস হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত — তাই ত, কালবেলা পড়্‌ল যে, চল্লুম মাকে নিয়ে ঘরে যাই"। আট জন ছেলে একটু দুলতে দুলতে এসে ধীরে ধীরে প্রতিমা কাঁধে তুললে। আবার দিক্‌লা দিক্‌লা দিক্‌লা বাজাতে বাজাতে সকলে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া প্রতিমা নৌকার উপর রক্ষা করিল। দুইখানি নৌকা পাশাপাশি বাঁধিয়া তাহার অগ্রভাগে প্রতিমা রক্ষিত ; সেই নৌকায় পুরোহিত মহাশয় উঠিলেন, তাঁহাকে একটু ধরিয়া তুলিতে হইয়াছিল, বাদুকরেরা ও অন্যান্য কতক লোক ঐ নৌকাতেই উঠিল, পার্শ্ব পানসীতে গুরুদেব, কর্ত্তা এবং নিকট আত্মীয়রা উঠিলেন, আরও তিনখানি নৌকা বোঝাই হইয়া গেল। বলিয়াছি সেদিন মেঘলা, রৌদ্র নাই, বেলা তিনটার সময়ই যেন সন্ধ্যার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। নৌকা কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ কেমন গুরুদেবের ভাব আসিল। তিনি গাহিয়া উঠিলেন :—

"মা হয়ে কেমন ক'রে তোরে দেব মা বিদায়।
ওলো পুরবাসী তোরা আনি মানা কর গো,
উমা যেন নাহি যায়।"

গুরুদেবের মুখে বিজয়া-গান শুনিয়া কর্ত্তাও তান ধরিলেন। ক্রমে কর্ত্তার পার্শ্বীয় গান শুনিয়া অন্যান্য নৌকার যাত্রীরাও বিজয়ার গান ধরিল, দুর্গার ঢোলে বাজনার বোল ফিরিয়া গেল। গুরু, পুরোহিত, কর্ত্তা, আত্মীয়, প্রতিবেশী, লোকজন,

নিশানওয়ালা, বাজুবন্দে, চাকি-বাকি সকলেই আসর কাজের গান ধরিয়াছে, তাহার উপর স্বয়ং গুরুদেব বিবাহের গান ধরাইয়া দিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে বিজয়া অনুষ্ঠান বিভ্রান্ত অকারণ নয়। নৌকাগুলি যখন প্রায় ঘাট পরিয়ার উপস্থিত হইয়াছে, তখন গুরুদেব নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গলুইয়ের মিওট দাঁড়াইলেন এবং জোড়করে গাঢ় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মা, চললি মা! এরই কি তোর দিবের উপর টান, তিনটে দিন বই রইলিনি? মা বেটী এবে যা, আবার আসিস্।" কর্তাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা গো, আবার বছর যে পুরে যেন যা! দেখিস্ মা, ভুলিস্‌নি অধম সন্তানদের, আসছে বছর যেন আবার দেখা দিস্।" সকল নৌকাতেই গুরুগম্ভীরে মা মা রব মুখরিত হইতে লাগিল, নানাই বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতে লাগিল; ঢোলেও করুণ রোল; পুরোহিত-মহাশয় একটু আচ্ছন্ন মতন হইয়াছিলেন, বিজয়ার বাদ্যে চমকাইয়া উঠিয়া ঢেউ ঢেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাঝির মাঝি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "অনুমতি হয় ত নৌকা গরিয়ে দি।" কর্তা তখন কোঁপাইতেছিলেন, মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মন্ত্রমুগ্ধ চক্রবর্তী বলিলেন, "দাও বাবা নায়েব দাও, মাকে বিসর্জন কর। মেয়ে হলে ঐ আমার চিরকালই আছে।" দুইখানি নৌকা দুই পাশে সরিতে লাগিল; মুক্তাহিরা, মুক্তাজিরা, অপূর্ণিতা প্রতিমা, শুধু ভক্তদলের আবাহ-কবির ভক্তির অঞ্জলি লইয়া, ধীরে ধীরে মধ্যস্রোতে নিমজ্জিতা হইলেন। নৌকা নিজ গ্রামের ঘাটে ভিড়িল,- সকলেই নিষ্প্রভ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, চক্ষে জল; যেন অবসাদে 'দামামো দামামো' বাজাইতে বাজাইতে ধলবল ঘাটিতে ফিরিল।

প্রতিমা আসিয়াছে মনে করিয়া অন্তঃপুরে অঙ্গনারা শঙ্খধ্বনি করিলেন, গুরুদেব পাশে চণ্ডীর ঘরে গৃহিণীরা উপস্থিত ছিলেন। ছেলে-মেয়ের দল উঠানে জড় হইয়া "ঠাকুর কৈ, ঠাকুর কৈ" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কর্তা একটি ছোট বাউনীকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "আয় দিদি, আগে ছোর সঙ্গেই কোলাকুলি করি।" বাউনী বলিল, "ও লক্ষ্মেশ্বরটা কে আজ কেন, সে ত শুক্কুরবার। ঠাকুর কত দূরে?" কর্তা বলিলেন, "আর ভাই এ বছরের মত মনকে প্রবোধ দিয়ে ঘরে যাই, বেঁচে থাকি—আবার আসছে বছর আসবে। বউমারা সবাই গেলেন কোথায়, দাদি তবে নিন; কই আমাদের বিশ্বেশ্বর-উমার জোড়ে করে রাখা হয়নি?" এই রকম সব কথা, সবার কাঁদ কাঁদ মুখ আর বিসর্জনের বাজনা—মেয়েরা চুপ-চুপ কই! একটি বছর আঠার বছরের ছাতিমপুর ঘাটের খুব ভিতরে, তাহার চৌদ্দ হাতোইয়ে কোন কালে জল যায় নাই, সে এক ডুবে পাঁচজনকে ছিপ্পাল করিয়া আসল কথাটা বুঝিয়া লইল, এবং অন্তরে গিয়া সাবাস দিল যে, বরীয় অভিপ্রায় অবধি প্রতিমা করিয়া তাঁহারা ঘটিতে লক্ষ্মী-রূপে প্রতিষ্ঠার বিলয় করিয়া আসিয়াছেন। মহা-অমঙ্গলের আশঙ্কায় অন্তঃপুরে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল; ইতিমধ্যে দুর্গানাথ সিদ্ধির জন্য বিশ্বেশ্বরী ঘাটের কাছে না পাইয়া এবং প্রতিমা বসাইবার জন্য যে আয়না চৌকী রচিত ছিল তাহার উপর জীবন্ত গুরুদেবকে মুক্তিমতে শায়িত দেখিয়া, কর্তা-ও গুরুদেবের মধ্যে মরন করিলেন; অবসাদ তখন সকলেরই শরীরে আসিয়াছে, যে যেখানে পাইল, শয়ন করিল। নিতাই শুন্ত ঘরে, নানাইজামা সিঁদিতে, চক্রবর্তী উঠানে—সব ঘুম; ঢাকী ঢাকে মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে, ঢুলী ঢোলকে কোল-বালিশ করেছে, নিশানওয়ালা ছোড়াটা ঈশান কোণে জড় হয়ে শুয়ে পড়েছে; সব ঘুম—সব নিঝুম!

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের পর কর্তার নিদ্রাভঙ্গ হইল, ক্রমে দুই একজন ক'রে সকলেই জেগে

উঠলেন, গৃহিণী চণ্ডীর ঘরের দরজার টাক থেকে কর্তার দিকে চেয়ে বললেন, "কি সর্বনাশ করে এলে!" কর্তা তখন প্রস্তুতিস্থ, কমলাকে কর্তব্যের উপদেশের মুখপানে চাহিলেন; প্রভু বলিলেন,—কমলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আপনারা ভাববেন না, যার ইচ্ছা হবে, এখন থেকে ঘরে পূজা দেবেন।" এর উপর কথা নাই। সেই অবধি ঘরে ঘরে দুর্গার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবধি ঘরে ঘরে দুর্গার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবধি ঘরে ঘরে দুর্গার পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

বাহি যায়, কোলাহল, জনতা-গুঞ্জন ;
সহাস-আননে নাই শাস্ত্র-আলাপন
নীরব কক্ষেতে বসি' জন দুইজনে
চেয়ে আছে পুত্র-দুটি সম্মুখে প্রসারি'।
নীরবে, ধ্যানমুখ — পুরোহিত যুগি ! —
কায়ের-বসনে বসি' আছে চোখ বুঁজি'।
সব যেন সুপ্ত ঠিক — আঁধার আঁধার !
শুধু মাঝে জ্বলে ধূপ ধূপ প্রতিমায় ! —
সোনার স্টেজ যেন আলোকের ফুল,
মণির দীপের কান্তি রোসনাই দুধে !
সবার গলাবাজা ! — শাঁখ ও সিঁদুর —
উজলা লোকের ছবি ! — জলে সিঁদুর।
কাজ নাই, ভেবে কেন — করিব না পূজা —
জনমে বিদ্যুৎ-হাসি — ওই দশভুজা !

পিঁপড়ার-মানুষে

(বিদেশী গল্প)

অনুবাদক :— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী

"উহারা যদি এ পথ ধরিয়া আসে, না আসিবারই বা কারণ কি, তবে জোর দুইদিনের মধ্যেই আপনার আবাদে পৌঁছিয়া যাইবে।"

লাইনিনগেন প্রত্যুত্তরে একটা মোটা চুরুট চুষিতে লাগিলেন; কোন জবাব না করিয়া চিন্তাকুল জেলা-কমিশনারের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবে চাহিয়া রহিলেন। শেষে ঠোঁট হইতে চুরুটটি নামাইয়া লইয়া সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া বসিলেন। পরে মৃদুস্বরে কহিলেন—

"আপনি মহানুভব, আমাকে এই সংবাদটা দিবার জন্যই আপনি সারাটি পথ লাইলেলে চড়িয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি যখন আশা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন, তখনই যে আমি আরও বেশি উৎসাহ বোধ করিতেছি। না মহাশয়, একপাল বন্য মহিষও আমাকে আমার আবাদ থেকে এক পাও সরাইতে পারিবে না।"

"লাইনিনগেন!" — জেলা-কমিশনার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আপনি উন্মাদ! আপনি কি মনে করেন তাহারা জন্তু, যে আপনি তাহাদের সঙ্গে লড়িবেন?—সে একটা অন্ধ-শক্তি—জলযানের মত। দৈর্ঘ্যে দশ এবং প্রস্থে দুই মাইল জুড়িয়া পিঁপড়ার সারি—শুধু পিঁপড়া আর পিঁপড়া। এক একটি যেন বুদ্ধিমান মানুষ; তিনবার গুলি ছোঁড়িতে যে সময় লাগে তাহারই মধ্যে উহারা একটি হৃষ্টপুষ্ট মহিষের সমস্ত মাংস খাইয়া হাড়গোড় মাত্র অবশিষ্ট রাখিবে। আমার কথা শুনুন, আপনি যদি এই মুহূর্তে এ স্থান ছাড়িয়া না যান, তবে আপনার ঐ আবাদের মত আপনারও কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না।"

লাইনিনগেন বিষণ্ণ-হাস্য করিয়া বলিলেন—"হাঁ, জলযানের মত, না আর-কিছু। আমি অসহায় স্ত্রীলোক নই যে এইরূপ প্রাকৃতিক উপদ্রবের জন্য পলায়ন করিব। তিন বৎসর পূর্বে যেদিন আমি এই আবাদ কৃষিভূমি স্থাপন করিয়া আমার কাজ সুরু করিয়াছিলাম, তখনই সকল সম্ভব-অসম্ভব দুর্যোগ সম্বন্ধে আমি ভাবিয়াছি; আজ, পিঁপড়া কেন, যে কোন বিপদের জন্য আমি প্রস্তুত আছি।"

লাইনিনগেন জেলা-সাহেবকে নদীতীর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন; সরকারী আহাজটি বোঝাই-বাঁধা ছিল। আহাজ ছাড়িয়া গেল। যতক্ষণ নদীর ঐ বাঁকে জাহাজটি অদৃশ্য হইয়া গেল; লাইনিনগেন বেশ তখনও উহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছেন—"আমি বলিতেছি, আপনি উহাদের জানেন না, চিনেন না!"

ঐ শহরের কাহিনী লাইনিনগেনেরও অজানা ছিল না, এবং আত্মরক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে-ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন, তাহাতে এই ঘনায়মান দুর্যোগ কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন নিশ্চয়ই। তাছাড়া, আবাদের তিন বৎসরের মধ্যে অনাবৃষ্টি, বন্যা, রোগ এবং আরও কত বিপদেরই না তিনি পড়িয়াছেন—কিন্তু বিধির সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা তিনি জয় করিয়াছেন; সেই দুর্দিনে আর আর আবাদীরা উহাদের কোন উপায় বা ব্যবস্থাই করিতে পারে নাই। ঐ নিরবচ্ছিন্ন একটানা সাফল্যের মূলে ছিল তাঁহার জীবনব্যাপী সেই কর্ম্মনীতির প্রতি দৃঢ় আস্থা—"মানুষের বুদ্ধির পূর্ণ জাগরণ হওয়া চাই, তবেই প্রকৃতিকে জয় করা যাইবে।" তাঁহার দৃঢ়

বিশ্বাস এই দুইয়ের উপরে তিনি যে কতটা শক্তিমান।

ট্রলি অপেক্ষা লাইনিনগ্রেডের উপরে কর্ণধারীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আর কাহারও নিকট এই খবর গোপন রাখার তিনি আবশ্যক করিলেন না। তাহাদের অনেকেই এই জেলার বাসিন্দা "ঐ পিঁপড়া আসিতেছে!" শুনিবামাত্রই তাহারা ভীত হইয়াছিল পলায়ন করিত। কিন্তু এখনই তিন লাইনিনগ্রেডের প্রতি তাহাদের আস্থা, উপরে জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি অবিচলিত ভক্তি যে, লাইনিনগ্রেড যেমন শান্তভাবে তাহাদিগকে ডাকিয়াছিল, তেমনই শান্ত ও স্থির হইয়া তাহারা প্রভুর দেওয়া সেই খবর ও আসন্ন সংগ্রামের নির্দেশ গ্রহণ করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সভাভঙ্গ হইয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরে দক্ষিণ দিক হইতে ভীত অন্তপক্ষের দ্রুত পলায়ন উপলক্ষে আনন্দ-ধ্বনি ঘোষণা করিয়া গেল,— চিরা ঘাস প্রভৃতি দিয়া অন্তগুলি সাবধানে বিষ্ঠায় ঢাকিয়া শাদা দিয়া সকল অস্ত্র হস্তদানের মত আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বিপক্ষ শ্রেণীর উপর দিয়া বিপক্ষদলে ছুটিয়া পলাইতেছে।

অন্যথা পিঁপড়া সারিবদ্ধভাবে পাহাড় বাহিয়া দ্রুতবেগে আবাসের অভিমুখে নামিয়া আসিতেছে; আবাসের চতুষ্পার্শ্বে যে জলপূর্ণ পরিখা ছিল তাহা হইতে কিছু দূরে বামে ও দক্ষিণে তাহারা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর নদীর দিকে যারা পড়িয়া তীর ধরিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

আবাসের তিন দিকে মোটামুটি সমান দূরত্বে তিনটি পরিখা খনন করিয়া রাখা হইয়াছে। যার দুই তীর এই গড় খনন করিয়া যায়, মানুষ এবং পশু সহজেই উহা পার হইতে পারে। সমস্ত প্রান্ত দুইটি নদীগর্ভে মিশিয়া আবাসের উত্তর ও চতুর্থ পার্শ্বের সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। আবাসের অধিবাসী কুমীরগুলি এবং অন্যান্য জন্তুগুলির মধ্যে একটি বাঁধ রহিয়াছে। ঐ বাঁধ খুলিয়া দিলে নদীর জলে পরিখা পূর্ণ হইয়া যাইবে। লাইনিনগ্রেড বাঁধ খুলিয়া দিয়া আবাসের চতুষ্পার্শ্বে জলের বেষ্টনী সৃষ্টি করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কেল্লা রক্ষার করিবার বুদ্ধি না থাকিলে পিঁপড়াদের আবাসে পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রথমে স্ত্রীলোক ও শিশু, পরে পশুর পাল নদীর বাঁধের উপর স্থানান্তরিত করা হইল। — অন্তধারীদের প্রস্থান পর্যন্ত তাহারা ঐস্থানে নিরাপদেই থাকিবে।

কুঠি বাড়ীটি যে উচ্চস্থানের উপর অবস্থিত তাহাকে বেড়িয়া যে আর একটা ছোট গড় কাটা হইয়াছিল তাহা আত্মরক্ষার নিমিত্তে বাঁধানো। সর্বশেষে লাইনিনগ্রেড সেই গড়টি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ঐ উচ্চভূমির উপরে আছে গোলাবাড়ী, আস্তাবল এবং আরও বহুরকমের কোঠাবাড়ী। অতঃপর তিনটি পেট্রোল-টাঙ্কের সমস্তটা গড় পূর্ণ করা হইল। কোন অলৌকিক উপায়ে পিঁপড়ার দল জল পার হইয়া আবাসে পৌঁছিলেও, এই "পেট্রোলের প্রাচীর" অবশ্যই অধিবাসীদের দুর্গ-প্রাচীরের মত হইবে। লাইনিনগ্রেড মনে মনে এই কল্পনাই করিতেছিলেন।

শত্রুদের সর্বপ্রথম বাধা দিতে হইবে বড় পরিখার ধারে; দলের পাকা ধরিয়া লোকগুলিকে ঘুরে ও নিকটে স্থাপন করা হইল। তারপর নিজের ঘরে ফিরিয়া তিনি সোলনায় শুইয়া তামাকের পাইপ টানিতে লাগিলেন। এমন সময় চর আসিয়া জানাইল— বহুদূরে দক্ষিণে পিঁপড়া দেখা দিয়াছে।

তখনই উঠিয়া লাইনিনগ্রেড ঘোড়ায় চাপিয়া দক্ষিণ-মুখে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সে বৃক্ষ কুলিবার বন্দে। বহুদূর দৃষ্টি যায় পর্বতভূমির উচ্চতলে একটি কৃষ্ণ রেখা ধীরে ধীরে ফাটিয়া উঠিতেছে; ওই কালো রেখা ক্রমশঃ দীর্ঘতর ও বিস্তারতর হইয়া পাহাড়ের রাজু পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে, তখন নিম্নদেশে ক্রত গতিতে

হয়াইটা পড়িতেছে। দীর্ঘ তরঙ্গেরই তাহা চিহ্ন দেখা যাইতেছে, কে যেন লম্বা লম্বা খাদগুলি বিরাট খাতে দিয়া কাটিয়া দিতেছে; সেই চলমান ছায়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া ক্রতবেগে নিকটতর হইতে লাগিল।

বাঁধের পশ্চাতে, ওই পয়ঃপ্রণালী ও জলপূর্ণ খাতের মধ্যে যতখানি স্থান পাইতে লাগিল, তখনই আশ্রয়প্রার্থীরা ভয়ে বাক্‌হারা হইয়া গেল। সেই ভয়াল জনতা আরও নিকটে পৌঁছিবার পূর্বেই এই আশ্রয়ের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাহারা সন্দিহান হইয়া উঠিল। লাইবিনগেন নিজেও সেই উদ্বেগের তাড়না হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। সম্মুখে লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু প্রাণী তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আর — একটা অতি ক্ষুদ্র পরিধামার মধ্যখানে তিনি ও তাঁহার কৃত্যগণ অপেক্ষা করিতেছেন — 'চিনবার খুব কেন্দ্রিতে পেটুক সময় লাগে' তাহার মনোই সকলে হাড়-পর্যন্ত মাংসহীন হইয়া যাইবে।

লাইবিনগেনের চোয়াল শক্ত হইয়া উঠিল, — তাহারা এখনও তাঁহাকে খাইতে পারে নাই, দেখিবেন কেমন করিয়া খায়ে। যতক্ষণ তাঁহার মুক্তিনাশ না হয়, ততক্ষণ যেই হউক, আর পিঁপড়েই হউক — কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিবেন না।

(২)

শত্রুরা সুসংবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছে — মানব-সৈন্য যতই সুশিক্ষিত হউক না কেন, এমন শত্রুর প্রতিরোধ-ক্ষমতা কি? সোজা একমুখে তাহারা ক্রমশঃ খাতের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। সম্মুখে বাধা আছে, কেন্দ্রিতের মুখে এই সংবাদ পাইয়া, দুইটি সৈন্যদল মূল হইতে পৃথক হইয়া গেল, এবং খাতের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। দুই-ক্রোশ লম্বা বাঁধের সমস্ত অংশটা কভার করিতে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগিতে পারে। তাহারা নিশ্চয় জানিয়াছে, পার হইবার একটা মাত্র জায়গাই আবিষ্কার করা যাইবে। তারপর দুই পাশের সৈন্যেরা চলিতে সুরু করিবে; কিন্তু মধ্যের এবং দক্ষিণাংশের সৈন্যেরা স্থির হইয়া রহিল। অবরুদ্ধ অধিবাসীরা এখনে ঐ অসুপরিমিত লোহিত-কৃষ্ণ পিঁপড়াগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল।

ইহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য যে, পিঁপড়া তো ছার, জন্তুরও চিন্তাশক্তি থাকিতে পারে। আসন্ন দুর্যোগের দারুণ দুশ্চিন্তায়, অধিবাসীদের বুদ্ধি-সুলভ বুদ্ধির তো কথাই নাই — এমন কি, লাইবিনগেনের সন্ধ্যা-বুদ্ধিও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সকলেরই মনে হইতেছে — ওই বিশাল বন্যার মত পিঁপড়ার দল যেন একটি মাত্র কামনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে — 'সম্মুখে খাদ্য থাক বা না থাক, যত কিছুই খাদ্য থাকুক তোমাদের দেহগুলি আমাদের চাই-ই — আমরা পৌঁছিবই'। অভিযান সুরু হইল।

বেলা চারি ঘটিকার সময় খাদ্য-সৈন্য দুইটি পরিখা-প্রান্তে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইল সম্মুখে নদীর অকূল বিস্তার। যেন কোন্ গোপন সঙ্কেতে সমস্ত সেনাবাহিনীতে এই খবর পৌঁছিয়া গেল। মুহূর্তে পরিখার ধারে অসংখ্য লাইবিনগেন কেন্দ্রস্থ পিঁপড়া-সৈন্যের যান্ত্রিক গতিবিধি লক্ষ্য করিলেন — তাহাতে মনে হয়, সম্মুখে যাবার খবর জানিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে ঐ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। খাদ্য অতিক্রম করিবার পথ না পাইয়া পিঁপড়াগুলি যেন অন্তর সহজ নিষ্কাশনের লোভে আবার ফিরিয়া যাইবার জল্পনা করিতেছে।

কিন্তু তাঁহার ভয় ভাঙিতে দেরী হইল না। প্রহরীদের চীৎকারে তিনি নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া দ্রুত অশ্ব চালনা করিলেন। তাঁহাকে যে দৃশ্য চাক্ষুষ করিলেন তাহাতে তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইয়া আসিল।

শতগজ দীর্ঘ একটা বিপুল কৃষ্ণবর্ণ স্রোত খাদের ঢালু পাড় বাহিয়া নামিয়া আসিতেছে। অসংখ্য পিঁপড়া যেখানে সেই বীরমূর্তি অবরোধের সুবিধা পাইতেছে, তখনই পশ্চাৎ হইতে বহুতর পিঁপড়া সেই

আহারে ফরাসীরা নিমন্ত্রণকারী পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করিতেছে ; এইরূপে পরলোকের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

লাইনিনগেন একটা ভুল অনুমান করিয়াছিলেন এই যে, বন্দি রাশি রাশি মৃত্তিকা খনন করিয়া খাদ ভরাট করিতে না পারিলে শিপড়ার দল উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। এখন দেখা গেল, পূর্ববর্তীদের একমাত্র কাজ, খাদের জলে ডুবিয়া, ভাসিয়া, সাঁতরাইয়া অনুগামীদের জন্য কেবলমাত্র পথটুকু সুগম করিয়া দেওয়া।

অনুসরণকারী ফৌজের দল লাইনিনগেনের পাশে দাঁড়াইয়া প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি তাহাদের একজনকে পিছনে ডাকিয়া বলিলেন — দেরি করিতে না পারিলে খাদের জল যেন বেশি বাড়িতে না পারে। দ্বিতীয় একজনকে বাহিরের ঘর হইতে কোদাল ও পেট্রোলের টিন আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। তৃতীয় অনুসরণকারী প্রহরীদের সাঁতার জলে নামিয়া পড়িয়া খাদের নিম্নতল ডুবি এখনও নিরাপদ।

কিন্তু শিপড়ার দল দ্রুত খাদ পার হইতে লাগিল — লাইনিনগেন যে সময় আন্দাজ করিয়াছিলেন তাহার আগেই। একটা নিমজ্জিত শিপড়ার মৃত স্থান পূরণ করিবার জন্য তখন তখন ছুটিতে লাগিল। লাইনিনগেনের লোক পৌঁছিবার পূর্বেই শত্রুরা প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। মন্দিরের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে ডুবিয়া তাড়াতাড়ি নদীর কিনারা খুঁড়িয়া মাটীর ঢেলা ও বালুরাশি জলের উপরে ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

লাইনিনগেন লক্ষ্য করিলেন তাহাদের আক্রমণ প্রবেই ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। এই সাঁতার কয়েকজন লোক আর বুদ্ধির পেট্রোলবাহকদের লইয়া এই অবস্থায় তিনি কি করিতে পারেন! আক্রমণের পরিধি যেরূপে বিস্তার লাভ করিতেছে — তাহাতে বিপদ সহজেই দেখা দিল বলিয়া।

এদিকে বিপদের উপর বিপদ — কালো শিপড়ার সেই বিস্তীর্ণ বাহিনীর উপর মাটীর যে ঢেলা নিক্ষেপ করা হইতেছিল, সেগুলি মৃত্তিকা ভাসাইয়া ডুবিয়া ডুবিয়া হইয়া তাহাদের দিকেই ফিরিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যে অন্ধকার শিপড়ার সারি পার হইয়া উপরে উঠিতেছে।

ঐ কীটসমাজ প্রবাহমধ্যে একটা কোদালের আঘাত করিয়া দেখা গেল, কোদালটা টানিয়া তুলিতে না তুলিতে উহার কাঠের হাতল বাহিয়া অনেকগুলি শিপড়া উঠিয়া আসিল। তখন জলের মধ্যে কোদালটি ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় রহিল না। কিন্তু উহারই মধ্যে অনেকগুলি শিপড়া লোকটার দেহ আশ্রয় করিয়াছে ; তখনই লোকটার অনাবৃত দেহে তাহারা যেন সাঁটিয়া গেল। উহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়গুলি হুল দিয়া তীব্র বিষ ঢালিয়া দিল। বিষের নিদারুণ জ্বালায় লোকটি চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাগিল, শেষে ডুবসাঁতারে ডুবিতে লাগিল।

হঠাৎ ওই হতভাগ্যের আর্তনাদ ছাপাইয়া লাইনিনগেনের সমুদ্রগর্জনবৎ কণ্ঠ শোনা গেল, "ডুবুরি, পেট্রোলের মধ্যে হাত ডুবাও!" মুহূর্তে লোকটির সেই ধ্বনি থামিয়া গেল। কে যেন তাহার দেহটি একেবারে অকেজো করিয়া দিয়াছে! আস্তে টিপিয়া ফেলিয়া সে পেট্রোলের জ্বালার মধ্যে কাঁধ পর্যন্ত হাত ডুবাইয়া রাখিল। কিন্তু তখনও শিপড়াদের আক্রমণ কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। সঙ্গীরা তাহার দেহ হইতে শিপড়াগুলি কোন রকমে টানিয়া ছাড়াইয়া লইল। ইতিমধ্যে আবাদের আদিবাসী এক বৃদ্ধ চিকিৎসক কিছুক্ষণ পূর্বে প্রস্তুতকরা একটি বিষয় ঔষধ তাহাকে পান করাইল।

ইতিমধ্যে খাদের জল বাড়িতে লাগিল। তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, নদীর শুষ্ক খাদের মুখে জল-আটকের কাজ রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে

জল বাড়িতে লাগিল; তীর হইতে তীরের বেগে পাত্র বাহিতে বাহিতে নবীন জল পিঁপড়ার দেহ জালো আস্তরণ ভাসিয়া তাহাদিগকে লইয়া যেন।

(৩)

ছুনিশ্চিত পরাজয় অবশ্যেই দেখা দিল। উত্তর অরোধাগে আবাদের অধিবাসীরা বিশুল উৎসাহিত হইয়া মাটীর ঢেলা ও বালুরাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এতক্ষণে অপর পারের পিঁপড়ার স্রোত ক্ষীণতর হইয়া নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল — বোধ হয় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সুতরাং চালু পাড় বাহিয়া তাহারা নিরাপদ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল।

খালের জলে এ পর্যন্ত যাহারা সুখাই ডুবিয়া মরিল। নিরুপায় পিঁপড়াগুলি তখন হাজারে হাজারে স্রোতের মুখবিবরে ঝাঁকুনি খাইতেছিল, কেহ বা সাঁতরাইয়া কিনারায় পৌঁছিতে প্রাণান্ত প্রয়াস পাইতেছিল, কিন্তু আবাদীদের হাতে তাহারা কেহই রক্ষা পাইল না।

ঘাঁটীগুলিতে সকল খবর পৌঁছিতেই দলে দলে হাজারুখর বিশৃঙ্খল জনতা খালের পাড় ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

দিনের শেষে সূর্য্যদেব তেঁতুলবনের আড়ালে অন্তর্হিত হইলেন। প্রদোষের অস্পষ্ট আলোক ধীরে ধীরে রাত্রির গভীর অন্ধকারে বিলাইয়া গেল। আশা করা যাইতেছে, সম্ভবতঃ পরদিন উষা পর্য্যন্ত তাহারা শান্তভাবে বিশ্রাম লইবে। তথাপি পার হইবার শেষ উদ্যম ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর বাঁধ খুলিয়া দিয়া খালের স্রোতোবেগ তীব্রতর করা হইল। লাইনিংগেন কর্ম্মচারীদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া, সারা রাত জোরে রোঁদ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। মোটরের বাতি এবং টর্চ্চের আলো জ্বালাইয়া রাখিবার বন্দোবস্তও করা হইল। এইরূপে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা সমাধা হইলে মালিক পরম পরিতৃপ্তিভরে রাত্রির আহার শেষ করিয়া ঘুমাইতে গেলেন — সেই দুদিন যাবৎ অপেক্ষমান পরম দুর্ভাবনা লাইনিংগেনের গভীর নিদ্রার কোন ব্যাঘাত করিতে পারিল না।

* * * *

পরদিন প্রত্যূষে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবেগ দেহে লাইনিংগেন পরিখার কিনারা ধরিয়া ঘোড়ায় উপরে অগ্রসর হইতেছিলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন অন্বেষণকারী সহর এক নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ বিরাট সমাবেশ। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় তাঁহার মনে হইল, পিঁপড়ার খাত পার হওয়ার আর কোন আশাই নাই। হৃদয়কাশে মনে বেশ একটা উত্তেজনা বোধ হইয়াছিল — এখন সুখ শেষ হইয়াছে।

লাইনিংগেন খালের পূর্ব্বে ও দক্ষিণদিকে অশ্বারোহণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সব ঠিকই আছে। তেঁতুলবনের বিপরীত দিকে পশ্চিম পার্শ্বে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন, ঘনক্ষেত্রের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে অজস্রসেনা অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পিঁপড়াগুলি খালের পরপারে বৃক্ষকাণ্ড, শাখা এবং পাতাগুলি চাকিয়া ভীড় জমাইয়াছে। পাতাগুলি তখন তখনই না খাইয়া বোঁটাগুলি কাটা কাটা করিয়া ছেদন করিতেছে, ফলে মাটীর উপরে পাতার একটা নরম আস্তরণ পড়িয়াছে। লাইনিংগেন এই সূত্রে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কেন না তিনি জানিতেন, নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার শক্তি, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং অসুর্য্য শক্তি-বুদ্ধি উহাদের আছে।

খনের অপরপ্রান্তস্থ সৈনিকদের নিকটে ধরা পাতাগুলি টানিয়া লইয়া যাওয়ার কৌশল লক্ষ্য করিতেই তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, একটা অভাবিত আক্রমণের আয়োজন যা তোড়জোড় চলিতেছে। এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সুদূর পাতার বর্ষণ চলিতেছিল।

প্রত্যেকটী পাতা টেনিয়া টানিয়া পিঁপড়াগুলি দরোসরি খালের কিনারায় লইয়া যাইতেছিল।

লাইনিনের হাতে বুদ্ধি যোগাইতে না। তথাপি ইহাও বুঝিলেন যে, এই সময়ে পরিস্থিতির দুরবগাহ আভিমুখ্য অথবা সহায় আরও গুরুতর। তিনি তখনই আদেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অশ্বারোহণে যোদ্ধা করিতে লাগিলেন — "অশ্বদলের পশ্চিম-পশ্চিম ভাগে পেট্রোল-পাম্প লইয়া চল। বন্দুকীর সম্মুখভাগের লোকদের প্রত্যেকের হাতে তোপের গুলিয়া দাও।" সম্মুখে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই এক ভয়ঙ্করীর অশ্ব গুরুতর ঘায়ের লম্বা করিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। — দূর পাহাড়ের গা বাহিয়া একটা ঠি বড় তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে — ঠিক ছুটিয়া নয়, যেন গড়াইবার মত ঘুরিয়া, হাঁপিয়া, পড়াইয়া আসিতেছে। জেনারেটা চতুষ্পদ জন্তুর নহে, — দেখিতে একটা কালো কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-মূর্তির মত। মাথাটা তোকার, চারিটা পা জমাগত পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে। ঐ মূর্তিটি ঘাসের উপর পড়ে, লাইনিনেনের ঠিক বিপরীত দিকে পৌঁছিয়া চলিয়া পড়িল; তিনি চিনিতে পারিলেন — সেটা একটা হরিণ, তাহার সর্বাঙ্গে পিঁপড়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

দৃশ্যটি মুহূর্তেই হইয়া শত্রুর এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারাও ব্যাপারটি প্রথমেই তাহার চক্ষু ছুটি আকর্ষণ করে। তারপর সেই মূর্তিহারা জন্তুটা অমনি বেগবান ঈশ্বরপ্রায় হইয়া একেবারে শত্রুর ব্যূহে প্রবেশ করিল — এখনে ছুটা-ছাটনায় অধির হইয়া সম্মুখে-পিছনে ছুটিতে লাগিল।

লাইনিনেনের একটি ঘণ্টির আঘাতে তাহার সকল বাহনার অবসান করিলেন। একবার ঘড়িটি বাহির করিয়া তিনি সময় দেখিয়া লইলেন। ঘড়িও এখন মুহূর্তেক মাত্র করা চলিবে না, তথাপি পিঁপড়াগুলি কতক্ষণে তাহাকে শেষ করে তাহা দেখিবার কৌতূহল তিনি প্রাণান্তে দমন করিতে পারিলেন না — একরকম নিজেরই প্রয়োজনে। দেখিলেন দশ মিনিটের মধ্যেই ঘোড়াসমেত সমস্ত শুদ্ধ একটা কঙ্কাল পড়িয়া রহিল। তাঁহারও ঐ দশা হইবে, এইরূপ — এক, দুই — লাইনিনেনের একবার খুব ঘোড়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব ভুল হইয়াছিল; বুদ্ধিতে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইলে তাঁহাকে আরও তৎপর হইতে হইবে। তিনি স্থির বুঝিতে পারিলেন এইবার দারুণ ঘাত আসিবে — ঘাসের পশ্চিম ভাগ যেখানে দক্ষিণমুখে বাঁকিয়া গেছে ঠিক সেই স্থান হইতে। সেইখানে পৌঁছিবামাত্র দেখিলেন, তিনি যে ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। বাঁকের ধরে পাতাগুলি স্রোতের টানে অনবরত হওয়ায় ওপারের পিঁপড়াদের মধ্যে যাতায়াত করিয়া সেতু-রচনা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। দস্তা ঘটি, পেট্রোল ও মাটির তেলায় অবিরাম বর্ষণে ঘাসের এপারে তাহাদের অবতরণ এখনও নিষ্ক্রিয় হয় নাই। কিন্তু জলের উপরে যে-ভাবে গাছের পাতা স্তর করিয়া উঠিতেছিল তাহাতে অনতিকালের মধ্যে স্রোত-ব্যাপী এক সুদৃঢ় সেতুপথের উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ার দাবি যে বেশে ধাবিত হইতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

নদীর পাড়ের উপরে যে জল বসান আছে তাহার সাহায্যে উহার জল উঁচান এবং নামান হয়। লাইনিনেন জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই স্থানে পৌঁছিলেন। অন্তপায় যে লোকটা জল চালাইতেছিল তাহাকে তিনি জল একেবারে ঘাসের তলা পর্যন্ত নামাইয়া দিয়া অল্পক্ষণ পরে আবার সেই জল বেগে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। এই কৌশলে প্রথমে খড়ই কাজ হইল — পরিষার জল নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাতার চাদরটাও নামিয়া গেল। পরে এক প্রবল স্রোত পুনরায় সমুদ্য পূর্ণ করিয়া পাতা ও পিঁপড়া দুইই সবেগে ভাসাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু একই কালে

এখানে ওখানে কতকগুলি কর্মব্যস্ত পিঁপড়ার দল এদিকের পাড়ে চিটকাইয়া পড়িল। পিঁপড়াগুলি কর্তব্য সম্বন্ধে এমনই সচেতন যে, তাহা সম্পাদন করিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করিল না, — তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারীদের আর্ত-চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

জল ক্রমশঃই উঠিতে ও নামিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জলময় পিঁপড়া ও পাতার রাশি ভাসিয়া চলিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে যাহাদের জল যখন এক সময়ে একেবারে তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন যাহারা প্রাণপণে যুঝিতেছিল তাহারা দেখিল, জল-ওঠা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। লাইনিনেন বুঝিতে পারিলেন সর্বনাশ হইয়াছে — ঘাসের জল বিনড়াইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে একজন পিয়াদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল — "বাঁধ পার হইয়া গেছে"।

(৪)

ঐ খবর ঠিক আর পাঁচই ইহারা আক্রমণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল; তখন যে-কিংবদন্তীর বিপদ সর্বাপেক্ষা গুরু বলে হইয়াছিল এখন সেইখানেই আসল যুদ্ধ বাধিল। এখানে প্রতিরোধকারীরা সংখ্যায় ছিল অল্প, এবং ঘুরে ঘুরে ছড়াইয়া ছিল; তার কারণ, যতগুলিকে ডাকিয়া পাওয়া সম্ভব হইয়াছিল, কেবল ততগুলিই আঘাতের সম্ভিলাষে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

ঘাসের জলে যে ব্যক্তি স্নান করিতেছিল সে যেমনই খাতের জল পর্যন্ত জল নামাইয়া দিল, অমনই পিঁপড়ার দল পূর্বনির্দেশ মত অতি দীর্ঘ হাম ছুটিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল — জলমুক্ত খাতের মধ্যে তাহারা দুর্লভ ফেলে নামিয়া আসিল। জল-ওঠার লোকটি সুযোগ খাতে জল একেবারে তলাইবার পূর্বেই দেখিতে পাইল চতুর্দিকে অসংখ্য পিঁপড়ার দল তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। সে তখন আর সময়ের মধ্য ছুটিতে আরম্ভ করিল — প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

এই খবর তলিনাকার লাইনিনেনের বুঝিতে বাকি রহিল না, অন্যদের আর ডাকা হইল না। তাহা অসম্ভব বলিয়া তাহার জন্য বা-চেষ্টা করিয়া তিনি সময় নষ্ট করিলেন না। যতক্ষণ উৎসাহের কিছুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল, তিনি কিছুতেই নিরস্ত হন নাই। এখন আর প্রতিরোধের কোন চেষ্টা — শুধুই নিষ্ফল মরণ, বিসর্জনম্। এইবার তিনি আকাশ পথে করিয়া নিজের শিবিরের আশ্রয়ে করিবেন। ঐখানে গিয়া পরিখার ভিতরে আশ্রয় লইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি নিজে 'রাজা'-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

ঐ বাড়ী আক্রমণ-স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে। অতএব পিঁপড়াদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার এই যে দ্বিতীয় সম্ভাবনা — ইহাকে লুপ্ত করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। রাজবাড়ীর নিকটে যে বিরাট প্রকাণ্ড পেট্রোলের টাঙ্ক ছিল তাহার একটা প্রান্ত অর্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে। বাকি অর্ধেকটার মাটীর তলাকার পাইপের সাহায্যে সেই খালি জায়গা ভর্তি করা হইল। ঐ খাদ রাজবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বাড়ীগুলির চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে।

এইখানে দুইজন তিনজন করিয়া লোকগুলি আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়, বর্তমান যুদ্ধে অনেক আশা তাহারা প্রায় ত্যাগ করিয়াছে। লাইনিনেন তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন —

"বন্ধুগণ, আমরা প্রায় বাজি হারিয়াছি। কিন্তু এখনও আশা আছে — ঐ পুরাতনগুলাকে মারিয়া তাড়া করিতে পারিব; তোমরা ভাবিও না। যদি কাহারও সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে তবে এখনই বেতন লইয়া চলিয়া যাইতে পার।"

একজনও নড়িল না।

তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বার বাঁধের নির্দ্দেশে খুসী হওয়ায় হয়ে লাইমিংসেন একটু হাসিলেন — সে হাসিতে একটা ঔদাস্য ও অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিল। —"ঐ তো ওরা! যত টাকা দেওয়া যদি না দেখিবে, তবে লাভ কি হইল? — তাই না? যতটা কাল সরঞ্জামের আশা করা হইবে না। এবারে ঐ যন্ত্রপাতিগুলা সিঁড়ীতে দিলেই তোমাদের সকলেরই তাক্ত লেগে যাইবে, তেমনই মজুরীও বেশি করিয়া পাইবে। আচ্ছা, এইবার একটু সোজা পথ দেখি, কিছু খাইয়া লও। যে পরিশ্রম করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের ওটা পাওনা হইয়াছে।"

নিজের মতলবের উপযোগীতায় তাহাদের আবাদের সমর্থন হয় নাই। এমন সিঁড়ীওলা কিছুদূরের জন্য দুইটি ঘড়িযুক্ত হওয়ায় এবং 'পেট্রোলের বেরা' তাহাদের মনে একটু সাহস সঞ্চার করায় যথেষ্ট খুসীর উদ্রেক হইল।

কাজিটোর্গা পরিবেষ্টনীর উপরে যে ত্রিশ ফিট জায়গা সমতল করা হইল। সেখানে সেখানে ছই একটি সিঁড়ীর খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। সাদনের পেট্রোলের টিনে কিছুদূর চলিয়া থাকিয়া তাহারা টিন তুলিয়া ফেলে প্রস্থান করিতে লাগিল। বেশ বোঝা গেল, ঐ কুলখন খাওয়ার অল্প পরে যাহা আসে তাহার জন্য উপস্থিত তাহারা বিশেষ ব্যস্ত নহে; আবাদের জন্যিতে যে সকল যন্ত্র অধিকারে তাহার প্রাচুর্যাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়।

ইহাই চতুর্দ্দিকের গাছপালা ও ক্ষেতগুলির উপরি ভাগে সিঁড়ীর গাঁথি গাঁথিয়া গেল। একদিনের এত পরিশ্রমের ফলে তাহারা পরম উৎসাহে গাঁথনি করিতে লাগিয়া গেল।

লাইমিংসেন হেড-লাইট এবং ষ্টার্চ-রহ সর্ব্বত্র প্রহরী বসাইয়া দিলেন; তার পর অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া ডায়ির পরিমাণ হিসাব করিতে বসিলেন। ইহার পর খানা আহার করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলেন — এমন চিন্তা তাঁহার নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করিল না যে, পরদিন রবিবার একটা শান্ত পরিশ্রম-করা অবকাশ ভিন্ন তাঁহার সেবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি প্রথমে বাড়ীর ধারে গিয়া উঠিলেন। তাঁহার চারিদিকে যে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন তাহা বেশ হৃদয় ভরি রাঙ্গে-রঞ্জিত একটি দৃশ্য — যতদূর দৃষ্টি চলে, চারিদিকে বহু বাঁধন বাঁধিয়া একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিশাল জনতা সূর্য্যালোকে ঝলমল করিতেছে। সে আর কিছু নয় — সেই অতি-সুদীর্ঘ সর্পসদৃশ সিঁড়ীর বাহিনী। শুরুভোজনের পরে উহারা যেন এখন বিশ্রাম করিতেছে।

উহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই! — আবাদের চারিদিক মানুষ, অশ্বখুর ও গোযানের চক্রের পর তাহাদের চাই-ই, এমন লোকের বল তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না।

এক একবার আশা হয়, পেট্রোলে-ভরি এই খাত তাহাদের উদ্যম-নিষ্ঠির পক্ষে একটা অন্তরায় হইবে; কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে সাঁতার কাটিয়া পার-হওয়ার সম্ভাবনাটা তিনি মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। একটু পরেই দেখা গেল, পূর্ব্বদিনে যেমন তেঁতুলপাতার সাহায্যে জেলা তৈয়ার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল আজও তেমনই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে এক দীর্ঘ সিঁড়ীর জোড়া-বন্ধা তেঁতুলের পাতা বহন করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

খাতের পেট্রোলে তোষাও একটু ছিলোছ নাই, এবারে আরও। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহার উপরিভাগের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া সিঁড়ীর ভীড় জমিয়া গেল। সদাগরি আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। আক্রমণের সুরু হইতে লাইমিংসেন কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সাধারণ সাজসজ্জায় তাহাদের পরিদর্শনে পরম করিতেছিলেন; তাঁহার হাতের একটি পেন্সিল পড়িয়া

না। আবার কলসীর উপরও আলো ছিল, তাহাতে যেন উহাদের অগ্রগতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি না করে। সুতরাং তাহারাও পিপ্পিক-পীড়নে প্রথম পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় খাদের পাশে বসিয়া রহিল।

এই অবসরে অসংখ্য পিঁপড়ায় পেট্রোল ঢালিয়া ফেলিল। তাহাদের অনেকেই কাঁচিটের বোঝা বহিয়া উপরে উঠিয়াই কলসীর দিকে ধাবমান হইতে লাগিল।

লাইনিনের বন্ধুবর্গ হাঁকিলেন, "খাদের ধার হইতে সকলে সরিয়া এস।" তাঁহার আদেশের অর্থ না বুঝিয়াই সকলে পলাইয়া আসিল।

লাইনিনের তখন মনে হইল, খুব সাবধানে খাদের মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে; তাহাতে পাথরের সেই খাদিটা ও তাহার উপরের পিঁপড়ার পাল ভাঙিয়া গিয়া নীচের পেট্রোল চলচল করিয়া উঠিবে; সঙ্গে সঙ্গে দেশলাইয়ের একটি জ্বলন্ত কাঠি সেই পেট্রোলের মধ্যে প্রবেশ করিবে। লাইনিনের আদেশমাত্র পিছনে দাঁড়াইয়া পড়িলেন — নিমেষে এক গগনস্পর্শী 'অগ্নি-প্রাকার' দুর্বৃত্তদলকে চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

তখনই পাহাড়ের এই 'জলন্ত' পরাজয়ে আবাসবাসীরা উল্লাসে মাতিয়া উঠিল; বালী খেলিয়া বালকেরা যেমন হাততালি দেয় ও নাচিতে থাকে তাহারাও সেইরূপ নাচিতে লাগিল।

খাদের তলদেশ পর্যন্ত পুড়িয়া পেট্রোল শেষ হইয়া আসিল। ধোঁয়ার ঘূর্ণনী ধীরে-ধীরে সূক্ষ্ম বিলীন হইল, আগুনের শিখাও স্তিমিত হইয়া আসিল। অঙ্গার অবিদগ্ধ হইতে দূরে দূরাকারে পলায়নপর হইতে লাগিল।

তথাপি তাহাদের উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না; বরং খাদবাসীর পরাজয়ে তাহাদের যেন জিদ চাপিয়া গেছে। ইতিমধ্যে খাদের কাঁচিটের বোঝা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে; স্তিমিত অগ্নিশিখা ম্লান হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় টীম হইতে তখন পুনরায় পেট্রোল ঢালিয়া দেওয়া হইল; ফলে পূর্ণ-ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হইল, আবার হাজার হাজার পিঁপড়া আগুনে পুড়িয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

লক্ষ্য পুনরায় স্থির হইয়া গেল। আবার খাদে পেট্রোলের বান ডাকিল। এই অসহায়ীন অন্তের উদ্যম — এই আত্মাহুতি যে একেবারেই অর্থহীন, ইহা কি উহারা কিছুতেই বুঝিবে না? সত্যই ইহার কোন অর্থ হয় না — হয় কি? হা, নিরর্থক হইতে পারিত যদি অফুরন্ত পেট্রোল থাকিত।

লাইনিনের চিন্তা যখন এই পর্যন্ত পৌঁছিল, তখন সেই প্রথম তিনি অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মনের জোর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সমস্ত শরীর শিরশির করিতে লাগিল, তিনি জমার তলায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

কোন রকমে ঐ অবধূতগুলা যদি খাদের তলায় একবার পৌঁছিতে পারে, তবে তাঁহাদের এই মানুষগুলির মোকাবেলা আসার সম্ভাবনা নাই। হা ভগবান, কীসের উহাদের পেটে যাওয়াই কি হবে তাঁহাদের ভবিতব্য!

তৃতীয় বার সহস্র সহস্র মৃত্যুসংকল্পী পেট্রোলের আগুনে পুড়িয়া মরিল। তখন পি. যেন কিছুই ঘটে নাই — তেমনই ভাবে পিঁপড়ার দল মহাসমারোহে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তখন তাঁহার স্মরণ হইল, কাছেই তিনি খড় রাখিবার একটি ঘরে বহুদিনের অব্যবহৃত দুটি পুরাতন লণ্ঠন পড়িয়া আছে। পোষাকের চামড়ার ভিতর হইতে ঐগুলি টানিয়া বাহির করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, নিষ্ক্রিয় পরাজয় ও দুঃখকে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিবার ইহা একটা শেষ উপায় হইল মাত্র। পোষাকের কেহ বা হাঁটু পাড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, কেহ বা উচ্চস্বরে মহা চীৎকার করিয়া ঐ

ক্রমে-নিকটবর্তী হওয়ার ফলে তাহাদের গতি দ্রুততর হইতে লাগিল। অবশেষে দুইজনের মধ্যে ব্যবধান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। লাইনিনসেন দেখিতে পাইলেন, আরোহীদের একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া উহার পার্শ্বে নাচিতে সুরু করিল, তাহার আর একজন। তাহারা অনবরত হাত নাড়িতে নদীর দিকে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু এত চেঁচামেচিতেও তাহারা রক্ষা পাইল না—সেতুর নিকটে পৌঁছিবার পূর্বেই না হইতে মধ্যে পর্যন্ত সর্বাঙ্গে সফেদা হইয়া গেলি। এমন সময় অদূরে একটা বিরাট দেহ বিস্তীর্ণ নদীর বুক ফাঁপাইয়া পড়িল—হয়ত অনেকক্ষণ পিঁপড়াগুলোই মত হিংস্র আর একপ্রকার পশু তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। অদূর সকলে ভয়বিহ্বলে তাহাদের পরিত্রাণ লক্ষ্য করিতে লাগিল—চড়া-রোদের সেই জলবিহারক চীৎকার শুনিয়া কাহারও জানিতে আর বাকি রহিল না যে, পিঁপড়াদের তুলনায় কুমীর এবং চীৎকৃত জলচরগুলি কিছু কম বুদ্ধিমান, বা শিকার-কার্যে কম পটু নহে।

এই ভীষণ পরিণাম চাক্ষুষ করিয়াও ক্রমে আরও অনেকে ঐ সঙ্কটসেতু পার হইতেই মনস্থ করিল। যারা ফিরিবার পথেও, তথাপি সেতুগুলিকে একেবারে ফিরে ফিরে চড়ুয়ার মুখে ফেলিয়া দেওয়া অপেক্ষা নদীবক্ষে কুমীরের মুখে পড়াও ভাল।

(৪)

মাথা উঁচিয়েছে; তথাপি যেমন করিয়া সুদূর যোড়াতে চাক্ষুকের যাত্রা ভাঙ্গা করিতে হয়, লাইনিনসেন তেমনই তাঁহার বুদ্ধিকে যেন তীর অভ্যাসের সঙ্গে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।—জগতের কোথাও কি এমন কেহ নাই যে এই ছয়জনগুলাকে আহার যে পাঠাইতে পারে?

এই চরম অবসাদ ও বিমূঢ়তার ফলেই তিনি যেন মরীয়া হইয়া উঠিলেন—আছে, এখনও আশা আছে। একমাত্র উপায়—ঐ বাঁধের জল যদি সম্পূর্ণ খুলিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তবে শুধু খাদ্যটাই না, এই বিশাল প্রান্তরটাই ভাসাইয়া দেওয়া যাইবে। ব্রাহ্ম-বাড়ী এবং সন্নিহিত বাড়ীগুলির ভিটা উঁচুই আছে, সুতরাং উহাদের ভিত পর্যন্ত প্লাবনের জল পৌঁছিতে পারিবে না।

হাঁ সম্ভব, নিশ্চয় সম্ভব! কেবল ঐ বাঁধটায় পৌঁছিতে পারিলেই হয়। ব্রাহ্ম-বাড়ী হইতে ঐ বাঁধ দুই মাইল মাত্র। কিন্তু মাঝপথে পিঁপড়ায় ছাইয়া রিয়াছে—তাঁহার ঐ নিরাপদ্‌টুকু নিশ্চিন্ত-পথ পার না হইতেই প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার পরও এমন কে দুঃসাহসী আছে যে ঐ পথে পথটা ছুটিয়া যাইবে? অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ঐ বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছান যদি সম্ভবও হয়, ফিরিয়া আসিবার কোন আশা আছে কি?

না, ঐ একটি কাজই করিবার আছে, এবং সে কাজ তাঁহাকেই করিতে হইবে। তা'ছাড়া, দেখ পর্যন্ত বিদ্যুতেই আশা ছাড়িয়ে চলিবে না। পিঁপড়াগুলা তো আর সর্বশক্তিমান নহে। কিন্তু সাপ যেমন শিকারকে মোহাবিষ্ট করিয়া তাহার সর্বশক্তি হরণ করিয়া লয়, ইহারাও তাঁহাকে তেমনই করিয়াছে—তাঁহার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

ইতিমধ্যেই পিঁপড়াগুলি সেতু-রচনা সুরু করিয়া দিয়াছে। লাইনিনসেন একটা জোয়ের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলেন—"শোন বন্ধুগণ, শোন!" লোকগুলা অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। এখনে তাঁহার আদেশে ঘাটের চতুর্দিক হইতে তাহারা ঝলির পরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমনই তাহাদের ইহারই মধ্যে সুখের উপর দুঃখের ঘবাদ ছায়া পড়িয়াছে।

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে লাইনিনসেন বলিতে লাগিলেন "শোন বন্ধুগণ। ঐ নদীর জলে সমস্ত আবার ভাসাইয়া দিতে পারিলে, আমরা এখনও বাঁচিয়া যাইতে পারি—তবে যদি কেহ ফিরিবার আশা

আসে করিয়া ঐ ধারে পৌঁছিতে পারে। সে কাজ আমি তোমাদের কাহাকেও করিতে দিতে পারি না; যদি দিই, তবে আমাকে ধিক! আমি কি পিঁপড়াদের চেয়েও অধম? আমার কৃতকর্মের ফল আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। তোমরা কেবল আমার এই কথাটি স্মরণ রাখিও — যে-মুহূর্তে আমি খালের ওপারে পৌঁছিব, তৎক্ষণাৎ তোমরা পেট্রোলে আগুন ধরাইয়া দিবে। সে আগুন নিবিবার আগেই মজাদারাই কার্য্য হাসিল হইয়া যাইবে। তোমাদের একমাত্র কাজ হইবে আমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত শান্তভাবে অপেক্ষা করা। — না না, আমি ফিরিয়া আসিবই, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

লাইনিনগ্রেন একজোড়া খুব মজবুত জুতা পরিলেন; দুই হাতে মোটার দস্তানা পরিয়া, মুখে বুট ও হাফপ্যান্ট, দস্তানা ও মাথা, এবং সার্ট ও গলার মাথের ফাঁকগুলিতে পেট্রোলে-ভিজান ন্যাকড়া জড়াইয়া লইলেন। তারপর এমন একজোড়া চুলি চোখে পরিলেন যাহার ভিতরে ধোঁয়া ঢুকিতে পারে না; কারণ, তিনি জানিতেন পিঁপড়ারা প্রথমেই শিকারের চোখদুইটা অন্ধ করিয়া দেয়। সবশেষে তুলা দিয়া নাক ও কানের ছিদ্র বুজিয়া নিলেন; তারপর তুলোয়া প্রস্তুর পোষাকটি পেট্রোলে ভিজাইয়া নিল।

এইবার তিনি যাত্রা করিবেন; এমন সময়ে আদিবাসী সেই বৃদ্ধ চিকিৎসক আসিয়া জানাইল যে, এক-জাতীয় পোকা হইতে সে যে এক আশ্চর্য্য আরক তৈয়ারী করিয়াছে, তাহার উৎকট গন্ধ পিঁপড়াদের পক্ষে অসহ্য; ঐ গন্ধই পোকাগুলিকে তীব্রতর পিঁপড়ার আক্রমণ হইতেও রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা বলিয়া চিকিৎসক বার বার লাইনিনগ্রেনের বুট, দস্তানা এবং মুখমণ্ডলে ঐ আরক মাখাইয়া দিল। এইবার সেই বিষম উদ্যমের কথা লাইনিনগ্রেনের স্মরণ হইল। আরম্ভ পায়ে পিঁপড়ার দংশনে জর্জ্জরিত হইবার যে ভয় পান করায় হইয়াছিল, তাহাই এক রাশ চিকিৎসক তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াই তিনি এক নিঃশ্বাসে সবটাই পান করিলেন। উহার কটু স্বাদ কিছুমাত্র অনুভব করিলেন না; কারণ, তখন ঐ ধারে পৌঁছানোর ভাবনাই তাঁহার সমস্ত চৈতন্য আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

লাইনিনগ্রেনের খালের দুর উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে রওনা হইয়া গেলেন; তারপর এক লম্ফে খাল পার হইয়া একেবারে পিঁপড়াদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

(৬)

লাইনিনগ্রেন তীরবেগে ছুটিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার বুট আরক মাখান থাকিলেও, এবং সমস্ত পোষাক পেট্রোলে ভিজানো থাকিলেও, পিঁপড়ারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবেই; কিন্তু তাঁহাও জানিতেন যে, যাহা তাঁহার যাওয়া চাই-ই, যেমন করিয়াই হউক তাঁহাকে পৌঁছিতেই হইবে।

অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই তিনি অনুভব করিলেন, কয়েকটি পিঁপড়া এখনই পোষাকের নীচে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, এবং আরও কয়েকটি তাঁহার মুখমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছে। তিনি কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জোরে পা চালাইতে চালাইতে, কদাচিৎ হস্তস্থ জ্বালা অনুভব করিয়া, কেবল অভ্যাসবশে তাহাদের উপর হস্তচালনা করিতে লাগিলেন। স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন তিনি ধারে পৌঁছিলেন বলিয়া, — পথ ক্রমে করিয়া আসিতেছে, আর পঞ্চাশ গজ মাত্র — তিনশত — দুইশত — আর একশত মাত্র।

লাইনিনগ্রেন এবার ধারে পৌঁছিয়াছেন। পৌঁছিয়াই পিঁপড়ার আক্রমণ হইতে চোখের চাকরি দুই মুহূর্ত্তে চালিয়া ফেলিলেন। চোখটি স্পর্শ করিবামাত্র ক্ষুদ্র পিঁপড়ার দল তাঁহার স্কন্ধে ধারতে ঝাঁপিয়া পড়িল — মুখমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু তিনি এক অসাধারণ শক্তিবলে উদ্যমের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন;

তখন দুরন্ত, কিন্তু যদি কাল প্রভাতে তত পুড়িতে হয়, তবে —

বাতাসের ঝাপটা ঘুরাইতে লাগিলেন; নদীর জলে খানিক পূর্ণ হইয়া ঢলিয়া উঠিল; আবারও প্রাণন সুরু হইয়া গিয়াছে।

এবারে তাঁহার কর্তব্য শেষ — তিনি চাকা ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে পিঁপড়ার ঝাঁক কামড়াইতে বুঝি পাইতে লাগিল। অন্য যাত্রীদের উদ্যম হইয়া নদীর জলে সবল আলো ছড়াইবার জন্যে ইচ্ছা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে, — কিন্তু সে কি ঐ জলতরঙ্গদলে তীক্ষ্ণ ছুরীর মতবিখণ্ডিত সৌন্দর্যবিলাস হইবার জন্য! তিনি নদীর দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; পায়ানার নীচ হইতে এক মজবুত মুখের উপর হইতে পিঁপড়াগুলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, পোষাকের নীচের অংশ পিষিয়া মারিলেন। টুপি-জলযার কিনারার ঠিক নীচে, তাহাদের একটি কামড়াইয়া ধরিয়াছে; তিনি উহা টানিয়া ফেলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই বিষের ক্রিয়া সুরু হইয়া গিয়াছে — তিনি অকস্মাৎ ছুটিতে লাগিলেন।

ছুটিতে ছুটিতে বিষৎকণের মধ্যেই পুরাণো তাঁহার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেট্রোজের ঐ আগুনের বেড়া যেন অতদূরে — অদূরে! — মনে হয়, সে পথের যেন শেষ নাই! অর্দ্ধেকও দৃষ্টি অতিক্রম করা যাইবে না। সেই সময়ে, সেই মুহূর্তে, তাঁহার মস্তিষ্কের এক কোণে, ভূত-বিলীয়মান কত চিত্র — অতীত জীবনের ঘটনা — চলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু অপর এক কোণে এক দৃঢ়তর, স্থিরপ্রজ্ঞ পুরুষ, লাইনিনজেন-নামক সেই জলদ-ধীর নিষ্ঠুর মাংসপিণ্ডটাকে ডাকিয়া বলিতেছে — 'এবার মৃত্যু আসিল, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেই মানুষ এমন মৃত্যুসকল দেখিয়া থাকে।'

পথের উপরে একখণ্ড প্রস্তরে হোঁচট খাইয়া হঠাৎ তিনি পড়িয়া গেলেন — জীবনশক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।

সেইক্ষণে তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল বিগত তরুণীন প্রাতরাশের সেই হরিণ — অতিশয় স্পষ্ট, আরও যেন উজ্জ্বল। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ — শুধু কঙ্কালটি পড়িয়া রহিল। জলযান। এমন করিয়া মরিতে পারিব না। মনে হইতেছে, কে যেন তাঁহার পা ধরিয়া টানিতেছে। তিনি টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন — টলিতে টলিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আরণ্যের আদিবাসীরা দেখিতেছিল, অতিক্রান্ত দ্বন্দ্বা শিকার একটি ছায়ামূর্তি এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে মাটীর উপরে এলাইয়া পড়িল। — একেবারে নিস্তব্ধ, নিশ্চল। পেরাধারা ছুটিয়া আসিল। পোষাক খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা প্রভুর দেহ হইতে পিঁপড়াগুলি সযত্নে উৎপাটন করিতেই দেখা গেল — সমগ্র দেহটি ফুলিয়া যেন একটি বিরাট ক্ষত অনুভব করিতেছে। কোথাও বা হাড় পর্যন্ত দেখা যাইতেছে।

আগুনের শিখা স্তিমিত হইয়া আসিল। সম্মুখে অসংখ্য পিঁপড়ার পরিবর্তে এক বিস্তৃত জলরাশি — সে কি অপূর্ব দৃশ্য! ঘরার জল পরাজিত সেনাবাহিনীকে ভাসাইয়া লইয়া নদীগর্ভে চিরতরে বিসর্জন করিল।

•

লাইনিনজেন শয্যায় শুইয়া আছেন — পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেঁক দিয়া, আলোবাতাস দিয়া রক্ত বন্ধ করা হইয়াছে। অজস্রগুলি ফুলিয়া উঠিয়া লাল হইয়াছে। সকলেই এক রকম উৎকণ্ঠার তাঁহার চারিদিকে বসিয়া আছে — সকলেরই মনে একটিমাত্র প্রশ্ন — "বাঁচিবেন তো!"

বৃদ্ধ চিকিৎসক বলিয়া উঠিলেন, "উনি মরিতে পারেন না, যদি না ডেমার মৃত্যু বরণ করেন।"

লাইবিনিৎসের চোখে খুশির হাসি। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন "সব ভালো তো ?"

নার্স জবাব দিল, "ডাক্তারেরা সব আহারে গিয়াছে।" লাইবিনিৎস গম্ভীরস্বরে বলিলেন — "আমি ও বলিয়াবিলাস কিরিয়া আসিবই ; যদিও একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছি।" শুষ্ক হাসি দেখা দিল তাঁহার মুখে ; তারপরেই চক্ষু মুদিলেন — তিনি ঘুমাইতে লাগিলেন।

আরক্ত প্রভাতসূর্য্য উঠিল যখন
দেখিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অজস্র তারা, কর্ষণে নিড়িল —
শশিরে শিশিরে।
শাখায় শাখায় পাখা গহন চীৎকারে,
ভাতে সর্ষফুল,
মধুমুখে বাপ-গন্ধ যখন বাতাসি'
আছাড়ে লাঙ্গুল।
কর্ষিছে শঙ্খক গাছে, পদে চটীযুগ,
ঘুরে ব্রেন উড়ে ; —
যে তারারে উদ্ধারিল ! দেখ, সে মানব —
প্রহরে প্রহরে !

ভক্তি

[এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি একটি অতিশয় কর্মজীবী ও প্রায়-ব্রহ্মচারিত ব্রাহ্মণের পত্নিকা হইতে উদ্ধৃত হইল। লেখকের নাম নাই। ইহার ধার যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনই, ইংরেজীতে যাহা cynical বলে, তাহাই। এইরূপ ব্রাহ্মণ কিন্তু সুলভ।]

দুইটা পথ আছে, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। শুনিতে জ্ঞানের পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।" কয়জনেই বা সে পথের পথিক হইতে পারে? আবার, এই অল্প কয়েক জনের মধ্যে কয়জনেরই বা অধিকার আছে সে পথ অবলম্বন করিতে? ভক্তির পথ কিন্তু সকলেরই জন্য উন্মুক্ত। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেরই তাহাতে অধিকার আছে। তাহা অনায়াস, তাহা উদার, তাহা অপরূপ, তাহা চিরসিদ্ধপথের "সাম্রাজ্যরাজমার্গ"।

জ্ঞান নীরস, ভক্তি সরস। জ্ঞানের পরিণাম দুঃখনিবৃত্তি, ভক্তির পরিণাম আনন্দ। জ্ঞান Negative, ভক্তি Positive; জ্ঞান অন্ধ-মানুষের হাত ধরিয়া ছুরিয়া অগ্রসর হয়, তাহার শেষ কথা "নেতি নেতি;" ভক্তি যেন পীতাম্বরধারিণী স্নেহের ন্যায় চারিদিক হইতে আদরে ঘিরিয়া আগুলিয়া রাখে, তাহার শেষ কথা —

"আছ জলদে, অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরে, সলিলে, গহনে,
আছ বিটপি-লতায়, জলধেঃ গায়,
শশি-তারকায়, তপনে।"

এই শশিতারকাবনিতা-মনোহর লীলাক্ষেত্রের ভেল ঘুচাইয়া জ্ঞান বলে এ সমস্তই মিথ্যা — "ন ক নাস্তি নাস্ত লোকঃ।" আর ভক্তি বলিতে চাহে — "কবে তুমিও এ ঘর ছাড়িয়া যাইবে?"

ভক্তি হৃদয়ের ধর্ম, আর মস্তিষ্কের ধর্ম জ্ঞান। হৃদয় না থাকিলে মস্তিষ্ক নিষ্ফল, আর মস্তিষ্ক না থাকিলে হৃদয় নিষ্ফল। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে বড় বলিবে? আধুনিক Physiology পড়িয়া দেখ — দেখিবে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এমন সকল স্নায়ু আছে যাহার সাহায্যে তাহা কিছুকাল স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করিতে পারে, মস্তিষ্কের অপেক্ষা রাখে না। মস্তিষ্ক কিন্তু হৃৎপিণ্ডের সাহায্য ব্যতীত এক পলও চলিতে পারে না। তবেই দেখা যাইতেছে, মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ডের অধীন, অর্থাৎ তাহা হইতে নিকৃষ্ট; অন্য না হইলে কেহ অধীন হয় না। এই কারণে মস্তিষ্কপ্রধান জ্ঞান হইতে হৃদয়ধর্ম ভক্তিকে অনেক উচ্চে আসন দেওয়া হইয়া থাকে।

এই ভক্তি বস্তুটি কি? কেহ কেহ মনে করেন ভক্তি ও প্রেম একার্থক। ইঁহারা বাতুল। আমি যদি আজ রামসুন্দরকে বলি "তোমার কন্যার প্রতি আমার ভক্তি আছে," তাহা হইলে তিনি খুব সম্ভব আমাকে ঘুনিঘিচুড়ি খাওয়াইবেন। আর যদি বলি "তোমার কন্যার প্রতি আমার প্রেম আছে।" তাহা হইলে হয়ত অন্নপ্রাশনে আসে নিক খাওয়াইবেন। আমার পক্ষে দুইটার ফল এক হইলেও, ঘুনিঘিচুড়ি আর আসে নিক আমাদের ও উদ্দেশ্যে এক নহে।

অনেকে বলেন, যে-মনোবৃত্তি আমাদিগকে মহতের প্রতি আকৃষ্ট করে, তাহার নাম ভক্তি। এটী মিথ্যা কথা। আমরা পাহাড়কে মহৎ বলিয়া জানি, কপর্দীপত্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানি। কিন্তু ইহাদিগকে ভক্তি করি না, ভক্তি করি শালগ্রাম বা তুলসী-পত্রকে।

তবে ভক্তি কি? যাহাকে হাতযশ বলে তাহারই আর-এক রূপ ভক্তি। তরলা এবং হীরক যেমন একই পদার্থের দুই রূপ, হাত ও ভক্তি তেমনই একই মনোভাবের দুই ভিন্ন প্রকাশ। তরলা যেখানে সেখানে মিলিতে পারে, হীরক দুষ্প্রাপ্য। সেইরূপ, সংসারে হাতযশের অভাব নাই। কিন্তু ভক্তি, কৈ তাহাদের আছে! যদিও তরলা মণির সেরূপের মতো ধারা বাঁধিয়া নির্ঝর হীরকে পরিণত হয়; সাধারণ হাতযশও Tradition-এর চাপে জমাট বাঁধিয়া ভক্তিরূপ ধারণ করে।

একটা অদ্ভুত, অসঙ্গত কিছু দেখিলে মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাকে হেঁ-হেঁপনা, মুখবিকৃতি বা নিরর্থক শব্দবিশেষের প্রকাশিত করে, হাস্য হইল; আর মনের মধ্যে সংসার প্রাণ, বা আমন্ত্রিত নয়নের আর্দ্রতায় বা ভাষার ঝঙ্কারে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত করে, ভক্তি হইল।

কোথাও কিছু নাই, মাথার মাঝখানে গাঁদু-ভক্তক চুল দাঁড়াইয়া চলিয়াছে দেখিয়া তাহারও মনে হাতযশের উদয় হইবে, তাহারও বা ভক্তি হইবে। সকলে পা দিয়া হাঁটিয়া চলে; হঠাৎ কেহ কেহ এক ব্যক্তি মাথা নীচু করিয়া পা দুইটা আকাশপানে তুলিয়া রাখিয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া লোকে হয় হাসিবে, না হয় ভক্তি করিবে। সংসার-সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া এক জন উর্ধ্বপদ্ধতি পলায়ন করিয়াছেন এ সংবাদে যিনি না হাসিলেন, তাঁহার মনে ভক্তির উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

যে-লোক তিনটা কাল তরলা ছিটের তুর্কী পরিয়া বেড়াইতেছিল, সেও যেন একদিন সে বাজারে দলের পোষাক ধার করিয়া রাজা সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিল! ইহা অপেক্ষা হাতযশ আর কি আছে? যে শিল্পী শিল্পটেই টানিতে টানিতে শিল্পটেই-টানার শক্তি নেই, যে-মাতা শিক্ষাতথা ধরিতে নাই' উপদেশ দিয়া পরমুহূর্তে শিক্ষাবিধি বলাইবার জন্য মাথা খুঁড়িতে থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা হাতযশ, বা ভক্তির পাত্র আর কি থাকিতে পারে! যে-পটি বা যে-শিরোমাত্রার ব্যবহার হাতযশে নাই তাঁহাদের কেহ ভক্তি করে না। তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধটা বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার আকারে ধারণ করে। বাস্তবিক, হাতযশাত্মক না হইলে ভক্তির উদ্রেক করা অসম্ভব।

ভক্তি ছাড়া পথ নাই। দেশের কলাকে ভক্তির মাত্রা বাড়াও। আর, ভক্তি-manufacture —commercial scale-এ করিতে চাও তো — যেমন, হাড়পোড়া, Tubercule bacillii, গুলি'বাই, প্রভৃতি দুই হাতে যেমন ছড়াইতে থাক।

তোমার শিখা জ্বলিয়া যেদিন ঘুচে তাহা হক,—
শপথ করিয়া বলিনু, বন্ধু, হয়েছি তোমার ভক্ত।
সিঁদুর-মাখানো পাথর দেখিলে তখনই মোছাই মাথা,
পায়ে ধরে' সাধি শীতলার গাধী, বিরূপাক্ষের ষাঁড়।

প্রাণপণে অবিরাম
ঋষি— হৃষীকেশ, বুদ্ধিনাথম, শিব, শনি, কালী, রাম।

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গতযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জ্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

(১)

দুর্গাপূজা

[এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, অভ্যাসের বশে আমাদের মনে তাহা জাগে না। বাঙালীর ঐ দুর্গা-প্রতিমায়, মহিষ-মর্দ্দিনী শক্তির সহিত যে অপর দেব-দেবীগুলির সমাবেশ দেখা যায়, তাহা কোন পুরাণে, সংহিতায় বা প্রাচীন মূর্ত্তি-শিল্পে আর কোথাও নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ ব্যাখ্যা আন্তঃস্ত কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতেই হয় তো, বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাতসারেই, বাঙালী-প্রতিভার একটা গূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যে অজ্ঞাত বাঙালী-সাধকের ধ্যানে ঐ পূর্ণাঙ্গ-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি যে বাঙালী-জাতির বিশিষ্ট ভাবনাকেই একটি প্রতীক-রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ভাবনা কি? বাঙালী সমন্বয়বাদী; সে, সৃষ্টি ও প্রলয়, ভোগ ও ত্যাগ, জ্ঞান ও ভক্তি, রূপ ও রস, অর্থ ও পরমার্থকে সমন্বিত করিবার সাধনাটী। ঐ প্রতীকের মধ্যে তবুই তাহার দ্বন্দ্ব-বিষাদ ঘুচে — সমাজে ও সংসারগঠিত বহুবিধ ভাব-অভাব — তাহার প্রাণের সর্ব্ববিধ পিপাসা মিটাই লাভ করিয়াছে। ঐ প্রতিমার পরিকল্পনাতেও যেমন, তেমনই উহার পূজা-সম্ভারে সকল আচার-অনুষ্ঠানে একটা জাতির সমগ্র-চরিত্র আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে — ঐখানে বেদান্তী বাঙালী, তান্ত্রিক বাঙালী, ও বৈষ্ণব বাঙালী এক হইয়া গেছে।]

আশ্বিন মাসে, মাটীর প্রতিমা গড়িয়া কি পূজা করি? দুর্গা। কিন্তু দুর্গা কে? এ বিষয়ে মতামত অনেক আছে।

২য়। বেদে দুর্গাকে 'জাতবেদস' বলিয়া অগ্নি আছে। এটি জ্ঞানের পূজা।

৩য়। কেহ কেহ ইঁহাকে 'রাত্রি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি কি রাত্রিদেবী?

৪র্থ। ভাদ্রমাসে সিংহরাশিতে সূর্য্য অবস্থিতি করেন তাহার পর আশ্বিনমাসে তুলা-রাশিতে গমন করেন। সিংহের পর অর্থাৎ সিংহ-পৃষ্ঠে কন্যা।

আমরাও পূজা করি দিয়ে-পুয়ে তফা। আমরা কি লক্ষ্মীমন্ত পূজা করি?

৪র্থ। পৌরাণিক মতে ইনি সৌন্দর্যের — বিশ্বতোমুখী — শ্রীরের ছায়া, এবং ধর্মেরও জননী। এটি সাধারণ গৃহীত মত।

৫ম। সাংখ্যমতে জগতে প্রকৃতি আর পুরুষ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, এবং প্রকৃতিই জগতের মূল। এই প্রকৃতি সৃষ্টি। কেহ কেহ বলেন, ইনি সাংখ্যের সেই প্রকৃতিমাত্র। সেইজন্য ইঁহাকে 'আদ্যাশক্তি' বলিয়া থাকে।

হয়ত সকল মতই মিশাইয়া এই 'ধুমধুমা' দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অনেকগুলি কথা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। সঙ্গে অসুর কেন? ইহা পৌরাণিক মতে সঙ্গত — পুরাণে দুর্গা মহিষমর্দিনী। কার্তিকেয়, গণেশ, ইঁহারাও পুত্র। কিন্তু সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী কি জন্য? পৌরাণিক মতানুসারেও দুর্গার সঙ্গে ইঁহাদের কোন যোগই সম্বন্ধ নাই। ইঁহাদের পৃথক পূজাও হইয়া থাকে। ইঁহারা এ সঙ্গে কেন?

যাহাই হউক, এ প্রক্রিয়া কখনও মিথ্যা বিষয়ের প্রক্রিয়া নহে — তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া, এত কোটি লোকে, এত উল্লাসের সহিত কখন ইহা পূজা করিত না। যাহা বস্তুতন্ত্রে বস্তুমূল, তাহা কখন মিথ্যা নহে — ছলনার উপাদানমাত্র নহে। কে, পুরাণ, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব না — তাহাতে এ প্রশ্নের অন্ত পাওয়া যায় না। বস্তুর স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিব। — কি এ? জগৎশক্তি। সর্বজননী, সর্বকর্মকারিণী, সর্বনিয়ন্ত্রিণী, সর্বসংহারিণী। নিম্নের আজ্ঞাকারিতায় এবং অসুরের নিপীড়নে লোকে সেই অনন্তশক্তিরই পরিচয় দেখিয়া থাকে। শক্তি হইতে যে বিনাশ, এবং শত্রুর নিপাত তাহা সেনাপতি কার্তিকের মূর্তি সূচিত করে। কিন্তু বাঙ্গালী কেবল শক্তিপূজায় সন্তুষ্ট নহে। নিজে শক্তিহীন; কেবল শক্তিমাত্র আরাধ্য হইলে বাঙ্গালীর ঘোর দুর্দশা হইত। শক্তি যেমন সর্বলোক-পূজ্য, আর দুইটি বিষয় বাঙ্গালীর কাছে তেমনি পূজ্য। বাঙ্গালী দর্শন-শাস্ত্রে শুনিয়াছে যে, জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স — শক্তিতে নহে। ঐশী শক্তির গুণে, জ্ঞান যাচ্ঞীয়, আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না।

আরও বাঙ্গালী দেখে যে, শক্তিই হউক, আর জ্ঞানই হউক, ইহকালের সুখ, দুইয়ের এক হইতে হয় না। শক্তিশালীও দুঃখ পায়, জ্ঞানবানও দুঃখ পায়। অতএব ইহলোকের সুখ দুইয়ের একেরও দেয় নহে। সেটি তাহাদিগের। অতএব তাহা একটি পৃথক্ দেবতা। তাহা লক্ষ্মী; জ্ঞান সরস্বতী। বাঙ্গালী তিনটিকে একত্রে পূজা করে। এই বাঙ্গালীর মহোৎসব।

আমরা এতক্ষণ বলিতেছি না যে, শারদীয়া প্রতিমার আদি এইরূপ। এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। আদি বোধ হয় পুরাপুরুক; এবং পুরাণের কল্পনার আদি সাংখ্য। তবে, লোকে যাহা ভাবিয়া এ পূজায় এত অনুরক্ত তাহাই বলিতেছি। এখনও বলি না যে, এই সকল কথাগুলি তাহাদের অনেকেরই স্পষ্টতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যাহা অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, অথচ চিত্তরে আছে — তাহাই বুঝাইতেছি।

এমত হইতে পারে যে, এই প্রক্রিয়ার আর একটি সূত্র আছে। হিন্দুধর্ম ত্রিতত্ত্বাত্মক। প্রাচীন ত্রিমূর্তি, — অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য। আধুনিক ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহেশ্বর। ঈশ্বরের বা পুরুষের তিনটি গুণ — সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। স্থূল চক্ষে যাহারা দেখে, তাহারা সংসারে তিনটি শক্তি দেখে — বল, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা, —দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী; শক্তি, ভোগ এবং জ্ঞান।

যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকে এ পূজা সাধারণ প্রবৃত্তির অনুচারিণী বলিয়াই লোকের ইহাতে এত অনুরাগ দেখা যায়।

(২)

ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্য-প্রীতি

[এই প্রবন্ধটি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর ১২৬১ সালে, ১লা শ্রাবণ তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা ইহা উদ্ধৃত করিলাম এইজন্য যে, ইহাতে প্রাক্-বঙ্কিম-যুগে বাঙালীর সাহিত্য-প্রীতি ও রসাস্বাদ-পিপাসা কিরূপ ছিল, তাহার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলিবে; কারণ গুপ্তকবির এ বিষয়ে যে-সমাজের সহিত যা হোক একটা প্রতিযোগিতা করা যাইতে পারে। সেই পরিচয় কাহারো কিছু কিছু গৌরবজনক না হইলেও (বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা মনে করিতেন না।) আর এক কারণে মূল্যবান। গুপ্তকবির ঐ কাব্য-প্রীতির মূলে ছিল অতি-সহজ স্বচ্ছতি-সংবেদনা; তাঁহার নিকটে ঐ কাব্যরস উৎকৃষ্ট এইজন্য যে, উহাতে স্বচ্ছতীর রসাস্বাদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক উৎসাহ আছে; তাই, ঐ সকল গান এবং তাহার রচয়িতা সেই কবিওয়ালা-দলের জীবন-কাহিনী-সংগ্রহের জন্য তিনি এমন ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের ঐ সাহিত্য-প্রীতির মূলে যে প্রাণের উৎসুক্য ছিল, আজিকার এই সর্বোন্নত সাহিত্যালোচনার যুগে সেই প্রাণ, সেই প্রীতি কোথায় ?]

রাম বসু প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কৃত কবিতা সকল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা মন, প্রাণ ও জীবন পর্যন্ত পণ করিয়াছি। এজন্য সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিজেই আহার নিদ্রার নিয়ম সকল করিয়াছি। স্বদেশে ও বিদেশে পরিশ্রমপূর্বক নানাস্থান হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিয়াছি। অমুক স্থানের অমুক মহাশয় অমুক পীঠটি জানেন, ইহা শ্রবণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ যে উপায়ে হউক তাঁহার আশ্রয় লইয়া সেই পীঠটী জানিয়া লইয়াছি। তাহা না পারিলে জনপীঠর শরণপূর্বক কেবল আক্ষেপ করিয়াছি। অতুল এ বিষয়ে আমার যেরূপ অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন, এই জগতের কোন সুখেই সুখ বোধ নাই—কিছুতেই মন স্থির হয় না—কথায় কোন কর্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, শুদ্ধ পুরাতন সার গান করিয়া মনে মনেই ভাবনা করিতেছি। পীঠের মত একটী পীঠ পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তৎকালে বোধ হয় যেন ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

হর ও কীরের কিছুমাত্র ভোজন করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মে। তিমিরনাশ ভূরিপরিমাণ আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাসেই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যখন সর্বস্বই লোপ পাইবার লক্ষণ হইয়াছে তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয় তাহাই লোভনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক।—আমরা এই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া সাহসকে সহায় করতঃ প্রবৃত্তিদেবীর চরণে শরণ লইয়াছি। এ বিষয়ে এরূপ চেষ্টা ও যত্ন না করিয়া যদি আর পাঁচ বৎসরকাল আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া বৃথা যাপন করি, তবে এদেশে ঐ সমস্ত কবিদিগের প্রণীত কবিতাগুলিন্ প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের নাম পর্যন্ত লোপ হইয়া আসিবে। নব্যজনেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। একশত বৎসরের অধিক কালের কথা প্রকাশ করিতে চাহি না, ৪০।৫০ বর্ষের মধ্যে এই বঙ্গদেশে কবিগণের দ্বারা যে সকল আশ্চর্য আশ্চর্য কবিতা রচনা হইয়াছে তাহার যথার্থ গুণ গাথা করিতে হইলে প্রকৃত একখানি পুস্তক প্রকটন করিতে হয়। অল্পবয়স্কদিগের পক্ষে যে কয়েকটী পীঠ উচিত হইল ইহার

কোন কোন স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেই অনায়াসে ধরিতে পারিবেন।

স্থানাভাব বশতঃ অদ্য আমরা কেবল নিতাইদাস বৈরাগী ও রাম বসুর গান মাত্র প্রকাশ করিলাম; ক্রমে শ্রেণীবদ্ধরূপে অন্যান্য কবিদিগের কবিতা পত্রস্থ করিব, তখন তাহাতেই পাঠ করিতে করিতে লেখকও হইবেন।

কোন কোন গান অসম্পূর্ণ প্রকাশ হওয়াতে দুঃখজনক অন্তরে আমাদিগের অন্তঃকরণ অহরহঃ দগ্ধ হইতেছে। যথা রাম বসুর কবিতা —

"যদি অমলো- কোকিলা প্রমলো,
জলে হইত নির্ম্মাণ।
নহে কাল কৃষ্ণ, হাসিলে অন্ধ,
মনেতে বাঁচিত প্রাণ॥"

হে পাঠকগণ, আপনারা বিবেচনা করুন ইহার পর ঐ কবি কিরূপ বিচিত্র বাক্‌কৌশলে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অব্যক্ত থাকা সামান্য শোকের ব্যাপার নহে। আহা! ঐ কথাগুলি শ্রুত হওয়াতে ভাবগ্রাহী পাঠকের মন কেমন চঞ্চল হইতেছে! অমৃতের প্রফুল্ল-পঙ্কজ-মধুপানে — চাতক বহু-দীন নীরদ-নির্ম্মিত নীর-পানে, চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু-সুধাপানে, ভ্রমর সুরভিত মুকুল লক্ষিত মধুপান-লোভনে, ভূপতি স্বীয় প্রিয় সিংহাসনে, সাধ্বী স্ত্রী পতিব্রত-সম্ভোগে, রসিকজন রসালাপ-আস্বাদনে, এবং কুল আপন মনে বঞ্চিত হইলে — কাহার দুঃখিত না হয়, আমরা উত্তম উত্তম কবিতার অপ্রাপ্য অসম্পূর্ণ পূর্বরূপে বঞ্চিত হওয়াতে তদপেক্ষা সহস্রগুণে দুঃখ হইয়াছি। যদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া এই অভাব বিমোচন করিয়া দেন, তবেই আমাকে শান্ত করিতে পারিব, নচেৎ তাহার চেষ্টা নিবারণ পক্ষে কোনরূপ উপায় দেখিতে পাই না। এই কার্য্য কখনই একজনের সাধ্যায়ত্ত নহে। — ইহাতে বঙ্গদেশে সদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অনায়াসে বিদ্বজ্জনের পক্ষে বিবিধ প্রকার বিদ্যুদ্ধাটি হইতে পারে। — যাহাতে মনের মনোযোগ, তাহাতেই মনের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি? অতএব আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া বারম্বার বিপুল বিনয়ে ব্যক্ত করিতেছি, সকলে এই মহোৎসবে দূরদর্শী না করিয়া, যত্ন অবলম্বন করিলেই কৃতার্থ হইতে পারিব।

এই সকল কবিতা প্রকাশ পাইলে পূর্ব্বতন মৃত কবিমহাশয়েরা কীর্ত্তির সহিত পৃথিবীতলে পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত হইবেন। দেশের উচ্চ সন্তান এবা পাইয়া গৌরব-পুলের গৌরব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে। অনুমানিক অহংকারী অনিপুণ কবিদিগের গর্ব্ব-পর্ব্বত চূর্ণ-সহিত অবোধগণে নিপতিত হইবেক। যাঁহারা কবিতা-প্রবন্ধ-পথের পথিক হইয়াছেন তাঁহারা সহজেই কার্য্যসিদ্ধির উপায়-পথ প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

অনেকগুলি যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা-অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্ব্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী কবিতার রসজ্ঞ কিরূপে হইতে পারেন? কারণ তাঁহারা অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শুনেন নাই। হাটে বাজারে, সামান্য ব্যবসায়ীদিগের মুখে দুই একটা ইতর কবিতা শুনিয়া উপহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ফলে, ইহাতে আমরা ঐ নব্যদলকে অক্ষম বলিয়া দোষারোপ করিতে পারি না, কেননা, তাঁহারা অপরিচিত ব্যাপারে কি প্রকারে অনুরাগী হইবেন। — সম্প্রতি আমরা প্রীতিচিত্তে বিশেষ অনুরোধ করি, উক্ত মহোদয়েরা স্বদেশীয় এই সমস্ত কবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিবেন। স্থিরভাবে অবলোকন করিয়া মনের সহ মর্ম্ম গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন। দেশীয় প্রাচীন কবি-কবন্ধ কবিতা দ্বারা ভাবুকতা, রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন। — ইঁহারা কি

বিচিত্র কৌশলে ছত্র ধরে ছত্র ধরে কবিতা রচনা করে আসরে আসরে উপস্থিত করিতেন। শুনেছি কি না শুনিতে? কি অপূর্ব! তাহার কি মধুরতা! সৌন্দর্য! ভাবের কি তাৎপর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য! কোন শব্দেই অপ্রাচুর্য দেখিতে পাই না। ইঁহারা যখন যে ভাবের কবিতা রচিয়াছেন তখন সেই ভাবকে মূর্তিমান করিয়াছেন, আমরা সময়ে সময়ে বৎকালে রচিত কবিতা পাঠ করি, তৎকালে এত প্রত্যক্ষ হয় যে, সে সকল চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া হইয়া সমস্ত লীলা দ্বারা চক্ষু-সুখ বিস্তার করিতেছে।

আমরা অত্র কেবল দুইজন কবির কবিতা পত্রস্থ করিলাম, এই সমস্ত হইতে ধারাবাহিকরূপে নায়ক-নায়িকার উক্তিপ্রত্যুক্তির ছলে একটি, গান করিয়া অথবা পাঠ করিয়া দেখুন, এমনি বোধ হইবে — যেন স্ত্রী-পুরুষ কিম্বা সহচরীগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমাদিগের সাক্ষাতেই নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানাভাবে নানা ছলে কথোপকথন করিতেছেন। বিশেষতঃ রাম বসু যেমন সরল অথচ কতি সহজে অনেক ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তেমন কেহই পারেন নাই, কিন্তু অপরাপর মহাত্মদিগের কোন অংশেই ন্যূন বলিতে পারি না, তবে কোন কোন বিষয়ে কোন কোন পক্ষে কিঞ্চিৎ তারতম্য যায়। অদ্যূনা দুই শত বৎসরের পূর্বেকার কথা উত্থাপন করণে বিরত হইলাম। ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল "গোজলা গুঁই" নামক এক ব্যক্তি "পেশাদারী" দল করিয়া কলীতলে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। 'লালুনন্দলাল', 'রঘু' ও 'রামজী' এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত 'গোজলা গুঁই' প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। রঘু নিবাস কলিকাতায়, তিনি তরজার মূলে অবতারণা করেন, গান ও মূল কবিতে ভাল পারিতেন। লালুনন্দলাল ও রামজীর বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারি নাই।

হরুঠাকুর রঘুর শিষ্য, রামজী যেন রামজীর শিষ্য, এবং নিতে বৈষ্ণব লালুনন্দলালের শিষ্য। ইঁহারা সাধনা সহকারে আপনাপন 'দলে' অর্থাৎ গুরুর নামে কবিতা দিতেন। যে কালে লালুনন্দলাল প্রভৃতি দল করিয়াছিলেন, সে কালে 'হরু' নামক একজন চরওয়ালা, যাহাকে সাধারণে 'কেষ্টা বুঁচী' বলিয়া উল্লেখ করিত, সেই ব্যক্তি কবিতা রচনা দ্বারা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল, সভাস্থ লোকেরা অধিকার সমাপ্ত পূর্বক তাহার গান শ্রবণ করিতেন। বড় বড় 'ওস্তাদি' দলেরা তাহার নিকট গান লইয়া তথায় লোকের মনোরঞ্জন করিত। ঐ বুঁচি হরুঠাকুরকে অনেকবার পরাজয় করিয়াছে। আমরা ঐ কেষ্টার চিহ্নের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, সেষ্টা যখন করিয়া সেষ্টা কেবল একটা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা—

যাত্রা

হরি কে সুখ তোমার এ নীলে।
কাল প্রেম করিলে।
হইবে কুপতি, কুমুদা যুবতী পাইবে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে ত্যজিলে ভুলে।

চিহ্নন

কাম স্নেহের যে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,
রাধারের বেশ, এখন কোথা লুকালে।
যাতুলো বহিলে, প্রভুলো করিলে, গোপো গোপীকুলে,
গোকুলে অকুলে ভাসায়ে দিলে।

তাহার অপরাংশ প্রাপ্ত হই নাই। এ গানের বয়স ৭০ বর্ষ হইবে।

আহা! — যখন এত স্মৃতি। — সঙ্গীত-সুধায় এত কৃতি, তখন ইহাকে 'বুঁচি' বলিয়া যে সম্বোধন করিবে?

এই স্থলে দেখুন,— এন্টনি 'নিলে গুঁড়ি' একজন গণনীয় কবি ছিল। যে দেশের তাঁতি, গুঁড়ি, বুঁড়ি, হাড়ি এতদ্রূপ সংজ্ঞক, সে দেশের ভদ্রলোকেরা আরো কত উন্নত হইবেন।

বিভাই দাসের 'ওস্তাদ' নাসুমজমাদের কৃত একটি গান সাগ্রহপূর্বক প্রকাশ করিলাম, সকলে দেখুন। যথা—

মহড়া

হোলো ওই সুখো লাজো পীরিতে
চিরদিন সেহ কাঁদিতে॥

চিতেন

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, ছিঁড়েছে না যাবে ফুল।
ফুলেরি না ফুল দিয়ে দেখি, পাড়ালো কত দূর॥
দেখে এই হোলো, কাণ্ডারী পাথালো,
তরণি লাগিলো ভাসিতে।

অন্তরা

যখো প্রাণো যখো যৌবনো পিয়ে, সকলো সইলাম ধার।
তবু তার মন পাওয়া সখি, আমারো হোলো ভার॥
না বুঝিলো দাখো, উল্টে বিদেশে,
কিন্নে পরিবালে জগতে।

এ গানের বয়স ৮০ বৎসরের ন্যূন নহে। এ গানকে প্রেমসাই করিতে হইবে। ১৪০ বৎসরের এদিকে নহে, বরং অধিক হইবে 'সোজনা শুঁটি' যে সমস্ত গান প্রস্তুত করেন, কোন বিশেষ যন্ত্রের ঝঙ্কারে তাহার দুইটি পীতের কিরদংশ লাভ করতঃ সাধারণের গোচরার্থ প্রহসনাকারে প্রকটন করিলাম। যথা—

"এসো এসো চাঁদবদনি।
এ ছলে বিরলে কোরোনা ধনি॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে কৃষ্ণ,
তুমি আমার রাধা রসবতি॥১
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাশ্বেতী তুমি লো মায়া,
মনে ভেবে দেখ আপনি॥"২

তথা—

"প্রাণ তোরে দেখিয়ে, দুখো গেলো মোর।
বিরহ অনলো, হইলো শীতলো, জুড়ালো প্রাণো চকোর॥"

ইহার প্রথম পদটী কি চমৎকার! বেশভূষা সিদ্ধান্তবৎ সিদ্ধান্তবচক শব্দবিন্যাস দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। হায়রে শুঁটি, তুই কি মানুষ ছিলিরে! মহাপুরুষের ছায় যাহার বিশ্বাস, তাহার 'সোজনা' খাঁজনার দ্বারা কি এই সোজনার বিকাশ হইতে পারে? তোমার সঙ্গীতে, ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতের গুণে যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ হইলাম।

ওই ভাবি মনে,—
যাবি কি রে কেহ তব বান্ধবের সনে,
তব চিতা-ভস্মরাশি ছড়ায়ে বদনে,
স্নেহ-শিশু পড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাষা-রত্নবাসে
ধীরে তুমি; সাধা খেলা খেলিলে হরষে;
যমুনা হয়েছে পার; সেই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা?

'বীরাঙ্গনা কাব্য' (মধুসূদন)

পূজার বাজার

[লেখকের মন্তব্য। ইতিপূর্বে এই লেখকের আর একটি ছোটো আলোচনা উদ্ধৃত করিয়াছি, লেখকের আর একটি খুব ভালো ছবি কবিতাটি। ইহার বিষয়বস্তু অতিশয় পুরাতন; বাঙালীকে লেখক অনেক গালি ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে, এখনও হয়; তবে এখন দেশের ও সমাজের প্রায় আমূল পরিবর্তনে বাঙালী ভৈরব বলিয়া পরিচিত হইবার তেমন সুযোগ আর পায় না। এই কবিতা আসলে — তামাসা (fun); হাসাইয়া-উসকের উপায় হইয়াছে ইহার এক রকমের অত্যুক্তি (exaggeration); লেখক তাহাতে সিদ্ধহস্ত। লেখকের ভাষাটিও এই রসের খুব উপযোগী হইয়াছে; ইহার ভাষার যে সহজতা লক্ষিত হয় তাহা শক্তিমান লেখকের পক্ষেই সম্ভব। তা ছাড়া, একটা ব্যক্তিগত ভঙ্গিও (style) আছে, তাহাই সুখ্য হয়।]

এবার পূজোয় সময় মত পঞ্চাশের টাকার আগে পাঠাই নাই। কারণ, জননী বৃদ্ধা হইয়াছেন; মহাবৈদ্য ডাক্তার সি-এ, এম-বি, মাতাকে পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, — মাতার ভীমরতি উপস্থিত। সুতরাং মাতাকে পূজার সময় কাপড় দিবার আবশ্যক নাই। সেই অর্থে অপব্যয় যাহা। শাস্ত্রকারেরা অর্থের অপব্যয় করিতে এবং অপাত্রে দান করিতে মুক্তহস্ত নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্রের আজ্ঞা অমান্য মহাপাপ, — মাকে কাপড় দিয়া শুধু শুধু মহাপাপ-পঙ্কে কেন ডুবিব? বিশেষতঃ, মায়ের উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পা কাঁপে, কাপড় কিনিয়া আনিতে পারেন না, — আঙুল কাঁপে। সুতরাং মাতা কাপড় পরিবেন কিরূপে? যে জীব কাপড় পরিতে অক্ষম, তাহাকে কাপড় দান — অর্থের অপব্যয় নয় কি?

আর আমার ছোট ভাইটি থাকে বিদেশে — ছোকোবাবে — পরের বাসায়; — তা অসুখে কাপড় পাঠান চলে না। তাকে পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুলে কাপড়ের দ্বিগুণ দাম পড়িবে। রেল-পার্শলে পাঠাইলে খরচা কিছু কম পড়ে বটে, কিন্তু রেল-কোম্পানীকে দামকা পয়সা দিব কেন? — কারণ রেল-পথই আমাদের দেশের সকল অনিষ্টের মূল; — অনর্থক রেল-কোম্পানীকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আর ছোট ভাই ত আমার পর নহে, — পূজার সময় কাপড়ের মূল্য আজ্ঞা — এর পরে শীতকালে কিনিয়া দিলেও চলিবে। শীতকালে যদি টাকা ফুরান না হয়, তৌ যাহোই কিনিয়া দিব।

স্ত্রী একথা বলিতে পারে, ছোটবৌটি আছেন — বাপের বাড়ীতে; তাঁহাকে কাপড় দেওয়া উচিত কি না? কিন্তু কথা হইতেছে, — যখন মায়ের কাপড় হইল না, ছোট ভায়ের কাপড় হইল না, তখন ছোট বউয়ের কাপড় হয় কেমন করিয়া? — আমাকে পক্ষপাত-দোষ স্পর্শিতে পারে। ঘরের পয়সা দিয়া কাপড় কিনিয়া দিব, অথচ আমার লোকনিন্দা হইবে, এমন কর্ম আমি করিতে পারি না। বিশেষ, ছোটভাই যখন বিদেশে — দূরদেশে — পরের বাসায় আছেন, তখন ছোটবউয়ের এই বিদেশকালে কখনই ও নূতন কাপড় পরা উচিত নয়। শাস্ত্রকারেরা এরূপ কাজ নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, স্বামী বিদেশে থাকিলে স্ত্রীগণ কখনই উত্তম বস্ত্রাভরণে আবৃত হইবেন না। আমি বরং ছোটবউয়ের কাছে একটি লোক পাঠাইব; সে এইরূপই উপদেশ দিবে। উহুঁ, লোক পাঠাইতে বেশী খরচ হইবে, — পোষ্টকার্ডে এই কটি কথা লিখিয়া পাঠাইলেই চলিবে; —

"ছোট-বধূ! স্বামী তোমার বিদেশে; — তুমি এক দিন মাথায় চুলগুলি বুড়া করিয়া ছাঁটিয়া

ফেলিবে। পায়ে যদি আলতা পরিয়া থাক, তা'ও তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিবে। শিরঃস্নান যদি মুক্ত কাপড় পরিয়া থাক, তবে পদ-পাঠমাত্র সেখানি খুলিয়া, একখানি সাদা ফেরা কাপড় পরিবে। গলায় অঞ্জন দিয়া থাক, তা ঘুচিয়া ফেলিবে, কর্ণে মুখ দেখিবে না। শাস্ত্রের ইহাই আদেশ, — তাই আমি লিখিয়া জানাইলাম। তাহা না হইলে কি আমি অন্ত তোমার পাঁচসের টাকা মূল্যের একখানি বারাণসী কিনিয়া দিতে পারিতাম না? আমরা পতিব্রতা হিন্দু-পরিবার; আমাদের হিন্দুয়ানি চলা উচিত; তাই তোমাকে এই উপদেশ দিলাম।"

অতএব, প্রথমেই বলিয়াছি, পঞ্চাশজনের এবার পূজার বাজারের জন্ত অর্থের আদৌ আবশ্যকতা নাই, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি বাক্তির জন্ত — যৎকিঞ্চিৎ— সে অতি সামান্তই, — নয় বলিলেই হয়, — টাকার দরকার। তা সেজন্ত যদি হাতে টাকা না থাকে, তা' হাওনোট লিখিয়া দি; তাতে যদি না হয়, তা' তমসুক রেজেষ্টী করিয়া দি, — না হয়, বিষয় বন্ধক দি। — ইহাতেও যদি কেহ টাকা ধার দিতে সঙ্কুচিত হয়, না হয় শালগ্রামের দৈতাই বেচিব! বেশী লোক নয়, বেশী লোক নয়, — কয়েকজন মাত্র। এবং তাঁহারা অতি ভালমানুষ ও ভদ্র-সন্তান, — দেখিতেও সুন্দর; কথা মধুর, নাক সকলেরই বাঁশীর ন্তায়। বড়-ঘরোনা কিনা! তা বেশী লোক নয়, বেশী লোক নয়! — অতি বৎসামান্ত টাকা হইলেই হইল। লোকসংখ্যা অতি কম, — অতি কম। — এই দেখুন না কেন হিসাব করিয়া; —

অগ্রে মুখে ছাই দিয়া আমার কেবলমাত্র দাড়ীওয়ালা বুদ্ধা কীর্ত্তনী আনিতে হইবে; এবং তাঁহার উপস্থিত তত্ত্ব দাড়ীর মাত্র পঞ্চি, এবং সঙ্গেমাত্র দাৎ-সাতে উনপঞ্চাশটি আলিকা-সন্তান। তা বেশী লোক আর কৈ? এমন ত হইয়াই থাকে।

গায়কটী রূপবান্, গুণবান্, উদারচিত্ত সঙ্গীত এবং বাদকটী চন্দননগর নিবাসী। তাহার উপর সাত-সাত ছুরস্তটী ছাত্রছাত্রী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুসলমান! তাহাদের বাবড়ী, চুড়বাবড়ী, সিঁথেবাবড়ী, মাঝেবাবড়ী, আবোবাবড়ী — এইরূপ পীতা, সাবিত্রী, সরস্বতী অন্নপূর্ণা-ভাতীয়া মোটমাট আটটী আসিবেন। তাহাদের তুলা বয়স মেয়ে জন আসিবেন। প্রত্যেক বাবড়ীর এক একটী করিয়া নব-কার্ত্তিকের তুল্য আতার ভিক্ষাপুত্র আছে। প্রত্যেক ভিক্ষাপুত্রের চার-চারিটী করিয়া পুরাতন সঙ্গিনী এবং একটী করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গিনী স্ত্রী। বাবড়ী-বাড়ীর তিনটী কি, — তাহারা দুইটী পাকা-চুলে, আর একটী নরুণ-পেড়ে; তিনজনেরই কাঁধে ঝোলা-ঝুলি; একটী পায়ে আধিক-ঝুটা ছুটী চাদর; একটী গোপেশ্বর-তীর্থের দাসত্ব করে। চামর-হাতে সহিস একজন; খাসলা-আপদ-ওয়ালা কোচমান একজন; এবং কাঁচি-ঝুটী, মাথেপাতা মেথরাণী একজন আসিবেন; টেড়ী-কাটা বয়ের ব্রাহ্মণ একজন; পঞ্চপোকা-লাঞ্ছনা ছয়-ছেলে-মেয়ে-দিনী খুঁজুন, উচ্চ-শিক্ষিত নাপিত একজন, অট্ট-হাসিনী নাপতিনী একজন, খড়দহবাড়ীর নাম-পাওয়া মধুকণ্ঠ ভিখারী একজন; খড়দহবাড়ীর বেতাবাদের, জোতিষীর — গুরু, পুরোহিত এবং মহাপোড়া মানুষ এক-একজন; এবং খড়দহবাড়ীর গ্রামের যাহাদের আদি অক্ষরে 'শ' আছে, এমন ধারা নর-নারী একান্ন জন। মোট তেরজনই ত হইল? একবার ঠিক করিয়া দেখুন না! আহা বিরাশীর সংখ্যে — তেরটী না হইবে! ঠিক-ঠাক দিয়া, দেখাশোনা করিয়া থাক পাড়িয়া, তেরিজ করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের অতলাস হইতে পারে। নয় নয়! কয়টী না হইবে? এই তেরটী মহাজন নর-নারীকে পূজার সময় মোকলাপাড়ায় তত্ত্ব না পাঠাইলে ভাল দেখায় কি? তুমাকে আমাকে এতদূর করিবে! তা আমি যেমন করিয়া পারি, তত্ত্ব পাঠাইব। এ সংসারে এতাবৎ তত্ত্ব টাকা যাহাকে খরচ হইয়াছে,

—শিয়ার ভাবে, ভাবার থেকে কাটে, পুরোহিতার নিত্যপ্রয়োজনে, আমার বাসা-খরচে বছরে অনেক টাকা দুধা খরচ হইয়া থাকে। তা, এ পুজোয় পরিবার কাপড়ে, এ সামান্য টাকা বাদ করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে কেন?

ঐ যে, ডাক-হরকরা আসিয়েছে। দেখি, বড়ীর চিঠিতে আজ সহধর্মিণী কি লিখিয়াছেন।

হরকরা আসিয়া পত্র দিল। প্রভু পত্নীর পত্র পাইয়া পরমানন্দে পাঠ করিতে লাগিলেন ;—

"প্রাণের নাথ হে!

আজ তিন দিন হইল, বাড়ীতে যাহাকে যাহাকে কাপড় দিতে হইবে, তাহাদের নামের ফর্দ পাঠাইয়াছি। এবং যাহাকে যাহাকে কাপড় দিতে হইবে না, তাহাদেরও নাম লিখিয়া দিয়াছি। এবারও আমাদের বড় টানাটানি। তা আমি জানি। কিন্তু যাহা বলিলে নয়, তাহাতে চাই। প্রাণেশ! অন্য আমার এই নিবেদন, যাহাদের জন্য সুতার কাপড় কিনিবে, তাঁহাদের কাপড় কয়েকটাতে দাসবাগানের ধার টাকা হিসাবে জোড়া হওয়া চাই। আর আমার মায়ের জন্য মুর্শিদাবাদী ভাল রেশমের কাপড় কিনিবে। মা আশীর্বাদিত হইয়া তোমায় কত আশীর্বাদ করিবেন।

"আমা ও সুতার মাপ পাঠাইয়াছি, যেন হারাইয়া ফেলিওনা। তুমি তবে বাড়ী আসিবে, তাহার ঠিক নাই, লিখিয়াছ। জিনিষগুলি বোলা, তৃতীয়ায় কি আমার নিকট পৌঁছান চাই।

"ফর্দ্দিকার পত্রে একটী কথা লিখিতে ভুলিয়া-ছিলাম। আমার ছোট ভাই কতকগুলি পাখা পুষিয়াছে। এই পূজায় সময় বাড়ী পাঠাবার জন্য চব্বিশটী সোনার ঘুঙুর দিতে পারিলে ভাল হয়।

"আমার বড় ননদিনী একটী বাঘ পুষিয়াছেন। বাঘের জন্য একটী রেশমী ছিটের আবশ্যক চাই। যদি বিড়ালের কোন রকম জামা কলিকাতায় উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা তিনটী কিনিবে। কারণ, আমার বকুল-ফুলের বইয়ের তিনটী বিড়াল আছে। অন্যের কিছুই চাই না। তোমার যেন টাকা খরচ হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নয়।

"তদ্ভিন্ন! তোমাকে কোন কথা লিখিতে আমার বাধা নাই। আমার পূজনীয়া মাতা বৃদ্ধা হইয়াছেন ; তাঁহার এখন অক্ষচিও কিঞ্চিৎ অধিয়াছে। শুনিতে পাই, কলিকাতার আশিন বাজারে ভাল পাকা আম পাওয়া যায়। টাকায় একটী করিয়া পাকা আম হইলে পঁচিশটী আম মায়ের জন্য আনিবে। যেন পাকা না হয়,—যা দু'দিন রাখিয়া যেন খাইতে পারেন। ইতি—

আমি তোমারই—
মলিনীবালা দেবী"

পত্র পাঠ করিয়া, প্রভু পরমানন্দ প্রাণেশীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; — "দেখিয়াছ, আমার সহধর্মিণীর কেমন ভাল স্বীকার! সংসারে অপরের জিনিষ লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজের জন্য কিছুই চাহেন নাই! বিজয়ার এই ক্ষণেই আমি মুক্ত হইয়া জীবিত আছি।"

ঔষধের গুণে স্বামী যেন শুনে
— যেন শিশুরের ঘুমা।
মিছা ভেবে আমি চিনাইয়া স্বামী
মুখে তুলে দেয় ওষুধ।

ঔষধের গুণে প্রকার বিহনে
স্বামী মুখ ফাটে মুখে।
ভেবে শিরুবাস ঘরে উপবাস
বাপের যেয়ের না যেবে।

— কবিকঙ্কণ

"বয়স"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আগে কি কি হইয়া থাকিবে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই আন্দাজ করা যাইবে, তাই সে সবের বিস্তারিত বিবরণ আর দিলাম না।

শাদু মায়ের হাতটা বেশ করিয়াই ধরিয়া আছে, কোমল তুলোর হাতটার উপর আঙুলগুলা চাপিয়া বসিয়া গেছে, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখা যায় আঙুলের পাশে পাশে রক্ত জমিয়া উঠিয়াছে। মায়ের কষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহার চেয়ে শাদুর কষ্ট কি অল্পমাত্র কম? তবু উপায় নাই হাতটা ছাড়িবার।

আবার ব্যথিত স্বরে বলিল—"ঘুমো খোন মানু। ...কি ছেলেমানুষী করতে যাচ্ছিলে! পাশের বাড়িটা নেহাৎ খালি ছিল, গেয়ে ফেলাম তাড়া, হঠাৎ এসে পড়তে পারলাম, নৈলে কি সর্বনাশ এতক্ষণ হয়ে যেত! এসব বুদ্ধি তোমায় কে দিলে?"

মানু ব্যাকুল মিনতির সহিত চাহিয়া বলিল—"আমি থাকতে পারব না।... কি করে থাকব বলো? আর কেউ না বুঝুক তুমি তো..."

ঘর চুপ হইয়া আসিল, একটা লজ্জার উপর আর একটা লজ্জায় পড়িবার ভয়ে চুপ করিয়া গেল।

ওকেই সাক্ষী মানিয়া বলায়, শাদুর মুখ দিয়াও কিছুক্ষণ কথা বাহির হইল না, সেও নিজের কণ্ঠস্বরকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। একটু পরে মানুই কথা কহিল, হাতটা মুক্ত করিবার জন্য একটু ঘুরাইবার চেষ্টা করিয়া সেইরকম ব্যাকুল মিনতির সহিত বলিল—"ছেড়ে দাও আমায়, আর যদি ধরে রাখিও না তুমি।... কেন এলে? কি করে এলে? যাও তো তুমি না..."

"ঘাঁটি থেকে এসে শুনলাম তোমার হঠাৎ জ্বর হয়েছে, আর ঘরে ঘোর হয় নিরুপায়ের হয় বিরক্তি, সেইজন্যে কলকাতা ছেড়ে তোমার বাবা চন্দননগরে সবাইকে নিয়ে চলে গেছেন। কী যে মনে হোল মানু—তুমি মেয়ে হয়ে যা করতে যাচ্ছিলে, পুরুষ হয়েও মনে হোল তাই করি আমি—সেই তা'রে দিই একার্থ জীবন। আবার ভাবলাম—কেন? এতো জানাই ছিল, কেউ তো ওঁরা আমায় চাইতেন না, আমি গরীব, সম্বলহীন, যে চাইত তার মনের যে ধুলো সেই এঁরাও তো আমায় জানা ছিল—মনটা কি প্রস্তুত ছিল না এর জন্যে? যদি না ছিল তো থাকা উচিত ছিল না কি?... অনেক তর্ক করলাম মনের সঙ্গে, কিন্তু মন কি শোনে? তখন..."

মানু ঘাড় নিচু করিয়া বলিল—"তবে আমায় বোঝাবার চেষ্টা করছ কেন?"

শাদু তাহার পিঠে হাত দিয়া একটু মুখের কাছে চাপিয়া ধরিল, বলিল—"বড় তর্ক করো মানু, দুষ্ট মনের মত; মনে আমার মনের মন, প্রাণের প্রাণ, এ বুঝবে না কেন?"

একটু সেই ভাবেই মনের মনের একটা গভ স্পর্শ লইল যেন, তাহার পর বলিল—"একবার মনে হোল যাই চন্দননগরে, একবারটি দেখি তো শেষ দেখা দেখে আসি। তারপর মনে হোল নিরুপায়ের ফিরে যাবার জন্যে যেখানে যেতে, উপদ্রবটা তো আমিই, একের কি আর?... মনে করলাম ভুলে যাবারই চেষ্টা করি..."

"খুব মন তো!—ছেড়ে দাও।"

শাদু আর একবার একটু আবেগভরে চাপিয়া ধরিল মুখের কাছে, বলিল—"চেষ্টা করলেই হয়!—তবে তোমায় বোঝাতে পারছি না কেন?... আসবই না ঠিক করেছিলাম, তারপর হঠাৎ একটা

কথা মনে পড়ে ছেলেটির চোখের এই রকমে,— আমার প্রেমে যা হচ্ছে যদি তার মনেও সেইরকম হয়! যদি এইরকম নিজেকে সে ভরে ফেলতে যায়!...”

খুব ঘরোয়া!...

“‘তো’—মনে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম মাত্র,

হচ্ছে মনে তোমার, এরপর কি আসতে পারে?—আসলে বাঁচতাম কি? বাঁচলেও কি চৈতন্য-হত হয়ে পড়ে থাকতাম না? পারতাম একটা পথ বেছে আসতে?”

উত্তরটা বোধ হয় মনের মতো হইয়াছে, মাত্ত এবার নিজেই বুকের মধ্যে চাপিয়া আসিল একটু, বলিল—“বেশ, কিন্তু ধারটা টের পেলে কি করে?”

সেটা যেন কিছু শক্ত ব্যাপার না, চন্দননগরে ফিরিয়া যখন টের পাওয়া গেল—সম্ভবত গঙ্গাতেই, তখন কোন্ বাড়িতে কলিকাতা হইতে নূতন লোক আসিয়াছে, বিবাহের ডোরাডোর হইয়াছে, সে-খবরটা পাওয়া খুব বেশি শক্ত হইল না—বিশেষ করিয়া একজন প্রেমিকের পক্ষে। কিন্তু সে ভাবে না বলিয়া শাত্ত উত্তরটার প্রেমিকের মতো করিয়াই দিল, বলিল—“সেকথা আমার জিগেস ক'র না মাত্ত, কি জানে টের পেলাম তা আমার কাছেও এখনও একটা রহস্য, শুধু এটুকুই জানি, কে যেন আমায় এইখানেই টানিয়া নিয়ে এল—কে যেন বললে, তুই যাকে চাস্ সে এইখানেই থাকে, এই বাড়িতে। পাশের ছোট বাড়িটা খালি ছিল—তাও কেবল ভাবি না, আমি চোখ-কান বুজে ভাড়া নিয়ে নিলাম। গঙ্গার ধারের ঘরটিতে বসেছিলাম—যদি তুমি আস এদিকে; দেখি, তুমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলে, বাগানটা পার হয়ে এই বেঞ্চের দিকে আসছ। অনেক দিন পরে দেখে আমি আগে ভুলে গিয়েছিলাম, তারপর হঠাৎ সেই কথা মনে হোল—বাড়ি নিশ্চয়ই, মাত্ত এত মাসে গঙ্গার ধারে আসে বেশ! তক্ষুণি বেরিয়েছি তক্ষুণি তুমি তোমার ঝিয়ের খোঁপা খুলে হাতে করে নিয়ে ওটা, আমি পাশের মতন পাগল উপরেই এলে...”

উত্তরটা আরও মনের মতো হওয়ায় এবার মাত্ত নিজেই শাত্তর বুকে নিজেকে একটু চাপিয়া বলিল, বলিল—“বেশ, এসেছ ভালোই হয়েছে; এবার ছেড়ে দাও, তোমার কোলে মাথা রেখে বসি—গঙ্গায় বান, এমন জোৎস্না, তুমি আছ, এমন দিন কি পাব আর জীবনে?”

একটু চুপ করিয়া থাকিতেই হইল দুজনকে, তাহার পর শাত্ত বলিল—“না ছেলেমানুষী রাখো, মাত্ত, আদিখ্যেতার মতন পাপ আর নেই। দাও এটা আমায় দিয়ে, গঙ্গার জলে ফেলে দিই। ভেবে দেখো না—প্রতাপকে না পাওয়ার পরও তো সৈরন্ধ্রী বেঁচে ছিল...”

মাত্ত হাসিয়া উঠিল, বলিল—“সৈরন্ধ্রী পোড়ারমুখী—পেলে আমি তাকে টুঁটি টুঁটি করে কাটতাম। না, না, আমি তার মতন করে বেঁচে থাকতে পারবনা—না, কক্ষনই না...”

তাহার পর হঠাৎ কি মনে হইল, শাত্তর বুকের মধ্যে থেকে সরিয়া আসিল মাত্ত, খুশিয়া বসিয়া বলিল—“বেশ, এই নাও দিয়ে দিচ্ছি...”

খোঁপাটা শিথিল করিয়া দিল। বেশ জড়াই একটা খাপিয়ের বেণী, —শাত্ত তাড়াতাড়ি সেটা খানিক করিয়া লইয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর একটু বিস্মিত ভাবে মাত্তর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—“দিয়ে দিলে যে?”

“ছাড়লে না, তাই দিয়ে দিলাম এখন...”

“‘এখন’ মানে?”—শাত্তর কণ্ঠস্বরে তার রেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

“‘এখন’ মানে—যতদিনই তো কাছে থেকে ছেড়ে নিতে পারবে না, দুদিন পরেই তো সে পথ বন্ধ হবে...”

শাশু ঝাড়োটা উঠিল, তার আড়েই, তাহার সঙ্গে কিন্তু আরও কিছু একটা — মুখটা যেন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে. বলিল — "মাজু!..."

— শুধু এইটুকুই বলিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মাজু দৃষ্টি নত করিল, তারপরে তেমনি স্বরেই বলিল — "হাঁ তাই ... সবাই সৈরন্ধিনী নয় ..."

শাশুর স্বরটাও কঠিন হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল — "বেশ, পারবে ?"

"হাঁ পারব ... মেয়েরা কি না পারে ?"

"বেশ, এসো তাহলে ... "

নীচেই বর্ষাস্ফীত নদী. মুহূর্তের মধ্যেই ঝেলি টপকাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এইটুকুই এই কাহিনীর পক্ষে প্রয়োজন, বাকিটা এতরকম অবান্তর। মাজুর চীৎকারে বাড়ির সবাই সবল ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। শাশুকে তুলিয়া ফেলা হইল। এর পর বিবাহ ছিন্ন আর পরাক্রম ছিল না, তাহাই হইল।

ঘটনাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের; নায়ক নায়িকার উপর বর্তমানের প্রভাব দেখিয়াও সেটা অনুমান করা যায়।

পঞ্চাশ বৎসর পরের একটি অনুরূপ ঘটনার কথা বলি এবার। —

রায়বাহাদুর উপরের ঘরে একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া পড়পড়া সেবন করিতে করিতে খিয়ার একটা নূতন আজ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় স্ত্রী মুখটা গম্ভীর করিয়া আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রায়বাহাদুর দৃষ্টি তুলিলেন, তাহার পর মুখের ভাব দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেন — "কি ব্যাপার ?"

"ঐ শোন, শুনতে তো পাও না, ঘরের দুখ ভাতে খাওয়েই কাজ দেখে। একটা কিছু যদি না হয় আমার নামে কুকুর পুষে রেখো। ঐ শোন, আবার ঐ আরম্ভ হোল "

ব্যাপারটা এই যে, রমীশ আসিয়াছে এবং চিত্রা তাহাকেই গানটা শুনাইতেছে। তাহাও যে তাহার কর্ণকুহরে অনুতবর্ষণের জন্যই করিতেছে এমন নয়, রমীশের কাছেই গান শেখে, তৈয়ার হইলে মিলাইয়া লয়। এও নিত্য-নিয়মিত নয়: হয়তো রমীশ একটা নূতন গান লিখিল, চিত্রাকে শুনাইল, পছন্দ হইল চিত্রার, আসায় করিয়া লইল। ... হয় এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, খুঁজিয়া পাতিয়া নূতন গান লিখিবার ঝোঁকটা রমীশের বাড়িয়াছে চিত্রার, চিত্রারও আসায় করিবার ঝোঁকটা।

স্বামী-স্ত্রীতে নাড়ুনির জন্য বিরতিতে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। এদের আধুনিকতা মোটেই পছন্দ করেন না দুজনের কেহই। সিনিয়র নাকের নথ কর্তার পড়পড়া তাহার কতকটা সাক্ষ্য দেয়। তাহার উপর যে বিপদ ঘটিয়াছে; — একটা গান না হয় লিখিল তখনও — প্রতিবেশীর ছেলে রমীশ. বহুদিনের জানাশোনা; ছেলেও ভালো পড়াশোনায়, এদিকেও হঠাৎ একটা বিপদের সম্ভাবনার কারণ নাই।

কিন্তু বিপদ অন্যদিকে ঘটিয়াছে যে — নিতান্তই গৃহস্থের ছেলে, গরীব বলিলেও ভুল হয় না ... অথচ চেহারা হঠাৎ অমন একটা চোখে পড়ে না। বিপদ যে সেইখানেই।

এদিকে সরলা রায়বাবের বৈমাত্র শাশুড়ীর ছেলের সঙ্গে রায়বাহাদুর কথা প্রায় পাকা করিয়া আনিয়াছেন; সমান সমান ঘর, সাহেবমহলে রায় সাহেবের অমন প্রতিপত্তি. ছেলের ভবিষ্যৎ বাঁধা একেবারে।

খান যেন পুলক হইয়া উঠিয়াছে; পাশ্চাত্য টাইম পিস্ খুলিয়া দিয়া হারবার্টের চুল করিয়া আঁচড়াইয়া দিলেন, মুখটা খুবই গভীর, দৃষ্টিতেও দুঃখটা আরও।

হারবার্টের উঠিয়া বসিলেন, যেন একটু মাতব্বর ধিক্কারের সহিত বলিলেন—"তোর আক্কেলের বিহারি করেছি!... ভাগ্যিস মেয়েছেলে, সব কথা তো আমি বলতে পারি না, তোমাকেই বুঝিয়ে বলতে হবে, যেন একটু শক্ত করেই বলবে।... আমি ছেলেটিকে না হয় বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলব একদিন। কত ইসারা ইঙ্গিত দিচ্ছি—তুমিও তো দিচ্ছ—যেন কাকে দেখতা হচ্ছে!—জ্বালা বিপদ তো!"

—কথা হইতেছে পলাশবনের পূর্বের সেই শাস্ত আর মানুষ জোড়াই—এখন হারবার্টের বক্তব্যের মুখোপাধ্যায় অর্থ 'হারগিট' মানবাহুবল্লী দেবী।

ছেড়ে দিলুম পথটা, বলল যেন ঘরটা—
যখন অবস্থায় পড়লে পরাজিই বড় বলায়।

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি—প্রথম, যে রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায়, অভিনব মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী—বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিব্য-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

সভ্যতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিচার-বুদ্ধির ঐকান্তিক বশ্যতা

ঐতিহাসিকদের মতে, আথেনীয় সভ্যতার সারবত্তা নিহিত আছে—পেরিক্লিসের একটি বক্তৃতায়, যে বক্তৃতায় তিনি আথেনীয়দিগকে একটা মহৎ দুঃসাধ্য ব্রতে সাধনা শিখাইয়াছিলেন। পেরিক্লিসের ঐ বক্তৃতার একটি সুন্দর ভাব-পরিচয়ের আভাস আছে—বক্তৃতাটি খুবই সুন্দর। কিন্তু সভ্যতার সারবত্তা বলিতে যে অভিনব সুন্দর বস্তু বোঝায়, তেমন রাষ্ট্র-নৈতিক বক্তৃতায় আমি তাহার সন্ধান করিব না। আথেনীয় সাধনার সেই মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে পেরিক্লিস, ইসোক্রাতেস (Isocrates) প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কের বক্তৃতা অপেক্ষা আরিস্তোফানেস (Aristophanes), ইউরিপিদিস, প্লেটোর সক্রেতীয় গল্প-গুলি করিয়া পাঠ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যে দুইটি—জ্ঞানমার্গের মত—হেলেনীয় সাধনা ও সংস্কৃতিকে প্রাণ এবং সৌরভ দুই-ই দান করিয়াছে, তাহা যদি কোথাও থাকে, তবে কবি, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদিগের লেখাতেই আছে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, কেবল তাহাদের রচনাতেই উহা বিলিয়া পাইবে, কিংবা তাহারাই উহার একমাত্র

প্রত্যেকেরই ; তবে আমি এখন সেকথা বলিতে চাই না যে, আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে যাহাদের অধিকাংশই, সেই কার্য্যের কোন বাহ্যিক নিদর্শন, কোন সুস্পষ্ট চিহ্নচিহ্ন রাখিয়া যান নাই ; হয়তো কেবল এমন একটি প্রভাব বিকিরণ করে যাহা সেই-যুগের মূলমন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর যাহাই হৌক, কোন রাষ্ট্রনৈতিককে জাতির আধ্যাত্মিক বা মানসিক সাধনার প্রবর্ত্তক বলিলে নিতান্তই হাস্যকর হইয়া পড়ে। সমাজের অভিনেতা অথবা মেরুদণ্ডের 'অস্থি'র মত, রাষ্ট্রনৈতিক মহারথীরা কেবল তাৎকালিক স্থায়ি অর্জ্জন করিয়া থাকেন ; পরে, তাহাদেরই মত, জনসঙ্ঘের স্মৃতি হইতে নিশ্চিহ্নিত হন, পণ্ডিতমণ্ডলের গবেষণার বিষীভূত হইয়া যান ; — 'জীবৎ-কালে উপহসিত এবং মৃত্যুর পরে বিস্মৃত' হইয়া থাকেন। দুইদিন পরেই যাহাদিগকে কেহই স্মরণ রাখিবে না, তাহাদেরই বাহ্য মহীয়সিত্বে ঘনিষ্ঠা বেশ্যার মত, তাহা অপেক্ষা হাস্যকর আর কি হইতে পারে ? বলুন দেখি, আপনাদের বন্ধুদলের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন — ওয়াটার্লুর যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কে ছিলেন ? ওয়াক্-অফিসেই বা কে ছিলেন ? অথবা, সে সময়ে 'কার্ল্ড অব আর্চবিশপ্‌স্' ছিলেন কে ? যেসব অভিনব মুনিঋষির ইংরাজ নর-নারী সেই নেপোলিয়ন-যুদ্ধ-কালীন প্রধান মন্ত্রীর নাম বলিতে না পারেন ; যিনি তাঁহার সহযোগী মন্ত্রীগণের, তাঁহার অধীনস্থ ইংরেজদের অধিক যোদ্ধপুরুষের, কিম্বা তাঁহার নৌ-সেনাপতির একজনেরও নাম না বলিতে পারেন,—তথাপি, প্রত্যেক দ্বিতীয়শ্রেণীর আড্ডাধারীকেই এ সংবাদ দিতে পারিবে যে, ঐ সময়ে শেলী, বায়রণ, কীটস্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, স্কট, মূর, ব্রুহাম এবং যেন অষ্টম প্রভৃতি — গদ্যে ও পদ্যে লাদিয়া রচনা করিতেছিলেন। ইহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইঁহারা সেকালে যেমন, একালেও তেমনই, মানুষের মনে একটা প্রবল ভাবধারা সঞ্চার করিয়া থাকেন ; ইঁহারা এখনও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, এখনও মানুষের জ্ঞান ও চিন্তারাজিকে পূরিত করিতেছেন ; এখনও আমাদিগকে নিত্য-নূতন সৃষ্টি দান করিতেছেন, অথবা পুরাতন সৃষ্টিরাজির পরিবর্ত্তন করিতেছেন ; এখনও তাঁহারা জনসঙ্ঘের যাবতীয় চিত্ত-চিন্তার সঞ্চিত সম্পদ সৃষ্টি করিতেছেন। ঐ সকল রাষ্ট্রনেতাগণ যত জোর সেই শুভ সম্পদগুলি সমাজ যে লাগাইয়া যতজন যন্ত্রে বিতরণ করিতে পারেন— তাঁহারা নিজে কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না। যদি তাঁহারা স্মরণীয় হন, তবে সে কেবল কোন বড় ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য—সেই ঘটনার কোনটাই তাঁহাদের দ্বারা ঘটে নাই।

অতএব আমি পেরিক্লিসের বক্তৃতার আদর্শীয় সভ্যতার তত্ত্ব সন্ধান করিব না। আমি কেবল সেই বক্তৃতার একটি কথাবাক্যের স্মরণ করিব — তাহাতে আদর্শীয় সভ্যতার যাহা প্রধান লক্ষণ, সেই 'শ্রেয়ঃ-সহিষ্ণুতা'র উল্লেখ আছে। ইহা সেই মানসিক গুণ যাহা উচ্চতম সভ্যতার অবস্থাতেই সম্ভব ; বিচার-পরায়ণতা হইতেই ইহা জন্মে — ইহার জন্য কেবল বলবোধই যথেষ্ট নয়। যে তিনটি মূল সত্য স্বীকার না করিলে সমাজে স্বাধীনতা-বোধ সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহা একমাত্র ঐ বিচারবুদ্ধিরই আয়ত্ত। সে তিনটি এই :— (১) আমরা যাহা বিশ্বাস করি তাহা সত্য না হইতেও পারে ; (২) যাহা আমাদের শ্রেয়, তাহাই শ্রেয় নয় ; এবং, (৩) কোন বিষয়েরই পুনর্ব্বিচার অগ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রকৃত মূল্য-জ্ঞান অর্জ্জিত না হইলে আমরা কেবল ইহাই বুঝিতে পারি যে, আমাদের অনুষ্ঠিত মত-প্রকাশে বাধা দিলে জীবন্তকেই পশু করা হয় ; কিন্তু বিচার-বুদ্ধি সমাক্ আপত্তিত না হইলে আমাদের হৃদয়ের সেই প্রেম ও দয়া-উদ্রেকী প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারি না — যাহার বশে আমরা অপর সকলকে আমাদের সমধর্ম্মী করিয়া

তুলিতে চাই। একমাত্র ঐ বিচারবুদ্ধিই সর্বৈ-সর্বা হওয়া চাই; আমার ঐ বিচার-বুদ্ধির বলেই আমরা এইরূপ আত্ম-মত ঘোষণার সীমাও নির্দেশ করিয়া দিব — যদি বিচারপূর্বক দেখা যায় যে, তাহাতে সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণসাধনের সম্ভাবনাই অধিক।

মূলতঃ থাকিলে, সকলেরই পূর্ণ আত্মতৃপ্তি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইবে। অতএব, অপরের তুচ্ছ চিন্তা বা মত নয় — জীবন-যাত্রা-প্রণালীর স্বাতন্ত্র্যও মানিয়া লইতে হইবে। যে ব্যক্তির স্বৈরূপ স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সা — নগ্নতা ও গৃহদাহ প্রভৃতির দ্বারা চরিতার্থ হয়, সমাজের পক্ষে যেমন মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব বটে; কিন্তু যে কেবল আমাদের মনেই কোনরূপ আঘাত দেয়, তাহাকেও কারারুদ্ধ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বিরুদ্ধতার একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত — অসভ্য-দর্শন নামক অপরাধের কঠিন শাস্তিবিধান। এইরূপ সম্বন্ধসের কথা স্মরণ করিলে আমাদের অনেকেরই মধ্যে একটা প্রবল দৈহিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, যেন দাঁতে-শিরায় হঠাৎ একটা আঘাত লাগে; ঐরূপ সম্পূর্ণ শারীরিক উপলব্ধিকেই আমরা একটা গভীর ঘৃণা-চেতনার উদ্রেক বলিয়া ভ্রম করি। এইরূপ ঘৃণোপলব্ধি ও বিদ্রূপবোধ কিরূপ তাহা আমি জানি, এবং আমার — কেবল অসভ্য-দর্শন বিষয়েই নয় — 'চীজ' (পনির)-নামক খাদ্যবস্তুটির সম্পর্কেও ঘটিয়া থাকে। ঐ 'চীজ'-দর্শনমাত্রে উহার ঘ্রাণ, এমন কি উহার স্মরণমাত্রে, আমার বোধের অবস্থিতি ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়; যখন কাহাকেও উহা খাইতে দেখি, তখন আমার সর্বশরীর ও মন বিরূপ হইয়া উঠে, মনুষ্যজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। তথাপি, আমার বিচার-বুদ্ধি আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, 'চীজ'-ভক্ষণ একটা পাপকর্ম নয়; বিচার-বুদ্ধিই নিষেধ করে — আমি যেন এতটা পাশবিক অনুভূতিকে নৈতিক অপরাধ-বোধে বলিয়া ভুল না করি। অতএব, একমাত্র বিচার-বুদ্ধিই মনের অন্ধ অন্যায়ের শাসনে রাখিতে পারে। পরমত-বিরুদ্ধতার মূলে আছে — এইরূপ অন্ধ সংস্কারের নীতির ছলে বড় করিয়া তোলা, এবং সেই নীতিগুলিকে অপরের উপরে জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার প্রবৃত্তি।

অবশ্য, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সচেতনতা সমস্তগুলিই এই পরমতবিদ্বেষিতার বিষয় সমান উপযুক্ত নয়; তথাপি, সকলেই উহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সকলেই অনুভব করিয়াছে যে — কোন চিন্তা, ভাব বা আচার-নীতি অপরের উপরে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া অতিশয় কুৎসিত; সকলেই অন্তরিক ভাবে বুঝিয়াছে যে — বন্ধ-মত মানুষই জীবনের বিকাশকে রুদ্ধ করে।

আবার, যাহাকে নিখুঁত-সংস্কার বা শুচিবায়ু বলে, তাহা মানুষের বাস্তব-বোধকেও আচ্ছন্ন করে — বাস্তবকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাওয়ার যে অতি তীক্ষ্ণ ও গভীর আনন্দ তাহা হইতে মানুষকে বঞ্চিত করে। সত্যকে সাক্ষাৎ করার — বস্তুর স্বরূপকে উপলব্ধি করার যে সম্ভোগ-সুখ, তাহার সহিত একমাত্র প্রেম অথবা সৌন্দর্যবোধজাতীয়ের তুলনা হইতে পারে। প্রেমিক তাহার প্রিয়তমকে যদি একটা কাল্পনিকের কুহকটিকার মধ্য দিয়াই দেখে, তবে সে যেমন অপর একটি মানবীয় সত্তার সহিত পূর্ণ পরিচয়, এবং তজ্জনিত একটি পরম আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়, তেমনই, যে ব্যক্তি এই বিশ্বসংসারকে কতকগুলি কু-বিচারের চশমা দিয়া দেখে, সে কখনই সেই নিবিড় হর্ষ অনুভব করিতে পারে না, যাহা কেবল তখনই উদ্রিক্ত হয়, যখন জগতের নগ্ন নিরাবরণ সত্য-রূপটিকে আমরা সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি।

যাহারা পরের কাছেও সহ্য করে এবং যাহারা ক্ষমাশীল, তাহাদের নিষ্ঠুর না হওয়াই স্বাভাবিক।

অপেক্ষা-অধীনে সর্বপ্রকার নৈতিক শৃঙ্খল আইন দ্বারা নিবিদ্ধ হইয়াছিল — তাহারা উহা সহ্য করিতে পারিত না। ইংলণ্ডীয় রেনেসান্স-যুগে যে উগ্র ব্যক্তি-পূজার প্রচলন হইয়াছিল, তাহার ফলে যেন একরাশি অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের উদয় হইয়াছিল। ইহারা অনেকগুলি নৈশাচারিক ও অন্যান্য বিধিনিষেধ নির্মম ভাবিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সেই পাপাচরণের অধিকাংশই অতি কঠিন বন্ধন-প্রয়োজনের বলে ঘটিয়াছিল। আপনারা যদি ইহা স্মরণ রাখেন — আমি তাহাই রাখিতে বলি — যে, ঐ সকল পুরুষ ইতিহাসের প্রায় অনেকগুলিই যুদ্ধ-নিবারণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখিবেন — বর্তমান যুগের মহাপুরুষেরা কেন্ যুগ সেই রেনেসান্স-যুগের রাষ্ট্রধুরন্ধরদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন।

মানুষের কু-বিশ্বাস বা কুসংস্কার — তাহার সেই বহুপূর্বের অসভ্য-জীবনের একটা জের মাত্র; বিচার-বুদ্ধি সেইগুলিকে অতিশয় সহজভাবে সহিত উড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দূর করিয়া দেয়। সেগুলা একরূপ বোধহীন বা পাশবিক অভ্যাস বলিলেও হয় — যেমন চীনের উপর আমার ঐ বিতৃষ্ণা; অথবা এমনও হইতে পারে যে, কোন বর্বর পূর্বপুরুষ হইতে উহার নানা সংস্কার পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়াছে। সেদিনও মিঃ জেম্স্ অবেদ তাঁহার একখানি পুস্তকে, কেবল একটু অদ্ভুত অলঙ্কারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে — বাল্যকালে সকলেই যেরূপ কাজ বা চিন্তা প্রায় করিয়া থাকে, তাহাই স্মৃতি একজন ঐরূপ কুসংস্কারপ্রবণ মানুষকে এমন যাতনা দিতে লাগিল যে, শেষে সে উন্মাদ হইয়া গেল! সমাজের বহু লোক পাপ-নাশক যে একটি মানসব্যাধিকে পোষণ করিয়া নিজেরাও কষ্ট পায় এবং অন্যকেও পাইতে বাধ্য করে, তাহা আর কিছু নয়, সেই প্রাচীন বর্বর-যুগের একটা অনপনীয় কু-বিশ্বাস — উপযুক্ত চিকিৎসায় যাহা উহা আরোগ্য করাও যায়। সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিষয়ে যে জ্ঞান-সঞ্চারের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, উহাই তাহার একমাত্র ঔষধ।

সমাজকে যদি সভ্যতার সত্য-অবস্থায় উন্নীত করা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে হইবে; যাহা-কিছু চিন্তা-যোগ্য হয়, তাহাতেই বুদ্ধিকে স্বাধীনভাবে বিচরণের স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে, যেমন-অভিরুচি—যে-কোন শব্দ, বাক্য বা ভাবটির ব্যবহার করিতে যেন কোন বাধা না থাকে। তাবে বা ভাষায়, মুখটি-মুখটির প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর — রুচি জিনিষটা আপেক্ষিক মাত্র; যেমন, আমার রুচিতে অধিকাংশ জনপ্রিয় গানের সুরও যেমন অসহ্য, তাহাও তেমনই গ্রাহ্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমি সেগুলিকে জোর করিয়া বন্ধ করিবার পক্ষপাতী নই; তাহা সহ্য করিবার মত বিবেচনাশক্তি আমার আছে; আইনের দ্বারা বন্ধ করিবার প্রস্তাব আমি কখনই করিব না। রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে, এমন অনেক বস্তু সম্বন্ধির অশ্লীলতার দুষ্টিদোষে দুষ্ট ছিল, যাহা তৎপূর্ব-যুগের কবি শিল্পী ও মনীষিগণ অতিশয় সুন্দর ও সরস বলিয়া মনে করিতেন। সে সময়ে কোন লেখক এমন কিছু লিখিতে পারিতেন না, যাহা ছেলেরা, ঘরের বা সেক্সপীয়রও লিখিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ সেইকালে এমন অনেক কিছুকে নির্বিবাদে বর্জন করিতে হইত যাহা ঐ সকল মহাজনগণ অতিশয় গ্রাহ্য ও ইষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুরুচির লোকানে, আর্ট-গ্যালারীতে ও পীক-ব্যাজারে যে যত্নের সাহিত্য, ছবি ও মূর্তি, এবং সঙ্গীত ঐকালে প্রচারিত হইত, তাহা যে-কোন প্রকৃতিবিশিষ্ট পুরুষ ও নারীর মনোরঞ্জক করিবে। একান্ত মনশ্চিত্ত-বিমোহন সাময়িক সাহিত্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তখন ছিল না; যে-আটক কেবল অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর ভাবাবেগ তৃপ্ত করে, তাহাতেও

কাহারও আপত্তি ছিল না। এক কথায়, ঐ কালের ঐ সমাজ-জীবন ও আট উভয়েরই এমন একটা আদর্শকে প্রশ্রয় দিত, যাহা কুশল-রসিক মিলটন বা কুরুচিগ্রস্ত লেকস্‌পীয়ারের মতে একজন অতিসাধারণ বাঙালীর মানুষেরও পক্ষে করা লজ্জাজনক।

রুচিবিষয়ক সকল ব্যাপারে যাহা একমাত্র উচিত ও বাঞ্ছনীয়, তাহা — ঐ উভয়ে অনোভাব; অর্থাৎ, পরের রুচি-স্বাধীনতা স্বীকার করা। আমার বিচারে ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, শিক্ষিত ও চিত্তোৎকর্ষসম্পন্ন নর-নারীর যাহা প্রেয়, তাহা মূর্খ ও অসভ্য জনগণের যাহা শ্রেয় কিংবা নিম্নশ্রেণির হওয়া উচিত নয়, তেমনই, ঐ অমার্জিত-রুচি মূর্খগণ যাহাতে সুখ পায়, তাহাতেও সুশিক্ষিত, সুসভ্য ব্যক্তির বাধা দেওয়া অকর্তব্য। কিন্তু বিপদ হয় ঐ উভয়শ্রেণি ব্যক্তিদিগেরই; কারণ, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার-শক্তি অধিকাংশ নিরক্ষরের হইয়া থাকে, তাহাদের রুচি বা রসবোধের বালাই নাই। তবু তাহারাই বিচারক না হইয়া ছাড়িবে না, কাজেই বিচারের মাপকাঠি হয় — একটা এমন-কিছু যাহা অতি সহজে ব্যবহারযোগ্য — কোন সূক্ষ্ম-বিচার বা সংশয়ের অবকাশ যাহাতে নাই। সাধারণ স্তরের মানুষ যাহারা, তাহারা একটা সহজ ব্যবহার-উপযোগী, তৈয়ারী-মাপকাঠিই পছন্দ করে; সেইরূপ মাপকাঠির দ্বারা তাহারা সকল বিষয়ে একটা অন্ত নিষ্পত্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। একটা ছবি সুন্দর কিনা তাহা সে বলিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহা যে রাফায়েলের আঁকা নয়, ইহা প্রমাণ করা সহজ; সেইরূপ, কোন্ ভাষার রুচি নিজে তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু কোন ভাষায় কতকগুলি বিশেষ শব্দ বা বিশেষ ধরণ সমাবেশ আছে কিনা, তাহা সে সহজেই বলিতে পারে। তাহার যে একটা মাপকাঠি আছে, সেই মাপকাঠির দ্বারাই সে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ছেলের খার্ড ও কার্ট ক্লাস গাড়ীর মত সর্ব-বিষয়ে উচ্চ-নীচভেদ করিয়া থাকে। পূজা-প্রীতি বা আচারগত ধার্মিকতা যেমন ধর্ম নয় — ধর্মবিধির অন্ধ অনুসরণ মাত্র, তেমনই, শুচিতা-সর্বস্বও প্রকৃত সুরুচির লক্ষণ নয় — উহা রুচির নামে একটা নিয়ম-পালন মাত্র। আবার, যিনি প্রকৃতই ধর্মপ্রাণ তিনি যেমন ধর্মের গৌরব-হানির ভয় করেন না, তেমনই, যে ব্যক্তি প্রকৃত রুচি-সম্পন্ন তিনি কুরুচি বলিয়া কোন-কিছুকে বর্জন করিতে অস্থির হন না।

জীবনের সর্ববিধ ভোগ্য বস্তু সুরুচি-সহ ভোগ করিবার শক্তি এবং তাহাতে অধিকারবোধ — পূর্ণ সভ্যতার লক্ষণ। উত্তমরূপে ভোগ করিতে হইলে মন হইতে সর্বপ্রকার কুসংস্কার-বন্ধন দূর করিতে হইবে; তদ্রূপ শুচিতার গর্ব, মিথ্যা-সংকোচ, মিথ্যা-সংকোচ এবং পাপ-বোধ-ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

ইহার জন্য চাই মনের বিচার-শীলতা; সার্থক ভোগসুখের জন্য শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে যে পার্থক্য-জ্ঞান আবশ্যক, তাহাই সেই মূল্যজ্ঞান — যাহাকে সভ্যতার অপর পৃষ্ঠ বলিয়াছি। এই মূল্যজ্ঞান হইতেই, সুসভ্য জাতিমাত্রেই বুঝিতে পারে যে, ভোগের বিরুদ্ধে কোন দোষ নাই; ভোগ যেমনই হৌক — ইন্দ্রিয়-সুখই হৌক, বা ইন্দ্রিয় ও হৃদয়, অথবা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকুক — কোনপ্রকার ভোগই দোষাবহ নহে। কেবল একটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে — তাহা এই যে, কোন ক্ষুদ্রতর সুখের জন্য বৃহত্তর সুখ-লাভে বিঘ্ন না হয়। যেমন, — প্রকৃত সভ্যতা যাহার আছে, সে মদ্যপানকে কুকার্য মনে করিবে না, কিন্তু সকল সভ্যসমাজেই পানাসক্ত মদ্যপ ঘৃণিত হইয়া থাকে। সভ্য-মানুষ যদি কোন ভোগ-সুখে বিরত হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় বলিয়া নহে — ঐরূপ ভোগসুখের পরিণাম সুখকর নয় বলিয়া। প্রকৃতির দণ্ডাপন হওয়াকেই সভ্য মানুষ লজ্জাকর বলিয়া মনে করে — তার কারণ, তাহারা তাহাকে

মূল্যজ্ঞান বিবেচিত হয়, এবং বিচার বুদ্ধি অপস্থ হইয়া থাকে। এই দুই কারণ ছাড়া আর কোন কারণেই সে কোনপ্রকার দুষ্কর্মেও লজ্জাবোধ করিবে না। যাহারা বর্বর তাহারাই এমন ব্যক্তিকে নির্লজ্জ বলিয়া অভিহিত করে।

এথেনীয়গণ যে সকল প্রমাদে অভ্যস্ত ছিল তাহাতে তাহারা কখনও লজ্জাবোধ করিত না। গ্রীক দর্শনও ঐরূপ আমোদ-প্রমোদকে সুস্থ-জীবনের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছে। হিব্রু ও গ্রীক — এই দুই আচার-রীতির মধ্যে যে বিষম পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা কোন শিক্ষকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না; তখন ঐ শিক্ষক তাঁহার ছাত্রগণকে বলিতে বাধ্য হন যে, আর সকলের উপরেও যেমন, আমোদ-প্রমোদের উপরেও তেমনি, আথেনীয়গণ বিচার-বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়াছে: এই বিচারবুদ্ধিই সকল বিষয়ে একটি সীমা বা সুপরিমিতি রক্ষা করে।

যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কলাশিল্প সমাজ আমাদের চক্ষে এত বরণীয়, তাহাও এই গ্রীক-আদর্শের অতি নিকটে পৌঁছিয়াছিল। ঐ সমাজের কলাবরীয় যাহা সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, উহারা ছিল অতিমাত্রায় বিচারশীল; সেই বিচারশীলতাও আবার অসাধারণ মূলজ্ঞানের দ্বারা সমন্বিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, যে-মাত্রায় ঐ দুইটি গুণ মিশ্রিত হইয়াছিল তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট সভ্যতার নিদান। যে-যুগে ফ্লরেন্টাইন, সিয়েন, ভিউস এবং স্বাধীন-চিন্তার উপাসক দুইজন পোপ জন্মিয়াছেন, সে-যুগের উদারপন্থী জার্মানগণ তাঁহাদের চিন্তার সহজ রক্ষা করিতে যেমন কোন বাধা পান নাই, তেমনই বাধাহীন মানসিক তাড়নাও তাঁহাদের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। একই কালে ঐরূপ বিপরীতের সমন্বয় একত্রে চিন্তা করিতেও ভাল লাগে, কারণ, এতদ্বারা এমনই ধারণা হয় যে, একদিকে যে সকল বিষয়ীদের আস্ফালন বাড়িয়াছে তাহাদের না আছে মনোবোধ, না আছে সৌজন্য, এবং অপর দিকে যে সকল প্রাচীনপন্থী উৎপাত করিতেছে তাহাদের না আছে সৌজন্য, না আছে মনোবোধ।

* * *

যেহেতু, সকল পণ্ডিতেরাই — যাঁহাদের মত প্রভায় যোদ্ধা — বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আথেনীয় সমাজে সভ্যতার যে নীরবধামে আরোহণ করিয়াছিল, তেমন আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না, অতএব এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে ঐ সমাজের একটি সর্বোত্তম চিত্র উদ্ধৃত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্লেটো-রচিত "সিম্পোজিয়াম" নামক গ্রন্থেই নাকি কবি, শিল্পী ও পণ্ডিত এবং সর্বশ্রেণীর রসিক-সমাজের মতে, এমন একটি রচনা — যাহার মত মনোমুগ্ধকর ও চমৎকার লেখনী-কর্ম এ পর্যন্ত মানব-প্রতিভার অসাধ্য হইয়া আছে। উহাতে এক পরম-রমণীয় জীবন-চর্যার একটি পরম-রমণীয় আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। এই চিত্তহারী কথোপ-কথন-সম্বন্ধে আমরা যে-সভ্যতার একটি-আভাস — ইহার বা তাহারও অধিক কিছু পাই, তাহা আমাদের স্বয়ম্ভত হইয়াই আছে; তেমনই ঐ একটি মুখেই সকল হইয়াছিল। এ চিত্র কোন যোগী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কল্পনা করেন নাই; ইহাতে যে কাহিনী আছে তাহা সভ্যতার সেবাকারী মানুষেরই জীবন-কাহিনী — সে জীবন যে-কোন মনুষ্য-সমাজ পুনরায় ধারণ করিতে পারে।

এখানে আমি এই গ্রন্থের কেবল সেইটুকু উদ্ধৃত করিব যাহা আমার এই আলোচনার বিষয়টিকে উজ্জ্বলতর করিতে পারে। ইহার অন্তর্গত বক্তৃতা-গুলিতে সভ্য-বলিবার যে আন্তরিক আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং প্রত্যেক বক্তা তাঁহার নিজস্ব মূল্য-জ্ঞানের মধ্য দিয়া বক্তব্যটির প্রকাশ-সুষমার দিকে যে দৃষ্টি রাখিয়াছেন — আমি বিশেষ করিয়া তাহার কথাই বলিব। এমন কি, সোক্রাতেসও তর্কে জয়লাভ করিবার জন্যই তর্ক করিতেছেন না; যাঁহাদের সঙ্গে

একজনও, আবশ্যক হইলে, নিজ-মুক্তির দুর্বলতা-স্বীকারে কুণ্ঠিত নহেন। একটা কথা আমিও কুণ্ঠার সহিত স্বীকার করি — এই সকল বক্তৃতার রসিকতার মাত্রা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহাও আমরা ইতিপূর্বে জানিয়া লইয়াছি যে, যে-কোন বিষয়ে অবাধ আলাপ ও হাস্য-পরিহাস করিবার বাসনা সভ্য-মানুষের একটা চরিত্র-লক্ষণ। আমার মনে হয়, অভিনয় মুকুমার-চিত্ত ও সদ্য-শালিত প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যেও এমন কেহ নাই যে, এই গ্রন্থের প্রেম-বিষয়ক আলোচনাটিকে কিছুমাত্র রোমাঞ্চকর মনে করিবে; যথা —

"যে সকল নর-নারী তাহাদের অর্ধাঙ্গগুলিকে ফিরিয়া পাইয়াছে (অর্থাৎ যাহারা চির-স্নেহে একই আত্মার অপরার্ধকে খুঁজিয়া পাইয়াছে) তাহারা সারাজীবন তাহাদের সর্বস্ব নিবেদন করিয়া পরস্পরের পরিচর্যা করে কেবল একটিমাত্র উদ্দেশ্যে — তাহারা একে অপরের মধ্যে সেই কি-এক অজানা বস্তুর অন্বেষণ করে; সে এক চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কিসের আকাঙ্ক্ষা তাহা বুঝাইতেও পারে না। এই মুগল-প্রেমের প্রেমিকেরা কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় ঐরূপ গভীর প্রেম অনুভব করে না; একে অপরের নিকট হইতে এমন কৃতার্থ হইয়া যাহা যাচ্ঞা করে, তাহা ভাষার অতীত; যাহা চায় তাহার আভাসমাত্র তাহাদের অন্তরে বিরাজ করে — সেই অস্পষ্ট বাসনার পথরেখা একরূপ অন্ধকারেই তাহারা চিনিয়া লয়।" (সেপী-কৃত অনুবাদ)

যে-অপূর্ণ বন্ধু-সমাগমোৎসবে, কচি, রসজ্ঞান ও সুস্থ বিচারবুদ্ধির এই অবাধিত প্রবাহ মুক্ত হইতে দেখি — যাহার ঐ বর্ণনা গত তেইশ-শত বৎসর ধরিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, তাহা যে-ভাবে সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে লণ্ডন-সহরের পুলিস-আদালতের কোন ম্যাজিস্ট্রেট নাম দিবেন "মাতালের উৎসব আমোদ"। ঐ নিমন্ত্রণ-সভা হইতে দুই ব্যক্তি একরূপ টলিতে টলিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল; একজন যেখানে বসিয়াছিল সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল; শেষের দুটি, অতিশয় অনেকক্ষণ নিদ্রার পর প্রত্যুষে উঠিল। তখনও অনেকেই নিদ্রাভিভূত; কেবল সোক্রাতেস এবং আরও দুইজন তখনও জাগিয়া আছেন; তখনও তাঁহারা মাঝে মাঝে পান-পাত্রে চুমুক দিতেছেন, এবং গল্প করিতেছেন। সোক্রাতেস তখনও তাহাদিগকে একটা কথা স্বীকার না করাইয়া ছাড়িবেন না যে, কমেডি ও ট্রাজেডি আসলে একই বস্তু। আরিস্তোফানেস প্রথমে ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন, পরে আর নিদ্রা নিবারণ করিতে পারিলেন না; অপর দুটি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তখন পূর্ণ বিবালোক প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়ের বহির্বাসে উভয়ের অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া সোক্রাতেস অতঃপর পদব্রজে লাইসিয়ম (Lyceum) গমন করিলেন; সেখানে অভ্যাসমত স্নান করিয়া, সারাদিন লেখাপড়া করিলেন; সন্ধ্যার সময়ে ঘুরে গিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-পরিক্রমা

অনুপূর্বা — শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য ও কবি-প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিয়াছেন — দুঃখ ওস্তাদ বরজলালের গান একালের নব্য-শৌখিনিকেরা শুনিতে চায় না, কাজেই দুঃখকে এই বলিয়া আসর ভাঙ্গে কবিতে হয় যে —

"মেলের মজা হ'ল শুরু,
এখন আসিয়াছে নূতন লোক —
ধরার নব নব রঙ্গ।"

ধরার নিয়মই তাই, 'নব নব রঙ্গ' আসিবেই। কিন্তু গানের আসরে গান চাই, কবি চলটাই বড় হইয়া উঠে তবে রসিকসমাজের বড়ই দুর্দিন। বরজলাল দুঃখ করিয়া বলিলেন —

"যেখানে প্রেম নাই, খোবার সঙ্গ —
সেখানে গান নাহি জমে।"

— প্রেমহীন, অতএব 'খোবা,' অর্থাৎ গাড়ারীন শ্রোতৃবর্গ দেখিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। তবু একটা বিপদ তাহার ঘটে নাই — সেই নব নব রঙ্গের রসিকেরা তাহাকে গালিগালাজ করে নাই, তাঁহার মাথায় উকীযথানিও ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু আজিকার এই আসরে বরজলালের মত কাহাকেও

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhadigital.com

গান শুনাইবার জন্য ডাকিয়া আনিলে তাঁহার যে কি হাল হইতে পারে তাহাই ভাবিয়া আমি একটু দমিয়া গেলাম।

তথাপি, আজ এই কবির পরিচয়-দানে প্রবৃত্ত হওয়ায় একটি বিশেষ কারণ আছে। কবি বর্তমান যুগের ভাবধারাগুলি ইতিপূর্বে যথাসময়ে মুদ্রিত হইলেও, রীতিমত প্রচারিত হয় নাই — বোধ হয় কবির নিজেরই দোষে, যা শুধে। একজন প্রচার যে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহাকে শাস্ত্র-মতে 'প্রচার' বলা যায় না। এটা প্রোপাগাণ্ডার যুগ; প্রোপাগাণ্ডার জন্য যে সকল যন্ত্র চালনা করিতে হয়, এবং যে সকল বিশেষ কলিকা আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা কবি অপেক্ষা অ-কবিরই অধিকতর সুসাধ্য। এজন্য, কবি বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে, ঐ যন্ত্র এবং ঐ মন্ত্র বিশারদ হওয়াই সর্বাগ্রে প্রয়োজন; তারপর, কবি হও ভাল, না হও তাহাতেও ক্ষতি নাই; মহাকবি, অদ্বিতীয় কবি, নব-যুগ-প্রবর্তক কবি, রবীন্দ্রবিজয়ী কবি হইতে কিছুমাত্র বাধা ঘটিবে না। সভাসমিতিতে সভাপতি হও, এবং দুই তিনখানি বড় পত্রিকাকে হস্তগত কর — দেখিবে লেখক প্রকাশক চি-চি পড়িয়া গিয়াছে। ইহার উপর যদি বেতার-যন্ত্রটিকে একেবারে আনিতে পারো, তবে তো জগৎ-কবি হইতে পারিবে। কবি বতীন্দ্রনাথের ভাগ্য এতদিনে একটু ফিরিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে; একজন অধ্যবসায়ী প্রকাশক তাঁহার কাব্যগুলিকে একত্র করিয়া একটা নূতন নাম দিয়া, (হালফ্যাশনের খামার সহযোগে) তাহার নূতন সংস্করণ সম্পন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ, ঐ আধুনিক যন্ত্রে তাহাকে আজ কবিতা কাব্যের সাহিত্য-বিপণিতে উপস্থিত করিয়াছেন। এখন যন্ত্রটা ভাল করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে, চাই-কি, এই ভদ্র-আলয়ের কোনাচলে তাঁহার নামটাও মাঝে মাঝে শোনা যাইতে পারে।

এই নূতন সংগ্রহ-কাব্যের নাম — অনুপূর্বা। ইহাতে যতীন্দ্রনাথের তিন তিন কাল হইতে কতকগুলি করিয়া কবিতা বাছিয়া সাজানো হইয়াছে। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোনটিই যায় দিবার যোগ্য নয়, যত গুলি যায় দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রণিধান-যোগ্য। এরূপ হইবার কারণ, এই কবির ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য নাই তেমনই যাচলতার নাই — তিনি কোন কবিতাই সুধা রচনা করেন না, অর্থাৎ তাঁহার অনেক কবিতাবিলাস নাই, প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার প্রেমের তীব্র উৎকণ্ঠার অবস্থা 'তাদিন' আছে। এজন্য তাঁহার কবিতার 'চয়ন' বা নির্বাচন সম্ভব নয়, তাহা অনাবশ্যক। যতীন্দ্রনাথ স্বভাব-কবি নহেন, তিনি অতিশয় আত্মসচেতন — অতি প্রবল ভাবাবেগকেও তিনি মুহূর্তমধ্যে নিজের বশে রাখিতে পারেন, তাই অন্য অনেক কবির মত তিনি ভাবদাসত্বকে হৃদ্যোবন্ধ করেন না। যে কবির ঐরূপ স্বভাব, তাঁহার কবিতাই 'চয়নে'র উপযুক্ত, এবং উত্তমরূপে নির্বাচন করিয়া একখানি গ্রন্থে সাজাইয়া না দিলে সেইরূপ কবির কবি-পরিচয় অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রোত্তর কবিদলের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কিছু বিলম্বেই হইয়াছিল, কিন্তু বিলম্বের একটা স্বাভাবিক কারণও ছিল। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রযুগের যখন 'ভরা-জোয়ার' তখন তাঁহার আবির্ভাব না হওয়াই যেন স্বাভাবিক। তার পূর্বে রবীন্দ্র-কাব্যের সেই অমরী-দুর্গের ভগ্ন, এবং তাহা ও হৃদয়ের যাদুকরী-লীলা যে কয়জন কবিকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদেরই উত্তর-সাধকরূপে পরিচিত করিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথ তাহাদের অন্যতম স্থান দাবি করিবার যোগ্য ছিলেন না; তাই বোধ হয়, তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী কিছুকাল তাঁহার প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। উত্তরকালে যতীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস তাঁহার নিজের প্রাণ-পাত্রে নিজের মত করিয়াই পান করিয়াছিলেন, তাহার সেই রস ও রূপে নিজের ভাব-প্রেরণাকে কিছু পরিবাসে শোধন করিয়া লইয়াছিলেন—কিন্তু সে-ও টনিকহিসাবে,

তাহাতে তাঁহার নিজস্ব কবিত্বশক্তি আদৌ ফুর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে বিশেষ কথা বলিয়াছি তাহার মূল কারণও বুঝিয়া লইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যজগতের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা যেমন অত্যুচ্চ কল্পনার জগৎ, তাহার ভিত্তিমূলও যেন উর্ধ্বলোক হইতে নামিল — তেমনই, তাহার অন্তর্গত সেই দুর্লভ আত্ম-কেন্দ্রিকতাই, দেহ-বাস্তবের যে ব্যক্তি, তাহাকে একরূপ অস্বীকার করিল; রবীন্দ্রনাথের সেই আইডিয়ালিজম্ এমনই ঐকান্তিক যে, তাহাতে কবি-ব্যক্তির ধরণী-আসাই দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে, নিজের দেহ-সংস্কারকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিবে না। সে কবিতায় কবির যে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহা ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া একটা উর্ধ্বভূমিতে মানব-সাধারণের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে; সেই সর্বজনীন ব্যক্তিত্বের বোধেই আমরা ঐ কবির সাযুজ্যলাভ করিতে পারি; এবং তাহা করিতে পারিলে যে রস আস্বাদন করা যায় তাহা এই দেহ-গত ব্যক্তিত্বের ভাবোদ্ভূত রস নয়; তাহাই খাঁটি রস — যেমন উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের রস, যে-রসকে আলঙ্কারিক 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই রসেরই সৃষ্টি করিয়াছেন — তেমন আর কোন কবি করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ রসও মানব দেহ-জীবনের রসের অনুরূপ মাত্র — প্রতিরূপ নয়, যে-প্রতিরূপের মধ্যেও মূল বস্তুসত্যটা রূপান্তরিত হয় মাত্র, একেবারে ভাবান্তরিত হয় না। এ রসে রক্তের অভিব্যক্তি নাই; তথাপি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসাধন-কলা এমনই মনোরম যে, শিরাধিকারেও তাহা হইতে যেটুকু রস আদায় করা যায়, তাহাতে আকৃষ্ট হওয়াও যেমন সহজ, মুগ্ধ হওয়া ও তেমনই অনিবার্য। ইহার ফলে, বাংলা কাব্যে একটা মূলগত কাব্যকলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রবীন্দ্রকাব্যের সেই পূত অন্তরিক্ষের রস সাধারণের পক্ষে দুরূহ হইয়া রহিল বটে, কিন্তু ঐ কাব্যকলাই একটি মুক্ত কবি-সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল। তাহাতে বাংলা কবি-ভাষা ও ভাবাঙ্গনের যে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিসাধন হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই সানন্দে স্বীকার করি; কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের সেই রস-কল্পনার দুঃসাধ্য অনুকরণ অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে; তাহার ফলে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া, অতিউচ্চ ভাব-কল্পনার অভিসারে — মানবজন্মের যে সত্য, দেহ-সংস্কারের যে অতি-জাগ্রত অনুভূতি ও আকূতি — তাহার প্রতি বিশ্বাচরণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কবি ষতীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ঐ বিশ্বাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সকল বিদ্রোহের মধ্যে যেমন এক প্রকার আত্মরিকতা থাকে, তেমনই আতিশয্যও থাকে; ষতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহে দুই-ই আছে। কিন্তু সে-যুগে, ইহা কাব্য রচিত বিদ্রোহ — রাষ্ট্রনৈতিক বা সমাজনৈতিক বিদ্রোহ নয়, এইজন্য সেই অতিশয্যও আন্তরিকতার মূলে রহিয়াছে — আন্তরিকতাকেই আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

এইবার ষতীন্দ্রনাথের ঐ বিদ্রোহের একটু ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বিদ্রোহটা মূলে ভাবগত হইলেও, উহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বহির্গত বস্তুর প্রতি বিরুদ্ধতাও আছে; সে বিদ্রোহ ঐ তৎকাল-প্রচলিত কাব্যরীতির বিরুদ্ধে, অতএব তাহা খাঁটি সাহিত্যিক বিদ্রোহও বটে। সেকালের কাব্যের সেই অতিসজ্জিত অঙ্গি-পেলব-মসৃণ সমবোজনাই তাহার কৃত্রিমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে ষতীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিকে বাহির হইতেও আঘাত করিয়াছিল। তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কি কারণে তাহার ঐ লালিত্য ও চিকনত্বাই কবিশিশুর এমন লাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। উহাই তাঁহার কবিদৃষ্টিকে সন্ত্রাস করিয়া থাকিবে। তারপর, সেই বিদ্রোহ

আর যারা যাবিল না — কোন ক্রিয়া আর রহিল না, তিনি নিমেষেই বুঝিতে পারিলেন, ইহারা যারা লেখে তাহাতে নিজেদের প্রাণগত উৎকণ্ঠার কোন তাগিদ নাই — যারা আছে তারা একরূপ ভাষা-অনুশীলন-পটুতার কসিবানে। কেন নাই? প্রথমতঃ ইহাদের ভাষা-প্রেরণার মূলে কোন সাক্ষাৎ-অনুভূতি নাই — আমাদের দেশের অর্বাচীন সংস্কৃত কবিদের মত, ইহারা যেন অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত 'রসের ঢেঁকুর তুলিয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ ইহারা ভাষানুভূতিকেই উৎকৃষ্ট কবিত্ব বলিয়া মনে করে। মহাকবি গ্যেটে (Goethe) জার্মান রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে ঠিক এই অভিযোগ করিয়াছিলেন, আমি অন্যত্র তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ; যথা :—

If feeling does not prompt,
in vain you strive;
If from the soul
the language does not come
By its own impulse,
to impel the hearts
Of hearers, with
communicated power,
In vain you strive,
in vain you study earnestly.
Toil on for ever;
piece together fragments
Cook up your broken
scraps of sentences
And blow with puffing breath
a struggling light,
Glimmering confusedly now,
now cold to ashes!

—রবীন্দ্রনাথও ঐ সকল কবিতা সম্বন্ধে ঠিক এমন অভিযোগই প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐ ভাষানুভূতির একটা বিশেষ লক্ষণ তাঁহার বিদ্রোহকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাকেই আমি আবেগত বিদ্রোহ বলিয়াছি; উহা ভাষা-রচনার ঐ কৃত্রিমতারই বিরুদ্ধে নয় — একেবারে তাহার অন্তর্গত কবিত্বের বিরুদ্ধে। জগৎ ও জীবনকে একটা সুবাসের মোহাগ্নি আবেশে মণ্ডিত করিয়া দেখাই যেন উহাদের কবিত্ব; সুখ-দুঃখকেও একটা মধুর বেদনা-রসে অতিরিক্ত করিয়া, তাহাদের সেই 'রস' আস্বাদন করিতে হইবে। জীবন একটি সুদীর্ঘ রাত্রি-রাত্রি, তাহার সর্বত্রই ঘুমঘোর; তাহার সকল কলরবই একটি বিরোধ-বেদনা-রাগিণীর বহুবিচিত্র আলাপমাত্র। রবীন্দ্রনাথের মত কবিমাত্রই ইহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল, বিদ্রোহের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় যাহা হইয়া থাকে তাহাও হইল, — তিনি কবিতামাত্রকেই অস্বীকার করিতে চাহিলেন; পেট্রিয়েট বা দেশভক্তি-প্রীতিকে কোন কালেই বরদাস্ত করিবেন না—সে সকলই দুর্বলের দৈন্যের আত্মবিলাস, মেরুদণ্ডহীন আত্মপ্রবঞ্চনা। ইহাতেই বলে কবি-প্রতিভার উপরে কালের প্রভাব, ঐ কালে না জন্মিলে রবীন্দ্রনাথের কবি-মনোভাব এমন কঠিন হইয়া উঠিত না।

কিন্তু সত্যই কি একমাত্র কালই ঐরূপ বিদ্রোহের জন্য দায়ী! উহার মূলে কি কোন গভীরতর ব্যক্তিগত প্রেরণা নাই? একেবারে ব্যক্তিগত যাহা তাহার কারণ নির্দেশ করা অতিশয় দুরূহ। তাঁহাকে আলো কবি করিয়াছে — কোন্ একান্ত ব্যক্তিগত আকুতি! এই বিদ্রোহ কোন্ ব্যক্তিক্রমের অভিশপ্ত নিজস্ব অভিযোগ! আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কাব্যরস, ও তাঁহার কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণ পরিচয় দিতে বসিয়াছি, কিন্তু যেহেতু আধুনিক কাব্যে কবির কবি-মানস এবং তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিগত কাব্য-প্রেরণা এতখানি অবশ্যবোধ্য দাবী করে যে, প্রথমে তাহাদেরই সন্ধান-সন্ধান না করিলে কবির কাব্য-সুন্দরীও অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না, অতএব, আমাদেরও প্রথমে কবি রবীন্দ্রনাথের এই অতিশয় আত্মগত আধ্যাত্মিক প্রেরণাটিকে সন্ধানসহকারে অভিধাবন করিতে হইবে, কাব্যের রস-নিকেতন পরে করিব।

যতীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা একটা কথা সকলেই বলিবেন, তাহা এই যে এ কবি দুঃখেরই একান্ত কবিতা লেখিয়াছেন —ইনি দুঃখের কবি। মোটা-কথা বলিলাম এই জন্য যে, সাধারণ পাঠক দুঃখকে দুঃখ ছাড়া আর কিছু বলিয়া বোঝে না; দুঃখের বিপরীতই সুখ, সুখের আর কোন অর্থ তাহাদের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ জীবনে, বা অসাধারণ-জীবনে, দুঃখ যে-রকমই হোক, তাহা দুঃখ শুধু দুঃখই নয়, তাহা একটা ক্ষত বটে; যদি তাহাই না হয়, তবে 'দুঃখের কবি' বলিলে কোন অর্থই হয় না, তেমন দুঃখ তাহা হইতে উঠে না। অতএব যতীন্দ্রনাথের এই দুঃখ একটা গভীর অনুভূতি-স্তরের প্রকাশক হয়। উহার মূলে যে বিদ্রোহ আছে তাহাও অস্বীকারযোগ্য নয়, স্বীকার্য; কারণ, যে বিদ্রোহ করে সে-ও একটা কিছু চায়, পক্ষ না বলিয়াই বিদ্রোহ করে। এই চাওয়াটাও আছে, সে সেই বস্তুকে বিশ্বাস করে; তাই সে নাস্তিক নয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, সেই বস্তু আস্তিক্যেও নাই, অন্ততঃ কবি-ব্যক্তিটিকে সে ধরা দেয় না, তবে সেই বঞ্চনাটাই দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই বঞ্চনাও সকলের পক্ষে সমান নয়; কারণ সাধারণ মানুষ যেটুকু পায় তাহাতেই তৃপ্ত, না পাইলেও পাইয়াছি মনে করিয়া সুখী। এই কবি-ব্যক্তিটি সেই সাধারণের একজন নহেন, তাই তিনি ঐরূপ কবি হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার পিপাসা যেমন প্রবল তেমনই অসীম; বস্তুতে তাঁহার তৃপ্তি নাই, তিনি অমৃতের মত সাগর সেচন করিতে চান। ক্ষুদ্র মানুষ অমৃত নয়, সাগর তাহাকে ধারণ করে। কবি যদি ভাব-সাধক আইডিয়ালিষ্ট হইতেন তবে তাঁর কথাই ছিল না, ভাব-সাগরের রত্নটি-তুলিকে অপাবৃত করিয়া ভাবের আবেশে তাহাই পান করিতেন, — তাহা তাঁহাকে সন্তোষ ও সুখমূর্ছনায় তিনি আমাদের অনন্ত রসপিপাসা তৃপ্ত করিতেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাহা করিবেন না, তিনি বস্তুত-জীবনের জয়ধ্বনি করে, মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের দুঃখে, সেই দুঃখের ভাব গ্রহণ উপলব্ধি করিতে চান — প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া তাহার কবিত্বের কোন-প্রমাণ পাইতে চান না, বাস্তবকে কল্পনার দ্বারা পূরণ করিয়া লইবেন না। তিনি দেখিয়াছেন, এই সৃষ্টি যদি একখানি কাব্যই হয়, তথাপি তাহা অতিশয় অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও খেয়াল-খুসীতে পরিপূর্ণ। বেশ, যদি তাহাই হয়, তবে অত গালি-গালাজ কেন? 'দুঃখের' বলিয়া মোটা-কম্বল গায়ে দিয়া সরিয়া পড়িলেই ত' সব হাঙ্গাম চুকিয়া যায়। না, ব্যাপারটাও বড় শক্ত। সেই সৃষ্টিকর্তা কবি বড়ই ধূর্ত, সে কে-কতটা লোভ দেখায় প্রাণ তাহাতে তুচ্ছ করিতে পারে না — বঞ্চনা দ্বারা সে সেই লোভটাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। ফলে, একদিকে তাঁহার অভিমান যেমন দুর্জয় হইয়া উঠে, তেমনই ঐ আত্ম-প্রবঞ্চিত সুখ-ভিখারীদের প্রতি অনুকম্পার অন্ত থাকে না।

যতীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে জগৎ ও জীবনকে যে দুঃখের ছকে এক-দফা করিয়া তুলিয়াছেন, সে দুঃখ কালো নয়, তাহা লোহিত-বর্ণ। তার কারণ, তাঁহার ঐ নিরাবরণ বৈরাগীর নয় — অনুরাগীর, — চাহেন অভিমানের ত্রিপ-পরিবাদ। তিনি যেন ঘিরে করিয়াই তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া, নিজে বিরুদ্ধপক্ষের উকিলের মত, তাহার বুক কি অপরাধই বাহির করাইয়া লইতে চায়। অভিযোগটা আর কিছু নয়, — যে পিপাসা নিয়াছে সে পানীয় দেয় নাই; দুঃখের ভিতরে বসিয়া আছে অথচ ধরা দিতে না। সমস্ত সৃষ্টি ঝাপিয়া একটা অসম্পূর্ণতা, একটা ব্যর্থতা ও নিদারুণ নিষ্ঠুরতাই বিরাজ করিতেছে, তাহারই দুঃখ মানুষকে অধীর করিয়া তোলে; সেই দুঃখবোধের জন্যই সুখের পিপাসা! এত বড় মিথ্যুকতা আর কি হইতে পারে! অতএব সৃষ্টিটা মিথ্যাই। তাহাই যদি হয়, তবে দুঃখটা

সত্য হয় কেন? বহস্য এইখানেই; দুঃখটাও সত্য হইত না যদি সুখপিপাসা সত্য না হইত। কবি যদি ঐ সুখপিপাসার সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেন তবে তিনিও এই দুঃখের কথা লিখিতেন না। পারেন না কেন? এই কথা সর্বত্র তাঁহার দৃষ্টিই ইঙ্গিত করিয়াছে। কবিও ভালবাসিয়াছেন, সেই ভালবাসা খাঁটি মানবীয় আসক্তির ভালবাসা; এ ভালবাসা নশ্বরতার আঘাতে অস্থির হইয়া উঠে। ইহাই মানুষের প্রাণের সত্যতম আর্তনাদ — ইহাই ভাববাদীর বিরুদ্ধে বাস্তববাদীর বিদ্রোহ। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য অতিশয় বস্তুতান্ত্রিক — আর কোন অর্থে নয়। এই প্রসঙ্গে একজন ফ্রেঞ্চ কবির কথা মনে পড়ে, এই কবিও নাকি কোন এক যুগের ভাবো, ভাবানুভূতির পরিবর্তে বাক্তি-হৃদয়ের বাস্তব-অনুভূতির সুর প্রথম প্রবর্তিত করেন। ইঁহাকেও ঐ নশ্বরতার ভয়ই বিহ্বল করিয়াছিল। ইঁহার সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন —

"In death he can see nothing but the horrors of dissolution. In brighter moments he may seek to console himself by a kind of philosophy, that all beauty must perish, that life is but fleeting and so on, but even as he speaks, his teeth are chattering and there rise before his eyes the creaking gibbets of Montfaucon with his own place prepared and ready, and hears the hollow croaks of the magpies rising upon the night air."

— কেমন, আমাদের কবি Villon-এর মত এটা দেহ-সর্বস্ব নহেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যি মন যেমন সকল কল্পনার বা দর্শনের সান্ত্বনাকে উড়াইয়া দিয়াছে, তেমনই, তিনি ঐ নশ্বরতার ব্যথাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিলেও তাহার দ্বারা অভিভূত হন নাই। কিন্তু তিনিও ঐরূপ বিভীষিকা দেখিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে এমন সকল বীভৎস-ভীষণ দৃশ্য-কল্পনা আছে, যাহা উপরের ঐ চিত্রকেও ম্লান করিয়া দেয়। রবীন্দ্র-কাব্যের খুব সুর এই নশ্বরতা-বোধের নহে; দুঃখকে তিনি আরও অনেকরূপে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ একটা চিন্তাই তাঁহার অনুভবকে সর্বাপেক্ষা উদ্বেলিত করিয়াছে — পরে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সুতরাং, নশ্বরতাকে এমন ঐতিহাসিক করিয়া দেখার কারণ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; তাঁহার মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া একটা প্রশ্ন খুবই ঘোরালো করিয়াছে; তাহা যেমন বাস্তব, তেমনই ব্যক্তিগত। যে অনুভূতি ঐরূপ বাস্তব ও ব্যক্তিগত বলিয়াই রবীন্দ্রকাব্যের নৈর্ব্যক্তিক (দেহ-ব্যক্তিহীন) রসস্বরূপকে যেন 'চ্যালেঞ্জ' করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় একমাত্র কবি, যিনি নিজ হৃদয়ের সাক্ষ্য ছাড়া আর কোন সাক্ষ্যই মান্য করেন নাই; বাংলা-কাব্যে — তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নয় — সেই মানুষের স্বাধিকার-ঘোষণা এই প্রথম। এই যে নিজ হৃদয়কেই একমাত্র প্রমাণ করা, ইহাতে কবির যেমন শক্তি-বৃদ্ধি হয়, তেমনই আর এক পক্ষে ক্ষতিও হয়; কিন্তু সে কথা পরে।

কবি রবীন্দ্রনাথের ঐ দুঃখবাদের কারণ ও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি, এখন আর একটি কথা বেশ করিলেই এ প্রসঙ্গ শেষ হয়। আমি বলিয়াছি, ঐ দুঃখবাদেরও মূলে আছে একটা আস্তিক-বুদ্ধি। দুঃখকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনই দুঃখবাদকেও অস্বীকার চলিবে না। একজন কেহ আছে, কিন্তু তাহাকে জানিবার উপায় নাই—সে যেন কিছুতেই জানিতে দিবে না; তাহার এই দুর্জ্ঞেয়তাই সকল দুঃখের মূল, তাহাই দুঃখকে অর্থহীন করিয়া আরও অসহনীয় করিয়াছে। এই দুর্জ্ঞেয়বাদ জ্ঞানের নয়—প্রেমের; কারণ যে-পিপাসার

ছিল্ল দিয়া সেই এতদিনের আমার প্রেমে, সে পিপাসাও প্রেমের পিপাসা। তখন কবি আর কোন সাধনা না পাইয়া স্থির করিলেন, ঐ দুঃখ যদি সত্য হয়, তবে সেই সত্য-স্বরূপও দুঃখস্বরূপ। তিনিই এই অসীম দুঃখ নিজেও বরণ করিয়াছেন, অতএব মানুষ তাঁহার নিকট সান্ত্বনা চাহিবে কি, — তিনিই মানুষের সান্ত্বনাস্থানের পাত্র! ইহাও এক অপূর্ব ভাবের প্রেম; ভাব-ছোঁয়া দুঃখের আরতি করিতে করিতে কবি ঐ দুঃখেই একটা অধ্যাত্মযোগ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই যোগে তিনি সেই মহান্ দুঃখস্বরূপের সহিত যুক্ত হইয়া, দুঃখের অমর-নিবাসেই এক অদ্ভুত প্রেমের বাসর-শয্যা পাতিয়াছেন। ইহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার কাব্যের গূঢ়তম মর্ম-প্রেরণা।

(২)

এইবার আমি এ পর্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত কবির কাব্য হইতেই উদ্ধৃত করিব — পাঠক-পাঠিকাগণ আমার পূর্বসিদ্ধান্তগুলি মিলাইয়া দেখিবেন। প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি এখানে যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি, মূল কবিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করায়, তাহাদের কবিত্ব নষ্ট হইবারই কথা। কিন্তু আমি এখনে, কবিত্ব — কাব্য নয় — কবি-মানসের পরিচয় করিতেছি, কাব্য-পরিচয় পরে করিব। —

১। সৌখীন কবিকল্পনা ও কবি-ভাবের প্রতি শ্লেষ ও ব্যঙ্গ; যতীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যতত্ত্বের — তাঁহার নূতনতর বাস্তব-দৃষ্টির — পরিচয়ও ইহাতে আছে।

(ক) ভাষা-বিহীন মনকবি রে!
ডুবে থাক এই তোরা গভীরে!

•

'ব্যথা' উলটি নিলে
'কাব্য' আপনি মিলে —
এ কাজও না পার যদি, বলো সে আখি দিলে।

• •

কমল হ'তেও যার অধিক কোমল পাপি
তারাই পুজেছে আর পুজিবে ভবানী?

• •

অভাবের দাখো ছুটো বাক্যের ফাঁদে ভুলে'
মানুষী-প্রেমের নেট্-কাগজীটা তাহিয়ে সে।
তার মাঝে ভরে বল, কবারির সেই আমি —
অমর, অক্ষয়, অজেয় ইত্যাদি।

(খ) সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের সাঁস ভালো ব'লে, খালা মাজে-ঘোলা চোখে তারা।

(পৃ: ৬৯)

(গ) কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, মন ঘরে ফেরে যায়,
বায়োস্কোপ থেকে লক্ষ কবির একঘেয়ে কবিতায়!
সেই উপবন, মলয়-পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রেয়সীর বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হারা-কাঁদা গলাগলি।
সব কবিতায়, দেখি তোমা, সাজো কল্পের পর কল্পে,
কুহকের রঙ ফলকে উঠুক, হাতগুলো যাক্ পল্পে'।
যে যায় সে যায় ওই ছুটে যায় লক্ষ বরণ-ঘোড়া,
প্রেমের কথা বৃথাই কহিছে লোহার সে জোড়া-জোড়া,
ফেলে সাজো, ফেরে ডালো,
সকল দুঃখ সুখ হউক, হে দাদা সব কালো!

যতীন্দ্রনাথের চক্ষে সংসার ও সৃষ্টির বাস্তব রূপ :—

(ঘ) শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত বক্ষে মীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।

* *

জীবনে কি ঘনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্বলে' ওঠো দাবানলে,
যখে চক্ষে পেতেছ আসন ফুঙ্কার পড়লে!

(পৃঃ ১)

(ঙ) চাঁদ-ভরা হসি বাঘড়ার কাঁদি', কাটিতে কাটারি ভুঁয়ে
বড় মেহে চাষা খেজুর-তরু জড়াইল দুইভুজে।
কাণ্ড বহিয়া আছে উঠিয়া, দাঁড়ায়ে কাঁসের তরে,
কাটারি খুলিয়া খেজুরের পাতা ঝোড়ে চাষা থরে থরে!
কাপাইয়া নির্দোষ —
কত না যতনে কাটারির ফলে ফোটে থাকে দুটি চোখ।
তাতে ঢুকিয়া পশি,
খেজুর-পাতায় চাঁদ ক'রে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।

* *

সেদিন হইতে খেজুর-বাগানে মীরবে অবতীর্ণ
দাদাদের হ'য়ে খেজুরলাতের দুইচোখ ভরে জল!
নিউনিয়া ফোরে সংগ্রহ করে ভাঁড়-ভরা মিঠে রস,
দিন হ'তে দিন হড়ায়ে পড়িল খেজুরগাছের যশ।

* *

চোখের অন্তরে জমাট অশ্রু মুখে মেখেছিল বাসা,
সে চন্দন তরিয়া মুখে বহুলোক হ'ল চারা।

এ বরণী করি' খেজুরসাহের আবাদ করিল কেবা ?
মাহনের জল-জ্বাল-দেওয়া চিনি কোথা কে তরিয়ে দেবা ?
অযেলাস-ভরা কলস তাহার কাঁড় রেখে গেছে ওঠ ;
সে নেশার আশে কোন্ মাতালের অন্তরে হাত ছোটে ?
মেয়ের এখানে খেজুর-গাছের কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর,
না জানি সেখানে ছেলে খুন কেন্ চশমের তাপিছের !

৩। মৃত্যু ও নশ্বরতার চিন্তায় কবিহৃদয়ের হতাশাস :—

(ক) এ ধরা মোরহান :—

মরণের কিছে স্মরণের চিপি দু'দিনে ভূমি-সমান।
কত না অশ্রু, কত হা-হুতাশ, কত হয়ে গায়ে ঝরা,
প্রান্ত হইয়া শান্তি লভিছে কত না কবি ভরা !—
সব হয়ে যায় ধূসর,
আসে, হাসে, কাঁদে, চলে' যায় ঘুরে বারোস্তোলের কিতা।
আমারি মতন এসেছে যেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী,
আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি।
আমারও দুঃখ সুখ,
ধূলা হ'য়ে যাবে — চাহি বা না চাহি তোমার পাষাণ-বুক।

(পৃঃ ১০-১১)

(খ) ভগ্ন ভাঙাটিয়া বাড়ী।

সে দিন যাহারা এসেছিল ভাড়া, আজই শেষ তারা ছাড়ি ?
ধূলা হ'ল যত ঝ-ঝুক-কাম, ভাঙ-পোঁচ, ঘষা-মাজা,
তারা যদা দুটী মেজাজের চাকি' বয়যৌবনে সাজা ?

• • •

হায় গো বন্ধু, তোমার ভাঙ্গে হেসে খেলা চিরদিন,
কত যৌবনমুকুলাঙ্কিত, কখনো জীবন-হীন।
কত এল গেল, জাগিল ঘুমা'ল — কত সুখ-দুখ-রোল,
কত হুলুধ্বনি, "বল হরি হরি বোল" !

তত ওষ্ঠের চাপা হাসি, তত তর্কের ক্রন্দন,
হৃদয়ের তত বিচ্ছেদ, তত দুরূহবন্ধন, —
খাঁচা ছেড়ে যেয়ে বন্ধু গো তব পাখনির স্তরে স্তরে,
তারি চাপে চাপে ধরিয়াছে ভাঁজ, বালিচুর ঝ'রে পড়ে।
ভিতরে ভিতরে শূন্যতা হয়ের তাকটের মুখে মুখে,
উপরে এখনো রং-ও কি তবু লাগ তাই কোন্ মুখে ?
(পৃঃ ১৩-১৫)

(গ) তড়িৎ যেমন যেয়ে লক্ষিত মেঘের শিরোপর,
আলোক যেমন অন্ধ চোখের ছায়াকার-তমসার,
মিলন যেমন বিরহের তরে সুখে-দুখে ঝুরু-ঝুরু,
জীবন তেমনি মরণের তরে হৃদয়ে দুরু দুরু।
যত খুঁজে যায় পাও —
মরণেরই সনে জীবনের যেন চিন্-চাক্ চিন্-চাক্।
(মরণিমা, পৃঃ ৩৪)

৪। ভগবান-নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ —

(ক) সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি জগন্নাথ ! —
সুখের চাকায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিক হাত।
তুমি শালগ্রাম-শিলা : —
শোওয়া-বসা যায় সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা !
(পৃঃ ৮)

(খ) ও ভাই কর্মকার।
আমারে পুড়িয়ে পিটায়ো ছাড়া কি মাহিত কর্ম আর ?
কোন্ ছোরে সেই ধ'রেছ হাতুড়ি, রাত্রি সতীয় ছোলো,
ত্রিযামুখর শুদ্ধ পল্লী, ছোলো গো বন্ধ ছোলো।
ঠকা-ঠাই-ঠাই কাঁদিয়ে মেয়েই, আগুন ছুটিছে ঘুরে,
শ্রান্ত শাঁড়াশি ক্লান্ত ওষ্ঠ আলুথালু কেশ ভুঁয়ে,
দেখ গো তোমার ছাপায় ছাপায়, হাতুড়ি মারিছে ছুঁচ ;
ক্লান্ত নিখিল, ঘর গো নিখিল তোমার মজুরি।
(পৃঃ ৬৮)

(গ) এসেছ বন্ধু ? তোমার কথাই জাগছিল তাই প্রাণে, —
কাল রাতে মোর ঘরে প'ড়ে গেছে কেতকীর পাতা ঘামে।
* * * * *

এমন ঘরে দু'তারাটি মোর পাকা ধানে পড়ে রই।
লাওয়ার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে বসো, — সে সুখের কথা কই।

উঠো না বন্ধু, অন্ধ রাত, — থাকে নবাব, ভাই,
আজিকার দিনে চাষার ঘরে যে খুদটুকু কিনারে নাই।
ঘরেঘরেটুর কাটুক দেহটা, ঘুরে আসি কেতখামা,
ঘাইলা বুট যেঁটে খুঁটে আনি যা' পাই ঘরের লানা।
চিরাচরীন নবান্ন-দিনে এসেছ আমার ঘরে,
শুকখনে তের অভাবিও অতি' পরস্পরে,
চরম প্রসাদ করিব যেমন, — বন্ধু, মাথায় কিরে —
কপালিত ক'রে আশীষ ঢালিয়া লখিও মোর শিরে।

(পৃঃ ১০৭—১০৮)

শাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেশের সম্বন্ধে —

(ক) সবাই বলেছে, তোরে পাঠালেন নিজে তিনি ভগবান্;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে ওঁর — তোমাদেরি তিনি চান;
উপায় পেয়েছি সুধা, —
হ'বে না তোদের ভয়, যাবি শোক পাপ তাপ আধি ঘুচে।
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, বদলিল না একচুল;
ভগবান চান আমাদের শুধু — একথা হইল ভুল;
কি হবে কথায় ছলে?
ভগবান চান — শুধু ভগবান্তো, একথা পাগলে বলে!

(পৃঃ ৭—৮)

(খ) পাকের সাথে কলহ, শুধু
পাক লাগে যা গায়ে তায়,
ধুতে ফেলে দিলে চলে,
শুধু পাঁকাল মিলিবার।

প্রেম-জলে নীতাতে ;
ঘরের চরি কোন্ চর ?
পাঁচাল ঘরেই এসেছিলেন
কে করে অন্ত লক্ষ্য ?
তিনিই ঘরের ভিতের পাঁচাল,
বীরের পাঁচাল বহুরাণী,
বিশ্বের পাঁচাল ঘরের।
মনের পাঁচাল অন্তর-রাজা,
মনের পাঁচাল হে-রাম,
যাঁর কৃপাতে সাধুরে শেষ
কুরুক্ষেত্রের বাসনাশ।
চলাচলে ধনঞ্জয়ে
মহা-পাঁচাল চলীচলে
কুরোক্ষুর: দিয়ে ছেদেন
পাঁচাল ঘরার উপদেশ।
সেদিন হ'তে পঞ্চস্রোতে
তত পাঁচালপাঁ রে
বাঁধ্‌ল বাসা মঠে মাঠে,
আশ্রমে ও মন্দিরে।
(পৃ: ২২৯ — ২৩০)

(খ) চারহাত-থাকা মানুষে ভরিয়া লাগে তিন হাত ঘর
কৌতুক লেখ — কেমনে নিজের মাথা ঠুকে ঠুকে মরে।
প্রেম-মন্দিরে তাহারই বিপদ — যেজন বাড়াবে লোভা,
পিঁপড়া-ভাঙা বড় কোদ-কুঁড়ো আর ঘাড়-ভাঙোরেই মজা।
মাথি' ছুড়ি' ফলমূল,—
যে দলিত, তব চরম সৃষ্টি খোড়া পিটাইয়া উট।
(মরুশিখা — পৃ: ১৮)

৬। এই দুঃখবাদ ও বিদ্রোহের মূল কোথায় ?

(ক) ছিটের ছিটের ঘরে আছে সেথি বাস-মুসুর জোড়, —
প্রেমের মেলায় রঙিন আঁখি, কলিকের দুঃখোর !
বিশ সুরের বিশাতি-সুরে কাঁদে লাখো হাহারব ;
তাহারি উপর লোহার-কুজন, ক্ষুদ্রের উৎসব !

কাজলা দুজনে চলেছি বহিয়া
একটি মুকুর অনেক ধোওয়া।
অলীকসুখের রাজপথে-পথে
কেঁদি হেঁকে হেঁকে সাহস-খোঁয়া।
তোমার মাথায় ঘুঘুর পসরা,
আমার মাথায় ঘুঘুর ডালা,
ঘুঘুর ঘুঘুর পালাপালি, তবু
বিবাদে পারিনি এ ওর জ্বালা।

(পৃঃ ১৪৯)

(৮) ফাগুন-আকাশে মাখে কাল-সাঁঝ,
কোড়ো মেঘে কিছু বেলা,
ওঠ্‌রে বেদিনী! মোট বেঁধে নিই,
তুলিতে হইবে খেলা।

•

সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে,
আমার সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি বেদিনী
তারাদুকে মুখ চাপি'।
দুই আর অমি পথে পথে ভ্রমি,
সাথে শত-তালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে তাল-ঠুকরী
চিরসাথী শির'পর।

•

ছুটে যায় খুঁটো, ওরে ঝেঁকা-ভাঁদু,
ছুটে যায় ঘরখানি,
ছুটো ভাঁড় আর কানা-ভাঙা হাঁড়ি,
ঘুরে ঘুরে গড়াগড়ি।
অকালের এই কালবৈশাখী —
ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটি মাথায় চাপিয়ে
বেদিনী যে হাত ধর্।

(পৃঃ ১৭২)

যতীন্দ্রনাথের নব-ভগবদ্‌গীতা, বা 'দুর্ভাগাবদ্‌গীতা' —

(ক) ওগো ভুলিয়া সহসা আজি যে সন্দেহ মনে জাগে,
হয় তো তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে অনুরাগে।
যাহা আছে যার তাহা ছাড়া আর কী পারে সে পরে দিতে!
অপার দুঃখ তোমা হ'তে তাই ব'রে পড়ে চারিভিতে!
হে বিরাট! আজ হেরি মনে তব দুঃখের নাহি ওর;
চির-বর্ষণে ভুলায় না তবু অনুরাগ ঝরিলোর!
প্রকাশিতে মহ, — করিতে সোপন প্রাণের গভীর ব্যথা
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা!
তথাপি, বন্ধু, সিঁদুর সভা বিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ভুলে ভুলে বুঝি তোমারি শীর্ণ-দুখ-রক্ত মাখা!
• • • •
কণ্ঠে কণ্ঠে কে কহিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ওঠে!
মরণে মরণে চিল চিল করি' কোন্ মহাপ্রাণ টোটে!
(পৃঃ ৯৩)

(খ) তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, বায়ু, অগ্নি, ব্যোম,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি স্বর্গ, সোম।
স্থাবরের স্থিতি, জঙ্গমের গতিধারা,
যেখানে যা-কিছু তুমি, — শুধু আমি-হারা!
যাকখানে খেলে চিৎ-লীলা-পারাবার,
তুমি-আমি অনন্তের এপার-ওপার।
দুঃখ মোর ভাই, —
হইয়া পরাণ-বন্ধু থাকিয়াও নাই।
(পৃঃ ২০৮)

যতীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি ও কবি-মানসের পরিচয় পত্রিকার নহে, এইবার সেই পরিচয়ের চেষ্টা করিব। এতক্ষণ সাদ করিলাম; কিন্তু ইহা ত' কাব্য- (আগামীবারে সমাপ্য)

কাব্য দেখে যেমন ভাবো,
কবি কেমন মানুষ,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব —
বাজমুখেই দুর্লভো।

বঙ্গ-দর্শন

—

ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি — বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ।

—ধর্ম্মতত্ত্ব (বঙ্কিমচন্দ্র)

পাইলেটকে খ্রিষ্টিয়ান করা যুষ্টের পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে ততদূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। এসব স্থলে ধর্ম্মোপদেশে কিছু হয় না। অতিমানুষ-কীর্ত্তি একটা প্রচার করিলে, যা' হয় একটা কাণ্ড হইতে পারিত। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতি-মানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকার ভেল্‌কির দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার বা আপনার দেবত্ব স্থাপন করেন নাই।

—কৃষ্ণচরিত্র।

এবার আমরা স্বাধীন হ'য়ে দুর্গোৎসব করিব, চারিদিকে সেই রব শুনিতেছি। দেশে যাকগুটিকের আবির্ভাব-কাল হইতে শুরু করিয়াছে; দুর্গাপূজার যে ছয় আনার খরিদা মনে হয়, তাহারও বিদ্যুৎচমক আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; ইহার উপর চুরী-ডাকাতি ও ব্ল্যাক-মার্কেটের যে অন্নোৎসব পড়িয়া গিয়াছে তাহাও নিম্নে হাত চরিয়া তুলিয়াছে। এবার সুখের সিঁদ্ধ' বাঙ্গালীর কখনও হয় নাই, কাজেই দুর্গোৎসবটা সাধারণে, অর্থাৎ পুজোর বাজার না হইবারই কথা; এবং স্বাধীন ব্যাপার তাহা যথেষ্ট স্বাধীন ভাবেই হইবে, ইহাই আশা করা যায়। যাহোক আপনাকে বাঙ্গালী এবার কি যে করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। শুনিতেছি কোন কোন স্থানে পূজার মন্ত্র নাকি সংস্কৃত না হইয়া বাংলা হইবে; এবং যাকে বলি দেওয়া নিয়ে হইতে নামিয়া আসিতে বলা হইবে; অন্ততঃও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, বলির খাড়া নাকি উঠিবে না। বাঙ্গালী স্বাধীন হইয়াছে বলিয়া যাকে আর মুক্ত করিতে হইবে না। এ সকলই বড় সুখের কথা। এইবার আমরা সত্যকার দুর্গোৎসব করিব — এতদিন তাহা করিতে পারি নাই; পিতা-পিতামহেরা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বাধীনতা না থাকায় সে উৎসবের কোন অর্থই হয় না। এইবার যাঙ্গালী প্রাণ ভরিয়া আশ মিটাইয়া দুর্গোৎসব করিবে। সে উৎসব চারিদিকে ঘনাইয়া উঠিতেছে।

• • •

না, হাসির কথা নয়; উৎসব তাহাকে বলে তাহা বাঙ্গালী বহুদিন ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার শেষ নাই, সম্বল ফেলিয়া ঢোঁড়া চাঁচিতে সে এমনই অভ্যস্ত হইয়াছে যে, উৎসবের নামে শ্মশান-কীর্ত্তন করিতে তাহার আর বাধে না। ওকে যা ত' একদা 'সাজার যা', যা 'দর্জ্জনীন' হইয়া উঠিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারও ঘরে আর চিনি আসেন না, চৌবাচ্চায় দাঁড়াইয়া সন্তানগণকে একবার পীনস্তন্যে দেখিয়া ফিরিয়া যান; তার উপর, এবার শুধু সর্ব্বজনীন নয়, 'স্বাধীনতা-জনীন'

হইয়াছেন; তাই ভয় হয়, এবার বাঙালী কি করিয়া বসে! চারিদিকে যে সব লক্ষণ দেখা যাইতেছে (খুলিয়া বলিবার যো নাই), তাহাতে এবার স্বাধীন বাংলায় বাঙালী যে দুর্গোৎসব করিবে, তাহা দেখিয়া স্বর্গত পরাধীন পিতৃ-পিতামহগণ নিশ্চয়ই লজ্জায় অধোবদন হইবেন।

* * *

এই সংখ্যায় আমরা পরাধীন বাংলার একটি দুর্গোৎসবের বিবরণ — একজন পরাধীন বাঙালীর আত্মকথা — উদ্ধৃত করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, পরাধীন অবস্থায় বাঙালী কেমন দুর্গোৎসব করিত এবং স্বাধীন অবস্থায় সে দুর্গোৎসব কিরূপ হইবার কথা। কিন্তু আমরা যে নেহাতই বাঙালী, স্বাধীনতার স্বর্গ এখনও খুঁজিতে পারি নাই, চক্রনাভিছে ত্রিবর্ণ-পতাকা দেখিয়া রাজভক্তির মূর্ছা করিতে পারি না, তাই এমন প্রশ্ন করিতে লজ্জাও বোধ করি না। এবারকার দুর্গোৎসব তো দুর্গতি-উৎসব নয়, উহা যেন একটি মৃত-পতির উৎসব যাহা স্বাধীন নরনারীর পক্ষেই সম্ভব। আমাদের দুর্গোৎসব অনেকদিন ফুরাইয়াছে, এ দুর্গোৎসব আমাদের নয়; তা'ছাড়া আমরা যে বাংলাদেশে বাস করি সে বাংলাদেশ এখনও কাল হয় নাই; তাহাতে এক অংশ পরাধীন থাকিতে আর এক অংশ স্বাধীন হইতে পারে না। সেই অন্যায়ের যারা ঘটিতেছে এক আর যারা ঘটিলে কেহ নিষেধ করিবার নাই, তাহার সংবাদ কম-বিস্তর পাইতেছি — বাংলার সংবাদপত্রগুলি হইতে নয়, — ঘরে ঘরে হইতে আত্মীয়-বন্ধুর চিঠি-পত্র হইতে। আমরা সেকালের দুর্গোৎসবের কথাই জানি ও বুঝি; বাংলাদেশ স্বাধীন কি পরাধীন — দুর্গোৎসব-কালে সে কথা আমরা কখনো ভাবি নাই, এখনও ভাবিনা; এ উৎসবে আমরা সমগ্র জাতি ও সমগ্র দেশকে স্মরণ করি; আমাদের উৎসবে জাতি ও জাতির ধর্মটাই বড়; সেই জাতি ও ধর্মই যেন বিপন্ন, তখন উৎসব করিবে কে!

* *

গত সংখ্যায় আমরা 'নবাগতেভ্যঃ' প্রতি' বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিবার অবকাশ পাই নাই। কিন্তু এতকালে উহার একটা কথা অনেকের নিকট প্রায় হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে; তাই আমাদের পক্ষ হইতে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। লেখক-গণকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি উপদেশ দিয়াছেন—কেহ টাকার জন্য লিখিবেন না। এই কথাটি এতকালে হেয়প্রায়, এবং সকল অর্থ-নীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ অনুকিমুক্ত মনে করিবেন। আমরাও তাঁহাদের সহিত একমত; কিন্তু এতই কালের নয়। লেখনীবৃত্তি এবং অন্যান্য বৃত্তির মতই একটা বৃত্তি বা জীবিকা হইয়া উঠিয়াছে। কেন তাহা হইয়াছে, এবং আধুনিক সমাজে তাহাই হইতে যায়,— তাহা আমরা জানি। কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের উন্নতি অপেক্ষা অবনতির সম্ভাবনাই অধিক, ইহা অস্বীকার করা যাইবে না। যারা হইয়া আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহা একরূপ ধর্মও বটে, কারণ, ওই ব্যবসায়ের মূলে আছে আত্মরক্ষা। কিন্তু যাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য, যাহা জাতির ভাবময় চিরজীবনের সম্পদ হইয়া থাকে, তাহার সৃষ্টি যিনি করেন, তিনি একই সঙ্গে দুইটা বৈষয়িক সাধন করিতে পারেন না, করেনও না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তাঁহাকে ঐ টাকার — হয় তো বা বাজার-মূল্যের নিকটতম — আশিতে হয়, তবে প্রতিভাসম্পন্নও তিনি তাঁহার স্বর্গ পালন করিতে পারেন না; ইহার প্রমাণ সকল আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে; কোন কোন বিলাতী সাহিত্যিক তাঁহাদের আত্ম-কাহিনীতে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেন পারেন না, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই অতিশয় সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে একটা ঘটনা যাহা প্রায় ঘটিয়া থাকে — সকলেই

করা করিয়া থাকিবেন। সেজন্য যেখানে খ্যাতি অর্জন করিতে তাঁহারা কোনোদিন চেষ্টা করেন সেই খ্যাতির পথে উত্তীর্ণ হন, সেইখানে তাঁহারা অর্থ বা খ্যাতি কোনোটাই লাভ করেন নাই; অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুইয়ের কোনো তাঁহারা কামনা করিয়াছিলেন। পরে যে খ্যাতিলাভ হইয়াছে তাহা সেই উপলক্ষ্যেরই পুরস্কার। কিন্তু খ্যাতি যখন টুকি পাইয়াছে, তখন তাঁহাদের হৃদ-সাধনার কবি-মানসের সেই স্বাধীন স্বয়ম্ভূ শক্তি ম্লান পাইয়াছে — খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গেই, এবং ঐ যুগের কারণে জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা, এবং তাহারও প্রয়োজনে জন-মনোরঞ্জনের পরিচেষ্টা, এবং সর্বশেষে, আত্মপ্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণের উচ্চ প্রশংসার একটিকে যেমন আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায় — সত্যকারের লেখক না হইয়া তাঁহাকেই নিজ লেখায় নিযুক্ত করিতে আর কোন বাধা থাকে না, তেমনই কবিচিত্ত ও অপ্রযুক্ত হইয়াছে এবং অসাহিত্যিক ও অবান্তর চিত্ত-বিক্ষেপের দুষ্টি সাধন করিয়া, প্রতিভা আপনার অজ্ঞাতসারে আত্মহারা হয়ে। খ্যাতির সহিত অর্থের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে, ততই ঐ পাপ প্রবেশ করে। কবি-সাহিত্যিক প্রতিভাবান হইলেও সে মানুষ হিসাবে খ্যাতি যত অকল্যাণকর নয়; কিন্তু হাতে ধনী হইয়া উঠিলে, মানুষটাই আর সে মানুষ থাকে না; খ্যাতি এবং অর্থ দুইয়ে মিলিয়া তাহার চিরতরে সেই সাহিত্য-স্রষ্টা সত্তাকে লোপসাট করে — যে পরিমাণে লোপসাধন বিলু অধিক হয়। তখনও সে তাহার সেই একদিনের স্রষ্টাসত্তার অভিমানে আঘাত করে না; সে যে তখন পরিপূর্ণ সাহিত্যিকই একজন হইয়াছে — সেই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কারণটি তাহা বুঝিতেও দেয় না। আমি খুব সাহিত্যিকের কথা বলিতেছি না, তাঁহাদের দ্বারা সাহিত্যের কোন স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা যেমন নাই, তেমনই তাঁহারা খ্যাতি ও অর্থের লোভে জনমন-বিমোদন সাহিত্যসেবা করিবেই — করিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু বাংলাদেশে সাহিত্যিক প্রতিভার এমনই দুর্ভাগ্য পড়িয়াছে যে, এখনও যেখানে যেটুকু যোগ্যতার আছে তাহা যদি এখনই করিয়া শুরু হইয়া যায়, তবে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া বসেন নাই; আমরা কেবল এইটুকু উদাহরণ যোগ করিতে চাই যে, সকল লেখকের পক্ষে ঐ উপদেশ যথার্থ নয়। যাঁহারা বিবিধের শক্তির অধিকারী তাঁহাদের সাহিত্য শুরুতর; তাঁহাদিগকে, অবশ্যক হইলে, সাহিত্যেরই হইতেই হইবে।

* * *

গত শ্রাবণসংখ্যা 'বর্তমান'-পত্রিকায় আমরা একটি গল্প পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—এখন গল্প, অন্ততঃ এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কারুসৃষ্টি আমরা অনেকদিন উপভোগ করিতে পাই নাই। গল্পটির নাম 'দরাজদিল', লেখক — আমাদের একালের অন্যতম প্রতিভাশালী গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 'বঙ্গ-দর্শনে'র এই প্রবন্ধে উহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়, তাহার কারণ পরে বুঝিতে পারা যাইবে। এই গল্পটি সাহিত্য-শিল্পের অটিল আদর্শ রক্ষা করিয়াও, অর্থাৎ মুখ্যতঃ রসসৃষ্টিতে সার্থক হইলেও, জীবনের একটি গভীরতম সমস্যা — যে সমস্যা বর্তমানে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা চিত্তবিক্ষেপকর ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে — সেই সমস্যার উপরেও একটি নীরব-মুখর যুক্তি-তর্কাতীত উপলব্ধির আলোক-পাত করিয়াছে, এমন কাজ কেবল কবিরাই করিতে পারেন। মুখ্য প্রমাণের আর একটি কারণ এই যে, ইহাতে একটি রীতিসিদ্ধ নাটক বা নাটকধর্মী উপন্যাসকে এমন ক্ষুদ্র আয়তনে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাতে উপন্যাস ও গল্প যে প্রকৃত আমরা লক্ষণের লক্ষ্য করি, তাহা যেন লুপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ঐ গল্পটিকেই বিশ্ব বিশ্ব করিয়া একখানি সুন্দর উপন্যাস রচনা করা যাইত — তাহার সেই বিস্তার উহার আয়াই

হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে উহার মূল রসবস্তু কিছুমাত্র উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত না ; কেবল স্থান (কাগজের বিস্তার উহাতেও আছে) ও শ্রমের আরও সংক্ষেপ হইত, সন্দেহ ও প্রকৃতির পরিচ্ছন্নটিকে অধিকতর বিশুদ্ধ, এবং আরও অনেকগুলি চরিত্র বা পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করা যাইত ; তাহার ফলে উপন্যাসের যে গৌরব-বৃদ্ধি হইত তাহা খুবই রসসৃষ্টির দিক দিয়া নয়— জীবনের বাস্তব ঘটনার সহিত অধিকতর পরিচয়ের সুযোগ হইত, একটা বেগবান-পথে ভ্রমণ করিয়া অনেক অতিরিক্ত-রস হইত। সত্য বটে, উপন্যাসের রসসৃষ্টি এই কারণে আরও শক্তিশালিনী যে, তাহাতে বহুতর, বিচিত্রতর, ঘটনাকে একটা বিপুল প্লটবন্ধনে বাঁধিয়া তাহার একটা সুবলয়িত কেন্দ্রগত সুষমা সন্ধান করিতে হয় — সেই জটিল বিন্যাসকে একটি রসবিন্দুতে সুসমাধিত করা চাই। এইজন্য সেখানে কবির সৃষ্টিশক্তিকে একটি দূরব্যাপী পরিধির উর্ধ্বে হইতে হয়। উপন্যাসের কেন্দ্রস যে-রস ঐ ঘটনাবৈচিত্র্যের রস — নানা রস, নানা বিরোধের রস করার রস। তথাপি এই গল্পটি পড়িয়া মনে হইয়াছে — সেই ঘটনাভার আর উহাতেও ওটানো রহিয়াছে, লেখক অনায়াসে তাহা বিস্তার করিতে পারিতেন — তিনি সেই ভার-ক্ষেপকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, অথচ তাহারা আমাদের মনের মধ্যে দ্বারা পাইয়াছে। আমার মনে হয় ছোটগল্পের রস-বৈচিত্র্য, এবং তদনুরূপ বিভিন্ন আকার ও ভঙ্গির আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও, এই ধরণের ছোট গল্পেই কল্পনা ও অনাসক্তির পরাকোটা। এই গল্পের নায়ক মহাকাব্য বা নাটকের নায়কই বটে, অথচ তাহাকে অতি-মানব বা অসাধারণ চরিত্র হইতে হয় নাই ; অতিমর্ত্য দুঃখ ও সহজ মানবধর্ম তথা সুখ-ধর্মের সে প্রতীক। তাহার জীবনে বিষেরও গরের সহিত মুখ আছে, আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলে, সেই তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ত্রিবিধ শক্তির মিলন হইয়াছে তাহার চরিত্রে —প্রত্যেকটিই উপযুক্ত মাত্রায় ; এই জন্যই উহাকে যেমন মহৎ তেমনই বাস্তব চরিত্র বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু যাহা আমাদিগকে — বিশেষতঃ এই যুগের ঘাত-প্রতিঘাত-জীবনের আবহাওয়ায় — সব চেয়ে মুগ্ধ ও উজ্জীবিত করে, তাহা ঐ চরিত্রের গৌরব ; সেই গৌরবেও একটা দেশ ও জাতিগত — বহু-আনাগত — সংস্কার-প্রবণ আছে ; মনে হয়, আমরা যেন সেই মহাজাহাজের যুগে ফিরিয়া গিয়াছি, সহসা একটা বৃহৎ কালের ঝঞ্ঝাবর্তের আবর্তে পড়িয়া হেইন তরিয়াছে। সে যুগ চিরপ্রাচীন হইলেও চিরনবীন, এবং তাহাতে মনুষ্যের যে চরিত্র-বিকাশ হয়, তাহাতেই মনে মানব হৃদয়ের এপিক্‌ধর্মিতা — এই এপিক্‌ধর্মিতা সর্বযুগের সর্বজাতির মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

* * *

কিন্তু চমৎকারের আরও কারণ আছে। লেখক এই গল্পের দ্বারা একটা বড় সমস্যার সমাধান — কবির মতই, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভাবে — করিয়া দিয়াছেন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। গল্পটির নাম 'অস্ত্রধারী' না হইয়া 'হিংসা ও অহিংসা' এইরূপ হইতেও পারিত ; হইলে, তাহারা গল্পের রসবস্তুকে লক্ষ্য করা হইত না বটে, পাঠক-পাঠিকার মনে পূর্ব হইতেই একটা বিতর্কমূলক রসবিরোধী মনোভাব কোথায় বাঁধিয়া বসিত। কিন্তু গল্পটি পড়িবার কালে যে-রসবস্তুটি ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠে, এবং শেষে একটি অপূর্ব রস-সংবেদনার দ্বারায় সমাধান হইয়া যায় তাহা ঐ হিংসা ও অহিংসার সমস্যা। ঘোষকর্ণ ও মানবধর্মে যে মূলতঃ প্রভেদ, সেই প্রভেদের জন্যই ঘোষকর্ণ ও মানবধর্ম-শাস্ত্র এক নয় ; এবং এই প্রভেদের যে কাল, তাহাকেই অধিমাধিত করিয়াছে মানুষের রচিত শ্রেষ্ঠ ভাষা, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই গল্পটিতেও সেই প্রভেদ ও তাহার কারণ এমন একটি রসরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাহার পর আর কোন তর্ক, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কবিদের

আজ হৈচৈ, ওঁকার শিখাই 'হুহু হৈচৈ' এবং না, 'হৈহৈহৈ' বেশ। 'হিংসা ও অহিংসা'র বিরুদ্ধে এই গল্পটিরও তাহাই হইয়াছে, সকল তর্কের নিরসন হইয়াছে, 'হিংসা ও অহিংসার কোন চিরাচরিত ধর্ম আর নাই। আমরা কেবল মানুষকেই দেখি, তাহাদেরই সম্বন্ধে হইয়া থাকি; হিংসা-অহিংসার ভেদ আর থাকে না, দুইই এক 'সৎ'-বাতুলের সমান হইয়া যায়। তখন মনে হয় বটে, ঐ আছা, ঐ 'সৎ'ই সব, আর সকলই মিথ্যা; ঐ মানুষই সব, আর সকলই তাহার পায়ের তলায়।

•

ঐ গল্পের আখ্যান-ভাগে বিশেষ নোয়াখালি-কাণ্ডের একটা সুস্পষ্ট ছবি বিদ্যমান যে অভিশপ্ত ঘটনাটি, তাহাতেই নায়ক-চরিত্রের একটা ট্রাজিক বিশ্লেষণ ঘটিয়াছে। বাংলাদেশের বাহার সেই আত্মাবমাননা বিষয়ে কোথাও একটা সকরুণ ছায়া পর্যন্ত ফেলিতে পারে নাই — বিহারে তাহা আর ঘটিবার কি কারণ, এই বাস্তবানুসারী ঘটনা-কাহিনী পাঠ করিলে, বাঙালীমাত্রেই তাহা চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ আত্মসচেতন লাভ করিবে। যে পৈশাচিক অত্যাচারের নয় নয় বাঙালী কুলবধূরা তাহাদের মাতৃত্বের জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছে — বাঙালী-পুরুষ তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা তো করেই নাই, সেই অত্যাচারকে সহনীয় করিবার জন্য তত্ত্বেরও, এবং সেই হইতে, আরও বেশী করিয়া অহিংসার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছে — প্রেম ও ক্ষমার অতি-উচ্চ আদর্শ ঘোলা করিতে আত্মনিয়োগ করিতেছে। ইহারা কি মানুষ! যে মানুষই নয়, তাহার আবার হিংসা-অহিংসা কি! যে মানুষ — অন্তত নয়, ভগবানও নয় — সমাজে বাস করে, নিজ নিজ স্ত্রী কন্যা লইয়া সেই একই ভাবে আত্মসুখ ভোগ করিতে সমান লালায়িত, সেও এমন অহিংসার অনুরাগী হয় কেন? একটু ভাবিয়া দেখার বা কোন মূল্য?

•

মতবিশেষে অহিংসা একটা বড় কথাই বটে, এই কারণেই ঐ কথাকে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত করা হইয়াছে। কিন্তু সে কাহাদের জন্য? অধিকার-ভেদ নাই? সে কি সমাজস্থলী গৃহীর জন্য? ঐ অহিংসা কি গৃহীর ধর্মে তোলাও যায় না? যদি তোলাও না যায় তবে একটা অসামঞ্জস্য থাকিবেই — সেখানে সেই আদর্শকে এড়াইবার চেষ্টা করিলে অহিংসাদর্শী গৃহীর, অর্থাৎ বিধাতাপুরুষের — আসল চরিত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। অহিংসাব্রতী পুরুষ অম্লানবদনে আততায়ীকে ক্ষমা করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে পারে, কিন্তু আত্মবিসর্জনটাই সমস্যার বড় কথা নয় — পরকে রক্ষা করা। তাহার চেয়ে বড় কথা; আমার নারীকে রক্ষা করা পুরুষের প্রাথমিক ধর্ম। ঐ অহিংসাদর্শী এখনও নোয়াখালির জবাব দিতে পারে নাই, সে প্রশ্নটাকেই এড়াইয়া গিয়াছে। উহারা বলে, ক্ষেত্রবিশেষে ঐ ধর্মের বিকল্প-বিধিও আছে; জিজ্ঞাসা করি, সেই ক্ষেত্র ক' একের 'বিশেষ' নয় — বিপুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কি সেই বিকল্প-বিধি পালন করিয়াছে? আসল কথা, কেবল উচ্চ ধর্মনীতি বা আদর্শের দোহাই দিয়াই কেহ নিজের সেইরূপ ব্যক্তিগত ধর্মী করিতে পারে না। লোহাই স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হয়, কারণ সেই স্পর্শ পাইলেও কাহাই থাকিয়া যায়। তবু লেখকেরা এই কাহার নাম 'সোনা হইয়াছি' বলিয়া ঘোষণা করিতেছে!

•

আমরা দেখ যে এই গল্পটির উদ্দেশ্য ও ঐ দীর্ঘ প্রসঙ্গ করিলাম, পাঠক-পাঠিকাগণ এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি তাঁহারা এমন মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা অহিংসাকর্তাকে গালি দিয়েছি, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমরা কেবল ঐ

ধর্মের সঙ্গে সাধারণ মানব-ধর্মের একটা অবশ্যম্ভাবী বৈষম্য নির্দেশ করিয়াছি। অহিংসা-ধর্ম কি তাহার সম্বন্ধে আলোচনার স্থল, অথবা তাহার সাধন-তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনার স্থান ইহা নহে। আমরা সে ধর্মের মহিমা সমাক অবগত আছি। অধুনা আমাদের দেশে, বিশেষত এই বাংলাদেশে, ঐ ধর্মের নামে, একটা ভাবপ্রবণ আধ্যাত্মিকতার অনুষ্ঠানে, যে আত্ম-সম্মোহন বা পর-প্রবঞ্চনা সৃষ্টি পাইয়াছে তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এই আলোচনা করিলাম; এবারকার প্রবন্ধে আরও কিছু করিব।

* * *

ঐ শ্রেণীর অহিংসাবাদীরা যে কিরূপ নির্লজ্জ তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। সম্প্রতি কলিকাতায় একদল কেন্দ্রেপ্রেমিক, বিলাত-যুদ্ধের বিরোধী বাঙালী মহিলাদের অভিনন্দনার্থে কয়েকটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মতি একেবারে সুস্থ না হইলেও, ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত ছিল। ঐ অনুষ্ঠানগুলিতে, সেই অভাব এবং অন্তত কয়েকজন — জাতির ইতিহাসে ও মানুষের ইতিহাসে অমরত্বলাভ করিবার যোগ্য — মহাপ্রাণ যুবকের কীর্তি স্মরণ ও কীর্তন করা হইয়াছিল। তাহাতে ঐ অহিংসাবাদীরা বিচলিত হইয়াছেন। মানিলাম যে, বধ-বিষাদ বা Creed-হিসিনটাই এমন কথা যে, এক ধর্ম-বিশ্বাসী অপর কোন ধর্ম-বিশ্বাসীর নাক-মাথে ঘিন্ন হইয়া উঠে, — যেমন মুসলমান হিন্দুকে বরদাস্ত করিতে পারে না। কিন্তু অহিংসাধর্মীদেরও এই হিংসা কেন? হিংসা ছাড়া আর কি? নিজের স্বার্থহানির ভয় বই ত' নয়? যাহারা 'হিংসা'-ধর্মী হইয়া ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল তাহারা অন্যায় কিছু করিয়াছিল, তা' সে হিংসাতে হৌক, আর অহিংসাতেই হৌক। তোমরা যাহারা ঐ বক্তৃতাবাজি করিয়া থাক, তাহারা কী ত্যাগ করিয়াছ? অহিংসাধর্ম যদি এত বড়ই হয় তবে তাহার দৃষ্টান্ত কি তোমরা? তোমাদের 'অভিনন্দনের'-কথা শুনিয়া কি সৃষ্টি তাহার মহিমা-প্রচার হইবে? মুখ আছে বলিয়াই বক্তৃতা করা যায়, কলম আছে বলিয়াই লিখিতে পারা যায়, বুদ্ধি কিছু টাঁক বলিয়াই কলপতি হওয়া যায়, এবং তর্কিশায় তাহারকম পড়া আছে বলিয়াই তর্ক করা যায় — কিন্তু যাহারা তোমাদের মত মানুষের দ্বারাও মারাইত না, যাহাদের আত্মার ভাষা তোমাদের ভাষা নয়, তাহাদের কীর্তি-অপকীর্তির বিচারে রায় দিবে তোমাদের মত মানুষ! কানাই-বটীনের নাম করিলে ধর্মহানি হয়! যাহাদের সেই মহাত্যাগ ও মহাবীর্য স্মরণ করিলেও এই কাপুরুষ-জাতির পাপক্ষয় হয়, তাহারা ও জাতির স্মরণীয় নয়! কেন নয়! তোমাদের কানুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়ে বুঝি!

* * *

সম্প্রতি বাংলাভাষাকে বাংলাদেশে 'সরকারী' ভাষা করার চক্রম প্রচেষ্টা হওয়ায়, বাঙালীসমাজে বড় হই-চৈ-কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। একজন পাটি বাঙালী, মাতৃভাষার পরম ভক্ত, ইংরেজী-শিক্ষার দলপতি, ঐ উপলক্ষে এমন একটি উক্তি করিয়াছেন যাহাতে বুঝিতেছি, তাঁহার উন্নাসটা অনেক-গুলির উপযুক্তই হইয়াছে, অর্থাৎ, বাংলা-ভক্তির জন্য বাংলা-বিদ্যার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। ঐ মাতৃ-ভাষার প্রতি, সেকালের তুলনায়, একালের এই স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঙালীর মনোভাব যে কত উচ্চ, তাহার প্রমাণস্বরূপ, সম্পাদকপ্রবর সেকালের সেই দাসমনোভাবাপন্ন এক বাঙালী মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই মনীষীর নাম — স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি নাকি তাঁহার পুত্র-ভাইপোকে উপদেশ দিয়াছিলেন — 'to think in English, and to dream even in English'! এই বাক্যটির সহিত আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে, উহা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'-নামক নাটকে মাতাল নিমেদত্তের উক্তি (দ্বিতীয় অঙ্ক,

দ্বিতীয় পক্ষের) প্রবেশকালীন বর্ণনা দূরের কথা—লেকালের বাঙালীসমাজে বর্ষার ও বর্ষাকাল-বোধের প্রসারে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরও সমান ছিলেন, তিনি যে এমন কথা কোথাও কোন উপলক্ষে বলিয়া থাকিতে পারেন, তাহা এতদিন আমরা কল্পনা করিতেও পারি নাই। কিংবা হইতেও পারে; কারণ এযুগের বাঙালী সম্পাদকমণ্ডলীর মত খাঁটি বাঙালি ও স্বদেশপ্রাণ বাঙালী ত' পূর্বে কোনকালে ছিল না। তার উপর, বাঙালী এখন স্বাধীন হইয়াছে, স্বাধীন বাঙালীর মনে পরাধীন পূর্বপুরুষ সম্বন্ধীয় যে হতশ্রদ্ধা সঞ্চার।

* * * *

প্রবন্ধকারের 'স্বদেশে' রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতিতে যেখানে একটি গুরুতর ভুল ছিল; একটি পত্রিকার আমাদের সেই ভুল সংশোধিত হইতে দেখিয়া আমরা বারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি; প্রীতিলাভের আরও কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের সেই বয়সের কবিতা যে এখনও আমাদের তরুণ বন্ধুমহলে (তরুণতর !) এমন কঠিন করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। আশ্চর্যের কথা, ঐ পত্রিকার ঐ লেখক যেন এমনই দেখা-পড়ার পণ্ডিত নিয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করেন। কেবল একটা ভুল তিনিও করিয়াছেন যাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন "যত যত কবিই তিনি হউন, রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর কলম চালানো" ইত্যাদি (পত্রিকাখানি এখন কাছে নাই)। কথাটা ঠিক হইল না; রবীন্দ্রনাথ কেন, কোন কবির 'লেখার উপর কলম-চালানো' শিক্ষা ও সাহিত্যিক-নীতি-বিরুদ্ধ। এবিষয়ে কবিদের মধ্যে ছোট-বড় ভেদ করিতে যাই। ঐ কথাটিতে অপর কবিদের সম্বন্ধে সেই ভেদ-জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। কবিদেরই একটা সমাজ আছে, তাহা ভুলিলে চলে কি !

* * *

এবার জানাইতে 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' প্রকাশিত হয়া গেল না। আরও একটি কৈফিয়ৎ পাঠক-পাঠিকাদের নিকট দিবার আছে। আমরা পূর্বে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম যে, এই সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর প্রথমে অসুস্থ ও পরে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায়, উপন্যাসটি এখনও প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, আরও সময় চাহিয়াছেন। অতএব পাঠক-পাঠিকাদলকে আরও কিছুকাল ধৈর্যধারণ করিতে হইবে। উপন্যাস না থাকিলে সাহিত্য-পত্রিকার অসম্পূর্ণতা হয়, ইহা আমরাও বুঝি, তবু আমরা এবার হইতে সে বিষয়ে উদাসীন হইয়াছি। বিশুদ্ধ গল্প ও উপন্যাস ত' সকল পত্রিকাতেই প্রচুর পরিমাণে থাকে এ পত্রিকায় যদি কিছু কম থাকে, তাহাতে খুব দোষ হয় কি !

[২০শে আশ্বিন

অতএব বুদ্ধিমানী, —
পুরানো প্রথি নিখিল করিতে তবে চূর্ণ নবপ্রথি।
প্রোথিত বপ্ত বসনতপ্ত রহিম ধীরজে বাঁধি'
বিদি' তারই তলে ভাবে মনে মনে বুদ্ধি সাদন সাধি।

— রহমান্না

---

৮ নং চেত পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট "অবেলা প্রেসে" বিপদভঞ্জন পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

থাকে। ইহাতে বিশেষ উন্নতি লক্ষণ হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে, দারিদ্র্য-দুঃখ সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই।

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ সমাজ-সংস্থাপনেরই ফল—যথা দারিদ্র্য। এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনই সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল নহে; তাহা নিবার্য্য, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অঙ্গ।

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্যসমাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

এগুলি সামাজিক অত্যাচারসম্ভূত।

কিন্তু কে অত্যাচার করে? কেন অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যের কি আত্মপীড়নের উপর অত্যাচার করে? তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিই অত্যাচার; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি, সেই অত্যাচার করে। সেই শক্তি—শাসনশক্তি; সামাজিক কেন্দ্র—রাজা বা সামাজিক শাসনকর্ত্তৃগণ। তাঁহারাই অত্যাচারী।

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাঁহারা রাজপুরুষ—অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ।

যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, বা রাজশাসন নাই, সে সকল বিষয়ে অধিকাংশের যে মত অল্পসংখ্যককে সেই মতে চলিতে হয়। মরিলে অধিকাংশ অল্পসংখ্যককে সমাজবহিষ্কৃত করিয়া দিবে—বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে। ইহা লোকতন্ত্রের সামাজিক অত্যাচার।

কি কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিবারণ হইতে পারে?

দুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল।

যাহার কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন প্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না—এমন প্রস্তর নাই যে আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহলোকের উচ্চ আপীলস্থল—সকল আপীলের উচ্চ আপীল এইখানে; ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অন্যান্য কিজন্যে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক বৃন্দের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। অনেক সময়েই যাহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে বুঝে। বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা।

অন্যত্র যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ। কখনও কখন রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্ত্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয়েন।

অন্যত্র কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিজনিকা শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

বাহুবল মনুষ্যসমাজের প্রকৃতি বিষয়ে অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অন্যায়াচরণে, বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ করে, সামাজিক

অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতি প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবল পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে — যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা, বিজ্ঞান, শিল্প, বাহুবল উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক — ধর্ম্মনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্রহ্মজ্ঞানবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

যেই শিক্ষাদীক্ষা উপদেশগুলো যদি স্বভাবিরুদ্ধ বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হুলস্থুলতা হয়। যাহা সমাজের একবার হুলস্থুল হয়, সমাজ আর তাহা রাখে না — উল্টাইয়া প্রস্তুত হয়। উপদেশবাক্যবলে 'আলোকিত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ বাহুল সমাজিত ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাহার কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ।

ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ — বাহুবলের অভাব।

যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও মনুষ্যের ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন শ্রেণিস্থিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল; যদি দয়া, সাধিষ্ণা, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল; না হয় খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের পক্ষই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। সে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শত্রু আছে। শত্রু আছে। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে। দুষ্টের অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন করে।

কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্ত্তব্য। যখন তোমাকে শ্রীবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবারে স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্ম্মিক। অতএব যাহার তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্ম্মিক।

আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে আমার চতুর্থ বিষয়ের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্ম্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্ম্মের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ব্বস্বান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

ভাঙা-গড়া

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এত ভরসায় কোরেছিনু ব'লে
মেটেই চলবে, ঠাকুর ?
দেখবে না চেয়ে, পায়ের তলায়
মানুষ কি মরা-কুকুর ?
এত সোনা ছাই ছেড়া-বেলপাতা,—
এরই তোমায় ঘিরেছিলো মায়া ?
ষোড়শোপচারে পূজিতা প্রতিমা
ভাসিয়ে দাঁড়ায় যায় !
ঝিলিবিলি করে চোখ্‌দুটো কেটেটে,
নিশ্বাস বন্ধ বিষটোয় উঠে,
ভুতুর ভেতর পায়ের শব্দে
আপনারে বলি পায় ।
কিরে শয়তানী ভীক ভয়ঙ্কর,
তুলা মকুনি টেনে টেনে ছাল,
ভাঙি মাঝে তুমি বেরোলি বেরাল
নাচো,—
বেরাল সেই যে কে মরে সে বাঁচে,
আপনি মরো কি বাঁচো ।

ছিলে যত সুন্দর,—
আজ, কি দশা অরুচিকর !
কে কোথা শুনেছে মাটে বসি শিব
শৃগাল শকুনি হয় উদ্গ্রীব ?
তোমার ভিতর এমন ঈশ্বর
কোথায় লুকায়ে ছিল !
মহানাশ ঘরে সাজানো আদরে
ভূতনাথ দেখা দিল ।

তবু ভেবেছিনু,—হোক্ কিছু নয়া,
ভৈরব যদি তুলিয়াছে ধরা,
না হয় নূতন গাহুনে কবি
দু'একটা দেবো লিখে ;

যে জাতির হায় তুমি একেবারে
মজ্জা ভাঙিয়া লাক্ষে খেয়ে যাচ্ছে !
পায়ের চাপনে ভস্ত ঘরে, ভস্ত
পলায় শিক্-বিরিঞ্চে ।

ভাঙিল আসর ঝিঁ ঝিঁ উড়ে পাল,
এত হ'য়ে গেল আকাশ পাতাল,
যে জাতির হেন বন্ধ মাতাল
এতকাল পূজা খায় !

ঐ যে কেদে মরা অন্নপূর্ণা
দারা ধরণীটা তার বিচূর্ণা,
যত ভীরুরে মরণ হানিলে —
মরা কি জিয়ানো যায় ?

বহুদিন পর চৈত্রি-পাজন,
মেখে-মাঠে আজ অম্বুবাচন,
খাদাও তোমার পাগুলে নাচন,
বেঁধে নাও জটাজুট,—

হাতের ত্রিশূল ঝাঁটুতে ভাঙিয়া
গলেরশালায় পিসিমা যাহিয়া
গাঁড়ে নাও ভাল, হ'য়েছে সকাল
বয় লাঙলের মুঠ ।

আমাদেরি সাথে চল গো ঠাকুর
　　ওই বাজে-দোকা বাটে,
দুই হাতে ঠেলে চালাও লাঙল
　　পাথরও যেন গো কাটে।
ভালো লাগিছ না আমরা শিব,
তা ব'লে চাহিনি আপো অভিজীব —
যাহারে চরণ নির্বিচারণ
　　ছড়ায় মরণ-পূর্ণা।
শুন! হও সচকিত,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শুভে ভাবণ কর ধারাজল
　　বাঁচুক অন্নপূর্ণা।

মোরা আছি সাথে, মাটেঃ মাটেঃ,
ঘরে নাই সতী যে ঘরণী-জায়া।
নিয়ে আয়নের প্রয়োজন কই?
　　এসে গড়নের পালা।
মাঠে মাঠে মোরা ফলাব ফসল,
বাটে বাটে ভরী হবে চঞ্চল,—
আসে ঘাড় আই কাঁধে হল, শিরে
　　কাস্তে-চাঁদের ডালা।
দেবতা যখন পূজা পেয়ে পেয়ে
হ'ল মানবের বাড়া —
শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব,
ভবে আই পাবে ছাড়া।

ঝড় এসে তোর ঘরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে
　　বিজয়েশের দেশে গো!
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো!

রক্ত মেঘে বিদ্যুৎ যাচে,
বজ্র বাজে গহন-গাঢ়ে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
　　উঠ্‌ছে অট্টহাসে গো!
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

আর্যোদয়*

শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, ডি-ফিল্ (মিউনিক্), ডি-লিট্ (প্যারিস্)

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৪)

পূর্বে ভারতের দিক হইতে তর্কবিতর্কপূর্বক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে আর্যগণ বহির্দেশ হইতেই ভারতে আগমন করেন। এখন গ্রীসের দিক হইতে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার পরীক্ষা করা যাইতেছে। যুক্তিগুলি প্রধানতঃ তিনটি। সুতরাং, গ্রীসের যে সকল যুক্তি ভারতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইবে সেই সকলই প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক এবং অসারগুলি বর্জনীয়। অর্থাৎ যদি দেখানো যায় যে, ঋগ্বেদীয় ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে আর্যগণ তাহারও পূর্বে ভারতে আগমন করেন; কিন্তু তাহা যদি প্রমাণ করা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে মোহেঞ্জো-দড়ো সভ্যতার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পর — অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীর পর — তাহাতে আর্যদের অন্তর্ভাব হয়।

প্রথমেই তাহা হইলে বিচার করিতে হইবে, ঋগ্বেদের ভাষা মোহেঞ্জো-দড়ো-সভ্যতার সমকালীন হইতে পারে কি না। উত্তরে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, তাহা পারে না। — প্রত্যেক ভাষারই একটা গতি আছে, কাল নিরন্তর পরিবর্তিত হইয়া চলাই জীবন্ত ভাষার ধর্ম। সংস্কৃত ও লাটিন ভাষা আর পরিবর্তিত হইতেছে না, কারণ এগুলি ভাষা আর জীবন্ত নহে, কিন্তু সংস্কৃত ও লাটিন হইতে উদ্ভূত বাংলা ও ফরাসীভাষা জীবন্ত, এবং সেই জন্যই এই দুই ভাষা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। অবশ্য যদি কেহ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত, এবং ফরাসী ভাষাকে লাটিন রূপে গণ্য করিতে সম্মত থাকেন তবে তাঁহার পক্ষে বলা সম্ভব হইবে যে ভাষার কোন পরিবর্তন নাই। কিন্তু মনুষ্যে গণিলে মনে করা যদি অসঙ্গত হয়, তবে বাংলাকে সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শুধু সংস্কৃত ও লাটিন কেন, পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছে। সংস্কৃত ভাষা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন যুগে বিবিধ প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও শেষে ভাষার জন্ম দান করিয়াছে। এই সকল ভাষার উৎপত্তির পূর্বে সংস্কৃত ভাষা যে লোপ পাইয়াছে তাহা নহে, কারণ আজ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় বইও লেখা হয়, কথাবার্তাও চলে। কিন্তু এই সংস্কৃত ভাষা — আধুনিক লাটিন ভাষার মত — যে কৃত্রিম, তাহা বলাই বাহুল্য, এবং এই ভাষার কৃত্রিমতার অপর কোন প্রমাণ না থাকিলেও ইহার পরিবর্তনহীনতা হইতেই তাহা অনুমান করা সম্ভব হইত।

এখন সকল ভাষা যে সমান গতিতে পরিবর্তিত হইয়া চলে তাহা নহে; বিভিন্ন বর্বর জাতির ভাষা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়, ফ্রেঞ্চভাষী সভ্য জাতির ভাষার পরিবর্তন প্রতি সভ্য দেশেই আরও মন্থর গতিতে সংঘটিত হয়। কিন্তু এই সকল বিশেষ বিবেচনার কারণ বর্তমান থাকিলেও, সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিন, জার্মানিক, স্লাভিক্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের বিবিধ আর্যভাষার ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া

* বঙ্গীয়-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রবোধ চন্দ্র বসু-স্মারক বক্তৃতা, নং ২।

এই সকল ভাষার পরিবর্ত্তনের পরিবেশ মোটামুটি নির্ণয় করা যায়। এই দুই শত বৎসরে ইংরাজী ভাষা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা যেমন Shaw, Shelley, Shakespeare ও Chaucer এর ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ পাণিনির ভাষা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষা, অথর্ব ও বহুর্বেদের ভাষা, এবং ঋগ্বেদের ভাষা পরস্পর তুলনা করিলে বৈদিক যুগের সেই জীবন্ত সংস্কৃত ভাষা কি পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। এবং পাণিনির ঐতিহাসিকাল জানা থাকিলে, ভাষার এই পরিবর্ত্তনের গতি হইতে ঋগ্বেদের ভাষারও কাল নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। এখন দেখা যায় কি? দেখা যায়, Chaucer ও Shaw-এর ভাষার যে পার্থক্য, পাণিনির ও ঋগ্বেদের ভাষার পার্থক্য তদপেক্ষা অধিক নহে, বরং কম; সুতরাং এতদ্বারা যাহা ন্যূনাধিক পাঁচ শত বৎসরের ব্যবধান স্বীকার করাই হইবে। এবং পাণিনিকে যখন খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমার্দ্ধে বলিয়া ধরা হয় (ইহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, পাণিনি 'যবন' অর্থাৎ গ্রীকদের উল্লেখ করিয়াছেন), তখন ঋগ্বেদের ভাষাও আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দশম শতকের ভাষা রূপে পরিলক্ষিত হইবে।

বাস্তবিক, ঋগ্বেদের ভাষা কোনক্রমেই খৃষ্টপূর্ব দুইসহস্র বৎসরের পূর্বেকার সেই অনৈসর্গিক-সভ্যতার অবাস্তবে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইরানীয় অবেস্তার ভাষা হইতেও ইহা প্রাচীনতর নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অবেস্তার গদ্য ও পদ্যে যে ভাষার ও ছন্দের অভিন্নতা অদ্ভুতরূপ। সুতরাং অবেস্তার গদ্যের ভাষা ও ঋগ্বেদের ভাষার মধ্যে তারতম্য দীর্ঘ ব্যবধান স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ, যদি নির্ণয় করা যায়, অবেস্তার গাথা কোন্ যুগে রচিত হইয়াছিল, তবে তাহার সেই যুগে ঋগ্বেদের ভাষাও প্রচলিত ছিল—এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইবে না।

কিন্তু অবেস্তার গাথা কোন্ যুগে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় কি? ইরানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী জরথুস্ত্র বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রায় সমসাময়িক; খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষভাগ ও ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভ ইরানীয়দের মতে জরথুস্ত্রের জীবিতকাল (১২)। কিন্তু জরথুস্ত্রের জীবিতকাল সম্বন্ধে এই ইরানীয় ঐতিহ্য আদৌ বিশ্বাস্য কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি নিঃসন্দেহে বলা যাইত, জরথুস্ত্রের আশ্রয়দাতা কবি বিস্তাস্প এবং হখামনিষ্ সম্রাট্ বিস্তাস্প অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতেই হইত যে অবেস্তার গাথা সকল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কি সম্ভব যে, সেই প্রবল প্রতাপান্বিত হখামনিষ্ সম্রাট্ অবেস্তার একজন কবি—অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজন্যরূপে গণিত হইয়াছেন? সেইজন্য এডুয়ার্ড মায়ার (Eduard Meyer) প্রমুখ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মনে করিতেন, এবং এখনও অনেকে মনে করেন যে, জরথুস্ত্রের আশ্রয়দাতা কবি বিস্তাস্প হখামনিষ্ সম্রাট্ বিস্তাস্পের বহু পূর্ববর্তী কোন ক্ষুদ্র রাজন্য ছিল। বাস্তবিক, ইরানের প্রাচীন সাহিত্যে জরথুস্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহার জীবিতকাল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে জরথুস্ত্রের কি হইতে আনুমানিক গাথাগুলির রচনার কাল সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন ইরানের দুইটী ভাষা জানা আছে; একটী অবেস্তার ভাষা, এবং অপরটী প্রাচীন পারসিক শিলালেখগুলির ভাষা। অবেস্তার ভাষা পূর্ব ইরানের, এবং শিলালিপির ভাষা

১২। দ্রষ্টব্য Keith, *Op. Cit.* p. 615.

পণ্ডিত ইতস্তত। সর্বপ্রাচীন পারসিক লিপিলিপি হইল খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক হইতে। ইহা হইতে সর্বপ্রাচীন অবেস্তায় — অর্থাৎ জরথুস্ত্রীয় গাথায় — ভাষা কোন্ শতাব্দীর তাহা অনুমান করা যায় কি? উত্তরে বলিতে হইবে, অবশ্যই যায়, যদি প্রাচীন পারসিক লিপিলিপির ভাষা ও গাথার ভাষার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা স্থির জানা থাকে। এই সম্বন্ধ জানা আছে, তবে তাহা বলিয়া রাখিলে বুঝানো অপেক্ষা উপমানের সাহায্যে বুঝানোই অপেক্ষাকৃত সহজ।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে জরথুস্ত্রীয় গাথার ভাষার সহিত প্রাচীন পারসিক লিপিলিপির ভাষার যে সম্বন্ধ, বৈদিক ভাষার সহিত প্রাচীন জার্মান্ ভাষার (Old High German) সম্বন্ধও তদ্রূপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে পূর্ব ইউরোপে কথিত হইত, এবং ইহাই ছাঁচে জার্মানিক ভাষাগুলি মধ্যে প্রাচীনতম। আর প্রাচীন জার্মান হইল সেই ভাষা যাহা খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকে মধ্য ইউরোপে কথিত হইত। সুতরাং প্রাচীন জার্মান ভাষা হইতে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের ভাষা। কিন্তু তবুও এই দুইটি সমসাময়িক ভাষা হওয়াতে ইহাদের একটির কাল জানা থাকিলে অপরটির কাল সম্বন্ধে অনুমান সহজ হয়। যদি জানা থাকে যে, প্রাচীন জার্মান ৮০০ খৃষ্টাব্দের ভাষা, তবে তাহা হইতেই সুতরাং যে ৪০০ খৃষ্টাব্দের ভাষা তাহা নির্ণয় করা চলে। সেইরূপ, আমাদের যখন জানা আছে যে, প্রাচীন পারসিক লিপিলিপির ভাষা খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর, তখন এই লিপিলিপির ভাষা ও জরথুস্ত্রীয় গাথার ভাষার সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া বলা যায় যে, খৃষ্টজন্মের আনুমানিক সহস্র বৎসর পূর্বে ইরানে জরথুস্ত্রীয় গাথার ভাষা বা তদনুরূপ কোন ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জরথুস্ত্রীয় ভাষা ও অবেস্তার ভাষা পরস্পর এতই সাদৃশ্যসম্পন্ন যে, এতদুভয় যে মোটামুটি সমকালীন তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কাজেই তাহার বিচারে অবেস্তার কাল খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক সহস্রাব্দ।

কিন্তু অবেস্তার ভাষা খৃষ্টপূর্ব সহস্র বৎসরের বলিয়াই কি অবেস্তার গ্রন্থসমূহও ঐ সময়ের হইবে? তাহা অবশ্যই নহে, কারণ পরে দেখা যাইবে যে, ভারতের বাহিরেই অবেস্তার গ্রন্থসমূহ অন্ততঃ ত্রিংশৎ-পরিমাণে রচিত হইয়াছিল। অবেস্তার গ্রন্থসমূহ যে ঋগ্বেদোপযোগী-প্রভৃতি অপেক্ষাও প্রাচীন তাহা স্বীকার করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি সর্বপ্রথম বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাও কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে। এইবার সেই বিষয়েই আলোচনা করা যাউক।

(৪)

ভারতীয় আর্য-ভাষা ও সভ্যতার অনুরূপ ভাষা ও সভ্যতার নিদর্শন সর্বপ্রথম ভারতের বাহিরেই পাওয়া যায়, ভারতের ভিতরে নহে। তুরস্কের অন্তর্গত বোঘাজ্-কই (Boghaz-Koi) নামক স্থানে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিৎ উইঙ্কলর (Winckler) অধুনা বিস্মৃত প্রাচীন হেত্থী (Hittite) সাম্রাজ্যের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। হেত্থী সাম্রাজ্য অতি প্রাচীন; খৃষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দী হইতেই এই সাম্রাজ্যের সূত্রপাত। এই সাম্রাজ্যের সমূহ রাষ্ট্রসম্পর্কিত লিপি (state archives) বা তাহার পরবর্তী কালে লিখিত প্রতিলিপি বোঘাজ্-কইয়ে পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ মৃত্তিকাস্তরিত প্রাচীন লিপির কাল লইয়াই বহু সময়ের পণ্ডিতে দ্বন্দ্ব, কিন্তু হেত্থী সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীতে আবিষ্কৃত লিপিগুলির কাল সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ বিভিন্ন প্রাচীন বর্ণমালার কাল হইতে হেত্থী সম্রাটদেরও কাল নির্ণয় করা যায়। হেত্থী সম্রাটদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী

ছিলেন খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে চতুর্দিকে হেত্তী সাম্রাজ্যের প্রাধান্য প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তর মেসোপোতামিয়ার অন্তর্গত মিতন্নি রাজ্যের অধীশ্বর মতিওয়াজ (Mattiwaza) সহিত হেত্তী সম্রাট্ শুব্বিলুলিউম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। সন্ধিপত্রটীর প্রতিরূপ বোঘাজ্-কয়ে পাওয়া গিয়াছে। এই সন্ধিপত্রে মিতন্নিদের পক্ষ হইতে অনেকটা করেকটী দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল দেবতার চারি জন বৈদিক দেবতা; যথা ইন্-দ-র (ইন্দ্র), উ-ক-ন্-ন (বরুণ) মি-ই-দ-র (মিত্র) ও ন-অন্-ন-ত্তি-অন্-ন (নাসত্য)।

এই নামগুলি যেরূপ বানানে পাওয়া যায়, বোঘাজ্-কয়ে ঠিক সেই আকারেই অবশ্য পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু তাহলেও এগুলি যে বেদের চারিটি প্রধান দেবতার নাম, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দৃষ্টিতে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহার কারণ এই যে, হেত্তীগণ নিজেদের ভাষা লিখিবার জন্য অক্কাদীয় অক্ষরবর্ণ (Accadian Syllabary) ব্যবহার করিত। ইহাতে যে নানা বিপত্তি ঘটিতে পারে তাহা যিনিই বাংলা অক্ষরে ইংরাজি অথবা ইংরাজি অক্ষরে বাংলা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু বাংলা অক্ষরে ইংরাজি লেখা অপেক্ষা অক্কাদীয় অক্ষরে হেত্তী ভাষার শব্দাবলী প্রকাশ করা আরও কঠিন। বাংলা লিপির ব্যঞ্জন-বর্ণ-জ্ঞাপক অক্ষরগুলি সবই অকারান্ত; ব্যঞ্জনবর্ণ অকার ভিন্ন অন্য স্বর বা অপর কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে, বা অপর কোন বর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে, আমরা অক্ষরগুলিকে বিশেষ কোন চিহ্ন (ই-কার উ-কার প্রভৃতি ও হসন্ত) অথবা বিশেষ সন্নিবেশের (যুক্তাক্ষর) সাহায্যে এমন ভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইয়া থাকি যে অক্ষরের চিহ্নগুলি বর্ণের চিহ্নে পরিণত হয়। যেমন 'ক' একটি অক্ষর (syllable), কিন্তু 'ক্' একটী বর্ণ (sound); অথচ যুক্তাক্ষরে হসন্ত প্রয়োগ না করিয়াও ক্-বর্ণ বুঝানো যাইতে পারে, যথা কিস্তী (অথবা কিস্তী)। এই সকল বিশেষ ব্যবস্থা আছে বলিয়াই বাংলা বর্ণমালা অক্ষরাশ্রয়ী (syllabic) হইলেও ছত্র-সাহায্যে বাংলা ভাষার সমুদয় শব্দসম্ভার প্রকাশ করা সম্ভব হয়। কিন্তু মনে করা যাউক, 'ক' এই চিহ্নটির দ্বারা যে ধ্বনি বুঝায় তাহা হইল 'কু'; 'খ' হইল 'খ্ম্'; এবং 'ন' হইল 'অন্'। এ-ক্ষেত্রে এই তিনটি চিহ্নের সাহায্যে যদি 'কখন' এই কথাটি লিখিবার চেষ্টা করা যায়, তবে যাহা দাঁড়াইবে তাহা হইল— 'কু-খ্ম্-অন্'! এই 'কু-খ্ম্-অন্' হইতেই সন্ধানী লোককে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, লেখকের অভিপ্রেত শব্দ হইল 'কখন'। এখন হেত্তী বর্ণমালায় যে অক্কাদীয় অক্ষরবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমাদের পরিকল্পিত এই কু-খ্ম্-অনের অনুরূপ। সুতরাং হেত্তীয় রাষ্ট্রলিপিতে যদি ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার নাম সুস্পষ্টাকারে পাওয়া না যায় তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

এ-কথা তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের আরম্ভে কালে উত্তর মেসোপোতামিয়ার মিতন্নি রাজ্যে ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার আরাধনা হইত। কিন্তু এই বৈদিক দেবতার আরাধনা মিতন্নিদের— অর্থাৎ মিতন্নি রাজ্যের আদিম অধিবাসীদের— করিত বলিয়া মনে হয় না। মিতন্নি ভাষার যতটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আর্য-ভাষার সহিত এই ভাষার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তবে মিতন্নিদের শাসক সম্প্রদায়— যাঁহারা ঐ দূরে মর্যন্নি নামে পরিচিত ছিলেন — তাঁহারা, এতদ্ভিন্ন আইয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মতে, আর্যভাষী ছিলেন; বোঘাজ্-কয়ে আবিষ্কৃত সন্ধিপত্রে যে ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়, খুব সম্ভব তাঁহারা এই মর্যন্নিদেরই দেবতা।

ইন্দিরাদের সঙ্গে হইতে তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতীয় আর্যদলের ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা ভারতের বাহিরেই সর্বপ্রথম হইয়াছিল। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অবেস্তে যেমন মিত্র ও বরুণ এক সঙ্গে 'মিত্রাবরুণৌ' এই দ্বন্দ্বসমাসান্ত পদের দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন, সেইরূপ বোগাজ-কয়ে আবিষ্কৃত লিপিতেও তাঁহারা এমন ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন যে তাহা হইতে মনে হয় যে, মিতন্নিরাও এই দুটি দেবতার মধ্যে একটি অতি নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করিত। বেদোক্ত ধর্মের এইরূপ একটি মূল বিশেষত্ব তাহা হইলে মিতন্নি রাজ্যের শাসক সম্প্রদায় মধ্যবর্তিতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে।

অবেস্তের ধর্মগ্রন্থ কোন ধর্ম যখন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মিতন্নি রাজ্যে মধ্যবর্তিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে, তখন অবেস্তের ভাষার মূল কোন ভাষাও সেই দেশে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই। তবে আর্যভাষার যত দূর যে মিতন্নিরা ব্যবহার করিত তাহার প্রমাণ আছে। ঘোড়াদের সম্বন্ধে কিক্কুলি নামক এক মিতন্নিবাসীর দ্বারা হেত্তী ভাষায় রচিত একটি পুস্তকের কিয়দংশ বোগাজ-কয়ে পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে ঐক, ত্রেস, পনৃস, সপ্ত প্রভৃতি এমন কতকগুলি সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার আছে যে-গুলির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি অতি প্রাচীন কালে কোন আর্যভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শব্দগুলি বেদ ও অবেস্তার তত্তদ্বাচক শব্দ হইতে পৃথক্। প্রথম শব্দটির বৈদিক রূপ 'এক,' এবং অবেস্তীয় রূপ 'অএব'; 'ত্রেস' হইল বৈদিক 'ত্রি'; 'পনৃস' ও 'পঞ্চে'-র মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট; আর বৈদিক 'সপ্ত' এবং অবেস্তীয় 'হপ্ত' এই দোনটিই সহিত 'সপ্ত' শব্দের পূর্ব সাদৃশ্য সাধন করা যায় না। এত সাদৃশ্য, তথাপি পূর্ণ সাদৃশ্যের অভাব কেন? ইহার কারণ, কিক্কুলির ভাষা যে-যুগের, বৈদিক ও অবেস্তীয় ভাষা সে যুগের নহে। মনে হয়, যেন ভারতীয় ও ইরানীয় আর্যদলের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ আকার ধারণ করার পূর্ববর্তী সেই ইন্দো-ইরানীয় ভাষারই অস্পষ্ট পরিচয় কিক্কুলির এই সংখ্যাবাচক শব্দগুলি হইতে পাওয়া যাইতেছে; এই সাধারণ ইন্দো-ইরানীয় মূল ভাষা বা তাহারই কোন উপভাষা যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি পশ্চিম এসিয়ায় প্রচলিত ছিল, তাহার আরও প্রমাণ আছে।

মিতন্নির অন্তঃপাতী এল্-অমর্না নামক স্থানে প্রাপ্তলিপির খনন-কার্যের ফলে আবিষ্কৃত কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা মিতন্নি রাজ্যের পূর্বে খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে রাজত্ব করিতেন। নামগুলি হইল — অর্তদস্ত, অর্তবি, শুনস্সর, সুতর্ন, ইত্যাদি। (১০) এই সকল নাম যে ইন্দো-ইরানীয় বংশের আর্য নাম তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে এগুলিকে পুরাপুরি ভারতীয় বা পুরাপুরি ইরানীয় বলা যাইবে না। কারণ বৈদিক ভাষায় 'শুনস্সর'-শব্দের রূপ হইত 'শোনশ্চর', এবং অবেস্তার ভাষায় 'সুতর্ন' হইত 'হুতর্ন'। কিক্কুলির উল্লিখিত সংখ্যাবাচক শব্দগুলির মত এগুলিকেও অতীত ইন্দো-ইরানীয় মূল ভাষার শব্দরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, যে ভাষা বিভিন্ন হইয়া পরে ভারতের বৈদিক ভাষায় এবং ইরানে অবেস্তার ভাষায় রূপান্তর

১০। এই নামগুলির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন Mironov (*Acta Orientalia*, Vol. XI, pp. 130 ff.) এবং Keith (*Woolner Commemoration Volume*, pp. 137 ff.)।

করিয়াছে, সেই ভাষা বা তাহারই কোন উপভাষার পশ্চিম সিরিয়ার এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম হইতে পাওয়া যাইতেছে। কিরুলির সংখ্যাবাচক শব্দাবলী এবং সিরিয়ার রাজবংশের এই সকল নাম হইতে তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি পশ্চিম এশিয়ায় এমন কতকের আর্য ভাষা প্রচলিত ছিল, যাহা হইতে পরে ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব ছিল না।

এত প্রাচীন যুগে ভারতে বা ইরানে আর্যভাষার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় অনেকে মনে করেন যে, আর্যগণ ইউরোপ হইতে ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার পথে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে সিরিয়া ও মেসোপোতামিয়ার উপস্থিত হ'ন, এবং তাহার পর কতকে শতাব্দী ধরিয়া পূর্বাভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে ইরান ও ভারতবর্ষে অধিকার করেন। Cambridge Ancient History-তেও (১৪) এই মত গৃহীত হইয়াছে, এবং যাঁহারা মনে করেন যে, মধ্য-ইউরোপ বা তাত্তিনাভিয়া আর্যদের আদি জন্মভূমি, তাঁহাদের পক্ষে এই মত গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু এই মত গ্রহণ করা অসম্ভব।

কারণ, সিরিয়া ও মেসোপোতামিয়া হইতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে নির্গত হইয়া পথে ইরানীয় সভ্যতা স্থাপন করিয়া ভারতে পৌঁছিতে আর্যদের নিশ্চয়ই অন্ততঃ চারিশত বৎসর লাগে নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রবলতর যুক্তি এই যে, ঋগ্বেদের ভাষা সম্বন্ধেই কেবল বলা চলে যে, তাহা খৃষ্টজন্মের ন্যূনাধিক এক সহস্র বৎসর পূর্বেকার; কিন্তু ঋগ্বেদের ধর্ম ও কৃষ্টি — যাহা ঋগ্বেদের ভাষারই মত ভারতীয় আর্যদের স্বতন্ত্র সৃষ্টি — তাহার সম্বন্ধে আদৌ এ-কথা বলা চলে না। কারণ, ভাষা এ-ক্ষেত্রে একটি মাত্র প্রবহমান ভাষা; কিন্তু যে ধর্মের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা একটি যুগের। কাজেই ঋগ্বেদ যে সময়ে বর্তমান আকারধারণ করিয়াছিল তাহার বহু পূর্বেই ঋগ্বেদে যে ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল — ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ঋগ্বেদীয় ভাষা যদি খৃষ্টপূর্ব একসহস্র বৎসরের হয় তবে ঋগ্বেদীয় সভ্যতার আরম্ভ হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহারও কতকে শতাব্দী পূর্বে, এবং তাহার আর্যদের আবির্ভাব-কাল অন্তত তাহারও পূর্ববর্তী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে-সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় সিরিয়া অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য নৃপতি রাজত্ব করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে অথবা তাহারও কিছু পূর্বে আর্যগণ ভারতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আর্যগণ ইউরোপ হইতে ভারতে আসিলে কিরূপে তাহা সম্ভব হইত! প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ববিৎ Hermann Hirt-এর মত এইরূপ অনুমোদন করে না। Hirt-এর বিশ্বাস ছিল যে, আর্যদের আদি জন্মভূমি ছিল ইউরোপে; এবং ইন্দো-ইরানীয়গণ সেই ইউরোপেই আর্যদের একটি বিশেষ শাখারূপে বিরাজিত হইয়া কতকালের পরে এশিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, এবং ক্রমে ইরানে আর্য-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবশেষে ভারতে উপনীত হ'ন। (১৫) Hirt-এর এই মত গ্রহণ করিলে সিরিয়া অঞ্চলে এত প্রাচীন কালে ইন্দো-ইরানীয়দের উপস্থিতি হয়তো বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তদপেক্ষাও প্রাচীন কালে আর্যদের ভারতে উপস্থিতি আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। ইন্দো-ইরানীয়দের সম্বন্ধে এই সকল সুনিশ্চিত তথ্যের সমন্বয় সাধন করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথমার্ধে তাহারা ভারতবর্ষ ও সিরিয়া এই দুই দেশের অন্তর্বর্তী কোন

১৪। Vol. II, p. 13.

১৫। Hirt, *Die Indogermanen*, vol I. p.

দেশ হইতে দুইটি বিভিন্ন দিকে নির্গত হইয়া ঐ সহস্রকের মধ্যভাগে এই দুইটি দেশেই আর্য-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ-এর দ্বিতীয় বিভাগ সম্বন্ধে অধ্যাপক মায়ার্স্ (Meyers) প্রায় একই কথা বলিয়াছেন (১৬) :—"এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ করায় পক্ষে বহু বিঘ্ন আছে। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ করিলে বলিতে হয় যে যে-সকল স্থানে ইন্দো-ইরানীয়দের প্রথম বাস স্থাপনা করার কথা — এবং যে-সকল স্থান ঐতিহাসিক যুগে তাহাদেরই ভিন্নদেশের জন্মভূমি হওয়ার কথা — সেই সকল স্থান তাহারা একেবারে নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল যে, কোথাও তাহাদের কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট ছিল না। তাহার আদিবাসীর যুগের অবসানকাল পর্যন্ত অর্থে বিদ্যার যাবতীয় স্থানের যে সমস্ত বহুবিধ নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা ইন্দো-ইউরোপীয় রূপে বিশ্লেষিত হইতে পারে; এবং মেডিয়ার প্রত্যন্তস্থ সিথিয়েশীয় মধ্যেও যে-সমস্ত জাতির বাস ছিল, দেখা যায় যে, সেগুলিও ইন্দো-ইরানীয় ছিল না। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইন্দো-ইরানীয় ইউরোপ পূর্বদিক হইতে এই অঞ্চলে অগ্রসর হইয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। অপর দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ কিছুমাত্র না থাকা সত্ত্বেও, বৈদিক যুগের — এবং তৎপূর্বর্তী যে ভারতীয় আর্যসভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার—প্রারম্ভকালরূপে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বৎসরের পরবর্তী কোন কাল গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব।"

(৩)

সকল দিক বিচার করিয়া তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ইন্দো-ইরানীয়গণ ভারতবর্ষ হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইরান, মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া এবং ইউরোপ অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করা যেমন অসম্ভব, ইউরোপ হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে তাঁহারা সিরিয়া মেসোপোটেমিয়া, ইরান ও ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন এই কথা স্বীকার করাও তেমনই অসম্ভব। সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই কথাই বলিতে হইবে যে সিরিয়া ও ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তী কোন দেশেই ইন্দো-ইরানীয়দের বাসভূমি অবস্থিত ছিল, সেখান হইতে তাঁহারা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথমার্ধে নির্গত হইয়া ঐ সহস্রকের মাঝামাঝি এক দিকে ভারতে, এবং অপর দিকে সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করার অর্থ আরও স্বীকার করা যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথমার্ধেরও আগে — অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের দ্বিসাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বেই —ইন্দো-ইরানীয়গণ তাঁহাদের আদি বাসভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ ভারতীয় ও ইরানীয় আর্যগণের এই যুক্ত বাসভূমিতে একটি সাধারণ ইন্দো-ইরানীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার পরিচয় বেদ ও অবেস্তার ভাষা ও প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টই পাওয়া যায়; এবং এই ইন্দো-ইরানীয় সাধারণ সভ্যতা যে একদিনে গড়িয়া ওঠে নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

মনে রাখিতে হইবে যে, ইন্দো-ইরানীয়দিগের আদি বাসভূমি বলিতে ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের আদি জন্মভূমি বুঝাইতেছে না। ইন্দো-ইউরোপীয় আদি-জন্মভূমি হইতে নির্গত হইয়া যে-আর্যগণ ক্রমে ক্রমে ইরান ও ভারত অধিকার করিয়াছিলেন এখানে কেবল তাঁহাদেরই প্রাচীনতম ইতিহাসের আলোচনা করা

১৬। Eduard meyer. Geschichte des Alertums. II. 1. Second Edition. 1928. p. 35

হইল। এই আলোচনার ফির হইল যে, খৃঃ পূঃ ২০০০এর কাছাকাছি কোন সময়ে এই পুরুষেরা আর্যদের ভারতবর্ষ ও সিরিয়ার মাঝামাঝি কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় সেই ইন্দো-ইরানীয় সভ্যতার সৃষ্টি করেন যাহার পরিচয় বেদ ও অবেস্তায় পাওয়া যায়, এবং যাহা পরে বিভিন্ন হইয়া ইরানে ও ভারতবর্ষে তদ্দেশীয় আর্য-সভ্যতার জন্মদান করে। এখন ইন্দো-ইরানীয়দের এই আদি বাসভূমি ছিল কোথায়? এই বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই। ঐতিহাসিকপ্রবর এডুয়ার্ড মায়ার্স মনে করিতেন যে পামিরই ছিল ইন্দো-ইরানীয় আর্যদিগের সর্ববাদের স্থান। কিন্তু অধুনাতন যুগে প্রত্নতত্ত্ববিৎ এর্নস্ট হের্ৎসফেল্ড (Ernst Herzfeld) বলিতেছেন যে, মধ্য-এসিয়ার আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নদীর অন্তর্বর্তী ভূমিই ইন্দো-ইরানীয় আর্যদিগের সর্ববাস-স্থান রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত (১৭)।

আমার মনে হয়, এই বিষয়ে হের্ৎসফেল্ডের মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ পামির অপেক্ষা কস্পীয় তুর্কিস্তান বাসস্থাপনার পক্ষে যোগাতর দেশ বটে; অধিকন্তু কস্পীয় তুর্কিস্তানকে ইন্দো-ইরানীয় আর্যদের সর্ববাসস্থানরূপে স্বীকার করিলে আর একটি সমস্যার সমাধান হয়— যাহা মায়ার্সের মত গ্রহণ করিলে হয় না। সেই সমস্যাটি এই। ইতিহাস হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, খৃঃ পূঃ ১৭৬০ অব্দে কস্সু-গণ (Kassites) বাবিলন্ (Babylon) অধিকার করিয়াছিল, সেই কস্সুদের ভাষায় সূর্য-বাচক শব্দ ছিল 'হুবিয়স্'। এখন এই শব্দ ইন্দো-ইরানীয় আর্যদের নিজস্ব সম্পত্তি। অপর কোন ভাষায় — এমন কি অপর কোন আর্য ভাষাতেও — এই শব্দ প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, কস্সুরেরা ইন্দো-ইরানীয়দিগের নিকট হইতেই এই শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল। যে-যুগে ইহা ঘটিয়াছিল সেই যুগে ইন্দো-ইরানীয়রা যে ঠিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতকেও মেসোপোটেমিয়া ও সিরিয়ার আর্যভাষার যে-অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, তখনও ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যভাষা পৃথক ও বিভিন্ন হইয়া যায় নাই। সুতরাং কস্সুরেরা অপৃথক্ ইন্দো-ইরানীয়দের নিকট হইতেই 'হুবিয়স্' কথাটি গ্রহণ করিয়া থাকিবে। এখন মনে রাখিতে হইবে যে, কস্সুদের আদি দেশ ছিল কাস্পীয় হ্রদের দক্ষিণ তীরে। এই স্থান হইতে তাহাদের অপৃথক ইন্দো-ইরানীয়দের সহিত সংস্পর্শ স্বীকার করা সম্ভব হয় — যদি হের্ৎসফেল্ডের মতানুসারে মধ্য-এসিয়ার কস্পীয় তুর্কিস্তানকেই এই ইন্দো-ইরানীয়দের আদি বাসস্থানরূপে স্বীকার করা হয়; কারণ পামির প্রদেশের সহিত কাস্পীয়তীরবাসী কস্সুদের যে কোন প্রকারের আদান প্রদান চলিত তাহা স্বীকার করা শক্ত।

উপরন্তু সিদ্ধান্তগুলির পুনরালোচনা করিয়া এইবার প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতে পারে। এখন সিদ্ধান্ত এই যে, ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান কোথায় বা কবে ইউরোপে অবতরণ করা পঞ্চাশ হইতে যায়। (এই বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে)। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দো-ইরানীয় আর্যগণ সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দের কাছাকাছি কস্পীয় তুর্কিস্তানে আসিয়া বাসস্থাপনা করেন এবং এখানে কিছুকাল অবস্থানপূর্বক (এই সময়েই সাধারণ ইন্দো-ইরানীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে) প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিভিন্ন ধারায় অগ্রসর হইতে সুরু করেন, যাহার ফলে খৃষ্টপূর্ব

১৭। Iran in the Ancient East, pp. 191-9.

দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি লিখিয়া ও উহাদের ভাষার এই উভয় শাখাই আবেস্তার সহিত পরিচিত হয়। আবেস্তের আলোচনায় তাহা হইতে স্থির হইল যে, রুশীয় তুর্কিস্তানে ইন্দো-ইরানীয় আর্যদলের আদি বাসস্থান ছাঁদ পরিপোষিত হইবার যোগ্য।

এইবার ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদলের অন্যান্য শাখার অনুশীলনের কাল ও দেশ পর্যালোচনা করিয়া, আদি ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদলের জন্মভূমি কোথায় ছিল তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

যবে সেইদিন আর্যেরা সব মেলিয়া শিরে,
ভারতে হইল প্রথম অতিথি 'কুভা, ইরাবতী,
বিপাশা' তীরে।
যবে, ভোরবার প্রথম তূর্য দূর হ'তে শুনি',
প্রাতঃস্নাত —
সিন্ধুর তীরে প্রাতঃশি তারা ধারাস্নাত ও জপ
মেলিতে, তাত।

নেশা

('প্রেমচন্দ'-এর হিন্দী হইতে)

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

[প্রসিদ্ধ হিন্দী লেখক স্বর্গত প্রেমচন্দের রচনার নমুনাস্বরূপ আমরা এই গল্পটির অনুবাদ প্রকাশিত করিলাম। অনুবাদক শ্রীযুত নরেশচন্দ্র পাল এই লেখকের আরও কয়েকটি গল্প অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা সেগুলি পাঠ করিয়াছি। এই গল্পটিতেও প্রেমচন্দের প্রতিভার পরিচয় আছে। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ—স্থান কাল ও পাত্র-নির্বাচনে কল্পনার অতিশয় সংযম সরল প্রকৃতি, এবং গল্পে একটি বাস্তব আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ, তিনি গল্প বলিতে পারেন, অর্থাৎ যে-কোন চরিত্র বা ঘটনাকে—অতিসামান্য হইলেও—চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে পারেন। কল্পনার এই সংযম এবং বাস্তবকে রসযুক্ত করিবার এই শক্তি কতকটা তাঁহের নিজ সমাজের প্রকৃতি হইতেই তিনি লাভ করিয়াছেন—সেই সহানুভূতিই হিন্দীভাষায় নব্য-সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব করিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু যেমন, তাহার আঁটও তেমনি; ঐ সাহিত্যিক সততাটুকুই আমাদিগকে মুগ্ধ করে।]

(১)

নেশাটা আমার, নেশাজনটাও; কিন্তু নিজের নামটা তাঁর করিতেছি না; সেকালে ফাঁসী চড়িব থাকি। গরীবের ছেলে আমি, আছিতেও আছি সমাজের প্রায় শেষ তলায়। গ্রামের স্কুলে যতদিন পড়িয়াছি, একটা কর্সা কাপড়ও পরিতে পাই নাই। চওড়ায় গামছার মত, একটা হস্ত হাতে লম্বা ধুতি খাটো পরিতেন; গায়ে হইল ত একটা ফতুয়া, নহিলে কিছুই না। গরমে শীতে জুতা না হইলে চলিত না, তাই পরিতেন। কিন্তু সে ত জুতা নয়, টীনা ফেরেঙ্গের পায়ে মুচিবার সোহার পাত—মহিষের চামড়ায় গ্রামের মুচীর তৈয়ারী। চামড়াও ইহারা নিজস্ব ধরণে শুকাইয়া মসলা-পাতি দিয়া কোন রকমে কাজের উপযোগী করিয়া লইত। কিন্তু এক এক জোড়া জুতা অন্যূন তিন বৎসর কাজ দিতেও, তাহার গন্ধ শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু থাকিয়া যাইতই। জুতার কালি পড়িত অবশ্য — সহিবার ছেলের ঝাঁপি।

ঘরের সকলে লকালে ছাতু খাইত, দুপুরে রুটির। গমের সঙ্গে একটু বেশী. — টাকায় তখন দশ সের। ক্ষেতের গম আমরা বিক্রী করিয়া দিতাম। তবে ঘরে দুধ বী সব সময় থাকিত। সের চারেক মহিষের দুধ হইত। একটা ব্যাপার দেখিয়াছি। হাই ঘরে খালিলে শুধু ছাই পাওয়া যায়, চাষের কাজে গরুটাকে লাগাইলে দুধ কমিতে কমিতে দুই মাসের মধ্যে একেবারে শুকাইয়া যায়। মহিষের বেলায় তাহা হয় না। দুধও যায়, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতও হয়। তবে একটা চৌটকা আছে। মহিষকে নিত্য গুটা কয়েক জল কাদায় স্নান করানো চাই। আমাদের আর একটা প্রধান কাজ ছিল কলায়ের ডাল। ক্ষেতেই কলাই হইত।

আমি ছাড়া পরিবারের আর কেহ স্কুলে পড়ে নাই। আমি খুব ছেলেবেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিনিয়ারের একটা ছাত্রবৃত্তি পাই। তাহাতে আমার নেশা ধরিয়া গেল — পড়ার নেশা। এ নেশা ত

জানই, কিন্তু হোস্টেলে যেমন ৪ টা, তেমনি প্রত্যেক ছাত্র মফস্বল হতে একটা না একটা উৎপাত লাগিয়া আছে। কোন রবিই যেন একা থাকিতে পারে না, নানা বন্ধু সঙ্গী সাথী জুটাইয়া লয়। পড়া-শোনার বেলা শেষ পর্য্যন্ত আমাকে অন্ত এক মাড়-রাজির হাতে আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছিল।

কি করিয়া গ্রাম হইতে সহরের স্কুলে প্রবেশ করিলাম সে এক মহাভারত। সে কাহিনী এখন থাক।

হষ্টেলে থাকি, জীবনে যেমন কখনও থাই নাই, শুই নাই, তেমনি থাই শুই—সকলের চোখের আড়ালে। আজ একথা বলিব না যে, হোষ্টেলে বাড়ীর চেয়ে ভাল খাইতাম। মাথা খোরাইয়া মুখিয়াছি কিসে মাথা আল থাকে। তবে কাপড়ওয়ালার খাস ত বাড়ীতে পাইতাম না। সুখের বদলে জুতা চপ্, জল খাবারে মুড়ি, বা বাজারের রুটির বদলে সাজারের বিস্কুট, ঘন কলায়ের ডালের জায়গায় পাতলা মুগের বা মুকুরীর ডাল, যাহা বাড়ীতে রাত্রিতে কখনো রোগীকে দেওয়া হইত—সেও বিচুড়ীর আকারে। তারপরে ধরিল মিঠাইয়ের নেশায়। আমার যে বেশ কাণে পেটে অম্বরোগ (Intestinal T. B.) হইয়াছিল, আমিত তাহার মূল কারণ মনে করি ঐ চার বছর কাল অবিরত ফুলাচা মিঠাই খাওয়া। আর একটা বড় অজ্ঞানত সহরে জীবনের কল্যাণে, বন্ধুলোকের খবাটে-ঠাট্টার চোটেও ফুটাইয়া দিলাম। ইহাতে যে পরিমাণ অর্থ আমার হইয়াছে, যে পরিমাণ অর্থ ছেলেদের হয়, তাহার হিসাব চিত্রগুপ্তও রাখিতে পারেন না।

এই ভাবে নানা বেশায় মুখ আছি। বাড়ীতে যাওয়া আসা কমাইয়া দিলাম। ছুটি-ছাটার কোন বনী বন্ধুর বাড়ী চলিয়া যাইতাম। গ্রামে চিঠিপত্রের রেওয়াজ কম। এমন থাকিলেও, তখনকার দিনে একখানা পোষ্টকার্ড আসিলে আশেপাশের দুই তিন বাড়ীর লোক চিঠি শুনিবার জন্ত জমায়েত হইয়া যাইত। হয়ত কেহ পড়িতেই জানে না। তখন জান-দুএকজন পড়িয়া শোনাইত। তাহাকে দুধ ইত্যাদি খাওয়াইয়া পড়িবার যেমনের অন্তে, ক্ষতি-পূরণ করা হইত।

আমি সহরে আসিয়া মাসে একখানা পত্র লিখিতাম। ইহাতে মাষার গৌরব বাড়িয়া যেত। পত্রের বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবেই, পত্রপ্রাপ্তির গৌরবে তিনি আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীর ঈর্ষাভাজন হইয়া পড়িতেন। তখন গ্রামের হইতে লোক যেজন্তের জন্ত বাহিরে যাইত না, গ্রামেই প্রয়োজনীয় সব কিছু মিলিত। তাই যে-ভাবে থাকিয়া খায় তাহার জীবিকা গ্রামের, অথাই পাইত। সুতরাং মাষির হইতে পত্র আসা কিছুটা অসাধারণ ঘটা কি।

ক্রমে দুই মাসে একখানা লিখি। লিখিও পত্র না পাইলেও আসে কি আটকায় কোন মাথা-ধিক না, এখন মাষার যেন পত্রাঘাতে গৌরবের লাঘব হইতে লাগিল। হয়ত বা মাসে মাসে সংবাদ পাইয়া, সংবাদ পাইতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, পত্রের জন্ত ব্যগ্রতাও হইত।

শেষ কালে আমি ছয়মাস পর্য্যন্ত পত্র না দিয়াই, গরমের ছুটিতে এক জমিদার বন্ধুর বাড়ী চলিয়া গেলাম। যখন ফিরিলাম, তখন ট্রেনেও মাষার সঙ্গে দেখা। সাড়ে সাত মাস খবর না পাইয়া মেহাতুর বৃদ্ধ সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। সেই রোমাঞ্চকর বিবরণই বলিব।.....

(২)

জমীদার-নন্দন ঈশ্বরীপ্রসাদের মধ্যে নানা রস খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে একটা আভিজাত্যের মহিমাও ছিল। তাহার চালচলনে মনে হইত, লোকের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন সম্ভ্রম লাভ করিতে সে জন্ম হইতেই অভ্যস্ত এবং এর জন্ত কোন রকম অবলম্বিত

প্রয়োজনও তাহার নাই। একটা লেভেল মর্য্যাদা-বোধ তাহার চরিত্রের অঙ্গীভূত ছিল। আমি এই ব্যাপারটা আজও আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। কেহ যদি মদ খায়, বারবনিতালয়ে যাতায়াত করে, ঘুষে কলেজে পরীক্ষায় পাশ করে,—তবে সে সঙ্গী-সাথীদের নিকট কি করিয়া নিজের মাথা উঁচু রাখিতে পারে? ঈশ্বরীর এই সব দোষই ছিল, কিন্তু কেহ, এমন কি এক গ্লাসের ইয়ার বন্ধুরা অথবা পঞ্চানন্দের মত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্র ঈশ্বরীপ্রসাদের চাকর বাকর—কেহ কোন দিন ঘুণাক্ষরেও মর্য্যাদাহানিকর কটাক্ষ বা কোন রকম ইঙ্গিত করিতে পারে নাই। তাহাকে সমীহ না করিয়া চলিবার যো ছিল না। তাহাকে আমি কোন দিন হাসিতে দেখি নাই, এমন কি চোঁয়েটি করিতেও শুনি নাই। যাঁর মুখে টিপাইয়া টিপাইয়া কথা বলিত, কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইত না।

এহেন ঈশ্বরীপ্রসাদের প্রণামপ্রাপ্তি দলে কমি হইয়া দিন রক্ষা করিতেছিল না। সে যখন পঞ্চাননের ছুটিটা তাহার দেশের বাড়ীতে কাটাইবার জন্য আমার নিমন্ত্রণ করিল, তখন যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। কিন্তু ঈশ্বরীপ্রসাদ একটা 'কিন্তু'ও ছুড়িয়া দিল—একটা কথা আছে ভাই। আমি রসিকতা করিয়া বলিলাম,

—মাত্র একটা কথা? দশটা বলনা।

—না আপাততঃ একটাই বলি।

—আচ্ছা তাই না হয় বল। বেশী না শোনে অবস্থা তখন বেগতিক হইলে, ঘুচ্‌ঘুচে ভবে মেব। তা কোন রকমে চলে যাবে। একটাই না হয় বলে ফেল।

আগেই বলিয়াছি, ঈশ্বরীকে হাসিতে দেখি নাই। তাই বলিয়া কিছুতে হাসিত না তা বলা যায় না। তবে অভিব্যক্তির একটা লক্ষণ—মন মুখ এক না করা। শুধু মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ না করার কথাই বলিতেছি না। আকা রকমও মুখের অন্য ভাষা আছে। চোখের দৃষ্টি, আঙ্গুলের অযথা চঞ্চলতা, নাসিকার স্ফীতি ঈষৎ অবনতি, ঠোঁট-বাঁকানো, গোঁফে তা দেওয়া—এর কোনটাই বক্তৃতার চেয়ে—কম মুখর নয়। যে ভাব-গোপনে দক্ষ, সে এই গুলির উপরেও দৃষ্টি রাখে। তবে ঈশ্বরী এখনও পুরোপুরি ঈশ্বরী লাভ করে নাই। তাই একটু অতিরিক্ত গম্ভীর হইল।

আমি হাসিবার জন্য কিছু বলি নাই। কিন্তু যে কোন কারণেই হৌক, ঈশ্বরী অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তখন এখনো কলম-বন্ধুত্ব-আলোচনের আদি পর্ব্বও সুরু হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরীর অনটা ভারী কোমল ছিল, সে নিজেদের গ্রামের দুঃখদুর্দ্দশা, দোষের খাটা (বিনা বেতনে জমীদারের কাজ করা) ইত্যাদিতে ব্যথিত হইত। এখন বলিল: আমরা এখানে জমী-জমার বিরোধ অনেক আলোচনা করেছি, বাড়ী গিয়ে কিন্তু ওসব চলবে না, ভাই। সবাই আমার অত্যন্ত রাগোয়ারী লোক। আর একটা কথাও আছে।

—এই যে বল্লে, একটি মাত্র কথা। এখন যে আর একটি আনছ!

—চটো থাক। একটা কিনারা করে নেওয়া দরকার।

আমি বিস্মিত হইলাম। ঈশ্বরী তাহা লক্ষ্য না করিয়াই বলিল: আমি তোমার হাঁড়ির খবর জানি। তুমি যে আমার ইয়ার-দোস্তের দলে ভিড়ছ, এটা ভাল লক্ষণ নয়। তবু এখানে ছিলে ভাল। বাড়ীতে এমন আবহাওয়া যে, সাধারণ লোকেরও নেশা ধরায়। এক একজনের তিন তিনজন চাকর। মুখের কথা ফোটতে না ফোটতে হুকুম তামিল করতে ছুটে আসে। তাদের মাথা খিড়ায়, বিশেষতঃ হুঁয়ার হওয়া আজুবোদেনদের। একবার এক ভদ্র ইংরেজ সওদাগর বাবাকে বলেছিলেন, ওদেশে পা দিতে না দিতেই

ইংরেজ অফিসের যে বেশে হয়ে থাকে, তার কারণে বোনকার লোকের সঙ্গেই বেশি মেশে। যে লোক বাড়ীতে বসে এ ভাবে চাকরদের মুখ দেখেনি, যার যা বাড়ীর সব কাজ করেন — কাপড়-কাচা বাসন-মাজা ঘরদোর ঝাঁট-দেওয়া সব, সে পাঁচটা চাকর আর আর্দালী বেয়ারার অহর্নিশি সেলাম পেয়ে পেয়ে হঠাৎ গদা হয়ে বসবেই।

— তা আমাকে এ সব কেন বলছ, ঈশ্বরী?

— বলছি এই জন্য যে, তোমাকে আমি আজ বিদ্বান হওয়ার লক্ষণ দেখেছি। পরীক্ষের ফেলের ফেড়োফোঁপ তার নয় জানতে? আমার ওখানে গিয়ে মহাসমুদ্রে পেকে খাবারের ফলাফলে সেকালে যদি নিজেকে হরিণ চরিণ নয়ার খুড়ো মনে করতে আরম্ভ কর?

— তবে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? এখানে যদি ভয়?

— ভয় আমার নিজের জন্য নয় পাছে তোমার অসিধে হয়।

— তাই? বলছি, তবে নিয়ে যেতে চাও কেন?

— তাই, আমার মনের মধ্যে তোমার মধ্যেই যা-কিছু পদার্থ আছে। আমার আশা, তোমাকে সঙ্গে রাখলে আমি হয়ত কিছু শোধরাব। কিন্তু সেকালে কে কাকে শোধরায় কে জানে! ভাল লোক ও মন্দ লোক একত্র হলে, যার চরিত্রের জোর বেশি সেই অন্যকে প্রভাবিত করে। ভাল হলেই, ভাল করতে পারে না।

এই কথাটা ছোকরার মুখে আমি কোনদিন এত কথা শুনি নাই। আজ যে একেবারে পরম তত্ত্বের খুলি আওড়াইতে সুরু করিল! হয়ত লোকটা ভিতরে ভিতরে আর এক রকম। কোনকালে তাহার অন্তর ত দেখিতে পাই নাই। আমি বলিলাম,

— আমাকে তুমি যতটা উঁচু নজরে দেখ, ঈশ্বরী, ততটা আমি নই। অন্তত এখন আর নই। আমার অঙ্গে খুব জ্বর, আমি জানেই নিজের দিকে আসছি। তার জন্যে দায়ী বহুলাংশে নিজেই, যে বাড়িয়ে অন্যান্য লোককে অকস্মাৎ আস্তাবল-আস্তাবলীর পাকে ফেলে চলে গেছে। থাক সে কথা। আমার তোমাকে শোধরাবার শক্তি যদি না থাকে, সে যদি কি তার কোন ফল দেখতে পাবে?

— না, তার আশা অবশ্য নেই।

— তবে কি জন্য নিয়ে যেতে চাও?

— ভাই, পড়বার পরীক্ষায় নকল করে মাকালের এসেছি। বলা পড়বার মত হয়েছিলাম। কিছু ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন পাহাড়ায়। তবে হোক, আমার ভালোর জোরে হোক, বা অন্য কোন কারণেই হোক, তিনি ধরিয়ে দেননি। আমি কিন্তু আর ওরে নেই, পাস হই আর ফেল হই। এই ফেব্রুয়ারি খুব পড়াশোনা করব, তাই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ত পড়াশোনার ভাল। আর যে পরিবর্তনই হোক ক্লাসে ত প্রথম এখনও আছ।

প্রথম তখনও ছিলাম বটে। তবে স্থানচ্যুত হওয়া অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বরীর কথায় কিছুটা সন্দিহান কিছিল। সে নিজের কাজ দেখিতে গিয়া পাশটা আমারই উপকার করিল।

কিন্তু তখনও সেসা পুরাপুরি কাটে নাই। যে ঘটনায় কাটিল, তাহাও এক রকম ঈশ্বরী প্রসাদের প্রসাদ-লব্ধ।

৩

গাড়ীতে উঠিয়াই উপরোক্ত বাণিজ্যিক আলোচনা বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কার্ট ক্লাস ত দূরের কথা, কোনদিন ইন্টারে ও চড়ি নাই। গাড়ী ১৪।১৬ মাইল ঘুরে ফিরে, আমাদের গ্রামের লোক সহরে পায়ে হাঁটিয়াই আসিত। এখন ঈশ্বরীপ্রসাদের প্রসাদাৎ গদী-আঁটা কার্ট ক্লাসের কামরায় গদীর মধ্যে আকণ্ঠ

বিস্ময় হইয়া বসিতে পারিলাম। গাড়ী ছাড়িবার কথা রাত নয়টায়। আমরা — আমি অন্ততঃ, ফার্ষ্ট ক্লাসে বসিবার লোভেই দুই ঘণ্টা আগে পৌঁছিয়া গেলাম। মনে রাখিতে হইবে, তখন কলেজে সবেমাত্র কার্ষ্টের চোরের রেওয়াজ; আমার শুইবার বিছানাটাও থাকিত কার্ষ্টের তক্তাপোষে পাতা; সেওয়ারের নরম বিছানা নয়। সেই তক্তাপোষে খুব পাতলা একটা তোষক। তাও আমার পক্ষে নূতন। বাড়ীতে হয় কাঁথা, নয় কাঁটাতারের মত খোঁয়াওয়ালা তুলাই সম্বল ছিল।

পশ্চী-মুখ-চোপের এক ঝাঁকে ট্রেনের পান-ভোজন ঘরে এক প্রশ্ন হইয়া গেল। শুধু পান-ভোজন নয়, অপমানও। সেখানে একটু আহত হইলাম। আমি প্রাণপণে বেকুফী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু জলপানির অল্প টাকা সম্বল বলিয়া কোন কালেই দুখানা ধুতি ও ছাটি শার্টের অতিরিক্ত কাপড় কিনিতে পারিতাম না। রবিবারে তাহা নিজ হস্তে কাচিতে হইত। হষ্টেলে থাকা খাকা বিনা পয়সায় হইত বলিয়াই, তুমিয়ে ঐ টাকা হইতে জলখাবার ও কাপড়চোপড় করিতে পারিতাম।

হোটেলের ভোজনকক্ষ ঘরোয়া নয়; সুতরাং পরিচারকরা বক্সিসের আশাকাঙ্ক্ষিতে খোসামুদি বিচার করে। বক্সিসটা-আসটার কথা তুলিব না, কারণ বক্সিসের আশা ও আসে বিদেশের মুখে। তবে চেহারা দেখিয়া খানসামারা আগেই বোঝে কে কেমন বক্সিস দেনে-ওয়ালা কে মাসিক কে পয়সাওয়ালা, তারা তাহাদের ভেদবুদ্ধি এড়ায় না। আমার খাবার ফেলা-ছড়ায় যে আয়, এই পরিচারকরা বক্সিসের লোভেই তার অধিক খোসামোদ করে। ঈশ্বরীই ত মোটা একটা টাকা দিল।

সুতরাং আমার দিকে কেহ তেমন দৃষ্টি দিল না। ঈশ্বরীও তাহা বড়ব এড়ায় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সে অপমানটাকে খোঁচাইয়া বড় করিতে চাহিল না।

আমরা উঠিলাম। খানসামা ঈশ্বরীপ্রসাদকে সেলাম করিল, আমাকে গ্রাহ্যই করিল না।

গাড়ী চলিল। পাসেঞ্জার গাড়ী বড়, বহু প্রতি তিন ষ্টেশনের অধ্যে একবার থামিতে লাগিল। আমরা প্রস্রাবপথে বাহির।

এক ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই, একজন ভদ্রলোক আমাদের কামরায় চড়িলেন। আমি বড়বা খুঁজিতে গেট না — চেঁচাইয়া বলিলাম, এ প্রথম শ্রেণীর কামরা! এ তোমার নয়।

ভদ্রলোক গ্রাহ্যই করিলেন না, কামরায় উঠিয়া পড়িলেন। কাপড়-চোপড় অতি সাধারণ। বিলাতী পোষাক তাহার অঙ্গে ছিল না। কিন্তু চোখ! একটু প্রকৃতিস্থ অবস্থায় লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইতাম, তাহাতে যেন বুদ্ধের ঐশ্বর্য্য লুকানো আছে। কিন্তু খানসামার বিনয় ব্যবহারে আমার মেজাজ কিঞ্চিৎবিগড়িল। কোনো ছুতায় মনের ঝাল ঝাড়িয়া করিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বস্তি নাই। ভদ্রলোক নীচের হাতের এটাচি-কেস উপরের তাকে (ঝাক) তুলিয়া রাখিলেন। তার পর আমার পাশে বসিয়া খুলন-প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। খুলন-প্রশ্নটা অবশ্য কিছু অদ্ভুত রকমের।

— আপনি বুঝি এই প্রথম প্রথমশ্রেণীতে চড়লেন?

আমার মুখ লাল হইয়া গেল — কথাটা সত্য বলিয়াই আঘাত বেশী লাগিল। ঈশ্বরী প্রসাদও চুপ করিয়া রহিল, মনে হইল যে, কোন কথা বলিবার চেষ্টায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। আমি জবাব দিলাম।

— এটা কি ভদ্রতাসঙ্গত প্রশ্ন?

— আপনি যে আমায় উত্তর দিচ্ছিলেন না, সেটা কি ভদ্রতাসঙ্গত হচ্ছে? আপনি কি মনে জানলেন, আমি কোনটা প্রথমশ্রেণী কোনটা নয়

জানি যে !

— সাধারণতঃ লোকে প্রথমশ্রেণীতে আসে না কি না।

— সাধারণতঃ আপনিও ত আসেন না।

— বারবার আমাকে টানছেন কেন ?

— আপনি আমাকে টেনে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই।

— তা এক প্রস্থ টাগ্ অব্ ওয়ার 'tug of war' এখানেই হবেন নাকি ?

— না, সে হয়ে গেছে। আপনিই টেনছিলেন, আমি ত শুধু আপনার টানাকে ঠেকিয়েছি।

— তবে আর কি, বাদ মিটে গেল।

— আপনার মন থেকে কুটী যাদের পাপ এখনও কেটেনি, আমার মন থেকেও তাদের পাপ কেটেনি।

— কি করতে চান ?

— আপনাকে উপরে দিতে চাই।

— বেশ, দিন। তবে ঘুষো না যাই।

— না, যাবেন না। আমি লোককে ধাক্কা মেরে গাড়ী থেকে ত ফেলে দিইনে।.....তা শুনুন। বলে না, 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' ? আপনি কোনদিন প্রথমশ্রেণীতে চড়েন নি, তাই মনে করেন, আর কেউ চড়তে পারে না।

আবার আমার কান ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। তবু বলিলাম,

— উপরে কি সেফ হল ?

— একটু ফাঁকী। আপনি মেয়ে কামরায় পড়তে লজ্জা পান। তাই আমার মতন বুড়ি ও জানা দেখে নেবেছেন।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ভদ্রলোক এবার সমস্ত ব্যাপারটাকে হালকা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন — কিছু মনে করো না ভায়া, আমাকে হামেশাই ছেলে ছোকরা নিয়ে থাকতে হয়। তোমাদের মত অনেক ছেলের ভার আমার উপর।

আমার বিরক্ত ভাব কাটিয়া এবার কৌতুক উদ্রেক হইতেছিল। যাহারা ছেলেবেলায় মা যৌবনে যান পায় না, তাহারা মনের কারণে থাকে। কেউ পান হইতে চুণ খসাইলেই ইহাদের ধাতে সয় না।

আমি বলিলাম : আমাকে 'তুমি তুমি' বলছ কেন, দাদাই ?

মিষ্ট হাসে মুখখানা উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন — যাদা, আমি বয়সে তোমার বাপের সমান। সে কথা ছেড়ে দিলেও, ছেলেদের স্নেহ, সম্বোধন করবার জন্য অধিকারও আছে। আর তুমিই ত প্রথম আমায় 'তুমি' বলেছিলে। বলিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

তারপর এটাচি হইতে তিনি কার্ড বাহির করিলেন দেখিয়া আমার মুখে আর বাক্য সরে না। ভদ্রলোক ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ। বিলাতী ডিগ্রীই গোটা তিন আছে।

ঈশ্বরী এতক্ষণ ধরিয়া কি যেন খুঁজিতেছিল। হাতড়াইতে হাতড়াইতে সুচির কোটায় যেন পরিচিত বস্তুতে হাত ঠেকিল। জিজ্ঞাসা করিল : আপনি শুকসুল বিশ্ববিদ্যালয়েও কাজ করেন, — না ?

—ঠিক কাজ করিনে, অর্থাৎ পড়াইনে। তবে ম্যানেজারের মত আছি। টাকাকড়ি তুলি। ওটা বাক্তিগত কাজে ধরে কিনা।

এতক্ষণে ঈশ্বরীর স্মরণ হইল। একবার ভদ্রলোক তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলেন, তাঁহার বাবা ২৫০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

(৬)

প্রতাপগড় ষ্টেশনে আমাদের নেবার জন্য বাড়ী হইতে লোক জন আসিয়াছিল। অত বোঝায় অর্থাৎ পরিচয়ে জামা-কাপড় পরা ছইজন ;— নায়েব, ম্যানেজার ইত্যাদি হইতে পারেন। পাঁচজন বেহারা, অর্থাৎ কুলী — যাহারা পেটি ভাতায় কিনা

মহুরিকে কাজ করিতে যাওয়া হয়। একজন মুসলমানী নাম রিয়াসত আলী, একজন ব্রাহ্মণ (পৈতা দেখাইবার জন্যই বোধ হয় গায়ে জামা দিত না) নাম — রাম রতন। এই দুই বাড়ীই "পতিত অভিজাত", অর্থাৎ শেখ রিয়াসত আলী ও ব্রাহ্মণ রাম রতন উচ্চবংশে জাত, এখন শেঠের ঘরে কিছু চাকরী করিতেছে। তাহারা নিজেদের মান বাঁচাইতে অর্থাৎ অন্নের উপর টেক্কা দিতেই দলা যাত্র। আমি ও আসেই মজিতেছিলাম, এখন দড়া হউক কলসী হউক, ইহাদের চোখে ওইরূপ একটা প্রশ্ন পাইলাম,

— তুমি বাছা বড় ঘরে হাঁসের বলের মধ্যে ঢুকেছ যে ?

চোখের প্রশ্ন সম্বন্ধে সাহসের অবকাশ ছিল। কিন্তু রিয়াসত আলী সাহসের অবকাশ রাখিল না, কণ্ঠস্বরে যেন চাবুক মারিয়া ঈশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল — হজুর, এই বাবুসাহেব কি আপনার সঙ্গে পড়েন ?

বাবুসাহেবের সাহেবের সম্বন্ধে সন্দেহ তাহার উর্দুর দীর্ঘায়ত টানে (accent) সুস্পষ্ট হইল। ঈশ্বরী সকরুণতার সঙ্গে জবাব দিল : হাঁ একসঙ্গে পড়েন ত বটেই, একসঙ্গে খাকেনও। উনি না থাকলে আমার পড়াই হত না। আমার নিজের লোকের জন্য একে টেনে এনেছি। ওঁর বাড়ী থেকে দু'বার জবাবী তার এসেছিল, আমি জবাব দিয়ে দিলাম ; পরে ওঁর বাপের কাছে চিঠি দিয়ে সব বুঝিয়ে দিলাম। দ্বিতীয়বার যে তার এসেছিল, তা ছিল অন্যরকম তার — যার প্রতি শব্দ চার আনা করে'। আমাদের চেয়ে বড় জমীদার ওঁরা, কিন্তু পাকেন যুনি ঋষির মত লাদাসিধা চালে।

অল্প অধিকাংশ কথার মত তারের ভাষাও সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু ঈশ্বরী যেন আমার এত বাজের লাঞ্ছনার প্রতীকার করিতে যাইয়া হইয়া আরোল তারোল বকিতেছিল। এক মিথ্যাকে চাপা দিতে শত মিথ্যা বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও চাপা পড়ে না। এতের ধর্ত্তীর চাতর, কি রকম তারে কত লাগে, তাহা কি জানে না ? বেঠাস কথা বলিয়া ফেলে নিজেই ঠাস পড়িতে হয়।

কিন্তু অভিজাত-বংশীয় শেখ ও ব্রাহ্মণের উপর হজুরের এই বক্তৃতার কি প্রভাব পড়িল, কোন প্রভাব পড়িল কি না, তাহা উল্টা কি সিধা, কিছুই বুঝিলাম না। তবে কে-তারে তারাও হজুর হইয়া আমার আশে-পাশে কিলিবিল করিল, "বাবুসাহেবের বিছানা ও লটবহরের" সন্ধান করিতে লাগিল (বিছানা আনিই নাই) তাহাতে আমি প্রমাদ গণিলাম। সেই যে বহিষের গল্প আছে, যে ঘোড়ার ডলাই-মলাই দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া সপ্তাহকাল ডলন-মলন করিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। শেষ কালে যা এই দেখ —ব্রাহ্মণ বহিষেরের অন্ত-সংবাহন হইতে, নরেনের জলে ডোবের জলে মুক্তি মাগিতে হয় !

ঈশ্বরীও কিছুটা ঘাবড়াইল। মান-হুজুর যন্ত্রের জন্য মানের ঘাবড়াও চাই ; এদিকে যন্ত্রের মানের ঘোড়ায় চাই ঘেওয়াও দরকার ; নহিলে মান-কচু ঘুসিয়া কলাগাছ হইবে। তখন তাহা অখাদ্য। মহা ফাপরে পড়িয়া গেল।

সেখানে ফেরুবাস কি ভাবে কাটিল, তাহার বর্ণনা আর দিব না, কাহিনী খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে শুধু একদিনের কথা বার্ত্তার নমুনা দিই।

এক রায়বহুর দারোগা মাঝে মাঝে ঈশ্বরীদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। পিতা ও পুত্র যেমন পরস্পরকে পালাক্রমে পালন করেন, দারোগা ও জমীদারও তেমনি পরস্পর প্রতিপালক। উভয়ের সৌজন্যে উভয়ের পোয়া-বারো। কিন্তু এই দারোগাটি বর্ষাচোরা আমের মত। আমার মোটা খদ্দরের কাপড় দেখিয়া ভাবিলেন, আমি বুঝি গাড়োয়ান (গাড়ির সঙ্গেও এই খদ্দর ছিল না — এ গ্রামদেশের) জেলার তৈরী, যাহার পারিভাষিক নাম 'গাড়া'। একদিন হাত জোড় করিয়া চুপি চুপি বলিলেন — হজুর,

আপনি ত পাড়ি-ঘরকে চলে—না!

দারোগার আগ্রহ দেখিয়া আমি বুঝিলাম, 'হাঁ' বলিলেই এই কাজে বেশী মনে হইবে।

কিন্তু হাঁ-না বলিবার পূর্ব হইতে যুক্তি পাইলাম। দারোগার নিজের মনোমত অপরের মুখী জবাই করিবার ফিকিরটা ফিতেছিলেন। প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া চলিলেন — সরকার, শুনতে পাই মুরক্ষ (মরক্ষ) হ'লেই জমীদারের অত্যাচার থাকবে না।

আমি বুঝিলাম: জমীদার থেকে কি লাভ! ঘরে ঘরে পরের জমাইয়ের উপর নবাবী করা ছাড়া জমীদাররা করে কি? এমন দিন আসবে যখন বেয়নেট না ধরে কেউ খেতে পাবে না।

দারোগা সহসা হইয়া বলিলেন,: আস্তে কথা বলুন হুজুর, কেউ শুনতে পাবে।

আমারও ঈশ্বরীর নিষেধ মনে হইল।

— আচ্ছা, হুজুর, যে সব জমীদার প্রজা ছাড়বে না, তাদের জারগা জমী কি জোর করি নিয়ে— নেবে?

— আমার ত মনে হয়, অনেকে খুশী হয়েই ছেড়ে দেবে। অনেকেরই ত মাথে ওসব ঝামেলা। তা ছাড়া, জমীদারী চালানোরে আজকাল বিস্তর হাঙ্গামা। আমের দিন ত নেই, যে রাবত পড়ে পড়ে মার খাবে, বুক ফাটবে, ত মুখ ফুটবে না। যারা দেখেনা, তাদের নজীর ত রয়েছে।

দারোগা আমাকে আশ্চর্য করিয়া একটু খুশীর ভাবই যেন ব্যক্ত করিলেন। — সে বেশ হয়, — না হুজুর!

পরক্ষণেই কি ভাবিয়া একটু জিজ্ঞাসু হইলেন — তা হুজুর, আপনাদের ও ত জমীদারীটা বাদে? শুনেছি আপনাদের বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমদানী।

আমি আত্ম-প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, না তত নয়, যাকে হাজার পঁচিশ হয়। তা আমরা অমনি ছেড়ে দেব।

— হুজুর, সৌত ছাড়বেনই — একটা কাজ করবেন? গরীবের একটা উপকার করবেন হুজুর?

আমি উদার ভাবে আশ্বাস দিলাম, — হাঁ হাঁ, বল না।

কথা বলিতে বলিতে দারোগার মুখ করুণ বিমুক্ত হইয়া গিয়াছিল; আবার হাত কচলিয়া বলিল,

— হুজুর পুলিসের কাজ ত নয়, যেন নজরে যায়। যদি কিছু জায়গা জমি পাই, তবে এই চেইয়ারী ছেড়ে দিয়ে চাষ-আবাদ করি। একটু জায়গা যদি আপনাদের বন্দুকে আমায় দেন হুজুর।.....

(৫)

দেড় মাস প্রায় নিরাপদে আত্মগোপনে কাটিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরীপ্রসাদের নিরুপদ্রবিতা দেখিয়া পিতা আমাকে বিস্তর জিনিষপত্র উপহার পাঠাইয়াছেন, কাপড়চোপড় সহেত। নিতে না চাহিলে বলিয়াছিলেন, — 'বেটা, ঈশ্বরীর জন্য না তিনে এনেছি, তাই তোমার জন্য এক প্রস্থ এনেছি।'

সাহেবী পোষাক পরিয়া কাইজার হইতে মুক্তিয়াছি, এমন সময় দেখি, বাবাও এক তৃতীয়শ্রেণীর কামরা হইতে নামিতেছেন। এখন বয়স হইয়াছে, অত হাঁটিতে পারেন না: তাই চার আনা গাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়ীতেই আসিয়াছেন। দেখাতে — বয়সের যেমন হয়। জীবনভোর রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া কঠিন শ্রম করিয়া যারা তুলস ক্যাকাশে সৌকুমার্য আসিবে কোথা হইতে? রক্তকণা-শূন্য শিরাউঠা মুখ, বয়স ও ব্যারাম মিলিয়া তাঁহার দেহ হইতে সরসতা শুষিয়া লইয়াছে। চেহারাটের ব্যালাই কোন অর্থেই নাই — না চিকনতা, না মেদবাহুল্য।

তখনও গরম ছিল, বৃষ্টি মাসে মাসে পড়িলেও দুই দিনেই আবার আকাশ ঘামাস বাষ্টি উঠিয়া

উঠিতেছে। বাবার বাড়ি গা, তার হাতে খেলো হুঁকা—তাহা টানিতে টানিতে নামিলেন। গা হাতে একটা চটের থলে, তাহাতে বোধ হয় তামাক টিকা ছিল। পরণে ঢে'রে টু-রাকো সমাতন গামছা। হাঁটুর মিনিকিটাও ঢাকা—ধুলায়। সেই অবস্থায় মহিলা মহিলী ছুতাজোড়াও আছে। বুঝিলাম, বাড়ি যাদ কোন খবর না পাইয়া তবু লইতে আসিয়াছেন। বাবাতে আমাকে দেখিতে না পান সেই জিনিসে গা ঢাকা দিবার মতলব করিতেছিলাম। গা ঢাকাও ছিল—সাহেবী পোষাকে। কিন্তু বাবা কি করিয়া দেখিতে পাইলেন। অনেক হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন; তাঁহার পায়ে ধাক্কা লাগিয়া ঈশ্বরীর টিফিন-কেরিয়ার পড়িয়া গেল। তাহা উঠাইয়া দিয়া বলিলেন।

"আমার হুকোয় এই বাবাজীর সঙ্গে। আজ সাত মাস খবর নেই। ছিলে কোথায়, বাবাজী?"

ঈশ্বরী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই বুড়োকে চেন নাকি?"

আমি ইংরাজীতে বলিলাম, "আমাদের বাড়ীর চাকর।"

আমাদের কোন চাকর থাকিতে পারে, এ ঈশ্বরীর অপ্রত্যয় হিল। কিন্তু তাবিল, হয়ত ছেলে কাজ করিবার জন্য 'মুনিব' রাখা হয়।

ততক্ষণে বাবা বলিতেছেন—"জবাব দিয়েছে কেবলে হুঁকো মজাবে।"

ঈশ্বরী অবাক হইয়া বলিল, "এ-যে পাগল দেখছি!"

আমি আবার ইংরেজীতেই বলিলাম, "সুযোগো লোক—মানে না।"

বাবা বলিলেন, আমার ছেলেকে আমি গাল দিয়ে তোমার লাগে কেন, বাপু?"

এবার নিকটে আসিয়া নাম ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,

—তোর মা কেঁদে কেঁদে আমায় ভিক্ষিতে দিলে না, তাই তোকে খিতে এসেছি, বাবা।

ঈশ্বরী এবার অস্থির হইয়া পড়িল। গালিটা বুঝিয়াছিল, আদর বুঝিল না। এবে মুনিবকে ছেলেও বলে! ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিল—"তুমি বড় বাড়া বাড়ি করছ বুড়ো। চাকরের এত বাড় ভাল নয়।"

—চাকর? কি বললে হে ছোকরা? চাকর! সুযোগো বাচ্ছা এই কথাই তোমায় বলে বুঝি ইংরেজী ক'রে?

তার পর মুহূর্তমাত্র। আমার পিঠে মহিষাসুর-মর্দনের তাণ্ডব চলিতে লাগিল, এক দুই-মহিষের চামড়ায় ছুতা, অপর এক দীর্ঘিত মহিষের পিঠে কাঠিয়া কাঠিয়া বলিতে লাগিল।

তারপর?—সেটা বলে হইয়াছে, ইঙ্গিতের মত।

কেউটা তার—নীচ জাতি, কালো তার রূপ।
তবি তারে রাগ ক'রে বলে—চুপ! চুপ!
তুমি যে মাটির কীট, ধাও তারি বন,
ম উঁচু দিকায় মাথে তোমারি কি ধন!

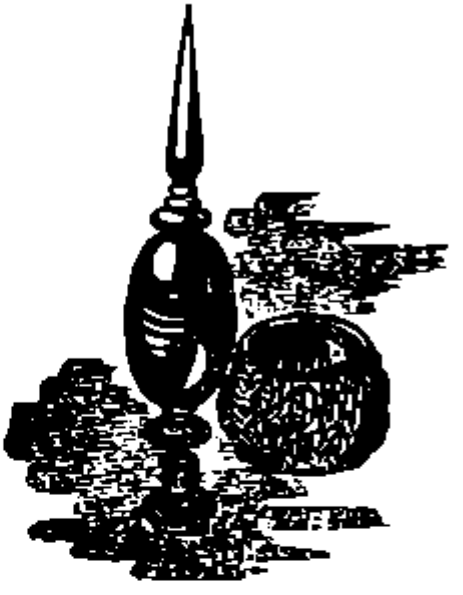

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চার কবিতা খাঁটি আকারে বিতরণ করা হইবে—যে-সব সর্বসাধারণের রসিকজনের উপযোগী কবিতা থাকেন, এবং যাহা সাধারণ-জীবনের এবং বাংলাভাষার আবহাওয়ার অনুকূল বটে। এখনের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নহে) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সত্যকার পরিচয় নাই। 'বঙ্গশ্রী'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন — কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে বর্ণ-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

(১)

জাগরণী

উঠ, প্রেয়সী আমার—
উঠ, প্রেয়সী আমার!
ছার-দুয়ার, কত বন্ধনের হার!
উঠ, প্রেয়সী আমার।

কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি ভোরে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে যে পারিব না আর।
নয়ন-অতলরাশি প্রেয়সী আমার!

তোমার পবিত্র ছায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
অনেতে জন্মেছে মায়া; ভালবেসে সুখী হই;
ভালোবাসি নারী-নরে,
ভালোবাসি চরাচরে,
ভালোবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।
উঠ, প্রেয়সী আমার!
উঠ, প্রেয়সী আমার—
জীবন-জুড়ানো ধন, ছবি-ফুল হার।

ওই চাঁদ অস্তে যায়,
বিহগ জাগিছে গায়,
মরণ আরতি বাজে, নিশি অবসান ;
ফিকে ফিকে যায়
ফিকে চুল ফিকে গায়,
নিবিড়-বুহুতা-জালে ফিকেরে যতনে —
ঊষা, প্রেয়সী আমার, যেন নবিন-নয়নে !

প্রিয়-প্রদক্ষিণ

প্রিয়ার ও তনু অহহ সে কোন্
দেবতার মন্দির !
যজনহীন মম উদাসীন
আত্মা সে শান্তির ।
তাহারে ঘিরিয়া ঘুরিছে হৃদয়
ঘুরিছে যাত্রি দিন,
উৎসুক মুখে কৌতুকে তারে
করিছে প্রদক্ষিণ !

ঘুরি সে যাত্রী বিরহ-রাত্রি
অরুণ ফেটিল ধীরে,
নূতন প্রেমের নির্ঝর-ঝরা
'নিশানি' ধরি' শিরে !
ওত হাসি ওত পুলক-অশ্রু
ভরি সে আবিষ্কার,
নৈব প্রসাদে খোলে ফেটিলের
নূতন নূতন দ্বার !

ফিরিছে হৃদয় ঘুরিছে তার,
ফিরিছে কপোলে, চোখে ;
অঙ্গে, উরসে, চরণে, পাণিতে,
ফিরিছে তাত্র-সুখে !
ফিরিছে আড়ুলে, ফিরিছে অঙ্গুলে,
ফিরিছে ভুরুর ভিলে,
ফিরে অবিরাম,—কৌতূহলের
অন্ত নাহিক মিলে ।

নূতন প্রণয়, নব পরিচয় —
নব-প্রাপ্তির রীতি,
কত জনমের মূর্ছনা তা'তে
যুগ্মির ওত স্মৃতি !
প্রিয়ার দিঠিতে খোলা-মন আজ
হয়েছে কাহিনীময়,
নৈব আলোকে ভ'রেছে দু'চোখ,
ভরেছে নীলাময় !

প্রিয়ার রূপের অন্ত নাহি যে,
নূতন সে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে তার দেখা নব নব
হেরি বিস্ময় মনে।
উদ্বেল তাই রক্ত-পলাশ
মাখিছে রাত্রিদিন ;
নিবিড় পলক আঁখি মনে করে
প্রিয়ারে প্রথম দিন !

---

(৩)

লাজ - ভাঙ্গানো

মোমটা খুলিবে নাকি ! থাক তবে বসি',
আমি কবি কবিতাটি রচিনী জাগিয়া।
একি ! একি ! চাঁপাগুলি নেয়ে বুঝি বসি' ?
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
আমি নিব ? — তাও নাই, পরশে আমার
(আমি যে চঞ্চল বড় !) খুলিবে কবরী !
ফুলদের ফুলপানি, আহা মরি, মরি ! —
চাঁপাগুলি ফিরে গেয়ে হাসিছে আবার !
এমন সুন্দর গান কে গো শেখেছিল ?
হাসিছ ? — তোমার জীত ? এ বড় অন্যায় !—
তব গুরু এত লাজ ! — গানের বাটায়
আমা লাগি' কিছু পান কে বল আনিল ?
"যাও, যাও"! — সেকি কথা ! ধরি' দুটি কর,
আনিও রাঙায়ে সেই আপন অধর।

---

(৪)

আষাঢ়ের আশঙ্কা

বেল-ফুল চাই না, জুঁইফুল দাও !
ও গানটা গেও না, ঐ গান গাও !
কেন ওভোরাদলে — বল — বল না ;
হাসুলে কেন তুমি ! — কথা ক'ও না !
কালকের গল্প আজ কর শেষ ;
আজকের রাতটা লাগুক না বেশ ?
সারাটা বেলা ধরে গাঁথলুম চুল,
খেলে না ছেড়ে তা, এমনিই ভুল !
জুঁইফুল চাই না, বেল-ফুল দাও ;
ও গানটা গেও না, ঐ গান গাও !
জুঁই বেল চাই না, চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি, তুমি পাও কি না পাও ?
কাকাতুয়া কিনে দেবে — কিনে দিলে খুব।
কথা কেন সেই মুখে, হয়ে গেলে চুপ ?
ভালোবাস কি না বাস — ঠিক বলো না !
চাঁদ ঐ উঠেছে, ছাদে চলো না।
মুখে চুপ লাগলো, দিয়ে যাও পান ;
মাথা ঘুরে পড়লো — দেও নাক দাম ;
চাই না জুঁই বেল, চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি, তুমি পাও কি না পাও ?

চাপা-ফুল চাই না, দাও বেল-ফুল ;
খোঁপা থেকে ঝরে পড়ে' গেল বিলকুল্ !
ছুড়িয়ে সব ক'টা পরিয়ে দাও ;
আবার না-ব'লে তুমি পালে চুমু খাও !
আমি হ'য়ে গেলে তুমি খুব কাঁদবে !
তখন ও যাদু-ঝোরে কারে বাঁধবে ?
ও কি, ও কি ! চোখ থেকে পড়ে কেন জল ?
হ'য়ে কেন যাব আমি ? — মিছে কথা বল।
দুঁই, যেন, চাসেনি — যা খুসি তা নাও,
ও-পালেতে চুমু খেলে, এ-পালেতে যাও !

---

(৫)

মুখ-অলী

নয়নে-নয়নে কথা কাল রাতি ভাগে,
আধ শ্রাণ জল যেন নিরাশের কাগে !
চাহিবারে শুরুজন, ওগো অন্তরালে ;
মোহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে !
কে যেন গো কানে কানে কহিছে সোহাগে,
"জান খালা, ভুল এই কলার পাতায়
একরাশ সেফালিকা ভুকান' কি যায় ?"
শুধু নয়নের দুটি কাল রাতি ভাগে ;
বন্দী হ'য়ে সমাটের ভুল কারাগারে
কাঁদে যথা ভুলবিতা শুধরে শুধরে
মনোদুখে ; মোমটার অলস-আঁধারে
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে।
ছাদে চল — মুক্ত বায়ু, বহিছে ফাল্গুনী ;
দ্রৌপদীর শাড়ীসম সপ্তরা যামিনী !

লুকোনো ছবি

"সে কিশোরীর ধূসর আলো খুঁজছি উঁচো
যাদ থেকে,
যা নিয়েছিলো হিসেব তো যার ছবিটি দেখে—
ভালোবাসার ঘুরঘুলিটি
দিয়ে গেল উড়ো চিঠি,
সে এক রঙীন্ শাওন বিয়ানে — হাসছ তুমি বসে
দেখে ?
তো তার খবর
নেছে,
সাদা-উড়ন্ নেচুনী শাড়ী নিশ্চিন্তে আছে তার
সে দেহে :
হদ হিসাব করলে দেখি,
আসছ তুমি চাহিয়ে মেলি, —
শপথ করে বলতে পারি, সুন্দরী সে সবার চেয়ে।

আছেও, প্রিয়ে, তুমের চিত্তর হলের উজান করে চলে,
তার সে খোপার পাখ্‌ড়ি টাপার রয়েছে প্রাণের
বহুমহলে।
কণ্ঠ তাহার কিংবা বিটে —
ছিউলি আবাঢ়-সাঝায় ছিটে।
নটবানো-হয়, আঁচল ঘুটে' রূপ-ঝিরা পড়ছে ঝরে'।
মিছে কেবল তবুও তুমি, বলুবে নিলাজ এলমতা সে,
যার মানে তার রূপের মোহ, সাঁচা তোমার
প্রেমের পানে ?
ও সব কথা নিক্তি ধরে'
দেখতে কে যায় ওজন করে' ?
তুমি তো মোর ভরা-ভাদর, ফাগুন মাসের দখিনা
বে।"

"চল, দেখে আর বাঁচিনে যে, হয়, কেতেছেন ঘুড়ো
বয়ে"
চোখ ঘুরায়ে কহল ঝিয়া, — "একেবারে ঢের
ব'য়ে।
চল্লিশেতে গালুসে-ধরা,
ছাপলা-চোখে চশ্‌মা পরা,
যৌবনেরই চমৎ এ নয় — পড়তে পার চোখের
জোরে।"

জবাব দিলাম, "ফটো যে তার রয়েছে মোর
জেব্‌লিটেতে,
সে যে তোমার সতীন, প্রিয়ে, সে মুখ তোমায় দেখতে
তো নেই।"
সেদিন ফটোর খবর পাওয়া,
উঠ্‌-পরান করেন খাওয়া,
জেব্‌স-বেরায় কেসেন খুলে' — ফি-টি ছিল
অক্ষরেতেই।

দেখেন তাহার উল্টা-পিঠে প্রেয়সী তাঁর নিজের মুখ,
উঠ্‌ল ফুটে আর্শীটিতে রূপের আলোর ঝলমটুক্।
জল-জমা সেই চোখের পাতায়,
অভিমানের দুকালতায়
রূপচাঁদ এক ধরল সোজা—অক্ষয়বাধা হাসির সুখ।

মন্ত্রহীন

হে আমার জ্যোতি, হে আমার দৃষ্টি
তুলিবি.. সবিতা, সখি হে প্রিয়া,
কখন মোদের হ'বে মেল ঠের
পারে যাব কোন্ পথের দিয়া ?
তবু শোন, সতি, গোপনীয় অতি
কহি আজ কিছু আমার কথা,
তোমার পতি যে যন্ত্র নেয় নি—
শুনেছ যা' — নয় যথার্থ তা'।

আমার মন্ত্র জনম অবধি
আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,
তব মুখ হ'তে আমার দেবতা
সে যন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেই দিন হ'তে ওই তনু মাঝে
তনু ছায়াটির দেবতা মম,
জপি আমি নাম — হে আমার কাম,
হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম।

নমো নমো নম সুন্দরতম
আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে যুগে দেহ পরমানন্দ
নয়নের ধার ব'লো না কেহ।
বাহুসোপানের ধাত্রী তব,
ধরা দিল মোর বাহুর পাশে,
ক্ষীর-সাগরের ওই তরঙ্গে
তনু চাঁদমুখ ভাসিয়া আসে।
দেবতা আমার ভিখারী হইল
ওই মুখে সুধা পাবার লোভে,
ওরই বসাসনে অতনু মদন
মনমোহন মূরতি লভে।

ও তনু আমার প্রেম-মুধাধার,
জনমন ধরি' জাগিয়া থাকে,
মুঠা ভরা মোর কামনা পুরায়
বক্ষিমখানি পুরতি রাখে।

প্রিয়ার তনুর অনু-পরমাণুরে
উজলয় রহিং নাহে,
দেখা ছুটে উঠে যে লীলাপদ্ম,
আমার দেবতা তাহাই বাছে।
ও-তনু পুড়িবে — জন্ম উড়িবে,
সে কথা আমার অজানা নহে,
বুকে রেখে তারে চোখে জলে জল,
তবু চুপে চুপে আমারে কহে :—

"আমি-টা আমার লীলাতরঙ্গে
খোপনে আপনা ভাঙি ও গড়ি,
সে ভাঙা-গড়ায় যে 'আছে' রয়েছে
সে খাকারে 'নাই' কেমনে ধরি ?
তবু ছল ক'রে লুকাই বন্ধু,
কত কাঁদ তাই পেখিব ব'লে,
কত কৈ-কিনু সে কথা কহিতে
ফিরে ফিরে আসি তোমারি কোলে।

আছি আছি আমি, আছ আছ তুমি,
আমি প্রিয়া আর তুমি যে প্রিয়,
আমার এ ছাড়া তেলীয় প্রেমের
বাঁধা আছে তব উত্তরীয়।
যা ছিল আমার সঁপেছি চরণে
বরন ফুলের সরম ধন,
এবারের এই তনুর লীলায়
পেলে কি তৃপ্তি হে প্রিয়তম ?"

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সখী,
দুরিদি, সঠিক, কবি হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই পিয়া।
আমার গুরুর উপবীত নাই
তর্কে তাহার কনক-হার,
শিরে নাই শিখা, নাই জটা-ভূট,
আছে বেদী আছে অনল-ধার।
তপালে নাহিক ত্রিপুণ্ড্র-রেখা,
সিঁদুরের টিপ পরে সে ভালে।
তা ব'লে শক্ত সহজ কিগো
হাতে ধরা শুক প্রেট-কালে!

উড়ুপরি সোম, আমার মরম
শুকর ভাষা বুঝিল কেবা?
হাতে বেদ আনে মুক্তিস্নান,
দিনে ধরে মোর চরণসেবা!
যার বিয়ে তার শুভদৃষ্টিক্ষণ
বিষভরা সে দেখার মোহে,
বিয়ের বেদি, তারি রূপ মেখি'
আমার রূপের জগৎ মোহে।
পরিয়া নীর বৈতরণীর,
সহমরিতি, শপথ করি—
এ নহে দয়া—নাস্তিক, তাই
সমাধিহীন জীবন ধরি।

খোঁ হতে তুই চক্ষে ক'রে নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার।
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি পাব ফল
কোন্ সাধনায়?
দেখায় প্রান্তরপারে
নদীর এক ধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে
আসি দীপখানি
শূন্য গৃহে অন্যমনে
একাকিনী বাতায়নে
বসে আছি পুলকিতে
বাসরের রাতি;—
কোথা অন্ধ বিধি কাঁটা কিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী?
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর ব্যথা ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি?

কন্ধ কণ্ঠ, নীরহারা, কহিবোনা কোন কথা,
কিছু ভাবে না।
নীরবে নীরব প্রাণে তোমার হৃদয় ধরে
নীরবে বেদনা।
প্রদীপ নিবারে দিব,
বক্ষে মাথা তুলি নিব,
স্নিগ্ধ করে পরশিব
সজল কপোল,—
বেণীমুক্ত কেশজাল
স্পর্শিবে তাপিত ভাল,
তোমার বক্ষের তাল
দ্রুতমন্দ হোল!
নিশ্বাসবীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন—
অর্দ্ধরাতে সাস্ত্বনায় নিদ্রিত ললাটে দিব
একটি চুম্বন।

জর্ণালিজম্ ও সাহিত্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[এই প্রবন্ধে লেখক জর্ণালিজম ও সাহিত্যের মধ্যে যে ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যেমন যৌক্তিক, তেমনই চিন্তাপূর্ণ হইয়াছে। 'জর্ণালিজম' বলিতে সংবাদ-ভাষ্যের পুরাতন-প্রবন্ধাদি বুঝায়, তাহার প্রেরণা ও প্রয়োজন একটা কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ — এ জন্য ঐরূপ রচনাকে 'সাময়িক সাহিত্য' বলা যাইতে পারে — 'সাহিত্য' বলা হয় ব্যাপক অর্থে। যাহা খাঁটি সাহিত্য তাহা একটা বিশিষ্ট কাল, জাতি ও সমাজকে অবলম্বন করিয়াও কোন্ গুণে তাহাতীত হইয়া থাকে, এবং সেই কারণেই সাহিত্যপর্যায়ভুক্ত হয়, লেখক তাহাই বুঝাইয়াছেন। আজিকার বাংলাসাহিত্যে জর্ণালিজমই সাহিত্যের মর্যাদা দাবী করিতেছে। অতএব এই প্রবন্ধটি আমরা আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদিগকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে বলি। কেবল একটা বিষয়ে আমাদের কিছু মতভেদ আছে। দেশ, জাতি ও সমাজের তাৎকালিক আচার-ব্যবহার, ভাষা-বিন্যাস, ও মনোবিধি সমস্তা খাঁটি সাহিত্যের পক্ষে অবলম্বন ত নহেই, বরং উহারাই সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে উপাদান; উহাদের কালের (রীতিকাব্য ছাড়া) উহারা সেই দেহ, যে-দেহে বাহিরকে কালের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। 'জর্ণালিজম' প্রাণহীন দেহমাত্র; কিন্তু সাহিত্যকে প্রাণবন্ত হইতে হইলে ঐ দেহটাও চাই। অতএব সমাজ-চৈতন্য ও জীবন-চৈতন্য মূলে পরস্পর-বিরোধী নয় — কবিরাই সেই বিরোধ দূর করিতে পারেন। তথাপি এই প্রবন্ধে লেখকের মূল বক্তব্যটি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, আলোচনার ভঙ্গিটিও নূতন। বাস:]

জর্ণালিজম কি বুঝি, সাহিত্য কি তাহাও বুঝি, কিন্তু এ দুয়ে প্রভেদটা কোথায় সহজে বুঝিতে পারি না। অনুমানে বুঝি একটা প্রভেদ কোথাও আছে — কিন্তু কোথায়? এবং কিসে? কোন্ গুণের তারতম্যে সাহিত্য জর্ণালিজম হইয়া পড়ে, কিম্বা কোন্ গুণের সঞ্চার হইলে জর্ণালিজম্ সাহিত্য হইয়া ওঠে। রসিক ব্যক্তি বলিতে পারেন, যা-তাহারা লিখিলে জর্ণালিজম্, তাহারা লিখিলে সাহিত্য। কিন্তু তাই কি? তবে জর্ণালিজম্ অনেক সময়ে এত শুষ্কতার কেন? সাহিত্যই বা অনেক সময়ে এমন অন্তঃসারশূন্য কেন? তাহাতেই প্রভেদের ঐ সংজ্ঞাকে মানিয়া লওয়া যায় না। জর্ণালিজম্ ও সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ বিচার করিয়া তাহাদের সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎপূর্বে জর্ণালিজম ও সাহিত্যের আপেক্ষিক সম্বন্ধটি পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বর্তমান কাল জর্ণালিজমের যুগ। রেলের যাত্রী-পথে জর্ণালিজম্ ও সাহিত্য মুখ্য-পথিক। রেলের আবির্ভাব হইতে পথিকদের পথে চলিতেছে। কিন্তু আজকাল জর্ণালিজমের যে যৌবন, যে প্রৌঢ়-জ্ঞান ও আত্মাভিমান এমন কোন কালে ছিল না। যে-জর্ণালিজম সাহিত্যের তত্ত্বাবাহক ছিল আজ সে সাহিত্যের স্কন্ধে আপনার পুরাতন ম্যাজেস্টোন ব্যাগটি তুলিয়া দিয়াছে। এ যুগ তো যাত্রা-পরিবর্তনের লক্ষণাক্রান্ত। কবিরাজের পাইক এখন অশ্বিপরের চেয়ে অধিকতর অভ্যর্থনাশালী, কারখানার মালিক কারখানার মজুরের অনুগ্রহপ্রার্থী। নিতান্ত পূর্ব-জন্মের সুকৃতি না থাকিলে এ যুগে কেহ মালিক বা

যদিও হয় না। আমরা সাহসের সিঁড়ির ওপরে উঠিয়া বলিয়া এ সব বলিতে বসিয়াছি। কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত বলা আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয়। [অবশ্য প্রয়োজন হইলে (এবং না হইলে) — তাহাও বলিতে পারি।] মুসলমানের বিদ্যানুরাগে সাহিত্য ও কর্পিলিজমের ভরসে তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কর্পিলিজম সাহিত্যাকাশের আকার ধরে—বল করিয়া উপরীত ধারণ করিয়াছে। আবার সাহিত্যও নিজের নাম ও জাতি ভাঁড়াইয়া কর্পিলিজমের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে — অনেক সময়েই চিনিবার উপায় নাই। এ দুইয়ের কর্পিলিজম এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। পূর্বে এমন ছিল না, যদিও কর্পিলিজম সব কালেই ছিল। কর্পিলিজম যে কেবল মধ্যকালে ছিল এমন নয়, রচনার সর্ব পর্যায়ে ছিল — এখনো আছে।

মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সব শাখাতেই কর্পিলিজম ও সাহিত্য দুই শ্রেণীর রচনাই আছে। থেকিডিডিসের মূল কর্পিলিজমের একাংশ এবং কুড়ানো মাল। কয়েকটি উদাহরণ লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

হোমারের মহাকাব্যদ্বয় যদি হয় সাহিত্য, তবে হেসিয়ডের (Hesiod) Works and Days কর্পিলিজম ছাড়া আর কিছুই নয়। চসারের কাব্য সাহিত্য, Langland-এর 'The Vision of Piers the Plowman' কর্পিলিজম্। শেক্সপীয়রের নাটক সাহিত্য আর তাঁহার সমকালীন 'University Wits' বলিয়া কথিত নাট্যকারদের (Marlowe বাদে) অধিকাংশ রচনাই কর্পিলিজম্। আমাদের দেশে কেবল কর্পিলিজম, জমকাও সাহিত্য। কালিদাসের কাব্য যদি সাহিত্য হয়, ভট্টিকাব্য কর্পিলিজমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়, শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ও পথের দাবী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম* কর্পিলিজমের কাছ ঘেঁষিয়া রচিত হইয়া গিয়াছে। বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালী সাহিত্য, আর আধুনিক ব্যবসায়ী লেখকদের অধিকাংশ রচনা কর্পিলিজম্। (কত নাম করিব — জানাজানি !) তারাশঙ্করের বিরাজবৌ সাহিত্য কিন্তু রাধাপ্রসাদ সেনের বিরাজবৌ কর্পিলিজম ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহিত্যিক-বিচারে পঞ্চমোৎকর্ষ দাবি করিতে না পারিলেই যে কোন রচনাকে কর্পিলিজম বলিতে হইবে এমন নয়। ইংরাজি সাহিত্যের যে সব নাটককে Restoration Comedy বলা হয়, সেগুলি চতুর রচনার দৃষ্টান্ত হইলেও অন্যূন শ্রেণীর সাহিত্য নয়। অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকগুলিও চতুর রচনার দৃষ্টান্ত — অন্যূন শ্রেণীর নাটকের নয়। কিন্তু যেহেতু এসব অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর শ্রেণীর রচনা — তাই বলিয়াই এগুলিকে কর্পিলিজম বলে ভাবিলে ভুল হইবে। এগুলি সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্পিলিজমের বিশেষ লক্ষণ এগুলে নাই। এ সমস্ত নাটক নিজের রচিত কৃত্রিম সংস্কার ও আবহাওয়ার মধ্যে বিধৃত। তৎসত্ত্বেও এগুলি আজিও যে উপভোগ্য তাহার কারণ এসব কৃত্রিম। গাছের ফুল কৃত্রিম বাগে রচিয়া মরিয়া যায়, কাগজের কৃত্রিম ফুলের দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে বাধা নাই।

আবার কর্পিলিজম হইলেই যে দুর্দিনবাদে মরা হইয়া যাইবে এমন নয়। জন্টেয়ার যে-সব রচনাকে কর্পিলিজম বলে করিয়া লিখিয়াছিলেন আজ সেই প্রহসনগুলিই তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার Candide ও টেলার্টীর রচনা কর্পিলিজম। আর যে-সব কাব্য ও

* তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কাব্য তিনখানি অন্যগুলির সঙ্গে এক পর্যায়ে পড়ে না। যঃ সঃ

সাহিত্যের জন্য দুঃখকাতর লোকে তাহাকে রোমান্সের চেয়ে বড় বলে, কবিকে ঔপন্যাসিকের চেয়ে (যে যুগের কথাসাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠত্বকে বড় বা major লেখক মনে করিত না) শ্রেষ্ঠতর মনে করিত,— সে-সব কথা আজ কে পাঠ করে ?

কাজেই দেখা গেল, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর রচনা হইলেই যে সাহিত্য হইবে এমন নয়, বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেই যে সাহিত্য হইবে এমন নয়, কিম্বা লিখিত হইয়া যথাকালে বিস্মৃত হইয়া গেলেই যে সাহিত্য হইবে — এমনও নয়। তবে সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ কি ? সাহিত্যের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কোন্ খানে ?

(২)

সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ সমাজ-চৈতন্য, সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ জীবন-চৈতন্য। সাহিত্যে সমাজ-চৈতন্য থাকিলেই মন্দ নয়, জীবন চৈতন্য থাকিলেও ক্ষতি নাই। সাহিত্যে জীবন-চৈতন্য অবশ্যই থাকিবে, সমাজচৈতন্য থাকিলেও ক্ষতি নাই। বিশেষ দেশ ও কালে লিখিত বলিয়া সাহিত্যে সমাজ-চৈতন্য অনেক সময়ে থাকিয়া যায় — সাহিত্যিকও সামাজিক জীব বলিয়া অনেক সময়ে তাহার অজ্ঞাতসারেই থাকিয়া যায়, কিন্তু ওই খানেই তাহার থাকিয়া গেলে চলিবে না ; তাহার জন্য সাহিত্য পর-বাড়ী হইতে ফেলে রচনাকে জীবন-চৈতন্যে পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে হইবে। সাহিত্যের আরও অনেক দোষ গুণ থাকিতে পারে — প্রয়োজন থাকিয়া যায়, কিন্তু সমাজ-চৈতন্য না থাকিলে রচনাকে অন্য কোন পর্য্যায়ে ফেলিতে হইবে, সাহিত্য বলা চলিবে না। সাহিত্য বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লিখিত হইতে পারে, সাময়িক ঘটনার চাপে লিখিত হইতে পারে, কিন্তু যে-কারণেই হোক, যে-সময়ে তাহার উদ্ভব তাহার আবহাওয়াকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে হইবে। সাহিত্য ও সাহিত্যের বাহিরের লিখন হইতে বিশেষ পার্থক্য নাই — ভাল সাহিত্যও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বা সাময়িক ঘটনার চাপে লিখিত হইতে বাধা নাই, বরঞ্চ অনেক সময়েই পূর্ব্বোক্ত কারণে বা ভাবে লিখিত হইয়া থাকে — প্রভেদটা প্রক্রিয়ায় নয়, পরিণামে।

অনেকটা উপায়ে সহজেরূপে বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ পোলিটিকাল ডকুমেন্টের ছাড়া আর কিছুই নয়। এতকাল পরেও সেগুলি দুষ্পাঠ্য এবং আধিকার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে এমন অনেক বস্তু এই সব রচনায় আছে,— অথচ তৎকালীন সংবাদপত্রের 'ডকুমেন্ট' গুলি আজ কোথায় ! এই প্রভেদের একটা কারণ অবশ্য, নিছক রচনার শিল্পকৌশলে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। কিন্তু ইহা একটা আংশিক কারণ, একমাত্র কারণ নহে। আসল কারণ, সংবাদপত্রের লেখক রচনায় সমাজচেতনার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আরও অগ্রসর হইয়া জীবন-চৈতন্যে পৌঁছিয়াছেন। ওই জীবন-চৈতন্যই তাঁহার ডকুমেন্টকে আজিও দুষ্পাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। নতুবা নিছক রচনা বা ষ্টাইলের উৎকর্ষ কোন প্রবন্ধকে দীর্ঘকাল জীয়াইয়া রাখিতে পারেনা। যেগুণে রচনা অমর হয় তাহার নাম জীবন-চৈতন্য। যে রচনায় ওই গুণ প্রচুর পরিমাণে আছে তাহার আয়ুষ্কাল স্বভাবতই দীর্ঘ। সমাজ-চৈতন্য রচনাকে কিছুকাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারে — কিন্তু সমাজের পরিবর্ত্তন হইলেই সেই রচনার ভিত্তি ভাঙিয়া পড়ে।

বার্নাড শ' ও ওয়েলসের অনেক রচনা মূলতঃ সাহিত্যিক, কিন্তু জীবন-চৈতন্যের ধন বহুল পরিমাণে তাহাতে আছে বলিয়া সেগুলি সাহিত্যের পংক্তিতে

উল্লিখিত হইয়া এখনও দর্শকদের চা খাইয়া আছে।*

শেক্সপীয়রের 'Merry Wives of Windsor' নাটকের কথা লিখিব। বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। রাজা যে প্রেমে পড়িয়া কিরূপ আচরণ করে রানী এলিজাবেথের তাহা দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায় রানীর অনুজ্ঞা ক্রমে নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল। মূল-প্রেরণার বিচারে নাটক খানি যতকাল বিগত হইবার কথা। কিন্তু চতুর কবি রানীর ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া অনেক পরিমাণে জীবন-চৈতন্য বা জীবনরস ইহাতে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

আবার বিপরীত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। হোমারের মহাকাব্য দুইখানি অমরত্ব লাভিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সমাজ-চৈতন্যের অংশই ভিন্ন আছে। রাজকুমারী নক্সিকা নদী-সন্তরণিনী হইয়া সমুদ্রতীরে কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। এই তথ্যটি সমাজ চৈতন্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তখনকালে ও তৎসমাজে রাজকুমারীদের পক্ষেও প্রকাশ্যে কাপড় কাচা যে সামাজিক বিধি বহির্ভূত ছিল না—এই ঘটনাটি তাহারই প্রমাণ। ইহা বিশেষ এক কালের, বিশেষ এক দেশের—অর্থাৎ বিশেষ এক সমাজের লক্ষণ। আধুনিক কোন রাজকুমারীর পক্ষে এমন কাজের কল্পনাও অসম্ভব। এমন সমাজ-চৈতন্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত হোমারের কাব্যগ্রন্থে আছে। তিনি যদি Hesiod মাত্র হইতেন, তবে সমাজ-চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া সমাজ-চৈতন্যেই শেষ করিতেন, ইউরোপের অধিগম্য হইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন যে কবির মূলধন জীবন-চৈতন্য।

"So said she; they long since in Earth's
soft arms were reposing.'
There, in their own dear land, their
fatherland, Lacedaemon"

কিংবা—

'Nay, and thou too, old man,
in former days wast, as we hear,
happy'-

উদ্ধৃত দুটি অংশে যে-রস তাহা তৎকাল বা তৎস্থান অর্থাৎ সমাজের কোন বিশেষ অবস্থার উপরে নির্ভরশীল নহে। ইহাদের অন্তর্নিহিত যেসব লক্ষণ মানবসমাজের অন্তর্গত, হোমারের গ্রীক-সমাজের তাহা নয়। এই রসকেই আমরা জীবন-রস বলিতেছি, এই রস লক্ষ্যে সমাজ-চৈতন্যকেই জীবন-চৈতন্য বলিতেছি। এই রসই হোমারের কাব্যের মূলধন। অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সমাজ-চৈতন্য আনুষঙ্গিকভাবে ব্যক্ত আছে। কবি ও মহাকবিতে প্রভেদ এই জীবন-রসের তারতম্যে। অ-কবি ইহার সন্ধান জানে না। সে বাস্ত্ব ও তাহাকে সমাজ-চৈতন্য চালায়—ফল এইটাই ইউরোপের কাব্যগুলি আধুনিকতম হওয়ায়।

(৩)

সমাজ-চৈতন্যের উপরে নির্ভর করিয়া স্থায়ী সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়, যেহেতু সমাজ-চৈতন্য বস্তুটাই ক্ষণস্থায়ী। দেশে দেশে সমাজ-ভেদ, কালে কালে সমাজ-ভেদ। সমাজ-চৈতন্যও দেশ ও কালের ভেদে ভিন্ন। আবার এক দেশেই কি সমাজ চিরদিন এক রকম থাকে? আজিকার সমাজ কালিকার সমাজ নয়। আজিকার সমাজ-চৈতন্য কালিকার হইতে ভিন্ন। এমন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া চলা আর পুরাতন পঞ্জিকা দেখিয়া তিথিনির্ণয় কি একজাতীয় ব্যাপার নয়? তথাপিজনের পক্ষে সমাজ-চৈতন্যই যথেষ্ট, কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সর্বনাশ! তবে যেহেতু সাহিত্যিকের সামাজিক সত্তা আছে, তাহার রচিত সাহিত্যেও সামাজিক লক্ষ্য অর্থাৎ সমাজ-চৈতন্য থাকিবে, থাকাই শ্রেয়। কিন্তু সাহিত্যিক নিজ স্বভাবের

* এখনও আছে, পরে থাকিবেনা। যঃ সঃ

প্রেরণায় সমাজ-চৈতন্যকে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, যে পরিমাণে হয় সেই পরিমাণে তাহার রচনা শৈথিল্য প্রাপ্ত হয়। আমার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

রবীন্দ্রনাথের গোরা। এ বইখানির সমাজের যে অবস্থায় লিখিত তাহার চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান। শুধু গ্রন্থখানির লিখন-কালের সামাজিক চিত্র নয়, গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা-কালের লক্ষণও ইহাতে অঙ্কিত। — (১) ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে আমাদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা হইয়াছে। ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে নানারূপ সমস্যা দেখা দিয়াছে। (২) ইংরাজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতিক্রিয়ায় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তে স্বদেশবোধ জাগিয়াছে। ইহারই অনুক্রম রূপে হিন্দু আদর্শ ও ভারতীয়তার আদর্শ বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বর্ণিত ঘটনার কাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী — এমন কি আনন্দমঠ-রচনারও পূর্ববর্তী বলিলেই চলে। গোরার বয়স সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে। ঘটনাকালে তাহার বয়স বোধ করি পঁচিশ বৎসরের অধিক নয়। বিনয়ের কিছু কম হওয়াই সম্ভব। অতএব ১৮৫৭+২৫=১৮৮২ সাল পাই। কিন্তু যে সমাজ-চৈতন্য গ্রন্থে দেখি তাহা নিছক ওই সময়কার নয়। স্বদেশী আন্দোলনের আভাসই ইহার প্রাথমিক প্রেরণা, আর কল্পিত সামাজিক কাঠামোর প্রেরণা দ্বিতীয় স্থানীয়। ইহাকে মিশ্র সমাজ-চৈতন্য বলা যাইতে পারে। প্রধানতঃ ১ম ও ২য় স্তরের সাহায্যেই ইহার গল্প-জাল বোনা হইয়াছে। এই দুই স্তর সমাজ-চৈতন্য।

এখন প্রথম স্তর বা ভাববায়ুর সমাধান আমাদের সমাজে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার নীতি সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আমাদের জীবনে এখন আর ইহা সক্রীয়, সক্রিয় আকর্ষণ নয়, স্বীকৃত সমাধান। ঐতিহাসিক মূল্য যেটুকু থাকুক, এখন ইহার কেবল সেটুকুই আছে। পঞ্চাশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই সমস্যা লোকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিত, আজ আর তাহা করে না। অর্থাৎ সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ-চৈতন্যের এই অংশটি মৃত। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, 'গোরা'-রচনার সমকালীন পাঠক এই উপন্যাস খানি পড়িয়া সমাজ-চৈতন্যোদ্ভূত যে অতিরিক্ত রস পাইত, আমরা আজ আর তাহা পাই না।

গোরা গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তর সমাজ-চৈতন্য হইতেছে, হিন্দু আদর্শ ও ভারতীয় আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ইহার মধ্যে আবার দুইটি ভাগ। প্রথম যে আমার অর্থাৎ এই দ্বন্দ্ববোধের সমাধান অনেক কাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হিন্দুর না ভারতীয়ের — ভারতীয় বলিতে ঠিক কি বুঝায় — এ সমস্যার সমাধান আজিও হয় নাই। এ সমস্যাটি এখনো জীবন্ত সমস্যা। বরঞ্চ আজকাল ভারতবর্ষে এই দুই আদর্শের টানাটানিতে রক্তক্ষয়ন চলিতেছে, অর্থে ক্ষয়, রূপে গরল উঠিতেছে। সমাধান কোন্ পথে আসিবে কেহ জানেনা, কিন্তু ঠিক সেই আদর্শই গোরার গুরুর আজ চক্ষুষ্মান পাঠকের কাছে ধরা পড়িবার কথা। এই দ্বন্দ্বটি আজ সজীব সমাজ-চৈতন্য, পূর্বোক্তটির মতো মৃত নয়। কিন্তু একদিন ইহারও সমাধান হইয়া যাইবে। তখন এটিও মৃত জ্যোতিষ্কের সমতুল্য হইবে। তখনকার পাঠক আজিকার পাঠকের আস্বাদিত অতিরিক্ত রসটুকু পাইবেনা। সে তখন যাহা পাইতে পারে তাহা নিছক সাহিত্য-রস, জীবন-চৈতন্য হইতে ব্যবহার সৃষ্টি। তখনও যদি গোরা সাধারণ পাঠকের পাঠতালিকাভুক্ত থাকে, তবে কোন সমাজ-চৈতন্যের তলায় থাকিবেনা, জীবন-চৈতন্যের তলায় থাকিবে। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চরিত্র-সৃষ্টির চিরকালের গ্রহণীয় রস যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে তাহা সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণে চিরকালের পাঠকের মনোযোগ সে লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আর যদি এমনই হয় যে, সমাজ-চৈতন্যের

পাঁচ ছটি নির্বাচিত হইবার পরে সকলেই সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল — পরিত্রাণ পেইলে আর কেহ গেল না, তবে মৃত্যুতে হইবে, জীবন-চৈতন্যের অভাবেই এমন ঘটিল। বিশের মতবাদকে অবলম্বন করিয়া গল্পগুলো এইরূপ বিশ্ব। মতবাদ এক প্রকার সমাজ-চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নয়, মতবাদ পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। গল্পগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির সমকক্ষ কিনা জানিনা, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইহার বিনাশের আশঙ্কা নাই। অনেক-দিন, দেড়শত দুইশত বৎসরকাল জীর্ণ হইতে পারে, হইয়াছেও বটে, কিন্তু গল্পগুলো চিরনবীন। এমন বিশুদ্ধ জীবন-চৈতন্যের ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র অপর কোন উপন্যাস রচনা করেন নাই।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে জর্গালিজম ও সাহিত্যের পার্থক্যে যে সব প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছি, এবারে তাহার জবাবটা খুঁজিতে পারা যাইবে। যেখানে জ্ঞানকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি করিয়াছে জর্গালিজম্। সাধারণ ক্রিয়া-কলাপের পর্যায়ে আলোচনা ও নির্দেশ করাই তাহার উদ্দেশ্য। আজ যে সবের মূল্য নিতান্ত ঐতিহাসিক মাত্র। জীবনের সহিত তাহাদের সহজ যোগ আজ খণ্ডিত: যে সমাজ-চৈতন্য ছিল তাহাদের ভিত্তি — সেই সমাজ বহুকাল অপসারিত। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষদাদির মূল্য আজও অব্যাহত, কারণ জীবন-চৈতন্য তাহাদের মূল। Hesiod-এর কাব্য গ্রীক-জীবনের তৎকালীন সংস্কার ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া গঠিত, তাহাই সেই তৎকালীনতা আমাদের এতৎকালীনতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।

Langland তাঁহার Vision of Piers the Ploughman-এ জগতের যে আদর্শকে অঙ্কিত করিয়াছিলেন আজ তাহার মূল্য কি? অতি চমৎকার-ভাবে ক্যেন্টারবেরির তীর্থযাত্রীদের কাহিনী, মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের ভিত্তিতে গঠিত বলিয়াই আজিও হৃদয়কে স্পর্শ করে। সমাজের চেয়ে মানুষ বড়। সমাজ মানুষের নিয়োজক মাত্র। এই সত্যটাই মানুষে আজ ভুলিতে বসিয়াছে।

সবই দেখা যাইতেছে, জর্গালিজম ও সাহিত্য নামক্ষয়ে ও রূপান্তরে আসিয়া ফ্রান্স হইতে আসে — কিন্তু এ দুইয়ের সংমিশ্রণ বর্তমান কালে যেমন ঘটিয়াছে, কখনো তেমন ঘটে নাই। আর শুধু সংমিশ্রণই বা কেন, জর্গালিজমকেই যথার্থ সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিবার একটা দুর্বুদ্ধি মানবসমাজে দেখা দিয়াছে। মানুষের সংস্কৃতির পক্ষে ইহা একটা চরম দুর্লক্ষণ।

কেন এমন হইল? বর্তমান যুগ চিত্তার অরাজকতার যুগ — সভা-সমিতি, বক্তৃতামঞ্চ, ভালো-মন্দ কেমন যেন তাল-গোল পাকাইয়া গিয়াছে। ইহার মূলে আছে গণতন্ত্রের মূল হস্তাবলেপ। চিত্তার এই গোধূলি-লগ্নে সমস্ত কেমন যেন অস্পষ্ট ও অলক্ষ্য। ইহা মধ্যযুগের শাশ্বত নক্ষত্রোজ্জ্বল রহস্যময় অন্ধকারও নয়, আধুনিক অত্যাশ্চর্য পল্লবের তীব্রদৃষ্টিতে ভাবের দিবা বিপ্রহরও নয়। এমন সময়ে একদেশ আর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া সহজ।

বিশেষ, এযুগে সাহিত্য রাজনীতির বাহন হইয়া পড়িয়াছে, সাহিত্যিকরা আর 'uncrowned king' নহে, তাহারা honorary clerk মাত্র, বিনা বেতনের কেরানী। রাজনীতিকদের অনুজ্ঞা ও অনুরোধে তাহার কলম চালিত হয়। দলীয়তাবোধের চেয়ে বৃহত্তর কোন আদর্শ তাহাদের সম্মুখে নাই — সমস্ত দৃষ্টিপথ হতে অপসারিত হইয়াছে। রাষ্ট্র-চৈতন্যের বিবর্তন অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে, মধ্যযুগের মানবত্রাস ক্রমে গণত্রাসে অভিক্রম করিয়া গণতন্ত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন এই গণতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার করিবার ভার সাহিত্যিকদের উপরে। মানব-বাদ বা জীবন-চৈতন্য গণতন্ত্রের

পুষ্টির অনুকূল নহে।

সর্বজনীন মানুষ আর সমগ্র মানুষ দুয়ের ভেদ আছে। সমগ্র মানুষ নিতান্তই তৎস্থানিক ও তৎকালিক, অর্থাৎ সে বিশেষ সমাজের অন্তর্গত সামাজিক জীব মাত্র — তাত্ত্বিকের আর কোন সত্তা তাহার নাই। কাজেই মানবত্বের বা জীবন-চৈতন্যের তাহার পক্ষে শুধু অবাস্তব নয় — কল্পিতও; কারণ, বৃহৎ মানুষের কথা বলিতে গেলে তাহার মনোযোগ অধ্যাত্মের দিকে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা। তাই সাহিত্যের আজ এই দুর্গতি।

এ ঢেউ উঠিয়াছে ইউরোপ হইতে, আসিয়া পৌঁছিয়াছে আমাদের দেশে। ইহার মূলে আছে সমগ্র রাজনীতির ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতজ্ঞ সাহিত্যিকদের আজ সম্মান ও অর্থ; কারণ, প্রভুর ইঙ্গিতকারিগণই প্রকাশ্যে সাহিত্যযোদ্ধা হইয়া আসরে অবতীর্ণ হন, এবং এতদিনে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টির হইতেছে বলিয়া সার্থক প্রচারণা বিস্তার করেন। এক হাতে আলো, অপর হাতে তাহা গলাধঃকরণের পুরস্কার। এ বড়ো সুখ নয়। অধিকাংশ লেখকেই দুই হাতের অপরিহার্য যোগটা বুঝিতে পারে না, তাহাতেই ভ্রান্তি-বিলাসের সুখে তাহাদের অনবদ্য থাকিয়াই যায়। ইহার ফলে, মানুষের সাহিত্যিক আদর্শ যে শুধু খাটো হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাই নয়, মানবত্বের আদর্শও ক্ষুণ্ণ হইতে সুরু করিয়াছে। জীবন-চৈতন্যবাদের আদর্শ-মানব ছিল 'রামচন্দ্র'। সমাজ-চৈতন্যবাদের হাতে পড়িয়া সে 'আরাদচন্দ্র' পরিণত হইয়াছে। কারিক আরামের ভেদে মনের কোন আদর্শ আধুনিক সাহিত্যের সম্মুখে নাই। একবার ক্ষুদ্রতর আদর্শকে গ্রহণ করিলে কোথায় তাহার শেষ কে বলিতে পারে? বৃহৎকে ভুলে ক্ষুদ্রতর করিয়া ফেলাই তাহার ধর্ম। বাংলাসাহিত্য আজ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতার আবর্তে পড়িয়া গিয়াছে। সমাজ-চৈতন্যের আদর্শে যে-সাহিত্যের সৃষ্টি — ব্যক্তিগত জমাখরচের হিসাবই তাহার স্বাভাবিক পরিণাম। সমগ্রের ফেরারীগিরি যে-সাহিত্যিকের আদর্শ, ব্যক্তিগত নকলনবিশীতে তাহার অবসান। কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃতি এই যে — কোন একটা দৌড় মানবসমাজে বেশী দিন তাহা চলনে না দিয়া থামে না। অন্যায়ের আত্মবিনাশিতা জাতীয়তাবাদ হইয়া সাম্রাজ্যবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যদি এখনও চলন না হইয়া থাকে তবে আরও অগ্রসর হইবে। ফ্যাসিজমের সর্বেন্দ্রিয়-মুক্তির উন্নাস চৈতন্য আজ ক্ষুদ্র সমাজ-চৈতন্যে উপনীত। এই প্রক্রিয়ার এইখানেই যে চলন তাহা মনে করিবার কারণ নাই। সেই চলনের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকাই হইতেছে প্রজ্ঞার পরিচয়। মানব-ইতিহাসের লোলুপ দুই চরমে আহত হইতে হইতে চলে। সেই তো মহৎ সাধনা: চরম যতই বিকটতর হইবে, মুক্তি ততই অধিকতর আসন্ন।

সাহিত্য বিষয়টা দেহ, না জীবটা দেহ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, জীবটা জীবন। দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রহিয়াছে। যতটুকু বিশেষ রূপে প্রকাশ করিলে যতটুকু অনুভবে আসে, যতটুকু সীমাবদ্ধ, যতটুকু জীব দ্বারা তাহাকে মনে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বুদ্ধিশক্তি তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।

— পঙ্কজ

স্বরাজ (?)

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

[এটি কবিতা নয় — একটি 'ছড়া' ; বাঙালী একদিনে ছড়া কাটিতে খুব পটু ছিল। কবিতার বিষয় আর ছড়ার বিষয় এক নয়— এই চারিটি পঙ্‌ক্তিতেই তাহা বুঝা যাইবে। বিষয়টি পদ্যই বটে, কিন্তু কথাগুলি পদ্য কবিতা বলিলে কেমন যাবাগো হইত না। এজন্য ছড়ারও একটা বিশেষ মূল্য আছে।]

ঘ'রে ঘ'রে জীবনের সোনা দিল অঞ্জলি,
বুকের রক্তে রেখে দিনরাত গুনছি।
একসাথ ঘ'রে কত উৎসব চলেছে,
যুগ ভ'রে দেশবাসী 'জয় হিন্দ্' বলেছে।
কারাগারে ঢেলে দেছে স্বরাজের ভরসায়।
হরতাল-শোভাযাত্রায় করা পথ-যাপন।
তারি হাতে তুমি পুনঃ বেচে দেবে লক্ষ্য,
সাম্প্রদায়িক ছোরা হয়ে উঠে চক্ষু।
বাটীদের মুকসব হাহাকারে অন্তরে,
গুণ্ডার উৎপাতে সদা ভীতি চলছে।
কাগজেতে সব কথা বলা নাকি বড় দোষ,
কোন কোন নেতাদের মনে এই আপসোষ—
লক্ষ্যহারা নাকি ঘোরাটোরা ইঞ্জিন,
দেখে অনাস্থিকে কাদায় চিরঋণ।
সুতরাং ইঞ্জিনের মুখ যাঁরা ধরবার,
অন্তস্থিকেতে ঐ স্বাধীনতা-সরকার —
অহিংস-নীতি নিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট যন্ত্র,
বড় তালের আজি দিনরাত হয়।
সোনাচ্ছে বুঝে তারা সদ্য ব্যবস্থা,
শান্তির নামি তাই করো এই ছুক্তি —
সবাই মরুক আর তুমি হেসে নাচবে,
যত সব দুঃখ পিঠে ক'রে বইবে।

একটি নীতি যেন হয় যদি জানা,
সেও ভালো—তোমরা যে তালিমের খানা।
জীবন্মৃতেরা সব শুনে বলে—টিন্ টিন্ ;
জীবন্ত লোক যারা তেজীয়ান নির্ভীক
খুঁজিয়া কয় তারা— তারপরে নয় নয়,
চাই মোরা প্রতিকার, সহায় চাই জয়।
নই মোরা কাপুরুষ, নই মোরা ছাগ-মেষ,
জানিয়া পেয়েছি এই সত্যের নির্দ্দেশ —
যারা সাপের হাতে মরা নয় মুক্তি,
অস্ত্রাচারীর সামনে নেই কোন ছুক্তি।
হস্তান্তর-বাদে আকাশের কলকে
হাতে তুলে নিয়ে যারা যুদ্ধের বলকে —
সরে' প'ড়ে ঘরে ঘরে যারাটিয়া দাদা —
হরতাল পথঘাট হয়ে গেল রাঙা,
তারাদেরি সাথে বেঁধে রাষ্ট্রের মৈত্রী,
অহিংসবাণীরা জপছে গায়ত্রী।
লাখো লাখো দেশবাসী জিটেমাটি হাকলো,
সব জব্দ সবাকার মাথলো ও কাঁদলো।
আর ও অস্ত্রের নাই নাড়ে-পড়,
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে জীবনের দুখ।
এ যদি স্বরাজ হয় কিবা এর মূল্য —
মরা আর বাঁচা যদি হয় সমতুল্য ?

বিদেশ হইতে আসিছে যত
বিলিতি ঘোড়ার ডিম !—
ফোস্ ! ফোস্ ! ডিম ছোবা-পক্ষীর !
—কিন্তু তবু কিম্ ?

— সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে ; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গভর্মেণ্ট মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও লাইব্রেরী হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনরুজ্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

বাঙালীর শিক্ষা ও জীবিকা

[এই প্রবন্ধটি আমরা পুরাতন 'বঙ্গবাণী' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ; ইহার লেখক — স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার। বিষয়টি যেমন গুরুতর, তেমনই তাঁহার আলোচনা শুধুই চিন্তাপূর্ণ নয়—স্ব-সমাজের সহিত লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তাহার প্রতি গভীর মমত্ব-বোধের জন্য, ইহাতে এক প্রকার সাহিত্য-রসও মূর্ত হইয়াছে। এ ধরনের লেখা এখনে দুর্লভ।]

সরস্বতী-গ্রন্থে 'চেকে'র মূল্য কষিতে কষিতে এমন একদা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, কলদার 'ঘাড়ে' সে চেক প্রেজেণ্ট করিলে সেখানকার ম্যানেজার শ্রীযুত ফুবের টাকা বকেয়া নজর হইতে পাঁচানব্বই পার্সেণ্ট ডিসকাউণ্ট কাটিয়া লয়েন,— বি, এ, বি, এল, এম, এ প্রভৃতি চেকের একসময়ের অতি মূল্যবান মার্কা-ও এখনে জার্মাণীর 'মার্কের' অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যেখানের বিদ্যালয় ঈশ্বরকে যদি পৌরাণিকেরা সাকার মূর্তিতে গঠিত করিয়া উপাসকের সম্মুখে উপস্থাপিত না করিতেন, অথবা বিদ্যালয়ের উপাসকেরাও যদি না কল্পনার শ্রীমন্দিরের চারু, নক্সা, কারু প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে জগতে ঈশ্বর-পূজা থাকিত কিনা এই সমস্যা যেমন সন্দেহজনক, তেমনই পুঁথিতে-লেখা 'বিদ্যা অমূল্য ধন' রূপ জ্ঞানবাক্য সংসারের খাতায় একটা মূল্য ধার্য করিয়া অক্ষপাত না করিলে কোথায় থাকিত তোমার ডুবরিদিগের বা বিষবিদ্যালয়, কোথায় থাকিত তোমার প্রথমত 'মক্তেব' বা জ্ঞানপূর্ণ তলেজ ; এবং এদেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকুল নির্মূল হইলেই টোলে বিদ্যালয়ের চোল থাকিত, আর ইংলণ্ডের ক্যাথলিক সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই

অন্তরঙ্গতা কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে।

বিদ্যার যে কত মূল্য আছে, ইহা বিদ্যার্থীকে প্রথম বুঝাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে বৃত্তি-শিক্ষা। 'ইউ, পি'র এক টাকা বৃত্তি হইতে 'মাইনরে' চার টাকা, পরে এন্ট্রান্সে ১০।১০ হইতে বি-এ, এম-এ'তে ৪০।৪০ পর্যন্ত বৃত্তি পাইতে পাইতে ছাত্রের হাতে-মাসে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ হয় যে, অধুনা ধন বিদ্যা কেবল নয়ন মুদা হাতের জন্যই প্রয়োজনীয়। এন্ট্রান্স মাসী-পিসি গুরুমহাশয়-ও মামুকে কোলে তুলিয়া নাচাইতে নাচাইতে জানে যৌতুক দেন—"লেখা পড়া শেখে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে"—ইতি গোয়ালন্দ-মডে; অথ নাক-মডে—"পড়লে শুনলে হবি কাতি, না পড়লে 'জানীলোক' নাবি।"

এইরূপে ঘাড়ী-নাড়ার মধ্যে, এবং দৌ-এর নাবির ভয়ে, বাদক বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকে কলিয়ে, অন্তরঙ্গ পুরুষকে, ভবিষ্যতে অর্থপ্রদানী চাকরী বা উকিলি প্রভৃতি বাহ্যিক জন্য প্রস্তুত-কলিতে থাকে।

এখনে সেই চাকরির বা ব্যবসার গায়ে একেবারে সাহেব ভাঁটা পড়ায় এবং সাহেবটার 'তেজ' প্রায়ই অনেক স্থানেই dishonoured হয় দেখিয়া, বাবাগণ ও মাতাগোবরণ আবিষ্কারেছেন যে, তাঁহারা সাহেবটাকে একখানি সূচা-মৈত্রেয় উদ্ভূত করিয়া বিদ্যা দান মৈত্রেয়ের আয়োজন করিবেন — বিষয়কর্ম-পূজার জন্য। ইংরেজী পড়িয়া আসে ইঞ্জিনিয়ার, এবং চোখে বসিয়া নাসিক নির্দিষ্ট নয়ন যুগ্ম উপার্জনের সেলাটা এখনে এমন জমিয়া গিয়াছে যে, আজিকার বৃত্তি অনেক বাঙালীই পরিত্যাগ করিয়াছে।

(২)

'কলিকাতা রিভিউ' প্রভৃতি প্রাচীন সমসাময়িক পত্রিকা ও অন্যান্য ইংরাজ পুস্তকে দেখিয়াছি যে, সেকালের ইংরাজী লেখকেরা বাঙালীর নৌ-বিদ্যার অযথা প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; প্রাবণ-ভাদ্রে পদ্মাপারে-কাহার আজিও দুটির চক্ষে দেখিয়াছেন এমন লোকও কেহ কেহ জীবিত আছেন। কলিকাতার নিকটে খালী-কোন্নগরে বাঙালিদের তরণী আমি ত' স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু পদ্মা, মেঘনার জীবন তরঙ্গ এবং 'ঘূর্ণির টা'কে' সর্বপ্রধানী যাত্র যে-বাঙালিকে উত্তম তরিতে পারে নাই — মেঘ ও টাদের বিকট কবলে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছে; বাঙালার নৌকার অস্তিত্ব এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় প্রায় আর বাঙি-বাড়ী দেখা যায় না। কলিকাতার উত্তরে চিৎপুর হইতে দক্ষিণে কেয়ার নীচ পর্যন্ত যতগুলি নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভিতর একটিও বাঙালী হাঁড়ী বা বাঙি নাই। বাঙালী মাঝিরাই ছিল — হিন্দু মুসলমান দুই রকমই: এখনও এই কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে, প্রাচীন বাটীতে যে সকল পুরাণ দালান আছে — তাহা প্রায়ই বাঙালী হিন্দু রাজ-কর্তৃক নির্মিত। সে জোড়া-থাম, সে খিলান, সে পলের ছাদ — যাহা পাথরের ন্যায় কঠিন এবং দর্পণের ন্যায় যাহাতে মুখ দেখা যাইত — সেই সব দেবমূর্তি, লতা-পাতা, ফুল পাখী মৎস্য প্রভৃতির আকৃতিপূর্ণ বিচিত্র কারুকার্যখচিত স্থপতিবিদ্যের উচ্চ প্রাচ্য-আর্য ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার-পরিচালিত এযুগের খ্রিষ্টীয়ের তন্নিকট কদাচিৎ প্রস্তুত করিতে পারে। বড় বড় ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারেরা এবং তাঁহাদের দেশীয় শিষ্যগণ — ভরিদ্বিয়ান, গথিক, গ্রীক প্রভৃতি স্থপতি-বিদ্যার বিষয় পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই সব দালানের একটা খিলান কাটিয়া তেলে অন্তত্তিন, সঙ্গে জোড় মিলাইয়া দিবার শক্তি ইঁহাদের আদৌ নাই। এই কলিকাতা নগরে অজ্ঞাত বাঙালী স্থপতির আর দেখিতে পান? পুরাতন ইমারৎ যাঁহারা দেখিয়াছেন, যা যাঁহাদের ঘরে আজও এক আধটা সেকালের সিন্দুক যায় ইতস্তত আছে, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে, কি নিপুণ হস্তে লোহে বাটালী চালাইয়া সেকালের ছুতারেরা

কফিকাঠের গায়ে ফুল কাটিয়াছে, তাহার মুখে সিঁদুর মাখে মকরাদি লিখিয়াছে; কিন্তু বাস্ত্র যেমন প্রকৃতি কেমন মজবুত, কেমন সুন্দর. — শিল্পকৌশলে কেমন বিবিধ ব্যবহারোপযোগী। বাঙালী কামার-কুমার আর বিশেষ হইয়াছে, কোন কোন গ্রামে যদিও দুই একজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় — আজও তাহারা কি সুন্দর তীরধনুক ছুরী, কাঁচি, কুড়ুল কাটারী, মোরকাটা খাঁড়া, মাছধরা বঁড়শি গড়িতে পারে! কোথায় গেল সেই বাণরাজার অসংখ্য বীর কামারেরা — যাহারা দুই হস্তে আয়সী হাতুড়ী তুলিয়া সজোরে পরিশ্রম করিতে পারিত? এই কলিকাতা-সহরে হিন্দুস্থানী ও ইংরেজ নাপিতের ভিড়ের মধ্যে যে দু একজন বাঙালী নাপিত এখনও দেখা যায় — তাহাদের কাছে নখ কাটিলে প্রায় পনের দিন আঙুল টাটাইয়া থাকে, এবং নব্য বাবুদিগের চুল তাহারা ধরাই কেমনতরো পাঁচফুলো করিয়া ছাঁটিয়া দেয়, বাবুরা খুশী হইয়া তুষ্ট তাহাদিগকে চারি আনা হইতে ছয় আনা বখশিস দিয়া থাকেন। এইরূপে বাঙালীর দেশে বাঙালী মিস্ত্রি, বাঙালী কারিগর, বাঙালী ধোপা-নাপিত আজকাল অতি অল্পই দেখা যায়; পশ্চিমের কুড়কার আসিয়া এখনও কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়িতে বসে নাই বটে, কিন্তু চাক ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতার অন্যান্য স্থানের কথা থাক, এককালে বাদরবাগানেই সমস্ত দোকান বাঙালীরই অধিকৃত ছিল। আজ বকবাজারে ঢুকিলে ভুল হয়, এটা বাঙালার কলিকাতা নয় — কাশীর নয়া-টোলায় ঘুরিতেছি।

কোথায় গেল সেই সব বাঙালী দোকানী — বাঙালী কারিগরের বংশধরেরা? সবাই কি মাষ্টারী, কেরাণীগিরি, ওকালতী বা আদালতের পাইকগিরি করিতেছে? বা, আমেরিকা-জয় বা ভূমিষ্ঠের ফলে তাহাদের ফল একেবারে লোপ পাইয়াছে?

আমি মোটামুটি গৃহস্থ জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় শুটিকয় শ্রেণীর কর্মীর কথা উল্লেখ করিলাম; যেমন চিত্রকার, গীবনকার, গুটী-শিল্প বাদ্য-যন্ত্র-কর্মী প্রভৃতি শিল্পকার্য, প্রস্তর-কাষ্ঠ-লৌহ-পিত্তল প্রভৃতি ধাতু এবং অন্যরূপ অন্য কার্য বাঙালী কর্মীর করায়ত্ত ছিল। বাঙালীর ঘর-দুয়ার, ঘোড়াশাল, জলপাত্র-গৃহনির্মাণের কাঠ-কাটরা, চৌকী, পালঙ্ক, খাট, অন্যান্য গৃহ-সজ্জা, অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয় বস্ত্র — এসব কথায়, জীবনযাত্রা-নির্বাহ ও সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষার জন্য বাঙালী যাহা কিছু ব্যবহার করিত, তাহাই বাংলাদেশে বাঙালী কর্তৃক প্রস্তুত হইত, এবং কারিগরির দ্বারা তাহাদের কলার জন্যও বিলক্ষণ ছিল। জাতিগুলি নামতঃ বর্তমান আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন এখন বাঙালী। কত করিয়াছে? আমার বোধ হয়, এই বঙ্গদেশে একসময় সম্পূর্ণরূপ আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিল বা হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। অনেকে ভাবেন, আমিও ভাবিয়াছি, প্রায় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এক বাঙালী পুরুষদিগের কোন নির্দিষ্ট শিরোভূষণ নাই কেন? একবার আমার এক ইংরেজ-বন্ধু আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি রহস্যচ্ছলে উত্তর দিয়াছিলাম যে, "এক বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দ্বারা বাঙালীরা তাহাদের মস্তক তাপগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করে না"। কিন্তু আমার বোধ হয়, এক সময় বাঙালীরা ভাবিয়াছিলেন যে, বঙ্গের জন্য পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের কথা ভুলে থাক, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেরও মুখ চাহিয়া থাকিবেন না; বাংলা বাঙালীকে যতটুকু কাপড় সরবরাহ করিতে পারে তাহাতেই তাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া লইবেন; এই জন্যই জামাজোড়া, টুপী, পাগড়ী সব ছাড়িয়া ফেলিয়া, মাত্র একখণ্ড ধুতি ও একখণ্ড উত্তরীয়ই — ইহার জন্য সমস্ত বাঙালীরই সামাজিক পরিচ্ছদ হইয়াছিল; এই পাতলা উত্তরীয় বা চাদরখানি যেন বাঙালীকে

বাঙালী বলিয়া চিনিবার নির্দশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল্যকালে আমিও দেখিয়াছি যে, তখনকার প্রাচীনেরা শৌচের সময় লাল মাটি ব্যবহার করিতেন এবং তাহার উপর একখানি কার্পাস-নির্মিত বস্ত্র উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন; পল্লী-গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐ প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। ঐ জিনিসটা যে বাঙালীর হিন্দুত্ব, প্রতিবেশী বিহার উৎকল বা আসামের নিকটেও সে-কথার জন্য প্রত্যাশী হইয়া থাকিব না; আর আজকাল আমার সন্দেহ হয়, মাটির ভাঁড় ও ঘুচে যাক্, গায়ের চামড়াখানাও ধোয়ার মাটি বলিয়া সে—জার্মানী হইতে আমদানী করা হইয়াছে। কোনও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক যদি এমন একটা সাবান চামড়া আবিষ্কার করিতে পারেন যাহা আমাদের ঐ প্রাণ অঙ্গে লাগাইলে খোসলার ন্যায় খসিয়া যায়, তাহা হইলে মনে হয়, এখন অনেক বাঙালী তাহা কিনিয়া ধন্য হইতে দ্বিধা করেন।

বিলাতী যাদুবিদ্যার কল্যাণে আমাদের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং বিশ্বকর্মা-পূজার আয়োজন আমাদিগকে করিতেই হইবে; এবং প্রথমেই করিতে হইবে — ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি যে সব জাতি অতীতের অভিমানে প্রবলভাবে কলকব্জাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন — তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণকে। ঐ অতীতের সমাজের অতি প্রয়োজনীয়, অতি উপকারী, অতি শিল্পবিদ্যা, যন্ত্র-কৌশল প্রবর্তীদিগকে অবজ্ঞার অস্ত্র উপাধি দিয়াছিলেন; তাহাতেই তাহারা নিজ নিজ সন্তানসন্ততিকে ঘৃণাভরা হৃদয়টী পরাইয়া হাতে উঁচাইয়া অস্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে; তাহার ফলে আজ বাঙালীর হাতে হাঁড়ি নাই, কলসী নাই, হাতুড়ী নাই, উঁতি নাই, কুলি নাই, কলিক নাই; এক মাত্র আছে কলম — টাইপরাইটারী কল তাহাও কাড়িয়া লইতেছে। আসন ও গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া বাঁহারা বাঙ্গালার এই সর্বনাশ করিয়াছেন — সেই বাঙ্গুয়ে, চুঙ্গুয়ে, ঘোষ, বোস, মিত্র, সেনগুপ্ত মহাশয়দিগকে, আজ অন্নাভাবের তাড়নায়, বৈশ্যদের খেলায়, নিজ নিজ পুত্র পৌত্রদিগকে দুহাতে কলকব্জা-যন্ত্রের করকৌশল শিখাইয়া অর্জনের জন্য পাঠাইতে হইবে। ঐ সব যুবকগণ কতকটা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকব্জা শিখিয়া, এবং কুলের সংস্কারবশে সদাচারী হইয়া, যখন দেখাইতে পারিবে যে, তাহারা উপার্জনক্ষম এবং সমাজের সকল স্তরে সমাদৃত ও সম্মানিত, তখন আবার আমাদের ছেলে কামারী করিতে, ছুতারের ছেলে ছুতারী করিতে ছুটিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছিৎ কেতাবী বিদ্যাও শিখা করিবে। পোষিতের সঙ্গে জাতিগত সংস্কার তাহাদের প্রকৃতিতে জড়িত থাকায়, তখন বন্ধ-বহুসেন-গুহেরা কলকব্জা-কার্যে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবে।

(৩)

আমার ঐ ধারণা কল্পনাপ্রসূত নহে; প্রমাণ স্বরূপ মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রথমে যখন এদেশে এঞ্জিনচালিত তৈলের কল স্থাপিত হয়, তখন কলওয়ালা হইয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায় জাতিই ছিলেন; তৈলকলের ঘন-চালিত ঘানি প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থাও হীন হইয়া পড়িতেছিল। এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বংশোদ্ভূত কলমালিকদের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া তৈলকারমহাশয়দিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেক্কিন্দ্রবাহে, অর্থাৎ স্ত্রীর গহনার হাত দিলেন; বরেলার আসিল, এঞ্জিন আসিল, ইক্ষু-চিনি ঘুমোদরাবে প্রস্তুত করিল যে, তৈলকলের জাতি-ব্যবসায় আবার সুখধামে চলিতেছে। এখন অনেক ছেলের কলের স্বত্বাধিকারী জাতিতে তৈলক, ব্যবসায়েও তৈলক। এবং যে সব

চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে দে-বংশের কল এখনও আছে, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই বোধ হয় জানিতে পারিবেন যে, তাঁহারা তৈলের ব্যবসায়ে লাভবান হইলেও, জাত-বজায় সহিত পালা দিতে পারেন না। এই যে পারেন না ইহার কতকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান দুইটী; প্রথম, তাঁহাদের রক্তের মধ্যে সর্ষে-তাজার সংস্কার নাই; এই অমূল্য সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহারা পিতৃপুরুষের নিকট হইতে লাভ করেন নাই; আর দ্বিতীয় হইতেছে,—তাঁহাদিগের অজ্ঞানিবান; লাভের লোভে তৈলের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও ঘানির অধিকাংশ স্থান যড়কর্ত্তা মেজকর্ত্তা মাঝের পরিবর্ত্তে তাঁহারা "বাবু" উপাধি গ্রহণ করেন; সুতরাং অনেক স্থলে তাঁহাদিগের কর্ম্মী চাকরদিগের উপর নির্ভর করিয়া কারবার; তাঁহারা তাঁহাদিগের চাকরের চাকর হয়েন। এইরূপ বাবু-ক্যাবিনেট-মেকারগণ তাঁহাদিগের সময়ের কর্ম্মীর মুখাপেক্ষী; বাবু-টলাহারা—তাঁহাদিগের মজ্জির মজ্জিতে চলিতে যাবা; বাবু "ভাইং ক্লিনিং"-রা তাঁহাদের উড়ে ও খোট্টা ধোপার আজ্ঞাকারী। দর্জ্জি যখন মেন-মরিক-ঠাকে বলে—"এ কোটটা কি রকম দিন দিনে তৈয়ারী হতে পারে?" তখন যদি কোন বলিতে পারেন যে—"নিয়ে এস দেখি আমার কাছে কাটি—দেখিয়ে কি পারে কিনা," আর নিজে সিয়ে বলে বসেন, তা হ'লে ওস্তাদের পো তখনই বলিতে যাবা হয়—"দিন দেখি—দিন দেখি—ওটা করে দেখি—।" আমাদের প্রাচুরেট, অনুত্তীর্ণ-প্রাচুরেট 'টেকনিক্যাল এডুকেশান্'-লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ভয় যে, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কলেজ-গৃহে কলমকবিতার সাহায্যে তাঁহারা ভাল করিয়া কারিগর খাটাইয়া লইবেন—'সুপারভাইজিং ওয়ার্ক' করিবেন। কিন্তু তা নয়; যেমন ইংসপাতালে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া পুঁজ রক্ত প্রেমাদি, ঘৃণা ত্যাগ করিয়া না ঘাঁটিলে কখনই কেহ ডাক্তারী করিতে পারে না, তেমনই, যে রোগে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, তেলের কোবর চুবাইয়া, মাঠে খাটিতে না পারে, সে কখনও কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তুমি সওদাগরের কর্ম্ম শিখিলে, হাতে কলমেও শিখিলে—তার পর যে মনে করিলে, ইলেক্ট্রিক কারের নীচে বসিয়া, সমুখ দেহ-আটা টেবিলের ধারে বসিয়া, ঘণ্টা টিপিয়া চাকর ডাকিবে আর মাঝে মাঝে "বসু, তোমার আজকের পার্টিটা হল? —কুক যে কেকখানা দিয়ে সাইলি তাতেই" —এই রকম লম্বা চাল চলিবে তাহা হইবে না। তোমার নিজে মালকোঁচা মারিয়া হাঁপো ধরিতে হইবে, নিজে ঘাটোলী চালাইতে হইবে—একদিকে বসু বসিবে, অন্য দিকে তুমি বসিবে, বসিয়া আত্মহারা সরাইবে, তুমী ডাকিবে না।

বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলেরা অন্ন পুঁজিতে সামান্য ব্যবসায় করিতে যাইয়া অনেক সময়েই যে সাফল্যলাভে বঞ্চিত হয় তাহার কারণ, এক—তাহারা ব্যবসায় শিক্ষা করে না; কোন্ সময়ে কোথায় কি কিনিতে হয়, কোন্ সময়ে কোথায় কি বেচিতে হয় তাহা জানে না, খাতা রাখিতে শিখে না,—আর সৈখন হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ্যাবস্থায় যেন পরীক্ষক, অভিভাবক অভিভাবিকারা আদর ও স্নেহভরে তাহাদের হেলেনে যে আলস্য ও রোগের অজগর প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, বয়ঃপ্রাপ্তে তাহা হাড়া ফুলর হইয়া উঠে। বাটী হইতে আট দশ মিনিটের পথ স্কুলে পাঠাইবার সময়, যখন বালকের শিক্ষিকা ওজায়াপাত বহন করিবার জন্য তাহার সঙ্গে একটা কি যা চাকর ঠেকাইয়া দিই—তখন কি আমরা জানি যে, শিশুর কি সর্ব্বনাশ করিতেছি। কলেজের আঠারো বছরের জোয়ান ছোকরাকে যখন আমি ছেলের মোড়ে ট্রামে উঠিয়া হাতিবেন রোডের মোড়ে নামিতে দেখি, তখন আমার কান্না আসে। ছেলেকে বাড়ীতে কখনও একটা মশারি টাঙাইবার পেরেক পোতে

যাবেনি, সে কি ভাহাজ ও চা নিয়ে কারখানে যাইলেই সঙ্গে সঙ্গে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া যাইতে পারে? খাটিতে হবে — খাটিতে হবে — খাটিতে হবে — আগে খাটিতে শেখ, খালি পায়ে চলতে শেখ, প্রথমে সস্তার দাও, তবে টেক্‌নিক্যাল এডুকেশনের কথা ভেবো। যদি কাহারও ঘরে পুরাতন 'এ্যাব্‌বিট্' আদি বিলাতী সচিত্র-পত্রের ফাইল থাকে, তবে খুলিয়া দেখিবেন যে, ভাহাতে — আজ যিনি পঞ্চম জর্জ্জরূপে ইংলণ্ডের ভাগ্যনেতার, তাঁহার একখানি চিত্র আছে। সে চিত্র তাঁহার বাল্যেতারী ভাহাতে 'বিভি'-অবস্থার প্রতিকৃতি, — সভাই প্রথম এডওয়ার্ডের ছিটীয় পুত্র ভাহিতের আন্তিন গুটাইয়া, কোমরে হাত দিয়া ভঙ্গিমা করিয়া, হাসিমুখে কলম তুলিতেছেন। বাবিনীকাল! আপনার বাড়ির ছেলেটি যত আদরেরই হোক্, যত বড় ধনীর ছেলেই হোক — ছয়মাসী ভাহার পর মন এটি মনে রাখিবেন; খাটান না একটু ভারে; ভাহার ত ঘড়ীতে ঢের আছে — কেউ ত বলবে না, আপনি গরীব! ছেলেই বা ব্যারাকী তার পড়বার ঘরটা ভাঁটি, সে ঘরেই বা দু' বালতী জল তুলে দেওয়ার; প্রথমটা যে নীচের কাজ — সে কাজটা দুর হবে, আর শরীরটাও হ'বে যাবে। বাড়ীতে ত রাজমিস্ত্রী লাগে, দেখ্‌বেন তিনি একবার মজুর মজুরানীদের শরীরের দিকে চেয়ে, — কি মাংস, কি সুখের ছাতি, কি সুডৌল হাতের গুলি, সর্দ্দারের গড়নে কি সৌষ্ঠব! তারা চর্ব্বি দিও খেতে পায়না, জাঁতীয় ঘটনাও তাদের ছুটে না।

যেমন সরস্বতী পূজার প্রাক্কালে পিতার পক্ষম বর্ষে 'হাতে খড়ি' দিতে হয়; নিদ্দা গৃহিণী প্রস্তুত করিতে হইলে পঞ্চবর্ষীয়া বালিকার কোলে পুতুলের ছেলে-মেয়ে দিতে হয়, যাতে খেলাঘরের হাঁড়ি-বেড়ী দিতে হয়, — তেমনি, সন্তোষী বা বিশ্বকর্ম্মা-পূজার উদ্যোগেও, ছেলের হৈমবেই তার হাতে খেলাঘরের হাঁড়ি বা হাতুড়ী দিতে হয়। উনিশ কুড়ি বছরের বয়স পর্য্যন্ত পাড়ে দেওয়া ছুতার মিস্ত্রী পা পুরিয়া, মজুরের পাঞ্জাবীতে আতেওয়ার মাখিয়া, সিঙ্কের ছাতা মাথায় ধরিতেও যার হ'তে থাকা হয়, সে কি আর বড় হয়ে ডিসি-ভূষির কুলো মেরে ব্যবসাদার হ'তে পারে, না, ভরাত হয়ে', তাঁত চিরে, কলা-মাখা হাতে উজিনে ভেলে ভেলে মিস্ত্রী হ'তে পারে?

যাদের দেখা দেখা করেছি, তাদের কি লেখা সত্যই একেবারে শেষ করে দিয়েছি? আমার বোধ হয়, না। এখনকার কিশোর বা যুবকদিগের মনের যা অবস্থা দেখ্‌তে পাই, তাতে অনেকটা আশা আছে; অন্ধ সংস্কারে ওঁদের জীবনকল্পের গতি বিপথে চালালেও, তাঁরা নিজের মনের জোরে বোধ হয় এখনও মোড় ফিরিয়ে নিজেও নিতে পারেন। তাঁরা এখন স্কুলে-কলেজে মামুলী পড়া পড়্‌ছেন পড়ুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেলার ছলে একটু হাত পা খেলান, কাজ করে' একটা নতুন খেলাও খেলুন।

(৪)

টেক্‌নীক্যাল বিদ্যালয়ের কথা — ভদ্রলোকের ছেলেদের হাতের কাজ শেখাবার কথা — খুব কলের সভা-সমিতির, বেড়াবার বাগানে, হাওয়া খাওয়ার পার্কে, বৈঠকে চল্‌ছে; আমাদের বাল্যাবস্থায় ওসব কথার উচ্চবাচ্যই ছিল না; তবু আমরা নিজ প্রয়োজন-সাধন জন্য, অথবা খেলার-ছলায়, যত হাতের কাজ করিয়াছি, এখনকার বালক বা কিশোরদিগকে তাহার ত কিছুই করিতে দেখি না। দোকান থেকে ছেলের সুপারি-কাটা, চন্দ্রপুলি তৈয়ারী-করা ঘুচিয়ে দিয়েছে, Exercise-বই বিক্রী করে' তেমনি ছেলেদের খাতা-বাঁধার পরিশ্রমটুকুও দেব করে' দিয়েছে। আমাদের অবশ্য কেহ কেহ পড়ার বই নিজের হাতে লেখাইও বাঁধিতে পারিত; আমারই একজন সহপাঠী ছিলেন—তিনি বছর বার ছেলের সময়ই বেশ বই বাঁধিতে পারিতেন; ওঁদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইত;

ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা সাজাইতে আসিলে তাহাদের নিকট হইতে নাম মাত্র মূল্যে টুকরা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। পুরাতন বই-এর মলাটের পেষ্টবোর্ড প্রায় সকল বাড়ীতেই পাওয়া যাইত; দু-এক পয়সা দিলেই দু-এক ডা' আর্সেনিক ডাক্তার লোকানে মিলিত; অথবা আমরা ঐরাবতদের সাদা কাগজের উপর জলাক্ত করে তার উপর লেবুর রস ছড়িয়ে এক রকম লেখন-লোহের আর্সেনিক-কাগজ তৈরারী করে নিতুম — তুলোর বই তৈরেই বেশ চলনসই বাজা হ'ত; কালি, — কি ইংরেজী কি বাঙ্গালা — কখনই বাজার থেকে কিনিনি, ঘরেই তৈরারী করে নিতুম। তারপর খেলা; পাকাটী বা পেপের ডালের এক দিক লাবানের ফেনা ফুলিয়ে শুকানো একটা বৈজ্ঞানিক খেলা ছিল; মাটীর পুতুল গড়ে' রোদেরা ত'খেলা করতুম, আমরাও মাটির হাতী ঘর প্রভৃতি হাতে প্রস্তুত করতুম। কলিকাতা বালাবন্ধু মিলে পূজা পূর্ণিমা প্রতিমাও গড়ে' আমরা খেলাঘরে পূজা করেছি।

যারা পড়বেন আশা করে' এই চরণগুলি পড়তে করছি আমি তাঁদের প্রায় সকলেরই ঠাকুরদাদার বয়সী — তাতেই তাঁরা আমার ভাই; তাই—বলছি ভাই, সংসারে বড় হয়ে যে খেলাই খেল, তার হাড়-ভাঙ্গা ছেলেখেলার ছেলেখেলা করেই করতে হবে; দেখ না বড় কারিগরীর বড় বাজারের তিন শ'-সাড়ে-তিন এঞ্জিনের রথ; খেল ত, কিন্তু এখন একটু ছোট বয়সার টিনের এঞ্জিন কিনে খেল; আমার বয়স বলে আপনাকে এত ছুটা ঠাওরাও কেন? পুরুষ বুড়ো-বুড়ো মনে করলেই বুড়ো হয়ে যায়; "a woman is as old as she looks herself; a man is as old as he thinks himself." — এই ত ছুটোছুটি করে কাজের আহাড় খেয়ে ফুটবল খেল: পল্লীগ্রামে সকলেরই বাড়ীতে ত একটু কাঁচা-মাটি আছে, কলকাতার বড়মানুষের বাড়ীতেও এখনও সব সিমেন্ট নয়— খেলিবী খেলা যায়; একটু কোদাল ধরে' তোলাও না, — ছুটো নাউ, কুমড়া, লাল শোভা পাবে। একখানা তাতারি, একটু রাঙ্গা মাটীতে ভেজো। মাটী মাটী করা ছুটো হচ্ছেই, একটু চেষ্টা করলেই বেশ তাতে রাঙ্গতাল দিতে পারবে। প্রথম প্রথম নাই-ই হল অত পরিষ্কার; পিসিমা মামা করে — ভালোনা; একখানা কর্মিক তোলাচে করে রেখো। সিঁড়ি ব্রক-টিনের দু'একখানা ইট খসে' গেলে, বা বারান্দার সিমেন্ট চটে' গেলে রাজমিস্ত্রী ডেকো না। একখানা ছোট কড়াই, একটী হাতুড়ি, একটা হিসুল, একটা ফুটাইবার, একখানা বাটালি তোমার চোখ তৈরারী করবে, তোমার হাত তৈরারী করবে; বাড়ীর পাশও তত্ত্বক বাঁচিয়ে রেখে।

প্রবন্ধ বন্ধ করবার সময় এসেছে, আর দোটা দুই কথা বলেই এখনকার মতন ছুটি পাই, ও ছুটি বিই। আধুনিক বিজ্ঞানিকার প্রধান দোষ হয়েছে — শুধু সংযমের অভাব নয়, অসংযমের আধিক্য। বিজ্ঞানের সহজ বিলাস ছন্দের উপাদানে বড় হয়ে জাতির জীবনের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। এই বিলাসিতা বিদূরিত করিতেই হইবে; নিজ নিজ-জীবনকে জোর করিয়া সংযমী হইতে হইবে, তাহা হইলে পুরু-পৌত্র আপনা-আপনি সংযম অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিবে। শিক্ষককে সংযমী হইতে হইবে, কর্ত্তাব্যক্তিদের, পরিচালকদের, সত্যবাদী হইতে হইবে, তবে জাতির জীবনক্ষেত্রে সকল সংপ্রবৃত্তির বীজ উপ্ত হইবে। দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শিক্ষাদাতা জগতে নাই, — দৃষ্টান্তের দ্বারা যাহা শিখা হয়, বক্তৃতার দ্বারা তাহা কখনই হইতে পারে না।

বঙ্গভাষা

[এই প্রবন্ধটি আমরা যে-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে লেখকের নাম নাই ; ঐ পত্রিকা হইতে আরেকটি লেখা ("কফি") আমরা সরকারে উদ্ধৃত করিয়াছি। খুব সম্ভব ইহার লেখক — শ্রীযুক্ত কালিদাসী মুখোপাধ্যায়। ইহাতে একশ্রেণীর সমালোচককে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে ; ইঁহারা ব্যাকরণ অভিধানের পণ্ডিতাদেরই কাব্যের হদ-বিচারে যোগ্য মনে করিতেন, এবং ভাষা সম্বন্ধে সংস্কারপন্থী ছিলেন। পরবর্তী যুগের ভাব ও ভাষার স্বচ্ছন্দতাকেও লেখক বিদ্রূপ করিয়াছেন। এখনে ফচির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, সমালোচনা প্রায় একই সুরে আছে, আগে ছিল পাণ্ডিত্যের আস্ফালন, এখন হইয়াছে বিশিষ্টজন অভিমতের উচ্চহাস।]

বক্তৃতা দুই প্রকার, চলিত ও সাধু। যে বক্তৃতার সাহায্যে আমরা মনের ভাব ব্যক্ত করি তাহার নাম — চলিত ভাষা। চলিত ভাষার — "কফি" "আফি" ইত্যাদি ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

যাহা চলিত ভাষা নহে তাহার নাম সাধুভাষা। সাধুভাষার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ৺চন্দ্রনাথ বসু। সাধুভাষার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"আমরা অনেকে বাসিমুখ না ধুইয়া, রাত্রি কাপড় না ছাড়িয়া, এমন কি শয্যা পরিত্যাগ না করিয়া চা, বিস্কট, রুটী, ডিম খাইয়া থাকি।"

এই স্থলে 'প্রভাতে' উহ্য না হইলেও, 'ধুইয়া' 'ছাড়িয়া' ও 'খাইয়া থাকি' এই তিন ক্রিয়ার সাহায্যে উহার সমুদয় রক্ষিত হইয়াছে।

এই দুই জাতীয় বক্তৃতার প্রত্যেকটি আবার 'দৃশ্য' ও 'শ্রব্য'-ভেদে দুই প্রকার। যখন পবন-পথে পরিচালিত হইয়া কর্ণপটহে আঘাত করেন, তখন ইনি শ্রাব্য, আর যখন মসীলিপ্ত হইয়া চক্ষুর পীড়া জন্মান তখন ইনি দৃশ্য। তন্মধ্যে শ্রবণের দুইরূপ — বক্তৃতা ও ছিত। ছিতে স্বরবর্ণ ও বক্তৃতায় ব্যঞ্জনবর্ণসকল প্রাধান্য লাভ করে। ছিত, যথা :—"আমি তো-ও-ও তো-ও-ও-ও যাচ্ছে-এ চাইনি-ই-ই-ই জীবনে তুমি অন্যায়-আচে-চ-এ-এ-এ-এ-ন্য-য়।"

বক্তৃতা, যথা :— "সভাপতি মহাশয় ও ভদ্র মহোদয়গণ, আমি বক্তা নহি, বক্তৃতা করা আমার কোন কালে অভ্যাস ছিল না, আমি অতি মন্দবুদ্ধি। অধিক আর কি বলিব, — আমি একটা গর্দভ। জানি না আজ এই বিরাট সভার মনে করিয়া কিরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। এখন সে কথা তুলায় থাক্। আমি বলিতেছিলাম, আজ আমার আনন্দের দিন। এতগুলি সুরসিক, সুশিক্ষিত, সুরুচি ব্যক্তিগণের সংসর্গে মনে আনন্দলহরি প্রবলরূপে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সহসা এই আনন্দচক্র পরিম্লান করিয়া চারিদিকে শোকের ঝড় বহিতেছে কেন! জানি কি তাই দাদাগণ, কেন এইরূপ হইল? হইল, তাহার কারণ আজ আমাদের বড় দুর্দিন। আজ আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রসিকলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। রসিকলাল বাবু পুরাতন। তাঁর — তিনি — আমাদের — তিনি স্কুলের জন্য — সর্ব্বসাধারণের — তাঁর — তাঁর অনেক গুণ, সে কথা এখন বলিবার বেলা বিড়ম্বনা, তাঁর স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অক্ষয়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এখনে আমরা এই স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিতে চাই। অতএব হে বন্ধুগণ, চাঁদা দাও।"

বক্তৃতা ও ছিত উভয়ের উদ্দেশ্য ও ফল একরূপ।

উদ্দেশ্য — উদ্যানে ও উদ্যমে। রামগোপাল, ক্ষেত্রচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, শচীন্দ্র ঘোষাই ঘণ, — আর নরোত্তম, রামপ্রসাদ, রজনীকান্ত,

দ্বিজেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ বল, সকলের ঐ এক উদ্দেশ্য, তুষ্টকে শাস্ত করা।

কল দ্বিবিধ, শ্রোতৃগত ও বক্তৃগত। শ্রোতৃগত কল — কর্ণকীটনুজ্জেন ও বুদ্ধিসঞ্চার। কর্ণকীটে আঘাতের প্রাবল্য বা অল্পতার উপর এই দুই প্রকার কল নির্ভর করে।

বক্তৃগত কল, —কীর্তি। বক্তৃতা করেন বা সঙ্গীত আলাপ করেন অথচ কীর্তিমান হন নাই এমন মানুষ ত দেখিতে পাই না। বক্তৃতা বা চিত্তের তারা যেমন হউক, রচনাশক্তি যেমন হউক, বিষয় ছাই-ভস্ম যাহাই হউক, কীর্তি অবশ্যম্ভাবী।

দুই বঙ্গভাষার দুইরূপ — গদ্য ও পদ্য। দুই সমাস্তরাল সরেখার ন্যায় সীমাবদ্ধ সংক্রিয়াদির নাম গদ্য, যথা : — "বুঝি, একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ, উনচল্লিশ, চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ।"

গদ্য দুই জাতীয়। বিস্তারক ও অনিস্তারক। যে গদ্যে দুই অনতিদূরবর্তী চরণের সোপান এক্যস্থাপক তাহা বিস্তারক। যথা : —

\ ভবুও কখন চরণে দলিল
রাজপ্রতিনিধি, রাজমন্ত্রিগণ। — হেমচন্দ্র।

যে গদ্য বিস্তারক নহে তাহাই অনিস্তারক। যথা : —

" এ কি একটা কথা হ'ল, বলনে!
গদ্য যদি
ঘরে অপমান সমস্তক্ষেত্রে ঘোরায়ে,
কাজরতা কেন তবে হবে বল দেখি মম
মনে আছি তড়িঘড়ি —
তারে কবি অন্তরঙ্গভাবে
গদ্য সহজ ঘরে বিতরণ
পারিতে কুরাবে বলনে?

বিস্তারক গদ্য আতত্ত বিস্তারক হইবে, এবং বিস্তারণ সহজ ও সুখপাঠ্য হইবে। যথা : —

" লোকলজ্জা ঘৃণা ভয় মা' বাপ নিষেধ হয়ে
আমার জন্যেতিনি অস্ত কারে সঁপিল।
অভাগার সঙ্গে আশা জন্মশোধ ঘুচিল।
হায়রে! প্রেমলাভ, দুর্বিষহ চাতকপ্রায়
যাইতে অতল জলে তৃষ্ণা বল বাড়িল;
দুরাশায় অভিলাষ অভিলাষ (ই) বাড়িল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার প্রাণপুত্তলি প্রতিমার,
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিত্রাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদবাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।
হায়, মনের কথা, আমার মেয়ের মতো
পরিতাপে অন্তর্দহনে প্রাণনাথ বলিল,
স্নেহের বাধা মন মরমেই রহিল।" — হেমচন্দ্র

গদ্য লিখিবার উদ্দেশ্য : —

১। অর্থোপার্জন। অর্থোপার্জনের উপায় দুইপ্রকার; শিখিতা বলিলে, বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষক প্রভৃতি দুই হইলে প্রথমোক্তের অর্থাগম হইয়া থাকে। গদ্যের আনা উপন্যাস ও সুখপাঠ্য সুরুচির পরিচয় ১৯'১৭০২ খানি এই জাতীয়।

২। অনিদ্রানিরাকরণ। প্রত্যেক উপন্যাস নামে অভিহিত না করিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দু' এক স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যথা, গোরা। এখানি উপন্যাস নামে প্রচলিত হইলেও অনিদ্রারোগে সঞ্জীবনীগ্রহের মতই অব্যর্থ।

পদ্য লিখিবার উদ্দেশ্য : —

১। আত্মতুষ্টি। লেখা শেষ করিতে পারিলেই আত্মতুষ্টি হয়। পদ্য শেষ করিতে পারা বড় সুখসাধ্য নহে। পদ্যের অর্থ গদ্যবৎ বলিয়া একটা পদার্থ আছে। ইহা লেখকের পরম বৈরী। গদ্যবৎ শব্দের অর্থ — সমাসবদ্ধ। অর্থাৎ পূর্বচরণে যদি চৌদ্দটি অক্ষর থাকে ও পরের চরণে গুণিয়া গুণিয়া ঠিক চৌদ্দটি

অক্ষর বসাইতে হইবে। এক-বেশি হইলে চলিবে না। ইহার নাম হুস্বোদ্গতা ভাষা। ইহা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। পরীক্ষাকর্ত্রী-মাত্রেই জানেন, অক্ষর-গুলাকে দাঁড়া অনেক সময়ে বড় বিপন্ন হইতে হয়, ছাত্রছাত্রীরা সর্পশিশুদের ন্যায় যেই তাহাদিগকে মুঠার মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা যায় অমনি তাহারা আঙুলের বাহির দিয়া পড়ে — পলায়, জিলাবী ইত্যাদি বানানের মধ্যে আটকাইয়া রাখা দুষ্কর হইয়া পড়ে। ইহার দৃষ্টান্ত : —

"হাতে লেখার নমুনা, লেখাই (ও) না করে
বিভীষিকা ভক্তদীর ছলে ভাসিয়ে।" — হেমচন্দ্র

২। ছাপার অক্ষরে সাদৃশ্য। অনেক অমূল্য পত্রে এতদ্‌তিরিক্ত আর কোনও উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় না।

৩। ঘটনার বিজ্ঞাপন। একটা ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা জানাইতে পারিলেই এই জাতীয় পত্র সার্থক হয়। নবীনাদের বিবাহ, হয়ত চাকরীর স্থানান্তর, ডিসমিস মাইচির জন্ম, মুহুরাজের তারতেশ্বর আগমন, বাঙালী পল্টনের প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি যে কোনও ঘটনা উপলক্ষে এইরূপ পত্র লিখিত হইয়া থাকে।

৪। বাসনারঞ্জন। মনোরাজ্যের একটী উপায় মৃত্যু। সর্বদেশে ও সর্বকালে এ কথা সত্য। কবিগণ মৃত্যুর পক্ষেই মনের মুকুট পরিধান করিয়া থাকেন। জীবদ্দশায় ইঁহাদের অনেকের ভাগ্যেই শিরোভূষণ বলি কিছু জুটিয়া থাকে ত গাধার টুপি।

কবির প্রকাশের উপায়, কথায় কথায় এক এক রসক বর্ণন। যথা : — "রবি পড়িতে পড়িতে উঠিল, উঠিয়া আবার পড়িল, আবার উঠিল, আবার পড়িল, আবার উঠিল, আবার পড়িল, পড়িয়া পড়িয়া আবার উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া উপরে চাহিল, চাহিয়া দেখিল আকাশে মেঘ হইয়াছে; চারিদিকে মেঘ, পাহাড়-প্রমাণ মেঘ, মেঘের উপর মেঘ, তাহার উপর মেঘ, আরও মেঘ, স্তরে স্তরে মেঘ, তাহার উপর মেঘ, তাহারও উপরে মেঘ, ইত্যাদি।" এ দৃষ্টান্তটি অসঙ্গত।

সহজকে দুর্বোধ ও বাক্যকে অবাক করিবার চেষ্টা, এবং বিস্ময়চিহ্ন ও dash-এর অজস্র প্রয়োগ দুরুহতার পরিচায়ক। "আমার ঘুমা মোর হইতেছে" — এই বাক্যে জড়ুতা প্রকাশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত দুই প্রকারে করা যাইতে পারে।

১ম। 'আমার ঘুমা একটা যেন অপূর্ণ, কি একটা যেন অবাক অভাব, একটা বিপুল শূন্যতা, একটা বিরাট হাহাকার, পরকে আত্মসাৎ করিবার মত একটা উৎকট আগ্রহ, একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা একটা যেন উপলব্ধি করিতেছি।"

২। "আমার! — অতিমার ঘুমা! — মোর — হইতেছে!" এই দুই প্রকার জড়ুতার প্রথমটী বাংলা নাটকে এবং দ্বিতীয়টি তরুণ-পাঠ্য নবেলের পাতায় পাতায় water hyacinth-এর মত অজস্র ফুটিয়াছে।

পদ্য ও গদ্যের সাধারণ গুণ :—

পদ্য ও গদ্যের একটি সাধারণ গুণ, অপরিতৃপ্ত-মনোহারিত্ব। বিলাতী কবি সেক্সপীয়রে এই গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কলেজের অধ্যাপক হইতে জনাদশ বাবুর বাজার সরকার পর্যন্ত সকলেই বলিবে "আহা! সেক্সপীয়রের মানবচরিত্র-চিত্রণ-নৈপুণ্য কি চমৎকার!" সেক্সপীয়রের কবিত্বে ইহারা সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু এরূপ মুগ্ধ হইবার জন্য সেক্সপীয়র পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মুগ্ধ হন নাই — কাউন্ট টলষ্টয়, তাঁহার কাছে সেক্সপীয়র কখনও অপরিচিত ছিল না — কে বলিতে পারে? যাহা হউক, এ পরীক্ষার আমাদের প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশেই অনেকগুলি অপরিচিত লেখকের অর্থই অপরিতৃপ্ত-মনোহারিত্ব আছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইহাদের লেখনীর অধিকাংশ অগ্রহায়ক থাকিলেও আমাদের মনোরঞ্জন করিতে থাকে। তাই বলিয়া সমীক্ষক না পড়িলেও ভাল লাগে এমন কথা আমি বলি নাই। দুইটি ঘোর গদ্য ও পদ্য উদাহরণ বর্জনীয়। গদ্যে আসল দুর্ঘোষাতা ; —

"ঐ যে গোক্ষুর শব্দিৎ, উহাই বিজ্ঞান-জগতের মূলধিত এক প্রকার জৈবন উপাদান ; আর উহাই ভিন্নর বিজ্ঞানজগতের জ্যোতিষ্কের ; সেই জ্যোতিষ্কের রশ্মিপুঞ্জ. সেই জ্যোতিষ্কের অবভাস পরিধিমণ্ডল সবই চাপাচুপি দিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ্কের কী ? না সূর্য্যের একাধিকা শব্দিৎ অর্থাৎ আত্মার্থাদা বুঝি। ঐ জ্যোতিষ্কের রশ্মিপুঞ্জ কী ? না মনোগত সংকল্পনা বা সংযোজনা। উহার অবভাস পরিধিমণ্ডল কী ? না ইহাদিগের বিষয়বৈচিত্র্য।"

উপরোক্ত অংশ আমি মধু গোক্ষুরকে শুনাইয়াছিলাম। সে ইহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। যাহা লোকে বুঝিতেই পারে না এমন লেখা লিখিয়া সুধিবীর ভার বৃদ্ধি করা এবং পাঠকের অমূল্য সময় নষ্ট করিবার আয়োজন করা অতি গর্হিত কার্য্য।

পদ্যে আসল দুর্ঘোষাতা :—

"আমি উন্মনা যে,
যে মধুর, আমি উদাসী।
মৌন্দর্য্যাকাশে অলস বেলায়,
তরুমর্ম্মরে ছায়ায় খেলায়,
কি মুরতি তব নীলাকাশচারী
নয়নে উঠে গো আভাসি।
ওগো মধুর, বিপুল মধুর, তুমি যাদুও
মোহন বাঁশরী,
কথে আমার কুহু কুহরি, সে কথা
যে যাই পাসরি।"

লোকে স্ত্রীসুখের জন্য, স্বজনসুখের জন্য, বিদেশিনী প্রেয়সীর জন্য উন্মনা হয়, উদাসী হয়, এই ত এতকাল জানা ছিল। এখানে দেখিতেছি এক ব্যক্তি সুখের জন্য উদাসী হইয়াছেন ! আমরা সুখের থাকিলেই উন্মনা হই, উনি ঘরে থাকিয়া সুখের জন্য উদাসী উন্মনা। উঁহার মানসিক অবস্থা আমাদের বোধশক্তির অতীত। তাহাও, তরুমর্ম্মরে, ছায়ায় খেলায় সুখের 'মুরতি' কিরূপে ফুটিয়া উঠে বলা শক্ত। তারপর, সুখের আবার বাঁশী বাজাইবে কি ! সুখের কি একটা মানুষ ? ওসবই কিছু বুঝিলাম না।

২য়। অশ্লীলতা। অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা হইতে পারে না, উহা সম্পূর্ণ রুচিসাপেক্ষ। আর যাহাই হউক, অশ্লীলতা আমরা কিছুতেই মার্জ্জনা করিতে পারি না। 'মহাভারত' অশ্লীল, এমন কথা শুনি নাই ; বরং উহাই দেখিতে পাই যে, অবৈধপ্রণয়ের সংস্রবের বিষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিদ্যা ও ব্রহ্মচারীর চিত্তকে মহাভারতের সুধাহ্রদে জর্জ্জরিত রাখার বিধি আছে। কিন্তু "টিয়াপাখা" উদ্ধারের অশ্লীল। বিশেষতঃ তাহার মধ্যে —

" — দিখা গলয় সরোজ
খসিয়া পড়িল সুখ বসনের মত
পয়োধরে."

— এই অংশ একেবারে মারাত্মক।

মঞ্জরীর স্বরূপ নির্দ্দেশ বর্ণনা করিয়াছি। উহার দোষগুণ সম্বন্ধে যে কয়টা মন্তব্য প্রকাশিত হইল তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে-কোন ব্যক্তি প্রবন্ধলেখার সমর্থ হইবেন। তবে যে বন্ধুবান্ধবগণ, আর বিলম্ব কেন ! এইবার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, লাজসরঞ্জাম লইয়া একবার লিখিতে আরম্ভ কর, একবার গদ্য ও পদ্যের তথাকথিত মঞ্জরীসুরের পৃষ্ঠদেশ কিলাকিত করিয়া ছাড়িয়া দাও। লিখিবার বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইও না। কারণ, গদ্যে বিষয় বিষবৎ বর্জ্জিত হইয়াছে, আমরা বিষবাষ্পের বিসর্জ্জন দিয়া

কেবল লিখিয়া যাইব। আমাদের লেখার কোন অর্থ দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় আমরা বলিতে চাহি : —
নাই থাকুক, তবুও লিখিব, অনর্গল লিখিব। কবি " জনমী বঙ্গভূমো, এ জীবনে চাহিনা অর্থ —"

যাকরণের ওজনিতে বুদ্ধি-জাতা পণ্ডা,
উঁচুই লোক যানাও নীচের লাহ বুদ্ধি সাত পণ্ডা।
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ তব বিশ্বোটক,
বাংলাভাষার কেউ তুমি নও, হাল, নয়ের কিম্বা বক।
শাস্ত্র পুঁথি ছুঁচে ছুঁচে করলে শুধু খাঁটপনা,
তথায় এসে টের পেয়েছি, পাওনি তুমি এক কণা।

— সত্যেন্দ্রনাথ

বাংলাভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৯শে শ্রাবণ ইংরেজশাসনাধীন ভারতবর্ষে "ডোমিনিয়ন" স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হয়।

তাহার কয়দিন মাত্র পরে বাংলার কোন রাজনীতিকের গৃহে দুই জন আগন্তুক বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সভিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। একজন বলিলেন, "এই সভিবেশনের সভিব ছয় জন বিদেশে গমন করিয়াছেন — অন্যান্য দেশের অবস্থা-ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন।" দ্বিতীয় ব্যক্তি একটু উষ্মার সহিত বলিলেন, "ওঁহারা যদি বিদেশ গমন না করিয়া থাকেন, তবে আমি ওঁহাদিগের শুদ্ধ বলিব; কারণ বিলাত-ফেরতদিগের দ্বারা আমাদিগের যত অনিষ্ট হইয়াছে, তত আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। যেন 'শুধু বৈদ্য নোক হইল বিদ্যার বিদ্যার'।"

শুনিয়া বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে 'আনন্দ মঠে' বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি মনে পড়িল — "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে — উহা অর্দ্ধেক ধর্ম মাত্র। * * * চৈতন্যদেবের কিছু শুধু প্রেমময় — দয়াময়ের কিছু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব — কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।"

মনে হইল দুইজনের কথাই সত্য — তবে উভয়ই অর্দ্ধেক সত্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন —

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া,
কতক্ষণ স্নেহ করি' দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

বঙ্কিমচন্দ্র দেশের ভক্ত ছাত্র পড় সকল পাঠককেই মুখর করিতে বলিয়াছিলেন এবং দেশ-বাৎসল্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"দেশ-বাৎসল্য পরম ধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বিরল ছিল। ইদানীন্তন লোকে আপন আপন গ্রাম, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত,—ইহা দেশবাৎসল্যের তুল্য নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিই, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী।"

১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ৭৩ বৎসর পরে ইংরেজের শাসন দেশে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে কোন ভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা উঠিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে কোন্‌টি সেই সম্মান লাভ করিবে? বোধহয় বিচার করিলে বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষার এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা — বঙ্কিমচন্দ্র। সেই জন্য 'বঙ্গদর্শনে'র কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"রামমোহন বঙ্গদেশকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন-দশা হইতে উদ্ধার করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আজ তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ চালিয়া সুরধুনী পলিদুর্ব্বিলা দেশকে করিয়া দিয়াছেন। আজ বাঙ্গালার কেবল মাত্র নদী বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্য-শ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদের মনের ভাব প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন —

"বাঙ্গালী তখন ইংরেজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরেজ অনেক গুণে গুণবান এবং অনেক সুখে সুখী। যদি তিন কোটি বাঙ্গালী রাতারাতি তিন কোটি ইংরেজ হইতে পারিত তবে সে মন্দ হিত না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কবি বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মত শিক্ষের গুরুস্বরূপ হইবে মাত্র, তাহা চিরকাল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ... ইংরাজী লেখক, ইংরাজী বক্তৃতা হইতে নবজন্ম লাভ করিব তখন খাঁটি বাঙ্গালীর সহৃদয়ের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত ভারতের বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষায় আপন অন্তর উক্তি সকল বিস্তার করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

এই মত অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কেবল আপনি বাংলায় আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করিতে থাকেন নাই — অপরকেও সেই কাজে প্রবর্তিত করিতে থাকেন। সেই সময়ে 'বঙ্গদর্শন'কে অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকসঙ্ঘ গঠিত হয়, তাহাকে 'বঙ্কিম-চক্র' বলা হইয়াছে। সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। রাজকৃষ্ণ বাবু প্রথমে যে কবিতা প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে তাহা গদ্যরূপে লিখিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে বহু পার্থক্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উপদেশ দিয়াছিলেন, বিষয়টি বিবেচনা করিয়া, অন্তর মত বিচার করিয়া প্রবন্ধটি নিজস্বরূপে রচনা করিতে হইবে। এইরূপ বহুসহকারে 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকশ্রেণীকে উপদেশ দিয়া তিনি লেখক গড়িয়া তুলিতেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রমেশ চন্দ্র দত্ত হয় মাসে কোন মাসিক পত্রে বাংলার সাহিত্যিকদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক ধারণার এ বিষয়ে একখানি গ্রন্থের অভাবের বিষয় উল্লেখ করেন। পরে তিনি ইংরেজীতে বাংলাসাহিত্যের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস রচনা করেন। সেই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহাকে বাংলা রচনায় প্রোৎসাহিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসা করিলে বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহাকে বাংলায় লিখিতে বলেন তখন তিনি তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার পিতৃব্য মনীচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির এবং মধুসূদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহাদিগের ইংরেজী কবিতা লোক ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু 'মেঘনাদ-বধ' যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে ততদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন, সেই উপদেশ তাঁহাকে বিশেষ রূপে প্রভাবিত করে, এবং ঐ ঘটনার অল্পদিন পরে তিনি 'বঙ্গবিজেতা' রচনা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র 'পত্রসূচনায়' লিখিয়াছিলেন, "বহুতর ইংরেজী চলা আবশ্যক, তাহার চলুক।" কিন্তু বিলাতে নিষ্ফলপূরী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় রাজনীতিকরা ইংরেজ হিতৈষীর মেরুদণ্ডে ইংরেজীকে যতদূর চালনা সম্ভব ততদূর চালাইয়াছিলেন। ফলে আমাদিগের কংগ্রেস ও জনকারেস দেশের জনসাধারণের সহিত সংযোগশূন্য হইয়া শক্তিহীন হইয়াছিল। বিদেশ হইতে যে গাছ আনা হয়, তাহা যেমন দেশের মাটীতে ও পরিবেষ্টনে সহজে সতেজ হয় না, ঐ সকল রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের তাহাই হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তিনি যখন রাজনীতিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই তিনি ম্যাটসিনীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ম্যাটসিনী ইটালীর তরুণ সম্প্রদায়ের সাহায্যে দেশের কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এ দেশের তরুণদিগকে তাঁহার বিপ্লবী আদর্শ যাচাই, আর সে আদর্শ গ্রহণ করাইবার

আরম্ভে বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত দেন নাই; পরে যাহাতে ইংরেজীতে অনভিজ্ঞগণও সেই আদর্শের পরিচয় পায়, সেইজন্য যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ও রজনীকান্ত গুহকে বাংলার ম্যাটসিনীর জীবনকথা ও তাহার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়োচনা দিয়াছিলেন।

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি তখনই উপলব্ধি করিয়াছিলেন — "যে উক্তি ইংরেজীতে হয়, তাহা করজন বাঙালীর হৃদয়ঙ্গম হয়?" কিন্তু তিনিও স্বীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে বাংলার প্রবর্তন করিতে পারেন নাই — বোধ হয় চাহেনও নাই। বাস্তবিক ১৯০৫-১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলন হয়, তাহার পূর্বে সেই অসাধারণ বাগ্মীর বাংলা বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য হইত না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে স্বীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের শেষে তিনি বাঙ্গালায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার ভৈষ্ণ ও ভাব-প্রকাশে জড়তার অভাব কাহারও মনোযোগ অতিক্রম করে নাই।

প্রাদেশিক সম্মিলন কংগ্রেসের পূর্বগামী। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সম্মিলনের অধিবেশনে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন — সম্মিলনের সহিত কংগ্রেসের প্রতিযোগিতা নাই, অনেক প্রাদেশিক ব্যাপার কংগ্রেসে বিবেচিত হইতে পারে না, এবং সেইজন্যই প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রয়োজন, তাহাতেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু তখন একদিকে যেমন কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানরূপে প্রবল হয়, তেমনই কেহ কেহ মনে করেন, লোকের মনোযোগ প্রাদেশিক সম্মিলনে আকৃষ্ট হইলে কংগ্রেস আবশ্যক মনোযোগে বঞ্চিত হইতে পারে। সেইজন্য কিছুদিন সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু সম্মিলনের প্রয়োজন বিশেষভাবেই অনুভূত হওয়ায় তাহাকে নূতন ভাবে পুনর্গঠিত করা হয়। স্থির হয়, এক একটি জিলায় এক এক বৎসর সম্মিলনের অধিবেশন হইবে — কেবল কলিকাতায় নহে। তাহাতে ভ্রাতৃপ্রেমেরও সুবিধা হইবে।

বৈকুণ্ঠনাথ সেনের আহ্বানে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে এই নবগঠিত বাষিক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। আনন্দমোহন বসু সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পরবর্তী অধিবেশন কৃষ্ণনগরে হয়। তাহার আয়োজন মনোমোহন ঘোষ করিয়াছিলেন। তিনিই স্থির করেন — যাহাতে সভাগত শ্রোতারাও প্রস্তাবাদি বুঝিতে পারেন, সেইজন্য প্রত্যেক প্রস্তাবে একজন বক্তা, সমর্থক বা অনুমোদক — বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। তিনি বলেন — দেশের জনসংখ্যার সহযোগী ইহা না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজ আমাদের দাবীতে কর্ণপাত করিবে না।

ইহার পরবর্তী অধিবেশন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নাটোরে হয়। সেই অধিবেশনে বাংলার অধিক আদর হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় স্বয়ং তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ করিবার পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুরোধে — সভাপতি — মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজী অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ করেন। অধিবেশনের কার্য বাঙ্গালাতেই সম্পন্ন হইবে এই প্রস্তাব হইলে, বাঙ্গালিদের বাঙ্গালা বক্তৃতা শোনাতে মুগ্ধ করিয়াছিল — তাঁহাদিগের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগরে অক্ষয়চন্দ্রের বৈজ্ঞের বাংলা বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। নাটোরের অধিবেশনে দ্বিতীয় দিন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হন। তখন তাঁহার প্রতাপ অতি প্রবল। তিনি সম্মিলনের কাজ সম্পূর্ণরূপে বাংলায় পরিচালনে আপত্তি করিলে আধার কৃষ্ণনগরের আদর্শ গৃহীত হয় — প্রত্যেক প্রস্তাবে একজন মাত্র বক্তা বাংলায় বক্তৃতা করেন। তবে সেই ব্যবস্থায় অধিক কাজ হয় নাই; তাহার ফলে বৃদ্ধিবলে অধিবেশন অসমাপ্তই রহিয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় এই অধিবেশনে

লালমোহন ঘোষের ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই উপস্থিত ছিলেন না। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্বদেশীয় রাজনৈতিক সম্মিলনের কার্য্যে কোন অধিবেশনে যোগ দেন নাই।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বাংলার প্রচারণে এই বিষয়ে মনে হইতেছে — তিনি বলিয়াছিলেন — বিলাত-ফেরতদিগের দ্বারা কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাই আর কাহারও দ্বারা হয় নাই — তাঁহার কথা অনেক সত্য।

কেবল সর্ব্বাংশসুন্দর সাহিত্য-সৃষ্টিই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না। দেশোদ্ধারের উদ্দেশ্যে জাতি সৃষ্টি করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য 'অনুশীলনে'র 'ধর্ম্ম' হইতে আহরণ করিয়া তাঁহার উপন্যাসে ও প্রবন্ধে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত। 'অনুশীলনে'র সূচনায় তিনি বলেন :—

"ইহা বলিতে পারি যে, ইংরেজ হইতে এ দেশের লোকের যা উপকার হইয়াছে, ইংরেজী শিক্ষাই তাহার প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরেজী ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল।"

তখন ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন — সুতরাং রাজপুরুষদিগকে বুঝাইবার জন্যও ইংরেজীর প্রয়োজন ছিল। আর —

"এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে : সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরেজীতে না বলিলে সমস্ত ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক-পরামর্শী, একোদ্যমী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। ঐকমত্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়, কেন না, এখন সংস্কৃত সুপ্রচার হইবার নহে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী — ইহাদিগের সাধারণ বিনিময়ভূমি ইংরাজী ভাষা। এই জন্যই ভারতীয় ঐক্যের প্রতি ইংরাজী শিক্ষিত হইবে।"

তখন এই প্রবন্ধ 'বিবিধ প্রবন্ধে' পুনর্মুদ্রিত হয়, তখন পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।"

তিনিই বলিয়াছিলেন, "কাহারও আকাঙ্ক্ষিত ফল নিষ্ফল হয় না।" তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত ফলও নিষ্ফল হয় নাই। অরবিন্দ তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া ও দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সেই কার্য্যের সাধনা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্বদেশী ও স্বরাজ-আন্দোলনের সময় কবিকে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরদা ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসিবার পূর্ব্বে অরবিন্দ বাংলাসাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন না, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু তিনি যে বাংলা সাহিত্যের সহিত কেবল সুপরিচিতই ছিলেন না, গভীর ভাবেই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ'-পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার সাতটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন : —

"When posterity comes to crown with her praises the makers of India, she will place her most splendid laurel not on the sweating temples of a place-hunting politician nor on the narrow forehead of a noisy social reformer, but on the serene brow of that gracious Bengali who never clamoured for place or power, but did his work, in silence for love of his work, even as nature does, and just because he had no aim but to give out the best that was in him, was able to create a language, a literature and a nation."

অরবিন্দের এই সাতটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ "উত্তরের" ইতিহাস বিচিত্র। অরবিন্দ অতি বিস্ময়কর প্রকৃতির ছিলেন। "ছিলেন" বলিলাম তাহার কারণ, তিনি শ্রীঅরবিন্দ হইবার পরে আমি তাঁহার কথা বলিতে পারি না। তিনি সর্বদাই যেন ভাবময় থাকিতেন; যোগাভ্যাস করিতেন; সংসারী হইয়াও তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন — সংসারের ভাবনা ভাবিতেন না; অর্থ চাহিত না, তিনি চিত্তার মগ্ন অবস্থায় 'বন্দেমাতরমের' জন্য 'মিট স্পিরিট' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন — সংসারের ভাবনা অবিবাদ্য ভট্টাচার্য্যের। সেই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি সংস্কৃত নাটকাদির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং বহু কবিতা লেখাও করিয়াছিলেন। সে সকল প্রকাশে তাহার কোনরূপ আগ্রহ লক্ষিত হইত না। তিনি পরবর্তীকালে অবাঙালী বিদ্বান লোককে শিক্ষাদান করিবেন, তিনি যে সেই-সকল রচনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, সে সকল প্রকাশিত হউক বা না হউক তাহাতে তাঁহার কোন ইষ্টাপত্তি নাই। বোধ হয়, স্থানপরিবর্তন ও পুলিসের "মনোযোগে" সে সকলের অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার হইবার কয়দিন পরে তিনি বরদা হইতে তাহার কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করিয়া বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ'-পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন বোম্বাই নগরে ভারতীয়দিগের উপযুক্ত সংবাদপত্রের অভাব ছিল এবং অল্পদিন পরে কিরোজশা মেটা-প্রমুখ ব্যক্তিরা সেই অভাব দূর করিবার জন্য 'বম্বে ক্রনিকল' প্রতিষ্ঠিত করেন। অরবিন্দ যখন 'ইন্দুপ্রকাশে' ঐ সকল প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন — বোধ হয় — নারায়ণ চন্দ্রাবরকর তাহার সম্পাদক ছিলেন। তখন বোম্বাই প্রদেশে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অসাধারণ সম্মান ও প্রভাব। তিনি হাইকোর্টের জজ, সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের কাজ করিতে পারিতেন না। কিন্তু কংগ্রেসের অন্তরালে যে সমাজ-সংস্কার-সমিতির হইত, তাহা তাঁহাকে করিয়া বাহিরে কংগ্রেস সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন। অরবিন্দের মতন তাঁহার তীব্র ও দর্পক দৃষ্টি অধিকার করে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কংগ্রেস শক্তি সঞ্চয় করিবার পূর্বেই যদি তাহার কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চতর যুক্তিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তবে কংগ্রেসের পক্ষে শক্তিসঞ্চয় করা সুকর হইবে। সেইজন্য তিনি 'ইন্দুপ্রকাশ'-সম্পাদককে ঐ লেখকের কংগ্রেস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশে বিরত হইতে বলেন। সম্পাদক তাঁহার কথা অনেক মানিয়া প্রবন্ধ বন্ধ করেন। বহুদিন পরে, অরবিন্দ দক্ষিণ রক্ষণনীতি-চর্চা ত্যাগ করিয়া, পণ্ডীচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পরে ঐ পত্রের গুজরাটী কিস্তীশচন্দ্র সেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হইয়া অরবিন্দের রাজনৈতিক-সম্বন্ধীয় ঐ সকল প্রবন্ধের উদ্ধার করিতে মনোযোগী হইয়া 'ইন্দুপ্রকাশের' পুরাতন সংখ্যাগুলি অনুসন্ধান করেন। সেই সময় তিনি লেখেন, "বাঙালী" পত্রিকায় কোন লেখক ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশে' সাতটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন — সাতটী প্রবন্ধের শিরোনামা —

১। যৌবন ও কলেজে পড়াশুনা
২। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গের আলাপ
৩। সরকারী চাকরী
৪। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা
৫। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র
৬। বাঙ্গালার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য
৭। আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা

সেই সময়ে বোম্বাই নগরের সংবাদপত্রে যে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—কৌতূহলবশে যেন মহাশয় তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং প্রবন্ধগুলির মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া লেখক যে তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হন। তিনি জানিতে পারেন, সেই সকল প্রবন্ধের লেখক — অরবিন্দ। তাঁহার চেষ্টায় যে প্রবন্ধগুলির 'উদ্ধার' হইয়াছে, সেজন্য

তিনি বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে অতি অল্পবয়সে লেখনী ধরিয়া দেশোদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়োদ্দীপক। সে সম্বন্ধে অনেকে লিখিয়াছেন, বাংলা কেবল ইঙ্গবঙ্গদের। তাহাতেই উদ্বেগ করিয়া অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন :—

"All honour then to the women of Bengal, whose cultural appreciation kept Bengali literature alive. And all honour to the noble few who with only the women of Bengal and a small class of cultured men to appreciate their efforts, adhered to the language our forefathers spoke, and did not sell themselves to the tongue of the foreigner. Their reward is the heart-felt gratitude of a nation and an immortal renown.

তিনি আধুনিক বাঙালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্বেগ ও উদ্বেগ আশার পূর্ণ-বিকাশস্থল। বঙ্গদেশের আধুনিক চিন্তা তাঁহাকে সংগঠিত করিয়াছে, তিনি সেই চিন্তাকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়াছেন—আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকল সম্প্রদায় বাঙালীর হৃদয়ে বিস্তার করিয়াছেন।

—'বঙ্কিমচন্দ্র', ভূমিকা পৃঃ।

নর্ত্তকী

(জাপানী গল্প)

[Lafcadio Hearn-এর ইংরাজী হইতে। পৃথিবীর একখণ্ড ছোট্ট গাছের মধ্যে যে গল্পটি ফুল পাইবার মেলা। রূপ, রং ও রসের একটি ছবি অমন সুকোমল মধুরভাবে ইহার মনোরঞ্জিনের কারণ। অনুঃ]

পূর্ব্বকথা :—পূর্ব্বকালে জাপানী চিত্রকরদের শিক্ষা-লাভ হইত নানান রকমে। কেহ বা পাহাড়ে ঘুরিয়া পরিভ্রমণের দ্বারা; সেখানে যত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, যত পুরাতন বৌদ্ধ-মন্দির ও তাহাদের ভিতর-বাহিরের যত কারু-কার্য্য — সেই সকলই বারবার দেখিয়া মনে ও চোখে চিত্রিত করিতে হইত। এই সকল চিত্রে আমরা শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির ছাপও পাই; কোন এক বিশেষ অনুভূতি, কোন বিশেষ স্থানে, একটি বিশেষ ক্ষণে তাহার মনে যে বিশেষ ভাবটির উদয় হইয়াছিল, চিত্রে তাহাই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এরূপ চিত্রাবলীতে অবশ্য অনেক ত্রুটীও কিছুও থাকে, তাহাতে আমাদের চিত্তে একটি অনভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়, একটা এমন কিছুর চকিত আভাস ফুটিয়া উঠে যাহা আমাদের সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে তৃপ্ত হইতে দেয় না। জাপানী চিত্রকর যাহা চিত্র করে তাহা হয়ত বাস্তব-চিত্র নহে — স্মৃতি ও ভাব-জগতের বস্তু, যদিও তাহাতে একটা বাস্তব স্থান-কাল-পাত্রের গূঢ় রস-সংকেতও ফুটিয়া উঠে। এই জন্য, যাঁহারা ঐ দেশ এবং ঐ সকল দৃশ্য দেখেন নাই তাঁহারা জাপানী চিত্রশিল্পীর এই যাদুশক্তির সম্যক বাহবা করিতে পারিবেন না। এই গল্পটিতে তাহার প্রমাণ আছে।

(১)

সে অনেকদিনের কথা। একজন শিকারী হঠাৎ চিত্রকর পার্শ্বস্থানাথে পথে হাটিয়া ফিরোহা হইতে ইয়েদো-শহরের দিকে চলিয়াছিল। সেকালে রাস্তা বেশি ছিল না, যাহা ছিল তাহাও দুর্গম। শেষটায় সাধারণ চেহারা আধিকার মতই ছিল; ঠিক এমনই পাইন ও সিডার-গাছের বন, এদের পাহাড়ের মাথায় মাথায় গ্রাম, বাড়ীগুলি খড়ে-ছাওয়া; একটার উপরে আরেকটা, যেন খাকে-থাকে ধানের ক্ষেত, তাহার মধ্যে কাহার উপর দুটিয়া চলিয়াছে — মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা-হলুদবর্ণের প্রকাণ্ড বোঝা। পথের পাশে সর্ব্বত্র শিন্তো-দেবতার মূর্ত্তি, — তাহাদের সম্মুখ দিয়া, আজিকার মতই, যাত্রীর দল তীর্থ-মন্দিরে গমন করিত।

মুরকের এ সকলই জানা ও দেখা আছে, তাহার এই দেশভ্রমণ নূতন নয়। তবু একদিন সন্ধ্যাকালে সে এমন এক স্থানে পৌঁছিল যেখানকার দৃশ্য দেখিয়া মনে হয় না যে, নিকটে কোথাও আহিবাস বা আহারের উপায় হইবে: চতুর্দ্দিকে কোথাও ঘরের ছুটি দেখা যায় না। স্থানটা তাড়াতাড়ি পার হইবার জন্য পথসংক্ষেপ করিতে গিয়া সে একেবারে পথ হারাইয়া ফেলিল।

মুক্ত আকাশের নীচেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে এইরূপ স্থির করিয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, সে যে-পাহাড়টার উপরে উঠিয়াছে তাহার বিপরীত দিকে, ঢালু ভূমির একস্থানে একটিমাত্র পুঁচে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে — নিশ্চয় কোন বাড়ীর;

সেই দিকে পা চালনা করিয়া নিকটে আসিয়া দেখিল, একটা কুটীর বটে—তবে ভগ্নপ্রায় হইবে। একটি-মাত্র দরজার সামনে একটু ঠাঁই দিয়া সেই আলোর রেখা তখনও বাহির হইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ দ্বারে করাঘাত করিল।

(২)

অনেকবার করাঘাত এবং ডাকাডাকি সত্ত্বেও প্রথমে কোন সাড়া মিলিল না; পরে ভিতর হইতে একটি স্ত্রীকণ্ঠ ক্ষীণ স্বরে শোনা গেল—"কি চাই?" কণ্ঠস্বর যত মিষ্ট, আরও বিস্ময়ের কারণ—তাহার উচ্চারণ ভদ্রলোকের ঘরে, রাজধানীর মার্জিত ভাষার। উত্তরে যুবক জানাইল, সে একজন হাজ, পাহাড়ের মধ্যে পথ হারাইয়াছে, রাত্রিটার জন্য একটা বিশ্রাম-স্থান ও কিছু খাদ্য পাওয়া যাইবে কিনা—না শোনে, সবচেয়ে নিকট গ্রাম কোনদিকে ও কতদূর তাহা বলিয়া দিলেও উপকৃত হইবে; ইহাও বলিল যে, পথ দেখাইয়া দিবার যদি কেহ থাকে তাহাকে সে বকশিস দিবে।

কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, উত্তর শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন—যুবক কেন্দ্রিজ হইতে কোন্‌প্রকারে ঐ কুটীরে পৌঁছিয়াছে, তাহা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু আরও দুই একটি প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া বোধ হয় বিশ্বাস হইল, তাহার শেষে বলিলেন, "আমি এখনই আসিতেছি; আজ রাত্রে কোন গ্রামে পৌঁছিবার চেষ্টা না করাই ভালো, পথ অতিশয় বিপদসঙ্কুল।"

একটু পরে সেই একটি দ্বার ঘর্ষিত হইয়া খুলিয়া গেল। রমণীর হাতে একটি লণ্ঠনের লাম্প—প্রথম দর্শনে বলিয়া আছেন যে, তাহার আলো অতিথির মুখেই পড়িয়াছে, নিজের মুখ অন্ধকার। সেও কাল করিয়া তাহার মুখ মিটীক্ষণ করিয়া রমণী বলিলেন "একটু অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি।" একটু পরেই পথশ্রমক্লান্তের জন্য একটি জলপাত্র লইয়া আসিলেন, দরজার চৌকাঠের উপরে তাহা রাখিয়া যুবকের হাতে একখানি তোয়ালে দিলেন। যুবক পাদুকা খুলিয়া পায়ের ধূলাকাদা ধুইয়া ফেলিল, তারপর যে ঘরখানিতে প্রবেশ করিল—ঘরটী বলিতে সেই একখানি ঘর—খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনখানে একটু ময়লা নাই; পিছনের দিকটায় কাঠের মেঝে একটু উঁচু-করা, সেইখানেই শয্যাদি রহ। গৃহস্বামিনী একখানি 'জাজিম' (সূতী-গালিচা) পাতিয়া দিলেন, যুবক তাহার উপরে হাঁটু মুড়িয়া বসিল; তাহার সম্মুখে একটি পিতলের অর্ঘ্যপাত্রও রক্ষিত হইল।

এতক্ষণে স্ত্রীলোকটিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ মিলিল। তাহার রূপ দেখিয়া যুবক চমকিত হইল; বয়স তাহার অপেক্ষা তিন কি চারি বৎসর অধিক হইবে, এখনও পূর্ণ যৌবন। তাহার ঘরের মেয়ে নয়—নিশ্চয়। সেই অপূর্ব মধুর কণ্ঠে রমণী তাহাকে বলিলেন, "আমি একা থাকি, কোন অতিথি অভ্যাগত আমার সুখে স্থান পায় না। কিন্তু আজ রাত্রে আপনি আর কোথাও গেলে প্রাণের আশঙ্কা আছে। কিছুদূরে কয়েক ঘর কৃষক আছে বটে, কিন্তু আপনাকে পথ দেখাইয়া দিবে কে? এই জন্য আমি আপনাকে আজ রাত্রি-প্রভাত পর্য্যন্ত আশ্রয় দিতেছি। আপনার কষ্ট হইবে, কিন্তু একটা বিছানা আমি আপনাকে দিব। আপনার ঘোড়ার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, আমার ঘরে মাত্র কিছু 'গ্রুয়েল বিওরি' * আছে—সুখাদ্য নয়, কিন্তু আমি সাদরে তাহা নিবেদন করিতেছি।"

* একরূপ নিরামিষ খাদ্য—বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর আহার।

পথিকের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, ঐ আহারের প্রস্তাবেই সে প্রফুল্ল হইল। তখন তরুণী গৃহকর্ত্রী একটি ছোট আগুন জ্বালাইয়া নীচের কয়েকটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন; একটি বাটিতে মোটা চাউলের ভাত ও সেই-বাটিগুলি অতিথির সম্মুখে স্থাপন করিয়া আতিথেয়তার ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে বলিলেন। আহার কালে অতিথির সহিত আর একটি কথাও কহিলেন না, তাহাতে যুবক একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সে মাঝে মাঝে দুই একটি যে প্রশ্ন করে, ঐ তরুণী কখনো একটু মাথা নাড়িয়া, কখনো বা একটি মাত্র কথায় তাহার উত্তর দেয়। যুবকটি আর আলাপের চেষ্টা করিল না।

এই অবসরে যুবক ঘরখানির ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। কোনোখানে একটু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্নমাত্র নাই, সব ঝকঝক তকতক করিতেছে। কেরোসিন ও রৈজলাদি রাখিবার টোলগুলি সাদা কাগজের তৈয়ারী, তাহাদের গায়ে সুন্দর করিয়া কালো চীনা-অক্ষরের সারি; ইহাও একরূপ শিল্পকর্ম; যে সকল ঘর কবি ও চিত্রকরের প্রিয়, ঐ অক্ষরগুলিতে তাহারই সঙ্কেত আছে, যথা — বসন্তের পুষ্পরাজী, পর্ব্বত ও নদী, নিশাথের বৃষ্টিধারা, আকাশ ও তারকাপুঞ্জ, শালবৃক্ষ, নদীস্রোত, পক্ষীর নদীস্রোতোক্রম, প্রভৃতি। ঘরের একপাশে একটি নীচু বেঞ্চীর মত রহিয়াছে, তাহার উপরে একটি 'বুংডুলান,' — তাহার মালার-তৈয়ারী ছোট ধরণা দুটি খোলা রহিয়াছে, কিন্তুর দুত প্রিয়জনের একখানি মূর্ত্তি-ফলক দেখা যাইতেছে। সেই বুংডুলানের সম্মুখে একটি বাতি জ্বলিতেছে, বাতিটি ঘেরিয়া একরাশি বনফুলের নৈবেদ্য। পুষ্পাবেদীর উর্দ্ধে, সূত্রের বেষ্টনীতে একখানি ছবি, নিতান্ত সাধারণ সস্তা ছবি নয়; ছবিখানি 'কল্পা'-দেবীর, তাহার মাথার পশ্চাতে কিরণ-কিরীটের মত সূর্য্যচক্র আঁকা রহিয়াছে।

যুবকের আহার শেষ হইলে, রমণী তাহাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে ভাল বিছানাও দিতে পারিব না, একটি কাপড়ের বস্তা মাত্র আছে। ঐ বিছানা আর ঐ বস্তাটি আমিই ব্যবহার করি। কিন্তু আজ রাত্রে আমার অনেক কাজ, ঘুমাইবার সময় পাইব না, অতএব আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাতেই ঘুমাইবার চেষ্টা করুন; আমি আপনার আরামের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলাম না।"

যুবক তখন বুঝিতে পারিল, কোন এক অজ্ঞাত কারণে ঐ নারী অতিশয় একা ও নির্জ্জনবাসিনী। আজ কেবলমাত্র ঘরের ঘরে সে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, একমাত্র শয্যাও তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছে।, সে আপত্তি করিল, এত ঘর সে চাহে না, একটু বেশী হইয়া পড়িতেছে — মেঝের উপরে একটা আস্তরণ সে শয়ন করিবে, মশার ভয় সে করে না। তখন সেই রমণী তাহাকে ছোট্ট রাণীর মত আদেশের ভঙ্গিতে সেই শয্যায় শয়ন করিতে বলিলেন। তাঁহার সত্যই একটা কাজ আছে, আর কোন কথিল চলিবে না, এইবার তাঁহাকে বিদায় দিতে হইবে; অতএব তিনিও অনুরোধ পালন করুন, নতুবা তাঁহার অসুবিধা করা হইবে। অগত্যা যুবককে তাহাই করিতে হইল। গৃহকর্ত্রী মেঝের উপরে একখানি চোকস পাতিয়া তাহাতে একটা কাঠের বালিশ রাখিলেন, পরে একটি কাপড়ের বস্তারি টানিয়া নিলেন। সবশেষে সেই বুংডুলানের দিকে, ঘরের অপরাংশ আড়াল করিয়া একটা পর্দা টানিয়া দিয়া এমন ভাবে বিদায় লইলেন যে, যুবকটি এখনই শয্যাগ্রহণ করে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

এইরূপ ভাবে পরের অসুবিধা করিয়া নিজে আরাম করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও যুবক ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ করিল; সে এত ক্লান্ত হইয়াছিল যে, কাঠের বালিশটার মাথা রাখিবা মাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

...ন, সহসা দুয়ারের — যেন সমস্ত একটা অন্ধকার পথে তাহার বুক কাঁপিয়া গেল। ...কটা যেন তাহার পায়ের শব্দ, যেমন ছন্ন তেমনই উৎকর্ণ পুনঃ ... হইল, ঘরে তাহার প্রবেশ করে নাই। তাহার নিজের জন্য কোন ভয় নাই, কারণ ...রোধের কিছুই নাই। কিন্তু যে সন্দেহে ঘরের ... সে আসিয়া নিশ্চয়ই তাহার যদি কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে? প্রথমে সে চীৎকার করিতে চাহিল, ... হইতেই মনে হইল, স্বামীকে আসন্ন বিপদ হইতে ... তাহার নিজের উপস্থিতি এখন না জানানোই ...

তাহার পর, যদি কাহাকে পাঠিয়া থাকে, ... তাহাকে কোন লাভ হইবে না। তাহার ... পাশে দুইটি ছোট ছোরা ঝুলানো ছিল — ... ছোরা দুইটি নাই। তাহার চিন্তার ... চারিদিকে দেখিল, বাহিরের সেই পাখা ... আড়াল করিয়া রাখিয়াছে — ... কিছু হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। ... সেই একই রকম নিস্তব্ধ, নিশ্চল। ... অন্ধকার। ... ঘুমন্ত আর স্থির থাকিতে পারিল না। ... ঘুমন্ত ... করিবার জন্য সকল বিপদ তুচ্ছ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তখন নিজের কাপড় ভাল করিয়া আঁটিয়া সে নিঃশব্দে ... ধীরে বাহির হইয়া আসিল, তার পর ধীরে ধীরে পর্দার কিনারাটি তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেই যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

সেই দৃশ্যপটের চারিদিকে বাতি জ্বালাইয়া, এবং অল্পরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সেই নারী তাহার সম্মুখে কী নৃত্য করিতেছে! আবার সেই পক্ষিরাজ দেখিয়া যুবক বুঝিতে পারিল, সে ওস্তাদ 'শিরাজবাই বলি' — যদিও সাধারণ নর্তকীর পোষাক অপেক্ষা এ পোষাক বহুগুণে মূল্যবান। একে অন্ধকারের সুন্দরী, তাহার উপর, ঐ নির্জন স্থানে, রাত্রিকালে, ঐরূপ আলোকে তাহার রূপ যেন অমানুষী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তদপেক্ষা বিস্ময়কর তাহার সেই নৃত্যকলা। সহসা একপ্রকার ভয়ে তাহার সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গ্রামের ছেলেবেলার যত সে সকল গল্প একটির আছে — সেই 'শিরাজ-বাজিনী' প্রভৃতির কথা — তাহার মনে পড়িল। কিন্তু, পরক্ষণে সম্মুখে পুতুলাবলী ও বেত্র-বেণীর মূর্তি দেখিয়া তাহার ভয় দূর হইল, মনে মনে লজ্জিত হইল। সেইসঙ্গে ইহাও মনে পড়িল, এইরূপ পুতুলাবলী দেখা অভিনয় গঠিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় তাহার আরব্যলাভীয় অভিপ্রেত নয়। কিন্তু ঐ দৃশ্য যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তাহার চলৎশক্তি হরণ করিয়াছিল, সে যেমন বিস্মিত তেমনই কৃতার্থ বোধ করিতেছিল। এমন বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা সে পূর্বে কখনও দেখে নাই, এমন রূপবতী নর্তকী আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। যতই দেখিতে লাগিল ততই সেই নৃত্যের অনাস্বাদিত কলাকৌশল তাহাকে যেন আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। সহসা নৃত্য বন্ধ হইল, নর্তকী যেন আর নিশ্বাস লইতে পারিতেছে না; কটিবন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া সে যেমন মুখ ফিরাইয়া তাহার উর্ধ্বাঙ্গের বসন খুলিতে যাইবে, অমনি যুবকের উপরে চোখ পড়িতেই সে অভিসারার মতো উঠিল।

যুবক তখনই অন্নদার কাছাকে সকল কথা বলিল; তাহার নিদ্রাভঙ্গের কারণ, তাহার ভয় ও দুশ্চিন্তা, শেষে তাহার দুর্ঘটনা ও উদ্ধারের কথা — সবই অকপটে তাহাকে বলিল। শেষে অনুচ্চস্বরে কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে আরও বলিল, তাহার বড়ই জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি কে — কেমন করিয়া নৃত্যকলায় এমন আশ্চর্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। সান্ত্বিও-সহায় বড় বিদ্যার নর্তকী

---

* প্রাচীন কালের এক শ্রেণীর নৃত্যগীতনিপুণা ভাসমানী নর্তকী।

আছে, সে তাহাদের সকলেরই মুখ দেখিয়াছে, কিন্তু এমন মুখ আর কোথাও দেখে নাই। তাই একবার দেখিতে আরম্ভ করিয়া সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারে নাই।

নর্ত্তকীর মুখে প্রথমে যেন অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল, পরে সব ভুলিয়া সে-তার পরিবর্ত্তিত হইল। সে বলিল, "মা, আমি রাগ করি নাই, কিন্তু এইরূপ লুকাইয়া দেখার জন্য দুঃখিত হইয়াছি, কারণ, মুখ খুবই ভাল দেখাল, ঐরূপ অবস্থায় তাহা দেখিলে যে-কেহ আমাকে পাগল বলে করিবে। অতএব, এখনই তোমাকে ইহার কারণ বলি।"

এইবার সে তাহার কাহিনী শুনাইল। তাহার নাম—যে-নামে সে নর্ত্তকী-রূপে সমাজে পরিচিত ছিল—সে নাম অতি বালক-বয়সেই ঐ যুবক শুনিয়াছিল। সেকালে সে-নাম রাজধানীতে কে না জানিত? গুণিজ-সমাজে এই নর্ত্তকীর সমকক্ষের অবধি ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন সেই খ্যাতি ও পূর্ণ যৌবনের কালেই, সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, ক্রমে তাহার সেই নামও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। নর্ত্তকী বলিল, এক যুবকের প্রেমে সে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল, সে ঐশ্বর্য্য কিছুই তাহার আর ভাল লাগিল না—সকলই সে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া গেল। তাহার প্রেমী বড় দরিদ্র ছিল, তবু উভয়ের সামান্য সম্পত্তি বিলাইয়া, দূরে পল্লীগ্রামে তাহাদের সন্ধানে চলিয়া যাইত। নির্জ্জন পার্ব্বত্য-প্রদেশে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দুইজনে বড় সুখে কয়েক বৎসর কাটাইল। যুবক তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল-বাসিত, তাহার সবচেয়ে সুখের বস্তু ছিল—সে ফিরিয়া সেই নূতন, আর কোন কামনা তাহার ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সে তাহার 'সারিন্দে' (সেতার) লইয়া প্রিয়-সঙ্গীতগুলি বাজাইত, নর্ত্তকী তাহার সহিত সঙ্গত করিয়া নৃত্য করিত। এমনি করিয়া সকল দুঃখ সুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একদিন সেই আর যায় না, বড় কঠিন সেই; সেই সেই সঙ্গ করিতে সে পারিল না তাহার প্রেমী অসুখে পড়িল, বহু শুশ্রূষাতেও বাঁচিল না। সেই হইতে ঐ রমণী অতিশয় নির্জ্জনে বাস করে। দুঃখ বিস্মরণকে গ্রহণ করিয়া—তাহার আত্মাকে প্রেম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার যত অনুষ্ঠান আছে—সে তাহা পরম নিষ্ঠার সহিত পালন করে। প্রতিদিন সে তাহার মৃত্তি-ফলকটির সম্মুখে পুষ্প-চন্দনের সাজাইয়া দেয়, প্রতিবারে সূর্য্যের ছায় সে তাহার সম্মুখে নৃত্য করে। পথিক আজ যাহা দেখিয়াছে তাহার মর্ম্ম ইহাই। যাহাতে অতিথির নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সেজন্য সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল, নৃত্যকালে অতি ধীরে পদক্ষেপ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। এজন্য সে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

কাহিনী শেষ হইলে, রমণী অতিথির জন্য একটু চা প্রস্তুত করিয়া এবারে পান করিল। তাহাকে পুনরায় নিদ্রা যাইবার জন্য তাহাকে এমনই অনুনয় করিল যে, যুবক অগত্যা আবার সেই তাপহরের অপরিচ্ছন্ন মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

এবার আর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না। যখন জাগিল তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বরাত্রের মত তাহার জন্য তেমনই সমারোহ সকলের খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। যুবকের ক্ষুধা পাইয়াছিল, তথাপি পাছে ঐ দরিদ্রা নারীর আহার-বই হয়, এই ভাবিয়া অতি অল্পই আহার করিল। এইবার বিদায় লইতে হইবে। সে যখন তাহার আহার ও শয্যাদানের মূল্য-স্বরূপ গৃহস্বামিনীকে কিছু দিতে চাহিল, তখন সে তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি যাহা করিয়াছি তাহা অর্থের জন্য নয়, স্বামীর মনস্তুষ্টি হইয়াই করিয়াছি। যাহা দিয়াছি তাহা এতই সামান্য যে তাহার মূল্যই বা কি! একমাত্র প্রার্থনা, আপনি যে কষ্ট পাইয়া গেলেন তাহা ভুলিয়া কেবল ইহাই

যান রাখেন এবং অতিথির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ তাহার সম্মানের আয়োজন করিয়াছিল।"

যুবক যেন হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। তাহার মনের গোপনে একটা দ্বন্দ্ব বহিয়া গেল — সে ঐ রমণীর কানে মুখ দুইটা বলিতে পারিল না যে, তাহার সেই রূপ ও যৌবনের জন্য তাহাকে কেহ মুগ্ধ করিয়াছে, সে কথা আর কাহারও কাছে সে বলিতে পারিবে না।

রমণী তাহাকে তাহার পথ দেখাইয়া দিল, এবং যতক্ষণ না সে পাহাড়ের নিম্নদেশে অদৃশ্য হইয়া গেল, ততক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল।

গ্রামে একঘণ্টা চলিবার পর যুবক বড় রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। তখন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় তাহার আপশোষ হইল — সে সেই রমণীকে নিজের নাম তো বলে নাই! একবার ভাবিল, ফিরিয়া যাইবে কি না, কিন্তু তখনই আপন মনে বলিয়া উঠিল, "কাজ কি! আমি তো চিরদিন এমনই পথিক থাকিব।" এই বলিয়া সে আবার পথ চলিতে লাগিল।

(৩)

কত বৎসর কাটিয়া গেছে, ইতিমধ্যে কত নূতন ফ্যাশন উঠিয়াছে ও গিয়াছে। সেই তরুণ চিত্রকর এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার অপূর্ব্ব চিত্রকার্য্যে মুগ্ধ হইয়া কত ধনী ও অধিরাজ, কত রাজপুরুষ তাহাকে অর্থ ও উপঢৌকন দিয়া পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিয়াছে। এজন্য এখন তাহার ধনৈশ্বর্য্যের সীমা নাই, জাপানের শ্রেষ্ঠ নগরী, যাহার নাম 'সম্রাট-পুরী', সেইখানে একটি মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সে বাস করিতেছে। কত দেশ হইতে কত চিত্রশিল্পী আসিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, এমন লোক নাই যে তাহার নাম শোনে নাই।

একদিন তাহার সেই প্রাসাদদ্বারে এক বৃদ্ধা আসিয়া দাঁড়াইল, গৃহস্বামীর সহিত দেখা করিতে চায়। তাহার দীন-হীন মূর্ত্তি ও মলিন বেশ দেখিয়া, একজন সাধারণ ভিখারিণী মনে করিয়া, দ্বারী তাহাকে অতিথির জন্য তাহার বিশ্রাম করিয়া দিল, বলিল, তাহার মনিব গৃহে নাই, সার্ব্বভৌম-সম্রাটের নিমন্ত্রণে, কবে ফিরিবেন, তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু বৃদ্ধা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, প্রতিদিন আসিয়া গৃহস্বামীর সন্ধান লয়, এবং প্রতিবারে একটা না একটা মিথ্যা কথা শুনিয়া ফিরিয়া যায়। তথাপি সে প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে আসে, তাহার হাতে কৈয়া কাপড়-ঢাকা একটা কিসের পুঁটুলি। তখন তৃতীয় তাহার কথা প্রভুকে না জানাইয়া পারিল না। মনিব সে কথা শুনিয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন, বলিলেন, এতদিন তাঁহাকে বলা হয় নাই কেন? এই বলিয়া তিনি নিজে বাহির হইয়া ফটকের নিকট গেলেন, বৃদ্ধাকে দেখিয়া অতিশয় সম্ভ্রম করে, সে কি চায়, জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা বলিল, সে অন্য বা অর্থ কিছুই প্রার্থনা করে না, সে কেবল একখানি ছবি আঁকাইয়া লইতে চায়। শুনিয়া সেই বৃদ্ধ চিত্রকর একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। অতঃপর তাহাকে লইয়া প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐখানে মেঝের উপরে বসিয়া বৃদ্ধা তাহার সেই পুঁটুলিটি খুলিতে লাগিল; খোলা হইলে দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি অতি পুরাতন, জীর্ণ অথচ মূল্যবান পোষাক রহিয়াছে — রেশমের উপরে সোনার কাজ-করা, বহুদিনের ব্যবহারে সূতাগুলি ঝরা হইয়া আসিয়াছে। তবু সে এক অপূর্ব্ব পোষাক — সেকালের মহীয়সীরা ঐরূপ পোষাক পরিত।

বৃদ্ধা বড় যত্নের সহিত তাঁজ খুলিয়া, কম্পিত অঙ্গুলি দ্বারা তাহার ভাঁজগুলি সমান করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তখন সেই পোষাকের পানে চাহিয়া মহাশিল্পীর মস্তিষ্ক মধ্যে একটা অতিমৃদু স্মৃতির ক্ষীণ

আলোড়ন আরম্ভ হইল, পরক্ষণেই সবটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাঁহার মনশ্চক্ষে একটা অতীতচিত্র ভাসিয়া উঠিল — সেই নির্জ্জন পর্ব্বতোপকূলে, সেই শিরালো ঝুটির, সেই সরল অতিথি-সৎকার; মনে পড়িল, সেই ছোট ঘরখানিতে সেই কাঠের বসাটী, এবং একটিমাত্র শয্যায় অতিথির শয়ন-কল্পনা; সেই সৌম্যালোকিত ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে, তাহার সম্মুখে একাকিনীর সেই বৃদ্ধা। তখন সেই বৃদ্ধ চিত্রকর — রাজপথের সম্মান-ভাজন সেই পুরুষ — নতজানু হইয়া বৃদ্ধাকে প্রণাম করিলেন। সে তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অতঃপর বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন "আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, কেবল মুহূর্ত্তের জন্য আমার ভুল হইয়াছিল, আমি আপনার মুখ স্মরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা, আপনাকে সেই একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। এখন আমি সবকথাই স্মরণ করিতেছি। আপনি একদিন আমাকে আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন, আপনার একটি রাত্রি যাপনের জন্য আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি আপনার মুখ দেখিয়াছি, আপনার কাহিনী শুনিয়াছি। আপনি মুক্তাবাবসায়িনী ছিলেন, আপনার নাম আমি ভুলি নাই।"

বৃদ্ধ শিল্পাচার্য্য যে সব কথা বলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বড় দুঃখে কষ্টে তাহার জীবন কাটিয়াছে, তাহার স্মৃতিশক্তিও ক্ষীণ হইয়াছে, তাই সে কিছুই বলিতে পারিল না। অতিথি আবার কহে, আবার সকল কথা — সে যাহা যাহা করিয়াছিল, সেই মুক্তাটির নিকটে সে নিজের যে কাহিনী বলিয়াছিল, সেই সব কথা প্রত্যেকটি স্মরণ করাইবার পর — তাহার মনে পড়িল, চক্ষে আলোক দেখা দিল। তখন সে বলিয়া উঠিল, "যিনি উর্দ্ধ হইতে দীনের প্রার্থনায় সাড়া দেন, তিনিই তাহা হইলে পথ দেখাইয়া আমাকে আপনার দুয়ারে লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমার কুটীরে আপনার মত মহৎ অতিথির পায়ের ধূলা যখন পড়িয়াছিল তখন অভাগিনীর অবস্থা এমন ছিল না। ভগবান বুদ্ধের কি অপার মহিমা, নহিলে আমাকেই বা আপনি স্মরণে রাখিবেন কেন।"

ইহার পর, বৃদ্ধা তাহার ইতিহাস বলিল। দিন দিন তাহার ধারিদ্র্য বাড়িতে লাগিল, অবশেষে সে তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানি ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আশ্রয়সন্ধানে আসিয়াছিল। তখন সকলে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার নামও কেহ জানে না। গৃহখানি হারাইয়া তাহার যত কষ্ট হইয়াছে তাহারও অধিক কষ্ট এই যে, জরা তাহাকে বড়ই দুর্ব্বল করিয়াছে — সে আর প্রতিবারে বৃহদ্ভবনের সম্মুখে নৃত্য করিতে পারে না; আর সে তাহাকে পরলোকবাসী জগদ্বন্ধুর আত্মার তর্পণ করিতে পারে না। তাই সে তাহার নর্ত্তকীবেশ-পরিহিত মূর্ত্তির একখানি ছবি আঁকাইয়া লইতে চায়। ছবিখানি সে বৃহদ্ভবনের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিবে। দেবতার নিকটে তাহার কেবল এই একটি মাত্র প্রার্থনা। সেইজন্য সে দেখের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরের শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহার সে ছবি যেমন-তেমন হইলে চলিবে না, বড় কারিগরির প্রয়োজন — নহিলে দেবতার তৃপ্তি হইবে না। তাই সে তাহার পোষাকটিও সঙ্গে আনিয়াছে, তাহার শিল্পাচার্য্যমহাশয় যেন সেই পোষাকেই তাহার ছবি আঁকিতে ইচ্ছা করিবেন।

শিল্পীপ্রবর স্মিতমুখে সকল কথা শুনিলেন, শুনিয়া বলিলেন, "আপনি যেমনটি চান আমি ঠিক সেইরূপ একখানি ছবি আঁকিয়া দিব। কিন্তু আজ একটি কাজ বাকি আছে, তাহাই শেষ করিতে হইবে। আপনি যদি ভাল জানেন আমি আপনার মনোমত চিত্র আমার সাধ্যমত এঁকে দিব।"

তখন বৃদ্ধা বলিল, "কিন্তু একটা কথা শিল্পাচার্য্য

মহাশয়কে এখনও বলা হয় নাই, তাঁহাই মনে করিয়া আমি কষ্ট পাইতেছি। আমি ঐ চিত্রখানির পরিবর্তে আর কিছুই দিতে পারিব না, কেবল ঐ পোষাকটী আপনি রাখিবেন। উহার কোন মূল্য আর নাই জানি, কিন্তু এককালে উহা সম্রাট মুসোলিনির ছিল। তাঁহাড়া, পুরাকালের একটা বিচিত্র ব্যাপারের আপনি উহা রাখিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন — একালে আর 'শিরাবোইওসি' নাই, 'মাকেরোনা' অন্যরূপ সাজ করিয়া থাকে।"

"আপনি সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার নিকটে যে অর্থ আছি তাহার সামান্য একটু পরিশোধ করিতে পারিলেও কৃতার্থ বোধ করিব। তাহা হইলে, আপনি কাল আসিবেন, আমি ঠিক ঐরূপ একখানি ছবি আঁকিয়া দিব।"

শিল্পাচার্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা তাঁহাকে বহুবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। তারপর বলিল "প্রভু, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার আর একটী অনুরোধ আছে। আমার ইচ্ছা নয় যে, আপনি আমার এখনকার এই মূর্তি অঙ্কিত করেন; আমি একদা যেমন ছিলাম — আমার সেই যৌবনকালের মূর্তি— আপনি যেমন দেখিয়াছিলেন — তাহাই যেন চিত্রিত করেন।"

চিত্রকর বলিলেন, "আমার মনে আছে, আপনি তখন পরমাসুন্দরী ছিলেন।"

বৃদ্ধার বলি-অঙ্কিত মুখমণ্ডল আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এই কথা শুনিয়া সে আবার নত হইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল। তার পর একটু উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে আমার সকল কামনাই পূর্ণ হইবে! প্রভুর যখন স্মরণ আছে, তখন আমি নিশ্চয় করি, তিনি যেন আমার সেই সুন্দরী-বয়সের ছবিই আঁকিয়া যেন — এই জরাজীর্ণ মূর্তি নয়; তাহা হইলে আমি যে সুখী ছিলাম না তাহা আপনিও অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন: শিল্পীশ্রেষ্ঠ আপনি — আমাকে আবার যুবতী করিয়া দিন! আমাকে যাহাতে সুন্দরী দেখায় আপনি তাহাই করুন! সেই একজনের জন্য আমি এই একটীবার ভিক্ষা করিতেছি, — তাহার চক্ষে আমি যেন সুন্দরী হইয়াই থাকি। ঐ ছবি দেখিয়া সে-ও খুশী হইবে — আর যে আমি নূতন করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারি না, সে অপরাধ সে ক্ষমা করিবে।"

মহাশিল্পী পুনরায় তাহাকে আশ্বাস দিলেন, "ভাল আসিবেন, আমি আপনার ছবি আঁকিব; আপনাকে যেই যে দেখিয়াছিলাম — সেই অবিদ্যা-সুন্দরী যুবতী শিরাবোইওসি, আমি তাহাই আঁকিয়া দিব। দেশের মধ্যে সবচেয়ে ধনী যে, তাহার ছবি আমি যেমন যত্ন করিয়া আঁকি, আপনার ছবি তেমনই করিয়া আঁকিব, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি কাল আসিবেন।"

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধা নর্তকী চিত্রকরের গৃহে আগমন করিল। চিত্রকর একখানি অতি কোমল রেশমী-বস্ত্রের উপরে তাহার ছবি আঁকিলেন। আচার্যের শিক্ষণ তাহার যে-রূপ দেখিয়াছিল সে-রূপ নহে; তিনি তাঁহার স্মৃতি হইতে তাহার সেই পূর্ব-রূপ পুনরুদ্ধার করিলেন। বিদ্যুদ্বিনীর মত চঞ্চল দুইটি চক্ষু; বেণুলতার মত তনী; রেশম ও জরীর পোষাকে সে যেন আকাশচারিণী অপ্সরীর মতই জ্যোতিষ্মতী। শুভ্র-শিল্পীর হাতু-তুলিকার স্পর্শে সেই বিগত যৌবন-শ্রী যেন ফিরিয়া আসিয়াছে, অপ্সরীর পাখনা উঠিয়াছে। 'আকেমোনো' খানি শেষ হইলে শিল্পী তাহাতে নিজ স্বাক্ষর মুদ্রিত করিলেন, তারপর একখানি রেশম-নির্মিত পট-পীঠিকার উপরে অঙ্কিতকে

বসাইয়া, দুইপ্রান্তে দুইটি উৎকৃষ্ট সিঙ্কের-কাপড়ের উত্তোলন-দণ্ড বাঁধিয়া দিলেন, সেই দণ্ডের আন্দোলিত জন্য কয়েকটি ঘণ্টাকিঙ্কিণিযুক্ত ঝোলকও তাহাতে সংযুক্ত করিলেন; ঝুলাইবার জন্য একটি রেশমের রজ্জুও রহিল। তারপর চিত্রখানি একটি শ্বেতবর্ণের কাষ্ঠ-পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিলেন, সেই সঙ্গে তাহাকে কিছু অর্থও দিতে চাহিলেন। সে কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিল না, অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিয়া উঠিল, "আমার আর কিছুই চাই না, আমি কেবল ঐ ছবিখানিই চাহিয়াছিলাম — উহারই জন্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এখনে তাহা পূর্ণ হইল। এ জীবনে আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমি আমার প্রাণে তাহা বুঝিয়াছি; ইহাও জানিয়াছি, যদি দুঃখাকাশে আমার সকল বাসনার অবসান হয়, তবে ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় আমি পাইব। কেবল একটি কথা ভাবিয়া আমি স্থির পাইতেছি না, ঐ পোষাকটি ছাড়া মহাশ্রীকে দিবার মত আমার যে আর কিছুই নাই! উহার মূল্যই বা কি? শুধু ঐ নর্ত্তকীর পোষাকটি লইবার জন্য আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি। প্রতিদিন আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করিব, আপনার জীবন যেন সুখময় হয়; দুঃখিনীর প্রতি আপনার এই দয়া আমি কখনই ভুলিব না।"

চিত্রকর তাহা স্বীকার করিলেন না, বলিলেন, "আমি কিছুই করি নাই। শুধু যদি ঐ পোষাকটি লইলে আপনি সুখী হন, আমি তাহা লইতেছি। উহা দেখিলেই আমার সেই রাত্রির কথা স্মরণ হইবে, কেমনে আপনি আপনার গৃহদ্বার দিয়া এক দরিদ্র বিপন্ন পথিকের অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন— তাহার একটি পয়সাও লইতে স্বীকৃত হন নাই। আমি এখনও আপনার নিকটে ঋণী। এখন বলুন, আপনি কোথায় যাইবেন, আমি নিয়ে গিয়া আপনার ঘরে ঘরে এই ছবি টাঙ্গাইয়া দিব।" আসল কথা, চিত্রকর ঐ বৃদ্ধার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা কিছুতেই তাহার ঠিকানা জানাইল না, বলিল, "কোন স্থানে আপনার মত ব্যক্তির যাইতে নাই।" তারপর কৃতজ্ঞি-প্রণাম করিয়া, বহু ধন্যবাদ দিয়া, আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে, তাহার সেই দর্শনধন হাতে লইয়া প্রস্থান করিল।

চিত্রকর তাহার এক কৃতজ্ঞে গোপনে বৃদ্ধার অনুসরণ করিতে বলিলেন, সে যেন তাহার ঠিকানা জানিয়া আসে। অনেকক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিল, এবং হাই হাত সঞ্চালন করিয়া বলিল, "হুজুর, আমি তাহার পিছু পিছু গিয়া নগরের বাহিরে নদীর শুষ্ক খাতটার ধারে পৌঁছিলাম — সেই খেখানে শ্মশান আছে তাহার নিকটে। সেইখানে একটা ভুঁড়ে ঘরে ঐ বৃদ্ধা বাস করে। বলিব কি হুজুর, সে একটা পোড়ো ভিটা — জনপ্রাণী নাই, চারিদিক খোলা।"

"সে যেমনই হোক, কাল তুই আমাকে লইয়া যাইবি। আমি এতদিন বাঁচিয়া আছি তাহাকে আহার, বস্ত্র, ও বাসস্থানের কষ্ট পাইতে দিব না।"

তার পর তিনি সকলকে সেই শিরাজাইগুলির কাহিনী বলিলেন, তাহা শুনিয়া কেহ আর তাঁহার এই আচরণে বিস্ময় বোধ করিল না।

(৫)

পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরে, এক শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আচার্য্য সেই শুষ্ক খাতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন—সেখানে অন্ত্যজেরাই বাস করে।

ছোট খঞ্জানির প্রবেশ-পথ একটি বাঁশ কাঠের পাল্লা দিয়া বন্ধ রহিয়াছে। অনেকবার হস্ত করাঘাত করিয়া কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন তাহা ঠেলিয়া, সেই ছিদ্রপথে মুখ দিয়া তিনি ডাকিতে বলিলেন, তাহাতেও কেহ উত্তর দিল না। তখন

নিজেই সেই ঘরে ঢুকিয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কি যেন অনুভব করিয়া তাঁহার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইল—ঠিক যেমনটী বহুকাল আগে আর একদিন তাঁহার হইয়াছিল—যেদিন এক নির্জন পার্ব্বত্য-ভূমির পথহারা পথিক আর এক কুটীরদ্বারে এমনই করাঘাত করিয়াছিল।

বৃদ্ধদেব নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী শুইয়া রহিয়াছে, যেন ঘুমাইতেছে। তাহার অঙ্গে একখানি মাত্র বসন, যেমন বস্ত্র তেমনই জীর্ণ। একখানি কাষ্ঠের তক্তার উপর চলিবার পূর্ব্বেকার সেই 'যুবযুবান'টী রেখিয়াই চিনিতে পারিলেন; তখনও যেমন, এখনও তেমনই তাহার শিয়রে সেই মৃত্তি-কলসটী রহিয়াছে—দেবমূর্ত্তির সম্মুখে একটী ছোট প্রদীপ জ্বলিতেছে। কল্যাণ-দেবীর সেই পূর্ণচন্দ্রকিরীটী ছবিখানি আর নাই। পুষ্পাবেদীর সম্মুখের দেওয়ালে, ঠিক তাহার মুখোমুখি, তাঁহার দেওয়া সেই মৃত্তি-ফলকের উপরার ঝুলানো রহিয়াছে, এবং ঠিক তাহারই নীচে একটী দেবীমূর্ত্তি—'হিতো-মোতো-কোয়ান'-এর বিগ্রহ। এই দেবীর নিকটে কেবল একবার একটী মাত্র প্রার্থনা করিবার বিধি আছে—দ্বিতীয়বার করিলে দেবী ক্রুদ্ধ হন। কুটীরমধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তীর্থযাত্রীর ধূলিমলিন কন্থা, এবং একটী দণ্ড ও কমণ্ডলু পড়িয়া আছে।

কিন্তু শিষ্যাচার্য্য তখন সে সকল দেখিতেছিলেন না, নিদ্রিতার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তিনি তাহাকে সুসংবাদ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; আনন্দ-পূর্ণ হৃদয়ে ডাকিলেন।

দেহরা বুঝিতে পারিলেন, দুয়ার রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তখনই তাহার সেই দুঃখ-মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না—সে মুখে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন যেন আর নাই। তৎপরিবর্ত্তে একটী অস্ফুট মাধুর্য্য—যেন অপগত যৌবনের একটা উপচ্ছায়া—তাহাকে ভাসিয়া উঠিয়াছে, যেন তাঁহা অপেক্ষাও কোন বড় শিল্পী—কোন্ মহা-যাদুকর—সে মুখ হইতে দুঃখসুখের সকল চিহ্ন, তাহার যতকিছু রেখা-লেখা মুছিয়া দিয়াছে!

এই ভাল বাসা?—আমার জীবনে
এই কি তোমার কাজ?
সব অচেতন রয়েছি শাসনে,
তুমি বসি' রবে আপন আসনে—
মোহাবিবে শুধু চারু কারুকলা,
সত্য ধরণের সাজ?
দিবে কি আমারে চির-যৌবন
হরিবে কি মোর জরা?
কণ্ঠে আমার ফুরাবে না সুর?
পড়িবে না খসি' পায়ের নূপুর?
রবে কি রূপের মোহ-পরশী
চিরদিন মধুরা?

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

( )

শরৎচন্দ্রের কৈফিয়ৎ

There are two conditions of my mental existence — the condition of a lucid reason, not to be disputed, and belonging to the memory of events forming the first epoch of my life and a condition of shadow and doubt, appertaining to the present. Therefore, what I shall tell of the earlier period, believe; and to what I may relate of the later time, give only such credit as may seem due.

— Edgar Allan Poe

উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলির একভাগ আমার, অপরভাগ শরৎচন্দ্রের ;— যদিও উহার সবটাই শরৎচন্দ্র দাবিয়া লইবেন, যদি ঐ আত্মকাহিনীকে আমার বলি, তাঁহারও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। শ্রীকান্তের পশ্চাতে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কিছু কৈফিয়ৎ এই গ্রন্থে আছে, উপন্যাসখানির ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার সেই কৈফিয়ৎ উদ্ধৃত করিব এবং সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ যেন শরৎচন্দ্রের বহুমুখী অন্তঃপ্রবৃত্তির কাহিনী, এখন কাহিয়া উঠিয়া তিনি সেই স্মরণ ও তাহার অর্থ সন্ধান করিতেছেন। সে যে কত দুরূহ তাহা তিনিও জানেন, বারবার বলিতেছেন—যেমনটি দেখিয়াছি তেমনই বলিব; কোন বিচার বা সমালোচনা নয়, কেবল সেই দেখার বিষয় এবং তজ্জনিত জিজ্ঞাসামাত্র আছে। সে বড়ই বিস্ময়কর বা অবিশ্বাস্য হইত, তাহা তাঁহার নিকটে কত সত্য ইহাই তিনি পাঠকগণকে বারবার বলিয়াছেন। অবিশ্বাস করিবার কারণ যে আছে! যারা জ্যোতিষ বা অলৌকিকের সত্য তাহাকে উপন্যাসের রস-সত্যরূপে পাঠক গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু তাহা যে কাহারও জীবনেরও সত্য হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা যে 'fact' — বিশেষ করিয়া ঐ সকল ঘটনা ও অভিজ্ঞতন — ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। এ সকল কি অর্থে কতখানি সত্য, আমি

তাহা বলিয়াছি। তথাপি, ইহার যাহা যতটুকু সত্য ঘটিয়াছিল, আজ তাহা দূর অতীতের স্বপ্নরূপে চিত্ত কবিত্বময় হইয়াছে, যাহা সামান্য তাহা অসামান্য বোধ হইতেছে — তাহার যে-অর্থ ছিল না, আজ তাহাও. লেখক নিজের প্রৌঢ় পরিণত চিন্তা ও সাহিত্যিক মনোভাবের বলে, তাহাতে যুক্ত করিয়াছেন। ইহাও স্বাভাবিক; তথাপি শরৎচন্দ্র তাহা স্বীকার করেন না — ইহার কারণ বাহিরের; অতএব সেখানে সাধারণ সত্যাসত্য বিচার চলিবে না। সেজন্যই হয়তো তিনিও দিতে পারেন না; কারণ, বস্তুতঃ এমনই মনে হয় যে, তাঁহার ভাষামুগ্ধা ও অতিরিক্ত সহানুভূতি বাস্তবের আকার আয়তনকে অতিক্রম করিয়াছে; একটা প্রতিক্রিয়া বা বিদ্রোহী মনোভাবের বশেও তিনি হয়তো কোথাও ছোটকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন — যেমন, এই উপন্যাসের 'অভয়া'-চরিত্রে। এ সকল সেই আত্মকাহিনীর বাহিরে। কিন্তু তথাপিও তাঁহার প্রাণ-মনের আদি-পরিচয়টি কোথাও হারাইয়া যায় নাই — নিজ-স্বভাবের সহায়ে তিনি অন্তর্দৃষ্টিকে শাণিত করিয়াছেন; সকল নব নব আক্ষেপ-বিক্ষেপও যেমন, ভাবুকতাপূর্ণ তত্ত্ববিচারের অন্তরালেও তেমনি, সেই এক শ্রীকান্ত তাহার জন্মগত বা প্রকৃতিসিদ্ধ সংস্কারকে — তাহার স্বভাবের চরিত্র্য নিরস্ত্রিকে অকপে স্বীকার করিয়াছে; উহা হইতে যে কাহারও নিষ্কৃতি নাই! এই কাহিনীতে যেখানে যত সজ্ঞান বিদ্রোহ ও চরমুক্তির প্রয়াস আছে, তাহা একদিকে যেমন একটি স্পর্শকাতর হৃদয়ের উত্তেজনামূলক, তেমনই পদে পদে ভিতর হইতে একটা কি-যেন বিশেষ প্রতিবাদ তাঁহাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ বা দায়মুক্ত হইতে দিবে না; এই দ্বন্দ্ব কখনও ঘুচে নাই। যেন মনে হয়, তাঁহার প্রাণ যাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবে, তাহাকেই তিনি বেশি করিয়া অস্বীকার করিবেন। এই প্রাণের সত্তাই এ কাহিনীর প্রথম পর্বে বিশেষ করিয়া ধরা দিয়াছে। সেই সত্যের আলোকে তিনি যাহা অপরোক্ষ করিয়াছিলেন, আজ এতদিন পরে, তাঁহার মন-বুদ্ধি তাহার উপরে একটা অস্বচ্ছ আবরণ টানিয়া দিয়াছে; সে সত্য তাঁহার নিকটেও আর তত্খানি নিঃসংশয় নহে,—তাই তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে তাঁহারও সঙ্কোচ বোধ হয়; অথচ একদিন তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইজন্য আজ তাহারও কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বলিতেছেন—

> (১) এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার যাহা কবির সৃষ্টি করা চলেনা। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।
>
> [প্রথম পর্ব, পৃঃ ২]

> (২) আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত' করিবেই, পরন্তু উহা কল্পনা বলিয়া ভ্রম করিতেও হয় ত' ইতস্ততঃ করিবে না। তথাপি, এইটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ, সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না, প্রতিপদেই বাধ হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, অন্তরে যাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিয়াছি, বাহিরে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজের কোন দোষই ঢাকে না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি ছত্রেই টানিয়া ধরিতে থাকে।
>
> [প্রথম পর্ব, পৃঃ ৬৬]

> (৩) মানুষের অন্তর জিনিষটাকে তিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া, মানুষ যখন নিজেই তাহা গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ

আমার দ্বারা কখনো ঘটবে না, সে কাজ আমি করিব বলেও ভরসা করি না — আমি শুনিয়া আর লজ্জায় মরিয়া যাইব। আমার শুধু নিজের মনটাই নয়, পরের মনকেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলা পড়িয়া দেখ — হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহারা কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়! লোকে বাহবা দিয়া বলে, — "যাঃ রে যাঃ! এই ত' রিয়ালিজিম! একেই ত' বলে চরিত্র-সমালোচনা! ··· মনে মনে বলি, "হায়রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিষটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা; তোমার কোটী কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার এই অনন্তে লয় পাইতে পারে, এবং হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া, তোমার কুয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ যাচাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে ··· ।" [ঐ. পৃ:]

উপরিউক্ত এই কথা কয়টাই যথেষ্ট। আমরা 'শ্রীকান্ত'-লেখক শরৎচন্দ্রের কৈফিয়ৎ যাহাই পাইতেছি, তাহাতে লেখক যে নিজে এই কাহিনী সম্বন্ধে কতখানি সতর্ক ও সচেতন, তাহাও বুঝিতে পারি। বিশেষ করিয়া ঐ শেষের উক্তিগুলিতে আমরা, একটী অতি গভীর সাহিত্যিক তত্ত্বকথার ইঙ্গিত পাই। তাহা এই যে, — আপনাকে যেমন, পরকেও তেমনই, কে কবে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? বুঝিয়া কিনিয়া সেই এক কথা, আমিও প্রথম হইতেই তাহাই বলিতেছি। যেহেতু এই কাহিনী মানুষের কাহিনী এবং মানুষের অন্তর জিনিষটা অনন্ত, সেইহেতু তাহার সত্যাসত্য-বিচার মানুষের অসাধ্য বলিয়াই যেমন ভাবী সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষেও স্পর্দ্ধা মাত্র। কথাটা একটু বুঝিয়া লইতে হইবে, কারণ সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-সমালোচনা — এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। মানুষের কাহিনী যে-সাহিত্য, তাহা যেমন মানুষজীবনের মতই অপার রহস্যপূর্ণ, তেমনই, সেই সাহিত্যের সমালোচনাও ঐ রহস্যকে স্বীকার করে, করে বলিয়াই সেই সমালোচনা মূল সৃষ্টির অনুবর্তী হয় — তাহাও সৃষ্টিধর্মী। সাহিত্যসমালোচনার আধুনিক রীতি ও পদ্ধতি কাব্যের অন্তর্গত কবি-সৃষ্টিকেই প্রামাণ্য করিয়াছে, সেই সৃষ্টির সত্যকেই খণ্ডিবার চেষ্টা করিয়াছে। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই সেই সমালোচক ও সেই সমালোচনার উদ্দেশে ঐ কথাগুলি বলেন নাই; তিনি বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-সুরুচি ও সাময়িক পত্রের সমালোচকমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়াছিলেন। না করিয়া উপায় ছিল না, কারণ যেমনই বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে, ও বাংলার বিদ্বৎপীঠ-গুলিতে একজন অধিপত্য লাভ করিয়াছে। ইহাদিগের জন্য, তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে, — আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি, আমি কবির করি নাই, তোমাদের পুঁথিগত সাহিত্যিক কলাবিধি — তোমাদের সাইকোলজির খাতির মাত্র করিয়া — তোমাদের ধারণা ও সংস্কার, তোমাদের পাণ্ডিত্য ও হৃদ-বুদ্ধির কলাপের মত, কিছু রচনা করি নাই। এই যে সতর্কবাণী ও ভর্ৎসনা, বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে ইহার প্রয়োজন থাকিলেও, বিশ্বিল-সাহিত্যবিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহা সত্য কি না? আমি এইখানে সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মানুষজীবনের কাব্যকার হওয়া যে সহজ নয়, বরং, তাহার মত আর-প্রতিষ্ঠা আর কিছুই হইতে পারে না — একথা যুগে যুগে নানাভাবে ও নানা অর্থে সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দেশ ও কালের, বা ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে, অথবা অভিনব অনন্ত, অসত্য-পরাহত মনোবিলাসীদের রুচির অনুবর্তন করিয়া, যে অসাধ্য কাব্য-নাটক-উপন্যাস রচিত হইয়া থাকে,

তাহাদের সেরূপও যেন আকৃষ্টিবের পরিচয় অভ, সমালোচকরাও তেমনি সেই সবলের উৎকর্ষ-অপকর্ষ-নির্ণয়ে নিজেদের জোরালী বিদ্যার কসরত প্রদর্শন করিতে পারিলেই সাহিত্যিক সর্বজ্ঞতার অধিকারী হয়। এমন ঘটনা এই দেশে ঘটে; ঘটিলেও কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে, যাহাদের কিছু সহায়কার সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক আলোচনা এখনও সমাজগত হয় নাই, উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত; অথচ সাহিত্যের বিচার করিয়া থাকে যেই সমাজ — যাহার সাহিত্যবুদ্ধি ও পরের কথা, পরে স্থূলভুক্ত করিয়া, শিক্ষার ক্ষেত্রটাও 'আড়া'-রূপে পরিণত হইয়াছে — 'সুধাকেন্দ্রমাঝে কুপ-বসন' চলিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই সমাজের তথা-কথিত সাহিত্যিক ও সমালোচকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবনকেই সাহিত্যের উপরে স্থান দিয়াছেন, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টি দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — আমার এই রচনা যদি তোমাদের ঐ পাণ্ডিত্য বা রুচিসঙ্গত না হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। ইহা আক্ষেপ-অভিমানের কথা — আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য রুচিবাগীশ সাহিত্যাচার্যগণের বিরুদ্ধে সার্বজনিক অভিযোগ। কিন্তু এ অভিযোগ যেটি সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে যেমন, সমকালীন সমালোচনার বিরুদ্ধেও তেমনই অনাবশ্যক। সাহিত্য জীবনের উপরে নয়, জীবনই সাহিত্যের উপরে। কে এমন দ্রষ্টা আছে যে, সাহিত্যের সেই জীবন-দর্পণকে, কবির সেই বিশ্বসৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার সত্যাসত্য-বিচারে রুচি-সাহিত্যের সূত্র আওড়াইবে? যে পুণ্যবান ব্যক্তিরা সেই সাহিত্যের সমুখীন হ'ন, তিনি যে কোনরূপ মাপকাঠি ব্যবহারের সুযোগই পান না। সেই অপার রহস্যের বাণীরূপটাই তিনি বুদ্ধিবাদে বিশ্লেষণ করেন এবং সে রহস্য ভেদ করিতে গিয়া তাহার নিজেকে আরও অন্ধকার করিয়া তোলেন। এই 'ইকিতা' যদি উপন্যাস না হইয়াও থাকে — কারণ, ইহা কোন বৈধ রীতির অনুসরণ করে নাই — তেমনি, তাহার একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে বাধা নাই। তেমনই, এই কাহিনীতে পাত্র-পাত্রী-গণের যে চরিত্র-চিত্র আছে তাহা সমালোচকের পুঁথিগত বিদ্যার অভিমান চরিতার্থ না করিলেও, সত্য ও অনবদ্য না হইবার হেতু নাই। কতকগুলা সমালোচনা-গ্রন্থ পড়িয়া আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, অথবা অতিসদ্য বিদেশী উপন্যাস ও গল্পরাশি পাঠ করিয়া আমাদের যে রুচি ও যে সংস্কার জন্মে, জীবনকে প্রত্যক্ষ-বিচার করিবার পক্ষে তাহার মূল্য কতটুকু? তথাপি উপন্যাসের নামে যে সকল অপকৃষ্ট ও অদ্ভুতকৃষ্ট রচনা জীবনকে দেখাইবার জ্ঞান করে, তাহাদের অন্তর্গত সেই বিদ্যার দুর্নীতিপূর্ণ চরিত্র ও উদ্ভট কাহিনীর পক্ষে শরৎচন্দ্রের ঐ অভিযোগ যে সত্য নয়, তিনি নিজেও তাহা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন। এই সকল গল্প-উপন্যাস প্রভৃতির সম্বন্ধেই আমাদের সমালোচকদলের লেখনীতে খই ফুটিয়া থাকে — তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও রসবোধ প্রয়োগের এমন স্থান আর নাই। যাহারা ঐ কাজ করিয়া থাকে, তাহারা বুদ্ধি-বিহারীকে এক করিয়া ওজন ত' করেই, পরন্তু দুইটিকেই মিছরীর উপরে স্থান দিয়া থাকে, দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ফরাসীর সাহিত্যে জীবনের অতি গভীর বহুবিচিত্র জটিল বিদ্যার যে অপূর্ব রূপ-রসে মণ্ডিত হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যে তাহা এখনও হইবার অবকাশ ঘটে নাই; আমাদের সাহিত্য কাব্যাখ্যানে, অর্থাৎ বস্তুর দিক দিয়া নয়—ভাবের দিক দিয়া — আমরা আমাদের সাহিত্যে জীবনের একটা রূপ সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাও কয়েকটি শক্তিমান কবির দ্বারাই হইয়াছে — বাকি সব অনধিকার তাঁহাদেরই অনুকরণ। এই সাহিত্যের সমালোচনাতেও আমাদের রস-পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যের যে বহর দেখাইয়াছেন, তাহাতে জীবন-রস-রসিকতার ঐ দিকটাও চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আবার, জীবনের যেটা বাস্তব দিক

সেই বিকটিকে রবের কবিতার যে সাহিত্যিক প্রেরণা অতিশয় বর্তমান যুগে দেখা যাইতেছে, তাহাতে দুই এক জন শক্তিশালী লেখকের প্রতিভা দৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও, তাহা যেমন প্রসার লাভ করিতেছে না দুইটি কারণে; প্রথমতঃ, ঐরূপ কাব্যের যথার্থ মূল্যবিচার এ পর্যন্ত হয় নাই — সমালোচক নাই; এবং প্রতিভা আপন পথে নিঃসন্দিগ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, নানাপন্থী অগণ্য তথাকথিত বাস্তববাদীর দল এমনই হট্টগোল তুলিয়াছে যে, তাহার মধ্যে জীবনকে দেখিবার দৃষ্টিটাই স্থির থাকিতে পারিতেছে না। বস্তুর রূপরূপ ও ভাবের রূপরূপ দুইই সত্য — কবিদৃষ্টির প্রকাশভেদে মাত্র। একজন জীবনের রহস্যকে ধ্যানে রূপময় করিয়া দেখেন, আর একজন সেই একই রহস্যকে প্রত্যক্ষ-বাস্তবের জবানীতে আর এক রূপরূপ দান করেন। কেহই সেই রহস্য-সমাধানের স্পর্ধা করেন না — তাহার রূপসৃষ্টি করেন মাত্র। যিনি সেই স্পর্ধা করেন, অর্থাৎ যিনি জীবনকে কোন একটা মতবাদের নজীর করিয়া — জীবনের কোন রূপসৃষ্টি নয় — তাহার একটা অর্থ নির্দেশ করিয়া দেন, তিনি সাহিত্যস্রষ্টা নহেন — অতি স্থূলবুদ্ধি সমালোচক মাত্র। অতএব কবির দৃষ্ট জীবন সম্বন্ধেও যেমন, তাহার সৃষ্ট মানব-মানবী সম্বন্ধেও তেমনি, সত্য-মিথ্যা, সঙ্গত-অসঙ্গতের কথাটাই বড় নয়; যদি সে প্রশ্ন উঠে, তবে তাহা বিচার করাও সাহিত্য-সমালোচকের কাজ; তাহার যদি সেই জন্য খাঁটি কবিদৃষ্টি-প্রসূত হয়, তবে ঐরূপ প্রশ্নও ঠিক তর্কমূলক প্রশ্ন নয় — উহা সেই কবিতাদের গভীরতা-বোধ এবং তজ্জনিত পাঠকহৃদয়ের বিস্ময়পূর্ণ কৌতূহলের মত। কবির যদি সেই দৃষ্টি থাকে তবে জীবনের যে-রূপটি আমরা দেখিতে পাইনা — তিনি সেই রূপ আমাদের দৃষ্টি-গোচর করেন; তাহা সত্য কি মিথ্যা এমন প্রশ্ন রসিক পাঠকের চিত্তে জাগিতেই পারে না; কেবল ইহাই অনুভব হয় যে, আমরা যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন তাহাই দেখিলাম; যাহা 'দেখিতেছি' তাহার আবার প্রমাণ কি? সত্য-মিথ্যার সংশয় নয় — সেই দুই বস্তুর গভীর রহস্যময়তা আমাদের বুদ্ধির অতীত বলিয়াই, আমরা একরূপ বিস্ময় বোধ করি — তাহাও রসাবেশের অনুকূল। যদি সেই অনুভূতি পাঠকচিত্তের না হয়, তবে সেই কবির দৃষ্টি পূর্ণদৃষ্টি নয়, অথবা পাঠকের সংস্কার অন্যরূপ — তিনি রসিক নহেন।

তাহা হইলে কি বুঝিলাম? শরৎচন্দ্রের ঐ অভিযোগ, তাঁহার ঐ দ্বিধা-জড়িত কৈফিয়ৎ নিতান্তই অনাবশ্যক — যাহাদের পাঠক-সমাজ তাঁহা প্রমাণ করিয়াছে। সমালোচকেরা প্রথম প্রথম বড় ভরসা করিয়াছিল, পরে তাহারা পক্ষেই ভোটাধিক্য দেখিয়া অগত্যা চুপ করিয়াছে; এবং আরও পরে, নব্য-সাহিত্যের নব্য-পণ্ডিতগণ, একদিকে ভক্তির আতিশয্য, এবং অপরদিকে পাণ্ডিত্যের মশালে এই দুইই একত্র করিয়া দিয়া, একটি চমৎকার মাপকাঠি বানাইয়া লইয়াছে — সেই মাপকাঠিকে গৌরব দিবার জন্য, শরৎচন্দ্রকেও গৌরব দিয়াছে। আমরা কোন মাপকাঠি ব্যবহার করিব না, তিনি যাহা যেমন দেখাইয়াছেন তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব; শরৎচন্দ্রের ঐ কৈফিয়ৎ আমাদের নিকট কৈফিয়ৎ নহে — উৎসাহবাণী।

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ

"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"

—গীতা

শ্রীকান্তের বাল্যজীবন, তাহার পিতামাতা বা ভাই-ভগিনীর কোন কথা এই কাহিনীতে নাই। মাতুল-গৃহে পরের বাড়ীতে সে 'মানুষ' হইয়াছে। সেখানে মানুষ হইবার যে পারিবারিক বাধকতা, এবং সেখানকার শিক্ষিতের যে পাকা বন্দোবস্ত তাহা সেকালের বাঙালী-সমাজের চক্ষে অতিশয় নিদোষ ছিল, সে পরিবারের ভিতরে আচারনিষ্ঠা ও বাহিরের কঠিন শাসন, কোনটারই শৈথিল্য নাই। যে-জাতির চারিত্রিক মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডী, যাহার রক্তে তাহার ঈশ্বরদত্ত সকল রীতি, নীতি ও শাসন-সম্বন্ধকে নিরন্তর গ্রহণ করিবার উদ্যত; বিদ্রোহ-বৃত্তি, বিষয় বা বস্তু-জ্ঞানে, এবং সামাজিক জগতে আত্ম-প্রসারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা — এ সকলই যাহার মেধা ও প্রতিভার অনুকূল না, সে জাতিকে বাঁচিতে হইলে — যৌবনবাদিনী মোহিনী রাজকীর উন্মাদকর সঙ্গীত শুনিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে — তাহাদের মাতৃজাতির নিজের মেরুটা বাঁধিয়া ফেলিতে হয়; বাঙালীও সেইজন্য তাহার সেই অমল ভাববিলাসী আত্মাটাকে নৈকর্ম্মের সুখাবাসনে মুক্তি দিবার জন্য, বাহিরে সমাজের খুঁটিতে নানা আচার-অনুষ্ঠানের কঠিন বন্ধন-পাশে নিজের মেরুটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকান্তের বাল্যজীবন আমরা জানি না, কিন্তু তাহার কৈশোর কাটিয়াছিল এমনই একটি খাঁটি শাসনতন্ত্রের সুদৃঢ় বন্ধনপাশে। কিন্তু ঐ কিশোর বালকটির স্বভাবে সেই আদিম বাঙালী-প্রকৃতি কিছু বেশী মাত্রায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; তাহা যেমন জন্মগত, তেমনই হয়ত' বালো সেই বন্ধন-রজ্জুর অভাবে। এক্ষণে ঐ আত্মীয়-পরিবারে, তাহাকে শাসনে রাখিবার রীতিমত সুব্যবস্থাই হইয়াছিল, কিন্তু যাহা মোক্ষায় বিসর্জ্জাইয়া দিয়াছে তাহাকে শোধরাইবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহারই একান্ত অভাব হইয়াছে — ভালবাসার অভাব; ঐরূপ অবস্থায় তাহা না হইয়া পারে না। এমন চরিত্রকে একমাত্র ভালবাসাই বশ করিতে পারে — দয়া নয়, আত্মীয়ের মঙ্গল-কামনাও নয়। তা'ছাড়া আমরা ঐ বালকের স্বভাবে তখনই একটা প্রকৃতি প্রবণ হইতে দেখি, যেখানে শাসনের উগ্রতা সেই চেতনাকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া থাকিবে — তাহার সাধারণ নাম দেওয়া যায় — বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ কঠিন আত্মাভিমানের বিদ্রোহ নয় — প্রতীয়মান অনুভূতির বিদ্রোহ। ঐ বালকের প্রাণ বড়ই অনুভূতি-প্রবণ; তাহার মনও অতিশয় সক্রিয়, কিন্তু তাহার মূলে আছে প্রাণের সেই অনুভূতি। তাই সেই বয়সেই সে সমাজে ও পরিবারে সর্ব্বপ্রকারে প্রাণহীন নিয়মপদ্ধতির বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা ও অসম্মতি ঘোষ করিতেছে। আর একটি অনুভূতি আছে — নিঃসঙ্গতা, তাহার প্রাণের সোসর কেহ নাই। এই একাকিত্ব, সম্পূর্ণ অজ্ঞানে তাহার চিত্তকে এমন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেছে, যে দেখে তাহাই যেন প্রকৃতির হইয়া উঠিতেছে — তাহার আত্মা আর সমাজবাসী হইতে পারে নাই, তাহার অন্তরের সেই বিদ্রোহ কখনও ঘুচে নাই। অতএব সে, সমাজের বাহিরে যাহারা বাস করে, তাহাদেরই মধ্যে প্রাণের মুক্তি, মনের মুক্তির সন্ধান করিয়াছে; তাহাতেও সে নিজে কোথাও কোন বন্ধন স্বীকার করে নাই।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঐ বিদ্রোহ, ঐ মুক্তিকামনা জাগিলেও সে তখনও নিজেকে আবিষ্কার করে নাই,

তখনও তাহার আত্মপ্রকাশের কাল আসে নাই। যেদিন যে উপায়ে তাহা ঘটিল, সেইদিন হইতেই তাহার আত্ম-কাহিনীর আরম্ভ। সে যাহা চায় অন্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, বাস্তবের অবাধ বেহিসাবী কল্পনার সে যে একটি মানস-আদর্শ খাড়া করিয়াছে, সে জানে তাহার অনুরূপ শক্তি তাহার নাই, কিন্তু তাহাই তাহার প্রাণের সত্য; সে যেন রূপকথার রাজপুত্র — এখনও জাগে নাই; তাহার অন্তরে ঘুমাইয়া আছে। একদিন সহসা সে যেন অন্তর হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে সন্ন্যাসীরূপে দেখা দিল, সেই নিমেষেই তাহাকে জয় করিয়া লইল। সাহে আছে, সময় হইলেই গুরুর দর্শনলাভ ঘটে; সে গুরু আমাদের সাধারণ মন্ত্রপাঠা কুলগুরু না — সে যেন আমাদেরই অন্তরের নিজ স্বরূপেরই একটা প্রতিভাস। বালকের গুরু বালকের রূপেই দেখা দিল; সেই আবির্ভাব তাহার সারাচিত্তকে মথিত অভিভূত করিয়া তাহাতে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, সে এতদিন পরে যেন নিজেকেই আবিষ্কার করিল, আপনার শক্তি ও দুর্বলতা দুয়েরই পরিচয় পাইল; জাগরে না হইলেও স্বপ্নে, দৃষ্টিতে ও বিস্মৃতিতে, সেই ধাক্কার বেগ তাহাকে বহন করিতে হইয়াছে, তাহার সারাজীবনের ছন্দে সেই বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ তাহাকে কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত করিল — তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বলভের কোন্ মহিমা সে প্রত্যক্ষ করিল, তাহা বুঝিয়া ফুরাইবার চেষ্টায় শ্রীকান্ত কবি হইয়া গিয়াছে — হইতে পারিয়াছে। ইন্দ্রনাথ-চরিত্র এমনই অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ যে, তাহাকে বর্ণনা করা যায় না, কেবল দেখানো যায়; শরৎচন্দ্র যে তাহা পারিয়াছেন, তার কারণ, তিনি ঐ বয়সেই তাহার সমগ্র রূপটাকে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই দেখাটাই আমরাও দেখিতেছি। আমরাও যখন দেখি, তখন বুদ্ধির দ্বারা দেখিনা, দ্বারা মনঃপ্রাণের দ্বারা দেখি, তাই সেই অদ্ভুতকেও অবিচারে মানিয়া লই। শরৎচন্দ্র এই দুরূহ কাজটি করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ইহা যদি তাহার কবিত্ব-শক্তির জোরেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব, সকল কবিত্বের মূলে আছে কোন এক মহান্ সত্যের অপরোক্ষ-দর্শন; যদি না থাকে, তবে কবিত্ব একটা ভান মাত্র, তাহা মিথ্যা। সেই সত্য একটা ভাব-সত্যও হইতে পারে, কৈবী কল্পনাশক্তির বলে ভাব-সত্যই বস্তু-সত্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এ কবির অভিপ্রায় — ইহার প্রেরণামূলে আছে ভাব-সত্য নাই — আছে একটা মানুষ, একটা রক্তমাংসের বাস্তব-মূর্তি। ইহাতে কল্পনার দোষমাত্র নাই — যেমনটি দেখা ঠিক তেমনটি তাহার মূর্তিমান করিয়া তোলা; তাহা না হইলে কেবল কবিশক্তির সাহায্যে ইহাকে এমন জীবন্ত করা যাইত না। কবির মনোভূমি এ চরিত্রের জন্মস্থান নয়। তথাপি এমন করিয়া দেখা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? ইন্দ্রনাথকে ত' অনেকেই দেখিয়াছে, কিন্তু আর কেহ ত এমন করিয়া আবিষ্কার করে নাই। তাহার কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, উহার খানিকটা শ্রীকান্ত নিজেই। মানুষ আপনাকে অনুভব করে — দেখিতে পায় না, তাই দেখাইতে পারে না; কিন্তু পরের মধ্যে আপনাকে দেখিতে পাওয়া যদি সম্ভব হয়, এবং তাহাও যদি তেমন বড় কিছু হয়, তবে আপনাকে দেখার দায় আর থাকে না — তাহার আনন্দও এমন যে, সেই দেখা সম্পূর্ণ না হইয়া পারে না। বড়টা বড়-কিছু হওয়া চাই বলিয়াছি — কথাটা অতি সত্য; আমার মধ্যে যদি সেই আত্মবিস্মার না হয়, আমার বড়-আমিটা যদি পিপাসার্ত না হয়, তবে আমার সেই দৃষ্টি আসিবে কোথা হইতে? এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, ঐ ইন্দ্রনাথ-চরিত্র সকল কল্পনার ঊর্ধ্বে; উহা অতিশয় বাস্তব, এবং বাস্তব বলিয়াই এত অদ্ভুত, এত বিস্ময়কর। উহা একটা ভাব-সত্যের রূপসৃষ্টি নয় — একটা মানবীয় সত্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ; শ্রীকান্তের জীবনেও উহা একটা বড় আধ্যাত্মিক ঘটনা —

এই জন্যই ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্তের গুরু বলিয়াছি। এমন গুরু আরও দুইজন ছিল — অন্নদাদিদি ও কমললতা। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও তাহার বিকাশের কাহিনী আছে। আধ্যাত্মিক বলিলাম এই জন্য যে, সাহিত্যিক প্রতিভার চেয়ে যাহা বড় — ইহা তাহারই ইতিহাস। শরৎচন্দ্র মানুষ যে একটি মানুষ — যে কবি নয়, ভাবুক-মনীষী নয়, খাঁটিনাম্বা সাহিত্যিক নয় — যে মানুষ বিধাতার ক্রীড়াপুত্তলি, তাঁহারই সৃষ্টি অথচ তাঁহারও বিস্ময়ের বস্তু — ইহা সেই একজন মানুষেরই চিরন্তনতম আত্মজিজ্ঞাসার কাহিনী — সে জিজ্ঞাসার শেষ নাই, তখনও তাহার উত্তর মিলিবে না।

এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের যে আত্মিক সম্বন্ধ তাহা বিচার করিবার পূর্বে, পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য, শ্রীকান্ত উপন্যাসখানি পাঠ করার পরেও — তাঁহাদের স্মরণশক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য, আমি সংক্ষেপে ইন্দ্রনাথের চিত্র ও চরিত্র কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত দুই সম্পর্কে দেখিয়াছে — তাহার নিজের সঙ্গে যে বয়সের পার্থক্য সেই এক দিক, এবং অন্নদাদিদির সহিত তাহার যে ব্যবহার বা তাঁহার প্রতি ইন্দ্রনাথের যে মনোভাব, সেই আরেক দিক; এই দুই দিক মিলাইয়া ইন্দ্রনাথের চরিত্র কতকটা বোঝা যাইবে, নতুবা সে এমনই বিশাল যে, তাহার নিঃশেষ বা প্রতিযোজন সম্ভবপর নহে। আসল এ চরিত্রের মূলতত্ত্ব — প্রাণের মহা-মুক্তি; ইহা একই কালে আসক্ত ও নিরাসক্ত — কোন বন্ধনশীলা মানিবে না, অথচ সেই মুক্ত প্রাণেরও কি প্রেম, কি করুণা! বালকের মত ইহার বিশ্বাস, মুনির মত ইহার ধীর্ণা ও অনুভোজন, মহাকবির মত ইহার অন্তর্জ্ঞান; যেন সকল জ্ঞান, সকল প্রেম ও সকল শক্তি একটি চিরকিশোরের রূপে লীলা করিতে নামিয়াছে। যেন বালক হইতে পারাই সাধনার শেষ সোপান, পরম-সত্তাই পরম সরল! তাই যীশুও বলিয়াছিলেন — "Blessed are the children, for theirs is the Kingdom of Heaven."

(ক্রমশঃ)

আলোকে যাহা ফুটিছে পরাণে
সবার লাগিবে আলো,
যে জ্যোতি হৃদিয়ে আমার আঁধার
সবারে দিবে সে আলো।

— রবীন্দ্রনাথ

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি — প্রথম, যে-রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায়, অভিনব মৌলিক এবং মনের পক্ষে খাদ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী — বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিয়া-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

( )

শিল্পী ও সমালোচক

(দুই বন্ধুর কথোপকথন)

[বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকার, অস্কার ওয়াইল্ড্ (Oscar Wilde)-লিখিত শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা। যেন সাহিত্যিক ও সমালোচকে দুই বন্ধু উচ্চাঙ্গের আলোচনা করিতেছেন — এই ভঙ্গিতে, লেখক তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শিল্প ও সাহিত্যজ্ঞান, এবং কবিজনোচিত রসিকতার সহিত, নানা প্রসঙ্গে নিজের স্বাধীনচিন্তা ও অতৈতিক চমকপ্রদ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক প্রমাণ করিতে চান যে, শুধু কবি বা শিল্পীই সৌন্দর্যসৃষ্টি করেন না, তিনি সমালোচক যিনিও কবি, তাঁহার সেই সমালোচনাও একপ্রকার সৃষ্টিই। মূল ইংরেজী গ্রন্থের ভাষা — চটুল, চিন্তা ও যুক্তি কাব্যোজ্জ্বল, এই তিনেরই সার্থক সম্মিলন ঘটিয়াছে, এজন্য লেখক কেবল কথায় নয় — তাঁহার ভাবে ও ভাষায় এই বইটিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। এই রচনাতেও পাঠক-পাঠিকাগণ এক বিষয়ে লেখকের বহুবিশ্রুত প্রতিভার পরিচয় পাইবেন — প্রচলিত মতের ঠিক বিপরীতটাকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার শক্তি; তাহাতেই তাঁহার উক্তিগুলি সময়ে সময়ে গভীরতর সত্যের মতো ধরা দিয়া উঠে।

স্থান — লণ্ডন, পিকাডিলির একটি সুসজ্জিত গৃহ। কাল — ২ রি

সিলবাট (পিয়ানো বাজাইতেছিলেন)। আলেন (ঘর হইতে মুখ তুলিয়া)। তোমার হাসছ কেন বল দেখি ?

চৌধুরে এই যে একখানা জীবন-গীতির বই

হয়েছে এর ভিতর একটা ভারি মজার গল্প শোনেছি।

দি — কি বই তখানা? ও:, ঘটে? তখানা আমি এখনও পড়িনি। বইখানা কেমন — বেশ ভালো?

অ — তুমি তখন পিয়ানো বাজাচ্ছিলে তখন আমি এই বইখানার পাতা উল্টে বেশ একটু আমোদ পাচ্ছিলাম,—যদিও আজকালকার এই সব স্মৃতিকথা আমার আদৌ ভাল লাগে না। এরা যারা লেখে, হয় তাদের একেবারে স্মৃতি-ভ্রংশ হয়েছে, নয়তো জীবনে তারা এমন কিছু করেনি যা' মনে থাকবার মত। সেই জন্যেই তাদের লেখা লোকে এত পড়তে চায়; আসল, এ দেশের লোক সেই সব লেখকের লেখা পড়ে' তৃপ্তিবোধ করে, বাদের নাম আর পাঁচজনেরই সমান।

দি — হাঁ, তা ঠিক: সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জন্যেও সেটা প্রয়োজনীয়; তারা সবাইকে ক্ষমা করতে পারে, কেবল, প্রতিভাবান ব্যক্তিকে ছাড়া। কিন্তু যাই বল, ঐ স্মৃতিকথা বা আত্মচরিতগুলো আমার ভারি ভালো লাগে — বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও যেমন, তেমনি, এর ঐ ভঙ্গিটাও। বড়লোকদের আত্মজীবন-কাহিনী বড় বেশি পাওয়া যায় না; যে দু'চারখানি পাওয়া গেছে সেগুলো যেমন লোভনীয়, তেমনই, পড়লে আর ভুলে যাবার যো নেই। রুসো (Rousseau) যে, কোনো ভক্তঠাকুরের কাছে গোপনে তাঁর জীবনের যতকিছু পাপ স্বীকার না ক'রে, সেগুলো বাইরে সকলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তার জন্যে জগৎবাসীর কাছে তিনি চিরদিন প্রীতির পাত্র হয়ে আছেন। না, সত্যি বলছি, আত্মজীবন-কাহিনীতে পাঠক দুঃখ না হ'য়ে পারে না। মানুষ জীবনের — মানুষের মুখভরা আত্মপ্রীতি যেন কোন দিক দিয়ে বেশ উপভোগ্য হয়ে থাকে: লোকে যখন নিজের কথা বলে, তখন সে কথায় আপনা হতেই যেন একটু রস এসে পড়ে; পরের কথা বলতে গেলেই বেরসিকতা করে ফেলে। তেমন, ধর, এর মত, যদি তাদের খুলে পড়া, আর ইচ্ছেমত বন্ধ করা যেত, তাহ'লে আরও ভাল হ'ত।

অ — তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কথা নিজেই লিখবে? তা হ'লে, এই যে সব এত মোটা মোটা করে' যত বড় জীবন-চরিত লিখছে এদের দশা কি হবে?

দি — তাদের দশা যা' হয়েছে তা' তো দেখতেই পাচ্ছ! তারা ত' একালের একটা জঞ্জাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক বড়লোকেরই অনেকগুলো করে' শিষ্য থাকে, তাদের মধ্যে যে 'হুজুগে' (অর্থাৎ, বিশ্বাসপ্রবণ) সেই তাঁর জীবন-চরিত লেখা করে।

অ — কি ভয়ানক কথা!

দি — না, ঐ কথাই সত্যি। সেকালে অনেকে মহাপুরুষদের দেবতা করে' তুলত, একালে তাদের ভূত বানিয়ে ছাড়ে। উৎসাহ বইএর সত্তা সংস্করণ হওয়া ভালই, কিন্তু বড় বড় লোক-দের এই রকম সস্তা সংস্করণ দেখলে ঘেন্না ধরে' যায়। যাক এসব কথা, এখন একটু বাজাই শোন; কি বাজাব — শোপ্যাঁ, না বোয়াক? বোয়াকের একটা খেয়ালী-সং বাজাই, এঁর জন্মাঙ্গলো ভারি উদ্ভাবক — অদ্ভুত সব জিনিষ খেলা আছে।

অ — না, আমার এখন গান ভাল লাগবেনা — ঐ রাগ-রাগিণীগুলো আমার কেমন যেন ঝাঁকা-ঝাঁকা ঠেকে, কোন-কিছুর স্পষ্ট প্রকাশ করে

থাকে না। না, সিরিয়াস্‌লি, তোমার বাজনা এখন থাক্‌, তুমি কিছু বোস, একটু কথাবার্তা চলুক। তোমের গলা আলো থাকলে না হয়ে ছিলুম সেটা সে, তখন তুমি কথা বল — তোমার গলাতে কেমন একটা ভাব আছে।

সি — (পিয়ানো হইতে উঠিয়া)। আজ রাতে আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না— ঐ রকম বিশ্রী হাসি হেসোনা, বলছি! সিগারেট খাই? ধন্যবাদ। এই এক-পাত্র ভ্যাকোডিলগুলো কি সুন্দর! যেন হাতির দাঁত আর এ্যাম্বার-মণি দিয়ে গড়া! এদের দেখে গ্রীকশিল্পকলার শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলির কথা মনে পড়ে। তুমি যে ঐ বইখানা পড়ে এত হাসছিলে—তার সেই আত্মকথার কোনখানটা পড়ছ? তাতে তোর্‌ পাশকর্দের জন্য ঐ মহাজ্ঞানী ব্যক্তিটি এমন অনুতপ্ত হয়ে উঠেছেন? বল, শুনি। পোপারের ঐ রাশিয়ান বাজাতে বাজাতে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন কত পাপ করেছি, তার জন্যে কান্নায় বুক ভরে' উঠছিল! যেন এমন সব দারুণ ট্র্যাজেডি আমার জীবনে ঘটেছে যার শোক আমি ভুলতে পারছিনে। কক্ষ, কোনটাই আমার নয়! আমার বোধ হয়, কেবল গানেরই ঐ শক্তি আছে। গানের দ্বারাই এমন একটা বিরহ-কালের সৃষ্টি হয়, যা আমাদের চেতনায় কখনো ছিল না, এমন সব বেদনা প্রাণের ভিতরে ভিড় করে' আসে, যা' আমাদের চোখ কখনো অশ্রুময় করেনি। আমি এখনও কল্পনা করতে পারি যে, যে-লোক বরাবর একটা সাধারণ জীবন যাপন ক'রে এসেছে, সেও হঠাৎ কোথাও একটা অদ্ভুত সুরের আলাপ শুনে যেন নিজের অজ্ঞাতেই নিজের গভীরতম সত্তাকে আবিষ্কার ক'রে ফেলে। তার প্রাণে তখন কত রকমের অপার্থিব অনুভূতি হতে থাকে — কত দুঃসাহসিক সুখ, কত উন্মত্ত রোমান্টিক প্রেম, কত বিরাট বৈরাগ্যের বাসনা। তার জীবনে যেন ঐ সকলই ঘটেছে! বল, অনেক্ষণ তোমার ঐ গল্পটা শুনি।

আ — গল্পটা তেমন কিছু নয়। তবে, ওর থেকে একটা চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়— আজকাল যে যন্ত্রের আর্ট-সমালোচনা হয়ে থাকে তার মূল্য কতটুকু। একজন মহিলা নাকি কোন এক বিখ্যাত চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর সেই ছবিগুলো তিনি কি হাত দিয়ে এঁকে থাকেন?

সি — সত্যিই কি তিনি হাত দিয়ে আঁকতেন?

আ — নাঃ, তোমাকে আর পারা গেল না! সে যাই হোক, তুমিই বল না, শিল্পীদের কল্পনা সমালোচনা করার কি দরকার? আর্টিষ্ট যা করে তাই করুক না। যদি কোন নতুন জগৎ সৃষ্টি করাই তার অভিপ্রায় হয়, তাই করুক না সে; কিম্বা যে-জগৎ আমরা সর্বদা দেখতে পাচ্ছি তারই একটা প্রতিবিম্ব যদি প্রতিফলিত করতে পারে, সেই বা মন্দ কি! এই অতি-পরিচিত জগৎকে যেন একটু নতুন করে' সাজিয়ে — তার নিজের গৌরবময়, স্বয়ং নির্বাচনী বুদ্ধি দিয়ে, যদি এটাকে একটু শোধন করে না দেয়, তবে ওটা যে বড় একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে! আর্টিষ্টরাই ত' তাকে একটা এক-মুহূর্তের পরম-রমণীয়তায় উদ্ভাসিত করে' তোলে। আমার মনে হয়, কল্পনা জিনিসটার অবাধ স্ফূর্তির জন্যে একটা বড়-রকমের অবকাশ চাই — নির্বাক নির্জনতা চাই। সমালোচকের তীব্র চীৎকার শিল্পীর সেই ধ্যান ভঙ্গ করবে কেন? যারা

নিজেরা কোন-কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তারা পরের সৃষ্টি-করা জিনিসের ভুল বিচার করবার স্পর্দ্ধা করে কেন? তারা এ সবের কি জানে? জানো চশমা যদি এমনিই বেশ দেখতে পারা যায়, তা' হলে তার আবার ব্যাখ্যা কেন?

বি — আর, সেই চশমা যদি দুর্বোধ্য হয় তা হ'লে ব্যাখ্যা করতে যাওয়াটাও অন্যায়।

আ — আমি ত' তা' বলিনি।

বি — না বললেও বলা উচিত ছিল। এতদিনে সকল বস্তুকেই এমন স্পষ্ট ও রহস্য-বর্জ্জিত করে' তোলা হয়েছে যে, যদি কোথাও একটু অস্পষ্টতার রহস্য এসেও জোটে যায়, তবে সেটুকুকে হায়রাণ হয়ে আমি ছাড়ি নই। যাঁরা দৈবী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাঁদের শক্তির সেই অলৌকিকতা ব্যাখ্যার দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্রাউনিঙের কথাই ধর না কেন। তাঁর কাব্যে যে একটা যাকোটাইকে যাকো প্রকাশ করার প্রয়াস আছে — সে কথা আর কেউ বলে না, কেন—তাঁর বলবারই কিছু ছিল না। আমি তাঁর রচনাবলীর অলঙ্ঘনতার কথাই বলছি। তবু সব দিক দিয়ে বিচার করলে বলতেই হবে, তিনি বড়লোকই একজন ছিলেন— দেবতার মত পূর্ণ শক্তির অধিকারী না হ'লেও মানুষের মত অসম্পূর্ণ শক্তি তাঁর ছিল। মানুষের মনের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল কলকব্জা-গুলোই তিনি এত বড় করে' দেখেছিলেন যে, কোন ভাষাই তার বাহন হ'তে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস; তাই তিনি তাঁর রচনার ভাষাকে কিছুমাত্র খাটিয়ে করেন নি। ব্রাউনিঙের হাতে পড়ের মিল জিনিসটাও যেন একটা তুচ্ছ আবোলের বস্তু হয়ে উঠেছিল। অথচ ঐ মিলই সিরিসিয়ারবাসিনী কাব্য-লক্ষ্মীর মিষ্টি-কণ্ঠের অপরূপ প্রতিধ্বনির মত নিজ-কণ্ঠের নিজেই সৃষ্টি করে', সে নিজেই যেন তার প্রত্যুত্তর করে। মিল ত' শুধুই ধ্বনিমাধুরীর একটা মূল উপকরণ নয়, ওর একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে; বড় শিল্পীর হাতে পড়লে মিল আমাদের চিত্তে ভাবান্তর ঘটাতে পারে, কিন্তুর ভাবের চমক দেয়—কেবলমাত্র ওই শিঞ্জন-ধ্বনির শান্দিয়তাই কোন একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সন্ধান খুলে যায়, কল্পনাও যা খুলতে পারে নি। ওই একটি কৌশলের দ্বারা মানুষের ভাবাকে দেবতার ভাষার পরিণত করা সম্ভব হয়েছে; গ্রীক কবিদের সেই বীণার আমরা ঐ একটি তার মাত্র খোজনা করতে পেরেছি। তবু ব্রাউনিঙকে বড়ই বলতে হবে। কিন্তু কিসে বড়? কবিহিসেবে নয়, — মন-নারীর মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে। সেই কথায় এতবড় শিল্পী বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আর দেখা দেয় নি। নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান সৃষ্টি করতে ওঁর জুড়ি নেই বললেও হয়। তিনি নিজে যে-সব সমস্যা উত্থাপন করেছেন, তার জবাব নিজেও দিতে পারেন নি বটে, কিন্তু সেই সমস্যা তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন,— শিল্পীর পক্ষে তাই ত' যথেষ্ট। চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়ে বিচার করলেও ওঁকে সেই আরেক জনের পরেই স্থান দিতে হবে— যিনি হ্যামলেট-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন; যদি ঐ সঙ্গে ওঁর বাক্‌শক্তিও থাকত, তা' হলে তিনি একেবারে ওঁর পাশেই বসতে পারতেন। ব্রাউনিঙ নাটের পরিবর্ত্ত-হিসেবে

পত্রের ব্যবহার জানেন।

আ — তুমি যা বলছ তার অনেকটা সত্যি বটে, কিন্তু সব সত্যি নয় — কতকগুলো বিষয়ে তোমার মত স্বাধীনভাবে বলে' মনে হয় না।

দি — যাকে ভালবাসি তার প্রতি একটু অবিচার না করে থাকি যে। কিন্তু তোমার কথাটা কি ছিল? — তুমি কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলে?

আ — আর কিছু নয়, কেবল এই কথা — যেকালে শিল্পকলায় চরম উৎকর্ষ হয়েছিল, সেকালে কোন দলাদলোচক ছিল না।

দি — বেশ, ও কথাটা আমি যেন আগেও শুনেছি। কথাটা পুরনো বন্ধুর মতো নবত্বহীন, আর যুক্তিতার মতই নিরর্থকতা।

আ — না, কথাটা অতিথির মতো — নিশ্চয়! — বড়ই তোমার অসন্তোষের কারণ, বড়ই তুমি বাধা পাচ্ছো না কেন। শিল্পকলার সবচেয়ে উন্নতি হয়েছিল যে-যুগে সে-যুগে তার কোন সমালোচক ছিল না। সেকালে শিল্পীরা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। নদীর ধার থেকে তারা যে যিহিন মাটি তুলে আনত তার থেকেই — কেবল হাতের বা কাঠের ছোট একটা টুকরো দিয়ে — এমন সব মনোহর পুতুল গড়ত, যা' তখনকার দিনের লোকেরা তাদের মৃত-আত্মীয়-বন্ধুদের কবরের ভিতরে সাজিয়ে দিত — দুঃখ-রাত তাই নিয়ে খেলা করবে। এখনো টাবারার পাহাড়ের ধারে হলুদবর্ণ বালির নীচে যে সব পুতুল পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মাথার চুলে, মুখের কোণে, পোষাকের পাকে যেন লাল রঙের রাগ অল্পই ধ'রে রেখে গেছে। লম্বা-লম্বা গ্রাউটের একখানি দীর্ঘ চিত্র-ফলক তারা তৈরী করে নিত; তাতিয়ের ঘা'রো দিয়ে, কিম্বা চুন ও আলকাতরা দিয়ে রঙ করত সেই গ্রাউটার; সেই রকমের গ্রাউটের ফলকে তারা যে সব ছবি তুলত, তাদের কোনটা স্বর্গের উদ্যানে ক্রাইষ্টদেবের নরনারীরূপে বিচরণ করছে — পায়ের নীচে রাশি রাশি রক্ত-নীল আফোডেল-ফুল ফুটে রয়েছে, তাদের মাঝখানটি শাদা; কিম্বা সে ছবি প্রিয়াম-দুহিতা পলিক্সেনার ছবি — যার আখিপাতের মতো লম্বা টুক-টুকে যেন আসল হয়ে রয়েছে! তারা জীবনের কোন ছবিই বাদ দেয়নি। বাজারে বসে' কেনা-বেচা করছে লোকজনের; পাহাড়ের ধারে মেষ চরাচ্ছে গায়ে চামড়া-মুড়ি-দেওয়া রাখাল; বনে 'লরেল'-গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে বন-দেবী, নিস্তব্ধ দুপুরে বাঁশি বাজাচ্ছে বন-দেবতা; লম্বা পর্দা-ঢাকা চতুর্দোলে চলেছেন কোন রাজা, বাহকদের বাঁধরাঙা ছেলে চমচম করছে, ময়ূরপুচ্ছের পাখা নিয়ে ক্রীতদাসেরা তাঁকে বাজন করছে। মুখে হাসি এবং চোখে জল নিয়ে নরনারীরা সব তাদের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে, তারা সেই সব দুঃখ ভাল ক'রেই দেখেছে — সেই সব প্রাণের গোপন কথা তাদেরও জানা কথা হয়ে গিয়েছে। তারা রঙ ও রেখার সহায়ে একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছিল। কোন বাজে কথায় তাদের বিরক্ত হ'তে হয়নি, তাদের কাজ তারা আপন মনেই করে' গিয়েছে। গ্রীকদের মধ্যে কোন শিল্প-সমালোচক ছিল না।

দি — মানলুম, তোমার কথাগুলি বড়ই প্রতিধ্বনিযুক্ত, কিন্তু মতামত বড়ই যুক্তিহীন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি বোধ হয় কোন বড়-বড় বক্তৃতার মুখে এই সব কথা শুনে থাকবে। ঐ কাজটি বড়ই বিপজ্জনক, — ওটা যদি তোমার একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়, তা' হলে তোমার চিন্তাশক্তির ধার একেবারেই ভোঁতা

হয়ে যাবে। আজকালকার সাময়িক-সাহিত্যে যে রকম ছড়াছড়ি হয়ে থাকে তার সম্বন্ধে কিছু বলা আমার কর্ম নয়। তাছাড়া এ মত একটা নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন যে, — যারা সবচেয়ে উঁচুতে ও চুলচেরা তারাই টিঁকে থাকে—সেই নিয়মের জোরেই ও গুলোও টিঁকে আছে, এবং থাকবে। আমি খাঁটি সাহিত্যের কথাই বলছি।

অ — সাহিত্য, আর ঐ সাময়িক প্রয়োজনে যা লেখা হয়, তার মধ্যে তফাৎ কি?

বি — একটা পড়বার উপযুক্ত নয়, অপরটা কেউ পড়ে না, এই মাত্র। তবে হেরফের ঐ যে মত — গ্রীকদের ছিলনে কোন শিল্প-সমালোচক ছিল না, এটা অতিরঞ্জন মাত্র। বরং এই কথা বললেই যথার্থ হবে যে, গ্রীকজাতটাই ছিল সমালোচকের জাত।

অ — বল কি?

বি — হাঁ, আজকাল যে-সমালোচকের জাত। কিন্তু গ্রীক শিল্পীর সঙ্গে যে জাতের সমালোচকের যে সম্বন্ধ ছিল, তাকে তুমি যে রকম অন্যায়-রকম তীব্রতায় নিন্দিত করেছ — তোমার ঐ চেয়েকার কবিতাটি — আমি সেই কথাই বলতে চাই যে। যা' কখনো ঘটেনি তারই একটা অতিরঞ্জিত নির্খুঁত ও যথাযথ বিবৃতি দেওয়াই যেমন ঐতিহাসিকমাত্রের যথার্থ কাজ, তেমনই, যার একটু বিদ্যাবুদ্ধি ও রসবোধ আছে তারও ঐ রকম গল্প তৈরী করবার অধিকার নিশ্চয় আছে। তবু আমি পণ্ডিতী ধরনে কথা-কওয়া পছন্দ করিনে। পণ্ডিতী আলাপ কেবল তারাই ক'রে থাকে যারা নিজেদের মূর্খতা গোপন করতে চায়, কিম্বা যাদের মস্তিষ্ক চালনা করবার মত আর কোন কাজই নেই। যা, এসো, তোমাকে যোয়াকের একখানা গল্প বানিয়ে শোনাই — খুব পাকাপাকা রকমের, যাকে বলে রসে উৎরেছে। দেওয়ালের পর্দার-আঁকা ঐ মূর্তিগুলো নির্বাক দেখাচ্ছে — তবু কেমন হাসি-মুখে চেয়ে আছে! আর ঐ রোদের মার্সিয়াস্‌টা — ওর চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে উঠেছে। এমন একটা গভীর আলোচনা থাক্। শোন, আমরা যে যুগে জন্মেছি সে যুগে যার কথা যত নীরস তাকেই লোকে তত চিত্তাকর্ষক ক'রে খাটিয়ে তবে — আমার সবচেয়ে ভয়, পাছে লোকে আমার কথায় উল্টো-মানে না করে। তুমিও আমার এমন অবস্থা ভোলো না যে, আমার মুখ দিয়ে কেবল তাকে-দাগবার মত কথাই বেরুতে থাকে। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া অবিশ্যি খুব ভাল কাজ, কিন্তু এটাও মাঝে মাঝে মনে রাখা উচিত যে, কোন বস্তুর চরিত্রের কোন মূল্য আছে তা কষ্টিতে বিচিয়ে দেওয়া যায় না। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে, আমি চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছি — ঠিক যেন কাঁচি-দিয়ে-কাটা এক টুকরো জুপোর পাত। তারাগুলো যেন সোনালী সুতোর তোষরা — ওকে ঘিরে আছে। আকাশটা যেন একটা বিরাট নীলকান্ত-মণি, তারি পাথরখানা কুঁদে কিতকটা ওই রকম গোল করে তুলেছে! চল, বেরিয়ে প'ড়ে ঐ রাত্রির রূপে অবগাহন করা যাক। ব'সে ব'সে মনের সঙ্গে খেলা করা বড়ই চমৎকার লাগে বটে, কিন্তু না ভেবে-চিন্তে যে-কোন একদিকে বেরিয়ে পড়া আরও রোমাঞ্চকর।

অ — তোমার মত খেয়ালী মানুষ দেখিনি। আমি আজ তোমার হাতছিমে, ঐ আলোচনাটা তোমাকে করতেই হবে; তুমি যে বললে, গ্রীকরা সকলেই ছিল আর্টের সমঝদার —

আচ্ছা, সমজদারীর কি প্রমাণ তারা দেছে ?

সি — কি জানো বন্ধু, গ্রীকরা যদি তাদের সেই সমালোচনা-শক্তির কিছুমাত্র নিদর্শন রেখে না-ও যেতো, তবু বলতে হবে যে, তারা, যেমন আর সব বিষয়েই শাস্ত্ররচনা করে' গেছে, তেমনি, এই শিল্পকলা-বিচারের শাস্ত্রও তাদের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। আমরা কোন্ একটি বস্তুর জন্যে গ্রীকদের কাছে সবচেয়ে ঋণী ? — সে আর কিছু নয়, ঐ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিটি তারা যেমন — ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অধ্যাত্ম-বিদ্যা, রাজনীতি, শিক্ষাবিজ্ঞান — সকল বিষয়ে প্রয়োগ করেছিল, তেমনি, আর্টের উপরেও করেছিল ; — যে দুটো কলাশিল্প সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদের সম্বন্ধেই অত্যন্ত নির্খুঁত শাস্ত্র রচনা করে গেছে তারা।

আ — সে দুটি বস্তু কি ?

সি — মানুষের জীবন, আর সাহিত্য ; — জীবন আর জীবনের নিখুঁত প্রকাশ। মানুষের জীবন সম্বন্ধে গ্রীকরা যে সব নীতি স্থির ক'রে গিয়েছিল, একালে এত বিষয়ে উপাদনা করে' আমরা তার মূলা খুঁজতে পাবো না। কিন্তু অপরটির বিষয়ে যে সব বিধি তারা নির্দেশ করে গিয়েছে অনেক জায়গায় তা' এত স্পষ্ট যে, আমরা বুঝতেই পারি নে। তারা ঠিকই ধারণা করেছিল যে, যে-শিল্প মানুষের জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যকে আত্মায় যত প্রতিবিম্বিত করতে পারে, সেই শিল্পই শিল্পকলার চরম ; তাই তারা কাব্যকে নিয়ে সমালোচনায় সুরু করেছিল। এই ধর গল্প। ঐ গল্পের জন্যটাকে তারা যে রকম ক'রে রীতিমত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বোঝবার চেষ্টা করেছিল, বোধ হয়, আজকালকার সুরসিকেরাও তাদের সুক্ষ্ম-সঙ্গতি-বিচারে তত্খানি সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় দেয় না। ছাপাখানা সৃষ্টি হওয়ার পর, গ্রন্থের দর্শ ও শিল্পশ্রেণীর মধ্যে যে সর্বনেশে বই-পড়া-রোগ জন্মেই বেড়ে উঠল তার ফলে, সাহিত্যকে কান দিয়ে শোনার অভ্যাস উঠে গেল, সবাই তাকে চোখ দিয়ে গিলতে লাগল। অথচ, কলা-শিল্পবিশেষের কাছে উপভোগ করবার প্রকৃষ্ট ইন্দ্রিয় হ'ল কান ; ঐ কানকে খুশী করার যে সব উপায় আছে, কাব্য রচনা করতে গিয়ে তার দিকে লক্ষ্য রেখে। এখন আমরা লেখাটাকেই একটা রীতিমত শিল্পকলা করে তুলেছি — ঐটেই হয়েছে একরকম বন্ধ্যা-রোগের কাজ। গ্রীকরা কিন্তু তা করেনি ; তাদের কাছে লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল — কাব্যকে রাত্রির থেকে না হারানো। তারা রচনার ভাল বাচাই করত তার কথাগুলোর আওয়াজ ধরে' — তার ছন্দ, তার শব্দগুলোর মধ্যে পরস্পরের সুর-সঙ্গতি কেমন হয়েছে, এই সব দেখে। কণ্ঠস্বরটাই ছিল কবিতার সাধন, আর কানই ছিল যাচনদার। আমার সন্দেহ সময়ে মনে হয়, ঐ যে হোমারের অন্ধ-হওয়ার কথা — ওর একটা রূপক-অর্থ আছে' ; তাই গাইতো, পরে যখন কাব্যের সমালোচনা আরম্ভ হয়, তখনই তৈরী হয়েছিল। ওর মানে এই যে, খুব বড় কবি যাঁরা তাঁরা যে কেবল দ্রষ্টা — কেবল যে অন্তশ্চক্ষু দিয়েই তাঁরা সব দেখতে পান, তা নয়, তাঁরা গায়কও বটে ; তাঁরা তাঁদের গান শুনে চোখের সুরের সাহায্যে, প্রত্যেক লাইনটি তাঁরা বার বার আবৃত্তি করেন, যতক্ষণ না তার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতটি কানে বাজে — যে

কথাগুলো আমাদের পাঠ্য হেরেস, তেওলো ও,র অবশ্যপাঠ্য দুরূহ ক'রে তোলেন। ঠিক এই কথাটা বলা না হতে পারে, কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন একটা কারণেই হোক, বা একটা যোগাযোগেই হোক — ইংলণ্ডের মহাকবি অষ্ট-শ্লোকেই তাঁর সেই বয়সের কবিতার মহান হয়, সেই অপরূপ সুরের গরিমা যাকে করে-ছিলেন। মিলটন যেন আর লিখতে পারতেন না, তখনই তিনি গাইতে সুরু করেছিলেন। তিনি যখন অন্ধ হলেন তখন তিনি যে সুর রচনা করতে লাগলেন—তাঁহলই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল, আর তাই হওয়াই উচিত। এ কথা মানতেই হবে যে, ঐ লেখার অভ্যাসটাই সাহিত্যিকদের কাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আমাদের আজকের সেই অক্ষরের শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন করতে হবে, তবে যাওয়াই সব কিছু যাচাই করতে হবে; তা হলো, গ্রীকদের নিয়ম-সমালোচনার যে সব সুস্থ নীতি ছিল তা আমরা খুঁজতে পারব। তুমি কিন্তু আমাকে ফরমাস করো না — ছোটো থেকে প্রোটিনাস পর্যন্ত যত গ্রীক সমালোচনা-শাস্ত্র লেখা হয়েছে তাদের ধারাবাহিক বিবরণ দিই। আজকের মুস্কিলটা এই যে, ওসব আলোচনা এখন মোটেই কাজে লাগবে না: ঐ টীকাও যদি আমাদের ঐ রকমের আলোচনা জমতে পায় তা' হ'লে ওর ওই ছাইয়াপা মুখ আরও খানিকটা ছাই মেখে নেবে। তবু একখানি খুব ছোট্ট রসশাস্ত্রের কথা বলতে পারো — আরিস্টটলের 'কাব্যবিচার,' — ওতে সব চুকিয়ে ক'রে বলা হয়েছে। বইখানার রচনারীতি মোটেই ভাল নয়—যেন একটা বড় বক্তৃতার সূচী-হিসেবে কতকগুলো টিকা খুব সংক্ষেপে মোটা ক'রে লাখা হয়েছে; কিন্তু, একখানা বড় বই লেখবার আগে তার বিষয়টার কতকগুলো টুকরো-টুকরো অংশ লিখে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওর ওই বিচার-পদ্ধতি, আর লেখকের মনের ভঙ্গিটি একেবারে উৎকৃষ্টতম বললেই হয়। শিল্পকলার দ্বারা সমাজের যে হিতসাধন হয়, মানুষের যে চিত্তোৎকর্ষ হয়, এবং চরিত্রগঠনেই যা তার কার্যকারিতা তত্টুকু — এ সকল আলোচনা প্লেটো প্রায় শেষ করে গেছেন; কিন্তু আরিস্টটলের এই বইখানিতে আর্টের যে বিচার করা হয়েছে, তা' চরিত্রনীতির দিক দিয়ে নয়, একেবারে খাঁটি রসবস্তুর দিক দিয়ে। প্লেটোও অবিশ্যি খাঁটি রসের দিকটা বাদ দেন নি; আর্টের নানা অঙ্গ ও উপকরণ সম্বন্ধে তিনিও আলোচনা করেছেন। তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম মানুষের প্রাণে সেই বাসনাটি জাগিয়ে দিয়েছিলেন, যে-বাসনা আমরা এখনও পূর্ণ করতে পারিনি — সেই জিজ্ঞাসা — সত্যের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক কি? বিশ্ববিধানের মূলে যে একটা চিন্তাশক্তি এবং মঙ্গল-অভিপ্রায় আছে, তা'তে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়? তিনি ভাব-বাদ (Idealism) ও বস্তু-বাদ (Realism)-এর যে সব সমস্যা উত্থাপন ও মীমাংসা করেছিলেন — অন্যান্য চিন্তার ক্ষেত্রে তার থেকে বিশেষ ফল পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু সেই তত্ত্বগুলোকেই আর্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখতে পাবে, তাদের মূল্য এখনও বিন্দুমাত্র কমে নি। কিন্তু আরিস্টটল আর্টের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি; তিনি, গ্যেটের (Goethe)

হয়ই, আর্টের নানা-রূপ — যা' হুজুগে ছুটে উঠে, তারই ব্যাখ্যা ও বিচার করেছেন—যেমন, তিনি ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে বলেছেন। ট্র্যাজেডির প্রধান উপাদান হ'ল তার ভাষা; মানুষের জীবনই তার বিষয়-বস্তু; তা'র জিনিস হচ্ছে একটা ঘটনা-ধারা: তাকে যে উপায়ে প্রকটিত করতে হবে, সে হ'ল অভিনয় এবং সেই সম্পর্কে বক্তব্য; তার একটা কার্যকারণসূত্রের পাকা চাই—সেটা হচ্ছে প্লট (Plot) বা গল্পনির্মাণের কৌশল; তারপর, সর্বশেষে, মানুষের প্রাণে তার সেই অনুভূতিসঞ্চারের শক্তি, সেটা হবে—রস বা অনুভূতির ভিতর দিয়ে একটা সুখময়-বোধ। গ্রীক না হ'লে এর সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ আর কেউ করতে পারত? শিল্প-সমালোচনার যা' কিছু — সব আমরা গ্রীকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাদের মনোযোগ যে কত সূক্ষ্ম ছিল, তার একটা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তারা যে উপাদানটি তাদের বিশেষ পরীক্ষা ক'রে সোবগুলি বিচার করত, সে হচ্ছে—ভাষা; এ কথা আমি তোমাকে আগে বলেছি। যে ছবি আঁকে, বা যে মূর্তি গড়ে তার শিল্পকর্মের উপাদান—তাদের তুলনায় অতি সামান্য বলতে হবে। তারা যা' যাত্র বর্ণসন্নিবেশে; তার দ্বারা বীণা বা বেহালার মত সঙ্গীত উৎপন্ন করা যায়; এমন ছবি আঁকা যায় বা' শেলি বা জেমিস-বাসী কোন চিত্রকরের আঁকা অতুল চিত্রপটের চেয়ে চোখকে কম খুশী করে না; এবং তার দ্বারা যে মূর্তি গ'ড়ে তোলা যায় তা'ও হোক বা মর্মর পাথরে-গড়া কোন মূর্তির চেয়ে কম সুঠাম বা সুডৌল নয়; কিন্তু এসবের দ্বারাও, ঐ ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় মানুষের ভাবনা, কামনা, তার আত্মার আহুতি—আর কিছু দ্বারা তা' হয় না।

কিন্তু না, আর নয়; ঐ দেখ, চাঁদটা একখানা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে—গন্ধকের মত ফিকে-হলুদ-রঙের একখানা মেঘ। কিম্বা, সিংহের কেশরের যেমন রং, যেমনধারা সেই রঙের—সেই কেশরের ভিতর দিয়ে সিংহের একটা চোখ যেন চেয়ে রয়েছে। ওর রঙ হয়েছে, আমি বুঝি কেবল তোমার সঙ্গে কথাই কইব। কিন্তু তবুও কোন কারণ নেই; আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—বহু দূর-কালের অস্পষ্ট, অর্ধেক-জানা, নীরস তথ্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি! এখন আমার পক্ষে, মেঘের অন্তরালের মত যে একমাত্র সুখ-সম্ভোগ — সে হচ্ছে, আর একটা সিগারেট। সিগারেটের অন্তত একটা গুণ আছে — অতৃপ্তিটা নষ্ট হয় না।

আ — আমার সিগারেটে একটা দোষ না, কেমন লাগে। এগুলো সত্যিই ভালো—আমি একেবারে তাইরো ছেড়ে আমাই।

(ক্রমশঃ)

সভ্যতা

(পূর্ণাঙ্গমূর্তি)

সভ্যতা ও তাহার বিস্তার

আমি এখনও সভ্যতার একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করি নাই, বোধ হয়, তাহা আর আবশ্যক হইবে না। আমার মনে হয়, যাঁহারা এ পর্যন্ত আমার এই প্রবন্ধ ধৈর্যসহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি সভ্যতা বলিতে কি বুঝি। সভ্যতা সমাজ-জীবনেরই একটা গুণ। খুব স্থূল অর্থে ইহা সেই বস্তু যাহার দ্বারা আমরা উন্নত ও অনুন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করি। অসভ্য সমাজের মানুষও যখন তাহার সহজাত প্রবৃত্তি গুলার উপরে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে, তখনই তাহারা অতি সামান্য মূল্যজ্ঞানেরও অধিকারী হয় — অর্থাৎ কোন্‌টা সুখ এবং কোন্‌টা দুঃখ, কোন্‌টা শ্রেয়োলাভের সাক্ষাৎ উপায়, কোন্‌টাই বা তাহার তুলনায় দূরের — এইরূপ বোধ করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহারা সভ্যতার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে। সভ্যতার পথে যে প্রথম পদক্ষেপ তাহা ঐ — বিচারবুদ্ধির দ্বারা অন্ধ সংস্কারের ক্রমসংশোধন; দ্বিতীয় পদক্ষেপ — অব্যবহিত এবং স্থূল ভোগসুখের জন্য প্রত্যক্ষ ও মূলত ভোগাবস্তুকে পরিত্যাগ। অসভ্য মানুষ যখন ক্ষুধার্ত হইয়া একটা বন্যপশু শিকার করে, তখনই সে তাহা কাঁচা খাইয়া ফেলে; কিন্তু যেদিন সে তাহা না করিয়া বন্যপশুটাকে ঘরে লইয়া যায় এবং তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সুখে ভক্ষণ করে, সেইদিন সে প্রথম আদিমের পথে পা বাড়াইয়াছে, সভ্যতার পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। আবার, ঠিক সেই কারণে মানুষকে ক্রম-মানসীলীবের প্রথম বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ সেইদিন হইতে তাহার মধ্যে জীবশক্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে. এই তত্ত্বটি প্রণিধানযোগ্য। সভ্যতা জিনিসটা চরিম, উহা প্রকৃতিবিরোধী। যাহাকে আমরা উন্নতি বা উপচয় বলি, তাহাই আর এক অর্থে অবনতি বা অপচয়ও বটে। যাহারা মানুষের জ্ঞান বা অনুভবশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, এমনকি, যাহারা শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাদিগকে, ঐ সকলের ফলস্বরূপ কৃত্রিম সমাজ হইতে তুলিয়া আনিবার করিয়াছে বটে; কিন্তু যাহারা, বুদ্ধিহীনতা, বুভুক্ষা, অথবা ঈর্ষার তাড়নে, সে সকল ত্যাগ করিতে অক্ষম, তাহারা ঐ সকল নবাবিষ্কারের ভোগী, অতিমাত্র সুখভোগের সঙ্কল্পলাভা মনীষীদিগকে ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া অভিশাপ দিয়াছে। এই দুইয়ের অর্থ যেমন হউক, তাহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই; অন্তত এইটুকুও স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, খাইবার পূর্বে কাঁচা মাংস রন্ধন করিবার প্রবৃত্তিটার দুই অর্থই হইতে পারে; উহা সভ্যতার প্রথম সোপান হইতে পারে, অথবা, সেই চার-হাত-পা'ওয়ালা আদি অকৃত্রিম অবস্থা হইতে দুই-পায়ে-চলার কৃত্রিম অবস্থায় মানব-জাতির অধঃপতনও হইতে পারে।

সভ্যতার যে দুইটি প্রধান প্রাথমিক লক্ষণ — সেই বিচারশীলতা ও বুভুক্ষণ হইতেই বহু অপর গুণের উদ্ভব হইয়া থাকে, যথা :— লজ্জা-সুন্দরের পূজা; তিতিক্ষা বা পরদুঃখসহিষ্ণুতা; ভাল-মন্দ-বোধের সূক্ষ্মতা; ঋজুতা; শিষ্টাচার; অনুসন্ধিৎসা, অন্তর্বাস, মিতব্যয়িতা ও আতিথ্য এই তিনের প্রতি বিমুখতা; কুসংস্কার ও শুচিতাগর্ব হইতে অব্যাহতি;

জীবনের যত কিছু উত্তম ভোগ্য বস্তুর প্রতি বিরাগ-হীনতা ; পূর্ণ আত্মতুষ্টি ও স্বাধীন-বিকাশের আকাঙ্ক্ষা ; মানব দাসত্বশক্তির চিন্তা সম্পূর্ণভাবে বর্জন ; নীচাশয়তার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ; অর্থাৎ, যে গুণগুলি দুইটি মাত্র কথার সংক্ষেপে নির্দেশ করা যায় — হৃদয়ের সরলতা ও মনের উজ্জ্বলতা।

কিন্তু সমাজ বলিতে যে একটা অতিশয় অনির্দেশ্য চরিত্রের জনসংঘটিক বুঝায়, তাহার কি সত্যই এইরূপ স্বচ্ছ ভাষাময়ী থাকিতে পারে ? পারে, কিন্তু খুব সুস্পষ্ট অর্থে নয়। বিভিন্ন কালের বিভিন্ন মানবসমাজ অন্তরাধিক স্থায়ী অভ্যাসগুলি বাহ্য প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের ভস্মরাশিতে তাহাদের চিরন্তনতার পরিচয় প্রকাশ করিয়া থাকে ; নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের চক্ষে এই বাহিরের জিনিষগুলিই সেই সমাজের সভ্যতার নিঃসংশয় নির্দশন বলিয়া গণ্য হয়। তাহাদের আচার-প্রথা, জীবনযাত্রার নানা উপকরণ, রীতি-নীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবের নানারূপ শ্রেণীবিন্যাস, এবং সর্বোপরি, যে ধরণের বিজ্ঞান ও শিল্পকলার আদর তাহারা করিয়াছিল, এবং যাহার উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইয়াছিল — সেই সকলই একটা বিশিষ্ট সভ্যতার পরিচয় বহন করে। আবার, যে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ না করিলেও, তাহার সৃষ্টি সেই সমাজেই হইয়াছিল, তাহারও সেই সভ্যতার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সে কালের সে সমাজের মনোভাব বিরূপ ছিল, এই উপলব্ধিটার নির্দশন হইতে তাহার একটা সঙ্কেত মাত্র পাওয়া যায়, তাহাও অভ্রান্ত নহে। তথাপি, ঐ সকল বিলাইয়া যে একটি বিশিষ্ট ধরণের সামাজিক মানস-জীবনের পরিচয় গড়িয়া লওয়া হয় তাহারই নাম — সভ্যতা : অর্থাৎ সমাজ-বদ্ধ জীবনের কতকগুলি আচারে-ব্যবহারে, একটা বিশেষ মনোভঙ্গির ফলে যে রূপটি ফুটিয়া উঠে, তাহাই সভ্যতা। এই বিশেষ ঢং বা বিশেষ ছাঁদ সঞ্চারিত হয় কোথা হইতে ? ব্যক্তি-বিশেষ হইতেই যে ইহার উৎপত্তি তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু মাত্র একটি ব্যক্তির চিত্তোৎকর্ষ ইহার হেতু হইতে পারে না — সে ত' সমুদ্রে একফোঁটা মিষ্টত্বের মত। একজন মানুষের দ্বারা একটা সভ্যতার সৃষ্টি হইতে পারে না। গত তিন হাজার বৎসরের কোন সময়েই পৃথিবীতে সভ্যমানুষ একেবারে বিরল ছিল না নিশ্চয়। অতিশয় আদিম বর্বরযুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, পরবর্তী যুগগুলিতে — সে যুগ যতই অন্ধকার অজ্ঞানের যুগ হউক না কেন — অন্ততঃ একজন বা দুইজন সভ্যমানুষ পৃথিবীতে অবশ্যই ছিল। তাহাতে সভ্যতার সৃষ্টি হয় নাই। কেবল, যে-কালে এমন সংখ্যক সভ্যমানুষ একত্র হইতে পারিয়াছিল, যাহাতে একটা ক্ষুদ্র কেন্দ্রমণ্ডল রচনা করিয়া তাহারা তাহাদের অন্তরের সরলতা বিস্তার করিতে এবং মনের আলোক বিকিরণ করিতে পারে—তখনই সভ্যতা-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। ঐ কেন্দ্রমণ্ডলটি, সংখ্যায় ও শক্তিতে উপযুক্ত হইতে না পারিলে, জনসমূহের মন নিজেদের মনের মত অনুবর্তিত করিতে সক্ষম হয় না; এইরূপ এক একটি মণ্ডলীবদ্ধ সভ্য নর-নারীই সভ্যতার উৎস ও তাহার প্রবাহক।

সভ্যতার উৎপত্তি ও তাহার কারণ দুইয়েরই সন্ধান করিতে হইবে মানুষের মনোজীবনে। ধর্মনীতি, ব্যবহারবিজ্ঞানে, প্রথা ও প্রতিষ্ঠানে, অথবা বুদ্ধিপ্রসূত নানা কলা-কৌশল — কোনটাই সভ্যতার হেতু নহে। এগুলাও কারণ নয় — কার্য। নিজেরাই আর কিছু দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সভ্যতার যে বুদ্ধিটি যানে ও জ্ঞানে গড়িয়া উঠে, তাহা ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি। এইবার এতক্ষণে আমরা একটা ধরিবার মত কিছু পাইলাম। একটা চিন্তাগত আকারহীন অনির্দেশ্য নামের পরিবর্তে একটা

বাক্তিকে পাইতেছি — সে তাহার ফলে সত্যব্যক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তির — নর বা নারীর — জীবনে স্বকর্তৃত্ব থাকিবে, অর্থাৎ সে যাহা কিছু করিবে তাহা বাহ্যতানুগত নয় — আপন অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণায়; অর্থাৎ, সে ব্যক্তিত্বের দাস নহে, সে আপনাকে আপনিই শাসন করে। সে যখন একটা মহাযোগ সিদ্ধান্ত করে, তখন সংযমসহকারে স্থির করিতে পারে, কোথায় এবং কখন সে তাহা ভঙ্গ করিবে। সত্য মানুষের আচার স্বাভাবিক নয়—কৃত্রিম; সে ব্যক্তি দমন করে, যাহা ভাঙিয়া চুরা হয়, কোন দুর্বল ব্যক্তির উপরে ক্রোধ হইলে তাহাকে প্রহার করিতে নিরস্ত হয়। তাই বলিয়া কেহ এমন মনে করিবেন না যে, সত্যমানুষকে আমি আদর্শ মানুষরূপে খাড়া করিবার মতলবে আছি। 'ভালো' বলিতে যদি কিছু বুঝায়, তবে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যিনি শ্রেষ্ঠ মানসিক সুস্বাস্থ্যের সমর্থ, এবং যিনি মনের সেই অবস্থা সমান ভাবে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারেন। সেরূপ মহাত্মার সন্ধান করিতে হইবে, যাহারা ভাবুক, শিল্পী অথবা যোগী, তাহাদের মধ্যেই মিলিতে পারে, কারণ, তাঁহারাই সুদীর্ঘকাল ধ্যানে বা রসাবেশে মগ্ন থাকিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ভোগ-বস্তুর এই ত্রুটি আছে, তাহারা অল্পকালেই বিস্বাদ হইয়া যায়। মনের যে অবস্থাটি অতিশয় সুখকর তাহাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাহারও ঐ দোষ আছে। কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট যাহা তাহার হ্রাসবৃদ্ধি ভোগের-কাঁটা থাকিতে পারে না; তাহাতে কোনরূপ তর-চড় নাই। সেই সুখমণ্ডলের দিবা সর্বদাই অম্লান-আলোকে সমুজ্জ্বল, সে আলোকে এতটুকু ছায়া নাই। অন্ধ, যে-মানুষ সন্ধ্যার সুকোমল ছায়ালোক, অথবা তারাখচিত রাত্রির আকাশ পছন্দ করে, এমন কি, তাহার গৃহ-কোণের অন্ধিসন্ধিও আরও উজ্জ্বল দেখাইবে বলিয়া বাহিরে বৃষ্টি বা তুষারপাতও যাহার ভাল লাগে, সেও উচ্চতরের একজন সত্য মানুষ হইতে পারে। যাহা সত্যশ্রেষ্ঠ তাহার চরম প্রমাণ লক্ষণ আছে — তাহা সর্বদাই একরূপ, এবং স্থির বা ধ্রুব। স্বর্গের সেই অমল অবিমিশ্র সুখলোকে কোন সত্যতম মানুষও যে অস্বস্তি বোধ করিবে না, এমন মনে হয় না।

তথাপি, শিল্পী, দার্শনিক বা যোগী হইলে সে মানুষ যে সত্য হইতে পারে না, এমন কথাও বলিতেছি না। আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, যাহারা সত্যতার আদর্শ-ফল তাহারা কখনো কোন একটা কিছুকেই জীবনের সর্বস্ব করিয়া তোলে না। এমন যে প্লেটো, তিনিও যখন তাঁহার 'রিপাব্লিক' নামক গ্রন্থে ঐ একটা আদর্শকেই অধিষ্ঠীয় করিয়া তুলিয়াছেন, তখনই তাঁহার ভিতরবুদ্ধি বিদায় লইয়াছে। যে-ব্যক্তি পূর্ণ সত্যতালাভ করিয়াছে তাহার রসবোধ এমনই সর্বতোমুখী যে, সে কোন অতিইষ্ট ভাবের আবেশে, ক্ষণ ক্ষণ বা অনেকক্ষণ, মত্ত হইয়া আর সকল জ্ঞান হারাইয়া বসে না; ঐরূপ অধিকের ভাবোন্মাদনাকে সে সর্বক্ষণ ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা করে না। সর্ববস্তুর রস সমভাবে আস্বাদন করাই তাহার কাম্য। ইহাতে তাহার অনুভূতির প্রসার হয়, — তাহাতে যত বৈচিত্র্য থাকে ততই গভীরতা থাকে না। যাহারা জ্ঞানপন্থী দার্শনিক তাহারা কেবল ঐ গভীরতারই পক্ষপাতী। এমন ব্যক্তি যদি শিল্পী হয়, তবে আমার বিশ্বাস, তাহার মনের যে অংশে আত্মপ্রকাশের যে ঝোঁকটা প্রবল হয়, সেই অংশই সত্য, কারণ, আত্মপ্রকাশের অতিরিক্ত আগ্রহ আত্ম-ছবিতার পরিচয় হইতে বেশিক্ষণ লাগে না। ঝোঁকের উপর, সর্বপ্রকার ঝোঁকের সমান অতিরিক্তটাই সত্যতার একটা বিশেষ লক্ষণ। তথাপি, সত্য ও সুন্দরের প্রতি আসক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের পিপাসা, মানুষের আত্মার যতকিছু গৌরবময় প্রকাশ, তাহার প্রতি এইরূপ স্বাভাবিক আকর্ষণ—একটা বড় ভাল হইলেও, জীবনে আরও কত সমন্বয়যোগ্য ধন আছে, ইহা

প্রকৃত সভ্যব্যক্তি যেমন উপাধি ধরে — কোন পীরী, ভাবুক বা পণ্ডিত যেমন ধরে না।

যাহার চিত্ত সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে যেমন মানুষ জীবনে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ স্থান দিবে, তাহার শিক্ষায় যাহাতে সর্ববিধ ভাবনার উন্মেষ হইয়া যাবে। যাহারা সুখান্বেষী এবং বুদ্ধিমান তাহাদের পক্ষেত্রের উপায় দুইটি — বিক্ষিপ্ত মন, এবং সবল ও প্রখর ইন্দ্রিয়। যাহার ইন্দ্রিয়গুলি যথোচিত কর্ষিত হয় নাই, সেই অশিক্ষিত ব্যক্তি কোন ভাব বা চিন্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব সুগভীরভাবে অনুভব করিতে পারে না, মনে যখন যাহা উদয় হয় তাহাকে লীলায় মত করিয়া উপভোগ করিতে পারে না—প্রত্যেক প্রত্যক্ষে, নিরানন্দ হাসিতে মত, মুখখানা ভিরাইয়া তাহার সকল দিক দেখিয়া লইতে পারে না; সে, একই ভাবে, নিজেকে সর্বসুখের সকল সম্পদের অধিকারীও যেমন, তেমনই, জগৎ-সংসারকে দুঃখের অভিনেতা মনে করিয়া, একটি অপূর্ণ রস আস্বাদন করিতে পারে না। এইরূপ উচ্চস্তরের রস-সম্ভোগ একমাত্র শিক্ষার গুণেই সম্ভব। যে সকল বৈষয়িক বিদ্যাকে শিক্ষা-নাম দেওয়া হয়, আমার এই আলোচনার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। মানি, তাহারও প্রয়োজন আছে, যেমন বিদ্যা মুখসাধনের একটি গৌণ উপায় বটে, তাহাও সভ্যতাদানে সহায়তা করে; কিন্তু সে উপায় প্রত্যক্ষ নয় — পরোক্ষ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য — আমাদের প্রকৃতিতে যে সব উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে সেইগুলিকে উদ্বুদ্ধ করা। যদি বলা হয়, সেইরূপ শিক্ষাও কেবল জ্ঞান বৃদ্ধি করে, আর কিছুই করেনা, তাহা হইলে কথাটা সূক্ষ্মবিচার-সহ হইবে না। জ্ঞানই জীবনের পরমার্থ নয়, আমি পূর্বে যে চিত্তোৎকর্ষ-জনিত সুখের কথা বলিয়াছি, জ্ঞান তাহার একটা উপায় মাত্র — জ্ঞানের নিজস্ব কোন মূল্য নাই। ঐ স্বতন্ত্র, অর্থাৎ বিশিষ্টতাহীন, স্বভাব-উপযোগী যে শিক্ষা, উহার দ্বারা কাহারও বৈষয়িক সুবিধালাভ হইবেনা, অর্থাৎ তাহা অর্থকরী-বিদ্যা নয় — জীবনকে উন্নতরূপে জানা, এবং পরিপূর্ণরূপে ভোগ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এত কাল পরে, সভ্যতাবুদ্ধির সহিত, তাহার আর একটি গুণ হওয়া উচিত — জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা বিশোধিত বা বিশিষ্ট আচরণ। মূর্খতা এবং একটা মস্ত দোষ, তাহাকে দোষ বলিয়াও হয় মনেনা। অজ্ঞানতা-বোধে বিদ্যুতে বিশোধিত হয় যাহারা, তাহাদের বিচার-বুদ্ধি পরাস্ত হইয়াছে। যাহা অপরিচিত বা অনভ্যস্ত বলিয়া অপ্রীতিকর, সেইরূপ আচার, প্রথা, রুচি বা প্রবৃত্তি, কিম্বা নৈতিক বা মানসিক কোন অভিচার-দর্শনে যাহারা তাহার কারণ সন্ধান না করিয়া, বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল "উঃ কি জঘন্য! কি জঘন্য!" বলিয়া চীৎকার করে ও ছুটিতে থাকে, তাহারা মনস্তত্ত্ব বা নীতিশাস্ত্রের কিছুই জানে না। বীতরাগে, পূর্ণ দৃষ্টিতে সেই সকল অদ্ভুত আচার-ব্যবহার দেখিয়া লইতেও তাহারা অক্ষম; তার কারণ, তাহাদের স্নায়ুগুলা দুর্বল হয়, অথবা জন্মগত কুসংস্কার তাহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে; মনের সেই ব্যাধি-গুলাকেই বড় বড় নাম দিয়া তাহারা গর্ব অনুভব করে, যথা — 'ধর্মগত রোষ' 'শুদ্ধাচারজ্ঞান' প্রভৃতি। তাহারা পাপকে স্পর্শ করিতে পারে না, সর্বশরীর কুঞ্চিত হইয়া উঠে; তাহাই হওয়া স্বাভাবিক, তাহাতে লাভের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, তাহারা যেন সেই স্নায়ুদৌর্বল্যের গর্ব না করে — তাহারা সাপ লইয়া খেলাধেলি করে, সর্পবিষে যাহারা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে যেন অশ্রদ্ধা না করে। তাহাদের ঐ অবস্থাকেই 'বিষবেগ' বা 'বিষবাত'-অবস্থা বলা হয় — কথাটা ঠিক বটে; কারণ, সে সময়ে তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয় — বিচারশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

পূর্ণ সত্যতার আর এক লক্ষণ — তাহাতে দুইটি বা ততোধিক পক্ষ নাই। কারণ, যাহারা সত্যান্বেষী তাহাদের চিত্তে আছে দুটি যে দুইটি প্রধান বাধা — সেই ক্রোধ ও কুসংস্কার নাই। সত্য মানুষ অভিমত সহিষ্ণু ও উদারচিত্ত হইয়া থাকে। সে বুঝিয়া লইয়াছে যে, ক্রোধের হেতু যাহাই হৌক, তাহার মানসিক চিকিৎসা আছে।

সত্যমানুষের রাজনৈতিক মতামত কেমন হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা অসম্ভব। তথাপি একথা নিশ্চিত যে, তাহার দাবীও হইবে সুস্পষ্ট, তাহার মতামতও তেমনই সেই দাবীর অনুযায়ী এবং যুক্তিসঙ্গত হইবে। সেই অভিযোগে অভিমত সুস্পষ্ট ও আন্তরিক বলিয়া সে দেশের পোলিটিক্যবিদের মত বড় বড় ধাপ্পাবাজি লইয়া মাতামাতি করে না, যথা — স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্রাজ্য, সমানাধিকার, জনসাধারণের স্বত্ব, ইত্যাদি। এই সকল অভি-মহার্ঘ শব্দের যে-কোন অর্থ হইতে পারে — অথবা কোন অর্থই না থাকিতে পারে। যদি বল, তুমি 'ট্রেড-ইউনিয়ন-বিল'-এর পক্ষে — তাহলে, উহা ন্যায়সঙ্গত; অথবা তুমি উহার বিপক্ষে — তাহলে, উহা ন্যায়সঙ্গত নয়, তবে তোমার উক্ত উক্তিই সমান জোরালো। যদি তুমি এই কারণে উহার সমর্থন না কর যে, উহার ফলে, শেষে তোমার পারিশ্রমিক উপার্জন হ্রাস পাইবে, তবে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হইবে। কিন্তু তুমি যদি কেবল এই জন্য উহার স্বপক্ষে ভোট দাও যে, উহা ন্যায়সঙ্গত, কিম্বা এই বলিয়া উহার বিরুদ্ধে ভোট দাও যে, উহা ন্যায়সঙ্গত নয়, তবে দুইটার কোনটাই ঠিক নহে, কারণ, কোনটারই অর্থ নাই। অবশ্য এমন হইতে পারে যে, তুমি ও আমি উভয়েরই লক্ষ্য এক, কিন্তু কোন একটি বিশেষ আইনের দ্বারা সেই লক্ষ্যটি সিদ্ধ হইবে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে; সেখানে যুক্তির দ্বারা পরস্পরের মত বিচার করিয়া দেখিবার অবকাশও আছে। আবার, যেখানে উভয়ের প্রাপ্তির লক্ষ্য এক নহে, কিন্তু উভয়ের পক্ষেই যুক্তি আছে, সেখানেও কটূক্তি করার কারণ নাই। এমন হইতে পারে যে, উভয়ে এক হইলেও, কোন এক পক্ষ এমন উপায় অবলম্বন করিতেছে, যাহাতে শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হওয়াই নিশ্চিত; তখনও তাহাদিগকে দুর্জন না বলিয়া নির্বোধ বলাই সঙ্গত। কেমন একটা অবস্থায় রাজনৈতিক মতভেদ কটূক্তিতে বিষাক্ত নিন্দনীয় হইতে পারে — যখন আমরা ইষ্টনির্ণয়ে একমত হইতে পারি নাই; কিন্তু সেই ইষ্টও সত্যতার সীমা অতিক্রম করিবে না, এবং আর কোন রাজনৈতিক পন্থায় সেই ইষ্টলাভ যে সম্ভবপর নয়, সে বিষয়েও যদি সকলে একমত হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য নয়; কারণ, আর সকলে যে আমার সহিত একমত হইবে, এমন আশা করাও অন্যায়। অতএব, যে ব্যক্তি পূর্ণসত্যতা লাভ করিয়াছে, সে যদিও সকল রাজনৈতিক সমস্যার সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিবে, তথাপি ঐরূপ অর্থহীন বড় বড় কথার মোহ ত্যাগ করিবে, বৃথা বিবাদ-বিসম্বাদও করিবেনা। ওই যে তিক্ততা এবং বাদ-বিসম্বাদের যোগ দিতে অনিচ্ছা, ইহার সহিত আরও একটা বড় গুণ সত্যতার অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ— তাহার নাম, শিষ্টাচার। মানুষের সকল দোষত্রুটি পাপ-অপরাধ ক্ষমা করিতে পারাই যদি পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ক্ষমা করিতে করিতেই পূর্ণজ্ঞানে পৌঁছিতে পারা যাইবে। মানুষমাত্রেরই অপরের নিকটে যে অল্পবিস্তর দোষ হয়— সৌজন্য ও শিষ্টাচারের দ্বারা তাহা যদি দূর করিতে পারো, তবেই তুমি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবার পথটি খুঁজিয়া পাইবে, সে তখন তাহার ভিতরকার খাঁটি বস্তুটি তোমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিবে। আর, তুমি যদি সেই শিষ্টাচরণ না কর, যে শিষ্টাচারের দ্বারা তোমার ও অপরের মধ্যে ব্যবধানটা ঘুচিয়া যায়, এবং তৎপরিবর্তে অকারণ সন্দেহ, ছোটনজর,

তাহিক অনোভাব, এবং অন্যদিকে সেজন্যে দুঃখিত থাও, তবে তুমিও তাহাকে যাহা দিতেছ, সেও তাহার অধিক কিছুই তোমাকে দিবে না। যাহারা অন্তর ও প্রকৃতিবাপন্ন, তাহাদিগের নিকটে কেহই অন্তরাল উদ্ঘাটন করে না। অতএব স্বীকার করি যে, কেবল মনে ইচ্ছিয়ের ও মনীষার দ্বারা যাহা লাভ করা যায় তাহা অতিশয় মূল্যবান হইলেও, সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণ আত্মীয়তের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা তাহার অপেক্ষাও মূল্যবান।

(ক্রমশঃ)

সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম, আর একটা ধারা মানুষের সাহিত্য। এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে। কেহ কাহাকে স্পর্শ করিয়া চলিতেছে। এই দুয়ের মধ্যে কোন্ ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পুরাপুরি জানিতে হইবে।

— রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থ-পরিক্রমা

অনুপূর্বা — শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

এবার যে গ্রন্থের আলোচনা করিতেছি, তাহার নাম 'অনুপূর্বা'। কবি-নামের পিছনে তাহার অনুপূর্ব, কাব্য-সমালোচকেরা তাহাই উহ্যই রাখিয়াছেন। এখানে অনুপূর্ব অর্থে কবির ব্যক্তিগত অনন্যতা। বিশেষ কবিরা তাঁহাদের বিশেষত্ব, অন্যসাধারণ আবেদন, চমক-লাগানো প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতির — যে প্রবলপূর্ব সমর্থন, তাহাই যথার্থ কাব্যোপলব্ধি। আমি যে কাজটি করিতেছি — অন্তত: যতীন্দ্রনাথের কবিমানসের পরিচয় দিবার কালে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব এই ছোট কথার উপর জোর দিয়াছি, — আশা করি, তাহাতেই আধুনিক কাব্যরসিক বিশ্বামিত্রের আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কাব্য বলিতে একালে কতকগুলি নব-বা-নরের দুর্বিজ্ঞেয়তাকে মানবভাষার বিশিষ্ট ভূষায়, তাহা ছন্দোহীন হউক, আর ছন্দোবদ্ধই হোক; ছন্দোহীন মিলহীন হইলেই দুরন্বয়িতা ও কঠিনত্ব আরও বিকট-মনোহর হইয়া থাকে। এমনই একজন চতুর্ভুজ রসিক 'কল্লোলে'র 'মধি-মন্থনে'র কবিতাগুলিকে (!)-চিহ্নে নমস্কারান্বিত করিয়া প্রণামে প্রত্যভিবাদন করিয়াছেন; ঐ সকল কবি নাকি সাহিত্যের প্রথম-প্রাণে 'মধি'! রবীন্দ্রনাথেরও 'মধি' হইতে বিলম্ব নাই। ইহাদের একটা সান্ত্বনা আছে — 'মধি' হইতে হইলে সেটা মানুষের হওয়া চাই, যাহাদের সে বালাই নাই, তাহারা 'মধি' হইবার পূর্ব হইতেই অব্যাহতি পাইয়াছে।

না, একালে কাব্যের জাতি গিয়াছে। প্রাণের অন্তর-গহন হইতে যে বাণী মুকুলের হইয়া উৎসারিত হয়, তাহার নাম কাব্য নয়; আমি কাব্যের যে রূপ-নিবেদন কবির বলিয়াছি — সে আবার কি? আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের — যাঁহাদের খাস মোল হইতে চিহ্নিশের মধ্যে — তাঁহারা বোধ হয়, ঐরূপ কিছুর নামও শোনেন নাই, কারণ জন্ম হইতেই তাঁহারা এই 'brave new world'-কেই জানেন, পুরাতন বুড়ী পৃথিবীর খবর রাখেন না। তাঁহাদিগকে কিছু নূতন কথা শুনাইব, তাহা এই যে, যতীন্দ্রনাথ চীৎকারই যেমন কবিতা নয়, তেমনই, কাব্যে — বিশেষ করিয়া আধুনিক কাব্যে —

কবি-মানস একটা নূতন এবং অনিবার্য উপলব্ধি হইয়া উঠিলেও, এবং তাহা বুঝিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক হইলেও, যতক্ষণ না কাব্যের রসরূপটি আয়ত্ত করা যায়, ততক্ষণ কাব্যের কোন পরিচয়ই পাওয়া হইল না। সেই রস-রূপ কি? এ বিষয়ে বহু বিচার-বিতর্ক আছে, কিন্তু সে সকলই পণ্ডিতী বা বৈয়াকরণিক বিচার; তাহাতে অভিজ্ঞ জ্ঞানাহত বেরসিক ভিন্ন আর কাহারও অধিকারও নাই, প্রয়োজনও নাই। কিন্তু আর এক প্রকার বিচারও আছে, কাব্যপাঠকালে ঠিক কি কারণে তাহা মুগ্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটা সাক্ষাৎ রহস্য-সন্ধান; — অর্থাৎ সেই যে রসানুভূতি তাহার প্রত্যক্ষ কারণ কি? সেই অব্যবহিত স্পর্শ কিসের স্পর্শ? অনুভূতির নাম যাহাই হউক, অনুভূতিটা কিসের? কবিতার কোন্ বস্তুটা সেই অনুভূতির সাক্ষাৎ কারণ? ইহার উত্তরে আধুনিক কাব্যপ্রমাতাগণ নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছেন — উহা কাব্যবিশেষের বিশিষ্ট বাগ্বিন্যাস। অতএব কবিতার সেই বাণী-রূপের বিচারই প্রকৃত কাব্যবিচার। প্রত্যেক কবির ও কাব্যের একটা অভিনব বস্তু বাগ্বিভঙ্গি ও বাগ্বিন্যাস আছে, উহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, অর্থাৎ আমাদের চিত্তে রসসঞ্চার করে — মুগ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধকারী রহস্যটাও আমাদিগের বোধগোচর করে। অতএব 'রস' নামক একটা তৃতীয় বস্তুর দার্শনিক স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, এবং তাহার ফলে একটা নির্বিশেষ কাব্য-তত্ত্বের স্থাপনা না করিয়া, প্রত্যেক কাব্যের বাণী-রূপটিকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমরা যাহা আবিষ্কার করি, তাহারই নিবেদনকে কাব্যের রস-নিবেদন বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক রসিক পাঠক কাব্যপাঠে মুগ্ধ হইবার কালে, তাহার ঐ বাগ্বিন্যাসটাই দেখেন আর কিছুই দেখেন না, অথচ একথা কিছুতেই সজ্ঞানে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। আধুনিক কাব্য-সমালোচনা সেই উপকারই করিয়াছে।

আমি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে কতকগুলি ছাব-চিত্র পৃথক উদ্ধৃত করিয়াছি — উহাতে আমাদের যে বুদ্ধির তৃপ্তিসাধন হইয়াছে, তাহা কাব্যরসগ্রহণের বুদ্ধি নয়, উহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। তথাপি ঐ আলোচনাও আমাদের কাজে লাগিবে — যাহাকে এমন বুদ্ধিবৃত্তির অধীন বলিয়া মনে হয়, তাহাও রসরূপে পরিণত হয় কেমন করিয়া — কোন মন্ত্রে? যাহা একটা মানসিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার তাহারই রসের হেতু হয় কেমন করিয়া? অভিজ্ঞ দার্শনিক যিনি তিনি কবি হইতে পারেন না এইজন্য যে, তাঁহার চিন্তা রস-প্রসূত নয় — বস্তুপ্রসূত; সেই চিন্তা তাঁহার নানা স্নেহমমতাপ্রাণের, তাঁহার সমগ্র সত্তার একাগ্র উপলব্ধি নয়; তাহাতে সেই মুহূর্তকালের দিব্য আবেশ নাই, যাহার ফলে, কোন চিন্তাই আর বিশুদ্ধ চিন্তার রূপে অবস্থান করিতে পারে না, একেবারে শরীরী হইয়া দেখা দেয় — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু রূপ ধরিতে ও জীবনে ছড়াইয়া আছে তাহাদেরই নূতন নূতন সমন্বয়ে এক একটি বাণী-বিগ্রহ হইয়া উঠে। কবির সেই উপলব্ধি চিন্তার পথে হয় না, হইলে তাহা মুহূর্তেই রূপময় হইয়া উঠিত না। আমরাই বিশ্লেষণ করিয়া তাহার একটা চিন্তাংশের আবিষ্কার করি, এবং রসবোধের অভাব পাণ্ডিত্যের দ্বারা পূরণ করিবার জন্য কাব্য ছাড়িয়া, ঐ রসকে ছাড়িয়া, রসতত্ত্বের রোমন্থন করি। আসলে সে তত্ত্ব রসের পর — রূপের; রস পরে — রূপ আগে।

সেই রূপের কথাটাই আজ করিয়া বুঝিতে হইবে, কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা বুঝিবার একটু বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়াই, আমি এইখানে কথাটার অবতারণা করিয়াছি। পূর্বে বলিয়াছি, রূপ আর কিছুর নয় — বাণীর; অর্থাৎ, তাহাকে কোমল মাটি বা মোমের মত গলাইয়া, ছানিয়া, আয়ত্তমত ছাঁচে ফেলিয়া যে মূর্তিনির্মাণ — তাহার সেই মূর্তি,

সেই রূপ। প্রত্যেক শক্তিমান কবি বা মহাকবি কবিভাষাকে নইয়া এই যে একটা নবরূপ নির্মাণ করেন, ইহাই তাঁহার ভাষা; ভাবাবিষ্কারেও যেমন, ভাবের রূপ-নির্মাণেও তেমনই, কবির ঐ বাণীমূর্তিই সর্বাপেক্ষা বড়ীয়; ভাব নয়, ভাবের রূপ — ভাষার মধ্যেই অন্তর্লোকের প্রকাশ হেতু। সেই ভাষা অভিধান-ধৃত্যা নির্দিষ্টসিদ্ধ রীতির ভাষা নয় — নয় বলিয়াই প্রত্যেক কবির ভাষা নূতন, নূতন বলিয়াই ভাষা-শিল্পে চমৎকৃতি ঘটে; ঐ চমৎকৃতিই রসানুভূতির প্রথম লক্ষণ। যেখানে তাহাও নাই, ভাষা আমাদের অভিজ্ঞতার কবীয় সেই রূপটিকে বাঁধিয়া রাখে, অর্থাৎ কবিতাকে মৃত করিয়া তোলে। কবি ও বাণী এই দুইয়ে মিলিয়া সেই রূপটিকে অমর করিয়া রাখে; আমরা তাহার ভাব নয়, অর্থ নয়, তাহার সেই অনুভূত অন্তর-ধ্বনিটিকেই চাই, তাহাই কবিতা; ইহার মধ্যে সংশয় করা চলে না।

ঐ কবি-রূপের কবির নিজের ভাষার কি রকম হইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। কবিতার ঐ রূপটিই হয় তাহাকে খুঁজিয়া চলিবে, নূতন নূতন ছাঁচ ফেলিয়া। কবিতার ভাষা কবিতার সেই বাণী রূপের [illegible] যায় — প্রত্যেক কবির যেমন, প্রত্যেক কবিতারও তেমনি, ভাষা অভিন্ন থাকে। কবির ভাষাও বাংলা, বা ইংরাজী, বা ফরাসী বটে, তবুও তাহা একটা নূতন ছাঁচ বা গড়ন লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক কবিতারও একটা নিজস্ব ভাষার রূপ আছে, সেটা কবিতাটীর ভাষার স্বরূপ; ইহাদের যে রকমের পরিচয় ও পর্যালোচনা আমরা দেখিতে পাই, তাহার কোনটারই রীতি নাই,— নাই বলিয়াই তাহার সেই স্বকীয় রূপ অধিকতর উজ্জ্বল ও লক্ষণীয় হইয়া উঠে। প্রত্যেক কবিই যদি সহজাত কবি হন, অর্থাৎ সাধারণ ভাষা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া, আন্তরী বাণীপ্রতিভার বলে তিনি তাঁহার কবিতার উপযোগী রূপ-নির্মাণ করেন। কবির বা কবিশক্তির আদি ও শেষ এই বাণীবিগ্রহ-রচনা।

আমি কবিতার ঐ ভাষাটাকে কবির বা কবি-শক্তির অভ্রান্ত নির্দর্শন বলিয়াছি — আমার ভাষা অর্থে এখানে কি, তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি গুরুতর কথাও মনে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক কবির ভাষার ঐ যে স্বাতন্ত্র্য, তাহা কবি-মানুষটার স্বাতন্ত্র্য নয়, সজ্ঞান স্বেচ্ছাচারের স্বাতন্ত্র্য নয়; সে স্বাতন্ত্র্য শিল্পীর, — রূপকারের স্বাতন্ত্র্য। কারণ ভাষার 'নবত্ব'ই কবিত্বের লক্ষণ নয়, ভাষার রূপসম্পদই কবিত্বের প্রমাণ। সেখানে 'রূপ' নাই, কিন্তু ভাষার নবত্ব-বিধানের চেষ্টা আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, একটা চতুর বুদ্ধি-জাতীয় জীব কবিত্বের আসনে বসিতেছে। কবি যিনি তিনি ভাষার বন্ধনকে মানেন না, কারণ, তিনিই ভাষার পতি — ঈশপতি; এইজন্যই দেখা যায়, তাঁহারা ভাষাকে বহুই নব নব রূপে রূপবতী করুন না কেন, ভাষার সর্বনাশ কখনও করেন না।

কবির ভাষার সেই নবত্বের কারণ কি, তাহা এতক্ষণে নিশ্চয়ই কতকটা বোঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ, কবির অনুভূতি একটা রূপময় অনুভূতি (এইজন্যই এত উপমা, এত রূপকল্প ঘটা); দ্বিতীয়তঃ, সে অনুভূতি আর কাহারও সমান নয়, তাই তাহার রূপও অনন্যসদৃশ। সুতরাং ভাষাও যে অনন্যসদৃশ হইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। এই জন্যই, যে প্রকৃত কবি, যে তাহা নয় — তাহার প্রমাণ ভাষাতেই জাজ্বল্যমান হইয়া থাকে। বড় কবি, ছোট কবির কথা নয় — কবিমাত্রেরই উহাই প্রত্যক্ষ পরিচয়। যাহার ভাষায় রূপলোকের প্রভাব বা অনুকরণ অধিক পরিমাণে আছে, সে উৎকৃষ্ট পদরচয়িতা হইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবি নয়; আমার যাহার ভাষা আদৌ রূপময় নয় (সুমনস হওয়া দূরের কথা) — কেবল হিক্কা ও চীৎকারের ভাষা, অথবা low-muttering delirium-এর মত কি যে বলে তাহা সেই জানে, আর কেহ

বুঝিতে পারে না, — সে যে কোন্ শ্রেণীর কবি, তাহা আবার সিদ্ধান্তেই অবশ্য আসেন।

এইবার আমরা ঐ একটি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া যতীন্দ্রনাথের কবিত্ব-বিচার তাঁহার ভাষার রূপ-বিচার করিব। কাজটি খুব সহজ করিয়া লইয়াছি — বুদ্ধিমান পাঠক তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, নতুবা 'অনুপূর্বার' কাব্যপরিচয়-প্রসঙ্গে, আমি গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া এতক্ষণ ঢেলা হাতিয়া জমিটি সমান করিলাম কেন? অতঃপর একেবারে ঐ ভাষার কথাই বলিব। পূর্বে আমি যে সকল কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে যতীন্দ্রনাথের ভাষা যে কিরূপ, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই পাঠকসাধারণেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ ভাষা হইতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি — এ কবির একটা 'বাণী' আছে, অর্থাৎ নিজস্ব একটা প্রাণগত উৎকণ্ঠা আছে — সে উৎকণ্ঠা যে-প্রকার হউক, তাহা যে দরাকার অনুভূতি, ঐ ভাষাই তাহার প্রমাণ। ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতি যদি সত্যকার অনুভূতি হয়, তবে তাহা অনন্যসদৃশ হইবে, অনন্যসদৃশ হইলেই তাহার জন্য ভাষার একটা নূতন ছাঁচ আবশ্যক। যতীন্দ্রনাথের ভাষা যেমন ভাষা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখানো যাইবে না, কারণ কবিতার মত, কবিতার ভাষাও অখণ্ড। কিন্তু ইহার কয়েকটি লক্ষণ বাক্যতত্ত্ব-অভিধান এবং ইডিয়ম প্রভৃতির প্রমাণে প্রমাণিত করা যায়। যতীন্দ্রনাথ প্রচলিত কবিভাষাকে যেন পদ্মদলিত করিয়া বাংলা-ভাষার তৃণগুল্ম লোকবাণী-ধারাকে উদ্ধারিত করিয়াছেন — অনুভূতির গভীরতা তাঁহাকে এমন প্রেরণাহীন করিয়াছে। যেখানে যে শব্দ পাইয়াছেন, তাহাকেই বসিয়া সেই অনুভূতির অগ্নিশিখায় তাহাকে নিষ্কলুষ করিয়া তাহাকেও ভাবের দীপ্তি দান করাইয়াছেন। চলতি, সাধু, সংস্কৃত বা ফেল, চাষা বা ভদ্র — সকলকেই ধরিয়া একাসনে বসাইয়া, তিনি একটি নূতন সাহিত্য-সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন। একটা কবিতায় ভাষা সুর হইতে আরম্ভ, আরম্ভ হইতে সুরের স্তরে বাঁধিয়াছেন, অথচ কোথাও স্খলিত হয় নাই। কোন কবিতায় ভাব যেমন ত্রিভাঙ্গিক ছন্দেই ভাষাও চুড়ান্ত গদ্য, কিন্তু তাহাতেও সহজ কাব্যের যেন বান ডাকিয়াছে। আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কবি যতীন্দ্রনাথকে ইহার জন্য কোনরূপ ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই, প্রাণপাত অভ্যাস করিতে হয় নাই; ইহার যে প্রেরণা তাহাকেই সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা 'দিব্যপ্রেরণা' বলিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেরণাটা স্বয়ম্ভব — ইংরাজীতে ইহাকেই বলে 'inspired'। ঐ মূল inspiration-টা যদি অব্যর্থ হয়, complete হয়, তবে, সে যে ভাষা-সমেত উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কবিকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। নহিলে, সাধ্য কি যে, যতীন্দ্রনাথ ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে সাহসী হন। ভাষা ভাবকে মূর্তি দিবার উপাদান মাত্র — যতীন্দ্রনাথের ঐ ভাষাও তাহাই; আমরা ত' পৃথক করিয়া ভাষাকে দেখিতেছি না, ভাবের মূর্তিটাকে দেখিতেছি। ভাব যদি সুন্দর হয়, অর্থাৎ সত্যকার কবি-ভাব এবং রূপময় হয়, তবে ভাষাও অনন্যসদৃশ হইবে। এই তত্ত্বটি যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার অভিনব সুস্পষ্ট-গোচর হইয়াছে। ভাষার লক্ষণ বীক্ষিত লক্ষণ করিয়াই, এই যে একটি অনন্য বাক্‌ভঙ্গির সৃষ্টি হইয়াছে, উহা ঐ এক কবির কবি-প্রাণের ভাষা — আর কোন কবির বা সাধারণ কবিতার ভাষা উহা নহে। আরও কয়েকটি লক্ষণ যতীন্দ্রনাথের কবিশক্তির, অর্থাৎ বাগ্বিভূতির — পরিচয় দিতেছে। তিনি যেমন অভিপ্রচলিত আটপৌরে-চতুষ্কোণ, বৈঠক-বাজারের বুদ্ধিকেও ভাবার্থের বৈদ্যুতিক শক্তি যুক্ত করিয়াছেন, তেমনই, কবি-প্রতিভার নিঃসংশয় প্রমাণ যাহা, তাহাও তাঁহার ভাষায় আছে — তিনি নূতন শব্দরচনা এবং নূতনতর পদযোজনাও (phrase making) করিয়াছেন। শব্দ লইয়া কারিগরিও কম নয়; কবিমাত্রেই যে মূলতঃ শব্দশিল্পী তাহাকে

কি সন্দেহ আছে! কেবল ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, কারা শিল্পের শিল্পকর্ম নয়; সে-শিল্প কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াত্মভূতির অথবা মানস-স্বপ্ন-প্রকাশের শিল্প নয়— তাহার মূলে আছে মানুষের প্রাণের আকুতি, তাই তাহার কারণ হইয়াছে কারা; — যাহার মত আকর্ষণ বস্তু আর কিছু নাই; তাই কারাসাহিত্য আর সকল শিল্পের উপরে।

এইবার আমি উপরকার বক্তব্যগুলির উদাহরণ স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিব।

( )

সহসা সে নিশি — বেড়ায় ঘুরিয়া, সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
ঘাড়-মোড় ভেঙে ভেঙের ভিতর পড়িলাম একেবারে।
ভাঙা ভেঙে উঠি' নেশা গেল ছুটি, পাঁজরে বিষম ব্যথা;
ক্ষত দেখি তাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে কোথা?
কথা নহে বলিবার; —
আপনিই তাই গোপনে সেখানে ঘুরিছ বেড়ার হাড়!

উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঁদানো চামড়া-পটি;
ভিতরে কিন্তু নড়-বেড়া-হাড়ে নিরন্তর খটাখটি!
হ'ল হাড় আলাতন;
মোদের আমার প্রাণের কথায় হবে তাই প্রলাপন।

['ঘুমের ঘোরে' পৃঃ ১৮,]

আকাশে চাষার আশা যাহে জোরা —
মাথন-ছানেন ঢেঁকে ঘোরে পেরাণা!
সহরে বলয়া তারে,
বেমালুম ঘুরে মরে,—
গাঁয়ে মাঠে কাজ কাটে, এ বড় ধাঁধা!
আমি কি করি!
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি'
আল-পথে টাল রেখে,
বেকাই ইমারা দেখে —
যোগাই যে চায় তারে — কলসী বড়ি!

শ্রাবণে আমন কিছু হয়েছে বোনা,
নূতন পাটের ডগা সবুজে-সোনা।
অধিরল ঝরে জল,
কবিরল চলন,
পাকা-পথে খাড় নেওয়া সাজানো খোয়া!
সো'চাকা-গাঁয়ে
'বহলাতিটী' যাত্রে,
শন্ শন্ চলে' যাই,
পড়ি — পড়ি — সামলাই,
মিজে ভিজে' মুখে রাখি চারুদিটীরে!

['পথের চারুনী', পৃঃ ৪০-৪১,]

কোথা হ'তে তুমি এলে সো সখি! কোথা ছিলে এতদিন!
আমার প্রথম-যৌবনে তবে তারা হ'ল কিটাইীন?
আমার দীপালি-রাতি
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবারে জীবন-বাতি!
অঞ্চ-বাছের সোতে সহস্র নয়ন-কমল-দল,
তারি' পরে ওই মেঘের তোমার রথ চলাচল?
তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি'
যে ছায়া পড়েছে তাহাতে লুকায় কত শোক-বিভাবরী!
অন্তর আজিকার —
কত প্রকারের আয়কাটা-ফুল-মর্ম নিঙাড়ি' ঢালি'?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব-মুকুল-ডালা —
সপ্ত-ছিন্ন শিত-কুসুমের কটি-সুতোর মালা।

['ঘুমের ঘোরে', পৃঃ ১৪-১৫,]

কোন্ গগনের রূপের পাতি
মোর আঁখি হতে উঠিয়া চ'লে?
ওগরে তারা তব আলকে
তোমায় আঁকেনা পুষ্পকলে।

কোন্ অলোকের চৈতি রবে
ও-মহাসাগরে তরঙ্গে উঠে ?
কোন্ পদ্মের পল্লব-কলি
নবরবি উষসে ফুটিয়া টুটে ?
কোন্ মেঘালির একটি রাগের
দীপালি নিখিলে ওঁঝারে ?
কোন্ বকুলের একটি বালক
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া মরে ?

['মোহনা', পৃঃ ১৪৮.]

মেঘের আলয়ে মেঘিনী যে মোর
ঘুমে ঘরিয়াছে ঘট.
তাই মোহানের আঙনে মেরেছে
শ্রাবণ তবুও তট।
কাজল-পরনে ঘুরি' বনে বনে,
হাতে ছাগলের দড়ি.
মেয়ে মেয়ে তার মুখে তুলে দিল
ফুলে-ভরা বরবী।
মোদের ছোপানো রঙের হাটে
ছিঁড়িয়া ছড়িল কালি.
চির-হাবরে'র বরণী যে তুই
বাস্ তার দিল্ তালি।
তবু যে মেঘিনী মেয়ের জন্ম —
বিশ্বয় সবে মানে ;
তরল কুশায় মেয়েরা যে হায়
মোহিনী-মন্ত্র জানে।

['মেঘিনী', পৃঃ ১৭৩.]

(৩)

বরণী তোমার প্রেমোদ-প্রবাস —
বাঁধ নি কো হেথা ঘর ;
বিশ্বতল ঘুরে চলেছ, বলো —
সবাই আমার পর।

নিরালার নিরুদ্ধ-জগৎ
প্রেমলেখা-রেখাহীন
জানের গহন ছেড়ে ছেড়ে, ভরিয়া
ভাষা হ'তে তারে দীন।

অজ্ঞের অজস্র ভূমিষ্ঠ টানি'
এসেছিল তব পাশ,
ভরিয়া তার তরণি, — আছে সে
যারে-বাঁধা ক্রীতদাস।
বাজার অতীত, আমি যাচাইনি,
তাতেই না রূপ ধরো :
যৌবনখানি বসনের মতো
খুলে যাবো, তুলে' পরা'।
তার কলাপে ভরে ভবন,
সিন্দুর সিঁথা' পরে'
অমর আহারে মরিয়া লয়েছ
বিশ্ব-আদরে ?

['বাঙ্ময়ী', পৃঃ ৪৫-৪৬.

বৌবাজারের মোড়ে
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কলাইয়ের ঘাংস খোড়ে,
যে-চৌমাথায় মাথা ঘুরে যায়, খুঁজে' পায় নাকো পথ,
যেথা যাবতীয় রসের দারুণি থামায় যারেক রথ,

•

ইতি উতি চাহি' পড়িল যখনে, ভূষ্টির উপর উচ্চ —
মালীর মাথায় কুড়ি-চুই-সের বেলা-জুহুমের গুচ্ছ।
আনি' তাহাতাহি ওরই মাঝে দাঁড়ি' কিনে' ফুল তাড়াতাড়ি
বর্ষার সাঁঝে আলাপোড়া কিনে খুসী-মনে এনু বাড়ি।
শয়নঘরের ছকে
ছিন্নমূল মনের কেতকী ফুটিল সুখের সুখে।

বাহিরে যখনো ঝরিছে বর্ষা, থেকে থেকে ডাকে দেয়া-
চিত্তে আমার স্বপন-শিখরে শত ছড়ায় ঢেউয়া।
রাত দু'পহর, স্তব্ধ সবাই, কাঁদে নিশি নিদ্রাহারা,
কেতকী-গন্ধে কত কি ভাবিতে এসেছিনু বুঝি তন্দ্রা।

• • •

অন্ধমুখে চাহি' দেখিনু চমকি' — ঘুলিছে সর্পনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে মাখায়ে হাসি!
ফণিয়া তোমার বাঁধা,
অলকগুচ্ছে অন্ধ-ঢাকা মুখ অন্ধারাবিত সাদা!
তোমারই শপথ, করিনু সত্য,— দেখিলাম, প্রাণবন্ধো!
দোলে ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে দুষ্ট-কেতকীর গন্ধ!
হাকিল পাহারা, — উঠি' ধড়মড়ি দু'হাতে খসানু ফাঁসি,
ঝর ঝর ঝরি' পড়িল শুষ্ক পরাগরাশি।
কাঁটা দিয়ে' হাতে বুঝিনু — স্বপন! আমারই মনের ভুল;
দুপুর-রাতের ঘুম ঘাটি' করে — দু'পাশে বেতাকুল?

['কেতকী', পৃঃ ১৩৭-৩৯]

বসেছিনু নিঃসঙ্গ —
সহসা আকাশে ঘনায়ে আসিল
বিপুল শকুন-সঙ্গ।
কপিকে ঢাকিল শ্যামল ছায়ায়
উদয়-অস্তাচল,
তালের পাখার শ্বাসে-প্রশ্বাসে
প্রলয়ের পরিমল।

•

মেঘ-অন্ধারায় কর্ণা-ধারায় —
ফলিয়াছে উষা-ধান,
দূরদর্শের আকাশ আসারে
অবিরাম অভিযান।
ধারেক সৌধীশতদ্রু-কূলে,
চিরতুষারের বুকে,
দেখে এল অগ-চরণচিহ্ন
বিরাগ-কৌতুকে।

ঘায়েল হরিণ — যাহা চমুকে
বসি' ছেলে পাখা —
মেঘবরণ-চুলে ঘুম-পরায়
ঘুমু-ঘুমু পিদু-ডাকা।
ঘানস-লহরে ঘরাল-মিথুন
খেলায় দুপাশ তুলে;
গ্রাম-উপকূলে নারিকেল-শ্রেণী
ডাক দিল দুলে' দুলে'।
পায়রী-গোলাপে গায়ে ঘুম্ ঘুল
কাশ্মিরানের পাছে,
ঘুম কবেকার ইসারা জানায় —
পাইনে ও পলাশে।

• •

অমাবস্যা' সবাকার —
নিরীহ-ঘটি নিরুদ্ধ-গতি
নগর-সজ্জ ঘরে।
শুধু কেবল দুতীক্ষ্ণ কালো
রজন-আলো জ্বলে;
ম'রে ম'রে উঠে নরকঙ্কাল —
নদীরও তরঙ্গলে।
অন্ধকারার ঘন মন্থনে
যত ঘুঘুঘু কোটে,—
বিষের নীল নবনীত-বিষ
বুঝি ফেলে ফেনে ওঠে।

['এশিয়ার আলো'; পৃঃ ১২৮-৩১,]

একা চাকা-কাঙা কাক-কেতু ঘুমে
ভ্রমে ঘুঘাবতী বুলুকাপথে,
— ঘুমেছ!
গগনবিহারী সে কাক-কণ্ঠে
হে কবি, তোমার
খোঁজিল-ঘুঘুম ঘুমেছ!

•

একেকবার রাস্তার মাঝে —
আজ ও ছায়া খুঁজেছে,
বাস্-ট্রাম-মধ্যে যারা অবশ
ঘুমা খেয়ে ঘুম খুঁজেছে।
কত কবি কুধা, কত লোভ ক্ষোভ
কতদিন ধরে' চাপিয়া
এতদিনে আজ উঠিয়াছে ওই
ষোড়শোপচারে কাঁপিয়া।
হে কবি, একথা জানিতে —
উপরাস্তানে মাথার বেঁচিত,
আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক,
কবিরাজ, তুমি মানিতে।

['কুয়াশা', পৃঃ ১৯৯,]

(৪)

রমণী-মিশ্রী মুখর ছন্দ — কাব্যেরও কামনা তাই,
কত অভিমানে লেখিকে কে জানে অজানা চিঠার ছাই!
কত মরণের মরণ পাখিয়া পরেছ হাতের মালা,
কটির কাপড় নিয়ের ফেলিয়া — না জানি সে কত জ্বালা!
ফেলে রেখে তুমি যুগের ছলে ভরা বসন্ত-রাতে,
কি জানি কি মনে ভাবো, হে কিশোর, ক্ষুব্ধ-ক্ষুব্ধ মাথে!
যুগের জন্য যার কাছে সে বেণু-বীণা তোরাদিয়া
সাধারণ সুখে কাটায় কি দিন শিঙা ফুল চুমি নিয়া?
কি জানি ভুলিয়ে, জানো আকর! ধরেছ তাহের বেলা?
অন্নপূর্ণা-পতি তব দুখে ভিক্ষা করে নি সেলা।
কহ তত্ত্ব, বিশ্বাস!
সুজার অর্থে চাপা-পড়া যত বেদনার ইতিহাস।
তুমি বেদজ্ঞা ধরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
সুখ বাঁচে ধরে, দুঃখ অমর, — তুমি ধ্রুবাজয়।

['বিশ্বতোমুখ', পৃঃ ১৮-১৯,]

নদীর ও-কূল কালো হয়ে আসে শ্রাবণ-সন্ধ্যাবেলা,
তখনো, বন্ধু ছিপটী তোমার সন্ধুখে থাকে মেলা।
চিকন কালো জলে,
মসৃণ কালো আহত বুক-পরের মতো চলে।

দূর পল্লীতে মেঠো ঘাস খাঁখ, জলি' ওঠে দীপশিখা,
খামে ছায়ানট, চাষি' নিষ্পটে নামে ধারা-ধবনিকা।
তবুনো কিসের আশে,
তোমার মরমে ঢেউ-এর ধাধায় কাৎরায় ছায়া ঘাসে?

['মংক্ত-শিকার', পৃঃ ১০৬]

যাক ভেসে এই প্রভাত-আলোকে
ভেসে থাকি দূর-সুরে, —
ধীরা নদী বেয়া ভেসে কাঁচালে
ভড়ায় ভরির ভুরে।

['মবায়', পৃঃ ১০৮]

মৌন দুপুর চাপিয়া রয়েছে সোনা শহরের বুকে,
টিন-শাহরের বিরাট নগর অহোরাত্র যেন ঘুমে।
আলকাতরার তপ্ত প্রলেপে কাল হয়ে গিয়া-পথ,
গলিয়ে সে 'লাভা' বলিত করিয়া চলিয়ে অবিরত।

পাষাণের বুকে, — মেয়ে মেয়ে আমি মৌন দুপুরবেলা, —
কখন যোগিল কোন্ অলক্ষিক পথ-কর্ত্তার চেলা?
কানন-রাজির শিশু-কন্যায় ধরণ করিয়া মেয়া
লোহার খাঁচায় মানুষ করিয়া কঠোর শাসন সেবা?
ছায়া বাড়াইয়া যত পথতরু দাঁড়াইয়া সারে-সার,
তারি মাঝে হায় বকুলও বিলায় আমুক গন্ধ তার!
শ্যামল মনের অমল প্রীতি কি ফুলে ফুলে আজও ফুটে!
নবফুল-ঘরে যে চুম্ব করে, — তপ্ত পাথরে লুটে!
মনে নাই তার মনের বর্ণা, শোনেমি সে কুজতান,
ফলে ফলে কাক ডালে ডালে বসি' করে তা'রে অপমান।
আকাশের চাঁদ কখন্ উঠিয়া কখন্ যে ফিরে ঘর,
পাষাণ-কারার কীক নাহি পায় খুলাইতে স্নেহ-কর।
ঈশানের মেঘ বিষাণ বাজায়, গুরু-মেঘে ধারি ঘরে,
জন-সমাদের পাষাণ-সোপানে বকুল কুরিয়া মরে।

['পাষাণ-পথে', পৃঃ ১২৮,]

আষাঢ়ের যাচে যাচে,
মেঘেদের কাঁকে কাঁকে,
টাদের কলসী কাঁখে চলে বিভাবরী ;
মলয়ার ফিরে পাশ,
ছাড়িমের ছুটে বাস,
বকুল ফেলিয়া শ্বাস ধীরে পড়ে ঝরি' ।
শুনি' ও নূপুর-ধ্বনি
পথ ছেড়ে দেয় ফণী,
শেতক উঠিয়া বসে পাখের আধার ;
শালুক ঘোমটা সরি'
দু' চোখে প্রদীপ ধরি,
বাউত বুলিয়া ডালে ঘুরিয়া তাকায় ।

['যমনারী', পৃঃ ১৭৯ ১৮০,]

তোমার পথের ধরা-শেফালীরা
এসেছিল আজ ভোরে,
বেলা হ'ল ঢের, মলিন মাধুরী
আসবার গেল ম'রে ।
চ'লে গেল তারা তোমার তারার
হাতে হাতে হাত ধরি',
ব'লে গেল তারা —"বোলো বঁধুরে
আজিও অভোরে ঝরি ।"
দিয়ে গেল তারা কর্পূরের
ছোপানো উত্তরীয় —
কয় গেল তারা — "শরতের মত
সরল পরিও, প্রিয় !

['বকুল অভিনন্দন দিনে', পৃঃ ২১২]

(৬)

চোখপুঁছির ফেরে
একখানি মেঘ যায় দিতে পারো সোধি-সাহারায় ছুঁড়ে ?

['ঘুমের ঘোরে', পৃঃ ৬]

এ জন্মাতে নিজ রক্তেরই লালে নি কি তাই রোঙ্গা !
আপন ফুলের ছবিগ ওটিতে অমৃত ওটিলোভা।
বাঁচাইতে ফেলে লোভার জীবন, খাকে না ওটির নাম ;
ওটি যদি লোটা পেতে চাই তবে শুধু লোভার নাম।

['অবসন্না', পৃ: ৭৩]

লোভ-উদ্রেক নারীর অঙ্গ-লাবণ্যে করিয়া দান,
জন্মর্দের মাথায় পুলিতে যাদুমী করিব পান।

['স্বর্গ হইতে বিদায়', পৃ: ৯১]

আছে গো আছেও সুখ :—
অন্তরে বিনা দেখা যাবে কেন মনের আঁধার দুখ।
মাঝে মাঝে দুরদৃষ্টিকা বিনা কে মাপে মরুর কূপ !
আলোয়ার আলো নহিলে পায় কেমনে হারার দিশা !

['কবির কাব্য', পৃ: ৯৩]

স্বর্গ হতেও গরীয়সী কি না মরেন জন্মভূমি —
স্বর্গ তো নাই, কেমনে যাচাই করিবে সে কথা তুমি !
এও বড় বিস্ময় —
'গরীয়সী' কেবে মনে মনে মনে স্বর্গে না গেলে নয় !
মাটি যদি হত মাতা,—
তর্পণে তার লাগিত কি লাখো সুজের উঁচা মাথা ?

['বিজীষা', পৃ: ১১০-১১]

শোনিত-নদী মহাপ্রান্তরে শিবার অন্তরাতি ;
দেহ খুঁজে ফিরে আত্মা রাখিতে আসি' অস্থাত-বাতি।

['শরশয্যায় ভীষ্ম', পৃ: ১২৪]

রস-খাতালে ও মুক্তিআরালে একেক জাতির খোকা,
একজন কাটে তাদের আশা ও আরেকজন কাটে সোকা।

['মুক্তি যুদ্ধ', পৃ: ১৩৮]

ভুলে জৌলিয়া থাকিতে ভুলিবে,
তবে যাবে ঠিক জানা.—
স্বর্গ-ক্ষেতের মাদুরী মতিয়া
বাঁধিল কেমন ধারা।

সুদূর গোষ্ঠের ভাব-বার্তা কি
স্মরিছে যে যাদুকর ?
কটি-দুল হাটে দুলায় করিতে
ঝরে কালা সিল চারু !

•

কায়ায়ে ছায়ায়ে খেলা যাঠ কি
বিবাগিনী হ'ল, ভাই ?
কটি-বসনেই কটি-কুমড়োদের
দু'হাতে আখাসে ছাই !

বাদলার ইথা ছেটে পড়ে ছুটী
না জানি কি পড়িতায়ে !
মাতলোর ডাকা আহ্বানের 'ধমি'
ঘুমায় যে সাথে সাথে !

খেলিয়া বেড়া'তে জলের দুলাল,
ঢেউএর আঁচলে ঢাকা,
সন্ধ্যার মুখে পদ্মার বুকে
জালে জড়াইল পাখা।
এখনো যে দেহ ছপোর পাতে রে,
হাঁসের দুইরো আঁখি !—
মরণের শীত করে নিবারণ
বাদলের কাঁথা ঢাকি' !

['হাটে', পৃঃ ১৪৭-৪৩]

আমি উপরে যে কবিতাংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পাঠ করিলে যে-কোন সাধারণ-শ্রেণীর পাঠক বুঝিতে পারিবেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আস্বাদন কিরূপ—ভাষা, ভাব, উপমা অলঙ্কারে মিলিয়া তাহা কোন্ বিশিষ্ট রস-রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ উদ্ধৃতি-গুলিকে আমি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিলেও, সবগুলির সেই রূপ একই, লক্ষণগুলি পৃথক করিয়া দেখাইবার জন্য ঐরূপ শ্রেণীকরণ করিয়াছি। প্রথম শ্রেণীতে তাহার যে একটা লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—সে লক্ষণের কথা পূর্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়-শ্রেণীতে

সেই ভাবেরই আর এক রূপ — রসাবেশের ঘন, ভাব যেন স্বচ্ছ হারিয়া চীনাংশুক পরিয়াছে। চিত্র-চিহ্নিত পংক্তিগুলিতে ভাবের আলঙ্কারিকতাই ভাব-দৃষ্টির গভীরতা সম্পাদন করিয়াছে — এই ভাগে রবীন্দ্রনাথের ভাষা অতুলনীয়। চতুর্থ শ্রেণীর উদ্ধৃত ভাষাখণ্ডগুলি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাভঙ্গির উদাহরণ; ইহাদের প্রথমটি, তাঁহার কবিধর্ম যা ভাষারূপ যে বিরূপ রসসৃষ্টি করিতে পারে, তাহার একটা সার্থক নিদর্শন। অপরগুলিতে সেই কল্পনার বিচিত্র ও বিরূপ বিলাস আছে। পঞ্চম শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম ও চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয় আছে, এখানেও তাঁহার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। চিত্র-চিহ্নিত পংক্তিগুলিতে তাঁহার আলঙ্কারিক বাক্‌বৈদগ্ধ্যের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছি।

ইহার পর, সাধারণভাবে আরও দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা রূপক-ভাবেই সার্থক হইয়াছে, এদিক দিয়া তাঁহার কল্পনাভঙ্গি প্রাচীন রীতিরই আশ্রয় করিয়াছে। তথাপি, 'খেয়ার ঘাটায়', 'লোহার খাঁচা', 'বেদিনী' প্রভৃতি কবিতার রূপকগুলিতে বস্তুর সহিত ভাবের নিখুঁত সাদৃশ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় — ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'inevitable', ইহাদের মধ্যে সেই গুণ রহিয়াছে। আর একটি লক্ষণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কবিধর্মের একটা তীক্ষ্ণ সজ্ঞানতা আছে, তাঁহার ঐ তীক্ষ্ণ অনুভূতিই যেন একপ্রকার জ্ঞানে পরিণত হয়, তখনই কবিত্বের কাজ করে। ইহাই তাঁহার কাব্যে Idealism-এর বিরোধী একপ্রকার Realism-এর কারণ। বাস্তবের অনুভূতি হইতে মুহূর্তের পরিত্রাণ নাই বলিয়া, কবিচিত্ত তিক্ত হইয়া উঠে, এবং যেখানেই বিরূপের পরশাল কবিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। কেবল যেখানে তাঁহার প্রাণ অনুস্থ, যা মার্থ-বিলাসের বাহা করিয়া উঠে, সেইখানেই ভাষার একটা মোহকর অনুরণন বাস্তব-অনুভূতির পরেও জাগিয়া থাকে—'বেদিনী', 'বনেরী' প্রভৃতি কবিতা ইহার দৃষ্টান্ত।

কবি-মানসের এই সজ্ঞানতা তাঁহার প্রায় সকল কবিতায় অনুসৃত হইয়া আছে, তাই উপমা ও দৃষ্টান্তের অবতারণা, সবের সবের ভাষারূপকের অতিক্রম করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও চমকিত করে। "বিচ্ছেদ', 'পরবাসে স্বীয়' প্রভৃতি কবিতায় তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিরুদ্ধপক্ষের উকীল তাহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিত না। ঐরূপ ব্যাখ্যার মূলে শুধু তর্কবুদ্ধি নাই, — জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, ইতিহাসেও তাহার সমর্থন খুঁজিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে 'কৃষ্ণা' কবিতাটি ভাব-সংহতির দিক দিয়াও অধিকতর সার্থক হইয়াছে।

এইবার রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ভাবের যেমন, ভাষারও তেমনি একটা বিশেষ-বিকাশ লক্ষিত হইবে। কি পাইলাম তাহা আমি দেখাইয়াছি, পাওয়াটা ফুরাইতে হয় না — হইলে, কাব্য-পাঠই বৃথা হইয়া যায়। কিন্তু না-পাওয়ারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে — সেটা পাঠকের তরফে। তাহাকে বিমুখ হইলে চলিবে না যে, কবি তাহারও কল্পনার জন্য ভাষা রচনা করেন না; তিনি যাহা দেন তাহা যে আমরা নিতে পারেন, তাহার কারণ এই যে, তাহার উপর টান দিতে পারেন না। তাই কবির কাছে ঠিক তাহাই চাওয়া উচিত, যে সম্বন্ধে দুই-বিচার করে সে অনুভব। তথাপি, যাহা পাই না, তাহা যেন পাই না — এই সঙ্গে তাহার ও একটা জানিয়ে চাহিলে খুব দোষ হয় না, রবীন্দ্রনাথ 'ক' কবিতে অবতারণা করিয়াছি না — নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করিয়াছি।

এই বিচারে, আমি 'চল', 'অসীমীর' প্রভৃতি পারিত্যক্ত শব্দ ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিব না, করিলে — ভাবের ঘরে না হউক, ভাষার ঘরে চুরী

করা হইবে : তাহা নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তৎপরিবর্তে, আমরা 'অনুভূতি' এবং 'কল্পনা' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিব। কল্পনা সেই বস্তু যাহা অনুভূতির দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া অনুভূতি ক্ষেত্রটীকে অতিক্রম করে; এবং করে বলিয়াই আমাদিগকে ভাবলোক হইতে কল্পলোকে উত্তীর্ণ করিয়া বাস্তবতারও বেশ কিছু দূরে লইয়া যায়। এই বাস্তব-দূরত্বই প্রাণের আরাম, ইহাকেই যদি ভাষান্তরে বলা যায়, তাহা হইলে কাহারও বুঝিতে বাকী হইবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পনাকে একটী বিশিষ্ট অনুভূতি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যে-কয়টী শব্দকে, প্রত্যেক পরিচ্ছেদান্তে, অতিক্রম করিয়া নব নব রূপলোক সৃষ্টি করে — রবীন্দ্রনাথ যেন শব্দ করিয়া তাহাকে পরিহার করিতে চাহিয়াছেন; ফলে কল্পনা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই, কেবল এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া পাখা ঝাপটাইয়াছে। এবং এক অতিতীব্র অনুভূতিসিক্ত রূপ রস-সুরভির কূলে বসিয়াও পিপাসা-বারি পান করিবে না, অথচ সেই পিপাসাকে অস্বীকারও করিবে না। ইংরেজীতে যাহাকে abnormal বলে, এই প্রকৃতিও সেইরূপ abnormal। সকল কবি-প্রকৃতি তাহাই। তথাপি রবীন্দ্রনাথের এই abnormality-ও যেন একটু abnormal। ইহা যেন একটা সন্ধান আছেই। এই জন্যই যাহা ভুলে ভাব-রাজ্যে তাহাই একটা স্বপ্নের রূপ ধারণ করে, সেই একই mood — উপমা, অলঙ্কার ছন্দ ও ধ্বনির দ্বারা নব নব ভঙ্গিতে বহুই বিচিত্র হইয়া, পাঠক-চিত্তে একটা বন্ধনস্বরূপ হইয়া উঠে। আমি সর্বপ্রথমেই বলিয়াছি, কবিতায় তত্ত্বটা কিছু নয়, প্রকাশটা — অর্থাৎ তাহার বাণীরূপটাই — আসল; রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাণী, যেমন উজ্জ্বল তেমনই পরিচ্ছন্ন। — বাণী বলিতে ভাবের যেরূপটীর রূপসৃষ্টি বুঝিতে হইবে। কিন্তু ঐ বাণীরূপের রূপ-সংযমের ভাবকে অতিক্রম করিয়া, তত্ত্বের প্রাধান্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই; তাঁহার কবিমানসের অতিরিক্ত সজাগ-তাই ভাবানুভূতিকে কল্পনার বেশিদূর প্রসারিত হইতে দেয় নাই। ইহার কারণ, তাঁহার সেই বাক্তি-চেতনার অভিমান; তিনি অনুভূতির তীব্রতার বহুটা অধীর হন, তাহাতে অজ্ঞান হইতে পারেন না — আত্মহারা হইয়া যান না। এই কারণে তাঁহার ভাবের রস-আস্বাদনে, অর্থাৎ প্রাণের সেই মুক্তি-সুখে — শেষ পর্যন্ত একটু অভাব বোধ থাকে, ছন্দ যতটা অভি-ভূত হয়, ততটা আবদ্ধ হয় না।

ইহাই যেন রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনেরও একটা ট্র্যাজেডি। তাঁহার কাব্যও নিছক কাব্য নয় — একটা বন্ধনদীর্ণ মানব-হৃদয়ের আলাই যেন সহাকার কবিশক্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে। আমি, নিজেরই তত্ত্বচিন্তা-অনুযায়ী এই দ্বন্দ্বের একটা অর্থ করিয়া, এই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহার করিব। আমার ব্যাখ্যাটি হইবে বৈশাস্তিক, — তজ্জন্য কাহারও ক্ষমা পাইতে হইবে না। আমি কাব্যসমালোচনা শেষ করিয়াছি, এক্ষণে কবির কাব্যটি লইয়া একটু সাইকো-এনালিসিস করিব, তাহাও আমারই মতে — যেখানে একটু সাহায্য করিবে মাত্র, বন্ধন দিতে পারিবে না। বৈশাস্তিক বলেন, 'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম' (যত 'আমি' আছে সকলেরই বেটা সর্বনাম) বিশ্বি, তাঁহার সৃষ্টি-কামনা হইতেই পারে না; 'কারণ কামনা বলিতেই একটা কিছুর অভাব বুঝায়, ব্রহ্মের অভাব-বোধ অসম্ভব।' তথাপি কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে (সৃষ্টি মানিতে হইলে), সেই 'আত্মা'ই প্রথমে কামনা-রূপিণী 'মায়া'র দ্বারা লিপ্ত হইলেন, পরে তাহার বশীভূত হইয়া 'জীব'-রূপে অধঃপতিত হইলেন। ঐ প্রথম অবস্থাটা ঈশ্বরের অবস্থা — ঈশ্বর-তত্ত্বী ব্রহ্ম 'মায়া'কে লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন; ঐ 'মায়া'ই 'কল্পনা'-শক্তি হইয়া ঈশ্বরকে কবি করিয়া তুলিল, ঈশ্বর কল্পনার দ্বারা এই সৃষ্টিধারা রচনা করিলেন। তিনি তখন কবি, কল্পনা তাঁহার দাসী। দাসী তাঁহাকে যত

মন রস আস্বাদন করাইয়া দেবে এমনই মেলা বসাইয়া দিল যে, সেই কবি-ঈশ্বর জ্ঞান হারাইলেন, একেবারে ঘোরতর খুন হইয়া পড়িলেন; তখন যাহা কল্পনা ছিল তাহাই বাস্তব হইয়া পড়িল, এবং যাহা রস-বস্তু তাহাই দুঃখ-হেতু হইয়া উঠিল। এক কথায়, তখন কবিও নাই, কল্পনাও নাই; ঈশ্বরটি তখন 'জীব' হইয়া কল্পনার জগৎকে বাস্তব মনে করিয়া, এবং নিজেকেও তাহার একটা অংশ মনে করিয়া, আর্তনাদে বিশ্বলোক বিদীর্ণ করিতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাস্তবটা — জীবের; কল্পনা — কবির, ঈশ্বরের। কবির সহিত 'কল্পনা'র যা 'মায়া'র প্রভু ও দাসী-সম্পর্ক। জীবরূপী ব্রহ্ম 'মায়া'র দাস হইয়া, বস্তুকে স্বীকার করিয়া, তাহার সহিত রফা করিতেই ব্যস্ত। কিন্তু তাহার অন্তরস্থ সেই ব্রহ্ম যাকে যাকে 'মায়া'র ছলনা ধরিয়া ফেলে, সে তখন উহাকে গালি দেয়, 'কল্পনা'র উপরে খড়্গ বিধিই হইয়া উঠে। কিন্তু মানুষের মনো, জীবের মায়া, সেই 'ব্রহ্ম' যখন তখন তাহার পূর্বজন্ম কবি-স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখন সে ঐ ছলনাময়ীকেই বৈষ্ণব-ভাবে সোহন করিয়া লইয়া রসবিহ্বল হয়, অন্যকেও পরমানন্দের অংশভাগ করিয়া তোলে। যদি সেই ব্যক্তি একবারে কবি ও বৈরাগিক হয়, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, ষতীন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছে। যেহেতু ষতীন্দ্রনাথ কবি, সেই হেতু তিনিও প্রজ্ঞা-ঈশ্বর, তিনিও মায়াধীশ,—তিনিও তাঁহার কল্পনাকে ইচ্ছামত রূপরসগন্ধে বিমুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু সেই সঙ্গে জীবত্বাভিমান বর্জন করিতে পারেন না বলিয়া, নিজেকে সেই 'মায়া'র দাস মনে করিয়া তাহার প্রতি অভিমান ক্ষুণ্ণিত হন; প্রকৃতিরূপিণী মায়া তাঁহাকে প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া, তাহার সেই কটাক্ষ-ইঙ্গিতে তাঁহার জগৎ বিদ্ধ করিলেও, তাহাকে ভাল লাগে বলিয়াই তাহার প্রতি বিদ্বেষের কথা নাই। চিত্তের যেন দুইটা বিরুদ্ধ-ধাতুর অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে; তিনি নিজেই তাহা একটি সুন্দর উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা :—

"সহসা দেখিনু, বেলার দুপুর — সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
ঝাড়-মোড় ভেঙে ভ্রমের ভিতর পড়িলাম একেবারে।
কাশা রেখে উঠি' মেলা যেন ছুটি,' পাঁজরে বিষম
ব্যথা —
শুনে দেখি তাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে
কোথা!
কথা নহে বলিবার —
আপনিই তাই গোপনে সেখানে ঘুড়িনু ভ্রমের
হাড়।
উপরে নিয়েছে বেমালুম হ'য়ে মিঠানো চামড়া-পটি,
ভিতরে কিন্তু নব-ভ্রমের-হাড়ে বিষম খটখটি!"
— এই 'খটখটি'ই তাঁহার কবি-জীবনের ট্রাজিডি।

আরও প্রমাণ আছে। বৈরাগিকের ধ্যানে ও জ্ঞানে এত বই দুই নাই; ষতীন্দ্রনাথের 'বধূ'ও ষতীন্দ্রনাথ নিজেই, — তাই দুঃখটাও তাঁহার নেই 'বধূর'ই দুঃখ; অর্থাৎ ইহাও বেদান্তের সেই 'আত্মার' দুঃখ। ঐ আত্মার পক্ষে 'মায়া' বা 'কল্পনা'ই সকল অনিষ্টের মূল—উহাই ত' ঈশ্বর-ব্রহ্মকে জীবের অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে! কিন্তু ষতীন্দ্রনাথ ত' খাঁটি বৈরাগিক নহেন, তাঁহার মধ্যে যে ঐ 'নব-ভ্রমের-হাড়ের খটখটি' রহিয়াছে; তাই বৈষ্ণবের মত কবিত্বের হাতে না পারিলেও ঐ কবিত্বরূপিণী তাঁহার কল্পনাকে বরণ করিয়াছে, অর্থাৎ কল্পনা তাঁহাকেও ছেড়ে নাই, শেষ পর্যন্ত রূপের একটা বিশেষ রসসৃষ্টির তাঁহাকে দলভুক্ত করিয়াছে।

কিন্তু তাহাতেই বাংলাকাব্যে একটি অভিনব বিশিষ্ট সুর — যেমন মৌলিক, তেমনই পূর্ণবৃত্ত হইয়া — ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে ষতীন্দ্রনাথ যে কারণে, যে গুণে যে স্থানে অধিকারে

করিয়াছেন, তাহা আমিকার এই ইংলণ্ডে কাহারও চোখে পড়িবে না, — একটি পড়িবে, এই আশায় আমি তাঁহার তারা ও বিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই কয়টি কথা লিখিয়া রাখিলাম।

যে জানী, যে মানিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক; তাহার সুখও অধিক। মানুষেই যে দুঃখ, ও ঈশ্বর আর কাহার দুঃখ কি?

— রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গ-দর্শন

[একণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন; মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। একণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির পার্থক্যে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

— বঙ্কিমচন্দ্র]

'বঙ্গ-দর্শনে'র পাঠকবর্গকে আমরা একবার নমস্কার জানাইয়াছি। অগ্রহায়ণে প্রণামান্তর আলিঙ্গন-গ্রহণ, অনুগ্রহকে আলিঙ্গনান্তে আশীর্বাদন, এবং বন্ধুজনকে নমস্কারান্তে আলিঙ্গন-দান করিতেছি; পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা মাতৃস্থানীয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম, যাঁহারা স্বয়স্যা তাঁহাদিগকে নমস্কার, এবং যাঁহারা কন্যাস্থানীয়া তাঁহাদিগকে স্নেহ-বিদ জানাইতেছি। ঐরূপে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সমীপে প্রার্থনা এই হইত যে, আমরা যেন সর্বদিগে মোহ ও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হই; কারণ, ব্যক্তিরও যেমন, জাতিরও তেমনি, সকল দুঃখদুর্দশার মূলে রহিয়াছে বুদ্ধিনাশ। বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা— মহাশক্তির অকাল-বোধন — পাশ্চাত্য সভ্যতার ভরিয়া, সকল অনিষ্টের মূলোচ্ছেদ করিয়া শান্তির বিজয়-উৎসব। মনে রাখিতে হইবে যে আগে যুদ্ধ, পরে ঐ জয়লাভ। সে যুদ্ধ যে বিষম যুদ্ধ, তাহাতে কোন্ অস্ত্র, কোন্ শক্তির আরাধনা করিতে হয়, তাহা যেন আমরা না ভুলি, শাক্ত বাঙ্গালী যেন তাহার কুলধর্ম বিস্মৃত না হয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের সেই বাণী — 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ' — এই মাহাত্ম্য যেন সর্বদা স্মরণ করি, তাহার কোন 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যা করিয়া ঐ মহাশক্তিকেই যেন অস্বীকার না করি। পাঠক-পাঠিকাগণ, ইহাই 'বঙ্গ-দর্শনে'র চরিতার্থ শিবের প্রার্থনা — 'বঙ্গ-দর্শনে'র যিনি জনক, এবং গুরু, সেই জাতিহিতৈষী মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীও ইহাই।

* * *

গত সংখ্যায় আমরা এবারকার দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাদের কৃপায় তাহা ঘটে নাই — সরকার বন্ধ ও অনুরোধ এই দুয়ে মিলিয়া কতকটা সামলাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালার পাকিস্তানেও চাক-ঢোল-কাঁসি-কাঁসির পূজা বৈকল্যভাবে একরূপ সম্পন্ন হইয়াছে—তাক না থাকিলেও, চাক-ঢাক গুড়-গুড় অবশ্যই হইয়াছে। পূজা করিবেই বা কে? সকলের নিজের অবস্থা ত' ঠেকের অবস্থা। যাই হোক, আমার যে এই উপলক্ষ্যে কোথাও একটা নোয়াখালি-কাণ্ড ঘটে নাই, ইহা শিবচিন্তামণির পুণ্যফল বলিতে হইবে;

বাঙালীর ও কথা কেহ বলে নাই। বলিলেই বে রক্ষা করিত? কে না বলে করিয়াছে?

• •

তবে কি কলিকাতা-অঞ্চলে, অর্থাৎ স্বাধীন বাংলায় — যেখানে চক্ষুলজ্জার বিন্দুমাত্র পরোয়া না করিয়া, মুক্ত উদ্যানে — যেখানকার ভাগ্যবান বাঙালী একদিকে স্বাধীনভাবে ছুরী-জোচ্চুরি, ব্ল্যাক-মার্কেট ও ফোটকের নেতাগিরির ব্যবসায় চালাইতেছে, এবং অন্যদিকে বাকি সব-বাঙালীও স্বাধীনভাবে সর্বস্ব উৎসাহের পালন করিতেছে, সেখানে এবার কিছু নূতনত্ব দেখা গিয়াছিল। পূজাটা 'স্বাধীনতা-জনীন' হওয়ায়, সর্বজনীনের উপরে একটু রঙ্ চড়িয়াছিল। 'সর্বজনীন' অর্থে 'স্বপ্রধান' বটে, কিন্তু সেই কারণেই Provincial Autonomy ও Self-Determination-এর প্রেরণায়, পল্লীতে পল্লীতে স্বাতন্ত্র্যের প্রতিযোগিতা অত্যন্তরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক পাড়ার এক একটি স্বাধীন দল কয় ঘুর-তেহাই লম্বমান্ পট্‌পট্, শব্দে উড্ডীন করিয়াছিল, প্রতিবেশীর সেই একই হিংসাদীপ্ত পতাকার সীমানা অতিক্রমভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল—অর্থাৎ বাংলাকে আসাম যেমন করিয়াছে, বিহার ও উড়িষ্যা যেমন করিয়াছে; অতএব তাহাকে খুবই বড় হইতে হইবে। কোন কোন স্থানে (শহর হইতে দূরে, মফস্বলে) ঐরূপ বিভিন্ন পল্লীতে এক একটি দল তাহাদের 'সর্বজনীন' পূজার প্রাঙ্গণে, প্রতিমার নিকটে, পরস্পরের অলক্ষিতে সন্ধান করিবার জন্য তাঁবুর একটি সংবৃদ্ধি গড়িয়া স্থাপন করিয়াছিল, প্রতিযোগিতায় কেহ হার স্বীকার করে নাই। ইহাতে অহিংসা-নীতির জয় হইয়াছিল — তাঁবুর ঐরূপ পরস্পরের প্রতি মুখ-ঘোরানিতেই বীরত্বের বাসনের প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার কোন কোন স্থানে ইতিমধ্যে মুখোমুখির সংবাদ আমরা পাইয়াছি; কারণ 'সর্বজনীন' আগে বাহির হইবে, তাহা লইয়া প্রতিযোগিতার কোন কোন মহলে Self-Determination কিছু উগ্র হইয়া পড়ে, ফলে লাঠালাঠি এবং শেষে প্রতিযোগিতার পর্যন্ত ঘটিয়াছে, — স্বাধীন ভারতের হিংসা-পতাকার গৌরব রক্ষা করিতে কোন পক্ষই ত্রুটি করে নাই। বাঙালীর সর্বজনীন দুর্গোৎসব যেরূপ স্বাধীনতা-জনীন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইহার পর একটা অভিজ্ঞান জারী না করিলে দুর্গামূর্তিগুলি আর বাঁচে না। এবার ঐ প্রতিযোগিতা হইয়াছে — মহিষী-নির্দ্ধিতে, যেন সিনেমা-আর্টের প্রদর্শনী, তার উপর আবার এই অহিংসা-ভাবের কবিকল্প স্বাধীনতা, এই জন্য যাহা বাঙালী সাধনাবে কেমন করিয়া?

কাজ কি আর ঐ দুর্গোৎসবে? ওটা ত' বাঙালীর পূজা, উহাতে বোধহয় প্রাদেশিকতার গন্ধ আছে। বাঙালী যতদিন ঐ পূজা করিবে, ততদিন ভারতকে মনেপ্রাণে আপনার করিতে পারিবে না। তা'ছাড়া উহার ঐ বলি, চণ্ডীপাঠ, — ও সব কি অহিংসার অনুকূল? দোষ ত' ঐখানে। অহিংসার স্বাধীনতা আর ঐ রক্তারক্তির পূজা — এ দুইয়ে মিলাইতে গেলে প্রতিযোগ-ভঙ্গ ত' হইবেই। তার পরিবর্তে এখন কিছুদিন কোরান-পাঠ করিলে, মুসলমান-ভাইরাও খুসিতে পারিবে, ভারতেরও আসলে অভিপ্রায়ই; আর ঐ প্রতিযোগিতা না থাকিলে, তাহারাও আর প্রতিযোগ-ভঙ্গ করিয়া পাপের ভাগী হইবে না। অতএব এইরূপ পূজা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি হিন্দুয়ানিই বর্জনীয়।

• • •

আমরাও বলি, আর ঐ দুর্গা পূজার প্রয়োজন কেন! দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব — আধুনিক পোলিটিক্যাল জাতীয়তা নয় — অন্তরের জাতীয়তা, সমাজের জাতীয়তা; সেজাতীয়তা তাহার সমাজে, ধর্মে, তাহার জীবন-যাত্রায়, তাহার সুখদুঃখ-চেতনায়, তাহার চরিত্রের বহুদিক-সংস্কারে ওতপ্রোত হইয়াছিল

—সেই জাতীয়তার উৎসব। এ প্রতিমা তাহার গৃহ-দেবতার প্রতিমা নয়—তাহার সমাজ-জীবনের প্রতীক। সারাবৎসরে বাঙালী একবার মাত্র আর সব ভুলিয়া সেই প্রেমের অথাধ সাগরে ডুবিয়া যাইত—তেমন প্রেম বোধ হয় বাঙালী ছাড়া আর কোন জাতি অনুভব করিতে পারে না। সেই যে 'মা আসিতেছেন,' 'এ যায় আমি যাকে আনিব,' তারপর সেই আগমনী গান—বাংলার অনেস্থলে আকাশে শারদীয়ার সেই নিখা আবির্ভাব—তাহার গানে বাঙালী পাগল হইয়া যাইত। তাহার জন্মভূমির সেই রূপ, আর তাহার সমাজ-জীবনের সেই প্রেম এক সুরে বাঁধা হইয়া যাইত। এ গান একার গান নয়, কুলের আর গানে নয়, অথাত্ত-সঙ্গীতও নয়—সে গানও সে তখন ভুলিয়া যাইত। মা যে সকলের মা; সেই মাকে আনিতে হইলে, তাঁহার পূজা করিতে হইলে, আত্তাল ব্রাহ্মণ সকলকে ডাকিয়া একত্রে প্রসাদ পাইতে হইবে—এ যেন ঐ একদিন স্বজাতি, স্ব-সমাজকে বুক ভরাইয়া আনন্দে নৃত্য করা। ইহাই বাঙালীর দুর্গোৎসব, গৃহ-দেবতার পূজা নয়, ইষ্টদেবতার পূজাও নয়, এ পূজা—প্রকৃতির পূজা, সমাজের পূজা, মানুষের পূজা। এমন পূজা বাঙালীই করিয়াছে, তাহাদের আর কোন হিন্দু করে নাই; মহাশক্তিকে নিজের কন্যারূপে আবাহন করিয়া, সে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের চতুর্বর্গকে একই পাত্রের পানীয় করিয়া তুলিয়াছে! সেই যে 'যাকে আনিব'—সে ত' আর কিছু নয়, সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠকে এক পরিবার-ভুক্ত করিয়া দেখিব। নারায়ণ, ভোজপাঠ, গীতাভিনয়, যাত্রাগীতা, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' এবং সর্বশেষে সর্ববর্ণের সকলকে আলিঙ্গন—এ উৎসব রাজসূয়-উৎসব অপেক্ষা মহীয়ান; রাজসৌধ নয়—মনুষ্যত্বাধারের মহিমা-ঘোষণার উৎসব। ইহাই বাঙালীর জাতিগত ধর্মসংস্কার; বাঙালী কখনও রাজসৌধ চায় নাই—প্রজার রাজ্যবোধ এবং তাহা রক্ষার জন্য সে একটি সমাজ-জীবন গড়িয়া লইয়াছিল। এই পূজার উপচার-উপকরণে সকলকেই যোগাইতে হয়, ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজবর্গ পর্যন্ত সকলের হাতে পড়া ইহার রূপ; এ যেন সর্বস্বর্ব—"স্বর্ণপদ্মং তবত্ত কিং নিধিং বিলসতি।"

অতএব, 'যাকে আনিব'—বাঙালীর সেই আকুল আমন্ত্রণ অর্থ বুঝিয়া দেখ। যে দরিদ্র সেও আপনার পর্ণ-কুটিরে উৎসবের আয়োজন করিয়াছে, ধনীর সহিত প্রতিযোগিতার সেখানে স্থান বা ভাবনা নাই—ঈর্ষার লজ্জা নাই। যে ধনী তাহার গৃহ শুকাইয়া, সে-ই মায়ের পূজায় সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি করিবে—তাহার ধনৈশ্বর্য সার্থক হইবে। তাই দেখিয়াছি, সেকালের ধনিয়ানী ধনী গৃহস্থের ঘ' কথাই নাই, যে-দরিদ্র ধনী হইয়াছে,—তা সে সাধু উপায়ে হোক, অসাধু উপায়ে হোক—তাহারও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য মাকে আনিতে হইবে; সেই স্বাভাবিক মনোভাবের মধ্যেও বাঙালী-প্রাণের অনেকখানি উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিত, এই মাতৃত্বকে আনন্দ-দান করিয়া তাহার আত্মা একটি অপরূপ শুচিতা লাভ করিত। অতিবড় কৃপণ যে, সে-ও এই উপলক্ষে তাহার জন্মান্তরীণ পাপক্ষয় করিত।

• •

আর আজ কি দেখিতেছি! ইহাই কি বাঙালীর দুর্গোৎসব? এ জাতির দারিদ্র্যের কথা জানি—এমন দরিদ্র বাঙালী কখনও ছিল না। আসল কথা, তাহার সমাজ ভাঙিয়াছে—দারিদ্র্যেরও মূল কারণ তাহাই। সমাজ ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহার জীবিকা-বিশ্বাস হইয়াছে, কর্ম নষ্ট হইয়াছে, মেরুদণ্ডও ভাঙিয়াছে! আলোর পিছনে ছুটিয়া সে যার ত্যাগ করিয়াছিল, ইংরাজের দাসত্ব করিতে গিয়া সে সব হারাইয়া, তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইয়াছে; সেই দাসত্ব, সেই চাকুরী এখনও তাহার জীবিকা; এখনও সে অন্নদাতার দাস। সে দাসত্ব ঘুচে নাই, সহজে ঘুচিবেও না, বরং বুঝি

পাইবার অবস্থাই অধিক হয়। উহাতে — তবু ছোটলোকটা মত 'স্বাধীন হইয়াছি' বলিয়া বিদ্যালয়-বুলি বলিয়াছে। তাই আজ বাঙালীর আর কোন বক্তব্য নাই, তাহার প্রয়োজন বড় যে প্রয়োজনের উপর তাহা একটা নিষ্ঠুর প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। সে ঐ মনুষ্যমূর্তিকেও নড়ী মারিয়া যাহোক দৈত্যাকার করে, প্রতিযোগিতা পর্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; তাহাতে শক্তি, ভক্তি বা প্রাণের উদ্বোধন হয় না, আটের সুলাপাত হইয়া থাকে। দল বাঁধিয়া, চাঁদা তুলিয়া তাহা করিতে হয়; কোন ধনী আর ঘরে শুয়ে আছিয়া, সকল সংকল্পে পড়িয়া উদ্যম করে না; তাহাতে চাঁদা দেয়, হয় ত' বেশি দিয়া দলপতি হয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থটিকে, অথবা বিদ্বেষ চরিতার্থ করে। একদিকে যেমন শক্তির বাহিরা, অন্য দিকে তেমনই অবশ্যম্ভাবিত বিরাট উদ্যম — এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা ঐ তিনদিনের জন্যও এতটুকু দূর হয় না। ধনী বাঙালী আর 'ঘরকে আগিয়ে' চায় না, তুলা অর্থব্যয় করে না; করিবার আবশ্যকও নাই — গ্রামে ত' সমাজ নাই-ই, পল্লীগ্রামেও সমাজ চিল-শকুনের আস্তানা হইয়া উঠিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, স্বর্গীয়ের ঐ প্রহসন আর কেন!

* *

পলিটিক্স্, ধর্ম ও সাহিত্য,—বাংলাদেশে এই তিনের বিবাদ হইয়াছে; আগে ছিল ধর্ম ও পলিটিক্স্, পরে তাহাতে সাহিত্যও যুক্ত হইয়াছে। ধর্ম ও পলিটিক্স্ এই দুইকে এক মহা-কালরাত্রির কৌশলে মিশ্রিত করিয়া যে স্বাধীনতা-প্রসবিনী সুরা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান করিয়া আমরা বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি; ইতিহাস লজ্জায় ম্লান হইয়াছে, জগৎ বিস্ময়ে হাঁ করিয়া, পেটের বিদ্যা নিবারণ করিতেছে। ইতিহাস বা জগৎ যাহাই করুক, আমরা একটি যাদু-যন্ত্র লাভ করিয়াছি — যাহারাই ঐ ধর্ম-পলিটিক্স্ যন্ত্রে তাহারাই দেবদুর্লভ হইয়া উঠে, উহাদের হাতে নিরক্ষর পর্যন্ত সকলেই সিকি-রাজার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ফলে, দেশে কোথাও আর কোন অর্থ টিঁকিয়া থাকিতে পারে না, ধর্ম-পলিটিকসের পাল্লায় পড়িলেই সব সাফ হইয়া যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

* * *

সম্প্রতি ভারতীয় বাজেয়ে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য প্রত্যেক চাউল ও ধান্য সংগ্রহ করিয়া তাহা সকলের পক্ষে সমান সুলভ করিবার একটি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে; প্রত্যেক গ্রামে যে সকল ধর্ম-পলিটিকস্-মার্কা মুরুব্বি আছেন, তাঁহারাই ইহার কর্তৃত্বভার পাইয়াছেন। আর তাহলো রহিল না; কেহ ত' বলিতে পারিবেনা যে, এ-গ্রামে বাবাজীর-দেনা আছে। এতখা যে বলিবে, সে বড়ই দুর্জন নয়, শেষুত্রাণী। তবু সহজে এতবড় একটা দুরহ সমস্যার সমাধান হইয়া গেল!

* * *

কিন্তু লোহাই আপনাদের। — 'ঘরে ত'ব কি নির্ভয়ে ত'ব' জানি না, গ্রামাঞ্চলের ধর্ম-পলিটিকস্ যে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি — ভক্তিমানের চক্ষু যে বিষ্ণুকেই মূর্তিত হইতে চায় না। প্রত্যেক গ্রামে একটি বা একটি মহাপুরুষ আছেন — তিনি বিদ্যায় বৃহস্পতি, চরিত্রে ধার্মিক, বুদ্ধিতে মুসলিম-লীগের বাবা, এবং ধর্মে অবোরপন্থী। ইঁহাদের জন্ম থানার দারোগা, মহকুমার হাকিম, ও জমিদারের নায়েব। বাহিরাগত গ্রামবাসী, ও স্বগৃহীত নিরীহ ভদ্রলোক ইঁহাদের প্রতাপে বিতাড়িত নিরুপায়। পূর্ববর্তী গভর্নমেন্টকে তোষণ করিয়া ইঁহারা নিজেদের স্বত্ববৃত্তি বজায় রাখিয়াছিল, এখনে রাতারাতি আর একপ্রকার জলুষ পড়িয়া, নূতন পতাকা উড়াইয়া, নূতন ব্যাজ পরিধান করিয়া, ইঁহারা দীক্ষিত সাধু বনিয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ধর্মের সহিত পলিটিকস্ যুক্ত হইলে অসম্ভব সম্ভব হয়—

—

যাহারা বহুরূপ অর্থাৎ তাহারা বহুরূপ ধর্মিত হইয়া এবং যেমনই গ্রামবাসীদের বৈরভাবের কারণটা হইয়াছে। এমনও শুনিয়াছি, একাধিক স্থানে, বহুরূপা গ্রামবাসীরা ক্রমে অধিক হইয়া, ধর্মাধিপতি-দের নিকটে আকুল আবেদন করিয়াছিল, তাহাতে ফল হয় নাই। না হইবারই কথা, কারণ, ফল-প্রার্থীমাত্র লাভ করিয়া অতিশয় অসাধু যদি সাধু হইতে না পারিল, তবে ঐ ফলদাতা মাত্রারা কি? সে কথা বিস্তারে বলাও যে যায়। উপর হইতে নীচে পর্যন্ত সকলেই যে ফলদা ধরিয়াছে।

* * *

পলিটিক্সের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ঘটিলে, অর্থাৎ, যারা একান্তই বাস্তব তাহাতে একটু রঙ্গনের তেজি লাগাইতে পারিলে, সকল ঝাঁজ ও ঝাঁঝি কেমন কাটে করিয়া লওয়া যায়—তাহার একটি সাধের এক নমুনা আমরা পাইয়াছি। বিশ্ববাসী সকলে—এমন কি, আমেরাও—জানি যে, আমরা 'মুক্তি' লাভ করিয়াছি; আমাদের আত্মাও খাঁচা ছাড়িবা-মাত্র তাহা জানিয়াছে। কিন্তু মুক্তিটা একটু যেমনধারা পোলিটিক্যাল বলিয়া জন-সাধারণের পাছে ভুল হয়, তাই সাহিত্যের দ্বারা 'মুক্তির মুক্তা'টাকে একটু বাজিয়া বাজিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, আমরা 'মুক্তি' লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু এখনও 'মুক্ত' হই নাই। আগে ঐ শব্দ দুইটার মূলোৎপত্তি বুঝিতে হইবে। 'মুক্তি'-শব্দটা সংস্কৃত, উহা বস্তু-বাচক, উহাই আমরা লাভ করিয়াছি। কিন্তু 'মুক্ত' শব্দটা বিশেষণ-জাতীয়, উহা পাওয়া যায় না, উহা হইতে হয়। উহার অর্থটা বাঙালীর পক্ষে বাংলাই হইবে—একেবারে খাঁটি ঘর-কন্নার বাংলা। তাহাতে 'মুক্ত' বলিতে 'আবর্জনা-মুক্ত' বুঝায় (আত্মপরলোকী কর্মসাধন)। অতএব, আমাদের মুক্তিলাভও যেমন সত্য, মুক্ত না হওয়াও তেমনই সত্য, কারণ, আবর্জনার আমাদের অন্তর-বাহির যে ভরিয়া রহিয়াছে, সেই [illegible] কিছুতে না মুক্তকচ্ছ হইয়া মুক্তির মুক্তা তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। এই যে সাহিত্যিক সমস্যা, ইহা আমরা বুঝিতে পারিলে পরম সত্যেরও স্বীকার করা যায়, আমাদের পলিটিকসেরও মানেটা হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহা হইলে আবর্জনামুক্ত হইবার মূলেই কি মুক্তি-লাভ হইয়াছে। হাঁ, তাহাই হইয়াছে। আপনারা বলিবেন, তাহা কি সম্ভব? যে-আকুল জন্তর জাগিয়া উঠিলে একটা জাতি মুক্তির জন্য অধীর হয়, সেই আকুলতা কি সকল আবর্জনা ভস্ম হইয়া যায় না? না; আমাদের মুক্তিলাভ বিনা আগুনেই হইয়াছে—যোগবলে; ওরফে শ্রীমুখ-বচন-প্রভাবে আমরা মুক্তিলাভ করিয়াছি। এইবার সেই 'মুক্তি'তে ফুঁ দিয়া আপনি জাগাইতে হইবে; সাহিত্যই সেই ফুঁ দিবে, তোমাদের কিছুই করিতে হইবে না, কেবল কয়েকটা কাগজ, ও একখানি মাসিক-পত্র করিবার পাঠ করিবে।

* *

না, সাহিত্য ছাড়া অন্য গতি নাই, তাই রঙ্গ ও পলিটিকসের সঙ্গে সাহিত্য মিলাইতেই হইবে। এই শুভ ত্রাহস্পর্শ-যোগ ব্যর্থ হইতে পারে না। কিন্তু একটা বড় বাধা আসে—যাহারা সাহিত্যিক হইয়া সাহিত্যের উপরে ধর্ম ও পলিটিকসকে স্থান দিয়াছে, তাহাদের সাধুতাও কি কেবল সাহিত্যিক সাধুতা হইলেই চলিবে!—প্রেমের কারবারটা ঠিকমত চলিলেই হইল? না, সেই ধার্মিক সাহিত্যিকদের ধর্মাচার কেমন—কেবল সভা-সমিতি ও পুস্তকে-প্রবন্ধে নয়, কেবল জয়ন্ত-কোর্তা ও গান্ধী-টুপিতেও নয়, এমন কি, ট্রামে চড়িয়া কেঁপু-বাজানোতেও নয় (বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কি ডিমোক্র্যাটিক সংস্করণ!)—সবে লজ্জা ও বৈঠকখানায় পিছনে, একটু অন্তরে তাঁহারা কি করিয়া থাকেন, তাহা উঁকি দিয়া দেখিবার

প্রয়োজন আছে কিনা ? বুঝও বুঝি, পলিটিক্সও বুঝি, সাহিত্যও বুঝি, কিন্তু এই ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

•

দেশের লোক সাহিত্য বলিতে কি বুঝে তাহা ত' জানি না। সিনেমার বিজ্ঞাপন হইতে রেডিওর বক্তৃতা পর্য্যন্ত সবগুলাই সাহিত্য ! আর ছেলের হাত-উঠান হইতে বীমা-কোম্পানীর ম্যানেজার পর্য্যন্ত সবলেই সাহিত্যিক। সাহিত্য কি তাহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সাহিত্য সেবায়ীর আত্ম-জ্ঞান ও বুদ্ধির মাপিক হইলে কোন্ কথাটার মানে, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিবেন কি ?

•

ঐ সাহিত্যিক ও লিটারেচার (?) মিলিয়া একটা নাকি বিরোট ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ আর কেহ 'বুদ্ধ' অথবা 'গুপ্ত যুগ' বলিলে চলিবে না, 'হাই এজ অব গুপ্ত লিটারেচার' বলিতে হইবে। সাহিত্য-ব্যবসায়ী শিল্পী ও সাহিত্যিক তাঁহাদের অনুপাদন-লিপি আধুনিক সিনেমাতে, অর্থাৎ বাহিরে ও ভিতরে, মুদ্রিত করিয়া দিবেন ; গান, কবিতা ও গল্প রচনা করিয়া, এবং মাঝে মাঝে নৃত্য-নাট্যের অভিনয় করিয়া, দেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞতা, যাহা অশিক্ষা প্রসূতীয়, দূর করিয়া দিবেন,। দেশে যত গুণ্ডা, বদ্মা, বেরসিক আছে, সকলে নাচিয়া গাহিয়া এবং গল্প-উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া, হাসাইয়া টসিয়া টসিয়া সব বৈকুণ্ঠলোকে প্রেরণ করিবে। (পরিত্রাণের মন্ত্র কাহাকে না)। আমরা-উদ্ধার ত' হইয়া গিয়াছে, এখন বাংলাদেশটা উদ্ধার হইলেই হয় ; তাহাও অতি সহজে হইবে, কারণ, বাংলাদেশে শিল্পী ও সাহিত্যিকের — নিজের ভাষা-সন্ন্যাসীর — অভাবটা নাকি আছে।

• •

সেদিন ব্রেড-কোয়ার্টার্স হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে একটা ফতোয়া জারী হইয়াছিল — বাংলাদেশের হরি-ভক্তদের সঙ্গে কোলাকুলি করিবার জন্য বর্ণহিন্দুদিগকে তাহাদের কুল-উপাধি অর্থাৎ পিতৃ-নাম ত্যাগ করিতে হইবে। বদ্য, পলিটিক্স্ ও সাহিত্য — এই তিনের মিলনে যে নিখাদুই-সাম্য অনিবার্য্য, তাহাতে সব সমস্যা আপনাথেকে সরল হইয়া যায়। — কেবল ছাপাখানার সৌজন্যে বড় বড় ভাষের কর্ম্ম অধিক অসাধারণ হইয়া থাকে। কোন খরচা নাই, যেন কি কষ্ট কর্ম্মগুলির জন্য ছুটাছুটি করিতে যে পেট্রোল-খরচা লাগে, তাহাও লাগিবে না। পিতৃর কুলের কুলপ্রদীপ মাহারা, কুলের কুলপ্রদীপ মাহারা, ইহারাই ঐ ভাষের মহৎ মূহূর্ত্ত সেবায়ীর চক্ষে তুলিয়া ধরিবে। আবার যদি সাহিত্যিকরা তাহা করে, তবে ত' সেবার ধুলোই পড়িয়া যাইবে। কারণ, ছাপার অক্ষরে নামটা (পুরা নামটাই) দেখিবার লালসা তাহাদেরই সবচেয়ে বেশি। ও বুঝি এতদিন কাহারও হয় নাই ; সেই খ্রীচৈতন্য হইতে কেশব সেন পর্য্যন্ত কেহই, ঐ মারুষ সামাজিক সমস্যা-সমাধানের ছাম-চাবিটি খুঁজিয়া পান নাই। পারিবেন কেমন করিয়া ? তাঁহারা কেবল কবিই বুঝিয়াছিলেন — না বুঝিলেন পলিটিক্স্, না ছিলেন সাহিত্যিক।

•

আমরা তাহা মানি। ভাষটা যে বড়, তাহাতে সন্দেহ কি ? খড়া-প্রভৃতির কথা ছোটলোকের কথা। উহার দ্বারাই বাঙালীর বাঙালীত্বকে অপমান একেবারে লোপ পাইবে। মাসের পূর্ব্বে 'খ্রী'টা ত' বাহিরে বসিয়াছে, এখন ছেলে পিতৃ-নামটা বর্জ্জন করিতে পারিলেই বাঙালী 'ভারতীয়'-রূপ ('হিন্দু'ও নয়) ব্রহ্ম-উপাধি লাভ করিবে। তখন 'বিরাট চন্দ্র' 'ব্রহ্মের পরমাণু' বলিলে আর কেহ চিনিতে পারিবে না, মহাত্মাদীদের দলে ভিড়িয়া পড়িতে অসুবিধা হইবে না। কিন্তু সেখানে ভিড়িতে হইলে শুধু

নামটাই নয় — নামটাও কাটিতে হইবে।

* * *

এই অহিংসাবাদী অহংস্বরূপানেরা আত্মপ্রচারের জন্য কতরকমের চমকপ্রদ সৃষ্টি করে, তাহাদের স্পর্ধা কতদূর বাড়িয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এই চমকটারও উল্লেখ করিলাম; নতুবা ঐ 'বেহিক-বাজারে'র দর বেচিবার ও কেনাইবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। শুনিতেছি, চমকটা ভাল করিয়া ফোল পিটাইবার পূর্বেই হঠাৎ ফাটিয়া গিয়াছে — যাত্রাটা একটু বেশি হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে, অহিংসাবাদী হইলেও সকল বাঙালী এখনও শিল্পী বা সাহিত্যিক হইয়া উঠে নাই।

*

গতবারে আমরা 'সৌরভী' নাম দিয়া যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার সম্পর্কে একটা বড় কৌতুককর ভুল করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যেখান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সেখানে লেখকের নাম ছিল না। নাম না থাকা সত্ত্বেও প্রবন্ধটি পড়িবামাত্র বুঝিলাম — উহার অনাবৃত্তি মৌলিক — ১২৯১ সালের পক্ষেও যেমন, এই ১৩৪৩ সালের পক্ষেও তেমনই। তাই অভিজ্ঞ আমরা সহকারে 'রঙ্গদর্শনে' উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, উহা সেকালের রবীন্দ্রনাথের রচনা। কিন্তু উহাতে আমরা কেবল একস্থানে একটি অপরাধ করিয়াছি, — 'বিষবৃক্ষে'র অনুবৃত্তি গ্রহণ করি নাই। আশা করি, আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ তাঁহারা মার্জনা করিবেন। কিন্তু অপরপক্ষে আমরা একটু বিশেষ আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেছি — 'রঙ্গ-দর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিবেন, আমাদের নির্বাচন-বুদ্ধি কেমন অভ্রান্ত। আশা থাকিলেও আমরা ঐ নামটা গোপন রাখিবার গৌপন করিয়াম, কারণ, ঐ প্রবন্ধের রচনা-ভঙ্গি রবীন্দ্রীয় বলিয়া সন্দেহ হইলেও, উহার ভাষা সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারিতেন না; ভাষ অপেক্ষা উহার ভাষাই লক্ষণীয়; এবং সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা হইতে উহা অতিমাত্র বিলক্ষণ। উহার অন্তর্নিহিত ভাব-চিন্তা একালের রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিক পাঠকের চক্ষে মূল্যবান নহে — তাঁহারা উহার অন্যরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন। আমরা তাহা মনে করি না, উহাও একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বলিয়াই মনে করি। নাম জানা থাকিলে আমাদেরও বোধ হয় ভুল হইত। অতএব আমাদের ঐ অজ্ঞতাই পাপে বর হইয়াছে।

*

এবারে পূজার সময়ে আমরা কয়েকখানি বই উপহার পাইয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে দুএক খানির উল্লেখ এইবারে করিয়া রাখি। সাধারণতঃ 'রঙ্গদর্শনে' পুস্তক-সমালোচনা করা হয় না। আমাদিগকে যাঁহারা সৌজন্যবশতঃ পুস্তক উপহার পাঠান তাঁহারা যেন ব্যক্তিগতভাবেই পাঠান, 'রঙ্গদর্শনে' সুপারিশ করিবার জন্য নহে। যে সকল পুস্তক সমালোচনা করিবার প্রয়োজন আছে, আমরা তাহা নিজেই নির্বাচন করিয়া সমালোচনা করিব — তাহাও পুস্তক-সমালোচনা নয়, সাহিত্য-সমালোচনা।

* * *

তথাপি, এই পূজার পার্ব্বণে আমরা একটু নিয়মভঙ্গ করিলাম, তাহাও সাহিত্যিক কর্ত্তব্য-বোধে। যেমন, শ্রীযুক্ত সিগ্‌নেট প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত গর্বিত মুকুমার রায়ের পুস্তকগুলি পাইয়া চুপ করিয়া থাকা আমাদের পক্ষেও অসম্ভব। বইগুলির নাম — 'আবোল-তাবোল', 'পাগলা দাশু', 'হ য ব র ল' ও 'আবোলাবোলা'। 'আবোল-তাবোল' বাঙ্গ-সাহিত্যের একখানি ক্লাসিক হইয়া থাকিবে। তাহার অন্যান্য বইগুলিও শিশু-সাহিত্যের সম্পদ। এ সকল ছবার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা। সুকুমার রায় যে বহুদূর হাস্যরস-সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে আজকাল-কার বলা যাইতে পারে — ঐ রস তাঁহারই

সৃষ্টি. তাহা এমন মৌলিক যে, ঐ এক দৃষ্টিতে যেন তাঁহাদের বুঝায়। এই উপন্যাস (তাঁহার জীবনেরও এই কাহিনী নয়) আমরা সেই অকালে-পরলোকগত প্রতিভাবান লেখককে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি সেই সঙ্গে প্রকাশক মহাশয়কেও ধন্যবাদ জানাইতেছি এইজন্য যে, তিনি এই পুরাতন বাঙালির সহজ সরলজীবনের নবজীবন দান করিয়াছেন — বিদেশের দৃশ্য প্রকৃতিও যেরূপ শোভন ও সুরুচিসম্মত হইয়াছে, তাহাতে বাঙালার পুস্তক-শিল্পের অবনতি অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

•

আর একখানি গ্রন্থ বড়ই নূতন — শুধুই নূতন নয়, চমৎকার। নাম — 'ত্রয়ীপাঠ', লেখক 'গ্রাম-পথে' অনুবাদক করিয়াছেন। বইখানি পড়িয়া আমাদের মত 'বিদগ্ধবিমুখ'ও মুগ্ধ হইয়াছে। বইখানি আসলে একটি বিশেষ সমাজের অতিশয় সহজ কাহিনী — সেই সমাজের উপরে একজন রহস্যময়ী 'নায়কের' দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সমস্যাটি সাধারণ মানুষের নিতান্ত 'সিমপল-লাইফ' সম্বন্ধে, তাই হোমরের মধ্যে চিত্তাকর্ষক। লেখিকা লেখকের পক্ষে প্রথম ও প্রধান করিয়া হইয়াছে। ইহার আরও দুইটি গুণ আছে : একটি, লেখকের অতিশয় সংযমিত চিত্র : আরেকটি তাঁহার সুষ্ঠু রসবোধ — ইংরেজীতে যাহাকে sense of humour বলে। বইখানি পড়িতে পড়িতে আরও মনে হয়, ইহার পশ্চাতে একটি সুশিক্ষিত, সুসংস্কৃত ও সংস্কারমুক্ত মন রহিয়াছে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, আর্ট-সমালোচনা ও সাহিত্য — সকলই অতিসাধারণভাবে ইহার মধ্যে টলাকেরা করিতেছে — মৌলিক আলাপের মতই সুখশ্রব্য হইয়াছে। তবু লেখক একটি বিষয়ে বিস্তার চর্চার ঐ সকল অতিসাধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেই বিষয়কে এমন সাহিত্যিক চং-চমৎকার দিয়াছেন যে শেষ পর্যন্ত কেহ পড়িয়া যাই বলিয়া মনে হয়। সমস্ত ব্যাপারটা একটি নিখুঁত আর্ট-কর্ম, প্রত্যেক অক্ষরটি ওজন-করা, অক্ষরপ্রয়োগের বিন্যাসেও অতিশয় যত্নশিল্প। ইহার ভাষাও এক হিসাবে আর্টের চূড়ান্ত : রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ভাষারীতির গদ্য-রীতিকে লেখক যেন অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়াছেন, সেই ভাষারই উপাদানে তিনি আপনার মনোমত মূর্তি গড়িয়া লইয়াছেন। রীতিও রবীন্দ্রনাথের ; কিন্তু ভাব-ভাবনা ও চিন্তাধারা তাঁহার নিজের, — ইহা যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল, তাহাই আশ্চর্য। কিন্তু এইরূপ আর্ট ও লিপি-চাতুরীর অন্তরালে লেখকের ব্যক্তি-মনটির যে লুকাচুরী রহিয়াছে, তাহাই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পাঠকের মনোহরণ করে। জিনিসের বাহুল্যই অতিশয় সেটি-সেন্টাল বা ভাবপ্রবণ, কিন্তু তাহাই গোপন করিয়া, সযত্ন করিয়া — তিনি যে বাস্তব-জীবনদৃষ্টির উপাসক, একজন বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিবাদী নিরিক্ষীর পুরুষ, এই বুদ্ধিজাটি রক্ষা করিবার সকল প্রয়াসে, এই পুস্তকের রস এমন গূঢ় ও গভীর হইয়াছে — চারিত্র আখ্যানবস্তুর গঠনটিও এমন রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছে। এই চতুর্বলিতে লেখক সিদ্ধহস্ত, ইহাতেই এই রচনা একটি নূতন রসরূপ ধারণ করিয়াছে।

• • •

আমরা আরও দুই একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক পাইয়াছি, স্থানাভাব না হইলে, অবকাশমত তাহাদেরও পরিচয় পরে দিব।

• • •

'পরিচয়' একখানি সাহিত্য-পত্রিকা। ইহা কোন সম্প্রদায়, সম্প্রদায় অথবা পলিটিকস্ বা ব্যবসায়-প্রচার পত্রিকা নয়। এই জন্য আমরা বাংলাসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও মনীষিগণের চিত্র প্রকাশিত করাও কর্তব্য মনে করি। বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলিতে, কি জীবিত কি মৃত — কোন বাঙালী কবি-সাহিত্যিকের চিত্র প্রকাশ করার রীতি নাই ;

চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৪]

সচিত্র-প্রবন্ধ বা ঐতিহাসিক গবেষণার সম্পর্কে যেরূপ চিত্র মুদ্রিত হয়, তাহাকে এইরূপ 'প্রকাশিত' বলা যায় না। এই সংখ্যায় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের চিত্র প্রকাশিত হইল; 'চিত্র-পরিচয়' নামে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও আমাদের প্রতিনিধি এক সপ্তাহ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দেবেন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিপ্রতিভার বিস্তারিত আলোচনা আমরা ভবিষ্যতে করিব।

[২৭শে কার্তিক

চিত্র-পরিচয়

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১৮৪৮ — ১৯২১)

ইঁহার পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামের বহুমূল্য-উপাধিক এক সুপ্রাচীন বৈদ্যবংশ-সম্ভূত মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া বিহারে গাজীপুর সহরে গিয়া বসবাস কালে সেনের-উপাধি (মল্লিকের) ত্যাগ করিয়া বংশের 'সেন' (সেনগুপ্ত) উপাধি গ্রহণ করেন। তথায় তিনি নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মী-লাভ করিতে পারেন নাই; ইহার কারণ, সাহস ও কর্মশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি অতিশয় লোভীন ও দুরন্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতাও সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা ছিলেন; তিনি যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, তেমনই তাঁহার মনের শক্তিও ছিল অসাধারণ, তদুপরি প্রখর আত্মসম্মান-বোধ ছিল। ইহার বলে, স্বামীর মৃত্যুর পর দুরবস্থায় পড়িয়াও তিনি পাঁচটি পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথই জ্যেষ্ঠ, অপর সহোদরগণও সকলেই বিদ্বান ও কৃতী হইয়াছিলেন; সর্বকনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ সেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ। ইনিও 'সড়কারে'র একনিষ্ঠ ও সুকবি। দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁহারা বিহার ত্যাগ করিয়া উত্তরপ্রদেশের যুক্তপ্রদেশের একাধিক স্থানে বাস করিয়াছেন; তন্মধ্যে এলাহাবাদ প্রধান, দেবেন্দ্রনাথ এইখানেই ওকালতি করিতেন। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাস করেন, পরে এল-এ উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনে নানা বিপর্যয় ও অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। কলেজীবনে তিনি দেরাদুনে বাস করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই বিবাহও করেন। কলিকাতায় 'খ্রীষ্টিক পাঠশালা' নামক বিদ্যালয় বৃহৎ কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার সম্পর্কে বাংলার রাজধানীতে তিনি যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তখনও বিজ্ঞান-কলা অপেক্ষা কাব্যের উপাসনা ও সাহিত্যিক বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতেই অধিকাংশ সময় কাটিত। আধুনিক গীতিকবিগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের একটি অতি উচ্চ স্থান আছে। উচ্চশিক্ষার সহিত স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা যুক্ত

হইলে যাহা হয়, দেবেন্দ্রনাথের কাব্যেও তাহাই হইয়াছে। তাঁহার কবিতায় ভাবে, ভাষে ও ছন্দে এমন একটা কবি-প্রকৃতির পরিচয় আছে, যাহা অভিনব মৌলিক। তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানাকারণে তাহা সুসংগ্রথিত হয় নাই। তাঁহার এই জাতীয় সংগ্রহের মধ্যে — 'অশোকগুচ্ছ'ই সর্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্যগুলির নাম — 'পারিজাতগুচ্ছ', 'বেলোলীগুচ্ছ' 'অপূর্ণ প্রত্যাশা' ও 'অপূর্ণ বীণাধ্বনি' প্রভৃতি।

কার্ত্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশে যে বিলম্ব হইয়া গেল তজ্জন্য আমরা গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের নিকটে অপরাধী আছি ও প্রার্থনা করিতেছি, কারণ ইহার কোন বৈধিক দেওয়া অতিরিক্ত অপরাধ বলিয়া মনে করি। আমাদের অফিস ও মুদ্রাযন্ত্র স্থানান্তরিত করায় নানা অসুবিধায় এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। অগ্রহায়ণ সংখ্যা যাহাতে অগ্রহায়ণের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমরা প্রাণপণ করিতেছি, এবং আশা করি তাহা পারিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ, 'বঙ্গদর্শন'

---

২৪ নং চৌরঙ্গী রোড, "ওরিয়েণ্টাল প্রেসে" পিপল্‌স্ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"Christian Ideal" আছে। ঈশ্বানের আদর্শ পুরুষ যিশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য আলোচনা করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যীশু পবিত্রতাধারী; কোন দুরাচারকে তিনি প্রাণে স্থান দেবেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহ বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য বুদ্ধদেবকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিলেও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই "Christian Ideal" কি কেবল মনুষ্যের আদর্শ? সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে?

এই প্রশ্নের সঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠে — হিন্দুর আদর্শ জাতীয় আদর্শ আছে কি? "Hindu Ideal" আছে কি? যদি থাকে, তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুসন্তানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয়ত কটাবস্ত্রধারী শুভ্রযজ্ঞোপবীতবিভূষিত গালে বসিয়াছি কবিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, "ও ছাই কিছু নাই।" নাই বটে কথা, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। ব্যাখ্যা করিলেন যেই আদর্শপ্রতিমার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু-আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, পূর্ব্বেই তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। যীশুতে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যিশুকে যদি রোমক সম্রাট যিহুদার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না — কেন না, রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনেক মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্মপ্রচারে নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। সেই নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ঘুরি ঘুরি বলিয়া হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠিরের বা উগ্রসেনের শাসনকার্য্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রকারান্তরে সমধিক মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন — এই কথাবলের বন্দীশালার যুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি হিন্দুরা ব্রাহ্মণের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইত, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। "কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য — কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অর্জ্জুনা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব দুজনই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য — "Christian Ideal" অপেক্ষা "Hindu Ideal" শ্রেষ্ঠ।

ইহাও সর্ব্বসম্প্রদায়ের আদর্শ মনুষ্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে,

ইহার কার্যাবলি অনুষ্ঠিত, অথবা অন্যান্যদের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ অনুরূপ, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যিশু বা চৈতন্যের ন্যায় মহাপুরুষগণও পূর্বোক্ত ধর্মপ্রচারের ব্যবসায়রূপে অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, রাজপুরুষ, তপস্বী, এবং ধর্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্ম-প্রচারকদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যের আদর্শ। অন্যান্যদের যত আদর্শ আছে, তাহা অঙ্গহীন ও খণ্ড-প্রকৃতির অবশ্য অনুকরণীয়। ইহাই Hindu Ideal; অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টধর্ম, তাহার আদর্শ-পুরুষকে আদর্শ-স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম, তাহার আদর্শ-পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে কেন না, ইহার ভিতর আর একটা বিষয়কর কথা আছে। কি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত কল ফলিয়াছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শপুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্বিরোধী, সন্ন্যাসী; এখনকার খ্রীষ্টান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখের জন্য বোদ্ধধর্মের বিস্তীর্ণ শিবিরমাত্র। হিন্দুধর্মের আদর্শ-পুরুষ সর্বগুণাকর—এখনকার হিন্দু সর্ব গুণে অকর্মণ্য। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিত্ত হইতে উহা লোপ পেয়েই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উহা লোপ একালে সেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর-পরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু ব্রহ্মণ ও রাজপুরুষগণের সর্বজনহিতৈষিতা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—সে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেদিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। অনুভব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে যায়—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ গ্রহণ করে না।

এখন আবার সেই আদর্শ-পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে।

হিন্দুধর্মের সার—চিত্তশুদ্ধি। হিন্দুধর্মাবলম্বীর আর কোন তত্ত্বই ইহার মত ধর্মগত নহে।...চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ।...চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই সার, এ মত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দু-ধর্মের সার, খ্রীষ্ট-ধর্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলাম-ধর্মের সার।...যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি স্রোত হিন্দু, স্রোত খৃষ্টীয়ান, স্রোত মুসলমান। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম। তবে প্রধানতঃ হিন্দুধর্মেই ইহা প্রবল। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। যদিনি ধর্ম-শাস্ত্রের সমস্ত বিধি-বিধান অনুসারে কার্য্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।

—বিবিধ প্রবন্ধ

ক্রৌঞ্চমিথুন

শ্রীকালিদাস রায়

জ্ঞানপথে হেরি' তরুশাখা'পরি রাগরসে নিমগন
ক্রৌঞ্চমিথুনে, মনে মনে সুখী হ'লে তুমি তপোধন।
হেরিলে, ক্রৌঞ্চে বিঁধিল ব্যাধের শর,
খর শোক-শর ক্রৌঞ্চীরে তার পর;
বিচলিত হ'লে হে প্রেম-তাপস, অশ্রু ঝরিল চোখে,
বাহির হইল শোক বাল্মিকীর তব শ্লোকে।
লক্ষিলে লঘুতা তাহারই সাক্ষাৎ
রামায়ণী রস-ধারায় তাহাতে হ'ল পরপাত।

কোথা সেই রাম, কোথা রামানুজ, সীতা?
কোথা সুগ্রীব, কোথা বিভীষণ মিতা?
লঙ্কানাথই কোথা রহিল, কোথা সে রক্ষোরাজ?
কোথা অযোধ্যা বিদেহরাজ্য আজ?
কোথা সপ্তক শত আশ্রমে তারা!
কোথা সে লঙ্কা — রক্ষোমানবের গড়া?

সকলি লুপ্ত, আজ রবি নাহি-হেন,
এই ভূভারতে কোথাও তাদের মিলে না ক' উদ্দেশ।

কেবল দুর্বাদীন
ক্রৌঞ্চমিথুন আজো তরুশাখে রসসুখে সমাসীন,
চঞ্চু-অগ্রে এঁকে আর চুমি' চুমি'
কল-কাকলীতে মুখরিত আজো করিতেছে বনভূমি।
ক্রৌঞ্চ-বধূর চুমা ও ঘায়ায়
লাঞ্ছনা-ভয় নাজেই করিল নিবারণের অভিনয়।
বুঝাই তাহায় শোকে
বিচলিত হ'লে, অশ্রু ঝরিল চোখে।

লঙ্কাই চুমা? আমার সৃষ্টি তাও কি সকলি মায়া?
তাদের শান্তি মিথ্যা ও' নয়, মিথ্যা যদিও ছায়া।
কবির শোচনা ঋষির বেদনা নিষ্ফল কভু নয়,
রামায়ণী-ধারা বহেছে ধরায় অক্ষয় অব্যয়।

"তার পর দেখ শেষ কোথা আর,
কেবে দেখ কথা সেই নিষাদের —
এর বিষাদের এত বিরহের,
এত সাধনার ধন,
"সেই সীতাদেবী রাজসভাঘারে
বিদায়-বিনয়ে নমি' অনুরোধে,
ছিন্ন-ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।"

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( )

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি বলিয়াছি, ইন্দ্রনাথের চরিত্র অতিশয় অসাধারণ; কিন্তু অসাধারণ বলিয়াই তাহা অবাস্তব বা অসম্ভব নয়—হইলে ঐরূপ চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব হইত না। সাধারণকে আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই বলিয়াই তাহা সাধারণ বটে, কিন্তু সাধারণের মধ্যেই এমন আছে যাহা দেখিলেও, আমরা দেখিবার জন্য প্রস্তুত নই—দেখিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই; তাই যখন কোন কারণে তাহা চোখে পড়ে, তখন অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। আবার জন্ম হইতেই যে সংস্কার-গুলি আমাদের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন, তাহাই সেই কাল সমাজ ও পরিবারের পক্ষে যতই উপযোগী হয়, ততই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। এই জন্যই মানুষকেও সেই সংস্কার-অনুযায়ী একটা সাধারণ ছাঁচে না ফেলিয়া তাহাকে বুঝিতে পারি না; সেই ছাঁচের সহিত না মিলিলে, হয় তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করে, নয় তাহাকে এই অর্থে অসাধারণ বলিয়া মন হইতে বিদায় করিয়া দিই যে, তাহা normal, বা সুস্থ ও স্বাভাবিক নহে; সে যেন প্রকৃতির একটা বিকার, তাহাকে ভয় অথবা অশ্রদ্ধা করি। সত্য বটে, যাহারা কোন কীর্ত্তির দ্বারা ইতিহাসে অমর হয় তাহাদিগকেও অসাধারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমরা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। কিন্তু বুদ্ধি কি? সে যেন নিতান্তই একটা ব্যতিক্রম। তা-ছাড়া, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সেই সকল কীর্ত্তিমান মানবের অধিকাংশই আমাদের সেই সংস্কার-সম্মত 'সাধারণে'র একটা খণ্ডিত সংস্করণ মাত্র। আমি ইন্দ্রনাথ-চরিত্রকে যে অর্থে অসাধারণ বলিয়াছি তাহা এইরূপ অসাধারণ নয়; তাহা কোন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিলাভের উপযুক্ত নয়—তেমন কীর্ত্তি বা খ্যাতিলাভের খেয়ালও তাহার হয় না। দ্বিতীয়তঃ, তাহা পূর্ব্বোক্ত অর্থে সাধারণ নয় বলিয়াই অসাধারণ; নতুবা, মানুষের চরিত্রহিসাবে তাহা কোন বিস্ময়কর নহে। আমরা মানুষকে সেই দিক দিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নই বলিয়াই—অতিশয় সাধারণ মানুষের ভিতরেই কতখানি শক্তি, কতখানি মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, সে চিন্তা করি না বলিয়াই—যখন

তাহার সেই রূপ দেখি, তখন তাহা বিশেষ করিতে পারি না, তাহাকে সেরূপ দেখা আমাদের সাধ্যায়ত্ত যায়। তত্ত্ব ইন্দ্রনাথ হয় ত আমাদের আশেপাশেই রহিয়াছে, তা কিন্তু — কে তাহাকে পরিচিত রাখে? আমাদের সে প্রয়োজনই হয় না। অতএব ইন্দ্রনাথ-চরিত্র অদ্ভুত বা বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অসাধারণ নয়; তাহা অবিশ্বাস্য, এমন কি অবোধ্যও হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অসত্য বা অপ্রাকৃত নয়। বরং এইরূপ চরিত্রের সহিত পরিচয় হওয়ার ফলে, এই সাধারণ মানুষ গুলাকেই আমরা আরও চক্ষু মেলিয়া দেখিবার শিক্ষা লাভ করিব, মানুষকে পূজা করিতে শিখিব।

তথাপি, ইন্দ্রনাথ-চরিত্রও আর এক অর্থে অসাধারণ, — তাহা, ব্যক্তিত্ব'রই অসাধারণ। এই 'ব্যক্তি'র কথাটা বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের চরিত্রগত আকৃতি ও প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কোন সাধারণ সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে পারে না। এই ব্যক্তিত্ব, ইংরেজীতে যাহাকে 'Individuality' বলে, ইহাই পরম রহস্যময়; এ রহস্য কোন দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা ভেদ করা যায় না। সৃষ্টির বহুবিধ 'রূপ' তাহা অনন্তবৈচিত্র্যময়; এই অনন্তবৈচিত্র্যময়তাই বুঝি সেই 'মায়া'র লীলা — মহাবৈয়াকরিকও যাহার ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া, শেষে বুঝির অসাধ্য বলিয়াই, তাহাকে 'অসৎ'-নাম দিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে; ইহাই সৃষ্টির সেই রূপ-রূপ যাহার বহুত্বের অন্ত নাই, তাই কোন সর্বনামে ধরা দেয় না। আমরা সেই সকলকে যে এক-একটা পৃথক নামে নির্দিষ্ট করি, তাহাও নির্বিশেষ নাম, তাহার কোন অর্থ হয় না। ইহাকে জানা নয় — ইহার কোন ব্যাখ্যা বা বিবৃতি নয় — একেবারে দেখিতে হয়। এই কাজ কবির কাজ, আর কাহারও নয়। ইন্দ্রনাথকে যে কবি দেখাইয়াছেন তিনিও বলিতে পারেন না, সে কোন্ ছাঁচের কিরূপ মানুষ। কতকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াও সেই চরিত্রকে ধরিতে পারা যাইবে না। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে যত প্রকার নায়কের বর্ণনা আছে তাহা ত' নহেই — মানবচরিত্র-বিজ্ঞানে বা মনস্তত্ত্বের কোন সূত্রই ইহার সেই ব্যক্তিত্ব আমাদের বুদ্ধিগোচর করিবে না। যাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্র লইয়া মাতামাতি করেন তাঁহারা বিশেষকে ছাড়িয়া নির্বিশেষের সাধনা করেন, সৃষ্টিকে ছাড়িয়া স্রষ্টার সন্ধান করেন, রূপকে ছাড়িয়া রসের চর্বণ করেন, 'ব্যক্তি'কে ছাড়িয়া 'সাধারণে'র সংজ্ঞা মুখস্থ করেন। এই জন্য যে-কাব্য জীবনের জীবন্তরূপকে আধারের নেত্রগোচর করে, সেইরূপ কাব্যের সমালোচনায় তাঁহারা অনধিকারী — পাণ্ডিত্যের ঘাস্‌লাল বিস্তার করিয়া তাঁহারা কৃত্রিম আধুনিক সাহিত্যের আদরে কোলাহল করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের যে মহত্ত্ব শ্রীকান্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে — শরৎচন্দ্র যাহার একটা রূপসৃষ্টি করিয়াছেন — তাহা ব্যক্তির, কোন সাধারণ সংজ্ঞা বা ধারণার অনুযায়ী নহে। শ্রীকান্তও এমনটা 'ব্যক্তি'কেই দেখিয়াছে, তাহার তুলনা সে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই। সে কেবল একটিমাত্র বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার বেশি আবশ্যক বোধ করে নাই; বলিয়াছে —

> "কতদেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে — কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই।" (পৃঃ ২৪)

— "এত বড় মহাপ্রাণ ত' আর কখনও দেখিতে পাই নাই।" — তার অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রনাথের মহাপ্রাণতা কেবল মাত্রাধিক্যে আর সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে; শ্রীকান্তের বিস্ময়ের কারণ,

মহাপ্রাণতার সহিত ঐ বাক্তির ঐ চরিত্র; উহাই অদ্বিতীয়, উহাই অনন্যসাধারণ। আরও একস্থানে, ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাহার যে ভাবাবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে শ্রীকান্ত বলিতেছে —

> "... ইহার কণ্ঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল। এই কথাগুলি লিখিবার ছলে, কিন্তু জিনিসটা তাহার ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো তত যে অত্যন্ত কঠিন তা' নয়, বোধ হয় অসাধ্য।"
> (পৃঃ ৪৭)

তাহার কারণ, তাহা সাধারণ অর্থই জ্ঞাপন করে— বিশেষের যে বিশেষ অনুভূতি তাহা ঐরূপ বর্ণনা দ্বারা জ্ঞাপন করা দুঃসাধ্য। তাই, ঐরূপ ব্যক্তি-বিগ্রহের মুখের উপর কেবল পক্ষপ্রদীপ তুলাইয়া আরতি করাই যায়— সখ্যসম্ভাষণ, এমন কি স্তোত্রপাঠ করাও চলে না।

ইন্দ্রনাথের চেহারার বর্ণনাও বেশি নাই, কেবল এইটুকু আছে যে, "ছেলেটি কালো। তাহার মাথার মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমারই মত, কিন্তু বয়সে কিছু বড়" (শ্রীকান্তের বয়স তখন পনরো)। আর তার, স্বভাব-চরিত্র! "সে বড় লোকের ছেলে, বাহিরে একটু ফিসে বাবু।" কিন্তু ফিসেরে মানুষটা আদৌ বাবু বা সভ্য-ভব্য নয়। সেই বয়সেই তাহার যে সব অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা শুনিলে ভদ্র পিতা-মাতা মাত্রেই শিহরিয়া উঠিবেন। সে বাঁশি বাজায়; ঘুড়ি ছাড়িয়া, অর্থাৎ ওলম ছাড়িয়া — নৌকার হাল ধরিয়াছে; মাছমারিতে ওস্তাদ, ছুরী ফলিতেও পটু; ইহার উপর, প্রায় সব রকমের নেশায় সে পাকেপ্রকারে হইয়া উঠিয়াছে! এ-হেন অমূল্য-রত্নসমষ্টিকে লইয়া উপন্যাস রচনা ত' দূরের কথা, কেহ কি ভদ্র-সমাজেও ইহাকে বাহির করিতে পারে? শ্রীকান্ত ইহার মধ্যে কি পাইয়াছিল? এই চরিত্রই বাংলার একজন বড় ঔপন্যাসিকের দিব্যচক্ষু খুলিয়া দিয়াছিল — ইহারই ছিটাফোঁটা লইয়া তিনি তাঁহার রীতিমত উপন্যাস-গুলিতে কত রকমের কত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন! 'শ্রীকান্তের' পাঠক-পাঠিকারা ইহার একটা উত্তর নিশ্চয় জানি, তাঁহারা বলিবেন, — ইন্দ্রনাথের বাহিরের চেহারা ও তাহার আচার-ব্যবহার দুশ্চরিত্র বালকের মত হইলেও, উহার অন্তরটি বড়ই মহৎ, বড়ই মধুর। কিন্তু এই উত্তরও কি ঠিক হইল? তবে কি তাহার বাহিরের ঐ আচরণগুলা বাদ দিয়া কেবল ভিতরের দিকটাই দেখিব? তেমন করিয়া দুইটাকে পৃথক করা যায় কি? ভাল আর মন্দকে কেবল নীতিশাস্ত্রেই পৃথক নির্দেশ করা যায়, কিন্তু 'মানুষ'টাকে ত' তেমন করিয়া ভাগ করা যায় না; এমন কি, ঐ দোষ ও গুণগুলারও দুইটা পৃথক তালিকা করা অসম্ভব। ইহারই নাম সেই 'ব্যক্তি' বা 'ব্যক্তি-চরিত্র', যাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। ঐ 'ব্যক্তি' একটা সমগ্র-বস্তু। ইহাকে সমগ্রভাবে দেখার মানেই — রস-রূপে দেখা। 'ব্যক্তি'কে এমন-ভাবে দেখিতে পারে দুইজন — কবি ও প্রেমিক। প্রেমিক যে, সে নিজেই দেখে, দেখাইতে পারে না। কবির দেখা অরূপ, সে-দেখায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখানোর শক্তিও আসে; তাহা শিল্পীর তন্ময়তা — প্রেমিকের একাত্মতা নয়। শরৎচন্দ্র যখন শ্রীকান্ত ছিলেন তখন প্রেমিকের মতই দেখিয়াছিলেন, দেখাইতে পারিতেন না; এখন তিনি কবি — শিল্পী, তাই দেখাইতেও পারিয়াছেন। শ্রীকান্তের সেই দেখা কেমন, এবং শরৎচন্দ্রের দেখানোই বা কেমন, এইবার তাহার কিছু নমুনা দিব; আমি কেবল বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক-পাঠিকাগণ যাহা পড়িয়াছেন আমি তাহার স্থানে স্থানে আওয়াজ-সন্ধান করিব মাত্র। —

"বুনো শুয়োর! কোথায় সে?"

ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে ব্যস্তভাবে কহিল, "আমি কি দেখতে পাচ্ছি, যে বলব?

আছো কোথাও এখানে।"

প্রায়ই দেখিতেছি, তাহাকাহি এক-একটা জনার বা বুড়ীমাদের তলা জনেক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাং' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সে দিকে ইন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধরাশায়ী না হইলেও বাছা-টাছা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, "ও কিছু না —সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।"

কিছু না—সাপ! সিংহিনী নৌকার মাঝখানে জড়-সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, "কি সাপ, ভাই?"

ইন্দ্র কহিল "সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখ্‌রো, কতো—জলে জেলে এসে গায়ে জড়িয়ে আছে—কোথাও তাড়া নেই, দেখছিস্ নে? কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরছে।..... আর কামড়ালেই বা কি করব? মরতে একদিন ত' হবেই, ভাই!"

ইন্দ্রনাথ চলিয়াছে একটি অতি দুঃখী পরিবারের জন্য কিছু অর্থ-সংগ্রহ করিতে, তাহাতে দুটীর পাপ-ভয় নাই, নিজেরও চক্ষু-লজ্জা নাই। ইহার পর পুনরায় আর এক স্থানে—

"আচ্ছা, ইন্দ্র, তুমি কখনও ঐসব দেখেছো?" (কে-সব ছায়া-মূর্তি নির্জন প্রান্তরে বা নদীর চরে — রাত্রিকালে যারা চাহিতে আসে)।

"কি সব?"

"ঐ যারা ভাত চাইতে আসে?"

"না ভাই, দেখিনি, লোকে বলে, তাই শুনেচি।"

"আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসিতে পারো?"

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, "আমি ত' একলাই আসি।"

"ভয় করে না?"

"না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না।" একটু থামিয়া কহিল "রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি নাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে ঢুকে যাস্, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখ্‌বি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা' হলেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে—তারা সব অন্তর্যামী কি না।"

এই শেষের কথাগুলিতে ইন্দ্রনাথের যে পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে—সমগ্র মানুষটাই সে একটা বড় পরিচয়। এই যে নির্ভীকতা, ইহা—ইংরেজীতে যাহাকে বলে, physical বা moral courage—তাহার চেয়ে বড়; তাহা এক-রূপ স্নায়বিক-দৌর্বল্যের সাহস, তাহা অজ্ঞতার সাহস—সে ভয় দেখাটার সম্বন্ধে। যাহাকে moral courage বলে, তাহাতে কর্তব্যজ্ঞানের সাহস, তাহাতেও স্নেহের ভয় না থাকিলেও, মনের উচ্চ অভিমান আছে। এখানে যে সাহস—যে নির্ভীকতা দেখা যায়, তাহাতে স্নেহ-চেতনার সম্পর্ক অবশ্যই আছে, কিন্তু মনের কোন সম্পর্ক ইহাতে নাই—ভাল-মন্দ, কর্তব্যাকর্তব্য-বোধের বালাই নাই; তদপেক্ষাও গভীর, অবচেতনা যেন একটা কিসের প্রত্যয় মাত্র আছে; সেই প্রত্যয়—কেবল অজ্ঞতা নয়, ভয়-নির্ভয়ের অতীত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ যে 'রামনাম করি'—উহার অর্থ কি? উহা কি শুধুই ভূত-তাড়াইবার রামনাম? না, প্রাণের সেই প্রত্যয়রূপী একটা বৃহত্তর বস্তু? উহা একটা অন্ধ-বিশ্বাসও বটে; অন্ধ এই অর্থে বটে যে, উহাতে কোন যুক্তিবিচার বা তর্কযুক্তির অবকাশ নাই। ধার্মিক ভাষায় বলিতে হইলে, উহাতে কোনরূপ দ্বৈত-জ্ঞান নাই—বাস্তবের

তাহাই হইয়াছে। দ্বৈত-জ্ঞানই সকল সংশয় ও সকল অবিশ্বাসের মূল — সকল 'জ্ঞান'ই দ্বৈত-জ্ঞান। যখন কোথাও 'দুই' আর থাকেনা, তখন কোন সংশয় আর থাকে না, তাই ভয়ও থাকে না। সেই অদ্বৈতের — একটা বিশ্বাসের পরিচয় নয় — একেবারে উপলব্ধি — ঐ বালকের হইয়াছে (বালকেরও হইতে পারে); সে তাহারই নাম দিয়াছে, 'বাঘ'। সেই অদ্বৈতের বুদ্ধিতে সাপে-মানুষে বিরোধ নাই — সবই যে এক-বাদ্য। কিন্তু সে ত' কেবল মনে বা বুঝে স্বীকার করিলেই হইবে না (যেমন আজকাল সকলেই অহিংসাবাদী হইয়া উঠিয়াছে); তাই জানিতে হইবে না, পাইতে — হইতে — হইবে। তাই ইন্দ্রনাথ বলিতেছে তুই মুখে রামনাম (সকলে মিলিয়া তালি দিয়া রামমুন-স্মরণ) করিলেই হইবে না, অন্তরে বিশ্বাস থাকা চাই ; না থাকিলে তার মুক্তি হবে না ; তখন ঐ নাম উচ্চারণ করিলে, কণ্ঠমণির চুরাস্ত হইবে — "তা' হ'লেই তারা (সাপেরা) টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে (যেমন পীরপন্থীরা টের পায়) — তারা সব অন্তর্যামী কি না।"

এই শেষ কথাটা শুনিয়া আমাদের হাসি পাইবে — মনে হইবে, বালক কি নির্বোধ, কি সরল! কিন্তু আসলে, উহাতেই একটি পরম তত্ত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার ভাষাও ঠিকই হইয়াছে। সেই অদ্বৈত-বুদ্ধি যাহার প্রাণে প্রবেশ করিয়া সমস্ত চেতনায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, সে সর্বজীবকে 'রামময়' দেখিতেছে — বিশেষ করিয়া, সেই সকলকে, যাহারা মানুষের মত বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। এই বালক 'বেদান্তবিদ্' নয় — 'বেদান্তজ্ঞ' ; বেদান্ত সে বোঝে না, তাহার প্রাণের স্পন্দনে বেদান্ত-সত্য হইতেছে। জ্ঞেয় যখন পুঁথির ভাষা হইতে জীবনের ভাষায় ভাষান্তরিত হয়, তখন সে শঙ্করাচার্য না হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে দেখা দেয় — সে তখন বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী অধ্যাপক না হইয়া জ্ঞানহীন বালক হইয়া উঠে। ইহাই পরম রহস্য — ইহাই ব্রহ্ম-তত্ত্ব-বিদ্যারও শ্রেষ্ঠতম পরিচয়।

শ্রীকান্ত ইহাই দেখিয়াছিল ; ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের ঐ নিকটা — ঐ অদ্ভুত তন্ময়তা — ঐ দুরন্ত আত্ম-প্রত্যয় এবং ভয়-সৌর্বল্যের অত্যন্ত অভাব — এমন অপরোক্ষ করিয়াছিল বলিয়াই, প্রথমে সে অবাক হইয়া ভাবিয়াছিল —

> "ঐ লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও?...যদি মানুষই হয় তবে ওর বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরী?" (পৃঃ ২৪)

যদি তাহাই হয় — যদি পাথর দিয়া তৈরীই হয়-তবে ত' সমস্যাই একটা মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু তাহা যে হইবার নয়। শ্রীকান্ত প্রথমে উহাই দেখিয়াছিল, কিন্তু পরে যখন আরও দেখিল, তখন বুঝিল, এ ব্যক্তি শুধু 'ব্যক্তি'ই নয় — 'বিশ্ব'ও বটে! পরে যাহা দেখিল তাহা ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের সেই দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ — যাহা শ্রীকান্তের সকল জিজ্ঞাসাকে নিরস্ত করিয়া, মানবাত্মার একটা নূতন মহিমা-মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিল। সেই লক্ষণ — ঐ পাথরের অন্তস্তল-প্রবাহিনী করুণার মন্দাকিনী-ধারা। এখানে কেবল একটাই উদ্ধৃত করিব। —

> ঘাটের ঔষধে চিঠি যাতা না যায়, এই জন্য ইন্দ্রনাথ পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া দুধের কাছে বসিয়া আসিয়াছিল, এবং নাচিতে না নাচিতে নাচাইয়া পাকিয়াই একটা জয়বিজড়িত স্বরে 'ইস্' বলিয়া উঠিল।...
>
> অকাল-চড়া বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। উহারই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ৮।৭ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক, — তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি

ঘাটের উপর। মৃণালের বোন কবি এইমাত্র তাহাকে জল হইতে তুলিতেছিল; তবু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে।...ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মাদুরের কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।...স্থলে জলে বিস্তৃত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর শেলির আমাদের চোখে পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দুর দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, "তুই একটু সরে' দাঁড়া, শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারাকে তিঙ্তিতে তুলে ঐ চড়ার ডাঙাটায় যেখা জলে রেখে আসি।"

মুখটি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি জাতের মড়া—তুমি ছোবে?" ইন্দু সরিয়া আসিয়া এক হাত তাহার মাথার তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত অনায়াসে তুলিয়া লইয়া কহিল, "নইলে বেচারাকে শিয়ালে কেঁয়াচিঁয়ি করে' খাবে। আহা! মুখে এখনও এর দুধের গন্ধ পর্যন্ত লেগে রয়েছে যে!" কহিল, "মড়ার কি জাত থাকে রে!" (পৃঃ ৩৫-৩৭)

আশা করি, ইহার অধিক আর উদ্ধৃত করিতে হইবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আছে। ঐ যে অসুর্য্য করুণা—যাহার আর এক নাম অনুকম্পা, তাহার দ্বারাও মনের সর্ব্ববন্ধন-মুক্তি হয়—যে বন্ধন-মুক্তিকে পূর্ণ-জ্ঞানের অবস্থাই বলা হইয়া থাকে। তবে কি পূর্ণ-অনুকম্পাই পূর্ণ-জ্ঞান? সে জ্ঞানে কোন অবচিত্তা নাই, সেও শিশুর মত—যেমন সরল, তেমনই অসন্দিগ্ধ। "মড়ার কি জাত থাকে রে!"—কথাটা অজ্ঞান অপণ্ডিত বালকের কথাই বটে, কিন্তু অনিবার্য্যরূপে আমাদের মন কোথায় কতদূরে গিয়া পৌঁছে। ঐ সামান্য দুইটি কথায় ছিদ্রপথে যেন মুহূর্ত্তে মহাসমুদ্র আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কথাটা জ্ঞানের, না প্রাণের? ঐ করুণা ঐ অনুকম্পাই কি মানুষকে এমন মহা-জ্ঞানের অধিকারী করে?

শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের এই আর এক পরিচয় পাইল। সেই নির্ভীকতা আর এই করুণা—এ দুইই সে দেখিল; কিন্তু দুইটা কি একই মানুষে থাকা সম্ভব? মূলে এ দুইটি কোথায় এক হইয়া আছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। আমরা ঐ দুইটা শুদ্ধকে যে একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের চরিত্রে মুক্ত হইয়া থাকিবার কল্পনা করি, এ চরিত্র যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বন্ধনে, বিরাগে, বিনয়ে, সদাচারে—কোনটাতেই সে প্রসন্নতার যোগ্য নয়। এ যেন একটা উন্মাদ—ইহার মতি স্থির নাই। আসলে ইহা কোন মন-গড়া আদর্শ-চরিত্র নয়—ইহাই সেই 'খাঁকি', সেই ব্যক্তিত্বেই একটা দুর্দ্দাম প্রকাশ ইহাতে আছে। ইহার ঐ করুণতা ও করুণা আর কাহারও মত নয়—ইহারই মত। উহা সম্ভব কি না, সমীচীন কোথায়—সে চিন্তা অনাবশ্যক; উহাকে আমরা দেখিতেছি, তাহাই যথেষ্ট, দেখার পর আর প্রশ্ন নাই। তাই শ্রীকান্ত দেখিয়াছে, বুঝিতে পারে নাই—পরিচয় কেবল দেখাইয়াছেন মাত্র।

কিন্তু সে চরিত্রের আরও একটা দিক আছে—সে তাহার সেই খাঁটি বালক-স্বভাব। শ্রীকান্ত নিজেও তখন বালক, ইন্দ্রনাথের সেই বালকত্বও তাহাকে কম আকৃষ্ট করে নাই। শিশু-সুলভ মুখ-স্বচ্ছন্দে বিকশিত করিলে, অযাচিতভাবে যত প্রীতি-সুধাময় তত পাইত, তাহার সেই শিশুপনা ও বালক-পনাই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিত। ইন্দ্রনাথের বালকসুলভ চাপলা, বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, এবং বিধির কর্ণ গোপনে করিবার জন্য নানা উপায়-উদ্ভাবনের কুশলতা,

এ সকলই বালক শ্রীকান্তের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তার পর, তার সেই অদ্ভুতত্ব, এবং মহাপ্রাণতা। কিন্তু তারও পরে, অন্নদা-দিদির সহিত তাহার সেই ব্যবহার,—তাহাও কি সে-বয়সে সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিল? সেখানে আমরা কি দেখি? এক দুর্দান্ত, দুর্দমিত, অদ্ভুত বালক — সেই বালকেরই ভালবাসা। অন্নদা-দিদিকে সে ভালবাসে — ইহা সর্ব্ববন্ধনমুক্তির সেই লীলা নয়। এখানে সে বালক, বালকের মতই সে তুচ্ছ বস্তুর জন্য লালায়িত: অন্নদার অতিবিস্বাদ, ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান — বোধ হয়, বালকের মত ঈর্ষাও — তাহার আছে। এই বালক-চরিত্র-চিত্রণে যে রস আছে, তাহাই খাঁটি ভালবাসা; কারণ এখানে বালকের প্রাণ, বালকের প্রেম ছাড়া আর কিছুই নাই। সেই ভালবাসা — অনুকম্পা বা করুণার তত্ত্ব নয়, সে একটা রস।

যাহা মানবাত্মার মানবত্বের নিদান সেই ভালবাসা কি বস্তু, তাহা বাক্যে কে কবে বুঝাইতে পারিয়াছে? তাহার বৈচিত্র্যও অনন্ত। প্রণয়, প্রেম, স্নেহ, মমতা মোহ-মোহ, বন্ধুতা — এমন সব পৃথক নাম আমরা দিই বটে, কিন্তু ইহাদের কোনটাই যেমন নিছক অবিমিশ্র একটা সেই-সেই নামের বস্তু নহে, তেমনই, উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একটা সাধারণ নির্দ্দিষ্টের কিছু আছে; সেই নির্দ্দিষ্টেই, এক-একটা বিশেষ সম্বন্ধ এবং ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রকৃতির প্রকারভেদে, যে বিশেষ-ছাপটি ধারণ করে, তাহাকে কোন নাম দেওয়া আরও দুরূহ। অন্নদা-দিদিকে ইন্দ্রনাথ ভালবাসিয়াছে — একদিকে একটা বালক, অপর দিকে একজন বর্ষীয়সী নারী। এ যে বালকেরই ভালবাসা, তাহার প্রমাণও এ ভালবাসা সজ্ঞান নয়। আবার ইহা ইন্দ্রনাথের মত বালকের ভালবাসা, অর্থাৎ ইহাতে দুর্দমনত্বেরও কোন আসক্তি নাই। তথাপি, এ ভালবাসার স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইন্দ্রনাথের সেই প্রবল ব্যক্তিত্ব — তাহার সেই দুর্জ্জয় আত্ম-বল, সেই প্রাণের মুক্তি-সেই দুর্দ্দমনীয় তেজের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে — ইহাদের দুইজনই সমান-অসাধারণ। অতএব এ আকর্ষণের একটা হেতুও রহিয়াছে — দুইজনেরই আত্মার গভীরে পরস্পরের সাদৃশ্য বা সমধর্ম্মিতা। বোধ হয়, সকল শ্রেষ্ঠ ভালবাসার হেতু ইহাই। সেখানে আত্মার গভীরতা নাই, সেখানে আকর্ষণও গভীর নয়; সেখানে আমরা প্রেম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা দুর্ব্বলের আত্ম-প্রবঞ্চনা, অথবা মনোবিলাস, অথবা রিপুপর-তন্ত্রতা মাত্র। শ্রীকান্ত যেমন ইন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইন্দ্রনাথও ঠিক সেইরূপ অন্নদা-দিদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে — এই যে আকর্ষণ, ইহা একটা গভীর আত্মিক আকর্ষণ; ইন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীকান্তের আকর্ষণ কেমন, তাহা পরে বলিব; কিন্তু এ আকর্ষণ যে উষ্ণ-রুধিরের শক্তিপিণ্ড সাদৃশ্যের আকর্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্নদা-দিদির মধ্যে যে শক্তি রহিয়াছে ইন্দ্রনাথ সেই শক্তিরই সিদ্ধ-সাধক। তাই আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই — তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়িয়াছে। অন্নদা-দিদির প্রতিও তাহার অনুকম্পা আছে; কিন্তু তাহা দুর্ব্বলের প্রতি শক্তিমানের, ছোটর প্রতি বড়র অনুকম্পা নয় — সে অনুকম্পায় উভয়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাও কি প্রেম নয়? সে কেমন প্রেম? বোধ হয়, ইহাও সেই পরমবস্তুর আর এক রূপ, দ্বন্দ্বের মধ্যে যাহা অনির্ব্বচনীয় — যে-রূপ মানব-হৃদয়-রূপ স্তরে ধারণ করিয়া কোনক্রমে পূর্ণাস্পদ হইয়া থাকে। এখানে তাহাই আবার, বালক-হৃদয়ের চাপল্য ও অজ্ঞান-কাতরতায় অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে। এ ভালবাসার কি নাম দিব? নারী-মহিমার পায়ে পুরুষ-প্রাণের আত্মনিবেদন? কিন্তু ইন্দ্রনাথ ত' বালক। নারী-পুরুষ-সম্পর্কের কোন বালাই ইহাতে নাই। অন্নদা-দিদি ইন্দ্রনাথেরই 'দিদি' — ইন্দ্রনাথ সেই 'দিদি'র ভাই। ইহাই সত্য। দুইজনে এক

জনক বা জননীর সন্তান — এই দোষের নিকটতম আত্মীয়। সে দোষের নাম শক্তি-দোষ। সেই শক্তি উভয়ের মধ্যে একই প্রকার স্ফূর্তি পাইয়াছে; তফাৎ এই যে, একজন বালক — তাই অজ্ঞান, আবেগে জন পূর্বাপেক্ষা বাড়ী — তাই সজ্ঞান; ইন্দ্রনাথ আপনাকে জানে না; অন্নদা-দিদি তাহাকে চেনে-জানে; তাহার সেই একটি কথায় সে যেন সব কথা বলিয়াছে —

> যাবার সময়ে ইন্দুর একটা হাত ধরিয়া বলিলেন — "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলাম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি সে সাহস আমার হয় না।"
>
> (পৃঃ ৭৯)

— তাই অন্নদা ইন্দুর দান গ্রহণ করিয়াছিল, শ্রীকান্তের টাকা লয় নাই।

আমি ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের এই কয়টি প্রধান দিক মাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। তথাপি, তাহা কি পারিয়াছি? শরৎচন্দ্র যাহা পারিয়াছেন আমি তাহার একটু ব্যাখ্যা করিবার দুঃসাহস করিয়াছি — তিনি দেখাইয়াছেন, আমি দেখিবার জন্য অবহিত হইয়াছি। ঐ চরিত্রের যেটা অন্তর দিক, সে দিকটার বিশেষ প্রসঙ্গ আমি করিলাম না, কারণ, তাহা যেমনই রস-সম্পন্ন যে, তাহার অনুচিন্তন শুধু অসাবধানের নয় — রীতিমত বেরসিকের কাজ। আমি যাহা করিয়াছি তাহা রস-নিবেদন নয়, ঐ রস-রূপের অন্তরালে যে একটি বড় সত্যের আভাস রহিয়াছে — রস-আস্বাদনের পরেও যাহা আমাদের চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা। তথাপি এই প্রসঙ্গেও, ইন্দ্রনাথের ঐ ভালবাসার যে অপূর্ব চিত্র লেখক অতি গভীর মর্মে ও নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কিছু উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। অন্নদা-দিদির প্রতি ইন্দ্রনাথের সজ্ঞান আকর্ষণের হেতু — সাপের মন্ত্র শিখিয়া লইবার আকুল ইচ্ছা। যখন অন্নদা-দিদি বলিলেন —

> "আমাদের আমাশোকা সবতাই কাকি। ...আমরা মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানিনে, মরাও বাঁচাতে পারিনে, কড়ি ফেলে সাপ ধরতে পারিনে...আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।"
>
> (পৃঃ ৬১)

তখন ইন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল,

> "যদি জানো না, তবে তোমরা দু'জনে লুকোচুরী করে চিরিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিচ্ছে কেন?...চল ঘোড়ার সব! আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।" (পৃঃ ৬১)

তারপর কি তার রাগ! কি গালাগালি!

কিন্তু ইহারই কিছুক্ষণ পরে, যখন সাহসী গাঁজার খুব জাঁকিয়া জমিয়া উঠিল, এবং সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া তাহার স্বমূর্তি ধারণ করিল, তখন ইন্দ্রনাথ তাহার বন্ধুদের খোঁচার আঘাত হইতেও তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল; উত্তমরূপে তাহার হাত পা বাঁধিয়া, পরে সাহসীর নাড়ির যারে অচৈতন্য দিদির চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বলিল —

> "আমি ওকে পুলিসে দিয়ে আসব, যা হ'লে দিদিকে ও খুন করে' ফেলবে, ও খুন করতে পারে।" (পৃঃ ৬৬)

ইহারও পরে, অন্নদা-দিদি যখন তাহাদের দুইজনকে তাহার গৃহে আসিতে নিষেধ করিল, তখন ইন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া যাহা বলিয়া উঠিল, তাহার মর্ম ইন্দ্রনাথ বুঝে নাই — অন্নদা বুঝিয়াছিল। বালকের গভীর অজ্ঞান ভালবাসার — এবং সকল ভালবাসারই —সকল যে ঈর্ষা, তাহার এমন ভঙ্গি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইন্দ্রনাথ বলিল —

> "তা বটে! আমাকে খুন করতে দিয়েছিল, সেটা কিছু না। আর আমি যে ওকে ছেড়ে

রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ!...কি বেমকহারাম তোমরা দু'জন। আর, শ্রীকান্ত আয় না।" (পৃ: ৬৭)

প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া অন্নদা একবার চেঁচাইয়া বলিল —

"হিঙুর মেয়ে হ'য়ে যে ষোলআনার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার লজ্জাশরম! চুলোয় যাও — আর আমি খোঁজ করব না, মরলেও দেখ না — হারামজাদা, নচ্ছার!"

ইহা কি শুধুই গালি? ইহাতে কাহার মর্ম বিদীর্ণ হইতেছে? ইহাই ত' মানুষের প্রাণের কাহিনী —যে-মানুষ মায়ার ঘোরে, কি এক দুর্বার আকার নেশায় — নিজেকে নিজেই আঘাত করিয়া, ভাঙিবার জন্য আকুল হয়। এই বালকও মানুষ, যে মানুষ ভালবাসে — সে-ও বালক।

অন্নদা ও ইন্দ্রনাথের কাহিনী এইটুকুই শেষ। ইন্দ্রনাথের নতুন দা' — সেই ব্রহ্মদৈত্যের জীবনটির প্রতি তাহার যে ব্যবহার, তাহাতেও ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের কোন নূতন পরিচয় নাই।

সর্বশেষে, এইখানেই আমি আরও দু'একটি কথা বলিব, তাহা ঠিক এই কাহিনীর সম্পর্কেই নয়। এই যে একটি চরিত্র, ইহার যতখানি বাস্তব, এবং যতখানি কল্পনাই হোক — কবির জীবন-দর্শনের দিক দিয়া, ইহা কোন এক বিশেষ সৃষ্টি, যা সাহিত্যিক সত্য-সত্যের পরিচয় দিতেছে কি না? বাংলা উপন্যাসে এ পর্যন্ত যে কয়জন শক্তিশালী লেখক সত্যকার সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন — মানব জীবনের সার্বভৌমিক আলেখ্য হিসাবে, অর্থাৎ বিশ্ব-সাহিত্যের দিক দিয়া যেমনই হোক — তাহার একটা দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য আছে কি না? বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র, এবং শরৎচন্দ্র হইতে তারাশঙ্কর পর্যন্ত, আখ্যান-কল্পনা ও চরিত্রসৃষ্টিতে, এমন একটা কিছু আছে কি না, যাহা — অংশে-হিসাবে যতই বিভিন্ন হউক — শেষ পর্যন্ত কোন না কোন দিক দিয়া একটা জাতির বিশিষ্ট প্রাণ-মনকে আশ্রয় করিয়া আছে? বাংলা সাহিত্য বস্তুপ্রধান নয়, ভাব-প্রধানই বটে। কিন্তু এই ভাবও এক হিসাবে বাস্তব — বাঙালীর জীবনে যা চরিতে- ঐ ভাবই বস্তুর রূপ ধারণ করে। ইন্দ্রনাথ-চরিত্রও কি নিছক একটা ভাব-কল্পনার সৃষ্টি? না, শরৎচন্দ্রের প্রতিভায়, বাঙালী-চরিত্রেরই একটা বিশেষ রূপ অতিশয় প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়িয়াছে? আমরা কি ঐ চরিত্রে এমন একটা কিছু দেখি না, যাহা আমাদেরই আধ্যাত্মিক সংস্কারের পক্ষে সম্ভব? সে বস্তু কি? যাহা সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ চরিত্রে — দুর্বলতা, সেন্টিমেন্ট, এমন কি, চরিত্রহীনতার লক্ষণ, তাহাই যখন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে মাত্রাধিক্য লাভ করে — পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে একটা অদ্ভুত আকর্ষণশক্তির দ্বারা আকাশ ও বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তোলে; কোথায়, কাহার ভিতর, কিরূপে তাহা প্রকাশ পাইবে, তাহার ঠিকানা নাই। অঙ্কের ক্লাস-রুমে সকলের পশ্চাতে বসিয়া যে শান্তশিষ্ট বালক মনোযোগ সহকারে অধ্যাপকের বক্তৃতা শ্রবণ করে, হয় ত' বা পরীক্ষাতেও উচ্চ স্থান অধিকার করে, — দেখিতে পাই, সে-ও হয়ত একদিন, বক্ষে আগুন ও চক্ষে দীপ্তি লইয়া দুরূপনে জীবনীর মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে! গ্রামের মাঠে, বনে-জঙ্গলে, যাহারা নিশ্চিন্ত মনে, নিতান্ত গ্রাম্য আমোদ-কৌতুকে বালা ও কৈশোর যাপন করে, যাহারা নাগরিক বিদ্যাবুদ্ধির ধারও ধারেনা, তাহাদের মধ্যেই এমন এক-একটি প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠে যে, সারা দেশ তাহাতে চমকিত হয়। ইহার জন্য কোন বিশেষ শিক্ষাবিধি, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে মানুষ হওয়ার আবশ্যক হয় না। ঐ সকল প্রাণ সম্পূর্ণ একক, আত্মনির্ভর, আত্মধর্মী। এই একাকিত্ব ও আত্ম-নির্ভরতাই বাঙালী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য; ইহাই তাহার

নিয়তি ; ইহারই জন্যে, তাহার যত কিছু দহন ও যত কিছু ক্ষুব্ধতা। এই ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের যে কারণে যে দহন — ঠিক সেই কারণেই বাঙালী আজ একদিক অভিমানে ক্ষুব্ধ ও দুর্বল। কেন আমি বাহিরে এই বন্ধন-বন্দীকৃত, ভিতরে সে কোন নিরঙ্কুশ-শাসন মানে না — ভিতরে, অর্থাৎ হৃদয়ের প্রকৃতিতে ; সেখানে সে 'সহজিয়া'। সেই বন্ধ-ক্ষুব্ধ রুদ্ধ-পিপাসায়— হৃদয়বৃত্তির সেই অবাধ ঔষ্ণীপনায় — সে এক অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয় ; সে শক্তি চরিত্র-শক্তি নয়, তাহার মূলে জ্ঞান-ক্রিয়া নাই, আছে এক তীব্র অনুভূতি ; তাহারই বলে সে পঙ্গু হইয়াও বিরিঞ্চিবন্দন করে ; মেধীর মত আত্মসাধনা করিয়া নয় — প্রেধীর মত আত্মবিসর্জন দিয়া সেও উর্ধ্ব-সমাধি লাভ করে। সেই প্রেমে যখন পূর্ণমাত্রায় ভাসিয়া ওঠে তখন সে ঘর ছাড়িয়া, সমাজ ছাড়িয়া নিষ্কম্প হইয়া যায়। যতক্ষণ সমাধিস্থ ততক্ষণ সে অচল, কর্মবিমুখ, অতি-সহিষ্ণু ও নানা দোষের আকর। যাহার চরিত্র-শক্তি নাই, অর্থাৎ যাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি সংস্কার নাই, কেবল প্রাণের ওই শক্তিটুকুই সম্বল — সে যেমন দেহ-যন্ত্রণায় পিপাসায়, সমাজ-সংসারের দুঃশাসনে, কৌলিন্যের অনিষ্টে পারে, অথবা মুগ্ধায়িত হয়, তেমনই, সে-ই আবার ঐ বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া এমন শিখায় জ্বলিয়া উঠে, যাহার আলোক আকাশের সূর্যরশ্মির সহিত এক হইয়া যায়।

ইন্দ্রনাথের চরিত্র এই কারণেও সত্য ; উহাতেও একটা জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় আছে, তাহাতেও আছে প্রাণেরই এক অপূর্ব প্রকাশ। যে-কবি ঐ চরিত্রকে এমন করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছেন, তিনিও — বিশ্বসাহিত্যের না হউন — বাংলা-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ও খাঁটি প্রতিনিধি।

(ক্রমশঃ)

"পরম আত্মীয় ব'লে যারে মনে মানি,
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি ?
অসীম কালের মাঝে ক্ষণিক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।
যতটুকু দেখা যায় চিনি দু'জনায়
তাহার অনেকখানি চিনিবারে যায়।"

মন্তর

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বরূপ মণ্ডল বলিল—"মন্তর যে আজকাল আর কয়তে নি, এ-কথা একবার কেন একশ বার মানব, বাবাঠাকুর, কিন্তু মন্তর নেই যা কক্ষনও বলেনি, একথা কি করে বেন মিই, বলুন না।...সেই তক্ক করতে এসেছিল আমায় দেখে, ঐ অখিল শুঁইয়ের ছেলে, দু'কলম ইজিরি পড়েচে...আপনাকে এদুরে দেখে ব্যাজ মুখে করে ঐ সটকালো।...কেন, মন্তর নেই তো প্যাট হয়ে বসে রইলি যি কেন।" ছেলেটি এবারে মুখ থেকে পাশে করিয়া কলেজে লেছে; বইখুখি বাড়িয়াছে, একাদ-সেকাদ লইয়া মাঝে মাঝে স্বরূপকে ঘাঁটাইয়া যায়।

একটা বাঁখারি চাঁচিতেছিল, হাতের একটা লম্বা টান দিয়া মুখটা ঘা করিয়া আমার দিকে একটু বাড়াইয়া দিল স্বরূপ, তাহার পর বলিল—"এই দেখুন, একটু শুচুকের খোঁয়া দিতে মনে হয় কি কঠিন বস্তুই না মুখের মধ্যে ঢুকল, অথচ এমন নিরও তো ছেল বাবাঠাকুর, যাখন আবমুনি-কাৎলার মুড়োগুলো ছাড়ু হয়ে গলে' লেছে এই মুখে ?...বলুন !"

—মন্তরশক্তির বড়াই নয়; স্বরূপের একটা নিজস্ব উপমা, মন্তরশক্তির নজির দিয়া মন্তরশক্তির কথাটা পরিষ্কার করা। আমার অজ্ঞানে হইয়া লেছে, তাহার বড়ই খুঁৎ থাক, উপমাটা নিখুঁতভাবে বুঝিতে আর আটকায় না। অখিল শুঁইয়ের ছেলের উদ্দেশে একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলাম—"সত্যিই তো, আজ যেই বলে কি মন্তরে হবে, গাঁতগুলো ছিদই না মুখে কোন কালে !"

যুক্তিবায় এবং বিশ্বাস করিবার লোকের পৃথিবীতে একেবারে অভাব পড়িয়া যায় নাই দেখিয়া স্বরূপের মুখটা ধীরে ধীরে প্রসন্ন হইয়া আসিল। বাঁখারিটা একবার চোখের কাছে ধরিয়া এদুরো ওদুরো দেখিয়া লইয়া পাশে রাখিয়া দিল, একটু হাসিয়া বলিল—"ইই মুনুরিরই গুলতি হচ্ছে; ইদিকে যে আমার লাঠি হয় লম্বকে, ফুরসেন না !...মন্, একটু তামুকের ব্যাবস্থা করি আপনার।"

উঠিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম—"এরা সব গেল কোথায় ?"

"বলছি সেকথা, এসি আগে"

একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া হুঁকাটা আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—"উই থেকেই তো কথাটা উঠল। বিলাস বাউরির পরিবারের উপর ভূতের ভর হচ্ছে; সবাই জানে ওর শাশুড়ি মাগির সঙ্গে বনত না, সে মরে যাবে মাবে নামে এখন ওর ঘেড়ে; সেপাই দারোগা হয়ে উঠলে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয় না বাবাঠাকুর ? সেই রকম আর কি। কিন্তু বিলাসের এখন টানাটা হচ্ছে, একটা পাশ-বেওয়া জামাই করেছে, ওসব ঘেকেলে কথা মানলে তো অঘোরা থাকে না আর, ডাক্তার ডাকিয়ে ঘোষের চিকিচ্ছে হচ্ছে। এরা সব তাই দেখতে লেছে কেঁউরে।...যাগি ভূতের মতন বজায় করে যাচ্ছে কিনা, হোমড়া-চোমড়া একটা ঘরেই বাবু সামনে দাঁড়াতে পারবে যি বাবাঠাকুর।"

স্বরূপ মণ্ডল হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আমার মুখের পানে চাহিল, দৃষ্টিতে কিছু মন্তব্যের প্রত্যাশা দেখিয়া বলিলাম—"তা না, ধর একটা রোজাই ডাকুক।"

একেবারে মনের মতো অভিমত পাইয়া স্বরূপ আরও একটু উল্লসিত হইয়া উঠিল অন্তরে অন্তরে,

কবির উপর একটা ঝাঁক কাটিয়ে কাটিয়ে বলিল—"আহি তাও বলিনে লালঠাকুর, আমি বলি—কাজ নেই তোর ওসব মেকেলে পাঠ প'ড়ে, কিন্তু তোর বোনের যদি ইস্টিরিয়াই হয়েছে তো তোর ডাক্তারে রোগের ইতি করুক, — হালে পানি পায় না কেন? ছেড়া-খেঁড়া কুনটি কিছু বাদ যাচ্ছে নি. ক'দিন থেকে. বউ কিন্তু তোর এখনও বক্কারের চোটে এমন বাড়ি খানি ক'রে রোজ একটা করছে কেন যে অতিথি বাহুরের মানুষে এক চিলিম তামুক দেবে তার বাসনা নেই? কথাটা অন্যায় বলে থাকি, আমার যা সাজা হেন লালঠাকুর। ...হেন, একটু পেসাদটা পেয়ে নিই।"

ঘর্মিকটা বলার পর মনটা খোলসা হইয়াছে, তাহার উপর একটু ঝোঁয়াও পেট পেটে, স্বরূপ আবার হুঁকায় জাবার বসাইয়া দিয়া বাঁধারিটা আবার একবার সেইভাবে আগাগোড়া দেখিয়া লইয়া তুলিতে যাইয়া একটু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল—"কিন্তু তাতো যাপার নয় লালঠাকুর, ব্যাপার হচ্ছে অন্যরকম। শ্বশুরবাড়িতে বোজা তো আর চুকতে দেবে নি, তা সে ভূত ঝাড়াবার জন্যেই হোক, চাই সাপের বিষ ঝাড়াবার জন্যেই হোক। বোজা আর ও বাড়িতে চুকতে পাবে নি।"

—আবার মাথা নীচু করিয়া বাঁধারি চাঁচা আরম্ভ করিয়া দিল, এবং তাহারই অন্য সূক্ষ্ম তির্যক দৃষ্টির সঙ্গে ঠোঁটে খুব ক্ষীণ একটু হাসি লইয়া আমার পানে একনজরে অনেকবার চাহিল যে, বোজা যেন কেন একটা গল্প জমিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে। প্রশ্ন করিলাম—"বলতে বাধা আছে নাকি যজমানের পোর? তাহ'লে না হয় থাক্।"

স্বরূপ বলিল—"বাধা আর কেমন কি লালঠাকুর? সেরুত-বউয়ের কেচ্ছা একটা, পাঁচ কানে তো তোলা যায় না, তাই আপনারা ভদ্দরলোকরা যাকে বলেন একটু খুরস্তা হচ্ছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"ব্যাপারটা নিতান্ত কম মনে হচ্ছে না আমার স্বরূপ, ও থাকই তা'হলে; তুমি বরং....."

স্বরূপ নিজের কথায় জোর টানিয়াই বলিল—"আমার তাও লাগি—আপনকার হোল বামুনের জান, গলাজলের মতন শুদ্ধু, হোর থাকে, দুধের ছানার মতন ফেটে যাবে।...গল্পটা আরম্ভ করলাম, শেষ করব নি, আধ-কপালের হিকিক কে লালঠাকুরে এসবে? ও বলেই খুই।"

না বাঁধারি রাখিয়া হাঁটু দুইটা জড়াইয়া বসিয়া স্বরূপ আরম্ভ করিল—"সে আজকের কথা নয় লালঠাকুর, নেহাৎ কম করে বললেও বেত্তু কুড়ি বছরের কম হবে নি। বিলাসের যার তাখন বয়স হয়ে এয়েছে — আমার চেয়ে বছর পঞ্চেকের বড়ই হেল — কিন্তু লজ্জাসরমের তখনও লাড়া বয়সের না হোক, যমনে-পদ্দিপাড়ার কাছাকাছি যাচ্ছে। অবশ্যের ভয়ে, লাড়া বয়সের — বলতে পারটি না লালঠাকুর, কেননা চাটুজ্যেপাড়ায় তাখনও অন্নাতি ঠাকুরের পিসি লজ্জানে বেঁচে। তিনি আবার কলড়ায় অন্নো মাখায় বেয়ক্কল কেটে মহাপ্রাণী বেরিয়ে গিয়ে যারা যায় — পুণ্যবতী মানুষ হেন, তামাদের মুখাই সেরে চলে'। তাহলেও দক্ষিণপাড়াতেও সবার তখন টেকা হেলা তাখন চাজ্জিখেনি কথা নয় লালঠাকুর — তাখনও বয়পালের খুড়ি বেঁচে, জলা বাউরির লখো বেঁচে, উদিকে লক্কল আশের জেঠাই বেঁচে, পাড়ায় অইপহির মানুষে যজ্জির হইমোল লেগে থাকত।

কুঁদুলে মেয়েমানুষকে বিধেতা পুরুষ তিনভাগে ভেঁটে দিয়েছেন লালঠাকুর, তৈলে একফেরে হয়ে পড়ে কিনা; এক—যাকে মেয়েলি কথায় বলে ঘর-জ্বালানি—পাড়াভাদানি; মানে পাড়াপড়শিদের অইপহর জ্বালো করে বেড়াচ্ছে—কার মেয়ে পর্ণ হবে, কার কটি ছেলের সাদিপাত্তির, কার বাড়িছুচ্ছা অন্নের

বকল, দাদুটি করে সে এমন লোক নেই—দাদলে বেড়াচ্ছে, মুখে রা নেই; বাড়ি এলেই কিন্তু সেই মানুষ অমিলদা, কাকচিল বলবার যো নেই। দু' নম্বরের মধ্যে ছোপ টাই উল্ট, বাতাবাদী — পাড়া-জালানী; নিজের পুনিকে পাখির মতন পুষে করে দাদলে আছে, বাজনার বাইরে পা দিয়েছে কি একেবারে অন্য মানুষ। বিলাসের মা ছেলে তিন মন্ত্রের মতো — যতক্ষণ বাড়িতে থাকত বিলাসের বাবা সাধনপুরো থেকে বাড়ির কুকুর বেড়ালটা পর্যন্ত উঠে হয়ে থাকত। অষ্টপহরই মুখ চলছে — এই সোয়ামীকে নিয়ে, তারপরেই হতভো ছেলে-মেয়েদের কাউকে নিয়ে, তার কের টেনেই হতভো বউকে নিয়ে; সেই রাত-সকালে উঠোনে গোবরজল-ছড়া দেওয়া থেকে এতটুকু কামাই নেই। সাধনপুরো বছরে যার তিন চার করে বিবাগী হয়ে যেত, তবে অনবরত কাঁসর-ঘণ্টার মধ্যে থেকে কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছল, টেঁকতে পারত নি; বাবার তাওাৎ ছেলে—হুংখু করে বলত, কি করি, বড্ড টাকা টাকা ঠেকে। অভ্যেস নেকন আর কি রাদাঠাকুর।

এই তিন মন্ত্রের অবস্থা, সাতে বলদুর আপনাকে। চৌকাটের বাইরে পা দিলে, তো পাড়ায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড পড়ে গেল। রাঙাখুড়ির (আমরা ভক্তিতে তাই বলে ডাকতুম) — রাঙাখুড়ির পদ্ধতি ছিল অনেক রকম। এমনি বাড়ির কলরাটা মুখে কায়েই বেরুল বাইরে, কেউ যদি একটু টুকলে তো তার স্কন্ধে লেগে গেল; কেউ যদি শুনেও না শুনলে—সেই চেঁচাই সবাই করত রাদাঠাকুর — তো তার সঙ্গে আরও তাড়াতাড়ি মেগে যেত—এমন পাড়া শ্মশান হয়ে যায় — কেউ একটা হুংখের কথা ভেঙে জিগ্যেস করে না এ-পাড়ায়, শুনলে কালা সেধে বলে — পড়ে' মলে' থাক এমন কান...বাস করত নি রাদাঠাকুর, ভুলেও যদি কিন্তু এমন আতে ঘা দিয়ে মোক্ষম মোক্ষম কথা বলত, আর এমন তাকে করে', যে তার সাধ্যি খুরে একটা জবাব না দেয়! তারপরেই বাস, একটার সঙ্গে জড়িয়ে আর একটা, তারপর আর একটা, দেখতে দেখতে সমস্ত পাড়াটা গমগম করে উঠত। এর সঙ্গে যদি দু পাশের খুড়ি, কি মণা বাউরির বউরা, কি দক্ষদের ছোঁড়াই সরিক হয়ে পড়ল, তো শুনুন না তত শুনবেন বলে' বলে'।... হুঁকোটা একবার কাৎ করুন রাদাঠাকুর, সে-সব কাহিনী বলতে গেলেও দম ফুরিয়ে এসে।"

বেশ ভালো করিয়া সোঁটাকতক টান দিয়া রাদাঠাকুর কল্কিটা আবার আমার হুঁকায় বসাইয়া দিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ির দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল — "কেউ কেরে নি এখনও। তা এপুনি ফেরে যাবে সে বুঝি? সেই পঞ্চম বেশানা নিয়ে ফেরেছেন, কুলতে পারে কখনও সে কথা রাদাঠাকুর।"

প্রশ্ন করিলাম — "সেটা আবার কি?"

"সেই কথাই তো বলচি রাদাঠাকুর, কিন্তু একটু গোড়া থেকে না বললে তো বুঝবেন নি। বিলাসের পেরথম বউটি ছেল বড় ভালো মানুষ, গোড়াথেকেই ঐ রকম পাড়াকুঁদুলি বউঝাঁটকি শাশুড়ির পাল্লায় পড়ে' আর কথা কইতে পারলে নি কখনও, ছেরকালটা চাপাই হয়ে গেল। অবশেষে যখন বড় ছেল, জ্ঞানগম্যি ছেল, ভালোমন্দ বুঝতে শিখলে, একদিন আচ্ছেহজে করে শাশুড়ির হাত থেকে এড়িয়ে গেল। বিলাসের তাখন বয়েস হয়েচে, হুংখে ঘেন্নায় আর বিয়ে করতে চাইলে নি। বছরখানেক কাটালে — একবার বিবাগী হয়ে বাপের মতন ঘুরেও এল, তারপর অস্থির হয়ে এর ওর মুখ দিয়ে বাপকে জানিয়ে দিলে — আর এক দণ্ড বাড়িতে টেঁকতে পারচে না, বিয়ে দিক তো দিক, নইলে সেও বোয়ের মতন আগুয়েহে করে সব জ্বালা জুড়োবে। কথাটা বুঝলেন না রাদাঠাকুর? এতদিন বাপে বেটার আর বোয়ে মিলে মায়ের মকদ্দমাটা কোন রকমে সামলাচ্ছেল,

জানোয়ারটি হয়ে যাচ্ছেন তো?' বরং বোয়ের ওপর দিয়েই যাচ্ছিল বেশির ভাগটা, এখন সে সোনার মতন পাখাটি গুটিয়ে নিতে দুজনকেই সবটা ঘাড় পেতে নিতে হচ্ছে। খাশিতার বাইরে হয়ে পড়ছেন; তার ওপর বাবা আবার মাঝে মাঝে বেরিয়ে যেত, তখন সমস্তটা ওর একার ঘাড়েই পড়ত তো?... বাপ একবার বিবাগী হয়ে ফিরে এসেছে এক-একে দিয়ে জামাই দিলে, বিয়ে দেবে তো দাও, নইলে আমো বোয়ের পথ দেখব।

মাসি তো খুঁজছেনই, আজ হবে কাল চায় না, বউ পিতে পেবা — তার তো এক আধার সবই? তার ওপর ছেলের শ্বশুরবাড়ির গোটাকতক লোকও পাওয়া যায়, একটা উপরি পাওনা, — একদিন ঘটা করে বিদ্যেসের বিয়ে হয়ে গেল।

বউ এল এই নারানী, পঞ্চাননতলার লাবু বাউরির মেয়ে। দিব্যি ডাগর-ডোগর বউ, হাড়কাট শুনো মোটা, পা দুখানা ভারি, হাঁটুর মধ্যেও একটা পুকুরপানি ভাব, যেন হাতের মলের বিদাখা-সখী। নানান লোকে নানান কথা বলতে লাগল; কেউ বললে, এইবার মাসির বিছেরাই জাগল, এই বোয়ের সঙ্গে কচালি করতে গেলে কোন্‌দিন জেবে যাবেক; কেউ বললে, আর যাই হোক, পাকা এবার ঠাণ্ডা হবে, বউ একটু জোয়ের হয়ে দিক, বাড়ি ছেড়ে আর মাসির বাইরে যেতবার দরকার হবে নি; কেউ বললে, তাই কি! — মাসির আলো হয়ে এসেছে, চোখ বুজলে তবু পাড়াটা ঠাণ্ডা হবার আশা ছেল, এখন এই বউ ঐ পাণ্ডবির হাতে টৈনিং পেয়ে যা দাঁড়াবে তাতে সে আশায় চিরকালের জন্যে আকাঁয় ছাই পড়ল।

সবচেয়ে জ্যাবজেজাবাম ছেয়ে গেল রাজাখুড়ি। অবিশ্যি পেথমে শ্বশুরবাড়ি এসে বউ যে ঘুপাচ দিন ছেল, তখন আর মুখ খোলেনি, তারপর ঘর করতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আশ মিটিয়ে নেগে গেল, বছর খানেক উপোসী হয়েছে, বুঝতে পারলেন কি কথাটা? বোয়ের কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই, — একগলা ঘোমটা টেনে, হাত নিয়ে বাড়িময় চাঁ চাঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে — একটা ধনিষ্টি যে উনুনে বসে' রয়েছে — সেকেই যা দিয়ে — কিছু একটা কর্, একটু চোখের জল ফেল্, না হয় গিয়ে ধনিকটা শুয়ে থাক্, না হয় খাওয়া বন্ধ কর্; ওদিকে না বাস্ উনুনই যে মুখ তুলে ছুটো! কিছু না, যে কাকে যেন বলছে! আসেকার বৌটা অত ভালো মানুষ ছেল, আর অত ঝীপদীবী, সে পঞ্চায় মাঝে মাঝে দু'একটা কথা ঘুরিয়ে বলত, এ যেন ঠোঁট দুটো সেলাই করে বসে আছে। মাসি ছেড়ে নাগল আরও ক্ষেপে, বাকিতে কাজ চিল বলা বন্ধ হল; উঁহুঁ, কায় ঘরেই ছেয়ে কথা কইছে! রাতাখুড়ি যেন দক্ষিতের পড়ে গেল। উদিকে বোয়ের মুখোড়ি হয় ভয়ে ছেড়ে চলেছে পাড়ায়, কি যে করবে মাসি যেন ছেবে উঠতে পারলে নি। সন্ধিতের ওপর সন্ধিতে ঐ সময় মাসি হঠাৎ অসুখে পড়ে গেল। দিব্যি ছোয়ো মরীল, মাথাব্যাথাটা পর্যন্ত কখনও হয় না, হঠাৎ এক্কি কাণ্ড! খুকির মুখ শুকিয়ে গেল, তাইমি নছতো বউ? মুখে কথা নেই, এদিকে ছেতরে ছেতরে কিছু তুকতাক করে দিলে নি তো? হঠাৎ বহুনি-কহুনি সব বন্ধ করে দিলে। পাড়াও ইদিকে ঠাণ্ডা হোল।

অসুখ কিন্তু ছেড়ে ছেতেই লাগল মাবাঠাকুর। কথাটা বুঝলেন নি? একে অ পেয়ে পেট ছেতরে ছেতরে, তায় যৌবনের নাড়িগুলো ছেল হাতপা ছড়িয়ে খেলতে পাচ্ছে নি, সব রকমটা ত ছেয়ে পড়ছে নিজের ছেহের ওপর, অসুখ না ছেড়ে ছেয়ে উপায় কি? একটা মাস গেল, বাঁচবেই নি বলে সবাই জানে, — এমন সময় আবার আঁতেছিয়ে ছেয়ে উঠল। কথা খুব সোজা, — এই ছেয় ছাপা, এই রকম আশা করে' ছেলে প্রাণপণে সেবা করছে, সোয়ামীও এই ছেয় চিকিছে — আশা করে, কিন্তুর

আর কষ্ট হয়নি, কল হোল উন্ট, মাসি চ্যাং-ভেঙিয়ে বেঁচে উঠল। পাড়ায় সবাইয়ের মুখ আবার শুকিয়ে উঠল।

শুধু বেঁচে গুটা রয় দাদাঠাকুর, দেহ-মনের একেবারে সবগুলোর দিয়ে বেঁচে উঠল। কথাটা হচ্ছে, ডাইনি বউ ধ'রে যে একটা জন্ম সেঁকে গেছল সেটা একেবারে কেটে গেল কিনা, মনটা দিব্যি ঝরঝরে হয়ে উঠল। অশিক্তি খুব দুর্বল হয়ে গেল, মাস-খানেকের রোগাড়ি তো? কিন্তু গাঁয়ের কোঁড়ার মতন গাঁ-গাঁ করে, আবার পুরুত হয়ে উঠতে লাগল। বেশ মনে আছে — ডাক্তারে পথ্যি দিলে শুক্কুরবার দিন, শনি নয়, রবি নয়, সোম নয়, মঙ্গল নয়, বুধবার দিন দুপুর দাদাখুড়ি আবার গলা খুলে দিলে। অবিশ্যি জোর আর স্যাতটা হোকেতে থাকবে — পেটের ছাত চলছে তাখনও, তবে হাঁ টিক আগেকার মতন। বামুনের ছাতে দুকুল না, — কাঁচিয়ে বেতে পারে আশা করে খোঁজ নিতে গেছলাম দাদাঠাকুর, আর 'ভাই ভয়ে' মুখের কথা খতম করতে হোল নি, বাজ্জী হেঁট করে আস্তে আস্তে ফিরে এলুম।

তারপর আজ একরকম তো কাল একরকম। এবার সব হোঁকটা পেয়ে পড়ল বোয়ের ওপর। তার দুটো হেতু ছেল, পেরথোম তো বাইরে বেরুতে পারে না, ঐ এক বউই ভরসা, তার ওপর বউ যে ডাইনি মন্ন সেটা পাকা হয়ে যেতে সাহস ছেল বেড়ে, সাহস বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশটাও, উঠতে বসতে হাতে পিছতে লাগল। জিগ্যেস করবেন বোয়ের আসটা কি? না, একটি কথা নয়, সেই আগেকার মতন চ্যাং চ্যাং করে মুখ ঝুজে নিজের পাট সেরে যাওয়া, না রায়, না গদা, কিছু নয়। তবে কি জানেন দাদাঠাকুর — মানষেরই মন তো! — ঐ যে চাদর হয়ে উঠল মাসি, তাতে মেগেছিল প্রাণে। একে শরীলে অসুরের মতন শক্তি থাকতেও অনেকটা বলে কিছু বলতে পারছে নি, তায় মাসির দাপটটা আরও বেড়ে বেড়ে, একটু অদেখা না হয়ে পড়লে এমনটা আর হোল কেন!

বারটা বেশ মনে আছে, শনিবার। জীবন-কাকার মায়ের শেরাদ্ধ ছেলো, আমরা সবাই জুটেচি। দুপুর গইড়ে গেছে। দুটো বাড়ি বাদ দিয়েই বিশাসের বাড়িটা, সেখেনে দাদাখুড়ি একাই এমন আসর জমিয়ে ফেলেছে যে, কাজের বাড়ির হইগোলও ফিকে মেরে গেছে। ..সেই বউকে নিয়ে — 'আমি তবে ঘটা করে শেরাদ্ধের নেমন্তন্ন খাওয়াব সবাইকে রে! ...তবে এই পোড়াকপালির হাত থেকে নিষ্কিতি পাব রে!...তবে আবার ঘটা করে নতুন বউ ঘরে নে'বুবোরে! ও ডাইনি আমার গুণ করে' নেয়ে ফেলতে বলেছিল, আবার কি মন্তর পেড়ে কি অপদাং ঘটাবেরে!'...মাঝে মাঝে কানে আসছে, মাঝে মাঝে আবার ইন্দিকারে গোলমালে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্চি সবাই, এমন সময় 'দাপড়ে — দেহু!' বলে এক পাড়াফাটানো চিৎকার, আর তারপরেই সব ঠাণ্ডা একেবারে। সবাই থতমত হয়ে এ-ওর মুখের পানে চেয়ে রইনু, তারপর উঠই মধ্যে কে একজন বলে উঠল — 'বউটাকে বোধয় সাবাড় করে দিলে — এ গলা তো মাসির ছেল না।'

এদিনি বাকি ঘামঘামও সুরু করেছেন — উঠতে পারতমি — ঘটিটা, বাটিটা, জাঁতিটা, সিন্দিটা যা হাতের কাছে পেলে তাই মাথলে ছুঁড়ে — পিটে লাগল, কি কপালে লাগল, কি বেঁটুতে, তোয়াক্কা নেই। কথাটা শুনে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে' উঠতে যাব, মিনিটখানেকও হয় নি দাদাঠাকুর, এমন সময় পাশের বাড়ির গোবর্দ্ধন বাউরির ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে — 'খেপির ঘরে এসো, তারাপিসিকে সাপে খেয়েছে!'...'সাপে খেয়েছে কিরে!...কাকে!' বলে সবাই ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি একবর্ণও মিথ্যে নয়, মাসি ঘরে একটা

গোঁ-গোঁ করে' শব্দ করতে করতে বাড়িয়ে আসে আস্তে আস্তে মাথা চালাচ্ছে। ইস্পিক ঠিক তাকির নিচেটায় এতখানি একটা ছোবলের দাগ, কালো ছক বিছানার এতখানিটা গেছে ছিঁড়ে, তাখনো ফরছে ফক একটু একটু করে'।

ছোবল দেখে সবার চক্ষুস্থির। সাপ যে হেঁজি-পেঁজি সাপ নয়, এটা বুঝতে কারুর বাকি রৈল না। তাখুনি বাড়ির হাতে মোটা ছিনেক শক্ত বেত দেওয়া হোল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক ছুটল দাদু হাজরার উদ্দেশে। দাদু হাজরার বাড়ি মন্দিরের পাশেই কস্তুরিতে; এ-তল্লাটে তাখন তার মতন ওঝা নেই। ইস্পিক ফটা ছোঁড়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল বিলাস আর তার বাপকে ডেকে আনতে, বাড়িতে বড় একটা থাকত না কিনা তারা, এখনি আবার আসাও কম থাকত।

স্বরূপ আবার কলকেটা চাহিয়া লইয়া মোটা-কলকে দীর্ঘ টান দিল, তারপর সেটা হুঁকায় মাথায় পুনরায় বসাইয়া দিয়া ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল —"কি কথা থেকে যে উঠল কথাটা। হ্যাঁ, আমার মনে কিনা, তুমি নিজের চোখে মন্ত্রের খেলা দেখেছ?.. চাড়ো ছোঁড়া ফকম হাঁড়িয়ে পড়ে, মনে করে...তবে একথা অবিশ্যি মানব বাবাঠাকুর, যিনিন যা দেখলুম তার তুল্যি পুর্বে দেখিও নি, আর এ জন্মে দেখবেও হবে নি।

দাপরথি ফেলনা করে, কিন্তু গাঁয়ে কোথায় সেল্লে, তার ছেলে নিবারণ এসে কপী বাহলে। পিঠে থালা বসিয়ে মন্ত্র করে' উল্লুকের মাটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে, থালা বসে না। অথচ কপী টপকে বেরিয়ে পড়ছে, গাঁওানি থেকে থেকে। নতুন শিষ্যে বাপের কায়ে, কেমন্ডে গেল। এর মধ্যে এরা বাপ-বেটাতেও এসে পড়েছে, বিলাস আবার ছুটে যাবে কস্তুরিতে, এমন সময় ছুড়া বাপজ্বী স্বয়ং এসে হাজির, কালে গেলে দেখেনেই থাক ছুটে এসতে হবে কিনা। ফুকেই বললে — কৈ আমার বিষিট কোথায়!...দাদু হাজরার আসে লোক পাঠোই ভালো ফরে গাঁজার ব্যবস্থা করে রাখবে ছোক্ত. বিলাসের বাপ কলকেটা হাতে তুলে দিলে। বেশ মিশিমিশি ফরে দম চড়িয়ে নিয়ে আর ফক কিছু না করে' একেবারেই ফড়ি চালা।

ফড়ি তো চালবে, কিন্তু ফড়ি চলে কৈ বাবা-ঠাকুর? মন্তর আউড়ে হাতের বাড়া ফড়ি মেরে দেয় ছেড়ে, সাঁপের ফাঁটার মতন মাটি কামড়ে যে পড়ে — আর নড়ন চড়ন নেই। একবার, দুবার তিন-বার মেরে বাপজ্বী-বুড়োর মুখ একেবারে রাঙা হয়ে উঠল, ধাড়িয়ে উঠে সবার ওপর একবার পিটি বুলিয়ে গর্জে উঠল — 'কি, দাদু হাজরার সঙ্গে তুকতাকা! বাপ মেরে ফেলে আবোর দিয়ে ফড়ি চালানো! তামাসা! তামাসা আমি দেখিয়ে দিতে পারি এখনি — জানে না সব, চেনে না দেশো হাজরাকে? ...মন্তর-তন্তরে তানেক পারদর্শি, চাখের মাথায় কি করে ফেলে। বিলাসের বাবা, আরও কয়েক জন হাত জোড় করে বললে — 'দোহাই সরকার, কেউ সাপকে আমরা চক্ষেই দেখি নি, মারা তো দূরের কথা। ছোবলের ঘরে দেখে সাপকে খোঁজবার হেয়েও হয় নি আমাদের কারুর।' অনেক করে কাকুতি মিনতি করে বলতে, বুড়ো ঠাণ্ডা হোল, বললে — 'আর এক ছিলিম বড় তামাক।'

বেশ ভালো করে গাঁজা টেনে, দমস্ত উঠোনটা ঘুরে ঘুরে কি সব তুক তাক করে এসে আবার ফড়ি নিয়ে বসল; চোখ দুটো জ্বলছে, দমস্ত শরীল দিয়ে মন্তর যেন ফুটে বেরুচ্ছে; বিড়-বিড় করে মন্তর ব'লে, হাতের ফড়ি উঠোনে আছড়ে মারার জিয়ে উঠল — 'জল্!'...ফড়ি এবার চলল, কিন্তু বিশেষ খানেক গিয়ে আবার গেল থেমে। দাদু হাজরা একেবারে উঠে দাঁড়ালো, আর একটা পাড়া-কাটানো হুঙ্কার দিয়ে ফড়ির ওপর উল্লুক মাটি আছড়ে

মন্তর আউড়ে বললে—'চল্! সাপ হোক, বেজ্ঞা-বক্ষী যেই হোক, হাতির কর সামনে!' ...সঙ্গে সঙ্গে কড়ি একেবারে বীরত্ব হয়ে উঠল দাদাঠাকুর, সে কি চাল! যার দু'য়েক একটু ভাঁইনে বাঁয়ে করলে, যেন ঠাহর করতে পারছে না, তারপর বললে সোজা রাস্তা, যেন বাঘা তোর ঘরে ঢুকতে পেরাপ হচ্ছে। দাওয়ায় পা রেখে উঠোনে নামল, উঠোন পেরিয়ে গোয়ালে ঢুকল, তারপরেই সে যা সিঙ্গি দাদাঠাকুর!—কপালের মাঝখানে কড়িটা চেপে বসেছে, চোখ দু'টো রাগে জলছে যেন আগুনের ভাঁটা, মাথাটা দিয়ে করে ঝরছে ঠিক যেন ফণা-ধরা একটা খরিস গোখরো গোয়ালের ঘুলো থেকে বেরুবার মুখে গলগলিয়ে বেরিয়ে এসেছে ..।"

স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিলাম, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—'যেন ফণা-ধরা কি বলছ মন্তর, সাপ নয়?"

মন্তরও কম বিস্ময়ের আমার পানে চাহিল না, একটু সেই ভাবে থাকিয়া উত্তর করিল—"আপনি যে অবাক করলেন দাদাঠাকুর, সাত কাণ রামায়ণ শুনে সীতে কার বাপো! ঐরকম গলাবাজির মধ্যে সাপ ঢোকায় পারে!—যমনের ও-ফ্লাটের মধ্যে কেউ কখনও সাপ দেখেনি; জিউর সাপ মনে পালায়, মনের সাপ পাঁয়াকে পালায়—রাঙা-খুড়ির এমনি রাগটা!...দাদাঠাকুর আমায় জিজ্ঞেস করে—সাপ মন্ত্র বাড়ি মন্তর!—সাপ কোথা থেকে এসবে? সাপ এসে সন্ধ্যা বাড়ি?

বউটা মন্তরের টানে হন হন করে ঢুকে এসে সামনে দাঁড়াতে, ঠিক যেন কার জন্ম হয়েছে..."

"কার বউ মন্তর?"

"নেও! কার বউ এখন তাই বুঝিয়ে বলো দাদাঠাকুরকে!...ঐ বিলাসের বউ; নিজের ছেলের বউ যার বাড়িতে ঢুকতে নারে, অপর কার বউ এসুবে তার বাড়িতে! অত নজ্জা তো? শাশুড়ির সামনেও ঘোমটা, এক বাড়ি লোকের সামনে দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—"কামড়াব নি! এখনে জামবাটিটা ছুঁড়ে..."

প্রশ্ন করিলাম—"বউটা কামড়ালে?"

"না কামড়ে কি তরে ক'ন দাদাঠাকুর! বলে, কিনা—রাগের মাথায় পহলা একটা জামবাটি ছুঁড়ে মারলে মাপি, সেটা ব্যথা হতে সেই দুবল শরীলে বিছানা ছেড়ে নাপো উঠে বললে কয়ে চুলের মুটি, যার সেই উনোনতলা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ব্যাত্ত রাগ ছেল জমে, সব একটা করে কড়ির নিচে এক হাম-কামড়! দুবল শরীল, তার আচমকা ছেড়ে নাপো উঠেছে, তার ওপর কিনিক-দেওয়া রক্ত দেখে মাপি তো কিরমি দিয়ে পড়ল ধারুকপাটি মেরে; জান হবে কি, ঐ অবস্থার ওপর আরও তিনটে উৎকট ধাক্কা—তেমনি মাপি সজ্ঞান তাই মাপি ছেড়ে যায় নি।...দেখি একবার, পেরাণের ধনি থাকে একটু।

একপাতা এ-বি-সি-ডি পড়ে' আমার মনে কিনা মন্তর মন্তর করছে, মন্তরের খেলা তুমি দেখতে নিজের চোখে!...বাঃ, তৈ দেখিনি তো? কোত্থেকে আর দেখব?"

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গতযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জ্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

(১)

হিন্দুত্ব

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

[১৩০৮ সালের 'যমুনা' হইতে। লেখক — স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ইনিও গতযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষিগণের অন্যতম। নিজে খৃষ্টীয় রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাসী হইলেও তিনি, 'ঊনাপন্থী' হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন, এবং একজন বড় বৈদান্তিক ছিলেন। এই আজন্ম-ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীও শেষে বাংলার সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়া অকাতরে নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এ হেন মহাপণ্ডিত মহাপুরুষের মুখে, হিন্দু হিন্দুত্ব ও তাহার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই কটি কথা, আশিকার দিনেও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবার যোগ্য।]

কথায় বলে "ভিন্ন রুচি হিতে নাই।" কিন্তু এমনি আমাদের পোড়াকপাল যে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবন্ত্রাহ্রে ভিন ভিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকরূপে আমাদের আতীয় জীবন-লীলার শেষ পালা সমাসন্নপ্রায়। যেমন ব্রাহ্মণ্যের তিথিগুলি একে একে ভাল, কিন্তু সংস্পর্শদোষে পড়ে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি তাঁহারা প্রত্যেকালেরে নিজে নিজে ভাল হইলেও সম্মেলন-সংঘর্ষহেতু মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁরা কারা?

প্রথম। — কৃষ্ণাজিনধারী 'হিন্দু'-'হিন্দু' - রব-নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সমাজের ও নূতনে, আর্ষে ও অনার্ষে, ঔপনিষদীতায় ও মনসা-পেঁচুর পীরে কোন প্রভেদ নাই। অনুষ্টুপ-ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইলেই, তাহাতে যাহাই থাকুক না কেন — আচার, অনাচার, ব্যাভিচার — তাহা বেদ। বেদমাতা যদিও ইঁহাদের কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইঁহারা শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বেদে যানযান ও ব্যোমযানের কথা উল্লিখিত আছে — নহিলে বেদমাতা চড়িয়া

তাঁহারা ব্রহ্মবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতেন না। একজন মহাদেবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল—"কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।" ভোলানাথ মহেশ ছুতোয় ঘোরে এ নিন্দাবাদকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কোন গুণ নাই' অর্থাৎ বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম; আর কপালে আগুন ত' শিবের বিশেষ বৈভব। গোঁড়া অদ্বৈতবেত্তা যেমনি অদ্বৈতসৌজন্যের নেশায় আমার নিন্দাকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমাকে বড় মনে করিব। তাঁহারা এক কথা জানেন, আর কিছুই জানেন না, শোনেন না। 'হিন্দু' 'হিন্দু' এই তাঁহাদের বুলি। দর্শনবিজ্ঞানশিল্প-বাণিজ্যে হিন্দুজাতি উৎকর্ষের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। ফুরোপীয়েরা তলদেশে বসিয়া গায়ের জোরে কেবল আস্ফালন করে। হিন্দুর সবই ভাল। শাঁসও ভাল, খোসাও ভাল, ভুষ্লও ভাল, তুষও ভাল। আহা! গোঁড়ামির এই ত প্রকৃত লক্ষণ।

"সকলই ভাই বাহুল্য তখন।
গোঁড়ামির এই তুমি জানিও লক্ষণ॥"

এখন ইহাদের কথায় কাঁটা দিয়া কোন্ দিন না প্রাণটা যায়। এই গোঁড়ারাই দেশের সোড়ার শত্রু।

দ্বিতীয়।—ইংরাজিনবিশ হিন্দু-নামধারী রাজ-পক্ষিকদীর দল। ইঁহাদের যে পাঠ পড়াও, সেই পাঠই পড়েন। "রাধারুষ্ণ" বলাও, তা-ও বলেন, "কালীকৃষ্ণহরি" বলাও, তা-ও বলেন। ইংরাজী সভ্যতার প্রথম যুগে যেসব গুরুদেবেরা শিখাইয়া-ছিলেন যে, হিন্দুরা চিরকালই ইষ্টক-কাষ্ঠ পূজা করিয়া আসিতেছে—ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু তাহারা জানিতও না, মানেও না। অমনি 'তথাস্তু' বলিয়া হাটকোটক্রপ চূড়া-ধড়া পরিধান করিয়া কাঁটা-চামচ বাজাইয়া সাহেবী পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ সেই যেসব গুরুদেবেরা শিখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা অধ্যাত্মদর্শনের অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়া-ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারবিদ্যায় তাঁহারা বড় একটা মন দিতেন না। ধর্মতত্ত্বে হিন্দু হওয়া চাই, কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ব্যাপার, সেখানে ফুরোপীয় হওয়াই উচিত। ফুরোপীয়েরা অধ্যাত্মদর্শনের বড় একটা ধার ধারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাণিজ্যবিদ্যায় তাহারা জগদ্গুরু। হিন্দুরা 'জগৎ মিথ্যা' এই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছিল, তাই পার্থিব ব্যাপারে তারা বড় উপাসীন। ইহার প্রমাণ কি? দেখ, আমরা এখনই আধ্যাত্মিক যে লড়াই করি না এবং করিতে আমাদের প্রবৃত্তিও হয় না। আমরা কেমন শান্ত ও সমাহিত, স্থির, ধীর, অচলপ্রতিষ্ঠ! আর ফুরোপীয়েরা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়—একমাসের পথকে একদিনের করে, লক্ষযোজন তরে, অভ্রভেদ-গিরিকে ভেদ করে—কেবল উদ্যমশীলতা ও ব্যস্ততা! তীব্রতা ও আকুলতা কি আধ্যাত্মিকতার পরিচয় নহে? যেমনি প্রতীচ্য ফুরণ এই কথা প্রচার করিলেন, অমনি ইংরাজিনবিশ সংস্কারকেরা তার-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বচন!" "সত্য বচন!" আমরা ধর্মে হিন্দু—অর্থাৎ পরমার্থ-বিষয়ে কোন মতামত রাখিব না—কিন্তু পার্থিব বিষয়ে আমরা ফুরোপকে আদর্শ করিব। এই ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায়টি যথেচ্ছাচারী—না ইংরেজ, না জাপান। উভয় কি?

তৃতীয়।—সমন্বয়বাদীর দল। এঁরা জোড়াতাড়া দিয়া একীকৃত করেন। আমাদেরও কিছু আছে, ওদেরও কিছু আছে, সকলেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে। এই বিকীর্ণ 'কিঞ্চিৎ'-গুলা জড় করিয়া একটা স্তূপ বাঁধিলে পূর্ণাবয়ব সর্বাঙ্গীন সত্য লাভ করা যায়। হিন্দুরা বলে, জগৎ মনীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর হাইকোর্ট লেন্সের বলেন, জগৎই একমাত্র সত্য, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি না, জানা যায় না। এস, দর্শন ও বিজ্ঞানকে মিলাইয়া দাও এবং পূর্ণসত্য গ্রহণ কর। ব্রহ্ম

সৎ-পদার্থ বটে, কিন্তু একাকী নহে। পাঁচটা ভূতও সৎ ও তাঁর টিয়নী। আমরা বড় ধাপে কহিতে ভালবাসি, সবাই ত্রিমিস্তোত্রম্, আর ভূয়োদর্শীরা কেবল নৈষ্কর্ম্য লাভ করে। এস আমরাও লেকচাই, কিন্তু চটু করিয়া। হিন্দুরা ঈশ্বরপরায়ণ, আর ব্রহ্মেরা ব্রহ্মপরায়ণ; যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও, তবে ঈশ্বর ও ব্রহ্মাই, দুই সমানঘরানার বজায় রাখ। আমরা কলসীপত্রে ভোজন করি আর সাহেবেরা টেবিলে বসে; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই। সকলেরই মন রাখা উচিত, কাহারও ছোট বড় করা ভাল নয়। দুই জমিদার সমান মুখ দেখাতে কোন এক গ্রাহ্মণ্ ঘুলুক ব্যয় লিখিলেন — এক পক্ষের অর্দ্ধেক ডিক্রি, অর্দ্ধেক ডিস্মিস্, অপর পক্ষেরও অর্দ্ধেক ডিক্রি অর্দ্ধেক ডিস্মিস্। পুরাতন প্রজারা উপহার পাইয়া উপস্থিত, নূতনও কেহ পাঠাইয়াছে; এখন কাহাকে রাখি, কাহাকে ফেলি। দু'জনেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া একটা সুষ্ঠা সমাধা গঠন করা চাই। তুফান হইয়াছে — মুসলমান মাঝী আল্লার দোহাই দিল, আর পৌত্তলিক হিন্দু আরোহীরা 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিল। ঝড় থামাও মানিল না, দুর্গাও মানিল না। দেখিয়া ইংরাজি-সংস্কৃত পড়া একজন বাবু 'দুর্গা আল্লা' 'দুর্গা আল্লা' বলিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমন্বয়ের প্রভাবে নৌকা তরাতুবি হইল, কি ঘাটে পঁহুছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, আমাদের উনার সমন্বয়বাদী ব্রাহ্মগণ ওঁকার-বম্বম্-হাল্লেলুয়া-আমেন-সংমিশ্রিত একটা মন্ত্র প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন, — যাহার প্রভাবে স্বর্গে-নৌকাটি সহজেই ভবনদী উত্তীর্ণ হইবে। এই মন্ত্রপ্রণেতারাই প্রতিযোগিহীন, সর্ব্বনাশী সংস্কারক।

ইতিহাসে পাঠে জানা যায় যে, তিন প্রকার উদারতা তিনটি প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল; — য়ুনানী গ্রীক সমন্বয়প্রিয়তা, রোমক বিসদৃশযোগশীলতা ও হিন্দু সমন্বয়প্রতিষ্ঠা।

গ্রীকেরা সকল মতের ও ভাবের অসার, বিসদৃশ অংশ ত্যাগ করিয়া সমান, সদৃশ অংশ গ্রহণ করিত। তাহাদের নৈসর্গিক তর্কপটুতা ভিন্ন জাতির সদৃশগুলির সহিত মিশিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গ্রীকদর্শনকারগণ জগতে বিকশিত দেবতের ও মনুষ্যত্বের সমাবেশভূমি অধিকার করিতে বড় করিতেন।

রোমীয়েরা বিসদৃশ পদার্থের একীকরণে পটু ছিল। কোন দেশে রোমের জয়পতাকা উড্ডীন হইবামাত্র বন্দীদের সহিত অমেলনির দেবতারাও রোমে চালান হইত। রোমবাসীদের বিদেশীয় দেব-দেবীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ছিল না। তাহাদের সংগ্রহ করা বড় ভাল লাগিত। মিলুক আর না মিলুক, সংখ্যা ও আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইলেই তৃপ্তি হইত। তাহাদের দেবতাদের তালিকা যত্নবেরও তালি-দেওয়া আউট-কিচিদের আঙ্গরাখার মত। এইরূপ উপায়ের বিসদৃশের মিলন হয় বটে, কিন্তু শ্রীসৌষ্ঠব হয় না।

হিন্দুর উদারতা প্রতিযোগিবিশিষ্ট। একটা মূলতত্ত্ব তাহারা গ্রহণ করে, এবং পরে সেই মূলতত্ত্বকে পরি-পুষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মতের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্র ঐ প্রতিযোগমূলক উদারতার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। মোক্ষের সার তত্ত্ব — এক বই দুই বস্তু পরমার্থতঃ হইতে পারে না — ইহাই গীতার মৌলিক শিক্ষা। কিন্তু বহুধাবি-সাংখ্যদর্শন, বৈতবাদি-ভক্তিশাস্ত্র, কঠোর যোগসাধন — সকলই সেই সারতত্ত্বে প্রথিত হইয়াছে। গীতা কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণহারের ন্যায়। দুইটি মিলাইয়া এক করা হয় নাই, কিন্তু একেরই ঐশ্বর্য্য-বৈভব বৃদ্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের বিরোধ মিটানো হইয়াছে। গ্রীকেরা বিভিন্ন মতের ভিতর হইতে সাধারণ ভাবটী গ্রহণ করে, রোমীয়েরা মতসমূহকে পাশাপাশি মিলাইয়া ঐক্যস্থাপন করে। কিন্তু হিন্দুরা একটী মৌলিক

সেকালাতীত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যান্য সার কথা সেই সুরের সুরায় ঢালিয়া গ্রহণ করে। আমার একটী নৈসর্গিক সুর আছে; যেখানে যা এসেছের সুরের সহিত আমার সুর মিলাইয়া মিইতা বা বল বৃদ্ধি করি; কিন্তু পাঁচটা সুরের সংযোগে আমার সুর প্রভুত করি না। হিন্দু গ্রহণ করে, সংযোগ করে, কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি হারায় না। এই একনিষ্ঠা উদারতা হিন্দুজাতির বিশেষ গুণ। আজ হিন্দু-সন্তানেরা সেই একনিষ্ঠতা — সেই উদারতা হারাইয়া, তেজোহীন ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

একজন 'হিন্দু'শব্দের অর্থ করিয়াছে — 'হীন' ও 'দুর্-পলায়ক'। বাস্তবিকই হিন্দুস্থানের হীনতার অবধি নাই। হিন্দু নিঃস্ব হইয়াছে। এই দুর্দশার প্রতিকার আবশ্যক। পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া যায় না, এবং দাঁড়াইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর নহে। অগ্রসর হইতেই হইবে। এখন কোন্ প্রণালীতে আমাদের গতিবিধি নিয়মিত করা উচিত।

প্রথমে আত্মমর্যাদা-জ্ঞান আবশ্যক। আমাদের কিছু আছে, আমরা অসার নহি, এইরূপ বোধ হওয়া চাই। আত্মাবলোকনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বেদান্তশাস্ত্র এক অপূর্ব, অপরিবর্তনীয় তত্ত্বকথা হিন্দুজাতিকে শুনাইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন-সংবেদনা যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে সেই বেদান্ত-তত্ত্ব পরিপুষ্ট ও কার্যকরী হইবে না। য়ুরোপে আত্মাবলোকন নাই — ইহা এক ঘোর প্রমাদ। আত্মাতুলের (Plato) মত আত্মদর্শী কয়জন জন্মিয়াছে! কান্ত (Kant) ও হেগেলের ন্যায় অন্তর্দর্শী অতি বিরল। যদি আমরা দর্শনবিদ্যায় অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে প্রতীচ্যদর্শনকে শিরোধার্য করিতে হইবে। কিন্তু আদান করিতে গিয়া যেন বেদান্তভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বেদান্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠাস্থানীয় চিরকালই থাকিবে। কিন্তু অপর-দর্শনের সহিত সংস্পর্শ ঘটাইয়া তাহাকে বিকসিত ও পুষ্টীকৃত করিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, বেদান্ত ব্রহ্মের লক্ষণ সম্বন্ধে আংশিক সত্য বলিয়াছে — এবং জর্মন হেগেলও আংশিক কথা বলিয়াছে — দুটা মিলাইয়া পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে, — তাঁহারা সত্য যে কি বস্তু, তাহার আভাস পর্যন্ত বোধ হয় দেখেন নাই। আর যাঁহারা, বেদান্তেই সব আছে, ইহাকে ঘরে তুলাইবার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা সংস্পর্জনিত ক্রমবিকাশবিধি তাহাকে বলে, তাহা জানেন না।

সমাজসংস্কার-বিষয়ে ঐরূপ আমাদের নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো উচিত। বর্ণাশ্রমধর্মই সেই ভিত্তি। বর্ণাশ্রমধর্ম বলিলে কেহ যেন বর্তমান কর্মগ্রন্থি শতবিভাগপূর্ণ সামাজিকতা মনে না করেন। য়ুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ঐ সমস্ত য়ুরোপীয় প্রথা বর্ণধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলপ্রদ হইবে, নহিলে বিফল হইবে।

রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রণালী। জাতীয় মহাসভার নেতারা মনে করেন যে, আমাদের রাজনীতি কিছুই ছিল না। য়ুরোপ হইতে ইহার আমদানী করা আবশ্যক। ইংলণ্ডে যেমন লোকের ভোটের উপর রাজ্যশাসন নির্ভর করে, সেইরূপ আমরাও এদেশে ভোট চালাইব। কিন্তু অবহিত হইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইংরাজের রাজতন্ত্র অর্থোন্নতিসাপেক্ষ। ব্যবসায়ী বণিকেরা রাজাকে অর্থের লাভ বা হানি দেখাইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে বাধা করিতে পারে। কোন বিষয় বা ব্যবস্থা ধনাগমের সহায় না হইলে একেবারে পরিত্যক্ত হয়। ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভূস্বামী ও ধনাঢ্যশ্রেণীবিশেষের অর্থশালসার দ্বারা চালিত। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতি যদি অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আমাদের দুর্দশার আর সীমা থাকিবে না।

যাহার মন আছে, যে রাজস্ব দিতে পারে, সেই ভোটের অধিকারী, এবং সেই অর্থের ভোটের উপর হিন্দুস্থানের রাজস্ব স্থাপিত হইবে, বলিই এক সোনারোপ বাধিবে।

হিন্দুর রাজশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অস্ত্রজীবী কর্তৃপক্ষ এবং ধনিকসম্প্রদায়ের উপর রাজার শক্তি বা শাসন-বিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানী অথচ অর্থহীন, যাঁহারা অস্ত্রসঞ্চালন করিতেন না, জন-বিজয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, এইরূপ সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক-শাসনপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের অধিকার ভোট হইতে উদ্ভূত হইত না, বা ভোটে বিনষ্ট হইত না। জ্ঞান, বুদ্ধি বা বৈরাগ্যের উপর ঐ শাসনবিধাতৃগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলদৃপ্ত নৃপতি ও অর্থলোলুপ বৈশ্য ঐ মনীষিবৃন্দের দ্বারা শাসিত হইত।

এই পুরাতন হিন্দু-শাসন-প্রণালী মুসলমানী প্রণালী অপেক্ষা ভাল কি মন্দ, তাহা আপাততঃ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে যদি আমরা জাতীয়তালাভ করিতে না চাহি, তাহা হইলে আর্য্য-রাজনীতি-প্রণালীকেই আমাদের নূতন রাজতন্ত্রের ভিত্তি করিতে হইবে। তাহার উপর যত ইচ্ছা ভোট চড়াও কোন ক্ষতি হইবে না।

ধর্ম, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে কিরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উদারভাবে প্রতীচ্য আদর্শ সকল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

(২)

পর-বিদ্যা

[১৩২৯ সালের 'মাসিক বসুমতী' হইতে ; লেখক—স্বর্গত অমৃতলাল বসু। ইঁহার সেকেলে ধরণের এই রচনাগুলি বর্তমান বাঙালী-জীবনের অস্থিসার বাস্তব সমস্যার আলোচনা হিসাবে খুবই মূল্যবান। গভীর স্বজাতি-প্রীতি, খরদর্শিতা ও স্বাভাবিক মননশীলতার সহিত, এই সকল রচনায় যে খাঁটি বাঙালী-মনের ছাপটুকু ফুটিয়া থাকে, তাহার জন্য এগুলির সাহিত্যিক মূল্যও অল্প নহে। বর্তমান প্রবন্ধে, লেখক, পরমার্থের মত, পর-বিদ্যাও যে কিরূপ অভাবের তাহাই দেখাইয়াছেন।]

ঠিক স্মরণ হয় না, বোধহয় যেন, ছেলেবেলায় অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম—"বিদ্যা-শিক্ষা করিলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান জন্মে।" এ হিতাহিতের অর্থ যদি এই হয় যে, কাহারও অহিত করিব না, সর্বদা জগতের হিতসাধনের জন্য নিযুক্ত থাকিব, তাহা হইলে আমরা যে ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি এবং করাইতেছি, তাহাতে হিতাহিতের এ তাৎপর্য একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। অবশ্য, দুই ও' দুই চার এ জন শিক্ষিত ব্যক্তি পরের হিতসাধনরূপ নির্বোধের কার্যে ব্রতী হইয়া জীবনের দিন ক'টা লোকসানে কাটাইয়া যেন, কিন্তু বিদ্যালয় হইতে এক পত্র ঘোল ঘুরে থাকিলেও এ বুদ্ধিবৃত্তি তাহাদের নিশ্চয়ই হইত। আর জীবনরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, অনুকূল প্রতিকূল নির্বাচনশক্তির যে জ্ঞান তাহা মনুষ্য অপেক্ষা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির যে বেশী আছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ছুতোর বা শিল্পীশিক্ষা সামাজিক নিয়মে যাহারা তাহাদিগের নিজের দৈনন্দিন মহাজনরা আদিয়াও যদি কলমেরে সজোরে উপরোধ করেন, তাহা হইলেও তাহারা পেটকরার উপর একখানা বেশী মজিনুও জমা করে না।

বর্তমান যুগে, শুধু এ দেশে নহে, জগতের সর্বত্রই বিদ্যার যেরকমের যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে লোক প্রায়শঃ উভয় পুরুষের হিতসাধনেরই, অথবা যাহাকে সে আপাততঃ নিজের হিত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারই জন্য চেষ্টা পাইতেছে এবং সেই হিতটা আপনার দিকে এত অধিক পরিমাণে টানিতে চেষ্টা করে যে আর পাঁচজনের হিত কাড়িয়া না লইলে তাহাদের হিতের মাত্রা সমান-সমান হয় না। অধ্যাপক যখন দেখেন যে, মাসিক বেতনে তাঁহার বেশী হিত হইতেছে না, তখন তিনি নোট-বই লিখেন, তাহাতে ছাত্রের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করিয়া তাহার অহিত ঘটাইলেও, পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থে নিজের হিতটা বেশ বাড়াইয়া তুলেন। উকিল যখন আইনের পাতে সোজা মামলার বহির্গত বিলাতী কৈফিয়ৎ বাহির করিয়া, এবং মুলতুবীর পর মুলতুবী ঘটাইয়া মক্কেলকে পথে বসান তখন তাঁহার নজর-লব্ধ হিত সেন্ট্রাল এভেনিউর উপর চেরাগা কোঠার ছাতে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয়ারাম খাঁচের দিকে হাত বাড়াইয়া উকিলবাবুর বিদ্যালাভের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকে। এইরূপে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, দপ্তরদার প্রভৃতির রোলস্ রয়েস্, ল্যাণ্ডো, জমীদারী, জাকর্তে বাড়ী, হীরা, ঘড়ি- জহরৎ সবই—অশিক্ষিতের দারিদ্র্যের উপর বিদ্যার আধিপত্য দেখাইয়া দেয়। বিজ্ঞান শুধু অজ্ঞানকে দূর করে না, অনেক সময় অজ্ঞানীকে পেটেও মারে। চরকা তাহার সেবিকাকে বস্ত্র দিক, অনেক সময় সেবিকার

সংসারের আর বস্তু দুই-ই জোগাইত; সহরবাসী কাপড়ের কল বিক্রয় মূলধন-প্রয়োগে চরকাকে বধ করিয়া তাহার দেবিকার পুরু-পৌত্রকে অন্নহীন বা ভিখারী করিয়াছে। এই দক্ষতার বিজ্ঞানে বড় বড় অঙ্ক উপাধি পাইলেও, 'দীনবন্ধু' নামে কখনও ভূষিত হইতে পারে না। আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদ্‌রা বলেন বটে, তাহা প্রস্তুত ব্যবহার্য্য সামগ্রী তত সুলভে বিক্রয় হয়, ইহাতে গরীবের কত সুবিধা; কিন্তু সে কি সুবিধা যদি সুবিধা — কিনিবার পয়সা নাই, সুতরাং মোটেই সস্তা নাই! গত দুই বৎসরের মধ্যে যাঁহারা এই বঙ্গদেশের সুদূর পল্লীগ্রামের অবস্থা একটু লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, অনেক স্থলে গৃহস্থের মূলধনটীকে লজ্জানিবারণের জন্য কতবার গৃহমধ্যে থাকিতে হইত।

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কলকারখানা এক শত জনকে ধনী করে — এত ধনী করে যে, তাহাদের প্রত্যেককে কোটিপতি বলিলেও যেন অবজ্ঞা করা হয়, আর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কাঙ্গাল-কাঙ্গালিনী করে; অশিক্ষিত বেকারেরা ঐ এক শতের মোট ধন, কাড়-কাটে, জল তোলে, অথবা ভুতা সাফ করে। সাধারণ ডাকাতেরা লাঠির জোরে পরস্বাপহরণ করে আর শিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধির কৌশলে ঐ কার্য্য সমাধা করেন; সাধারণ ডাকাতের জন্য পুলিস আছে, আর এই Intellectual dacoity-র ব্যবসা পৃথিবীতল অজ্ঞানের foolish মুখ হইতে নির্গত হয়; বিজ্ঞানের কলকর্ত্তাকে তার কথার বাহবা না দিয়া থাকিতে পারে না। এক শত টাকার বাজীতে ১০০০৲ টাকা খরচ করিয়া হারিয়া মোসাহেব বলিয়া থাকেন, "হারি আর যাই করি, আমার উকিল জবে আসামীকে যে নাস্তানাবুদ করেছে, তার চরিত্তিরের কথা যে রকম আদালতে বার ক'রে দিয়েছে তাতেই আমার টাকা উঠে গেছে।"

আগে বলিয়াছি, দুই দল জন নির্দ্দোষকে বধ দিয়ে, জগতের বুদ্ধিমান সাধারণ এখন বিজ্ঞানকে আপনাকে বধ করিবার জন্য। পথে প্রান্তরে গৃহে দর্শনালয়ে ঐশ্বর্য্য মাংসর্য্যে রোগে, এমনকি, রোগেও আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিজ্ঞান বিধাতার পেটে ঢুকিয়া কামড়াইতে থাকে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মানবকে যে শক্তিপ্রদান করে, তাহাতে তাহার উচ্চাভিলাষ ও ধারণ-প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী হয়; কামনার বিরাম নাই, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই; আর ধারণ — তাহে মায়া ত আছেই, তাহার উপর, বেশী নয়, গত তিন বৎসরের মধ্যেই, মানুষকে প্রাণে বধ করিবার কত মারাত্মক, কত মারিক উপায়ই না সৃষ্টি করিয়াছে!

সমগ্র সভ্যজগতে বিজ্ঞানবিস্তারের ফল ত' হইল এই। তাহার পর আমাদের এ দেশের, বিশেষ বঙ্গদেশের কথা। প্রথমে ইংরাজ আসিল, তাহার ঔপনিবেশ সম্বন্ধে যত, দেখিয়াই আমরা মোহিত হইলাম, প্রাণ বিলাইয়া দিলাম, মুখুজ্জ্যের প্রাণবল্লভের মোহিনী মূর্ত্তি ধরণের কবলে আত্মসমর্পণ করিলাম। 'সাহেব' বলিলেন, "তোমরা মূর্খ আছ," আমরা বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।" 'সাহেব' বলিলেন, "আমরা তোমাদের লেখাপড়া শিখাইয়া বিদ্বান করিব," আমরা বলিলাম, "যে আজ্ঞে"। তাহার পর একটা যেটা বলিল, তাহাতে জনকতক 'সাহেব' হইলেন, ও জনকতক মাথায় মাথায় বাঙ্গালীও হইলেন। তর্ক এই, আমরা কোন্ মূর্খি বলিয়া বিদ্বান্ হইব। জনকতক সাহেবের মত যে, আমরা যেমন ব্যক্তিগত অজ্ঞানে ক্যাক্ ক্যাক্ করি, সেই ক্যাক্ ক্যাক্‌টাই একটু ভাল করিয়া করিতে শিখি, তাহার পর নিজের ডানা নাকিয়া কখন বা মাটীর ঘাস-কুড়াগুলি খুঁটিয়া খাই, আর কখন বা গাছের কলটা আপটায় ঠোকর মারি। আর জনকতক 'সাহেবের' মত হইল, না আমরা "রাবাস্কক" বলিতে

দিবি; পাখীর ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ পাখী-ই বুঝে, ও ত' স্বাভাবিক, ও ত' আর বিদ্যা নয়; বিদ্যা হ'ল "রাধাকৃষ্ণ" বলা। অধিকাংশ বাঙালী বলিলেন, "ইঁা গো আমাদের 'রাধাকৃষ্ণ'-ই বলাও"; তাঁহারা বুঝি দেখাইলেন যে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিলে আমাদের কোনও লাভ নাই, নিজের ডানার জোর দিয়া চিল-কাল্পটা উড়িয়া বেড়াইতে হইবে, একটা গাছটাছ দেখিয়া নিজের বাসা নিজেই বাঁধিতে হইবে, আপনার আহার্য্য আপনিই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহার উপর ঝড় আছে, বৃষ্টি আছে, কুকুরের দাঁত ও বিড়ালের পেটও আছে; কিন্তু "রাধাকৃষ্ণ"-বুলি শিখিলে আমরা ঘরে বিলাইব, সৌখীন লোক আমাদের কিনিয়া লইবে, চঞ্চুকে সিঙ্গলের তারেরা খাঁচার ভিতর আমাদের দানা দিবে, ছোলা দিবে, ছাতু দিবে, পিঠে দিবে — কোন্ না দু-এক দিন পাতের ভেজ-ভাজা, বিস্কুট-ভাজাও দিবে; পাঁচ জনকে ডেকে আমাদের দেখাইবে, বুলি শুনাইবে। সুতরাং যাহা হইল আমরা 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি-ই শিখিব। শঙ্করাচার্য্য যেমন শিবস্তোত্র লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, মেকলেও তেমনি অমর হইয়াছেন বাঙালী-স্তোত্র লিখিয়া। সেই কলের দেশের মেকলে বলিলেন, "হাও বাঙালীকে বিদ্যার ফল ফেলে।" আজ এক শত বছরের উপর সেই বিদ্যার ফল চলিয়াছে; যেমন ধাতার ধরার ফল ঘুচিয়া এখন ছোলার মিল হইয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন ইস্কিমিয়ার আসিয়া তাহারও চাকাটা বড়্টা পিটন্টা বসিয়া যেন — আর ফল হইতে বাঙালীর ছেলেরা ঠেকর মং, ঘুরের নং, তিনের নম্বরের বল্লা আটা পুরি তুলি হইয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া পড়িয়া বস্তাবন্দী হয়। বিদ্যা মাথার খুলীর ভিতর রকমেরকমের পুরাণো আসবাব ভরিয়া দিতেছে। আমরা চলিতে তুলিয়া গিয়াছি, উঠিতে তুলিয়া গিয়াছি, খুঁটিতে তুলিয়া গিয়াছি, চোখরাঙাইতে তুলিয়া গিয়াছি। ক্ষেতের ধান, বনের ফল, ফুলের মধু, সকলের আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছি; কেবল শিকল পায়ে হাতে বসিয়া বসিতেছি "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ". আর এক একবার শুমোরে পরগুলা ফুলাইয়া তুলিতেছি। প্রথম দল বিশ বৎসর হ'লটা পাখী এত রকম রাগে বিকাইত তখন নয়, তাহার পর টীয়ার দেখা দিল, ফুরেষ্কাল তুলিল, Bird of Paradise, Macaw, Magpie, Canary, আরও কত কি আমদানী হইল; তাহারা কেহ শিস্ দেয়, কেহ গান করে, কেহ বলে 'পলি পলি'; আর এ দিকে বাজার হাজার "রাধাকৃষ্ণ"-বলা টীয়ে পলি পলি; সুতরাং দু আনা ছোড়াও হাটে বিকায় না; কিনিলেও খাইতে বেশ বোঝা যায় — ছটা ছোলাও আর মিলে না। একে ত' সর্ব্বনেশে অহং সব মানুষের মনের ঘরে বসিয়া নাস্তানাবুদ করিতেছে, তাহার উপর ইংরাজী শিখিয়া আমাদের অহংটা একেবারে সাত হাত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই কারণ নাই, কেন না ইংরাজীতে আমি-জ্ঞাপক আই (I)-টা বড় অক্ষরে (Capital এ) লিখিতে হয়; পৃথিবীর আর কোনও ভাষার লিখন-প্রণালীতেই বোধ হয় এ নিয়ম নাই।

কলটায় হাজির পাঁচটায় ছুটী, বেশ-ভূষা বেশ পরিপাটী; চেয়ার টেবল সাজিয়ে রাখা, মাথার উপর টানা-পাখা; কোনও হাঙ্গাম নাই, কোনও ঝামেলা নাই; বড়বাটের মধ্যে 'সাহেবকে' একটু কোমর মোয়াইয়া সেলাম দেওয়া, চাপরাশীকে চাটা বলা; কাজের কথা একটা Carried over থেকে আর একটা Carried over পর্য্যন্ত ঠিক দেওয়া; কিসের হিসাব, কত হিসাব তার ঠিক-ঠিকানার দরকার নাই: আর না হয়, 'সাহেবে'র draft করা চিঠির নকল করা (তা হয় অধিকার সেক্সপীয়র ছোপটুকু পর্য্যন্ত); তার উপর মাস গেলেই মাহিনা, নগদ কড়কড়ে টাকা। এমন শান্তিপূর্ণ সুখের স্বর্গ

ছাড়িয়া কে যায় চরের ক্ষেত্র চাষের জন্য, কে বসিয়া দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়ী ধরে, কে যায় পত্তর খাটাইয়া, ধান্য ধানাইয়া লাভ-লোকসানের খবর চিঠির দিয়া অন্নদাগ্রহের অর্থ খুঁজিতে? "রাধাকৃষ্ণ" খুলি বলিতে শিখিয়া আরও একটা জাতি রকম লাভ হইল: পক্ষিসমাজে বুলি-বলা পাখীরা একটা বড় রকম নূতন জাতি হইয়া দাঁড়াইল, সে জাতের নাম হইল Babu (বাবু)। যার বাপ — কোনও হাবুকে জামাইতে আসিয়া কলাসের উপর পা দিলে বাবু খানা হইয়া তাহাকে দূর্ দূর্ করেন — তাঁরাই ছেলে ছুটা পায় দিয়ে ঘরে ঢুকিয়া "Good morning, Sir. hope I'm not intruding" বলিলেই, বাবু অমনই তাহাতে হাত বাড়াইয়া দেখাণ্ড করিয়া তাকিয়ার ধারে বসিতে দেন। সুতরাং ঠাঁতি তাঁত ছাড়িল, কামার হাতুড়ি ছাড়িল, ছুতোর র‍্যাঁদা ছাড়িল, পড়িতে বসিল — "I am up রাধাকৃষ্ণ," "You are in রাধাকৃষ্ণ," আর একবারে শৈশুক জাত ছাড়িয়া হইয়া গেল — বাবু! এমন উৎসাহী শুশ্রূষে এত বাবু জন্মিয়াছে যে ধাবুরা বস্তা-পচা হইতেছে, আর বাবু নামে একটা দুর্গন্ধ উঠিয়াছে। অক্সফোর্ডে ও কেম্‌ব্রিজে যে মহানৈবেদ্য সাজান হয় তাহারই ঝুটা নৈবেদ্য লইয়া এদেশে সরস্বতী-পূজা আরম্ভ হইল। সকল বিদ্যারই একটু একটু করিয়া আমাদের গলাঃকরণ করান হইল, বিদ্যার আর কিছুই বাকি রহিল না; —

"কোন শাস্ত্র বাদি হয় তাঁর অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুষ্পাঠী বিদ্যাতে তৎপর॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
'মোক্তারি'-বিদ্যা সেই অতি শিখিলেন বাম॥"

ডিক্রিজারী দেশী-মস্তিষ্ক উদ্ঘাটন করিয়া তাহার গৃহিণকার যদি কেহ যোগদৃষ্টি নিপাতিত করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সেকেণ্ডহাণ্ড বিদ্যার কি বিচিত্র সম্ভারই সেখানে স্তূপীকৃত রহিয়াছে। একটা ঠ্যাং-ভাঙ্গা সাহিত্যের উপর একটা ঘাড়-ভাঙ্গা সায়েন্স, আড়কাটার টানান খানিকটা ঝুলা-পড়া দর্শন, এক কোণে একখানা অঙ্কের কঙ্কাল, আরও কত কি কত কি — ছাঁটাং ছাপার উপর সব হরপ কি বুঝা যায়? সে মস্তিষ্ক দেখিলেই বহুবাজার ষ্ট্রীটের সেকেণ্ডহাণ্ড জিনিষের দোকান মনে পড়ে; দু'খানা গদিছেঁড়া কৌচ্ — দোকানদার বলছে "এ আসল এক্‌ঘরের বাড়ীর, আর কারুর দোকানে পাবেন না।" খানকতক হাতভাঙ্গা পিঠ-ভাঙ্গা কেদারা — একবারে বলে আমেরিকান্, যেন এমার্সনের বাড়খানকার দেড় chapter; সোটাতক ডবল্‌উইক্ কেরোসিন ল্যাম্প — মোবটা কাটা, দু ঘুরালে পলতে উঠে না, কিন্তু আসলে অন্নদাবাবুর বাড়ীর; দুইটা টীমের ট্রাঙ্কের ঢাকা; মস্ত এক বাক্সিল ছাতা-ধরা ব্যাটন; একখানা উইরে-খাওয়া জাপানী স্ক্রীন্; চাকা-ভাঙ্গা বাইসাইক্‌ল্, ছুটো ছুইল্, সেকেণ্ডের পারা; প্রস্তরফলক নির্ম্মলবরণ কেঁচো টানাপাখা ও ১৮৯০ সালের খাকারের ডাইরেক্টরী। এরূপ দোকানের বেসাতী কতদিন চলে? তাই বহুবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাংশে প্রায় খাজারের সীমানার পর হইতেই আরম্ভ করিয়া হদ্‌সীবলস্ ট্রাঙ্ক লেনের মোড় পর্য্যন্ত একদিন সারি সারি যে Second hand Conglomeration-এর দোকান ছিল তাহার প্রায় একখানিও আর দেখা যায় না; ঐ ষ্ট্রীটের পশ্চিমাংশে ঐরূপ দোকান দু'পাঁচখানা আজও শেন্‌সনের অপেক্ষায় প্রাচীন জীবন কোনও মতে রক্ষা করিয়া আছে।

এই সেকেণ্ডহাণ্ড বিদ্যার অসারত্ব ও নিরর্থকতার কথা এখন ছেলেরা বুঝিতেছে, যুবকরা বুঝিয়াছে, অভিজ্ঞাবক-পদে প্রতিষ্ঠিত প্রৌঢ় প্রাচীনরাও বুঝিয়াছেন। উকীল অনেকদিন বুঝিয়াছিলেন যে, শ্যামলা আর শ্যামলা আনে না; তাই গাউন পরিলেন, কিন্তু তাতেও টাউনের খরচ চলে না; ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে বোটল চলিলেও চলিতে পারে কিন্তু

'এম্ বি'-র বিদ্যা কলাপে মোটেই চলে না ; 'এফ-এ'র দেয় ভরসা (যদি কেপ্টী করিয়া দিবার জন্য M. L. C কি সরকারী ব্যারিষ্টার খণ্ডর না থাকে) মফস্বলের বাট টাকার মাষ্টারী [চালের দাম দশ টাকা হল, ছেলের দুধ টাকায় আড়াই সের] ; বি. এ দেখিতেছেন বিয়ের বাজারেও দাম আর — ছত্রের ভাষে ব'লে — বেশী দিন বর্ষরা হইবে না ; কিন্তু তবু ছাত্রের বন্যা ল' কলেজের সেই, মেডিকেল কলেজের গাদাগাদী, আর্ট কলেজের ভূত ভাসাইয়া দিতেছে। কি করে, কোথায় যায়, আর অন্য পথ নাই। শিয়ালদহ ঐঞ্জনে যাইয়া একখানা টিকিট কিনিয়া নৈহাটিতে নামিয়া আর একখানা আড়ংঘাটা পর্যন্ত—সেখান হইতে হাঁটিয়া—অবশেষে মোয়াদহ ; সেখানে নামিয়া খেয়ানী দেখে সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত ভীষণ তরঙ্গাকুল পদ্মা, খান তিন চার হেঁকেলে খেয়া নৌকা মাত্র আছে, তাহাতে এত লোক উঠিয়াছে যে গলুই-এর কাছ পর্যন্ত যাত্রী ঠাসাঠাসি, একটা ছোট ছেলেরও পা রাখিবার জায়গা নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আজ বৎসর খানেক ধরিয়া একটা কথা উঠিয়াছে যে, আমাদের কলেজ তুলিয়া কুমারিয়াল এডুকেশন দাও। ডাইস ট্রাইটস ক'জন 'ছোট সাহেব' কোন্ কলেজের কমার্শিয়াল ডিগ্রি পাইয়া ভারতে আসিয়া আপনাদের ভাগ্যের চিন্তিজারী করিতেছেন, ছুপেরকে কবরে পাঠাইয়া মফস্বলের মহাসন কোন্ প্রকারে বিদ্যার লক্ষতায় বীর আয়ত্তে আনিতেছেন তা জানি না, — কলেজী বিদ্যার কথা কলেজী মাথাই বুঝিতে পারে, সে মাথা আমার নাই।

এ প্রস্তাবের আলোচনা সময়ান্তরে করিবার চেষ্টা করিব, আপাততঃ যে বিদ্যা চলিতেছে তাহা যে "অমূল্য ধন" তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝা গিয়াছে ; বাজারে এ বিদ্যার মূল্য এখন ঘোর সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান।

বড় কথা শুনি, বড় কথা কই,
জড় করে' নিয়ে পড়ি বড় বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড় হই
　　কে পারে হাসিতে কেপে !

কেমারার বসে' সারাদিন ধরে'
বই পড়ে' পড়ে' মুখস্থ করে'
কভু মাথা ঘুরে, কভু মাথা ঘোরে,
　　ঘুরিবা যাইব ক্ষেপে !

ইংরেজ চেয়ে ভিসে যোরা কম ?
আমরা যে ছোট, সেটা বড় ভ্রম ;
আকার প্রকার হাবভাব-ভরম
　　এতেই যা' কিছু ক্ষেপে।

যাহা দেখে তাহা তাই কেপি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে'
করি কতমত গুরুমারা টীকে,
　　দেখনীর মুচে যেপে।

অবুঝ বাঁশী

শ্রীপ্রশান্তকুমার বাগ্‌চী

তারা-ভরা আজি এ রাতে
কেন গো বাঁশী বাজালে,
ঘুম ভাঙিয়ে সকল প্রাণ
সুরের নাড়ি নাচালে ?
তুমি যে ধরা দেবে না জানি,
তবুই কেন হেরখানি
আকুল করো স্বপনে,
চোখের জলে ভেবে যে আঁখি,
একেলা ঘরে গোপনে।

কতনা নিশি আমার তরে
বেকুলে ছিনু জাগিয়া,
শুনিতে তব চরণ-ধ্বনি,
চুমন-বঁধু লাগিয়া।
প্রদীপ-আলো জানালা-তলে,
নিশুত নিশি গেল যে চ'লে,
এলে না তুমি দুয়ারে মোর
জীবন-ধন জুড়াতে,
এলে না সুখ-সোহাগ-ভরে
সকল সাধ পুরাতে।

ফাগুন আজি যেরেছে পাখা
বিদায় নেবে বলিয়া,
গগনে তার সজল আঁখি
উঠেছে ছলছলিয়া।
উদাসী ওগো, কি ধন চাও,
পারিনে আমি বুঝিতে,
সপন ভুলে সুরের ভুলে
কি এলে বৃথা খুঁজিতে ?

আজি এ চাঁদ-হারানো রাতে,
কি দিব, বলো, তোমার হাতে —
মোর যা ছিল রঙীন দিনে
উজাড়ি' ফেলে দিয়েছি,
তোমারি দুঃখ-দুরতি' পরে
বেদনে সুধা পিয়েছি।

ফাগুন আজি যেরেছে পাখা
আমার সেই ঘোরের মেলা
মলিন হ'য়ে মিলিল, হায়, —
তবুও কোন্ সাহসে
অবুঝ বাঁশী বাজাও, প্রিয়
করুণতম বাঁধনে ?

আধুনিক কবিতার মান-নির্ণয়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আমরা যে জাতীয় নূতন কবিতার আবির্ভাব, এবং তাহাদের প্রকৃতি ও শিল্পরীতি লইয়া বহুবিধ আলোচনা দেখিতে পাই। বিশেষ জোরের সহিত ঘোষিত হইলেও, এখনও এই নূতন রীতিকে বাংলা কাব্যের সহজ রীতি বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকের আপত্তি আছে। যাহারা এই নবত্বের উদ্গাতা তাঁহারাও, ইহা এখনও পরীক্ষার স্তর পার হয় নাই বলিয়াই মনে করেন। কবিতা-সৃষ্টি আদৌ পরীক্ষার বিষয় কিনা সে কথা বিচার-বিবেচনার পূর্বে একথা অন্ততঃ অসংকোচে বলা যায় যে, যে-কবিতা সহজ-গ্রাহ্য হয় না, এবং যাহাকে প্রকৃত কবিতার জন্য তত্ত্ব-আলোচনার প্রয়োজন হয়, তাহা অন্ততঃ জাতির চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ-রূপ নহে; তাহার ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন, বর্তমান জাতীয় জীবনের আবহাওয়া তাহার অনুকূল নহে। অবশ্য কোন প্রকার নূতনত্বের জন্যই গোড়ার কোথাও অনুকূল আবহাওয়া থাকে না। কিন্তু জাতির চিত্তধর্মের সহিত যোগ থাকিলে সৃষ্টিমাত্রেই আগুনের মত ছড়াইয়া পড়ে — সকল বাধা, তাহার সম্মুখে খড়ের স্তূপে ফুলাকির মত উড়িয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে হয় না। ইহার প্রমাণ — বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" জনসাধারণ, প্রথম হইতেই নূতনের আবির্ভাব নিঃসংকোচে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন। আপত্তি কিছু উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আপত্তি অন্তর্জাতীয়। সে আপত্তি অস্বীকৃতি নহে, কেবল পুঁটি-মাছি লইয়া বিতর্ক। তাহার জন্য জনত-সৃষ্টির প্রয়োজন হয় নাই, পরন্তু, নূতন নূতন সৃষ্টির দ্বারাই যেটুকু বাকী ছিল তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। অপর সৃষ্টি-মূলক সাহিত্যের ন্যায় কবিতারও বিচার-পথ ইহাই — উহা আপন শক্তিতেই পাঠকের মন জয় করে। বিচার-গৌরব অর্জন করিবার জন্য কোনও আয়ুধের, কিম্বা অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার জন্য কোনও দীপ-বিধার প্রয়োজন হয় না।

বাংলার আধুনিক কবিতা এখনও সেই চিরন্তন পরীক্ষা পায় নাই। উহার মধ্যে প্রাণ-সত্তার কিছু থাকিলেও, এখনও উহার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, এখনও উহা বাংলার জীবন-ধারার সহজ উত্তরণ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতে পারিতেছে না। কেন? সেই কথাই একটু চিন্তা করিয়া দেখা যাক্।

বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ-আধুনিক ও মূল্যোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য, এই সমস্ত কাব্য-সৃষ্টির যে অংশে আয়োজনের যে অভাব আছে তাহা অস্বীকার্য। কবিতার আঙ্গিক লইয়াও যে উহাদের মধ্যে সন্ধানে পরীক্ষা-কার্য চলিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সন্ধান চেষ্টা নিষ্ফল হইলেও, ইহাই সাহসের সাধনার সিদ্ধি-অর্জনের ঠিক পথ কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। এই জাতীয় ভাঙ্গাগড়া, নিরীক্ষা-পরীক্ষা নিতান্তই ল্যাবরেটরি-ওয়ার্ক। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিয়া এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে জোড়া দিয়া কবিতা সৃষ্টি হয় না। যাঁহারা এ বিষয়ে সিদ্ধ সাধক তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন — উহা উদ্বেলিত প্রাণের প্রেরণায় নিজেই নিজের দেহ সংগ্রহ করিয়া বহির্জগতে আত্ম-প্রকাশ

করে। সুতরাং এটা কবিতা নিরাচিত, মনের মত পদ্য না পদ্যাংশকে (যত সম্মানিত রীতিতেই হউক না কেন) ছোড়া দিয়া, কবিতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা কবিতার জন্মকালের বিরোধী। আধুনিক কবিতার জনকগণ (অনেক ক্ষেত্রে) কবিতার ঐ জন্মকালকে অস্বীকার করেন। সুতরাং প্রাণপণ প্রয়াসেও এই প্রাণহীন ছলনা সাহিত্যের দরবারে, জীবিত বলিয়া সর্বত্র নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখিতে পারিতেছে না।

এই আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে বর্তমানে দুই শ্রেণীর কাব্য-সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের আদর্শ কি, শিল্প-রীতির বৈশিষ্ট্য কি, এই সকল বিচার করিলে এরূপ কবিতার একটা যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে। এই আধুনিক কবিদের প্রায় সকলেই বাস্তববাদী, অর্থাৎ সাহিত্য-সৃষ্টিতে ইঁহারা বাস্তবের সহিত সম্পর্কশূন্য কাল্পনিক বিষয়-বস্তুর আশ্রয় লওয়ার বিরোধী। যদিও অতীতে বিশুদ্ধ কল্পনার ভিত্তিতে অনেক বড় বড় কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে, তবুও সেই জাতীয় নিছক কাব্যকে ইঁহারা সমর্থন করেন না। রোমান্স্ সম্বন্ধে একটা একদেশদর্শী ধারণার বশে, ইঁহাদের অনেকে একশ্রেণী সকল রকম রোমান্সের বিরোধী। অলৌকিকের বিষয়, বাস্তবাতিরিক্ত বাঞ্ছা, বস্তুকে ছাপাইয়া মনের প্রকাশ,—ইহাই যদি রোমান্সের লক্ষণ হয়, তবে কাব্যের যথার্থ প্রাণ-ধর্ম যাহা, তাহার মধ্যে এই সকল লক্ষণই বিদ্যমান আছে। এক অপূর্ব বিষয়, একটা লোকোত্তর অনুভূতিই, বাস্তবের সব-কিছু খণ্ডতা ক্ষুদ্রতাকে পূর্ণ করিয়া তাহাকে কাব্যরসে মণ্ডিত করে—এই হিসাবে সকল কবিতাই অপূর্ব রোমান্টিক্। যে সকল কবি তত্ত্বতঃ ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারাও কার্যতঃ ইহার প্রয়োজন না মানিয়া পারেন না। অন্যদিকে যাহারা ইহাকে সজ্ঞানে স্বীকার করেন না—আমাদের মনে হয়, এই অস্বীকৃতিই তাঁহাদের কবিতার আঙ্গিক গুলিকে সজীব করিয়া তুলিবার পক্ষে প্রকারান্তরে বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

এই আধুনিক কবিদলের মধ্যে দুইদল দেখিতে পাওয়া যায়—একে অপরের বিরোধী। উভয় শ্রেণীই বাস্তববাদী; তবে একদল চরমপন্থী, আর এক দল নরমপন্থী। চরমপন্থীরা কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে, আর্ট ও আঙ্গিকের নামে, কোনরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদের বিরোধী। তাঁহাদের মতে, কবিতায় লক্ষ্য হওয়া উচিত, বিশ্বমানবের প্রাক্-ক্রিয়ার পূর্ণ প্রকাশ। নরমপন্থীদের লক্ষ্য বাস্তব হইলেও, তাঁহাদের মতে, কবিতা হইতেছে নিছক আর্ট বা শিল্পসৃষ্টি; সেইজন্য তাঁহারা কবিতার এই দিকটার উপরেই বেশী জোর দেন। চরমপন্থীদের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য উভয়ই খুব উঁচার হইলেও, তাঁহারা কবিতার মধ্যে কয়েকটি বাঁধাধরি বিষয়ের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে, কবিতা হইতে হইলে উহার মধ্যে কয়েকটী বিষয়ের সদ্ভাব এবং কয়েকটির অভাব থাকা চাই; উহা কবিতার পক্ষে অপরিহার্য। প্রথমতঃ, উহার মধ্যে রসসৃষ্টির জন্য কোনও কৃত্রিম উপলক্ষ থাকিবে না। কারণ, এই রসবস্তুটী বাস্তব-সম্পর্কশূন্য কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা এক শ্রেণীর বিলাস, উহা জীবন-কর্মের অনুগত নয়। দ্বিতীয়তঃ, আর্টের খাতিরেও, কবিতার মধ্যে ব্যাকরণের সংস্কারজাত বা তৎ-প্রতিযোগক কোনও পদ বা ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। তৃতীয়তঃ, কবিতা বুদ্ধিপ্রধান ও জীবন-সমালোচনামূলক হইবে। উহাতে বাস্তব-জীবনের প্রয়োজন, মানব-সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য, সমান অধিকারের দাবী, রাষ্ট্রিক সমতার চেষ্টা, প্রবৃত্তির আলোচনা কিংবা সেক্সের তাগিদ থাকিতে পারে, কিন্তু উহা বিশ্লেষণমূলক হওয়া চাই; অতীতের শিক্ষা-সংস্কার — যাহাদের ফলে এক শ্রেণীর মানুষকে

বুদ্ধিজীবী এবং আর এক শ্রেণীকে প্রমজীবী ভাবিতে হয়,—অর্থাৎ যে সকল চিন্তা হইতে শ্রেণীবিশেষের উৎপত্তি—উহার মধ্যে তাহার সন্নিবেশ থাকিবে না। এই গণ্ডির মধ্যে যাহা রচিত হইবে তাহাই হইবে সমাজতন্ত্রের কবিতা, বাকী সমস্তই কবিতার বিকৃতি। ইঁহাদের এই নালিশ হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও রেহাই পায় না। কিন্তু বিদ্রোহ জিনিষটা লিপিবদ্ধের নহে, তাহার প্রয়োজন মিটিয়া গেলে কবিতার রূপ কি হইবে? সে কথায় উত্তর দেওয়া ইঁহারা অনাবশ্যক মনে করেন। তখনকার কবিতার রূপ কি হইবে তাহার জন্য আগে হইতে দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ, ইঁহারা কবিতার সাময়িক ছাড়া কোনও শাশ্বত রূপ স্বীকার করেন না। তা ছাড়া, এই রূপ সাময়িক প্রয়োজন গদ্যের দ্বারাও মিটিতে পারে — ইহার জন্যও কবিতার প্রয়োজন হইলে সে কবিতা যে প্রোপাগ্যাণ্ডা কবিতা হইয়া উঠে, এরূপ মনে করিবার হেতু আছে। কিন্তু ইহা যে প্রোপাগ্যাণ্ডা-কবিতা নয়, সে কথা ইঁহারাও বলেন না। ইঁহারা বলেন, কবিতা মাত্রেই যখন প্রোপাগ্যাণ্ডা-কবিতা, তখন তাঁহাদিগের কবিতারই বা তাহা হইতে বেশ কি আছে? কবিমাত্রেই যখন নিজের জীবনরস রূপের মধ্যে লুকাইয়া দান করিয়া, আর পাঁচ জনের সশ্রদ্ধ প্রশংসা আকর্ষণ করিবার জন্য, সাধারণের মধ্যে তাহা প্রকাশ করেন, তখন সকল কবিতাই কি প্রোপাগ্যাণ্ডা (বা প্রচার)-মূলক নয়?

নবপন্থীরাও বাস্তববাদী। তবে ইঁহারা বিশেষ করিয়া কোনও বৃহৎ সমাজ বা সমগ্র মানব-জীবনের কথা না ভাবিয়া, নিজেদেরই ব্যক্তিগত জীবনের যাহা বাস্তব অনুভূতি, বাস্তব ভাবনা বা সমস্যা, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া কাব্য রচনায় পক্ষপাতী। সেই হিসাবে ইঁহাদিগকে বাস্তববাদীদের মধ্যেও অনেকটা ব্যক্তিবাস্তববাদী বলা যাইতে পারে। এইপ্রকার আত্মকেন্দ্রিক কবিতায় ভাব-বৃষ্টি স্বভাবতই অতি সংকীর্ণ হইতে বাধ্য; উহাতে পাঠকের — বৃহত্তর সমাজের — ক্ষুধা মিটাইবার উপাদান বড়ই অল্প। অথচ এই বৃহৎ ক্ষুধা মিটানোই মহাপ্রাণ (great) কবিতার একটা প্রধান লক্ষণ। সৌভাগ্যক্রমে প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবিতার ত্রুটির বাহিরেও, উহার মধ্যে যাহার সম্ভাবনা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীতে সে সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। দ্বিতীয়োক্তগণ বাস্তববাদী হইলেও, ইঁহাদের বাস্তব শুধুই ব্যক্তিগত অনুভূতির বাস্তব। ফলে, এক-একজন এক-একটা ভঙ্গীকেই ব্যক্তিগত করিয়া লন, এবং শুধু এক নিমেষের একটা ভাবনা, একটা নূতনতর শব্দ, একটা অদ্ভুত উপমা বা একটা উদ্ভট লিখন অনেক সময়ে ইঁহাদের কবিতার উপলক্ষ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ আফিমের নেশার মত একটা নেশার ঘোরে, অতিমাত্র অন্তর্মুখীন হইয়া, একটি মাত্র ছোট অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া, তাহারই চারিদিকে বাক্যপুঞ্জের রঙ্গিত কল্পনার জাল বুনিতে থাকেন। ইহা তাঁহারা আমাদিগকে বুঝাই করে, তথাপি তাহা যে অতিশয় দীর্ঘশ্বাস, ইহা অস্বীকার করা শক্ত। ইঁহাদেরই এক পার্শ্বে আর এক দল কবি আছেন, যাঁহারা কবিতার যথার্থ প্রেরণাটি প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতে না পারিয়া, ইংরাজী হইতে কয়েকটি সৈনিক মাত্র আহরণ করিয়া, অপটু হস্তে তাহাদের পরীক্ষা করিতে থাকেন। দু' একটা ব্যতিক্রম থাকিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল কবিতা, ভাষা, আঙ্গিক প্রভৃতির অযাচিতভাবে এমনই কৃত্রিম হইয়া উঠে, যে উহা পাঠকের মনে, অল্পোদ্রেক করা দু' দণ্ডের কথা, কোনও প্রকার অনুভূতিই সৃষ্টি করিতে পারে না। তবুও, পাশ্চাত্য কবিতার আধুনিক সমালোচকদের রচনা হইতে যথেচ্ছ উদ্ধৃত করিয়া এই গুলিকে সমর্থনের একটা প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রয়াস একটা মিথ্যা প্রয়াস মাত্র। যেমন সৈনিক আহরণ

করিলেই যদি কবিতা রচনা করা সম্ভবপর হয়, তথাপি কোন কবির প্রাণের মধ্যে ডুবিয়া, তাঁহার সহিত একাত্ম হইতে না পারিলে, তাঁহার টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করা যায় না। এই সহজ সত্যটি ইঁহারা বুঝিয়া মানে। যাহাদের জীবনের সহিত আমাদের কোনও দিক দিয়া কোনও সম্পর্ক নাই তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিই, আমাদের অত্যন্ত আপনার রবীন্দ্রনাথের টেক্‌নিক্‌টুকু এপর্যন্ত কেহ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন কি? রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের যে কয়জন শক্তিমান কবি কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই রবীন্দ্রনাথের টেক্‌নিক্ নকল করিয়া সফলী হইতে পারেন নাই; পরন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার মধ্যে নিজেদের যে বিশেষ দিক বা অধিকারটুকু খাড়া পাইয়াছেন, তাহাতেই আপনাদের পথ কাটিয়া লইয়াছেন। অন্ধকারকে দিবে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতার হুবহু নকল করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সে অনুকরণ যে কতখানি হাস্যকর হয়, তাহা যাঁহাদের কোই সাহিত্যজ্ঞান আছে তাঁহারাই বলিতে পারিবেন।

নকল করিয়া কবিতা হয় না, কবিতার জন্ম জীবনের মহা সৃষ্টি-নিয়মের অধীন। উহাতে বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনও প্রশ্ন আসে না। সকল বিষয়বস্তু বা সকল আঙ্গিকেই কবিতা হয়, যদি উহা প্রাণের স্পর্শে জন্মগ্রহণ করে। লক্ষ্য বা বিষয়বস্তু বড় হইলে হয়ত সে কবিতা মহা-প্রাণ (great) হয়, না হয় স্বল্পপ্রাণ হয়। কিন্তু প্রাণ-ধর্ম না থাকিলে উহা কবিতাই হয় না। এই প্রাণ-ধর্ম ও বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, — একটি কবিতার আত্মা, আরেকটি তাহার দেহ। দুইটিতে মিলিয়া জন্ম-রূপ। এই জন্ম কোনও একটা অদ্ভুত মিলিন নহে, পরন্তু ইহা আমাদের সহজ সংস্কার। নিত্যকার প্রকৃতির বিকৃতি না ঘটিলে ইহা সকলেই অন্তরিন্দ্রিয় অনুভব করে। ইহার প্রতিবেশ মধ্যেও ইহার অনুভূতি আছে। পঙ্গু যখন চক্ষু বুজিয়া মানুষের পা চালিয়া যায়, তখন সে যাহা অনুভব করে, তাহারও হয়। বহুদিন পরে প্রবাসী বন্ধুকে আসিয়া যাহা অনুভব করে তাহারও একটা হয়। ব্রহ্মবাদ কি, তাহা না জানিলেও, এই হয় অনুভব করিতে তাহারও বাধে না; জানিলেও কোনও অতিরিক্ত হয় না, বরং ব্রহ্মবাদেরই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই অত্যন্ত সহজ কথাটি ব্রহ্ম-বাদের সহিত যুক্ত হওয়ায়, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ব্রহ্মের উপনিষদ্ উপলব্ধি থাকায়, যদি উহা অপাংক্তেয় হয়, তবে তাহা খুবই দুঃখের বিষয়। প্রত্যেকটি মনঃসমীক্ষণে ইহার উৎপত্তি-কারণ যাহাই নির্ণীত হউক না কেন, এই অনুভূতিটি সত্য, এবং ইহার প্রকৃতিও আমাদের পরিচিত। ইহারই তীব্র প্রেরণা মানুষের চিত্তকে সক্রিয় করিয়া তোলে এবং একটা প্রত্যক্ষ কিছুর মধ্যে আপন পরিচয়টি রাখিয়া দিতে চায়। বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রে এই আনন্দের আদি রূপটির নাম উজ্জ্বল রস, কারণ ইহা জড়বৎ বিদ্যমান মানুষকেও উজ্জ্বল, — তাহার অন্তরকে দীপ্ত করিয়া তোলে। কবিতায় বিষয়বস্তু থাকাই হউক না, কবিতা হইতে হইলে, আমার — অর্থাৎ পাঠকের অনোভাব স্বীকার করিতেই হইবে; নিজস্ব আবেদনের দ্বারা আমার মনে চমৎকৃতি করিতে হইবে। সত্যকার কবিপ্রাণের স্পর্শে কি করিয়া বাস্তবও যথার্থ কাব্য হইয়া উঠে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত বাংলাসাহিত্যে আছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাংলার আধুনিক কবিতার সম্বন্ধে এখনও কিছুই বলা যায় না। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর কবিদের সাধনা যখন পরস্পরের পরিপূরক হইবে, এবং তাহাতে সত্যকার প্রাণের প্রেরণা যুক্ত হইবে, তখনই হয়ত ইহার সত্যকার রূপটি দেখা দিবে। কিন্তু তাহার পূর্বে প্রয়োজন —

জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখিতে নূতন রূপে বরণ করিবার সাহস ; সমাজ ও সংস্কারের শতপাকে আবদ্ধ মানুষের সহিত গভীর সহানুভূতি ; মানব-আত্মার অন্ধকারময় গুহানিকায় অন্তরতর দৃষ্টিপাত করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এবং সেই সঙ্গে গভীর রসানুভূতি ও সহজ প্রকাশ-ক্ষমতা। কিন্তু সে কবি এখন কোথায়? হয়ত তিনি পরে আসিবেন, কিম্বা বর্তমানের এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই কোথাও আত্মগোপন করিয়া আছেন।

'বউ কথা কও'

শ্রীসত্যেন্দ্র জানা

ভোরের আলোয়—'বউ কথা কও'
ডাকছি পাখী—কুলি না যে,
রক্ত বসন—সারদে রঙে
বউ বেরলো—দিনের কাজে ;
রাত-ভোর সে—কইলো কথা—
ও পাখী, —তুই ছিলি কোথা ?
রসিক ভারী ! —ভোরের আলোয়
ডাকতে এলি—বউয়ের লাজে।

খোকন ডাকে—মিঠাও ডাকে
ডাকে 'খুকু'—ভোরের আলোয়,
খোপটা বউয়ের, —খসবে না তায়
সাধলে নেবে—আলোয় আলোয় ;
তুই যে রসিক—ডাকলে ভোরে
খোপটা বউয়ের পড়বে সরে'
ভাববে যেন পাগল-করা
কানুর বাঁশী খোপায় বাজে ;
রাতের কথা বেফাঁস করা
"বউ কথা কও"—তোর কি লাজে !

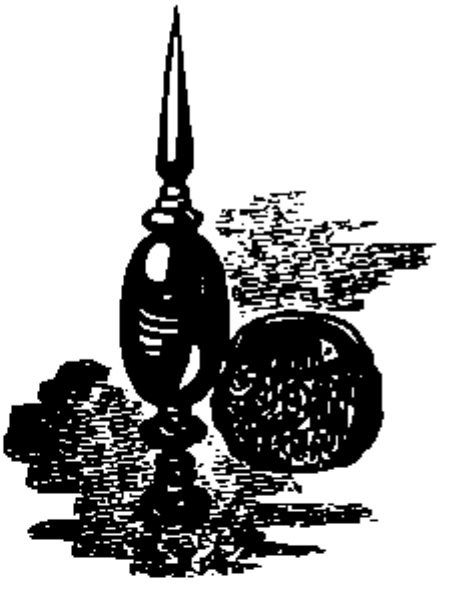

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া খাঁটি কাব্যরস বিতরণ করা হইবে—যে-রস সর্ব্বকালের রসিকসমাজ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাভাষার কাব্যরসও বটে। একালের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের পরিচয় নাই। 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

(১)

গৃহলক্ষ্মী

প্রিয়ে, কি সুখ আমার মূরতি তোমার!
সবা যেন হাসিতেছে আলয় আমার!

সবা যেন ঘরে ঘরে,
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে বেণু-বীণা বাজে লাগলয়!
ধায়ে হরষ-ভরে,
কল-কোলাহল ক'রে,
হাসে খেলে চারিদিকে কুমারী কুমার!

হ'য়ে কত আয়াসন,
করি সব আহরণ,
ঘরে এসে উলে যায় হৃদয়ের ভার!
একমনা একাসন,
তুমি শুভ শতদল,
ফুটিতেছ চল চল সম্মুখে আমার!

কুমা কুমা ছুরে যাবি,
মোর ঘরে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার !—
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ সে এ বহুরতী যার খুশী তার !

---

(২)

নারী-মঙ্গল

জানি আমি, নারী, তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কায় পরাবলী —
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে ধরি কি তাহার !
গানের মুরলীসম শব্দের ঝাঙ্কারী !
উপমার কালিদাস, অর্থের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা !)
হেরি' সখি ! মুগ্ধ হয় মুগ্ধ চেতনা ;
নাচিছে উর্ব্বশী যেন বাসন্তী-নিশোলা !
কিন্তু যবে হেরি সখি ছন্দ-ভঙ্গিমার
অর্থের মধুরতর চিকণ মহিমা —
তাহের সে সমাবেশ, (রস উথলায়,
পদে পদে — চারুতার গুপ্ত গরিমা !)
মুগ্ধ হয় বুদ্ধি মোর, সবে না গো বাণী !
কবির এ কল্পনা কেমনে বাখানি ?

সুকেশিনি, সুহাসিনি, চন্দ্রবদনি,
হে সুন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্ব্বরী
পতি-পাশে (ফুলে যথা ভ্রমরের রমণী)
যাও অর্দ্ধযামিনীতে — আনন্দ-লহরী
জাগাতে প্রমোদ-কক্ষে, মধু-বিলাসিনী
অভিসারিকার বেশে — নূপুর গুঞ্জরি
বাজে যবি ; বাজে যবি কণক-কিঙ্কিণী
গুঞ্জরি ; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি বধূবরী !
কি উৎসব ! হাসে দীপ ; হাসে নেত্র-তারা ;
হাসে অলকের পুষ্প ; কণকে কণকে
হাসে তব চারুচেলী ; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে !
রূপে তোর পতি তব, তোমার সুষমা
পান করে শত নেত্রে, অয়ি মনোরমা !

তাই সখি, তোমায় ও রূপ-কক্ষে বসি
থাকি আমি দিবানিশি। লোকে বলে
"এ কি !
নির্জ্জনে কেমনে থাকে ?"—হে কবি-প্রেয়সি,
বুঝাব এবের, এরা বুঝিবে তবে কি !
তোমার সকাশে যার সে কি গো নির্জ্জন !
সহস্র সমিতি সে যে, সভার আহ্বান,
সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
সহস্রের সাথে সে যে আদান-প্রদান !
তুমি একা কথা কও ! —দু' চক্ষু চঞ্চল
কথা কয় ; কথা কয় প্রফুল্ল অধর,
কথা কয় শত মুখে কেশের কুন্তল —
কারে উপহার ! হয় বিস্ময়-বিহ্বল।
কি উৎসব ! রূপ-রাজো এ কি মহোৎসব।
এ কি তব অঙ্গে-অঙ্গে হর্ষ-কোলাহল !

আলুথালু কেশপাশে, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে ; বাম পৃষ্ঠদেশে
ছুটিতেছ চতুর্দিকে ! জান না বন্ধন,
দুর্নিবারা যৌবনতা ! পাগলিনী-সাজে
ধাইয়া করিছ কাজ ! যেন মেঘমাঝে
প্রাবণের সৌদামিনী ! বিদ্যুৎ হরিণী
যেন বনমাঝে ! উল্কা যেন রশ্মিণী !
উদাও অস্থির তব নারী-মূর্তি মাঝে !
হে নারী ! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তব কি বন্ধন ! হায় কি ঘোরা-দৃশ্যনা
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অযোগ্য-বিহরে !
চকিতে পাশিয়াছ, অয়ি সুমঙ্গলা !
সুখাদির, নিয়ন্ত্রিত রাজচক্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হ'তে তোমার ও নারী-মূর্তি মাঝে !

হে মোহিনী শিকারাত্রী ! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন মাঝে ! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে তাহারে, তার চক্ষে নিদ্রিনী
দিয়া আসিছ টানিয়া ; বন্ধ এ বন্ধন !
নয় — না উন্মাদিনী কবির প্রেয়সী ;
তিমিরসুতের মুখে যামিনী যেমনি
ফুটায় চক্র-কুসুম, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা !
ঢালিয়াছ জ্যোৎস্নার শান্তির সাগরে,
ঘোরা তমস্বিনী নিশি, রহিছে ফটিকা,—
কবি-চিত্ত-ব্যোমভূমে সৌন্দর্য্যের শিখা
কে জ্বালিল ? হে যামি, মোহিনী মূর্ত্তি ধ'রে
'শান্তি, শান্তি' উচ্চারিলে, আইল অমনি
শান্তির-সদনে, সখি, অর্দ্ধ-মুকুলনী !

নিরালাকে ছিল সখি প্রেমের নগরী ;
ছিল না উৎসব ; যত ঐশ্বর্য্য বিভব
ছিল গুপ্ত ; মানসের পুষ্পতরু সব
ছিল শুষ্ক ; নিরাময় ঘুমেতে সুন্দরী !
তুমি এলে একদিন রাজরাণী-প্রায় —
জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী !
সে কি কি ঘুমিয়াছি ? তোলা কি সে যায় !
এস সখি, আজি তোমা অভিষেক করি ।
ধর ধর ছত্র-দণ্ড, রাজরাজেশ্বরী ! —
বিপুল ভাবের রাজ্য, অফুল্ল, বিরাট !
বিচিত্র-সুন্দর-আলোকে তোরণ-কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অশনী
বসিছে সাদরে ; গায় সত কবি
তোমার বন্দনা-গীতি, হে বন্ধ-সুন্দরী !

(৩)

ছায়া-সঙ্গিনী

সুখে দুখে ছিল চিরসাথী,
জগৎ-ভুলানো জ্যোৎস্নারাতি !
জীবনের দীর্ঘতম-স্বপন।
আশাবাসে হারায়ে — হারায়ে
নিরাশিস আমাতে হারায়ে,
প্রতিদিন-অভ্যাস মতন।

পড়ে' আছে মরমে বরন —
অলক্ষ্যেতে করি আলাপন ;
সেহে স্নেহ, নাহিক লালসা।
ছুঁয়ে দেখি, প্রাণে প্রাণ যেন —
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন !
একি আশা ভাবনা ভরসা।

যখন যা করেছি যখন —
আসে ভাসে করি' আয়োজন,
অপেক্ষায় রহিত বসিয়া।
ক্ষুদ্র সুখ, তুচ্ছ ঘটনা —
যখনি হয়েছি অন্যমন,
অমনি গেয়েছে নিশিদিয়া।

ভোরে আসি বিদায়ের রাতে —
পিছনে বসিয়া পাখা হাতে,
নাহি নিদ্রা, নিমেষ নয়নে।
স্বপ্নে যদি কভু কাঁদিয়াছি,
জাগিয়াছে, — "ঐ কাছে আছি ;"
স্নেহে মর্ম ভুলায়ে স্বপনে।

ঘর ছার জগৎ সংসার,
সকলি — সকলি ছিল তার !
আমি নিত্য অতিথি নূতন ;
নিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই,
গৃহপানে কভু চেয়ে রই —
অনায়াস নিবেদ যেমন !

নিত্য জনে কি হীন উদাস !
নিত্য প্রাণে কি ক্ষুদ্র বিশ্বাস !
লোকে সুখে কি ঘিরে সাধনা !
কত শক্তি আপনে বিপরে !
কত শোভা গৌরবে সম্পদে !
ভুলে ভ্রমে দীনের আর্চনা।

---

(৪)

সর্বার্থসাধিকা

এ কুসুমে এ কুসুমিতে, যে সুষমা, যতেক সুষমা,
অঙ্গে অঙ্গে ছুটাইয়া পাবনের আনন্দ-নির্ঝর।
মোহিয়াছি পল্লবোষে ফোঁটা ফোঁটা মধুর প্রায়—
সুরভিত গন্ধ'পরে কালো আঁখি যেমন বুলায়।

হে কবিতা, এ পরিচয় করিনাক প্রয়োজনের,
তোমার অক্ষয় ঘটে স্বর্ণ-শত ঘরে নিরন্তর।
তিমিরীর নিশ্বাসের উচ্ছলে তুচ্ছ গণিবারে,
উদার তোমার চিত্ত, তৃপ্তি নেই — বিত্ত যা' না পারে।
চলিছ প্রবাস-দূতী, বেশ-ধীরা — হাস্ত-অশ্রু-ভারে,
এ কুটীরে তোমা রাখি? বিশেহারা কবিরে যে দাসে?

তপস্বিনী বাণি মোর, এ দুর্দিনে করিনাক ভয়,
দুটি ধরি গৃহকুঞ্জে আসিয়াছ কল্পনার ছবি।
শুভরি' উঠিল প্রাণ, কিংশুকেও অর্পিবে সৌরভ।
কল্পলতা! চাহিতেছ অঙ্কুরের কাব্যের বৈভব।
বিশ্বের বেদনে তুমি নব-প্রাণে নবীন আলোকে,
মন্ত্রীরের তালে তালে, ছন্দ নাচে আপন পুলকে।

হে বিমলা পুণ্যশীলা, এ পরিলে করেছ নির্মল;
প্রেমে সংযত ধীর করি' মোর বা ছিল চপল।
সম্বরনে, সন্ন্যাসীপে, তব শুভ করুণ-নিঃশ্বাসে,
পুনরায় উথান হলো অন্তঃপুরে কল্যাণের সনে।
পবিত্র মহিমাময়ী জ্যোতির্ময় তোমার নয়ন
প্রতি পদক্ষেপে মোর সাথে থাকি করিছে শাসন।

---

(৫)

শেষ আসরে

বসিয়াছ তুমি অন্তরালের
আধার তলে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায়
সোহাগ-ছলে;
প্রভাতে প্রদোষে দুখে সুখে মোর
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণকরা তরুণপরা
দু'খানি করে —
এস, সখি, আজ যৌবন-স্মৃতি
শেষ-আসরে।

মনে পড়ে সেই মধু-যামিনীর
দীপিকা দিয়া
চলে' গেছ, প্রিয়া তুঙ্গ-যামী
চকিতিয়া।
মাথার উপরে জোছনার-পরী —
পারুল-হাসে বলিছে, ছলনি,
ছপালি-আলোর আলিপনা-আঁকা
বেদীর প'রে —
ধ্যানের মাঝে প্রীতি-পারিজাত-
মেখলা পরে'।

কতদিন সেই কাঁপারে কাঁকণ
ঝলিকা দয়,
চাষির 'হিং'ট' বাজারে আসিতে
দুপুর যয় ;
হেরেছি প্রতিমা — শ্রীতি-ছলছল,
লাজ-সঙ্কোচে নুয়িত অঙ্গ,
পরশি' অধরে পিতৃর অধর
ধাঁড়াতে ঠেলে' ;
লুটিত আঁচল নীলাম্বরীর
চরণে এসে'।

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
'দন্ধা' দিতে,
মাটির 'দেউটী' বরষে চাকিয়া
আঁচলটিতে ;
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল, —
চোখোচোখি হোতে ধাঁড়াত্ব থমকি'
পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত
দেউল মাঝে।

হেরে, সখি, সেই বিবাহ-তারা
জেগেছি আজো,
তালিক-ফুলের রঙটী কপোল'
মেঘের কোলে।
খেলাঘর ভরি' উঠে কলরব,
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব —
মিছা পরিষের চতুর্দোলায়,
উলুর রবে ;
জীবন-উষায় বিনোদ-ফুলায়
সেজেছে সবে।

আজি, পূর্ণিমার কৌমুদী তুফান
দেখে গো সখি'
মুখ-মরম বন্ধু সখিদে
উঠেছে ভরি'—
আগে যা' বুঝি নি আজি তা' বুঝেছি,
কাছে যা' ছিল তা' স্বপনে খুঁজেছি,
দু'জনে মোহার হৃদয়ে মিশেছি
পুলকভরে —
এস সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
মেলা-বাসরে।

---

(৬)

নব-পরিচয়

কার যৌবনে ঢেকে এলে তনু ?
আজ তাও পুনঃ কে লয় টানি' ?
যা' ছিল তোমার — তাই নিতে মোরে
কেন চিরদিন প্রয়াস, রাণী ?
আজি নিশিশেষে ব'লে মুখোমুখি
নব-পরিচয় হৃদয়ে ল'য়।
নূতন করিয়া গুঠন তুলি'
মিলাবো নয়ন নয়নে তব।

আজি দূর হ'তে বড় কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি' আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে নেল কি ঘুরে ?
কোন্ গহনের মধুপর পাখি
মোর আঁখি হ'তে উড়িয়া চলে ?
শুধায়ে তারা তব যাদুকে
তোমার অচেনা পুষ্পবনে।

কোন্ অলকের ঠৈত্তি-কমল
ও-কপোলতলে শুকায়ে উঠে ?
কোন্ পরশে পরশমণির
সরসী উছলে মুকুতা ফুটে ?
কোন্ সেফালির একটি রাতের
দীপালী নিবিছে ওঠাধরে !
কোন্ বকুলের একটি বাসর
ওই কেশপাশে কুরিয়া ঝরে !

এ বারের মতো শিরীষ কুসুমে
কোন্ তনু ও-রোমকূপে !
এবারের মতো কুলান্ কুহায়
কোন্ চুম্বক তোমায় ছুঁয়ে !
কোন্ কুরঙ্গীর কুহু কুহু কুহু
কেড়ে আনে তব কণ্ঠ-আড়ে ?
কোন্ সে চাঁদের মধু-পূর্ণিমা
তোর হ'য়ে যায় ও-তনুপাতে ?
অজানা বধূর, তারই তুলাতে
বহ সখি কার গন্ধবোঝা ?
তাই বার বার কুঞ্চে তোমারে
ঘনে আর কারে পুংসবা ।

আমরা দুজনে চলেছি যদিও
অনাদি মুকের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের যাত্রাপথে পথে
কেবি কেঁদে কেঁদে যাচক খোঁজা ?

তোমার আঁখিরে ঘিরিয়া পলক,
আমার মাথার সুধায় ভরা,
দুধায় দুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনে এ ওর জ্বালা ।
রেখে চলো তুমি — চাই সুধা চাই ! —
ঘরে ঘরে ছুটে তৃষিত আঁখি,
আমি রেখে চলি — চাই সুধা চাই ! —
ফিরে করে' আসে সুধার ফাঁকি ।
নূতন বোঝায় মাথা ফেরে যায়,
চলে যে চরণ, চলি কি মতে ?
অন্তরে অন্তরে বরাবরি ক'রে
ফিরনের বোঝা নামাস্ পথে ।

অসীম পথের নূতন পাথে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি',
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস্,
আমি বিসুরে চাহিয়া থাকি ।
পথপাশে বসি' অনেক ভিখারী,
ওঠে কলরব বোঝের বেরি'—
চাই সুধা চাই, চাই সুধা চাই —
নূতন ভাণ্ডে পুরাণো কেরি ।

বন্দী হ'য়ে আছ তুমি সুদূর মেঘে,
আমি গৃহলক্ষ্মী, এই ভবন-ভবনে
এই দুঃখ-ভৈক্ষে ভরা মানবের স্নেহে ;
তাই দুটী বাহুপাশে তুলায়-বন্ধনে
সোনার কলসটী বহিতেছ স্নেহে —
শুভ ক্ষিপ্র, নিখিলের নয়ন-রঞ্জন !

— রবীন্দ্রনাথ

জল্লাদ

[বিখ্যাত ফরাসী লেখক Honore de Balzac-এর প্রসিদ্ধ গল্পের অনুবাদ। গল্পটি এতই প্রসিদ্ধ যে, বোধ হয় অনেকেই ইতিপূর্বে পাঠ করিয়াছেন। তথাপি, 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য আমরা ইহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত করিলাম। এরূপ গল্প বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ।]

(১)

ফুল দেখা শহরের ঘড়ি-ঘরে এই মাত্র রাত্রি দুই-প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। দুর্গ-প্রাসাদের উচ্চ ভূমিতে, উদ্যানের অপর প্রান্তে, জনৈক তরুণ ফরাসিস সেনা-নায়ক প্রাকারের উপরে ভর দিয়া যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। সৈনিকের চিন্ত-ভাবনা-হীন জীবনে এইরূপ চিন্তামগ্ন হওয়া স্বাভাবিক নয়, তথাপি, আজিকার ঐ রাত্রি এবং এমন স্থান ও এমন দৃশ্য যে ভাবোদ্রেকের বিশেষ অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মাথার উপরে মেঘহীন নীল আকাশের গম্বুজ। নিম্নে যে রমণীয় উপত্যকাভূমি প্রসারিত রহিয়াছে, তাহার পথগুলি জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়া গিয়াছে; পাশের সেই গাছগুলির উপরে তারার অস্ফুট আলো ও ঘন চন্দ্রকিরণ পড়িয়াছে; যুবক সেই দিকে চাহিয়া ছিল। নিকটে একটি কমলা-লেবুর গাছে অজস্র ফুল ধরিয়াছে, সে তাহারই গায়ে হেলান দিয়া প্রায় একশত ফুট নীচে ফুল শহরটি দেখিতে পাইতেছিল। যে পর্বতের উপরে এই প্রাসাদটি নির্মিত হইয়াছে, ঐ শহর যেন উত্তরের হিম-বায়ু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাহারই আড়ালে, পরমসুখে আশ্রয় লইয়াছে। ফুল কিনারাইতেই অদূরে সমুদ্র দেখা গেল, সেই চন্দ্রালোকে তাহার তরঙ্গমালা যেন বেলাভূমির প্রান্তে একটি রূপার পাড় বুনিয়া চলিয়াছে।

ভিতরে নৃত্যগীত চলিতেছিল। আনন্দের কল-গুঞ্জন, অস্ত্রশস্ত্রঝঞ্ঝনি, বেহালার সঙ্গীত, এবং সৈনিক-কর্মচারী ও তাহাদের নৃত্যসঙ্গিনীদিগের উচ্চ হাস্য, দূরাগত সাগর-তরঙ্গের সহিত মিশিয়া, তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। দিনের প্রচণ্ড উত্তাপে অবসন্ন হইয়া, এখন রাত্রির শীতল স্পর্শে সে যেন একটু সঞ্জীবিত হইয়াছে; স্নিগ্ধ-সুরভি বায়ুপ্রবাহে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া তাহার অঙ্গ যেন জুড়াইয়া যাইতেছে।

দুর্গের যিনি অধিপতি তিনি এই দেশের অভিজাত-কুলীন প্রধানদিগের একজন; প্রাসাদে তিনিই সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। ঐ পরিবারের ছোটা কন্যা আজ সারা বিকাল ধরিয়া, এই যুবা-সেনা-নায়কটিকে যেরূপ চোখে-চোখে রাখিয়াছিল — হয় ত' তাহার সেই অবলা-জাতির দৃষ্টি স্বভাব করিয়াই — যুবক এমন উন্মনা হইয়াছে। কন্যা ছিল অনিন্দ্যসুন্দরী। যদিও তাহার আরও এক ভগিনী ও তিন ভ্রাতা বিদ্যমান, তথাপি লেবাকেসের মার্কুইস যেরূপ বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকারী, তাহাতে কন্যা যে তাহার বিবাহকালে প্রভূত যৌতুক পাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি! কিন্তু সারা স্পেনদেশে যাহার মত উৎকট আভিজাত্য-গর্ব আর কাহারও ছিল না, তিনি যে পারী-শহরের এক দুর্গীর পুত্রকে কন্যাদান করিবেন এমন অসম্ভব আশা সে পোষণ করে কেমন করিয়া? ইহার উপর, ঐ পরিবারের কলাধী-বিদ্বেষও কম নহে। মার্কুইস যে দাদা ফেরদিনান্দের পক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, এমন সন্দেহের কারণও ছিল; পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের অনেক ঐ মার্কুইস ভিন্ন আর কাহারও আদেশ মান্য করে না। উহাদিগকে দলে সহজে টানিবার জন্যই

প্রধান সেনানায়ক ডিক্সন মার্শি অধীনে একদল সৈন্য এই মেঘা-শহরে মোতায়েন রাখিয়াছেন। তিনি মার্শাল নে'র শ্রেণির এক পত্রে অবগত হইয়াছেন যে, ইংরাজেরা অবিলম্বে সমুদ্রকূলে অবতরণ করিবার চেষ্টায় আছে, এবং মার্কুইস বাকি খোপনে লন্ডনের মন্ত্রীসভার সহিত বার্তা-বিনিময় করিতেছেন।

সেনানায়কের ডিক্সনের সেনাদলকে যথারীতি লাহরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল; তথাপি অতিথির সতর্কভাবে থাকিতে হয়। প্রাসাদের সেই উদ্যানের উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া সে আবার একবার নিম্নে শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিল। ঐ ভূমির কিনারার দিকে যাইতে যাইতে সে একবার ভাবিল, মার্কুইস যে তাহার সহিত এমন সদয় ব্যবহার করিতেছেন, তাহার অর্থ কি? অর্থ, চারিদিকে যখন এমন অশান্তি বিরাজ করিতেছে তখন সেনাপতি 'কি'-ই বা কেন এত দক্ষিণ ও উদার হইয়া উঠিয়াছেন? কিন্তু তখনই তাহার চিন্তাধারার পরিবর্তন হইল — আবার সন্দেহ ও সতর্কভাবে জাগিয়া উঠিল। সন্দেহের কারণও ঘটিয়াছে। সহসা তাহার মনে হইল, নীচে নগরমধ্যে অনেক আলো জ্বলিতেছে। যদিও ঐ দিনটা ছিল স্পেনবাসীদের একটা পর্বদিন, তথাপিও সে প্রথমেই আদেশজারী করিয়াছে যে, একমাত্র দুর্গ-প্রাসাদ ভিন্ন আর কোথাও বেশি আলো জ্বলিবে না; সামরিক বিধি-অনুযায়ী সকল আলোকই একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিবাইয়া দিতে হইবে। সে দেখিল, সৈনিক প্রহরীগণ নিজ নিজ স্থানে পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে; এখানে ওখানে তাহাদের সঙ্গীনের ফলকগুলি চকমক করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু নিম্নে শহরে একটা সন্দেহজনক নিস্তব্ধতা। ঐরূপ আলোকে সত্ত্বেও, স্পেনীয়গণ যে উৎসবের আমোদে মত্ত হইয়াছে, এমন বোধ হইতেছে না। সে কিছুক্ষণ ধরিয়া নগরবাসীদের এই অদ্ভুত অবাক-করার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রহস্য যেন ক্রমেই আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। আরও কারণ, সে তাহার অধীনস্থ কয়েকজন কর্মচারীকে, নগরের অবস্থা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার আদেশ দিয়া আসিয়াছিল — যেন তাহারা সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সব খবর রাখে। শহরে প্রবেশ করিবার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী যে পথ, তাহার মুখে একটি ছোট পাহারা-ঘর ছিল। সে এখনও ফিরে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য, যৌবনসুলভ অধীরতায়, দেওয়ালের একটা ফাঁক দিয়া লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল, কারণ দ্বার-পথে যাইতে হইলে বিলম্ব হইবে। ঠিক সেইসময় পশ্চাতে একটা মৃদু শব্দ শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, মনে হইল, যেন উদ্যানের প্রস্তরাকীর্ণ পথের উপরে কোন রমণীর লঘু পদক্ষেপ শোনা যাইতেছে। সেই দিকে ফিরিয়া সে কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চক্ষু সমুদ্রের দিকে চাহিয়া যেন ধাঁধিয়া গেল। অকূল জলরাশির সে কি অপূর্ব প্রভা! পলকে যাহা দেখিল, তাহাতে নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না, রক্তস্রোতের মত শুম্ভিত হইয়া গেল। শুভ্র চন্দ্রালোকে সিন্ধু পর্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই আলোকে সে অতিদূরে সমুদ্রবক্ষে কয়েকটি জাহাজের পাল স্পষ্ট দেখিতে পাইল; দেখিয়া তাহার সারা দেহে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে নিজেকে বুঝাইতে চাহিল যে, অস্তিকূল জলরাশির উপরে চন্দ্রকিরণ পড়িয়া ঐ রূপ একটা মায়াময় ছলনা করিতেছে। এই কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে শুনিতে পাইল, কে যেন তাহা-দলার তাহাকেই ডাকিতেছে। দেয়ালের ফাঁকটার দিকে চাহিয়াই দেখিতে পাইল, একজন সিপাহীর সঙ্গীন তাহার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছে, — দেখিয়াই চিনিতে পারিল, সে তাহারই অনুচর এক বন্দুকধারী সৈনিক।

"এখানে কি আপনি? — সেনানায়ক মহাশয়!"

"হাঁ, কি ব্যাপার বল দেখি ?"—অধিনায়ক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কারণ একটা বিপদের আশঙ্কায় সে অতিশয় সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে।

"নীচেকার ঐ বাঁধীর বাচ্চাগুলা যেন পোকার মত নিঃসাড়ে চলাফেরা করিতেছে। উহাদের উপর নজর রাখিয়া আমি একজন টহল দিতেছিলাম, এখন আপনার আদেশমত কিছু খবর লইয়া আসিয়াছি।"

"বলিয়া যাও।"

ঐ মাত্র দুর্গ-প্রাসাদের একটা লোক শহর হইতে এদিকে আসিতেছিল, আমি তাহার পিছু লইয়াছিলাম। লোকটার জিনিসটাই বড়ই সন্দেহজনক—বিশেষ, এত রাত্রে, ঐ বর্বরগুলির বাড়ি আলাইবার কি সরঞ্জাম পড়িল ? মনে মনে ভাবিলাম, বেটারা কি আমাদিগকে নাকাল করিবার মতলবে আছে নাকি ? তখনই লোকটার পিছু লইলাম। ভালো কাজটা করিয়াছিলাম, তাই এখান হইতে হাত কয়েকের মধ্যেই, এক জায়গায় এক রাশ শুকনা কাঠ জমা করা রহিয়াছে—দেখিতে পাইলাম।"

হঠাৎ নীচের শহর হইতে একটা ভীষণ তীব্র আওয়াজে লোকটার কথা বন্ধ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সেনানায়কের মুখের উপর একটা আলোকের ঝলক লাগিল, এবং বন্দুকধারী সিপাহীটা ঝলসিয়া হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে সম্মুখে প্রায় দশ হাত দূরে একরাশি কাঠ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভিতরে নৃত্যলতার সঙ্গীত ও হাস্যকলরব নিমেষে স্তব্ধ হইয়া গেল—কেবল মুহূর্তের আর্তনাদ সেই মৃত্যুবৎ নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। তাহার পর সম্মুখের শুভ্র বারিরাশির উপর দিয়া কামান-গর্জন ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

(২)

সেনানায়কের ললাট ঘামিয়া উঠিল। সে তাহার তরবারি ফেলিয়া আসিয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিল, তাহার অনুচরদের সকলেই নিহত হইয়াছে; ইংরেজ-সৈন্যও এখনই অবতরণ করিবে। ইহাও বুঝিল যে, বাঁচিয়া থাকিলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না, হয় ত' কোর্ট-মার্শালের বিচারাধীন হইতে হইবে। সে একবার নীচের দিকে চাহিয়া ঐ স্থানের উচ্চতা দেখিয়া লইল, তাহার পর যেমন ঝাঁপ দিতে যাইবে, অমনি কে তাহার বাহুটা ধরিয়া ফেলিল।

তারা বলিল "এখনই পলাও। আমার তাঁবেদারা আসিতেছে—তোমাকে ধরা পড়িতে হইবে। নীচে ঠিক এই পাহাড়ে উঠিবার পথের মুখে ঘুমানিতোর ঘোড়া বাঁধা আছে—আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করিও না।"

সে তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া দিল। মুহূর্ত কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কিন্তু পরক্ষণে প্রাণ-বাঁচাইবার সহজাত সংস্কার তাহার পৌরুষকে জয় করিল—সে উত্থান পায় হইয়া নির্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল; এক শৈল হইতে অপর শৈলে লাফ দিয়া সে এমন পথ ধরিল, যে পথে পার্বত্য ছাগ ভিন্ন আর কোন প্রাণী চলিতে পারে না। সে তারার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—তাহার ভাইকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিতেছে; তার পর আততায়ীদের পদশব্দও শোনা গেল; কয়েকবার তাহার কানের পাশ দিয়া বন্দুকের গুলি ছুটিয়া গেল। তৎসত্ত্বেও সে পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া পৌঁছিল, ঘোড়াটাও দেখিতে পাইল; চড়িয়া তাহাকে বিদ্যুৎবেগে ছুটাইয়া দিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে, ফিরতে মার্শ'। সেনাপতি 'জি'-র সেনানিবাসে প্রবেশ করিল। তিনি তখন আর সকলের সহিত ভোজনে বসিয়াছিলেন। সেনানায়কের সর্বশরীর অবসন্ন, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে, সেই অবস্থায় সেনাপতির সম্মুখে গিয়া সে বলিল—

"আমার জীবন এখন আপনার হাতে।"

তার পর একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সে সব কথা বলিয়া গেল। সেকেন্ড কীথের সকলে তাহা শুনিল তাহা লইয়া আলোচনা করিল। অবশেষে, সেই জীবন-প্রকৃতি ক্যাপ্টেনের হাত ধরে বলিলেন —

"যে মানুষ শেষ না দিয়া দয়া করাই উচিত। স্পেনীয়দের এই ষড়যন্ত্রের অবাবদিহি তোমাকে আর করিতে হইবে না; আমরা যে যদি অন্তরূপ বিবেচনা না করেন, তবে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।"

এ কথায় হতভাগা সেনানায়ক বিশেষ সান্ত্বনা পাইল না, বলিয়া উঠিল —

"আর, যদি এ কথা সম্রাটের কানে যায়?"

সেনাপতি বলিলেন, "তাহা হইলে তিনি তোমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবেন। তবু দেখা যাক্, কি করিতে পারি।" তার পরেই গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আপাততঃ সে আলোচনা থাক্। এখন ইহার এমন একটা প্রতিবিধান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহার ফলে উহাদের ষড়যন্ত্রের চক্র ভাঙিয়া যায় — উহা যেন সুস্থরীতি মানুষের মত নয়, যন্ত্রপক্ষর মত!"

ইহার এক ঘণ্টা পরে, একটি পুরা রেজিমেন্ট, একদল অশ্বারোহী-সেনা, এবং সহকারীহিসাবে একটি ক্ষুদ্র গোলন্দাজ-বাহিনী পথে বাহির হইয়া পড়িল। স্বয়ং সেনাপতি ও সেনানায়ক ভিকন ইহাদের আগে আগে চলিলেন। স্পেনীয়গণ তাহাদের সহযোদ্ধাদের কি দশা করিয়াছে, তাহা ঐ সেনাদলকে উত্তমরূপে জানাইয়া দেওয়া হইল, যাহাতে তাহারা ক্রোধে আকুল হইয়া উঠে।

দুই ঘণ্টা হইতে বেশীর ভাগের মধ্যে যত বাকি পথ তাহা যেন মন্ত্রবলে শেষ হইয়া গেল। অগ্রবর্তী গ্রাম-গুলা ইতিপূর্বে অধিকার করিয়াছিল, সেই সকল পল্লীর একটাও রক্ষা পাইল না, গ্রামের-গ্রাম জ্বালা হইয়া গেল।

এদিকে ইংরেজের জাহাজ তখনও সমুদ্রে ভাসিতেছে, তীরে পৌঁছিতে পারে নাই। ব্যাপারটি সে সময়ে দুর্বোধ্য হইলেও, পরে জানা গিয়াছিল যে, ঐগুলি আসল ইংরেজী-নয়; ফরাসীরা কামানবাহী জাহাজ দূর সমুদ্রের পশ্চাতে ফেলিয়া অনেক আগে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং মেক্সার অধিবাসিগণ সমুদ্রকে ঐগুলিকেই দেখিয়া যে-সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহা ত' পাইলই না, এই হঠাৎ বিদ্রোহের ফলে সহরসেনার সেই দারুণ আক্রমণ এক মুহূর্তের জন্য রোধ করিতে পারিল না; কিছু করিবার পূর্বেই তাহারা ফরাসীসেনার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইল যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ মেক্সার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিল। স্পেনীয়দের দেশপ্রেম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নগর-রক্ষী ফরাসী সৈন্যকে হত্যা-করার জন্য দায়ী, তাঁহারা এখনে সহরটিকে রক্ষা করিবার জন্য, নিজেরাই প্রাণদান করিতে অগ্রসর হইলেন; কারণ, ফরাসী সেনাপতির খ্রিষ্টান প্রকৃতির কথা তাঁহারা জানিতেন, তাই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তিনি সমুদয় মেক্সা-সহরটাকে অগ্নিসাৎ করিবেন, কামান-যুদ্ধ-বনিতা সকলেরই শিরশ্ছেদ করা হইবে। সেনাপতি 'জি' — তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করিলেন; তবে সর্ত রহিল যে, নিরস্ত্র হইতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময়, দুর্গ-প্রাসাদের সকলকেই নির্বিচারে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। নেতৃগণ এই সর্তে রাজী হইলে পর, সেনাপতি অবশিষ্ট নগরবাসীর প্রাণ রক্ষার, এবং সহরটিকে দাহ ও লুণ্ঠন হইতে অব্যাহতি দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই সঙ্গে একটা বড় অঙ্কের জরিমানাও ধার্য করিলেন, এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহা আদায়ের জন্য, নগরের ধনাঢ্যতম ব্যক্তিদিগকে জামিনস্বরূপ আটক রাখা হইল। নিজ সৈন্যদলের নিরাপত্তা-বিধান, এবং যথাসাধ্য সত্বর সুরক্ষিত করিবার জন্য, তিনি সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেন — সৈন্যদলকে সহরের ঘুরে ঘুরে বাস করিতে দেওয়ার ব্যবস্থাও

না-মঞ্জুর করিয়া দিলেন। তাহারা উত্তুঙ্গ প্রাসাদে রাত্রি-যাপনের আয়োজন করিল।

(৩)

অতঃপর করাসী-সেনাপতি বিজয়ীর বেশে সেই প্রাসাদ-দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সেনাধ্যক্ষের সমগ্র পরিবার ও পরিজনবর্গের মুখ শুকাইয়া গেল। তাহারা সেই সুবৃহৎ বৃত্তাকার কক্ষের পাহারার অধীন হইয়া রহিলেন। ঐ কক্ষের দাওয়ান দিয়া দুর্গ-প্রাসাদের চতুর্পার্শ্ব সমুদ্র উত্তমরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

সেনাপতির শরীর-রক্ষী ও সহকারী সেনানায়ক যাহারা, তাহাদের বাসস্থান ঐ প্রাসাদের বহির্ভাগে একটি ব্যারাকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে ইংরাজ-দিগের অবতরণ বার্থ করিবার জন্য, একটি মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইল। মন্ত্রণার শেষে জনৈক স্বপক্ষচারীকে মার্শাল নে'র নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং সমুদ্রকূলে কামানশ্রেণী বসাইবার ব্যবস্থাও করা হইল। অতঃপর সপারিষদ সেনাপতি-মহাশয় বন্দীগণের সদ্গতি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে দুইশত সেনাবাসীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইল। এই সাময়িক হত্যাকার্য্য সমাধা করিয়া সেনাপতি হুকুম দিলেন, প্রাসাদে যতগুলি বন্দী আছে ততগুলি ফাঁসিকাঠ ঐখানেই খাড়া করা হউক, এবং ফাঁসি-দিবার জন্য, শহর হইতে, ঐরূপ এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনা হউক। এদিকে, ডিউক, ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে যে সময়টুকু পাইয়াছিল, তাহার সুযোগে বন্দীদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে ভয়ে সেনাপতিকে বলিল —

"আমি একটা অনুরোধ ভিক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিলাম।"

সেনাপতি তাহা শুনিয়া একরূপ বিদ্রূপ-তিক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন — 'তুমি!'

"কোন্ মুখেই বা বলি! অনুরোধটাও কম দুঃখকর নয়। বাহিরে যে ফাঁসিকাঠগুলা তোলা হইতেছে, বৃদ্ধ মার্কুইস তাহা দেখিয়াছেন। তিনি প্রার্থনা করেন যে, আপনি তাঁহার ও তাঁহার পরিবার-বর্গের চতুষ্পাশ্বের একটু পরিবর্ত্তন করেন — ফাঁসি না দিয়া যেন তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করা হয়।"

সেনাপতি বলিলেন, "মঞ্জুর"।

"তাঁহার আর একটি প্রার্থনা এই যে, মৃত্যুকালে তাঁহারা যেন স্বধর্ম্মীয় ধর্ম্মের সান্ত্বনাদাতা হইতে বঞ্চিত না হন, আর এখনই তাঁহাদের হাত-পা খুলিয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, কেহই পলায়নের চেষ্টা করিবেন না।"

সেনাপতি বলিলেন "তাহাও মঞ্জুর করিলাম, কিন্তু তুমি জামিন রহিলে।"

"আপনি যদি তাঁহার কন্যার পুত্রটির প্রাণরক্ষা করেন, তবে বৃদ্ধ মার্কুইস তাঁহার সকল সম্পত্তি আপনাকেই দান করিবেন।"

শুনিয়া সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন —

"তাই নাকি! তাঁহার সম্পত্তি ত' পূর্ব্বেই রাজ-দোহের দানে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি একটু চুপ করিলেন, পরে, যেন অবজ্ঞাভরে ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন —

"তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তৎপেক্ষা একটা ভাল মতলব আমি স্থির করিয়াছি। তাঁহার ঐ শেষ প্রার্থনার অর্থ বুঝিয়াছি। আচ্ছা, বেশ; তাঁহার বংশের নামটা যাহাতে বজায় থাকে তাহাই হউক। কিন্তু সেই নামের সঙ্গে স্পেনবাসীরা চিরদিন স্মরণ করিবে — সে কতবড় বিশ্বাসঘাতকের নাম, আর তাহার শাস্তিই বা কিরূপ হইয়াছিল। আমি তাঁহার পুত্রদের যে-কোনটিকে বন্দ ও প্রাণ

ওরই ভিতরে দিতে রাজী আছি—কেবল একটিমাত্র সর্তে, তাহাকেই জাহাজের কাজ করিতে হইবে। ব্যস! আর নয়, আমি আর কোন কথা শুনিব না।"

আহারে প্রবৃত্ত; সামরিক কর্মচারিগণ সকলেই খুশি ও খুসার্ত হইয়া ভোজনে বসিলেন, কেবল একজন অনুপস্থিত রহিল—সে ডিক্সন মার্শ। অনেক ইতস্তত করিয়া সে সেই নূতনাগার প্রবেশ করিল। সে কক্ষ তখন জোয়েফ-পরিবারের দীর্ঘ-খাদে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া দুঃখের ছায়া বিগুণ হইতে লাগিল। কাল রজনীতেও তাহারা এই কক্ষে নৃত্য করিয়াছিল—নৃত্যের ঘূর্ণনে তাহাদের মুখগুলি এক একবার চোখে পড়িয়া তখনই অন্তর্হিত হইতেছিল। এই দুই তরুণী ও তিন তাহার মাধ্যগুলি আজ একটু পরেই দাসত্বের জন্য বিক্রীত হইবে। তিন পুত্র ও দুই কন্যার সহিত তাঁহাদের জনক-জননী বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছেন, বর্ণবন্ধিত ক্রীতদাস তাঁহাদের হস্তপদ বদ্ধ। আর্ল্ট্স-পরিবারের আটজন ভৃত্যও একদিকে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের হাতগুলা পিছমোড়া করিয়া বাঁধা। চতুষ্পার্শ্বে বন্দিত এই পনেরো জন করুণী অতি গম্ভীরভাবে পরস্পরের সহিত দৃষ্টিবিনিময় করিতেছিল। তাহাদের চোখ দেখিয়া বুঝা যায় না, কিন্তুর কি ভাবের উদয় হইতেছে। কিন্তু দুই-এক জনের ললাটে দারুণ ক্রোধমিশ্রিত একটা কঠিন নির্ভীকতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—এত বড় চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।

যে সৈনিকগণ নির্বিকার ভাবে পাহারা দিতেছিল, তাহারাও, মহাসমরে এতবড় দুঃখে সমবেদনা বোধ করিতেছিল। ডিক্সন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, সকলের মুখেই একটা কৌতূহল দীপ্ত হইয়া উঠিল। বন্দীদের বন্ধন মুক্ত করিবার আদেশ দিয়া সে নিজেই তাহার বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া দিল। কুমারী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। সেনানায়ক তাহার মাথাখানি সামান্য একটু স্পর্শ না করিয়া পারিল না—সে তাহার কালো চুল ও কাঁধ কটি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। স্পেনীয় সুন্দরী বলিতে যাহা বুঝায়—ইহারা তাহাই; তাহার গাত্রবর্ণও যেন স্পেনীয় সুন্দরীদের মত, তেমনই তাহার চোখদুইটি তাকের পালকের চেয়ে কালো; সেই আখিতারার উপরে যে পক্ষ্মরাজি শোভা পাইতেছে তাহা যেমন দীর্ঘ, তেমনই ঘুটিল।

সেইরূপ স্নিগ্ধ হাতে ইহারা জিজ্ঞাসা করিল "আর কি প্রিয় হইয়াছে?" কুমারীসুলভ একটি লাজুকী তখনও সে হাসিতে লাগিয়া ছিল। ডিক্সন একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি করিল। তাই তিনটির মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া, একবার ইহার পানে চাহিয়াই পুনরায় সে সেই তিনটি স্পেনীয় তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমটি, পরিবারের জ্যেষ্ঠা সন্তান; বয়স ত্রিশবৎসর হইবে; বর্ণ গৌরচি, গঠন ভাল নহে। দেখিতে উন্নত ও লাস্যিক হইলেও, তাহার চেহারায় বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। দেখিলে মনে হয়, প্রাচীন স্পেনীয় বীরদল যে সুদূরের অন্তরঙ্গিনীর জন্য বিষাদ ছিলেন, এই যুবতীও তাহা আছে। এই জ্যেষ্ঠা পুত্রের নাম—ডনাসিকো। দ্বিতীয় পুত্র ফেলিপের বয়স বিশ বৎসর হইবে; সে ছিল দেখিতে অনেকটা তাহার ভগিনী ক্লারার মত। সর্বকনিষ্ঠের বয়স মাত্র আট বৎসর। কোনও চিত্রশিল্পী, মাতৃস্নেহের সুধাস্পর্শে সেই রোমান-সুলভ মুখশ্রীর চিত্র দেখিতে পাইত, চিত্রকর যাজ্ঞি-অঙ্কিত চিত্রে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে; যে ছবিখানি রোমের প্রথমাস্ত্র-সুলভ নর-নারী দেখাইবার জন্য তিনি আঁকিয়াছিলেন। আর, ডনাসিকো আর্ল্ট্সকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন মুসিলোর আঁকা একখানি চিত্রপট হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। এই সব দেখিয়া,

কিন্তুর দারুণ হতাশার ভাবে একবার ঊর্ধ্বমুখে চাহিল —ইহাদের একজনও নাকি সেনাপতির প্রস্তাবে সম্মত হইবে। যাহা হউক, কোনরূপে সাহস সঞ্চয় করিয়া সে কথাটা ক্লারার নিকটে পাড়িল—শুনিয়া মাত্র তরুণীর দাসত্বের শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মসম্বরণ করিল, এবং উঠিয়া পিতার নিকটে গেল; তাঁহার পদতলে বসিয়া বলিল—

"বাবা, হুয়ানিতোকে শপথ করিতে বলুন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, সে যেন তাহা পালন করে; তবেই আমাদের আর কোন দুঃখ থাকিবে না।"

মার্কুইস-পত্নীর দলন আশায় আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি স্বামীর দিকে একটু ঝুঁকিয়া যেমনি সেই বীভৎস-ভীষণ গুপ্ত-কথাটি শুনিতে পাইলেন সেই মুহূর্তে মূর্চ্ছিত হইলেন। হুয়ানিতো এতক্ষণে সব বুঝিতে পারিল, সে আসন ছাড়িয়া পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত লাফাইয়া উঠিল। কিন্তুর এইবার মার্কুইসের নিকট হইতে পূর্ব-বক্তব্যস্বীকারের প্রতিশ্রুতি লইয়া সৈন্যগণকে, নিজের দায়িত্ব বিদায় করিয়া দিল। তৃতীয়জনকে বাহিরে লইয়া গিয়া—ফাঁসিকাষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইল। যখন গৃহমধ্যে কিন্তুর ছাড়া আর কেহ রহিল না, তখন মার্কুইস আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন—"হুয়ানিতো!"

সে কোন উত্তর না দিয়া এমন ভাবে মাথাটা অবনত করিল যে, তাহাতেই বুঝা গেল, সে ঐ আদেশ পালন করিবে না; তার পর সে বসিয়া পড়িল, এবং অশ্রুহীন চোখে জনক ও জননীর মুখে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি অসহ্য! তখন ক্লারা নিকটে গিয়া তাহার হাঁটুর উপরে বসিল, বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া চোখের পাতার উপরে চুমা খাইল, তার পর প্রচুর কণ্ঠে কহিল—

"হুয়ানিতো! লক্ষ্মী ভাই আমার! তোমার হাতে মরণ সে যে কত সুখের তায়া যদি বুঝিতে! ঐ ফাঁসী-দেওয়া লোকটার অপবিত্র হাত আমার দেহ স্পর্শ করিবে, সে যে আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না! তুমি ত' এইসব দুর্গতি হইতে তোমার বোনকে রক্ষা করিবে!—ভাইটি আমার! কত ভালবাস আমায় তুমি! আর কোন লোক যদি আমাকে লইয়া যায়, তুমি কি তাহা সহ্য করিবে!—তবে!"

এই বলিয়া চতুরা তরুণী তাহার সেই কোমল ভাবণ-চোখে কিন্তুরের দিকে একটা অপূর্ব কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—হুয়ানিতোর অন্তরে তাহার সেই কথাটী-বিষের সে যেন ভাল করিয়া আস্বাদটা দিতে চায়।

ছোট ভাই ফেলিপ বলিল, "ভাই, বুক বাঁধো। নহিলে এত বড় বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না যে!"

হঠাৎ ক্লারা উঠিয়া পড়িল; যাহারা হুয়ানিতোকে ঘেরিয়াছিল, তাহারা সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। এইবার যে পুত্র এতক্ষণ কারণে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে পিতার মুখামুখি হইল।

গম্ভীরকণ্ঠে মার্কুইস বলিলেন, "হুয়ানিতো! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি।"

তরুণ কাউন্টের দিক হইতে কোন সাড়াই মিলিল না। তখন পিতা পুত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা, মাতুলেরা ও ফেলিপ যেন মন্ত্রচালিতের মত, তাহাদের পিতার দেখাদেখি সেইরূপ করিল। সেই বংশের তাহাদের বংশকে মহাবিপত্তির কবল হইতে রক্ষা করিবে—সকলে একসঙ্গে, যেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাহার প্রতি কর-প্রসারণ করিল; এ যেন তাহাদের পিতারই আকুল প্রার্থনার প্রতিধ্বনি।

"পুত্র, তুমি কি তোমার জাতির মান হারাইবে?—সেই অনোবল এবং প্রাণের সেই মহত্ত্বকে বল

কই? আমি কি এমনি করিয়া তোমার সম্মুখে আসু পাতিয়া থাকিব?"—পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গৃহিণী, এ কি আমার পুত্র!"

তখনই স্বাভাবিক মাতৃত্ব যেন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"ও তোমার কথা রাখিবে বই কি।" এই সময়ে হুয়ানিতোর ভ্রূ দুইটী যে ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন — তাহার অর্থ তাহারা খানিই বুঝিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া কন্যা মারিকিতা দুই বাহুতে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিল, তাহার চোখ দুইটি হইতে তপ্ত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালক-বালিকা দুইজনেও তাহাকে অনুসরণ করিল। এই সময়ে ঐ বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া হুয়ানিতোর নিকট লইয়া গেল। তিনিও বুঝিলেন, এ বৃদ্ধ বেশী অধিক দিন বাঁচিবে না। তাহাকে একটা ঔষধ দিয়া, আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য তিনি বাহির হইয়া গেলেন; বাহিরের সেই বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, সেনাপতি তখন খুব সজাগ অবস্থায় নাই; তখনও তাঁহার অঙ্গসজ্জা ভোজনের আসন ত্যাগ করে নাই, সকলে মদ্যপান করিতেছিল। সুরার প্রসাদে তাহাদের তখনও সংজ্ঞা লোপ পায় নাই।

(৪)

প্রায় আরও এক ঘণ্টা পরে সেখানে পরিচারিকা লইয়া নাপিত, সেনাপতি-পরিবারের প্রাতঃকৃত্য দেখিবার জন্য, প্রাসাদের সেই উচ্চভূমিতে আহূত হইল। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা-রক্ষার ভার পড়িয়াছিল একজন সৈনিকের উপর। সে তাহাদিগকে এমন স্থানে ঠেলিয়া দিল, যেখানে জানালাটে সোফেলাখান পরমেশ্বরের পা প্রায় মাথার উপরে আসিয়া পড়ে। সেই স্থান হইতে প্রায় হিলহাত দূরে দুর্গপ্রাচীর স্থাপন করা হইয়াছে,—ঠিক উপরেই শাণিত খড়্গখানি ঝকমক করিতেছিল। পাছে সেই মুহূর্তে হুয়ানিতো বাহির হয়, সেইজন্য একজন জল্লাদও হাজির আছে।

চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু সেই অমানিত শব্দের — সান্ত্রী-সৈন্যের তালে-তালে পদক্ষেপ ও অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সেই গাম্ভীর্যতা ভঙ্গ করিল। তাহার সহিত অন্যরূপ শব্দও ছিল; তখনও সামরিক কর্মচারীগণ ভোজনশালায় বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উচ্চকণ্ঠের হাস্যালাপ শোনা যাইতেছিল; ঠিক যেমন পূর্ব্বরাত্রে, নৃত্যশালায় গীতবাদ্য ও নৃত্যকারীর পদশব্দে সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সকল আয়োজন চাপা পড়িয়াছিল।

সকলেই দুর্গ-প্রাসাদের দিকে তাকাইল, দেখিল — সেই মহামান্য পরিবারের প্রত্যেকে, আসন্ন বীভৎসের যবনিকার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। সকলেরই ললাট স্থির, প্রশান্ত। কেবল একজন, অতিশয় বিবর্ণমুখে অবসন্ন দেহে পুরোহিতের বাহুতে ভর করিয়া আছে। পুরোহিত তাহার কর্ণে অন্তিম যতকিছু সান্ত্বনাবাণী আছে, তাহাই শুনাইতেছিলেন; তাহার দণ্ড যে মৃত্যুদণ্ডের অধিক — সে যে জীবনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে! তখন অপর সকলের মত, জল্লাদও বুঝিতে পারিল, এই একটা দিনের জন্য তাহার কর্ণে হুয়ানিতো করিতে বাকি হইয়াছে। বৃদ্ধ মার্কুইস, তাঁহার পত্নী, কন্যা ও মারিকিতা এবং তাহাদের ছোট ভাই দুইটী সেই ভীষণ স্থান হইতে কিছুদূরে ঘাস পাতিয়া বসিলেন। পুরোহিত হুয়ানিতোকে ধরিয়া সেই স্থানে লইয়া গেলেন। সে যখন খড়্গকাষ্ঠের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন জল্লাদ তাহার অঙ্গাবরণ টানিয়া, অন্তর্নিহিত কিনাইয়া কি বলিল — বোধহয় কাজটা বুঝাইয়া দিল। অতঃপর রক্ষণাবেক্ষক সকলকে এমনভাবে সাজাইয়া লইলেন যাহাতে শিরশ্ছেদ-কার্য্য তাহারও চোখে না পড়ে।

কিন্তু তাহারা যে আছিতে স্পেনীয়, তাই সকলেই নির্ভীকভাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্লারাই সকলের আগে দ্রুতপদে তাহার মায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল —

"হুয়ানিতো, আমার যে ভাই সাহস বড় কম! আমাকে রক্ষা কর — আমাকেই আগে নাও!"

এই সময়ে কে যেন জানালা খুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে শোনা গেল. উচ্চভূমির সেই প্রাচীর-বেষ্টনীতে তাহার পদশব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল — পরমুহূর্তে সেই স্থানে কিছুক্ষণ দেখা গেল। ক্লারা তখন ঘুণ-ঘুষির উপরে তাহার মাথা পাতিয়া দিয়াছে. যেন তাহার স্বপ্নের শ্রীদা কঠিন খড়্গখানাকে চরম আঘাতের জন্য মিনতি করিতেছে।

তাহা দেখিয়া সেনানায়কের ধৃষ্টতার উপক্রম হইল, কোনক্রমে বলপূর্বক করিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ক্লারার পাশে দাঁড়াইল।

অতি মৃদু কম্পিত কণ্ঠে সে ক্লারাকে বলিল. "সেনাপতি তোমার প্রাণরক্ষা করিবেন, যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও।"

স্পেনীয় যুবতী কেবল একবার মাত্র তাহার পানে চাহিল. সে চাহনিতে যেন দর্প তেমনি সতীত্ব গর্ব ফুটিয়া উঠিল। তারপর গম্ভীর-গম্ভীর স্বরে বলিল, "হুয়ানিতো, আর দেরি!"

তৎক্ষণাৎ মাথাটা খসিয়া হুয়ানিতোর পায়ের দিকে গড়াইয়া পড়িল। 'মার্কেসা দা লোপাজে'র (মার্কুইস-পত্নীর) দেহ একটা প্রবল কম্পনে আলোড়িত হইয়া গেল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারিলেন না, কিন্তু যাতনার কোন চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

বালক বাহুবেল তাহার ভাইকে বলিল —

"এইখানে বসি, দাদাদাদি? কেমন, ঠিক হইয়াছে ত'?"

ছোট বোন মারিকিতা যখন আসিল, তাহাকে দেখিয়া হুয়ানিতো বলিয়া উঠিল —

"এই বুঝি মারিকিতা! তুই যে কাঁদিতেছিস?"

"হাঁ, ভাই, — আমি যে তোমার কথা ভাবিতেছি, আমরা সবাই চলিয়া গেলে তোমার কি দশা হইবে!"

ইহার পর দীর্ঘদেহ মার্কুইস নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একবার সেই মুণ্ডহীন দেহের দিকে তাকাইলেন. তাঁহারই সন্তানসমের রক্তে দেহখানা রাঙিয়া গিয়াছে। তার পর চক্ষু ফিরাইয়া তিনি সেই নিস্তব্ধ, নিশ্চল জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অতঃপর হুয়ানিতোর দিকে তাঁহারা দুই কর প্রসারিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন —

"স্পেনবাসীগণ, তোমরা শোন! আমি পিতা — আমার পুত্রকে আমি আশীর্বাদ করিতেছি। এইবার, তুমি — নূতন মার্কুইস! নিঃসঙ্কোচে বরমাল্য কর — তুমি নিষ্পাপ!"

কিন্তু যখন বর্ষীয়সীর বাহুতে ভর করিয়া তাহার জননী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন. তখন হুয়ানিতো এমন হৃদয়-বিদারক স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল — "এ যে আমার মা! আমি যে ঐ বুকের দুধ পান করিয়াছি!" — যে, তাহার সেই চীৎকার শুনিয়া জনতার মধ্যেও একটা অবিশ্রান্ত হা-হা-ধ্বনি উত্থিত হইল; সেই আর্তনাদে অদূর কোরদোভার, গ্রানাডার সামরিকদলের হাতরব সহসা থামিয়া গেল। মার্কুইস-পত্নী বুঝিতে পারিলেন, হুয়ানিতোর শক্তি ফুরাইয়াছে, সে আর পারিবে না। তাই দেখিয়া তিনি নিমেষে নিম্নস্থ প্রাচীর-বেষ্টনীর উপর উঠিয়া নিম্নে ঝাঁপ দিলেন, তাঁহার দেহ পাষাণের তলদেশে আছাড়িয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। দর্শকগণ প্রলয়ধ্বনি করিল. হুয়ানিতো সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

* *

একজন পরম সেনানায়ক — তাহার তখন প্রায় মৃত অবস্থা — জেনারেলকে বলিল, "কিরূপ যার্চ্চ, আমাকে এই প্রদেশের সম্পর্কে কয়েকটী কথা বলিতেছিল — কিন্তু আমি যাহা যাইয়া বলিতে পারি, ইহা আপনার হুকুমে হয় নাই।"

শুনিয়া সেনাপতি 'কি —' একটু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর যাস-খানেকের মধ্যে ফ্রান্সে প্রায় পাঁচশত পরিবারে কান্নার রোল উঠিবে — সে খবর রাখেন আপনি? আপনি কি চান যে, আমরা এইখানে আমাদের হাড় কয়খানি বাস যাইয়া যাই?"

এই বক্তৃতার পরে ভোজনশালায় আর কোন ব্যক্তি — এমন কি নিম্নতন কর্ম্মচারীও — তাহার পানপাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না।

নবীন বয়সে অতুল-কিরণ
অলি' উঠে উৎসাহি',
কিশোর-হাতে কাঁপে সভাতল,
বালক উঠিল গাহি' —
"গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়!"
কথায় সুর চাহি'।
কথা তখন বাম বাহুপাশে
জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে
ছুরী বসাইল বলে। —
"গুরুজীর জয়!" কহিয়া বালক
লুটা'ল ধরণীতলে
— কর্ণবীর।

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি — প্রথম, যে-রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায় অতিশয় মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী — বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিবা-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

শিল্পী ও সমালোচক

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক — আচ্ছা, আমি স্বীকার করছি যে, গ্রীকদের সম্বন্ধে আমি যা' বলেছি ঠিক হয় নি, তুমি যা' বলেছ তাই ঠিক — গ্রীসের আকাশে আলো ছিল আর্ট-ক্রিটিক। আমি তা' মেনে নিলাম; অধিকন্তু সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে একটু ছাবিরও যুক্ত করছি আকাশ, বিচারশক্তির চেয়ে সৃষ্টিশক্তি ঢের বড় — ও দুয়ের মধ্যে তুলনাই হয় না।

খ — ওই যে তুলোকে বিশ্বাস মনে করা — ওটা নিতান্তই যুক্তিহীন। বিচার-বুদ্ধি না থাকলে কোন রকম শিল্পসৃষ্টি হতেই পারে না — অন্ততঃ, যে-রচনার কিছু মূল্য আছে। একটু আগেই তুমি বলছিলে যে, শিল্পী তার স্বপ্ন নির্মাণকারী-বুদ্ধি ও নিজের পছন্দমত, জীবনকে আমাদের চেয়ে নতুন করে সৃষ্টি করে তোলে — তাকে এক-মুহূর্তের একটা পরম-মনোরম

মান করে। তবেই হ'ল, ওই যে যাচাই করে' নেবার শক্তি বুদ্ধি, এবং যাচাই নেবার বিশুদ্ধতা— ওই ত' হচ্ছে মনের একটা বিশিষ্ট কিরণ-বৃত্তি। ওই বৃত্তি যার নেই, সে আবার কলাশিল্পের কোন কাজ করবে কেমন করে'! ম্যাথু-আর্নল্ড্ যে বলেছিলেন, সাহিত্য হচ্ছে 'জীবনেরই সমালোচনা'—বলার ভঙ্গিটা খুব ভাল হয়নি বটে — কিন্তু ওর দ্বারা প্রমাণ হয়, তিনি সকল সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ঐ বিচার-বৃত্তির ক্রিয়াটাও কত গভীর করে' উপলব্ধি করেছিলেন।

আ — আমি হ'লে বলতাম — বড় বড় কবি ও শিল্পীরা এরূপ অজ্ঞানে তাদের কর্ম করে' থাকেন: বলতাম, তাঁরা যে কত জ্ঞানী, তা' নিজেরাও জানতেন না — এমনি এই ধরণ কথাই এক জায়গায় বলেছেন বলে' স্মরণ হচ্ছে।

পি — কথাটা তাই নয়, জানো। সব রকম সূক্ষ্ম কলাকীর্তির সন্ধানে, স্পষ্ট অভিপ্রায়ের বশেই সম্ভব হয়। গান-গাওয়াটা কবির স্বভাব হ'লেই যে কবিরা গান গায়, তা' নয়—অন্ততঃ যারা বড় কবি তাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। কবিরা যে গান গায় তার কারণ, তাদের গান গাইতে ইচ্ছে হয়। চিরদিন তাই হয়ে আসছে। আমাদের একটা ধারণা আছে যে, কাব্যের আদি জন্মকালে কবিরাও খুব, এখনকার চেয়ে ঢের বেশি সরল, স্বতঃস্ফূর্ত ও তাজা ছিল; তার কারণ, যে-জগতে সেই আদিকালের কবিরা বিচরণ করতেন, যে-প্রকৃতির শোভা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হতেন, তার নিজেরই একটা এমন রূপ ছিল যা' আপনা-আপনি কবিতা হয়ে উঠত — কবিকে তার তা একটুও ভেজে-ঝরে' নিতে হ'ত না। কবিতাদেবীর প্রিয় নিকেতন সেই অলিম্পাস (Olympus) এখন বন-তুলসে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; পাহাড়ের উঁচু বাঁকা পাশগুলো তৃণহীন, রুক্ষ, নিষ্প্রাণকল্প হয়েছে; কিন্তু আমরা কল্পনা-চক্ষে দেখতে পাই, সুন্দরী কলা-লক্ষ্মীরা ঐখানে সেই ভূমির উপর বিচরণ করছেন, তাঁদের অমল কোমল পদস্পর্শ দিয়ে আনিমোনি (Anemone)-ফুলের মিশির বুলিয়ে দিচ্ছেন। আষাঢ়, সন্ধ্যাকালে গোধূলির আলোকে সেখানে আপোলো এসে দাঁড়িয়েছেন, মেষপালকদের ছেড়ে গান শোনাবার জন্যে। কিন্তু এসব আমাদের কল্পনা, আমরাই সেই অতিসুন্দর অতীতকে আমাদের মনের-মোহের-মাধুরী দিয়ে রঞ্জিত করি। আমরা ইতিহাস জানি যে, যে সব যুগকে আমরা কবিতার যুগ বলি, তার কোনোটাই সহজ স্বাভাবিকতার যুগ নয়; সেই যুগের যে-সব কলাকীর্তি অতিসহজ সরল স্বাভাবিক বলে' আমরা মনে করি, তা' আসলে অতিশয় সন্ধান-সাধনার ফল। আমার কথা বিশ্বাস কর, আনেই, — এই আত্ম-চেতনা না থাকলে কোন শিল্পকীর্তিই সম্ভব হতে পারে না; আর ঐ সজ্ঞানতারই নাম শিল্পী-মনের কিরণ-বৃত্তি।

আ — হাঁ, তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি — যা' বলছ তা' কতকটা সত্যি বটে। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলো — যেগুলোকে একখানা কাব্য না বলে' কাব্য-সংগ্রহ বলা যায়, কবিদের নামও পাওয়া যায় না — সেগুলো ত' কোনো একজন কবি সৃষ্টি করে নি, বরং এক-একটা জাতির সমবেত সৃষ্টি বলতে হবে।

পি — যখন তারা সম্পূর্ণ এক-একখানা কাব্য হয়

উঠেছে, তখন আর তা' বলা যেতে পারে না ; তখন যে তারা একটা সুসম্বদ্ধ রূপ-রস লাভ করেছে ! কারণ, যার হাইপ নেই তা' আর্ট নয় ; যার অন্য রচনাগত ঐক্য নেই তাকে হাইপ বলা যেতে পারে না ; আর, ঐ ঐক্য মানেই রচনাকারীর ব্যক্তিত্ব। যে-সব বিচ্ছিন্ন উপাদান-উপকরণ ছড়িয়ে ছিল, সেগুলোকে এক ক'রে একটা সুসঙ্গত রূপ দিয়েছে যে, সে-ই ত' তা'কে নতুন করে সৃষ্টি করেছে — যেমন হোমার করেছিলেন, শেক্‌স্‌পীয়র করেছিলেন। সেই সব কথা এক-একটা গানের সুরে গড়ে উঠেছিল ; — যা' একটা পরম-রূপের সৃষ্টি তাই চিরদিনের সৃষ্টি হয়ে উঠল। জীবন আর সাহিত্য এই দুটোর পরিচয় যতই করছি, ততই দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে, যা-কিছু চমৎকার, যা-কিছু বিস্ময়কর, তার মূলে আছে একটা কোন অসাধারণ ব্যক্তি। মনে হয়, একটা বিশেষ কালে জন্মেছে বলেই কোন মানুষ যে বড় হয়েছে তা নয়, বরং সেই মানুষটাই সেই যুগকে বড় করে দিয়েছে। সমালোচনার কথা বলছিল, তাতেই ফিরে আসা যাক। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই। যে-যুগে সমালোচনার অভাব হয়েছে, সে-যুগে, হয় কোন কলাশিল্প ছিল না, নয় যা ছিল তা' অত্যন্ত বিধিবদ্ধ, প্রাণহীন — কতকগুলো বাঁধা-ছাঁচের নকল বা পুনরাবৃত্তি মাত্র। এমন যুগও ছিল, যেটা সাধারণ অর্থে সৃষ্টির যুগ নয় ; সে যুগে মানুষের একমাত্র বাসনা হয়েছে, তার অতীতের জ্ঞানগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার ; সে তখন সোনা থেকে রূপো, রূপো থেকে সীসেকে পৃথক করে' রেখেছে ; দামী পাথরগুলোকে গুণে রেখেছে ; মুক্তোগুলোর নামকরণ করেছে। কিন্তু এমন একটাও সৃষ্টির যুগ দেখা যায় না, যখন সমালোচনা ছিল না। কারণ, সমালোচনাই ত' শিল্পীকে নতুন নতুন রূপসৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়। সৃষ্টির কর্মটা এমন যে, তা' থেমে যায় না, ফিরে ফিরে দেখা দেয়। ঐ যে সমালোচনা-বুদ্ধি, সৃষ্টিকর্ম এর কাছেই ঋণী ; সমালোচনা আছে ব'লেই শিল্পের নিত্য-নূতন পদ্ধতি দেখা দেয়, সমালোচকই শিল্পীর হাতে নতুন নতুন ছাঁচ এগিয়ে দেয়। রেনেসাঁসের সময়ে ফ্লরেন্সে যখন গ্রীকসাহিত্যের পুনরাবির্ভাব হ'ল, তখন ভর্সিটাও তার জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এসব ইতিহাসের কচ্‌কচিতে কাজ নেই — যেমন নীরস, তেমনি ক্লান্তি-ভরা ; মোটামুটি এই বললেই হবে যে, কলাশিল্পের এই যে বিচিত্র রূপ আমরা দেখতে পাই, সে সবই গ্রীকদের ঐ সমালোচনা-বুদ্ধি থেকে জন্মেছে। তবুও, শিল্পের কোন নতুন ধারা যখনই দেখা দিয়েছে, তখনই তা' সমালোচনার উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে। অথচ, ঐ নতুন ধারাটা এল কোথা থেকে ? যে-সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সমালোচনা নেই, তার দ্বারা নতুন-কিছু গড়া হয় না, আর সবই গড়তে পারা যায়।

আ — তুমি বলছ, সমালোচনা-কাজটা সৃষ্টিকর্মের আনুষঙ্গিক — তারই একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ ; আমি এখন তা পুরোপুরি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু যে-সমালোচনার সঙ্গে সৃষ্টি-কর্মের কোন সম্পর্ক নেই, তার সম্বন্ধে তোমার কি মত ? আমার একটা বদ্ অভ্যাস আছে — মাসিকপত্রগুলো না পড়ে' পারি নে ; তাতে যে সব সমালোচনা থাকে তা' একেবারেই অখাদ্য।

সি — আজকালকার সৃষ্টিগুলও তেমনি। এক মহা-প্রতিভা আরেক মহা-প্রতিভাকে এমন

করছেন, এ অপকর্ম আর এক অপকর্মের প্রত্যুত্তরে পরস্পর। তবু, আমি বোধ হয় একটু অবিচার করছি। সমালোচক, সমালোচক বলো — আমি অবিশ্যি উচ্চশ্রেণীদের কথাই বলছি — এই যারা দৈনিক-পত্রিকা কম্ব মাসের পত্রিকায় সমালোচনা লিখে থাকে তারা — যে সব লেখকের সমালোচনা করবার ভার পড়ে, নিজেরা তাদের চেয়ে পণ্ডিত। তাই হওয়াই সম্ভব, কারণ বই-লেখার চেয়ে বই-এর সমালোচনা-করা অনেক বেশি শক্ত — অনেক বেশি পড়াশুনোর দরকার।

অ — তাই নাকি!

মি — নিশ্চয়! যে-কেউ একখানা তিন-খণ্ডে-ভরা নভেল লিখতে পারে; তার জন্যে চাই — জীবন সম্বন্ধেও যেমন, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনি সহজ অভিজ্ঞতা। এ সব বইয়ের যারা সমালোচনা করে তাদের দুর্ভাগ্য হয় এই যে, তাদের কলমে একটা লিখিয়ে ঠিক ধরতে পারে না। যে-লেখার ইংরেজি বলে' কিছু নেই, তার বিচার করা অসম্ভব। কারণ, কখন কখন এমনও শোনা যায় যে, তারা নাকি বইগুলো আদ্যোপান্ত পড়েও না। পড়ে না বটে, পড়া উচিতও নয়। পড়ার দরকারই বা কি? কোন্ মদ কি থেকে তৈরী হয়েছে বা কি ধাতের, তা' জানবার জন্যে গ্যালন্ পান করতে হয় না। আমি এও জানি, এমন অনেক তত্ত্ব লেখক ও চিত্রশিল্পী আছেন যারা সমালোচনা আদৌ পছন্দ করেন না। ঠিকই করেন; তাঁরা যা' লেখেন বা আঁকেন তার সঙ্গে এই কালের বুদ্ধিগত কোন যোগ নেই — না আছে একটা নতুন চিন্তাধারা, না আছে কল্পনা-বিলাসের নূতনত্ব, বা সৌন্দর্যসৃষ্টির একটা নতুন দিক; তাদের সম্বন্ধে কারো কিছু না বলাই ভালো) — তবে সে সব বলবে কেউ মনেও রাখবে না।

অ — কিন্তু মাপ কর, তোমার উচ্ছ্বাসে একটু বাধা দিচ্ছি — সমালোচনার গুণ-গান করতে গিয়ে তুমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। যাই বল না কেন, একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, একটা কিছু করার চেয়ে, তার সম্বন্ধে বলা ঢের সহজ।

মি — কি বলছ? — কাজটা শক্ত — তার সম্বন্ধে কিছু বলাই খুব সহজ? একেবারেই নয়! ও একটা মস্ত ভুল, সবাই তাই মনে করে। একটা কাজ করা বরং সহজ, তার সম্বন্ধে কিছু বলাটাই সবচেয়ে শক্ত। ইতিহাসে যে সব কীর্তির কথা আছে, তার কর্তা যে-কেউ হতে পারে, কিন্তু ইতিহাস লিখতে পারে ক'জন? কর্মের প্রবৃত্তিই বল, আর ফলের আবেগই বল — সেখানে মানুষে-পশুতে কোন প্রভেদ নেই; একমাত্র ওই ভাষা আছে বলেই মানুষ পশুর চেয়ে বড়, মানুষে-মানুষেও ছোট-বড় ভেদ হয়ে থাকে। আর ঐ ভাষাই সকল ভাব-চিন্তার জননী — ভাব-চিন্তা ভাষার জননী নয়। বাস্তবিক, কর্ম কথাটাই সব সময়ে সোজা; মানুষের আর কিছু করবার শক্তি নেই — ওই তাদের একমাত্র গতি। যা অনর্থক, কাজকে অত বড় মনে কোরো না। মানুষ যা' কিছু করে—বাইরের কতকগুলো ঘটনা বা অবস্থার তাগিদেই করে — অবশে, অন্ধভাবে; সেই তাড়নার মূলে আছে যে-শক্তি, তার কোন সজ্ঞানতা নেই। কর্ম যারা করে তাদের কল্পনাশক্তিও নেই — যারা স্বপ্ন দেখতে জানে না, তারাই কর্ম করতে বাধ্য হয়।

অ — সিলবার্ট, তুমি দেখছি, মানুষের সারা

ইতিহাসটাই উল্টো বুঝতে চাও!

সি — মানুষের ইতিহাস যদি পড়তে হয়, তবে সেটাকে আগাগোড়া সংশোধন ক'রে নিতে হবে। যাদের বিচার-শক্তি আছে, তারা এই কাজটাই আগে করবে। মানুষের জীবনকে আমরা যখন পূর্ণ বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে দেখতে পারবো, তখনই বুঝতে পারব যে, যে-মানুষ স্বল্প লাভে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্রহ্ম যদি কেউ থাকে, তবে সে হচ্ছে তোমার ঐ কর্মনিষ্ঠ মানুষ। যে-জমিতে, যে তেবেছিল আমাদায় চাষ করেছে, তার থেকেই আমরা আজকের ফসল পেয়েছি। আবার, আমাদের সুখ-সাধনের জন্য যেখানে সে ধানের চাষ করেছে বলে মনে মনে খুশী হয়েছিল, সেইখান থেকেই নব নব বিষ-ফলের উৎপত্তি হয়েছে। কোন্ দিকে চলেছে সে জ্ঞান নেই ব'লেই ত' মানুষ চলবার পথ খুঁজে পেয়েছে!

অ — তুমি তা' হলে বলতে চাও যে, কর্মের ক্ষেত্রে কোন সজ্ঞান উদ্দেশ্য আছে মনে করাই একটা ভ্রান্ত ধারণা?

সি — তার চেয়েও খারাপ কিছু। আমরা বড় কাজই করি না কেন, জীবন-নায়ক মহাযন্ত্রটি তাকে গ্রাস করে' নিজের কাজে লাগায় — যাকে পুণ্য-কর্ম বলি, তাকে গুঁড়িয়ে একমুঠো ছাই করে' দেয়; যেগুলোকে আমরা পাপ বলি সেইগুলোকেই একটা নতুন সভ্যতা-সৃষ্টির উপাদান করে' তোলে — হয়ত' সে এক সৌন্দর্যময় মহান্ সভ্যতা, যেমন সভ্যতা পূর্বে কখনো ছিল না। কিন্তু মানুষ কতকগুলো কথার দাস বই ত' নয়। এই যে জড়বাদ ব'লে একটা কথা তৈরী করেছে, যার বিরুদ্ধে আক্রোশের অন্ত নেই — জানে না যে, জগতে ঐ জড়বাদই যে সব বিপ্লব ঘটিয়েছে, তারই ফলে মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনা আরও উন্নত ও পরিশুদ্ধ হয়েছে; আবার, পৃথিবীতে যখনই অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়েছে, তখনই তার ফলে মানুষের প্রাণ-মনের বহুবিধ শক্তি হতাশার নিষ্ফলতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে — অতিনব বিদ্যা এক-একটা ধর্মবিশ্বাসের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে মানুষের মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। যার নাম আত্মনিগ্রহ — তার দ্বারা মানুষ শুধু নিজেরই আত্মার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে; আর যার নাম আত্মবলি বা আত্ম-বিসর্জন, সে হ'চ্ছে সেই অতিপ্রাচীন বর্বরযুগের নরবলি-প্রথার রূপান্তর — সেই বস্তুটাকেই পূজো-করা; মানুষের ইতিহাসে এই ভয়ানক বস্তুটার প্রভাব মোটেই কম নয়; এখনও, এই যুগেও প্রতিদিন কত মানুষ বলি যাচ্ছে, দেশে দেশে এর জন্যে যূপকাষ্ঠ পোঁতা হয়েছে। পুণ্যকর্মই বটে। কিসে পুণ্য হয় কে বলতে পারে? আমি ত' পারিনে। কেউ পারে না।

অ — কিন্তুটা, তোমার কথাগুলো বড় নির্মম হ'য়ে উঠছে। এত কথার আর দরকার নেই — আমরা আবার সাহিত্যের মিঠে-মধুর হাওয়া সেবন করি, এস। তুমি কি বলছিলে? কর্ম করার চেয়ে থাকা রচনা করা ঢের বেশি শক্ত?

সি — (একটু চুপ করিয়া থাকার পর) — নয় ত' কি? আমার বিশ্বাস, আমি একটা অতি সহজ সত্য-কথাই উচ্চারণ করেছি। কেমন, এখন বুঝতে পেরেছ — আমার কথাই ঠিক? মানুষ যখন কিছু করে তখন ত' সে একটা ফলের পুতুলমাত্র। যখন কিছুর বর্ণনা করে তখন সে হয় কবি। এইটাই হ'ল মূল-তত্ত্ব। ইলিয়নের কটিতটক্ষুব্ধ বাণু-প্রস্তরে ধ'রিয়ে যারা তাদের চিত্রিত শরাসন থেকে খাঁজকাটা

হাঁর ছুঁড়েছিল, কিংবা 'আর্ক'-কাঠের তৈরী হুড়ুই-দৌড় বল্লম দিয়ে আঘাত করেছিল পরস্পর সেই তারাগুলোর উপর — যার কোনটা অতি-কঠিন চামড়া দিয়ে তৈরী, কোনটা বা আগুনের মত উত্তপ্তকে পিতল দিয়ে গড়া, — তাদের সেই কাজ খুব শক্ত ছিল না। আমার সেই যে এক ব্যাভিলনিয়ান রাজ-মহিষী তার পতিকে হত্যা করেছিল, — প্রথমে একখানি উৎকৃষ্ট চামড়া-দড়ি সুকৌশলে গাড়িতার সঙ্গে রচনা করে' তার সেবা করলে, পরে যখন সেই স্বামী রাজ-কক্ষে মদিরার পাত্রে ইয়ারোদের সঙ্গে প্রমত্ত হয়ে রয়েছে, ঠিক সেই সময়ে তার মাথার উপর একটা লাল-মুক্তোর ঝাড় ফেলে, সে যে তার উপপত্নিকে গুপ্ত স্থান থেকে ডেকে এনে, তাকে নিয়ে সেই ভাবময় অবস্থাতেই স্বামীর সেই বুকটাতে ছুরি বসিয়েছিল — সে-বুক ঔদিয়ের দেবী-মন্দিরে নিজের মেয়েকে বলি দেবার সময়েও বিদীর্ণ হয় নি! — এই সব যে কাজ, এতেই বা কি সাহাদুরী আছে? আর যারা এ সবদের বর্ণনা করেছে? যারা এই সব ঘটনাকে বাস্তব-রূপ দিয়ে চিরদিনের ঘটনা করে তুলেছে? ঐ-সব নর-নারী বড়, না, যারা তাদের নিয়ে গান রচনা করেছে তারা বড়? "উদার-ভাল মহাবীর হেক্টর আর বাঁচিয়া নাই" — কবি লুসিয়ান তাঁর কাব্যে, প্রেতলোকের বর্ণনায়, একজনের মুখে এই কথাটি দিয়েছেন; সেখানে হেলেনের মাথায় ঘুসিটা গড়াগড়ি যাচ্ছে — তার অতি নাকি বড় শাদা দেখাচ্ছে; — কি আশ্চর্য্য! যার এখন এই বিকট মূর্ত্তি, তারই জন্যে কত জয়ন্তী নাগর-কক্ষে কেঁদেছিল! বীরত্বকে সজ্জিত কত রূপবান যোদ্ধা তারি জন্য রণ-ভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে, কত সৌধ-কিরীটিনী নগরী ধূলিসাৎ হয়েছে! হা, জগতের সবই নশ্বর বটে। তবু আজও মেঢ়-মরালীর মত রূপসী, সেই সীতা-বাহিনী হেলেন রাজপুরী থেকে বেরিয়ে দুর্গপ্রাকারের উপরে এসে দাঁড়ান, — হাঁফিয়ে যেমনি করে'ই নীচে সমর-তরঙ্গের দিকে চেয়ে থাকেন। রাজপুরীর প্রাঙ্গণ-চত্বরে প্রিয়ামের বীরসুত, যুদ্ধযাত্রার আগে, আজ পিতৃদেবের অস্ত্রাগারখানি খেঁটে নিচ্ছেন — রাজবধূ আন্দ্রোমাকীর সৌরভে দুই বাহু তাঁর ভরে রয়েছে। তিনি বাধা দেবার পিতৃব্যের খুলে আনি উপর রাখলেন — শিশুপুত্র পিতার সেই মুখ দেখে ভয় পেয়েছে। ঐ যে সব নর-নারী, এরা কি কল্পনার মায়া-কায়া? এই সব বীরমূর্ত্তি কি পাহাড়-পর্ব্বতের কুয়াসা দিয়ে তৈরী? না, গানের সুরে ভেসে-ওঠা কতকগুলো ছায়া-ছবি? না, এরা অতিপ্রাকৃত মানুষ? মানুষ যে কর্ম্মগুলো করে, তাতে আছে কি? তার মূলে যে শক্তির খেলা থাকে সে ত' সেই মুহূর্ত্তেই ফুরিয়ে যায়। সে ত' ঘটনাধীন সত্তা — ঘটনার বাহিরে সত্তাকে ছোট-করা! কেবল কবিরাই তাদের গাথা দিয়ে জগতের সত্তা-রূপটি গড়ে' যান — যে যত বেশীতে জানে, সে রূপও সে-ই আঁকে।

আ — তোমার কথা শুনতে শুনতে আমারও তাই মনে হচ্ছে।

লি — তা'ই যে শক্তি! ট্রয়ের দুর্গপ্রাচীর জীর্ণ গলিত হয়ে পড়েছে, তার গায়ে যে টিকটিকি বসে' থাকে তার ছটাও সমূল লোপের মত। প্রিয়ামের প্রাসাদ-কক্ষ পেচকের বাসা হয়েছে। ট্রয়ের শুভ্র-প্রাকারে ভেড়া আর ছাগলের পাল নিয়ে রাখালেরা ঘুরে বেড়ায়; আর, যে-নাগরকে তোমার 'দৈবোক্ত, মন্ত্রপূত' বলে' বর্ণনা করেছেন, — যে-নাগরকে,

নিখুঁত-চিহ্নিত তার-বুনে পোড়মাটা অর্ধচন্দ্রা-কারে বিদ্ধ হয়ে রেখা দিত, এখন তার জলে একখানা ছোট নৌকোয় একা বসে' মাছ ধরছে কোন ধীবর ; জালে-বাঁধা পোষায় ভাটিগুলো কি রকম ভেসে ভেসে উঠছে তাই সে একমনে দেখছে। এই ত' বাস্তব জগৎ ! কিন্তু এদিকে সব ঠিক তেমনি আছে ; প্রতিদিন সকালে পুরীষার খুলে যায় : পরস্পরে ও অন্যপৃষ্ঠে, কিংবা মোড়াভাঁজা হয়ে চড়ে,' মোড়লরা বেরিয়ে আসে—যুদ্ধে যায় তারা ; সন্ধ্যে দিন রক্ত-কোলা-হলে আকাশ বিদীর্ণ হয় ; যখন রাত্রি নামে, তখন তাঁবুতে তাঁবুতে মশাল জ্বলে' ওঠে ; রাজার সভা-মণ্ডপের সামনের অগ্নিপাত্রে আগুন জ্বালানো হয়। পাথরের মূর্তিতে, কিংবা চিত্রিত প্রাচীর-গাত্রে, শিল্পীর হাতে যারা জীবন্ত হয়ে উঠে, তাদের জীবন একটা মুহূর্ত-কালে চিরস্থির হয়ে থাকে — যদিও সে একটি অসীম সৌন্দর্যের চির-মুহূর্ত। সে-জীবনে একটি-ধারের একঘেয়েমি, অথবা একই অবস্থায় একই রকমের প্রশান্তি আছে। কিন্তু কবিরা যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কি অন্ত আছে ! তাদের যুবা-বয়স, প্রৌঢ়-বয়স আছে ; শিশুকাল আছে, বার্দ্ধক্য আছে। পাথরে-গড়া মূর্তিতে সৌন্দর্য্যের অনন্ত একটি রূপকে এক মুহূর্তের একটি অবস্থায় ধরে রাখা হয়েছে ; পটমঞ্চের উপর যে ছবিটি রঙের বাস দিয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তারও সেই প্রাণ-ধর্ম নেই—যার প্রধান লক্ষণ হ'চ্ছে বিকাশ বা পরিবর্তনশীলতা। তারা যে মৃত্যুহীন, তার কারণ, তারা জীবনের কিছুই জানে না ; জীবন-মৃত্যুর রহস্য কেবল তারাই জেনেছে, যাদের উপর কালের প্রভাব আছে ; যাদের শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎও আছে ; যাদের উন্নতিও আছে, পতনও আছে। যে সব শিল্পকলাকে 'মৃত' বলা হয় তাদের একটা বড় অসুবিধে এই যে, গতি বা চাঞ্চল্যকে তারা রূপ দিতে পারে না ; ও কাজ একমাত্র কাব্য-সাহিত্যই পারে ; কেবল সাহিত্যেই দেহের গতিশীলতা ও মনের অস্থিরতাকে বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব।

অ — হাঁ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু, শিল্পীকে, স্রষ্টাকে যত বড় ভাবছ, সমালোচককে তত ছোট করা হচ্ছে নাকি ?

সি — তা' কেন হবে ?

অ — কারণ, সমালোচক যা' লেখে, সে হচ্ছে পূর্ব-সঙ্গীতের একটা প্রতিধ্বনি—সুস্পষ্ট রূপ-রেখার একটা ছায়াময় প্রতিলিপি মাত্র। যে নতুন জগৎ কবি বা শিল্পী সৃষ্টি করেন তাতে যদি খুব বড় প্রতিভার প্রাণ-স্পর্শ থাকে, তবে সে এমন সম্পূর্ণ-সুন্দর হ'য়ে উঠবে যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা তাকে আরও সুস্পষ্ট, আরও সুন্দর করে' তোলা যায় না। একথা আমি এখন বেশ বুঝতে পেরেছি এবং স্বীকারও করছি যে, কিছু করার চেয়ে কিছু বলা ঢের সহজ। তবু আর্ট ও জীবনের মধ্যে যে সম্পর্ক — তার সম্বন্ধেই খাটে ; কিন্তু আর্ট ও তার সমালোচনা বলতে যা বোঝায় তাদের সম্পর্কে খাটে না।

সি — আরে, সমালোচনা জিনিষটাই যে একটা আর্ট ! শিল্পীর সঙ্গে এই জগৎ যুক্তমান জগৎ, যা কাল্পনা-বাসনা — ভাবচিত্রময় জগৎটার যে সম্বন্ধ, কবি-স্রষ্টার সঙ্গে সমালোচকের সম্বন্ধও ঠিক তাই। ধর : কবি বা শিল্পীর মত, তার সেই কাজটির জন্যে খুব উঁচুই বিশেষজ্ঞের দরকার হয় না। দেখ না, একটা গোরো

চাকরের স্ত্রী আর তাই অতিথির নিমোষ ইচ্ছা এতটা পরস্পরকে নিয়ে যে চলাচলি — তাই হয়েছিল ওয়ার্ড স্কোয়েরের অমন একখানা উপন্যাসের বিষয়বস্তু! ওই নিয়ে তিনি তাদের একটা অদ্ভুত ছন্দ সৃষ্টি করে দেছেন! ক্রিটিকের সৃষ্টিশক্তিও কম নয়; বিষয় যেমনই হোক, তার থেকেই একটা অপূর্ব সাহিত্য রচনা করে' দেবে সে; যে-কোন বস্তু বা বিষয় তার মনে প্রেরণা জাগাতে পারে। তুচ্ছের তাদমক-বিচার হয় — তার ত্রুটিটা নিয়ে। কিন্তু এমন কোন বিষয় নেই যা' তার মনকে উস্কে দেয় না, যা খোঁচা দিয়ে উত্তপ্ত করে' তোলে না।

আ — তবু, সমালোচনাকে কি খাঁটি আর্ট বা সৃষ্টিকর্ম বলা যায়?

গি — কেন যাবে না! তারও ত' সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করবার জন্যে — কিছু একটা গড়বার জন্যে — উপাদান-উপকরণ রয়েছে; সে-ও সেইগুলো নিয়ে একটা সুন্দর এবং নতুন-কিছু গ'ড়ে তোলে। কাব্যসৃষ্টিতে কবিরা তার বেশি কি করে' থাকেন? যথার্থ বলতে হ'লে, সমালোচনা কেন সৃষ্টির মধ্যেই আরেকটি সৃষ্টি। ঠিক যেমন বড় বড় কবিরা — হোমার এস্কাইলস থেকে সেক্সপীয়ার, কীটস্ পর্যন্ত, সকলেই — নানা পুরাণ, ইতিহাস, কথা-কাহিনী ও কিম্বদন্তীকে উপাদান করে' ওঁদের কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন; ওঁরা যেমন একেবারে সোজা জীবনের থেকেই সে-সব গ্রহণ করেন নি — এবং সেই উপাদান-গুলোও নিতান্ত কাঁচা ছিল না, কবিপুঙ্গবেই তাদের একটা রং ও রূপ পাকিয়ে নিয়েছিল, — তেমনি, ক্রিটিকরাও যে-সব বিষয় নিয়ে তাদের সৃষ্টিকর্ম করে' থাকে — সেগুলোও অপরের দ্বারা ঠিক সেই রকম আগে থেকেই যেন পরিমার্জিত করে' রাখা হয়েছে; তারা কেবল তাইতে একটা নতুন রং, নতুন রূপ ফুটিয়ে তোলে। আমি বলি, সমালোচনা সৃষ্টিকর্মের চেয়ে বড়, যেহেতু ওটাতে বাইরের শাসন একেবারেই নেই। খুব উঁচুদরের সমালোচনায়, ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতির পূর্ণ-প্রকাশ থাকে, কাজেই তার মত সৃষ্টি-কর্ম আর কিছু হতে পারে না। বাইরের জগৎ বা বাইরের সমাজ, — এ সকলের বন্ধন তাকে আদৌ মানতে হয় না; কবি বা শিল্পীর মত, বাস্তবের সঙ্গে কোন রকম সামঞ্জস্য রক্ষা করার দায় তার নেই, সম্ভব-অসম্ভবের ভাবনাও নেই। কাব্যসৃষ্টিতে তুমি বাস্তবের কল্পীপাথরে যাচাই করতেও পারো, কিন্তু যা' মানুষের আত্মার সত্য, তাকে যাচাই করবে কি দিয়ে?

আ — আত্মার সত্য?

গি — হাঁ, আত্মার সত্য নয় ত' কি? অতি উচ্চাঙ্গের সমালোচনায় তাই থাকে — মানুষ তার আত্মার অনুভূতিকেই বাক্যে প্রকাশ করে। তাই সে কাহিনী ইতিহাসের কাহিনীর চেয়েও মনোমুগ্ধকর, কারণ, তাতে কোন ভেজাল নেই; আবার দর্শন-শাস্ত্রের চেয়ে তা সুখপাঠ্য, কারণ, তার বিষয়-বস্তু একটা নিরাকার নির্বিশেষ কিছু নয়, অতিশয় সুস্পষ্ট সাকার সত্তা আছে তার। তাকেই সুসত্যতম আত্ম-চরিত বলা যেতে পারে; কারণ, তাতে জীবনের কয়কগুলো ঘটনার বিবরণ নেই, — অন্তরের কথাই আছে। ক্রিটিক যা সমালোচক যিনি, তিনি অন্য-পতির সেবা ছাড়া আর কিছুই করেন না — তাঁর প্রাণে সেই সব ভাব উদ্রেক করবার জন্যেই চিরকর ছবি আঁকে,

কবি কাব্য রচনা করে, ভাষার পাখায় ভর দিয়ে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে।

আ — আমি কিন্তু সমালোচনায় তার অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করেছি।

মি — হাঁ, জানি; একটা কথা চলিত হয়েছে বটে যে, সমালোচনার যথার্থ কাজ হচ্ছে — লেখা যেমন সেটি ঠিক তার মত করে দেখতে পারা। কিন্তু ওটা একটা ভয়ঙ্কর ভুল; কারণ, যাকে বিশুদ্ধ সমালোচনা বলা যায়, তার রীতিই হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টিনতা—তার দৃষ্টি নিজের উপরে নিবদ্ধ: পরের অন্তরে কি আছে তার সন্ধান নয় — নিজের অন্তরের রহস্য উদ্ঘাটন করাই তার কাজ। শ্রেষ্ঠ সমালোচনা যখন কোন শিল্প-কর্ম্মের পরিচয় দেয়, তখন সেইটেকেই সেখানে চেষ্টা করে না, সেই বস্তুর ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করে না; তাকে দেখে নিজের মনে যা' হচ্ছে তাই প্রকাশ করার নাম সমালোচনা।

আ — সত্যিই কি তাই?

মি — তা'ছাড়া আর কি? মিঃ রাফিন টার্নারের ছবির সম্বন্ধে কি বলেছেন তা' জানতে চায় কে? কি এসে যায় তা'তে? কিন্তু সেই কথাগুলো যে অপূর্ব্ব, বিরাট-সত্তার সুরলহরীযুক্ত করে', আবেগপূর্ণ গদ্য-ভাষায় তিনি বলেছেন — সে-ভাষার প্রত্যেক শব্দের, প্রত্যেক বাক্যের, প্রত্যেক উপমার যে সূক্ষ্ম কারু-কুশল পারিপাট্য — তার সেই অনুপরমাণুর অবারিত ধারাবাহী, সেই ত' একটা উচ্চাঙ্গের কারুকলা; সাহিত্য-কেই আমি শ্রেষ্ঠ আর্ট বলে' মনে করি, অতএব, সেই বাক্যরচনা তখু আর্ট নয় — উচ্চশ্রেণীর আর্ট। আবার, পেটার (Pater) যদি মোনালিসার ছবিতে এমন কিছু দেখে থাকেন যা' লেওনার্দোর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাতেই বা কি এসে যায়? যে ওই ছবিখানা এঁকেছিল, তার মনে হাসির ওই বিচিত্র ভঙ্গিমাটাই ছিল সবচেয়ে বড় — এমন কথা কেউ কেউ বলেছে। কিন্তু আমি যখন 'লুভর'-গ্রাসাদের ঝিঙ্কটিচল আর্ট-গ্যালারীর ভিতর দিয়ে, ঐ অদ্ভুত ছবিখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন এই কথাগুলোই ক্রমাগত গুঞ্জরণ করি —

"যে পর্ব্বতগুহার মাঝে বসে' আছে ঐ নারী — বয়সে ও তাদের চেয়েও প্রাচীন: যে সব রক্তপায়ী পিশাচ অন্তরের অন্ধ দুঃস্বপ্নের শোণিত পান করে, এবং যারা বার বার মরে ও বেঁচে ওঠে, ঐ নারী তাদের মতই যেন বহুবার মরেছে, মরে' আবার বেঁচে উঠেছে — দুনিয়ার রহস্য কে জানে ও! সমুদ্রের অতল-জলে ও ডুব দিয়ে এসেছে, সেখানকার সেই স্তিমিত দিবালোক ওর সর্ব্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে; পূর্ব্বদেশ থেকে যে বণিকদল বিচিত্র বসনের বসন নিয়ে আসে — ও তাদের সঙ্গেও পণ্য-বিনিময় করেছে; ওই ছিল সেই হেলেন-জননী লীডা — ট্রয়ের সেই হেলেন; আবার যীশু-মাতা মহাদেবী মেরীর জননীও ছিল ও-ই। এ সকলের স্মৃতি ওর কাছে বীণা-বেণুর সুরলহরীর মত; সেই সুরের সঙ্গীত-রাগেই ওর মুখের মায়াবী-রেখা এমন চল-চঞ্চল, ওর আখিপুটে ও করপল্লবে এমন কোমল আভা ফুটে উঠেছে।"

এমনি করেই ছবিটা আসলে যা,' তার চেয়ে শতগুণ মনোরম হয়ে ওঠে; যে-রহস্য তার ভিতরে গোপনে বাস করছে — যা' সে নিজেও জানে না — তা' আমাদের কাছে ধরা দেয়; আর ঐ যে স্বপ্নময়, মোহময় গন্ধ,—ওর সঙ্গীত-ধ্বনিও আমাদের কানে তেমনি মধুর লাগে, যেমন মধুর লেগেছিল সেই বাঁশির আলাপ

'লা জোকণ্ডা'র কাছে। সেই সুর শুনতে শুনতে তার এই প্রশ্নটি এমন তীক্ষ্ণতায় মূর্ছিত হয়ে উঠেছে — যা' চরম-বিষের মতই উন্মাদক। আমাকে যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, ওই ছবি সম্বন্ধে, লেওনার্দো যদি শুনতে পেতেন যে, কেউ এই সব কথা বলছে, — বলেছে যে, মানুষের যত ভাবনা-কামনা, যতকিছু পাওয়া না-পাওয়ার শক্তি ও অশক্তি — সব যেন পরীক্ষাতর ও তীব্রতর হ'য়ে ঐ মুখের প্রত্যেক রেখাটি পরিস্ফুট করে' তুলেছে; ওরই ওপর প্রকাশ যেন হয়ে গেছে — ওরই প্রকাশ পেয়েছে স্ত্রীলোক জীবনের প্রীতি-রোষের ভোগ-লালসা, মধ্যযুগের তন্ত্রমন্ত্রের আবেশ — সেই অমৃত-সিপাসা ও বিষের প্রেম-রস, রেনেসাঁসের জীবন-সাধনা, যেক্তিয়াসের পাপোদ্ধার; — যদি শুনতেন তিনি, তা'হলে কি বলতেন, সে প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, — তিনি হয় ত' বলতেন, এসব কিছুই তাঁর মনে হয় নি; ঐ ছবিতে তিনি কেবল রেখা ও আয়তনের একটা নূতনতর বিন্যাস, আর নীল ও সবুজ এই দুই রং মিলিয়ে একটা অপূর্ব বর্ণ-সুষমা সম্ভাবন করেছেন মাত্র। ঠিক এই কারণেই, আমি যে-ধরনের সমালোচনার সুরুয়াত দিয়েছি — ঐ হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা। ও রকম সমালোচনায়, কোন একটা কাব্য বা চিত্র বা আর কিছুকে উপলক্ষ্য করে' সম্পূর্ণ নতুন-কিছু সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু-বস্তুটার প্রকৃত অর্থ কি, শিল্পী তার-মারফতে কি বলতে চেয়েছে — তাই নিয়ে সমালোচক মাথা ঘামায় না, কিম্বা, শিল্পীর কথাটাকেই শেষ-কথা বলে' মেনে নেয় না; উচিতও তাই। কারণ, সুন্দর আর্ট-সৃষ্টির মধ্যে যে অর্থটি নিহিত থাকে, তা' যেমন শিল্পীর মনেও ছিল, তেমনই, সে সৌন্দর্যে দেখবার তার অনেক আছে। যার যে রকম, সে-ই ঐ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার থেকে কিছু আহরণ করে, আমাদের চোখে তাকে আরও বিস্ময়কর করে তোলে; প্রত্যেক সুন্দর সৃষ্টি তার নতুন নতুন সম্পর্ক পাতিয়ে দেয়, তাই সে আমাদের জীবনেরই একটা অঙ্গ হয়ে ওঠে — আমরা যা' চাই সে যেন তারি একটা ইঙ্গিত; কিম্বা যা চাই অথচ পেতে হয় ভয়, সে যেন তেমনি একটা বিষ্ণু। যা' সুন্দর তার কোন অর্থ নেই বলেই তার প্রকাশ সীমাহীন। সৌন্দর্য যখন তার স্বরূপ প্রকাশ করে তখন তার মধ্যেই আমরা নানা বিষের রূপাদল-বিভা দেখতে পাই।

অ — কিন্তু এ রকম সমালোচনাকে কি ঠিক সমালোচনা বলা চলে?

শি — সমালোচনার যত সমালোচনা ওকেই বলে; কারণ, এ ত' কোন একটা বিশেষ কলা-কীর্তির পরিচয় দেওয়া নয়, একেবারে মূল সৌন্দর্য নিয়েই তার কাজ; তাই শিল্পীও যা' বলে কহতে পারেনি, যা' সেও বোঝেনি, যা খুঁজতে পারলেও সম্পূর্ণ খুঁজিয়ে খুঁজতে পারেনি, সমালোচক সেটা খুঁজে বের করে' দেয়।

অ — তা' হলে উৎকৃষ্ট সমালোচনা সৃষ্টিকর্মের চেয়েও বড় — তার সৃষ্টি আরও উঁচুদরের সৃষ্টি — সেটা ঠিক যেমনটি আছে তাকে তেমনটি না দেখাই সমালোচকের কাজ — তুমি এই বলতে চাও?

শি — হাঁ, আমি তাই মনে করি। যে শিল্পকর্মটি সমালোচনার বিষয় হবে, তার থেকে একটা ইঙ্গিতভার নিয়ে সমালোচক নতুন রকম কিছু রচনা করবে। সে বস্তুর যে সৌন্দর্য, তার প্রকৃতি এমনই যে, তাকে যেন

ইচ্ছে তেমনি রূপ দেওয়া যায়, তাকে যেমন ইচ্ছে তেমনি করে' দেখতে পারি। দর্শা-লোকের কানে সে এমন সব সোপন রহস্যের সূত্র গুঞ্জন করে, যা' কোন শিল্পীর মনে উদয় হয়নি; যে সেই মূর্তি গড়েছিল, যা পটখানা চিত্রিত করেছিল, কিংবা যবনিকাকে নিয়ে তার উপর যত কারুকর্ম করেছিল, সে সবও করা তাবেই নি।

এমন কথাও শোনা যায়, শিল্পীর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, সে তার মনের কারুসৃষ্টিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারে না। ট্রাজেডিটা আসলে তা' নয়; অধিকাংশ আর্টিষ্ট তাদের সেই মানসী-প্রতিমাকে এমন অবাধে, এমন দ্বিধাচিত্তহীন প্রতিমূর্ত করতে পারে যে, তাতে আর কোন ছন্দে বা বিসম্বাদের অবকাশ থাকে না। এই জন্যেই সঙ্গীতকলাই শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা। সঙ্গীতে অনির্বচনীয় যা' তাকে বর্ণনীয় করা যায় না। সকল আর্টেই কতকগুলো যে প্রকাশের বাধা থাকে, তা' থাকা আবশ্যক এই কারণেই। শেষ, ভাস্কর-শিল্পী তার পাথরে কোন রং ব্যবহার করতে পারে না; চিত্রশিল্পীও তার ছিন্নে আকার-আয়তনের সঠিক রূপটি ধরে' দিতে পারে না; — তাতে তাদের আপত্তি নেই, বরং সে জন্যে তারা খুশী। কারণ, ঐ খুঁতিগুলো ত্যাগ করার দরুণ, তারা বাস্তবকে পুরোপুরি ধরে' দিতে পারে না — পারলে সেটা খুব মিতাচারই অনুকরণ; আবার, অন্যের চাতুরীকেও যদি সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারত, তবে সেও একটু অতিরিক্ত রকমের তরল হয়ে উঠত। আর্টের এই রকম অসম্পূর্ণতা আছে ব'লেই তার সৌন্দর্য্য যেন নির্দোষ হয়ে ওঠে।

কিন্তু, আর না, নৈশ-ভোজনের সময় হয়েছে; উপস্থিত দু'একটি চলনা-বলনীয় বিষয় শিল্প-সৌন্দর্য্য বিচার করা যাক; তারপর, সমালোচনা কি অর্থে কতখানি ব্যাপারে কাজও করে, সে বিচারের অবতারণা করা যাবে।

(ক্রমশঃ)

ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের সহিত তুলনায়, কাব্যকলার একটি বড় অসুবিধা এই যে, যেহেতু ইহাকে শব্দ-ভিন্ন বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়, অতএব, যাহা বাক্যে প্রকাশ পায় না, কেবল ভাবে-ভঙ্গিতে মুখর হইয়া উঠে — সেই স্বাভাবিক শোক, বা আনন্দের অতি-গভীর স্তব্ধ আবেগ কাব্যকলার সাহায্যে প্রত্যক্ষ করানো যায় না।

সভ্যতা

(পূর্ণাঙ্গ্যুক্তি)

সভ্যতা-ধারা হইতে হইলে, তাহা যাহার সম্বন্ধেই হউক না কেন, তাহার ভিতর কতকগুলি জিনিষ থাকা চাই; তাহার পক্ষে-শক্তি নাই, সে সভ্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখি যে, কেহ কোন ব্যক্তি নিজে কিছু হজম বা সৃষ্টি করিতে নাও পারে। সৃষ্টি করিবার, অর্থাৎ কিছু গড়িবার, বা কোন শিল্পকীর্তি স্থাপন করিবার যে প্রেরণা, তাহার দ্বারা সভ্যতা ও বর্বরতার কোন নির্দেশ করা যায় না। কেবল ভাল-মন্দ বিচার বা রস-গ্রাহণের শক্তিই যোগ্য সভ্যতার লক্ষণ। যে পুরুষ বা যে নারীর পক্ষে সর্ববিধ শিল্পকর্মই সমান নীরস, সে সভ্য নহে।

সভ্য-জীবনের যে সকল সুখ — তাহা দেহগত ও মনোবৃত্তি-সাপেক্ষ; তন্মধ্যে সৌন্দর্য-উপভোগের যে সুখ তাহাই শ্রেষ্ঠ। সে-সুখ — প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি আত্মীয়তা-সূত্রের জন্মান্তরের মত প্রবল বা তীব্র নয়; কিন্তু তাহা অধিকতর স্থায়ী। ঐ অপরিমিত সুখকে শ্রেষ্ঠ মনে করার মূলে আছে সেই মূলাজ্ঞান। অবশ্য, ভাব-চিন্তার অনুশীলনই জীবনের একমাত্র কর্ম হইতে পারে না; এমন কর্ম আছে যাহা সেই শ্রেষ্ঠ সুখলাভের উপায় ও বটেই, — যাহার অনুযোজন, এমন কি আচরণও সভ্যব্যক্তির পক্ষে অসঙ্গত নয়। যদি জীবিকার জন্য পরিশ্রম করা আবশ্যক হয় তাহাও করিতে হইবে; সুখ ভোগ করিতে হইলে সংসার-যাত্রা নির্বিঘ্নে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জীবিকা-সমস্যার সমাধান হইলে পর, বাহিরের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকাই সভ্যতার লক্ষণ। কোন কর্মেরই নিজস্ব কোন পৃথক মূল্য নাই — সকল কর্মই সেই উচ্চই সুখভোগের উপায় মাত্র।

আমি স্বীকার করিয়াছি যে, সকল কর্মই সভ্য-জীবনে শ্রেয়োলাভের উপায়স্বরূপ হইতে পারে — বিশেষতঃ পরের হিত-সাধন। কিন্তু যাহারা কর্মবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করে, তাহারা কেবল ঐরূপ নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তির বশেই সংসারে এত হড়াহড়ি করিয়া বেড়ায় না। নিজেদের ইচ্ছাটাকেই — একটা কোন আজগুবি আদর্শ বা বিশ্বাসকেই — আর সকলের উপর চাপাইয়া দিবার জন্য, তাহারা ঐরূপ পরহিতব্রত গ্রহণ করে। ইহারা নিজেরা কোন উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিকর্ম করিতে পারে না — নিজেদের মনোগত কোন ভাবকে শিল্পসৃষ্টির দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে অপারগ; তাই অপরের জীবনধারাকে বাধাগ্রস্ত করিয়া, সেই অক্ষমতার আত্মগ্লানি চরিতার্থ করে। প্রেম, বন্ধুত্ব, পরস্পর আলাপ-আলোচনার সুখ, সৌন্দর্য-ধ্যান বা সৌন্দর্যসৃষ্টি, অথবা নিজের চরিত্রের ভোল ফেরানো — এ সকলের কোনটাতেই তাহারা তৃপ্তি পায় না; গুরু হওয়া চাই, প্রভু চাই, পরকে বশীভূত, বা নিজের মত-বিশ্বাসের অধীন করা চাই। ইহারাই এক একটা 'জাতি' গড়িয়া তোলে, ইহারাই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে; মনুষ্য-প্রকৃতির যে দিকটা সুন্দর, ও মঙ্গলময়, মানুষকে যেন তাহা হইতেই উদ্ধার করিয়া তাহার বহু উপকার সাধন করে। সভ্য মানুষের মত সুখভোগ-প্রবৃত্তি তাহাদের প্রকৃতিসুলভ নয় বলিয়া, সে শক্তি যাহাদের আছে, তাহাদিগকেও ইহারা সেই সুখভোগ করিতে দিবে না; তাহারা নিজেরা যাহা পছন্দ করে, আর

সকলকেও তাহাই করিতে হইবে। এরূপ ভোগ করিয়া—তাহারা নিজেরা যাহা ভাবে ও বিশ্বাস করে, পরকেও তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করে। যেহেতু জগতে দুর্বৃত্ত সংখ্যাই অত্যধিক, সেইহেতু তাহারা আত্মপ্রাধান্য লাভও করে। ফলে, সর্বত্রিকের একটা বাহ্যিক সভ্যতা বা নিরাপত্তাপ্রবণতার প্রতিষ্ঠা হয়।

এখন, আমার সভ্য মানুষের কথাই বলি। মানুষ সভ্য হইয়া জন্মায় না, তাহাকে সভ্য করিয়া তুলিতে হয়; সে মানুষ একরূপ কৃত্রিম মানুষ—স্বাভাবিক মানুষ নয়, অর্থাৎ তাহার জন্মগত প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন হয়; তেমন মানুষ স্বভাব-সবল না হইলেও, এক অর্থে তাহার প্রকৃতি আরও নিখুঁত। কথাটা স্ববিরোধী হইল; ইহা বুঝিয়া লইতে হইলে একটু কল্পনার সাহায্য লইতে হইবে—কল্পনায় দুইটি স্বতন্ত্র ধারণা করিতে হইবে। ইহার একটিকে বলা যাক—জীবন বলিতে যাহা কিছু আমরা অনুভব করি তাহা যেন একটা প্রবাহ; অপরটি, যেন সেই প্রবাহের এক-একটি দল—যেমন আমরা; অর্থাৎ এক-একটা ব্যক্তির জীবন। সর্বত্র অবস্থায় জীবন-প্রবাহের সেই দলগুলা নানা দুর্বিপাক, ক্ষয় ও দুঃস্বপ্নের আবর্জনায় পূর্ণ থাকে; উহাই সেই দলের চিরন্তনের অবিকৃত রূপ। কিন্তু মানুষ সভ্য হইলে তাহার সেই জীবন-দল, একেবারে হউক, অবিকৃত আর থাকে না—শিক্ষিত শিক্ষা, বহু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্গতির অভিজ্ঞতায়, সেই দলের গঠনটাও বিকৃত হইয়া—অথবা বাকিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার কিছুটা আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠে। শিক্ষা-সম্মার্জনীর দ্বারাই যেন তাহার সেই আদি-স্বভাবকে সে বহিষ্কার করিয়া দেয়, এবং সেইজন্য একরূপ কৃত্রিমতা লাভ করে। এইজন্যই, সে যেমন কোনরূপ দেহ-সুখকেই বর্জন করিতে চাহিবে না—নৈতিক শুচিতা গ্রাহ্য করিবে না, তেমনই আবার, নীচ ইন্দ্রিয়বৃত্তির লালসাকে সে সংবরণ অথবা সংযত করিবে। একজন অসভ্য মানুষ, যতক্ষণ পীড়িত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ পান-ভোজন বন্ধ করে না; কিন্তু কোন সভ্য মানুষ তদ্রূপ দৈহিক অসুস্থতা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে না, যখনই অসুস্থ হইবার তাহা ভাবে করিবে।

সভ্য মানুষ সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ। তেমন মানুষ সচরিত্রও নয়, সরল-স্বভাব, প্রকৃতির সন্তানও নয়। সে শিল্পী নয়, বীর নয়, সাধু-সন্ন্যাসীও নয়, তত্ত্বজ্ঞানীও নয়। কিন্তু সকল শ্রেণীকার হয় সে আত্মদান করিতে পারে; দলের মঙ্গলে ঘোরে; এবং আচার-ব্যবহারে কোন ত্রুটি সে করে না। জীবনটাকে উপভোগরূপে ভোগ করাই তাহার একমাত্র বাসনা। ঐ বাসনা সফল করিবার জন্য তাহার মন এবং তাহার দেহবৃত্তি উপযুক্তরূপে কর্ষিত হইয়াছে। তাহার মনের পিপাসাও অপরিসীম, এইজন্য তাহাতে কোন সঙ্কোচও নাই, ঘাবড়িচিত্তাও নাই। সে উদাসচেতা, পরমত-সহিষ্ণু; কোন কিছুতেই তাহার অকারণ ঘৃণা নাই। যেহেতু, কোনটা ঘৃণা, কোনটা দোষ—সে জ্ঞান তাহার আছে, এজন্য সে জ্ঞানের শিক্ষ দিয়াই সকল বস্তুর মূল্য-বিচার করে, কাজের শিক্ষা দিয়া নহে। জনসাধারণ যে-সকল বিষয়ে একমত সেই সকল বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা হয় না, কারণ, নিজের ব্যক্তির সম্বন্ধে সে পূর্ণ-সচেতন। হৃদয়, ইন্দ্রিয়, মন ও মন—এই তিনেরই উৎকর্ষ-সাধন দ্বারা সে এমন একটি জীবনযাপন-নীতি স্থির করিয়া লয়, যাহাতে—যতদূর সম্ভব, কোন বিরুদ্ধ-সংস্কার, বা প্রবৃত্তির অসংযম স্থান পায় না। না, সভ্যমানুষ কিছুতেই প্রকৃতির নিয়ম পালন করিতে পারে না।

৩

সভ্যতা-সৃষ্টির উপায়

দুটি প্রশ্ন এখনও বাকী আছে। আমরা কি সভ্যতা চাই? চাহিলেও তাহা কি লাভ করা সম্ভব?

সভ্যতা যে সকলেই কাম্য তাহা মনে করিবার কারণ—প্রত্যেক সুরুচিসম্পন্ন নর-নারীর অন্তরে এমন কামনা গভীরভাবে বিদ্যমান আছে। অবশ্য এমন কতিপয় অতিবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও আছে যাহারা সভ্যতাহীন জীবনের গুণগান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে চায়; আমাদের এমন সুবিধাবাদী লোকেরও অভাব নাই যাহারা সভ্যতার আনুষঙ্গিক নানা ব্যাধি এবং অসভ্য-জীবনের নানা সুবিধার কথাও বলিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা আদিম অসভ্য জীবন যাপন করিবার জন্য অধীরতা প্রকাশ করিয়া একটা নূতন ভাবের ধারাচর্যা দেখায়, তাহারা যেন আরও একটু বুদ্ধিমান হইয়া একটা কথা ভাবিয়া দেখে, তাহা এই যে, সভ্যতার বিষাদ এত তিক্ত কিনা, আর একটা সৌখীন ভাব-বিলাস সম্পূর্ণ অন্য বস্তু—এ দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রাণে প্রাণে জানে যে, বর্বরদের জীবন সম্বন্ধে হব্‌স্ (Hobbes) যাহা বলিয়াছেন তাহা অতিসত্য কথা। তাহাদের সেই কুকুরাদের নানান বিভীষিকা, এবং অতিসত্য কথাটুকু, একঘেয়ে জীবন-যাত্রার কথা আমাদেরও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ঐ যে আমাদের মনের প্রচ্ছন্ন কামনা—সভ্যতার মত কাম্য আর কিছু নাই, এই যে বিশ্বাস—ইহা হইতেই আমরা নিশ্চিত অনুমান করিতে পারি যে, ঐ কামনা মিথ্যা নয়। কেন যে এই কামনা মানুষের হয় সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, তাহার জবাব কেহই আমার কাছ নয়। বর্বর-জাতির মধ্যেও যখন ঐরূপ কামনা কিছু দুই-চারিজনের অন্তরে একটু আত্ম-চেতনা, বা ঐরূপ অবস্থার পরিবর্তন-চিন্তার উদয় হয়, তখন তাহার কারণ আর যাহাই হৌক, সেও যে একটা ইচ্ছা, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই ইচ্ছা আর কিছু নয়—আমাদের প্রাণের সেই অন্তর্নিহিত সুখান্বেষণের ইচ্ছা। সভ্যতার মূলে অন্ততঃ সেই ইচ্ছাই আছে। মিঃ ম্যাক্ ডুগাল বলেন, "বর্বরেরা কখনও হাসে না।" মিঃ ডুগালের কথা ঠিক নহে; আমি বলি, বর্বরেরাও হাসে, তবে তাহা ঠিক হাসি নয়, একরূপ বন্যবিকাশ। একবার ভাবিয়া দেখ, কারণে ও অকারণে তাহারা কত রকমের যন্ত্রণাই না ভোগ করে! তাহাদের সেই ঘোরতর কুসংস্কার এবং দুর্বার প্রবৃত্তিগুলাই ত' সকল সুখের হন্তারক, এবং সকল দুঃখেরও সৃষ্টিকারক।

সভ্যতাই তাহাদিগকে সেই দুঃখ হইতে উদ্ধার করিতে পারে; জীবনটা যে ভাল করিয়া ভোগ করা সম্ভব, এ বিশ্বাস সভ্যতাই উদ্রেক করিতে পারে। সভ্যতাপ্রাপ্ত হইলেই মানুষ বুঝিতে পারে—কত মহৎ ভাব, কত সুকুমার কলাবিদ্যা তাহার জীবনে বিকাশোন্মুখ হইয়া আছে। সভ্যতাই যেন সেই 'পরশমণি', যে—মানুষের মুমূর্ষুকালের মধ্যে, জগতের সকল ঐশ্বর্য্য, তাহার জন্মজন্মান্তরের সকল অস্বাভাবিক লোলুপতা দেখাইয়া দেয়, এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত করে। সেই যে হুর্কেরি ইচ্ছার কথা আমি বলিয়াছি—মুখে মুখে, ও দেশে দেশে, মানুষ তাহারই নাম দিয়াছে—'প্রোগ্রিগিটস'।

সে যাহা হউক, যিনি ঐ কথাটার অর্থ বুঝিয়াছেন, তিনি যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি সভ্যতা কামনা করি?', এবং বস্তুতঃ তাহার উত্তর যেন, হয় আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তিনি যে উহা চান, তাহা স্বীকার করিবেন। দ্বিতীয়, একটা কথা এই যে, কজন ঐ কথাটার অর্থ বোঝে? অতএব বেশির ভাগ লোক যে উহা চাহিয়াছে, বা করিতেছে চাহিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ

আছে। তথাপি, যেহেতু আমি সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছি, এবং যেহেতু আমি নিজে উহা কামনা করি, অতএব, আমি এক্ষণে উহা লাভ করিবার একটী উপায়ও নির্দ্দেশ করিব। যদি কোন সমাজ সভ্য হইতে চায়, এবং সভ্যতা সৃষ্টি করিবার অভিলাষী হয়, তবে তাহার কার্য্যবিধি কিরূপ হওয়া উচিত, আমি তাহারই একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিব।

যে আদি কেন্দ্রসকল হইতে সভ্যতার বিস্তার হয় বলিয়াছি, সেই কেন্দ্রসকল বাদে, বাহিরের যুবকের সমাজে, জনসাধারণের অন্ততঃ কিয়দংশ এমন হওয়া চাই যে, সর্ব্ববিষয়ে তাহারা অনুসন্ধিৎসু, এবং কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের আগ্রহও তাহাদের আছে। প্রাচীন স্পার্টা-বাসীরা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিল যে, একটা সমগ্র সমাজকে — অন্ততঃ তাহাদের কন্যা যাহারা পালন করিত না, তাহাদিগকে — শিক্ষার দ্বারা যুদ্ধ-কার্য্যে অভিজ্ঞ নিপুণ করিয়া তোলা যায়। কিন্তু যতদূর জানা আছে, একমাত্র আমেরীকানরাই সর্ব্বপ্রথম নিজ সমাজকে ঐ শিক্ষা দিয়াছিল যে, শিক্ষার গুণে জীবনের মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা যায়। সভ্যতাসৃষ্টির জন্যও, সমগ্র সমাজে উদ্দেশ্যানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা সভ্যতাপ্রার্থী সমাজের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঐরূপ শিক্ষার দ্বারা যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়, তাহাই মুখ্য নয়; উহার ফলে মনের যে অভিনব সুখকর অবস্থা—যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসুখ—সম্ভবপর হয়, তাহাই মুখ্য; ঐ সভ্যতাও সেই উপায় মাত্র, এবং একমাত্র উপায় না হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। আবার, ঐ যে সভ্যতা, যাহা সেই সুখলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, তাহাও সমাজকে একটা ভ্রমের মধ্যেই রক্ষিত করে — সে যেন একটা রং মাত্র; সেই রং যে পায় কয়েকজন পূর্ণ-সভ্য নর-নারীর সেই কেন্দ্রস্থলটি হইতে। অতএব কোন সমাজ যদি ঐ সভ্যতার রঙে রঞ্জিত হইতে চায়, তবে তাহাকে ইহাই প্রথমে স্থির করিতে হইবে যে, কি উপায়ে সভ্যতা-সৃষ্টিকারী সেই পূর্ণসভ্য নরনারীর কেন্দ্রমণ্ডল উদ্ভূত হইতে পারে — তাহার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে সমাজে কিরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন?

কিন্তু পরিমাণ বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাহিরের কোন ব্যক্তিই উচ্চতম সভ্যতার অধিকারী হইতে পারে না। তাই বলিয়া ইহাও সত্য নয় যে, বৈষয়িক সম্পদ থাকিলেই কোন সমাজে লোকমাত্র সভ্যতার রং লাগিতে পারে। আমুষঙ্গিক কালের ধনাঢ্যতম সমাজগুলির দিকে চাহিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ কথাটার অর্থ কেবল এই যে, উৎকৃষ্ট সভ্যতার অধিকারী হইতে হইলে, মানুষের মনটা সর্ব্বপ্রকার অভাব-অনটনের ভাবনা হইতে মুক্ত থাকা চাই। এইখানেই বড় মহাপ্রাণ মানব-হিতৈষীরা একটা বিশ্রী ও কঠিন সমস্যার পড়িয়া যাইবেন। সভ্যতার আদি উৎস হইবে যাহারা — সেই অল্প কয়েকজন নরনারীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য বাকি অধিকাংশ জনগণ অধিকতর দারিদ্র্য ভোগ করিবে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, — তাহারা ঐ ভার বহন করিতে পারা হইবে, যেমন চিরদিন হইয়াছে। সভ্যতা-রক্ষার জন্য প্রচুর অবসরসম্পন্ন এক শ্রেণীর মানুষ সমাজের মধ্যে থাকা অত্যাবশ্যক; ঐ শ্রেণীর পরিচর্য্যার জন্য দাস বা ভৃত্যজাতীয় একদল মানুষও থাকিবে; অর্থাৎ, সৌভাগ্যের মানুষও চাই, যাহারা তাহাদের উদ্বৃত্ত সময় ও শক্তি অপরের সেবায় নিয়োজিত করিবে। এই সাম্য-বিরোধী ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর বা দুঃসহ হইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহারা সভ্যতার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না — সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ অপেক্ষা সাম্যই অধিকতর মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু মানুষের সমাজে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে

হইলে, পূর্ব-বর্বরতাকেও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ঐরূপ বর্বরতার কাঁদ ছিঁড়িবার পূর্বে, মানব-প্রেমিকগণ যেন মনে রাখেন যে, এমন বহু মানুষ আছে যাহারা দাসত্ব করিতে মোটেই অনিচ্ছুক নয়; এমন মানুষও অল্প নয় যাহারা একটা উচ্চ আদর্শলাভের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

(ক্রমশঃ)

য়ুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিশ্বরূপধারণ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—ভিন্ন মহাদেশে এই সভ্যতাকে বহন পোষণ করিতেছে। এত ভিন্ন ভিন্ন বহুদূরব্যাপ্ত দেশের উপর এক মহাসভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য্য বৃহৎ ব্যাপার, ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই। সুতরাং কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব? কোন্ ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব? অন্য সকল সভ্যতাই এক-দেশের সভ্যতা, এক-জাতির সভ্যতা। সেই জাতি যতদিন ইচ্ছা মোসাইয়াছে ততদিন তাহা জমিয়াছে, তাহার পর তাহা নিবিয়া গিয়াছে, অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা-হোমানলের সমিধকাষ্ঠ যোগাইবার ভার লইয়াছে—মানবলোক, মানবজাতি। অতএব এই যজ্ঞহুতাশন কি নিবিবে, না, ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে?

—রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থ-পরিক্রমা

চিত্রাবলী-কাব্য (কবি ওসমান রচিত হিন্দী প্রেম গাথা)।

—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম, এ, পি-এইচ-ডি

(১)

১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে (হিজরী ১০২২) আহমদাবাদের রাজত্বে পাটীপুর-নিবাসী কবি ওসমান রচিত "চিত্রাবলী" নামক হিন্দী পুথির প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন —

"কথা এক মৈঁ কহি উপাঈ,
কহত সঠি ঔ সুনত সোহাঈ।

বরনিঅ সুনত কানয়ন পাবা,
তরনহু কে তন কাম জগবা।
বিরিধ ভূমৈ মন হোই দিবানা,
হৈ সংসার ধাঁধা জেই জা
জোগী ভূমৈ জোগপথ পাবা,
জোগী কঁহ সুখ জোগ কথা।
ইছাভোগ এক আহ সোহাবা,
জেহি জস ইচ্ছা তৈস কথা পাবা।
মহুল মুকুর বিমল জস দেখা,
জো দেখৈ সো আপুহি দেখা।

[মনে মনে আমি এই কাহিনী নানা করিয়াছি, যাহা বলিতেও মধুর, এবং শুনিতেও মনোরম। এই প্রেমগাথা বালকের পক্ষেও তরুণের কামোদ্দীপক। চোর যেমন সানাইয়ের আওয়াজ শুনিয়া চতুরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, যোগী যোগের পথ খুঁজিয়া পাইবেন, ভোগী ভোগমার্গে অধিক আনন্দ পাইবেন। কহিবার জন্য ইহা সকলকে উদ্দীপ্ত করিবে। এই মধুর মুকুরের বিমল প্রতিবিম্বে যিনি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন তিনি নিজেকেই দেখিতে পাইবেন, তাঁহার আত্মদর্শন লাভ হইবে।]

আমিও বহুদিন এমন কিছু তালাশ করিতেছি। ভাবিলাম, কবি ওসমানের "চিত্রাবলী" নামক এক অপূর্ব্ব ব্যাপার — একাধারে গল্প-সাহিত্য, কাব্য-কলঙ্কন কিংবা রোমান্সের মনোজ্ঞ জ্ঞান-রত্ন। কিন্তু কবির এই অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থের পত্র এবং তথ্যসূচির অস্তিত্ব-কে যার মানাইয়ের দেখিয়া সন্দেহ হইল, তাঁহার এই দারী পেটেন্ট ঔষধ কিংবা

শ্রীযুত ওজেয়াহের বেগ সম্পাদিত। কাশী-নাগরী-প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রবন্ধাদি-কবিতার বাংলাক্ষর-বদল নিয়ত বিজ্ঞাপনের ধারাবাহী নয়। "চিত্রাবলী" হয়তো জিজ্ঞাসুর [১৩] বয়সের পূর্বে সেলমাহের সময়ে লিখিত জাহাঙ্গীর-কৃত "তুজুক", এবং সম্রাট মহম্মদ শাহ-র রাজত্বে "চিত্রাবলী" লিখিত হইবার প্রায় ১১০ বৎসর পরে কবি নূর মহম্মদ-কৃত "ইন্দ্রাবতী" কাব্যের সহিত "চিত্রাবলী"র তুলনামূলক সমালোচনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শেষোক্ত প্রেম-গাথা দুইটি জাহাঙ্গীর-এর অনুকরণেই লিখিত হইয়াছে। পদ্মাবত্ হইতে "চিত্রাবলী" কাহিনীগঠনে অনেক বিভিন্নতার। "ইন্দ্রাবতী"-র মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে: তবুও মোটামুটি বুঝা যায়, উহা অন্ততঃ চিত্রাবলী-র সমশ্রেণীর কাব্য। জাহাঙ্গীর-এর মতো বিনয় আছে: তুলীদাসের কাছে তাঁহার নিবেদন —

"দুই সঁবারহে, মেরবহ দোষা"

অর্থাৎ কাব্যের দোষ দুটি সংশোধন করিয়া আমাকে রক্ষা দিবেন।

ইন্দ্রাবতী কাব্যেও অনুরূপ আবেদন আছে; অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন —

"মোহি বিবেক কিছু নাহী,
নহি বিদ্যা বল আহি।"

[আমার বিবেক (বুদ্ধিশুদ্ধি) কিছুমাত্র নাই, বিদ্যার জোরও নাই।]

চিত্রাবলী-র কবি যান, প্রস্তাবনায় উদ্ধৃত সোহাগুলির পরেই লিখিয়াছেন —

"আগী বুদ্ধি হোই অধিকাই,
আন কথা এক কহৈ বনাই।
কবিহু আগে সীস হোই, বিনতি করৌ গহি পাঁয়।
অছর দুই সঁবারেহু, মোরন লিহেঁ ছপাই॥"

[যাহার বুদ্ধি অধিক সে আর একটি কথা অর্থাৎ প্রেম-গাথা রচনা করুক। কবিগণের পায়ে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছি তাঁহারা যেন অক্ষরচ্যুতি ইত্যাদি সংশোধন করেন, দোষগুলি ক্ষমা করেন।]

এই উক্তিতে প্রক্রিয়াবিধার আহ্বান আছে, লৌকিক বিনয়-প্রকাশও আছে। কবি জ্ঞানের গোসাঁই তুলসীদাসজী-র সমসাময়িক। তিনি নিশ্চয়ই গোসাঁইজী-কে কবিগুরুরূপে আহ্বান করেন নাই, কাশীধাম ও গাজীপুর যেমন দূর নয় — ইহলোক পরলোকের মতো পরিচয় ছিল, এমন প্রমাণ নাই। প্রস্তাবনার সোহাগুলি যে স্থানে ছাপা-পুথিতে পাওয়া যায় উহার দ্বারা মনে হয়, যেন কবি জ্ঞানও স্বকীয় কাব্যের প্রশংসায় মালা ছাড়াইয়া নিজের মাহিকতা জাহির করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়: জ্ঞানচূড় হইয়া হয়ত সোহাগুলি এই বিরাট ও অসাধারণ সৃষ্টি করিয়াছে। জায়সী এবং কবি নূরমহম্মদের কাব্যে রসাত্মক বাক্যের অনুরূপ প্রশংসা আছে। শেষোক্ত কবি লিখিয়াছেন —

"হৌন অছত হৈ বাস সমানা, কবি সোতা হৈ তাঁর সমানা।"

মুসলমান কবি-র কাব্যের উপর "হিন্দী"-ছাপ মারিয়া আমরা প্রথমেই হিন্দী-উর্দু বিভাগের দূরী-পাকে পাঠাইয়াছি। যদি গান্ধীজী বিপাকে পড়িয়া দুই যোকায় পা দিয়াছেন, না দিলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। গান্ধীজীর স্বপক্ষে একটা ভাল ঐতিহাসিক নজীর আছে। আকবর বাদশাহ অল্পবয়স্ক অবস্থায় পড়িয়া এবং একই কালের প্রেরণায় আইন জারি করিয়াছিলেন—প্রাথমিক শিক্ষায় আরম্ভেই হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ পাঠশালা মক্তব-মাদ্রাসায় নাগরী ও ফার্সি বর্ণলিপি লেখা এবং পড়া অভ্যাস করিবে; ইহাতে এক বছরের বেশী সময় লাগিবেনা; অন্তঃ হিন্দীর

বড়-সড় হইয়াও সারা জীবন নাম পর্যন্ত লিখিতে-ছিলেন কিনা সন্দেহ। যাহা হৌক মোটামুটি অবস্থা— অর্থাৎ মুসলমান কবি আমীর খসরু, খানখানা আব্দুর রহীম, জায়সী, ওসমান ইত্যাদিকে লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে। মুসলমানেরা যে ভাষা-কে উর্দু বলিয়া দাবী করেন, হিন্দুরা হিন্দী বলিয়া বলেন। এই বিরোধ মাঝে মাঝে হাতাহাতি এবং কখনও বা হাসির তুফান সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে একটা আঠের গল্প মনে পড়িল।

এক সুধাসা সৈয়দ-সাহেবের মৃত্যুর পর বিকালে বেলা ষষ্ঠা করিয়া কবর দেওয়া হইয়াছিল। কবরের পাশেই চাষের জমি। পরের দিন এক জাঠ চাষা জমিতে লাঙল দিতে আসিয়া দেখিল, কবর খুঁড়িয়া লোহ-খোপ জানোয়ার শব বাহির করিয়া ফেলিয়াছে, একটী জন্তু (হাইনা) মৃতটী জন্তুর মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। হাল বলদ ফেলিয়া জাঠ তাহার অধিবাসী-ভাইদের নিয়া সোরগোল আরম্ভ করিল — "হজুর! আপনার বাপকে জন্তু টানিয়া লইয়া যাইতেছে।" সৈয়দ সাহেবের বড় ছেলে বাহিরে আসিয়া জাঠদের উত্তম-মধ্যম দিতে দিতে বলিল, "আহাম্মক বেইমান! আমার ওয়ালিদ সাহেব-কে জন্তু লইয়া যাইতে পারে?" বিলাতী ডিগ্রীধারী মেজো ছেলেটী তাঁহাকে বেহেস্তে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়াছিল। প্রহারের চোটে জাঠের মাথার দুবুদ্ধির উদয় এবং মুখ দিয়া এক ছত্র কবিতা বাহির হইয়া পড়িল। জাঠ হাতজোড় করিয়া বলিল, 'হজুর। আপনার কথাই ঠিক; আমিও ঐ কথাই বলিয়াছি, আপনি বুঝিতে পারেন নাই।'

"তু কহতা কেরেস্তা, মৈঁ। কহ জন্তু।

যোনি যোনি আতর হৈ, যোনি যোনি পন্থ।"

[আপনি যাহাকে ফেরেস্তা বা দেবতুল্য মনে করেন আমি উহাকেই "জন্তু" বলিয়া থাকি, কথা ও কথায় অনেক বিভিন্নতা, এক ভাষায় বুলি অন্য ভাষায় থাকি।]

সৈয়দ-সন্তান মরা খুশী হইয়া জাঠকে কিছু বকশিস দিলেন। হিন্দী-উর্দুর ব্যাপারে আসলে "যার নাম চালাকা তার-ই নাম বুদ্ধি"। উভয়ের মধ্যে কেবল নাগরী ও আরবী বর্ণলিপি লইয়াই ঝগড়া।

"চিত্রাবলী" কাব্যের জাতি-বিচার করিতে হইলে বিশেষ ভাবে কয়েকটি বিষয় সুধীসমাজের নিকট উপস্থিত করা প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত এই পুস্তকের তিন খানা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পুথি কালী-মন্দিরের রামেশ্বরক্ষিত পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপি অতি আধুনিক। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী এই পুথির নকল সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা কাশেরী হস্তাক্ষরে রামকান্ত ওঝা কর্তৃক, পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের জন্য নকল করা হইয়াছিল। পণ্ডিতজী এক খানা আসি অক্ষরে-লিখিত পাণ্ডুলিপি (নকলের তারিখ জানা নাই) সংগ্রহ করিয়া কাশেরী প্রতিলিপির উপর উক্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ সাজাইয়া লইয়াছিলেন। দ্বিবেদী মহাশয় "চিত্রাবলী"-কাব্যের এক সংস্করণ সম্পাদন করিবার চেষ্টা বোধ হয় করিয়াছিলেন। তিনি একাধিক কাজ আগলাইয়া বসিতেন এবং অন্য পণ্ডিত দ্বারা কাজ করাইতেন। সংস্করণের জন্য প্রস্তুত পাণ্ডুলিপিখানিতে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ দেখা যায়; কিন্তু কোথাও দ্বিবেদী মহাশয়ের নিজের হাতে লেখা একটিও অক্ষর নাই, পাঠ-শুদ্ধি নাই। শ্রীযুক্ত জগমোহন বর্মা নাগরীপ্রচারিণী-সভা কর্তৃক আনিত হইয়া এই পুস্তক সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে দ্বিবেদী মহাশয়ের পাণ্ডুলিপির উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। বর্তমান সংস্করণের ৯৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হওয়ার পর তিনি আলাইপুর-নিবাসী রহমান মিঁয়ার নিকট উর্দু অক্ষরে লেখা চিত্রাবলী-র একখানা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুথি

পাইয়াছিলেন। পুথি সংগ্রহের বাতিকের জন্যই বোধ হয় সর্বসাধারণের কাছে ইহারা "খোঁজী মিঞা" নামেই বিশেষ পরিচিত। এই পুথিখানির পাঠ পূর্বোক্ত পুথিদ্বয়ের পাঠ অপেক্ষা শুদ্ধ; যথা, এক জায়গায় "লহরী" শব্দের স্থানে "সহরী" (সহরি = পুঁটিমাছ) পাঠ দিবেদী মহাশয়ের পুথিতে লিখিত আছে, ছাপাও হইয়াছে। দিবেদী মহাশয় যাচিয়া থাকিলে কিন্তু পুঁটিমাছের সপক্ষে 'পদ্মাবত' পুথির তথা "মৃগাঙ্ক-চন্দ্রিকা"-র ভাষ্য—"কনক-কটোরা" শব্দের 'গলে ফুলকা মুড়ি' অর্থ করিয়া একটা কিছু জবাব দিয়া বসিতেন।

এখন বিচার্য বিষয়, স্বয়ং কবি ওসমান কোন্ হরফে তাঁহার পুথি লিখিয়াছিলেন? ইহা সর্বথা অনুমান-সাপেক্ষ; কারণ, নাগরী ও ফারসী দুই হরফে লেখা নকল পাওয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু আসল পুথি কোন্ হরফে লেখা ছিল কেহ বলিতে পারে না। "চিত্রাবলী"-র পূর্বে "পদ্মাবত", এবং পরে লিখিত "ইন্দ্রাবতী" সম্বন্ধেও ঠিক ঐকথা। 'পদ্মাবত' কাব্যের * বেশীর ভাগ পুথি পাওয়া গিয়াছে ফারসি অক্ষরে লেখা, কায়েথী নাগরী হরফে লেখা কয়েক খানা আছে। কবি নূরমহম্মদের "ইন্দ্রাবতী"-পুথির ফারসী অক্ষরে লিখিত একখানা পাণ্ডুলিপি নূরমহম্মদের বংশধর মৌলবী ছফিউল্লার নিকট হইতে মীর্জাপুর-নিবাসী মৌলবী আবদুল্লা পাইয়াছিলেন। আসল পুথিখানা ফারসী অক্ষরে লেখা ছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মৌলবী আবদুল্লা কায়েথী অক্ষরে এই পুথি খানা নকল করাইয়াছিলেন। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল বলিয়াছেন জায়সী-র গ্রন্থ সর্বপ্রথম ফারসী অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল; পরে উহা হিন্দী অক্ষরে নকল করা হয়। ফার্সী অক্ষরে লেখা 'ইন্দ্রাবতী'-র আসল পুথির কায়েথী অক্ষরে নকল করা ব্যাপার হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, মুসলমান কবিদিগের রচিত প্রেমগাথাসমূহ সর্বপ্রথম ফার্সি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। বাংলাদেশে দৌলত কাজী-র "লোর-চন্দ্রানী" এবং আলাওয়ালের "পদ্মাবতী"-পুথি সর্বপ্রথম বাংলা কিংবা ফার্সি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল সঠিক বলা যায় না। তার দিক হইতে বা দিকে লিখিবার কারণ হইতে বুঝা যায়, মুসলমান আমলে মুসলমানেরা সবই ফার্সি অক্ষরে লিখিতেন। ইহার ফলে, অন্যাবধি তাঁহারা ঐ লিপির সহিত পরিচিত ছিলেন। প্রেমগাথা-রচয়িতা মুসলমান কবিদিগের সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল; হিন্দী এবং বাংলা তাঁহারা সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম জানিতেন না। সাধারণতঃ বেশী বয়সে কোন নূতন ভাষা কেহ আয়ত্ত করিলেও সেই ভাষার বর্ণলিপি সুচারুরূপে অনেকে লিখিতে পারেন না। নাগরী লিখিতে না পারিলেও এই যুগে অনেকেই নাগরী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত, হিন্দী, নাগরী সাহিত্য অক্লেশে পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন। দৃষ্টান্ত বেশী দূরে খুঁজিবার প্রয়োজন নাই। মুসলমান আমলকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তিব্বতের বৌদ্ধ বিহারে বসিয়া বাংলা হরফে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' ইত্যাদি নকল করিয়াছেন। বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত পঠন-পাঠন কোন অজ্ঞাত কাল হইতে বাংলা দেশে প্রবর্তিত হইয়া আমাদের সময় পর্যন্ত ছিল। নাগরী- ওসমান, নূরমহম্মদ ইত্যাদি কবিদিগের অবস্থাটা বোধ হয় অনেকটা আমার মতই ছিল। হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছি, কিন্তু একটি কথা উদ্ধৃত করিতে হইলে, হয় বাংলা হরফেই লিখিয়া থাকি, কিংবা ছেলেদের দ্বারা নাগরী অক্ষরে লিখাইতে হয়।

---

* রামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত "পদ্মাবত"; বঙ্গবা, পৃ: ১

† ইন্দ্রাবতী, নাগরী-প্রচারিণী-সভা সংস্করণ।

মুসলমান কর্তৃক ফার্সী অক্ষরে যাহা লিখিত হইয়াছে, মুসলমান ধর্মের সহিত সম্পর্কিত যে সমস্ত প্রেমকাহিনীর প্রাধান্য, মুসলমানের ঘরে যাহা অমূল্য সম্পদ-জ্ঞানে আজ পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইতেছে — উহাকে হিন্দুগণ কেমন করিয়া আপনার জিনিস বলিয়া দাবী করিতে পারেন? এই সমস্ত প্রেমকাহিনীর একটা সাধারণ রীতি আছে। ঐ রীতি আরবীয় খলিফ এবং তাঁহার পূর্ববর্তী জাতি কবিগণের নিকট হইতেই মুসলমান কবিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতির বৈশিষ্ট্য — প্রথমে, নিরাকার বিরাজন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" আল্লার স্তুতি; ইহার পরে, হজরত মহম্মদ এবং তাঁহার "মেরাজযাত্রা" অর্থাৎ পার্শ্ব-চতুষ্টয়ের সৃষ্টী-মণ্ডল প্রদক্ষিণ; ইহার পরে তৎকালীন মুসলমান-বাদশাহের গুণ-কীর্তন। এই সমস্ত কাব্যের কোন কবিগণ কোথাও ইসলাম-বিরোধী কোন মতবাদ প্রচার করেন নাই, মূর্তিপূজা কিংবা বহুদেবদেবী-উপাসনার সমর্থন নাই। অপর পক্ষে, ইহা বলা যাইতে পারে, এই সমস্ত প্রেমকাহিনীর নায়ক-নায়িকাগণ হিন্দুস্থানের রাজা-রাণী, রাজপুত্র ও রাজকন্যা। 'পদ্মাবত'-কাব্যে জায়সী তবুও সুলতান আলাউদ্দীন-কে প্রতি-নায়ক হিসাবে স্থান দিয়াছেন; পরবর্তীকালের 'চিত্রাবলী' কিংবা 'ইন্দ্রাবতী'-কাব্যের উপাখ্যান-অংশে কোথাও মুসলমানের নাম-গন্ধ নাই। এই সমস্ত কবিগণ হিন্দুর দেব-দেবী, পূজা-উৎসব, সামাজিক রীতি ও লৌকিক সংস্কারের এমন সহজস্বচ্ছন্দ চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, যাহা কোন হিন্দু কবিতায়, এমন কি, তুলসীদাসজীর মহাকাব্যেও হিন্দুরা খুঁজিয়া পাইবেন না। ইঁহাদের ভাষায় আরবী ফার্সি শব্দের ব্যবহার দুই হইবে কিনা সন্দেহ; অথচ কঠিন সংস্কৃত শব্দ ইহা অপেক্ষা চতুর্গুণ হইবে।

হিন্দী-উর্দু সংগ্রাম আমাদের মতে ভ্রান্ত, তাহা কিংবা বিদ্বেষমূলক নয়। ইহা বিশুদ্ধ আধুনিক এবং রুচির সাম্প্রদায়িক আড়াআড়ি। মুসলমানে মুখের উপর দুই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এক শ্রেণীর হিন্দু ভাষার মধ্যে ফারসী শব্দ দেখিলেই আঁৎকাইয়া উঠেন; অথচ "কায়স্থ-কলম" বর্জন করেন নাই। লাল-কবি * (১৭৩৬-১৭৪৩ খ্রীঃ) সমসাময়িক হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

"ব্রজভাষা ভাষা কঠিন কহৌ সুকবি সব কোয়।
মিলৈ সংস্কৃত পারসিহ অতি প্রকট সুহোয়॥
মিলৈ অমর তরু মাধবী নাগ যবন ভাষানি।
সহজ পারসীহ মিলে ষট বিধি কবিত বখানি॥"

[সুধী ব্যক্তি সকলেই বলিয়া থাকেন, ব্রজভাষার সংস্কৃত এবং পারসিক ভাষার সহিত মিলন ঘটিলে ইহা অতি প্রকট প্রকাশশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে। যে কবিতায় অমর ভাষা সংস্কৃত, মাধবী, নাগ (রাজপুতানার অপভ্রংশ), যবন ভাষা (পাঞ্জাবী?) এবং পারসিক ভাষার সহজরূপে মিলন ঘটে সেই কবিতা-ই প্রকাশের যোগ্য।]

হিন্দী ভাষার এইরূপ উপর দাঙ্গা কলাচিৎ দেখা যায়। লাল-কবি জানালেন্দ্রযশোভূষণ দ্বারা আমাদের চোখের ছানি কাটিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার উপর অবতরণিকা লিখিতে গিয়াই, ঘোঁটা এবং বাঙালী হিন্দু-মুসলমান, ভাষা-সংগ্রাম বাধাইয়া অযথা সমাজে অকারণ বিক্ষুব্ধতা সৃষ্টি করিতেছেন। অযোধ্যের মুসলমান কবিগণ জানীজের কবীর দাসজীর ন্যায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পন্থাই দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজাবাদশাহ্-র জন্য কবিতা রচনা করেন নাই; সর্বসাধারণের কবিত ভাষায় হিন্দু-মুসলমান-কে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস পরিবেশন করিয়াছেন; কবীরজী

* মিশ্র বন্ধুবিনোদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬১১।

বলিয়াছেন —

"জাতি না পুছো সন্ত, কী পুছি নিশ্চয় জ্ঞান।
মোল করো তরবার কা পড়া রহন দো ম্যান॥"

[সাধুর জাতিবিচার না করিয়া জ্ঞান যাচাই কর; তলোয়ারের দামটাই জানিয়া লও, খাপ পড়িয়া থাকুক।]

সৎসাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। ভাষা এবং বর্ণনিপির কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সর্বদেশ, সর্বজাতির সাহিত্য হইতে যিনি রস গ্রহণ করিতে পারেন না তিনি রসজ্ঞ নহেন; মৌলাটি মধুস্রবের সময় শৌণ্ডিনীটী মূল বিচার করে না। বাংলা এবং হিন্দী ভাষার দুরারোহ্য বল ভাষার পরে পড়ে। অন্তরের দিকট হইতে ভাবসম্পদ এবং তদ্রসে কিছু কিছু অল্প অধিকারী না করিয়া ভাষাতত্ত্বের কোন ভাষাই সরল এবং সুখ হইতে পারে নাই, এবং করিবেও না।

মোট কথা, উপর হইতে বাষপিতে উচ্চ স্বরে লেখা আমাদের 'পদ্মাবতী' পুথি বাঙ্গালী হিন্দু আপনার বলিয়া যদি দাবী করিতে পারেন, তবে গুলমাদের "চিত্রাবলী"-গাথাও হিন্দী বলিয়া দাবী করিবার সকল কারণ আছে। "পদ্মাবতী" পুথির —

"সুআ সো মআ হেন সুরসরি বাণী"

—বাঙ্গালীর মনে একদিন যে প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছিল উহা কোন বাঙ্গালী হিন্দুর বাংলা হইতে লেখা কবিতা হইতে কম সুখর নহে।

(৩)

"চিত্রাবলী"-কাব্য মোট ৪৫ "খণ্ড" বা অধ্যায়ে বিভক্ত। কাব্যের প্রধান অংশে বিবৃত হইল। ইহাতে ইতিহাস এবং গল্প-অংশের যোগ-সাধন হইয়াছে। সুতরাং আশা করি, কেহ গ্রন্থ উপাখ্যান করিয়া ভাবভঙ্গ করিবেন না।

নেপাল-রাজ্যের রাজা বসীধর বহুবৎসর পর্যন্ত পুত্রমুখে হতাশ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। মন্ত্রীদের পরামর্শে তিনি সাধুসেবার জন্য এক বিরাট আয়োজন খুলিলেন। রাজা ভক্তি-সহকারে সমাগত সাধুদের পরিচর্যা করিতেন; কোন প্রার্থী-কে তিনি বিমুখ করিতেন না। ফিরিটেই কৈলাস পর্যন্ত। রাজার ভক্তি ও দয়া পরীক্ষার জন্য স্বয়ং হর-পার্বতী যোগী ও যোগিনী-বেশ ধারণ করিয়া একদিন রাজার দরবারে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ না করিলে জলগ্রহণ করিবেন না। শুনিয়া বসীধর বিনীতভাবে যোগি-দম্পতির প্রার্থিতব্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। রসবেত্তা মহাদেব বলিলেন, যোগোদ্দেশে তোমার মস্তক আমায় দিতে হইবে, অন্য কিছু আমি চাহিনা। রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলির পীঠের কাছে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। রাজার ভক্তি ও সাহস দেখিয়া হর-পার্বতী প্রীত হইলেন; রাজা দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং শিব ও ভবানী। কবি লিখিয়াছেন —

"সুরসরি সীস জলাসিবি মাথে,
হর-পহি গ্রীব ধরহ তর নাথে॥

কুচ ঘাস গল তরক্ষ রাখা।
ঐ পুনি সিখর-সুতা বনি সাথা॥

লোচন সথা অমিনি অধারা, দেহি হে মরন
অমর সম ধরা॥

[তাঁহার শিরে সুরসরিৎ গঙ্গা, স্কন্ধদেশে জলাসিবি, গ্রীবাদেশে কণিপতি বাসুকি,গলায় রুদ্রমালা, হাতে ডমরু; তাঁহার পার্শ্বে শিখর-সুতা গৌরী। তাঁহার অবলোচন অমিয় অধারা সদৃশ, যে অমিতে মরন অমর সম ধরা হইয়াছিল।]

উমা-মহেশের বরে রাজার একটি পুত্র জন্মিল। গ্রহবিপ্র "জোড়াচক্র" বিচার করিয়া নাম রাখিলেন, সুজান-কুমার। মহা ধুমধামের সহিত কুমারের শ্রীমুখা

সম্পন্ন হইল। কয়েক দিনে রাজা সমস্ত আত্মীয় কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে কুমার বিদ্যাশিক্ষার্থে বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের গৃহে প্রেরিত হইলেন। বিদ্যাশিক্ষার সহিত পরীক্ষা ও বাহুযুদ্ধ, অশ্বচালনা ইত্যাদি কুমার স্বাধীনভাবে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন কুমার সৈন্য-সামন্ত লইয়া শিকারে চলিলেন, সঙ্গে শিকারী-চিতার গাড়ী, শিকার-বাঘা তাজী কুত্তা—যেন কুমার সৈন্যে বাঙ্গালী শিকার-খানার সরঞ্জাম সহিত শিকারে চলিয়াছেন। সহসা অন্যমনস্ক কুমার অশ্বারোহী হইতে বহু দূরে একাকী শিকার খেলিতে খেলিতে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যা-বেলা আশ্রয়স্থান খুঁজিবার জন্য একটি পাহাড়ের উপর উঠিলেন। ঐ স্থানে পরিষ্কার আকাশের এক খণ্ডিমা [নিঃ জ্যো] দেখিতে পাইয়া পরিশ্রান্ত কুমার উহার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে এক সৈন্য আসিয়া দেখিতে পাইল, একজন মানুষ তাহার খাটিয়ার উপর আছে। ঐ সৈন্যই পাহাড়ের মালিক; সে অত্যন্ত ধনবান, আতিথ্যধর্ম্মের সহিত অপরিচিত নহে। কুমারের কাছে যাইয়া বাঘ ভালুক হইতে অতিথি রক্ষা করিবার জন্য সে জাগিয়া রহিল।

এই ভাবে একপ্রহর গত হইবার পর আর এক সৈন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দুই জন পরস্পর বন্ধু, বহুদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। আলিঙ্গন, কুশল-প্রশ্ন ইত্যাদির পর বন্ধু বলিল, তোমাকে আজ রাত্রে আমার সঙ্গে রূপনগর যাইতে হইবে। দক্ষিণাপথে রূপনগর রাজ্য। রাজা চিত্রসেনের অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা চিত্রাবলী এখন একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বহুকাল তাঁহার রূপযৌবনের কথা শুনিয়াছি; নানা স্থানে সেখানের নাচ তামাশা দেখিয়াছি; কলিকালে যত রাগ-রাগিণী প্রচলিত আছে সবই শুনিয়াছি। কন্যাদের গান শুনিয়া যাহা-তহ গন্ধর্ব্ব চুপ হইয়া যায়, সুরপতি ইন্দ্র লজ্জায় মাথা নীচু করেন। সৈন্যের বন্ধু সরকারী রসিক। বন্ধুকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রূপনগরের নাচওয়ালীর কথা শুনাইয়া বলিল, তাহাদের রূপের খাঁদার তুলনাকি, কণ্ঠস্বরে ব্রজকুমুল যাহা পড়িয়া থাকে; কিন্তু দর্শকের অমূল্য মন তাহাদের পায়ে পড়িয়াও রেহাই পায়না, নাচের তালে তালে নাচি খাইয়াও নাচিয়া থাকিতে চায়।

কুমারের পাহারায় নিযুক্ত ঐ সৈন্যের কথোপকথন শুনিবার সখ হইল; অথচ অতিথিকে ছাড়িয়া যাওয়াও যো নাই। অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া ঘুমন্ত রাজপুত্র-কে খাটিয়াসমেত উঠাইয়া রূপনগরে চিত্রাবলী-র শয়নকক্ষে নেওয়াইয়া রাখিল। আশা ছাড়িয়া ঘুম ভাঙ্গিবার পর রাজপুত্র দেখিল, সে যেন এক স্বপ্নপুরীতে আসিয়াছে। চিত্রশালার প্রাচীর গাত্রে সারিসারি চিত্র, কাহারই নাকোশিল ঃ তুলিকা ইত্যাদি। উহার মধ্যে যেন এক সজীব অপরূপ নারী-মূর্ত্তি প্রাচীর-গাত্র আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুজনসুন্দর উহাকে দেখিয়াই মোহগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার উক্তি অবশ্য —

"কবই সীস পাই তর ধরণী, কবহুঁ টীক মোটী
বিনতী তরই।
কবহুঁ চাহৈ অকল গহ,
হাথ ন আব অচক মন রহা।"

— কখনও পায়ের নীচে মাথা রাখিতেছেন, কখনও

* মূলগ্রন্থে এক পাতায় (পৃঃ ৩০) সংগীতশাস্ত্রের "হনুমত"-মত এবং "পার্ব্বতী"-মতের বিচার, রাগ-রাগিণী, গায়ক-বৈদগ্ধ ইত্যাদি সুরের বর্ণনা আছে। মুসলমান আমলে সংগীত-চর্চ্চা সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই অংশ অবশ্য পড়িবেন। এই গ্রন্থে আমার অধিকার নাই; সুতরাং অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে। রাগিণীর মধ্যে "বংগালী" বাদ পড়ে নাই।

করজোড়ে পাঠাইয়া মিনতি করিতেছেন, কখনও আঁচল ধরিতে যাইয়া ধরিতে পারিতেছেন না। কুমার জ্ঞান হারাইয়াছেন। উহা যে মানবী নয়, শুধু পটে-লিখা ছবি! হতাশ হইয়া কুমার নিজের ছবি কুমারীর পাশে আঁকিয়া রাখিলেন। আবার তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল।

পর দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিবার পর কুমার দেখিতে পাইলেন তিনি নির্জন পাহাড়ের উপর নিতান্ত একাকী পড়িয়া আছেন। অর্ধরাত্রির সেই সুধা চিত্রাবলিকা নাই, প্রিয়তমাও নাই। তবে ইহা কি স্বপ্ন, না মায়া, না অতিমন্ত্র! নিজের হাত এবং পরিধের বস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন, জায়গায় জায়গায় রং লাগিয়া আছে। মনে মনে স্থির হইতে পারে, অতঃপর কি করিয়া প্রস্থিত হইতে পারে? ইহার পর কুমারের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও প্রেম-বিকার।

স্বপনলোকের রাজকন্যা চিত্রাবলী-র অবস্থাও তদ্রূপ। চিত্রশালায় তাঁহার ছবির পাশে অনিন্দ্যসুন্দর রাজপুত্রের ছবি দেখিয়া তিনিও প্রেমে উতলা হইলেন। পটের সহিত কথার ঐ প্রেমের বাস্তবিক দূর করিবার জন্য রাণী, এক কুটনীর কথা শুনিয়া, কুমারের চিত্রটি দূরে ফেলিলেন। ইহাতে ফল হইল বিপরীত। রাজকুমারীর হুকুমে ঐ চাকরকে বাধা দূরাইয়া দেশের বাহির করা হইল। চিত্রাবলী পটে-আঁকা কুমার-কে মন-জগতে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে অন্বেষণের নমুনাসহ যোগাসনকে পাঠাইলেন। তাহারা যোগী-বেশে ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া, কথার অনুরূপ সেই বিরহী রাজপুত্রকে সন্ধান করিতে লাগিল। দৈবক্রমে ইহাদের মধ্যে একজন নেপাল-রাজ্যের কর্ণপালের উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রকে চিনিয়া ফেলিল। রাজপুত্র যোগী হইয়া তখনই চলিলেন; সেখানে এক শিব-মন্দিরে চিত্রাবলী-র সহিত গোপনে সাক্ষাৎ হইল। পরের দিন রাজকুমারী কর্তৃক অপমানিত সেই তরুণ সুজানকুমারের নিকট আসিয়া বলিল, চিত্রাবলী মাতৃকাসদনে এক কাজল পাঠাইয়াছেন; এই কাজল চোখে দিলে আপনাকে কেহ দেখিতে পাইবে না; আপনি নিজের রাজকন্যার মহলে গতায়াত করিতে পারিবেন।

প্রেমে পড়িলে মানুষ চোখ থাকিতেও আঁধা হইয়া যায়, সাধুও চুরিবিদ্যা আয়ত্ত করে। রাজপুত্র প্রয়োজনে পড়িয়া ঐ বিষাক্ত কাজল চোখে দেওয়া মাত্র স্বয়ং অন্ধ হইয়া গেলেন। পাষণ্ড তরুণ কুমার-কে ভুলাইয়া এক পাহাড়ের গুহায় ফেলিয়া দিল। গুহার মধ্যে ছিল এক বিরাট অজগর সাপ। কুমার-কে উপস্থ করিয়া অজগর ছোবল দিতে লাগিল; কেমনা, বিরহ-ক্লিষ্টের দেহের ঘ্রাণ বাঘাড়ি-কে হার মানায়। অজগর কোনমতে কুমার-কে পেটের ভিতর করিয়া পলাইয়া গেল। পাহাড়ের উপর হইতে একটি বনমানুষ এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল। বনমানুষ দ্রুতপায় রাজপুত্রকে গুহা হইতে তুলিয়া আনিল এবং একপ্রকার পাতার রস চোখে দিয়া কাজলের বিষক্রিয়া দূর করিল। বনের ফল দিয়া চলিতে চলিতে কুমার এক হাতীর সামনে পড়িলেন। হাতী কুমার-কে শুঁড়ে উঠাইয়া আছাড় মারিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় এক অষ্টিকায় পক্ষীরাজ হাতীকেই ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হাতী আকাশ হইতে রাজপুত্রকে সমুদ্রের কিনারায় বালিয়াড়ির উপর ফেলিয়া দিল। ঐ দেশের সাগর-রাজার কন্যা কৌলাবতী [কমলাবতী] সখীগণের সহিত নিকটস্থ উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন। তিনি যোগী সুজানকুমার-কে দেখিয়া প্রেমে পড়িলেন। সাধুসেবা-র অছিলায় কৌলাবতী কুমার-কে অন্তঃপুরে ভোজন করাইতে বলিলেন; কিন্তু কুমার রাজকুমারীর আত্মনিবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। বিদায়ের সময় এক সখী সাধুর ভক্তকের মধ্যে ডিবাকের সহিত রাজকন্যার হার ফেলিয়া দিল। চুরির অপরাধ

কুমার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ঐদিকে রাজকন্যার সখী মুনিনী-র মারফত প্রেমবার্তার আসা যিওয়া-যিওয়া অপেক্ষাও কুমারের পক্ষে অসহ্য হইল।

কয়েক মাস পরে সোহিল-রাজা কৌশাম্বীকে প্রার্থনা করিলেন। এই খবর লইয়া দূত যাইয়া দেখে। নাগর রাজার রাজধানী অবরুদ্ধ; রাজা সপরিবারে কিল্লা-মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত। এই সংবাদ পাইয়া যখন রাজকুমার সোহিল-রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুমার অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সোহিল-রাজাকে বধ করিলেন। জয়মাল্যস্বরূপ কৌশাম্বীর বরমাল্য কুমারের গলায় পড়িল; কিন্তু বাসর-রাত্রির সুখশয্যায়, উদাসী হৃদয় কমলের প্রতি বিমুখ হইয়া, নিজের দুঃখ নিবেদন করিল :—

"কুঁঅর কহা মুহু রাজকুমারী, ঐী জোগী
অহ ভঁবর হুআরী।
খোজত অহা জো কেতকি দালা, বীচহি
অহুঅ কীঅ গরালা॥
জো লহুঁ তৌরি কেতকি পাবৌ, কৌল
আস তৌ সৌ ম পুআবে।
* *
এক প্রেমরস ছোই তব্, অব্
চিত্রাবলী পাউ।"

[রাজপুত্রি! আমি উদাসী, যোগী। দুঃখী ভ্রমর কেতকী-র সুবাস খুঁজিতে খুঁজিতে অর্ধপথে অজগরের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ভ্রমর যে পর্যন্ত কেতকী-কে পাইবেনা সে পর্যন্ত কমলের বাসনা পূর্ণ হইবার নয়; প্রেম-রস তখনই হইবে যখন আমি চিত্রাবলী-কে পাইব।]

যাহা হৌক্, রাজকুমারী প্রেমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিলেন না। ঘোটকথা, "মানবতী গার্লস স্কুল"-নাটকের নায়ক-নায়িকা অপেক্ষা উহাদের সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্ঠতর হইল। কবি বলিয়াছেন —

অবরন্থ নাই অবর রস নীনূহা।
এক রস ছাড়ি ঔর সব রস নীনূহা॥

সুজানকুমারের আকস্মিক অন্তর্ধানে জগন্নয়ের রাজকন্যা চিত্রাবলী শর্বরীকর ন্যায় লোকচক্ষুর অগোচর অন্তরের আস্তরে লুকিয়েছিলেন; বাহিরে প্রাসাদী, কিন্তরে অনল অঙ্গার। তাঁহার দূতগণ আবার চতুর্দিকে পলাতকের অনুসন্ধানে ছুটিল। পশ্চিম দিকে প্রেরিত দূত প্রথমে মুলতান দেশে উপস্থিত হইল। সেখানে সিন্ধী লোকের বাস, তাহারা মহীরাবণের* উপাসক। মুলতান হইতে দূত খট্টা নগরে [বর্তমান করাচীর নিম্ন ভূমে] চলিল। সেখানে বিচিত্র বর্ণের দুষ্টী লোক দেখা যায়। উহা লরকানা† ও মেলুচ-জাতির দেশ। খট্টা হইতে দূত পেশাওয়ার ও কাবুল চলিল। কাবুল "মোগল" জাতির দেশ; ঐ দেশের রাজারা পৃথিবীপতি হইয়া থাকে। কাবুলের পরে বলখ্-স্থান, খোরাসান, সিজেস্তর মালার রাজা জম (রোম) এবং "শাম" বা সিরিয়া দেশ। ইহার পরে হাজীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজকুমারীর চর মক্কা যাত্রা করিল। কবি বলিয়াছেন, যাহারা কাবা-শরীফের পাথর-কে পাথর বলিয়া মনে করে তাহারা ভোগ থাকিতেও যোগী। যাহার "সিদা" [অকৃত্রিমতা] লাভ হইবে, সে মহীমা সেলেও কি হয়!

---

* ভারতবর্ষে এরূপ কোন সম্প্রদায় ছিল কিনা জানা যায় নাই। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক।

† মূলে "লরকা ন বলুচা" আছে। ইহার কোন অর্থ হয়না। ফার্সী-লিপি হইতে পাঠোদ্ধারে সম্পাদক মহাশয় "ন" কে আলাদা করিয়াছে। সিন্ধুর 'লরখানা-জিলায়ে' নাম হইতে ঐ "লরকানা" জাতি হইয়াই প্রচলিত হইয়াছে।

দক্ষিণ দিকের চর এতক্ষণে ইংরেজের দেশ বলশীল পর্যন্ত দেখিয়া আসিল। সেখানে ছোট বড় সকলেই ধনী; সেখানে সেখানে বন্দর। তাহারা ওলন্দের বাস এবং পসার খায়। পূর্বদিকে চরের সকল মধুরা হইতে চীন দেশ পর্যন্ত। মধুরা বৃন্দাবন, দিল্লী প্রয়াগ, কাশী এবং মোহতাস দুর্গ তালাস করিয়া দুই ত্রিহুত অর্থাৎ উত্তর বিহারে উপস্থিত হইল। গাজীপুরের মুসলমান কবি বিহারপতি-র কবিতার সহিত সুপরিচিত ছিলেন; তিনিই রূপনগর-ওলন্দীয় চর-কে বিহারপতি-র পানে পাঠাইয়াছেন। বিহার হইতে বাংলাদেশে প্রবেশ করিবার পথ "গড়ী" (রাজমহলের পশ্চিমে সিঙ্গিয়ালী)। উহার উত্তরে পথ, দক্ষিণে পাহাড়; সাহসী ব্যক্তিরাই শুধু এই পথ দিয়া যাইতে পারে, প্রথমে সাহসের না হইলে হাত-পথে ডাকাতের হাতে প্রাণ দিতে হয়। গড়ী বা দুর্গবন্দর পৌঁছিয়া বোধহয়ে রাজকুমারীর চর বাড়ী বাড়ী রাজকুমারকে তালাস করিল। সোনারগাঁ, ফুলুয়া, চট্টগ্রাম, সন্দীপ বেড়াইয়া রূপনগরের দূত আসাম চলিয়া গেল; ঢাকা সহরে আসিল না, অথচ তখন উহা বাঙ্গালার রাজধানী। বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন —

"পুরব অনুপম দেশ বঙ্গালা, পুরবি রহিমি
ভীমিহ কালা।

পাচ হাথ ভূমি জলপূরী, ঘরি ঘরি থৈ
দেখে ন পূরী।
সুখে পঁথন চলৈ বহীরী, ঘরি পাটি তৈ
মেহলী পাউ।

অন্ন ঘন দুধ দুধ মিঠ থালী, দয়া হিয়ে পৈ
লোক বঙ্গালী।
ভঁই নহ হিংজা উহ নহ বিদা, হী'জা বিনে
বিদারে জিজা।
নব কহ অমিরিত পাচ তৈ, বঙ্গালী কহ সাত।
কেলা কাঁঠী পামরল, নাদ বাহুরী জাত॥"

[পূর্ব দিকে বাঙ্গালা এক অপূর্ব দেশ। এই খানে ভূমি চিরসবুজ, তৃণরাজি শ্যামল। বৎসরে পাঁচবার এইখানে জলে ভরা, পায় নৌকা ব্যতীত পথ খুঁজিয়া পাওয়া। ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় ডাকাত বাটপাড়; কিন্তু নৌকায় চড়িয়া নিরীহ যাওয়া যায়। দুধের মতো অন্ন এবং ঘনের প্রাচুর্য; দুধের মতো মিঠা পানি (?)। বাঙ্গালী লোক দয়ালু। সেখানে ইচ্ছা সেখানেই বহু (আসল অর্থ, 'বাহুরী') পাওয়া যায়। জিভা একবার জুটিলেই অন্য কথা মনে পড়ে না।* সকলেই বলে 'অমৃত' (দধি দুগ্ধ ঘৃত পর্যন্ত ইত্যাদি) পাঁচ প্রকার; বাঙ্গালীরা বলে সাতটী। যথা — কলসী, কাঠিল, পান, খেজুরের রস, শাক, মাছ ও ভাত।]

বাংলাদেশে নিরাশ হইয়া দূত কোচ, কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা, পেগু, আরাকান দেশের ঐশ্বর্যশালী স্থানে রূপনগরওলন্দীয় প্রেরিতদিগকে খোঁজ করিল। ইহার পর আবার ব্রহ্মপথে আসামে উপস্থিত হইল। আসাম দেশের রাজার উপাধি "স্বর্গদেব"। হরিয়াল পাখী যেমন অট্টালিকে বাস করে, কখনও মাটিতে পা দেয়না — সেইরূপ অসমিয়াগণ রাজদিন মাচা-র উপর থাকে। তাহাদের যান-বাহন — নৌকা এবং হাতী। পূর্বদিকে চলিতে চলিতে চীন দেশে উপস্থিত হইয়া দূত আসিয়া হইয়া পড়িল। এখন

---

* সেকালে বিদেশী লোকেরা বাংলাদেশে আসিলেই একটা বিবাহ করিত; কিংবা "পরদেশী" দুঃখের গান গাহিয়া বাঁচ শ্রেণীর বাহুরী যোগাড় করিত। নিজের মতলবেই কাঁদে পড়িয়া, খোট্টারা এমন আরাম-আয়েশের বাংলা মুলুক ছাড়িত না। তাহাদের দেশের স্ত্রী-পুত্রেরা বিশ্বাস করিত, "বাঙ্গাল-কা যাদু" খোট্টা-কে দিনে ভেড়া, রাতে বাঘুন করিয়া রাখে।

আর পৃথিবী নাই, কোথায় সে যাইতে পারে? বাকী রহিল শুধু স্বর্গ; সেখানে যাইতে হইলে কবিরাজকে নিরুদ্দেশ পর্বতের চূড়ায় উঠিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিরুদ্দেশ পর্বতে গিয়া আসিল। তৈরাং এই সময়ে ভূপালকুমার কৌলাবতী-র নিকট হইতে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া শিকারে ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিলেন। কুমারের সন্ধান পাইয়া খুব তাড়াতাড়ি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া চিত্রাবলী-কে সংবাদ দিলেন, কেতকী-র পত্রখানা এখন পর্যন্ত তাঁহার হস্তগত হয় নাই। চিত্রাবলীর বিমলপত্রিকা লইয়া দূত আবার ছদ্মবেশে সাগর-রাজ্যে যাত্রা করিল। সেখানে পঁহুছিয়া দেখা পাইল এক শিব মহাপুরুষ অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া যুবক দূত তরুণী বালিকা মনে মনে ভাবিয়া চারিদিকে ফিরিয়া চাহিল। অবশেষে দেখা পাইল, শিবভাবা দুইজনে সকলের মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারেন; তাঁহার কৃপায় দুঃখেরা ধনিক ধন ফিরিয়া পায়, বন্ধ্যা পুত্র-সন্তান লাভ করে, পতিব্রতা স্ত্রীর পরাভক পরাধীনী স্বামী ঘরে ফিরিয়া আসেন, ইত্যাদি। এতদিন-পরে ভূপালকুমার শিব-মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিলেন। দোহন সাক্ষাৎকারের সময় দুজনেই দুজনের পায়ে লুটোপুটি। চিত্রাবলী-র চিঠি পড়িয়া কুমার সাগর-রাজার রাজ্য হইতে পলায়নের মতলব করিলেন। খুব ফিরিয়া তিনি কৌলাবতী-কে বলিলেন —

"অয়েমি দুরস্থ অব রাজকন্যে, যৌ পরাধীনে আমি ভিখারী।

আউর হুয়ে-আয় হম, মালপাই খুব

খোয়া।

চিত্রাবলী বিরহ-অনে, হামকো বিরহ-বিয়োগ॥"

[মহারাজাধি! আমি পরাধীনে, এখন আমার ভাগ্যে ভিখারী হইয়াছি। এখন আমার মালপাই খুবকেতে আর কাজ নাই। আমি যাহার বিরহ-বিয়োগী সেই চিত্রাবলী-ই আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে।]

ইহার পর কৌলাবতী-কে অল্প কয়েক কথায় প্রবোধ দিয়া কুমার যোগীবেশে ঝোলা-কাঁথা কাঁধে ঝোলিয়া নিরুদ্দেশের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন। তপনদত্ত যোগী আত্মপ্রকাশ করিয়া চিত্রাবলী-কে বিবাহ করিলেন। পরে কৌলাবতীকেও তপনদত্তে লইয়া আসিলেন। অবশেষে ভূপালকুমার দুই রাণী লইয়া সৈন্যিক রাজ্যে ফিরিলেন।

চিত্রাবলী-কাব্যে কবির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু শেষ কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে —

"জান যার যদ্যি সব, জপ তপ সবের সেরা।
মন সে উদাস বনভবন, সে প্রবিপাটে
প্রেম॥

[জানা-থাকে জপ-তপ নিষ্ঠা-সংযম সবকটি সবার— মনের ভাল। যিনি প্রেমের পথে অধিক, জগতের লোক তাঁহাকেই উদাস বলিয়া জানিবে।]

মেঘদূতের যক্ষের মতো কৌলাবতীর বিরহের দুঃসহ অশ্রু দুর্ভেদ্য, অথচ প্রেমের জন্য কবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমান যুগের ধনী উহার বাণী-র সার্থকতা আছে।

(৪)

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য কাব্য-সমালোচনা কিংবা ঠাকুরমার ঝুলি ধরিয়া ছড়ানো গল্প বাহির করা নয়। বিনা মতলবে ঐতিহাসিক কবিতা কাব্য পাঠ করিয়া থাকে। এই "চিত্রাবলী"-প্রেমকাব্যের মধ্যে ঐতিহাসের আলোচনা আছে; অধিকাংশ স্থলে কেহ উহার সমালোচনা করিবেন। কবি ওসমান এবং তাঁহার কাব্য হইতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। ইসলামের নিয়ম একেশ্বরবাদ হিন্দুস্থানের মাটির সোঁদা গন্ধে যে ভাবে তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়কে পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে কৌতূহলিক ব্রাহ্মণও সম্পূর্ণরূপে আরোপ করিতে পারেন না।

কাব্যের প্রারম্ভেই ঈশ্বরস্তুতি; ইহারও আলা কিংবা

মোসলমানী শব্দ-বিন্যাসের কোনরূপও নাই, অথচ মিঃসঙ্কোচে সর্ব্বত্র আছেন, ভাব অতি প্রকট। ওসমানের গুরু ছিলেন যাহা হাজী নামক মোসলিম ভেলভুবি-নিবাসী মহাপুরুষ। তাহার সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"বিহু সো যবনী একদিন, যবত যবত পা পুষ্টী।
তবসী পুনি ভয় সোঁ, তায় নয়ক নহ ছুট্টী।"

[সেই-ভাবে (জামরূপ যবনস্ত দ্বারা) যখন কবির কবিতে একদিন হেয় অর্থাৎ অহংজ্ঞানে লোপ পাইবে ; "তৎবয়সি"-জ্ঞান উদয় হইলে সব নরকের ভয় ভাঙ্গিয়া যায়।]

মুসলমান কবি ও লেখক ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে-ছেন : অথচ এই প্রচারের ভাষা ও ভাবধারার মধ্যে কোথাও বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা নাই। খ্রীষ্টান পাদরীদের ন্যায় পরধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং দেবতার মূর্ত্তি ছাপাইয়া বিনা পয়সায় বিতরণের উৎকট মুসলমান আমলে মোল্লাদেরও ছিলনা। আমীর খসরুর সময় হইতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় চারিশত বৎসর পরে জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ঐ ব্যবধান অন্ততঃ ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইনা। মুসলমানগণ ইসলাম ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী মূল বা কবিতা মধ্যে প্রাণে ভারতবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। কবি ওসমানের জন্মভূমি গাজী-পুর-বর্ণনাই ইহার মস্ত দৃষ্টান্ত। যথা—

"গাজীপুর উত্তম অস্থানা, দেবস্থান আদি জন জানা।
গঙ্গা তিনি যমুনা তীর আই, বীচ তিনি সোবতী সুহাই।
তিন্হারা উত্তম ওই চীন্হা, রাপর তীর দেবতন রূপ
কীন্হা।
পুনি কলিমুল অই বসতিল তথী, জামহ অমরপুরী
বসি গই।
উপর কোট রোট সুহলাবী, দেবত পাপ বিথা জাঁই
হরী।"

[গাজীপুর উত্তম স্থান। সকলেই জানে আদি অর্থাৎ দেবতারা এখানে বাসভূমি ছিল। যমুনার সহিত মিলিয়া গঙ্গা সেখানে আসিয়াছেন ; মধ্যপথে মিলিয়াছে সুনীরা সোবতী। জিয়ারা-র ছোট পরিষ্কার স্থান আসিয়া যাপর মূলে দেবতারা এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। কলিমুল আবার লোকসমাকীর্ণ অমরপুরীসদৃশ নগর এই স্থানে করিয়া উঠিয়াছে। উপরে দৃঢ়কোট সুরক্ষিত। যাহাকে দর্শনমাত্র পাপ তাপ দূর হয় সেই সুরক্ষিত গঙ্গা বিরাজিত।]

হিন্দুর তীর্থযাত্রা কবির জানাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করা হইয়াছে — এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমরা স্থানে স্থানে স্বল্প পাঠকের বিরক্তিকর মূল বোল উদ্ধৃত করিয়াছি। ওসমান সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারের সহিত সম্যক পরিচিত ছিলেন। তাঁহার উপর পাণ্ডিত্য ফলাইবার বিদ্যা লেখকের নাই। সুতরাং কবি-র সমস্ত অধিকৃত রাখিয়া "গাজীপুর-বর্ণন"-সর্গের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল —

"গাজীপুর নগরে বহু বিদ্বান পণ্ডিত, বেদ বেদান্ত জানেন। এ নগরবাসীগণ জ্ঞানে যৌন, দয়ায় চতুর বাগ্মী, অরিমুখে সিংহ-শার্দ্দূল। যুদ্ধব্যবসায়ী যোদ্ধগণ পাঠান, ঘোরপুর রাজপুত, বাজনিপুণ ভাট, ডাঁড়, অন্যান্য [শিল্প] এবং সঙ্গীতব্যবসায়ী ওস্তাদ বাহক এই নগরের অধিবাসী। যাহাকেই দেখ সে নিজের কাজে বেশ রাজা। সেখানে সেতারে তানচর্চ্চা, নাচ, ক্রীড়া, কৌতুক ; সমস্তদিন লোক রাস্তায়ও বাধা দোলাইয়া চলে। যে যাহার মনোমত আবাসেই থাকে, উহাই তাহার দুনিয়া ও স্বর্গ।..... হিন্দু ও তুরুক সেখানে অভিন্নীয়। চারি বর্ণের লোকে শহর ভরপুর। ব্রাহ্মণগণ সকলেই পণ্ডিত জ্ঞানী ; চারি বেদ তাঁহাদের জানা আছে। হোম, জপ এবং তুলসী মান তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। ক্ষত্রী বৈশ্য সকলেই

বিদেশীরা। পুরুষদের ঘরে ঘরে পশমবোনা গলাবন্ধ, মাথাবাঁধা রুমাল ইত্যাদি বর্ণনীয়। চারিদিকেই আনন্দ, কেলি-কোলাহল, দুঃখ কি জিনিস, কেহ জানেনা।"

কোনদিন দুর্ভাগ্যে এমন স্থানে কোথাও ছিল কিনা জানিনা। মোগল সাম্রাজ্যের ছায়ায় গাজীপুর পরমে মোগল-পাঠান, শেখ-সৈয়দ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র যেখানে একত্র বাস করিত সেখানে নিশ্চয়ই মসজিদ-মন্দির, আজান-শঙ্খধ্বনি, পাঠোবলি-কোর্বানি, মহাষ্টমী-দুর্গাপূজা, রোজা-একাদশী, চাচিরা-শোভাযাত্রা, মূর্তি-পাঞ্জাসাও ছিল; অথচ সেখানে অনাবিল প্রীতি, অহিংসা ও অখণ্ড আনন্দ। ঐতিহাসিকের মত যে-রসিক হইলে, মুসলমান-কবি নয়া মেরা ধাপের গাজীপুরের ইতিহাসের অন্ত পণ্ডিতদের ধারস্থ না হইয়া, কোন্ নামজাদা গাজী সেখান জয় করিয়া পুর-পত্তন করিয়াছেন, কোন্ জায়গায় শহীদের কবরী কবর আছে — অন্বেষণ করিতেন। ঐতিহাসিকের পাখা নাই, উড়িতে পারে না; কবি আকাশচারী বিহঙ্গম, উর্ধ্বলোক হইতে দেবের দৃষ্টিতে তিনি মাটির পৃথিবী দেখিয়া যাইতেন। কাজেই ঈসা-ঈসবী, অসবাব অনুসর কিছু তাঁহার চোখে পড়ে না; হিংসায় অশিব শিরাধ্বনি তাঁহার কর্ণ ও মর্মপীড়া জন্মাইতে পারে না। যাহা হৌক, কবি-বর্ণিত মুসলমান রাজত্বের এই অনাবিল সমাজ-চিত্র আমাদের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু, অতীতের বস্তু। আপনার মুসলমান হিন্দু মুসলমান গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে — "কেহি মো দিবসা পরা:।"

বিস্তৃত ঘরে পরাণ-বঁধু
একান্ত উতালা,
শরম-স্নেহে নীরবে ঘনে'
ভাবিছে রাজবালা —
কে পরালে মালা।

কেমন বীর-মূরতি তার
মাধুরী দিয়ে গিলা,
দীপ্তিভরা নয়ন মাঝে
তৃপ্তিহীন তৃষা।

ঘরে তারে দেখেছে যেন,
এমনি মনে লয় —
ঘুচিয়া গেছে, ছড়ায় তবু
অসীম বিস্ময়।

কণ্ঠ হ'তে ফেলিল হায় —
যেন বিজুলি-জ্বালা।
শরম 'পরে লুটায়ে পড়ে'
ভাবিল রাজবালা —
কে পরালে মালা।

বঙ্গ-দর্শন

"এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে নানা জাতি। বাঙালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, সিন্ধু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই; ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই!....কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক — যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা-জ্ঞান নাই।

স্বাতন্ত্র্য অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। তিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাতশত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, একণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন।... পুরাণ-উপপুরাণ, কাব্যনাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। রাজার রাজ্য-সম্পত্তি রক্ষার যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস — এ সকলের ভূরিভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা।"

— বঙ্কিমচন্দ্র

কি লিখিব? পাঠক-পাঠিকাদিগেরই জিজ্ঞাসা করিতেছি। 'বঙ্গ-দর্শন' অর্থে — বাংলা ও বাঙালীর খুব বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে, আমাদের ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় — তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা; অবস্থাটা প্রধানতঃ বাঙালী-সমাজের অবস্থাই বটে; কিন্তু বাঙালীর হাল-চাল, মতি-গতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম — তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি, এবং আরও বিশেষ করিয়া, সাহিত্যিক কীর্ত্তিকলাপের একটা 'যাচ-বাছ' দেখাই আমাদের অভিপ্রায়। কিন্তু অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে — সাহিত্যের দুর্গতি, এমন কি, জীবন-মরণ সমস্যার কথাটাই এত বড় হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই সমস্যাকে চাপা দিয়া, যে যেমন পারে,

ইহারই দরুণ হইতে কিছু করিয়া লইবার চেষ্টা এমন সর্বব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে — যে, আর কোন বিষয়ের আলোচনা নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। দরকারও যা ছলচাতুরীর অবকাশ ত' নাই-ই ; নিজেদের কুল ভ্রান্তি, নির্বুদ্ধি-দুর্বুদ্ধির কথাও যে কিছু চিন্তা করি, তাহারও উপায় দেখিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কি লিখি ? ঠিক এই সর্বব্যাপক অবস্থা চিন্তা করিলে যে কথাগুলি বারবার মনে আসে তাহা লিখিলে অনেকেই চটিয়া উঠিবেন। আমাদের পুরাতন বন্ধুদের অনেকেই এই বিভাগের আলোচনা পাঠ করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন ; আমাদের লেখার ভঙ্গিটা যেমন ভাল নয়, তেমনই, তাহাতে যোগত্তর 'প্রেস্টিজ' আছে, 'যুক্তিহীন কটাক্ষ' আছে, এমন কি, 'স্ক্যান্ডাল'ও আছে ! এ অভিযোগের প্রত্যেকটিই গুরুতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ইহার উত্তরে, এবার আরও কয়েকটি কথা অকপটে ও স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকার উপরে ছাড়িয়া দিলাম।

* * * *

এই 'বক-ধর্মে' আরম্ভ করিবার পূর্বেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমরা যাহা সত্য বলিয়া মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, তাহাই বলিব ; আমাদের চিন্তা, মতামত, যা বিশ্বাস যে অভ্রান্ত, এমন কথা আমরা কখনই বলি না। তেমনই, অপরেও — তাঁহাদের পক্ষে জোটপাথা দরুই অনুচিত হইবে — যে অভ্রান্ত, এমন বিশ্বাস আমরা করি না ; কারণ মানুষ দেবতা নয়। আমরা প্রতিবাদও করি, অভিযোগও জানাই ; কিন্তু কখনকে কখনও অশ্রদ্ধা করি না, করিলে আমরা 'বক-ধর্মে' লিখিতাম না। কাহাদের — এবং কি জন্য — বিরুদ্ধ সমালোচনা করি, তাহাও, যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি — যা স্বার্থান্ধতার ভয় নাই, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। আমার তাঁহারা এই বাজারেই, যেন কিছু ওজারীরা হইতে পারিয়াছেন — পুরিপীর পাড়ী ও নিজের গাড়ী সর্বদাই সরবরাহ করে — তাঁহারাও, সৌখীন দৃষ্টি ও সৌখীন মনোভাবের চর্চা করিয়া আত্মপ্রসাদের উপায়তায় এমনই স্ফীত হইয়া থাকেন যে, আমাদের এই অল্প কচকচির মালা ও ঝাঁ কুঞ্চিত করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। এ সকলই আমরা জানি ; ইহাও জানি যে, সর্ববিষয়েই মতভেদ আছে। কিন্তু মতভেদ অর্থে ইহাই নয় যে, বিরুদ্ধ মতবাদেই লাঞ্ছনা বা সভা নয়। আমরা ভ্রান্ত হইতে পারি, কিন্তু আমাদের এই সকল মত-প্রকাশের মূলে কোন কু-অভিসন্ধি নাই, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় নাই, কাহাকেও আঘাত করিবার কারাক্ষও নাই।

* *

'বক-ধর্মে'র যে কোন 'দল' নাই — ইহাই তাহার একটা অপরাধ বা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। দল নাই বলিয়াই, বাংলাদেশের কোন পত্রিকা তাহার সম্বন্ধে একটা ভাল কথা বলিবে না, খুব বেশি যদি অনুগ্রহ করে, তবে গালি দিয়া কিছু লিখিবে না ; গালিগালাজ সকলেই গালি দিবে। অতএব আমাদের সম্বন্ধে 'স্ক্যান্ডাল'-এর কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বরং যাঁহারা ইহার প্রথম সংখ্যা দেখিয়া, উপহাস করিয়া গালি দিয়াছিলেন যে, ইহা একটা 'one man show', তাঁহাদের সেই গালিই আমরা সাদরে বলিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। কিন্তু, 'প্রেস্টিজ' এবং 'যুক্তিহীন কটাক্ষ', এই দুইটাই নিরুপায় গালাগালি, কাজেই উহার কি উত্তর দিব ! যেখানেই কেহ আর কাহাকেও ঐ দুইটা গালি দেয়, সেইখানেই অপর পক্ষ ঠিক উহাই ফিরাইয়া দিতে পারে, তাহাতে তর্কে কেহ কখনও হারিয়াছে ? আর ঐ 'প্রেস্টিজ' কথাটা যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহারা বিদ্বান হইলেও বুদ্ধিমান নহেন, সাধু হইলেও জ্ঞানী নহেন ; কারণ, যাহার কোন 'প্রেস্টিজ' নাই সে ত' পরমহংস

হইয়াছে, যদি পরমহংস না হইয়া থাকে তবে অপরের 'প্রেডুলিস' আছে বলিয়া গালি দেয় কেন? আমরাও চটিয়া উঠি, কিন্তু 'প্রেডুলিস' বলি না—বলি, মোহ অথবা অজ্ঞানী। 'মোহ' বলিলে মানুষকে ক্ষমা করাও হয়; এবং 'অজ্ঞানী' বলিলে অন্ততঃ তাহার বুদ্ধিকে সম্মান করা হয়। 'প্রেডুলিস' কথাটির আমাদের আরও আপত্তি এই যে, ইহার দ্বারা—শুধুই দীর্ঘশ্বাস নয়, সহীর্ষশ্বাস, বা চিন্তা-শক্তির অভাবও বুঝায়। আমাদের কিন্তু একটু চিন্তা করিবার, একটু তর্কবিতর্কের শক্তি আছে, এমন দাবী করি। কেবল যে আমাদেরই আছে, তাহা বলি না—অনেকেরই আছে, আমাদেরও আছে। ইহাও দাবী করি যে, বাংলাদেশে এখনও যেটুকু স্বাধীন চিন্তা, সত্য চিন্তা, নিঃস্বার্থ কল্যাণ-চিন্তা অবশিষ্ট আছে—আমাদেরও তাহাতে কিঞ্চিৎ দান আছে; যদি তাহা কোথাও না থাকে তবে আমাদেরও নাই।

• • •

বাকি থাকে ঐ 'যুক্তিহীন' কথাটা। আমরা ত' কোন যুক্তির উপর জোর দিই না, আমরা ত' কোন তত্ত্ব প্রচার করি না। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ও অভিজ্ঞতায় (মানুষমাত্রেরই যাহা আছে, এবং থাকা উচিত) যেমন দেখি তেমনই বলি; সেখানে যুক্তির অভাব নয়, সেখানে ভুল হইতে পারে; সেখানে যুক্তি-প্রমাণ বড় নয়, অভিজ্ঞতার কথাটাই বড়। যদি আমাদের সেই দেখাটা ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অথবা আমাদের দৃষ্টিটা বাঁকা হয়, তাহাতেও অসহিষ্ণু হইবার কারণ নাই; দৃষ্টি ত' সকলেরই আছে। তাহাতেও যদি যুক্তির আবশ্যক হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, কিসের গোলমাল আছে, সে গোলমাল এক পক্ষেই নয়, দুই পক্ষেই হইতে পারে। কিন্তু আমরা তাহাও স্বীকার করি না; কারণ, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের কথা যে অস্বীকার করে তার কারণ, আমরা সেই সকল তথ্য হারাইয়া দিই, যাহা চাপা দিবার চেষ্টাই হইয়া থাকে; ঐ তথ্যগুলি আগে, আমাদের মতামতের মূলের মূলা চাই না। বরং, যাহারা ঐ যুক্তিহীনতার কথা বলে—আমাদের সন্দেহ হয়, তাহারা তথ্যের সত্যকেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। কেন নয়, তাহা আমরা জানি বলিয়াই তথ্যগুলির একটু ব্যাখ্যা করিতেও হয়। ব্যাখ্যা যুক্তিহীন কিনা, তাহার প্রমাণও ঐ তথ্যগুলি।

• • •

আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসমত সত্যকথা বলিতেই চেষ্টা করি, ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা বলি না; যদি কোন কথা মিথ্যা হয় তাহা তথ্যগতই মিথ্যা; সেরূপ হইলে আমরা সর্বাগ্রে তাহা স্বীকার করিব, তাহাতে ত' কোন লজ্জা নাই। শুধু নিজেরাই নয়—আমরা সকলকেই, তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও সহজ বিশ্বাসমত অকপটে, যাহা বলিতেছে তাহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে বলি, একটা ছলের চলনা না লাগাইয়া—সহজ বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় তাহাই স্বীকার করিতে বলি। এ বিষয়ে জাতির শিক্ষিত সমাজেরও কতখানি অক্ষমতা বা বুদ্ধিনাশ ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখ পাই। যেখানে বিদ্যা আছে সেখানে জ্ঞানজ্ঞান নাই; যেখানে বুদ্ধি আছে সেখানে সত্যনিষ্ঠা নাই; যেখানে দুইই আছে সেখানে চরিত্র নাই। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি নাই, চরিত্রের গর্বও নাই; কিন্তু সত্য-নির্ণয়ের একটা আন্তরিক চেষ্টা আছে। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে কেবল ঐ টুকুই দাবী করি। সত্যনিষ্ঠা যাহাদের নাই তাহাদের যুক্তি থাকিতে পারে, আমাদের যুক্তি না থাকিলেও সত্যনিষ্ঠা আছে। যাঁহারা যুক্তি-পরায়ণ তাঁহারা যদি সেই সঙ্গে সত্যনিষ্ঠও হন, তাহা-হইলে আমরা তাঁহাদের পায়ের ধূলা লইয়া এই কলমটা তাঁহাদের হাতেই তুলিয়া দিব। কিন্তু হইবে কেমন করিয়া? তাঁহারা কিছু করিয়া লইয়াছেন, আরও লইবার আশা রাখেন, তাঁহারা কি এই

নির্দোষ? তাহারও ব্যক্তিগত সাধুতার কথা বলিতেছি না, বুদ্ধিমান বাঙালীর সেন্স-অফ্-হিউমর কথা বলিতেছি।

কিন্তু আমরা কী এমন যুক্তিহীন কথা বলিয়া থাকি? আমাদের পাঠক-পাঠিকারা এতদিনে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন — কোন্ দুইটা কথার উপরে আমরা সর্বদা জোর দিয়া থাকি; কথা-দুইটাও একেবারে গোড়ার কথা। 'আমরা বলিয়া থাকি যে, আমরা স্বাধীন হই নাই; ইহাতেই বোধ হয় সকলে আমাদের উপরে জ্বলিয়া চটিয়াছেন। চটিবারই কথা যে! অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষার পরে, "আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি" বলিবার একটা অদ্ভুত অন্তরঃ মিলিয়াছে। সে স্বাধীনতা যে কেমন — মুখে কেমন, শাসায় কেমন, এবং প্রশংসায় কেমন — তাহা আমাদের নেতাগণ, এবং আমাদের সংবাদপত্রগুলির স্বাধীন সম্পাদকগণ সকলেই জানেন। কিন্তু ঐ পিতলটাকেই যদি সোনা বলিয়া একটু বুঝিয়াও দেওয়া যায়, তবে চির-চিন্তিকে সেটুকু সুখেও বঞ্চিত করিতে চাহিলে — যে করিতে চায়, তাহাকে কি কেহ ক্ষমা করিতে পারে? স্বাধীনতা যে কি বস্তু, তাহা কেমন করিয়া লাভ করিতে হয়, এবং লাভ করিয়া থাকিলে তাহার নিদর্শন প্রমাণ কি — এ সকল প্রশ্নের একটারও উত্তর এই হতভাগা জাতি দিতে পারে না — শুনিতেও চাহে না। কেবল সকলে মিলিয়া সমস্বরে বলিতে পারিলেই হইল — 'আমরা স্বাধীন হইয়াছি।' মজাটা যাচাই করিতে যেন্সেই — কেহ বলে, স্বাধীনতার মজায় পৌঁছিয়াছি, মজাটা খোলা-না-খোলা সম্পূর্ণ আমাদের হাত; ইহাই ত' স্বাধীনতা। কেহ বলে, আমরা বাহিরে যতটা স্বাধীন হইবার তাহা হইয়াছি, তবে যে এখনও সুখভোগ করিতে পারিতেছি না, এখন কি, জীবনের দুঃখভোগও বাকি আছে, তাহাতে স্বাধীনতার গৌরবহানি হয় না; আমরা এখনও যেমন শান্ত শিষ্ট, অহিংস, প্রেমপরায়ণ হই নাই, তাই এখনও অনেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। স্বাধীন হইলেই ত' চতুরানন মুচিবে না, বরং অবস্থা আরও জটিল হইবারই কথা; তাহাই হইতেছে, ইহাতে স্বাধীনতার দোষ কি? যাঁহারা আমাদিগের জন্য এই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও বলেন, স্বাধীনতার কিং-পজল আমরা করিয়াছি, সোল্-রিপোর্টটা বাকি আছে; এবং এমন ভয়ও দেখাইতেছেন যে, যদি আমরা নীরবে সকল কষ্ট সহ্য না করি, যদি কিছুমাত্র অস্থিরতা প্রকাশ করি, তবে ঐ রিপোর্টও বদলিয়া যাইবে। এই সকল কথা শুনিয়া, এবং দস্তাকার অবস্থা দেখিয়া, আমরা যদি সন্দেহ প্রকাশ করি — যদি যদি — ইহা ত' 'লাভ' করিয়া পরে 'ক্ষতি'-করার কথা নয়, তাহা হইলে সমস্যা ক্রমেই আরও জটিল, এমন কী ভীষণ হইয়া উঠিবে না; আসলে ঐ স্বাধীনতা-লাভের গোড়ায় গলদ আছে — তবে কি কথাটা বড়ই যুক্তিহীন হয়? জোমিনিয়ন ষ্টেটাসের কথা ছাড়িয়াই দিলাম (তাহা নিরর্থক বলিয়া অবশ্যনীয়) — সে জাঁক যা হয় নাই করিলাম; কিন্তু প্রজাসূয়ককে যে-ভাবে হয়ম-পাসন করিতে হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা এখনও স্বাধীন হইতে পারে নাই, অথবা তাহারা স্বাধীন হইবার উপযুক্ত নয়। ইহা স্বীকার যিনি না করিবেন, তাঁহার যুক্তি থাকিতে পারে; যিনি করিবেন তাঁহারও যুক্তি আছে। কিন্তু যুক্তিটাই বড় কথা নয় — সত্যটা কি?

* * * *

আর সকল যুক্তি ছাড়িয়া দিই; এই যে দেশটা বিভক্ত হইয়াছে, ইহা কি স্বাধীনতা-লাভের ভয়ঙ্কর অন্তরায় নয়? ভারতবর্ষের একটা অংশ, ইহার অঙ্গচ্ছেদ-বিচ্ছেদের মত সম্পূর্ণ একটা পৃথক দেশ ও রাষ্ট্রে পরিণত হইল; যে কারণেই হোক, তাহাকে যদি সম্মতি দিতে হইয়া থাকে, তবে তাহাতেও

স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ হইবে, এমন কথা কোন্ অর্থে সত্য হইতে পারে? ভবিষ্যতে আবার হইতেও তো পারে। এইরূপ আশা ও আশ্বাস ব্যর্থ-সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা কি যুক্তিসঙ্গত? আশাও কি একটা যুক্তি? সেই জোর করিতে হইবে এমন কথাই যদি বলিবার হয়, তবে কি ইহাও বলা উচিত নয় যে, যেদিন ঐ হইবস্ত আবার যুক্ত হইবে, সেই দিন ভারত স্বাধীন হইবে, তৎপূর্বে না। না, এমন আমরা এক কিস্তি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি? স্বাধীনতা কি এমন কিস্তিবন্দী ভাবে লাভ করা যায়? সে কেমন স্বাধীনতা? ঐ বিশ্বযুদ্ধোত্তর-যুগের স্বাধীনতা-লাভের পরেও ভারতবাসীর উপরে যে আক্রমণ বন্ধ হইয়াছে, এবং সেই আক্রমণ রোধ করার ব্যাপারে এক পক্ষের যে দুর্বলতা অতিমাত্র সুস্পষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী (আমি ধর্মঘটের কথা বলিতেছি না, আক্রমণের কথা বলিতেছি), তাহা চিন্তা করিলে, এই সম্বন্ধে স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু, তাহা বুঝিবার জন্য খুব বেশি যুক্তিশক্তির আবশ্যক হয়? কাশ্মীর বা হায়দ্রাবাদ — অন্তত কাশ্মীর এখনই যে বাঘের মুখে পড়িয়াছে, সে যে 'বনে ছুঁলে আঠারো ঘা' — তাহা কি এখনই বুঝা যাইতেছে না? আমি সংবাদপত্রের সংবাদ বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বীরত্ব-ঘোষণার কথা বলিতেছি না, যাহারা রিয়ালিস্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ তাঁহাদের আলোচনার কথাই বলিতেছি। আমরা অনেক আগেই, কাশ্মীর আক্রমণকালেই বুঝিয়াছিলাম, ইহার আর রফা নাই; আবার, মিঃ জিন্না সাহেবের পাকিস্তানের পর্যায় আকাশ দিয়া—যাহারা 'পাকা ধানে' নজর করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের সহিত পাল্লা দেওয়ার শক্তি ও আগ্রহ এখনই হয় নাই। যাহারা এইরূপ এখনও এই কার্য করিতেছে, তাহাদের সহিত মিত্রতা করা করিতেই হইবে, নহিলে ঐ স্বাধীনতাও রক্ষা করা যাইবে না; বলিতে হইবে, ব্রিটিশ জাতি অতিশয় সাধু হইয়াছে, তাহারা দাদাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে; এ সব যাহা দেখিতেছ, ইহাতে আটলি সাহেবের, বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন হাত নাই। হাত যে নাই ইহা খুব বড় করিয়া না বলিলে, ঐ স্বাধীনতালাভের কোন অর্থই হয় না; কারণ, ইংরাজ যে তাহার ত্যাগ করিয়াছে—তাহাদিগকে এই ত্যাগ করাইতে পারাটাই যে আমাদের আসল জয়লাভ — এ কথা বলিতে এবং বলাইতে হইবেই। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে ব্রিটিশের সকল নীতিই বজায় আছে, এমন কি, শাসনযন্ত্রটার সকল অংশে — তাহার চাকাগুলিতেও, ইংরেজের খাদ তুলাগুলি — বড় লাগাম্বাগুলিই যেমনই মজবুত হইয়া বসিয়া আছে। এ সকল কথা যুক্তির কথা নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা। কাশ্মীরের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত রফা করিতেই হইবে, এবং তাহাও সেই 'অর্ধ-অঙ্গুলি'র অনুরূপ। স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে যে 'অর্ধ-অঙ্গুলি' নয়—তাহাও সেই বড়াই করিতে হইবে। না বলিয়া উপায় নাই যে! ইংরাজ যে ছাড়িবে না। স্বাধীনতা-লাভের সকল ফলাফল এইরূপ; যাহারা ভবিষ্যতের আশায় হাত পাতিয়া আছে, তাহারা ইহাতেও পরিবে না জানি; কিন্তু ভবিষ্যতে কি না হইতে পারে! বিশেষত, এই অপদার্থতার দ্বারা অমিত্রতার বিষে। ভবিষ্যতের হিসাবে বর্তমানের বাহাই হয় না, বিশেষত এইরূপ সকল ব্যাপারে। এই যে মহাবিপদ-ভঞ্জন স্বাধীনতা, ইহার সকল ফলাফল এমনই যে, শুধু যাহিরের শত্রুর বিরুদ্ধে নয়—নিজের আত্মীয়জনের সম্বন্ধেও অতিশয় চিন্তিত হইতে হইয়াছে। যদি সত্যকার স্বাধীনতালাভ হইত, অর্থাৎ এই স্বাধীনতা যদি মূলে সত্য হইত, তবে নিজেদের বিরুদ্ধতাও আপনা আপনি শান্ত হইয়া আসিত; যাহারা এতদিন মরিয়া দেশে একটা ঘোর অশান্তি ঘটাইবার জন্য, দল বাঁধিয়া ও ষড়যন্ত্র করিয়া এখনো হীনতার আশ্রয়ে কাজ হইয়া উঠিয়াছে,

তাহারাও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িত।

* * *

আমরা আর একটী কথা বলি, তাহা এই যে—ব্রিটিশজাতি ভারত ত্যাগ করে নাই, কেবল একটু গা-ঢাকা হইয়াছে মাত্র; ছাড়িয়া যাওয়া মুখের কথা, শত দুইশত বৎসরেও বিতাড়িত করিতে পারে নাই, এবার তাহাই করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে, যা করিয়া লইয়াছে। এবার যে একটা বড় বিপদে পড়িয়া (আমাদের ভরে নহে), তাহার জাতিসুলভ অসাধারণ কূটনীতির আশ্রয় লইয়াছে—পুরাতন অধিকার ছাড়িয়া দিয়া, আরও কঠিন করিয়া পুনরধিকারের জন্য, একটা বড় রাজনৈতিক জুয়া-খেলায় মাতিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত সফল হইবে কি না, ইংরেজ কেমন ভাবনা কখনও করে না; উপস্থিত যে পন্থা সে অবলম্বন করিয়াছে তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া জানে; তাহার এই সংকল্পই আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে। এই যে কাশ্মীর ও হায়দারাবাদের ব্যাপার—ইহার পিছনে, প্রায় প্রত্যক্ষভাবে কে রহিয়াছে? আমাদের তাহা বলিবার সামর্থ্যও নাই, বলিলে নিজেদেরই মুখ হেঁট হয়; তা' ছাড়া, ইংরেজের সংস্রব ত্যাগ করিবার শক্তিও নাই। তাই কাশ্মীর ও পাকিস্তানের উপরেই রাগ ঝাড়িতে হইতেছে। এই যে, ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে নাই, আমরা বলিয়া থাকি—ইহাতেও কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না, মাত্র যুক্তির তুচ্ছটিকা-ভাগ ছিন্ন করিয়া দিলেই, সত্যটা সূর্য্যের মত প্রকাশ হইয়া পড়ে।

* * *

যাঁহারা যুক্তির কথা বলেন, তাঁহাদের উত্তরে আমরা এত কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম, নতুবা, ঐ এক কথা পুনঃ পুনঃ বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই অবস্থায় যাঁহারা দেশ-শাসনের ভার পাইয়াছেন তাঁহাদের ধারিত ও দুশ্চিন্তা যে কত অধিক তাহা আমরা বুঝি। তাঁহারা কিরূপ অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল রকম জানেন; বাঙ্গালী যে কিরূপ বুদ্ধিহীন, শক্তিহীন ও একতাহীন হইয়া পড়িয়াছে, কিরূপে যে কতদিকে কত চক্র ও চক্রান্ত চলিতেছে, ইহাও তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বাহিরেও একেবারে মূলের উপর, কোন্ অঙ্গ কিরূপ শাসিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে, সে সংবাদও তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। এমন অবস্থায় এই দেশের শাসন ও রক্ষার ভার যাঁহারা লইয়াছেন, তাঁহারা যে সুযোগের আশায় তাহা করিয়াছেন, এমন কথা কোন বুদ্ধিমান বাঙ্গালীই বলিবে না—যাঁহারা এমনও বলপতিত্বের কামনা করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। অতএব, যাঁহারা এই সুকঠিন ভার লইয়াছেন, তাঁহাদের নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনত চলিবার ও চালাইবার অধিকার আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও আমরা বিশ্বাস করি যে, আইনের দ্বারা সমস্ত দেশটাকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, এমন কি, মুখও প্রায় বন্ধ করিয়া দিলে, হিতে বিপরীত হইবে—সজ্জনেরাও দুর্জ্জনের সহিত যোগ দিবে, দুর্জ্জনের বলবৃদ্ধি হইবে। সত্য বটে, অনেকে তাঁহাদের সমর্থন করিবেই—কিন্তু তাহারা দেশের আপামর সাধারণ নয়, এবং তাহাদের অধিকাংশই কোন নীতির ধার ধারে না; তাহারা শাসক-সম্প্রদায়ের সম্মান করে কেন, তাহাও বলিতে জানে। ইহাদেরই দ্বারস্থত দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যাইবে না। ইহাদের অধিকাংশই ধনিক, শক্তি-সম্পন্ন; সাধারণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইলে, ইহারাদিগকেও তাহারা সুচক্ষে দেখিবে না; তাহাতে কোন্ পক্ষের বল বৃদ্ধি হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তখন একমাত্র পুলিশ ও দমনকারী কর্ম্মচারী ছাড়া আর কাহাকেও পাওয়া যাইবে না, তাহাতে নেতা ও রক্ষকরূপে তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের লোকের

সমর্থনও চাই। তাঁহারা কাহাদের সমর্থন রাখেন বা নিরপেক্ষ মনে করিতেছেন, তাহাদের অধিকাংশের চরিত্রগুণে, কলমের খোঁচায় তাহাদের প্রতি আস্থাহীন হইবে। আর যদি পুরাতন শাসননীতিই অবলম্বন করিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, যদি উস্কানি দেয় বলিয়া উপায় সম্বন্ধে তাঁহারা সঠিক বোধ না করেন, তাহা হইলেও কি ঘটিবে বলা যায় না, কারণ বর্তমানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নূতন; সকলেরই বিশ্বাস এ বারের তাহাদের বিক্ষোভেরই শাসন; তাই প্রথমে বড় অবলম্বন পাইবে। তার উপর, বাঙালী অতিশয় স্পর্শকাতর। তাঁহারা যে জনমতের নির্দেশ দিবেন, তাহাদেরই প্রতিনিধি — সেই প্রতিনিধিরাই তাহাদের চক্ষে অধঃপতিত বা নিন্দিত হইয়া পড়িবে। অবস্থা খুবই জটিল সন্দেহ নাই। এ জন্য শুধু উস্কানি মূলক হইলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া সেই সঙ্গেই শুদ্ধ করিয়া জন-মনের নিকট লঘু করিলে চলিবে না, উপায় সম্বন্ধে আরও ধীর হইতে হইবে। আমরা রাজনীতি বুঝি না বলিয়াই হয়ত' বলিতে হই, কিন্তু আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয়।

আর কিছুর ত' নয়; বাহিরের যে অবস্থার কথা বলিয়াছি, তাহাও বর্তমানে বাঙালীর পক্ষে কম উদ্বেগজনক নয়। রাজ্যরাষ্ট্রের চতুষ্পার্শে, এমন কি, ভিতরেও যারা আরব হইয়াছে এবং জবরদস্ত হইয়া পড়িবারই সম্ভাবনা, তাহাদের এই ধনে-পাওয়া (Award) কয় দিন রুখি — পূর্বপাকিস্তানের এই উদ্বৃত্ত জনশক্তিকে ঠেকা করিবার কি ব্যবস্থা হইয়াছে? সেই শিখী হইলেই কি সৈন্য-সামন্ত আসিবে? না, প্রেম ও অহিংসার বাহিনী দ্বারা সেই আক্রমণ রোধ করা হইবে? বাঙালীকে ত' অস্ত্রধারণ করিতে দেওয়া হইবে না — দিলেই যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করিবে, আরও কি করিবে কে জানে? ইংরেজও ঠিক তাহাই বলিত। তাহাদের ঠাকাঠি করিবার অস্ত্র চিরদিনই পাইবে, গৃহে আত্মরক্ষা করিবার অস্ত্র রাখিতে পারিবে না, কারণ, তাহাতে হিংসা-হানাহানি, দাঙ্গা প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা; আরও কারণ, তাহাতে রাজ্যের নিরাপত্তা নষ্ট হইতে পারে। কে তাকাতি, খুন প্রভৃতি অন্যায়ে চলিতেছে, এবং চলিবে বলিয়াই বোধহয় — কারণ পুলিস কিছুই করিতে পারে না, পারিবেও না — সেই ডাকাতি দমন করিবার জন্য কি আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্র রাখিতে দেওয়া হইবে না? রাজ্যরক্ষার জন্য জনসাধারণকে অস্ত্র দেওয়া হইবে না — দেশ-রক্ষার জন্যও বাঙালীকে মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়া হইবে না! কাশ্মীরে যারা হইতেছে তাহা যে হঠাৎ এখানেও হইবে না (উপরে দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে বড়ই বড় কথাবার্তা চলুক না কেন) এমন বিশ্বাস করিবার কোন কারণ আজ আছে কি! পাকিস্তানের রাষ্ট্রপরিচালনীতি যে কেমন, তাহা আজ কে না মর্মে মর্মে বুঝিতেছে? যাহারা রাজনীতিকেই ভুল করিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের সেই নীতি প্রযোজ্য হইতে পারে, এমন কি, অবিলম্বে ভবিষ্যতে তাহারা জয়ী হইয়া যাইতেও পারে, কিন্তু যাদের ত' কোন ভবিষ্যৎ-চিন্তা থাকে না, তারা জানেও পারে না; যদি সেখানের কেহও আক্রমণ করে — আক্রমণের সুযোগ, সুবিধা, আয়োজন, প্রয়োজন কোনটাই কম নহে — তবে আমাদের দশা কি হইবে? হয়ত কাশ্মীরের অবস্থা হইবে না কি! সেখানে শুধু সেখ আব্দুল্লা আছে, এখানে কে আছে? থাকিবার মধ্যে নাই, কারণ তাহা হইলে, সাম্প্রদায়িক পাশাচরণ বৃদ্ধি পাইবে — থাকি প্রেম ও অহিংসার এই বৈকুণ্ঠপুরী (যে পুরী-রক্ষার জন্য আইনের বন্ধবন্ধন আবশ্যক হইয়াছে) কলুষিত হইবে। কিন্তু যদি সেইরূপ কিছু ঘটে, তবে তাহার প্রতিরোধ কি প্রকার হইবে, তাহা ত' আমরা দেখিতেই

পাইয়েছি, বাঙালী জাতির — দেশের নর-নারীর — সেই অবস্থা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। সেইরূপ ঘটনা সম্ভব না হইলেও, অনুরূপ কখনই নয়; যদি ঘটে, তাহা হইলে কোন্ পক্ষের কিরূপ জবাব দিতে হইবে, অথবা কিরূপ সন্ধি হইবে, এবং সেইরূপ আক্রমণ-কালে ও সন্ধিস্থাপনের পরে, আমাদের অবস্থা কি হইবে তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার অধিকারও আমাদের নাই? না, এসব কথা একেবারেই 'যুক্তিহীন'?

•

ইহার জন্য অবশ্য আমাদের অর্থাৎ বাংলার শাসন-পরিষদকে দায়ী করিতেছি না; কেবল ইহাই বলি যে, বাংলাদেশের বাঙালী শাসন-কর্তৃপক্ষ, আন্তর্রাষ্ট্রের বৃহত্তর নীতি ও বৃহত্তর স্বার্থের কথাও যেমন সর্বদা মনে রাখিবেন, তেমনই, তাঁহারা যে বাঙালী — বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশের সম্বন্ধে তাঁহাদের যে একটা পৃথক দায়িত্ব আছে, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এমন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে নবলব্ধ স্বত্ব রক্ষা করাও সম্ভব নহে। বাংলার সমস্যা যে স্বভাবতই কিছু স্বতন্ত্র — সে জন্য সর্ব-ভারতীয় নীতির অন্ধ অনুসরণ বাঙালীর পক্ষে মঙ্গল-জনক নয়, এ কথা খুলিয়া বলিতে আমাদের সাহস হয় না, কিন্তু বাঙালী হইয়া তাঁহারা কি একথা বুঝিবেন না? বাংলা রক্ষার জন্য তাঁহারা বাঙালীকে বিশ্বাস করিতেছেন না কেন, তাহার উত্তরে যাহা বলিবার আছে, ইংরাজও কি ঠিক তাহাই বলিত না?

• •

কিন্তু এ সকল কথা বলিয়াও কোন ফল নাই। বাঙালীর বুদ্ধিনাশ হইয়াছে। নহিলে, বাংলাদেশে এত দলাদলি কেন? সকল ক্ষেত্রেই, যে সম্বন্ধে অবহেলা সেই সর্বাপেক্ষা বড়াই হয় কেন? নেতাগিরি একটা রীতিমত ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। ব্ল্যাকমার্কেটের প্রশ্রয়দাতা না হইলে দেশের শক্তিবৃদ্ধি হয় না, নেতাগিরি করাও দুঃসাধ্য; হয়ত বা ভিক্ষুকের তালীমের হইতেও বাদে না। কিছুই আশ্চর্য নয়। বাংলাদেশের এত ঘা'য়ের ভিন সবাই পলিটিক্স্ করিয়া একেবারে গণপতি ও ঘনপতি হইয়া উঠিয়াছে — পলিটিকসের চরিত্র বদ্ধ মিলিয়াছে বলিয়া কেহ-কাহারও বড়ই সুবিধা হইয়াছে। ঐ পলিটিকস্ এমনই সর্বগ্রাসী যে, কতকগুলা সাহিত্যিকও একটা সঙ্ঘ করিয়াছে; তাহারা বলে, তাহাদেরই নাকি বাংলা সাহিত্যের মোরসে—ধর্ম-পলিটিকসের জোরে তাহারাই নাকি সাহিত্যের গতি স্থির করিয়াছে! ইহারা অতঃপর ঘোষণা করিতেছে যে, পলিটিকস্ ছাড়া সাহিত্য হইতে পারে না; যেহেতু তাহারাই সাহিত্য-পলিটিকসের নেতা অতএব সকলকেই তাহাদের চক্ষুশূল মানিতে হইবে, যে না মানিবে তাহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে। ইহারা নূতন নূতন প্রমাণ প্রবর্তন করে — তাহার জন্য আদালত হইলে, কমিশনও বসায়! তাই বলিতেছিলাম, বাঙালীর পাপের ভরা ভরিয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যের পুণ্যক্ষেত্রটাও ক্লেদে পঙ্কিল করিয়াছে। এই সকল কথাই আমরা লিখি — আর কেহ লেখে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা লিখি; ইহা অনেকেরই ভাল লাগে না, বলে — "প্রেস্টুকিস", "যুক্তিহীন"!

• •

ঐ যে নীলবর্ণ শৃগাল বাংলাসাহিত্যের বনে রাজা হইয়া দাপাদাপি করিতেছে, উহাদের কোন্‌টা ছোট রাজা, কোন্‌টা বড় রাজা বলা কঠিন; কারণ নবনারী-কুঞ্জরের মত উহারা পরস্পরকে এমন ভাবে আঁকড়াইয়া আছে যে, কোন্ মাথাটার পেছে কোন্‌টা, তাহা ঠিক করা শক্ত। বিষ্ণুশর্মা একটা শৃগালের কথাই বলিয়াছেন, এ যে প্রায় এক গণ্ডা! না, তারও বেশী, কারণ দুই-চারিটা কেউও আছে। কিন্তু সেই একটার এমন সুবিধা ছিল না, যেমন

গলায় ডাক বাহির হইল অমনি সব চাহিয়া দেখে। কিন্তু ইহাদের যে ডাক নাই, তাহার পর ডাক ছাড়িতেছে বড় কেহই কিছু বলে না, মনের অবস্থাটা যেন জানোয়ারের খাইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ইহারা আর একটি বড় অবয় ডাক ছাড়িয়াছে—ডাকটা শুনিয়া বোধ আমরাও ডাবোচ্যাকা খাইয়াছি, একটু মজাও হইয়াছে। তবে খুলিয়াই বলি।

* * *

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নাম দিয়া এক সিনেমা-কোম্পানি একখানা ছবি তৈয়ারী করিয়াছে। তৈয়ারীরা সাহিত্যের উপরে একটু আর্ট ফলাইয়াছে। এখন কিছু অজানা নয়ে নাই; আজকাল ত আর্ট ও সাহিত্য এক হইয়া গিয়াছে। রেডিও-আর্টিষ্ট, থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং গল্প-উপন্যাসের সাহিত্যিক সব একত্র হইয়া মিলিয়া ঐ আর্টের নিদর্শনা প্রস্তুত করিতেছে। সকলেই একই সোত্রের — একই গোত্র বিভিন্ন ধরে, — দেখেন নাই কি, সকলেই, আবশ্যক হইলে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ট্রামে চড়িয়া বেড়াতে যাইয়া থাকে। এখন, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ 'চন্দ্রশেখর'কে তাহারাই সমাজের একদল আর্টের নিদর্শনায় পরিণত করিয়াছে; তাহাতে শিবের ধনে চিনিটা কেনা হইয়া গেছে। শৈবলিনী 'পাপীয়সী' না হইয়া নবীনকী হইয়াছে। চন্দ্রশেখর শিহরাম দুলিতে বাধা হইয়াছে, আর প্রতাপ — মুখ দেখাইতে পারিবেনা বলিয়া, 'আর্টফেল' না করিয়া লর্ডলিসের প্রায় 'ডাইফেল' করায় আর কি! না, মহাশয়, আমরা ঐ ছবি চক্ষেতে দেখি নাই, তবে আর্ট একটু বুঝি কিনা, তাই সর্বচক্ষে ঐরূপ দেখিয়াছি। যাহারা ঐ ছবি তৈয়ারী করিয়াছে তাহারা অন্তর্যামী নিশ্চয়। বাঙালীর আর্ট-বুঝা কিরূপ, ও সম্বন্ধে সৌখীন তাহা জানে। ছবি দেখিতে দারোটা শব্দে তাহিয়া পড়িয়াছে। এতদিনে, ইহারা বঙ্কিমচন্দ্রের নাকে কলে ফাঁসিয়া (শিব! শিব!) বাঙালীকে ঘুরাইয়া দিল, লোকটা কিরূপ অন্তত ও বেরসিক ছিল। ছবিকে ছবিও হইল, সেই সঙ্গে একটা অত বড় কাজও হইল! বাংলা দেশে সিনেমা আছে, কিন্তু অন্ধ-লোকের বিনোদন নাই — বড়ই দুঃখের হইয়াছে।

* * *

আমরা কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই, কারণ আমরা নিতান্তই সাহিত্যিক, আর্টের নীলবর্ণ নাখিয়া, শিল্পী ও সাহিত্যিক মিলিয়া, দল স্থাপন করি নাই; তাই 'চন্দ্রশেখরে'র ঐ সিনেমা-ছবি দেখিয়া কোনরূপ হৈ চৈ করা আবশ্যক মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের স্থান নিজেই চিরদিন রক্ষা করিবেন; আর্টিষ্টরা যদি উল্লম্ফন দিয়া থাকে, তবে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, ছুঁচিন যাবে রবীন্দ্রনাথেরও ঐ দশা হইবে। সর্বাহারী পিশাচ যাহারা তাহারা 'শিব'কে মানে না, তাহাতে শিবের কি? আর ঐ ভূত-প্রেত-গুলাকেই বা শাসন করিবে কে?

* *

কিন্তু এই উপলক্ষে নীলবর্ণ পৃষ্ঠাদের আমার একটা ডাক ছাড়িবার সুবিধা হইয়াছে। যাহারা, সাহিত্যিক ও শিল্পী মিলিয়া দেশবাসীর রসপিপাসা উদ্রেক করিতে চাহিতেছিল — সর্বপ্রকার পাঁচালাঁচালি, খুই-তরাজ, নারীহরণ প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য আর্টের দ্বারা 'হাট' জয় করিতে চাহিতেছিল, তাহারাই কেন যে এমন ক্ষেপিয়া গেল সে রহস্য বুঝিবে কে? যাহারা সিনেমার সৌন্দর্য লাভের জন্য ব্যাকুল, তাহারা হঠাৎ এমন ডাক ছাড়িল কেন? হঠাৎ তাহারা আর্টের বিরুদ্ধে এইরূপ সাম্প্রদায়িক সাহিত্য-মনোভাব প্রকাশ করিল কেন? আর কিছু না পারিয়া শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বার্থাধিকারী হইবার বাসনা হইল কেন? বলে,—"আমরাই তাঁহার উত্তরাধিকারী, ঐরূপ ছবি দ্বারা আমাদেরই মানহানি করা হইয়াছে।" এইবার লড়াই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঁচানো হুকুম হইয়া পড়িল। ঐ যাহারা 'চন্দ্রশেখরে'র 'উত্তর'

দিয়া 'উত্তরাধিকারী' হইয়াছে, তাহারা বরং ভাল ছিল, কিন্তু এ আমার কেমন 'উত্তরাধিকারী'? আইন, না সাহিত্যের? সাহিত্যের নিশ্চয়ই নয়, কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের দৈহিক বংশের কোথাও থাকিলেও, এ মূলে তাঁহার সাহিত্যিক বংশের যে কোথাও আছে, তাহা ত' জানিতাম না! যাহারা নূতন আলোর নূতন কণ্ঠস্বরের খোসামোদ করিয়া সাহিত্যিক 'দায় খালাস' খুচিয়াছে শুরু হইতে চায়, তাহারা কি বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর? যাহারা বোতাম খুলিয়া বই-বেচা বেনে-সাহিত্যিক হইয়াছে তাহারাই কি বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর? না, যাহারা সাহিত্যের জোবপাড়াগুলিতে হজন-মজন করিয়া বেড়ায়, কিম্বা ট্রামে চড়িয়া কেঁপু বাজাইয়া হৈহৈ-রৈরৈ সাজে, তাহারাই বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর? আর বংশে কাজ নাই, বঙ্কিমচন্দ্র বিবাগী হইয়াই থাকুন।

* * *

ঐ সিনেমার কথায় একটা কথা মনে পড়িল। বাঙালীর সিনেমা-নেশা যেরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে শহরগুলার যাহাই হউক, এবার পল্লীগ্রামগুলাও আর বাঁচে না। ও নেশা মদের নেশার চেয়ে কম নয়; আমরা এমনও শুনিয়াছি, চাল কিনিবার পয়সা দিয়া সিনেমা দেখিয়া আসিয়াছে, অন্ত ঘরে খাইবার কিছু নাই—গরীব গ্রামবাসীর এমন দুর্গতিও হয়। আমরা নীতিবাগীশ নই, থিয়েটার-সিনেমার যে আমোদ, এবং সেই সঙ্গে যে শিক্ষা, তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। কিন্তু এ মাটীর গুণ এমনই যে, মূলের বালাও এখানে সাপ হইয়া ওঠে। আমাদের অধিকাংশ সিনেমা-বক্তিতে আমোদের সঙ্গে শিক্ষা, রসের সঙ্গে রুচির কেমন মিলন হইয়া থাকে, তাহা কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের অজানা নাই। এখনে ঐ রসের খোলা-ভাঁটি গ্রামেও খোলা হইতেছে; যাহারা ব্ল্যাকমার্কেট করিয়া এতদিন তাহাদের রক্ত শুষিতেছিল, তাহারাই এখন গরীব গ্রামবাসীদের চামড়াতে ঢুলঢুলি বাজাইয়া আরও কিছু রোজগার করিতে চায়। পল্লীসুহৃদবিদের এই অজ্ঞানে, জেলার সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় পর্যন্ত নাকীপাঠ করিয়া, গ্রামাঞ্চলে সভ্যতাবিস্তারের পথ সুগম করিয়া দেন, এমনও শুনিয়াছি। এখন আহারে-আহারী রোগ-বিস্ফোরের মত বিষ হইতে—এই ভয়ানক নেশা হইতে ঐ গৃহস্থ পরিবারগুলাকে বাঁচায় কে? যাহারা ঐ সকল সিনেমা-গৃহের প্রতিষ্ঠাতা, তাহারা আমার ধর্ম-পরিচিতদের স্থানীয় পাণ্ডা—বাঙালী-নেশার কারণ! ইহাদের লজ্জাও নাই, ভয়ও নাই। এত আইন হইতেছে, যেখানে-সেখানে এইরূপ খোলা-ভাঁটি যাহাতে কেহ খুলিতে না পারে, সেরূপ আইন করা যায় না?

[২৮শে অগ্রহায়ণ

চিত্র-পরিচয়

অক্ষয়কুমার বড়াল

(১৮৬০—১৯১৯)

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বিখ্যাত গীতিকবি। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'এষা' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অপর কয়েকখানি কাব্যের নাম —'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি' ও 'ভুল'। ইনি কবি

বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্য-শিষ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত, ইঁহার কবিতায়ও রবীন্দ্রযুগের ঐতিহ্যবিভা দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের কবিতার প্রধান লক্ষণ দুইটি — (১) ভাষার অত্যধিক সংক্ষিপ্ত বা সিদ্ধান্তধর্মিতা, এবং তজ্জন্য ভাষার গাঢ়তা; তাঁহার ভাষায় বিশুদ্ধিও লক্ষণীয়; (২) আধুনিক ঐতিহ্য কবিতায় যাহা প্রধান লক্ষণ সেই আত্মভাবপ্রধান কল্পনা, বা কল্পনার অন্তর্মুখতা (subjectivity), এজন্য তাঁহার ভাষায় ('প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি') একটি অতি মৃদু ভাবাবেশ-বিহ্বল শৈথিল্যমূর্ছনা আছে। এই সূত্র তিনি বিহারীলালের নিকট পাইয়াছিলেন, ও তাহাকে স্বকীয় প্রেম-কল্পনায় অধিকতর গভীর করিয়াছিলেন।

'কল্পনা'র পাঠক-পাঠিকাগণ এবারেও বিলম্বের জন্য আমাদের উপরে বেশরোয়াভি বিরক্ত হইয়া থাকিবেন; হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এবার একটি সবিনয় নিবেদন আছে। গতবারের মত এবারকার অপরাধ সম্পূর্ণ আমাদেরই নহে, বরং অন্যদের অবজ্ঞা বুঝিয়া তাঁহারা শুধু ক্ষমা নয় সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন, এমন আশা করিতেছি। 'অগ্রহায়ণ' সংখ্যা আমাদের প্রতিশ্রুতি মত অগ্রহায়ণের শেষ তারিখের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সহসা বাজারে কাগজ আর পাওয়া গেল না, বাধ্য হয়া কর্তা ছাপাইতে না পারায় আমরা এতদিন অতিশয় বিরক্তির ভাবে কাটাইয়াছি। বিলম্বের ইহাই কারণ; অর্থাৎ সর্বসাধারণের যে অবস্থা, তাহাতে অগ্রলোকের অন্তরঙ্গ-কথা করা চলে। ইহাই আমাদের নিবেদন।

কর্ণধারগণ, 'কল্পনা'

---

২৪ নং কৈলাসী বোস, "অবলা প্রেসে" শিবলাল শাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকালীচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখনও প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে? প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, যেমন অনুকরণ মাত্র। মিল্টনের মহাকাব্য হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। লুসের রোমক সাহিত্য, যুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের রামেও দুইখানি মহাকাব্য আছে — তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে — তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। তবে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আরেকখানির অনুকরণ। মহাভারতে যে রামায়ণের পর-কালে প্রক্ষিপ্ত, তাহা হইলে সাহেব লিখ বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়কদলনে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণের অধিকাংশ বনবাসী বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণ মহাভারতে অর্জ্জুনে পরিণত হইয়াছেন, এবং তাহার লক্ষণ নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নূতন সৃষ্টি, তবে হনুমানের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্য্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদুর; অভিমন্যু, ইন্দ্রজিতের অগ্নি-মজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নীসহিত বনবাসী, যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নীসহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্নী অপহৃতা, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সঙ্কল্পনে সেই অগ্নি জ্বলন্ত; একে স্পষ্টতঃ, অন্যে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপাখ্যানভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না হউক; কিন্তু অনুকরণীয়ে এবং অনুকরণে ইহার অপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য অতি বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে।

আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমক মূলবিদ্যার অনুকরণ। এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এরূপ ঘটে; প্রথম অনুকরণ মাত্র হয়, পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণ প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই; এবে দেখ, তাহাকে অনুকরণ। মাত্রই, অনুকরণ মাত্র ঘৃণা নহে; এবং বাঙ্গালির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু কিছু দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ-নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উচ্চস্থে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্টই স্বভাবতই উচ্চস্থের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উচ্চস্থ যেরূপ করে, সেইরূপ করা, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে।

ইহা অবশ্য আমরা স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, তত্তটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাপূর্ণ

অনুকারীরই যাহুলা; এবং তাহাদিগকে প্রায় গুরু জ্ঞানের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষকালের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি যদা দুঃখ। বাঙালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে কুণ্ঠাশূন্য অধিকারী। এই জন্যই আমরা বাঙালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি।

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি বহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্র্যের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য-ঘটিত। অনুকরণে এই সুখের ভাস হয়। শাকস্পেয়র উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক শাকস্পেয়রের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

অতএব সংসারে চরিত্রবৈচিত্র্য, কার্যবৈচিত্র্য এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য্য অনুকরণীয়ের ছাঁচে ঢলে, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কার্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র্য-হানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে, মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ঘটে না; সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তিসকলের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল প্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্বফলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যের নিকট শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকালসাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে আসে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের বর্ত্তমান অনুকরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙালির চরিত্রলোকসিদ্ধ নহে।

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখনও কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে, উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

আলো-আঁধার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১)

দিনের শেষে দিক্-সীমায়
পীত রবি নিবিয়া যায়,
হাতের তারা তখনো আসেনাই :—
ধরার কোণে আমার ঘরে
জ্ব'লেছে নিতি তোমার তরে
সন্ধ্যাদীপ ছিন্ন অমলিন।
তোমারি জ্বালা সে দীপালোকে
নিয়া দ'লে বুক চোখে —
দেখেছি তব পায়ানো সংসার,
খুঁটি ও নাটি, ছোট ও বড়
যা কিছু সব হ'য়েছে জড়ো —
আলোর পাশে আঁধিছে ছায়া তার।
তাহারি মাঝে ঘুরিছে
ফিরিছে পালি' শাসন-ত্রাস,
সকল-দুখ-সহন মুখে
ভরসাখানি চালো।
তোমারি জ্বালা এদীপ মোর
আমার ঘর আলো।

(২)

সবার শেষে গভীর রাতে
শোবার ঘরে তোমারি হাতে
নিবেছে নিতি নিশীথ-দীপ মম ;
তখনো কেশ-পরিচারে,
তনু আঁচল-বসনভারে
অন্ধকার হ'য়েছে সুগহন।
তোমারি দেওয়া অন্ধকার
আঁচল ভরি' বারবার
নিশাযোড়ুর ক'রেছি আমি পান ;
তাহারি স্নিগ্ধ-পরশ-স্নেহে
দিনের দাহন্ত দেহে
নিত্য আমি ক'রেছি সুখ-স্নান।
চিরঘটে তীর্থবারি —
ক'রেছি সেই অন্ধকারই,
বাহিরে যারি' দিয়েছ দারাবার,
তোমার আলো মেলিয়া ডানা
দুয়ারে তব দিয়েছে হানা—
ক'রেছি মানা ঘুচিয়া দুই হাত।

(৩)

তোমারি আলো অলোকতম,
আঁধার তব কুসুম-সম,—
চিত্ত মম শঙ্কা নাহি তায়।
এদীপে যদি এদীপ জ্বলে,
আঁধারে তবে আঁধার গলে,
জীবন হ'তে মরণ যায় তার।
বিশ্বহৃদয় উৎকর্ণানে
চাহিয়া পুঁথি বিশ্বপানে —
তুলিয়া ধরি' তোমারি জ্বালা'
এদীপে তব ভালা ;
নিশীথে তব নিবিয়া পাতি'
তোমারি তোলা আঁধার গাঁথি'
শ্মশানকালী পূজিতে মাটি
অশ্রুসিক্তা-মালা।

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

(২)

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার শ্রীকান্তের উপর ইন্দ্রনাথের যে প্রভাব, যাহার প্রতি শ্রীকান্তের যে আকর্ষণ, তাহা কিরূপ ও কি কারণে, সেই আলোচনা একটু বিস্তারে করা প্রয়োজন; কারণ, শ্রীকান্তের জীবনে ঐ প্রভাব অবশ্য বড়ই কীণ হইত, তখনো সম্পূর্ণ মুছে যায় নাই; বরং আমার মনে হয়, ঐ প্রভাবই ছল ছলে তাহার জীবনে একটা ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই প্রভাবই তাহার অবচেতনার বাসা বাঁধিয়া শক্তি ও অশক্তি দুইই বৃদ্ধি করিয়াছিল। আমি আগেই ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের একরূপ পরিচয় দিয়াছি, সেটা তাহার এবং অন্নদাদিদির দিক হইতে; এখানে শ্রীকান্তের দিক হইতেও তাহাকে আর একবার দেখিয়া লইতে হইবে; উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য বুঝিতে পারিলে শ্রীকান্ত-চরিত্রের একটা গোড়া-পত্তন করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। ঐ চরিত্রের সহিত শ্রীকান্ত-চরিত্রের মানসিক পার্থক্য কম নয়; বরং এত বেশি যে, এমনও বলা যাইতে পারে, একটা অপরের যেন বিপরীত। তবে প্রভাব বা আকর্ষণের কথা আসে কেমন করিয়া? শ্রীকান্ত যে অতিপ্রবল ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই — এমনও বলিয়াছি যে, সে ইন্দ্রনাথের মধ্যে নিজেরই গভীরতর সত্তার একটা বাস্তব প্রতিমূর্ত্তি যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সে যাহা কামনা করে, তাহার প্রাণ যাহাকে শ্রেয় বলিয়া স্বীকার করে — ইন্দ্রনাথের মধ্যে সে যেন অজ্ঞানে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। এইরূপ লক্ষ্য করিবার শক্তি যাহার আছে তাহার ভিতরে একটা বড় আমি নিশ্চয় আছে — এই 'আমি' ঠিক তাহার 'ব্যক্তি-আমি' নয়; মানুষের ঐ ব্যক্তি-আমিটাই মানব-আমি, তাহাকে লক্ষ্য করিতে না পারাটাই 'ক্ষুদ্র-আমিটার' ট্রাজেডি — ইহাই মানুষের নিয়তি, ইংরেজীতে যাহাকে Fate বলে। অতএব শ্রীকান্তের উপরে ইন্দ্রনাথের প্রভাব যতই গভীর বা প্রবল হউক, ঐ একটি কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে —

সেই দুই 'ব্যক্তি'র তথা : একটা মানুষের আসল, আর একটা তাহার বাস্তব। জীবনের যত-কিছু ভাঙা-গড়া ঐ বাস্তবকে লইয়াই ; কেবল, ব্যক্তিত্বের তাহার বাকা বাহির অপেক্ষা ভিতরে প্রবল হইয়া থাকে। শ্রীকান্ত বাল্যকালেও ভাবুক এবং অতিশয় আত্মসচেতন ; সে মেটিমেন্টাল, অন্ধ ভিন্নাবেগ। পরে দেখা গিয়াছে, পরস্ত্রীকাতর হইলেও সে কোনরূপ দুঃসাহসিকের দুষ্কার্যে অবলম্বন করে নাই, তার কারণ, কিছুতেই তাহার অবিচলিত আস্থা নাই ; হৃদয়ের আবেগ আছে, কিন্তু কর্ম-নিষ্ঠা নাই ; অথচ সে কর্মকুণ্ঠও না। সে যাহা কিছু করে, ভাবপ্রবণতার বশে — অন্তরের বিশ্বাসের বশে নয়। সে প্রেমিক নয়, উদাসীন ; আসলে সে একা, কাহারও আপন হইতে সে পারে।

এইরূপ চরিত্রের উপরে ইন্দ্রনাথের প্রভাব কিরূপ হইতে পারে? ইন্দ্রনাথের সহিত ইহার সাদৃশ্য কোথায়, এবং কতটুকু? উপরে আমি যে লক্ষণগুলির উল্লেখ করিয়াছি তাহার কতকগুলির সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় — প্রভাবের কারণ তাহাই বটে। কিন্তু কোন দুই ব্যক্তি-চরিত্রে ঐ লক্ষণগুলার কারণ এক নয় — যদিও তাহাদের ঐ সাদৃশ্য গভীরতর অর্থে সত্য, অর্থাৎ সেই বিভিন্নপ্রকার মানুষটার পক্ষে মিথ্যা নয়। কিন্তু বাহির দিক দিয়া পার্থক্যটাই বেশি। সেই পার্থক্য সত্ত্বেও প্রভাবটা কেমন হইতে পারে তাহাই দেখিব।

সাধারণ প্রভাবের মূলে থাকে 'শ্রদ্ধা'। ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত যেরূপ শ্রদ্ধা করে — সে নিজে তাহার নাম দিয়াছে, ভালবাসা। ভালবাসাও যে একরূপ শ্রদ্ধা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রে এবং অভিধানে শ্রদ্ধা অর্থে আর একটা বড় কথা। গীতা যে বলিয়াছেন "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" — তাহার সোজাসুজি অর্থ এই যদি হয়, "যে-ব্যক্তির যাহাতে শ্রদ্ধা সে নিজেও তাহাই" — তবে সে একরূপ একেবারে শ্রদ্ধা, তাহাই গভীরতম অর্থে ভালবাসা ঘটে। শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছে —

"যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন — কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই অন্ধকারে বিদেশীর জন্যই আমার স্নেহের প্রতি কণাটি পর্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।" [পৃঃ ৯]

"যে আহ্বানে এই শুদ্ধ নিবিড় নিশীথে এই বাড়ীর সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া, একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্যই ছিল না।" [পৃঃ ১৩]

"আমি ইন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছিলাম।"

[পৃঃ ৪০]

— এই সকল খুবই সত্য, এই ভালবাসা বালকের হইলেও, ঐরূপ আকর্ষণ অর্থহীন নয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাও কি একপ্রকার শ্রদ্ধা নয়? উত্তরে হাঁ, ও না, দুইই বলিতে হয়। হাঁ এই জন্য যে, বালক শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের মধ্যে একটা এমন 'শক্তি'র প্রকাশ দেখিয়াছে, যাহা তাহার নাই, কিন্তু যাহা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এইরূপ মুগ্ধ হওয়াও এক প্রকার শ্রদ্ধার লক্ষণ। কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে যে, সেইরূপ শ্রদ্ধা বালকের হৃদয়ে ভালবাসায় রূপান্তরিত হইয়াছে ; ইন্দ্রনাথের চরিত্রের যে দিকটা কঠিন ও মহৎ তাহাকে সে প্রণাম করে, তাহার বড়-আমিটা সাড়া দেয়, কিন্তু ব্যক্তি-আমিটা অভিভূত হইয়া পড়ে ; সেই ব্যক্তি আমি ইন্দ্রনাথের অন্তরটাকেই চিনিয়াছে, সেই অন্তরটাকেই ভালবাসিয়াছে, সেইখানে সে তাহার সহিত সহমর্মিতা অনুভব করিয়াছে ; সেইজন্যই তাহাকে সে নিজেরই একটা 'বড়-আমি' বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। বস্তুতঃ ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের সেই বাস্তব

ব্যক্তি-আমিটার যদি কোন ঘোষ বা স্পর্শ ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা এইখানেই। ইহাকেই যদি প্রভার নামান্তর বলা যায়, তবে এ প্রভার মূলে আছে অবেক্ষ-কারের জন্মের সমানুভূতি; ইহা সেই প্রভা নয় যাহার মূলে আছে একটা গভীর বিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়ের আশ্বাস। এখানে সে প্রশ্নই উঠে না, কারণ ইহা একেবারে ব্যাপার—এখানে সত্তা বা বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের কোন অবকাশই নাই। তাহা হইলে, এরূপ প্রভার দ্বারা "স এব অহং" — ইন্দ্রনাথের সহিত শ্রীকান্তের একাত্মতা — কতখানি সম্ভব? শ্রীকান্ত যেমন তেমনই রহিয়া গেল—তাহার 'ব্যক্তি-আমিটা' রূপান্তরিত হয় নাই; ইন্দ্রনাথকে সে ভালবাসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মহত্বকে সে কখনও আত্মসাৎ করিতে চাহে নাই, পারে নাই বলিয়া নহে—সেই 'প্রভা' শ্রীকান্ত-চরিত্রে সম্ভব নয় বলিয়া।

আমি বলিয়াছি, ঐরূপ প্রভার মূলে আছে প্রত্যয়, যা অসংশয়; অর্থাৎ উহা একরূপ জ্ঞান ও শক্তিমূলক। ঐ প্রভাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি — অন্ধ ভক্তি নয়, সকল সন্দেহমুক্তের ভক্তি। শ্রীকান্তের মত মানুষ—যাহার জন্য এত দুর্বল বা স্পর্শকাতর, যাহার প্রাণ এত আবেগপ্রবণ, তাহার শক্তি অল্পরূপ; সে বিদ্রোহ করিতে পারে, নিজ স্বার্থ অনায়াসে বিসর্জন করিতে পারে, এমন কি নিজেকে নষ্ট করিবার নির্লজ্জতাও তাহার আছে; কিন্তু সে কোন বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে চাহে না, পারেও না। ঐরূপ প্রকৃতি আত্মপ্রত্যয়ের পক্ষে একটা বড় বাধা। সে কোনবিষয়ে দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে না, সেই জন্যই কোন কর্মে তাহার নিষ্ঠা নাই; এমন কি, জন্মগত সম্পর্কেও তাহার আত্মবিশ্বাস নাই। কাজেই তেমন প্রভা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার সমস্ত জীবনটাই ভাব-চিন্তা ও কর্মের একটা লক্ষ্যহীন স্রোতোধারা; তাহাতে তরঙ্গবিক্ষেপ আছে — তট-বন্ধন থাকিলেও, দিক্-নির্ণয় নাই। তাহার কারণ, শ্রীকান্তের জীবনে কতকগুলি দুরন্ত সংস্কারের বল আছে, এমন আত্মপ্রত্যয়, সংশয়হীনতা বা আধ্যাত্মিক সত্তা-সন্ধান ঐরূপ প্রকৃতির বিরোধী; ইহাই সে-জীবনের যতকিছু ট্রাজেডির কারণ। অতএব শ্রীকান্তের প্রভা সেই-জাতীয় প্রভা নহে।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের কোন সংস্কার নাই, তাহার একবার সংস্কার — মুক্ত-প্রাণের অবাধ অনুষ্ঠান আত্মানুভূতি, সকল প্রকার সংস্কার-লোপকারী—জ্ঞানেরও অগোচর — এমনরূপ আত্মপ্রত্যয়। ইন্দ্রনাথ জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ জীবনকে সে মুক্ত করিয়া আলিঙ্গন করে, অথচ তাহার দ্বারা আদৌ বদ্ধ নয়; শ্রীকান্ত জীবনকে মুক্ত করিতে চায় — পারে না, জড়িত বদ্ধ হইবার জন্য আছে। তাহার সংশয় কখন ঘোচে না—বয়স যেমন তেমনই থাকে, তাহার সেই অনুভূতি-কারার প্রাণ তেমনই আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। যে প্রাচীন সংস্কার তাহার রক্তগত তাহাও সে ত্যাগ করিতে পারে না, আবার আধুনিক জীবনের নানা সহজ-সরল তাহার সেই সংস্কারকে ঘর হইতে বিচলিত করে — তাহাকেও সে অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের আত্মা এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া ক্রমে যেন আরও বলহীন হইয়াছে। তথাপি সেই সর্বসংস্কারমুক্ত মহাশক্তিধর ইন্দ্রনাথকে—জীবনের প্রভাতকালেই যে তাহার সেই অন্তরের বদ্ধ-আমিটাকে একটা অতর্কিত আঘাতে সচেতন করিয়াছিল — তাহাকে সে কখন ভুলিতে পারে নাই। সেই বোধ হয়, তাহার জীবনের সহজকে জটিল করিয়াছিল, তাহার কোন কোন সংস্কারকে দৃঢ়তর করিলেও, অপর কতকগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সে যে ইন্দ্রনাথ নয় —কখনও হইতে পারিবে না, তাহাও জানিত; তাই বোধ হয়, শেষ পর্যন্ত সে সর্বধর্ম ও সর্বনীতির একটা শূন্যবাদে আশ্রয় লইয়া আত্মাভিমান চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইহার অনেকখানিই এ কাহিনীর বাহিরে,

শ্রীকান্ত-জীবনে ইহাপেক্ষা পরিতাপের ঘটনা ঘটে নাই। এখানে ইন্দ্রনাথ তাহার জীবনে একটা দুঃসাহসিক জ্যোতিষের মত যখন দৃশ্য তখন অদৃশ্য হইয়াছে। অতঃপর ইন্দ্রনাথের প্রতি বালক-শ্রীকান্তের সেই শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কেমন, সে সম্বন্ধে তাহারই জবানীতে কিছু উদ্ধৃত করিব।

শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ যে-ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা সেই বয়সের পক্ষে স্বাভাবিক, সকল ক্ষেত্রেই সেইরূপ হয়। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মানুষের সেই নিষিদ্ধ বলিয়াই দাবি। এ জন্য যে-বালক নিষি-নিষেধ লঙ্ঘন করিবার প্রেরণা শক্তি রাখে তাহাকে দুঃসাহসিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন জানিয়াও মন যে বীর বলিয়া পূজা করিতে, ইহাই স্বাভাবিক। তাহার যেমন সেই শক্তি ও সাহস, তেমনি স্পর্ধার বীরত্ব নয়— অপরিচিতি এমন পরিচয় দিল, যেমনি শ্রীকান্তের মত এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বালককে একা ও অসহায় দেখিয়া আততায়ীদের আক্রমণ হইতে প্রথম করিয়া উদ্ধার করিল, সেই দিন হইতে সে যে বালক-শ্রীকান্তের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিবে, তাহাও অনিবার্য। ইন্দ্রনাথ তাহাকে স্নেহ করিয়াছে, একটি পরদুঃখকাতর বালককে কোলের কাছে টানিয়া লইয়াছে— কিন্তু তাহার দুর্বলতাও বুঝিয়াছে; এজন্য তাহাকে ঠিক বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করে নাই। শ্রীকান্তও তাহা বুঝিত, অভিমান হইত, কিন্তু কেমন দুরাশাকে মনে কখনো স্থান দেয় নাই। তাহার সেই ভালবাসাতেও সঙ্কোচ কম ছিল না— দুর্বল হৃদয়ের একটা সঙ্কোচ প্রথম পরিচয়ের দিনেই সে অনুভব করিয়াছিল। সেদিনের সেই ব্যাপারে ঐ দুঃসাহসী দুর্দান্ত বালকের ভাসা তাহার হৃদয় জয় করিলেও, তাহার প্রতি অন্তরের ভাব খুলে নাই —

"আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না— ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা, তাহার প্রকাশ্যে নিন্দা ও দুর্নাম করায় মন তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।" [পৃঃ ৬]

আবার যেদিন অন্ধকার খিড়কির ঘাটে অন্ধ তিমিরে তাহারা সে নিবিড় জঙ্গলের পথে ঐ দুরন্ত বালকেরই বাঁশি-বাজানো শুনিয়াছিল, সেদিন —

"যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম — যদি আমিও কখনো বাঁশি বাজাইতে পারিতাম।" [পৃঃ ৭]

— ইহা শুধুই ভালবাসা নয়, ভক্তির পূজাও বটে।

এইবার, উদ্ধৃতের স্বভাবে যে দাদুর বা বৈসাদৃশ্যের প্রবণতা শ্রীকান্ত নিজেই বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহা হইতেও ঐ প্রভাবের স্বরূপটা বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীকান্তের সেই বালক-বয়সেও অভিমান আত্ম-সচেতন; ইন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় এই আত্ম-সচেতনতাও তাহার দুর্বলতার একটা কারণ। ইন্দ্রনাথের ঠিক ঐ বস্তুটাই নাই, অভিনব শক্তিমান চরিত্রের তাহা থাকে না। ঐরূপ সচেতনতাই আত্ম-বিশ্বাসের কারণ; তাই ইংরেজীতে যাহাকে Inferiority Complex বলে ইন্দ্রনাথের তাহা নাই; শ্রীকান্তের আছে। শ্রীকান্ত, অন্ততঃ সেই বয়সে, অথচ 'ভীতু' ছিল— এই বোধটা তাহাকে পীড়িত করিত; কিন্তু ইন্দ্রনাথের নিকটে তাহা স্বীকার করিবে না বলিয়াই, অন্তরে বুদ্ধিহারা হইলেও সে নির্ভীকতার পরিচয় দিবে। দেখা যাইতেছে, ভাটা একরূপ সেবাদাস, অনেক জোর তাহার আছে; এইরূপ জোর তাহার চরিত্রে সোড়া হইয়াই ছিল; ছিল না কেবল সেই আর এক প্রকার নির্ভয়তা যাহা সকল জ্ঞান-অজ্ঞানের— মোহ ও মনের সকল সংস্কারের অতীত, সেই 'যাযাবরে'র নির্ভয়তা। কিন্তু ইন্দ্রনাথের প্রভাবে ঐ ভয়টাও তাহার কাটিয়া গিয়াছিল, পরে একস্থানে সে-ই বলিতেছে —

"এ সকল বিষয়ে আমি যে-লোকের শিষ্য তাহাকে

ভূতের ভাবটা আর ছিল না। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে — সেই একটি রাতে যখন ইন্দ্র করিয়াছিল, 'শ্রীকান্ত, মনে-মনে 'রামনাম' কর; ছেলেটী আমার পিছনে বসিয়া আছে', সেই বিশ্বাস তখু ভয় দেখাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত, কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই।" ৯

[পৃঃ ১০৮-১০৭]

এখানে আরেকটা খুব বড় কথা বলিয়াছে, তাহাতেও ইন্দ্রনাথের অনুভূতা যে কেমন ও কি রকমের, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের অনেকেই ভূত বিশ্বাস না করিলেও ভয় পাই, ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিত কিন্তু ভয় পাইত না। এখানে ভয়ের সঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের যে সম্পর্ক দেখা যাইতেছে তাহাতেই বিশ্বাস বস্তুটা আসলে কি, তাহাও বুঝিয়া লইবার সুবিধা হইবে। আমরা যাহাকে সাধারণ ভাষায় বিশ্বাস-অবিশ্বাস বলি তাহা অনেকটা একটা অভিমান মাত্র — তাহাতে প্রাণের সত্তা বা আত্মার প্রত্যয় নাই। আমরা ভয় পাই, অর্থাৎ অবিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করি; ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিয়াও ভয় পায় না, অর্থাৎ তাহার ঐ বিশ্বাসও একটা বড় বিশ্বাসের অধীন। সে কোন-কিছু আছে বলিয়া বিচলিত হয় না, অর্থাৎ মনের আসক্তি উৎপন্ন করে না; এমন একটা বস্তুকে তাহার বিশ্বাস আছে যাহার জন্য অবিশ্বাস তাহার কিছুমেই নাই, ভয় করিবারও কিছু নাই। আমাদের যেমন কোন বস্তুতে বিশ্বাস নাই, কোন-কিছুতে প্রাণের বা আত্মার প্রত্যয় নাই; সে শক্তি নাই বলিয়াই ভয়-সংস্কারও অন্ত নাই। কেবল, মনের অভিমান বজায় থাকিলেই হইল; সত্য কি তাহা জানি না, জানিবার প্রয়োজন-বোধও নাই; বস্তু বিশ্বাসে অবিশ্বাসে বাসা বাঁধিয়াছে। তাই বাহিরেও বিশ্বাস ভয়ে দলা-সতর্ক থাকি; 'আছে' নয় — 'নাই' বলিবার সংসাহসকে উদ্যত করিয়া নিজেদের সেই 'আছি'টাকেই ঢাকিবার চেষ্টা করি। ইহাও এক-প্রকার Complex।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। যখনই শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ ঐ একস্থলে শৈথিল্য করিয়াছিল, সেও সাধারণ মনে ১কারণ, স্নেহের সঙ্গে মনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। ভূতের ভয় সে করে না — বিশ্বাস-অবিশ্বাস নয়, সে সত্যই ঐ বস্তুকে ভয় করিয়াছে, সেও একপ্রকার শক্তি দান করিয়াছে। সে হয় ত' আরও অনেক ধরণের ভয় করে, ঐ একটা ভয় না-করা চরিত্র-বলের লক্ষণ না হইতে পারে, তথাপি, ঐরূপ একটা দৈহিক ভয়-সংস্কার যাহার থাকে না সে একটা বড় শক্তির অধিকারী হয় — অন্তরেও যেমন বাহিরেও তেমনই নিঃসঙ্গ থাকিবার শক্তি; প্রকৃতি-বিশ্বের এই শক্তিই মুক্তি-সাধনার সহায় হয়। অতএব শ্রীকান্ত-চরিত্রের একটা দিক ইহার দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই নির্ভয়তা যে ইন্দ্রনাথের তুলনায় পূর্ণ-নির্ভয়তা নয়, সে কথা শ্রীকান্ত জানে; এই কাহিনীতে সেইরূপ আত্ম-সমালোচনা — স্বপ্রকৃতিকে একটু দূরে রাখিয়া দেখিবার প্রয়াস — অনেক স্থলে আছে; এবং যদিও তাহা সর্বত্র অভ্রান্ত নয়, তথাপি যাহে যাহে তাহা প্রায়ই সত্য ও অকপট যে আমার পক্ষে সে সকল কথাই মূল্যবান হইয়াছে। এই নির্ভয়তার সম্বন্ধেই সে আরেক স্থলে বলিয়াছে —

"এরূপ অনেক জায়গায় আমি ইতিপূর্বে আর কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে বস্তুকে আসিতে পারিত সে ইন্দ্র, আমি নয়।... আমার সে ভরসা কই? সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই 'বাঘ'-নামের অক্ষের কবচ কই?"

[পৃঃ ১২১-২২]

— এই যে confession বা স্বীকৃতি, এই চরিত্রের মূলগত প্রভেদ এখানেও স্পষ্ট হইয়া

উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের এ কালের সাহিত্যে দুঃখ বা দুঃখবাদ কিছু কমিয়া, তাই আমাকে বার বার এই কথা বলিতে হইতেছে, অথচ কথাটা যে বেশ পরিষ্কার হইতেছে না, তাহা আমিও বুঝিতেছি। ইন্দ্রনাথ-চরিত্রকে আমাদের পরে আর প্রয়োজন হইবে না; এ চরিত্র সাধারণ চরিত্র নয়, সৌভাগ্য সাধারণ নর-নারীর জীবন-কথার ভিতরে যেমিয়ুক্ত অনুসন্ধান করা যায় না। যিনি এই কাহিনী লিখিয়াছেন, তিনিও যদি ঐ-চরিত্রের স্রষ্টা হইতেন, তবে এই কাহিনী এমন সাহিত্যিক রস-কাহিনী হইয়া উঠিত না। আমি যে বিশ্বাস, বা শক্তি বা দুর্জয় আত্ম-চৈতন্যের কথা বলিয়াছি, তাহা শ্রীকান্তের নাই; নাই বলিয়াই সে দুর্বল মানুষেরই একজন হইয়া এমন সহজভাবে, মানুষের সকলের অক্ষমতা — তাহার পিপাসা ও পরাজয়, সাধনা ও আত্মবঞ্চনা, ভুলচুক ও গুরুতর চিত্ত-চুতির ভিতর দিয়া এমন রসোত্তীর্ণ দান করিতে পারিয়াছে। তথাপি ইন্দ্রনাথকেও বুঝিয়া লইতে হইবে, কারণ সে-ও মানবাত্মারই আর একটা স্বাভাবিক বিকাশ; জীবনের যে-দিকটায় কোন প্রশ্ন নাই, তাই উত্তরও নাই — যে-মুখে দাঁড়াইলে অন্তরঙ্গতা, আলো-অন্ধকার প্রাণের পরিচয়ে ভরে না — সেই দিকও আছে; সাধারণ মানুষ আমরা — সে দিক আমাদের দিক নয় বটে, তথাপি তাহার আভাস পাইলেও কতকটা আরাম হয়। শ্রীকান্তের ঐ যে দীর্ঘনিঃশ্বাস — ইন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়া তাহার ঐ যে আক্ষেপ — উহাও এমন অন্তর জেন করিয়া উঠিত না, হয় ত' বা সে তাহার জীবনে সে চিন্তাই কখনো করিত না, যদি না সে তাহাকে দেখিত। সে যে ইন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিল—দেখিতে পারিয়াছিল, তাহাও শুধু সৌভাগ্য নয়, তাহার নিজেরই একটা চরিত্রগুণে; কয়জন এমন করিয়া তাহাকে দেখিতে পারিত? সুতরাং, উভয় চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য যেমনই হোক — কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে বলিতে হইবে। আমি এই জন্যই 'বড় আমি' ও 'ব্যক্তি-আমি' নামে দুই-টা 'আমি'র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছি।

প্রভাবের আর এক কারণ শ্রীকান্তের আর একটি কথায় ধরা দিয়াছে। শ্রীকান্তের চরিত্রে হয় ত' একটা আত্ম-নির্ভর নিঃসঙ্গতার মেঘা কোন কারণে পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল, সে কথা প্রথমেই বলিয়াছি; পরে ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু 'অন্নপূর্ণা'-মূর্তির সন্ধান আকাঙ্ক্ষা ইন্দ্রনাথকে দেখিয়াই মাকি আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যথা —

"কিন্তু কি করিয়া 'অন্নপূর্ণা' ধরা পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ মেয়ের যে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ।" [পৃঃ ৩]

— যেন কেবল এই জন্যই ইন্দ্রনাথের কথা এই কাহিনীতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর আর এক স্থানে —

"ইন্দ্র জলে ফেলিয়া দিয়া নৌকার হাল হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন নৌকার উপর।... হঠাৎ হয় ত' একদিন সে পশ্চিমের গঞ্জার একটানা স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ...।"

এই একটানা স্রোতে হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া-থাকা — ইহাই ত' সর্বজন-মুক্তির পরম লোভনীয় একটি চিত্র; এ যেন সেই "অকূল পাথার মেঘার দিগুল বিরতি", কিম্বা সেই আর এক জনের পরিপূর্ণ মুক্তি-সুখের নিশ্বাস —

"প্রভাত জলে, ভরে' আছি তরণীতে তাসিয়ে
খেলা।
খেয়ার শেষে উতরিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব
ভাঁটার বেলা॥"

ইহার পরেই শ্রীকান্ত বলিতেছে —

"এমনি একদিন উদ্দেশবিহীন ভাসিয়া-যাওয়ার

সুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত বাহিরে বিসর্জনের প্রতি মুহূর্ত হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল।" [পৃঃ ৮]

— এই একটা আলোয় উহাদের প্রত্যেকটির সম্পূর্ণ মিল ছিল, তাই শ্রীকান্তের জীবনে ইন্দ্রনাথের প্রভাব যদি কোথাও ফলিয়া থাকে তবে তাহা এইখানে। কিন্তু ইহাও চরিত্রগত মিল নয়, কারণ, অতিশয় বিপরীত চরিত্রের মানুষও সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এইরূপ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে — যেমন, অতিশয় পরিমাণে, বা অতিশয় দুর্বল। ঐ যে "ইচ্ছেহীন ভাসিয়া যাওয়া," উহার প্রথম অগ্নি-দীক্ষা সে ইন্দ্রনাথের নিকটেই পাইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়াছিল—কি কারণে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি মাত্র; সংসারের প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষ যে সেই কারণ নহে, ইহাও বিশ্বাস করিতে পারি; সে চরিত্র তেমন দুর্বল নহে। তবু সে একটা আধ্যাত্মিক পিপাসার বশেই গৃহত্যাগ করিয়াছিল — মহাপ্রেমিকের পক্ষেও সন্ন্যাসগ্রহণ অস্বাভাবিক নহে। যে বীর সে যেমন গরের উপরে জয়ী হইবার বাসনা ত্যাগ করিতেও পারে, তেমনই প্রেমিক হইয়াও সংসারের দ্বিত-শাসন চেষ্টা ত্যাগ করা অসম্ভব নহে; সেই ত্যাগ করার কারণ, তার দুর্বলতা, বিদ্বেষ বা বৈরাগ্য না হইতেও পারে। আত্মার সেই মুক্তি সেই পূর্ণ-স্বাধীনতা — সেই 'ইচ্ছেহীনতা'র অধিকার সাধারণ মানুষের নাই, তাই আমরা ঐরূপ 'নিরুদ্যম' হইয়া যাওয়াকে দুর্বল বা স্বার্থপরের 'পলায়ন' বলিয়া নিন্দা করি। ইন্দ্রনাথকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা যায় কিনা, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি জোর করিয়া কিছু বলিব না। কিন্তু শ্রীকান্ত যে সেই আখ্যানটি বর্ণন করিয়াছে তাহার কারণ, সে ঐরূপ জীবনের দুইটা দাবাই ইন্দ্রনাথের চরিত্রে পাইয়াছে — তাহার সেই স্বাধীন-চিত্তের নির্ভয়তা, এবং সেই করুণা। প্রথমটি নাম / পৌরুষ, দ্বিতীয়টির নাম নিঃস্বার্থতা। এই দুই যদি থাকে তবে ঐরূপ দায়িত্বহীনতা অনেকের মত মহাপুরুষকে আশ্রয় করে। ইন্দ্রনাথের মত 'মহাপ্রাণ' সে আর কোথায় দেখিয়াছে! অতএব ইন্দ্রনাথের আত্মনির্ভরতায় সেই ঔদাসীন্য এবং তাহার সেই অপার করুণা, এই দুইয়ে মিলিয়া শ্রীকান্তকে এমন একটি আবেগে আকৃষ্ট করিয়াছে — যাহা পরবর্তী জীবনে, তাহার দুর্বলতা বা অনুভবের শূন্যতাকে ঢাকিবার একটা উপায় হইয়াছে; বহুদিন যা মানিবার আসল কারণটা সে একরূপ আত্মবিস্মরণের বশে নিজের কাছে অস্বীকার করিয়াছে, ইন্দ্রনাথের দিব্য বলিয়া সে গৌরববোধ করিয়াছে।

শ্রীকান্ত-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে আমার এই বিশ্লেষণ — হয় ত' বা অতিরিক্ত — আলোচনা পরে কাজে লাগিবে; আলোচনার এই আনুষঙ্গিকেই আমি কয়েকটা মূলসূত্র একটু সরল করিয়া বুঝাইয়া লইতেছি। তাহারও চরিত্রে যাহিরের প্রভাব এবং অন্তর্মুখী সে-চরিত্রের বিকাশ যদি যা বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে একটা কথা স্মরণ রাখিতেই হইবে — মানুষ নিজ-স্বভাব কখন অতিক্রম করিতে পারে না; গুরু বা আদর্শ বা ভুয়োদর্শন—এ সকলের একটা সৌম্য ক্রিয়া তাহার জীবনে অনাবিষ্কৃত ঘটিতে পারিলেও, যাহারা বিধাতার সৃষ্টালিকা না — ইংরেজীতে যাহাকে common herd বলে তাহা-নয়, অর্থাৎ যাহাদের character বলিয়া কিছু আছে — তাহাদের নিয়তি সবাই অবশ্যম্ভাবী; আমরা যাহাকে ট্রাজেডি বলি তাহা এইরূপ চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব; ঐ character যেই সরল ও অনন্যসাধারণ হয়, ট্রাজেডিও তত দুরূহ হইয়া উঠে। মানুষের স্বভাব যত স্বচ্ছ, তাহার পরিণামও তেমনই সরল হইতে বাধ্য। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের পরিণাম যে একরূপ হইতে পারে না, তাহার কারণ— ঐ দুয়ের চরিত্র আসলে স্বতন্ত্র। আমি পার্থক্যের

দিকটাই বেশি করিয়া দেখাইয়াছি ; এখনও যদি তেমন স্পষ্ট না হইয়া থাকে, আরও দুই-একটি প্রমাণ দিতেছি। ঐ কথাতে তবেই বলা যাক। এখানেও দুই জনের স্বভাবে প্রধান পার্থক্য এই যে, শ্রীকান্ত অতিশয় আত্মসচেতন, তাহার আত্মবৃত্তির সহিত কাব্যুকতা বা চিত্রাশীলতাও আছে—সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে ; আবার কতকগুলি সংস্কারও তাহার আছে, একদা অনেক বিষয়ে তাহার দ্বিধা-সংকোচও কম নয়। যাহারা অতিমাত্রায় আত্মসচেতন (self-conscious) এবং তদুপরি ভাবুকতা বা কল্পনা-শক্তির অধিকারী, তাহারা একজন আদর্শবাদী না হইয়া পারে না ; এই আদর্শবাদ—ব্যক্তি-জীবনের এই Idealism-ও — এক প্রকার দুর্বলতা, তাহাতে অতি প্রচুর আত্মবিশ্বাস আছে। তাই ইন্দ্রনাথের কল্পনা যেমন অবাধ, অজ্ঞান, দ্বিধা-বিতর্কহীন—কোন আত্মসংকোচ বা সেন্টিমেন্ট তাহাতে নাই, শ্রীকান্তের কল্পনা তেমন নয়, তত্থানি আত্মহারা নয় ; তাহার দয়া আছে, সহানুভূতি আছে, কিন্তু কোথাও সে তাহার আত্মচেতনার বিরুদ্ধে কিছু করে না, তাহার সহানুভূতির মধ্যেও কোন-না-কোন অধিকার-বোধের উল্লেখনা আছে। ইহার একটা দৃষ্টান্ত ইন্দ্রনাথের সেই নতুন-দা'র কাহিনীতে পাওয়া যাইবে। সেই অতিশয় অসহায়, অতিদুর্বল স্বার্থপর জীবটির প্রতি ইন্দ্রনাথ আর যে-কোন কারণে যতই ক্ষমাপরবশ হউক না কেন, সেরূপ ক্ষমারও একটা সীমা আছে ; শ্রীকান্ত যে কোন কারণেই উহাকে এক মুহূর্তও সহ্য করিত না, ইহা নিশ্চিত। সে তখন ইন্দ্রনাথের মুখ চাহিয়াই সব সহ্য করিতেছিল। তাহার ইহাই মনে হইয়া থাকিবে যে, ইন্দ্রনাথও যদি লজ্জা পাইতেছে না, সে যেন তাহার আত্মীয়ের ইজ্জত ও নিজের আভিজাত্য-বোধ বজায় রাখিবার জন্যই প্রাণপণ করিতেছে, নতুবা, তাহার মত মানুষ এতখানি সহ্য করে কেমন করিয়া ! ইহা যে কতকটা সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি শ্রীকান্তের ঐ যে বিবৃতি তাহাতে আমরা শ্রীকান্তের জবানীতে তাহারই মনোভাব বুঝিতে পারি, ঘটনার একটা দিকই দেখি : কিন্তু শ্রীকান্ত যে দিকটি দেখে নাই, বা দেখায় যাই — আমাদের চিত্তে তাহাও উঁকি দেয় ; ইন্দ্রনাথের এই দুর্বলতায় আমরা যেমন বিস্ময়-বোধ করি, তেমনই ঐ জীবটির প্রতি তাহার শুধু লৌজন্যই নয়, করুণার মাত্রাটাও লক্ষ করি। মনে হয়, সে কেন ঐ 'ক্ষুদ্রের জীবটি'র প্রতিও কৃপাপরবশ হইয়াছে ; শ্রীকান্ত যাহাকে করুণার অযোগ্য মনে করে — সাধারণ মানবধর্মে তাহাই উচিত ও স্বাভাবিক — ইন্দ্রনাথ তাহাকে নিজ অপেক্ষা নির্মোহ, দুর্বল ও অসহায় বুঝিয়া যে-করুণার পাত্র হইয়াছে তাহার মূলে আছে সেই মূঢ়ত্বের চেতনা—যাহাকে শক্তিমান আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলা যাইতে পারে। "জীনা নরা মিত্রনা:" — এই সাধারণ উক্তিটিও যে কত বড় সত্য তাহা ইন্দ্রনাথের ঐ আচরণে আমরা বুঝিতে পারি। যে মানুষ হীন বা দুর্বল সেই নিষ্করুণ হয়, যে যত শক্তিমান তাহার করুণাও তত অধিক। আমার এই করুণাও যখন সর্ববাসী হয় তখন সেও যেন পূর্ণজ্ঞানেরই একটা রূপ — এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেই যে আরেকটী বাক্য আছে — "To know all is to pardon all" (যে সব জানে সে সবই ক্ষমা করে) — ইহাও বড় সত্য। অতএব ঐ নতুন-দা'র কাহিনীও এই দুই চরিত্রের পার্থক্য বুঝিবার পক্ষে একটা সহজ দৃষ্টান্ত।

ইন্দ্রনাথের বিশ্বাসের কথা বলিয়াছি, সে বিশ্বাস কেমন, এবং শ্রীকান্তের বিশ্বাস কি কারণে আরও সহজ তাহারও একটা দৃষ্টান্ত দিব। অন্নদাদিদি ইন্দ্রনাথকে একটা মিথ্যা আশা দিয়াছিল — অবশ্যই মনে না দিয়া পারে নাই। ইন্দ্রনাথ তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল, সে বিশ্বাস এতখানি সহজ এতখানি সম্পূর্ণ যে, পরে সেই মিথ্যার স্বপ্নোদ্যানকে সে সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ অন্নদাদিদি যে কোন অবস্থায় কখনও মিথ্যা বলিতে পারে ইহা মনে করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অন্নদাদিদির স্বীকারোক্তি শুধুই তাহার আশাভঙ্গ করে নাই, তাহার প্রাণের গভীরে আঘাত করিয়াছে। বালকের মতই সে তাহার বিশ্বাস ত্যাগ করিবে না। শ্রীকান্তের ঐরূপ বালকসুলভ বিশ্বাস নাই, সে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্থান-কাল-পাত্র বোঝে, অন্নদাদিদির কথা সে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিল—

"কি জানি কেন, আমি এই অত্যন্ত কালের পরিচয়ে তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না।" [পৃঃ ৬১]

—'পারিল না', তাহার একমাত্র কারণ, সে সত্যই বালক, শ্রীকান্ত তাহার তুলনায় বৃদ্ধ। শ্রীকান্ত আশ্চর্য হইয়াছে,—কেন ইন্দ্রনাথ পারিল না! যাহার এত বুদ্ধি, যে এত কৌশল জানে, শ্রীকান্তের তুলনায় যে এত বহুদর্শী—সে বিশ্বাসে বালক; বালকের বিশ্বাসজন্য—জগৎ অন্ধকার হইয়া যাওয়ার মত; সে ধাক্কা সামলাইতে হইলে, তারও চেয়ে বড় একটা শক্তি চাই; ইন্দ্রনাথ পারিয়াছিল—কোন্ শক্তিতে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। আমরা অনেক কিছু বুঝিয়া সকল ব্যাপারে সংসারের সঙ্গে রফা করিয়া চলি, আমাদের অনেক জিনিস সম্বন্ধেই বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস করিতে হয়। আমরা নিজেরা দুর্বল, তাই দুর্বলকে কথা দিই, নিজেরাও কথার আশা রাখি। আমাদের নিকটে বিশ্বাস বা সত্যজ্ঞান-অপেক্ষা ঐরূপ বুদ্ধিই মূল্যবান। কিন্তু বিশ্বাসের যে নিঃসঙ্গ অবস্থা তাহাতে আত্মকতা সেন্টিমেন্ট প্রভৃতি মনোবিলাসের প্রশ্রয় নাই, সহানুভূতির আত্মপ্রসাদও নাই; তাহাতে আছে আত্মার সাক্ষাৎ দীপ্তি। সেই 'হাঁ' বা 'না' এমনই যে, তাহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, যুক্তিতর্কের অবান্তরতা নাই। সেইরূপ বিশ্বাস যাহার, সে হয় 'না' বলিয়া সকলই ত্যাগ করে, নয়—'হাঁ' বলিয়া সবটাই গ্রহণ করে। বিচার করে না, বিশ্বাস করে না—যাহা করে তাহাতে আত্মার পূর্ণ সম্মতি আছে বলিয়া পূর্ণশক্তিও অনুভব করে। যে জ্ঞান থাকিলে ঐরূপ সহানুভূতিমূলক বিশ্বাস সহজেই হয় সে জ্ঞান শ্রীকান্তের আছে, তাহাতে একরূপ বিচারমুখিও আছে; কিন্তু তাহা সংসার-নিরপেক্ষ সংস্কারমুক্ত নয়, তাই অবাস্তবও নয়। পরে দেখা যাইবে, শ্রীকান্ত এমন অনেক কিছু বিশ্বাস করে যাহা অলৌকিক সত্য নহে; তাহাতে জ্ঞান অপেক্ষা সহানুভূতির প্রয়োজনই অধিক। ইন্দ্রনাথের জ্ঞান-বিশ্বাস যে কিরূপ, তাহা যে কত সহজ ও অবাস্তব, সে সম্বন্ধে শ্রীকান্ত নিজেই একস্থানে অনেকটা বড় গভীর টীকা করিয়াছে—তাহার বিশ্বাসের মূল কোথায়, সে যে কেন বিশ্বাসকে কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে পারে না, এই কথাগুলির তাহাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিয়াছে—

"তাই আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি, ঐ বয়সে কাহারও কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া, বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল তত্ত্ব সে পাইল কোথায়? এখন কিন্তু মনের সঙ্গে ইহার উত্তরটাও বেশ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিল না।... সেই জন্যই বোধ হয়, তাহার সেই হৃদয়ের স্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন সত্তা কোন অজ্ঞাত নিয়মে বলে সেই বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্তার দেখা পাইয়া অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত। বিশ্বাস অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে তবে সে মানুষের মন ছাড়া আর কোথাও নয়। সুতরাং এই অবস্থাকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে, জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, কোনদিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে সহজ এবং সত্যকেই পাইবে, তাহা ত' বিচিত্র নয়।" [পৃঃ ৩১-৩৮]

শ্রীকান্ত নিজের সম্বন্ধে এমন কথা নিশ্চয় বলিতে

খারে না; 'ইহা ভাবে আমি কি এক যাদুর প্রভাব (পৃঃ ৮১) — এ স্থানে তাহার প্রথম ধরিতে দিল।

ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত ভাল বাসিয়াছে, পূজা করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ তাহার দুরাশা কখন করে নাই — ইহাই সত্য। কেবল ইহাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইন্দ্রনাথ ঐটুকুর আশা লেই বহুদেই তাহাকে তাহার স্বরূপের পথেই কতকটা ঠেলিয়া দিয়াছিল; তাহাতে তার ফল, পরমুখাপেক্ষিতা, অমনুষ্যে-জীবন যাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা — এ সকলই ঐ ইন্দ্রনাথকে দেখিয়াই

তাহার চিত্তে ও চরিত্রে একটা বর্ষের মত দৃঢ়মূর্তির হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রভাবই শেষে আরও প্রখর ও ঘনীভূত হইয়া শরৎচন্দ্রের যে অসাধারণ সৃষ্টি রাজলক্ষ্মীকে তাহার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে করিয়াছি, সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত। শ্রীকান্তের কাহিনীতে অতঃপর আমরা যে কয় জনা নারীর সাক্ষাৎ পাইব তাহাদের, একদিকে আছে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কারের দৃঢ়বন্ধন এবং অপরদিকে স্বাধীন মানবীর সহজস্ফূর্তি; এই দুয়ের দ্বন্দ্বে ইন্দ্রনাথ সমান বল সঞ্চার করিয়াছে; ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের সম্মুখেও সেই শক্তির আদর্শ, আবার মানুষের দুঃখ-দুর্বিপাকেই সকল সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার উপরে স্থান দেওয়ার যে অকপটহীন দুঃসাহস, তাহার সম্মুখেও সেই এক আদর্শ। এই অদ্ভুত দ্বন্দ্ব — একই প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ স্ব-বিরোধী প্রবৃত্তির লুকাচুরী, ইহাই শ্রীকান্তের জীবনকে এমন দুরূহ করিয়াছে। এই ইন্দ্রনাথ যেমন অন্নদাদিদির পাশেও দাঁড়াইয়া আছে, তেমনই অভয়া হইতেও দূরে নাই। শ্রীকান্তের দুর্বলতা যেখানে সেইখানেই ইন্দ্রনাথকে প্রয়োজন; শ্রীকান্তের সেই আত্মাভিমান — সে যে কোথাও হৃদয়ের দুর্বলতা স্বীকার করিবে না — এই অভিমান বজায় রাখিবার জন্য সে অন্তরের অন্তরে ইন্দ্রনাথকেই বরণ করে। ইন্দ্রনাথের মত প্রেম-শক্তি তাহার নাই, তাহা সে জানে; কিন্তু সেই শক্তিহীনতাকে — সেই বন্ধনহীনতার ঔদাসীন্যকে, সে যে ইন্দ্রনাথের অনাসক্ত জীবনের উচ্চ আদর্শ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া আপন হইতে চায়, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

শ্রীকান্তের জীবনে ইন্দ্রনাথের যে প্রভাব তাহা বহুদূর ব্যাপী বিস্তারে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলাম — সে প্রভাব কত রকমের হইতে পারে তাহাই দেখাইলাম। মানুষের চরিত্র বা হৃদয়বৃত্তির ব্যাপারে কোন যুক্তি, কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্ব কাজে লাগিবে না; এরূপ আলোচনায় কোন শেষ সিদ্ধান্ত নাই, কেবল একরূপ ব্যাখ্যা করা যায় মাত্র — তাহাও মূল কাহিনীর সামঞ্জস্যবিধায়ক হওয়া চাই; আমি উপরিত যাহা বলিয়েছি পরে সমগ্র কাহিনীর দ্বারা তাহার যতটুকু সমর্থিত হয়, ততটুকুই যথার্থ।

(ক্রমশঃ)

হায় সমর বহিয়ে তোমারে ধরিবে কেবা,
তবো তখন তোমায় আপন বেধি যে করিতে পারিনে সেবা।
নিশির কহিল কাঁদিয়া —
তোমারে আমি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিক আমার বল,
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অচঞ্চল।

স্মরণে

শ্রীতারাচরণ বসু

(১)

তারাসুন্দরী দেবী, প্রতিপদ চা'ও কাল হবে তোমা সেবা,
তাই-দ্বিতীয়ার এ শুভ-প্রভাতে, দিদি, আমি আছি কেবা!
তোমার হাতের কোঁচানো ধুতিটি, উড়ানীতে ফুল-বোনা,
ঘাটার মলনা, কেয়া-খয়েরের মুচকি-মিশি ও সোনা,
খাজাপোশের অকল-তলে চন্দ্রপুলির রাশি —
তবু বলিয়া 'বিদায়' লইতে তোমা এল না 'বাসী'।
ওই দেখ, তোমা মা বুঝি আবার ফেলিছেন আখিজল —
তুমি কাঁদো নাকি? ভালো আছি দিদি, নাই মোর অঙ্কুশল।

(২)

অন্তরে তোর স্থান দানে নাই, — তোমের সিথির ধরি'
কাঁচা-ফুল দিয়ে শপথ তোর রাখেনি ক্ষমা করি'।
মেয়ে বড় প্রিয় আজনগুলি যে আজ স্মরণে রাখে —
সারা বছরের শেষ মিটাইতে একটি দিনের পাকে?
তুমি নাই আজ; হাসির মতন কর্পূর-সুবাসিত
পায়সান্নের থালিটি আমার সম্মুখে ধর'নি ত'?
বেশী মেয়ে দুটি কারে খুশি করা? কে করে
ভোজন-ভুল?
ব্যথা পেলে বুঝি? ভালো আছি দিদি, নাই
মোর অঙ্কুশল।

(৩)

সকালের আলো কখন মিলালো, বার-বেলা কেটে যায়,
এবারের মত চন্দন-কণা তবু কি হল না সায়?
কই চুলা-সিঁদি? ওরা-পান কই? দূর্বা লুটায় ভুঁয়ে,
ললাট আমার করে হাহাকার, শীতল কর গো ছুঁয়ে!
তবের দুয়ারে তোরা হল না যে নূতন কাঁটার চারা
মোর অন্তরে রাখিল সে কোন্ সন্ধান 'দ্বিতীয়া'
এ জীবনে তার মূল্যবেশীর সন্ধানে নাই ফল, —
তবু ভালো আছি, কাঁদিস্‌নে দিদি, নাই মোর অঙ্কুশল।

(৪)

দিয়ে কথা যদি কথা রাখি আজো, মিলিবেই
আমি কথা;
এমন দিখ্যাচারের পাপ অনেক আছে ত' কথা।
বধূ-জীবনের প্রথমে যখন কর্তার খাদন চেপে,
নিরুপায় প্রাণে ব্যথা পাবে জেনে, তত মিছা
খেছি বলে'।
পিসিমার কাশী-প্রাপ্তির কথা, জানার ব্যারাম অতি,
যাবার সময় চাকরীটি মোর, যাওনি' হারালো পতি —
দুর ছেলে তবু, কাঁদিয়া দিয়েছি 'অয় সুমঙ্গল'!
সেদিনের মত ক্ষমা করো, দিদি, নাই মোর অঙ্কুশল।

(৫)

তবু মিছা নয়, ঝুকে যাই থাক্—এ মোর ললাটখানি
তোমারি স্নেহের রক্ষা-তিলকে অঙ্কন আজো মানি।
মরণের পায়ে আশীষ আমারে আজিও যে করিছায়;
তবের দুয়ারে—কাঁটা দিবে কেন?—নিজে আগুলিয়া
আছ!
কেঁপে ওঠে নাকি দুটিকোঁটা জল আখিকোণে
তবু এসে—
আজিকার ভোরে, এ দূর-দেশের প্রবাসীর উদ্দেশে?
তাই ভেবে বলি—শুভদিনে মন কোরো নাকো চঞ্চল,
তাইটি তোমার ভালো আছে, দিদি, নাই তার অঙ্কুশল।

তারা-হারা

(কবি-কাহিনী)

[ফরাসী গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে। একটি নিছক কাব্য-বস্তু যে এইরূপ গল্প হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহাতে কল্পনার যে সুকুমারতার ভঙ্গি ও এক প্রকার রসিকতা রহিয়াছে, তাহাই ফরাসী জাতির কাব্যরস-রসিকতার একটি বিশেষ লক্ষণ।]

একটা সনেটের শেষ লাইন হাতে শেষ করেছি, এমন সময়ে আমার খাস-খানসামা এসে বললে,

"হুজুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম "তাঁরা কার্ড দিয়েছেন কি?"

"হাঁ হুজুর, এই যে।"

একখানার লেখা আছে "হেলিয়াস," আর এক-খানার "আকারোস" — দু'জন দেবদূতই ত' বটে!

বললাম, "আসতে বল।"

অবশ্য এমন দু'জন মানবীয় অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমি যে বেশ উৎসুক হয়ে উঠলাম, তা' বলাই বাহুল্য। দু'জনেরই বেশ বড় বড় পাখার পোষাক: প্রত্যেক পাখায় চারখানি করে' পালক, তাদের ডগাকার তুলোয় আস্তরটা ঠিক যেন সকাল-বেলার হালকা কুয়াসার মত — তার থেকে রামধনুর সব কটা রং ঠিকরে পড়ছে। তাঁদের শরীরের যেটুকু দেখতে পাওয়া গেল সে যেন বরফের মত শাদা, কেবল একটু গোলাপী আভা মাখানো। আমি হাত বাড়িয়ে 'বসতে আজ্ঞা হোক' বললাম, তার পর খুব নম্রতা করে' জিজ্ঞেস করলাম, কি প্রয়োজনে তাঁরা আমার মত এই অধমকে দর্শনদান করে' ধন্য করেছেন।

হেলিয়াস বললেন,

"খুব সাফ্‌সোই বলছি। ঠিক ষোল বছর আগে, জুলাইমাসের এক সুন্দর রাতে, আমি আর আকারোস বিলিয়ার্ড খেলছিলাম — আকাশের সবুজ কার্পেটের উপরে।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম,

"মাপ করবেন, — কিন্তু আকাশ ত' সবুজ নয় — সে ত' নীল।"

"অনন্ত আকাশের কোন কোন স্থান নীল বটে। কিন্তু অন্য সব জায়গায়, বিশেষ করে' তার যেখানেটা পারস্যদেশের সহর আর প্রান্তরের উপরে ঝুঁকে পড়েছে — সে সব জায়গা খুব সবুজ, চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়।"

আমি আর কিছু বললাম না। হেলিয়াস বলতে লাগলেন,

"সবচেয়ে সুন্দর যে দুইটি নক্ষত্র আমরা তাই নিয়ে করেছিলাম আমাদের বিলিয়ার্ডের বল —"

"আর ছড়ি করেছিলেন কি দিয়ে?"

"ধূমকেতুর লেজ। কাজেই বুঝতে পারছ, খেলাটা বেশ জমে' উঠেছিল। আমিই বাজিটা জিত্‌ব জিত্‌ব করছি, এমন সময়ে খুব জোরে একটা ঘা' দিতেই বল দুটো ফিনারা পার হয়ে গেল"।

"বাইরে পড়ে' গেল?"

"হাঁ, একেবারে আকাশের ফিনারা টপ্‌কে। তারি দুর্ঘটনা ঘটে' গেল, কারণ দু-দুটো তারা ঝর পড়ে' বাওয়া ঘর্মের পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার

কি না! স্বর্গের মহাজনের যিনি অমাত্য তিনি হুকুম দিলেন, যে-পর্যন্ত না ওই হারানো তারা দুটোকে খুঁজে বের করে' আবার সেখানকার সেইখানে দেখে দিই, ততদিন স্বর্গের আমোদ-প্রমোদে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে বারণ।

"এই ষোল বছর ধরে' কি খোঁজাটাই খুঁজলাম আমরা! পৃথিবীর যত জায়গা আছে সেখানে ঐ তারা দুটো পড়ে' দিয়ে থাকা সম্ভব, কিছু আর বাদ রাখি নি। কিন্তু সে আর পাওয়া গেল না — কি দুর্ভাগ্য বল দেখি? শেষে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি — স্বর্গ থেকে চির-নির্বাসনে যাত্রা করতেই প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময়ে খবর পেলাম, তোমার যিনি প্রণয়িনী সেই চঞ্চলীর চোখদুটি নাকি অনুপমীয় — অবিশ্যি, সুখ-দুখে যা ঘটেছে তা' যদি বিশ্বাস করতে হয়। যা' শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে, তাঁর চোখ-দুটি সাধারণ মর্ত্য-সুন্দরীর চোখ নয়, ও স্বর্গেরই সেই দুটি আলোর গোলক, আমরা যা' খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। আশা করি, তিনি সে দুটি ফিরিয়ে দিতে অমত করবেন না।"

শুনে আমি ত' অবাক! আমার প্রাণসখা প্রিয়তমার চোখদুটি এরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে, এ কথা মনে হ'তেই ভয়ে কান্না হয়ে গেলাম। কিন্তু ঐ দুজন দেবদূতের নৈতিক শক্তি উদ্ধার করে' বেরুবার যখন আমারই হাতে, তখন এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করাও ত' আমার উচিত। অগত্যা আমি তখনই মাদ্‌মোয়াজেল জেঁাজকে ডেকে পাঠালাম, সে এসে তাকে সব কথা বুঝিয়ে বললাম।

তার কিন্তু কোন ভাবান্তর হ'ল না — ভয়ও পেল না, শুনে আশ্চর্য্যও হ'ল না। একটু কি চিন্তা করে' আগন্তুক দুজনের দিকে ফিরে দাঁড়ালো, তারপর তার চোখদুটির পাতা যতদূর সম্ভব তুলে' ধরে' তাঁদের জিগ্যেস করলে, "দেখুন দেখি আপনারা — এ দুটো কি আপনাদের সেই হারিয়ে-যাওয়া তারা বলে' মনে হয়?"

তাঁরা খুব কাছে সরে' এলেন, খুব লক্ষ্য করে' মেঁাজেলের সেই স্বচ্ছ, নির্মল চোখদুটি দেখতে লাগলেন। কয়েক মিনিট চাপা গলায় দুজনে কি বলাবলি করলেন — ঠিক যেমন বিচারপতিরা রায় দেবার আগে পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে। শেষকালে হেলিয়াস বললেন,

"না, এ সেই নক্ষত্র নয়, যা' ষোল বছর আগে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদের সে দুটির এত বেশি দীপ্তি ছিল না — যদিও সেই ঘুলাইমাসের রাতে তারা খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।"

এই বলে' বড়ই নিরাশ হয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন। তাঁদের জন্যে আমার দুঃখ হ'ল, যদিও সেই সঙ্গে প্রাণটাও বাঁচলো — আর একটু হ'লেই আমাকে প্রিয়হারা হ'তে হয়েছিল আর কি!

আর মেঁাজেল? সে ত' হেসেই কুটোকুটি! বললে, "কেমন চালাকি করে' জবের কিস্তির দিয়েছি! কথাটা সত্যিই বটে। আমার যা কর্ত্তব্য বলেছেন, আমার জন্মাবার কিছুক্ষণ পরেই আকাশ থেকে দুটো তারা খসে' পড়ে', খোলা জান্‌লা গলিয়ে একেবারে আমার চোখের পাতায় জিহ্বায় চুমো খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু দেবদূত দুটো যখন একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল তখন আমি কি করেছিলাম জানো? ঠিক সেই সময়ে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, সেই যে তুমি আমার ঠোঁটে প্রথম চুমো খেয়েছিলে — সেই চুমোর কথা। আমি নিশ্চয় জানতাম, সে আনন্দ স্মরণ করলে আমার চোখদুটোতে এমন আলো ফুটে উঠবে, যার সঙ্গে কোন নক্ষত্রের আলো — হোক না সে স্বর্গের — কিছুতেই সমান হ'তে পারে না।"

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে ; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন-কি, পূর্বপুরুষের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনরুজ্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

বর্ণাশ্রম ও আধুনিক সমাজ

[প্রবন্ধটি ১৩১৩ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'সাহিত্য'-পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। লেখক স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল। আধুনিক কালে যে সমাজ-বিপ্লব আসিয়া হইয়াছে — সমগ্র মানব-সমাজে যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, লেখক অতি-প্রাচীন হিন্দু-চিন্তার সাহায্যে তাহাকে পুনঃস্থাপিত করিয়া তাহাকে একমাত্র কল্যাণের সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন ; ঠিক নির্দেশও নয়, তিনি দেখাইয়াছেন, সেই সমাধান সকল উৎপাতের শান্তি আনিতেই হইবে ; ইহা অভ্রান্ত হইবার উদ্দেশ্য লেখক, মানুষ-সমাজ ঐরূপ ব্যবস্থাতেই স্থিতি লাভ করিবে, কারণ, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাই অবশ্যম্ভাবী।]

হিন্দুর সকলই আছে, আমার কিছুই নাই। কথায় যাহা আছে কাজে তাহা নাই, অনুষ্ঠানে যাহা আছে জ্ঞানেতে তাহা নাই, আদর্শে যাহা আছে বাস্তবে তার কিছুই নাই। এইজন্য হিন্দু বলিয়া আমরা যে গৌরব করি, তাহা সমর্থন করা যায় না।

তাই বলিয়া এই গৌরবটুকুও ত ছাড়িতে পারি না। এই গৌরবটুকুই যে এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। এই গৌরবটুকু আছে বলিয়াই ত আমরা আজও দুনিয়ার দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি। এই গৌরব মিথ্যা হইলেও, বিদেশীর সভ্যতা ও সাধনার আঘাতে এইটিই এখন আমাদের বর্ম-চর্ম স্বরূপ হইয়া আছে। এই বর্মই এই মিথ্যা গৌরবে আঘাত করিতে এখন সঙ্কোচ হয়। এটি যেমন আমাদের বর্তমানের আশ্রয়, তেমনি ভবিষ্যতেরও আশা। এই গৌরবটুকু ফেলে আমাদের সব গেল।

কিন্তু এই মুকুলও অতিমাত্র হইয়া চিরদিন টিকিবে না। স্বানুভূতিহীন শাস্ত্র, অর্থহীন অনুষ্ঠান, প্রাণহীন কর্ম লইয়া চিরদিন চলে না। ইহাতে জাতির শক্তি থাকে না, ভবিষ্যতা মাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীনের শবকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া কোন জাতি মঙ্গলীলাভ লাভ করিতে পারে না। আমার এই শবকে 'আমি'

বিয়া" না পোড়াইয়া, শুদ্ধতাকে ধরিয়াও কোনও জাতির বৈশিষ্ট্য ও জাতিত্ব বজায় থাকে না। জাতীয়তা কেবল কতকগুলি কাযে নহে। এই মূলাধার কাযগুলি সকল সমাজেই প্রায় বিস্তর পাওয়া যায়। জীবনের মূল সমস্যা সর্ব্বত্রই এক। অর্থাৎ ও অর্থের মূল লক্ষ্য সকলদেশেই সমান। সমুদায় সভ্য সমাজেই এগুলি আছে। তবে বস্তুতে এক হইলেও, আকারে বিভিন্ন হইয়া আছে। এই আকারগত বৈচিত্র্যই জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের প্রাণ। বাল্যে ও যৌবনে শিক্ষা, যৌবনে সংসার, সকলেই করে; এবং বার্দ্ধক্যে অবসর লইয়া নিষ্কৃতি হইয়া জীবনের সন্ধ্যাকালে সকলেই শান্তিতে ও আরামে কাটাইতে চাহে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থের মূল আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, মূল প্রয়োজন ও সাধন সকল সভ্যসমাজেই পাওয়া যায়। কিন্তু, বস্তুতে কতকটা ঐক্য থাকিলেও, আকারে আমাদের আত্মকর্তৃত্বের মতন কোনও কিছু অপর সভ্য সমাজে নাই; ছিল বলিয়াও জানি না। আমাদের বিবাহের মূল লক্ষ্য যাহা, অপর সভ্যজাতির বিবাহের মূল লক্ষ্যও তাহাই; সর্ব্বত্রই প্রজোৎপাদনের জন্য, বংশরক্ষার জন্য, সমাজস্থিতিরক্ষণ-নিবারণের জন্য বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমাদের বিবাহপ্রথার এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যত্র দেখা যায় না। এই বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের বিবাহের অনুষ্ঠানটীর আলোচনা করিতে হয়। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্য ভাবের অপেক্ষা অনুষ্ঠানের মধ্যেই বেশী ফুটিয়াছে। আমরা যদি খৃষ্টিয়ানের মতন রেজিষ্ট্রারি করিয়া বিবাহ করি, অথবা মুসলমানের মতন কাবিননামা সহি করিতে আরম্ভ করি, তাহাতে বিবাহের মূল লক্ষ্য—প্রজোৎপত্তি ও সন্তানরক্ষার কোন ব্যাঘাত জন্মিবে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও, এরূপ বিবাহ আর হিন্দুবিবাহ থাকিবে না।

সুতরাং আমাদের সমাজের প্রাচীন, পুরাগত অনুষ্ঠানগুলির, রীতিনীতি, চালচলন,—এককথায় আমাদের জীবনের বাহিরের কর্ম্মকাণ্ড, আমাদের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের কাঠামটাকেও একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়া আমরা নূতন করিয়া জাতীয় জীবনের এই বহিরঙ্গগুলিকে গড়িয়া তুলিতে পারি না।

ফলতঃ যাহা একান্ত প্রাণহীন, তাহা আপনা হইতেই পড়িয়া খসিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যার মধ্যে প্রাণবস্তু নাই, তাহাকে ধরিয়া রাখিবে কে? এই পথেই বৈদিকক্রিয়াদি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে। একদিন ইন্দ্রবরুণাদি বৈদিক দেবতারা লোকের প্রত্যক্ষ, অনুভবসম্বন্ধ, সত্যবস্তু ছিলেন। তাঁহাদের আর্য্যেরা যখন যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন এই প্রত্যক্ষ আকাশকে তাঁরা সত্য সত্যই প্রাণবান্ ও চেতনবান্ বলিয়া অনুভব করিতেন। যাস্কাদি ঋষি তখন তাঁহাদের চক্ষে প্রত্যক্ষ রাজার মতন ছিলেন। তাঁহারা অগ্নিকে যে-চক্ষে দেখিতেন তাহাতে অগ্নির পূজা তাঁহাদের নিকটে সত্য ও স্বাভাবিক ছিল।

ক্রমে লোকে সে সরল সহজ অনুভূতি হারাইল। সুর্য্যাদি পুরাতন প্রত্যক্ষ নষ্ট হইয়া গেল। প্রাণ-জ্যোতিঃর সাক্ষাৎকারে বাহিরের জ্যোতিঃসকল হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। তখন উপনিষদ্ গাহিয়া উঠিলেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

অর্থাৎ—যেখানে সূর্য্য কিরণহীন, চন্দ্রতারকা কিরণ-হীন, বিদ্যুৎসকল যেখানে প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নি কিরূপে সেখানে দীপ্তি পাইবে? সমুদয় বস্তু সেই জ্যোতির্ম্ময়েরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত,

তাঁহার নীতিতেই সকলে নীতি পাইতেছে। এতাবৎ কাল লোকে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের বস্তুসকলকেই বাহিরের ও অন্তরের সকল জ্যোতিঃর মূল বলিয়া মনে করিতেছিল। তখন যে তাহারা এই পরোক্ষ জগতেই বাঁধা ছিল, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পাইলেও তখনও তার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। কিন্তু যখনই আত্মজ্যোতিঃর প্রত্যক্ষ-লাভ হইল, তখন হইতেই সূর্য্যাদির অলৌকিকত্ব নষ্ট হইয়া গেল; ইহারা যে স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় ও স্বপ্রকাশ নহে ইহা দেখা গেল। আর তখন হইতেই ইহাদের উপাসনার অন্তরতম প্রাণবস্তু চলিয়া গেল।

ইহার পরেও নানাপ্রকারের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা কিছুকাল পর্য্যন্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড সমাজে প্রচলিত রহিল সত্য, কিন্তু ক্রমে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশে, নব নব ভাবের ও আদর্শের প্রকাশে এসকল ক্রিয়াকাণ্ড পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেল। প্রাণহীন বৈদিক কর্ম্মকে আর ধরিয়া, রাখা গেল না। নূতন কর্ম্ম ও নূতন অনুষ্ঠানাদি আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

যথা পূর্ব্বং তথা পরং। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যাহা হইয়াছে, কালক্রমে বর্ত্তমান যুগেও তাহাই হইবে। নূতন ভাব ও আদর্শের প্রকাশে সর্ব্বপ্রথমে সমাজ-চৈতন্য প্রাচীন ও প্রচলিতকেই নূতন ব্যাখ্যানির দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া লইতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় না। আংশিকভাবে হয় মাত্র। যতটুকু পরিমাণে এই চেষ্টা ফলবতী হয়, ততটুকু পরিমাণে প্রাচীন ও প্রচলিত টিকিয়া যায়। নূতন অর্থ লাভ করিয়া, নূতন প্রাণ পাইয়া, নবযুগের সাধনার সঙ্গে তাহা মিশিয়া যায়। যাহা এরূপ অর্থ লাভ করিতে পারে না, কিম্বা যাহা নবযুগের সঙ্গে কিছুতেই আর মিশ খায় না, যাহাতে নূতন প্রাণসঞ্চার করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য বা একান্ত অসাধ্য হয়, নবযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত ও প্রত্যক্ষ-অনুভূতিযুক্ত অর্থ দান করা যায় না, তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যায়। এইরূপেই আমাদের দেশে বহুতর প্রাচীন ক্রিয়াকলাপাদি ক্রমে লোপ পাইয়াছে। তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব ও অসাধ্য।

(২)

শীতাতে বর্ণসঙ্করের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই বর্ণাশ্রম সংবিধিত হইয়াছে। কিন্তু এখন সঙ্করবর্ণই ত ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার হিন্দুসমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণ ত এখন এদেশে নাই। আর বর্ণ যতটুকুও বা আছে, আশ্রম ত আদৌ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর নাই, আশ্রমের বিলোপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অর্দ্ধেক লোপ পাইয়া এখন বাকি পড়িয়া আছে কেবল বর্ণভেদ বা জাতিভেদ। বর্ত্তমান বর্ণভেদ কি বস্তুর আশ্রয়ে, বা শীতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? অযাজন—অধ্যাপন যজন-যাজন ব্রাহ্মণের কর্ম্ম—সে ব্রাহ্মণ কোথায়? কেহ দুধ-বেচা ব্রাহ্মণ, কেহ বা তামা-কাঁসা-বেচা ব্রাহ্মণ, কেহ বা কলিবার। বর্ণাশ্রমের-নামে বিলাতী ফ্রীমেসন-কৌলীন্যের একটা অদ্ভুত অনুকরণ বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয় ত' বা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বর্ণাশ্রমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব ও অসাধ্য। তবে বর্ণাশ্রমের আদর্শটি অতি উদার এবং বৃহৎ একথাও অস্বীকার করা যায় না। এটি ভুলিয়া গেলেও চলিবে না। দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী করিয়া যাহাতে ঐ আদর্শটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, তার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সে চেষ্টা করিতে হইলে বর্ত্তমান বর্ণভেদ বা জাতি-ভেদকে একেবারে ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ছিন্ন-সূত্রের প্রাচীন জের রক্ষা করিবার চেষ্টা এখন নিষ্প্রয়োজন ও ভাবনাহীন হইবে। বর্ত্তমান সমাজে হয় শূদ্র নাই, না হয় দ্বিজ নাই—দু'এর একটা

আনিতেই হইবে। তারপর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দ্বারা যদি বিচার হয়, তবে গুরুদীক্ষা যেই লাভ করে সেই দ্বিজ হইয়া যায়। গুরুকুলের নিকটে বহুদীক্ষালাভে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের সমান অধিকার। তন্ত্র সর্ববর্ণকে এই অধিকার দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণব সকলেরই এই অধিকার আছে। অন্যান্যবর্ণের লোকেও গুরুকরণ ও মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা যে কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, এই মন্ত্রদীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্বের অধিকারী হইয়া থাকেন। এইজন্যই বলিতে হয় যে, সত্যভাবে বিচার করিলে, কি শুদ্ধির হিসাবে, কি কর্মের হিসাবে, কি আধ্যাত্ম-জীবনে দীক্ষালাভের হিসাবে, বৈদিক বিধাই দেখা যাউক না কেন, বর্তমানে বাঙ্গালী সমাজে প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্যের কোন কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আশ্রম ত নাই, বর্ণও নাই। এই অবস্থায় কেবল বর্ণকে বা জাতিকে বা 'ইউজেনিক্স' আশ্রয় করিয়া বর্ণাশ্রমধর্মের আদর্শ রক্ষা বা তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এদিকে যা কিছু চেষ্টা হইতেছে তার মূল প্রেরণা জাতিজিঘাংসা, নিছক সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবিদ্বেষের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা। এক কথায় বলিতে গেলে আমরা বর্ণাশ্রমের দোহাই দিয়া প্রকৃতপক্ষে বিলাতী শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-বিরোধই class distinction এবং class warfare প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ ভাবে হিন্দু-সভ্যতা ও সাধনাকে রক্ষা করা যাইবে না, বরং আরও বেশী করিয়া তাহার উচ্ছেদই সাধিত হইবে। অথচ আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম যে-আদর্শের সন্ধানে যাইয়া সমাজ-সমস্যার যে মীমাংসাটি করিতে চাহিয়াছিল তাহাকে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। বর্তমানের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও সাধনা সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে। সে আদর্শটি—বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এই আদর্শ ইউরোপেরও নূতন আবিষ্কার নহে, আমাদেরও নিতান্ত অপরিচিত নহে। যেখানে উচ্চতর ধর্ম ফুটিয়াছে সেখানেই এই আদর্শটি আসিয়াছে।

ফরাসী-বিপ্লবের বহু বহু শতাব্দ পূর্বে যীশুখৃষ্ট এই আদর্শটি প্রচার করেন। তারও বহু শতাব্দ পূর্বে এদেশে ভগবান বুদ্ধদেব এই আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবেরও বহু বহু যুগ পূর্বে ভারতের প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাই সাধন করিয়াছিলেন। খৃষ্টের বহু শতাব্দ পরে, আজ হজরত মোহম্মদও এই সাম্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্মের সকল কর্মেরই মূল লক্ষ্য এইটি। অথচ আজ পর্য্যন্ত কোনও সমাজে বা কোনও ধর্মমণ্ডলীতে এই সমাজন আদর্শটির সমাক প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা যেমন একটা সার্বজনীন আদর্শ, সেইরূপ বৈষম্য, বিরোধ এবং প্রভুত্বও একটা সার্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা। সাম্য আত্মার ঈপ্সিত, কিন্তু বৈষম্য সংসারের অপরিহার্য্য নিয়তি। মৈত্রী প্রাণের আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু বিরোধ, প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য ও সার্বজনীন পন্থা। স্বাধীনতা পরম পুরুষার্থ, কিন্তু অধীনতা ব্যতীত সমাজ-স্থিতি আর সমাজ-স্থিতি ব্যতীত লোকরক্ষা ও জীবনরক্ষা, আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি, ধর্ম ও কর্ম সকলই অসম্ভব ও অসাধ্য হয়। বৈষম্যের মধ্যেই সাম্যকে, বিরোধের মধ্যেই মৈত্রীকে, পরাধীনতার মধ্যেই স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তবে এই কঠিন, দুরূহ, সার্বজনীন সমাজ-সমস্যার মীমাংসা সম্ভব। এই অঘটন ঘটাইব কিরূপে?

(৩)

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা বর্ণাশ্রমব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু নিষ্ফল

হইলেও, এই সমস্যার ইঙ্গিতাভাস যে অন্ত পথে আছে, তাহাও মনে হয় না। অন্ততঃ এ পর্যন্ত ইহার আর কোনও প্রেরণার পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। এই জন্যই বিশেষ সাবধানে এই বর্ণাশ্রমধর্মকে বর্জন না করিয়া ইহার সংশোধন, পরিবর্তন ও সময়োপযোগী সম্প্রসারণ সম্ভব কি না, আমাদিগকে বারবার তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আর এই বিচারের মূল, সকলের আগে আমাদিগকে এইটি বুঝিতে হইবে যে, যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাকে আমরা ইউরোপের আদর্শরূপে জানিয়া অনেক সময় অন্ধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তাহা ইউরোপের বিশিষ্ট ও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, কিন্তু আমাদেরও প্রাচীনতম সাধনের ধন। কখনও স্বাধীনতার বা সাম্যের বা মৈত্রীর সম্পূর্ণ রূপ আজি পর্যন্ত ইউরোপে লাভ করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। প্রত্যেক বস্তুর বা তত্ত্বের যা আদর্শটা হইটা দিক আছে—একটা তার ভাবের দিক্, আর একটা তার অভাবের দিক্; একটা ইতির দিক্—হাঁ'র দিক, আর একটা নেতির দিক্—না'র দিক; একটা positive দিক্, আর একটা negative দিক্। ইউরোপ এ পর্যন্ত স্বাধীনতার ভাবের দিক্, ইতির দিক্, হাঁ'র দিক্ বা positive দিকটা ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই; তার অভাবের দিক্, নেতির দিক্, না'র দিক্ বা negative দিকটাই খুব শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। ইউরোপ স্বাধীনতা বলিতে কেবল অধীনতার অভাবটাই বুঝে, স্বাধীনতার ভিতরেও যে একটা অধীনতা আছে, একথা এখনও পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারে নাই। এইজন্য ইউরোপীয় ভাষায় আমাদের স্বাধীনতার সত্য প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের আমাদের ভাষাতেও তাহাদের Independence, Freedom, বা Liberty-র কোনও সত্য প্রতিশব্দ নাই। আমাদের প্রাচীন সাধনায় স্ব-এর অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলিয়াছে। আর এই স্ব-এর আত্মতত্ত্ব; ইহা একই সঙ্গে ব্যক্তির ও বিশ্বের, ব্যষ্টির ও সমষ্টির; একই সঙ্গে ইহা সোপাধিক ও নিরুপাধিক, অংশ ও অংশী। আত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্ব একই বস্তু, যা একই তত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্বের উপরেই ভারতীয় সাধনার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ-লাভ করিয়াই উপনিষদ বলিয়াছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

অর্থাৎ যিনি আত্মাতে সমুদয় বস্তুকে দেখেন, সমুদায় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না। এই একাত্মানুভূতির উপরেই ভারতীয় সাধনার সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। অধিকারের বা স্বত্বের বা রাইটের (right-এর) সমতার উপরে এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত নহে; কিন্তু আত্মার একত্বের উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। আমার সুখদুঃখাদির অনুভূতি যেমন, সকলেরই—হইবার কথা; আমার মতন তাহারাও প্রিয়বস্তুলাভে উৎফুল্ল ও অপ্রিয়লাভে বিষণ্ণ হইয়া থাকে; এই যে সমবেদনা বা সহানুভূতি ইহাই আমাদের সাম্যসাধনার মূল মন্ত্র। ইহারই উপরে ভারতের সমাজে মৈত্রী ও অহিংসা-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ সামাজিক নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক; বাহিরের নহে কিন্তু ভিতরের। এইজন্য বাহিরের বৈষম্যে, বিরোধে, অধীনতাতে ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না। ভারতীয় সাধনা বিশেষভাবে অন্তরঙ্গ-জীবনে—Subjective life-এরই—এই আদর্শের অনুশীলন করিয়াছে; বহিরঙ্গে ইহার অবাধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখনও পায় নাই।

ভারতীয় সাধনা ইহা বেশ বুঝিয়াছিল যে, আমাদের সাধারণ সকলেই এই শ্রেষ্ঠতম আদর্শলাভের অধিকারী নহে। আত্মজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী যাহারা কেহই এই

সামাজিক সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মর্ম ও মর্যাদা বুঝিতে পারে না। কেবল তত্ত্বজ্ঞানিগণই সমাজরূপ এই আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারেন। এখনও এমন সকল মহাপুরুষ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ধারণের সম্পূর্ণরূপ সাধন হইয়াছে। ইঁহারা অপরের শরীর আহত হইলে নিজের অক্ষত শরীরে বেদনা অনুভব করেন; অপরকে শীতার্ত দেখিলে ইঁহাদের শীতবস্ত্রাবৃত দেহ থর থর কাঁপিতে থাকে; অপরের দুর্দিনদৃষ্টিতে ইঁহারা নিজেরা পরিতৃপ্তি লাভ করেন; অপরের পাপ-যাচনা পর্যন্ত ইঁহারা নিজেদের মনের ভোগ করিয়া থাকেন। গুরু-কৃপায় এমন মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াছি। ইঁহাদের দেখিয়াই আমাদের প্রাচীন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শটা যে কি, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছি। ইঁহারাই শ্রেষ্ঠতম স্তরের সত্য অধিকারী। সকলের পক্ষে এই উচ্চতম অবস্থালাভ সম্ভব নহে। কিন্তু এই অবস্থাই জীবের সাধ্য। ইহাই সনাতন চরম লক্ষ্য। এইটি প্রতিষ্ঠিত করাই সমাজধর্মের উদ্দেশ্য। আর জনসাধারণকে ক্রমে ক্রমে এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্যই, মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় সাধনার এই বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মানুষের কেন্দ্রবিমুখে স্থায়ী করিবার জন্য বর্ণবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় নাই,—তাহাকে ফিরে ফিরে নষ্ট করাই বর্ণাশ্রম-ধর্মের অভিপ্রায়। গীতায় ভগবান—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ

—এই বলিয়া এই উদ্দেশ্যটিকেই নির্দেশ করিয়াছেন। চাতুর্বর্ণ্য বলিতে, চারিবর্ণের মিলনে যে সমষ্টির সৃষ্টি হয় সেই সমুদায়কেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ ভগবান ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও পরিচিতির চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু বিরাট সমাজদেহের এই চারের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারিটি বিশেষ অঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধকে বা organic relation-এ—বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য রক্ষা থাকে, কিন্তু সমাজদেহে কোনও প্রকারের ভেদের সৃষ্টি হয় না। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণের মধ্যে যাহাতে এরূপ স্বাতন্ত্র্যাভিমান ও ভেদবুদ্ধি না জন্মিতে পারে, যাহাতে মৌলিক মানবীয় সাম্যের আদর্শকে নষ্ট করিতে না পারে, তাহাই ছিল আমাদের প্রাচীন সমাজ-বিজ্ঞানে এই বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

(৩)

অতএব গুণ ও কর্মের দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তির সামাজিক পদ নির্দ্ধারিত হইবে। যাহার ব্রাহ্মণ-লক্ষণ আছে, অর্থাৎ যে বিদ্যাবিজ্ঞানাদির দ্বারা লোকশিক্ষক ও ধর্মযাজকের কর্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সেই ব্রহ্মকর্ম অবলম্বন করিয়া, সমাজের সেবা করিবে। যাহার ক্ষাত্র-লক্ষণ আছে, চরিত্র ও শিক্ষার দ্বারা যে দেশ-রক্ষা ও দেশ-শাসনের উপযুক্ত সেই ক্ষাত্র-কর্ম অবলম্বনে সমাজ-সেবা করিবে। যে পণ্য উৎপাদনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যাদি বিষয়ে রুচির পরিচয় দান করিবে সে-ই বৈশ্যকর্ম অবলম্বন করিবে। কিন্তু শূদ্র বলিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির শুশ্রূষাবৃত্তি করিবার জন্য কোন নিকৃষ্ট বর্ণ আর থাকিবে না। আজ যদি ভগবান আবির্ভূত হইয়া গীতার্থ প্রচার করিতেন, তাহা হইলে চাতুর্বর্ণ্যের কথা বলিতেন না। পরিচর্যা করিবার জন্য একটা বিশেষ বর্ণের বা শ্রেণীর কোনও প্রয়োজন ভবিষ্যতে থাকিবে না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ও কলাকুশলতার কল্যাণে পূর্ব্বে শূদ্রেরা যে-সকল কর্ম করিতেন তাহার সংখ্যা এবং শ্রমলাঘবও ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইবে। দক্ষিণের "পারিয়া" শ্রেণীকে প্রকৃতপক্ষে আর শূদ্র বলা যায় না, বৈশ্যই বলা কর্তব্য। কারণ, কৃষি-গোরক্ষা প্রভৃতি কর্মের দ্বারাই এখন এই পারিয়ারা আপনাদের জীবিকা অর্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং কি ইউরোপে কি হিন্দুস্থানে সর্বত্রই সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র বলিয়া একটা বিশেষ বর্ণ আর থাকিবে না।

বর্তমানে যেমন 'জন' বলিতে কৌলিক উপাধি বুঝায়, কেবল তাহাতেই পৃথক্‌ভাবে হইয়া আছে। কিন্তু মহাজন ও জনের — capitalist ও labourer মধ্যে বর্তমানে যে পার্থক্য ও বিরোধ আছে, তবে তাহাও থাকিবে না। সমাজ-গতি সেই পথেই চলিয়াছে। আর আধুনিক বন্ধ-জগতের এই দেবতার সমাসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজদেহে পুরাতন রক্তের বা পুত্রের কোনও বিশেষ স্থান ও সম্মতি আর থাকিবে না বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য — এই তিন বর্ণবন্ধন থাকিবে। সর্বত্রই মানব-সমাজে চিরদিন এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ ছিল — চিরদিনই থাকিবে। লোকশিক্ষক ও লোক-পালকেরা সর্বদাই সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানার্হ হইয়া থাকিবেন। বণিকাদি তাঁহাদের নিম্নে, ও কৃষি-গোরক্ষা-ব্যবসায়ে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহারা সর্বদাই ও সর্বদেশেই সমাজে সর্বাপেক্ষা অল্প সম্মানের পাত্রবেন। এইরূপ ত্রৈ-বৈশ্যের অপরিহার্য। আর, জন্মগত (বা hereditary) না হইয়া গুণকর্মগত হইলে, এই অপরিহার্য ত্রৈ-বৈশ্যের প্রকৃতপক্ষে সাম্যমৈত্রীর কোনও বিশেষ অন্তরায়ও উৎপাদন করিবে না। আর অন্যান্যতঃ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠকর্মী বা ব্যবসায়ীর অন্তরে যাহা কিছু আভিজাত্য ও অভিমান জন্মিবার আশঙ্কা আছে, আত্মসংযমের দ্বারা তাহারও নিবারণের ব্যবস্থা করা যায়। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যটি এখন উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যবস্থার দ্বারা ভেদের মধ্যেই অভেদ, বিরোধের মধ্যেই মৈত্রী, অধীনতার উপরেই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তবে কার্যতঃ এই বর্ণাশ্রমধর্ম বহুদিন ভীষণতার লক্ষ্যস্থল হইয়া বর্তমানে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রাচীন প্রাণ আর নাই, সনাতন মর্ম আর নাই, আছে কেবল জীর্ণ কঠোর কাঠাম মাত্র।

এইরূপ জীবনের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই দেখিতে পাই যে, হিন্দুর শাস্ত্র-ইতিহাসে একটা উচ্চতম আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু এখন তার সাধন নাই। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আছে, তার দত্ত অর্থবোধ নাই। উন্নত পন্থা আছে, কিন্তু উপযোগী অনুশীলন নাই। বহুবিধ শ্রেষ্ঠতন সংস্কার ও অনুষ্ঠান আছে কিন্তু তাহাদের প্রাণ নাই। এইজন্যই বলি হিন্দুর সবগুলি আছে, অথচ কিছুই নাই; আছে কেবল একটা দেশব্যাপী অজড়তা, আর আছে এই অজড়তার চিরসাথী একটা দুরপনেয় অতিকায় অভিমান। এই অভিমানকে নষ্ট করিতে চাই না, এ অভিমানকে নষ্ট করিতে চলিবে না — ইহাকে সত্য করিতে হইবে। এই অজড়তাকে দূর করিয়া, প্রাচীন সাধনার দ্বারা বর্তমানের উপযোগী ও আবশ্যকীয় সংস্কারগুলিকে অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া, জাগরূক ও জীবন্ত করিতে হইবে। এই জন্য প্রাচীনকে লইয়া এতটা নাড়াচাড়া করি। এই জন্য হারানো প্রাচীনকে ফিরিয়ে চাই। কারণ এই প্রাচীন দেহগুলির দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে যে বস্তুটি ফুটিয়া উঠিবে, তার মতন কোনও কিছু আধুনিক জগতের আর কোথাও আছে বা পাওয়া সম্ভব বলিয়া যে বোধ হয় না।

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া খাঁটি কাব্যরস বিতরণ করা হইবে—যে-রস সর্ব্বকালের রসিকসমাজ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাভাষার কাব্যরসও বটে। একালের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিকুলের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সত্যকার পরিচয় নাই। 'রঙ্গমঞ্চে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে বর্ণ-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

বিদায়-চুম্বন

দাও দাও বিদায়-চুম্বন।
জীবনের যত রাগ একেবারে করে' খালি
অস্তাগারে ঢাকি দিয়ে যতনে দিতেছ তালি, —
দাও দাও বিদায়-চুম্বন!
ল'বে ও হীরার কুচি চক্ষের সলিল মুছি'
সঞ্চিত করিবে, সখি, জীবন যাপন —
দাও দাও বিদায়-চুম্বন।

এ ছেলেরে দাও, সখি, তব মাতৃহীন বালা,
পৌষের হরষ নীরে হউক হাসি দাও, বালা, —
দাও দাও বিদায়-চুম্বন !
— যমুনার বারিরাশে কোথা পাব জ্যোৎস্নাবাসি ?
এ জগতে ছেড়ে দাও বিশুদ্ধ বিদ্যুৎ হাসি ! —
দাও দাও বিদায়-চুম্বন !
পুলিনে ঝরুক হায় নীরে কদম্বের ফুল,
সলিলে নাচিয়ে আসি ঘুলিয়া যমুন,
দাও দাও বিদায়-চুম্বন !

দাও দাও বিদায়-চুম্বন ! —
দূর্বাকান্ত বসিবে অমর-প্রয়াগে মম
ভরি' সব একরাশি কাঞ্চন-বিজন !
দাও, — চিত্ত-মণিদাহে দাহিব যখন যারি'
চির-বিচ্ছেদের দিনে বিরহের চিরসাথী —
দাও দাও — বিদায়-চুম্বন !

স্বপ্নাভাস

একেলা কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক, —
এসেছিল — বসেছিল — ছেড়েছিল কেন পিক্ !
একেলা কাঁপিছে বন, কাঁপিতেছে বায়ু ধীর, —
চলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি মুকে তার !

একেলা ঘুমিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়, —
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ তৃণ-গুল্ম-কুসুমময় !
একেলা ভাবিছে ধরা, মনে কহিনি-কথা, —
আকাশে মিলিয়া ছিল, ভূমিতলে ভাঙ্গলতা !

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা ?
একেলা আঁধারে কেন জাগে তার রূপ-কণা !
ঘুমায়িয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন —
শয়নে স্বপনে বাসে কাঁপে তার পরশন !

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে !
কাতর-নয়নে চেয়ে — কোথা গেল নাহি জানি —
মহুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি !

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে' অভিমানে !
আসে কেন মুছি নাই, — সে-ও আসা দিতে জানে !
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন সে স্বপন আর —
কুয়াশা-আঁধারে ভাবে শয়ন পুলিনা তার !

---

(৩)

প্রার্থনা

সন্ধ্যাতে ছোট শুভ্র, মুক্তির মতন,
　　ধরি' ফুলাস্ত্রে ;
সহসা উঠলীর বাস, পড়ে যবে দীর্ঘশ্বাস,
　　পড়ে যবে গাঢ়-স্বরে, স্খলিত-বচনে।

'উজাড়ি' সমস্ত গৃহ আনিছেন যারা, —
　　কিসে স্বর্গ পায় !
কত্তু কাঁদি' উচ্চরোলে ফেলেন আমারে কোলে,
　　বলেন কাঁদিয়া কত্তু — 'তাঁরেই রেখে আয় !'

ধমিয়ে ধরিয়া কোলে ছোটো কন্যা বসি',
　　গলে যত্ন দিয়া ;
শুনে যত্ন একমনে, মুছে অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে মুক্তপানে চেয়ে চেয়ে চাহিয়া।

'যে জীবা — অনলম্বা', পাঠে পুরোহিত,
　　কণ্ঠ শোকাকুল ;
তাহারি তৃপ্তির তরে দিয়েছি যতন-ভরে
　　তৈজস, তকুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, তুল।

গায়ে গায়ে আছে বসি' ক্ষুদ্র কন্যাদুটি,
　　মলিন বদনে ;
কত্তু ধীরে অশ্রু ঝরে, কত্তু চায় পরস্পরে,
　　কত্তু দু'জনায় চক্ষু মুছায় দু'জনে।

কি জানে তারে আজ ! কেমনি হাসিয়া
　　সে কি ল'বে আর !
সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে !
　　সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার !

চঞ্চল অবোধ শিশু দু'জনের চঞ্চল,
　　চারিদিকে চায় ;
সবাই কাঁদিছে কেন ! আর সে আসবে যেন,
　　যারেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায়।

পিতা নাই, মাতা নাই, পতি-পুত্র নাই,
　　অতি অসহায় —
সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে' —
　　অনলে, অনিলে, শূন্যে, কোথায় — কোথায় !

কোথায় অমিয় মধু, কোথা বিশ্বজয়,
　　কোথা প্রেমপুরী !
আমি আজ ধরাতলে, সতর্কি নয়ন-জলে,
　　খুঁজিতেছি বুকি তার, দুই কর জুড়ি'।

(৪)

ব্যথার স্মৃতি

প্রতি নিশিদিন ফিরি উদাসীন লক্ষ্যবিহীন প্রবাসে,
লোকে ভালোবাসে, কত খেলে হাসে, দিন যায়
আসে হতাশে।
মনে পড়ে যায়, দুখে-আদুরায় চোখ দুটি পায়
সেই যে —
অবনীর সাথ উষ্ণ দুরুদুরু—সেই সে আমার সেই যে!

উঠে আসে খালি শ্মশানের কালি চিতাধূম খালি
পবনে,
যত কিছু আলো কোথে দেয় কালো, লাগেনাকো
ভালো জীবনে।
এ কি অবসাদ! যত সুখ-সাধ লাগে বিষাদ
যেন গো,
আর পাপিয়ার বধিয়ে ছাতার ভরু না কাঁপায়
কেন গো!

জীবনের যত বসন্ত গত; — ফাল্গুনের মত পরিয়া
শ'ড়ে পথ-পাশে মিশে থাকি ঘাসে, চোখ জল
আসে ভরিয়া।
চুড়িওলা হাঁকে, জানালার ফাঁকে কজনা ডাকে
— 'এ বাড়ী!'
অবগুণ্ঠনার মুখ দেখা যায়, মন চলে যায় কি-যাহাই।

যাসন্তী রং কাঠের বাসন আনেরা কি রকম
কত কি —
পথে ফেরে-ফেরে যায় ফেরে-ফেরে — কে তাদের
দেখে নিরখি!
ফেলুকেউ-পাড় ভরি-মুটিয়ার পরোনাকো আর
নজর,
ফিরি আর কৈ পরাণসই একা-একা ঐ চলন!

চিঠি-বিলি-করা ডাক-হরকরা চলে' যায় পাশের
ঐ —
উদাস-বাথা পথ-চেয়ে-থাকা দুখে-কোরে-রাখা
চিঠি কৈ?
বহুদের পর নেই ডাকঘর, নইলে খবর নিত সে;
এই-টাই-চিঠি লিখে চায় দিতেই একখানা চিঠি
দিত সে।

সেই একদিন প্রথম-নবীন ফল-বিলীন শ্রাবণে —
গোপ পল্লীর গুরুদুরীর দুয়ারুটীর প্রাঙ্গণে!
আর একদিন বিদায়-খলিন চেতনা-বিহীন চক্ষে
হইল ধরণী পাণ্ডুবরণী ম্লানিল অমনি বক্ষে!

'বহুদের মনে পবন পবনে এই সব মনে পড়ে গো,
যে ছিল সে নাই, হ'য়ে গেছে ছাই, জলে আঁখি তাই
ভরে গো!
এত আলো-মাঝ, হাসি আনুকূল সবই ম্রিয়মাণ
লাগে যে, —
দুটীর আঁধার, নিবিড় আঁধার ধরি শুধু তার
জাগে যে!

(৫)

শুভ্রাধন্য

মনে পড়েছে দুজা-কালিয়া
　　দেরী নাই বেশী আর,
মোর পানে প্রিয়া তুলিল যারেক
　　করুণ নয়ন তার।
বিছানাখানা বিষাদ বয়ন
　　কালো টানা সেই বুক,
ঘনিয়া পড়েছে, চিরনিদ্রায়
　　তন্দ্রা হয়েছে সুখ।
অঞ্চলে বাঁধা চাবি-রিং তার
　　ছিল মোর পরশনে,
শুভ্রাধন্যর ছইবোড়া আঁখি
　　ভরিয়া উঠিল জলে।

সে চাবী তাহার ঘর আলমের
　　ক্যাশ-বাক্সের চাবী,
কোন জনে মোর চলিত না শুধু
　　তাহার উপরে দাবী।
এ চক পুরীর চাবী মোর প্রিয়া
　　যতনে রাখিত কাছে,
চাহিলে কখনো পাই নাই আমি
　　ভাবিতাম কি যে আছে।
আজ দিয়ে গেল শেষ সমর্পণ
　　সকলের শেষ দানে,
দানের ভঙ্গি ধারায় মিনতি
　　ব্যাকুল করিছে প্রাণ।

চলে' গেছ প্রিয়া — যখন কোটেছ
　　চোখের যমুনা ল'য়ে,
শুভ্র লাজের মলয় শুধুরে
　　পদ্মপরাগ ব'য়ে।

বিজন দুপুরে উদাসী পরাণ,
　　হাতে নাই কোনো কাজ—
বাক্সটী তার কাছেতে আনিয়া
　　খুলিয়া দেখিনু আজ।
রহিয়াছে সেই আশীর্ব্বাদীর
　　ইয়ারিং এক জোড়া,
ঠাকুমার দেওয়া প্রাচীন বুমকা
　　লাল কৌটায় ভরা।
হার একছড়া শুভ্র কমের
　　শুভ্র মাখানো বাসে,
বিয়ের নলক — রূপোর বলয়
　　জড়ানো রয়েছে তা'তে।

শাঁখার সোণার পাত একটুক,
　　ক'টী কাঁচপোকা টিপ্—
লাবণির মতে দাঁতের তারকা
　　সুরমার রেখা-দীপ।
তারি সাথে আছে চিঠি একতাড়া
　　অনেক দিনের লেখা,
নব-অনুরাগ-রঞ্জিত লিপি
　　আজ পড়িতেছি একা।
পড়ি আর কাঁদি কত স্মরণের
　　কত উৎসব স্মরি,
দুজা-কালিয়ার আশ্লিষের
　　আবেশ জড়ায়ে ধরি।

ছোট ছোট কথা ছোট দুখ সুখ
　　গাঁথা আছে তার মাঝে,
ফুলদানীর শুষ্ক কুসুমে
　　অতীত সুরভি রাজে।

যৌবন যেথা ধায়ে পড়িবারে
দেখে মনে হয় ভুল,
কুড়ানো উপলে পাই যে আমার
কল্পনারি কুলকূল।
কুট বিদ্রূপ প্রেম-লাঞ্ছনা
ঘর দিয়েছে ভাই,
চরণ-চিহ্নে দেবী প্রতিমার
কৃপার আভাস পাই।

হায়, আজুরের রাজে আমারে
রাখিল কে হীরাচুর,
সঙ্গীত কাঁপি করিল কে মোর
বেদনায় ভরপুর!
পূজারিণী যবে ভুলে দিয়ে গেল
আজি মন্দির-দ্বার,
আছে ধূপ-দীপ, বিলপত্র —
দেবী যে নাহিক আর!

(৬)

সারদা ও প্রেমদা

১

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে,
জীবন-গগন-মাঝে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ণ চন্দ্রমা উষা, অপূর্ণ সন্ধ্যার তৃষা,
পৃথিবীর দুটী প্রান্ত উঠিছে রাঙিয়া!

২

প্রেমদা যা হাতে টানে, সারদা তাহাকে ভানে,
বুঝিতে পারি না আমি কোন্ দিকে যাই;
দোঁহারই সমান স্নেহ, কেহ কম নহে কেহ,
দু'জনে ওজনে তুল দুলদুল নাই!

৩

প্রেমদা পরায় ফুলে, কোমল শেফালী-ফুলে
গড়িয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিতাই-তীরে, আমকাঠ দিয়ে ধিরে,
আগুন বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়!

৪

নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিরাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জিছে সমানে,
পাষাণ-কূলের স্বামী— পাষাণ-মোচক আমি,
ধীরে ধীরে ভেসে যাই দু'জনার বানে!

আজিকে তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া র'ব দুয়ারে,
রাখিব আমি' আলো।
তুমি তো জানতেছ, আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হ'বে ভালো।
আমায় দানি' তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমায় দানি' আমি
একেলা হ'য়ে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে
রাখিব দিনযামী॥

আর্যোদয় *

শ্রীঘটকৃষ্ণ ঘোষ, ডি-ফিল্ (মিউনিক), ডি-লিট্ (প্যারিস্)

আর্য-অনুপ্রবেশের ইতিহাসসম্পর্কে সাধারণ মূল প্রশ্নগুলি পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যভাষার বিভিন্ন শাখার প্রাচীনতম ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাহা হইতে তাহাদের আদি বাসস্থান ও অনুপ্রবেশ-কাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় কি না তাহাই বিচার করা হইবে। ইন্দো-ইউরোপীয় বলিতে যদিও ইন্দো-ইরানীয়ও বুঝায়, তথাপি সৌকর্যার্থে এই অধ্যায়ে ইন্দো-ইরানীয়দের আলোচনা করা হইবে না, কারণ ইন্দো-ইরানীয়দের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পূর্বের অধ্যায়ে করা হইয়াছে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আরও করা হইবে।

ইতিহাসের জগতে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যভাষার প্রথম অনুপ্রবেশ-কাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রক। এই এত প্রাচীন যুগেই ইরাণীয় সাম্রাজ্যের তীরভূমি, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতিস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিবিধ চিহ্ন ও সঙ্কেত হইতে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যভাষার উপস্থিতি অনুমান করা হইয়া থাকে। বাবিলনে খৃষ্টপূর্ব সপ্তবিংশ শতকেই কতকগুলি দৈব-ব্যঞ্জক মন্ত্রের ভাষা (Omen-texts) 'মাত্তা' নামক এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আমিরীয় গ্রন্থসমূহে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর ফ্রান্সের (Forrer) মতে এই 'মাত্তা' ও ইরানীয় 'মাদ' (অর্থাৎ Medo) অভিন্ন। কিন্তু কেবল মাত্র একটি নামের সাদৃশ্য হইতে এরূপ একত্ব অনুমান করা আদৌ সঙ্গত নহে যে, উত্তর-পশ্চিম ইরানের সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মাদজনেরই এখানে উল্লেখ হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে লুবীয়গণই (Luvians) সর্বপ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিরূপে পরিলক্ষিত হইত — যদি তাহাদের ভাষা বাস্তবিকই একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারূপে স্বীকৃত হইত। কিন্তু হেত্তী ভাষার সহিত লুবীয় ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও এই ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় বলা যায় কি না সে-বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দিহান আছেন। যোষ্ঠ-কর হেত্তীভাষা ব্যতীত আর যে-সকল ভাষা আবিষ্কৃত হইয়াছে লুবীয় ভাষা হইল তাহাদেরই একটি। হেত্তীভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয় কি না সে-বিষয়েও অনেকে সন্দিহান। কাজেই লুবীয় ভাষা সম্বন্ধে সে-সন্দেহ যে আরও অধিক মাত্রায় বর্তমান তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যাঁহারা হেত্তীভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারাও ইহাকে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন প্রভৃতির স্বসৃষ্টভাষা বলিয়া মনে করেন না; তাঁহারা বলেন হেত্তী হইল সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন প্রভৃতির মাতৃভাষা। অর্থাৎ, সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা যে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে হেত্তী হইল সেই মূল ভাষারই স্বসৃষ্টভাষা। এক্ষেত্রে যে হেত্তীভাষা, তাহারই সহিত লুবীয় ভাষার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ এই ভাষাকেও ইন্দো-ইউরোপীয় রূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। কিন্তু লুবীয় ভাষায় রচিত লিপি এত কম পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহা হইতে এই ভাষা সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার কোনই উপায় নাই। কাজেই বর্তমান আলোচনায় লুবীয় ভাষার প্রতি আমাদের নিরপেক্ষ থাকাই ভাল।

হেত্তী ভাষা সম্বন্ধে কিন্তু বলা চলিবে না যে সে-ভাষায় লিখিত লিপির পরিমাণ এত কম যে তাহা হইতে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়

* কলীয়-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রবোধ চন্দ্র বসু-মল্লিক বক্তৃতা, নং ৩।

না। দেবী ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় অব্যবহিত পরে অথবা এই ভাষার সংস্করিতার লইয়া নানা যুক্তির নানা মত দেখা দিয়াছিল। এখন কিন্তু এই ভাষা সম্বন্ধে অধ্যাপক সমারের (Sommer) মতই প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক সমার দেখাইয়াছেন যে ভাষার শব্দাবলীর দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেবী ভাষাকে আর্য (Indo-European) ভাষা বলা যাইবে না, কারণ গ্রীক্, আর্মেনীয় প্রভৃতি অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের সংখ্যাই এই ভাষায় বেশী। কিন্তু ভাষার অন্তর্গত শব্দাবলীর বিভক্তি প্রভৃতি বিচার করিলে দেবী ভাষাকে বাস্তবিকই ইন্দো-ইউরোপীয় বলিয়া মনে হয়। এ কথায় বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ বর্তমান যুগে আমাদের দেশেও বাংলা ও ইংরাজীর এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ শুনিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চারিত বাক্য বাংলা না ইংরাজী তাহাই নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। কেহ হয়তো বলিলেন "animal-এ many-টিরে man-টিরে teach করিতে পারে।" এখন এই বাক্য ইংরাজী না বাংলা? অপরে যে যাহাই বলুক, ভাষাতত্ত্ববিদকে এইরূপ বাক্য বাংলা ভাষার বাক্যরূপেই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এখানে প্রধান শব্দগুলি ইংরাজী হইলেও বিভক্তিগুলি সবই বাংলা, এবং বাক্যগঠনের রীতিও তদ্রূপ। বলা, বিভক্তি, লিঙ্গ, বাচ্য প্রভৃতিরূপ উপাদানগুলিই হইল সকল ভাষার কাঠামো, এবং এই কাঠামোর তুলনা করিয়াই ভাষার জাতি-বিচার করা হইয়া থাকে। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে দেবী ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারূপে স্বীকার না করার কোন কারণ থাকে না।

তবে যাঁহারা দেবী ভাষাকে সংস্কৃত, গ্রীক্ প্রভৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মাতৃস্থানীয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক (যেমন আমেরিকান ভাষাতত্ত্ববিৎ Sturtevant) তাঁহাদের পক্ষেও কি কোন যুক্তি নাই? তাঁহাদের পক্ষেও অবশ্যই যুক্তি আছে, তবে সেই যুক্তি যে তাঁহারা যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন তাহা মনে হয় না, এবং আরও মনে হয় যে, এই যুক্তি যথাযথরূপে প্রয়োগ করিলে দেবীভাষা সংস্কৃতাদি স্বয়ম্ভাষা না মাতৃস্থানীয় এ প্রশ্নেরও সহজ সমাধান হইয়া যায়। Sturtevant-এর এই কথা বাস্তবিকই সত্য যে সংস্কৃত, গ্রীক্ প্রভৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় স্বয়ম্ভাষার মধ্যে পরস্পর যেরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, দেবী ও সংস্কৃতাদি ভাষার পার্থক্য হইল তদপেক্ষাও অধিক। কিন্তু এইজন্যই দেবী ভাষাকে সংস্কৃতাদি ভাষার মাতৃস্থানীয় মনে করা সঙ্গত হইবে কি? যদি স্বীকার করা যাইত যে, দেবী ভিন্ন অপর সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় স্বয়ম্ভাষা মূল ভাষাটি হইতে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে এক সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইলে হয়তো এরূপ ধারণা পোষণ করা সম্ভব হইত। কিন্তু এ-কথা কেহই বিশ্বাস করেন না, এবং করাও অসম্ভব। আধুনিক যুগে ভাষাতত্ত্বে যে মত অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করা হয় তাহা হয়: এই যে, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হইতে বিভিন্ন যুগে সংস্কৃত, গ্রীক্ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, এবং বিচ্ছেদের সময় মূল ভাষাটি কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় সেই সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাষা হইতেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ বলিয়া লইতে হইবে যে, বিভিন্ন উপভাষাগুলির ন্যায় মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাটিও নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছিল, এবং এই পরিবর্তনশীল মূল ভাষাটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপভাষার জন্মদান করিয়াছিল। বাস্তবিক সংস্কৃত, গ্রীক্ প্রভৃতি উপভাষাগুলি যদি পরিবর্তনশীল হয় তবে মূল ভাষাটিও কেন তদ্রূপ হইবে না তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। মূলভাষাটির পরিবর্তনশীলতা স্বীকার করার পক্ষে অন্য যুক্তিও আছে। মূল ভাষাটির

পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি কোন একটি উপভাষার মধ্যে পাওয়া যায় না, অথচ ধরিয়া লওয়া হয় যে, একাধিক উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী মূল ভাষা হইতেই প্রাপ্ত। সংস্কৃত ও গ্রীক্ ভাষা তুলনা করিয়া কোন বিশেষ বিষয়ে মূল ভাষা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, ইরানীয় ও ল্যাটিন ভাষার তুলনা হইতে হয়তো মূল ভাষা সম্বন্ধে সেই বিষয়েই একটি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সূচিত হইল। এক্ষেত্রে মূল ভাষাটি সেই বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক কিরূপ ছিল তাহা কিরূপে জানা যাইবে? তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রতিপদেই এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু যেহেতু সাধারণতঃ ধরিয়াই লওয়া হয় যে, প্রতি ভাষাই প্রত্যেক বিশেষের মূল ভাষা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারে সেই হেতু এইরূপ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক কোন সমাধান প্রায়ই পাওয়া যায় না। একটি উদাহরণ দিলেই আশা করি এই বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাইবে। 'অশ্ব্' এই শব্দটির সংস্কৃত, ইরানীয়, ল্যাটিন (equos) প্রভৃতি ভাষার রূপ হইতে মনে হইতে পারে যে, শব্দটি মূল ভাষায় অকারান্ত ছিল; কিন্তু এই শব্দটির জার্মানিক (যথা গথিক ik), স্লাভিক (jazu, azu) লিথুয়ানীয় (esz, asz) প্রভৃতি রূপ হইতে আদৌ তাহা মনে হয় না। এক্ষণে মূল ভাষায় শব্দটির রূপ কি ছিল তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? ধরিয়া লইতে হইবে যে, মূল ভাষাতেই শব্দটি বিভিন্ন মূলে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। যখন সংস্কৃত, ইরানীয়, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা মূল ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন মূল ভাষায় এই শব্দটি ছিল অকারান্ত; কিন্তু যখন জার্মানিক, স্লাভিক প্রভৃতি ভাষা বিচ্ছিন্ন হয় তখন শব্দটি মূল ভাষায় অকারান্ত ছিল না। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে বিভিন্ন উপভাষার 'অশ্ব্'-শব্দটির যে সকল রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না। কিন্তু মূল ভাষাটিও যে উপভাষাগুলির ন্যায় নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছিল — এই কথা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া না লইলে যে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাটিকেও যখন একটি বিবর্তনশীল ভাষা বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে তখন আর হেত্তী ভাষাকে সংস্কৃত, গ্রীক্ প্রভৃতি ভাষার মাতৃস্থানীয় রূপে গ্রহণ না করিবার কোন কারণ থাকে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, অন্যান্য ভাষা বিবর্তনশীল মূল ভাষাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বহু পূর্বেই হেত্তী ভাষা মূল ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা হইলেই অন্যান্য উপভাষাগুলি হইতে এই ভাষার যে গভীর পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় তাহার যথেষ্ট কারণ নির্দেশ করা হইয়া যায়। কাজেই হেত্তী ভাষা সংস্কৃত ও গ্রীক্ ভাষার মাতৃস্থানীয় — একথা না বলিয়া বলা উচিত, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে হেত্তী হইল জ্যেষ্ঠতম। ইন্দো-ইউরোপীয়গণের প্রাচীনতম ইতিহাসের আলোচনায় হেত্তী ভাষার সাক্ষ্য সর্বপ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সাক্ষ্য রূপে গ্রহণ করা তাহা হইলে আদৌ অসমীচীন হইবে না।

এখন হেত্তী ভাষা যদি সর্বপ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারূপে পরিগণিত হয় তাহা হইলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত হেত্তী-দেশই ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের আদি বাসস্থান। কিন্তু হেত্তী-দেশ কখনই ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদিগের আদি বাসস্থান রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, বহুবিধ প্রাত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে এই দেশের প্রাচীনতম ইতিহাস সম্বন্ধে এখন নিঃসন্দেহে যাহা জানা গিয়াছে তাহা হইল এই যে, হেত্তীদিগের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতেই হেত্তী-দেশ আসিরীয়দিগের উপনিবেশ-ভূমি ছিল, এবং হেত্তীদিগের আবির্ভাবের ফলেই খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে ঐ দেশের প্রাচীন

আর্যদের উপনিবেশগুলি স্থাপিত হয়। (১) বেদীদিগের আদিবাসের পূর্বে যে-সকল আদিবাসীদের অধিকারে ছিল সেই সেই যে কখনও বেদীদিগের আদি-বাসস্থান হইতে পারে না তাহা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বেদীগণই সর্বপ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি, সুতরাং ঐতিহাসিক যুগে যে-সকল (বর্তমানসমেত) এই বেদীদিগেরই ক্রিয়াকলাপের রঙ্গভূমিরূপে প্রতিপন্ন হয়, সেই সেই সম্বন্ধে একথা বেশ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাহা ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান হইতে অন্যান্য বিপ্রকৃষ্ট ছিল না।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রাচীনতম বেদী-লিপির কাল হইল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দ। আবার অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে, বেদীগণের আধিপত্যের পূর্ববর্তী যুগের তাহাদের আদিবাসীর উপনিবেশগুলি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে অকস্মাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে কার্যকারণ-সম্বন্ধ বড়ই সুস্পষ্ট। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে বেদীগণ বহির্দেশ হইতে আসিয়া আদিবাসীর উপনিবেশগুলি ধ্বংস করিয়া, অর্থ শতাব্দীর মধ্যে নিজেদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিল।

একথে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ইন্দো-ইরানীয় আর্যগণ সম্বন্ধেও আমরা পূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, তাঁহারা খৃষ্টজন্মের আনুমানিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে রুশীয় তুর্কিস্তানে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিছু-কাল অবস্থানের পর বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় একই সময়ে (খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে) ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের বেদী-শাখা তুরস্কে, এবং ইন্দো-ইরানীয়-শাখা রুশীয় তুর্কিস্তানে উপস্থিত হইয়াছিল। ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের প্রাচীনতম শাখা দুইটীর আবির্ভাবে যদি একই সময়ে এই দুইটি দেশে (তুরস্ক ও রুশীয় তুর্কিস্তান) ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে কি ইহাই মনে করা স্বাভাবিক নয় যে, ইন্দো-ইউরোপীয়-দিগের আদি বাসস্থান ছিল এই দুইটি দেশ হইতে সমদূরবর্তী? এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে ভারতবর্ষ বা মধ্য ইউরোপ এই দুইটি দেশের কোনটীই ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের আদি জন্মভূমিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না।

বেদীগণ কোন্ দিক হইতে তুরস্কে প্রবেশ করে তাহা এখানে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, কারণ ইহা জানা থাকিলে ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের আদি বাসস্থান কোথায় অবস্থিত ছিল সে সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সর্ববিষয়ে যেমনের আছুড়াব, এই বিষয়েও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। তুরস্কের অন্তর্গত আনা-টোলিয়ার এবং মাসিডোনিয়ার প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে — ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত গ্রেস গোয়েৎসে (Goetze) বলিয়াছেন যে, ইন্দো-ইউরোপীয় বেদীগণ ইউরোপ হইতেই এশিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য যখন এই মতের পরিপন্থী, তখন কেবলমাত্র প্রাগৈতি-হাসিক যুগের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ভর করিয়া কখনই একথা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না; কারণ দেখা যায় যে, বেদীগণের ইতিহাসে যখন আরম্ভ হইতেছে তখন তাহারা মধ্য ও পূর্ব এশিয়া-মাইনরে নহে, পশ্চিম এশিয়া-মাইনরে রহে। ইউরোপ হইতে বেদীগণের আগমন হইলে এরূপ হইতে পারিত কি? যদি প্রমাণ করা যাইত যে, বেদীগণের প্রাচীন-তম উপনিবেশ পশ্চিম এশিয়া-মাইনরে অবস্থিত ছিল

(১) এই সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য Goetze, *Kulturgeschichte des Alten Orients*, dritter Abschnitt, erste Lieferung, 1933, p. 76.

তাহা হইলে হয়তো মোয়েসেস-এর মত গ্রহণ করার কারণ থাকিত। কিন্তু হেত্তী-সাম্রাজ্য যখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ তখনও এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত অহ্‌হিয়বা-নামক এক জাতির অধিকারে ছিল, এবং মোয়েসেস নিজেও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। মোয়েসেসের কথা হইতে আরও মনে হয় যে, তিনি এশিয়া-মাইনরের এই অহ্‌হিয়বাদিগকে গ্রীক্ আখাইয়দিগের পূর্বপুরুষরূপে স্বীকার করিতেও প্রস্তুত, কিন্তু অন্যান্য সমালোচক (Sommer) এই প্রবাদটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে গ্রীক্-আখাইয়দিগের সহিত এশিয়া-মাইনরের অহ্‌হিয়বা-গণের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করার যথেষ্ট কারণ নাই। কিন্তু অহ্‌হিয়বাগণ গ্রীক্ আখাইয়দের পূর্বপুরুষ হউক আর নাই হউক, হেত্তী সাম্রাজ্যের মূলে তাহারা যে উত্তর-পশ্চিম এশিয়া-মাইনর অধিকার করিয়াছিল — ইহা হইতেই বুঝা যায়, হেত্তীগণ কখনই ইউরোপ হইতে এশিয়ায় আগমন করে নাই। এই সকল কারণ পর্যালোচনা করিয়াই ঐতিহাসিকপ্রবর এডুআর্ড মায়ের (Eduard Meyer) তাঁহারই রচিত হেত্তী-জাতির ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, হেত্তীগণ পূর্বদিক হইতে এশিয়া-মাইনরে প্রবেশ করিয়াছিল, (১) এবং এই বিষয়ে তাঁহারই মত আমরা প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিব।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রাচীনতম ইতিহাস সম্বন্ধে হেত্তীভাষা হইতে কি ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা আলোচিত হইল। এইবার তুখারীয় ভাষা হইতে এ-সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাই আলোচনা করিতে হইবে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবলীর মধ্যে তুখারীয় ভাষার এমন কতকগুলি বিশেষ বৈচিত্র্য আছে যে জন্য এই ভাষার রচিত লিপি সকল অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের হইলেও ভাষাটিকে হেত্তী ভাষারই মত একটি অতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলিয়া মনে করা হয়। এই ভাষা ঐতিহাসিক যুগে পূর্ব তুর্কিস্তানে কথিত হইত এবং এই ভাষায় রচিত যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কাল হইল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে সপ্তম শতক। মহাভারত ও পুরাণাদিতে শক, যবন, চীন প্রভৃতি জাতির সহিত তুখারীয়দের উল্লেখ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, কিন্তু তুখারীয় ভাষার পরিচয় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্বে পাওয়া যায় নাই।

তুখারীয় ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা এক 'কেন্তুম্' ভাষা। সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা 'শতম্' ও 'কেন্তুম্' এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত 'শতম্' (অবেস্তীয় 'সতম্') ও ল্যাটিন 'কেন্তুম্' (Centum) সমার্থক শব্দ, এবং দুইটিই ইন্দো-ইউরোপীয় 'কৃ্ন্‌তম্' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দটির প্রথম বর্ণটি এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, যাহা এখানে 'কৃ্' এই চিহ্নদ্বারা ইঙ্গিত হইয়াছে। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলি ছিল তিন প্রকারের। তিন প্রকারের ক-বর্গীয় ধ্বনির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কিছু নাই, কারণ বাংলা ভাষাতেও এই তিন প্রকারের ক-বর্গীয় বর্ণ আছে, এবং আমরা সকলেই প্রতিদিন যে-গুলি ব্যবহার উচ্চারণ করিয়া থাকি। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে ক-বর্গটি সর্বত্র একই রূপে উচ্চারিত হয় না। যখন আমরা 'কি' এই শব্দটি উচ্চারণ করি তখন তালব্য ক-বর্গটির তালব্য উচ্চারণ হয়, অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী তালব্য স্বর ই-কারের প্রভাবে আমি বর্ণ কৃ উচ্চারণে হইয়া পড়ে খ্যা। এই বর্ণটিকেই ভাষাতত্ত্বে কৃ' (k') এই চিহ্ন দ্বারা

১। Eduard Meyer, *Reich und Kultur der Chetiter*, P. 234.

সূচিত করা হয়। এখন তালব্য বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ক্ বোধ হয় ক্ষ্ (অর্থাৎ ক্‌যে) পর্যন্ত উচ্চারিত হত, তাহাতে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ক্‌ও সেইরূপ ক্ষ্‌তে (অর্থাৎ ক্ষ্যে) পরিণত হয়)। 'ক্ষ্' এই অক্ষরের ক্-বর্ণ তাহা হইলে শুদ্ধ ক্ রূপে বিশ্লেষিত হইতে পারে না, কারণ প্রকৃত পক্ষে তাহা হইল কণ্ঠ্য ক্। ক্-বর্ণের অব্যবহিত পরে শুদ্ধ কণ্ঠ্য বর্ণ (অর্থাৎ অ বা আ) থাকিলে যে-বর্ণ লক্ষ্য হয় কেবল তাহাই হইল শুদ্ধ কণ্ঠ্য ক্।

এখন বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাংলাতেও এবং প্রত্যেক ভাষাতেই তালব্য, কণ্ঠ্য এবং অন্তরোষ্ঠ্য এই তিন প্রকারের ক-বর্গীয় বর্ণ আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাতেও এই তিন প্রকারের ক-বর্গীয় বর্ণ ছিল, কিন্তু এই বিষয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা অপর কোন ভাষায় দেখা যায় না। বাংলা প্রভৃতি ভাষায়, অব্যবহিত পরে তালব্য বা কণ্ঠ্য স্বর থাকিলে অথবা অন্যত্রও তালব্য ও কণ্ঠ্য ক্ উচ্চারিত হয়; কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় ক-বর্গীয় তালব্য ও কণ্ঠ্য বর্ণের উচ্চারণে সেরূপ কোন নিয়ম ছিল না। অর্থাৎ মূলভাষায় ই বর্ণের অব্যবহিত পূর্বে ক্, এবং উ-বর্ণের অব্যবহিত পূর্বে কা উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল। মূল ভাষার এই বিশেষত্ব ছিল বলিয়াই স্বীকার করা হয় যে, তাহাতে তিন প্রকারের ক-বর্গীয় বর্ণ ছিল; কিন্তু এই বিশেষত্ব না থাকায় বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে এই তিন প্রকারের ক-বর্গীয় বর্ণ লক্ষ্য হইলেও স্বীকার করা হয় না যে, এই সকল ভাষাতে তিন প্রকারের ক-বর্গীয় বর্ণ আছে। কারণ বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ক-বর্গীয় বর্ণের জিহ্বা কেন অনুবর্তী স্বরবর্ণের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, তাহা বলা যায় না; মূল ভাষায় কিন্তু এই জিহ্বা কেন তাহা বলা যায়।

মূল ভাষার ত্রিবিধ ক-বর্গীয় বর্ণাবলীর তালব্য শ্রেণীর বর্ণগুলির (অর্থাৎ কা. খ্‌া. গ্‌া. ঘ্‌া) প্রথমটি কয়েকটী ভাষায় (যথা সংস্কৃত, ইরানীয়, আর্মেনীয়, স্লাভিক, লিথুয়ানীয়) শ-তালব্য বা স-তালব্য, এবং অপর কতকগুলি ভাষায় (যথা ল্যাটিন, গ্রীক্, জার্মানিক্, কেল্টিক্) কণ্ঠ্য বর্ণে পরিণত হইয়াছে। সেই জন্যই মূল ভাষার শত-বাচক শব্দ 'কাম্‌তোম্' সংস্কৃত (ও আবেস্তীয়) ভাষায় হইয়াছে 'শতম্', এবং ল্যাটিন ভাষায় হইয়াছে 'কেন্তুম্' (Centum)। তাহাতেই 'শতম্' ও 'কেন্তুম্' এই দুটি শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে-সকল ভাষায় আদি ভাষার কা-বর্গীয় শ্‌ অথবা দ্‌-তে পরিণত হইয়াছে সেইগুলিকে সমগ্রভাবে শতম্-ভাষা নামে অভিহিত করা হয়, এবং যে-সকল ভাষায় এই বর্গটি কু বা তদ্রূপ কোন কণ্ঠ্য-জাতীয় স্পর্শ বর্ণে পরিণত হইয়াছে বা হইয়াছিল সেইগুলিকে সমগ্রভাবে কেন্তুম্-ভাষা বলা হয়। বেত্তী ও তুখারীয় ভাষায় কথা যদি বাদ দেওয়া যায় তবে বলা চলে যে, কেন্তুম্-ভাষাগুলি সমগ্রতঃ ভিস্চুলা নদীর প্রতীচ্য দেশে, এবং শতম্-ভাষাগুলি সমগ্রতঃ সেই নদীর প্রাচ্য দেশে। ভিস্চুলা নদীর দুই দিকে দুই বিভিন্ন ধরণের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা কথিত হয় ইহা লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতপ্রবর হের্ম্‌ান্ হিট্ বলিয়াছিলেন যে, ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের আদি জন্মভূমি এই ভিস্চুলা নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত ছিল, এবং ঐ ভিস্চুলা নদীই উভয় পার্শ্বস্থ আর্যদের মধ্যে আদান-প্রদানে বাধার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ভাষারও মধ্যে এমন ভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার ফলে ভিস্চুলার পূর্বদেশীয় আর্যভাষাগুলি হইল শতম্-ভাষার এবং পশ্চিমদেশীয় ভাষাগুলি হইল কেন্তুম্-ভাষায় পরিণত হইয়াছে। যতদিন না বেত্তী ও তুখারীয় ভাষা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ততদিন হিট্‌এর এই থিওরীতে লক্ষ্য দিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু এখন আর হিট্‌এর থিওরী গ্রহণ করার উপায় নাই, কারণ ভিস্চুলা নদী হইতে বহুদূর পূর্বে অবস্থিত

ব্যবহৃত এই হেথী ও তুখারীয় ভাষার কোনটিই শতম্-ভাষা নহে।

হেথী ও তুখারীয় ভাষা শতম্-ভাষা নহে ইহা সত্য, কিন্তু সেইজন্যই এই ভাষা দুইটিকে গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতির সধর্মীয় কেন্তুম্-ভাষাও বলা চলে না। এই সকল ভাষায় মূল ভাষার তালব্য ক (অর্থাৎ কৃ) শ্, বা স্-তে পরিণত হয় নাই বলিয়াই এগুলিকে শতম্-ভাষা বলা হয় নাই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, মূল ভাষাতে ক-বর্গীয় তালব্য বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল অনেকটা পরবর্তী যুগে। মূল ভাষার যে অবস্থায় গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতি কেন্তুম্ ভাষা বিভিন্ন হইয়াছিল সেই অবস্থায় মূল ভাষাটিতে ক-বর্গীয় তালব্য বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল; কিন্তু মনে হয় যে, মূল ভাষাটির যে অবস্থায় হেথী ও তুখারীয় ভাষা তাহা হইতে বিভিন্ন হইয়াছিল সেই অবস্থায় মূল ভাষায় ক-বর্গীয় তালব্য বর্ণের উদ্ভব হয় নাই। সেই জন্যই আমরা দুইটিতে হেথী ও তুখারীয়-ভাষাকে কেন্তুম্-ভাষা বলিয়া মনে হইলেও এই দুই ভাষাকে গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতির সহিত সমপর্যায়ভুক্ত করা চলিবে না।

এই দিক হইতে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, অপর সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় শতম্ ও কেন্তুম্ ভাষা অপেক্ষা হেথী ও তুখারীয় ভাষা প্রাচীনতর। ইন্দো-ইউরোপীয় অঞ্চলের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে হেথী ভাষা হইতে যে-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখন তুখারীয় ভাষা হইতেও এই সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি? ঐতিহাসিক যুগে তুখার-দিগকে যে-স্থানে (পূর্ব তুর্কিস্তান) পাওয়া যাইতেছে সেইস্থান যে তাহাদের আদি বাসভূমি ছিল না তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কেল্টিক-ভাষী গালাটীয়গণ (Galatoeans) যেমন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বলা ইউরোপ হইতে এশিয়া-মাইনরে আসিয়া তথায় বসতি স্থাপনা করিয়াছিল, মনে হয় সেইরূপেই — তাহারও বহু পূর্ববর্তী যুগে — কেন্তুম্-ভাষী তুখারগণ তাহাদের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব তুর্কিস্তানে আগমন করিয়াছিল। এখন এই তুখারীয়দের আদি বাসস্থান কোথায় অবস্থিত ছিল? অধ্যাপক বেন্‌ভেনিস্ত্ (Benveniste) এ-সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তুখারীয়দের আদি বাসভূমি ভল্গা নদী ও উরাল পর্বতের মাঝামাঝি কোন দেশে অবস্থিত ছিল। (৩) তুখারীয় হইল প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির একটি। এই ভাষা যে অঞ্চলে প্রথম কথিত হইত সেই অঞ্চল হইতে ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান অতিদূরবর্তী না হওয়াই স্বাভাবিক।

ইন্দো-ইউরোপীয় অঞ্চলের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে ইন্দো-ইরানীয়, হেথী ও তুখারীয় ভাষার কি ইঙ্গিত তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এইবার এই বিষয়ে লিথুয়ানীয় ভাষার সাক্ষ্যের বিচার করিতে হইবে। লিথুয়ানীয় পুরাপুরি একটি শতম্-ভাষা। মূল ভাষা শতম্ ও কেন্তুমে বিভক্ত হইয়া পড়িবার পূর্বে হেথী ও তুখারীয় ভাষা তাহা হইতে বিভিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু লিথুয়ানীয় সম্বন্ধে এ কথা আদৌ বলা চলিবে না। মূলভাষা কেন্তুম্ ও শতমে বিভক্ত হইয়া যাওয়ার পর তাহার শতম্-ভাগ হইতে লিথুয়ানীয় ভাষার উৎপত্তি হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, হেথী ও তুখারীয় ভাষার পর লিথুয়ানীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু যে-সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা আজও বাঁচিয়া আছে তাহাদের মধ্যে মূল ভাষাটির সহিত সাদৃশ্য লিথুয়ানীয় ভাষারই সর্বাপেক্ষা অধিক।

৩। দ্রষ্টব্য Benveniste, Hirt-Festschrift, vol. II, p. 239.

শুধু তাহাই নয়, বৈদিক, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত দূর ভাষার যে পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, আধুনিক লিথুয়ানীয় ভাষার সহিত দূর ভাষার পার্থক্য — তদপেক্ষা অল্প বলিয়াই বিবেচিত হয়। লিথুয়ানীয় ভাষার এইরূপ নানা বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, একটি দূরস্থ ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হইতে এই ভাষাটি পরিবর্তিত হইয়াছে খুব কম। কিন্তু সকল কথা সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত একটি সত্য হইল এই যে, যে-সকল লোক বহুদিন যাবৎ একই-স্থানে বাস করে এবং ভিন্নজাতীয় লোকের সহিত মেলামেশা ও আদান-প্রদান পরিহার করিয়া চলে তাহাদের ভাষা সর্বাপেক্ষা মন্থর গতিতে পরিবর্তিত হয়। লিথুয়ানীয়রা যে এইরূপ একটি জাতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ইহারা অতি প্রাচীন কালেই বাল্টিক সাগরের তীরে আসিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিল। এইখানে অন্যদের জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাহাদের জীবন-যাত্রা সুরু হয়, এবং নিজেদের এই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কখনও তাহারা অন্য কোন দেশে গিয়া বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। লিথুয়ানীয়দিগের সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সকলেরই স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের আদি বাসস্থান হইতে লিথুয়ানীয়দিগের আদি বাসস্থানের দূরত্ব অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ সেই আদিম যুগে যদি লিথুয়ানীয়দিগকে দীর্ঘকাল ধরিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রমণের পর তবে তাহাদের জাতীয় বাসভূমিতে পৌঁছাইতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের ভাষা বিভিন্ন পর-ভাষার সহিত সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে আরও অধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হইত। দূর ভাষা হইতে লিথুয়ানীয় ভাষা সর্বাপেক্ষা কম পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আদি ইন্দো-ইউরোপীয় মূল বাসভূমি হইতে লিথুয়ানীয়দিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প দূর আসিতে হইয়াছিল। এই সম্পর্কে স্মরণ করিতে হইবে যে পূর্বে লিথুয়ানীয়দের বাসভূমি প্রাচ্যাভিমুখে আরও বহুদূর বিস্তৃত ছিল। অনেকে মনে করেন যে আদিযুগে লিথুয়ানীয়দের পশ্চিমে স্লাভ্, এবং পূর্বে ফিন্-জাতির বাসভূমি অবস্থিত ছিল। ইহা মনে করার একটি কারণ এই যে, ফিন্ ভাষায় লিথুয়ানীয় শব্দ যত পাওয়া যায় স্লাভিক্ শব্দ তত পাওয়া যায় না। ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি জন্মভূমি সম্বন্ধে লিথুয়ানীয় ভাষা হইতে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহাই মনে হয় যে রুশিয়ার কোন অংশেই এই দেশ অবস্থিত ছিল। এখন ইন্দো-ইরানীয় ও হেল্লী ভাষার আলোচনা করিয়া পূর্বে যে দুই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহাদের সহিত এই সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন করিতে হইলে যাহা স্বীকার করা অনিবার্য হইয়া পড়ে তাহা এই যে, রুশিয়াই ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল।

কেবল মাত্র ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া আদি আর্য-দেশ সম্বন্ধে সঠিকতা আর অগ্রসর হইতে পারে না; কারণ গ্রীক্, ল্যাটিন, জার্মানিক প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হইতে এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত কিছুই পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয় আর্য ভাষাগুলির মধ্যে যে ভাষাটির নিদর্শন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কাল হইতে পাওয়া যায় সে-টী হইল গ্রীক্। ব্যাকরণ ও বাক্যগঠনের প্রণালীতে (Syntax) গ্রীক্ ভাষা যে পুরাপুরি একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখা যায় যে, এই ভাষারও শব্দাবলীর অধিকাংশ ইন্দো-ইউরোপীয় নহে। এই দিক দিয়া গ্রীক্ ভাষা সংস্কৃত ভাষারই অনুরূপ। সংস্কৃত এবং গ্রীক্ এই দুই ভাষাতেই একই কারণে অনার্য-শব্দের

এর প্রাদুর্ভাব। আর্যগণ আসিবার পূর্বে এই দুই দেশেই প্রাক্-আর্য অনার্য-সভ্যতা অসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং এই দুই দেশেই আর্য সভ্যতা প্রাচীনতর অনার্য সভ্যতার নিকট হইতে নানা বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা প্রধানতঃ প্রাচীনতর দ্রাবিড় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইল, এবং গ্রীসের প্রাক্-আর্য মিনোয়ান (Minoan) সভ্যতা তদ্রূপ আর্য সভ্যতাকে সর্বভাবেই প্রভাবান্বিত করিল। উভয় ক্ষেত্রেই বিজেতা আর্যগণের ভাষাই জয়যুক্ত হইল, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আবার বিজিত অনার্যদিগের ভাষা হইতে বহু শব্দ আর্যদিগের ভাষায় প্রবেশ লাভ করিল। এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিজেতৃগণ বিজিত অনার্যগণের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিতে শিখিল। (৪) গ্রীসে যখন প্রাক্-আর্য অধিবাসী ও সভ্যতার এত সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে তখন এই দেশ যে কোনক্রমেই আর্যদের আদি বাসস্থানরূপে পরিগণিত হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ আর্যদের আবির্ভাব এই দেশে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন যুগেই ঘটিয়াছিল। হোমার ইলিয়াডে যে আখাইয়দের যশঃকীর্তি অমর ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন সেই আখাইয়গণও গ্রীকভাষী ছিল কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। সাধারণতঃ কিন্তু আখাইয়গণকেই গ্রীসের সর্বপ্রাচীন আর্যভাষী অধিবাসী বলিয়া ধরা হয়। তবে গ্রীসে প্রাক্-আর্য মিনোয়ান সভ্যতার মূল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে শেষ হইলে তাহার পরে যে কখন আখাইয়গণের আবির্ভাব হয় সে বিষয়ে প্রায় সকল ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিৎ একমত। গ্রীক্ আর্যগণ কোন্ দেশ বা কোন্ দিক হইতে গ্রীসে প্রবেশ করেন সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে কিছুই জানিবার উপায় নাই।

৪। সংক্ষেপে এ গ্রীক্ ভাষার এই তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন Hall. Bronge Age Greece, p. 289.

প্রাচীন হিন্দুরা আর্য ছিলেন; অথবা তাঁহাদিগের সন্তান। কিন্তু এই আর্য শব্দ আর বেদের আর্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটি আর্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের অনুবর্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান্, রুষ, যবন, পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আর্য। আর্য কাহারা,—কোথা হইতেই বা আসিল? অনার্য কাহারা; কোথা হইতেই বা আসিল? একদেশে দুই প্রকার মনুষ্য বাস কেন? আর্যের দেশে অনার্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনার্যের দেশে আর্য আসিয়া বাস করিয়াছে?

সোনা-পোকা

অনুবাদক : শ্রীমধুরেন্দ্র নাথ নন্দী

[মার্কিন লেখক Edgar Allan Poe-র 'Gold Bug' নামক প্রসিদ্ধ গল্পের বঙ্গানুবাদ। উক্ত মার্কিন লেখক গল্পসাহিত্যে একটি নূতন পদ্ধতি ও কল্পনারাজির প্রবর্তন করেন ; কেবল ইংরেজী নয়, ফরাসী সাহিত্যও তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। বর্তমান গল্পে তাঁহার সেই পদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। একটা দুর্বোধ্য রহস্যজাল সৃষ্টি করিয়া শেষে — প্রায় উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য যাহা তাহারই অতিসহজ স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা — ইহাও তাঁহার গল্পরচনার একটি বিশিষ্ট কৌশল। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক Sir A. Conan Doyle তাঁহার Shrelock Holmes-নামীয় গল্পগুলিতে এই পদ্ধতি অতি সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন।]

(১)

মিঃ উইলিয়াম লেগ্রাণ্ডের সঙ্গে বহুবৎসর পূর্বে আমার পরিচয় হইয়াছিল। তিনি ছিলেন এক হুগিনো বংশের সন্তান, কেবল তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু উপর্যুপরি দুর্ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে তিনি একেবারে সর্বস্বান্ত হন। সর্বস্ব খোয়ানোর যে দুঃখ তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি চৌদ্দটি ক্রীতদাস সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ ক্যারোলিনার অন্তর্গত চার্লস্টনের নিকটবর্তী সলিভান-দ্বীপে বসবাস আরম্ভ করেন।

সলিভান দ্বীপটি ছিল একটু অদ্ভুতরকমের। সৈকত হইতে তিন মাইলের মধ্যে — শুধু সমুদ্র-বালু ব্যতীত আর কিছু ছিল না বলিলেই হয়, এবং প্রস্থে কোথাও সিকি মাইলের অধিক নহে। প্রধান ভূভাগ হইতে দ্বীপটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে অগভীর প্রায় একটা ক্ষুদ্র খাড়ি। ঐ দ্বীপে কোথাও বড় গাছ একটাও দেখা যায় না, কেবল পশ্চিম সিরার কাছাকাছি একটা বন তালীবন দেখা যায়, তাহার মধ্যে যে পুরাতন দুর্গ ও পোড়ো বাড়ীগুলি আছে — গ্রীষ্মকালে বাতির ঝড় আর জ্বরের ভয়ে লোকেরা চার্লস্টন সহর হইতে পলাইয়া আসিয়া তাহাতে আশ্রয় লইত। ঐ পশ্চিম অংশ এবং সমুদ্রপারের শুভ্র কঠিন একখানি বেলাভূমি ছাড়া বাকি দ্বীপটি মিটমটে ছোট ছোট গাছে ও ঝোপে আচ্ছন্ন ছিল। গাছগুলি ছিল ইংলণ্ডের উদ্যান-বিলাসীদের নিকট বড়ই লোভনীয়।

এই দ্বীপের দূরতম পূর্ব-সিরার অদূরে, বনভূমির এক নিভৃত নির্জন প্রদেশে লেগ্রাণ্ড একটি কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। একদা বিভাস নৈকষেয়ই এইখানে তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, পরিচয় শীঘ্রই বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই একান্তবাসী মানুষটি সুদূরে আমার কৌতূহল এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থ বিদ্বান, মনের জোরও ছিল তাঁহার অসাধারণ ; কিন্তু সেইসঙ্গে যেন একটা মনুষ্য-বিদ্বেষও ছিল : কখনও বা তিনি কেমন যেন অকারণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেন, আবার এক এক সময় কেমন একরূপ অবসাদে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার ঘরে বহু গ্রন্থ থাকিলেও সেগুলি যে তাঁহার খুব কাজে আসিত এমন মনে হয় না ; বন্দুক-ছোড়া এবং মৎস্যশিকারই ছিল তাঁহার প্রধান নেশা ; কখনও বা বেলাভূমির উপর দিয়া, কখনও বা মূলত মূলের বনে বনে, তিনি বিচরণ করিতেন, এবং কীটবিজ্ঞান সম্বন্ধে

খুঁজিয়া বেড়াইতেন। জুপিটার নামে এক বৃদ্ধ নিগ্রো এই সকল সন্ধান-কার্যে তাঁহার প্রায় নিত্য-সঙ্গের ছিল। যদিও জুপিটারকে তাহাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের পূর্বেই দাসত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি কোন অর্থ বা প্রলোভনেই সে তাহার মুরুব্বি প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে রাজী হয় নাই। বস্তুতঃ লেগ্রাণ্ডের আত্মীয়-স্বজন তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকারের লক্ষণ দেখিয়া তাহার এইরূপ একগুঁয়েমি কিছুতে কিছুতে সমর্থন করিয়াছিলেন, কারণ, সে অবস্থায় লেগ্রাণ্ডের সেবা ও তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য একজন অভিভাবকের প্রয়োজন ছিল।

সলিভান দ্বীপে শীতের প্রকোপ বিশেষ না বলিলেই হয়; বস্তুতঃ সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আগুনের প্রয়োজন খুব কমই হইত। কিন্তু এবারে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি—আঠারো তারিখে—প্রথম শীত পড়িল। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে বন্ধুর বাসে ঢাকা পথের উপর দিয়া অত্যন্ত দ্রুতপদে আমি বন্ধুর কুঁড়ের অভিমুখে চলিয়াছিলাম। চার্লসটন সহরে আমার বাসাবাড়ী দ্বীপ হইতে বহু দূর যাইলে দূরে, তথাপি আমি গত কয়েক সপ্তাহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি নাই,—কারণ, একালের মত সেকালে যাতায়াতের পথ তেমন সুগম ছিল না। বন্ধুর আবাসে পৌঁছিয়া অভ্যাসমত আমি দরজায় টোকা দিয়া শব্দ করিলাম, কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া গুপ্ত স্থান হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে অগ্নিকুণ্ডে বেশ চমৎকার আগুন জ্বলিতেছিল — এই ব্যবস্থা যেমন নূতন, তেমনই সময়োপযোগীও বটে। ওভারকোটটি খুলিয়া রাখিয়া, জলন্ত আগুনের পাশে একটি আরাম-কেদারায় আমি বসিয়া পড়িলাম, এবং গৃহস্বামীর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যের পরেই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে সাদর-সম্ভাষে অভ্যর্থনা করিলেন। জুপিটার আকর্ণ-হাসিতে মুখ ভরিয়া সান্ধ্য-ভোজনের জন্য কিছু পশুখাদ্য রন্ধন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এদিকে লেগ্রাণ্ড, — তাঁহার যেমন স্বভাব — একটা নূতন খেয়ালে মাতিয়া উঠিয়াছেন; তিনি একটি নূতন জাতের ছাতুখোর বিহঙ্গ কুড়াইয়া পাইয়াছেন; তা ছাড়া, জুপিটারের সাহায্যে এমন একটি একেবারে নূতন কাচপোকা-জাতীয় কীট সংগ্রহ করিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে আমার মতামত কাল সকালের মধ্যেই তাঁহার চাই।

মনে মনে ঐ পোকার ঘাস-জাল কামনা করিয়া আগুনে হাত সেঁকিতে সেঁকিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ রাত্রেই নয় কেন?"

লেগ্রাণ্ড বলিলেন, "আমি কি জানি যে আজ রাত্রে তুমি এখানে আসিবে? কতকাল তোমায় দেখা নাই! আমি ত' জানিতাম না যে, এতদিন থাকিতে তুমি আজ আসিবে। ফিরিবার পথে কেয়ার লেফ্‌টেন্যাণ্ট 'জি'-এর সঙ্গে দেখা হইল; নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পোকাটি তাঁহাকে দেখিবার জন্য দিতে হইল। কাল সকালের পূর্বে তুমি ত' উহা দেখিতে পাইবে না; কাজেই আজ রাতটা এখানে থাকিয়া যাও, কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি জুপিটারকে উহা আনিতে পাঠাইব। এমন সুন্দর জাতের আর কোথাও দেখিতে পাইবে না।"

"কি? সূর্যোদয়?"

"দূর! আমি ঐ পোকার কথা বলিতেছি। উহার রং কাঁচা সোনার মত, আকারেও ঠিক যেন একটা বড় 'হিকোরি'-বাদাম। পিঠের এক পাশে দুটি ঘোর-কালো ফোঁটার মত দাগ, আর এক পাশে একটি মাত্র দাগ, কিন্তু লম্বা। আর শুঁয়াগুলি —"

এই সময়ে জুপিটার বলিয়া উঠিল, "ও সব কিছু নয়, আমিই বলিতেছি; পোকাটি যে একটি সোনা-পোকা তাহাতে সন্দেহ নাই; সবটা শরীরেই,

কোনখানেই টাকা নয়; যেন ভারী পোকা আমি জীবনে আর দেখি নাই।"

শ্রেগ্রাঁ যেন একটু বেশি আত্মপ্রসাদের সহিত উঠিলেন, "বেশ, তোমার কথাই না হয় মানিলাম; কিন্তু এদিকে মাথা যে পুড়িয়া গেল!" তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাত্রের সম্বন্ধে তুলিটার যাহা বলিল তাহা মানিতে হইবে। উহার পিঠের খোলাটা যেন কঠিন ধাতু-নির্ম্মিত, তাহাতে আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কাল সকালে নিজে না দেখা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিব না। তবে উহার চেহারার একটা মোটামুটি ধারণা আমি এখনই করাইয়া দিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি ঘোরে একটি টেবিলের সম্মুখে গিয়া বসিলেন। টেবিলের উপর কাগজ ও কলম ছিল কিন্তু কাগজ ছিল না; শ্রেগ্রাঁর মতো পুঁথিয়া একটুকরাও আমরা পাইলেন না।

অবশেষে ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে তুর্কুরেল কাগজের মত যেখানা মলাট বাহির করিলেন; "হাঁ, ঠিক, ইহাতেই হইবে" বলিয়া ঐ কাগজের উপরেই কলম লইয়া একটা যেমন-তেমন নক্সা আঁকিতে সুরু করিলেন। আমি কিন্তু আগেই দেখাইয়াছি, কারণ আমার চক্ষু তখনও কাটে নাই। আঁকা শেষ হইলে তিনি আসন হইতে না উঠিয়াই উহা আমার হাতে দিলেন। এমন সময়ে দুয়ারের বাহিরে কুকুরের উচ্চ চীৎকার শোনা গেল, তাহার পর নখ-আঁচড়ানোর সঙ্গে তুলিটার ঘরটা খুলিয়া দিল। শ্রেগ্রাঁর প্রকাণ্ড নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরটি সবেগে প্রবেশ করিয়া আমার হাঁটুর উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে তাহার আদরে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। ইহার কারণ, ইতিপূর্ব্বে আমি যখনই এখানে আসিয়াছি, কুকুরটি আমার নিকট একটু বিশেষ প্রশ্রয় পাইয়াছে। যাহা হৌক, তাহার আদর-করা শেষ হইলে আমি কাগজটি দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু সত্য বলিতে কি, যন্ত্রের আঁকা ঐ ছবিটি আমার কিছুমাত্র কৌতূহল উদ্রেক করিল না।

ছবিখানি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া আমি বলিলাম, "হাঁ, পোকাটি যে অদ্ভুত তাহা স্বীকার করিতেই হয়। — আমার কাছে একেবারেই নূতন, এ রকমটি ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই; অবশ্য, যদি উহা আমার খুলি, অর্থাৎ মাথার মত দেখিতে হয়; কারণ, অনেকটা সেইরূপই দেখাইতেছে।"

আমার বন্ধুর প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রেগ্রাঁ বলিয়া উঠিলেন, "মড়ার মাথা! হাঁ, ঠিক, ঠিকই বলিয়াছ; কাগজের উপরে উহা অনেকটা ঐ রকমই দেখাইতেছে বটে। উপরের কালো দাগ দুইটি যেন দুইটি চোখ, কেমন না? নীচের লম্বা দাগটা যেন মুখ, এবং আকৃতিও যেন একটা ডিমের মত।"

আমি বলিলাম, "সম্ভবতঃ তাহাই। কিন্তু শ্রেগ্রাঁ, আমার সন্দেহ হইতেছে, তোমার আঁকা ঠিক হয় নাই। কাজেই পোকাটির স্বরূপ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে আমার একবার উহা চোখে দেখা দরকার।"

তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, খুব ভাল আঁকিতে জানি না বটে, তবে চলনসই পারি বই কি; অন্ততঃ সেটুকু পারা উচিত, কেন, না, একজনের কাছেই শিখিয়াছিলাম, কাজেই একেবারে আনাড়ী মূর্খ নই।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে, বন্ধু, তুমি আমার সঙ্গে তামাসাই করিতেছ। সত্যই ইহাকে মানুষের খুলির একটা চলনসই ছবি বলিতে পারা যায়; শুধু তাহাই নহে, প্রচলিত শারীর-বিদ্যায় উহা একটি চমৎকার নমুনাও বটে। কিন্তু তোমার পোকা যদি সত্যই ঐ রকম দেখিতে হয়, তবে এখন কিছুতে কিমাকারে জীব জগতে আর দ্বিতীয় নাই। চাই কি, উহার সম্বন্ধে একটি রোমাঞ্চকর গল্পও

রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি উহাকে কাচপোকার পর্যায়েই ফেলিবে, অথবা ঐ জাতীয় একটা কিছু — প্রকৃতির গ্রন্থে তত নামই না আছে! সে যাহাই হৌক, পুঁথা দেখিতেছি না যে?"

মেগ্রাঁর যেন উৎসাহের ভাটিয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন, "পুঁথা? পুঁথাও নিশ্চয় আছে। পোকার যেন থাকে, তেমনটিই আমি মাকিয়াছি, এবং আমার মনে হয়, উহাই যথেষ্ট।"

"বটে, বটে! হয়তো তোমার কথাই ঠিক, তবু আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" তাঁহার মেজাজ বিগড়াইবার ভয়ে আমি আর কোন মন্তব্য না করিয়া কাগজটি ফিরাইয়া দিলাম; কিন্তু ব্যাপার যেরূপ গড়াইয়াছে, তাহাতে আমি একটু আশ্চর্যই হইলাম, এমন কি, তাঁহার ঐ মেজাজ দেখিয়া ভড়কাইয়া গেলাম। সবাই পোকাটির যে ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহাতে পুঁথাগুলি মোটেই স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; আবার, সমগ্র অবয়বটিতে মড়ার মাথার আদল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অত্যন্ত বিরক্তভাবে মেগ্রাঁ কাগজের টুকরাটি ফিরাইয়া লইলেন, সম্ভবতঃ আগুনে পোড়াইবার জন্ত উহা পাকাইতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে নক্সাটির দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহার যেন ভাবান্তর হইল। হঠাৎ তাঁহার মুখখানা ভাঁড়া হইয়া পরমুহূর্তেই অত্যন্ত লাল হইয়া গেল। উপবিষ্ট অবস্থাতেই তিনি কয়েক মিনিট গভীর অভিনিবেশসহকারে নক্সাটি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; অবশেষে গাত্রোত্থান করিলেন এবং টেবিলের উপর হইতে একটুকু মোম-বাতি সংগ্রহ করিয়া ঘরের অপর কোণে একটি বড় সিন্দুকের উপর দিয়া বসিলেন — কাগজটি পুনরায় গভীর মনোযোগের সহিত চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভাবভঙ্গীতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। কিন্তু ক্রমেই তিনি এরূপ আবিষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন, তাহাতে কোন মন্তব্য করা সমীচীন মনে করিলাম না। কিছু পরে জেটের পকেট হইতে একটি থলি বাহির করিয়া কাগজটা খুব সাবধানে তাহাতে পুরিয়া, থলিটি সিন্দুকের ভেতরে রাখিয়া তালা বন্ধ করিলেন। তাঁহার মুখের ভাব ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু পূর্ব উৎসাহ একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। মনে হইল, অভিমান নয়, একটা অনুতপ্ত-ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, ততই তিনি ভাবমগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন — বুঝিলাম, কোনরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা তাঁহার মনে শুরু করা যাইবে না। সত্যবাদের মত, আজিকার রাত্রিটাও এই কুঁড়েঘরটিতে কাটাইয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু গৃহপতির ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। তিনিও আমাকে থাকিয়া যাইতে জোর করিলেন না, যদিও সেদিন বিদায়কালে অতিরিক্ত ভদ্রতার সহিত আমার করমর্দন করিলেন।

(২)

ইহার পর প্রায় মাসখানেক কাটিয়া গেলে (ইতিমধ্যে মেগ্রাঁর আর কোন খবর আমি পাই নাই) একদিন তাঁহার ভৃত্য ভূপিটার চায়ের্টনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেচারা বৃদ্ধ মেগ্রাকে এমন মনমরা আমি আর কখনও দেখি নাই; আমার আশঙ্কা হইল, বুঝি বা বন্ধুর সে ভীষণ বিপদ ঘটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি জুল, খবর কি? তোমার প্রভুর কুশল তো?"

"না, মাসা! সত্য বলিতে কি, মালিক যা পতিক মোটেই ভাল নয়।"

"ভাল নয়! বড়ই ভাবনার কথা, কিন্তু কি

হইয়াছে উহার ?"

"উহাই ত' আসল কথা। তোমার অসুখের কথাই বলছ্লা : তবু খানিকটা বড় রকম।"

"বল কি! খুব অসুখ! একেবারে বিছানায় পড়িয়া আছেন ?"

"না, সে রকম নয়, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে না ; তাহলেই ত' আলোইয়া যাবে। বেচারী 'থালা'র জন্ম মনটা আমার বড় আড়ি হাড়ি লাগিতেছে।"

"ফুলিটার, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না — তুমি বলিতেছ, তোমার প্রভুর বড় অসুখ, কিন্তু তিনি কি নিজে কিছুই বলেন না ?"

"হয়ত এমন কিছু ঘটে নাই যাহাতে ওই রকম পালস হইতে হয়। মলা উইল বলে, তাহার কিছু হয় নাই। তাহা হইলে মাঝে মাঝে উঁচু করিয়া আর মাথাটা দেয়ালের দিকে করিয়া অমন ঘুরিয়া বেড়ায় কেন ? চোখদুটা বা অমন ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে কেন ? তার উপর, সবসময়েই একটা থালা মন লইয়া কি করে সেটা জানে।"

"কি লইয়া ?"

"সব সময় তাহার সঙ্গে একটা থাকা মন থাকে —"

"সে আবার কি ?"

"প্লেটের উপরে কি সব থাক-জোক করে, আর তাহার সঙ্গে ঐ থাকা মন। হেন হিজিবিজি দাগ আমি কখনও দেখি নাই। ঐ দেখিয়াই আমার ভয় লাগিয়া গেছে, তাই কথা পালায় বাখিতে হইয়াছে। সেদিন আমাকে ডাকি দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর সমস্ত দিন আর দেখা নাই। আমি একগাছা মোটা লাঠি কাটিয়া রাখিয়াছিলাম, আসিলে বেশ দা কতক দিব বলিয়া। কিন্তু তাহার চেহারা এমন খারাপ হইয়া গিয়াছে দেখিলাম যে ভয় মারা হইল, পারিলাম না।"

"সে যাহাই হৌক, প্লেটের নিকট হইতে কোন সংবাদ আসিয়াছে কি ?"

"না, কেবল এইটী আসিয়াছে" — এই বলিয়া ফুলিটার আমার হাতে একটী পত্র দিল। পত্রে লেখা ছিল —

"প্রিয় ...

"বহুদিন তোমার কোন খবর নাই কেন ? আমার কোন কড় ব্যবহারে তুমি রাগ করিয়াছ কি ? অসম্ভব ; তাহা হইতেই পারে না। তুমি ত' আমি চির বুদ্ধিহীন নও।

"তোমার সঙ্গ শেষ দেখা হইবার পর বিশেষ কারণে আমি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তোমাকে আমার কিছু বলিবার আছে : কিন্তু কেমন করিয়া বলিব বা আদৌ বলা উচিত হইবে কিনা, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

"কিছুদিন যাবৎ আমার সময়টা ভাল যাইতেছে না। বেচারী বৃদ্ধ ভৃত্যের অতিরিক্ত খবরদারী আমাকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, প্রায়ই সঙ্গের দীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। তুমি বিশ্বাস করিবে কিনা জানি না, সে আমাকে পাহারা করিবার জন্ম সেদিন একটী মোটা লাঠি যোগাড় করিয়াছিল — আমার অপরাধ, আমি তাহার জন্ম একটী চিঠিকুটি লিখিয়া রাখিয়া লাঠিখানি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমার মুখ অগ্নির শুরু না দেখিলে সেদিন সে আমাকে রেহাই দিত না।

"আমাদের শেষ দেখা হইবার পরে আমার বাল্যটীর জন্ম নূতন কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

"যদি বিশেষ অসুবিধা না হয়, তবে ফুলিটারের সঙ্গে চলিয়া আসিও। অবশ্যই আসিবে। বিশেষ প্রয়োজনে আজ রাত্রেই তোমাকে আমার চাই। জরুরী প্রয়োজন।

তোমার —

উইলিয়াম প্লেট"

তিন্নিতে এমন একটা সুর ছিল, যাহাতে আমি বড়ই অস্বস্তি বোধ করিলাম। তাঁহার এমন কি ভাবনা! আমার কোন্ নূতন খেয়ালে বাধা দিলেন? কি এমন জরুরী প্রয়োজন? ফুলিটারের কথা হইতে কিছুই আর কথা গেল না। আমার ভয় হইল, নিজের সেই দুর্ভাগ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। যাহা হৌক, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি নিগ্রোটার সঙ্গে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

জেটীতে পৌঁছিলে দেখিতে পাইলাম, আমাদের যে নৌকা করিয়া যাইতে হইবে তাহার তলায় একটা বড় কম্বল ও তিনখানা কোদাল রহিয়াছে — প্রায় নূতন বলিয়া মনে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"ফুলিটার?"

"ঐ কাজে ও কোদাল তাহার বড়ই দরকার"

"কিন্তু ঐগুলি এখানে কেন?"

"বন্দুকেরা! ঐগুলা সহর হইতে কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবেই; একটি গাড়ী পাওয়া খরচ হইয়াছে।"

"এ যে বড় ঝঞ্ঝাট ফেলিলে! এই সব লইয়া করিবে কি?"

"কি করিয়া বলিব? সে নিজেও যদি জানে, তা কি বলিয়েছি! ঐ পোকাটাই যত নষ্টের মূল।"

ঐ পোকাটা যেমন করিয়া ফুলিটারের মাথায় ঢুকিয়া বসিয়া আছে, তাহাতে উহার কাছে আর কিছু পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া আমি নৌকায় উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল। প্রবল বাতাস পাইয়া নৌকাখানা ছুটিয়া চলিল। দূরের কিছু উত্তরে যে খাড়িটা আছে তাহাতে প্রবেশ করিয়া নৌকা হইতে নামিলাম, পরে প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া হুদের পৌঁছিলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা হইবে। দেখিলাম, মেজর আমাদের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি এমন জোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন যে, আমি চমকিয়া উঠিলাম, মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহা যেন আরও দৃঢ় হইল। তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক শুষ্ক, প্রায় বিবর্ণ বলিলেই হয়; চোখ বসিয়া গিয়াছে, তাহাতে কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। কুশল-প্রশ্নের পর আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া মেজরটাকে 'কি'—র নিকট হইতে পোকাটা পাওয়া গিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম।

যেন একটু জোর দিয়াই তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়। পরের দিন সকালেই পাইয়াছি। সাথে টাকা দিলেও উহা আমি হাতছাড়া করিতাম না। পোকাটার সম্বন্ধে ফুলিটার যাহা বলে তাহা খুবই সত্য।"

বলিলাম, "কি বলে সে?" একটা অজ্ঞানের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

মেজরের গম্ভীরভাবে তিনি উত্তর করিলেন, "পোকাটা যে খাঁটি সোনার তৈরী, তাহা সে বিশ্বাস করে।"

তাঁহার এই কথায় আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। যেন একটা বড় অঘটন ঘটিয়াছে, তাঁহার মুখে সেইরূপ একটা ছাপ দেখা দিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঐ পোকা হইতেই আমার অতুল ঐশ্বর্য লাভ হইবে; যে পৈতৃক সম্পত্তি হারাইয়াছি তাহা আবার ফিরিয়া পাইব। সুতরাং আমি যদি উহাকে বহুমূল্য মনে করি তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে? তাগ্যক্রমে উহা যখন আমার হস্তগত হইয়াছে তখন উহাকে কাজে লাগাইতেই হইবে। উহাতে যে সঙ্কেত রহিয়াছে তাহাই বলিয়া আমি ধনরাশির সন্ধান পাইব। ফুলিটার, পোকাটা আন ত' দেখি?"

"এঁ্যা! পোকা? — না, আমি পারিব না, তুমিই লইয়া আইস।"

শুনিয়া মেজর অতিশয় গম্ভীরভাবে উঠিয়া গেলেন, একটা কাচের আলমারি হইতে বাহির করিয়া পোকাটা আমার হাতে আনিয়া দিলেন। পোকাটি

...দিকে বেশ গুরুতর — প্রাইভেসির অভাব। যাহারা চরের উপরে আছি এমন লোকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই — বিজ্ঞানের দিক দিয়া খুবই দুঃখজনক বটে। পিঠের একধারে ছোটো কালো দাগ রহিয়াছে, অপর পাশে আর একটি ঘা দাগ। ঘোলাটা যেমন কঠিন তেমনি চকচকে, যেন পালিশ-করা মোমা! ওজনেও ভারিক্কে। সব বিবেচনা করিয়া আমি ইহাকে গ্রহে ফুলিটারের বন্ধুরা খুব অসন্তুষ্ট মনে করিবেন।

কিন্তু তাহাতে ঐ নয়। 'চরে যে কেন এই পাথর হইয়াছে তাহার কোন কারণ ভাবিয়া পাইলাম না।

প্রেস্টন দেখি একটু বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন, "ওর অনুসন্ধান — লোকটার সম্বন্ধে যাহা কিছু তা নিয়ে — সব শেষ করিয়া তবে তোমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার সহিত পরামর্শের জন্য। আমার আগে আর ঐ লোকা, এই চরের মোহ ঘটাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।"

তাহার কথায় বাধা দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, "ডাক্তার প্রেস্টন, নিশ্চয় তোমার শরীর খুব অসুস্থ হইয়াছে, একটু সাবধানে হইতে হইবে। দিন কতক তুমি শুইয়া থাক; তোমার সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যে কয়দিন আবশ্যক আমি তোমার কাছেই থাকিব। তোমার নিশ্চয় জ্বর হইয়াছে, জ্বর —"

আমার কথা শেষ হইতে না দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার নাড়ী দেখ দেখি।"

আমি নাড়ী পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য, জ্বরের কোন লক্ষণই দেখিলাম না। বলিলাম, জ্বর না হইলে, তোমার শরীর ভাল নাই। অন্ততঃ একটিবার আমার কথা রাখ। তোমার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথম কাজ — ঘুমাইতে যাওয়া, তারপর —"

তিনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ভুল করিতেছ, বন্ধু! দেখ, আমার মনের যে উত্তেজনা চলিয়াছে, তাহার পক্ষে আমি খুব বেশি অসুস্থ নই; যদি আমার ভাল করিতে চাও এই উত্তেজনা দূর কর।"

"তাহার কি উপায় করিতে পারি?"

"উপায় খুবই সহজ। দ্বীপ হইতে আসল ফুলিটার ও আমি আর ঐ পাহাড়তলায় নিচে অভিযান করিব, কিন্তু সঙ্গে এমন আর একজনকে চাই যাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি। তেমন লোক তুমি ছাড়া আর কে আছে! ইহার ফল যেমনই হোক, তাহাতেই আমার উত্তেজনা কাটিয়া যাইবে।"

আমি উত্তর করিলাম, "তোমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু বল দেখি, তোমার এই অভিযানের সঙ্গে ঐ সর্বনেশে পোকাটার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা?"

"হাঁ, আছে।"

"তাহা হইলে, বন্ধু, এমন পাগলামিতে আমি নাই।"

"শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; তবে আর কি করা যায়? তাহা হইলে এ কাজ আমাদের দুই জনকেই করিতে হইবে।"

"তাহাই কর। এ-দেখি, একেবারেই পাগল! আচ্ছা, ধরিয়াও, তোমাদের কতক্ষণ লাগিবে বল দেখি?"

"সম্ভবতঃ দিন দশ। এখনই আমাদের যাত্রা করিতে হইবে, এবং যেমন করিয়া হউক, সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

"দেখ, আমি যাইতে পারি, কিন্তু তোমাকে বর্ণনপথ করিতে হইবে যে, তোমার এই ভূত ছাড়িলে এবং ঐ পোকাটার ব্যাপার (ভগবান জানেন!) তোমার অভিলাষ মত চুকিয়া গেলে, তুমি বাড়ী ফিরিয়া আসিবে; পরে চিকিৎসকের আদেশের বলেই আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।"

"আচ্ছা তাহাই হইবে। আমি তথা দিলাম। এখন চল, বাহির হইয়া পড়ি — আর একটুও বিলম্ব করা চলিবে না।"

(৩)

অতঃপর অতিশয় তাড়াতাড়ি সময়ে আমি বন্ধুর সঙ্গ লইলাম। বেশ চারিটার সময়ে আমি, লেগ্রাঁদ, ফ্রাইডে আর কুকুরটা — এই চারিজনে যাত্রা করিলাম। ফ্রাইডে জিদ ধরিল, সে একাই সারা পথ বহিবে এবং কোদালগুলি বহিবে: প্রভুর প্রয়োজনের জন্য, যা কোন শিউরায় খাটিয়ে নহে — আমার বিশ্বাস, লেগ্রাঁদের হাতের বাগানের মধ্যে কোন অস্ত্র থাকে, ইহা সে ইচ্ছা করে না। আমার উপর দুইটা আধারে-সাজন বহন করিবার ভার পড়িল; লেগ্রাঁদ নিজে একটি লম্বা বেতের আধার পোকাটি ঝুলাইয়া সেটাকে বাল্কিকরের মত দুলাইতে দুলাইতে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

দ্বীপের সামনের খাড়ি আমরা ডিঙ্গিতে পার হইলাম। তার পর উপকূলের উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সেই নিবিড় নির্জন অজানাপথে কোথাও মনুষ্য-পদচিহ্নের আভাস আজ নাই।

এইরূপে দুই ঘণ্টা পথ চলিয়া অবশেষে প্রায় সূর্যাস্তের সময় আমরা পূর্বের চেয়ে সহস্রগুণ তীব্র এক দুর্দম অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঐ মানভূমির উপরে গভীর ঔটোবনের মধ্যে পথ চলিতে চলিতে বুঝিতে পারিলাম, লক্ষের কাছেই না থাকিলে আমাদের পক্ষে পথচলাই অসম্ভব হইত। এতস্থানে পৌঁছিয়া ফ্রাইডার তাহার প্রভুর নির্দেশমত একটা প্রকাণ্ড উঁচু টিউলিপ-গাছের পাদ-দেশ পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। চারিদিকের আটলটি একই গাছ এবং আরও বহু গাছকে এই টিউলিপ উচ্চতায় ছাড়াইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পত্রের সৌন্দর্য্যে, গঠন-সৌষ্ঠবে, শাখা-প্রশাখার বিপুল বিস্তারে, এবং সর্ব্বোপরি সেগুলির অপূর্ব গাম্ভীর্য্যে ইহা অনন্য-সাধারণ — এমনটি আমি আর কখনও দেখি নাই। আমরা বৃক্ষের তলদেশে পৌঁছিলে লেগ্রাঁদ ফ্রাইডারের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ঐ গাছে চড়িতে পারিবে কিনা। বৃদ্ধ ফ্রাইডার প্রথমটা ইতস্ততঃ করিল, তারপরমুহূর্তে কোন জবাবই দিল না; অবশেষে গাছের সেই বিশাল কাণ্ডের দিকে আগাইয়া গেল, গাছটির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। শেষ হইলে সে শুধুই বলিল — "হাঁ, মনিব, খুব কোন গাছে চড়িতে কখনও ভয় পায় না, সে গাছ যেমনই হউক।"

"তাহা হইলে বড় তাড়াতাড়ি গাছে উঠিতে থাক, নতুবা অন্ধকার হইয়া আসিবে, তাহার পর আলো ছাড়াই দেখিতে পাওয়া যাইবে না।"

"কত উঁচুতে উঠিতে হইবে?"

"আগে ডালটায় ত' উঠ, তাহার পর কি করিতে হইবে আমি বলিয়া দিব। হাঁড়াও, সঙ্গে পোকাটাও লও দেখি।"

নিগ্রো ভয়ে পিছু হটিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "আমার সেই পোকা! সোনা-পোকা! উহা লইয়া গাছে চড়িবার দরকারটা কি? আমি উহা ছুঁইতে পারিব না।"

"তোমার মত হোঁৎকা একটা নিগ্রো একটা মরা পোকা সঙ্গে লইতে এত ভয় পায়! এই বলিতে ঝুলাইয়াও যাইতে পার। যেমন করিয়া হউক, উহাকে তোমার সঙ্গে রাখা চাইই, নহিলে এই শাবলের একটি ঘায়ে তোমার মাথা আমি ভাঙ্গিয়া দিব।"

ফ্রাইডার এবার ভাবে সম্মতি জানাইল, যেন সে কত লজ্জাই পাইয়াছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতে হইবে, বল: এই বুড়াকে লইয়া

উঁচু জমা তোমার একটা অভ্যাস হইয়াছে দেখিতেছি। আমি ও সে-অভ্যাস করি নাকি! তা তা' হউক, উহাকে আমি গ্রাহ্যই করিলাম না।" এই বলিয়া, হাসির ফোয়ারাটি ঘরিয়া লোকটিকে যতদূর সম্ভব তাহার দেহ হইতে দূরে রাখিয়া, জুপিটার পুনরায় উঁচুদরে হুকুম প্রচার করিল।

আমেরিকার অগ্ন্যুদ্গমের এই সুন্দর টিউটিলি গাছগুলি বাড়িবার মুখে দেখিতে যেমন নীরেট ও চকচকে, উঁচুতেও তেমনই সেগুলি হয়; তখন গায়ে তোমে তাদোপালা থাকে না। কিন্তু বেশ পাকা হইয়া আসিলে, উহাদের বাকল শক্ত হয়, অথচ খসখসে হইয়া উঠে, এবং গায়েও বহু গাঁট দেখা দেয়; তা'ছাড়া তাহাদের উপরে ছোট ছোট ডাল গজাইয়া থাকে। এইজন্যই এই টিউটিলি গাছটায় উঠা যতই অসম্ভব মনে হউক না কেন, আসলে সেরূপ নয়। জুপিটার বারকয়েক পড়িতে পড়িতে শেষে বহুচেষ্টায় কোনোরকমে একটা মোটা ডালে গিয়া উঠিল — উহা মাটী হইতে ষাট-সত্তর ফুট উঁচু হইবে। এতক্ষণে যে চড়ার বিদ্যে একরকম করিয়া গেল।

উপর হইতে জুপিটার জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার কোন্ দিকে যাইতে হইবে বল।"

লেফ্রাঁ বলিলেন, "এই পাশের সবচেয়ে বড় ডালটায়ে উঠিয়া যাও।" জুপিটার তৎপরতার সহিত উহার আদেশ পালন করিল; উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিতে করিতে তাহার দেহ ক্রমে ঘন পত্রাচ্ছাদনে আবৃত হইয়া গেল; কেবল, কুকুরকে উৎসাহ দিবার জন্য যেরূপ শব্দ করা হয়, সেরূপই একটা বহুমুখপ্রসূত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল।

"আর কতদূর?"

"এখানটা বড় উঁচু!"

লিফ্রা জানাইল, "অনেক!—এখান হইতে আকাশ দেখা যাইতেছে।"

"আকাশের ভাবনায় তোমার কাজ নাই, এখন যাহা বলি শুন। নীচের দিকে তাকাইয়া বল দেখি, কয়টা ডাল ছাড়িয়া গিয়াছ?"

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এদিকের পাঁচটী মোটা ডাল।"

"তাহা হইলে আরও এক ডাল উঠ।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শোনা গেল, জুপিটার সপ্তম ডালে উঠিয়াছে।

লেফ্রাঁ সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "ভূপ, এখন তোমাকে ঐ ডালটা ধরিয়া উহারই উপরে খড়টা পায়ের আমাইয়া যাইতে হইবে। যদি অদ্ভুত কিছু দেখ, আমাকে বলিবে।"

অন্ধ বন্ধুবিচ্ছেদের সম্ভাবনায় আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল এইবার তাহাও দূর হইয়া গেল, তিনি যে উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন এই ধারণাই আমার বদ্ধমূল হইল। বড় ভাবনা হইল, কেমন করিয়া তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাই। এমনই সময় আসিতেছি, এমন সময়ে আবার জুপিটারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল —

"এই ডালটায় আর বেশি দূর যাইতে ভয় করিতেছে, উহার প্রায় সবটাই মরা ডাল।"

"কি বলিলে?—মরা ডাল?"

"হাঁ মাসা, একেবারে মরিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, যাহাদের বক্ষা হইয়া গিয়াছে।"

"তাই ত'! এখন তাহা হইলে কি করি?" — ভয়ানক বিপন্নভাবে লেফ্রাঁ বলিয়া উঠিলেন।

এতক্ষণে আমি কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া খুশী হইয়া উঠিলাম—এইবার একটু ভরসা হইল, বলিলাম, 'চল তবে এইবার ফিরিয়া যুমাইবে চল। আইন, এই ত' বুদ্ধির কাজ! এতক্ষণে কথাটা বুঝিয়া যাও নাই ত'?"

আমার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া তিনি চেঁচাইয়া বলিলেন, "জুপিটার, আমার কথা শুনিতে

পাও কি ?"

"হাঁ, বাবা, পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।"

"বেশ, এইবার গাছের যা দিয়া দেখ দেখি ডালটা অত্যন্ত শুকনা কিনা।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দ্বিতীয়টা জবাব দিল, "হাঁ, বাবা, শুকনাই বটে, তবে কতটা ভাবিয়াছিলাম তত্টা নহে; আমার একার পক্ষে ঐ ডালের উপর দিয়া আগাইয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারে।"

"তোমার একার পক্ষে! — মানে কি?"

"মানে, আমি পোকাটার কথাই বলিতেছি, উহা ঠিক জাতি কিনা! উহাকে বাঁচে ফেলিয়া দিলে কেবল দ্বিতীয় ডাল্টা কোনরকমে বহিতে পারিবে।"

ফুপিটারের উত্তর শ্রবণে খড়ির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লেগ্রাঁদ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি একটা মস্ত পাখি বটে, নহিলে এমন বাজে বকিবে কেন? পোকাটা যদি তুমি ফেলিয়া দাও, তবে জানিও, তোমার মাথা আমি ভাঙিয়া দিব। আমার কথা শুনিতে পাইতেছ, ফুপিটার?"

"পাইতেছি, বাবা; এই গরীবের উপর অত রাগ করিও না।"

"বেশ, এখন শোন। দড়টা নিরাপদে মনে কর— একটু সাহস করিয়া জড়টা আগাইয়া যাও দেখি, পোকাটা ফেলিও না। নীচে নামিয়া আসিলেই আমি তোমাকে একটি টাকা বকশিস দিব।"

সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় জবাব দিল, "আমি যাইতেছি, বাবা। প্রায় আগায় পৌঁছিলাম বলিয়া।"

লেগ্রাঁদ যেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আগায় পৌঁছিয়াছ? — কি বলিতেছ, ফুপিটার?"

"এই পৌঁছিয়াছি, — ও বাবা! ডালের উপরে ওটা আবার কি!"

লেগ্রাঁদ উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি — কি দেখা যাইতেছে?"

"একটা গহ্বর বাবা খুলি! মনে হয়, কবে কোন্ হতভাগার মুণ্ডটি কাটিয়া এখানে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তারপর কাক-শকুনের খোরাক হইয়াছে।"

"যাহা হইলে, উহা একটা গহ্বর বাবাই বটে? বেশ! এখন দেখ দেখি, ডালের সঙ্গে উহা কিরূপে আটকানো রহিয়াছে, আর, উহার গায়ে কোনরূপ চিহ্ন আছে কি না?"

"নিশ্চয়, দেখিব বই কি — কি আশ্চর্য! একটা মোটা মজবুত খাড়া আটিয়া রাখা হইয়াছে।"

"এখন যাহা বলি, ঠিক তাহাই কর দেখি — শুনিতে পাইতেছ?"

"নিশ্চয়, তোমার কথামত করিব বইকি।"

"এইবার খুলিটার বাঁ চোখ কোনটা ঠিক করিয়া লও।"

"হায়, হায়! উহার কোন চোখই যে নাই!"

"তুমি একটা আস্ত গাধা! তোমার কোন্‌টা ডান হাত কোন্‌টা বাঁ হাত তাহা জান?"

"জানি বই কি, নিশ্চয় জানি! কেন, যে হাতে আমি কাঠ কাটি উহাই ত' আমার বাঁ হাত।"

"তুমি কি সত্যই বাঁ হাতে কাঠ কাটিয়া থাক? আচ্ছা বেশ, তবে দেখ যে দিকে তোমার বাঁ হাত সেই দিকেই তোমার বাঁ চোখ, বুঝিলে? আমার বিশ্বাস, এইবার ঐ খুলিটার বাঁ চোখ তুমি খুঁজিয়া পাইবে।"

অতঃপর কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল; অবশেষে ফুপিটার যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল — আচ্ছা, খুলিটার বাঁ দিকের চোখই বাঁ চোখ তো; কিন্তু উহার হাতই যে নাই! যাক গে, এইবার বাঁ চোখ পাওয়া গিয়াছে — এইটাই তো বাঁ চোখ। তারপর প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, "বাঁ চোখ দিয়া কি করিতে হইবে?"

"বাঁ চোখের মধ্য দিয়া পোকাটা বড়িশসূত্র

সমাধির নীচে ছাড়িতে থাক, কিন্তু সাবধান দড়ি ছুটিয়া না যায়।"

"এ কাজ ত' খুবই সহজ; আমি ছুটার মধ্যে দিয়া পোকাটা বাঁধিয়া দিতেছি, নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ুক।"

তখন অন্ধকার চলিতেছিল, ছুপিটারকে দেখা যাইতেছিল না। এবার পোকাটা ছাড়িয়া দিয়াই দড়ির প্রান্তে উহাকে ঝুলিতে দেখা গেল — যেন একটি জোনাকির মৃদু কম্পিত-অস্তমান স্বর্ণের শেষ বিন্দুটুকু চিকমিক করিতেছে। এখন যদি উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে ঠিক আমাদের পায়ের কাছেই পড়িবে। লেগ্রাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে কোদালির সাহায্যে তিন-চারটি গজ পরিমিত জায়গা বৃত্তাকারে সাফ করিয়া লইলেন। তাঁহার কাজ শেষ হইলে, তিনি ছুপিটারকে দড়ি ছাড়িয়া দিয়া নীচে নামিয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

দড়ি ছাড়িয়া দিতেই পোকাটা যে জায়গায় আসিয়া পড়িল, লেগ্রাণ্ড ঠিক সেই স্থানে একটি খুঁটি পুঁতিয়া তাঁহার পকেট হইতে একটা ফিতা বাহির করিলেন। তারপর খুঁটি হইতে গাছের যে দূরত্ব সবচেয়ে নিকট, সেইখানে ফিতার অপর প্রান্ত বাঁধিয়া দিলেন; পরে তাহাতেই লাগান ঠিক করিয়া ফিতা হাকিতে হাকিতে খুঁটি হইতে আরও পঞ্চাশ ফুট বাহিরে চলিয়া গিয়া সেইখানে আর একটি খুঁটি পাকিলেন। তারপর এই দ্বিতীয় খুঁটিকে কেন্দ্র করিয়া চার ফুট ব্যাস মাপিয়া একটা বৃত্ত চিহ্নিত করিয়া লইলেন। ইহার পর প্রত্যেককে এক একখানি কোদাল লইয়া ঐ স্থানটি খুব তাড়াতাড়ি খুঁড়িয়া ফেলিতে বলিলেন।

সত্য বলিতে কি, কোনকালেই ঐ রকম তামাসার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না; তার উপর, ঠিক ঐ সময়ে আমি উহা মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলাম না, — কারণ, তখন শঙ্কার দ্বারা একেবারে গায় হইতে সাতের হইয়া আসিতেছিল, আমিও ভার হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু না করিয়া উপায় কি! মনুর অনুরোধে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে চটাইবার সাহস হইল না। যদি ছুপিটারের সাহায্য পাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত, তবে এই পাগলটাকে জোর করিয়া পুরে লইয়া যাইবার চেষ্টা নিশ্চয় করিতাম। কিন্তু বুড়া সিলাসের মনোভাব আমার ভালই জানা ছিল — তাহার প্রভুর বিরুদ্ধে কোন কাজ করিলে আমাকে সে কিছুতেই সাহায্য করিবে না। এখন আমার আর সন্দেহমাত্র রহিল না যে, লেগ্রাণ্ডের মনে, দক্ষিণদেশী লোকদের মতই অন্ধবিশ্বাস সম্বন্ধে একটা মিথ্যা বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তদুপরি পোকাটা পাইবার পর — বিশেষতঃ ছুপিটারের সেই মন্তব্যের পর — তাঁহার সেই সংস্কার আরও দৃঢ় হইয়াছে। ইহার উপর যদি মস্তিষ্কের দোষ থাকে, এবং এইরূপ বিশ্বাস যদি কল্পনার সহিত মিলিয়া যায়, তবে ত কথাই নাই। বেচারীর সেই কথাও তখন আমার স্মরণ হইল, সেই যে বলিয়াছিল — 'আমার পূর্ব ঐশ্বর্য যে ফিরিয়া পাইব, এই পোকা হইতেই তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি'। মোটের উপর, আমি বড়ই বিরক্ত বোধ করিলাম। অবশ্যেষে, উপায় যখন নাই তখন অগত্যা খুশী-মনে খুঁড়িতে রাজি হইলাম। মনে করিলাম, চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা ঐ পাগলের মন যত শীঘ্র ভাঙিয়া দেওয়া যায়, তত্ই মঙ্গল।

লণ্ঠন দুইটি জ্বালাইয়া আমরা পুরাদমে কাজে লাগিয়া গেলাম — যেন কি মহৎ কাজই না করিতেছি! লণ্ঠনের আলোয় হাতিয়ার-হাতে আমাদের সেই মূর্তিগুলা একখানা ছবির মত দেখাইতেছিল। সেই সময়ে যদি কেহ হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িত তাহা হইলে আমাদিগকে সে কি চক্ষে দেখিত তাহা অনুমান করিতে পারি।

ঘণ্টা খানেক খুঁড়িয়া আমরা একটানা মাটী খুঁড়িয়া

চলিলাম। সকলেই প্রায় চুপচাপ। কেবল কুকুরটা আমাদের কাছে বিশেষ কৌতূহল বোধ করিয়া যেরূপ চীৎকার করিতেছিল তাহাতে আমরা সন্ত্রস্ত হইয়াছিলাম। অবশ্য সে এমন তীক্ষ্ণ চীৎকার সুরু করিয়া দিল যে, নিকটে কোথাও কেহ আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ করিয়া আমরা শঙ্কিত হইলাম, অন্তত: লেগ্রাঁদ ঐরূপ আশঙ্কাই করিতেছিলেন। আমি কিন্তু এরূপ বিঘ্ন ঘটিলে খুশিই হইতাম; কেন না, তাহা হইলে এই উদ্‌ভ্রান্ত মানুষটিকে ঘরে ফিরাইবার একটা উপায় হয়। অবশেষে জুপিটার গর্ত হইতে খুব সাবধানে উঠিয়া গিয়া কুকুরটার মুখ একটা রুমালের দ্বারা বন্ধ করিয়া দিল, চীৎকারও থামিয়া গেল। অতঃপর মুখে একটা গভীর খুশীর ভাব ধারণ করিয়া জুপিটার আবার কাজ সুরু করিল।

নির্দ্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল; পাঁচ ফুট গভীর মাটী খুঁড়িয়াও ধনরত্নের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলে কিছুক্ষণ কাজ থামাইল। আমি আশা করিতেছিলাম, এইবার বুঝি এই প্রহসনের যবনিকা পড়ে। লেগ্রাঁদ যদিও এই ঘটনায় অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি কপালের ঘাম মুছিয়া পুনরায় কাজ সুরু করিয়া দিলেন। উপরের লম্বা সেজা সেই অস্থির সমতা মোটা সেস হইলে, সুবলার আরও দুই ফুট খোঁড়াইয়া খনন করা হইল। তথাপি কিছুই মিলিল না। স্বর্গীয়ের পশ্চাদ্ধাবনকারী এই বন্ধুর জন্য আমি বড়ই অনুকম্পা বোধ করিলাম। শেষে মুখে হতাশার চিহ্ন লইয়া তিনি গর্ত্ত হইতে উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিশয় অনিচ্ছা সহকারে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত পোষাকটা পরিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আমি কোন মন্তব্য করি নাই। জুপিটার তাহার প্রভুর ইঙ্গিতে যন্ত্রপাতিগুলি গুছাইয়া লইতেছিল। ইহার পর কুকুরটার মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল। আমরা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম।

(৩)

বহুক্ষণের পর আবার পা মাটি অক্ষরের হইয়াছি. এমন সময় হঠাৎ লেগ্রাঁদ একটা গালি উচ্চারণ করিয়া জুপিটারের জামার কলার সজোরে চাপিয়া ধরিলেন। বিস্ময়বিস্ফারিত নিগ্রোর চক্ষুদ্বয় এবং মুখমণ্ডল পূর্ব বিবর্ণিত হইয়া উঠিল। কোনরকমে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সে প্রভুর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, ক্রুদ্ধ লেগ্রাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "পাজি, নচ্ছার, কালো শোয়ার কোথাকার! বল্, এখনি বল্! — আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি কিছুমাত্র গোপন না করিয়া এখনই তার জবাব দে — তোর বাঁ চোখ কোন্‌টা?"

জুপিটার তাহার ডান চোখের উপর হাত রাখিয়া ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিল, "কোহাই হুজুর! এই ত' আমার বাঁ চোখ!" প্রভুর হস্তে সম্ভাব্য প্রহারের ভয়ে সে তাহার ডান চোখটি জোরে চাপিয়া ধরিল।

লেগ্রাঁদ নিগ্রোকে ছাড়িয়া দিয়া উল্লাসে কয়েকবার চতুর্দ্দিকে ঘুরপাক খাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি জানি, এই আলবাৎ আমি করিয়াছিলাম।" প্রভুর আচরণে বিস্মিত হওয়াতে জুপিটার দাঁড়াইয়া উঠিয়া একবার লেগ্রাঁদ আরেকবার আমার দিকে তাকাইতে লাগিল।

লেগ্রাঁদ বলিলেন, "এ, আমাদের আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে, কাজটা এখনও চুকিয়া যায় নাই।" এই বলিয়া তিনি সুবলার টিউলিপ গাছটার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সকলে বৃক্ষের সান্নিধ্যে পৌঁছিলে লেগ্রাঁদ জুপিটারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জুপিটার সামনের না পিছনের — কোন্ দিকটা ডানে আটকানো ছিল?"

"সমুখের দিকটা বরফের পানে ছিল, তাহাতেই না উহার চোখে দুইটা কাকড়া এত সহজে বেধ করিতে পারিয়াছে।"

তখন সেক্রেটারি ফুপিটারের চোখ দুইটা পর পর স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কোনটায় ছিটা দিয়া ঐ চোখটা গলাইয়া দিয়াছিল।

"তোমার হুকুম-মত এই বাঁ চোখের ছিটা দিয়াই আমি চোখটা গলাইয়া দিয়াছিলাম।" বলিয়া ছিন্ন বাঁ চোখ বলিতে তাহাকে ডান চোখটাই দেখাইয়া দিল।

"হইয়াছে — যাদু! আর একবার টেষ্ট করিয়া দেখিতে হইবে।"

এইবার আমার বন্ধুর পালানির জন্যও আমি একটু বুদ্ধির আভাস পাইলাম। তিনি খুঁটিটা ডিন ইঞ্চি পশ্চিমে সরাইয়া লইলেন, এবং পূর্বের মত, তেমনই ছিটা টানিয়া সজোরে দুই ঘা দিয়া সেই খুঁটিটি পুনরায় গলাইয়া দিলেন। ইহার পর, পূর্বের মত আর একটা চুক তেমনি করা হইল। এই স্থানটি পূর্বের স্থান হইতে ডাহিনে সাত ফুট দূরে পড়িল।

সকলে পুনরায় কোদালি দিয়া খুঁড়িতে লাগিলাম। আমি বড়ই ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম, তথাপি, কেন জানি না, আমার কি যে ভাব হইল, এবার এই পরিশ্রমের কাজে মন আর বিরূপ হইয়া উঠিল না; বরং একটা অকারণ উৎসাহে সত্য সত্যই মাতিয়া উঠিলাম। সম্ভবতঃ বন্ধুর অদ্ভুত খাম-খেয়ালের কল্পজালে এমন একটা হিসাবী বুদ্ধি বা স্থির-সিদ্ধান্তের আভাস পাইলাম, যাহাতে আমার কিছু আস্থা জন্মিল, তাই আমিও উৎসাহের সহিত মাটী খুঁড়িতে লাগিলাম। যে ধন-লাভের স্বপ্নে আমার হতভাগা বন্ধুর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল, আমিও যেন তাহার আমার মাঝে মাঝে অংশ হইয়া উঠিতে ছিলাম। মনের এরূপ অবস্থায় যখন প্রায় দেড় ফুট কাটিয়া গেল, তখন ফুপিটার উচ্চ চীৎকারে আমরা চমকিয়া উঠিলাম। সেবারের চীৎকারের কারণ ছিল অন্যরূপ, সে যেন একটা কৌতুক বা খেলার ছলে চীৎকার করিতেছিল, এবারে তাহার চীৎকার বেশ সত্যিই ও বেদনাপূর্ণ। ফুপিটার পুনরায় তাহাকে ঘুষোঘুষি পালাইবার চেষ্টা করিল সে তাহা সজোরে ছাড়াইয়া সর্দ্দের মত লাফাইয়া পড়িল এবং তীব্রস্বরে মাটী আঁচড়াইতে সুরু করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই সে একরাশ মানুষের হাড় বাহির করিয়া ফেলিল — ছোটো ছোটো নরকঙ্কালের হাড়। তাহার তাঁকে তাঁকে কতকগুলা ধাতুনির্ম্মিত বোতাম ও মাটি-হইয়া-যাওয়া পোষাকের টুকরা রহিয়াছে। আরও দুই চারিটা কোদালের ঘা দিতেই একটা প্রকাণ্ড খুলীর কপা বাহির হইয়া পড়িল — যেরূপ খুলী স্পেনীয়দের ব্যবহার করিয়া থাকে। এবং আরও কিছুক্ষণ খুঁড়িবার পর কয়েক টুকরা সোনা ও কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা চকচক করিয়া উঠিল।

ফুপিটারের জ্ঞানের আর বাকী নাই; কিন্তু তাহার ক্রূর মুখমণ্ডলে একটা গভীর হতাশার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি আমাদিগকে খুঁড়িয়া যাইতে বলিলেন; তাঁহার মুখ হইতে আর কোন শব্দ বাহির হইতে না হইতেই অভিপ্রায়িত একটা লোহার কড়ায় আমার হতাশ অঙ্গপ্রাণ ঠেকিয়া যাওয়ায় আমি হোঁচট খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলাম।

পুনরায় উৎসাহের সহিত কাজে লাগিলাম; দশ মিনিট কাল সে কি গভীর উৎকণ্ঠায় কাটিল। ইতঃপরে আমরা মৃত্তিকাতল হইতে খুব মজবুত গড়ন একটা কাঠের সিন্দুক উদ্ধার করিলাম।

আশ্চর্য্য মজবুত সেই সিন্দুক। তেমনই আশ্চর্য্য তার সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। দেখিলে মনে হয় যে, কোন ধাতু-পদার্থের দ্বারা — সম্ভবতঃ পারদের বাইক্লোরাইড দিয়া — ঐরূপ করা সম্ভব হইয়াছে। বাক্সটী দৈর্ঘ্যে সাড়ে-তিন ও প্রস্থে তিন ফুট, এবং আড়াই ফুট গভীর ছিল। দুই জন লোক বহন করিয়া লইতে পারে

ওইরূপ দুই পাশে তিনটি করিয়া মোট ছয়টি কড়া আছে। আমরা সকলে প্রাণপণ চেষ্টায় বাক্সটি কোনরকমে দরজাটির কাছে আনিতে পারিলাম। ঘুচিলাম এই ভয়ঙ্কর ভারি বস্তুটিকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই বাক্সের তালাটা দুইটি মাত্র কণ্ট্ দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কণ্ট্ দুইটা খুলিয়া ফেলিলাম — সে সময়ে সকলে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশা-বিশ্বাসে ধারুল উৎগ্রীব হইয়া উঠিয়াছি। পর মুহূর্ত্তে এক বিপুল ধনভাণ্ডার চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া গেল, লণ্ঠনের আলো লাগিয়া রাশীকৃত সোনা ও মণিরত্ন ঝকমক করিয়া উঠিল — আমাদের চোখ একেবারে ধাঁধাইয়া গেল।

আমার সে যে কি বিপুল অবস্থা তাহা স্বীকার করিতে কিছুমাত্র লজ্জা নাই। অবশ্য বিস্ময়ের ভাগই ছিল প্রবল। কিন্তু লেগ্রাণ্ড যেন উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। এই ঘটনায়, নিরাশাদের যেমন হইয়া থাকে, হুপিটারের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তখনই সে সর্জ্জের অর্থো হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার দুই হাত দুইটা কনুই পর্য্যন্ত সোনায় ডুবাইয়া রাখিয়া দিল — যেন সে একজন অবগাহন-সুখ অনুভব করিতেছে। অবশেষে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে আপন মনেই বলিতে লাগিল,

"পোকা ত' নয়, সোনামণি আমার! এই সবই ত সেই সোনা-পোকার জন্য! কিন্তু তাহাকে কি অনাদরই না করিয়াছি! এখন বল্ নিগার বদ্‌জোর মুখ পুড়িল ত?"

এখন এই ধনরাশি যে এখান হইতে সরাইতে হইবে, প্রভু-ভৃত্য দুইজনকে আমরাই তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে হইল। সময় বহিয়া যাইতেছে, রাত্রি ভোর হইবার আগেই যতদূর সম্ভব এ সকল ঘরে তুলিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহার উপায় স্থির করাই কঠিন; পরামর্শ করিতেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহাও যেন কেমন এলোমেলো হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মাল সরাইয়া বাক্সটি হাল্কা করিয়া কোনরকমে আমরা উপরে টানিয়া তুলিলাম। তারপর বাকি জিনিষগুলি কাঁটাবনের ভিতরে ঝুরুটের সাহায্যে রাখা হইল — হুপিটার ঝুরুটটাকে কড়া হুকুম দিল, আমরা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সে যেন এখানে টুঁ শব্দ না করিয়া পাহারা দেয়। এইবার আমরা বাক্সটি লইয়া তাড়াতাড়ি বাসার দিকে রওনা হইলাম, পৌঁছিতে প্রায় ১টা বাজিল। আমরা তখন এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, সে অবস্থায় আর কিছু করিতে পারা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং রাত্রির আহার শেষ করিয়া দুইটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিলাম। তারপর ঘরের দাওয়া হইতে তিনটি বড় বাগ লইয়া আমরা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিলাম। চারিটার সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া অবশিষ্ট ধনরাশি মোটামুটি সমান ভাগ করিয়া লইয়া, গর্ত্তটা না বুজাইয়াই আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। বাড়ী পৌঁছিয়াই ব্যাগগুলি একত্রিতে নামাইয়া রাখিলাম। তখন পূর্ব্বদিগন্তে গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে।

দারুণ অবসাদে আমরা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সেই উত্তেজনার মুহূর্ত্তে বিশ্রামও কি সম্ভব? তিন চারি ঘণ্টার তালা-তালা নিদ্রার পর ধনভাণ্ডারটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আমরা একই সঙ্গে জাগিয়া উঠিলাম — যেন আগে হইতে এইরূপই পরামর্শ করা ছিল।

লিস্‌টটা পুরাপুরি তৈরি ছিল। সারা দিন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জিনিষগুলি পরীক্ষা করিতেই কাটিয়া গেল। প্রথমদিকে কিছুই গুছাইতে পারা যায় নাই, সবই অস্থির এলোমেলো স্তূপাকার অবস্থায় ছিল। তারপর বিশেষ যত্নের সহিত বাছাই করা

হইলে, দেখা গেল, আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক বেশি ও বহুমূল্য সম্পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সবশুদ্ধ বাজার-দর তখন অন্তত: চারিশত পঞ্চাশ হাজার টাকা, কিংবা তারও বেশি। রূপা ছিলই না, সবই সোনা। নানা-রকমের প্রাচীন মুদ্রা ছিল — রুশীয়, স্পেনীয়, জার্মান; কয়েকটি ইংলিশ গিনিও ছিল; তাহা ছাড়া কয়েকটি এমন কাউন্টার ছিল যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। কয়েকটি মুদ্রা বেশ বড় এবং ভারী; ছবিগুলি এতই প্রাচীন যে উহাদের উপরকার চিহ্ন পাঠ করা দুঃসাধ্য। আমেরিকার মুদ্রা একটিও ছিল না। দামী পাথরগুলির মূল্য নিরূপণ করা আরও শক্ত। প্রায় ১০০টি হীরা ছিল; উহাদের কয়েকটি বৃহৎ ও সুগঠন, একটিও খুব ছোট নহে; পাঁচটি খুব উজ্জ্বল চুনি, ৩১০টি সুন্দর পান্না, আর ২১টি নানা রঙের নীলা, — সবগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ অবস্থায় সিন্দুকের মধ্যে ছড়ান ছিল; উহাদের সোনার ট্রাইগুলি পৃথক করিয়া হাতুড়ি দিয়া পিটান হইয়াছিল — যাহাতে গলান না যায়। এ ছাড়া নিরেট সোনার গহনাও ছিল প্রচুর; যেন মোটা আঙুলের প্রায় দুইশত আংটি; কানের দুল; তাবিজ যেন ছিল ডিমিলটী; ডিমিলটী যেন বড় এবং ভারি ভল; পাঁচটী যেন মূল্যবান সোনার ঘুঙুরসহ; একটি প্রকাণ্ড সোনার পানপাত্র, তাহার গায়ে আঙুর-পাতা ও পানরত পুরুষের নক্সা; দুইটি কারুকার্য-খচিত ভৃঙ্গারের বাঁট। টুকিটাকি জিনিস আরও অনেক ছিল, এখন মনে নাই। সবগুলির ওজন ইংরেজী মাপ অনুযায়ী সাড়ে তিনশত পাউণ্ডের বেশি। এই তালিকায় ১২৭ টি উৎকৃষ্ট সোনার ঘড়ি ধরা হয় নাই, উহাদের মধ্যে তিনটির প্রত্যেকের মূল্য ৫০০ ডলার হইবে; উহাদের অনেকগুলি যেমন অতি প্রাচীন, তেমনই ঘড়ি-হিসাবেও উৎকৃষ্ট — প্রায় সবগুলিতে মণিমুক্তা খচিত রহিয়াছে, তথাপি প্রত্যেকটিতে অনেকগুলি করিয়া হুয়েল ছিল; উহাদের সোনাও খুব মূল্যবান। সেই রাত্রে জিনিষগুলির মূল্য আমরা মোটা মোটা আন্দাজ করিয়াছিলাম; পরে কম দামের গহনা এবং রত্নগুলি (কয়েকটি আমাদের নিজ ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিয়া) বিক্রয় করিয়া দিলে দেখা গেল যে, সম্পদরাশির যে মূল্য হিসাব করা হইয়াছিল, তাহা আসল মূল্যের চেয়ে অনেক কম।

অতঃপর যখন বাচাই করা শেষ হইল এবং আনন্দিক উত্তেজনাও সাময়িক ভাবে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল তখন মেজর বুঝিতে পারিলেন যে, আমি এই ব্যাপার প্রথমাবধি কত গভীর আগ্রহ লইয়া পড়িয়াছি। অতঃপর তিনি সেই রহস্য-কথা সবিস্তারে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

[আগামী বারে সমাপ্য]

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি — প্রথম, যে-রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায় অতিশয় মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী — বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিব্য-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

শিল্পী ও সমালোচক

(কথোপকথন)

দ্বিতীয় পর্ব

আ — Ortolan-গুলো বড় চমৎকার রান্না হয়েছিল, আর ঐ chamberlin — স্বাদও যেমন, গন্ধও তেমনি! এখন আমাদের সেই আলোচনাটা আবার আরম্ভ করা যাক।

শি — তাহা, অমন কাজটি কোরো না। আলোচনা করতে বসে' কেবল এক্টা'কেই ধরে' থাকতে নেই — এটা-ওটা সবরকমই এসে পড়া চাই। বরং, আমাদের বিষয়টা থেকে "ধরাছোঁয়ার বাইরে" — তার কারণ ও আরোগ্যের উপায়ে; এ সম্বন্ধে এখনো কই লিখব ঠিক করেছি; কিন্তু যে-কোন বিষয় আলোচনা করতে পারো, হাল্কা বা' এসে পড়ে।

আ — বা, আমি ঐ রসজ্ঞালোচক আর সমালোচনার

কথাই এখন ভাবতে চাই। তুমি বলেছ, অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে একটা সৃষ্টিকর্ম। — সে কথাও সম্পূর্ণ স্বীকার; এর কথায় সেও একটা সত্য আছে। আচ্ছা বেশ, এখন তা হ'লে আমাকে বুঝিয়ে দাও, ক্রিটিক্‌রা কি স্রষ্টা না হয়ে কখনো রসোত্তীর্ণ হতে পারে না?

বি — হাঁ, ইচ্ছা করলে, ক্রিটিকরাও ব্যাখ্যার কাজ করতে পারে। কিন্তু তাদের তাতে যে রস সম্ভার জোগান আমরা তা চরি বা আর কিছুর অর্থ বুঝিয়ে দেয় তা নয়; বরং সেই বস্তুটার রসত্ব আরও ঘনীভূত করে তুলবে; সেই শিল্প-সৃষ্টির চারদিকে এমন একটা বিশ্বরসের বৃত্তরেখা টেনে দেবে — যা দেখতে ও ভজন উপভোগ্য ভালো লাগা উচিত। সাধারণ মানুষ যারা ছবি সেতারের ঝিনুকের সমীক্ষা করে না — কবিতের যা ধোঁকে চলতে চায়; তুর্কির মত সহজে ধরে ফেলতে যে, "শেকস্‌পীয়র, কিটস সম্বন্ধে লেখা আর কতো বই পড়তে যাব কেন? তাঁদের নাটক বা কাব্যগুলোই ত' রয়েছে, সেই ত' যথেষ্ট।" একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ঠিকই বলেছেন যে, কিটসের কাব্যের রসাস্বাদ করতে পারা — সে হচ্ছে বিদ্বান হওয়ার একটা বড় পুরস্কার। আর, শেকস্‌পীয়রের যে গ্রীক মন বুঝতে চায়, তাকে সেই মূলটাকেও সবদিক দিয়ে বুঝে নিতে হবে। তাকে ইংরেজী ভাষার ক্রমোন্নতির স্তরগুলো জানতে হবে; মিলহীন ও মিলযুক্ত ছন্দের উত্তর বা বিবর্তন বুঝে নিতে হবে; গ্রীক নাটক পড়তে হবে — 'আমাদেরকে' সৃষ্টি করেছেন যে কবি আর 'অ্যাডভেঞ্চার' স্রষ্টা যিনি, তাঁদের হৃদয়ের ভাবা-রীতির অন্য যোগ কোথায়, কতটুকু — তাও বেশ নিতে হবে; এক কথায়, শেক্সপিয়রের যুগের এথেন্সের সঙ্গে এলিজাবেথের যুগের লণ্ডনকে যুক্ত করবার বিদ্যা তার থাকা চাই; আর চাই, ফ্রান্সের এবং অন্যান্য দেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে শেকস্‌পীয়রের স্থান কোথায়, তা'ও জানা করে' বুঝে নেওয়া। বেশ, আমেই, এখানে একটা মজার কথা আছে। বিদেশী সাহিত্য ও বিদেশী কলা-শিল্পের সংস্পর্শে এসেই এক-একটা জাতির যেমন সেই আত্ম-চেতনা জাগে, যাকে আমরা বলি জাতীয়তা-বোধ, — তেমনই, ঠিক উল্টো দিকে এটাও সত্য যে, ব্যক্তি-চেতনা খুব তীব্র করে' তুলতে পারলেই অপরের শিল্প-কর্মের মূলে যে ব্যক্তিত্ব আছে, সমালোচক সেটা আবিষ্কার করতে পারে; নিজের সেই ব্যক্তি-চেতনা অপরের সৃষ্টি-কর্মের ভিতরে যত গভীর হয়ে প্রবেশ করতে পারে, ততই ব্যাখ্যা আরও সত্য, আরও সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয় হয়ে ওঠে।

আ — আমার ত' মনে হয়, ক্রিটিকের ঐ রকম নিজস্ব মনোভাব সে কাজের পক্ষে একটা বাধা হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

বি — না, বরং সেইটেই একটা আলোর মত অপর বস্তুকে প্রকাশ করে দেয়। পরের ব্যক্তিত্ব বুঝতে হলে তোমার নিজের ব্যক্তিত্বটা খুব সজাগ করে তুলতে হবে।

আ — তার ফলে কি হয়?

বি — বলছি তোমাকে — বোধ হয় দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো সবচেয়ে ভালো হয়। আমার মনে হয়, সাহিত্য-সমালোচকের স্থানই সকলের উপরে — কারণ কবিদের দৃষ্টিও যেমন দূর-প্রসারী, কাব্যের ক্ষেত্রটাও তেমনই বিস্তৃত, আমার বিষয়টার মাহাত্ম্যও সবচেয়ে বেশি; —

তবু প্রত্যেক আর্টের এক-একটা মূলক ক্রিটিক আছে। নাটকের ক্রিটিক হ'ল অভিনেতা; কবির ছন্দগুলিকে সে নানা দিক দিয়ে মূর্তন করে' দেখায়। প্রত্যেক অভিনেতার নিজস্ব মতুন ভঙ্গিও আছে; নাটকের কথা-গুলিকে যার সঙ্গে ক'রে সে তার ঐ অভিনয়ের দ্বারা — তার অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে, এমন একটা "কিনিষ গড়ে' তোলে, যা সম্পূর্ণ মতুন। তেমনি, যে গান গায়, বাঁশি বা বেহালা বাজায়, সেও সঙ্গীতকলার অঙ্গকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে, তাই সে-ই হ'ল সঙ্গীতের ক্রিটিক। এখানা রঙীন ছবিকে যে কেবল রেখার সাহায্যে (etching), আর এক রকমের রং-হীন চিত্র করে' তোলে, সে-ও একটা মতুন উপায়ে, সেই মূল ছবির ভিতরকার রং, তার একটা মূলতত্ত্বের রূপ — সেই ছবির ছবিত্ব — আরও ভালো করে' ফুটিয়ে তোলে। অতএব, সেও এক অর্থে ঐ মূল শিল্পসৃষ্টিকে আর এক রকম ক'রে দেখাতে পারে — সে রূপ ঠিক সেই আসল রূপ নয়। এই রকমের ক্রিটিক যারা, তাদের কাজ দেখে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ঐ রকম দেখানো বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় কেবল একটা কারণে,—তাদের সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যক্তিত্বই সেই কারণ। রবিন্দ্রনাথ যখন বেটোফেনের কোন বিখ্যাত রাগিণী আলাপ করেন তখন তিনি শুধু বেটোফেনের প্রতিধ্বনি করেন না, সেই সঙ্গে নিজের প্রাণের সুরও তাতে যুক্ত করেন; তাইতেই আমরা মূল বেটোফেনকে আরও গভীর করে'—নিবিড়তর করে' পাই। কারণ, তখন আর একজন শ্রেষ্ঠ মনিষের মনচেতনায় তাঁর সৃষ্টির সেই মূলটিই আর এক রকম করে' জীবন্ত হয়ে ওঠে — যেন আর একটি কবি-চিত্তের সংস্পর্শ লাভ করে' আরও অপূর্ব, আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে — তা'তেই বেটোফেনের ব্যক্তিত্ব যেন আরও প্রসারিত, তার সত্তাটা আরও সত্য হয়ে ওঠে। একজন খুব বড় অভিনেতা যখন শেকস্‌পীয়রের নাটক অভিনয় করেন, তখনও আমাদের সেই রকমের অনুভূতি হয়; তিনি সেই চরিত্রটির যে মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা আমাদের সামনে ধরেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব এমন সঙ্গোপনে প্রবেশ করতে পারে ব'লেই সে যেন শেকস্‌পীয়রকেই আরও প্রসারিত করে দেওয়া। লোকে এমন কথা বলে বটে যে, অভিনেতারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মনমতো হ্যামলেট অভিনয় করে, সে হ্যামলেট শেকস্‌পীয়রের নয়। কথাটা আদৌ সত্যি নয়। আসলে শেকস্‌পীয়রের হ্যামলেট-চরিত্রের একটা মূলনিষ্ঠ রূপ-রূপ থাকলেও, তার আর একটা দিকও আছে, সেটা জীবনের দিক — অর্থাৎ যা-ধরা-দেওয়া দিক, অস্পষ্ট অজানার দিক। মানুষের যত রকম মন-বাড়ানোর ব্যাপার আছে — হ্যামলেটও তাতে তত্তগুলো আছে।

আ — অ্যাঁ! মনের যতরকম ব্যাপার তত্তগুলো হ্যামলেট!

বি — আর, যেহেতু ব্যক্তির ঐ ব্যক্তিত্ব-চেতনার থেকেই যতকিছু আর্টের জন্ম হয়, সেই জন্যে শিল্পসৃষ্টির অন্তরতম রূপটিও সেই ব্যক্তির কাছে ধরা দেয় — যার নিজের ব্যক্তিত্ব-চেতনা খুব প্রখর ও বলিষ্ঠ। দুই পক্ষের এই দুই চেতনা যখন পরস্পরকে স্পর্শ করে তখনই খাঁটি ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা সম্ভব হয়।

আ — তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে, ঐ রকম ব্যাখ্যাকার ক্রিটিক যে — সে মূল শিল্পসৃষ্টি থেকে যতখানি

পরে, সেও হয়তো দিনে ৫ বার ক্রিটিক হয়তো রাতে, দিনেও হয়তো রাতে ক্রিটিকের ভাবে!

বি — হয় প্রাচীন অন্যায়ী — ক্রিটিকরাই ত' জগতে কাজে মানুষ চিন্তা, মানুষ আদর্শের দিক দিয়ে যাচাই করে' সেগুলোকে চিরস্থায়ী করে রাখে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, মানুষের সভ্যতা যত বৃদ্ধি পাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিগুলো যত সূক্ষ্ম ও সুন্দর হয়ে উঠবে, ততই প্রত্যেক মানুষে যারা শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ধীমান, তারা ক্রমশঃ বস্তুর-জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটানো ছেড়ে দেবেন, একমাত্র আর্টের দ্বারা যেখানে যা সৃষ্টি হয়েছে তার থেকেই তাঁরা মনের সবকিছু খোরাক সংগ্রহ করে' নেবেন। কারণ, জীবনের যা' কিছু দেবার আছে, তার কোন ত্রুটি নেই: যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে তাও ভুল ক'রে ঘটে — ঠিক মানুষীর উপায়ে ঘটে না; সুখকর যা কিছু ঘটে তার মধ্যেও একটা বিকট অসারতা থাকে; ট্র্যাজেডিগুলো ত' প্রহসনে পরিণত হয়।

অ — হায়! হায়! জীবনের কি দুর্দশা! মানুষের কি বিড়ম্বনা! জীবনের যে মর্মজ্ঞরা, যে রসকে একজন তোমার কবি জীবনের সারবস্তু বলেছেন, তাদেরও কি তোমার প্রাণটা একটু নাড়া দেয় না?

বি — বরং খুব বেশি নাড়াচাড়ি নাড়া দিয়ে-দেখে। কারণ, যখন অতীতের দিকে ফিরে তাকাই, সেই সব নিখিল-অতীত জীবনেরও কথা ভাবি, সেই সব জনগুলো — সেই আদিকে বিস্ময়ে যা সুখে মাতোয়ারা হয়ে গাঁও — তখন মনে হয়, সে যেন খুব মিষ্টি মোহময়। যে-সব কাজের এককালে আমুলের মত মনে হয়েছিল, তাদের মত অসারও কিছু আছে? সবচেয়ে অবিশ্বাসের ধন কি? — না, যা' একদিন লাভ প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম। সবচেয়ে অসাধনীয় অসম্ভব কি? — না, যা' একদিন নিজ হাতে করেছি। যা, আমাদের জীবন আমাদের কেবল ঠকিয়েই চলেছে; সে যেন পুতুলনাচের বাজিকর। আমরা তার থেকে সুখ চাই, সে-ও দেয় বটে, কিন্তু তারই সঙ্গে নিত্য হয়ে লাগে দুশ্চাপায় দুঃখ। যদি বা এমন একটা বহুৎ সুখ পাই — যার সেই মহিমা আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনকে ট্র্যাজেডির মাহাত্ম্যেরকে মণ্ডিত করেছে বলে' আমরা হই, তাকেও বেশিদিন ধরে' রাখতে পারিনে — তার ভেতর থেকে ছোট একটা কিছু সেইখান অধিকার করে' বসে। কোন এক সকাল-বেলার মেঘলা-ঘুমের আলোয়, কিংবা শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে কোন এক সুশোভনময় নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, যে সোনালী কেশগুচ্ছটিকে এত অল্প সোনার কৌটায় তুলে রেখেছিলাম — যাকে একদিন পাগলের মত ছুঁয়ে ফেলেছি, চুমু খেয়েছি, সে আর প্রাণে একটুকু সাড়া জাগায় না, তার পানে ফের চোখে আর একটুকু ঘোর লাগে না!

অ — তা'হলে জীবন একেবারে নিষ্ফল বলতে চাও?

বি — যারা আর্টের উপাসক তাদের চক্ষে ত' বটেই। জীবনটা তাদের কাছে মূল্যহীন হ'য়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ — তার ব্যবহারটা অতি নীচ ভূমিকের মত। একবার তুমি প্রাণে যে নিবিড়তা গভীরভাবে অনুভব করেছ, ঠিক তেমনটি আর কখনো আর একবার অনুভব করতে তোমাকে সে দেবে না। কিন্তু আর্টের জগতে ঠিক এর বিপরীত। ঐ যে, দেয়ালের উপর 'ডিওনিসস কর্নেজি'খানা রয়েছে,— আমি

জানি, যদি এর কোন একটা জায়গা খুলে পড়তে যদি, তা'হলে তখনই আমার প্রাণে চীন বিদ্বেষের সঞ্চার হবে এমন একজনের উপর, যে কখনও আমার কোন অনিষ্ট করেনি; কিম্বা হয়ত এমন একজনের প্রেমে আমার প্রাণ তন্ময় হয়ে উঠবে, যাকে আমি কখনো দেখিনি, দেখবো না। এমন কোন যাদের আলোর নেই যা' আজ আমাদের প্রাণে সৃষ্টি করতে পারে না। তখন্ কোন্ একজন টপকোস করব তাও আগের থেকে ঠিক ক'রে নিতে পারি — বিশেষ, কবির পর্যায়। নিজের মনে নিজেই বলব — কাল খুব ভোরবেলায় আমরা বাজিলকে সঙ্গে করে' বেড়িয়ে আসব হুত্যা-হুইনীর হায়াঙ্কর উপত্যকায়; ঠিক তাই হবে — ভোর হ'তেই অন্ধকার বনপথে দিয়ে পৌঁছব, দেখব পথের পাশে মাউ,রাবাসী মহাকবি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই নবীতীর-ভূমি যে কালে আর ফুলে ভরে' গেছে তার কি রূপ! — কাটা-ঘরকন্নাপির চেয়ে সুন্দর, তারতীয় দেবদারুর চেয়ে সুন্দর! সিঁদুর কিম্বা অপার চেয়ে চোখ-জলসানো সেই সব ফুল! সেখানে হুত্যা-নদীর সেই হায়াঙ্কর উপত্যকে যারা গান করে' বেড়াচ্ছে তারা এই পৃথিবীতে রাজা হ'য়ে রাজত্ব করেছিল একদিন। তারপর, আমরা সেই যাদুময়ন সোপানাবলী আরোহণ করে' ক্রমে উর্ধ্ব হ'তে উর্ধ্বলোকে উঠতে থাকব, তারাগুলো আরও বড় দেখাবে, রাজাদের সেই গান স্পষ্ট হয়ে আসবে। শেষে আমরাও স্বর্গের সীমানায় সেই স্বর্ণ-পুরীতে গিয়ে পৌঁছব, যেখানে সাতটী সুবর্ণময় তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে ত্রিকিন-বাহিত রথের উপরে একজনের দেখা পাব — তার কপালে অলিভ-পাতার মুকুট, সর্বাঙ্গ শাল ওড়নায় ঢাকা, বহির্বাসখানি সবুজ, আর আমাদের যা' আসল পরিচয়ের ঘর। তাকে দেখবামাত্র বুকের ভিতর সেই চিরন্তন বাসনোদ্বেলি আবার জেগে উঠবে, শিরায় শিরায় দুরন্ত হ'য়ে উঠবে রক্তস্রোত। তখনি তাকে চিনতে পারব। সে সেই বিয়াত্রিচে — সেই নারী, যে নারীকে অন্ততঃ তিরিশি আমাদের প্রাণের পূজা নিবেদন করেছি। যে তুষার আমাদের বুকে জমাট বেঁধেছিল এতদিন, এখন তা' নিমেষে গলে' যাবে; আর্দ্র-স্বরে ডেকে উঠবে উঠল সেই জন — অন্ধকারে কাঁদতে লাগল। তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঠেকিয়ে প্রথম আলোয় আমরা, কারণ তখনই জানা হবে যে আমরা 'বিয়াট্রি পাপী। তারপর যখন প্রায়শ্চিত্ত করে' আমরা শুচি হ'লাম, বিস্মরণী-হ্রদের জল অঞ্জলি ভরে' পান করলাম, 'ইউনো'-নদীতে অবগাহন করে' প্রাণ-মন শুদ্ধ হল, — তখন আমাদের কৃপাধিষ্ঠাত্রী সেই দেবী হাতে ধরে' তুলে নিলেন একেবারে উর্দ্ধতম স্বর্গপুরীতে। সেখানে বিয়াত্রিচে তাঁর চোখদুটীকে পদ্ম-মেখরের মুখের উপরে স্থিরনিবদ্ধ করে' রইলেন — সে চোখ জ্বেলেনিই চেয়ে রইল। আমরা সেই পরম-সুখের পরমানন্দ লাভ করলাম — যে-প্রেম আকাশের গ্রহতারাকে গতিমান করেছে, কবিদের সেই প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে যাবে।

হাঁ, ভোরবেলার সেই মহাকবির সঙ্গে আমরাও এক-প্রাণ হয়ে যেতে পারি; একই মন্দিরে তাঁর সঙ্গে নতজানু হ'য়ে একই দেবতার আরাধনা করতে পারি; তাঁর হৃদয়ের সেই পিপাসাকে আর সেই দারুণ বিচ্ছেদ-বিষ দুই-জনেই ভাগ-ভাগ হ'তে পারি আমরা। আর যদি

প্রতীচ্য কবিদের এই সকল ভাবভঙ্গিমা আমাদের ভাল লাগে না লাগে, যদি আমাদেরই কাব্যের এই ত্রুটি ও অবসাদ, এই অস্থি-মজ্জা পাশের উদ্ভাসনা প্রাণে অনুভব করতে চাই, তা'হলে, তার জন্যেও এমন সব যাই করছে যার লোপাট, যাতে একটা সময়ে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব, যা' বিশ্বসংসারে অন্যে জীবন যাপন করলেও পাব না। তোমার হাতের কাছে ঐ যে ছোট্ট একখানি বই রয়েছে—লুক্রেশিয়ার লাভ্‌লেস, যার কোমার বেদুইন মত মেহগনির গুঁড়ো ছড়ানো, আর খুব শক্ত হাতির দাঁতের পালিশের দিয়ে পালিশ করা — ওখানা হচ্ছে বোদ্‌লেয়ারের শ্রেষ্ঠ রচনা, সোজিয়ে'র মত প্রিয় ছিল ওই কাব্যখানি। এর যেখানে সেই কবর পানই আছে সেইখানটায় খোল, সেই যে —

"যেথা সে তামিনী জ্ঞান-গভীর,

অথবা রূপসী অতি,

বিবাহ-প্রতিমা যদি বা সে হয়,

হোকনা — কি তারে কহি ?"

— ঐযে আরম্ভ হয়েছে কবিতাটা, ওর সবটা পড়লে, পরো দুঃখেরও এমন সুন্দর লাগবে, নিজের দুঃখকেও যা কখনো লাগেনি। তার পর সেই কবিতাটি পড়' যা'তে একজন ইচ্ছে করে, নিজেকে নিজেই যন্ত্রণা দিচ্ছে। এর ওই ছন্দটা আস্তে আস্তে তোমার মাথায় প্রবেশ করুক, এর সুরে তোমার মন বিহ্বল হয়ে উঠুক, তখন দেখবে, একমুহূর্তে তুমিও ঠিক সেই মানুষ হয়ে উঠেছ — ওই কবিতাটি যে রচনা করেছিল। সমস্ত বইখানাও পড়ে' ফেলতে পারো, এর ভিতরে যে সব গভীর-গোপন অনুভূতির আবেগ আছে, তার একটাও যদি তোমার প্রাণে লাগে, তা'হলে তুমিও পিপাসার্ত হ'য়ে ওই কাব্যের বিষ-মধু পান করতে থাকবে; তোমার প্রাণ এমন সব উদ্ভট পাপ-সুখের প্রায়শ্চিত্ত করতে অধীর হয়ে উঠবে, যা' আচরণ করা দূরে থাক, কখনো ভাবনাও করোনি। তার পর, এই রকম বিষসুন্দর লোভের যদি আর শেষ না থাকে, তুমি অনায়াসে অন্য ফুলের মধু আহরণ করতে পারো। তুমি সেই সিসিলিবাসী কবিকে তার বহুকালবিস্তৃত কবর থেকে জাগিয়ে তুলতে পারো — সেই মেলিয়াগ্রের, যুবতী হেলিওদোরার প্রণয়ী ছিল যে। সে-ও তার গান গোলাপে তোমাকে, তার গ্লুমেও ফুলের ছড়াছড়ি; লাল রঙের আনার-কলি, জল-জলজী আইরিস, পাপ্‌ড়িতে সোল-গোল বাগ-কাটা ভায়োলেট, ঘোর-নীল হায়াসিন্থ, হাইড্রেঞ্জিয়া, আরও কত কি! কবির প্রিয়তমা যখন ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াতেন তখন তাঁর সেই পা-দু'খানি পড়ত — যেন এক ফুলের উপরে আর একটি ফুল ফোটে চলছে। তাঁর ঠোঁট দু'খানি ছিল ঘুমে-ভরা পপি-ফুলের টুকটুকে পাপড়ির মত, ভায়োলেট-ফুলের চেয়ে কোমল— তেমনই সুগন্ধি। তাঁর মুখখানি দেখে বলে' মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আগুন-রাঙা ক্রোকাস-ফুল। তাঁরই জন্যে দীর্ঘশ্বাস নার্সিসাস হিয়াসিন্থ বারিবিন্দু ঝরে' রেখেছে তাঁর সরু গোলাপীতে; তাঁরই সমস্ত পায়ার জন্যে ঐ মাটিতে এসে ফুটেছে অ্যানিমোনি-ফুল — সিসিলী-কবীরূপের প্রেম-নিবেদন তুচ্ছ করে'! ঐ ক্রোকাস, অ্যানিমোনি, নার্সিসাস —এদের কেউই তাঁর মত সুন্দর নয়।

এই যে — একজনের প্রাণে যা' হয়তো আর একজনের প্রাণেও পৌঁছে দেওয়া — এও কম

আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। কবিদের অনুভূতগুলো আমাদেরও অনুভূত করে তোলে। কেউ আপন মাথায় আপন সুরে গান গাইছে — সে গান শুনে আমাদেরও প্রাণে সেই ব্যথা জাগে। যে মরে' গেছে তারও সুখের কথা ফুরোয় না, কেননা মাটিতে মাটি হয়ে গেছে তার আনন্দ এখনও সাড়া জাগায় আমাদের প্রাণে। ভেবে দাও তোমার ঐ জীবনের কথা! আমাদের প্রাণমনের কতটুকু অভাব পূরণ করতে পারে সে? জীবনের সব কিছুই বাস্তবের ক্ষুদ্র সীমায় সীমাবদ্ধ; জীবনের যে ভাষা তা অভিনয় খাপছাড়া, তার কোন-কিছুতে ভাবের সঙ্গে রূপের সামঞ্জস্য নেই — যা' না থাকলে কোন ভাবুক বা রসিকের প্রাণ তৃপ্ত হতে পারে না।

আ — তা' হ'লে আর্ট ছাড়া আমাদের আর গতি নেই দেখছি।

শি — নয় ত কি! কারণ, আর্ট কোথাও ব্যথা দেয় না, আঘাত করে না। নাটকের অভিনয় দেখে আমাদের চোখ দিয়ে যে জল গড়ায়, তার সঙ্গে কোন ফলাফলের সম্পর্ক নেই; সেই রকম নিষ্ফল ভাবাবেগ সৃষ্টি করাই আর্টের কাজ। আর্টও আঘাতের কাঁদায় বটে, কিন্তু তাতে বুক ফাটে না; আমাদের শোক হয়—কিন্তু সে শোকে কোন যাতনা থাকে না। বাস্তব-জীবনে মানুষ যে শোক পায়—শিলোভা বলেছেন — তার ফলে চিত্তের মলিনতা ঘটে; কিন্তু কাব্য-নাটক প্রভৃতি কলা-শিল্পের যে ফলশ্রুতি — তাতে আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হয়, আমরা নির্মল হয়ে উঠি; এও সেই গ্রীক সমালোচকদেরই উক্তি। এক-মাত্র আর্টের সাধনা ক'রেই আমাদের সর্বাঙ্গ-সিদ্ধি হ'তে পারে; বাস্তব-জীবনের যতকিছু দুঃখ দুর্ঘটনা থেকে একমাত্র আর্টই আমাদের রক্ষা করতে পারে। জীবনের সুখ সেই প্রসূত করুক, তার দুঃখ হরণের ভার কল্পনা-বিকশিত করবার চেষ্টা করুক, আমাদের তাতে আর তখন কিছু এসে যায় না। আমরা সত্যিকার আনন্দ পাব সেই সব মানুষের কাহিনী থেকে — যারা কোনকালে পৃথিবীতে ছিল না; কেবল তাদেরই শোকে অশ্রুবর্ষণ করব — ফর্তেরিয়া কিম্বা দেস্দিমোনার মত যারা কোনকালে মরে না, মরবে না।

আ — একটু থামো। আমার মনে হচ্ছে, তোমার এসব কথার মূলে কোন নীতি-কর্ম নেই।

শি — নাই বা। কারণ, আর্টের দ্বারা যে-সব ভাবের উদ্রেক হয় তাতে আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না—ঐ ভাবগুলোই যথেষ্ট। আর, বাস্তব জীবনে—তা' সে ব্যক্তির জীবনই হোক, আর সমাজ-জীবনই হোক — সকল ভাবাবেগের একটা উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন আছে—সে হচ্ছে কোন একটা কর্মে প্রবৃত্ত করা। সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ নীতি-কর্মের জন্ম হয়েছে; কারণ, মানুষের শক্তিকে সংহত করবার জন্যই সমাজ; সেই সমাজকে সুস্থ ও সবল করতে হ'লে সমাজের সকলের হিতার্থে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে যে কিছু-না-কিছু কর্ম দাবী করা হয়, তা' খুবই ন্যায়সঙ্গত। কর্ম তাই চাইই; এমন কি, দুঃখবাদেও সে কথা বলতে পারে, কিন্তু নিষ্কর্মার কথা নেই। অভিপ্রায়টা খুবই সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু এখের একটা কথা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, সে হচ্ছে এই যে, যারা ভাবুক বা ধ্যানী, অর্থাৎ কোন কর্ম করে না, সমাজনীতির দিক দিয়ে তারাই সবচেয়ে অপরাধী হলেও—শ্রেয় সাধনার দিক দিয়ে, ঐ ধ্যান-চিন্তা ও কল্পনাই যদি

একমাত্র চুরি না করলেই শোভা পায়।

আ — ধ্যান-চিন্তা!

বি — হাঁ, ধ্যান-চিন্তা। কিন্তু আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, কোন কর্ম করার চেয়ে তার সম্বন্ধে কিছু বলা ঢের বেশি শক্ত। এখন আরও বলি যে, কিছু-না-করাই সবচেয়ে চালাকি এবং অতি গভীর জ্ঞানলক্ষণ। যে প্লেটোর জ্ঞানপিপাসা প্রবল ছিল, তিনিও বলেছেন, ঐ ধ্যান করার শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি। আবার বিজ্ঞানের এতবড় ভক্ত ছিলেন যে আরিষ্টটল তাঁরও ঐ এক মত। মধ্যযুগের যোগী-সন্ন্যাসীরাও নিছাম জীবন যাপন করতে যে এত উৎসুক ছিলেন তা'ও ঐ শক্তি অর্জন করবার জন্যে।

আ — তা' হলে কিছু-না-করার জন্যেই আমরা বেঁচে আছি!

বি — যে-জন দুখলাগে হলে' ক্রিয়ইটির সব-কিছুর পানে চেয়ে থাকে, তার-মত হ'য়ে যে নির্জনে পালোচনা করে, তার দৃষ্টি যেমন অন্ধ তেমনই অন্ধকার। কিন্তু আমরা যারা সেই চমৎকার মুখ পায় হয়ে যাবার পর জন্মেছি—আমাদের মন এর বেশি সজাগ, আমাদের বিশ্লেষবুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ, অতি-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সুখের জন্য আমরা এত উৎসুক যে, জীবনকে ভোগ না করে' তার সম্বন্ধে বড় বড় তত্ত্বের ধ্যান করতে আমরা মোটেই রাজি নই। অধ্যাত্ম-বিদ্যা আমাদের ধাতে সয় না, তত্ত্বের জন্য সমাধিও নিতান্ত লেকেলে হয়ে পড়েছে। তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা যে-জগতের বাস তলে বলে' তাঁরা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠেন, সেটা আসলে জ্ঞানসৌন্দর্যের জগৎ নয়—স্বপ্নচিন্তার জগৎ। সে জগতে একেল কল্পনা-পক্ষিরা সেই অতি নীরস তাপহীন বায়ু সেবন করে' আমাদের একেবারে উপযোগী হয়ে থাকতে হবে। না, আমেরি, সে আমরা পারব না, আমরা ফিরে আবার সাধু সন্ন্যাসী হয়ে পারব না; বরং যারা পাপ করে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবার ইচ্ছে আছে। যারা রূপ-রসিক, তাদের কাছে ঐ সব অস্পষ্ট ধোঁয়া-ধোঁয়া ত্রিমিত অভিনয় অকচিকর। খ্রীকরা যে এমন একটা রূপ-রসিক শিল্পীর জাত ছিল, তার কারণ, অন্য অতীত বা সুদূর অনুভূতি থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিল। আরিষ্টটলের মত—কিংবা কাণ্ট-হর্সন পড়ার পর থেকে আমরাও রূপ চাই, দেহ চাই; তা'ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের পিপাসা মিটবে না।

আ — তা' হলে, তোমার মতটা এখন কি দাঁড়াল?

বি — আমার মনে হয়, এই রকম সূক্ষ্ম জ্ঞান-দৃষ্টি ও বাস্তবের তত্ত্বই আমরা শুধু নিজেদের জীবন নয়—সমস্ত জাতির জীবনটাই আমাদের চেতনার বিষয় করে' নিতে পারব; সেই হবে সত্যিকার আধুনিকতা—আমাদের চিত্তবৃত্তি সর্বাংশে আধুনিক হয়ে উঠবে। নিজের সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে হ'লে আর সকলকেও তেমনি করে' জানতে হবে। এমন কোন ওষাপত্তা নেই, আমার পক্ষেও যা' সম্ভব হবে না; জীবনকে ভোগ করার এমন কোন প্রাচীন রীতি নেই যাকে আমরা পুনর্জীবিত করতে না পারব। সে কি অসম্ভব? আমার বিশ্বাস, অসম্ভব নয়। জীবনকে ঐ কর্মনীতির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারলে, আমাদের ধ্যান করবার, কল্পনা করবার শক্তি বেড়ে যাবে। এর পক্ষে একটা বড় দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি আধুনিক বিজ্ঞানের "ম্যাক্সওয়েল" ঐ তত্ত্বটি থেকে; তাতে দেখা

যাচ্ছে, আমরা যা কিছু করি, তাতে আমাদের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব কিছু নেই—সেই হলো-হুল্লোড়ের যে নিয়তি, তারই বলে সকল কর্মই আমরা বরবাদ করে' থাকি। ঐ বিজ্ঞান বলে' দিচ্ছে যে, আমরা যখন কিছু করি, তখনই আমরা সবচেয়ে বড়। ঐ তথাই আমাদের চোখে সেই বন্ধন-রজ্জুটা ধরিয়ে দিয়েছে যা' শিকারীর পাতা ফাঁদের মত আমাদের চারদিক আষ্টেপৃষ্ঠে করে' ফেলেছে; আমাদের শেষ-পরিণাম যে কি, তাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে।

তবু বাইরের জগতে কর্মের স্বাধীনতা, অর্থাৎ মনোমত জীবন যাপনের অধিকার হরণ করলেও, ঐ নিয়তি আমাদের একটা বড় উপকারও করেছে। আমরা যখন মনোজগতে বাস করি, তখন আমাদের সেই অন্তরাত্মার সুমুখে তার জগৎ মূর্ত্তিটা এসে ধরা দেয় বটে, কিন্তু অনেক অমূল্য জিনিষও এসে যায় আমাদের হাতে। যেহেতু আমাদের এই জীবন একার জীবন নয়, বহু মৃত-পুরুষের জীবন-ধারা তার জলে স্থলে প্রবাহিত হচ্ছে; যেহেতু আমাদের এই অন্তর-পুরুষটা এক-পুরুষ নয়—বহু-পুরুষ, এবং সেই বহু-পুরুষ কত অজানা স্থানে বিচরণ করেছে, অতীতের কত কবরখানায় ছিল তার আস্তানা—সেই জন্যে, আমাদের মনের অন্ধে কত মানুষের কত স্মৃতি ভিড় করছে এসে, কত জীবনের কত পাপ আমাদের দৃষ্টির অন্তরে মূর্ত্তিত হয়ে রয়েছে। আমরা সজ্ঞানে যতটুকু জানি, অজ্ঞানে তার চেয়ে বেশি জানি; সেই জ্ঞান বিস্ময়। সেই যে আমাদের 'কিম্বদন্তীর আর একটা আমি, সেই 'বহু-আমি'—সে আমাদের প্রাণে কত দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে, যা কখনো পারো না জানি তাই দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তবুও সে আমাদের একটা মহা উপকার করতে পারে, জানো,—এই একঘেয়ে অতি-পরিচিত বাস্তবের বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাই বলি, আমরা আমাদের এজমের একঘেয়ে থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারি, কত অতীত যুগের অ-দেখা জগতে ফিরে যেতে পারি—সে যুগ, সে জগৎ আমাদের অপরিচিত বলে' মনে হবে না। তাই বলছি, আমরা এ-জীবনের এই ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে' বহুতর জীবনের মহিমা লাভ করতে পারি। কবি সেওয়ার্ড যে বেদনায় অধীর হ'য়ে সারা জীবন আর্ত্তনাদ করেছিলেন, সেই মহা-বেদনা আমাদের মুখেও তেমনি ফেনে ওঠে; মিওক্লিটাস তাঁর বীথিতে যে নিজেন, তাই শুনে মার্ত্তের রাখালদের সঙ্গে, ভেনের বনদেবীদের সঙ্গে, আমরাও প্রাণের আনন্দে কলহাস্য করে' উঠি; আমরাও ভ্যালেন্টাইন মত আপাদ-মস্তক গোলাপে প'রে প্রেয়সীর রাজবাহিনীর বিলাস-কক্ষ থেকে বিদায় হই; সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করে' আমরাও, আসেসাসের মত, মরিবাসে মুখ ঢেকে গোপনে দুরন্তের প্রেম-নিবেদন করি; আমরা কবি, 'ভীয়োঁ'র (Villon) মত, সন্ত কোন পাপ-কর্ম করে' এসে সেই পাপকে গানের সুরে মধুর করে' তুলতে পারি; আমরাও কবি কোলীর চোখ দিয়ে উষার অকলুষ রূপমাধুরী পান করি, আবার, যখন এডিমিয়নের সঙ্গে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করি, তখন আকাশের ঐ জ্যোৎস্না-রূপসী আমাদেরই যৌবন-লাবণ্য দেখে লালসাতুর হয়ে ওঠে। তুমি কি মনে কর, এই যে অসংখ্য জীবনের হর্ষ-বিষাদ আমরা

কোন চরিত্র কেমন করিয়া কোন্ পরিবেশে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বলিতে পারিলে, কল্পনাই বটে; কিন্তু সে-কল্পনা ঐ বাস্তবানুগত্য হইতেই, অন্যের — কল্পজগৎবাসী শ্রোতার জীবনের বহু-কিছু ঘটনা ঐ কল্পনার আকারে স্বীকৃত হইয়া উঠিবে।

(ক্রমশঃ)

সভ্যতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৫)

সভ্যতা-সৃষ্টির উপায়

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সভ্যতার জীবন যাপন করিতে হইলে, অর্থাৎ অতিরিক্তভাবে এবং সুস্থ মানসিক সুখ উপভোগ করিতে হইলে, দুইটি বস্তুর প্রয়োজন — প্রথম, প্রাণধারণের সহায়ক স্বাধীনতা; দ্বিতীয়, সুপ্রচুর অবসর। আবার, স্বাধীনতাও চাই, অর্থাৎ নিজে কেমন জীবন যাপন করিব তাহা নিজেই স্থির করিবার অধিকার, — অন্যের মতিগতি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার, এবং মনের ভাব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐরূপ নিশ্চিন্ত জীবিকা, অবসর, এবং স্বাধীনতা প্রভৃতির জন্য অর্থও চাই; যে-পরিশ্রমের দ্বারা পণ্য উৎপাদন করা যায় কেবল তাহাই অর্থোপার্জনের সহায়। এইরূপ যত অর্থকরী শ্রম-কর্ম আছে তাহা মনের সেই প্রজ্ঞাবান-শক্তির প্রতিকূল; কারণ, তাহাতে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়। অন্নকোষ কিংবা কেন্দ্রিক হইতে উদর-পূর্তি ও রস-পিপাসা অর্জন করার পর, ভদ্র লোক যাহাকিছুর, যাবতীয় বা যাবৎ-কর্মচারী হইয়া, এবং সেই সেই কর্মে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেষ্টায় আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া, শেষে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, তোমরূপ উচ্চাঙ্গের সুখভোগ করিবার সামর্থ্য আর নাই; একটু জটিল পূর্তি, আবেগময় বন্ধুত্ব, জমজমির উপন্যাস, অত্যাধিক মিষ্টান্ন ছবি, তমর্থ সঙ্গীত, সিনেমা, পলক্, আজ্ঞার গল্প, নানারূপ আসব প্রভৃতি প্রসাধনের উপায় — এই সকলের সুখই তাহাদের পক্ষে সুখ বলিয়া মনে হয়।

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাদিগকে কখনো অর্থ উপার্জন করিতে হয় নাই তাহারাই অর্থ ব্যয় করিতে জানে, তাহারাই বুঝিতে পারে অর্থের সার্থকতা কি? যে-বস্তু আমরা ভাবনা করি তাহার মূল্যনিরূপণেই ও' অর্থের গৌরব। অর্থের ঐরূপ ব্যবহার কেবল তাহাদেরই পক্ষে সম্ভব — যে মনে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাহাকে কাহারও বন্দনা বা মনস্তুষ্টি করিতে হয় না, এবং সেইজন্য তোমরূপ কুণ্ঠতা

বাহির চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা এইরূপ স্বাধীন চলাফেরাই বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, ও কঠিন সত্যও লাভ করিতে পারে। যাহারা সমাজতন্ত্রবাদী তাহারা যদি কাজ করিয়া পূরা-বেতন না পায় তবে অন্তত তাহারা আমাদের এই প্রশ্নের সহজ উত্তর দিতে চাহিবে না, — প্রশ্নটা এই যে, মনের স্বাধীনতা সকলের সমান হইলেই কি মানুষের দ্রোহ দুঃখলাভ হইবে? এ প্রশ্নের মন-খোলা উত্তর তাহারাও দিতে পারিবে না। উহাও সত্য যে, সমাজতন্ত্রবাদের মূল তত্ত্বটা একজন অবসরভোগী ভাবুক মানুষের মাথা হইতেই বাহির হইয়াছিল; সেই তত্ত্বকে ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রতিভাও ঐ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সম্ভব হইয়াছে।

আসল কথা, যদি কোন সমাজ সভ্যতার অধিকারী হইতে চায় তবে তাহাকে উহার খরচও যোগাইতে হইবে। মূল ও মূলিবাসিটি, মিউজিয়ম ও চিত্রশালা প্রভৃতির যে ব্যবস্থায় যখন করিতে হয়, এইরূপ একটা অবসরজীবী সম্প্রদায়কে পালন করিবার জন্যও ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। ইহার জন্য সমাজে শ্রেণীভেদ থাকিবেই, ঐরূপ দাসত্বহীনতাই সমাজের পক্ষে দ্রোহকর। মানুষের জীবনযাপন বা চিন্তা-জীবনের দায়ভার, তাহার ধন-গ্রহণ — আপন প্রকৃতির মতই অধিকার করিবার শক্তি অল্পলোকেরই আছে; সে শক্তি জন্মগত প্রতিভার মত। এইরূপ প্রতিভা যদি সবলে লালিত না হয়, যদি জড়তা ও কর্কশতা হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা না হয়, তবে যেমন প্রতিভাও বিকৃত হইয়া পড়ে; অতএব প্রত্যেক সমাজে একটা অপরিশ্রমী অবসরভোগী নর-নারীর দল থাকা অত্যাবশ্যক। সমাজের বাকি অধিকাংশ জনগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, উচ্চভাব ও উচ্চচিন্তার জগৎও একটা আছে, সে জগৎ মিথ্যা নয়। সেই জগতে পৌঁছিবার পথ সকলে নির্দেশ করিতে পারে না। সভ্যতার আকরস্বরূপ এই যে নর-নারীর ক্ষুদ্র মণ্ডলটি, ইহারা কিন্তু সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কোন চেষ্টা করে না — ভূরিশিষ্টি করে না, কেবল নিজেদের জীবনে তাহারা সেই পথটি ধরিয়া চলে; এবং তাহার দ্বারাই সকলের সম্মুখে শ্রেয়ের আদর্শ তুলিয়া ধরে। তাহাদের সেই আদর্শটুকু হইতেই সকলে দেখিতে পায়, ঐ অল্প কয়েকজন এমন একটা কিছু সত্যই পাইয়াছে যাহা পরম সুখপ্রদ; হয় তো সত্য সত্যই এমন সকল ভোগ্যবস্তুও আছে যাহাদের তুলনায় তাহাদের সুখগুলা নিছক। তখন তাহারা চিন্তা করিতে সুরু করে — সত্যই কি ঘোড়দৌড়, বক্সিং, ফুটবল, সিনেমা ও হাইহিল জুতো-চটা ও আই. এস. সি. এবং আরও-আরও সুন্দরতর সহস্রবিধ আনন্দ অধিকতর শ্রেয়? এমনি করিয়া মানুষের মন জাগে, এখানে ওখানে দুই চারিটা বর্বর কৌতূহলী হইয়া উঠে। হয়তো, এখন ফুল-হাতের এক প্রৌঢ়-সভ্যতার অন্তরপ্রান্তের অধিবাসীর মধ্যে নূতন-কাটা বাসের দুর্গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসে তখন তাহারই সঙ্গে সেই বর্বরের মনে সভ্যতার সৌরভ সঞ্চারিত হয়। মন্বন্তরোত্তরের কিতত্ত্ব দিয়া সে সহস্র-বার বাতায়ন রুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু একদিন সহসা ধরিয়া ফেলে যে, উহার অন্তরাল কোথায়টার দিকে সে চাহিয়া চাহিয়া আছে; তাহাতে সে ঔৎসুক্য ও বিস্ময় বোধ করে। আর একদিন সে হয়তো বুঝিতে পারে যে, কোন বিশপ বা ম্যাজিস্ট্রেট যে বিষয়টাকে অশ্লীল ও অসভ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আসলে তাহা তেমন কিছু নয়। সেই বর্বরই একদিন বোকাচিও (Boccaccio) গল্প পড়িতে পড়িতে মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীদের চরিত্র-স্খলন না হাসিয়া পারিবে না এবং নিজেকে সেইরূপ হাসিতে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিবে।

কেবল ঐরূপ কর্মপ্রাণমুক্ত অবসরভোগী ব্যক্তিরাই যে উৎকৃষ্ট সভ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে, উহার পক্ষে অকাট্য যুক্তিও যেমন আছে, তেমনই ইতিহাসের

হইবার আছে। আমাদের মনীষীরা যদি সংখ্যা অধিক্য করা ছিল তবে সমাজের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের তেমন বিরোধ নাই। সমাজতন্ত্র যদি প্রয়োজনীয় হয় তবে সমাজেরই থাকিবে, ঐরূপ উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য এক শ্রেণীর নিষ্কর্মা মনীষীর সমাজের বহন করা অসম্ভব নয় — এমন কথা ও ইতিপূর্বে বলা হইয়া গিয়াছে। এক কথা হইতে পারে যে, কাহাদের মধ্য হইতে ঐরূপ পুরুষ বা নারী নির্বাচন করা হইবে। সর্বসাধারণ উত্তরাধিকার-সূত্রে যাহা ঐ কাজ পাইয়া থাকে এমন অধিবেচনার কাজ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। এরূপ বিধান করিবার কোন কারণ নাই যে, কেবল যদি পিতা-মাতার সন্তানেরাই বুদ্ধি ও সদ্বৃত্তিতে অন্য সকলকে ছাড়াইয়া যাইবে। আধুনিক ইংলণ্ডে অনেকগুলি নিষ্কর্মা বংশ এইরূপ দুর্বিপাকের কবলিত দেখা গিয়াছে, যদিও তেমনটি অন্যত্র তেমন সাধারণ সত্য-প্রকৃতির নয় বলিয়া মনে হয়। সাধারণ সন্তানের চরিত্রে যে দোষ-গুণগুলি দেখিয়া পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশ ঐরূপ পাওয়া অধিকার অসম্ভব। অধিকন্তু, যে-সকল ছোট-ছোট বিষয় লইয়া সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হয়, ঐরূপ মানুষের অন্তরে তাহাদের স্থান থাকে না; ঐরূপ মানুষ তাহাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখে না। তাহাদের মনে হয় যে, ঐরূপ বিষয় লইয়া মাথা ঘামানো তাহাদের অবমাননা। তাহারা আর কিছুই নয় — কেবল কতিপয় ভাব-বাতিকগ্রস্তের উপাধি-ভূষিত সর্বদা দীর্ঘ তালিকা মাত্র, ইহাদের ছবির আরও সাধারণ পংক্তিগুলির ভোজ-তৃপ্তি হয়।

যে-গুলি খাঁটি ঐরূপ নিষ্কর্মা-শ্রেণীভুক্ত হইবে তাহাদের দ্বারাই যে সমাজের অপ্রকৃত বা সমাজের অন্তরায়-স্বরূপ হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইহাদের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না, কেবল একটা কথা মনে রাখিতে হইবে — সমাজে এমন এক শ্রেণীর নিষ্কর্মা মানুষকে সর্বদাই থাকা চাই যাহাদের নিকটে কোন নূতন উদ্ভাবন প্রত্যাশা করা হইবে না। তাহারা কেন থাকিবে তাহার জবাবদিহিও তাহাদের করিতে হইবে না। কারণ, এমন দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল ব্যক্তি জগতের মহা-উপকার সাধন করিয়াছেন তাঁহারা সমসাময়িক সমাজের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিলেন; যে-যুগে তাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন সে যুগে কেহ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করে নাই; তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবারও কেহ চিন্তাযুক্ত নিষ্কর্মা মনীষীদের কেহ; তাঁহারাও সেই শ্রেণীর মানুষ বলিয়াই গণ্য হইতেন। অতএব এমন একটি শ্রেণী গঠন করিয়া তুলিতে হইবে যাহাদিগের নিকটে আমরা কিছুই প্রত্যাশা করিব না; অথচ তাহাদের মধ্য হইতে যেরূপ নরনারীর অভ্যুদয় হইবে যাহারা সমাজকে সর্বাধিক দানের দ্বারা ঋণী করিবে।

কেহ যেন এমন ভুল না করেন যে, যে সব মানুষের পাল মোটা মোটা দুবলা বা আর কোন কাজে তাহারাই বুঝি অবসরপ্রাপ্ত পরিশ্রম-যুক্ত সম্প্রদায় — সে-সম্বন্ধে আগে আমি বলিয়াছি। যে সকল লোক কোন বুদ্ধি বা সাহসের দ্বারা মহত্বের উচ্চের পানে উপনীত হয়, তাহারাও দুটে-বহুর অপেক্ষা উচ্চ স্তরের মানুষ নয়, কেবল তাহাদের মস্তিষ্কটাই অতিরিক্ত। অবশ্য, বাহিরের স্বরূপ দুই দশ জন থাকিতে পারে, কিন্তু উহাদের ঐ জীবিকা এমনই যে, প্রমজীবীদের মতই উহারা সজ্ঞানলাভে অসমর্থ। যদি অবশ্য উহাদের কেহ 'জন-আরাধনার আপ্রেন' বা 'বিরাট তুলিধারিণীর অধিপতি' হন, তখন সেই প্রভুদের অবস্থা দাসদিগের অপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠে। কারণ, ঐরূপ পদবীতে আরোহণ করিলেই — ছোট-বড় সকলের — এক প্রকার প্রভুত্বপিপাসা জাগে; তাহারা ঐরূপ সিদ্ধিলাভেই সর্বাপেক্ষা বড় মনে করে, এবং যাহার দ্বারা ঐ সিদ্ধিলাভ হয় তাহাকেই শ্রেষ্ঠকর্ম বলিয়া জ্ঞান করে। তাহারা নিজেরা যাবার হাত দেয় তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু তাহাদের চক্ষে অসত্য

আর কিছু নাই। এজন্য তাহাদের মনও বেশির ভাগ কেত্রেই তাহাদের অবস্থানুযায়ী ছোটো হইয়া যায়।

আধুনিক পোলিটিক্যাল বুদ্ধি যে কিরূপ পঙ্গু তাহার একটা চমৎকার নমুনা এই যে, অর্জিত ও অনর্জিত ধনের উপরে টাক্সের পরিমাণ সমান নয় বটে, কিন্তু তাহা সম্ভব করা হইয়াছে প্রয়োজনাধিক অংশের পক্ষে। যে ব্যক্তি ধন উপার্জন করে সে সমাজের আরও অধিক উপার্জনের জন্যই সেই অর্জিত ধন নিয়োজিত করে, এবং সে অর্থ সে যায় করে প্রত্যক্ষ বৃদ্ধির জন্য, সমাজে প্রতিযোগিতা-সাধনের জন্য, গাধন, সুখভোগ বা অর্থব্যয়ের আয়োজন-প্রয়োজনের জন্য। অপর পক্ষে, যাহারা পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করে না, সেই সকল ধনীগৃহে যাহারা এমন অবসর-ভোগী মানুষ পাওয়া যাইবে যাহারা সন্তানের শ্রেয়োলাভের জন্যই অর্থব্যয় করে। যে-মানুষকে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হয় সে অভিজ্ঞতায় শুষ্ক-কঠিন স্বাধীন, অনুদার হইয়া উঠে, তাহার মন রুদ্ধ হইয়া যায়; সে তাহার সেই অর্জিত ধন রক্ষা করিবার আগ্রহে প্রায় হিংস্র হইয়া উঠে, এবং হিসে সেই ধন আরও বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টাই করে। ঐ ধনীদিগের জীবনা হইতে মুক্ত জ্ঞানবিহারীর দল, উহাদের দয়া হইতেই স্বাধীনতার সাধী, সমাজ-বিপ্লব, ব্যক্তির অধিকারবাদ ও নৈরাজ্যনীতি প্রভৃতির প্রচারক দেখা দিয়াছে — এইগুলিই আধুনিক চিন্তাধারার প্রধান সম্বল।

এক বিদ্যার প্রবন্ধে ধনীর রেনা (Renan) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দীনতা ও বিচারবুদ্ধি সহকারে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ঐরূপ অবসরভোগী ধনী যাহারা তাঁহাদের বর্গ হইতে — সর্বপ্রকার দুঃখ-দৈন্যের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, মনুষ্য-জীবনের উৎকর্ষসূচক যাহা-কিছু তাহারই রক্ষণে বহুবান হওয়া; প্রয়োজনের বড় অপেক্ষা সুন্দর বড়ো আদর করা; যাহা-কিছু অতি গুরুভার ও উপকারের সেইগুলির ঘাড়ে ভার চাপানো। ধনোপার্জনের দায় হইতে যাহারা মুক্ত তাহারাই প্রকৃত স্বাধীনতার হইতে পারে। ঐরূপ হইতে পারাই যে সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ অঙ্গ, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। এ পর্যন্ত তাঁহার সহিত আমিও একমত; কিন্তু মনে হয়, এইটা বিষয়ে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়, কারণ, যদিও তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই, তবু তাঁহার অভিপ্রায় যেন এইরূপ যে, ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগণই রাজশাসনের উপযুক্ত ও অধিকারী। আমি উহাতে আদৌ সম্মত হইতে পারি না, বরং ঠিক উল্টা কথাই বলি। যাহারা কোন প্রত্যক্ষ-কর্ম নিজে সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহাদের হাতে ঐশ্বর্যের প্রকৃত-কার্য অনুভব যাহারা কোন কর্ম করে না বলিয়া ঐ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে তাহারাই যদি অপব্যয়-কর্ম করে, তবে মূল কথাটাই অর্থহীন হইয়া পড়ে। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যাহারা সভ্যতার নির্দেশকারী, রাজশাসন ব্যাপারে তাহাদের কোন দায়িত্ব না থাকাই উচিত; তবেই, আমরা জানি, বর্তমানের অভিশপ্ত মানুষের উচ্ছল খেয়ালটি নষ্ট করিয়া দেয়। তাহা হইলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই — কোন্ প্রকার শাসনতন্ত্র সভ্যতা-সৃষ্টির পথে সর্বাপেক্ষা হিতকর? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেও হয়।

যে-কোন শাসনতন্ত্র সভ্যতা-সৃষ্টির অনুকূল হইতে পারে, যদি তাহার অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক বালক-বালিকাকে শৈশবাবধি শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হয় — যাহার ফলে উৎকৃষ্ট শিক্ষা বুঝি বা অর্থবলে মানুষ উপার্জন করিতে পারে না। তারপর, সেই শিক্ষিত কৃতিত্ব উপযোগী যতকিছু জ্ঞেয়বস্তু তাহাদিগকে আবজীবন অধ্যয়ন করিতে হইবে, এবং প্রতিদানে তাহাদের নিকট হইতে কিছুই দাবী করা হইবে না। ইহার জন্য কি পরিমাণ অর্থ আবশ্যক, এবং কেমন

করিয়া তাহা ঠাটিয়া দিতে হইবে, সেই গবর্মেণ্টকে তাহাদের হিসাব ঠাক করিয়া বুঝিয়ে হইবে। সেইরূপ সভ্য-জীবনের জন্য প্রত্যেক নারী বা পুরুষের ঠিক কত টাকা আবশ্যক তাহা বলা কঠিন, কারণ সকল দেশে জীবনযাত্রা একরূপ নহে। আমার বোধ হয়, বর্তমান অবস্থায় বার্ষিক সাতশত বা আটশত পাউণ্ডের কমে কাহারও চলে না; অবশ্য পুরুষদের তার চেয়ে কিছু বেশি করিবে।

কিন্তু ইহা ত কেবল একটা পরিমাণ মাত্র, ইহার দ্বারা ঐ প্রশ্নের একটা কাজ-চালানি উত্তরও দেওয়া হইল কোন্ প্রকার স্ত্রী সভ্যতা-সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে বিঘ্নকর, তাহার একটা সমীচীন জবাব দিবার পূর্বে আর একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, সে প্রশ্ন মনুষ্য-চরিত্রের সম্পর্কে। মানুষ যেরূপ লজ্জিত ও ঈর্ষাপরায়ণ তাহাতে এমন আশা কি করা যায় যে, সে তাহার স্বৈরিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া, আত্মার উন্নতির জন্য, এমন এক শ্রেণীর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে যাহার ফলাফল নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। অথবা তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ-দুর্বিপাক ভোগ করিবার অধিকারী? — ভোগ না তাহারা সভ্যতম, তাহাতে অপরের কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার আমি সোসিউলিস্ট ও পুলিসকোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের উপরে সানন্দে ছাড়িয়া দিলাম; তাঁহারাই বলিতে পারেন, মানুষের চরিত্রে কি সম্ভব, আর কি সম্ভব নয়। আমি কেবল ইহাই বলিতে পারি, যে, যতদিন না সাধারণ মানুষ এরূপ দুর্বিসহকর উদারতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় ততদিন পবিত্রতা ও সভ্যতা এই দুই বস্তু একত্রে সম্ভব হইবে না।

পৃথিবীতে পূর্বে কখনো গণতান্ত্রিক সমাজসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ইহাও সত্য যে, বিংশশতাব্দীর পূর্বে কোথাও গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয় নাই। গ্রীস বা ইতালিতে যে তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতেও মুষ্টি অধিকারসম্পন্ন একটা ক্ষুদ্র সমাজই শাসনকার্য করিত। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে, যখন আমি এই প্রবন্ধের একটা খসড়া প্রস্তুত করি, তখনই যদি ইহার রচনায় শেষ করিতাম তবে ইহাই লিখিতাম যে, গণতন্ত্র কিম্বা আর কোন রাষ্ট্রের সম্পর্কে সভ্যতা-সৃষ্টির আলোচনা একরূপ তত্ত্বালোচনা মাত্র — একটা মানসিক ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই মুদ্ধ সব উল্টাইয়া দিয়াছে; ইহার দ্বারা যে একটি নূতন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহাতে একালের সকলেই চমকিত হইয়াছে তাহা এই যে, অন্ততঃ আগামী পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সর্ববিধ ঢাইলাসন-কার্যে — সমর-বিভাগের বাহিরেই প্রভুত্ব করিবে; ইহা শুধুই সম্ভব নয়, প্রায় নিশ্চিত। এই মুদ্ধই আমাদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, চিরদিন যেমন আজিও তেমনই, শক্তির প্রকৃত অধিকারী আর কেহ নহে। জনসাধারণের ইচ্ছায় বা আদেশে কিছুই হইবার নয়; কয়েকজন নেতৃস্থানীয় উর্ধতন ব্যক্তির আজ্ঞাকারী, অস্ত্রশস্ত্রে সমাক সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খলিত একদল মানুষই সর্ববিধ আদেশ বা ইচ্ছাকে কার্যকরী করিতে পারে। এখন বহুলোক বুঝিতে পারিয়াছে যে, যদি কেহ আপন ইচ্ছা — সমস্তটাই — অপরের উপরে প্রয়োগ করিতে চায়, তবে সেই অপরকে উত্তমরূপে মুড়াইয়া দিতে হইবে — বিনা বাক্যে উহা পালন না করিলে, হয় মৃত্যু নয় জীবন্ত অবস্থায় কারাগার। এই মুদ্ধই মানুষকে একটি জ্ঞান দান করিয়াছে — রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা চিরদিন জানিতেন,—সে জ্ঞান এই যে, সকল যুক্তির শেষ যুক্তি — ঐ জাতিপ্রেরণ ও বলপ্রয়োগ। যাহাদের বল সর্বাপেক্ষা বেশী, এবং যাহারা আর সকলকে সন্ত্রস্ত করিতে পারে, তাহারাই শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবে।

এবার সামরিক কার্যে যোগ দেওয়াইবার জন্য যে বাধ্যতামূলক আইন করা হইয়াছিল তদ্দ্বারা শত

সহজ মানুষকে, তাহাদের ঘর-সংসার, বৃদ্ধি ও ধারণার হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতে আমরা দেখিয়াছি। যে কারণে তাহারা অন্যের সহিত দল করে তাহাই করিতে যারা হইয়া প্রায় সকলে অকালে চুপ্সে মরণ করিয়াছে। তাহারা যে সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিল, সেও ঠিক হত্যাশালার হস্ত পশুপালের মত। একদে যে কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক লোককে লাগাইয়া রাখিতে হয়, বিচারের জন্য কোর্ট-মার্শালের মত আইন করিতে হয় — সেই বিচার ও দণ্ডদানের পদ্ধতি এমনই যে, তাহাতেই মানুষের বুক ভয়ে ধাঁপিয়া উঠে। এমন গবর্মেণ্ট মানুষকে দিয়া কি না করাইতে পারে? — রাশিয়া ও ইতালিতে, এবং অল্পও, কয়েকজন পুরুষ মাত্র এই ভয়টি আবিষ্কার করিয়াছেন।

বলশেভিজ-বাদের গুরু যাঁহারা তাঁহারাও এমন কথা বলিবেন না যে, উহাতে জনগণের সম্মতি বা অনুমোদন আছে; আর ফাসিষ্ট-নীতিও যে জন-প্রিয়, ইহা বিশ্বাস না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তথাপি রাশিয়া ও ইতালীতে কয়েকজন লুব্ধ ও দুরভিসন্ধি পুরুষ যেরূপ সাফল্যসহকারে তাহাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া অপর সকল দেশের স্বাধীন শাসকগণ ঈর্ষান্বিত হইবে, তাহারাও এ বিষয়ে ভাবিতে সুরু করিবে; উহাদের ঐ দৃষ্টান্ত কোন-না-কোন আকারে পৃথিবীর সর্বত্র অনুসৃত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আমার ত' মনে হয় না, তাহাতে শেষ পর্যন্ত সভ্যতার বিশেষ ক্ষতি হইবে।

কালক্রমে ঐ নূতন শাসন-নীতির, অথবা উহার নেতাদের ঐ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফল এমন দাঁড়াইতে পারে — পারেই বা কেন, ইতিমধ্যেই লোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটু নিশ্চিন্তভাবে, বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রাশিয়ার এই সাময়িক প্রভুত্বমূলক শাসন কোন নূতন পথে অগ্রসর হইবে না: ঐরূপ শাসনের পরিণাম পূর্বকালে যেমন হইয়াছে একালেও সেইরূপ হইবে। বিপ্লবের ফলে ক্রমশঃই উহার ফলকজাগুলির সমূহ পরিবর্তন ঘটিবে। যাহাকে রাজশাসন করিতে হইবে, তিনি যে ব্যক্তিই হউন — আগষ্টাস্ বা লেনিন, মুসোলিনি বা নেপোলিয়ন — তাঁহাকে চারিপাশে কতকগুলি সামরিক ও অসামরিক বিচক্ষণ ব্যক্তির দল গড়িয়া লইতে হইবে। উহারাও শক্তিমান, উহাদেরও কামনা বাসনা আছে। উহারা যে সব কামনা করিবে তাহা পূর্বেকার সেই নিয়ত বা নির্ধারিত সত্তা মানুষগুলার কামনা হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে: এবং যেহেতু সেই কামনা চরিতার্থ করিবার শক্তি তাহাদের থাকিবে, অতএব তাহারা তাহা না করিয়া ছাড়িবে না। তখন এক নূতন ধরণের বিলাসী সমাজ দেখা দিবে, এবং তাহাদের মধ্য হইতেই আবার সেই অবসরভোগী কতকগুলি বংশধারীর অভ্যুদয় হইবে, তাহারাই সভ্যতা সৃষ্টি করিবে।

ঐ প্রত্যাবর্তনের পথটা সম্ভবতঃ আরও ছোট করিয়া লইবার সুবিধা হইবে। যাহারা নগণ্য অবস্থা হইতে অতিশয় গণ্য হইয়া উঠে, তাহাদের একটা অন্ধত্ব প্রতি ক্ষেত্রে কিছু বেশি হইয়া থাকে—উহা জনগণের প্রভাব। একমাত্র সামরিক বিক্রম ছাড়া যে আর একটি উপায়ে আরও সুদক্ষতাবে সেই মোহিনী শক্তির অধিকারী হওয়া যায় — তাহা কালচার, বা কাব্য-কলা-শিল্পের প্রতি অনুরাগ-প্রদর্শন। এই জন্য, যাহারা অনায়াসপূর্বক রাজ্যাধিকার করে — সেই সকল অত্যাচারী প্রভুরা সর্বাগ্রে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, শিক্ষিত সমাজের উন্নতিবিধানে তৎপর হয়। এ বিষয়ে দুই নেপোলিয়নের কার্যা সকলের স্মরণ হইবে। জগতের বড় বড় সেনা-বিজেতা — সাইরস, আলেকজাণ্ডার, তৈমুর ও আকবর—সকলেরই একরূপ কালচার-প্রীতি ছিল — জ্ঞানী ও জ্ঞানীদের সহিত সমকক্ষতা প্রমাণ করিবার বাসনা ছিল। ইহাও সত্য

যে, এইরূপ সাহেবআনাদারী বৈদেশিকী বুদ্ধিদোষের রাজদণ্ড হইতেই অনেক সময়ে সমষ্টিতা, সম্ভাব ও ধর্মকর্মের ওজ আমাদের বিকৃতি হইয়াছে, ইহাতেই সভ্যতা-দুরভিমানী জাতী ও কুটীদের লক্ষণ ও প্রতিপালক চিহ্ন। এই জন্য আমি জানিতেছি, আমরি. এই প্রবন্ধের এক-এক খণ্ড আমি রাজিয়ার 'মনির'-পক্ষে, এবং সিবিয়র মুসোলিনি ও উইন্‌ষ্টন চার্চিল মহাশয়কে পাঠাইয়া দিব।

(ক্রমশঃ)

ধনবিদ্যাই সভ্যতার জননিত্রী। যদি বলি যে, ধনবিদ্যা সভ্যতাবৃদ্ধির বিঘ্ন জন্মায়, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত মনুষ্যধর্মের দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তটী বরং এক আদরণীয়, দ্বিতীয়টী স্বার্থপরতার এবং নীচ বলিয়া যায়। দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা আধ্যাত্মিক, ধনলিপ্সা সর্বসাধারণ; এজন্য অল্পলোকের কল্যাণসাধক। অতএব সুখস্বচ্ছন্দের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যত সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিবৃদ্ধ হইয়া আসিবে তত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, তত্সঙ্গে ভাষা-সাহিত্যাদির শ্রীবৃদ্ধি ও সামাজিক বিপ্লব উৎপন্ন হয়।

— বঙ্কিমচন্দ্র

ভূত

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

ঝাকড়ুর অসুখ হ'ল।

ওদের সর্দার কানোয়া মুরহরকে অনেকদিন ধ'রে বহুদা থেকে। সে এসে দুদিন অন্তরঅন্তর তিনদিনের পর তিনদিন গাঁজা টেনে কয়া ঘাটীর লোকদের জ্বরজ্বালার পর জ্বরজ্বালে আক্রান্ত করে তোলে। মুরহরটীর উপর যতক্ষণ না ভূতে আবার ভর করছে, ততক্ষণ তার ঘর-চাল আরম্ভ হবেনা। দুদিন থেকে সে ঘরে আছে।

মা'র মন খুশী হয়ে ওঠে; ভাবে যা ওদের মনে ভূত পালাক — কথাটা তাহ'লে সত্যি।

মুরহরটীর কালো কালো উঁচু পরনে মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি মনে উঠিলেন মুরহরী, আসলে তাকে মোকদ্দমার দালালী। মেয়ের অসুখের সৌজন্যে সৌজন্যটী চরমোৎকর্ষে পৌঁছাবার পূর্বেই কেসটা মেরে দেওয়া দরকার হয়ে পড়ল। মুরহরা আসার পর মোকদ্দমা উঠে এসেছে। এতবার এতখানা গাঁয়ের পাঁচটী মকেল হাতছাড়া হওয়ার মানে, চিরকালের জন্য সোটা গাঁয়েরনা হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কেন যা কোন ডাক্তিয়ের সাধ্যি নেই এ মোকদ্দমার আসামীদের বাঁচে। মাঝে থেকে ছুটির মেরে রামদেওয়াজ খুশী। নিন পনেরো থেকে চলছিল মেয়ের কিট্। আজ দুদিন থেকে আছে ঘুম। সারে নি ঠিকই। আবার হবে জানি। এবারই হবে কেসটা হয়; কানোয়া ওঝাটা ভলে ভলে গাঁজা আর টাকার শ্রাদ্ধ করছে কেবল।

যাক্, আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় না।

সেই রকমই সোঙানি; সেই রকমই হাত-পায়ের খিঁচুনি; চোখ কপালে উঠেছে; সারা শরীর শক্ত হয়ে; মেয়ের মনুষ্যের মত হয়ে গেছে; মুখ দিয়ে ফেনা বার হচ্ছে; মুখ বন্ধ করে দিলে হয়ত বার হবেনা; মেয়ে বীভৎস হয়ে গিয়েছে, দেখলে ভয় করে। ঝাকড়ুর পরনের কাপড় ছেঁড়ার দিকে তাকাতে পারেন না; এ কি সাজা দিচ্ছে ভগবান!

ঐ একরত্তি মেয়ে এত কষ্ট কি সহ্য করতে পারে! মেয়ের হাত চোখের তলে ঘুম ফুলে। বিনা পিসিমা টেনে হেঁচড়ে আরও অনেক মেয়েদের তুলেছেন। পাড়ার মোড়ল একটী লাঠী হাতে গুটী গুটী এসে দাঁড়িয়েছেন উঠানে।

কানোয়া যা সত্য তাড়াতাড়ি করতে হবে জানতে পারে, মুরহরটীর মাথায় ঢোকার জন্য। যে মাথায় পিসিমার স্নেহদৃষ্টি পড়ে,— তাহলে আর কিছু ঢুকবেনা এতে। তবু কানোয়া উঠানে গিয়ে চলাটা খানে পড়ে। না ভোরবেলা চলা; তাদের চেয়ে অনেক বেলা! তবু মুরহরকে দাঁড়িয়ে পিসিমাকে বলতে হয় "ঐ ঘরে গিয়ে কিছে কাপড়চোপড় বদলে এস, ঘরদোর যা। আসবার উপর দুদিনের যার কাপড় আছে।"

মুরহরের মা মরমে মরে যায়। উপর পরনের অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কানোয়া ওঝার ঝাকড়ুকে প্রাথমিক অনুষ্ঠানের আর শেষ নেই। সেদ্ধ ভাত এক টুকরো জলন্ত কয়লা মুরহরটীর কানের ছিদ্রের মুখে লাগিয়ে ধরা হয়। কানের মধ্যেই নাকি সেই ভূতটা ঢুকেছে। কয়লার ধোঁয়া আর চামড়া-পোড়া ধোঁয়া মিলে একটা অদ্ভুত গন্ধ বার হয়। মা জোর চোখ বোজেন। উপর

পারবে নিশ্চয়ই। সুরজকুমারীর চোখের পাতা একটু ভিজে ওঠে। এত বুড়ি সে হোলো চিরকাল ক'রে ওঠে! এখনই চোখের সে হাত দিয়ে কানের পাশকাটা চামড়াটার উপর থেকে রসুনের ছাই ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে! "ছেলে ঘরে থাকলো হাত দুখান; ছোটখো মেয়ে।" মা হামেসাই এই বলেন।

ওরা বলে, "কালকে তুমি পালাবে, আর সব ঠিক হয়ে যাবে। চাষেদীর ছেলের অভাব নাকি; সৌখীন মুসলমান তুমি। কালকে অরবেলার পুজো; আমাকে যেতে হবে মইষালী। এখান থেকে হোয়ো কোম। এখনি গিয়ে দাও আমার পাওনা দু' আড়া ধানে, পাঁঠাসিকে পয়সা, এক বুড়ি পান সুপুরী আর এক খান ধেড়ে সিঁদুর।"

কাহারীর হাত থালার ঈশ্বর পরমাণ লোক চটিয়েই যান।

"সাহবার জন্যেই পয়সা নিয়ে যাবে নাকি?"

"যা দিতে ইচ্ছে হয় দিওনা। মইষালী আজ আমার যেতেই হবে।"

পিসিমা বলেন, "ও ওদের অত বকিসনে। না দিলে কি কখনও কারোসিদ্ধি হয়?"

ননদাদার মা ফিসফিস করে বলে "এদের চটানো ভালো নয় বাপু।" কানোরা ওরা তার পাওনা নিয়ে চলে যাবার সময়, মা তাকে ভরসা দেবার জন্যে জানিয়ে গেল, আর ভলে' গেল মইষালীর পুজো সেরে হ'লে আবার আসতে। একগাল হেসে ওরা বলে' যায়—"নিশ্চয়ই আসব মা।"

"যতসব চাষা ছোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গিয়েছে"—মুখে বলেন বটে ঈশ্বর পরমাণ, কিন্তু মনে মনে ভাবেন, লোকটা সত্যিই ভণ্ড, না হ'লে ভুতটা যে মুসলমান সে কথা জানলো কি করে?

ভুতটা সত্যিই মুসলমান।

ছেলে ছিল সুরজকুমারী। সিঁথি ছেলে ছেলে বেড়াচ্ছিল। সুন্দর স্বাস্থ্য। এই এতখানি চোয়াড়। দেখে কে বলবে যে তার মাত্র ষোল বছর বয়স। আছুরে মেয়ে, মা বাপের এক মাত্তর মেয়ে; মা বাবা তাই যত পারেন বিয়ের দিন পিছোচ্ছিলেন।—যে ক'টা দিন কাছে রাখা যায়। বিয়ে হলেই তো চলে' যাবে শ্বশুরঘর করতে।

"আর ঐ মেয়ে আবার এমনই!"—পিসিমা সকাল সন্ধ্যা টিকটিক করেন। আইবুড়ো সিঁধি মেয়ে; নিরাত এ বাড়ী ও বাড়ী পাড়া বেড়ানো; এতদার বাড়ীর ঘর হ'লে আবার নিস্তার যেমন থাকে না তাঁর। সোমত্ত মেয়ে। তোদের ঘরে আমরা তিন ছেলের মা। বাপরে মরুকগে—বাপের মেয়ে তারা মা তাল ষোলে কহকগে যাক। তবে এটা নাই বেলা ভাল নয়। আজকালকার মুখই আলাদা। কে কার কথায় কান দেয়! আর মেয়ের মা বাবাই যদি না শুনলো, তবে আর মেয়েকে ব'কেই বা কি, ক'য়েই বা কি।"

ওরকমের কথা বাড়ি হলে মিষ্টি লাগে—এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন ঈশ্বর পরমাণ আর তাঁর স্ত্রী।

"কোজাগর পুজো"র (চিত্রগুপ্তের পুজো) দিনের কথা। বছরকার দিনে নিজের বাড়ীর পুজো, খাওয়া দাওয়া মাথায় থাকলো, মেয়ে নেমন্তন্ন তাঁর বন্ধু সম্পত্তিরামের বাড়ী নেবন্নর খেতে। বাহনেরাও মুন্সীর মেয়ে সম্পত্তিরা। মেয়ে মেয়ে তো মেয়ে রাত বটার সময় বাড়ী ফিরলেন।

সেই রাতেই আরম্ভ।

অর্দ্ধেক রাত্তিরে চিৎকার করে ওঠে সুরজকুমারী। আতঙ্কের আর্ত্তনাদের সঙ্গে প্রাণটাও বেরিয়ে গেল বুঝি তার। কি হ'ল! কি হ'ল! মা ধড়ফড়িয়ে ওঠেন। বাবা বারান্দার খাটিয়া থেকে নেমে, তাড়াতাড়িতে খড়ম খুঁজে পায় না। সাপ বাঁ চোর? ভয়ে ঠকঠকিয়ে কেঁপে মরেন পিসিমা। ওঘর থেকে এ ঘরে আসবার সময় হাতের শিলীপ পড়লো বুঝি!

বাড়ীতে গোলমাল পড়ে' যায়।

"কি হয়েছে ইন্দর? আপনার কি ঘুরিয়ার মা? ও সুরজ! সুরিয়া! অমন করে' কাতরাচ্ছিস কেন মা? কি হয়েছে বলবি তো! পেট কামড়াচ্ছে? মাথার কাপড় কি আট করে বেঁধেছে?"

সুরজকুঁয়রী তখন ঠেলা দিলেও সাড়া দেবেনা। সে অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে তখন পড়ে' রয়েছে। বিস্ফারিত চোখ; পলক পড়ছে না; আতঙ্কের ছায়া পড়েছে তাতে। তাকে দেখে যেন সে ভয় পেয়েছে। ভীত হেসে গিয়েছে তার।

মাথায় একটু জল দাও। জাঁতিটা আনো তো, দেখি দাঁত খোলা যায় কিনা। জোর পাখা কর; আরে পারে না, মাথায় কাছে।—ইন্দর পরমানন্দের বিছানাহীন জায়গায় তাঁর চোখে-হাসি-পড়া বোন নিঃসহায় হয়ে পড়েন।

সেই খেলেই চলছে।

পরদিন সকালে জানা হ'লে সুরজকুঁয়রী বলে যে, সে ছাইচন্দ মাখামুড় কিছু দেখেছিল।—ডাকী ধারণা। প্রথমে তো বলেই না। পরে অনেক সাধ্যসাধনার পর মায়ের সব কথা বলে।

—সে ফিরছিল দলপতিরামের বাড়ী থেকে। তখন সন্ধ্যা হ'য়-হয়। খেইচুকো গাছটার নীচে একজন মুসলমান। ঐ যে কৌপুরী আসওয়ালাটা আসে না, তারই মত পোষাক। কাঁচা পাকা মেশানো দাড়ি; রঙটা রক্ত; গলায় একটা প্রকাণ্ড মাদুলি; মাথার সামনে টাক, অথচ পিছনের চুল বড় বড় বাবরীর মত করে' রাখা। লোকটা ইসারা করে' তাকে আসতে। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছে আমার। প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছি, আর সেই লোকটা তাড়া করেছে আমাকে ধরবার জন্যে। এই ধরলো বুঝি! আমাদের বাড়ীর খিড়কির দুয়োর সামনে;—এই পৌঁছে গেলাম বলে; দুয়োরের চৌকাঠের বাইরে থেকেই হাত বাড়িয়েছে সে···

বলে আর সুরজকুঁয়রী হাউ হাউ করে কাঁদে। তার চোখ মুখের আতঙ্কের ভাব যায়না।

মা চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন। কি মা, আমিতো রয়েছি আছি।"

সুরজকুঁয়রী মার হাতখানা চেপে ধরে।

কিন্তু ভয় তার আর ভাঙলো না। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। খুট করে শব্দ হলেও চমকে ওঠে। গাছের পাতাটা পড়লেও ভয় পায়। চব্বিশ ঘণ্টা চোখমুখে আতঙ্কভাব। বাড়ীর লোকজনের মধ্যে থেকেও তার ভয় আসে। সেখানে তাকে জনবহুল ছুটতে হবে ঐ মুসলমানটার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। এই আতঙ্কময় পরিবেশ কি তাকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত অনুসরণ করবে? এক মিনিটও কি সে শান্তি পাবে না, স্বস্তি পাবে না? ঐ বুঝি জানালা দিয়ে সেই দাড়িওয়ালা মুখটা উঁকি ঝুঁকি মারছে! জানালার কপাটটা দিয়ে যে বন্ধ করে রেখে সে সাহসও নেই। পৃথিবীশুদ্ধ যে মেয়েরা যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের এমন হয়না কেন? মা চব্বিশ ঘণ্টা তাকে চোখে চোখে রাখেন; দুয়োরে জল তুলতে গিয়েই, কিম্বা উনুনের পাশেই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যায়। তবে কাঁটা দিয়ে ওঠে সারা গায়ে। রামজী, আমার মেয়েকে ভাল করে দাও। কি পাপ করেছি আমি ঠাকুর তোমার কাছে?

তিন মাথা এক হয়। ইন্দর পরমানন্দ, তাঁর স্ত্রী, আর তাঁর বোন কিস্ কিস্ করে পরামর্শ করেন,—বিয়ের বুদ্ধি মেয়ে। একথা নিয়ে সাত-মুখ করা উচিত নয়। কাছে-পিঠের লোককে খবর দেবার দরকার নেই। বন্ধুবান্ধবের অবশ্যই কথাটা জানা চাই। এমনিই এতদিনে হয়ত টিটিকার পড়ে গিয়েছে পাড়ার আর সমাজে। কি ভুলই হয়েছিল এত বড় মেয়ের বিয়ে না দেওয়া।

পিসিমা এই দুশ্চিন্তাও ভুলিয়ে দিতে ছাড়েন না;—পই পই করে বলে এসেছি মিত্তির তিরিশ

নি, মেয়ে দিয়ে সব নিয়ে যাও। তখন যে তখন তাকে উঠবে কেন? যা হবার হয়েছে; এখন কেবল দেখা যে, ওরা যেন কাছে-পিঠের না হয়। তাই আমরা বারেন্দির তহশীলী থানায় বাদী হয়ে কালোয়া মুরহরকে।

সেদিন সেই যে গায় ঘুঙুরী দিয়ে গিয়েছে আর সে এ মুখো হয়নি।

"যর সব কে ছোড়"—দুশ্চিন্তায় ইন্দর পরমানের খেয়ালের ঠিক নেই।

"মেয়ে যে এদিকে গেল। নি নি দুদিন ধরি ঘরে বসছে!"

"তার আমি কি করবো!"

"তুমি করবে না তো কি ও পাড়ার রামেশ্বরাজ বুদী করবে?"

নিনি তখন ফরাসে ইন্দর পরমকে দুদিনের মত নরম করে যান।

"তা এখন কি করা যায়?"

ঠিক এর জন্যে রোজকে ডাকায়; এ ব্যাপারে অবশ্য রোজা আসে নেই। তারও আপত্তি ছিল;—আইবুড়ো মেয়ে, ...মুসলমানে ছোঁবে...

ইন্দর পরমানেরও মনের অবস্থা খচ্ খচ্ করে।

ঘুরঙ্কুরীর মা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে দেন; "মুসলমান ভূতের ওঝা মুসলমান রোজাই হওয়া চাই।"

একটা অকাট্য যুক্তির আশ্রয় পেয়ে, ইন্দর পরমান এই বিপদের মধ্যেও একটু যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

রুস্তমকে খবর দিতে সে বলে, "ভূত যখন মেয়ের ঘাড়ের উপর সওয়ার হবে তখন সত্যের কোন ফল হবেনা। এখন মেয়ে অজ্ঞান থাকবে। জ্ঞান হতে দেন, তার পর খবর দেবেন—ঐ কাছেই তো। ভূতটা যখন বাড়ী ছেড়ে বাইরে যাবে সেই সময় ছাড়বো সত্যর, আর যাতে সে বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে। ফেরাতেই তো টেকাতে হিবের চেয়েছাতা।"

পরের দিন এসে রুস্তম রোজা বাড়ীর সীমানায় উপর একটা কালো মুর্গী জবাই করে। তারপর সন্তর্পণে সকলে মুড়িয়ে সীমানার চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। পাঁচ মিনিটের সময় লাগেনা। যাবার সময় বলেও যায় বলে' যায়, "এখন দেখুন আপনার কপাল, সত্যের তাকৎ, আর আমার হাতযশ।" ছনি সুরঙ্কুরীর ঘরে থাকে। আবার যে কে' যৌ। ইন্দর পরমানের মনে সন্দেহ জাগে—যা বিশ্বাস পাচ্ছেন। হয়ত রুস্তম ইচ্ছে করেই ভূতটাকে তাড়ায় নি। হিঁদুর মেয়েকে পেয়েছে মুসলমান ভূতে; হয়তো ওঝা মনে মনে খুশীই হয়েছে—যা লাল-পাতা ভাবে নমো-নমো করে' কাজ সেরে করলো। তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল।

পাচা. শিকড়. চৌটকা-টাটকী অনেক কিছুই হ'ল। আর ঘাবড়াচ্ছে গুড়-গুড় করে না। বাড়ীর লোকের মনে হয় ডাক্তার ডাকায়। ডাকতে হ'লে বাঙ্গালী ডাক্তার, ডাক্তারীতে অত মাথা আর ঘামাও নাই। তা ছাড়া, হরিশ ডাক্তার একরকম বাড়ীর লোক। তার কাছে খুলে সব কথা বলা যায়। আরও এক কথা—নিজের ছাত-মেয়াদার ডাক্তার আনলে, কথাটা সমাজে প্রচার হবে বেশী;—বাঙ্গালী ডাক্তারই ভাল।

হরিশবাবু বিবাহবাবুর ডিস্পেন্সারীর কম্পাউণ্ডার। ত্রৈমিসকোপ খলায় ঘুরিয়ে তিনি সাইকেল থেকে নামেন। দরজার আড়াল থেকে ঘুরঙ্কুরীর মা বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে ওঁকে মেয়ের ভূতে-পাওয়ার সারা বৃত্তান্ত শোনান।

—তোমার ছেলে বাবা হবে ডাক্তারবাবু। আমার মেয়েকে সারিয়ে দাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

"ভগবানই মালিক"—বলে হরিশ কম্পাউণ্ডার

খসখস্ করে প্রেসক্রিপশন লিখে নিজের পকেটে রাখে।

"ছটোর সময় ওষুধটা দিয়ে যাবো"।

হরিশ কম্পাউণ্ডারের ওষুধ বহুদিন চলে, সিসির পর সিসি। সেবারে নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে সে। ঈশ্বর পরলোকে বসে নিশ্চয়ই ডাক্তারকে ডাকছে। এর উপর আর কথা নেই।

মা পিসিমা কেঁদে আকুল হন,—হরিশ ডাক্তারও জবাব দিলো!

নিবারণবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ঈশ্বর পরমাণের কাছ থেকে সব শোনেন—আজ পর্যন্ত যা যা চিকিৎসা হয়েছে সব। পাকা-মাথা তাকে বাটীটা দেখেন। তোখের পাতা; জীবুলের ঘণা। 'জিভটা একটু দেখি, মা।'

তারপরই দেখেন—নিজের বাড়িটি।

"বয়স কত ছ'ল ছেলেটির?"

"এই ষোল বছর পূর্ণ হয়েছে।"

বাইরে এসে কিছুক্ষণ টাকা পকেটে খুঁজতে খুঁজতে বলেন "কোনো ওষুধের দরকার নেই। ছিঁড়ে দিয়ে দেন তাড়াতাড়ি। ছেলেপিলে ছধেই সেরে যাবে। দুধ খেতে দেবেন।"

ডিস্পেন্সারীতে ফিরে গিয়ে হরিশ কম্পাউণ্ডারকে বলেন "রিমিরিয়ার কেস।"

ঈশ্বর পরমাণ তাঁ কথিয়ে বাড়ীতে সকলকে জানিয়ে দেন যে ভোলা বাঁচবে না; নিবারণ ডাক্তার বলেছে—রিমিরিয়া জ্বর। স্ত্রীর কাছে একান্তে গলার স্বর নামিয়ে বলেন, আসল জ্বর বাড়ীতে আনলে তবেই নকল পালাবে।

স্ত্রী চটে' যান—"এর মধ্যেও তোমার হাসি মস্করা আসে! এখন দিদিমণিই এর একটা বেন্দোবস্ত করে' ফেলো।"

এর পর আরম্ভ হয় বর-খোঁজার পালা।

টুপি পরে', তিলক কেটে, দামী কোটের উপর পাট-করা চাদর জড়িয়ে চলে ছেলে-খোঁজার সফর। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে হবে।

বিদেশী কারবারী সহরেই থাকে বেশী। তাদের পেশা কারবারীতে কলমবিদ্যা। ছেলের আরজ্জের মধ্যে চাকরীর করে' খায়, গাঁয়ে থাকে, এমন লোক হাতে পোলা যায়। তবুও বলে, কলমের জোর থাকলে কি হয়, একটা মুদ্দো উপড়োতে তিনজন কাবেলের দরকার হয়। কিন্তু সহরের ছেলে পাওয়া শক্ত। খাঁটি জাতের বাপদের বেশী। তারা চায় হাজারের কম তিনকের (ধরলে) কথা বলে না। তা ছাড়া, ছেলের নিজের একটা আলাদা আছে। বিবাহনের দামের আবার আর একটা দফা। বয়সের কথা।

ভোলা কথা কেউ বলবে না; ভাবে এক, আর বলে আর; কারবারীতে কাজ-করা লোক কিনা;—নিজেকে দিয়েই তা বুঝতে পারেন ঈশ্বর পরমাণ। ...দশ ফটার্কে চিনেছি। ছেলের বিয়েটা হয়ে যেতে দাও না একবার, তারপর টের পাওয়াবো।—

এখন কিন্তু তোরের মত থাকতে হয় ঈশ্বর পরমাণকে। কি জানি ভাল না জানতে পারলে কখন তো কহতে পারে লোকে। হয়ত অসুখের কথাটা চাঁদরা পিটিয়ে প্রচার করে' দেবে। এখনই যে করছে না তা কে জানে! ছেলের কাপড়া যে ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না, তা হয়ত মা-সুরভকুমারীর কুনজরে পড়বার খবরটা পেয়েই। কথা বাড়ানো ওষ্ঠে। কে জানে!

সময় ছেড়ে ছুটতে হয় গাঁয়ের পথে—টিকিয়ে টিকিয়ে গরুর গাড়ীর সফরে। সঙ্গে রাখবিছি ডাকর—তামাক সাজা, তেল মাখানো, আর রাতে শোবার সময় পা ছ'খানা টিপে দেবার জন্ত। এ না করলে কারুর পরিবারের লোকরা ছেলের বাড়ীর আতিথ্যের যত্নের করবে। কাজেই মাথায় উঠেছে। রোজগারের মাথে খোঁজ নেই, কেবল

খোলো বিছি, ভিজিয়ে দিন। এর থেকে নিশ্চয় মেই মহীন মেয়ের একটা হিল্লে না হয়। তারপর সকল থেকে দিয়ে বাড়ীতে ঢোকো। ঠোঁটটা বাড়িয়েছো কি ঠিক বলেছি — "কি, কিছু হ'লো? হে আমি আগেই জানি। মেয়েটাকে মেরে ফেলবে এই তবে। পরের দিন রামায়ণ পড়া হবে, আর তুমি একটা মেয়ের বিয়ের ঠিক করতে পারবে না।"

সুরসুন্দরীর মা কিছু বলেন না, কেবল কাঁদেন।

"তা হ'লে আজোকোলার ছেলেটিকেই ঠিক করি, কি বলো?"

কোন উত্তর পান না। মনে মনে বিরক্তে আজ আর আপত্তির সাড়াও আসে না।

আজোকোলা গ্রামের পক্ষধর পরামাণিক, ছেলেটি মন্দ নয়। বেশ ছবিলদার আছে; বড় মেয়েও। তবে তাদের বাপের দোষ আছে। তারা "কিরণপক্ষী" কায়স্থ, অন্ত জাতের হক আছে তাদের মেয়ে। ছেলেটির একটু যেন খোল-তোলা দোষ্টে। আগে একটা "নৌকাডুবি" (একরকম গ্রাম্য অভিনয়) হয় ঠিক তার। তাই নিয়ে ছেলের সব মেলাগুলিতে ঘুরতো। ঘর থেকে কিছু লোকসান দিয়ে, বাপ যাত্রা আসার পর ছেলে আবার ফিরে এসেছেন। এখন ছোটটি নিজের ঘর-দোরের দেখে।

এর আগে যখনই এই ছেলেটির কথা উঠেছে তখনই, মেয়েদেরকে কথা ছেড়েই যাও, ঈশ্বর পরামাণিক মনের ভিতর থেকে এর প্রতিবাদ করে এসেছেন। "অমত" কারণ তিনি। কত উঁচু তাঁর জাতের খাতি; ওখানে মেয়ে দিয়ে নিজে যাবেন জাত খোয়াতে! তার উপর পাত্রাধারে বিয়ে দিয়ে! সে বাড়ীর মেয়েরা হয়ত তামাক খায়, হয়ত ভিজেকে উঠে যান জানে। তাদের ঘরে দিয়ে যাবো সুরসুন্দরীর মত মেয়ে! — যে চিঠি লিখতে জানে, রামায়ণ পড়তে জানে, সেলাই প্রাইজারী পায়। ঘরে ফেলেও নয়।...

ঘটনার স্রোতে পিসিমার প্রতিবাদ ক্ষীণ হয়ে এসেছে — "কিরণপক্ষী ছেলে আবার টাকা নেবে কি?" টাকার প্রশ্নটাই যেন বড়। কিরণপক্ষীতে আর আপত্তি নেই।

এখন এ বিয়ের পক্ষে অসংখ্য যুক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, — একটা পয়সা খরচ নেই, অবশ্য তাদ, যে দিন বলো সেদিনই বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যেতে পারে; সুরসুন্দরী যেতে উঠবে, মেয়েটা শান্তিতে থাকতে পারবে।

এইখানেই শেষ পর্যন্ত বিয়ের ঠিক হয়ে যায়। অবশ্য কাছাড়া মেয়ে পাবার উল্লাসে, বরপক্ষ — মেয়ে দেখতে কেমন — এই খবর পর্যন্ত পাত্রার লোকের কাছ থেকে নেবার চেষ্টা করে না।

হুপক্ষই লাভে আছে — বোকানিধায় চালাচ্ছে বরাপত্তা হাল, আর খরচ দিচ্ছে অচল টাকা।

মেয়ের পক্ষই কঠিন দেখা। — তাড়াতাড়ি সব করতে হবে। এই মাসেই হওয়া চাই। ছেলে আবার ঘর, বিয়াসমন বিয়ের সঙ্গেই করতে হবে।

ও পক্ষ সব সর্তেই রাজী।

ঈশ্বর পরামাণিক আবার বেশী সাবধানী লোক। বিয়ের দিন পাত্রার ছেলেদের তৈরী করে' রাখবেন লাঠি নিয়ে; কি জানি বিয়ের দিন আবার যদি সুরসুন্দরী অজ্ঞান হয়ে যায়, আর তাই নিয়ে বরপক্ষ যদি গোলমাল করে।

বিয়ের দিন পাত্রার মেয়েরা গ্রাম ভরে' গানের সুরে বরযাত্রীদের অজস্র গালাগালি দেয়। যেমনের উত্তেজনে গালি দেবার সময় পিসিমার কণ্ঠস্বর আর সকলের গলা ছাপিয়ে ওঠে —

"যেমনের ছেলে পীরিতে-আজোকোলা ডুবেছে,
কত রসিক নাগর ঘিরেছে,
যেমনের মিঠে গলায় ঘরে পাড়ার কুল পালায়,
যেমনের ..."

পিরিতের গলার ঘরে কিনা জানি না — তবু সেদিন সুরজকুমারীর উপর তার কোনো রাগ হয়নি। কোন রকমে দুর্গা দুর্গা করে' ফিরে ঘরে যায়।

কাঁদতে কাঁদতে পাড়া জখার করে' সুরজকুমারী ঘরের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

আরম্ভ হয়ে যায় তার নতুন জীবন সেই রাত থেকে। নতুন আলোর রঙীন হয়ে ওঠে তার জগৎ। কোন বিজীবিকার ছায়া নেই তাতে।

নতুন মেলার বিটে মাসকতার ছয়া একটা বছর প্রায় ঘুরে আসে। স্বপ্নের মত মধুর মাস তরীটী কোথা দিয়ে কেটে যায় সুরজকুমারী তা বুঝতেও পারেনা। ... তা বলে' সেই মুসলমানের স্বপ্নের মত নয়। না গো না, এখনও সে কথা মনে করলেও বুক টিপ টিপ করে। বেচে চায় না সে আর সাপের বাড়ী এ জীবনে। জন্মের কথা জোনার, হামজী! সে তুই জীবনে আমাকে ছাড়বে তা জানিনি। জেনেছিলাম তার হাত থেকে পালাতে পালাতেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে।

এখানে এসে কেবল একদিন সেই মুসলমানটা এসেছিল রাতের অন্ধকারে। শ্রাবণ মাস; টিপ-টিপুনি বৃষ্টি হচ্ছে। গজাধর সিংহের চিন গাঁয়ে, আধিয়ারের কাছ থেকে তারই ধানের ভাগ নিয়ে আসতে। সে রাত্তিরে সে খাণ্ডড়ীর ঘরে শুয়েছিল। ঘুম আর আসে না। এ পাশ ওপাশ করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ভোর রাতে খাণ্ডড়ী এক ঘুম সেরে উঠলেন;.....পাশের খাটিয়া থেকে সুরজকুমারী তাঁর জামাক খাওয়ার শব শুনতে পাচ্ছে; .....একটু যেন তন্দ্রার ঘোর এসেছে এসেছে..... এমন সময় সেই — সেই লোকটা।.....

"জাগরাছ কেন বৌমা! বুকে হাত দিয়ে শুয়েছো নাকি?" যাক সেদিন ব্যাপার বেশী দূর গড়ায়নি। খাণ্ডড়ী বুঝতে পারেন নি।

কেবল সেই একদিন।

তা না হ'লে বশুরবাড়ী টিকাই তার দুষ্কর। তবে চব্বিশ ঘণ্টা ইচ্ছে করে সে গজাধর তার কাছে কাছে থাকুক। অকূল সমুদ্রের একমাত্র আশ্রয়কে সে মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে রাজী নয়।

গজাধর বলে, নিজের বেলায় চোখার সঙ্গে গল্প করলে না কি বলবেন, পাড়ার লোকে কি বলবে?

সুরজকুমারীর এ কথা মনে ধরে না।

রোজই গজাধর বিকেলে আড্ডা দিতে যায়, দু মাইল দূরের বিরৌলী বাজারে, আর রাত ন'টা দশটায় ফেরে। এই সময়টুকুর তর সয় না সুরজ-কুমারীর। আর এই সন্ধিলগ্নে শিয়রে আসে এক আতঙ্ক, গজাধর চলে' গেলেই আবার বুঝি সেই মুসলমানটা আসবে। মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে, কানের মধ্যে যেন একটা শব্দ হয়; — একটা কপাট খুলে যাবার মতোর সব ঝিলিক যেন বেরিয়ে গেল মাথা খালি করে'। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সে তেজপাতে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। এসব লক্ষণের ক্রম আর মাত্রা এখন তার নখদর্পণে। সে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে গজাধর কাছে থাকলে ভূতটা পালাবে, আলো সম্মুখে রাখলে ছায়া যেমন পিছনে পালায়। তাই সে গজাধরকে আগলে রেখে রাখতে চায়, নিজের মনের মধ্যে পুরে রাখতে চায়। কেবল তার সাথে মনে নয়, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যও গজাধরকে তার দরকার। অথচ তার মনের এই গোপন কোণটীর খবর তার স্বামী জানে না। প্রায় সন্ধ্যায় বিরৌলী বাজারের মায়াজীলালের দোকানে গজাধর তার স্ত্রীর প্রেমের পরশুখে প্রশংসা করে। বছর ঘুরে আবার চিত্রগুপ্তের পুজো এসেছে — লালা জায়েদ্রদের সব চাইতে বড় পুজো। বিরৌলী বাজারে এই বারোয়ারী পুজোর তত মূল্যবান।

সুরজকুমারীর ছোট ননদ রেবতী এসেছে বাপের বাড়ী, দশহরার সময়; — ছটপরবের পর শ্বশুর বাড়ী

যাবে। সুরজকুমারীর গভীর আক্ষেপ।

"এই অল্পের মাঠের মেলায় গরুর গাড়ী করে' দু মাইল দূরে বিরৌলী বাজারে যাবে মেলা দেখতে! না না, মেলাই তাদের দিয়ে কাজ নেই।"

পরে অনেক ভেবে ভেবে বিরৌলী যাবার জন্য তৈরী হয় গজাধর।

"গানের ডিবেটা ভরে' দিয়েছো তো? আর এ বছর চিরঞ্জীবের মেলা বাই বা দেখলে। আর ক'টা মাস যেতে থাক তারপর তোমাদেরই গভীরাটের মেলায় নৌটাঙ্কী দেখিয়ে আনবো। এ ক'মাস তুই সাবধানে থাকতে হয়।"

সুরজকুমারীর চোখ দুল দুল করে' আসে।

"আমার ফিরতে অনেক রাত হবে"; — বাড়ী থেকে বেরুবার সময় গজাধরের মনটাও খারাপ হয়ে যায়।

সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ীর দাওয়ায় বসে' মেয়েরা গল্পগুজব করছে।

"মেলার বাজনা শুনে মনে হচ্ছে যেন আমাদের গোরুগোড়ার বাজছে।"

"হাটের মেলা কিনা, তাই।"

গজাধরের মা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন "তোর খুব যেতে ইচ্ছে করছে বুঝি, মেলী।"

"বৌদি যাবে না, আর আমি যাবো বুঝি! আর আমার শ্বশুরবাড়ীতে তো এরোক্ষ মরে গেছে।"

"তোর বৌদির কি এই অবস্থায় রাত কিরতে যাওয়া উচিত। তার উপর ডাক্তিকের দিন।"

"আমি কি বলছি যাকি যেতে?"

"ছেলে আমার যদি রাগ করে, তাইতো ভয়। পাশের থেকে চুমনী থাকলে তো আর ভয় নেই। এতকাল পরে এসি, আর চিরঞ্জীবের পুজোর মেলা দেখবি না। এ আমার ভাল লাগছে না। ঝাড়া ডাকি ভল্টনকে। ওরে ও ভল্টন্! গাড়ীতে গোরাল বিচোন, আর বিছানা দে। সাবধানে নিয়ে যাবি খানা ভোমা বাঁচিয়ে, আস্তে আস্তে।"

মেলায় তাড়াতাড়ি পৌঁছে সুরজকুমারী আর মেলনী দুজনেরই অন্তরাত্মা ভয়ে, — গজাধর আবার তাদের দেখে না ফেলে। মেলা দেখে নৈসর্গিকই তারা বাড়ী ফিরে যাবে। খাওড়ী বলেছেন, ছেলে বসে' থাকবেন; গজাধর বাড়ী ফিরবার আগেই ফেরা চাই কিন্তু।

লারি সারি আলোর কাছে গিয়ে পড়েছে তারা।

"এখানে কি হচ্ছে রে ভল্টন?"

"খেটার"

"থিয়েটার তা আগে বলিসনি কেন ভল্টন। চল চল ঐ খানেই। মেয়েদের জায়গার দিকে গাড়ী ঘুরিয়ে।"

থিয়েটার — তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পালার নাম "সমর"। অজস্র লোকের কোলাহলের মধ্যে একবর্ণও শুনবার কি বুঝবার উপায় নেই। তবুও সুরজকুমারী আর মেলনীর বেশ লাগে। কি সুন্দর রাজার পোষাক! কি রকম করে' তরোয়াল ঘুরোচ্ছে! ভয়ে বুক টিপ টিপ করে। সন্তিকারের আগুন আলিয়ের ঐশ্বর্য উপর; এখনই আগুন টাগুন লেগে একটা অনর্থ হয় বুঝি। পাশের রাস্তার মোটর থেকে থেকে আগুন লম্বা করে' ছেড়ে আসছে ঘাবেরা। কি সুন্দর সুবাসটি তার। পাশের আকাশ থেকে মেয়েরা পথ আগলে দাঁড়িয়েছে ঘরিন্। অজানা কারণে একটু যেন শিউরে ওঠে সুরজকুমারী।... ঘরিনের পিঠের বিনুনীটা কেবল দেখা যাচ্ছে; ঘিয়েরঙের চুড়ি পাঞ্জাবী পরনে।...

শিরীষের মধ্যে দিয়ে একটা হাল্কা ঘিম ঝিরঝির ধীরে ধীরে সুরজকুমারীর সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

...ঠিক কোনমুরি গজাধর-ওয়ালার ঘর যেমন।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার। মুহূর্তের জন্য নিজের মনকে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে কতক্ষণ ঠকিয়ে রাখা চলে?

ঐ তো-সেই রকমই বাসনী চুল পিছনে। আর কোনো ভুল নেই·····

হঠাৎ তবে একটা অন্ধ কালের পর্দায় আমাকে ঢাকে। আমার অধৈর্যটা খালি হয়ে যাচ্ছে। অকাল ছেলের প্রতিমা গর্ভের অন্ধকারটাকে একেবারে তুহিন করে দিচ্ছে।··· জানকীনাথ! এ কি হচ্ছে? এই ভয়টা কি এখনো একেবারে আছে!... সব বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ বুঁজবার ক্ষমতাও নেই।

·····আমি এ পর্দা একেবারে আসতে দিলে আর যাবে না। এর শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখতে হবে। তার আগে নিস্তার নেই। রক্তিম যদি সম্মুখে না থেকে তা'লে হয়। হয়ত ওর মুখটা অন্যরকম; পিছনের দিক থেকে সেই মুখলমানটার মত দেখাচ্ছিল। রাক্ষসী বাঁচায় আমাকে, ওর মুখ যেন আমাকে দেখতে না হয়। তাও কি হয়! এ আমার ভবিতব্য। এই লোকটা চিরজীবন আমার অনুসরণ করবে। আমার জীবন বিষময় তুলবে। ..এই যায়,—এইবার সে এদিকে মুখ করে' দাঁড়াচ্ছে। সেই কাঁচাপাকা দাড়ি; সেই চোখ মুখ, গালের আঁচিল, আমার সম্মুখের দিকের টাক, সেই শয়তানী হাসি; ভুল হওয়ার কি জো আছে!—ঐ—ঐ যে সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

শরীরের সব স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। চিৎকার করে' ওঠে সুরঙ্কুমারী। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

রেবতী আর কয়েকজন মহিলা মিলে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় গরুর গাড়ীতে এনে তুলে দেয়।

—কিছু গয়না কি দিয়ে গিয়েছে।

—খানিকক্ষণ গাড়ীতে চাঁদা যাওয়ার পরে থাকলেই নেরে যাবে।

—যাত্রীর লোকেরও মনিহারি। ওরা পোয়াতিকে এই ছিড়ের অষুধ দিয়ে এসেছে।

—ওরে ঠাকুরারা, তোরা এখানে ভিড় করছিস কেন?

এর পর মহিলারা আবার ভিড়-করা আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার খেতে।

"গুণ্ডিস খুব আস্তে আস্তে চালাস গাড়ী;"—ভয় গলায় ঘর বেরোয় যা রেবতীর ভাল করে'।

—তোর যাতে সুরঙ্কুমারীর জ্ঞান হয়।

গাড়ী অবস্থায় ঘরে ঢুকছে আর আপন মনে বকে' চলেছেন;—"কোথাকার জল এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা যায় না। কেন মরতে হেতে দিয়েছিলাম বৌকে বেলায়। এখন ছেলে জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেবো? ঐ রেবতী, তোর হাতটাতে কিছু মাদুলিটাদুলি তো বৌমা? কোন চোট্‌টাট্ লাগেনিতো কোথাও? তাদের তাদের এবার বিপদটা কাটলে বাঁচি।.....

রেবতী ঠায় বসে' আছে সুরঙ্কুমারীর শিয়রে। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরঙ্কুমারী বলে "এখুনি আমায় নিয়ে আসবে।"

রেবতী সায় দেয় "হাঁ, এই এসে পড়লো বলে" সুরঙ্কুমারী শিউরে উঠে নয়নের হাত ছেড়ে দেয়; একেবারে দিয়ে ফেলবে বুঝি। কেন, তা রেবতী বুঝতে পারেনা।

গাড়ী জিজ্ঞাসা করেন "কি বলছে কি বৌমা?" রেবতী জবাব দেয়না। বৌদি বলছে ছেলের কথা;—ও কথা কি মার কাছে বলা যায়।

বাইরে সহসায় ভড়ার শব্দ হয়। মার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে,—এখন ছেলেকে কি বলবেন? সুরঙ্কুমারী এ শব্দে চমকে ওঠে। রেবতী তড়াক করে তার মাথার কাছ থেকে উঠে দাঁড়ায়;—"ঐ এসে পড়েছে ভাইয়া। যাচ্ছি না" সুরঙ্কুমারী মাথার

ভাগ্নেকে টেনে নেয়। ঝাড়ুটা আলো দিয়ে দরজা খুলে দেয়। চমকে যায় ছেলের চেহারা দেখে।

"ওকি অবেহিদ একপাশে ঘা দেখে। গালের উপর ওটা কি আঙ্গিলের মত?"

গলাবন্ধ সেটাকে বার দিয়ে খুঁটে ফেলে; আর হাসতে হাসতে বলে, "সকালে ঘুম কেলা যাবে মা। পিরেটার অবেহিলাম আজ রেলাম। বলেলো আবার সবাই মেলায় যাবার বায়না ধরবেন। তাই যাইনি।"

বেলারী এসে পড়ে সেখানে।

"বৌইদির লখ মোনার এমন মোটেনি দেখি। কি পিরেটার! কি মেকেতিলে?"

"রকিত বলে একটা ছোট্টো পাট রিল"

"এদিকে আর একটী প্রাণী তো ঘরে ঢেকিয়ে হ'লো। এইবার একটু নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমুতে যাই।" এবং তথা ঘুরজকুমারীর ঘর পর্যন্ত পৌঁছোলো।

"ঘুরিয়া! ও ঘুরিয়া! ঘুমিয়ে নাকি?"

ঘুরজকুমারীর ঘুমন্ত আখিতা ভেঙে আসে। আতঙ্কঘন জগতের রক্তাক্তরূপ এখন তার দৃষ্টিতে ঘনো। আর তার কিসের ভয়? থিয়েটার দেখার কথা স্বামীকে বলা হবেনা; ঝাড়ুটী ঘরে রিয়েছেন কিনা, তাই বা কে জানে!

তার ঘুমঘোর জগতের পরিবেশে সে পৌঁছে গিয়েছে। ঘুমন্তঘরের বিজলিবাতির রাঙা শিখরে ফেলে সে এসেছে। গলাবন্ধের অগ্রপশ্চ ঝুলের সঙ্গে আরও খেঁলে গেছে সে। এই নিরিবিলি আশ্রয়ে এসে পৌঁছে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। ঝুলের দুলুনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, — নিজের বা ওর...টা ঘুমা যায় না। এই ঝুলের আড়ালে থাকলেই কেবল সে সেই দরজাটার হাত থেকে বাঁচতে পারে। কখিন মিয়ার বাড়ী ঘুমী ছেকে ওঠে। এর তাড়াতাড়ি! ঘুরজকুমারীর ঘরের আধাঅন্ধকার আলোই ভেটেছে, তবে রাতের আঁধার এর শীতলিয় কাটার কি দরকার ছিল। ঘুমন্ত গলাবন্ধের আঙুল এসে পড়েছে ঘুরজকুমারীর কানের সেই আধপোড়া-পড়া জায়গাটায়। আস্তে আস্তে আঙুল ক'টাকে সরিয়ে ঘুরজকুমারী মাথার চুল দিয়ে সেই ঘরপোড়া-পড়া জায়গাটা ঢেকে দেয়। ঝাড়ুটী ঘোরঘরা নিয়েছে উঠোনে।

বীরাম আলি কখিন যে, "বাঁয়ের ইচ্ছিল হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেইরল দিয়েছে। তা বাঁগা, কেইরলে কি ইচ্ছিল ভাল হয়?"

— বিদূষক

গ্রন্থ-পরিক্রমা

কবি (উপন্যাস) — শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রচনাটির একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছি — আমার এই আলোচনা হইতে সকলে তাহার কারণ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তৎপূর্বে লেখকের সম্বন্ধে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করিতে হইবে, তাহা একটু বিস্তার হইলেই ভাল হয়।

তারাশঙ্করের আমরা গল্প-সাহিত্যিক, যে একটি সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি এবং রসসৃষ্টির একটি নূতন ক্ষেত্র তৈরি করিয়াছেন, আমার মনে হয়, ইহাতে সন্দেহ করিবার আমাদের সাহিত্য-রসিকগণের ভিতে এখনও ঘটে নাই। অতিও কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে বর্তমান বাংলা গল্পসাহিত্যের যে একটা মোটামুটি পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহাতে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক প্রতিভার দুই একটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাহার দৃষ্টি বা কল্পনাবস্তুর মতীরতার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের পক্ষেই, তাঁহার এই প্রতিভার যে একটি অতিশয় মৌলিক, এবং বোধ হয়, সুদূরের দিক প্রবণ হইবার সম্ভা রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে তখনও আমি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে সাহস করি নাই। তাহাতে, 'কবি' নামে এই বড় গল্পটি পাঠ করিয়া কিন্তু তারাশঙ্করের কবিদৃষ্টির ঘুরোলোক, যা প্রধান লক্ষণটির সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছি।

ইতিপূর্বে (অর্থাৎ, 'কবি'-রচনার পূর্বে) তারাশঙ্করের অনেকগুলি গল্প এবং দুইখানি বড় উপন্যাস রচনা করিয়া তাঁহার শক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙালী পাঠক-সমাজে, অন্তত তাহাদের সত্য-রসপিপাসাসম্পৃক্তির প্রমাণে, স্বীকৃত করিয়াছে। তাঁহার গল্পগুলির অভিনবত্বের একটা কারণ এই যে, বাংলার একটা অঞ্চলের একেবারে মাটির গন্ধ তাহাতে পাওয়া যায় — সেই মাটির রসী মর্ত্য মন ওজনের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশিয়া আছে যে মানুষের সমাজ — সেই সমাজও যেন বাংলার প্রকৃতিরই একটি অঙ্গ; সেই সমাজের উপরকার স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত, সব তাঁহার ঐ গল্পগুলিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 'জলসা

• ...ছোট ছোট ঘটনা হইতে ভোর, দুপুর, বেলা পর্যন্ত — সমাজের সকল স্তরের সকল চরিত্রের যেন নিপুণ মুখচিত্রীর হাতে, তাহাদের সেই ঘাটতি-দশা বৃদ্ধি হইয়া আমাদের এই সময়ের সন্ধ্যা-দৃষ্টির সম্মুখে হাজির হইয়াছে; পরনে চোখে আরাম-করা একটা পর্দা যেন কে সরাইয়া দিল — জীবন-সমুদ্রের একটা বেলিকা উঠিয়া গেল; একটা মুকুর ও তাহার পটভূমিকার যে জীবন-নাট্যের অভিনয় দেখিতে লাগিলাম, তাহা যেমন বাস্তব, তেমনই অপরিচিত! মুহূর্ত চাহিয়াছিলাম এই দেখিয়া যে, এই সকল চিত্রে ও কাহিনীতে লেখক সেই তন্ময়তা আনয়ন করিয়াছেন, যাহার ফলে, প্রত্যেক চরিত্র লেখকের আত্ম-সংস্কার-মুক্তির হইয়া, অতিশয় সহজ স্বাভাবিক রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে। অর্থাৎ, জীবন সম্বন্ধে কোন বিশেষ তত্ত্ব বা মতবাদ, কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ধারণা বা তথ্য তাহাতে নাই। ইহা ঠিক বাস্তব-নিষ্ঠা নয়, অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ সীমার বহিরঙ্গের ফোটোগ্রাফ নয়; ইহাতে প্রত্যেকের মধ্যে জীবনেরই এক-একটা সুখত ও বিচ্ছিন্ন রূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তিত্বের; লেখক সেই রূপী কোথাও নিজে একটুকু স্পর্শ করেন নাই। তিনি যেন জীবনের সহিত যোগমুক্ত হইয়া — আপনার দেবদৃষ্টিকে সেই সুরের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সকলের আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি প্রত্যেক চরিত্রের অন্তর্যামীটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তাহারা এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দৃষ্টি প্রাতিভ দৃষ্টি, ইহাকেও এক্ষণ পূর্ণ-দৃষ্টি বলা যাইতে পারে।

তখন ইহাও বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, এই লেখক কে-অঞ্চলের, কে-সমাজের জীবনকে তাঁহার গল্পসৃষ্টির উপাদান করিয়াছেন, তাহার সেই মাটি তিনি হাতেহাতে জানিয়াছেন; তাহার কঠিন ও কোমল অংশ, তাহার মাটি ও জলের তিনি তাঁহার অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহার গল্পসৃষ্টির সেই উপাদান, তিনি যাই পড়িয়া, নানা তথ্য, তত্ত্ব ও মতবাদের সাহায্যে করিয়া, পাঠিয়া বা আলুকরার ইত্যাদি মসলা মিশ্রিত করিয়া, তৈয়ার করিয়া লন নাই; ওই মাটি-কই তিনি চিনিয়াছেন — সেই মাটির মধ্যেই, তাহারই তলদেশের নিগূঢ় রসধারাকে নিজস্বরূপে পূর্ণ-অনুভব করিয়াছেন; তাই তাঁহার গল্প, গল্পের চরিত্র, এবং তাহার পটভূমি ও মূলবেদিকা — প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ — এমনই এক-আত্মস্থ হইয়া উঠে যে, সকলকেই সেই এক জীবনের অঙ্গাঙ্গী বলিয়া বোধ হয়। সে-সৃষ্টির কোন অংশ যে বিচ্ছিন্ন নয়, সকলই এক কার্যকারণসূত্রে পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া রহস্যকে গভীর করিয়া তুলিয়াছে, এমনই একটা প্রত্যয় সেই রসাস্বাদের আনন্দেও অনুভব করিয়া উঠে। এই সকল কারণে, তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনের একটা নূতন রূপ ও নূতন রসাস্বাদ আছে; উহা বাস্তব বটে, কিন্তু তাহা বস্তুসর্বস্বী গভীরতর বাস্তব — জীবনের রহস্যলোকের বাস্তব।

উপরের কথাগুলা একটু তত্ত্ব-ঘেঁষা হইয়া গেল, কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পগুলির অধিকাংশ স্মরণ করিলে এবং সবগুলিকে একসঙ্গে ধরিলে, পাঠক-পাঠিকারা সম্ভবতঃ আমার ঐ কথাগুলার একটা মোটামুটি অর্থ বুঝিয়া লইতে পারিবেন। একটা বিষয় তাঁহারাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাহা এই যে, তারাশঙ্করের গল্পের কথাবস্তু ও চরিত্র-চিত্র এ দুইয়ের যোগ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ঐ চরিত্রগুলিই কেন্দ্র বা ভিত্তি করিয়া গল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে; অথচ গল্পগুলি নিছক চরিত্র-চিত্রণ নয়, অধিকাংশের জন্য একটা নাটকীয় ঘটনা-পরিণাম আছে। এইখানেই তাঁহার কল্পনার গভীরতা ও সম্পূর্ণতার নিদর্শনের প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি স্থির-চিত্র নয়, তাহাদের অন্তর্বৃদ্ধি আছে, বিকাশ আছে, পরিণতি আছে — অর্থাৎ তাহারা খাঁটি জীবন-ধর্মী, তাহাদের মধ্যে সেই শক্তির ক্রিয়া আছে যাহার সাধারণ অভিধান নাম প্রবৃত্তি —

আরও হয় কার্মিক নামও আছে — যাহা নানাভাবে নানা অবস্থায় ও নানা সাহচর্যে মানুষকে এক একটি চরিত্ররূপে বিকশিত করে; সেই রহস্যময় শক্তির আগুনে গলিয়াই এক-একটি চরিত্রের ছাঁচে প্রত্যেক মানুষের মুখ সুষক হইয়া উঠে। মন-গড়া — কিংবা সাইকোলজি, বায়োলজি, ফ্রয়েডজি, আলফ্রেড্‌লোজি, সোসিওলজি প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিচারের ল্যাবরেটরীতে তৈয়ারী করা চরিত্র তাহারা নয়, কাব্য-পুরাণ-ইতিহাসের ত' নহেই। এরূপ চরিত্রসৃষ্টি করিবার জন্য জীবন-কর্মকারের কর্মশালায়, হাপরের গনগনে আঁচাইয়া ভাঁতোর ধরি টানিবার ছলে সেই কর্মকারের হাতের কৌশল, তাহার হাতুড়ির ছন্দ চোখে আনে ও কানে লোট করিয়া লইতে হয়; ইহার জন্য মেহা-অন্বেষা, শুচি-অশুচি-বিচার ত্যাগ করিতে হয়; ঐ জীবন যেন একটা প্রবাহ, মানুষগুলা এক-একটা তরঙ্গ মাত্র,— একটা স্রোত, একটা জল, উহার আবার শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দর, উচ্চ-নীচ-ভেদ কি? আসলে, উহা সেই এক শক্তির লীলা — যে-শক্তি মানুষের প্রবৃত্তি-রূপে কত রঙ-বেরঙের খেলা খেলিতেছে। উহাকে প্রেম বলিলে হইবে না, জ্ঞান বলিলে হইবে না, সৌন্দর্য বলিলেও হইবে না, উহা নিছক শক্তিমাত্র। সেই শক্তি-পূর্ণ, আত্ম-পুষ্ট, নিশ্চিন্ত, নির্বিকার শক্তির লীলা বুঝিতে যাঁ পারিয়া আমরা, ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নানা বিরোধাভাস সৃষ্টি করি। তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা ধরিতে পারা যায় না, বুঝে ধরিয়াও দেখা যাইবে না; তাহার সহিত চিত্তকে যোগযুক্ত করিতে পারিলে যে-রসের অবতারণা হয়, তাহাতেই কবি-শিল্পীগণ তাহার সেই অনির্বচনীয়কে একটা অর্থের ছদ্মবেশ পরিয়া দেন, — অর্থহীন, নিয়তিনিয়মহীন, পূর্বাপর-সঙ্গতিহীন, অতএব অসম্পূর্ণ, বিকল ও বিসদৃশ ব্যাপারগুলিকে একটা রসরূপ দান করেন। ইহাই সকল শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের লক্ষণ। কিন্তু তারাশঙ্কর, অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যের এই কাহিনীকারের-বিভাগে, সেই শক্তিকে যেমনটি দিয়া তাঁহার কবিদৃষ্টিরোচর করিয়াছেন — তাহাকে যে-রূপকে তিনি মূর্তিমৎ করিয়াছেন, তাহাতে মৌলিকতার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এই জন্যই তাঁহার প্রায় সকল গল্পই চরিত্রকে মুখ্য করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্র বলিতে কি বুঝি তাহা পূর্বে বলিয়াছি — আমি বাংলা গল্প-উপন্যাসের চরিত্র বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, সেই চরিত্রের কথা বলিতেছি না। তারাশঙ্করের গল্পের ঐ চরিত্রগুলি জীবনের সেই কার্যকারণের অন্তিমুক্ত হইতে এক রহস্যময় শক্তির লীলাচক্রে উৎক্ষিপ্ত বা উৎপতিত স্ফুলিঙ্গবিন্দুর মত। ইহাদের যেন একটা প্রবল গতিবেগ আছে — ইহারা স্থির নয়, অন্তরস্থ গতিবেগে ইহারা যে চরিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই চরিত্রও চলিষ্ণু, গতিমান, অন্বেষণশীল, পরিণাম-মুখী: তাহার সেই যে গতি, সেই পরিণামশীলতা তাহাই গল্প হইয়া উঠে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, গল্প ত' সকল রকমের চরিত্র লইয়াই রচিত হইতে পারে; তাহার উত্তরে বলা যায়, গল্প ত' একরকম নয় — একটা বর্ণনাও ত' গল্প, কোন একটি ঘটনার চিত্তাকর্ষক বিবৃতিও গল্প; আবার, চরিত্র-বিশ্লেষণমূলক কতকগুলি অবস্থার মৌখিক লিপিও ত' গল্প। এ গল্প তাহা হইতে স্বতন্ত্র; চরিত্রের বর্ণনা, বিবৃতি বা বিশ্লেষণ নয়, চরিত্রের বিকাশ বা রূপান্তর — যাহাকে ইংরেজীতে growth বা development বলে — এ সকল গল্প তাহারই গল্প; অর্থাৎ সেই যে শক্তির কথা বলিয়াছি, ইহা যেন তাহারই বিচিত্র ব্যক্তি-রূপের মুখর-কাহিনী — সেই গতির, পরিণতির সেই পরিমেয়ের মাত্রা ও পরিমাণ স্থির করিয়া লইয়া পরে তাহার গতিপথ নির্দেশ করে অঙ্কিত করা হইয়াছে। গল্পের সেই গতি-প্রেরণা চরিত্রের মধ্যেই আছে — সেখানে যদি একটুও হিসাব-ভুল হয়, তবে গল্পটাই মাটি হইয়া যাইবে। কারণ, ঐ চরিত্র নিজের গল্প নিজে সৃষ্টি

করিয়াছে — তারাশঙ্কর সেই চরিত্রের মধ্যেই সমগ্র গল্পটি সম্পূর্ণ আকারে দেখিয়া লইয়াছেন।

সত্য বটে, তাঁহার সকল গল্পেই চরিত্রের সহিত একটি নাটকীয় ঘটনা-চক্র যুক্ত হয় নাই। অর্থাৎ সকল চরিত্রই গল্পের আকারে পূর্ণাবয়বিত হয় নাই, তথাপি চরিত্রাঙ্কণের সেই শক্তির ক্রিয়া প্রায় সর্বত্রই লক্ষিত হইবে। 'রসকলি'র 'রসকলি'-নামক গল্পটিতেও তাহা যেমন আছে, তেমনি 'ডেপুটী'র 'ডেপুটী'তেও আছে। কিন্তু ঐ যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছি, তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'ডেপুটী'র 'না' গল্পটি। এই গল্পের গল্পত্ব যেমন নাটকীয় লক্ষণযুক্ত, ইহার পরিণতিও তেমন উজ্জ্বল, তেমনই ঘোরালো যে দুইটি চরিত্র অতিশয় দৃঢ় অথচ সূক্ষ্ম রেখায় চিত্রিত হইয়াছে — গল্পটির ঘটনাবাহুল্যে সেই দুই চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী বিকাশদ্বারা ঘটিতেই হয়; 'character is fate' বা 'স্বভাবঃ কর্মজং পুনঃ' — এই পরম সত্যটিই যেন এখানে তথারূপ ধারণ করিয়াছে।

আমি তারাশঙ্করের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকত্বের আলোচনায় এই যে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম, ইহাতেও হয় ত' আসল কথাটা স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারি নাই। জীবন বলিতে আমি কি বুঝি তাহা বলিয়াছি, বলিয়াছি — মূলে সে একটা শক্তি, আমাদের জ্ঞানে তাহা অন্ধ। সেই শক্তি মানুষের দেহ-জীবন আশ্রয় করিয়া, তাহার নিজেরই সেই দুর্জ্ঞেয় লীলার বেগে এক-একটি চরিত্ররূপে ফুটিয়া করিয়া যাইতেছে। আর কিছু নয়, কেবল তারাশঙ্করই তাঁর তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে যে ভাবে ও ভঙ্গিতে লক্ষ্যান্বিত হইয়াছে, ঠিক তেমনটি আমাদের সাহিত্যে পূর্বে ছিল না। তারাশঙ্করের সাহিত্য-সৃষ্টি আকারে বা আয়তনে — এমন কি পরিমাণেও — বড় নয়; তাঁহার সৃষ্টিশক্তির ঐশ্বর্যও নিত্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তার একটা কারণ, বাঙালীর জীবনে তাহার বিস্তারের ক্ষেত্র বড় সংকীর্ণ, যেরূপ শক্তির অবাধ লীলার স্থান বা পরিবেশ অতিশয় সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই সীমার, সেই সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে তারাশঙ্কর জীবনের একটি সম্পূর্ণ মূলগত রূপকে আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে দৃষ্টি অতিশয় বাস্তবনিষ্ঠ হইলেও বাস্তবাতীত; বাস্তবের ভিতর দিয়াই একটা রস-রহস্যের সন্ধান তাহাতে আছে। তিনি যেন অতিশয় দৃঢ়নিষ্ঠতে ও নিবিড়দৃষ্টিতে মানুষকেই এই জীবনে এক বিরাট পুতুলনাচের মঞ্চে কোন্ অদৃশ্য খালীকরের হস্তস্থত রজ্জুর আকর্ষণে নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন; সেই খালীকরের মতই নির্বিকারভাবে জীবনের সর্বত্র তাঁহার দৃষ্টি বিচরণ করিয়াছে — বীভৎসকেও যেমন, ভীষণকেও তেমনই, মধুরকে যেমন করুণকেও তেমনই, এক পংক্তিতে বসাইয়াছে।

এই দৃষ্টির মূলে আছে একরূপ বৈজ্ঞানিক পিপাসা; শুনিতে একটু অদ্ভুত বটে, কিন্তু সকল যথার্থ-জিজ্ঞাসাই বৈজ্ঞানিক। তারাশঙ্করের ঐ রসজ্ঞতা ও গল্পরসিকতাও যেন তৈথী, তেমনই তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও কারণ-জিজ্ঞাসা ঐ প্রতিভারই আনুষঙ্গিক। আমরা তাঁহার শিল্পকর্ম গুলির নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁহার শিল্পশালায় প্রবেশ করিলে উপকরণ-আয়োজনের প্রাচুর্য দেখিয়াও কম বিস্মিত হইব না। জীবনের রূপকার হইতে হইলে, জীবনের প্রথই পাঠ করিতে হয়; সকল রূপকারই অল্পবিস্তর তাহা পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই আপনাপন রুচি ও রসবোধের গণ্ডির মধ্যে তাহা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ, নিজ নিজ পিপাসায়—নিজ নিজ রসকল্পনার দৃষ্টিতে যেটুকু দেখিবার তাহাই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তারাশঙ্কর যেন জীবনকে, আগে একটা জিজ্ঞাসার পিপাসায় বসে — রসাস্বাদনের জন্য বা রসকল্পনার বসে নয়—তাহার কলকব্জা, তাহার জটিল জাল-গ্রন্থি খুলিয়া দেখিবার একটা দুর্দমনীয় কৌতূহলে — কেবল দেখিবার ও

জানিবার আকুল ইচ্ছায় — যা পরিশ্রম করিয়াছেন। গল্পের প্লট সংগ্রহ করিবার জন্য নয়, জীবনকে চোখে চুমুক দিবার মত সৌখীনভাবে একটু আস্বাদন করিবার জন্য নয়, আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভারতবর্ষ এবং ভ্রমণ-শেষে ভারত সম্বন্ধে মহা-বিজ্ঞতাপূর্ণ গ্রন্থ-রচনার জন্য নয়, জীবনকে এক পলকমাত্র ছাড়া-চোখে দেখিয়া, সেই দেখার অভিমানে পর-পর চইয়া জীবন-রহস্যের মহাসত্য বা জীবন-তত্ত্বের মহা-আচার্য্য বনিবার জন্যও নয়— কেবল জীবনকে দেখার জন্যই তাহাকে দেখার এই পিপাসা তারাশঙ্করের যেমন আছে, যা ছিল বলিয়া মনে হয়, ঠিক তেমনটি আমাদের আর কোন ঔপন্যাসিক বা গল্প-লেখকের ছিল বা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত একটি বিচিত্র রচনায় — যাহার নাম দিয়াছেন "হাঁসুলীর বাঁকের উপকথা।" এই রচনাটিকে কি নাম দিব? ইহা ঠিক গল্প বা উপন্যাস নয়, ইহা তারাশঙ্করের সেই অপর জুবার — সেই মানুষ ও মানুষের সমাজকে জানিবার দেখিবার, সেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-নিবৃত্তির একটি চমৎকার দলিল। একটি বিশিষ্ট উপজাতির জীবন-যাত্রা, তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম-বিশ্বাস, চরিত্র-নীতি, — তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও পরাজয়, তাহাদের জীবিকা এবং তাহাদের বাস-ভূমির ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক রূপ, এবং সর্বশেষে ঐ জাতিটার পুরাতন ও আধুনিক ইতিবৃত্ত — এই সকলই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কোন গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের জরিপ-বিভাগের তথ্য-সংগ্রহ-পুস্তকে ইহা অপেক্ষা সম্পূর্ণতর সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি ধন এবং আরেকটি চক্ষু ইহাতে সংযুক্ত হইয়া আছে। সেই যে জীবনের কথা বলিয়াছি, এই সকল নর-নারীর মধ্যে তাহাদের প্রাণের গঠনে, তাহাদের সাধারণ ও ব্যক্তিগত চরিত্রে — সেই জীবন বা সেই রহস্যময় শক্তির লীলা কোন্ ভঙ্গিতে কোন্ ছন্দে প্রকাশ পাইতেছে, তারাশঙ্করের দৃষ্টি সে বিষয়েও নিবদ্ধ আছে। এ দৃষ্টি মুখ্যতঃ কবি-দৃষ্টি নয়; এ দৃষ্টি সংস্কার-বর্জিত, বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিকের দৃষ্টি; এই দৃষ্টিই তারাশঙ্করের সকল রচনার আদি-প্রেরণা। এইখানে, এই বিষয়টি-রচনায় তাঁহার সেই স্ব-ধর্মই আর সকল প্রবৃত্তিকে পরাভূত করিয়াছে। এই রচনাটি পাঠ করিলে আমরা কোন গল্প বা কাহিনী-রস আস্বাদন করি না, কোন ব্যক্তি বা বিশেষ-চরিত্রই ইহাতে প্রধান হইয়া উঠে নাই — চরিত্রগুলি একটা বিশিষ্ট-জীবন-লয়ের গতি বা আবর্তের মিশানো ঘায়। এ মনোভাব শিল্পীর মনোভাব নয় — একরূপ সমাজ-বিজ্ঞানীর মনোভাব; তফাৎ এই যে, তাহাতে কেবল জড়বিজ্ঞান নয়, চিৎ-বিজ্ঞানেরও প্রলেপ আছে।

এই যে তারাশঙ্কর, ইনিই যখন জীবনের চিত্র-রূপ নির্মাণ করেন — যেমন তাঁহার গল্পগুলিতে করিয়াছেন — তখন যে তাহাতে একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের রসসৃষ্টি হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। সে-রস বাস্তবের রসই বটে, কিন্তু তাহার অন্তরালে একটা নির্মম অনাসক্ত তাত্ত্বিক-দৃষ্টি আছে; সেই দৃষ্টি যখন নর-নারীর জন্ম-মৃত্যুর উপর নিবদ্ধ হইয়াছে তখন তাহা খাঁটি আর্টিষ্টের নির্মমতায় পরিণত হইয়া, সর্বপ্রকার-মুক্তির যে-আনন্দ সেই আনন্দের রস-সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই তারাশঙ্করের আর্ট, আমি তাঁহাকে একজন তাত্ত্বিক রস-প্রেরণা বলিয়াছি; ইহার মূল দৃষ্টান্ত হিসাবে, তাঁহার গল্পে নর-নারীর প্রেম ও প্রেম-বিকারগুলি স্মরণ করিতে বলি। সে প্রেমে নীতি-দুর্নীতির দায় নাই — আছে কেবল প্রত্যেক চরিত্রে সেই প্রবৃত্তির ছন্দময় সঞ্চার।

'জলসাঘরে'র জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের প্রেম — স্নেহ বা প্রাণের পিপাসা নয়, সে একটা সৌখীন যাদন-বাতি; তাহার খেলার আবাদের সঙ্গে

উদ্ধৃত করে, নীতি-নীতির সঙ্গে তার কবিতা আমাদের প্রাণে সংক্রামিত করে, তাহাতেও দূরে থাকে ঐ চরিত্রের সৌন্দর্য-বীর্যের টুঁটেটি ছিঁড়িয়া। আমরা ঐ প্রেম কুড়াইয়া-বিছাইয়াও দেখি না, কারণ, তাহাতে elemental বা প্রকৃতিসুলভ প্রবৃত্তি : কোথাও বা একটা নারীর অপূর্ণ রূপে মুগ্ধ হইয়া একটা পুরুষ তাহাকে চুম্বন না করিয়া পারে না, — এই সাধারণ রূপ-মোহের মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তির কোন্ সূক্ষ্ম চেতনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ! আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম : তারাশঙ্করের ঐ সৃষ্টি কিরূপ রূপ-সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে — এই সংকেতটি অবলম্বন করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহার গল্পগুলি আর একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল চরিত্র যে এমন authentic বা অকৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ, তিনি কেবল উপরকার আবরণটাই দেখেন নাই ; সর্বত্র সেই রহস্যময়ী শক্তির, সেই জীবন-রূপিণী মোহিনী নর্তকীর — সেই বেদ-পুরাণ নীতি-শাস্ত্র-লঙ্ঘন-কারিণী বেহুলার "আয়ুহতা বরঞ্চিয়া — উপরে নশ্বরতা, অপরে চিরন্তনতা"-মূর্তি চোখের সম্মুখে রাখিয়াছেন।

পূর্বে বলিয়াছি, তারাশঙ্করের সাহিত্য-কীর্তি বড় বা বিশাল নহে, তাহার পরিমাণ বা বিস্তার কোনটাই সৃষ্টি-শক্তির প্রাচুর্যের পরিচায়ক নহে। তথাপি বাংলা সাহিত্যে, বা আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, বাঙালী-জীবনের কাব্য-কাহিনী-রচনায়, তারাশঙ্কর যে একটী বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার পরিমাণ এবং গঠন-রীতি যেমনই হৌক, একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি যে একটি গভীরতর রস-ধারা আমাদের সাহিত্যে, আমাদের জীবনের মৃত্তিকা-তল হইতে উৎসারিত করিয়াছেন, আমি এখন তাহারই একটা ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইবার, আমি যে-জন্য এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম — সেই কাদম্বরীর আলোচনা করিব, তারাশঙ্করের আর সকল গল্প উপন্যাস বাদ দিয়া আমি এবং কেবল ঐ একটি রচনাবলম্বনে আমার মনে যে-চিন্তাগুলির উদয় হইয়াছে, তাহাই একটু বিস্তারিত করিয়া চেষ্টা করিব।

* * *

(২)

তারাশঙ্করের পূর্ব-লিখিত গল্প ও উপন্যাস পাঠ করিয়া তাঁহাদের সেই রসরূপের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হইয়াছি, তেমনই তাঁহার অন্তরালে যে একটি অতি গভীর ও অতিশয় তীক্ষ্ণ জীবন-দৃষ্টির আভাস পাইয়াছি — আমি উপরে তাহার একটু আলোচনা করিয়াছি। প্রথম হইতেই এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, বাঙালী সমাজ ও বাঙালী জাতির জীবিতে জীবন- বাংলাদেশের একটা প্রাচীন বৃত্তিমূলে — গত দুইশত বৎসরের শিক্ষাবিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব এবং ধর্ম-বিপ্লবের আঘাত সত্ত্বেও, সেই বহুদূর হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া — বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি যেটুকু যে-অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে, যা বহু বিকৃতি সত্ত্বেও এখনও তাহার প্রাণধর্মের সেই প্রাচীন প্রবৃত্তিগুলা যতটুকু সক্রিয় আছে — তারাশঙ্কর জাতির সেই আদি-প্রাকৃতিক জীবন-কাহিনীর কথক বা কাহিনীকার-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুধু সেই প্রাকৃতিক জীবনই নয় — সেই সমাজের উচ্চ, মধ্য ও নিম্নস্তরের বাস্তুসংস্থানে কালের যত চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে, বাংলার মধ্য-যুগের — সেই মধ্যবর্তী-স্তরের — যে আভিজাত্য-গৌরব উচ্চবর্ণের সাক্ষ্য হিন্দুর জীবন-স্রোতকে বিশুদ্ধ করিয়াছিল, এবং সেই একই সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রকৃতিপুঞ্জকে শ্রীচৈতন্যের মহাবৈষ্ণব-ধর্মের যে গঙ্গা ডুবাইয়া ভাসাইয়া, ক্লেদে অন্তঃশলিলা করুণায় যত এখনও তাহার জীবনকে সরস করিয়া রাখিয়াছে —

কালস্রোতের সেই মূল তত্ত্বেরেখাও তিনি ধরিয়া রেখিয়াছেন, কোথাও তাহার অস্পষ্ট, কোথাও বা গভীরাঙ্কিত চিহ্ন তিনি ফুটাইয়া ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এ সকলই আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা যা মনস্তত্ত্বের প্রশ্নও অনুভব করিয়াছিলাম। আমি পূর্বে বলিয়াছি, তারাশঙ্কর তাঁহার গল্পগুলিতে যে-সমাজের যে জীবন-চিত্র — যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেন সেই স্থানের মাটিতে গড়া, ঐ মাটিতে তিনি যেন তাঁহার সাদা চিত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। এ কথা পূর্বে বলিয়াছি, আমার একটু সন্দেহ ছিল, তাঁহার সচেতন কবিবুদ্ধি যেমনই হৌক, তাঁহার সৃষ্টি ও সাহিত্যিক প্রতিভা যতই শক্তিমান হউক, একটা গভীরতর জাতিগত চেতনা (race-experience) তাঁহারও অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়াছে। যে সমষ্টিগত চেতনা একটা জাতির বিশিষ্ট জীবন-ধারায়—নানা যুগের নানা ভাব ও প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়াও নিজের সেই আদিম প্রাণধর্মকে পুষ্ট অথচ অবিচলিত রাখে—ইতিহাস যাহার বিবর্তনটাই বড় করিয়া দেখে, জীবিতের মধ্যে মৃতের সন্ধান করে, মৃতের জীবিত-রূপকে দেখে না—তারাশঙ্কর তাহাকেই গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন এই বাংলাদেশের এমন এক খণ্ড মাটিতে, যেখানে এই জাতির সেই আদি-প্রকৃতি, তাহার রক্তগত প্রবৃত্তি, এক কথায়, তাহার মানবতাই একটা অক্ষয় এবং বিশিষ্ট রূপ বহু পরিশ্রম করে করিয়া, এখনও এই বিশ্বেতরাজীতে নিজের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই 'কবি' নামক কাব্যখানিতে তারাশঙ্কর একটা জাতির সেই মর্মমূল উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—ঐ ক্ষুদ্র কাহিনীটিতে তিনি তাহার সেই সহজ বংশের ক্রম-লক্ষণ ধরিয়া দিয়াছেন। এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই আমি এই কাব্যখানির পরিচয়-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কাহিনীর নায়ক হইয়াছে একজন অজ্ঞাত-জাতীয় অশিক্ষিত যুবা—ইহার নায়িকা হইয়াছে যে-নারী সে সমাজ-পরিবৃত্তির বৈশিষ্ট্য। আমরা একেবারে বাংলার সেই প্রাক-প্রাগ্, ঐতিহাসিক যুগের সমাজে উত্তীর্ণ হই—যে-সমাজে যৌনবিপ্লবের ফলে আর্য বা ব্রাহ্মণ-শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। প্রায় প্রাক্-ঐতিহাসিক বলিয়াই এই জন্য যে, তৎপূর্বের বাঙালী-জীবন ও বাঙালী সমাজ কি ছিল—আমরা এখনে যাহাকে বাঙালী বলি, ঠিক তাহাই ছিল কিনা—তাহা কোন ঐতিহাসিক এখনও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। এ যেন সেই যৌবনের ও যৌবার মূল, যখন বাঙালীর সেই অনার্য রক্তের প্রকৃতি-প্রেম একটা নূতন তত্ত্বের প্রশ্রয় পাইয়া উজ্জীবন ও কৃতার্থ হইয়াছে। কোন বর্ণভেদ — কোন কঠিন আচার-সংযমের শাসন নাই, সেই হইতে পৃথক কোন আত্মার অভিমান নাই; আছে কেবল একটা অতিসহজীয় উৎকণ্ঠা; সে উৎকণ্ঠা একরূপ বিস্মৃতির আবেশে সারা প্রাণকে এমনি বিভোর করে যে, আর সবকিছুই মিথ্যা মনে হয়। এ জগৎ খাঁটি রস-রসের জগৎ; সেই রস-রসের রহস্যে রহস্যময় নরনারীর যে-জীবন তাহাই মহা-মহার্ঘ ও পরম-পবিত্র বলিয়া মনে হয়। ইহাই এই জাতিকে চিরদিন আবিষ্ট, মুগ্ধ ও উৎকণ্ঠিত করিয়াছে—ইহাই তাহার বাস্তবগত সংস্কৃতি। বাহিরে যত-কিছু ভাঙা-গড়া, যত বিপ্লব, যত নিত্য-নূতনের প্রভাব ও মাতামাতি চলুক না কেন, ইহার মাটিতে এবং ইহার সেই একান্ত প্রকৃতি-পরবশ দেহ-চেতনায় —ঐ এক বীজ চিরদিন অঙ্কুরোন্মুখ হইয়া আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণও যে-তত্ত্বের সাধনা করিয়াছিলেন, সহজিয়া-সাধক চণ্ডীদাসও তাহাই করিয়াছিলেন; আবার এই অতি-আধুনিক যুগের সাধক-কবি বিহারীলাল নূতন সুরে, সেই এক মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত-কবি রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রভাব হইতে নিস্তার পান নাই;

আত্ম-সম্বন্ধের — উপনিষদের — শিক্ষা লাভ করিয়াও, বাঙালী-স্বভাবের সেই প্রাণের উৎসটা এখন শুকাইতে পারেন নাই। তিনিও আত্ম-প্রাণের নূতন ভাষা-চ্ছন্দ করিয়া, ব্রহ্মকে প্রকৃতির রূপে ধ্যান করিয়া রূপসের রহস্যলোকে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহারও কবি-জীবনে ঐ আত্ম-অন্বেষাত্মিকতা এবং অনাদি বাঙালীর প্রকৃতি-প্রেম-বিশ্বাসিতা — একদিকে আন্তর্জাতিকতার উচ্চ-আদর্শ ও অপরদিকে সকল নীতি ও নিয়ম-নিষেধ বিসর্জন দেই সহজিয়া বৈষ্ণবতার সমাবেশ — এই দুয়ের ফলে, শেষ পর্যন্ত যে তিনির প্রকৃতিই জন্মী হইয়াছে। যাহারা তাঁহাকেও ধরিতে হইয়াছে, এই জীবনের মত পরমসুন্দর আর কিছুই নাই, মরণের পারলোক তেমন কেহ নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুঃখ নাই; প্রাণের পিপাসাই একমাত্র সত্য, এবং সে পিপাসা মিটাইতে হইলে সব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে একেবারে — ইহাদের বৈশিষ্ট্য মানুষীর সাধনা করিতে হইবে। তাহাদেরই ঐ 'কবি' সেই একই সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছে; কিন্তু সে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে জীবনের দূর-সৃষ্টির ফলনে, প্রেরণার প্রকৃতির সহযোগে, সেই তান্ত্রিক পদ্ধতিতে — যে তত্ত্ব বাঙালীরই জীবন-তত্ত্ব, যাহার নাম প্রকৃতি-উপাসনা।

এই সূত্রে আমরা সেই প্রকৃতিকে — বাংলার ও বাঙালীর প্রকৃতিকে — যে-রূপে ও রসে এবং যে-মহত্তায় উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত হইতে দেখি, তেমনটি বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও দেখি নাই। ঐ কবি যে-সমাজের সর্বনিম্ন স্তরদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সেই সমাজ উপরকার সভ্যতার, বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতির চাপে, পতিত ভূমিকা-প্রোথিত ঘাস। উহার উপরে কলিমার আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সংস্কৃত আছে এবং আভিজাত্যের বাবু অর্থাৎ উর্দুওয়ালী-পড়া চামুড়িয়া বাঙালী আছে; কিন্তু উহারই দেহ হইতে, এক উহারই প্রকৃতি-মূলের তলিতে ও সুরে, যে জীবন-রীতি উৎসারিত হইয়াছে, তাহারই যাহার মূল সূত্রই ঐ 'কবি'র চরিত্রে এমন নিখুঁত করিয়া প্রাণবন্ত ও স্নেহময় করিয়া দেখাইয়াছেন, বাঙালীর সমগ্র সাধনা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি উহাতেই ধরা দেয় নাই? সে বৈশিষ্ট্য কি? এই কাহিনীতে তাহার সবটাই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথমতঃ, এ জাতির আভিজাত্য-গৌরব বলিয়া প্রকৃত কোন গৌরব নাই; ইহার গৌরব — সর্ববিশেষত্ববর্জিত, উচ্চ-নীচ-অভিমানহীন, ঐ কৃষির মতই সরলতা-বাহিনী একটি অতি সরল অকৃত্রিম মানবতায়। সেই মানবতার মূল মন্ত্র — জীবনকে যতদূর সম্ভব ঝঞ্ঝাটমুক্ত করিয়া, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ-বাহুল্য, ঐশ্বর্যের দুরাকাঙ্ক্ষা, এবং লোকব্যবহারের সর্বপ্রকার কৃত্রিম বন্ধনজাল অস্বীকার করিয়া, ব্যক্তি-মানুষকে যতদূর সম্ভব মুক্তিদান করা। সে মুক্তিও একরূপ জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ এই মরজ-জন্মেই, দেহের এই পিপাসাকেই নির্বিষ করিয়া — দেহের অন্তরে যিনি আছেন তাঁহার ভোগের বৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া — দুটাকেই অমর করিয়া তোলা। কথাটা ভাষার কুয়াশাতে গিয়া এইরূপ জটলাটী হইয়া পড়িল; কিন্তু পাঠক-পাঠিকাগণ ঐ গল্পটী পড়িলেই ইহার মর্ম অনুভব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীর ঐ যে নিজস্ব জাতিগত বা রক্তগত আকৃতি, তাহা সমাজের উপরের স্তরে শাস্ত্র-শাসনের ও সমাজ-বন্ধনের কঠিন জমাটে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলেও, ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত সকলের চিত্তে উহা সমান; সমাজের ঐ কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও, ভাবের বা অনুভবের ক্ষেত্রে একটী আশ্চর্য সমানুভূতি সমগ্র জাতিকে সমপ্রাণ করিয়া রাখিয়াছে — এমন দুই-একটী স্ত্রী আছে যাহাতে বক্তার দিলে আর সকল স্ত্রী ঐক্যতানে বাজিয়া উঠে, — ইহাও দেখিতে পাই। এমন স্ত্রী হয়ত আর সকল জাতিরও ঐরূপ দুই-একটা আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেখানে

শ্রেণীতে পৃথক সাধনারও প্রবর্তন। এই শ্রেণীর সৃষ্টি এ যুগের বাঙালী-সমাজেও হইয়াছে — শহর ও শহরতলিতে অল্পশিক্ষিত ঐরূপ শ্রেণীর অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু সেই শ্রেণী বিশালতর বাঙালী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট হইয়াই আছে; আমরা শহরবাসীরা ঐ শ্রেণীকেই জানি ও চিনি, তাই তাহাদেরই মন দিয়া বাঙালীকে বেশি বুঝি বলিয়া ভুল করিয়া থাকি। আসলে, আমরা, অর্থাৎ এই নূতন পরাধীন-শ্রেণীর বাঙালী — পরধর্ম ও পরবিদ্যা-পরিচিত বাঙালী — জাতির সেই চেতনা হইতেই বহু হইয়া পড়িয়াছি। শ্রেণী-কথাটির উপরে জোর দিবারও আবশ্যক আছে, কারণ, খাঁটি বাঙালী-সমাজে বৃত্তিগত জাতি-উপজাতি-ভেদ ছিল বটে, ঐ রূপ শ্রেণীভেদ ছিল না; তার কারণ, তাহার ঐ ব্যবস্থা — ভাব ও মন-জীবনে স্বাভাবিক সাম্য-প্রবণতা। এই 'কবি'ও জাতিতে ডোম বটে, কিন্তু তাহার ঐ ভাবসাধনায়, বাক্যে ও তাহাতে কিছু মাত্র ভেদ নাই। সেই জন্য, আমরা যাহাকে সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলি তাহা নয়; অর্থাৎ কোন জাতির জীবনযাত্রার উপরে তা নে একটা বৈধ-পদার্থের মত আস্তরণ মাত্র নয়; উহা তাহার জীবনের সর্বস্ব-সঞ্চারী প্রাণ-রস, উহাই তাহার জীবনী-শক্তি — উহাতেই সে বাঁচিয়া আছে। ঐ 'কবি'র মধ্যে সেই প্রাক্‌শ্রেণীর গভীরতম ও বিশুদ্ধতম বিকাশ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সেই ভাব — যাহা বাঙালীর ঐ সমাজ-জীবনের নানা বন্ধন ও নানা অন্যায়কর সংস্কার-অজ্ঞানের তলায় পড়িয়া জীবনের গতিধারায় বিশ্লিষ্ট ও বিপর্যস্ত হইয়া থাকে — তাহারও সাধনমার্গ আছে; অর্থাৎ, যাহা হৃদয়স্থ, তাহাকেই বীজরূপে আশ্রয় করিয়া সেই বীজের পূর্ণবিকাশ-সাধনের একটা নিজস্ব পন্থাও আছে। এই পন্থাও প্রকৃতির পন্থা; ইহা শাস্ত্রনির্দিষ্ট নয়, ইহার পথ বাঙালী আপনার অনুভূতি — অর্থাৎ নিজ অন্তরের ক্ষুধা-অনুযায়ী আপনি খুঁজিয়া লয়। ইহারই নাম 'সহজিয়া'। — বাঙালীই এই মন্ত্রের আদি সাধক। সে কেমন সাধনা, এ মন্ত্রের ঐ 'অধিষ্ঠান' বাক্যই তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ইহাও এক অর্থে প্রকৃতি-সাধনা, অর্থাৎ ইহাও তান্ত্রিক। কিন্তু বাঙালী শ্মশানে বা ভৈরবী-চক্রে বসিয়া ও সাধনা করে না — তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি; সে জীবনের পাত্রেই জীবনের রসমাধুরী পান করিতে চায় — তুচ্ছ ঐহিক-পিপাসাকে রুদ্ধ করিয়া নয়, তাহাকেই শোধন করিয়া, নির্মল করিয়া; সকল কামনা-বাসনা-সংস্কারকে — স্নেহ-প্রীতির সহজাত ক্ষুধাকে — একরূপ রসে পরিণত করিবার যে শক্তি, তাহারই সাধনা করে। তবু ঘাট, এই প্রবৃত্তি অধ্যাত্ম-গভীর হইয়া বিভিন্ন যোগ-মার্গে বা গুহ্য-সাধন-মার্গেও প্রয়াণ করিয়াছে; কিন্তু তাহা জাতিহিসাবে নয় — সে সকল সাধনা সাধারণ-জীবন-ধারার বাহিরেই রহিয়া গেছে। তাই বাঙালী শাক্তই হোক, আর বৈষ্ণবই হউক, সে যে-স্তরেরই হউক, সে যে-স্তরেরই দীক্ষিত শিষ্য হউক — আসলে সে ঐ সহজিয়া। মহাশক্তিকেও যা মা বলিয়াই ভজনা করিয়া সে তাহার সেই সহজ পিপাসা না মিটাইয়া পারে না; শাক্ত বাঙালী ও বৈষ্ণব বাঙালীতে এই মাত্র ভেদ যে, একজনের বাস্তব-বিমুখতা কিছু বেশি, অপরে সেই বাস্তবকেই গূঢ়তর রসরূপে ভোগ করিতে চায়। আমি এমনও বলিতে পারি যে, ঐ 'সহজ' ভেদও উপরকার সেই সমাজবন্ধনের মতই কৃত্রিম; বাঙালী আসলে শাক্তও নয়, বৈষ্ণবও নয়, বৌদ্ধও নয়, বেদান্তীও নয়; সে সকলই কতকগুলা বাহিরের ছাঁচ মাত্র; সে-ছাঁচে সে যেমন গড়ে তেমনি ভাঙে; তাহার ভিতরকার সেই তরল বস্তুটা চিরদিন তরলই আছে। ছাঁচগুলা ভাঙিয়া তাহা দেখিবার সুবিধা হইবে না, তাই তাহাদের,

প্রকৃতি সকল কবির প্রাণের; তবে তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের
এরোড্রোমিক্স — রাইট বা ফরিয়ে নহে। গদ্যকবিরা হলেন, বৈজ্ঞানিক
প্রকৃতি তাহার মুক্তপক্ষেরই এই সকল কাব্যের নায়ক।

সরস্বতী

[এই প্রবন্ধ ১৩০১ সালের 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল,
লেখক স্বর্গত উমেশ চন্দ্র বটব্যাল।]

বঙ্গদেশে সরস্বতী দেবীর পূজামহোৎসব শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। সরস্বতী সাহিত্য-সেবকের নিত্য-উপাস্য দেবতা। সাহিত্য-হিতৈষীরা সেই উপাস্য দেবতার ইতিহাস পর্য্যালোচনায় আনন্দলাভ করিবেন বিবেচনায়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে অগ্রসর হইতেছি।

দেবতার আবার ইতিহাস কি? — আছে; দেবতারও ইতিহাস আছে। মনুষ্যের উন্নতির সহিত মনুষ্যের উপাস্য দেবতারও উন্নতি, অবনতির সহিত অবনতি হইয়া থাকে। সরস্বতীদেবীরও তদ্রূপ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস উন্নতির ইতিহাস কি অবনতির ইতিহাস, আমরা তাহার বিচার করিব না। পাঠকদের উপর তাহার বিচারের ভার রহিল। আমরা ইতিহাস লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

সরস্বতী অতি প্রাচীন দেবতা। ভারতে আর্য্য-উপনিবেশ-সংস্থাপনের পূর্ব্বেও সরস্বতী দেবতা বলিয়া পূজা হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল যেমন তাঁহার প্রতিমা গঠিত হয়, পূর্ব্বকালে তেমন প্রতিমা নির্ম্মিত হইত না। এক্ষণে সরস্বতী একটি বীণাপাণি স্ত্রীর মূর্ত্তিতে আমাদের চর্ম্মচক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু পূর্ব্বকালে তাঁহার তাদৃশী মূর্ত্তি কল্পিত হইত না।

সরস্বতী সম্বন্ধে এক্ষণে একটি কুৎসিত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মার কন্যা, তাঁহারই পত্নী। যে দুরভিসন্ধি করিয়া কল্পনায় এই ঘৃণিত আখ্যায়িকার জন্ম, সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র তাহাকে ধিক্কার না করিয়া থাকিতে পারেন না।

গণিকাগৃহে আজকাল সরস্বতীপূজার বড় ধুম। সরস্বতীকে কেহ কেহ বিশেষতঃ কলাবিদ্যার দেবতা বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন সরস্বতী ঐরূপ ছিলেন না।

তন্ত্রলোকের গুরুও একে যে সরস্বতীর প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় তাঁহার ষোড়শীর বক্ষঃস্থলের উল্লেখ করিয়া পূজা করা হয়। ইহাতে সরস্বতীদেবীর মনে কি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা তিনিই জানেন।

ব্রহ্মার, বিষ্ণুপতি ও ভালচন্দ্রের কোপে, সরস্বতীর এই পরিণাম ঘটিয়াছে। প্রাচীন সরস্বতীকে হাতে গড়া হইত না, অঙ্কিত বা মন্ত্রপূত করা হইত না, এবং তিনি একটি প্রবলীর কলাবিদ্যাবিশারদ অসম্ভ্য বলিয়াও উপাসকের পুষ্পাঞ্জলি পাইতেন না। বলিতে কি, প্রাচীন সরস্বতীর কোনও মূর্ত্তিই ছিল না।

এক্ষণে যে সকল বৈদিক শব্দ অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তন্মধ্যে "সরস্" একটি। সরস্ শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ; বেদে তদ্ভব সূর্য্যের একটি বৈদিক নাম "সরস্বান্"। সরস্বতী, — অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা।

এই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতার অপর নাম "বাগ্‌দেবী"। এ স্থলে 'বাক্' অর্থেও সাধারণ বাক্যমাত্র বুঝিলে ভ্রম হইবে। যাহা বেদাত্মিকা বাক্, তাহাই এই বাক্ শব্দের অভিধেয়। বাগ্‌দেবী — অর্থাৎ, বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ঋষিরা সকল পদার্থেরই, বিশেষতঃ সৎপ্রকারে

উহাই ঐশ্বর্যের বিষয়ক পদার্থসমূহের অধিদেবতা কল্পনা করিতেন। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'অগ্নি,' বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'বায়ু', সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'সূর্য', এইরূপ। তদ্রূপ বেদবাক্যরূপ উহাই বাক্যার্থসিদ্ধির এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছিল, — এবং তাহা একটি অদ্ভুত জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া তাঁহার সরস্বতী বা জ্যোতিষ্মতী, এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল।

এই নাম রক্ষিত হইবার পরে, আর্যেরা যখন কালে যথাবর্ত্ত নামক জনপদে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তখনকার এক নদী-বিশেষেরও 'সরস্বতী' এই নাম সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই জনপদে অগ্নিরা ও অথর্বা নামক ঋষিগণ, এবং যজু ও স্তোত্র প্রভৃতি আদিম গ্রন্থাপয়িতৃগণ, সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে 'যজ্ঞ' নামক উপাসনাপ্রণালীর প্রচার করেন। বেদবাক্য দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্বাহিত হইত, এবং বেদবাক্যের অপর নাম 'ব্রহ্ম' বলিয়া, এই জনপদ সরস্বতী সমেত 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া বিখ্যাত হয়। ব্রহ্মাবর্ত্তের একদিকে তখনকালে একটি লবণাক্তমিনী গভীর নদী প্রবাহিত ছিল। সেই নদীর তীরেই যাজ্ঞিক ঋষিদের প্রায় ও আবাসস্থান ছিল। তথায় তাঁহারা সংবৎসরকাল স্থায়ী 'সত্র' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। সংবৎসর তথায় বেদধ্বনি হইত বলিয়া, তাহা যেন বাগ্‌দেবীর বাসস্থান বলিয়া প্রতীত হইত, এবং কালক্রমে তাহারও 'সরস্বতী' এই নাম প্রাপ্ত হইল।

জ্যোতিঃস্বরূপিনী বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইক্ষণে এক নদীবিশেষেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে পরিণত হইলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা সমবে সরস্বতী বলিলে বাগ্‌দেবীকেও বুঝাইত, এবং নদী-বিশেষের অধিষ্ঠাত্রীকেও বুঝাইত। মধুচ্ছন্দা সরস্বতী বিষয়ে যে একটি মন্ত্র রচনা করেন, — তাহা অতি কৌশলে রচিত হইয়াছিল : তাহার এক পক্ষে বাগ্দেবী-কেও বুঝায়, অপর পক্ষে সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রীকেও বুঝায়।

সেই মন্ত্রটি এই :—

পাবকা নঃ সরস্বতী — বাজেভির্বাজিনীবতী
ধীনামবিত্র্যবতু।
বাজেভির্বাজিনীবতী — চোদয়ত্রী সুনৃতানাম্।
চোদয়ত্রি মেধাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী। — যজ্ঞং দধে সরস্বতী।
বিধাতে বিশ্বা ভুবনানি।

"পবিত্রকারিণী (১) অন্নবতীস্বরূপশক্তিযুক্তা (২) * যজ্ঞ-রক্ষাকারিণী (৩) সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। মনোরথ বেদবাক্য সকলের প্রেরয়িত্রী, সুকৃত ব্যক্তির উদ্বোধনকারিণী, (৪) সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করিয়াছিলেন (৫)। তিনি সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া শোভাময় করেন।"

বাগ্দেবীর পক্ষে ইহার অর্থ এই :—

"যিনি মনুষ্যের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্মল করেন, যিনি বজ্রশালিনী এবং অন্নদাত্রী, সেই সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। তিনি সুকৃত ও সত্য

---

(১) মূল — "পাবকাঃ।"
(২) মূল — "বাজেভিঃ।" বাজেভিঃ অন্নৈঃ উপলক্ষিতা ইত্যর্থঃ।
(৩) মূল — "বাজিনীবতী।"
(৪) মূল — "সুনৃতানাম্।" এখানে ঋতি শব্দের অর্থ ঋতি।
(৫) মূল — "যজ্ঞং দধে।" অর্থাৎ, সরস্বতীতীরেই প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তে যজ্ঞপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বাক্যের প্রেরয়িত্রী, তিনি বুদ্ধির উদ্বোধনকারিণী — তিনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্রী। তিনি মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম পরমাত্মার চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেন; তিনি মনুষ্য নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন।"

যিনি বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর মনোহর স্তুতি কি হইতে পারে? — তিনি "পাবকা", — আমাদের হৃদয়ের কামক্রোধাদিরূপ মল তিনি দূর করেন। তিনি আমাদের হৃদয়মন্দিরকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের যোগ্য করেন। তিনি যজ্ঞশালিনী; — তিনি যজ্ঞকার্য্য দ্বারা বেষ্টিতা। তিনি অন্নদাত্রী, — কেন না, তাঁহার প্রসাদে মনুষ্যেরা দেবতার উপাসনা করিয়া দেবতার অনুগ্রহে ভূরিদাতৃ ফল বলিয়া ধরিয়া বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যের হৃদয়ের শুচিতা — মনুষ্যের জিহ্বার মনোহর সত্য বাক্য — সরস্বতীরই কার্য্য। শুচিতা ও সত্যবাক্য বেদানুশীলনের ফল। সে কালে যজ্ঞই প্রধান সৎকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুরাদি অপানের দ্বারা জীবের তৃপ্তিসাধন করা, যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। আজিও কথা-কথায় 'বলি' বা 'যজ্ঞ' বলিলে, বৃহৎ ভোজ বুঝায়। যজ্ঞ-শব্দে সৎকর্ম্ম বুঝিলে, বেদই সৎকর্ম্মের মূলাধার; কেন না, বেদে ঈশ্বরের প্রীতিকামনা করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের উপদেশ দেয়। আর বেদ হইতে আমরা মহাসমুদ্রের ন্যায় অনন্ত পরমাত্মা কি, — তাহা বুঝিয়া থাকি, বিশেষ, — 'কেতুনা', চিহ্নের দ্বারা। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকৌশলের চিহ্ন আমাদের চারিদিকে জাজ্বল্যমান। সেই সকল চিহ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বেদ বলেন, দেখ, এই বিশ্বরচনা দেখ, — এত বিস্ময়কর বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি না হইয়া যায় না! এইরূপে সরস্বতী স্বাভাবিক অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন মনুষ্য-হৃদয়ে এক স্বর্গীয় জ্যোতির সঞ্চার করিয়া দেন।

সংস্কৃত 'বাক্' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; তাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আমি সরস্বতী স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন; তিনি এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ-মাত্র। যেমন সূর্য্যের আলোকে বৃক্ষলতাদি প্রকাশ হয় — তদ্রূপ এই অদ্ভুত জ্যোতির আলোকে ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকাশ হয়েন। এই জ্যোতিঃ বেদবাক্যের মধ্যে বাস করে। যখন সরস্বতীর উপাসনা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এই নিরাকার জ্যোতিঃই দেবতা বলিয়া উপাসনার্হ হইয়াছিল। — এখন কি আমরা মহাকবি কালিদাসের ন্যায় এরূপ আশা করিতে পারি যে, 'কবিমহতী সরস্বতী' তাঁহার প্রিয় ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার 'মহীয়সী' হইবেন?

মহাত্মার মুক্তি

মহতশ্চিত্তপ্রসাদস্য মহতঃ প্রভবস্তিতিঃ।
নির্বৈরৈঃ সর্বভূতেষু যঃ স যাতেতি পাণ্ডব॥

ভগবদ্গীতাবিদ্যার আচার্যগণের এক সম্প্রদায় ভেদ করিলেন: অমায় না বলিয়া নাটকের অঙ্ক ধরিলেই ঠিক হয়, এবং তাঁহার পক্ষে যাহা অনিবার্য, ও আমাদের পক্ষে মহাদুঃখের হাহাকার টানিয়াছে, তাহারই চতুর্থ ঊনত্রিংশ যবনিকাপাত হইল,—মহাত্মার লীলাবসান সেই চতুর্থ অঙ্কেরই চরম মুহূর্ত। অতঃপর, নাটকীয় ঘটনা-প্রবাহের এই উচ্চ তরঙ্গশিখর আমরা ভবিষ্যতের বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে লুটাইয়া পড়িব; নিম্নস্থ নিশীথরাত্রি এই অভিশপ্ত ভূমির উপরে ছায়াবী-তপস্বিনীর মত ধ্যানাসন পাতিয়া;—চিরদুঃখী, না নবজীবনের মন্ত্রপাঠ করিবে, কে জানে!

* *

মহাত্মার জীবন-লীলা যে এমন করিয়া অবসান হইবে ইহা দুঃস্বপ্নেরও অগোচর, তথাপি আশ্চর্যের কারণ ঘটিয়াছিল। ইদানীং তিনি যেন জগৎ-সংসার মানুষ সকলকেই তুচ্ছ করিয়া, দূরত্বে তাঁহার অন্তরে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন—নিজ-জীবন ভগবানকে নিবেদন করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। নোয়াখালি হইতেই তাঁহার এই মনোভাব আমাদের নিকটে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি ক্রমেই যেন সকল কিছুর ফলাফল-চিন্তা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাহিরে চতুর্দিকে মানুষের সমাজে যাহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহার মত ভাবগুরু মহাপুরুষের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তাই যেন, তিনি ক্রমে আরও বেশি করিয়া তাঁহার সকল ভাবনার ভার ইষ্টদেবতাকে সমর্পণ করিয়া মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হইতে চাহিয়াছিলেন। যে-অর্জুনকে তিনি তাঁহার আত্মার সকল শক্তিসাধ্য যুদ্ধ করিয়া ধরিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার প্রাণবায়ু, তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত ছিল, তাহাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই—জগতের কঠিন পাষাণ-প্রাচীরে এই অর্জুন কায়ার অঙ্ক অকম্পিত করাঘাত করিয়া, তিনি তাঁহার শক্তি নিঃশেষ করিয়াছেন। জগৎ সাড়া দিল না: কখনো দিবে কি না তাহা মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসই জানে—আজ সে চিন্তাও নিরর্থক। অতীতের ইতিহাস ও মানবপ্রকৃতি এই দুয়ের নিক্ষে, বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে যজ্ঞানল জ্বলিয়াছে,—তাহারই ভাগ্নীয় বেদীতে তিনি আত্মাহুতি দান করিলেন।

* * * *

মহাকাল তাহার বলি গ্রহণ করিয়াছে—এ বলির প্রয়োজন ছিল কিনা, তাহা আমরা জানি না; মহাত্মা গান্ধীর মত পুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব সাধারণ ঘটনা নহে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার ঠিক বুঝিবে না। এই হত্যা সাধারণ হত্যা তো নহেই; শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়—জগতের ইতিহাসেও এমন ঘটনা ঠিক এমন ভাবে আর কখনো ঘটে নাই। যাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে, তাঁহার

দিকেও যেমন, তেমনি যে এই হত্যা করিয়াছে তাহার দিকেও চাহিয়া আমাদের দৃষ্টি বিস্ময় এবং ভক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়। মানুষের সর্বপ্রিয় দুর্বলতা অস্বীকার করিয়া যে পুরুষ মানবত্বার জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন একদিকে তাঁহার সেই শান্ত-সমাহিত, স্নেহ-কোমল জ্যোতির্ময় দেহখানি, অপরদিকে একজন আমারই হতভাগ্য মানুষ তাহার উদ্যত ভবের অন্ধ রোষাগ্নি সেই দেহ লক্ষ্য করিয়া শিখাসহ ঘৃণা উদ্গিরণ করিয়াছে! কিন্তু মহাত্মাকে সত্যই কি কেহ হত্যা করিয়াছে? তাহা কি কাহারও পক্ষে সম্ভব? ঐ আততায়ী একটা নিমিত্তমাত্র নহে কি? তিনি কি নিজেই নিজের জীবনটা ঐ রূপে উৎসর্গ করেন নাই? তাঁহার চতুর্দিকে আমরা যে শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছি সেই শোকের তলদেশে তদপেক্ষা গভীর একটা আক্ষেপ, একটা হাহাকারের ঘূর্ণি নাই কি? মহাত্মাকে আমরা বাঁচাইতে পারি নাই, বাঁচাইবার চেষ্টা করি নাই — ইহাই সত্য।

• • •

যে সত্যকে তিনি দৃঢ়রূপে নিজ জীবনে ধারণ করিয়াছিলেন — সে সত্যের সাধন-পথে ইদানীং তিনি বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছিলেন। মহাত্মার সেই সত্যাগ্রহের একটা ক্ষুদ্রাংশও আমরা কখনও আমাদের ধর্ম বলিয়া অন্তরে গ্রহণ করিতে পারি নাই। মহাত্মা যে অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, আমরা তাহা মানি নাই; আমরা নিজেরাও যেমন বিদ্যা অভিমান করিয়াছি, তেমনই, আমাদের আপামর নর-নারী সেই আদর্শকে সত্যই বরণ করিয়াছে এই আত্ম-প্রবঞ্চনা-মূলক বিশ্বাস আমরা করিয়াছি। মহাত্মা তাহা জানিতেন, তথাপি তাঁহার সরল বিশ্বাস তাঁহাকে এমনি মুগ্ধ করিত যে, তিনি তাঁহার কোটি ভক্তের সেই তামসিক অভিনন্দনে পুনঃ পুনঃ ভ্রান্তিমুক্ত হইয়াও — পুনরায় মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। ইহাই তাঁহার ঐরূপ দেহত্যাগের কারণ হইয়াছে। তাঁহার মোহান্ধ-নিধনের দায়ের আমরা কম শঙ্কিত হই নাই; শিশু সাপকে আলিঙ্গন করে না — মহাপুরুষেরও একরূপ শিশু; কি কারণে কেন যেমার কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না — তাহা আমরা, কেবল তাঁহার মাহাত্ম্য প্রমাণ করিবার জন্য, ভাবিয়াও দেখি নাই; ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা আমাদের পাপকে কেবল ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি — পাপ-মুক্তির ত্রাণ করিয়া তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা ও বিশ্বাসকে কেবলই প্রতারণা করিয়াছি।

• • •

ইহার পর পঞ্জাবে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তাহার দুদিনের মোহাবাদি, কলিকাতা ছাড়া হইয়া গেল। এই অবস্থায় একটা বৃহৎ মানবসমাজ যখন হতাশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে মহাত্মা কলিকাতা ও নোয়াখালির মর্ম সেবনের প্রয়োগ করিতে চাহিলেন। কলিকাতায় যে অলৌকিক সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল — দিল্লীতেও তাহা না ঘটিবে কেন? এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এ অগ্নি নির্বাপিত করিবার ভার মহাত্মার নয় — যাহাদের কাজ, তাহারা যদি সকলে শক্তি ও পৌরুষের সহিত তাহাতে অগ্রসর হইতে পারিত, তবে মহাত্মার আত্মাহুতির প্রয়োজনই থাকিত না। তাঁহার এই সরলতা ও বিশ্বাস যেমন দেবশিশুর মত, তেমনই সেই বিশ্বাসই তাঁহার জীবন-নাশের কারণ হইয়াছে। এই কথা স্মরণ করিয়া মানুষমাত্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে — আমরাও ইহাই চিন্তা করিয়া ঐ ঘটনার মর্মান্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছি।

মহাত্মার সংকল্প, তাঁহার আচরণ, এবং উদ্দেশ্য [illegible] বিচার আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে করিবার সাধ্য ও অধিকার নাই; বিদ্যা ও বুদ্ধির অভিমান চিরদিনই মানুষের অধোগমন। আজ এই সকল চিন্তা করিতেও হৃদয় যেন অবসন্ন হইয়া পড়ে; ভারতের আকাশ জুড়িয়া ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে,

গান্ধীজী আততায়ী-হস্তে জীবন দিয়াছেন বটে; কিন্তু আমরা যতই অস্বীকার করিতে চেষ্টা করি, তথাপি ইহাই সত্য যে, আমরাই তাঁহার ঐরূপ পরিণামের জন্য দায়ী। তাঁহার একমাত্র দুর্বলতা ছিল এই যে তিনি প্রেমী ছিলেন; যেমন, একজন জানিয়াও বলা হয়ে: আগুনে হাত না দিলেও আগুন হাত পোড়ায়। তিনি অন্তরের অন্তরে জানিতেন, ঈশ্বর হস্তে এই জাতি গ্রহণ করে নাই, কেবল তাঁহার বাক্তিগত চরিত্র ও সেই মূর্তিটাই পূজা করিয়াছে — সেই ভক্তিটুকুই সত্য; তাহার পরে আর কিছুই সত্য নহে। ইহা বুঝে না, বুঝিবার ইহার মানে না, যে শক্তি তাঁহার নাই থাকিতে পারে না বলিয়াই নাই — তাহারা কেবল তাহার ভান করিয়াছে মাত্র। যদি সেই বিশ্বাস সেই শক্তি সত্যকার পাঁচ জন লোকেরও থাকিত, তবে স্বাধীনতা যে পথের কথা — এই জাতি সেইদিন মুক্তির অধিকারী হইত। এই নিষ্ঠাচার ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কংগ্রেসের শিবির পোষিতে, সর্বাঙ্গে ইহার লক্ষণসমূহ গান্ধীজীও দেখিয়াছিলেন; এবং ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, দয়া ও অহিংসার কেবল একজন ব্যক্তি উপাসক অবশিষ্ট আছে — সে তিনি নিজে। এই ধারণা যতই বৃদ্ধি পাইয়াছে, ততই তিনি নিজের বিশ্বাসে আরও দৃঢ় ও কঠোর হইয়া উঠিয়াছেন। পৃষ্ঠ, মুখ বা চৈতন্য — কাহাকেও এতখানি বিপন্ন হইতে হয় নাই; মানুষের ইতিহাসে এতবড় সমস্যা — এত বড় বিপদ পূর্বে দেখা দেয় নাই। আজ মহাত্মার এই আত্মবলিদানের পরেও কি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে না যে, তিনি আমাদের পাপ গ্রহণ করিলেন না — যা বিধাতা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দিলেন না? তিনি যে-পাপ গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই পাপেই কি হত্যাকারীর রূপে তাঁহার প্রাণ হরণ করিল না? মহাত্মা তাঁহার জীবনের শেষ কয়দিনে, মানুষের নিয়তি, তথা ভারতের কোন্ দুর্দশা যথা শান্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি — কিন্তু আভাসও ইঙ্গিতেও পাইয়াছি। অন্ততঃ এই দুঃখের এই দুর্দিনক্ষণে তিনি যে ব্যর্থ-কাম হইয়াছেন, এই জ্ঞান হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। ব্যক্তি-সত্তা যতই অক্ষুণ্ণ যতই প্রাণিক হউক, তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতেই হইবে। আজ মানবাত্মার এক কালে যে তীব্র আত্মদহনের আয়োজন ও অনুষ্ঠান চলিতেছে, সেই আত্মদহনের সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ আততায়ীরও সৃষ্টি হইয়াছে; সেই প্রতিক্রিয়ার মুখেই ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের এইরূপ মোড় ঘটিয়াছে — ইহা কি সত্য নহে? শুধু তিমিরে চাহিলে হইবে না, ঐ বাহিরের পানেও তাকাও; ঐ পাপের ঈষৎ-স্ফুট নয়নাবলী সমস্ত ভারতের সুখ-শান্তি, মানবাত্মার সর্বনাশ সম্পাদনেও প্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই নয়নের বিষবাষ্পে মূর্ছিত হইয়াই এক আততায়ী সমস্ত দেশের অভিশাপ বহন করিয়া তাহার আত্মাটিকে মহাকালের কবলিত করিয়াছে — অভিসন্ধানে অমঙ্গল-মরণ বরণ করিয়াছে। এ পাপের উৎপত্তি কোথায়? মহাত্মা তাঁহার আত্মার দ্বারাও উহা রোধ করিতে পারেন নাই — এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

•

তাই, আজ একটা কথা আমরা মন হইতে কিছুতেই মুছে ফেলিতে পারিতেছি না — তাহা এই যে, মহাত্মার ঐ মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা ও তাহার মন্ত্র ভারতের বর্তমান ক্ষেত্রে বিফল হইয়াছে; তাঁহার ঐ আত্মদানে ভারতের তথা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

মহাকল্যাণের বীজ নিহিত থাকিলেও, তাহা যাহা আজ পরিত্রাণ-দান করিবে না। মুমূর্ষুকে শান্তির নিষ্ক্রিয়-স্বপ্ন এই যে আমের মহাপুরুষের আত্মবলিদান, তাহাও মুক্তি আর্থ হইল — প্রকৃতির উপরে পুরুষ জয়ী হইল না; পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত তাহা হয় নাই — বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য এবং শেষে গান্ধী, কেহই মানবজাতির কর্মফল — প্রারব্ধের পূর্বঘটনা — মকুব করিতে পারেন না।

আফ্রিকার এই সঙ্কটে উদ্ধারলাভের যে অহিংসনীতি বা যুদ্ধনীতি তাহাকে যদি পলিটিক্স্ নাম দিতে হয়, তবে সেই পলিটিক্সের সহিত মহাত্মার ঐ পন্থাবলম্বনের যোগসাধন আমরা করিতে পারি নাই। এমনও বিশ্বাস করি, এই যোগসাধনের ঐকান্তিক প্রয়াসে মহাত্মাও মধ্যে মধ্যে বিপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহার সেই দুর্লভ প্রতিভা তিনি কখনও হারান নাই বটে, তথাপি তিনি মাঝে মাঝে হতাশ হইয়া প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিতেন। আজ যদি অন্ধ উন্মাদনা, বা অতৈতন্যিক রাষ্ট্রিয় আত্ম-সান্ত্বনার বশে, আমরা সেই সকল সঙ্কল্পকে স্বীকার করিতে না চাই, তবে ঐ মহাত্যাগের তপস্যা যে-বিশ্বাসকে নির্বিঘ্নভাবে প্রকাশ করিয়া বিশ্বে সত্যকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছে, সেই বিশ্বাসকেই লাঞ্ছন করা হইবে, — যে মহাসেতু দিকে দিকে মুক্তিবাহন করিতেছে তাহার কবল হইতে আমরা রক্ষা পাইব না।

(২)

এইবার সকল চিন্তা, সকল বিতর্ক, বিচার-বিতর্ক দূরে রাখিয়া — এই মহাশোক-অবসরে আমরা প্রাণে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিব। যে-কালে যে-অবস্থায় যে-ভাবে গান্ধীজির দেহান্ত হইল, তাহা মনে করিলে, এমন কোন ভারতবাসী-নাই — সে যে সম্প্রদায়ের এ মতাবলীই হউক — যাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া একটা নিরাকার হাহাধ্বনি নির্গত হইবে না, যাহার চক্ষের সম্মুখে একটা মুহ্যমানী বা ছিন্নমস্তা-মূর্তি বৈরবী-মূর্তি ধরিয়া উঠিবে না। আজ এই বৎসরের ঐ দিনে, অর্থাৎ ১৯২১ সালের সেই গান্ধী-মূর্তি স্মরণ করিলাম — মনে পড়ে, সেই 'আবির্ভাব' আমার মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিলাম। যাঁহারা আমাদের সমবয়সী তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, আমরা কোন্ যুগের কথা বলিতেছি। সেই কালে আমরা শত শত ছাই কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেই কবিতাগুলি আজ আমরা কেবার পড়িলাম — সেই পুরুষের এই পরিণাম চিন্তা করিয়া প্রাণে যে কি ব্যথা অনুভব করিয়াছি, তাহা বুঝাইবার জন্য এখানে অনেক পংক্তি উদ্ধৃত করিতে হইবে, যা করিয়া পাঠকদিগের মনে সহানুভূতিজনক আমাদের এই প্রলাপোক্তির মার্জনা করিবেন। প্রথম কবিতার অনেক লাইন —

অমিত আকাশ নীল হ'তে যে আলো-তটির ঢেউ,
ধ্যান হ'তে এ মোহের নীলাদি প্রভাতের উষোদয়।
মহা-মরণোত্তর-সম্ভবঃ মাধি', ধরিতে মুর্তায়ে শিব,
মহা-জনমের মন্ত্র মাধিল আপনি-মুক্ত বীর!
মুক্ত জন্ম-মরণের তীরে অভিনব আলি'
সাগর-পারের তীর্থ-লিপিরে আঁকি দিল প্রকাশি'

* *

জন্মভূমি তার রাখে কি রাখে না — সে ভাবনা
নাই হয়ত,
নিখিল মা কেহ মাথটি তাহার উজল অজ-পটে!
কেন্ পথে সে যে কোন্ দিক দিয়ে যেথায়
ধরাল আসি —
মৌসুমী-বায়ু সঙ্গে যেমন দুরন্তের মেঘরাশি,
সে কথা কেহই জানিবার আগে হঠাৎ সেদিন
কেন্ —
নব-প্রাবৃত্তি — জেকজালেমের — অপরূপ
এ কি যেন!

অমাবস্যার ঘোর এ মৌন-অন্ধিমা, নয় এই অন্ধ-রাত্রি,
এখনো তোমার জ্ঞান-দীপ্তি রেখেছে প্রজ্ঞার বাতি!
কীর্তন তবু বন্ধ করিতে — কণ্ঠেরে
বাঁধিতে জানে!
উৎসবরূপে কারার ভাঙার বাঁধির মানব মনে!
জন-সঙ্ঘে বাজায় ওঠে — 'অবতার! অবতার'!
ধ্বংস-বিনাশে এরিছে তারাও নব-লীলা বিধাতার।
— 'আবির্ভাব' (স্বপন-পসারী)

যেমনই করিবে সেই একটি পুরুষের বন্দনা
যে যার যেখানে, যখন যে ভাবে চেতনা-তরঙ্গে
ধ্যানমূর্তিরূপে তৃপ্তি-মন্ত্র জপে!
ধরণীর! মরণের-মন্থ-শেষে
উঠে তারে ঘেরি অমৃতভাণ্ড — অক্ষিয়ের!
জগতে জানের যেখানে-যিনি, কুড়ায়ে সবি —
সেই ইন্দ্রকে চালিবে আপন প্রজ্ঞের ছবি!
পরিবে কণ্ঠে মহাবৈজয়ন্ত তত্ত্ব-গীতা,
জীবন যৌবন ও যৌবন-ঘট শত উষ্ণ-তিথা!
অন্তরে তার পরিচয় নিবে শুধু তুমি!
সত্য-জীবন মৈত্রেয়! তব চরণ চুমি!

নিরাময় সেই মহিমা সবার বাড়িয়া যাবে!
তুমি নমস্য, সবারে তুমিও নমস্কার!
চিরবিস্ময়ভরা তোমার ও নয়ন-যুগে
অন্ধ-আঁধির অন্ধকারের-অশ্রু ঝরে!
অর্ঘ-অমর বিরল-মরম, হে সন্ন্যাসি,
তুমিই সত্য-সংসারতলে ধরা'লে আসি'!
আদিকাল হ'তে অন্তকালে তুমি একি রত্ন —
হে মহাজ্যোতিক! জাতক-চক্র ঘুরিবে কত!
কতবার দিবে আপনারে মহি ধরের রূপে —
ছোট-'আমি'গুলি ভরিয়া তুলিবে তোমার রূপে!
চিনেছি তোমারে, যুগে যুগে অবতীর্ণ তুমি!
হে সোদরিয়! বুদ্ধ! তোমার চরণ চুমি!

যাদেরি হেরমে আসন তোমার চিরন্তন,
ইতিহাসে যবে ধরা দাও, সে যে পরমক্ষণ!
দেশে দেশে তব শুভ-আগমন-বার্তা রটে,
তোমার কাহিনী কীর্তন হয় ঘরে ঘাটে।
পরে যৌবিন তোমারে তুলিয়া তোমার মাঝ
জপ করে সবে নিজেরি গাহিয়া অধিরাজ —
নরে ভুলে' গিয়ে শুধু 'নারায়ণ'-মন্ত্র পড়ে,
মনের মতন স্বার্থসাধন মূর্তি গড়ে —
ভক্ত-অহং জ্ঞানাঞ্জনে করিয়া বেলা
হয়নে-কুহকে সাজায় কেবলি মায়ীর চেলা —
জনজীবন-মূর্তি ধরিয়া এস গো তুমি!
মানব-পুত্র! মৈত্রেয়! তব চরণ চুমি!
— 'মহামানব' (ঐ)

প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্বে সেই আবির্ভাবের বন্দনা কেহকে করিয়াছিলাম, প্রাণে তাহা এখনও বাজিতেছে; আজ কে বা কবে এই ত্রিযোজনের বন্দনা করিবে! নিয়তির এই অট্টহাসকেও পরিহাস করিয়া সেই সুরে সেই বন্দনা গাহিতে প্রাণ যে লুটাইয়া পড়ে! এ দেশ হিন্দুর দেশ, তাহার উপাস্য সেই নিখিল নিরঞ্জনা অরূপ করিয়া হিন্দু সাধনা আজ, করিতে পারে না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া হিন্দুর আর কোন মহাপুরুষ এমন ভাবে দেহত্যাগ করেন নাই। কৃষ্ণকে এক ব্যাধ হত্যা করিয়াছিল, তাহাও অজ্ঞানে; কৃষ্ণও মৃত্যুকে পূর্ব হইতেই বরণ করিয়াছিলেন। অতএব, ভারতের পুণ্যভূমিতে — গান্ধীজির তুল্য কোন মহাপুরুষ এমনভাবে দেহত্যাগ করেন নাই। তাই এই ঘটনা কেবল একটা শোচনীয় দুর্ঘটনাই নয় — উহা অশনি; যথা যা চন্দ্রের পূর্বাহ্নকে যেমন একটা মহা অকল্যাণ ও অশৌচের কাল বলিয়া হিন্দু বিশ্বাস করে এই ঘটনাও তেমনই মহা-অকল্যাণের সূচনা করিতেছে — একটা মহাদুর্যোগ যা মুক্তির মুখে

আমরা গড়াইয়াছি; মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তকাল সমুপস্থিত।

আমরা যে-লোকে অভিভূত হইয়াছি তাহাতে কোন সান্ত্বনা নাই — এই অমোঘ অভি মীমাংসায় পালন করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্ত পরাজয়ে হইবে; মোহই যদি প্রবল হইয়া উঠে, তবে মহাত্মাকে হত্যা করার ঐ পাপ আমাদিগকেও গ্রাস করিবে। তৎপরিবর্তে কবির ভাষায়, ইহাই স্মরণ করিয়া চিত্তকে দৃঢ় করিতে বলি যে —

বিনা পাপে দুঃখ ভোগ
অন্তরে অন্তর হেন করুক সংযোগ,
বহ্নিশিখাসম শুদ্ধ স্বর্ণের প্রায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের। সেই দুঃখে রহিবেন জাগী
দেবতাও বিশ্বে; যবে শুধিবেন তিনি
নিজহাতে আত্মঋণ, তখন জগতে
কেহ নয় কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে।

— পাপ আমরা করিয়াছি, 'বিনাপাপে দুঃখ-ভোগ' নয়; তথাপি, মহাত্মার বিয়োগজনিত এই দুঃখ-ভোগের সাক্ষাৎ কারণ আমাদেরই সেই পাপ নয়। এ দুঃখ কে দিয়াছে? কোন্ মহাপাপের দুরন্ত লালসা আমাদের এই দুঃখভোগের যৌগ এবং অনন্তিক্রম কারণ, তাহা আমরা খুঁজিব কেমন করিয়া?

তবু একটা সান্ত্বনা আছে — সে সান্ত্বনা হিন্দুর। মহাপুরুষদেরই মুক্ত, তাঁহারা বন্ধনকে স্বীকার করিতে আসেন না, মোহের বন্ধনকে স্বীকার করেন; সেই বন্ধন হইতে মুক্তি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন, কাজ শেষ হইলে এক মুহূর্তও তাঁহারা সে বন্ধন সহ্য করেন না। মহাত্মাও মহাপুরুষ, তাঁহার জন্মমরণ না হইলে তিনি কখনই মুক্তি চাহিতেন না। কিন্তু এ বিষয়ে, পরম-ভাগবত ভক্ত-বৈষ্ণব বলিয়া তিনি নিজে কিছুই স্থির করিতেন না, মহাত্মার সকল কামনাই তাঁহার ইষ্টদেবতা 'রাম'-এর ইচ্ছাধীন ছিল। তিনি ভক্ত ও শিষ্যের মত অনেক কিছুই কামনা করিতেন, কিন্তু অন্তরে সেই একজনের অনুমতি ও বাণীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। তিনি কামনা করিয়াছিলেন, ১২৫ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন, তাহা না হইলে তাঁহার ব্রত সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন না; ইহাতেও তাঁহার সেই ইষ্টদেবতার সম্মতি ও বাণীর নির্দেশ চাহিয়াছিলেন; কামনা ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু সম্মতি হয়ত পান নাই। তাই, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে একজন বর্মনাথী বিদেশিনীর নিকটে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, ঐ ইচ্ছা ও আশা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। ইষ্টদেবতার নিকটে এই যে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহার শেষ ও অপূর্ব প্রমাণ আমরা পাইয়াছি — আততায়ীর প্রথম আঘাতেই, তাঁহার মুখে আমার ও নিশ্চিত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার উচ্চারিত সেই শেষ ছাটি কথা — 'হে রাম!' — তাহার পরেই তিনি চেতনা হারাইলেন। সেই মুহূর্তে তিনি কি ভাবিয়াছিলেন? তিনি কি বিদ্যুতের মত পাইয়াছিলেন? তাঁহার জীবনের সেই সাধনা যতটুকু আমরা ধারণা করিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, তিনি সেই মুহূর্তে, ভারতের তথা জগতের সকল কথা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার সমগ্র জীবন ইষ্টদেবতার পায়ে লুটাইয়া দিয়া — আর কিছু নয়, কেবল তাঁহাকেই স্মরণ করিলেন; হয়ত অন্তরাত্মা উঠিয়া উঠিয়াছিলেন, পরক্ষণেই সেই মৃত্যুকে তাঁহারই দান বলিয়া গ্রহণ করিলেন; এমন কি, হয়ত ঐ মৃত্যুরূপের মধ্যেও তাঁহাকেই আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ঐ যে "হে রাম" উচ্চারণ করিয়া তিনি মৃত্যুর বক্ষে ঢলিয়া পড়িলেন, তাহার অনুরূপ একটি কাহিনী আমরা স্মরণ করিতেছি। তপিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের মুখে সেই কাহিনী শুনিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সেই ভীষণ হানাহানির দিনে, একজন উচ্চপদস্থ সিপাহী শত্রুপক্ষীয় আরেকজনের সম্মুখীন হইয়া করিতে করিতে

এমন স্থানে আসিয়া পড়িল যেখানে পথ দুইদিকে দুই ভাগ হইয়া গেছে; সংযোগ-স্থলে দুইজন এক সন্ন্যাসী বসিয়া ছিল: শিষ্যেরা যখন তাহাকে যাদুমন্ত্রে বশ করার কৌশলটা জিজ্ঞাসা করিয়াও, অভ্রান্তপথীরা কোন্ দিকে গিয়াছে, তাহার কোন উত্তর পাইল না. তখন একজন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বক্ষে অসি বিদ্ধ করিয়া দিল। ভূমির অঙ্কে ঢলিয়া পড়িয়া সেই সাধুও তখন আহতজীবের পানে চাহিয়া, ঐ কথা বলিয়া তাহার দীর্ঘ মৌনব্রত ভঙ্গ করিল—"তোমার ঐ রূপেও আমি তাহাদেরই দেখিলাম!" মহাত্মাজীও কি তাহাই দেখিয়াছিলেন!—'রাম' কি ঐ রূপেই তাঁহার অন্তরে দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের ও জগৎ-জন্মের জটিল দেবতাবন্ধন হইতে মুক্তি দিলেন? সাধারণ মানুষ আমরা—ঐ সাধনা আমাদের নহে। এখন ঘোর অন্ধতমিস্র অবস্থা, এমন অবস্থায় নির্মল চিত্তও শোকে মলিন হইয়া উঠে; তথাপি, মহাত্মার মৃত্যু আমাদের পক্ষে যেমনই হোক, তাঁহার পক্ষে উহাই যদি 'মহামুক্তি' না হয়, তবে তাঁহার 'রাম'-নাম-সাধনা যে মিথ্যা হইয়া পড়ে।

[১৮ই মাঘ, ১৩৫৪

ছিন্নকারী বেদ সন্দেহিয়া, ভাবে বুঝি, ধ্বংসী তোমার কাজ,
'ক্রুসে'র পরে জীবন দিয়ে রুদ্ধ আপন অন্তরে ধরণীর পাজর।
চড়াপাহাড়ের অন্ধকারে ফুটল আলো, উঠ্‌ল যে ঝলমল,
আপনি মরে' বিশ্বনরে দিলে তুমি নবজীবন দান।
স্বর্গে মর্ত্যে বাঁধলে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে,
মরণজয়ী সীমা তোমার — অন্তরে অটল আত্মারামে।

— সত্যেন্দ্রনাথ

বঙ্গ-দর্শন

ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল — নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি ঊর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ দিকে রাজশাসন-প্রণালী, দণ্ডবিধি, দায়, সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, ভোজন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। "আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে।" জালের এইরূপ সূত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে হইলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়; যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। হিন্দুসমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান — অত্যাপি জাজ্বল্যমান।

— বঙ্কিমচন্দ্র

আমরা মাঘ মাসে পৌষের 'বঙ্গ-দর্শন' লিখিয়েছি। পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের বিলম্বের কথা অবশ্যই জানেন — কাগজ সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'বঙ্গ-দর্শন' যে-উদ্দেশ্য যে-পথে বাহির হইয়াছে তাহাতে একেই বাধা-বিঘ্নের অন্ত নাই, তাহার উপর এই যে বাধা তাহা একরূপ দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে পরিচালকগণের যে লাঘব আছে (বিশেষ করিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে) সম্পাদকের তাহা নাই এই জন্য যে, 'বঙ্গ-দর্শন' সাময়িক পত্রিকা হইলেও ইহার যে নীতি ও আদর্শ তাহা মাস-পত্রিকার নিয়মাধীন নয়। তথাপি, কি কারণে বিলম্ব হইতেছে তাহা আমরা অধিক জানি বলিয়া পাঠিকাগণের এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে আমরাও যেমন বাধ্য হইয়াছি তেমনই পাঠক-পাঠিকাগণকেও মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করি। যাঁহারা 'বঙ্গ-দর্শনে'র নিয়মিত প্রকাশে বিলম্ব ঘটিলে ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হন, তাঁহারা যে ইহার হিতার্থী, ইহা মনে করিয়া আমরা এই অবস্থাতেও কতকটা উৎসাহ বোধ করি; যাঁহারা আমাদের এই অকর্ম্মণ্যতার অন্য অর্থ করা হয় তো বা, কোন কারণে এই অপরাধ অমার্জ্জনীয় মনে করেন, তাঁহাদের সেই ব্যবহারে আমাদের কোন আপত্তি নাই, লজ্জাও নাই—খাঁটি বাঙ্গালী আমরা, ভাব করিয়া লাভ কি?

* *

আগামী ১লা মাঘ বেতালী বুহাদ্যন্ত্রের জন্মোৎসব হইবে। ঐ দিনে বুহাদ্যন্ত্রকে বরণ করিবার, তাহার উদ্দেশে সমস্তজাতির প্রণামটি

ভিক্টোরিয়ার পূর্ণ প্রতিমূর্তি — সিংহাসনে উপবিষ্টা একটা পুরুষমূর্তি আছে, এ বিষয়ে এই মহাপণ্ডিতদেরও কাহারও দ্বিমত নাই। স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য যে যে সংগ্রাম, তাহার কোন্ শাখায় তিনি কতখানি শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন — তাঁহার সেই জীবনব্যাপী সাধনার তত্ত্বখানি তত্ত্বজ্ঞ হইবার জন্য, এ সকল গ্রন্থের উহা একটি ইতিহাস দিবে, সে বিষয়ে বর্তমানের বাক্-বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। আমরা জানি, মহা-প্রেম ও মহা-সৌন্দর্যের অন্তরালবর্তী সেই পুরুষের তথ্যটি সহজ ও সরল করিয়া, কোন রাজনৈতিক সমিতিকে লক্ষ্য করিবার জন্য নয়, সর্বজনীন মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণবিকাশ চক্ষুর করিয়া এই জাতি যেন মনুষ্যত্ব-সাধনার পথে অগ্রসর হয়, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা। তথাপি, আজ যে আমরা তাঁহাকে স্মরণ করি, তাহা নিতান্তই বটে; কিন্তু এই পুরুষ সমস্ত মানবের প্রাতঃস্মরণীয়দিগের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবেন — মানুষের সকল কীর্তির ভেদ মনুষ্য যে নয়, এই মহাবাক্যের এমন সার্থক দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসেও অল্প আছে, তার কারণ, এমন কীর্তিমান্ পুরুষই যে বিরল।

* * * *

কিন্তু এই উৎসব-উপলক্ষে ভারত-সরকার ঐ বিলাতকে কোন মর্যাদা দেন নাই, ইহাতে কেহই দুঃখিত নয়, বিস্মিত হইবার কারণ আছে। উৎসব বা স্মরণ-তর্পণ করিবার জন্য যদি কয়েকটি টিকিট নির্দিষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে ডাকমাশুলের তালিকা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। অতএব ভারত-সরকারের এই আচরণ শোভন বা সুনীতিসম্মত হয় নাই; তাঁহারা যে কেন এরূপ করিলেন, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। আই-এন্-এ সেনাদল সম্পর্কে তাঁহাদের যে আচরণ দেশবাসীকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই, কারণ তাহাতে গুরুতর রাজনৈতিক অভিপ্রায় থাকিতে পারে; কিন্তু যে পুরুষের মূর্তি এখনও জীবন্তের মত ভারতবাসীর মনোলোকে জাগ্রদ্ভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহাকে কাহারও চক্ষুর অন্তরাল করা সম্ভব নয়; অতএব ঐ বিলাতে সাম্রাজ্যের একটা পর্যবেক্ষণে চিহ্নিত না করার কারণ কি, তাহা আমাদের সহজবুদ্ধির অগোচর।

* * * * *

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি এই দেখিয়া যে, বাংলা গবর্মেণ্টও এই বিলাতি পালন করিবার জন্য বাঙালীকে সরকারী অনুমতি দেন নাই। ইহাতে একটা প্রশ্ন না উঠিয়া পারে না, তাহা এই যে, বাংলা গবর্মেণ্ট কি বাঙালী জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয়? আরও অনেক ব্যাপারে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু এই প্রশ্ন আর কোথাও এমন স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই। এই গবর্মেণ্ট কি বাঙালীরই নিজের গবর্মেণ্ট, না সর্বাধিনেতা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের আজ্ঞাবহ? সমস্ত বাঙালী-জাতি যে পর্বদিন পালন করিতে চায়, তাহাতে জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় শাসকবর্গের অনুমোদন নাই কেন? জনগণের সেই দাবী কি এমনই যে, তাহা গ্রাহ্য করিলে 'শান্তি-শৃঙ্খলা'র ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা? তবে দিনের পর দিন সংবাদপত্রগুলিতে যে সকল আবেদন পত্রাকারে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে ব্যাপার শাসক-সম্প্রদায় এমন বধির হইয়া আছেন কেন? ইহাই যদি জাতির স্বাধীনতালাভ ও স্বায়ত্ত-শাসন-সুখের নমুনা হয়, তবে জনগণের প্রতি বিদেশী-শাসকগণের সেই উপেক্ষা, জাতির প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগের প্রতি সেই কঠোর ঔদাসীন্য কি আরও সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না?

* * * *

বহু কাল্লাকাটির পর একজনের জন্য অবশেষে শনিয়াছে, তিনি বাঙালী নহেন — নহেন বলিয়াই

তাঁহার এই অনুগ্রহ আমাদিগকে বড় বাড়িয়াছে। এতদিন নীরব থাকিয়া তিনি যেন হঠাৎ আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন — দেখ, তোমাদের জাতির প্রতিনিধি যাঁহারা, যাঁহাদের সঙ্গে কামনা-বাসনার আদান-প্রদান করিয়া তোমরা এতদিন ধন্য হইতেছিলে, তাঁহারা তোমাদের কাহার আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না, আমিও তাঁহাদিগকে বাধ্য করিতে পারি না; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অধিকারে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম, না করিলে আমার পলোটিক্স তরলতা ও দৌর্বল্যের হানি হয়। বোধ হয়, আরও এক কারণে আমার উহা করা — আমি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি সরকার প্রকাশ্যে প্রশ্ন প্রশ্রয় করি নাই, ইহা সকলেই জানে, অতএব এখন চুপ করিয়া থাকিলে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা তর্ক হইতে পারে, তাই নিজের প্রতি তর্কজালের আমি তোমাদের সেই দাবির দূর করিয়াছি। চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী মহাশয় ঠিক এই কারণেই উহাদের সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন কিনা তাহা বলা কঠিন, কিন্তু বাঙালী-সাধারণের মনে এইরূপ একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণেই বোধ, তাঁহার ঐ সৌজন্য বা অনুগ্রহ বাঙালীকে কতকটা দীনভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে — আমাদের জাতির তিনি মহত্ত্ব করিয়াছেন।

• •

অতঃপর নেতাজীর জন্মদিনে বাঙালী কাহাকে সম্বোধন করিবে, — উৎসব করিতে পারিলেই হইল, কোন রকমে প্রাণের উচ্ছ্বাসটা বাহির করিয়া দিবার একটা পথ পাইলেই হইল। বহুকাল রাধাকৃষ্ণ-বিরহে করিয়া বাঙালীর জন্য রহিয়াই কীর্তনাখেলে কোমল হইয়া উঠে, বিরহের চাঁদে জোছনা করিতে তাহার কিছুমাত্র বাধে না। আবার, কৃষ্ণ ও কালী দুইকেই সে সমান ভক্তি করে — নেতাজীকে যেমন, যোগীকেও তেমনই করে। আমাদের কেমন স্বভাব, তাই বৃথা চীৎকার করিয়া উৎসবের সুখটা

পূর্ববঙ্গে হিন্দুর অবস্থা যাহা হইয়াছে তাহা আর চাপা দিয়া স্বাধীনতাজ্যোতি পশ্চিম বঙ্গের কাছ-প্রসাদ লওয়া যায় না। আমরা সম্পূর্ণ হইতেই সেখানকার হিন্দুসমাজের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সংবাদ পাইতেছি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী যে এতদিন নীরব থাকিয়া সহসা হাতে হাঁড়ি ভাঙিয়া দিয়াছেন; সেখানে কতজন অপহৃতা কাহারা জানি না, সেখানে কতজন অপহৃতা কাহারা জানি না, — প্রেম ও অহিংসার যে বীজ সেখানে বপন করা হইয়াছিল তাহা যে বিষম ফলোৎপাদন করিতেছে, এবং সেই ফলমূলে তিনি বিষম ভয়পাইয়া করিয়াছেন, সেখানে বিষম গ্লানি বিরাজ করিতেছে — ইহাতেই যে-টুকু সত্য-সংবাদ তিনি বিনম্রিতভাবে সকলকে জানাইয়া গেলেন। কিন্তু ঐ পূর্বভূমির বাহিরে সেই দীন ভেদন করিয়া বপন করা হয় নাই বলিয়া যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে, অর্থাৎ হিন্দুরা ধন-প্রাণ, মান-ইজ্জত কিছুই রক্ষা করিতে না পারিয়া, দলে দলে সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া, ছত্র পক্ষর মত চতুর্দিকে আশ্রয়-সন্ধানে ছুটিতেছে। আমাদের সীমান্ত-বাসী যাহারা — যেমন শ্রীহট্টের হিন্দুরা — আসামে প্রবেশ করিতে পারিবে না; আসাম পাকিস্তান নয়, হিন্দুপতাকাবাহী একটি হিন্দু — খুঁটি! — রাজধানী রাজা, কিন্তু তাহার রাজধানী প্রেম এমনই যে, ঐ দুর্গম দুর্গাগড় এই মহাদিপের একটু দয়া পর্যন্ত পাইবে না! ও দিকে ত এই: এ দিকে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে — যে-বঙ্গ বাঙালী জাতিরই, বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙালীর প্রধান বাসভূমি, এবং যেখানে একটি স্বাধীন বাংলা-সরকার দৌর্ঘও প্রতাপে বাঙালী জাতিকে শাসন ও পালন করিতেছেন — সেই বঙ্গেও তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার কোন আগ্রহ বা অনুকূলী ব্যবস্থার লক্ষণ

দেখা যাইতেছে না। এ নিয়ে আছে, তথা বাংলা সরকারের অবহিত ও তৎপর হইবার জন্য একজন চিন্তাশীল বাঙালী প্রতি এক ইংরেজী লৈখিকে যে যৌক্তিক ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমাদের আশঙ্কা আরও দৃঢ় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের মত, অন্যান্য তথা-প্রমাণ সহযোগে প্রকৃত অবস্থার যে বিস্তৃত প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, অন্তঃসার শূন্যতাই পাকিস্তানী বাংলার হিন্দু-বাঙালীকে, যেমন ঐ প্রদেশের অন্যান্য হিন্দু প্রতিবেশীকে, ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে, নিঃশেষ করিতে বসিবে। যদি ইহাদের অধিকাংশ অবিলম্বে বাংলা-সরকারের দুর্বলতা ও কংগ্রেসী প্রভুত্বের অবসান করিতে হয়, তাহা হইলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ হিন্দু-সমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় পাকিস্তানস্থ হিন্দুসমাজের বড় বড় অংশগুলিকে হিন্দুর দেহ বলা (যুক্তি!—ধর্মবর্জিত রাষ্ট্র-তন্ত্রে) কতদূর যুক্তিসঙ্গত এবং অবশ্য-কর্তব্য না? কিন্তু তাহাতে ত' কোন কর্তব্যই দেখা যাইতেছে না। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে যে সব দেশত্যাগী বিপন্নের দল একটা নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে-ধারার মত পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে কোন সাহায্য করা ত' দূরের কথা — এই দেশ-ত্যাগের বলচিত্রাপনের সুযোগ-সুবিধা, যা কোনরূপ বাধাদান বিনা, বাংলা-সরকারকে বিহুমাত্র চিন্তিত বলিয়া মনে হয় না।

* *

তবে কি ভূমি-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, জাতি বা সমাজের অর্ধেক অঙ্গ ভারিক্ত হইয়া গেল? বাঙালীর দৈহিক ভিটার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের অঙ্গে জুড়াইয়া গিয়াছে; কর্তারা অনর্থক গোলমাল না করিয়া, Award-নামক একটি কর্ম-লঘুকারীতে বাঙালীর ভাগ্য-বিচার করাইয়া দিলেন — বন্টোর কল বাধা করিয়া দিল তাহাতে তো আর কথা কহিবার যো নাই! জানিয়া না পারিলে কষ্টই হইতে হয় যে! বাঙালীও সেই দান মাথায় করিয়া হাই তুলিয়া নাচিল। যে দিন আকাশে ত্রিবর্ণ-পতাকা উড়াইবার ঝিক' যাহা এসে তাহার চেয়ে কত বড় বস্তু সে পাইল! পেটের ভাত বহুদিন গিয়াছে, এখন মাথাও গেল — অন্ততঃ অর্ধেক বাঙালীর, কিন্তু বাকি অর্ধেক স্বাধীন হইয়া দেখে! স্বাধীন হইলে মানুষ সর্বস্ব বিলাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় না—দেখাইয়াও করিতেও নয়। তাহা হইলে, বাংলা ভাগের ঐ অর্ধ-শতাব্দী আগিয়া সভার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও একরূপ স্বীকার করা হইয়াছিল যে, আমরা ভূমিসত্ত্ব-ত্যাগী নয়—ধর্ম ও সমাজের ত্যাগও বটে! কার্যতঃ তাহাই স্বীকার করা হইয়াছে—মুখে অস্বীকার করিয়া যত বড় বড় কথাই বলা হউক না কেন। এখনও ঐ হতভাগাদলকে, এহেন নিরুপায় ও অসহায় অবস্থাতেও—উদ্বৃত্ত ও উত্তম জমিগুলি বলে বলপূর্বক পশুর মত অধিকার করিয়াও—নির্বিঘ্নে বসবাস করিবার বীরত্বপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হইতেছে! শোনা যায়, স্বাধীন ভারতের কোন মহাজনবন্ধী রাষ্ট্রনায়ককে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই মহাসঙ্কটের কথা জানাইলে তিনি নাকি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চভাবের ঘোরে, কৃপাসিক্তির অর্ধনিমীলিত সুরে বলিয়াছেন—উহা নাকি একটা লজ্জারই মত, উহার মূলে আছে ভীরুতা, অতএব ত্যাগ করিলে সঙ্কট আর থাকিবে না। ঐ ভীরুতার অপবাদ দেওয়া জীবন্মৃত মানুষকে যে কত বড় অপমান করা, তাহা মহাকালের বীর-নায়ক — মহামানব-বর্গী রাষ্ট্রনেতাটিকে কে বুঝাইয়া দিবে? পশ্চিম পাঞ্জাবের যেমন, মোহাজাদি ও পূর্ববঙ্গের তেমনই যাহারা হত পশুর মত দিগ্বিদিকে ছুটিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা সাহস বা পৌরুষে তিনিও বড় নহেন; তফাৎ এই যে, তাহাদের স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যা রাজ-পরিবারের মত সুখ-সম্পদে ও সুরক্ষিত অবস্থায় বাস করিতে

পারিতেছে না। ঐ কথা যে বলে, সে যদি সত্যই মহামানব হইয়া থাকে, সে-যদি মানুষকে ঐরূপ ভীরুতার অপবাদ দিবার অধিকারী হইয়া থাকে, তবে তৎপূর্বে তাহার নিজের পরমায়ুটাকেও ঐরূপ স্থানে দান করিতে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। আর যদি সত্যই তিনি সেইরূপ মহামানব হন তাহা হইলে ঐ কথার অর্থ এই হয় যে, যদি বাঁচিতে চাও, সকলকে মহামানব হইতে হইবে, সাধারণ মানব যাহারা তাহাদের বাঁচিবার অধিকার নাই।

• • •

এইরূপ মহামানবীয় নীতি-কথা এখনও অনেক রক্তাধারী বাঙ্গালী যুবকদলের মুখে শোনা যাইতেছে — আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশই পূর্বপুরুষবাদী বাঙ্গালী। ইহাদের ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রা, এবং বর্তমান ব্যবসায় সম্বন্ধে একটু সন্ধান লইলেই হয়তো আশ্চর্য হইবার কারণ থাকিবে না। যেহেতু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই; সেই বা সত্যই প্রজাপারমিতার পন্থায় পদার্পণ করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর ভোগবিলাসী বাঙ্গালী জাতির মুখপাত্র নয়; যাহারা ইহাদের কথা মুদ্রিত ও প্রচারিত করে তাহারাও সত্যাগ্রহের পক্ষপাতী, তাহারা যে-রাষ্ট্রনীতির সেবা করে তাহাতে ঐ সমস্যা ও সঙ্কট চিরদিনই গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে; সেই নীতি এমনই উচ্চনীতি যে ঐরূপ ভাবনাই তাহার পক্ষে অসঙ্গত।

• •

এমনও হইতে পারে যে, ভারত-মহারাষ্ট্রে যখন কোন ধর্মের — শাস্ত্রের বা সমাজ-গঠনের কোন দোষ-ধর্মের — স্থান নাই, তখন ঐরূপ একটা বিশেষ ধর্মের বিশেষ সমাজকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? হিন্দু যদি মুসলমান হইয়া যায় — হইতে বাধ্য হয়, তাহাতে ঐ রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া কোন আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ, কোন ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করা তাহার লক্ষ্য নহে; দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তি বা যে-সমাজের দ্বারা ধর্ম, তাহা সেই সমাজ বা ব্যক্তি নিজের প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবে, যা পারে, বুঝিতে হইবে সেই ধর্ম শক্তিহীন — ধর্মান্তরিত হওয়ার কোন দোষ নাই। অতএব রাষ্ট্র-নীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া শাসনতন্ত্রকে মজবুত করিবার জন্য যে সকল সমস্যা সমাধান করা কর্তব্য তাহাই তাহাই সর্বাগ্রে করিবে, ও সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবে না। এই জন্যই অতিমাত্র secular, অর্থাৎ, অসাম্প্রদায়িক পারমার্থিক — সর্বপ্রকার অধ্যাত্ম হইতে মুক্ত; ইহা একটা ডিমোক্রেসী, অর্থাৎ, এমন একটা নীতিতে উপরে প্রতিষ্ঠিত যাহা কোন ব্যক্তি বা সমাজের বিশেষ অধিকার মানে না; কেবল সেই অধিকারগুলিই পালন ও রক্ষা করিবে যাহাতে কাহারও বাধা দেয় বা সমাজের নাই। সেই ডেমক্রেসী দৃঢ় করিবার জন্য, একটি নীতিকে ঐ রাষ্ট্র-নীতির সহিত যুক্ত করা হইয়াছে — তাহারই নাম অহিংসা-নীতি। ইহা কোন বিশেষ ধর্মের, বিশেষ নীতি নহে; ঐ ডিমোক্রেসীকে নিরাপদ করিবার এমন নীতি আর নাই — ঐ বুদ্ধি দৃঢ় করিবার এমন সহজ যন্ত্র আর নাই। যদি কোন বিশেষ ধর্মের আকারে সেই ডেমক্রেসী যদি কোথাও আত্মপ্রকাশ করে, তবে তাহাকে নিশ্চিহ্নরূপে উচ্ছেদ করিতে হইবে। অতএব, যদি কোন বিশেষ সমাজ তাহার বিশিষ্ট জাতি-ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাধনা রক্ষা করিবার জন্য আকুল হয়, তবে সেই সমাজকে সাহায্য করিলে ঐ রাষ্ট্রনীতিই ক্ষুণ্ণ হইবে। এমন অবস্থায় হিন্দু বাঙ্গালীর ঐ ঘোর বিপদে ভারত-রাষ্ট্রের অধীন বাংলার শাসন-পরিষদ যে অভিমত ব্যক্ত করিবেন, এমন আশা করা বোধহয় অন্যায়।

• • •

বাংলা গভর্নমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তার সাফাই তাহার

অনুরূপ হইবেও আমাদের তাহা অনুমান করিতে পারি। যখন কি. ৫ লীহিত্যের বাংলা-সরকারের নিকটই আমরা একটু স্বরূপ আর্থনীতি প্রত্যাশা করি তখন কেন্দ্র-মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি কেমনই হোক — বাংলা ও বাঙালীকে ইহা করাই বাংলার সাহায্য কর্তব্য তাঁহারা বলি, বাংলার কৃষক-শ্রমিকের যেমন, বাঙালীর সমাজ-সাহিত্যেও তেমনই উপাদান থাকেন, তবে বাংলা-সরকার বেঙ্গলী-জাতির সাহিত্যিক কাজে কোন অর্থে? বাংলাদেশ বিভক্তির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালী বিক্ষুব্ধমনের বিভক্তির হইয়া, তার ও একটা বিভাগ আর প্রকৃতপক্ষে আজ হইতে বসিয়াছে তাহাতে ইহা করিতে হইবে না? সেই অংশ ইহা না পাইলে বাঙালী-জাতির ক্ষতি, যেন কি, প্রায় নির্ভাগ হইবে না? যে দিক চক্ষু বুজিয়া যেমন খুশিমত উচ্চারণ, এবং মুখস্থকে আসল অবয়ব অস্বীকার করিয়া যেমন মিথ্যা আখ্যায় আখ্যা হইবার যেন তেমনই কি আমরা ইহা পাইব? বিভাগ বা উড়িয়ার সঙ্গে সীমানা লইয়া যোকদমা করিলে তাহার ফল হইবে না জানি, — যাহারা যে যোকদমার বিচারপতি তাহারাই যখন প্রতিবাদী, এবং তাহারাই যখন প্রভু, তখন সে আশা বৃথা। কিন্তু যেটুকু ভূমি চিরকাল হইয়াছে তাহারেই, ঐ বিভাগ সুজনসমাজে শত্রুপুরী হইতে উদ্ধার করিয়া, ঘরচিহ্নের ব্যবস্থা করিতেও কি তাঁহারা অপারগ? সেখানে ত' উপরওয়ালাদের আপত্তির কোন কারণ দেখি না। এ সমস্যার সমাধান সহজ নহে তাহা জানি, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা ত' করিতে হইবে। চোখ বুজিয়া এড়াইবার চেষ্টা সুবুদ্ধিসঙ্গত হইবে না, সময় থাকিতে সাবধান না হইলে, ক্রমে ইহাও ভীষণ আকার ধারণ করিবে, তখন একূল ওকূল দুইকূল সামলানো দায় হইয়া উঠিবে।

* * * * *

গত বড়দিনের ছুটিতে বেঙ্গলীশহরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের রজতজয়ন্তী-উৎসব ও বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, এরূপ সংবাদে আমরা পত্রিকাযোগে পাইয়াছি। ঐ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য যে কোনরূপ নিমন্ত্রণ পাই নাই এমন কথা বলিলে অবশ্যার্থে হইবে; উদ্যোক্তাগণের তরফ হইতে একজন বিশিষ্ট আত্ম বন্ধুর মারফতে দাদর অনুরোধ পৌঁছিয়াছিল: সভাপতির অভিভাষণে আমরা রীতিবিরুদ্ধ এবং বাধিবাধক বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের বক্তব্যের শেষে কোনটারই সমাধান করা করিতে পারি নাই। এরূপ আচরণের বিশ্লেষণ হয়তো — হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, কোথাও অপ্রিয় আলোচনায় বিদ্ন হইয়াছে, ইহাও আমরা বুঝি। এমনি ত' সাহিত্যিক সুজনসমাজে আমাদের সুনামের অবধি নাই; আমরা যে অতিশয় অসামাজিক তাহা নহে। সভা-সমিতি সম্মেলন প্রভৃতির ত' কথাই নাই, কোন বন্ধু-বৈঠকেও যোগদান করি না; যদি বা কোথাও সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনার বৈঠকে মুখ খুলিতে হয়, তবে এমন সব অসামাজিক এমন ভাবে ব্যক্ত করিয়া ফেলি যে, ইহাতে ঐ বন্ধুবর্গের কর্তব্যটা ত' ঘটেই — এমন স্থানে আমন্ত্রণ করে যাহার মত অবাঞ্ছনীয় আর নাই। এজন্য আমরা বহুদূর সজাগ, সর্বপ্রকার সঙ্গ ও সম্মেলন বর্জন করিয়া থাকি। আমাদের এই স্বভাবের কথা আমরা ভালরূপেই জানি, অন্যসমাজের গালিও খাইয়া লই। কিন্তু সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সামাজিকতার উৎসব একটা জাতীয় অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাদের অসামাজিকতাকে নিন্দনীয় আত্মম্ভরিতা বলিয়া স্বীকার করিতে যাবে। আত্মম্ভরী হইলেও আত্মপূজা-লাভের সুযোগ কেহ ত্যাগ করে না — সভা-সমিতিগুলির সভাপতি বা 'প্রধান-অতিথি' হইয়া, সাধারণের যেটুকু বিজ্ঞাপন-গৌরবের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা কোন্ আত্মম্ভরী

মানুষ বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে? বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে যতদিন হইতেই, আমরা ঐরূপ গৌরবলাভ করিতে আসিতে হইয়াছি — সেই সকল আহ্বান যদি পুলকিতচিত্তে প্রতিগ্রহ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এতদিনে আমরা বাংলা-সাহিত্যের একটা ছোট-খাটো — অন্ততঃ 'সরকারী সভাপতি' হইয়া রীতিমত জাঁকাইয়া বসিতে পারিতাম — একটি বিশাল যজমান-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া নানা প্রকারে প্রসাদী ও দক্ষিণা আদায় করিবার কি সুযোগই না হইত! ঐরূপ সভা-সমিতির সভাপতি-পদটি একচেটিয়া করিয়া যেমন অনেক রথী-মহারথীর প্রাণে অতিমাত্র ঈর্ষার উদ্রেক করিতে পারিতাম, তেমনি, যেখানে যত নিত্য-নৈমিত্তিক সাহিত্য-যজ্ঞের যজমান আছেন তাঁহাদের ভক্তি-প্রীতির মালা-চন্দন আমরা করিয়া, ঐ আসনটিকেই 'আহা আহা, মরি মরি'র দ্বারা মনোহর করিয়া তুলিতাম। কিন্তু তাহা পারি না এই জন্য যে, সাহিত্যকে আমরা ঐরূপ সামাজিক সৌজন্য-বিনিময়, তথা আত্মপূজা ও আত্মপ্রচারের সাধন করিতে সম্মত নহি — সাহিত্যিক সভা-সমিতি বা সম্মেলনে সাহিত্যিক অপেক্ষা সাহিত্যের সম্মানটাই বড় করিয়া দেখিতে চাই — সাহিত্যের নাম দিয়া অপর-কিছুকে গৌরবান্বিত করাও একটা বিশ্বাসের বলিয়াই মনে করি।

• • • •

প্রবাসী বাঙালীরা বৎসরে একবার করিয়া একটা সামাজিক সম্মেলনে মিলিত হইবেন, ইহা যেমন আবশ্যক, তেমনি কর্তব্যও বটে। উদ্দেশ্যটা আমরা জানি; কিন্তু প্রবাসে তাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের গর্ব ছাড়া আর কোন গর্ব অনুভব করিবার সুযোগ পান না, বলিয়া ঐ সম্মেলন বাংলাসাহিত্যের নামেই আহ্বান করিয়া থাকেন; বাঙালীর আর কি-ই বা আছে! এ সকলই বুঝি। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ঢাকা পড়িয়া যায় বলিয়া, উপলক্ষ্যটাই বেশি করিয়া চোখে পড়ে, তাহাতেই উৎসবের ঢাক-ঢোল সাহিত্যের পুলা-বস্ত্র খুলাইয়া দেয় — "তাদের কবিতেই মনের বিকাশ যায়।" গায়কটি বাহাতে ভাল করিয়া কবিতা উঠে তাহার জন্য সাহিত্য-কুঞ্জে শাখা-প্রশাখা গজাইয়া তুলিতে হয়, পত্রপল্লবে বাহাতে ঢাকিতে থাকে। সাহিত্য ত' এখন শুধুই সাহিত্য নয়, সেও যে একটা 'ডিমোক্রেসী'! আবার, পূজায় পৌরহিত্য করিবার অধিকার শুধুই ব্রাহ্মণের থাকিবে কেন! ইহিনদের ডাকিয়া পৌরোহিত্য না করাইলে সাহিত্যকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রূপে দেখা যায় কেমন করিয়া! কথাটা খুবই সত্য, সাহিত্যকে এমন সম্মান ইতিপূর্বে আর কোন জাতি দিয়াছে? এমন সর্বজনীন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা ত' আর কোন জাতির নাই। কিন্তু আসলে ইহা যে 'শিবের গাজন' ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইয়েছি। বাঙালী আমরা, 'গাজন' বা 'মেলা'কে আমাদের জাতীয় উৎসব বলিয়াই মনে করি, তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু বাঙালীর ঐ অবশিষ্ট গৌরবটাকে এমন করিয়া "শিবের বাপান্ত" করিবার পক্ষপাতী আমরা নহি।

• •

বাংলা-সাহিত্যের বাঙালীত্বর্জন, তথা প্রাদেশিকতা-বর্জনের যে উচ্চনীতির পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহা বাঙালীজাতির গৌরব বৃদ্ধি-করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই গৌরবলাভের জন্য আর কোন প্রদেশের কিছুমাত্র চিন্তা নাই, বরং তাহারা যেন প্রাদেশিকতাকেই সগর্বে ঘোষণা করিতেছে, — তাহাতে রাষ্ট্রপতিদের কোন আপত্তিও যেন নাই। ইহাতে সন্দেহ কোন সঙ্গত কারণ নাই — নূতন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মূলে যে দর্প আছে তাহাতে প্রত্যেক প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে

ভারার যাবতীয় ঘর বন্ধ করিতে পারিবে, এবং উহাই তাহাদের। তাহা না হইলে, তিনি ইংরেজের একটি ভয়ঙ্কর এবং শক্তিশালী অস্ত্রকে পার্লামেন্টের অস্ত্রঘরে অস্ত্রত করেন। তিনি বর্তমানে কংগ্রেসের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি-সভার সভাপতি — সভা ও অধিবেশনে সেই সিংহ-সমান শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ঐ প্রাদেশিকতা-বাদের আলিঙ্গনে ধরা দিলেন কেমন করিয়া? সভাপতি বিহার ও উড়িষ্যার ডাক-টিকিট লইয়া ও বিদেশ যে সময়ে উপস্থিত হইয়াছে — অধিবেশন-প্রাঙ্গণে প্রবেশের উদ্বেলিত করিয়া ভক্ত-শ্রোত দরজাটের কাছে নাই, যে সময়ে সভাপতি পাইয়াছেন; ঐ সময়ের বিহারের নেতৃবর্গ যে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন, সে সম্বন্ধেও কাহারও দ্বিমত নয়। বিহারের নেতৃবর্গ কি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের বিরুদ্ধবাদী? তাহা যেন; তাঁহারা যে তাঁহার অনুমোদিত ধর্মঘটই করিয়াছেন, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার সেই সমাচারে অবশ্য এত উদারতা প্রকাশেরই ঘোষণা করিয়াছেন। সভাপতি তিনি তাঁহার বিহারী সহকর্মীদিগকে এমন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন বিহারের কয়লার অধিষ্ঠাতাদিগকে তাঁহাদের দাবিদাওয়া পূরণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে, কারণ তাহা পূরণ করিতে না পারিলে ঐ অংশগুলি ধর্মঘটীরা কিরিয়া পাইবে না বলিয়া করিবে, বিহারের ধর্মঘটীরা সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, কয়লার যে চুক্তিগুলি এখন অধিকার করিয়া ধর্মঘটীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা ধর্মঘটীদের ফেরত দেওয়ার মত শুভকর্ম আর নাই। সেখানে যেন অন্যরূপ চেষ্টার কর্তৃপক্ষ অবতরণ করিতে হইবে — এ পাশে ছাড়া মারিয়া, অর্থাৎ কিলা যেন করিয়া, কোথাও বা মাথা কাটাইয়া। বিহারের সরকারী মুখপত্র 'সার্চলাইট' যে-ভাবে এই নীতির ঘোষণা করিয়াছে, তাহা কোনও সুকৌশল-সীল পরিচয়ের সভা ও ভাষানিষ্ঠ সুলভায় ধীরতার করি, রাজের বিভাজন এমন করিয়াই করিতে হয়, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সকল পরাধীনতা-পরাধী রাষ্ট্রপুরুষই ঐ সমাচরণ নীতি পালন করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাত্মাজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের একজন নিষ্ঠাবান ও খাঁটিয়ান সাধক। মনে আছে, দিল্লীতে নূতন রাষ্ট্রশাসন-পরিষদের অধিবেশন-দিনে তিনি যখন সভাপতির আসনে বসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সেই মার্জনা-রেখাঙ্কিত সৌম্য-গম্ভীর ফলনে নাকি দুঃখের দুরন্তছায়া দেখা দিয়াছিল; বিহারপ্রবেশ দুঃখের লীলাভূমি বলিয়া, বর্তমান বিহারের যিনি আত্মা-স্বরূপ তাঁহার মূর্তি দুঃখের মূর্তির মত হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা ক্ষুদ্র, মহতের চরিত্র-মহিমা আমরা বুঝিব কেমন করিয়া? কালিদাস বলিয়াছেন, "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং হিনস্তি বিদ্যাচরিতং মহাত্মনাম্" — অর্থাৎ, মহাপুরুষদের অসাধারণ আচরণ দেখিয়া তাহার কারণ বুঝিতে পারে না বলিয়াই নির্বোধেরা নিন্দা করিয়া থাকে। কালিদাসের কথা ত' মিথ্যা হইতে পারে না।

[৬ই মাঘ, ১৩৫৪

মাঘের 'বসন্তদর্শন' মাঘ মাসেই সিদ্ধিলাভ করে, কিন্তু এবার মাঘ-গগনের কালকে ভ্রূকুটি করিয়া স্বয়ং মহাকাল অট্টহাস্য করিয়াছেন। গত ৩০ তারিখ সারা ভারতবর্ষের চিত্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছে, বহুতো যা তাহার অনেকখানি ভাসিয়া গিয়াছে। একই দেশের আকাশ-বাতাস অধিবাসে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তবুও এ দুর্ঘটনার প্রান্ত দূর হইতে দূরান্তরে দুঃখের বিভীষিকা বিস্তার করিতেছে, তাহার উপর সাম্প্রদায়ের বক্র বিশ্লেষণ করিয়া এই ভীষণ অনুশোচনা ও দুর্ভিসন্ধি। ইহাতে আমরা

ভারত-ভাগ্য-বিধাতার ভয়ঙ্কর রুদ্র-মূর্তির দেখিতেছি — অর্জুনের মতই আমাদের হাতে সেই ধনুর্বাণটি ধরু করিতে পারিতেছি না —

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

— মনে হয়, এবার বুঝি আর রক্ষা নাই; এই অনুশোচনার বিষের সূচনা করিতেছে?

• • •

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অশান্তির কারণ, এই মহা বিপদে কর্তৃপক্ষ যাহা ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না: জনসাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক এবং সেই কারণে মহাদুর্যোগ নিবারণ করিবে কে? যাহারা শোষণ মারফৎ লাভ করিতেছে তাহারা যদি কয়েকজন বুদ্ধিমান সমাজদ্রোহী হয়, তবে তাহাদিগকে উদ্ঘাটিত করা যেমন সহজ, তেমনই অবশ্য-কর্তব্য। কিন্তু ঐ বিক্ষিপ্ত যদি এমন গভীর ও ব্যাপক হইয়া থাকে, তবে তাহা একটা গভীরতর ব্যাধির প্রকাশ-চিহ্ন মাত্র; সেই বিস্ফোটকগুলিতেই অস্ত্রোপচার করিলে হইবে না, রক্তদুষ্টির নিদানও নির্ণয় করিতে হইবে। সেই মূল কারণটির সহিত যুঝিতে হইবে। আমরা এমন কথা বলিতেছিনা যে, ঐ ক্ষিপ্ত মানুষগুলার আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে না; একাজ সুসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য নয়— যে-কোন শক্তিশালী গবর্মেণ্ট তাহা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতেই নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে না; যে-নীতি বা কর্মপন্থার অনুসরণে, ঐ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও সংশোধন করিতে হইবে। যেমন আগুন নিবাইতেই আগুন জ্বালিবার কারণ ঘুচিয়া যায় না; না জ্বালিবার আলস্যে বা উপলক্ষে নিজেই আগুন তাহার স্বভাব ত্যাগ করিবে না। সমাজকে সুস্থ ও শান্ত করিবার জন্য লোক-নায়কগণ যদি শান্তির লোকধর্মকে অস্বীকার করিয়া কোন অলৌকিক তন্ত্রকে রাষ্ট্র-নীতিরূপে অবলম্বন করেন, তবে সেরূপ নীতি নিষ্ফল হইবারই সম্ভাবনা। রাজাচক্র-নীতি ও মোক্ষসাধন-নীতি এক হইতে পারে না। সুমহৎ এক্সপেরিমেণ্ট হিসাবে উহার মূল্য যেমনই হোক, উহার জন্য যে লোকক্ষয় অনিবার্য — ক্রমশঃই যে পরিমাণে আহুতি দেওয়া হইতেছে, তাহা আদৌ আশাপ্রদ নহে।

• • •

ইহাও সত্য যে, হিংসা বা অহিংসা কোনটাই যৌগোলিক সীমানার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না; আরও সত্য এই যে, রাজনৈতিক অর্থে ভারত দুই-ভাগ হইয়া থাকিলেও কার্যতঃ তাহা হয় নাই। অন্তরে সেই একই লোকসমাজ ও জনবসতির মধ্যে, একটা অংশে যদি হিংসাকে প্রশ্রয় বা লাভ করিবার উপায় না থাকে, তবে অপর একটা অংশে তাহাকে দমন করিতে পারিলে, হিংসার সংক্রামকতা হইতে মুক্ত থাকা কি সম্ভব? ঐরূপ পাশাপাশি দুই রাজ্যের একটাতে যদি হিংসাই মূলনীতি হইয়া থাকে, এবং সেই হিংসার আক্রমণশীল অভিসন্ধি সফল হইয়া যদি অপর রাজ্যের ক্রমাগত ভূমিতে হটাইতে থাকে, তবে সেই মূল অভিযুক্তকে নির্মূলিত করিবার বা করাইবার শক্তিই সর্বাগ্রে আবশ্যক। তাহা না করিয়া যদি নিজের ঘরগুলাকেই কেবল জল ঢালিয়া অগ্নিস্পর্শ নিবারণ করিতে হয়, তবে ঘরগুলার ভিতই জখম হইয়া যাইবে। যদি হিংসাকে ইন্ধনহীন করিয়া, অথবা বলপ্রয়োগে নির্মূলিত করিয়া উচ্ছেদ করিতে হয়, তবে সংঘর্ষস্থলের সর্বত্রই তাহা করিতে হইবে। আজ সেই হিংসাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে-নীতির আশ্রয় লইতে হইতেছে তাহাতে অহিংসাদলের মূল-নীতিটিকেই লঙ্ঘন করা হইতেছে, হইবারই কথা। কিন্তু

এই উঠিতে পারে, যদি আমরা জনের সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিয়াছি — সংঘ সম্বন্ধে তাহার দ্বিতীয় নীতির — সেই এক ধর্ম-নীতির —, উপদেশ বাদ দিয়াছি কেন করিয়া? ইহাতে জনসাধারণের চিত্ত ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিবে, কারণ, তখন এমন সময়েই ক্রমশঃ বুদ্ধি-পাওয়া স্বাভাবিক যে, দেশের এক অংশে যে-জনসমাজের উপরে বল-প্রয়োগের উপায় আছে সেখানে অহিংসা-নীতি পালন করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যেখানে ঐরূপ বল-প্রয়োগের উপায় নাই সেখানে অহিংস-নীতি পালন করাই কর্তব্য। যদি ইহাই সত্য হয় তাহা হইলে এ নীতি বলবানের নীতি নয়, দুর্বলের নীতি; মহাত্মার যে অহিংসা তাহা বলবানের নীতি, সে নীতি আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছে। এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই সংসারের জ্ঞান বা অভিমান করিতেছে, ঐ অভিমানই আমাদের সর্বনাশ ঘটাইতে পারে।

•

যে পাপে দেশ জর্জরিত হইয়াছে সেই পাপের জন্যই কি মহাত্মার ঐরূপ দেহপাত ঘটে নাই? এখন শোকে উন্মত্ত হইয়া অন্ধ আক্রোশের বশে আত্ম-দোষ ক্ষালন করিলে সত্য পাপ-মুক্তি হইবে কি? এই দারুণ শোক তাহাদের জন-সাধারণকে স্নেহের মতই বাজিয়াছে — বাজিবারই কথা; তাহারাই পিতৃহীন হইয়াছে, তাহাদের চোখের আলো নিবিয়া গিয়াছে, জগৎ শূন্য হইয়াছে। কিন্তু যাহারা পত্রে ও পত্রে শোক-জ্ঞাপন-উপলক্ষ্যে সম্পাদকের সহিত সাহিত্যিক বা সাংবাদিক পাল্লা দিতেছে, তাহাদের শোক কি স্নেহের? যিনি যত বড় সাহিত্যিক তাঁহাকে তত বড় করিয়া আটের কসরত দেখাইতে হইবে, নহিলে মান থাকে না বুঝি? কে-শোক মানুষকে তাহার আত্মার সহিত মুখামুখি করিয়া দেয় তাহাই সকল মিথ্যা সকল কপটতা হরণ করে — তখন সে বৃথা-বাক্য বলিতে ঘৃণাবোধ করে; তখন সে জনসাধারণের বক্তৃতা বা প্রতিযোগিতামূলক নাটাভিনয় করিতে লজ্জা পায়। যাহারা ঐরূপ বক্তৃতাদির প্রবর্তন করিতেছে, তাহারা যে সকলের সহিত একাত্মতা প্রকাশ করিবার জন্যই তাহা করিতেছে, এমন মনে হয় না; তাহাতেও একরূপ আত্মপ্রচার আছে — এমন কি, অভিনয় আস্বাদনও আছে। মহাত্মার জীবৎকালেও যেমন, তাঁহার জীবনান্তেও তেমনি, ইহারা তেমন তাঁহার মূর্তিটাকে পুষ্পচন্দনে চর্চিত করিয়া বিদেশের বিলাস-কক্ষের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে — শোকের গুরু-গুরু মন্দ্রে মন আন্দোলিত করিতেছে। আমাদের এরূপ মন্তব্যে পাঠকপাঠিকাগণ বিস্মিত, এমন কি, ক্ষুব্ধ হইবেন জানি, কিন্তু আমরা জনসাধারণের কথা বলিতেছি না — সেই সকল স্বাচ্ছন্দ্যময় ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছি, যাঁহাদের ঘরে বসিয়া শোক-সাধা চর্চা করিবার প্রচুর অবসর আছে — হাপাইবার ভাবনাও নাই; সভায় সভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবার জন্য মোটর-ভাড়ারও অভাব নাই। শোক তাঁহাদেরও হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু সে শোক সাধারণ নয়, একটু অসাধারণই বটে।

• • •

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, রবিবার প্রবীণ কবি ষতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি পরলোকে গমন করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি পীড়ির অবস্থায় প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার কবি-শক্তি ও সাহিত্যিক উৎসাহ অটুট ছিল, এখনই একালে প্রায় দেখা যায় না। কিছুদিন পূর্বে আমরা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম, কবি হাইনের (Heinrich Heine) মত তাঁহার সেই mattress grave দেখিয়া যেমন ব্যথিত হইয়াছিলাম, তেমনই সেই অবস্থাতেও তাঁহার হৃদ্‌-মনের অক্ষয় সজীবতা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ইদানীং তাঁহার চক্ষুর অভিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এক-

একটা আক্ষেপের শেষ সমর্থনের জন্য তেমনি একজনকে হইয়া উঠিত। তখিনাথ, এই অবসরে তাঁহাকে যে বিদায় অভিনন্দন পাইয়া তাঁহার জন্মস্থ সেই যে বিদায় হইয়া গেল তাহাতেই কলে রবিবারে তাঁহার মৃত্যু হয়। শনিবার পর্যন্ত সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল, পরে আর তাহা সম্ভব হয় নাই। এই সংবাদে আমরা বড়ই দুঃখ পেয়ে করিয়াছি, কারণ, আমাদের বিশ্বাস, তিনি ছ মাসি সত্ত্বেও আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন; থাকার এইরূপ যথেষ্ট হিল যে, তখনও তাঁহার কবিজীবন সমাপ্ত হয় নাই।

•

বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রযুগের উপাসক কবিগোষ্ঠীর যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে কবি যতীন্দ্রমোহনই একদিকে অগ্রগণ্য। কবি করুণানিধান, দুর্গাচরণ ও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক হইলেও, কাব্য-সাধনায় রবীন্দ্রনাথের আবাসস্থলে সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা ও সকল সাধনার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনিই রবীন্দ্রশিষ্য-মণ্ডলের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। দুই কারণেই হয়—রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তাঁহার যাত্রিশের অন্তঃপ্রাণিতার দ্বারা, তিনি সেকালের অনেক আধুনিকপিপাসু তরুণকে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করিতেন। আমরাও একদা তাঁহার সেই কবিপ্রাণের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহার সেই স্নেহ ও সহানুভূতির স্মৃতি তখনো মুছিয়া যাইবার নয়। মনে আছে, তাঁহারই সঙ্গ আশ্রয় করিয়া সেই প্রথম রবীন্দ্র-সন্দর্শনে গিয়াছিলাম—সে ১৩১৮ সালের কথা। সেদিন সন্ধ্যায় কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এক নিভৃত কক্ষে, কবিকে দেখিয়া ও তাঁহার সেই আলাপ শুনিয়া যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, আজও তাহা তেমনই অনুভব করিতেছি, তাহাতেও যতীন্দ্রমোহনকে স্মরণ করিতেছি।

•

যতীন্দ্রমোহনের কবি-প্রতিভা ও কাব্যকীর্তি সম্বন্ধে কিছু সমিবার স্থান ইহা নয়, তবে অপেক্ষা মানুষটিরই এখন বেশি করিয়া মনে হইবার কথা। তথাপি, যতীন্দ্রমোহনের সাংসারিক বা সামাজিক জীবনকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার সেই কবি-রূপটিই সর্বাগ্রে মনে পড়ে; তাঁহার সেই রূপ চির অক্ষিত স্মৃতিপটের সীমাবদ্ধীর মধ্য, একটুকু স্মরণ দিয়া উঠিত। অনুভূতির সেই গভীরতা ও তীব্রতাই তাঁহার কবিতার একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। কবিতার এই মুখ এবং কবিজীবনের এই ভরি একালে দুর্লভ। তাই আজ যে-মানুষটির অদর্শনে বেদনা বোধ করিতেছি, সেই মানুষটির অভাব তেমন করে মনে পড়িতেছে না। সেই সঙ্গে ইহাও বোধ করিতেছি যে, যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে রবীন্দ্রযুগের একটি জীবিত-নিদর্শন অদৃশ্য হইয়া গেল—সেই কালের সাহিত্যিক আবহাওয়াকে তিনিই সজীবতা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ অনেক দিন গত হইয়াছেন, কবি করুণানিধান থাকিয়াও নাই, দুর্গাচরণ চিরদিনই সাহিত্যসমাজ হইতে দূরে বাস করিয়াছেন; একমাত্র যতীন্দ্রমোহনই সেকালের সেই কবিদলের স্মৃতি বহন করিয়া, যেমন তাহার সেই তুলসীমঞ্চটিকে কোনরূপে আগুলিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ সেই তুলসীমঞ্চের দীপটিও নিবিয়া গেল।

•

প্রতিবৎসরের মত এবারের বাংলাদেশে সরস্বতী-পূজার উৎসব ছেলে-মেয়েরা যথারীতি উৎসাহ সহকারে সম্পন্ন করিয়াছে। এই সরস্বতীপূজা সম্বন্ধে আমাদের মত বৃদ্ধদের মনে একটা কথা প্রায়ই জাগে। এই পূজা বিশেষ করিয়া বাঙালীরই পূজা, অন্যান্য বড় পূজাগুলির মত বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ইহাতেও জাজ্বল্যমান হইয়া আছে; তবু এই উৎসবে বাঙালীর সেই বৈশিষ্ট্যও একটু বেশি করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একালে সকল বৈশিষ্ট্যই লোপ পাইতে বসিয়াছে—

•

পল্লীজীবন ও পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে যে ক্রিয়া বিধি-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, তখন তাহাদের চরিত্রও তখন, তেমনই তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভিন্নরূপ হইবারই কথা। আদি কাল হইতে সরস্বতী-পূজা আসিতেছে। এই পূজা বিদ্যার ও জ্ঞানের — তাহাদের প্রাণ-রস ও নবীন — তাহাদের পূজা ইহা নয়। আমাদের এই দেবী সকল প্রকৃতি কল্যাণময়ী অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া সর্ব সমাজের সকল শ্রেণীর পূজা হইলেও, বাঙালীর ঘরে ঘরে তাঁহার যে ধ্যান ও অর্চনা হইয়া থাকে — পুরোহিতের বিদ্যালাভ কামনা করিয়া। এমন অনেক বাঙালী পুত্র পাঠশালে যাইবার পূর্বে তাহাদের এই দেবীকে একটি বিশেষ ভক্তিভরে। উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যেও ছাত্রগণের মন একটি নিষ্ঠা ও সংযমের ভাব তাহাদের মনেও সঞ্চারিত হয়। সরস্বতী বিদ্যা-দেবতা বলিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্যার্থীদের সকলেরই যে ভক্তিভাব ছিল, তাহাও বাঙালী-সমাজের একটা সংস্কারের মধ্যেই গণ্য। আর কোন হিন্দু-সমাজে বিদ্যার দেবতারূপে সরস্বতীর এইরূপ অর্চনা — এইরূপ উৎসব হয় কিনা জানি না। কিন্তু যুগ ও পরিস্থিতি বদলিয়া এই ভাবটা পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে হয়। আমরা বিদ্যার প্রতি বাঙালীর সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা অনেকখানি হারাইয়াছি। নানা কারণে বিকৃতিও হইয়াছে। বিদ্যা এখন বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় — ইহার জন্য ছোটবড় যত দোকান খোলা হইয়াছে; পূর্বে পরিচালন তপস্যা করিয়া বিদ্যা লাভ করিত, এখন ধনীর সন্তানেরাই ইন্দ্রজালের মতো বিদ্যালাভ করে। বালকেরাও স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, বিদ্যা বাড়ী-ঘর-বাগানের মতই একটা সম্পত্তি — যে কর টাকা সেই কত সহজে উহার মালিক হইতে পারে; একটু বড় হইলেই তাহারা সেইরূপ ক্রয়-কৌশলগুলি আয়ত্ত করিতে যত্নবান হয়। অতএব এখন ঐপূজায় যে উৎসাহ দেখা যায়, তাহার ভাব যতখানি তাহা বিদ্যার উৎসাহ নয়, ইহাদের প্রাণের ক্ষুধা বা প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি: একটি অবিমিশ্র উল্লাস নয়। ইহা যেমন মুখে চিত্ত, তেমনই বিদ্যার পরিবর্তে একটা সংস্কারের আশ্রয় করিয়াছে। সরস্বতী এখন আর বিদ্যার দেবতা নহেন তাঁহাদের উৎসবেই তাঁহার আবাহন ও অর্চনা হইয়া থাকে।

* * *

সরস্বতীর এই যে অপমৃত্যুর কথা বলিতেছি, ইহাও অদ্ভুত বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ বাঙালীর সরস্বতী শুধুই বিদ্যার দেবতা ছিলেন না — সৌন্দর্যেরও দেবতা ছিলেন; সেই সৌন্দর্য প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রাণে তাহার স্পর্শ অনুভব করা ঐ পূজায় একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় ছিল। বাঙালীর সকল পূজা-পার্বণেই পল্লী-জীবন ও পল্লী-প্রকৃতির সহিত একটা ঘনিষ্ঠ যোগ যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনই, এই সরস্বতী-পূজার উৎসবে তাহার স্বভাব-কবিত্বের ও প্রকৃতি-প্রেমের একটা বড় প্রমাণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ পার্বণের সপ্তম নাম — শ্রীপঞ্চমী, বাসন্তী-পঞ্চমী। বৎসরের ঠিক এখন একটি সময়ে, ঋতুচক্রের এমন একটি আবর্তন-সন্ধে উহার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, উহা যে বসন্তেরই আগমনী উৎসব, তাহা আমরা অন্তরে অনুভব না করিয়া পারি না। ঐ পূজা বাংলার পল্লী-প্রকৃতির বাসন্তী-শোভার পূজাও বটে। এই জন্যই সরস্বতীর কোন মূর্তি নয় — পূজার অঙ্গ উপকরণই ছিল সেই ভাবের দ্যোতক। নবীন মাঠ, ও বন এই তিনের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, পূজার পূর্বদিন উপকরণ-সংগ্রহের ছলে সারা গ্রামখানি খুঁজিয়া আসিতে হইত — মাঠ হইতে শস্যের শীষ, বন হইতে আমের বুকুল, এবং নদীর কিনারা হইতে শর-ঞ্চী আহরণ করিতে হইত। এই সবগুলি যেন ঐ দেবতার বিভূতি। এই যে প্রকৃতি-প্রেম — এই যে শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক অনুরাগ, ইহাকেই অন্ন ও আবীরের রাশি

যেন সাকার হইয়া তুলিত। টীকার পর, এবং এ সকলের উপরে বিরাজ করেন — দেবেশী ও মহাশয়, এবং বাণি-ভবনের অনেকখানি পুঁথি; বাণীই ত' সৌন্দর্যের শেষ প্রকাশ। সে বাণী কেমন বাণী? সেই বীণায় সুর বাজার সুর? সেই পূজার বাসন্তী রঙের বসন পরিয়া যে অঞ্জলিদান, তাহাতে কিশোর-কিশোরীর প্রাণে কোন্ ভাবের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক? এ পূজায় মানুষের হাতে-গড়া প্রতিমার স্থান ছিল না — কেন, তাহা বুঝিতে পারি। এ পূজা প্রতিমার পূজা নয়, সাক্ষাৎ প্রকৃতির পূজা — প্রতিমার সৌন্দর্য স্বভাব-সৌন্দর্যের হেয় করিবে। দেবের পূজায় প্রকৃতির উপরে প্রতিমাই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহার কারণও খুব স্পষ্ট। প্রতিমা-পূজাও পূর্বে ছিল, কিন্তু সে ঐ শহরেরই অঙ্গবিশেষে। সংস্কারী বাঙালী প্রকৃতির পূজা করিবে কেমন করিয়া! তাছাড়া, আছিলার এই পূজায়, আর এক অর্থে, সেই বহুপুরাতন প্রয়োজনা আছে — জীবন-বসন্তের যৌবন-উদ্যানে যেবারে শুচি ও সুন্দর থাকে, সেই বয়সের বাঙালী-সন্তান এই পূজায় তাহাদের প্রাণের শিখালো-স্মৃতি করে।

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উপন্যাস 'বঙ্গ-শ্রী'তে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, সে সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ আমরা ইতিপূর্বে দিয়াছিলাম। এবারে দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা রাখিতে আমরাই তাঁহাকে বাধ্য দিতে বাধ্য হইয়াছি। এ ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, বরং পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে সবিনয় ক্ষমা-ভিক্ষা আছি। এইরূপ ভুল আমরা আর করিব না, করিতে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্করের সহিত উপন্যাস যে 'বঙ্গ-শ্রী'তে কখনো প্রকাশিত হইবে না, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। এই বিশ্বাসের আমাদের ছিল বলিয়াই কেন যে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল, তাহা আশা করি, এই সংখ্যার পাঠকগণ অনুমান করিতে পারিবেন।

[২৮শে মাঘ, ১৩৫৪

চিত্র-পরিচয়

কামিনী রায়

(১৮৭৪ — ১৯৩৩)

বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসন্তা-গ্রামে জন্ম; বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা, ও কেশব-জয় কেদারনাথ রায়ের পত্নী। বাংলার মহিলা-কবিদিগের মধ্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চ; রচিত কাব্যগুলির মধ্যে 'আলো ও ছায়া'ই সুপরিচিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ; অপরগুলির নাম — 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ' প্রভৃতি।

"পুরাতন ও পরিবর্তন-যুগের সন্ধিস্থলে যেমন জন্মলাভ, তেমনই, পরিবর্তন-যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে আমরা কবি কামিনী রায়কে পাই। আধুনিক যুগের কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে যে নিরিক্ত-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুবর্ধনা—ব্যক্তিগত ভাব-অনুভবের অনুভূতা প্রকাশ করিয়াছেন কামিনী রায়ের কবিতায় সেই আত্মভাবের প্রাধান্য আছে, কিন্তু সমাজের আর সকলের সঙ্গে প্রাণের মিল নাই বলিয়া তিনি দুঃখ পান; অর্থাৎ তাঁহার কবিতার ভাব ব্যক্তিগত হইলেও, তিনি সমাজ ও জাতিসাধারণ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। পরবর্তী যুগে ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনা হইতেই উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার উদ্ভব হইয়াছে — কাব্যের রূপ-কল্পও আরও সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ কবির কল্পনা তেমন মুক্ত বা স্বাধীন নয়। ইঁহার কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি-পূজা বা সৌন্দর্যপ্রীতি অপেক্ষা নর-নারীর চারিত্রিক সাধন-সুষমাই রোমান্বিত হইয়াছে। কামিনী রায়ের ভাষাও অতিশয় সাধত ও পরিমিত — পরিবর্তন-যুগের কবিদের মত ঝঙ্কারপূর্ণ ও উচ্ছ্বাসময় নয়। ঐ সংযম ও আত্ম-পরীক্ষার মধ্যে যে আত্মসচেতনতা আছে, তাহাই আধুনিকতার একটা লক্ষণ। তথাপি, তাঁহার কল্পনার প্রসার অল্প, ভাষার ও ছন্দে আধুনিক গীতিকবিতার পটীয়ান আকুতি বা অপরূপ ধ্বনি-ঝঙ্কার নাই। এই সকল কারণে কামিনী রায়কে পরিবর্তন-যুগ ও আধুনিক-যুগের মধ্যবর্তী বলিয়া নির্দেশ করাই সঙ্গত।"

— 'কাব্যমঞ্জুষা' হইতে।

---

৪৪ নং চোরবাগান রোড, "ভবানী প্রেসে" শিশিরকুমার পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীবাণীকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অধিকাংশ লোক [illegible] অর্থের [illegible] দুঃখ পুরোহিতের পরে করিতেন। পুরোহিতদের [illegible] কাল, তাহা নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইত। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশে বিদ্যুদ্ধের সাহায্যে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব জ্ঞানের স্রোত চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাঁহারা নিখিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণ স্বরূপ—অতিথিসৎকারের কথাটা জানাযাক। আতিথ্য সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে; আমাদের নিখিত গ্রন্থকারেরা অতিথিকে নারায়ণ বলিয়া উঠেন; ছিপদী পেটিয়ে লাখি মেরেন। কিন্তু যে জাতি ইহলোকে নাই, সে চীনদেশের বিষয়। তাঁহারা অতিথি-সৎকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আরও শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল বিষয়ে নিখিত গ্রন্থকারেরা জ্ঞানী, সে সকল বিষয়ে নিখিত গ্রন্থকারেরা অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে হইবে।

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরূপ কার্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী; এই প্রণালীর অনুবর্তী হইয়া আধুনিক বিদ্যকেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এদেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এদেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে; তর্কচূড়ামণি, বাগ্মী বা সুলেখক — ইহাই বাঙ্গালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয় পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত দুঃখ, দুর্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগে যে বৃত্তিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই প্রকৃতধর্ম; সেগুলির অবহেলা, আর বৃত্তিবৃত্তির অনুচিত স্ফূর্তি অধর্মসাধক পাপ। আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্মজ্ঞান বিষয়ে এরূপ ঘটে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রত্যেক, কখনও চক্ষে বা মনঃমাত্র আকৃতিতেও নিহিত হয় নাই; বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মার অর্পিত হয় নাই; চন্দ্রে পক্ষপাতিত্ব বা রাগদ্বেষে নহে। কেবল সেই সর্বাঙ্গসুন্দর — অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ পরিণতি-বিশিষ্ট উচ্চধর্মশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে।

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় দোষ এই যে, সকলকে এক এক কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিণত হইতে হইবে — সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথায়? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্যরসগ্রাহী, সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতত্ত্বে অপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ — সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ব-বিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত।

তৃতীয় দোষ এই যে, 'শাস্ত্রশিক্ষণ' অর্থাৎ শিক্ষার — উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ফূরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উষধ করিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সে চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি—তেমনই এই জ্ঞানার্জনব্যতিব্যস্ত

শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, আবশ্যিক অভাব — বুদ্ধি সকলের অবনতি। বুদ্ধির ফল, মনে রাখা, জিজ্ঞাসা, তর্কে যেন চটপট করিয়া বলিতে পারা। তারপর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল, কি শুষ্ক কাঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল; যুক্তি-অবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তক-প্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তাগণ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আচরণ বলিয়া চলিল; জ্ঞানার্জনী বুদ্ধিগুলি মুড়ো খোন্তার মত কেবল ঘিসাইয়া দিলে পিছিতে পারে, কি আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল; — সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায় — বিবৃতি নামে কাল্পনাময়ী দেবী আসিয়া তার নামাইয়া লইলে, তাহারা খালে বিলিয়া সচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না, এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও ঐরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, অনুকরণ সার্থক করিব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। আমি সোল্লাস বলিয়া যে ঘোষাকে লম্বুর বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাঁহাদের অন্ত লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রজ্ঞাবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটায় বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই — ঠিক হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালীর বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই দুশিক্ষার মূল ইংরেজের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত, আরও নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না।

জ্ঞান স্বাস্থ্যকর এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। অভাব স্বাস্থ্যকর, এবং অভাব হইলে পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলা কথা জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। ফুটে অনেক আলো জ্বলিতেছে কেবল দিঙ্নির্ণয় অন্ধকার। এই জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানে না। একজন ইংরেজ বন্দর হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগানে কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অখাদ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, "সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই — আটি খাইতে হয়।" তারপর আঁধ আসিল। সাহেব মালীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, "সাহেব, কেমন খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া পাঁসটা চুষী দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।" সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষ রসনায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্বক আধা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের জ্ঞানক্ষেত্র এই বাগানের মত জ্ঞানে ভূলে পরিপূর্ণ, অধিকারীর ভোগে হয় না, তিনি ছোবড়ার জায়গায় আটি, আটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

কবির কৈফিয়ৎ

শ্রীকালিদাস রায়

বাংলার কথা লিখিতেছ বন্ধু, তব দীর্ঘ হয়,
যেন করি' সে বিদীর্ণ হ'লো আজ।
যৌবন গত, প্রেমের পীরিতি এবে বড় অসময়,
প্রেরিত সাজিতে উনবাটে পাই লাজ।

প্রেয়সী বাণী যোগায় না আজ সে মাধুরী-বৈভব,
নায়িকা ধরেছে নটী মধুরীর রূপ,
দেবতার কথা কি লিখিব—তায় নেউল নিরুদ্যম,
ঘুমাইছে পাঁপ, এত হয়েছে কূপ।

পল্লীর পীরিতি লিখিব কি, তায় নাই সেই সরলতা,
পল্লীও আজ নগরের অনুকারী ;
বিদায়ের গানে কাহারো হৃদয়ে কি লেগেছে ব্যথার
কথা ?

প্রাচীন হিন্দু-কীর্তি এখনো জাগা'ত উদ্দীপনা,
'হিন্দু' বলিতে আজি লেশ লাজ পায়।
শবাসনে বসি' কে করে বাণীর আবাহন-অর্চনা ?
শাশান-নিশীথে প্রেতের কখনো গায় ?

কি গান গাহিব ? সুর তো পাই না, ছন্দ
পাইনা খুঁজি'।
কল্পনেরও আজিকে কে হর টানে ?
যন্ত্র-দানব হরিয়া নিয়াছে যা ছিল কবির পুঁজি,
একও আজ সুখদা নাহি যানে।

অতীত নাহিক নাহি ত অতীত, নাহি ত ভবিষ্যৎ,
আছে শুধু তার কুণ্ঠিত বর্তমান।
গাহিতে চাহিলে হাহাকারে মোর রোধে কণ্ঠের
পথ,
সেতারের তিনা তারে বাজেনা ক' তান।

প্রতিভাস ঘটে একলা, বন্ধু, স্বপ্নলোকের বাণী,
গণিযুগ-ভালে স্বপ্ন সিঁদুরে চুমে' ;
কৈফা-চড়িয়া রাজপাটে আজি, রূপে ভরে দেবযানী,
ব্রত হলে যেন সব সঁপি' অসুরে।

বিশ্ব ভরেছে শকুনি গেচক শৃগালের চীৎকারে,
অমারাত্রি এবে, অস্ত গিয়াছে রবি ;
মূক-বধির বিষণ্ণ পশুই চিনাতে পারে,
অন্ধের তরে কি গান গাহিবে কবি ?

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আমাদের দেশে, আমাদের চেনে কেন, সব দেশেই, নারীর প্রকৃতিতে যা চরিত্রে এমন একটা কিছু আছে যাহা পুরুষ-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত; এইজন্যই পুরুষ তাহাকে নারীকে পারিল না—পারিবার আশাও তাহার হয় নাই; তাহাতে সাধারণ জীবনযাত্রার বাধে না। বৃদ্ধিতে পারে নাই তাহার প্রমাণ, সকল দেশের কাব্যসাহিত্যে কবিরা নারীকে যেমন দেবীর আসনে বসাইয়াছে, তেমনই আবার, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় তাহাকেই নরকের দ্বার বলিয়া পুরুষকে সাবধান হইতে বলিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, পুরুষ নারীকে তাহার নিজের ধর্ম বা সংস্কার-অনুযায়ী, অর্থাৎ আত্মীকরণ—জ্ঞানলব্ধ করিয়া, নিজের মত করিয়া দেখিতে চায়, পারে না। উপরে যে মহামনীষীর উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছি তিনিও নারীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন না; ঐ উক্তিটির মধ্যে যে আছে তাহার গভীর অর্থ তিনিও বুঝিতে চাহেন পারেন নাই। ইহাতে নারী-চরিত্রের কাঠামোটা মাত্র করিয়া পুরুষোচিত অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি ঐ ধারণাটি সত্য। নারী-জীবনের যে সাধারণ নিয়তি আমরা দৃষ্টান্তের দ্বারা, তাহাতে উহার যাথার্থ্য দেখাই। পুরুষ নারীকে অতিশয় স্থূলরূপ ও অসহায় বুঝিয়া তাহাকে রক্ষা করা, তাহার সেই দুর্বলতাকেই পূরণ করা—এমন কি, সেই দুর্বলতাকে একটু বিশেষ যত্ন ও সেবা করাকেই পৌরুষের ধর্ম বলিয়া মনে করে। কারণটি কারণের যে তাহার জীবনে নারীর নিকটে ওই ছাড়া আর কিছু চাহিবার নাই—প্রাকৃতিক নিয়মেই যে ধন হইতে তাহার অধিকারই নাই—সেই ধন স্বীকার করিয়া যে একটা বড় রকমের আত্মপ্রসাদ লাভ

তবে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত : নারীর প্রতি তাহার সেই পুরুষত্ব রক্ষা করিতে পারিলেই কর্তব্য শেষ হইল। নারীর সঙ্গে যে তাহার তর্ক নয়, এই জানটাই যথেষ্ট ; নারী-প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র ইহা সে বোঝে, কিন্তু সে প্রকৃতি কেমন, তাহার নিজের সহিত তুলনায় তাহাতে এমন-কিছু আছে কি না যাহা বিপরীত হইয়াও তুচ্ছ নয়, যাহা ছোট বা মিথ্যা নয়, কেবল বিপরীত মাত্র — এমন প্রশ্ন সে কখনো করে না ; তার কারণ, বিপরীত বলিয়াই সে-প্রকৃতি তাহার নিকটে যেমন দুর্বোধ্য, তেমনই অবজ্ঞেয়। এই অহমিকার পুরুষ-প্রকৃতির মজ্জাগত, উহাই নারীর প্রতি তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এই প্রবন্ধের শিরোদেশে ঐ যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহার অর্থ যদি ইহাই হয় যে, "নারী তাহার জীবনে কোন কর্মশক্তির অধিকারী নয়, কিছু করা তাহার ধর্ম নয় ; সে কিছু করে না, কেবল দুঃখভোগের দ্বারা সে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সহে" — তবে কথাটার আরেক অর্থ এই হইতে পারে যে — পুরুষের কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য, তাহার সেই শক্তি-অভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য, যে একটি সর্ব-সহিষ্ণু ধাত্রীরূপিণী ধরণীর প্রয়োজন, নারী সেই ধরণীস্থানীয়া ; অর্থাৎ, পুরুষকে সৌম্যমূর্তি লক্ষ করিবার জন্য সেই যে আরেক শক্তির প্রয়োজন — নারী সেই শক্তি। আত্মাভিমানী পুরুষ যে-শক্তির গর্ব করে সেই শক্তি ঐরূপ আধার না পাইলে নিষ্ফল হইয়া যাইত ; নারীর ঐ শক্তি আপনাকে তাহার অনুকূল ও অধীন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই, পুরুষ আত্ম-প্রতিষ্ঠার অবকাশ পাইয়াছে। অতএব শক্তিটা মূলে পুরুষের নয় — নারীরই। পুরুষের ঐ আত্মাভিমান এবং নারীর ঐ আত্মবিলোপ, এই দুইয়ের অন্যোন্যাপেক্ষতাই যদি সংসার বা সৃষ্টিরহস্যকে গতিমান করিয়া থাকে, তবে ইহাই সত্য যে, নারীর ঐ আত্মবিলোপ-শক্তিই প্রধান শক্তি। পুরুষ সেই শক্তিকে জানে না—ইহাই যেমন তাহার দুর্ভাগ্যের নিদান, তেমনই, ঐ দুর্ভাগ্যই তাহার সেই আত্মাভিমান বা কর্তৃত্ববোধের হেতু — যাহা না থাকিলে সে কোন কাজই করিত না। অতএব, সকল কর্মের মূল-কর্ত্রী ঐ নারী ; পুরুষ তাহারই সেই অ-কর্তৃত্বে—সেই আত্ম-বিলোপের মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া যেন তাহারই কোন অভাব বা অভাবের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে, অথচ ঐ পুরুষই "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।"

কিন্তু গীতার ঐ বচনটিতে প্রকৃতি ও পুরুষের যে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে, আমি তাহা ঐ এক অর্থে স্বীকার করিতেও, নারীকে ঐরূপ বৈশ্বিক দৃষ্টিতে দেখিতে রাজি নই ; তার কারণ, আমি বাঙালী, আমার রক্তে প্রকৃতির প্রভাব বড় বেশি ; তা' ছাড়া আমি এখানে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেছি না, নর-নারীর জীবন-রহস্য, অর্থাৎ প্রকৃতিরই লীলা-রঙ্গ একটু উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি — আমি কাব্য-সমালোচনা করিতেছি। শ্রীকান্তও বাঙালী, তাহার সৃষ্টিও বাঙালীর সৃষ্টি ; অতএব এ কাব্যের নারীচরিত্রগুলি যে একটু বিশেষ রকম অ-বৈশ্বিক হইবে, তাহাও নিশ্চিত ; এ জন্য সেই বাঙালী-সুলভ ভাব-লালসার দিক দিয়াই নারী-প্রকৃতির আলোচনা করিব, তাহাতেই অন্নদা-দিদির চরিত্রটিকে বুঝিবার সুবিধা হইবে। এখনে ঐ নারী-প্রকৃতির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব, পাঠক—এবং পাঠিকারাও—অধীর হইবেন।

আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ সম্বন্ধে সাধারণ দার্শনিক চিন্তা এইরূপ — আমি অবশ্য একটু ব্যক্তিত্ব ও স্পষ্টতর করিয়া দিতেছি। সৃষ্টির মূলে আছে কাম, এই কামের উদ্রেক করিতে পারিলে সৃষ্টির, তথা তত্ত্বরক্ষার উদ্রেক হয়। এই উদ্রেকের জন্য যে জ্ঞান — তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা সেই জ্ঞানকেই পুরুষের বিশেষ শক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; তাহাই আত্মার ধাতু, সেই আত্মাই দেহধারী খাঁটি পুরুষের আত্মা। ঐ যে কাম উহাই প্রকৃতির শক্তি ; নারীই

দেহাত্মিনী প্রকৃতিকন্যা কাহিনী। পুরুষ তাহার প্রতিত্রাসনে এই দ্বিধাদুষ্টী লাভ করিয়াছে; কামনীন, অর্থাৎ জ্ঞানময় সেই আত্মার নিম্নে আত্মবিদ্যা উপভোগ করিতে হইলে, প্রকৃতিকে — সৃষ্টিকে, এবং ঐ নারীকে — 'Give the dog a bad name and hang him' করিতে হইবে। যে নিরন্তর আত্মোৎকর্ষের অহেতুক (অতএব পুরুষের অবোধ্য পথা) টানে মহাপুরুষ অনুক্ষণ সৃষ্টিধারায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে — সেই স্বতঃপূর্ত জ্ঞানিনী-শক্তির নাম কাম। নারী-প্রকৃতিও যদি সেই প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হয়, নারী যদি সেই কামেরই প্রতীক-বিগ্রহ হয়, এবং পুরুষ যদি ঐ কামের বন্ধনে বদ্ধ, মুক্তি-প্রয়াসী, অন্তঃপতিত আত্মাই হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যতদিন সে এই সৃষ্টির—প্রকৃতির—নারীর — দাসত্বে বিচরণ করিতেছে ততদিন সে-ই স্বতন্ত্রতর; যেহেতু ঐ জ্ঞানই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ, অতএব ততদিন সে অক্ষুণ্ণ, বিকাশপ্রবণ, দুর্বৃত্ত ও দুরাচার; এবং যেহেতু নারী স্বরূপতই নয়, ঐ কামই তাহার প্রকৃতিস্বরূপ, অতএব, পুরুষের তুলনায় সে মুগ্ধ, লাঞ্ছী ও নিষ্পাপ; সে দুর্বল নহে, সবল; কারণ, যাহার যাহা লক্ষ্য তাহাই তাহার সত্তা, এবং তাহাই তাহার শক্তি। তুমি পুরুষ, জ্ঞানের দম্ভ করো, স্বর্গস্থই আত্মা বলিয়া প্রকৃতির প্রতি তোমার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অন্ত নাই, তবু সেই প্রকৃতির দেওয়া দেহ — তাহারই অঙ্গজলে পুষ্ট ঐ রক্ত-পিত্তময় মাংসপিণ্ডই তোমার সেই আত্ম-সাধনার একমাত্র সম্বল; তোমার ঐ দেহের মধ্যে আত্মা যেখানেই থাকুক, যে-মন তোমার একমাত্র অস্ত্র, যাহার দ্বারা তুমি এই সৃষ্টিকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছ—তাহাও ঐ প্রকৃতিই গড়িয়া দিয়াছে, এবং তোমারই স্বভাব-দোষে তাহা এমন মারণাস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে! সেই আত্মাভিমানী তুমি এমনই কৃতঘ্ন যে, ঐ প্রকৃতিকে ও তাহার সেই শক্তি-রূপিণী নারী-দেহধারিণীকে দাসী করিয়া, তোমার পাপের শাস্তি তাহার উপরে চাপাইয়া দিয়া পুরুষাভিমান চরিতার্থ করিতে চাও! কিন্তু ইহাও সত্য নয়; মোক্ষকামী তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ যাহাই বলুন না কেন, এক দুর্বল পুরুষের — সাধারণ কাপুরুষের — জীবনযাত্রা-নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা যাহাই উপদেশ করুন না কেন, ঋষি ও ঋষি-এবং বীরত্বের সৃষ্টিতে নারীর সত্তাকার রূপ চিরদিন ধরা দিয়াছে। এই সৃষ্টি যদি নারীরূপা হয়, তবে সেই নারীও অন্যের অপরা প্রকৃতি, — যে-প্রকৃতির বলে সেই 'এক' পুরুষ মন্ত্রে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া, নিজেকে 'বহু'-বিভক্ত করিয়া, সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই আত্মাহুতির মূলে যে কাম ছিল, তাহার প্রকৃত নাম কি? ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয় করা যদি সহজ, কিন্তু এই কামের অপার রহস্য, মানব-চৈতন্যের গোচর হইলেও — মানব-বুদ্ধির অগোচর। ইহার কোনো তত্ত্ব নাই। ঐ যে আত্মাহুতি — প্রকৃতি তথা নারী, তাহাই বিরাট ও ব্যষ্টি-রূপ; নারীও ব্রহ্মের সেই অপরা প্রকৃতি; অর্থাৎ, সেই যজ্ঞের কর্তা — ঐ আহুতির হোতা তিনি, আহুতির দ্রব্যও তিনি; হোম-কর্তাও তিনি, হোম-কর্মও তিনি। ইহাও সেই doing ও suffering-এর কথা; পুরুষ যদি doing-এর অধিকারী হয়, এবং নারী যদি suffering-এর পাত্রী হয়, তবে ঐ পুরুষ এবং ঐ প্রকৃতি, সেই একই ব্রহ্মের দুই রূপ বুঝিতে হইবে। একেরই স্বরূপ-বিকাশের এই যে লীলা-বৈচিত্র্য, তাহাই জগৎ; মানুষের জীবনে ইহার যে অন্তর নাট্য-রূপ, তাহাই সকল কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। আমরা এমনই এক অতি বিচিত্র জীবন-কাহিনীর কথা আলিয়া পড়িয়াছি।

স্বীকার তাহার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে ঐ নারীর এমন এক মূর্তি দেখিয়াছিল, যাহার অর্থ সে কখনো খুঁজিয়া পায় নাই; তাহার সেই আত্মনিগ্রহ-শক্তির অসীমতা তাহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল —

সে দৃষ্টি তাহার দুই চক্ষুকে এমনই কলঙ্কিত করিয়াছিল যে, অন্যান্য নারীচরিত্রের মাঝেও সে সেই মহিমার দুই-চারটা রেখা দিয়াছে। এই উপন্যাসের নায়ক সে নিজেই বটে, কিন্তু তাহাতে সেই পুরুষ-নায়কের কোন পুরুষ মহিমা নাই, অনেকটা নারীই প্রধান হইয়া আছে; সেই নারীগুলির চরিত্রকলঙ্কই নায়কের চরিত্রে স্থানে স্থানে কবিত্ব হইয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অন্নদাদিদি তাহার পুরুষ-জীবনে যেটুকু যে রিক্ততা দিয়াছে, তাহার জীবনে সে রিক্ততা যেন আর ঘুচে নাই। প্রায় একই ঘরে, একই ঘটনা-সূত্রে, সে দুইটী বর পাইয়াছে; পুরুষ ইন্দ্রনাথ ও নারী অন্নদা, দুই জনে দুই দিক দিয়া তাহার মন এত বড় করিয়া দিয়াছে যে, তাহার পর সাধারণ নারী বা পুরুষকে সে আর শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই, — ভালবাসাকে সহজ বা সহজাত করিয়া গ্রহণ করিতে তাহার বাধিয়াছে। তথাপি পুরুষ সম্বন্ধে তাহার ভাবনার কারণ ঘটে নাই, কারণ এ সম্বন্ধে পুরুষের বালাই নাই। কিন্তু নারীকে তেমন অনায়াস করে কেমন করিয়া? শ্রীকান্ত যে বাঙালী, তাই অন্নদা-চরিত্রের সেই নারী-মন ইন্দ্রনাথের পুরুষ-মনকেও পরাভূত করিয়াছে। ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি তাহার পুরুষ-অভিমানকে ছিন্নে ছিন্নে যেটুকু উন্নত রাখিয়াছিল, পর পর দুই জন নারীর সম্পর্কে তাহা বজায় রাখিতে গিয়া, সে নিজের দুর্বলতারই পরিচয় দিয়াছে, নারীর নারীত্ব-গৌরবই বৃদ্ধি পাইয়াছে, — এ কাহিনী 'মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিমা'র কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে। এখন অন্নদা-দিদির সেই নারীত্ব-মহিমা একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য, আমি পাঠকপাঠিকাগণকে আমাদের সমাজে জীবনযাত্রা-বিধি, এবং তৎসম্পর্কে আমরা যে সংস্কার ও আচারগত নিয়ম বিশেষ করিয়া বরণ করিতে বলি।

এই নারীকে আমরা সহজ একটা অভিধায় অনন্যসাধারণ, সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই দেখি; সমাজের ইতিহাসে, জীবনযাত্রার এমন নয়, বীরত্বে আখ্যায়িকায় তাহার আবির্ভাব যে, আমাদের সত্তা ও শ্রদ্ধা সহজে তাহাতে নিবেদিয়া উঠে। অথচ ঐ আখ্যায়িকা না হইলে ঐরূপ চরিত্র এমন চমকিত করিত না, তাহার আগুন এমন করিয়া জ্বলিত না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাহারা আর একজন শক্তিমান কথাশিল্পী তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা যেন নারীর আত্মাকে যেন খুলিয়া দেখাইবার জন্য, আরও বীরত্ব ও অন্যান্য আখ্যায়িকার মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়াছেন — আদি তাহাদের 'কবি'-নায়ক গল্পটির কথা বলিতেছি। কিন্তু সেখানে তাহা চমক সৃষ্টি করে না, তার কারণ, সেখানে যে-চরিত্রে ও সেই জীবনে আড়ালের কোন বৈষম্য নাই, তাই সে কাহিনী অতিশয় বাস্তবও বটে। সেখানে নারীচরিত্রের যে পরিচয় আছে তাহা আরও মূলগত; সেখানে তাহার মহিমা নয় — তাহার সত্তা-স্বরূপের বিকৃতিই একটা ট্র্যাজেডি-রস ঘনাইয়া তুলিয়াছে। এখানে ঠিক তাহার বিপরীত; তথাপি একটা বড় সাদৃশ্যও আছে, সে ঐ অবস্থার সাদৃশ্য — যেন নারীচরিত্রের শক্তির দিক, তা' সে যেমনই হোক, ঐরূপ দুর্গতি-দুর্ঘটনায় মধ্যেই প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। যেন এক অর্থে, ঐ 'suffering'-এর কথাটা বড় সত্য। নারীর যে মূর্তি ত্যাগ-তাপেষণী-মূর্তি — সেই শ্রী-সৌন্দর্যের কমলা-সমা-মূর্তি ইহা নয়; কবিগণ এবং শ্রীমান ও শ্রীমতীমান পুরুষেরা নারীর এই মূর্তিরই উপাসনা করেন; ইহাই সামাজিক তথা সাহিত্যিক আদর্শও বটে। কিন্তু অন্নদাদিদির ঐ মূর্তি এমন অ-পূর্ণপরিচিত এবং ন্যায়বিরুদ্ধ যে, শ্রীকান্ত ঐখানে ঐ রূপে তাহাকে না দেখিলে, আমরা উহা কল্পনা করিতে পারিতাম না; অথচ ঐ আদর্শেই আমরা পূজা করি — কত ঘরে উহারই ছদ্ম-মূর্তি বিরাজ

করিয়াছে। — অন্তত কিছুদিন পূর্বেও আমাদের সমাজে করিত। আজিকে, পুরুষসমাজের সেই অমলা-মূর্তি এবং এই ভৈরবীমূর্তি — দুইই সেই এক নারীর দুই-রূপ মাত্র। পুরুষ তাহার নিজের দুষ্কৃতি ও দুর্গতির লজ্জায় তাহাকে যখন যেমন সাজায় সেও তখন সেই রূপ ধারণ করে — তাহাতেই তাহার শক্তির স্ফূর্তি, তাহাতেই তাহার প্রকৃতির চরিতার্থতা। পুরুষের স্নেহ, পুরুষের সেবা, পুরুষের ঘর-সাধুরীর বেসাতি ও অলঙ্কার তাহার যে-রূপকে রচনা করিয়া তোলে, সে-রূপ পুরুষের সেবা রূপ; সে তাহার আকাঙ্ক্ষা ও তাহার সাধ্যমত নারীকে সুখসাধনার সামগ্রী করিয়া তোলে, শক্তিরূপিণী নারীকে দুর্বলা ও ভোগনা করিয়া না দেখিলে তাহার ভোগবাসনা ও পৌরুষাভিমান তৃপ্ত হয় না। কিন্তু পুরুষের সহচরী-রূপে সেই ভোগসুখে সমশিক্ষোরতা, অথবা, পৌরুষ-বীর্যের সাধনায় সহকর্মিণীরূপে তাহার সেই সহযোগিতা, ইহার কোনটাতেই নারীর নিজস্ব পৃথক শক্তির সম্যক ধারণা হয় না; সে ধারণা হয় তখনই — যখন নারী পুরুষের সর্বপ্রকার সেবা ও সাহচর্য বর্জিত হয়; অর্থাৎ, যখন ব্যক্তি-পুরুষ বা সমাজ-পুরুষ একমাত্র দুর্বল ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, তাহার পাপ ও শাস্তি নারীকেই বহন করিতে হয়। তখন নারীর শক্তি সেই আদি-প্রকৃতিতে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহার সেই রাজ-রাজেশ্বরী-মূর্তির পরিবর্তে মহাভৈরবী-মূর্তি দেখিয়া আমরা ত্রস্ত হই। এই মূর্তি অবস্থাভেদে দুইরূপ হইতে পারে — মহাশক্তি-রূপিণী, ও অনন্ত ক্ষমা বা করুণারূপিণী। অমলা-দিদির মূর্তি ঐ দ্বিতীয় মূর্তি; তাহাতেও একটা গর্জন আছে, অমলার নারী-স্বভাবে একটা কঠিন বন্ধন আছে — তাহার পশ্চাতে জাতিগত সংস্কার ও সংস্কৃতির একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

পূর্বে বলিয়াছি, নারীর প্রকৃতিই এমন যে তাহাতে পুরুষের মত আত্মোপলব্ধির বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাই; তাহার শক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং তুলনায় তাহা মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর — আমি ভূমিকায় সেই তত্ত্বের স্থাপনা করিয়াছি। প্রত্যেক সমাজ নারীকে যে ছাঁচে ফেলিয়া তাহার গঠনসাধন করিয়াছে, নারীও সেই ছাঁচ গ্রহণ করিয়া, সেই একই নারীত্বের এক একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাঙালী-সমাজ যে-পুরুষের সমাজ, সে-পুরুষ কঠিনের অপেক্ষা কমনীয়তা ও মধুরতা, ভোগশিখার অধিকতর অপেক্ষা স্নেহসুধের শান্তিই তাহার অধিকতর কাম্য। নারীকে সে নিজ চরিত্রের উপযোগী ছাঁচে গড়িয়া লইয়াছিল; তাহাকে সুখসাধনে ভোগসহচরী না করিয়া, মাতা, পত্নী ও কন্যারূপে স্নেহসেবার অধিকারিণী করিয়া, সে তাহার শক্তিকে স্নিগ্ধ পথে প্রবর্তিত করিয়াছে। নারীর সহিত পুরুষের যে সাক্ষাৎ প্রাকৃতিক সম্পর্ক — যে সম্পর্কে সে পত্নীরূপেই পুরুষের সমশক্তিভাগিনী, সেই সম্পর্কের পূর্ণ ও প্রবল পিপাসা সে—যুগ তাহার সাধনার মার্গে, বহু সমাজবিকৃতি আচারে — চরিতার্থ করিয়াছে; এমন কি, গুরুতর ধর্মসাধনায় তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়াছে। আমরা জানি, ঐ আচার স্থান এই সমাজে যত বড়, ঠিক সেই অনুপাতে পত্নীর স্থান কোথায়। ইহার কারণ, এই অতল পৌরুষ-বিমুখ জাতি নারীর স্নেহ-সেবার দ্বারা যে মাতৃশক্তি তাহা দ্বারাই নিজের দুর্বলতা পূরণ করিতে চাহিয়াছে। আর, এ দিকে ঐ পত্নীরূপিণী নারী তাহাকে পুরুষের স্বাভাবিক পিপাসা রুদ্ধ করিয়া এমন একটি তপস্বিনী করিতে হইবে, যাহাতে স্বামীর ঐ অবহেলা সে একপ্রকার স্নেহের দ্বারা সহনীয় করিতে পারে, এবং একটি দৃঢ় আত্মমর্যাদাবোধে যুক্ত হইয়া তাহার পতিপ্রেমকে একরূপ ঘনসাধনায় অপারোরিত করে। এই পত্নীধর্ম স্নেহহীন নহে — ইহা পতীত্বমাত্র নয়, তাহার প্রধান একাংশে বিরল

হইলেও পুরুষদের মধ্যেই পাওয়া যাইত। ভালোবাসা বা প্রেম বলিতে আমরা কোনো যাহা বুঝি উহা ঠিক তাহা নহে; দাম্পত্যপ্রেমে যে ছিল না তাহা নহে — অন্য সমাজের মত এ সমাজেও তাহা নর-নারীর অভিজ্ঞতার সৌন্দর্যের মত, সেকালের প্রমাণের মধ্যেই ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে পতি-পত্নীর যে সম্পর্ক এ সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে পুরুষের পক্ষে কোন উচ্চতর পারিবারিক অথবা সামাজিক নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু নারীকে একটা কঠিন সংস্কার-বন্ধন স্বীকার করিয়া একরূপ শক্তিসাধনা করিতে হইত, এবং তাহাতেও এক অদ্ভুত ফের — প্রতিসাম্য-বিরহপক্ষে একটি অপূর্ণ কামবৃত্তি বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

আমার মনে হয়, ইহা সাধারণ হিন্দু-সংস্কার নয়, সেই হিন্দু-সংস্কার ছাড়াও একটি বিশেষ বাঙালী-সংস্কার ঐ নারীকে এমন ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে। কেমন করিয়া তাহা জানি না — কত ভাব ও অভাবের সাধনা, কত যুগের প্রচেষ্টায় এই সমাজে হইয়া গিয়াছে, তাহার মূলে, এ দেশের নারী-প্রকৃতি একটি বিশেষ-ভাবের আধার হইয়াছে, — নারীর সেই স্বাভাবিক প্রেম-পিপাসা পত্নী-জীবনে এক অস্বাভাবিক কামবৃত্তির উদ্রেক করিয়াছে। অস্বাভাবিক বলিতেছি এই জন্য যে, তাহার পত্নীত্বকে মাতৃত্বই এমন বৃহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ করিয়াছে। বাঙালীর সংসার ও পরিবার এমন একটি নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, বাঙালীর মেয়ে মা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে নাই, তাহার জীবনে ঐ এক স্বভাবের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে। স্বামীর সহিত ব্যবহারেও তাহার সেই সর্বংসহা প্রকৃতিই — মানুষের মধ্যে যাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে — যৌনকামনাকেও অতিক্রম করিয়া অতি অল্পেই আত্মবিসর্জনের উপায় করিয়া লয়। এইজন্যই বাঙালীর সমাজে পত্নীজনিত নারীত্ব, সতী অনাচারের সহ করিয়া পুরুষকে ক্ষমা করিবার, পালন করিবার ঐ ক্ষমতা ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা শুধু সতীত্ব নামক সেই বিশিষ্ট হিন্দু-সংস্কারই নয়, আরও বেশি; কেবল সেই সংস্কার ঐ অন্তঃপ্রকৃতির অনুশীলনকে, ঐ আত্মবিসর্জন-ধর্মের সাধনাকে সহজ করিয়াছে। বাঙালী পুরুষের চরিত্র, বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থা, এবং বাঙালীর পারিবারিক জীবন — এই তিনের সংযোগে, বাঙালী নারীর যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে — তাহার দিঁদুরে ও শাড়ীতে যে আকৃতি-সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাহা একাধারে জননী ও পত্নীর। তথাপি, আমার কথা শেষ হইল না; আমি পত্নীত্বের মধ্যেও মাতৃত্বের যে প্রভাব প্রয়োজনের কথা বলিয়াছি তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন, ঐ পত্নীত্ব মাতৃত্বের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে — আমাদের সংসারে পত্নীর প্রেম ঠিক পতি-প্রেম নয়, অর্থাৎ, তাহাতে নারী-পুরুষের যে আদিম সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের কোন গভীরতর আকৃতি নাই। এ কথার উত্তরে কেবল একটি প্রমাণাভাস উদ্ধৃত করিতে পারি, যুক্তি-তর্ক বৃথা। সেকালে যাহারা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইত, তাহারা, আবশ্যক হইলে, মৃত হইতে শুক্লপক্ষযুক্ত শিশুকে দিঁ কিয়া ফেলিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত। না, নারীর স্তন-মুখের ক্ষেদ করা সহজই সহজ নয়, আমি কেবল পুরুষ-হৃদয়ের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার হলে একটা ব্যাখ্যার চেষ্টামাত্র করিয়াছি, নহিলে, আমার দৃষ্টি রহিয়াছে কেবল একদিকে — পত্নীত্বও নয়, মাতৃত্বও নয় — প্রেমও নয়, দেহও নয়, — নারীপ্রকৃতির সেই আদি-রূপটির দিকে।

এই শক্তি সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষা-সংস্কার-ভেদে নারী-চরিত্রে নানা রূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু আদি প্রকৃতি সেই একই। আমাদের সংসার ও জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে, আমরা যাহার চরিত্র-রেখাই লক্ষ্য করি — সেই প্রকৃতির নানা বিচিত্রিকেই বিশদে

করি। তথাপি একটা ধাঁধা কখনো ঘোচে না, দু—দু—যত চরিত্রই দেখি না কেন, সকলেরই মূলে কি যেন একটা রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করি, তাহার অর্থ বুঝি না; কোন ভাষাশাস্ত্র তাহার সেই জটিলতা মোচন করিতে পারে না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—"এই বিড়ালই বনে গেলে বন-বিড়াল হয়"; তাহার অর্থ, যাহাকে এমন শিষ্ট শান্ত পোষমানা দেখিতেছ, সে-ই যদি ছাড়া পায়—যদি গৃহে বাস না করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে তাহারই স্বভাব ভীষণ হইয়া উঠে। কথাটা নারী-চরিত্র সম্বন্ধে পুরুষের বিস্ময়ের প্রমাণ। নারী যেমন ছলনাময়ী, সংস্কার-ভীরু, পরাশ্রয়ী ও একনিষ্ঠাপরায়ণা, তেমনই আবার এ সকলের যাহা বিপরীত তাহাও নারীতেই সম্ভব। অতএব, এখানে পুরুষের নীতিশাস্ত্র বা ভাষাশাস্ত্র হার মানিয়া যায়। আমি 'শ্রীকান্তের' অন্নদা-দিদির ব্যক্তি-চরিত্র সম্মুখে রাখিয়াই এত কথা বলিতেছি; অন্নদাদিদির চরিত্রেও একটা দিকই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বটে, তথাপি তাহারও অন্তরালে সেই নারীপ্রকৃতির আদিম রূপ উঁকি দিতেছে, যথাস্থানে সে আলোচনা করিব। সমাজ যেমনই হোক, সংস্কার যেমনই হোক, সেই সংস্কার-বন্ধনের বশ্যতা-স্বীকার, অথবা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া, নারী তাহার সেই এক প্রকৃতিরই পালন করে। আমরা বুঝি না, ভুল করি; তার কারণ, ঐখানেই পুরুষ সর্বাপেক্ষা দুর্বল, সবচেয়ে বোধহীন; তাই ওখানে সে কোন রহস্যকে আমোল দেয় না, বিলে তাহার ভোগলালসাই বাধা পায়। তাই সেখানে সে লোকধর্ম ও নীতিশাস্ত্রকে প্রাণপণে ঠকাইয়া করে; নীতিশাস্ত্র ত' আর কিছুই নয়—ভোগকে নিরাপদ করিবার শাস্ত্র। নারীকে স্বরূপে দেখিবার জন্য চিত্তের যে মুক্ততা চাই, সাধারণ মানুষের তাহা নাই—আছে বীভাচারী তান্ত্রিকের। তন্ত্রমতে ঐ সাধারণ মানুষের নাম 'পশু', তাহাদের আচারকে 'পশাচার' বলে। 'পশু' অর্থে কোন গালি নয়—স্বাভাবিক প্রকৃতিপন্থার জ্ঞানহীন মানুষ। তান্ত্রিক নারীর যে বিশ্বরূপের রূপ দেখিয়াছে—সেই রূপ দেখিবার জন্য সে সমাজের বাহিরে শ্মশানে তাহার আস্তানা করিয়াছে। আমাদের ত' তাহা করা চলিবে না, আমরা সে-রূপ দেখিতেও চাই না।

কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, ইহাও একটা বড় রহস্য যে, আমরা নারী-শক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখি—সেই শক্তিকে পূর্ণ উদ্যুক্ত হইতে দেখি—তাহে, দুর্ঘটনায়; সুখে যা সম্ভবিতে নয়, যেন আগুনের মতই তাহার মত জ্বালা তত দীপ্তি। ইহার কারণ কি? আত্মনিগ্রহের একটা অদ্ভুত নেশা কি নারীর প্রকৃতিগত? কোন কোন স্থলে তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়—মনে হয়, একটা দুরন্ত আত্মাভিমানের বশে নারী তাহার দুর্ভাগ্যকেও স্বীকার করিতে চায় না; যে দুর্ঘটনা যে দুঃখের জন্য পুরুষই দায়ী—সেই পুরুষকে ক্ষেহ করিয়া বা মার্জনা করিয়া নয়, যেন তাহাকে সম্পূর্ণ অপরাধী করিবার জন্যই সে ঐ কঠিন আত্মনিগ্রহের সাধনা করে। কিন্তু ইহাও নারী-প্রকৃতির বিকৃতি—সুস্থ নয়, অসুস্থতার লক্ষণ। এমন বিকৃতি আরও অনেকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আজ যে নারী-বিদ্রোহ সর্বসমাজে দেখা যাইতেছে, তাহাও সেইরূপ বিকৃতি। নারী পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র, তাহার শক্তি পুরুষের শক্তি নয়; তথাপি সে যে পুরুষের সহিত সমস্পর্ধিতার পরীক্ষে, তাহারই জন্য তাহাকে সাবেস্তা করিতে চায়। ইহাও একটা বিষম-লক্ষণ—প্রাকৃতিক লক্ষণ নয়। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। ঐ যে আত্মনিগ্রহ, উহা প্রকৃতপক্ষে আত্মশক্তিরই বিলাস, উহাতেই নারীর সেই স্বকীয় প্রকৃতি যেন প্রাণের নিগূঢ় পিপাসা মিটাইয়া করে। পুরুষ আমরা কিছুতেই তাহা বুঝিব না, বুঝিতে—আমাদেরই কারণে উহা হইয়া থাকে বলিয়া, আমাদের পৌরুষ আহত হয়। কিন্তু যদি আমরা সংস্কারমুক্ত হইয়া, নারীকে নারীরই দিক দিয়া

দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে — কথাটা নিষ্ঠুর হইলেও — বীকার করিতে বাধিত না যে, ঐ একটা দৃষ্টান্তেই নারীর যেন একটা পূর্ণতর আত্মপুষ্টি হয়। এই পুষ্টিকে সে অবশ্য তাহার বহির্দেহনাশের জন্য না, মানেও না; কিন্তু অন্তর্দেহনাশের সে যে ক্ষতিকে অনুভব করে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ, উহাও আত্মোৎসর্গ, এবং আনন্দই সে শক্তির নিদান।

এইবার এ আলোচনা শেষ করি। উপরে যত যত ভাবে অনেক কথা বলিয়াছি — তবু একই, কিন্তু তথাপি অবশেষে তবুই কেবলই হারাইয়া যায়। তথাপি, বাংলা গল্পে ও উপন্যাসে এই নারী-চরিত্রই যেন কবি-কল্পনার উপজীব্য ও পরীক্ষাস্থল হইয়াছে, বাঙালী কথাশিল্পী এই নারীকেই বিচিত্র-বিচিত্র ভঙ্গীতে দেখিয়াছেন; এই নারীর স্বপ্রকৃতিকে তিনি যতটুকু ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি ততখানি প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ দেখিবার ভাবে, কেহ বা নিকটে, কেহ বা দূরে থাকিয়া সেই শক্তিকে অসীম দুঃখ সহ করিবার শক্তিরূপে চিনিয়াছেন, ইহাও সত্য। সাহিত্যের অন্যত্র বিভাগে যে ট্র্যাজেডী-তত্ত্বীয় নাটক বা নাটকধর্মী কাব্যপ্রধান উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে পুরুষ নায়ক হইলেও পুরুষের পৌরুষবীর্যের পরিণামে — স্বকপোলকল্পিত নিয়তির হস্তে তাহার সেই পরাজিতাই—সে ট্র্যাজেডির মূল মন্ত্র; কিন্তু পুরুষের সেই আত্মনাশ ঐ ট্র্যাজেডিরই অন্তর্ভুক্ত নায়িকা-নারীর আত্মোৎসর্গ হইতে স্বতন্ত্র। পুরুষের জন্য যে দুঃখ তাহা পরাজয়ের দুঃখ, আত্মপতনের দুঃখ; কিন্তু নারীর জন্য যে দুঃখ তাহাতে শোকের অন্যান্য একটি অপূর্ব সৌন্দর্যবোধ থাকে — কবির পরিমাণ যেমনই হোক, শক্তিরই জয়গান হইয়া থাকে; যেন তাহাতেই নারী-প্রকৃতির কোন্ একটা মূল সুর পূর্ণতীব্রে নিঃসেবিত হইতে দেখি। দুঃখ, সন্তাপ, ঐশ্বর্যের আসেটনীতেও নারী যেন দুঃখের অনন্তলোক হাসিমুখে সহ্য করিয়া তাহার নারীত্বের পূর্ণ-মহিমা লাভ করে; তাহার জন্য নাম— ডেস্‌ডিমোনা, ওফেলিয়া, ভ্রমর, সুন্দরমণি! শুধু তাহাই নয়, স্বামীও তাহার স্বামী-অভিমান ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজের সেই নারীরই উপলব্ধি করে, সেও তখন বলিয়া ওঠে —

"No more but e'en a woman and commanded by such poor passion as the maid that milks and does the meanest chare."

কিন্তু তাহার কারণস্বরূপ ঐ কবিগণ যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাও নারী-প্রকৃতির পূর্ণশক্তির নয়; আরও ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইবে। প্রেম বা স্নেহ বা পরদুঃখকাতরতা নারী-চরিত্রের লক্ষণ বটে, কিন্তু নারী-প্রকৃতি তাহারও উপরে। আমাদের দেশে সেই প্রকৃতির প্রকাশ যে-রূপ হইতে দেখা যায়, অপর কোন সমাজে, সাধারণভাবে তেমন হয় না, তাই সে সাহিত্যে নারীর পরিচয় অন্যরূপ। সেখানে পুরুষের গৌরবই অধিক; পুরুষের পৌরুষ-সেবা লাভ করিয়া, এবং সেই পৌরুষের সহচরী হইয়া, নারী আরেক রূপে তাহার স্বর্গ-পালন করিতেছে — পুরুষ তাহার পৌরুষের দ্বারা নারীর নরত্বপক্ষিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; অথবা, নারী সেই পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পুরুষ-শক্তির আশ্রয় হইয়াছে।

এখানে, এই বাঙালী-জীবনে, নারীর সে আশ্রয় বা আবরণ নাই; তাই তাহার সেই পূর্ণশক্তির আদিম রূপ কত মুহূর্তে কত স্থানে জাগিয়া ওঠে, অথচ পুরুষ তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। সেইরূপ একটি নারী — ঐ অন্নদা-দিদি; শ্রীকান্ত তাহার কোন্ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছিল, এবং নারী-পূজার সেই অর্ঘ্য তাহাকেই নিবেদন করিয়াছিল, সেকথা এইবার বলিব, — আমরা ঐ চরিত্রের দিক দিয়াই সে চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দি

পাই দেখিব ; এবং তাহা হইতে—শ্রীবাসের ঐ আদর্শ কল্পিতে পারিব।
হইতেই — শ্রীগৌরভক্তিরসের আরও চিত্তরে প্রবেশ　　(ক্রমশঃ)

"মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব, যত মহত্ত্ব, সমস্তই দুঃখের আগুনে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মূলা দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূলা দুঃখে, বীর্যের মূলা দুঃখে, পুণ্যের মূলা দুঃখে।"

— রবীন্দ্রনাথ

কোজাগরী

[আসাম দেশের কবিতা — অনুবাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

রজনী গভীর হ'য়ে আসে
ধ্রুবতারা জ্বলিছে আকাশে,
ধানক্ষেত কুয়াশায় ঢাকা,
ঝিঁ ঝি-ভরা বেণুবনে
　　চুপি-চুপি চলেছে হাওয়া।
প্রহরী পিটায় লোহা
　　কাঠের কাঁসর,
প্যাদোডায় ঘণ্টার স্বর,
ঘুরে ঘুরে ডাকে ফেরা
স্নেহের কাঁদার —
আরও দূরে কুটীরে কে যায় ?
রজনী গভীর হ'য়ে আসে।
কথা ক'য়ে যাই দুইজনে
পাশাপাশি ব'সে দুজনায়,
জীবন মধুর লাগে রজনীর প্রায়।
পাহাড়ের গায়ে
উঠে' আসে হাল্কা-ঠাণ্ডে
　　গায়ে-গায়ে আগুন ধরায়ে।

ঐ ধ্রুবতারা
　　জ্বলিতেছে কাহুনের পারা।
শুধু বাহুড়ের
পিপিরের কণাগুলি মুখে এসে পড়ে,
আসে দূর মাদলের ধ্বনি,
দুজনে বসিয়া থাকি সারারাতি রজনী।

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া যাঁহা কাব্যরস বিতরণ করা হইবে—কেবল সর্ব্বকালের রসিকসমাজ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাভাষার কাব্যরসও বটে। একালের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদলের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সম্যক্‌রূপ পরিচয় নাই। 'রঙ্গদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাটি পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে বর্ষ-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

১

বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উর্ম্মিতে,
ঐশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার!
তোমার শ্রীপদ-তল: এখনো লভিছে
প্রসাদিছে কতশত ক্ষুব্ধ পারাবার।

গভীর সুস্বর-বনে তুমি গায়ায়িনী
বসি' নিজ বটমূলে — নেত্র নিরাকুল।
স্থির ধরে কপাছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবাধরে পা দু'খানি আশ্রয়ে শার্দ্দূল।

বিস্তীর্ণ পন্নার তুমি রয় উপকূলে
　　ঘনে' আছ মেঘরূপে অভিন্ন-হৃদয়া !
নক্রকুল মত্ত-তুণ্ড পড়ি' পাদমূলে,
　　তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা !

দুকূট-সাহারে হেরি — চন্দ্রমুখ সাথে
　　ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা !
যবির অরুক-ঘনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
　　ন'রে তুমি অকলিত ক্রীড়ার বিহ্বলা !

নিস্তব্ধ অরণ্য-চূড়ে নাহি অন্ধকার,
　　অনন্তকী-লতার গেহে সিরিভূমি ভরি'
গহ্বরে গহ্বরে শুরু-ধরাধূ-পুৎকার,
　　বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি শিহরি' ।

অলোকে কিংশুকে গেহ ছাইয়া প্রাবৃত,
　　শিবকণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
দুত-বুদ্বুদের বক্ষে মন্দ্রিত অম্বর,
　　এ হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্বার্থ-সাধিকে !

এ — চণ্ডীদাস-বীণি, শ্রীচৈতন্য-শ্রুতি,
　　রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাহু, গগন-মুকুটি,
　　মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বর্ষিত-জননী !

(

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

ধানে তোমার রূপ দেখি গো, মনে তোমার
　　চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি !
তুমি জগৎ-ধাত্রীরূপা, পালন কর পীযূষ-দানে,
অমরা তোরে স্নেহের ক'ণ, মধুর হ'ল নবীন ধানে ।
পদ্ম তোমার পায়ের অক্ষ ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ — নিশাস সে তোর —
　　ভরল বলে ।
নগরে তোর শঙ্খ বাজে — শুনতে যে পাই
　　রাত্রি-দিবা,
হিমাচলের তুষার ছিরে' চন্দ্র তোমায় চলছে কিবা !
দেখ্‌ছি গো রাজ-রাজেশ্বরী-মূর্তি তোমার গ্রামের
　　ঘাটে,
বিহাগে তোর খাদ্য অঙ্গে বস্ত্র তোমার উষা বাটে ।

অমরা তুমি, অঙ্ক নিয়ে পিছ্‌লা নদীর বৈরীকে,
গৌরী তুমি — তৈরী তুমি গিরিরাজের সৈন্যকে ।
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মথনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুটলে তারত নন্দনে ।
চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নবী-জলোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো-কেশ
　　দোলে ।

কাঁটালে তোর আঙুল কাঁটায়, জল-ঝরা সেই
　　মধুল আম,
ঘাট-শালিকে বলনা গায়, নকীব ডেকে চাতক
　　যায় ।
নাগ-কেশরে চামর করে, কোকেল ডেকে সজীতে,
অভিষেকের বারি করে নিত্য তোমার পল্লিতে ।

তোমার ছেলে ঘুমুলে ঘরে প্রভাতপতি হয় উতলা,
বিনি-সুতোর পদ্ম তোমার তোলায় কাপাস নিশি-রাতি।
সন্ধ্যাহারা ওই মরি-আলী বিনি-সুতার হার গাঁথে,
অবাধ হাই তার হাতির-পাতার ছায়ার ছাতা তোর
মাথে।
তু'কে ছিতা পীযূষ তোমার অন্ধুছে — লক্ষ্য
বাঁধছে সো,
গানের আমার ছন্দ-ছটি তোর পথিক-জনে
সাধছে সো!

পদ্মা তোমার সাতনরী হার, মুক্তাকুরির শুচেক
তোর;
ব্রহ্মপুত্র মুকুর নারী, প্রাণের নারী মেঘা তোর।
কিরীট তোমার — বিরাট হীরা হিমালয়ের
হিমাতে,
তোর কোহিনুর কাড়বে কে বল! নাগাল না
পায় কেউ হাতে।

ছিতা তোমার ক'লটা-সি'দি — যে দেখেছে সেই
জানে,
তান কানে তোর 'বাতা'র বিলিক্, 'কর্ণফুলী' বাম
কানে।
'ইছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার ভয়
ঘোচে,
'পদ্মা' — ভয়-পদ্ম-উপাদান — লক্ষ্যে মন ভুলোচে।
'ভাগীরথে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাকছে বেদের
মন্ত্রে সো,
'বৈতরণে' আর 'সাম্বোদরে' জপছে "মাতৈঃ"
যন্ত্রে সো;
রাঙের 'মধুমতী' তুমি, অঙ্গে 'রূপোতাক্ষী' তুই,
দাপের ভীতি, ধরার প্রীতি দুই চোখে তুই দাবিস
দুই।
ধাত্রী! তোমায় দেখছি আমি — দেখছি জগৎ-
ধাত্রী-বেশ,
তব-স্থানে তোর প্রাণ ঢেলে, মোর গল্পাছন্দি-কল্পেশ!

---

(৩)

কবির মা

(১)

দুর্দ্ধ গরিব নামহীন মোর
যা হয়েই তুই থাকলি, মা!
সবদিকে আমি ছোট বলে' তুই
আস্‌লিরে কোলে রাখ্‌লি, মা!
পাঠাবি কোথায়? নাহি গৌরব;
তুলিবি কোথায়? নাহি গৌরব;
পরে নিলে না ত' ঘরে রেখে দিলি
তাই ত' আমারে, পাল্‌লি মা!

(২)

তোরি আঁচলের খুঁট ধরে' ধাই
তরা-অন্নের মাঠপানে,
তোরি পাশ্‌মূলে দাঁড়াইয়া চাই
রাঙমুখ-আকা মাঠপানে।
মন্দিরে তোর সাথে সাথে যাই,
পীযূষ-প্রসাদ হাত ভরে' পাই —
জলধরী যার দুধুমুখে, তারে
বৃথা ভাগবত-পাঠ কেনে?

(৩)

দিও না আমায়ে লবারে বেড়ে —
　　দুরু দুরু কাঁপে বক্ষ, মা !
আমি শুধু দীন দুর্বল দুখী
　　অক্ষম সাধে সখা, মা !
জানোজনের পলাকার ভার
জলভরা চোখ সহে না আমার,
কাজল-গরার কাজলে তোমার
　　ঢুকাও সজল, রক্ষ মা !

(৪)

তুই পড়ে' দিস পাতার টোপর
　　— সোনার কিরীটে নেই মা মোর,
তোর আঁচলের বসুর বাতাস
　　আয়াস করে' কি পায় চামর ?
পাছিমে পুঁথির ওল্টাতে পাতা,
দিই দিস্ —তাহা পাপিয়ার সাথ,
গুল না পাকুক, গুন্-গুন্ করে
　　বেড়িয়া ও পদ — এই ভরসা ।

(৫)

যেন না তোমার স্নেহের দীঘিতে
　　কমলের সাথে নাইতে পাই ;
যেন না তোমার বিপিন-ভবনে
　　পাপিয়ার সাথে গাইতে পাই ।
চন্দন সাথে যেন রোজ রোজ
পরশি তোমার চরণ-সরোজ,
যেন না তোমার চাহুকের মত
　　হরির করুণা চাইতে পাই !

---

(৪)

স্বর্ণপুরী

ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা 'আইরি'-ক্ষেতের আড়ে —
একটুকু আর আঁধার-করা নধুর কেয়াবাড়ে,
পুবের দিকে আধ-ভাঁটালের বাগান দিয়ে যেরা,
ছড়ান ঘরে বাঁধার তলে রাখাল-বালকেরা —
　　ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্ণপুরী,
　　ঐখানেতে জনম আমার স্নেহ চুরি !

ধানখামারের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে সলাজলি সজনে-গাছের সাঁকা,
গোরুর গাড়ীর চাকার পথে শুকায় নাড' কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে খুঁটে-ছাইয়ের গাদা ;—
　　শুধু আমার জন্মভূমি স্বর্ণপুরী,
　　বিশ্বখোজা ঐখানেতে স্নেহ চুরি !

যত দেশের যত পাখী ঐ গাঁয়ে কি আছে !
কেউ কাছে যেঁষে উঁকে' বাসার কাছে কাছে।
পথের পাশে গাছের তলা ঘুরে পড়ে থাকে,
চলার দোলেই দুলনো পাতা শুঁড়োর পায়ে পাকে ;—
বনে-ভরা এমনি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার চিত্ত সেথায় সেছে চুরি !

পল্লীবীথি কোথায় পাব ? — পথ নাইক' মোটে,
চৈৎ-মাসেতে শুকিয়ে উঠে- জলটুকু না জোটে !
পানাভরা ডোবার-ভরা, সিন্ধি গাছে ছাওয়া,
ভাঁট-নিমিলিয়ে অঙ্গলের হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া,—
এমনি আমার স্বর্গছাড়া স্বর্গপুরী,
স্বর্গলোভা তবু সেথায় সেছে চুরি !

তবু ওরই ঘুঘোর-পাড়ার কদমতলার ধারে
সন্ধীর্তনের মিলন-গীতি পাড়া অন্ধকারে ;
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, ব্যথা-বাঁধন-হারা —
আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদে ভরে তারা ;
এমনি আমার সাবাসিধে স্বর্গপুরী,
তাইত আমার মনটি সেথায় সেছে চুরি !

---

(৫)

দেশের মাটি

মধুর চেয়েও আছে মধুর —
সে ঐ আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি !

চন্দনেরি গন্ধভরা,
শীতল-করা, ক্লান্তি-হরা —
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি।

শিয়রে তার পূর্ব্ব এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিশুঝুমে জোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি।

নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে ফসল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
পাশের সে তার ঘোমের পাটি।

ঘটলক্ষ্মীর মাল্য মাথায়,
নীলার কমল সঙ্গে বাজায়,
পাঁচজোরে তার পঞ্চ-ফুল,
অঙ্গে বকুল আর চোপাটি।

নারিকেলের সোপন কোষে
অন্ন-পানী' জোগায় গো সে,
কোলভরা তার ফলক-ধানে
আটটি নীরে বাঁধা আঁটি।

সে যে গো নীলপক্ষ-আঁখি,
সেই গো যে নীলকণ্ঠ পাখী, —
মুক্তি-সুখের বার্ত্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের আনাগোনা।

নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট-ছোট গ্রাম-গুলি।
পল্লব-ঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি — কালোজল, নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের ধূলি তার লাগি মাখি রজে,
যা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে
জল ভরে'।

আর্যোদয় *

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ, ডি-ফিল্ (মিউনিক্), ডি-লিট্ (প্যারিস্)

(পূর্বানুবৃত্তি)

ইন্দোইউরোপীয় আর্য ভাষাগুলির মধ্যে যে-দুইটি হইতে আর্যদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত আসা করিতে পারা যায় সেই দুইটি (অর্থাৎ লিথুয়ানীয় ও গ্রীক্) আলোচনা করা হইল। ল্যাটিন, জার্মানিক, কেল্টিক প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য আর্য-ভাষা এই সম্পর্কে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ এই সকল ভাষা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হইতে সর্ববিষয়ে এতই পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে — যে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা যে সকল দেশে কথিত হয় বা হইত, সেই সকল দেশের কোনটিতেই আর্যদের আদি বাসস্থান অবস্থিত ছিল না। যে-দেশে যে-ভাষার জন্ম সেই দেশে সেই ভাষা অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তিত হইবার কথা। ল্যাটিন হইতে ইটালিয়ান, ফরাসী, স্পানিশ্ প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ল্যাটিনের সহিত এই ভাষাগুলির প্রত্যেকটির সাদৃশ্য সমান নহে। ইটালিয়ান ভাষার সহিতই ল্যাটিনের সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং তাহার কারণ অবশ্যই এই যে যে-দেশে প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা কথিত হইত সেই দেশেই এখন ইটালিয়ান ভাষা কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ ভাষাতত্ত্বের পরিকল্পিত আদি ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার সহিত সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার যতটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, ল্যাটিন, জার্মানিক, কেল্টিক প্রভৃতি ভাষার ততটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত যে যে-সকল দেশে ল্যাটিন, জার্মানিক প্রভৃতি আর্য ভাষা কথিত হয় সেই সকল দেশ আর্যদের আদি বাসভূমি রূপে বিবেচিত হইতে পারে না।

কিন্তু তথাপি যাহা পুরাতত্ত্ববিৎ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্কান্ডিনাভিয়া বা জার্মানীর অংশবিশেষ আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল। ভাষাতত্ত্বের বিচারে এই সিদ্ধান্ত আদৌ গ্রাহ্য করানো যায় না বলিয়া ইঁহারা প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে ঐ কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে সকল পুরাতত্ত্ববিৎ প্রধানতঃ এই চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের নাম পেঙ্কা (Penka) মুখ্ (Much) ও কসিনা (Kossina)। পেঙ্কার মতের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ইনি নৃতত্ত্বের (ethnology) দিক হইতে আর্যদের উদ্ভব ও প্রাচীনতম ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রত্নাবলীর সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্ববিদগণ সাধারণতঃ ভাষাতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করিয়া লইয়া থাকেন বলিয়া পেঙ্কা অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে পেঙ্কার সমর্থন আদৌ করা যায় না, কারণ 'আর্য' কথাটির অর্থই যখন 'আর্যভাষী', তখন ভাষাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা কিরূপে সম্ভব হয়? পেঙ্কা কিন্তু ইহাই করিয়াছিলেন। পেঙ্কার মতে, স্কান্ডিনাভিয়ার অধিবাসীদের মত যাহাদের শরীর তাহারাই কেবল আর্য। এই বিশ্বাস প্রথম হইতেই থাকায় মনে বদ্ধমূল তিনি যে যখনই কোন দেশে স্কান্ডিনাভিয়াকেই আর্যদের আদি

* বঙ্গীয়-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রবোধ চন্দ্র বসু-বক্তৃতা, নং ৪।

জন্মভূমি রূপে নির্দেশ করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথমেই যদি জার্মানীবাসিদিগকে আর্যনামে অভিহিত করা হয় তাহা হইলে জার্মানিয়াই যে আদি আর্যভূমি তাহা প্রমাণ করা কি কঠিন হয়? পেশ্কা যাহা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং তাঁহার মতের কোনও আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক যুগে প্রত্নতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের দিক হইতে বিশেষজ্ঞগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জার্জিনাভিয়া আর্যদের আদি জন্মভূমি। অনেকে মনে করেন যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রক জার্জিনাভিয়া হইতে নির্গত হইয়া জার্মানগণ ঐ সহস্রকীয় অর্ধাংশ সময় ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপেরও অনেকখানি অধিকার করিয়াছিল। পণ্ডিতগণ সর্বপ্রাচীন জার্মানিক জাতিগুলির অন্যতম, ইহারা যে অতি প্রাচীন কালেই স্কিনিয়া পর্যন্ত বসতি বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু জার্জিনাভিয়া বা জার্মানী যে ইন্দো-ইউরোপীয় দিগেরও আদি বাসভূমি ইহা বিশ্বাস করিবার একেবারেই কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহারা এ কথা বিশ্বাস করেন তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকেন যে, জার্মানীর উত্তরাংশে বা জার্জিনাভিয়ায় কোন বিদেশীয় জাতি যে কখনও পদার্পণ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই। অথচও যদি এই সকল দেশে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ভিন্ন অপর কোন ভাষার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা না যায়, তাহা হইলে স্বীকার না করিয়া উপায় কি যে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা জার্মানিক দেশেই উদ্ভূত হইয়া তাহা হইতে অন্যান্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে?, যাহারা মনে করেন যে, জার্মানিক দেশেই আর্যজাতির উদ্ভব হইয়াছিল তাঁহাদের পক্ষে ইহাই হইল প্রধান যুক্তি। কিন্তু এই যুক্তি নিতান্তই অসার। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভাষার বিস্তৃতি পরম্পরাক্রমে এমন ভাবে ঘটিতে পারে যে, যেখানে ইন্দো ইউরোপীয়গণ কখনও পদার্পণ করে নাই সেখানেও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রচলন হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে।

কসিনা ও তাঁহার সম্প্রদায় জার্মানীকেই আদি আর্যভূমি বলিয়া স্থির হন নাই। প্রাচীন কালে যদি কোথাও কোন জাতি কৃষি ও সভ্যতার কোন বিষয়ে জার্মানদের সহিত সাদৃশ্যশালী ছিল বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই জাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, জার্মানগণ কারিয়া তাহাদিগকে সেই সেই বিষয় শিখাইয়াছে। এই যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া কসিনা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালেই জার্মানগণ চতুর্দিকে ছোটোট অভিযান প্রেরণ করিয়া ইউরোপ ও এসিয়ার নানা অংশ আর্যভাষাভাষী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই ধরণের গবেষণা কল্পনাবিলাস মাত্র। আর্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা যে প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্বের সাহায্যেই করিতে হইবে, একথা আধুনিক যুগের পুরাতত্ত্ববিৎগণও (যথা, Senger) মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারাই আবার বলেন যে, ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত যদি এই বিষয়ে একমুখী না হয়, তবে পুরাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পুরাতত্ত্বের দিক হইতে আরও যে-সকল মনীষী জার্মানীকেই আদি আর্যভূমি রূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুখ্ (Much) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে বাল্টিক সাগরের পশ্চিম তীরই আর্যদিগের আদি জন্মভূমি, কারণ, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের পর হইতেই নাকি এখানে নানা প্রকারের হস্তনির্মিত প্রস্তর-অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই দেশের জার্মানিক সভ্যতা অন্যান্য দেশের আর্য-সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু মুখ্-এর এই মতের

প্রতিবাদ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড্ (Gordon Childe) বলিয়াছেন (১) যে জার্মানিক শব্দগুলির আবিষ্কৃত প্রত্ন বহুসংখ্যক সৌষ্ঠব ও বৈচিত্র্য হইতে যদি অনুমান করা হয় যে জার্মানিক সভ্যতা অতি প্রাচীন, তাহা হইলে লিটুয়ানিয়ান্ শব্দগুলির পক্ষেও অনুরূপ প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত বস্তুনির্দিষ্ট প্রত্ন-সম্ভারগুলি হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে লাভনি সভ্যতাও সমভাবে প্রাচীন। প্রত্ন-দ্রব্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য হইতে প্রমাণিত হয় না যে শব্দগুলি অতি প্রাচীন যুগের। তাহা হইতে কেবল এইটুকু প্রমাণিত হয় যে প্রত্ন-যুগের সভ্যতা ঐ সকল শব্দে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং পশ্চিম বাল্টিক তীর যে প্রাচীনতম আবাসভূমি—একথা বাল্টিক তীরের প্রত্নবস্তুগুলির সভ্যতা হইতে আদৌ প্রমাণিত হয় না। যাহা হউক এ-সম্বন্ধে প্রমাণিত হয় তাহা বরঞ্চ এই যে, বাল্টিক-তীরস্থ জার্মানিক প্রদেশে উচ্চতর সভ্যতার বিকাশ হইতে অনেকদিন বিলম্ব হইয়াছিল।

হুর্ৎ আরও বলিয়াছেন যে বাল্টিক-তীরে প্রত্ন-যুগের যে-সমস্ত বস্তুপাতি পাওয়া যায় সেগুলি আকারে ও নির্মাণে এতই সরল যে সেগুলিকে প্রত্ন যুগের প্রাচীনতম কালে নির্মিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আকার ও নির্মাণের সরলতা কখনই প্রাচীনত্বের মানদণ্ডরূপে বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, কোন সুসভ্য জাতি বিধি লৌষ্ঠববিধান করিয়া যে-সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিল সেইগুলিরই অনুকরণে বর্বর জাতি সকল এমন সব যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারে যে-গুলিকে বাস্তবিকই 'সরল' বলা ছাড়া উপায় থাকে না। বাল্টিক-তীরস্থ প্রত্নবস্তুগুলির সভ্যতা যে অতি প্রাচীন একথা তাহা হইলে কোন দিক দিয়াই যুক্তিসঙ্গত পন্থায় প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং হুর্ৎ-এর একথাও গ্রহণ করা যাইবে না যে, বাল্টিক-তীরের জার্মানেরা তাহাদের প্রত্নবস্তুগুলির সভ্যতা অতি প্রাচীন কালে বিধি আবাসভূমি বরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কাজেই বাল্টিক তীর যে জার্মানের আদি বাসভূমি — এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের কোন যুক্তিই টিকাইয়া রাখা যায় না। হুর্ৎ, তাঁহার মত স্থাপনা করিবার জন্য অনুরূপ আরও কয়েকটী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলির তিনি আরও নিখিল। কতকগুলি খনিজ পদার্থের (যেমন Callais) খনি ইউরোপে কোথাও নাই, এশিয়ায় আছে, কিন্তু তথাপি বহু প্রাচীন কাল হইতেই পদার্থটি ইউরোপে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজ সিদ্ধান্ত যাহা হওয়া উচিত তাহা এই যে এশিয়াবাসীরা ঐ সকল পদার্থ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইউরোপে আনিয়াছিল। একথা স্বীকার করিলে কিন্তু আর হুর্ৎ-এর বলা চলিবে না যে আর্য-সভ্যতা বাল্টিক তীর হইতে সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। হুর্ৎ-কে সেই জন্য বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে যে, ঐ সকল পদার্থের খনি একদিন ইউরোপেও ছিল, কিন্তু পরে সেগুলি কৃষিকর্ষাদির ফলে ক্রমে ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অযৌক্তিক যুক্তি প্রয়োগে প্রবৃত্ত হওয়াই যে কেবল হাস্যাস্পদ হ'ন তাহা বলাই বাহুল্য।

ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যজনের আদি বাসভূমি নির্দেশের উদ্দেশে প্রত্নতত্ত্বের দিক্ হইতে আরও এক রকমের যুক্তি উত্থাপন করা হইয়া থাকে; এইটিরও সংক্ষিপ্ত বিচার এইখানে করিতে হইবে। যাঁহারা জার্মানিকেই আদি আর্যভূমিরূপে প্রমাণ করিতে উদ্যুক্ত তাঁহারাই প্রধানতঃ এই রকমের যুক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইউরোপ হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে-সমস্ত ধাতুপাতি পাওয়া যায় সে-গুলি সাধারণতঃ আবিষ্কৃত রেখাচিত্র দ্বারা

১। Vienner Beitraege zur Kulturgeschichte und Linguistik, 1938, p. 526.

অলঙ্কৃত। কিন্তু তাওলাদের এই জ্যামিতিক রেখাচিত্র দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। এক প্রকারের রেখাচিত্র তাওলাদে সরু-আঘাত পূর্বক বিশিষ্ট করিয়া উৎপাদন করা হয়; প্রত্নতত্ত্বে ইহা Schnurkeramik নামে প্রসিদ্ধ; আমরা ইহাকে 'সূত্রালঙ্কৃত ভাণ্ড' বলিব। দ্বিতীয় প্রকারের চিত্রাঙ্কণের বিশেষত্ব এই যে, ইহার গাত্রালঙ্কার-উৎপাদনে সূত্রের পরিবর্তে অন্যবিধ কিছুর ব্যবহার করা হইত; প্রত্নতত্ত্বে ইহা Handkeramik নামে প্রসিদ্ধ; আমরা ইহাকে 'প্রত্নালঙ্কৃত ভাণ্ড' বলিব। এখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ-বিষয়ে একমত যে, ইউরোপীয় প্রাগৈতিহাসিক ভাণ্ডশিল্পের এই সূত্রালঙ্কার ও প্রত্নালঙ্কার পরস্পর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং এই দুই প্রকারের ভাণ্ডালঙ্কারের একটি যে ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের নিজস্ব সম্পত্তি সে বিষয়েও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায়। সুতরাং যদি নির্ধারণ করা যায়, এই দুই প্রকারের ভাণ্ডালঙ্কারের মধ্যে কোনটি ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের নিজস্ব এবং কোন্ দেশেই বা সেই ভাণ্ডালঙ্কারের উৎপত্তি — তাহা হইলেই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের কিছু দূর হইতে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু এই দুই বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই প্রত্নতত্ত্বে দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত দেখা যায়। কেহ বলেন, সূত্রালঙ্কারই ইন্দো-ইউরোপীয়, আবার কেহ বলেন, প্রত্নালঙ্কারই ইন্দো-ইউরোপীয় রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সূত্রালঙ্কার এবং প্রত্নালঙ্কার এই দুই প্রকারের ভাণ্ডালঙ্কারের প্রত্যেকটির উৎপত্তিভূমি এক সম্প্রদায়ের মতে মধ্য-ইউরোপ এবং আর এক সম্প্রদায়ের মতে পূর্ব-ইউরোপ! কাজেই প্রত্নতত্ত্বের বিচারে আর্যদিগের আদি বাসস্থান যে সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত করা যাইবে সে আশা সুদূরপরাহত।

সূত্রালঙ্কার যে মধ্য-ইউরোপে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু আধুনিক যুগে ঠিক ঐ ধরণের সূত্রালঙ্কার-বিশিষ্ট প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভগ্নাবশেষ দক্ষিণ রাশিয়াতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকন্তু, দক্ষিণ রাশিয়ার আবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষ আদিম অবস্থা হইতে সূত্রালঙ্কারের ক্রমবিকাশের অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, এবং সেই জন্য দক্ষিণ রাশিয়াই এই জাতীয় ভাণ্ডালঙ্কারের জন্মভূমি রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। (২) অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সূত্রালঙ্কার পূর্ব-ইউরোপ হইতে মধ্য ইউরোপে সংক্রামিত হইয়াছিল, এবং সূত্রালঙ্কারের জন্মস্থান যদি ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের জন্মস্থানরূপে বিবেচিত হয়, তবে পূর্ব-ইউরোপই সেই জন্মস্থানরূপে পরিগণিত হইবে। এই সকল বিবিধ কারণ চিন্তা করিয়া রোজেনবার্গ বলিয়াছেন যে দক্ষিণ রাশিয়ার অন্তর্গত উসাটোভা-ই হইল ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণের আদি জন্মভূমি। (৩) কিন্তু রোজেনবার্গের মত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই, কারণ, অনেকে মনে করেন যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের মধ্য-ইউরোপীয় প্রাগৈতিহাসিক ভাণ্ডশিল্পের সহিতই উসাটোভার ভাণ্ডশিল্পের সাদৃশ্য সামান্য। কিন্তু পূর্ব-ইউরোপের পক্ষে এখনি বিচলিত হইবার নহে। কারণ, পোলাণ্ডদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ মুলিখিউ দেখাইয়াছেন যে, পোলাণ্ডের এক বহুদূর প্রাগৈতিহাসিক সূত্রালঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়—যাহা মধ্য-ইউরোপ এবং উসাটোভা এই উভয় স্থানের প্রাগৈতিহাসিক ভাণ্ডালঙ্কার সূত্রালঙ্কার

২। Rosenberg, Kulturstroemungen in Europa zur Steinzeit, Kopenhagen 1931.

৩। Seger, Hirt-Festschrift, Vol. I, p. 24.

অপেক্ষা প্রাচীনতর বলে গণিত হওয়া উচিত।

প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যও সেই একই রকমের। যদ্যপি ইউরোপে এই ধরণের তাম্রাশ্মের পাত্রাদি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অনতিদূরে পূর্বে ইউক্রাইনের অন্তর্গত ট্রিপোলো (Tripolje) হইতে প্রত্নতত্ত্ব-যুক্ত প্রাগৈতিহাসিক তাম্রাদির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এবং ইন্দো-ইউরোপীয় প্রশ্নের অন্যতম পণ্ডিত নেহ্রিং (Nehring) মনে করেন যে, ট্রিপোলো-সভ্যতাই হইল আদি ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে সমস্যাটার যে সমাধানেরই প্রয়াস পাওয়া যাক না কেন — যে দিক দিয়াই দক্ষিণ-রাশিয়ার প্রাগৈতিহাসিক তাম্রাদির বিচার করা হউক না কেন, দক্ষিণ-রাশিয়ার সাথে অধিকসংখ্যক ভাবে কোন দিক দিয়াই ছাড় করানো যায় না। এটি বলা যায়, দক্ষিণ-ইউরোপীয় সভ্যতার ইন্দো-ইউরোপীয়, তবে দক্ষিণ-রাশিয়ার ট্রিপোলো হইতে আগন্তুক আসিবে; আবার এটি বলা যায় যে দক্ষিণ-রাশিয়ার প্রত্নতত্ত্বের ইন্দো-ইউরোপীয়, তবে অনুরূপ আগন্তুক আসিবে ট্রিপোলোর পক্ষ হইতে।

সকল দিক বিচার করিয়া নেহ্রিং অবশেষে বলিয়াছেন, ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের আদি বাসভূমির মধ্যে দক্ষিণ-রাশিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে ইহা পশ্চিম দিকেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহা হইলে ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সিদ্ধান্তদ্বয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, দক্ষিণ-রাশিয়াই ছিল আর্যদের জন্মভূমি। নেহ্রিং যে বৃহত্তর আর্যদের আদি জন্মভূমিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে যে, ইহা এত বিস্তীর্ণ যে মূল প্রকৃতির সভ্যতাকের সীমানা এতদ্বারা সূচিত হয় না। কিন্তু আধুনিক যুগের ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের দিক্ হইতে কোন একটী সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রকে আর্যদের আদি বাসভূমিরূপে নির্দেশ করা অসম্ভব। বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহার বিভিন্ন অবস্থায় ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগুলি নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিল। কারণ, সংস্কৃত ভাষার সহিত কেল্টিক ভাষার, গ্রীক্ ভাষার সহিত আর্মেনিয়ান ভাষার, স্লাভ ভাষার সহিত জার্মানিক ভাষার, এবং আরও এইরূপ অনেক শাখা-ভাষার মধ্যে পরস্পর এমন ধরণের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে, তাহা হইতে মনে না হইয়া পারে না যে এই সকল ভাষা বিভিন্ন হওয়ার পরও পরস্পরের সহিত বহুকাল বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই অবস্থার উদ্ভব হওয়া যে সম্ভব নয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিভিন্ন জাতীয় শাখা-ভাষার মধ্যে (যথা সংস্কৃত ও কেল্টিক, জার্মানিক ও স্লাভিক, ইত্যাদি) যে সকল বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় Isogloss বা সমবাক্ বলা হয়; সমজাতীয় ভাষার (যেমন সংস্কৃত ও ইরানীয় ভাষার, অথবা লাটিন ও কেল্টিক ভাষার) সাদৃশ্যকে কিন্তু Isogloss বলা হয় না। সমজাতীয় ভাষার পরস্পর সাদৃশ্যের কারণ এই যে, মূল সোটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কালে সেই সকল ভাষা অভিন্নই ছিল। কিন্তু Isogloss সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে না, কারণ ভিন্ন জাতীয় ভাষারূপে বিচ্ছিন্ন ভাষাবলীর পরস্পর সাদৃশ্যকেই Isogloss বলা হয়। এখন ইন্দো-ইউরোপীয় শাখা-ভাষাগুলির মধ্যে বহু Isogloss পাওয়া যায়। তাহা হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও ভাষাগুলির মধ্যে নানা সূত্রে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কোন সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন শাখা-ভাষার পরস্পর সংযোগ সম্ভব নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে সেই প্রাথমিক বিশ্লেষই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অতএব আইস্‌লের (৪) মত, যাঁহারা মনে করেন যে, ইন্দো-ইউরোপীয়গণ বহুকাল যাবৎ একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়াছিল

৪। Cambridge History of India, Vol. I, p. 66.

ওঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আজিকার দিনে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, চূড়ান্তরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পূর্বে বিভিন্ন আর্যভাষাগুলি কিছুকাল ধরিয়া পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। মূল ভাষা হইতে এগুলি ভাষা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখনও পরস্পর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় নাই — এই অবস্থা কি কোন সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডে আর্য জাতির পক্ষে সম্ভব? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে কোন সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডকে আর্যদের আদি জন্মভূমিরূপে নির্দেশ করা বাতুলতা মাত্র।

পরস্পর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি যদি একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে, তবে আর পেঙ্কা প্রভৃতির ন্যায় এ কথা বলাও আর সম্ভব হইবে না যে, ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণ একটি বিশিষ্ট জাতির লোক ছিলেন। কারণ একটি সঙ্কীর্ণ দেশের অধিবাসী সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা সম্ভব হইলেও কোন বিস্তীর্ণ দেশের অধিবাসী সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহে বলিতে পারিবেন না যে, শরীরের গঠনে তাঁহারা সম্পূর্ণ সমজাতীয় ছিল। কাজেই ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণের কেশ শিঙ্গলবর্ণ (blonde) ছিল, না কৃষ্ণবর্ণ (brunette) ছিল — এরূপ প্রশ্নেরও কোন যথার্থ অবকাশ থাকে না। কিন্তু নাৎসিবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এই অবান্তর প্রশ্নটিই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীক ইতিহাসে আপোলো সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি শিঙ্গলকেশ ছিলেন, এবং কেতো, ভদ্রা প্রভৃতি বিখ্যাত রোমান্ জন্মসমাজকেও প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ শিঙ্গলকেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই নাৎসিভাবাপন্ন বহু গবেষক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণও শিঙ্গলকেশ (অর্থাৎ নর্ডিক জাতীয়) ছিল। এই ধরণের যুক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নাই, কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রোমানদের মধ্যে শিঙ্গল কেশ বিরল ছিল বলিয়াই শিঙ্গলবর্ণ কেশবিশিষ্ট কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে সেই কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া দেওয়া তাঁহারা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিত। আর গ্রীকদের আপোলোকে শিঙ্গলকেশরূপে বর্ণনা করিয়াছে — এটুকু মাত্র তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া যদি কেহ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যে, গ্রীকদেরও শিঙ্গলকেশ ছিল, তবে তাঁহাদের পক্ষে যে প্রকৃত কোন যুক্তি আছে তাহা স্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইতিপূর্বে পাশ্চিমের বাগ্বিতণ্ডার পক্ষগুলি আর্যভাষীদিগকে স্পষ্টাক্ষরে শিঙ্গলকেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখনি এই নাৎসি ভাবাপন্ন গবেষকগণ তাঁহাদিগেরই প্রদত্ত যুক্তি এই অন্তর্বর্ষণে কোনদিন আর্যজাতির আদি বাসস্থানরূপে স্বীকার করে নাই।

আধুনিক যুগে ব্রাণ্ডেনষ্টাইন্ সম্পূর্ণ নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া আর্যদের আদি জন্মভূমি ও প্রাচীনতম ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন। বিভিন্ন যুগে আর্যদের মধ্যে যে শব্দাবলী প্রচলিত ছিল সেইগুলির বিচার করিয়া ব্রাণ্ডেনষ্টাইন্ প্রথমতঃ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সেই যুগে আর্যদিগের সভ্যতা কিরূপ ছিল এবং কোন্ ধরণের দেশে সেই সভ্যতার বিকাশ ঘটা সম্ভব ছিল। এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন শব্দগুলির অর্থ নানা ভাষায় কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আর্যদিগের বিবিধ শাখার প্রাচীনতম ইতিহাসও তিনি কথঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ব্রাণ্ডেনষ্টাইন দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য আর্যভাষাগুলি সমগ্রভাবে মূল শব্দগুলিতে যে অর্থ আরোপ করিয়াছে, ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় সেই শব্দগুলির অর্থ তদপেক্ষা প্রাচীনতর। ইহা হইতে ব্রাণ্ডেনষ্টাইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আদি ইন্দো-ইউরোপীয়দলের দল-সমাজ হইতে ইন্দো-ইরানীয় শাখা

সংস্কৃতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দো-ইরানীয়-শাখার বিচ্ছেদের পূর্ববর্তী কালের মূল ভাষা হইল ব্রাগেন্‌হাইমের মতে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় এবং তৎপরবর্তী যুগের মূল ভাষা হইল অর্বাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়দের শব্দ-ভাণ্ডার হইতে বুঝা যায় যে, তখনকার তাঁহাদের বাসস্থান কোন পর্বতমালার পাদদেশস্থ এক বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল। ব্রাগেন্‌হাইমের মতে এই সমতলক্ষেত্র উরাল পর্বতমালার পশ্চিমে উরাল-পশ্চিমে কিংবদ্বিক্ ঠেস ছিল অথবা কিছুটা হইতে পারে না। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় যে-সকল উদ্ভিদের নাম ছিল সেগুলির বিচার করিয়া ব্রাগেন্‌হাইম্ দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষও নাই যেটি ইউরোপেরই নিজস্ব বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে পারে। এবং অনুরূপ পন্থায় অন্বেষণ করিয়া ব্রাগেন্‌হাইম্ অন্যত্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণ যে-সকল পশুপক্ষী জন্তুর সহিত পরিচিত ছিলেন সেগুলির মধ্যে প্রধান হইল বন্য শূকর, ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, ইত্যাদি। অর্বাচীন পরবর্তী যুগের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হইতে কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্ভিদ্ ও জন্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলী হইতে যে প্রকারের তথ্যের সহিত পরিচয় ঘটে তাহা হইল একটি শুষ্ক সমতল ক্ষেত্র, কিন্তু পরবর্তী যুগের শব্দাবলী হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই যুগে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণ জলাভূমির সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং এই যুগেই প্রথম সেতু-বাচক শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সেতু-বাচক শব্দের ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে, এই যুগে আর্যগণ যাযাবর-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থির বসতি স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন; কারণ পরিচিত স্থানে পুনরাগমনের উদ্দেশ্যেই লোক প্রথম সেতুরচনা করিয়া থাকে এবং সেইজন্য সেতুরচনা হইতে বসতি-স্থানে পুনরাগমনের উদ্দেশ্য সূচিত হয়, এবং স্থিরবসতি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের বসতিস্থানে অধিবাসী-দের ফিরিয়া আসিবার যে বিশেষ কোন আগ্রহ থাকে না তাহাও সুস্পষ্ট। অর্বাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের জন্তু ও উদ্ভিদেরও বিচার করিয়া ব্রাগেন্‌হাইম্ অন্বেষণের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই যুগে ইন্দো-ইউরোপীয়দিগের বাসস্থান ছিল আর্দ্রাধিক্যের পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে। ব্রাগেন্‌হাইমের মতে অবিভক্ত ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণের আদি বাসস্থান ছিল কিংবদ্বিক ঠেস। সেখান হইতে ইন্দো-ইরানীয়গণ পূর্বাভিমুখে এবং অপর সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি সমস্ত ভাবে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। পশ্চিমাভিমুখী ইন্দো-ইউরোপীয়গণ হট্টিসো জলাভূমির নিকটে আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের এক শাখা এই স্থান হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া পরে জার্মানিক জাতিতে পরিণত হয়, এবং আর এক শাখা ইউক্রাইন পর্যন্ত পশ্চিম দিকে আরও অগ্রসর হইয়া অবশেষে সেখান হইতে দুইটি উপশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপ অধিকার করে।

ইন্দো-ইউরোপীয় শাখাগুলির গতিবিধি সম্বন্ধে ব্রাগেন্‌হাইমের এই সিদ্ধান্ত যে সর্বাংশে নির্ভুল তাহা অবশ্যই স্বীকার করা যায় না। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রাগেন্‌হাইম্ তাঁহার এই নূতন ধরনের গবেষণার ফলে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নেহ্রিং-এর সিদ্ধান্তের সহিত অধিক না হইলেও তাহার প্রতিকূল নহে। এই দুই মতের প্রধান পার্থক্য এই যে, নেহ্রিং যে-ভূখণ্ডকে আর্যগণের আদি জন্মভূমি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাগেন্‌হাইমের মতে সেটি হইল পশ্চিমগামী আর্যশাখাগুলির অন্তর্বর্তী-কালীন বাসস্থল। নেহ্রিং বলেন, আর্যগণের আদি

বাসস্থান পশ্চিমে মধ্য-ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে একটি প্রবল যুক্তি আছে। পশ্চিম ইউরোপে যে আর্যভাষার প্রচার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে ঘটিয়াছিল এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ এই ভূ-ভাগে বাস্ক্, প্রভৃতি অনার্য ভাষা এখনও রক্ষিত হইয়া থাকে। আর্যদের সম্পর্কে আসিতে কেল্ট, ব্রাথিক প্রভৃতি ভাষার যে স্থান, পশ্চিম ইউরোপে বাস্ক্ ভাষারও সেই স্থান। মধ্য-ইউরোপ আর্যদলের আদি বাসস্থান হইলে সেই ভূখণ্ডের এত নিকটে এখনও অনার্যভাষার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। তাহার উপর পূর্বোল্লিখিত এই কথাটিও ভুলিলে চলিবে না যে, মধ্য ইউরোপে মূল আর্যভাষা এত্তা পরিবর্তিত হইয়াছে যে, আর্য ভাষাই যে সেই ভূখণ্ডের আদি ভাষা ছিল এ-কথা আদৌ স্বীকার করা যায় না। কাজেই আর্যদের আদি বাসস্থান মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এই মত গ্রহণ করা শক্ত।

এইবার দেখা যাউক, কোন অনার্যভাষা হইতে আদি আর্যভূমি সম্বন্ধে কোন সঙ্কেত পাওয়া যায় কি না। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সহিত ফিনো-উগ্রিয় (ফিন্-ভাষা, হাঙ্গেরিয়ান্ ভাষা, ইত্যাদি) গোষ্ঠীর ভাষার সাদৃশ্য এত্তা অধিক যে কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিয়া থাকেন, বেদী বা তুখারীয় ভাষার ন্যায় নবাবিষ্কৃত ভাষা হইলে ফিনো-উগ্রিয় ভাষাগুলি নিশ্চয়ই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু এই দুইটি ভাষাগোষ্ঠীর সাদৃশ্য অসম্ভব না সম্পর্কাভাব সে-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। যে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই ও থাকিতে পারে না তাহা এই যে, ইন্দো-ইউরোপীয় ও ফিনো-উগ্রিয় ভাষাগোষ্ঠী পরস্পর পরস্পরকে অতি প্রাচীন কালেই প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ফিনো-উগ্রিয় ভাষাগোষ্ঠীর জন্মস্থান কিন্তু মধ্য-রাশিয়া।

ফিনো-উগ্রিয় ভাষাগোষ্ঠীর ন্যায় সেমিটিক ভাষা-গোষ্ঠীও অতি প্রাচীনকালে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়াছিল। এই কথা সিলভান লেভি, মেয়্যে প্রভৃতি মোয়্লার বিদ্বান্ গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন। এবং মেয়্যে-ই বার বার বলিয়াছেন যে, আরবদেশকে সেমিটিক জাতির আদি বাসস্থান রূপে মনে করা একটি ভ্রম। তাঁহার মতে আরবের উত্তরস্থ কোন দেশ হইতে সেমিটিক্‌গণ আরবে আসিয়া নিবাস স্থাপন করে। মেয়্যে-র নিজের বিশ্বাস এই যে ইন্দো ইউরোপীয় ও সেমিটিক্ ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ অসম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই মত পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই।

সেমিটিক্ ও ফিনো-উগ্রিয় ভাষাগোষ্ঠীর সহিত যদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অতি প্রাচীনকালেই সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে তবে তাহা হইতে ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে একটি সূত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আরবের উত্তরে অবস্থিত সেমিটিক্ জাতির এবং মধ্য-রাশিয়ার অবস্থিত ফিনো-উগ্রিয় জাতির সহিত সংস্পর্শ যে দেশে হইতে সম্ভব হইতে পারে তাহা অবশ্যই পশ্চিম রাশিয়া। ইতিহাস-ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত যদি হইলে অনার্য ফিনো-উগ্রিয় ও সেমিটিক্ ভাষার প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

সন্ধ্যারতি

[কবি অরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে]

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

(১)

সন্ধ্যা হ'য়ে এল, কবি ! তুমি জানো, আমি তব পিছে
চলেছিনু সেই পথে, যার 'পরে আলো না দুয়ায় ।
আজ এই বিদায়ের ক্ষণে হয় সেই আসা মিছে,
গগন-প্রান্তরে কোন দীপ কোথা জ্বলে না যে হায় !
দুরুহের দাহ-গান শুনেছিনু তব কণ্ঠে, কবি,
সেই মন্ত্রে যৌবনের সোমরস — একমাত্র ছবি —
ঢেলেছিনু বাণী-ঘটে, উত্তরিতে সেই অমরায়,
নিত্য-যোবনা বসন্তের রাতি যেথা কভু না পোহায় ।

(২)

আজও তুমি আগে আগে — আমি তব পিছে চলিয়াছি,
এ'পথের যাত্রাশেষে তারা'র না স্পর্শিল তব ;
আজও দোঁহে আনিয়াছি সেই ফুলে মালা একগাছি —
গলে যার একদিন রচিয়াছ গ্রন্থ নব-নব ।
আপনি লইছ কণ্ঠে সে মালিকা তুমি শ্রীতিভরে,
তুলে মোর বর ব'লে ছুটিত যে তোমার আদরে !
আজ আর কণ্ঠে নয়, একটুকু পরশন যাচি'
রাখিলাম করতলে, জানাবারে — আজও আমি আছি ।

(৩)

সেই আমি ! — তবু মোর মুখপানে চাহিয়া বিস্ময়ে
কি ভাবিছ ? হাসিছে না কোন ব্যথা তব অন্তরাল
নীরবতা, ম্লান-আঁখি বলা কিল কোন্ পরিচয়ে ? —
কবিদের উপমায় চাহিবে কি নয়নের লাজ !
তোমার কাহিনী, বন্ধু, জানি নহে কারো দয়াদান,
এ শীত-প্রান্তরে তবু ঝরে নাই মনোহর-ফুল !
নীরব যদিও কণ্ঠ, তবু আছে বক্ষে আলিঙ্গিতা
জীবন-মোহিনী বাণী, — সে যে তব চির-পরিচিতা

(৪)

ঝরিয়ে সবুজ ঘাসে এখনো সে ঝাউয়ের মঞ্জুল,
দামিনী যেমনি নাচে, মেঘে চাঁই যাবে পাখোরাজ ;
তারে কোহিনুর-দীপ, ঝিলিমিলি রেখাবী-দুকূল —
মাঝে সন্ধ্যা তালীবনে, পাখী করে কাকলি-আওয়াজ !
রূপার ফলক তোলে চন্দ্রকর তালের পাতাতে,
সৃষ্টি করি' জোৎস্না ধরে কে তরুণী লতাদুর্বা-তলে !
প্রভাতে গিরির শিরে — দেখ দেখ, কে গিয়েছে ফেলি' —
কি সুন্দর ! — যেন সে মযূরকণ্ঠী কুয়াশার চেলী !

(৫)

পীত প্রবালের শিখা — দিক্‌প্রান্তে পলাশের বন !
তালিম-দুখের ডালি কে সাজায় সাঁজের আকাশে !
জাফ্‌রান-রসে যেই পলাতক চাঁদের চুম্বন ;
নদী বয় — তারই কিতাব যোনা জলের কলা সে !
আজও তুমি যেন সখি যমুনার — ব্রজবুন্দাবন,
তুলায় পাখার জ্যোৎস্না, আজও কাঁপে প্রাণ-পারাবত !
তবু আজ একা তুমি, — যখন গভীর হয় রাতি,
চুলে পড়' একালনে, পথা কেহ রাখে না যে পাতি' !

(৬)

হে সুজন, আজ আমি কি শুধাব — সে কোন্ ফুলন ! —
দেখা হ'ল পথিপ্রান্তে, বহুকালো অদেখের তরে ;
বল বন্ধু, আরো কত তীর্থপথে — তুষিন-শীতল —
গাহন করিলে তুমি, বয় তবু কত না শিরে !
হরিদ্বার-কনখলে পিপাসায় করিলে তর্পণ,
কারে সখি মঠে মঠে লুটায়িয়া করিলে ক্রন্দন ?
নীলাচলে কি খেলিলে — সে অকূল বারিধি-বাসরে !
দারুব্রহ্মে প্রণমিয়া কোন্ বর মাগিলে কাহার !

(৭)

কাহার ? — তোমারে, কবি, কোন্ বিধি করিবে কাহার ? —
জন্ম হ'তে ম'লি যে নিখিলের রূপ-নারায়ণে !
সেই রূপে উজলিয়া উঠে দুনি, ম্লান দুস্তর,
কঠিন ভুবন হয় হৃদয়ের রস-প্রস্রবণে !

সুন্দরের পরিস্পর্শে মিলায় যে নিমেষের তরে,
ক্রন্দন ঘুমিয়া যায়, বাঁশি থেমে — থামকের তরে।
তাতে তোমা ধন রিক্তি, নদী যেন, অসীম অম্বর,
তাতে কামনের পাখী — কাঁদিবার কোথা অবসর।

(৮)

আমার বন্ধনা লহ, লহ মোর প্রাণের প্রণাম,
ছন্দে গড়ি' দিনু যাহা তুমি লহ তাহার অধিক ;
কত না কহিনু হায় — ইঙ্গিতিয়া গাহি তব নাম,
তাহাও নাহিনু ছাড়ে অন্তে আমি ছিনকণ্ঠ লিখ।
কেমনে বাণীহলে তোমা উৎসে উৎসিনু প্রীতি ?
আকুল করিয়ে মোরে অন্তরাল-যৌবনের স্মৃতি।
তবু সে চাহিনা ফিরে' লেখিনের সে 'মন-পরশ',—
যার চেয়ে ভালবেসে সো 'যান-দুর্লা' আর 'শান্তিরস'।

রূপ-ছলে চলমল, কবে তব অলিন্দায় ভরি'
উথলিল আকাঙ্ক্ষারা ? কোন্ স্বপ্ন নিশা-বিভাবরী
ওড়িয়াছে আঁখি তব ? — লাজনম শ্রীচরণ-মূলে
সর্ব্ব-সমর্পণ করি' আজ তুমি সুখ-সুখ ভুলে'।
কবে ধারা ঝরি' নিলা অঙ্গে তোমা, চুমিল্য
নয়নে —
অধরে চুমিয়া দেখে ! — নেহারিনে কুসুমে-কুসুমে

শতদল আলোকিয়ে অপরূপ রূপ-কুমারিকা !
বাজিল ও বাহু-বন্ধে সুমধুর ঘুঙুরী-বাঁধন।
দিল কি অমনি ভরি' দেবীর সে বাসর-ধরাসন
চয়নিয়া চঞ্চুপুটে পুজারীক ফুল সযতনে ?
তাই তব গীতি-পুষ্পে নিত্য হেন মধু-পরিমল,
ভুবিনে অন্ধ-ভাষা —পূর্ণ-ফুট, উজল, অমল।

— যখন-পলাশী

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে ; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গতযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জীবিত করিয়া শিক্ষিত সাধারণের চিত্তসোচর করিব।

স্বরাজ-সাধনা

[স্বর্গত অনুরূপা দেবী এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধটি ১৩২৩-২৪ সালের 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয় নাই। তথাপি, প্রবন্ধটি বর্তমানে আরও সময়োচিত, এবং ইহার অন্তর্গত ভাব ও চিন্তা যেমন সত্য তেমনই মর্মস্পর্শী বলিয়া, আমরা অবিকলাংশে উদ্ধৃত করিতেছি। লেখকের বক্তব্য এই যে, আমরা যে 'স্বরাজ' লইয়া এত হাতাহাতি করিতেছি উহা মূলে হুবহু বিলাতীয় অনুকরণ, এবং পরন্তু বলিয়াই উহা আমাদের অনুকরণাদি করিয়াছে। ইতিপূর্বে এই 'শ্রুতিস্মৃতি'-বিভাগে, আমরা স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের যে গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও ঠিক এমন কথাই আছে। বাঙালী মনীষীগণই, যেমন জাতীয়তাবাদ, তেমনই ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির খাঁটি রূপ — এই দুইয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়াছিলেন। আজ যে 'জাতীয়'-সমবেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার কোনখানে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি বা প্রতিভার গন্ধমাত্র নাই ; সেই জন্যই 'হিন্দু'-নামটাও বর্জন করা আবশ্যক হইয়াছে।]

যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় দাদাভাই নাওরোজী মহাশয় সেই বাক্যের জন্য সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া "স্বরাজ" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, তখন হইতেই ঐ শব্দটি ভারতবাসীর রসনায় অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং বিভিন্ন মতিক কর্তৃক স্বরাজের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অনুভূত হইয়া জনসমাজে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। কেহ বলেন, স্বরাজ অর্থে সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় সাম্রাজ্যবিরহিত ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা। কেহ বলেন, ইংরাজের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়া উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা ; কেহ বা বলেন, বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতির ভিতর থাকিয়া ঔপনিবেশিক প্রথা অনুসারে স্বদেশবাসীর দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র গঠন ; এইরূপ যত প্রকার অর্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বা হইতেছে, সবই রাজনীতির দিক দিয়া।

প্রথম দেখা যাউক, এ সমিতিই হউক-তাহার সভ্য অধিকার করিলেই কি আমাদের স্বরাজ-লাভ হয়! তাহা যদি আমাদের দাদা কাটাইয়া এবং পরোপকারব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যান, আর আমরা জনকয়েক বুদ্ধিমানকে লইয়া নিজের পার্লামেণ্ট বসাই,—তাহা যদি নিযুক্ত হয় পার্লামেণ্টারি প্রাইম-মিনিষ্টার, গুরুবাণী পড়িবার, পরারী তর্জমার, কলাকাবলী করেন ডিরেক্টার, আলোচনাকারী লর্ড-চ্যান্সেলর, কানপুরী কাউন্সেলার, ঘাড়ভাঙা ট্রেজারী লাট, পাইনের এটর্নী জেনারেল, বক্তাদি হোমেক্রাফ আর আমাদের এই দিয়াসলাই,—তাহা হইলেই কি আমরা সুখ-শান্তির চরম সীমায় উপনীত হইব,—বঙ্গীয় যেলার অনুকৃতি হইতে মুক্তি পাইব?

যে স্বরাজের কথা বলিবার জন্য আমি এই প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছি, তাহার অবতারণার পূর্বে স্বরাজের আসে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার জন্য আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাহার কয়েকটা কথা স্মরণ করিয়া আমরা বিগত আঠারো আনি, একবার বিচার করিয়া দেখিলে হয় না?

ধরুন, এই মিউনিসিপালিটি। এই কলিকাতা কর্পোরেশনের গায়ে একটু আঁচড় দিয়া দেখিলেই ভারতবর্ষের ছোট-বড় সকল মিউনিসিপালিটির বাত অনেকটা বুঝা যাইবে।

প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর হইল, মিউনিসিপালিটিতে এই নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে; সে অবধি তিন বৎসর অন্তর আমরা একদিন স্বাধীন সিটিজেন হইতেছি, মাথা হইতে ভোটের মোট নামাইয়া ঘাড়-ঝাড়া দিতেছি। আমাদের আমি একজন ভোটার, তাই সেই ইলেক্‌শনের দিন কি 'ইলেশন'! কি গরম মেজাজের, কি তারিফ ভোয়াজের দিন! আমার অংশরোধ পূরার জন্য বড়বাবুর জমিদারপুত্র আমার বাড়ীটা তর তুঁতুরীর বাহন, ভূলী-কাঁধী বন্ধুদের আমার সম্মুখে জোড়হস্ত। মক্কেল-মাতাল-ভরা বড় বড় উকীল মনে মনে আমার পালকের কর্তা ও মুখে কর্ণধার বলছেন, আর সব ভোগ-দেওয়া দাদা-গ্রাম রায়বাহাদুরদের কি ঘন ঘন 'দাদা'-সম্বোধন! আসি যার একজন, কিন্তু সে যাবার জন্যে সওয়ার হাকিবে একখানা মোটর, একখানা ল্যাণ্ডো, দু'খানা অফিস-ব্রাম, তিনখানা সেকেণ্ড ক্লাস! জনতাকে দেখে ভোলবার সময় পাওয়া ওঁকে ঘাঁরে খুব হেঁড়া হেঁড়ী করে: অর্জনার বেজনার আশিও সারস্বতের ছায় আছাই. 'কাশিওয়ালারা' হেঁড়া-হেঁড়ী ক'রে একখানা রথের ভিতর আমায় ভরে' দিলে, তার পর যাত্রাদল—দুজনে দুদিক্ থেকে! একজন চাকর পাখিরে বুদ্ধিরে, আর একজন ছোটাই-লিটের আমলের বাড়ি—যাত্রাদল! শেষ পোলিং অফিসে পৌঁছোই জনধারায়,—যেতেই হবে; আমি না গেলে আমাদিগেই ভদ্রমিনার যাবারুর তিনটি জনপ্রাণ ভরুবেন না। আমার ইচ্ছা দু'জনকে দু'দিকে সরাইয়ে দেখানে চুমুক দিই, আর ভাবটা, ভড়ুরী দু'খান, সিঙ্গাড়া চাটা, নিমকীখানা, সীতাভোগ মিহিদানা, সেটিক্যামিং, রাজভোগ, রসগোল্লা, গোলাপজল-ভরা বড় তালশাঁস, আর 'আমার আর্থটা মাটীর রেকাবিতে বাড়ী আনি; কিন্তু তত্ত্ব উপযাসী থাকিবেন এই আশঙ্কায় উদরস্থ উত্তম পুরস্কারে দেখানেই কিছু নিবেদন করতে হ'ল। এই যে এক অর্চনা উপাসনা, ঘাটাঘাটি হাঁটাহাঁটি—এ কেবলমাত্র আমাদের উপকারের জন্য; তাঁদের কোনই লাভ নাই; ইহাদের সহবাসে থেকে থেকে তাঁদের ছায় এঁরাও পরোপকার-ব্রতে পূর্ণমাত্রায় দীক্ষিত হয়েছেন; এই যে ষোড়শোপাচারে ভোটার-পূজা করেন, এর দোষ নেবেন তিন বছর ধ'রে আসা-পাশ্‌তলা উপকার ক'রে।

যেমন রিপিজম্ মানে বর্ষ নয়, আমার বিশ্বাস—

সিভিলিজেশন্ যাহাকে বলা যায় তাহা নয়; সে জন্য এ কথাটির আমি অনুবাদ করিব না। সিভিলাইজ্‌ড্ বাবুরা বলিবেন, 'আমাদের সাহেব-পাড়ায় রাস্তা করিয়া আমাদের অনেক প্রকার মিউনিসিপাল উন্নতি হইয়াছে; দেখ দেখি, কি সব বড় বড় রাস্তা, কি গ্যাসের আলো, কি বিজলী-বাতী, কি জলের কল, ইত্যাদি ইত্যাদি।' অন্-সিভিলাইজ্‌ড্ আমরা বলি, — হউক তো, বড় বড় রাস্তা! কত শত পত্র অন্নাসনে ছেদে চুরমার! কত লাটপুরুষের বাবরিটার অস্থির লোপ! যাক্ না লোকের ভিটা-বাড়ী, চুলোয় যাক্ লোকের বংশানুক্রমিক সুখ-দুঃখে আশা-নিরাশায় সুস্থিতিত ঘর-বাড়ী দেখুক না গৃহস্থ লোকে ছুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে ট্রামিকোনের খাদা ঠেস দিয়ে ট্রামের গোয়ারী চলাচল, মোটরের বুক্কিগাড়ী চলাচল, দরী-বোকাই লাটের গাড়ি, আর তারে লোকান-বোকাই বিলাতী বাণিজ্যের হেলোয়ারী হাট! বারো-চোদ্দো বৎসরের বালক-বালিকার বালিকার উপর সিভিলাইজ্‌ড্ চুলোর কি বাহার, কি উন্নতি গ্যাস হেরোসিন বিজলী-বাতির! এক যে দেশে অন্-সিভিলাইজ্‌ড্ জলস্রোতের ব্যবস্থা ছিল, সেই দেশে পরসা দিয়া কৃত্রিম নিবারণ করিতেছি, আর দু'বেলায় যেন ঘাটেরই গুরুন বুঝিয়া করিবারা দিতেছি, এ সুখ বোধ হয় রাজরাজেশ্বর ছিল না! পঞ্জিকা খুলিলে দেখিতে পাই, জলরাশি পর্বতের প্রায় প্রতিদিনই উন্নতোন্নত দৃশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেন, কিন্তু জলের জল ক্রনোমিটার ধরিয়া ঠিক একটার সময় বন্ধ হইয়া যায়। আমি ত সহরের উত্তর প্রান্তে বাস করিয়া থাকি, এ দেশের জলা দেশের জলাভাব প্রায়ই পৌঁছায় না; কাজেই কল-বন্ধের সঙ্গে ঘড়ি মিলাইয়া পাই। যখন প্রথম কলিকাতায় কলের জল হয়, তখন স্বায়ত্তশাসন মিউনিসিপাল আখ্যায় আসন প্রাপ্ত হয় নাই; তাই বোধ হয়, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল পুরু-পার্শ্বের নিকট নিরাপত্তি করে জল পাওয়া যাইত; কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রথা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

মিউনিসিপালিটি আমাদের রোগ-শিশুদের অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নিশ্বাস মিউনিসের ধরচা নিবার শক্তি আমাদের আছে কি? হয় ত কোন বিজ্ঞ ডাইসপেপ্টিক্যান বলিতে পারেন যে, ডোমরা কলিকাতার ভিটা মেটিয়া উঠিয়া যাও; কিন্তু যাই কোথায়? কোনো চুলো কি রেখেছ? সিভিলিজেশন যে পল্লীগ্রামগুলির দাঁড়া হইবারে ঠিকিয়ে বেরিয়েছেন, তাহাদিগকে ওলাউঠা যে কেমনে ওটোপুটি করছে; তাহা একবার এসি সিভিলিজেশন বেড়েছে যে, নিজের ব্যবহার পুরাতন পুকুরিণীসমূহের সংস্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইতেছেন। সে টাকা আর রোগ নিবারণের জন্য বিশুদ্ধ জলদানে যায় না বলিয়া রোগ হইবার পর মরিবার যাইবার জন্য ডাক্তার-খরচের প্রস্তাবে ও ঔষধাগারীর বাসনার দান করা হয়; অথবা কাজের বিশ্রাম-আমোদের জন্য তাহাতে বন্দুক-বুলি নির্মিত হয়।

যে দেশে ঈশ্বরের নাম "দীননাথ" বলিয়া প্রচলিত, সেই দেশে "Survival of the Fittest" মতটি এখন জনবাণী বলিয়া প্রচারিত হইতেছে: fittest মানে richest, সৌজন্য strongest; অর্থাৎ ধনবান্ শক্তিমানই জীবিত থাকবে' বোধ। কলিকাতার সাহেবদের আর বাঙ্গালের প্রাণ রাখিতে বাঁচিয়া থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, আর এই সত্য জলদেশের লক্ষ ১০ হাজারের উপর পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণ জানুন মাসের মাঝামাঝি হইতেই আমাদের ঘোষাল পর্যন্ত পিপাসায় ছটফট করিতে থাকে, কোন গৃহস্থের দ্বারা ধরিয়ে সে এক গণ্ডুষ জলদানের অনুমতি ভিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হয়; কেন না, তাহার গৃহিণী, কন্যা বা বধূ পরিচয় হইতে কেশস্তবক পর্যন্ত সৌন্দর্যের রৌদ্রে

হয় করিয়া কেন্দ্রীয় ফুরেরী কোন গুরুত্বের পুরস্কার হইতে দুই এক বার হয় করিয়াছে পাশীর আনাদ করিয়াছেন।

যে দিন চলিয়া গিয়াছে—যখন মন্ত্রিসভা করিতে ছয় জীবন-যাপন করিয়া ইসলামজগৎ শাসন-শাসন করিতেন; যে দিন চলিয়া গিয়াছে—যে দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া আলমগীর বিজয়ন্ত-প্রস্তর টুপী বিক্রয় করিয়া আপনার ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিতেন; সেদিন চলিয়া গিয়াছে—যে দিন রামকৃষ্ণের পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া ভক্ত সন্ন্যাসীর সিংহাসনকে বসিতেন; যে দিন চলিয়া গিয়াছে—যে দিন শেষের অন্ধ লোক অসহায় পুনিয়া নিজের পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া রাজা রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন; আর যে দিনও নাই—যখন উপন্যাসের রাজা আপনাকে প্রেমিকের চেয়েও ও জগদ্বিখ্যাত দেশিনীর কাছের বলিয়া পরিচয় দিয়া—রাজাধিকারী ঈশ্বর, তাঁরা ভগবানের অর্থাধারীদের জানে—প্রজাপালন করিতেন।

এখন রাজা মানে প্রথমেই আমরা বুঝি পার্লিয়ামেন্ট; পার্লিয়ামেন্টের নির্বাচিত নির্ভর করে ভোটের উপর। এই ভোট-এর অদ্ভুত যন্ত্র। বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, ধন, অভিজ্ঞতা, পদ-মর্যাদা সবই ভোট-তালিকায় অঙ্কের সংখ্যার নিকট পরাস্ত।

এই ভোটের পড়ুকের উপরই বিলাতী পার্লিয়ামেন্ট চলিয়া আসিতেছে; উপরন্তু সেখানে আবার দলাদলিও আছে; হাত-আখড়ায়ের আসরে জনসাধারণের সখী-সংবাদ গাহিয়া থাকেন, পরে নিয়ামকরা আসর লইয়া তাহার উত্তর দিলেন; ইঁহারা ভোটের জোরে পোটের জোরে মিনিষ্টারাদি সর্দার হয়েন; উঁহাদের ইচ্ছাতে শাসন-পালন, শোষণ, দোহন-গোহন সবই হইয়া থাকে—ইংরেজের লোক মনে করে, আমরা স্বাধীন; সেখানকার জনসাধারণ যথার্থ স্বাধীন হয় বছর ১৮ অন্তর একটি দিন, যে দিন ভোটারের ইলেকশন হয়। সে দিন আমাদের মিউনিসিপাল কমিটি-ভলাণ্টারের মত সেখানেও পার্লামেন্টারি বিষয়, বিষ-টীক আছে। আমরা নিতান্ত কাঙ্গাল, তাই ভাবি, সেই স্বাধীনতা পেলেই স্বর্গ পাব: যেমন কাঙলা মাছ খেতে উঠিয়ে আমের ঝুড়ি ঝুড়িয়ে বন না পেলে ফেলে দিয়ে বলে, "শালা কি ঝালা, একটুও রস রাখেনি, সব চুষে খেয়েছে।" প্রাচীন আর্য আদর্শ মন হইতে একবারে মুছিয়া গিয়াছে; পুরাপুরি-ভক্তির বিষয় অসম্ভব অলৌকিক কল্পনা মনে করি, অথবা স্থানবিশেষে নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী ব্যাখ্যা করিয়া লই। মোগল-পাঠান রাজত্বকালে সেই আদর্শে ওস্তাদটা ছেলের মিসিয়াছিল মাত্র, আর এখন ইংরাজী-যুগে শৈশব হইতে, গুরু-দক্ষিণার পরিবর্তে, ডুবালের গল পড়িতে আরম্ভ করিয়া, যৌবনে French Revolution-এর ইতিহাস হইতে প্রজাতন্ত্র, ও Adam Smith's Wealth of Nations হইতে অর্থনীতি শিক্ষা করিয়া প্রাচ্য একবারে আমাদিগের পেটে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। আজ যদি ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তে রাজ্যচালনার সম্পূর্ণ অধিকার আসিয়া পড়ে, তবে পার্লামেন্ট কাউন্সিল কমিটী ভোট সর্দার মিনিষ্টার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার পুলিস জজ প্রভৃতির যে সকল পাশ্চাত্য পুতুলি আমাদিগের মস্তিষ্কে জোগিত হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলিই মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া ও অঙ্গে চাপকান আচকান্ বা পাঞ্জাবী পিরান পরাইয়া দেখানে স্থানে বসাইয়া দিব; কত জোর মাসিক বার হাজার টাকা বেতনের পদটা আট হাজারের হাতে যাবে করিব। সেই স্কুল সেই কলেজ সেই ইসপাতাল সবই থাকিবে, তবে না হয় 'Harry was a good boy'-এর স্থানে 'Hari or Hanif was a good boy' হইবে (হইবে কেন, হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে Primary-পাঠ,

বিজ্ঞান-Readers হইয়াছে)। আর হাসপাতালে সকলে ইংরাজী ইন্‌জেকশন, আর হাকিমী দাবুয়া এবং দাদাহে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের ব্যবস্থা হইলেও হইতে পারে।

তার পর ক্ষমতা ;— ক্ষমতার মোহন যে আসবে পরিপূর্ণ থাকে, সে সুরা হাইড হইতে উদ্ভূত। যেমন সুরা পান করিলেই পা টলিবে, মাতাল হইতে হইবেই, তেমন ক্ষমতা আসিলেই সে পাকেপ্রকারে শাসনাধীন জন নিশ্চয়ই মাতাল হইবে — থাকিয়া থাকিয়া চলিবে।

তথা আছে বটে — বলঃ বলঃ বাহুবলং, কিন্তু মনের ভিতর হইতে শক্তি তাহাকে টেনিয়া না দিলে বাহু-বীর অস্ত্রাঘাতও মুখে তুলিতে সমর্থ হয়েন না। আর সেই জন্যই বুদ্ধিমুক্ত বিজ্ঞী মন চালিত হয়েন মস্তিষ্কের পরামর্শে; বুদ্ধিতে ও আক্রোশে। মস্তিষ্ক বিদ্যা গ্রহণ করে, ধন উপার্জন করে, শক্তি সঞ্চয় করে। সমাজ-গঠনের আদি অবস্থায় মানব যখন পশুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাহুবলে দুর্বলকে দলন ও তাহার ধনরাজ লুণ্ঠন করিত, তখন দলপতি সর্বাপেক্ষা চতুর ও বুদ্ধিমানকে সর্দার আখ্যা প্রদান করিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিত। সমাজ যখন একটু গুছাইয়া উঠিয়া লজ্জা-উপাধি পরিগ্রহ করিল, তখন সর্দারের অভিধান হইল রাজা, আর সৈন্য হইল সৈন্য। সর্দার একটা মাথার চালাইত বড় জোর দুইশত চারি শত লোক; কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রজাপূর্ণ রাজ্য চালাইতে একটা মস্তিষ্কের শক্তিতে সকল সময় সঙ্কুলান হয় না বলিয়া, রাজা প্রজাবিদ্রোহের মধ্য হইতে প্রথম মন্ত্রি সংগ্রহ করিয়া যন্ত্র-তন্ত্র রচিত করিলেন। এইরূপে সাত আটটি মন্ত্রিক রাজ্যের কোটি কোটি মনুষ্যকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালন করিতে লাগিলেন। সেই মন্ত্রিশক্তিচালিত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রই অনুদিত হইয়া প্রেসিডেন্ট প্রাইম-মিনিষ্টার পার্লিয়ামেন্ট কংগ্রেস কাউন্সিল সেনেট প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

ভারতবর্ষ একদাত্র ভারতবাসীর কর্তৃত্বাধীনে আসিলেও সেই প্রথম মস্তিষ্ক-কর্তিতের হস্তেই শাসন-পালনের সমস্ত শক্তিই ন্যস্ত হইবে। যেদিন মানব স্বার্থ ভুলিবে, সে দিন সে 'আমি' ও 'আমার' বিস্মৃত হইয়া পরমার্থ-তত্ত্বে আত্মাকে নিয়োজিত করিবে, পৃথিবীর কোন প্রলোভনই তার তাহাকে বিষ-বিষ পান করাইয়া হাজা মজা ক্ষমতার কাউন্সিলার করিতে পারিবে না। সুতরাং স্বার্থকে বলী না করিয়া কোন পলেটিটেরী শাসন সমস্যার কোন কার্যাই লিপ্ত হইবেন না। অতি, মদ ও মোসের ন্যায় স্বার্থও প্রথম হইতে বর্জিত না হইলে দিন দিন আপনার আধিপত্য বৃদ্ধি করিতে থাকে, স্বার্থের উপায় ক্ষমতা — ক্ষমতা। আপনাকে অন্য-অপেক্ষা অধিক বলবান করা। জড় জগতে বাহুবল বুদ্ধিবল ধনবল এই তিন বলই প্রধান ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু বুদ্ধিবল প্রবল না হইলে বাহুবল ও ধনবলও বিশেষ কার্যকর হয় না; আবার বুদ্ধিবলের সঙ্গে ধনবল থাকিলে বাহুবল ক্রয় করা অতি সুলভ হয়।

শাসন-যন্ত্রের ইঞ্জিনিয়ারকে, বিদেশী-ই হউন বা স্বদেশী-ই হউন, নিজের বলের একাধিপত্য স্থাপিবার জন্য অন্যকে অপেক্ষাকৃত বলহীন করিতে হইবে। ক্ষমতার নেশা এতই চিত্তাকর্ষক যে, সংসারীর কথা দূরে থাকুক, সাধক পিতা মাতা দারা সুত পরিত্যাগ করিয়া, সকল ভোগ-সুখ বিসর্জন দিয়া, অরণ্যে বা অট্টালিকায় নগরান্তে উরুতলে বা সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে প্রকৃতির উপর কতকটা প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিলেই, সেই ক্ষমতাপ্রকাশে আত্মতৃপ্তির জন্য, শান্ত পথে দীন হইয়া মুক্তি-লাভের আশাকেও পরিত্যাগ করতঃ অধিকাংশ যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া যায়েন। ক্ষমতার চরণে মস্তক অবনত করিবার জন্য মানবের আগ্রহ এত অধিক যে, লোক কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কথা

তুমিতো মনে মনে ভাবছ, এ লোকটা আজগুবী কথা কি! তুমি কি করতে চুল কাটিতে পারেন? ছাদনাতলা সেলা করিতে পারেন? পাকে হাঁটিয়া বক্তৃতা দান হইতে পারেন? তিনি কি সাধনার পথ দেখাইতে পারেন বা ঈশ্বরজ্ঞান দিতে পারেন— এ কথা অনেক লোকই জিজ্ঞাসা করে।

এক দিকে ইন্দ্রোক্রসীয় প্রভৃতি যেমন প্রভুর পায়ের জন্য বাড়িয়াছে, অন্যদিকে তাহাদের মন আবার তেমনই সেবকরূপে প্রভুপদে লুণ্ঠনের জন্য লালায়িত।

এই যে সাম্রাজ্যবাদ, ইহা কেবল ফুলী-কাপ্তির প্রাণের মধ্যে আবদ্ধ নহে, অনেক হোমরা-চোমরা ধনকুবের, অনেক খেতাবী বাবু, অনেক খেতাবী বাহাদুর, অনেক গর্ভনমেন্ট লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলার প্রভুপদে ইতিমধ্যে কলিতে না পারিলে যেন অস্থির হইয়া উঠে।

খাঁটি সোনার গহনা হয় না, তাহাতে তামার ভাগ কিছু কিছু থাকিবে, অল্প-বেশী খাদ-মেশান-ও তত্ত্ব কিছু থাকিবে। বেশীভাগে সবগুলি লোক লইয়া সংসার চলে সুতরাং এই বৈষয়িক সংসার যতদিন থাকিবে, ততদিনই একটু রকমফের ভেজাল দিয়াই সংসার গড়িতে হইবে। বাটীর মেয়েদিগের গায়ের-গহনা কিছু না কিছু পরিমাণে বা লেখকভাবে খোদ করিবে-ই করিবে।

এ দেশে পক্ষি-চক্ষু-ভেদী বীরাগণও অনুরিত হয়, উপনয়নের কল্পনায় বীরমিথাজনের জন্য ছেলের চুল-চুলুনির দস্তুর অবলম্বন করিতে হয় না। এখানকার দলা-চোর প্রবঞ্চক বাচিয়াদী প্রভৃতি জলপথেরই লোকেরও মনে একটু ঈশ্বরের ছায়া, একটু বৈরাগ্যের হাওয়া স্পর্শ করে: সুতরাং মোগল-আগমনের পূর্বে যবিনমনে, এবং রাজত্বপে ইংরাজ বিরাজ করিবার পূর্বে জন-জনে, বিলাসিতা আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই; সেইজন্য নিত্য প্রয়োজনীয়ের অভাবের অনুভবে ঈশ্বর-অন্বিতা হয়: বঙ্গভূমি ছাড়িয়া এবং বিলাতী ঢেরের সুবিধা পাইয়া বাঙ্গোয়ারের বঙ্গভূমিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; আর ব্রহ্মবিদ্যাস্থলে পুরোহিত-শাসন আসন পাতিয়া লওয়ায়ের ভিতর ঈশ্বর নামের লোভ জাগাইয়া রেওয়াজে বৈরাগ্যের স্থানে "যা তবের কর্তব্যম" বলিয়া আমরা তদ্ব-ঠাকুরের বক্ষিয়া-বাধানো কোলে চলিয়া পড়িয়াছি।

এই নিদ্রা বিরামের নিদ্রা নহে, সুখের নিদ্রা নহে, শরীরে নবশক্তি সঞ্চারের নিদ্রা নহে: এ নিদ্রা একটি ব্যাধি, চিরনিদ্রার উপক্রমণিকামাত্র: এই ঘুমোনিদ্রা ভঙ্গ করিতে প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডপের আশ্রয় চাই। সত্য ও ব্রহ্ম দুই পুরী মানবকে কর্ম করিতে বলে: সত্যের সাধনায় ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্ম; ব্রহ্মের কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত। ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ব্রহ্মের সাধনা চাই, সে সাধনার আদর্শ আর্যগণ পুরাপুরি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পরে তাহার কথা বলিব, কিন্তু সে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সাধারণ লোককে ব্রহ্মাণ্ডপের আশ্রয় লইয়া পরিতৃপ্তির দ্বারা ভোগ-লালসার নিবৃত্তি আনিতে হইবে; নিদ্রা-সিদ্ধ মহাপুরুষরাই প্রথম হইতেই সত্যের পথের পথিক হইতে পারেন। ইংরাজের আমার হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডপের ভিতর ধীরে ধীরে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে; আমাদিগকে প্রবৃত্তিমার্গ হইতে হইবে এবং প্রবৃত্তিমার্গ যেমন উত্তোলী হইতে হইবে, সতর্কও তেমনই হইতে হইবে: যেন কেহ ও নীতির সঙ্গে সাধন ও মোক্ষ-শক্তিও গ্রহণ করিয়া না ফেলি; উদ্যমে পূর্ণ প্রতীচ্যের উদ্যম কখনও না করিয়া প্রাচ্যের সংযম-রজ্জুর আকর্ষণে তাহাকে সংযত রাখিতে হইবে। বণিক আমার হইলেও কলী গ্রহণযোগ্য নহে, গৃহে আনিলে সর্বনাশ সংসার; পবিত্রকারী গোমস্তই করিয়া যদি আনিবে, সেটি সাত রাজার ধন।

কার্যক্ষেত্রে আমাদিগকে সহজেই অগ্রসর হইতে

হইবে, সৌন্দর্য শক্তির আরাধনা প্রয়োজন। শক্তি-লক্ষ্য আমাদিগকে অন্তর অন্তর করিতে হইবে। প্রেমের দেবীর শক্তি, মনের শক্তি, আত্মার শক্তি দিনে দিনে পলে পলে অজ্ঞান দ্বারা বর্ধিত করিয়া সেই মহিমার শক্তি জাতীয় নরনীশক্তিতে পরিণত করা: অনুকরণী মহাশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কেবল পরম রাখিলে হইবে না; দূর বিষয়ে দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে যে, সেই সুদূর আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে আছে; আগে সংযম দ্বারা তাহাকে এমন না করিতে পারিলে বৈরাগ্যবিজয়ের শক্তিলাভ করিতে আমরা কখনই সক্ষম হইব না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

"শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানা জাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিক্যাল বলসঞ্চার করা। এমন করিয়া যে-জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দলে করিয়া দেখিতেছি। সুতরাং সর্বপ্রকার শক্তিই কীণ হইয়া সর্বত্র যাহা পাইতেছে, ইহা আমাদের লাভ; কোথাও আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতেছে বলিয়াই সফলতা নষ্ট হইতেছে।"

"আমরা একদিন সুদূরভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম; আমাদের বিচার বুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থ-ভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বল, আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বল, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাখে — কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে-ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে ভাবে গ্রহণ করিলে কতিই হইয়া থাকে।"

— রবীন্দ্রনাথ

সোনা-পোকা

(পূর্বানুবৃত্তি)

[গল্পটির এই শেষ অংশের অনুবাদে ভাষার পরিবর্তন করা হইয়াছে; প্রথম অংশটি ছিল একটি ঐতিহ্যের কাহিনী, দ্বিতীয় অংশটি বৈজ্ঞানিক-আলাপ: তাই বাংলা অনুবাদে সেই ভঙ্গিটিই রাখা হইয়াছে। ইংরেজীতে বাংলার মত ভাষার দুইটি স্পষ্ট পৃথক রীতি নাই, সে পক্ষে আমাদের সুবিধা আছে। অবশ্য, একই ভাষার দুই-রীতি — বাস্তবসম্মত নয়; কিন্তু ইংরেজীর অনুবাদে এইরূপ দুই ভাষারই উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার একটা সুযোগ মিলিয়াছে, গল্পটির দুইভাগ এক সঙ্গে পড়িলে ব্যাপারটা বুঝা যাইবে না, তাহাতেই কোনরূপ ক্ষতি হইবে না।]

"তোমার বোধ হয় মনে আছে, সেদিন রাত্রে আমি তোমাদের ঐ পোকার একটা ছবি এঁকে দেখিয়েছিলাম: আরও নিশ্চয় মনে আছে যে, তুমি যখন বারবার বলছিলে, সেটা পোকার মত না হয়ে একটা মড়ার মাথার খুলির মত হয়েছে, তখন আমি কারি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল, তুমি বুঝি ঠাট্টা করছ, তারপর পোকার পায়ে সেই দাগগুলোর কথা মনে হওয়ায় আমি ভেবেছিলাম তোমার কথা কতকটা সত্যি বটে। তবু আমি যে ভাল আঁকতে জানিনে — তোমার কথায় ঐ রকম একটা খোঁচা ছিল; তাই আমি চটেছিলাম, কারণ ঐ বিদ্যেটা আমি ভাল করেই শিখেছিলাম, এবং তার জন্যে আমার একটু গুমরাও ছিল। তাই পার্চমেন্টের টুকরোটা তুমি যখন ফিরিয়ে দিলে আমি তখনই সেটাকে মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে আগুনে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম।"

"পার্চমেন্ট, না কাগজের টুকরো ?"

"না, কাগজ নয়, যদিও বাইরে দেখতে কাগজের মতই বটে; আমারও প্রথমটা তাই বোধ হয়েছিল: তবু যখন আঁকতে আরম্ভ করলাম, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ওটা আসলে কাগজ নয় — খুব পাতলা এতটুকরো পার্চমেন্ট। জিনিষটা আমি আগে ছিল — মনে আছে ? যাই হোক, কাগজটা ঘুরে পাকিয়ে ফেলতে যাচ্ছি এমন সময়ে হঠাৎ নক্সাটার উপরেই চোখ পড়ে গেল — ঠিক যেটা তুমিও এইমাত্র দেখছিলে; চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম — তাই ত! মড়ার মাথার খুলিই ত' বটে! আবার, ঠিক যেখানে আমি পোকার ছবি এঁকেছিলাম, সেইখানেই। প্রথমটা আমার ধাঁধা কেমন ঘুলিয়ে গেল; স্পষ্ট দেখলাম, আমার ছবি এ নয়, যদিও আগা-গোড়া ঠিক একটা ছিপ আছে। তখনই একটা বাতি নিয়ে আমি ঘরের ওপাশে গিয়ে বসে' খুব ভালো করে' পার্চমেন্টখানা দেখতে লাগলাম। ওল্টাতেই দেখলাম, সেখানে আমার ছবিটাও ঠিক যেমন এঁকেছিলাম তেমনি আঁকা রয়েছে। আরও আশ্চর্য্য হলাম এইজন্যে যে, আমার ছবির লাইনগুলো ঐ মড়ার মাথার ছবিটার ঠিক উপর উপর পড়েছে — দুটোর আকার আয়তন একেবারে এক মাপের। এই যে দুটোর পিঠোপিঠি অদ্ভুত মিল, তাই দেখেই আমি একেবারে থ ধরে গেলাম। সে ভাবটা যখন কেটে গেল তখন আর একটা কথা মনে হওয়ায় আমি আরও অবাক হয়ে

দেলাম। যখন আমি কাগজখানার উপরে আঙুল বুলু করি তখন তার কোথাও কোন ছবি বা আর কিছু ছিল না, এ আমার স্পষ্ট মনে পড়ল; তাতে সন্দেহ মাত্র নেই, কারণ কাগজখানা বড় সরল বলে', আমি উল্টে পাল্টে একটু পরিষ্কার জায়গা খুঁজে নিয়েছিলাম — ঐ মড়ার মাথাটা যদি কোথাও আঁকা থাকত, তাহলে নিশ্চয় তখন আমার চোখ এড়িয়ে যেত না। এ বিষয়ে জোর করা তখন অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তবু আলোও, প্রায় সেই মুহূর্তে, আমার মাথার ভিতরে একটা অতিসূক্ষ্ম অস্পষ্ট আলোর বিন্দুর মত যে সন্দেহটা উঁকি দিয়েছিল, তারই, শেষ এবং পূর্ণ প্রমাণ তুমি কাল রাত্রের ঐ অভিধানে চাক্ষুষ করেছ। এর পর লাফিয়ে উঠে, তখনকার মত পার্চমেন্টখানা একটা ভাল জায়গায় লুকিয়ে রেখে ওর সম্বন্ধে সকল চিন্তা ত্যাগ করলাম, কারণ, তার জন্যে সম্পূর্ণ একা হওয়ার দরকার। তুমিও চলে গেলে, ডুপিটারও কিছুক্ষণ পরে ঘাড় গুঁজে অলস হয়ে পড়ল; তখন আমি বেশ ধীরে ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাপারটার কিনারা করতে লেগে গেলাম। প্রথমে, পার্চমেন্টখানা কেমন করে' আমার হাতে এসেছিল তাই ভেবে দেখলাম। লোকাটাকে পেয়েছিলাম দ্বীপের থেকে মাইল খানেক পূবে, সমুদ্রের কূলে — জল থেকে খুব কাছে। ধরবামাত্র এমন কামড়ে দিলে যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হ'ল; উড়ে' ডুপিটারের দিকে গেছেই — সে কি রকম লাফালাফী তা তো জানো — একটা পাতা বা ঐ রকম একটা কিছু খুঁজতে লাগল, তাই দিয়ে ধরবে। সেই সময়ে আমাদের দু'জনের চোখই ঐ পার্চমেন্টের টুকরোর উপর পড়া — তখন কাগজ বলেই মনে হয়েছিল। কাগজখানার অর্ধেকটা বালিতে পোতা ছিল, একটা কোণমাত্র উঁচু হয়ে বেরিয়ে ছিল। ঠিক তার কাছেই একটা বড় নৌকোর ভাঙা জায়গাটা কাঠ পড়েছিল — তাহলে যে-রকমের নৌকো দরকার হয়। সেটা জাহাজ-ডুবির চিহ্নই বটে, আর তাও বটে খানেক বছর আগে; কারণ, কাঠগুলো এত বিবর্ণ হয়ে গেছে যে, জাহাজের নৌকো বলে আর চেনাই যায় না।

"ডুপিটার সেই কাগজখানা তুলে' তার দিয়ে লোকাটাকে বেঁধে করে' আমার হাতে দিলে। ডাঙায় ফিরে আসবার সময় লেফটেনান্ট জি-র সঙ্গে দেখা — তোমায় সে কথা বলেছিলাম। তিনি লোকাটা যখন দেখছিলেন, কাগজটা আমার হাতেই ছিল; যখন পকেটে পুরলেন, তখন কাগজখানাও চাইলেন না; আমিও অন্যমনস্ক হয়ে আমার পকেটেই রাখলা বেঁধে দিয়েছিলাম। তোমার মনে আছে, লোকাটার ছবি এঁকে দেখাবার জন্যে আমি কাগজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না; খোঁজে খোঁজে হাতড়ে শেষে পকেটে হাত দিতেই ঐ কাগজখানাই বেরুল। আমি যে এত খুঁটিয়ে তোমাকে কাগজখানার কথা বলছি তার কারণ, ঐ কাগজটা আমার হাতে যে ঐ রকম করে' এসেছিল সেই কথাই তখন সকলের চেয়ে অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

"তুমি হয়ত' পাগলামি বলে' মনে করবে — আমি কিন্তু তখনই এ ব্যাপারের মধ্যে তার ও কারণ দুয়েরই একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিলাম, যেন একটা একই লম্বা শিকলের দুইটা মুখই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। সমুদ্রের ধারে একটা জাহাজ, আর সেই জাহাজের খুব কাছে পড়ে' আছে একখণ্ড পার্চমেন্ট, কাগজ নয় — পার্চমেন্ট; তা'তে মড়ার মাথার ছবি আঁকা রয়েছে। তুমি বলবে, এ দুটোর মধ্যে যোগ কোথায়? তার উত্তরে আমি বলবো যে ঐ মড়ার মাথার ছবি জলদস্যুদের একটা সঙ্কেত-চিহ্ন; একথা অনেকেই জানে। তাদের রক্ত-পতাকায় ঐ চিহ্ন আঁকা থাকে।

"এটা যে কাগজ নয় — পার্চমেন্ট, সেও একটা

বড় কথা। পাইথনে নীচু এই হয় না, হয় বেকার থাকে; সমস্যার সেখানেতার কাজ আগুনে করাই সহজ; যা সাধারণে নয়, বিশেষ দরকারী, তাই পাইথনেই লেখা হয়। ঐ মড়ার মাথার ছবি দেখে আমার এই কথাটা বেশি করে' মনে হ'ল। কাগজখানার আকৃতিও লক্ষ্য করলাম, — একটা পাশ ঘেঁষে সেটার লম্বায় সমান সোজা, এবং চওড়ার চেয়ে লম্বায় বেশি ছিল। ঠিক এই আকারের মৃত্যুবাণ কাগজেই লোকে এমন সব কথা লিখে রাখে যা অন্যের দরকারী, এবং লিখে রাখলে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম "তুমি তা' হলে, যখন লোকার ছবিটা এঁকেছিলে, তখন ঐ মড়ার মাথাটা ছিল না; তা'হলে ঐ খুলিটার সঙ্গে কাগজের সম্পর্ক আর কেমন করে? — ওটা তো তোমার ঐ লোকার ছবিটার পরে কোন সময়ে ওখানে আঁকা হয়েছিল? কে কেমন করে' আঁকল, তা' তোমরাই জানেন — কিন্তু তুমি নিজেই তা' না স্বীকার করছ!"

"আরে! ঐটেই তো আসল কথা! অবিশ্যি, ওটা হলে' ঠকতে আমাকে বেশি বেগ পেতে হয় নি। আমার চিন্তার ধারাটা ঠিকই ছিল, তাতে একটা বাঁ ছোটো উল্টর হয়েই পারে না। খুলিটা ছিল এই রকম। লোকাটা আঁকবার সময়ে ঐ মড়ার মাথাটা যে তোমার ছিল না তা নিশ্চিত। ছবিটা শেষ করে' আমি কাগজখানা তোমার হাতে দিলাম — তারপর, আমাকে কেউ দেখা পর্যন্ত আমি তোমার কার্যকলাপ তাল করেই লক্ষ্য করছিলাম। অতএব তুমিও ঐ খুলিটা যে আঁক নি তা নিশ্চিত; অন্য কোন ব্যক্তিও আঁকেনি, কারণ, ঘরে আর এমন কেউ ছিল না, যে ছবি আঁকতে পারে। তা' হ'লে ওটা কোন মানুষে আঁকে নি, অথচ আঁকা হয়েছে।

"যখন এই পর্যন্ত ভেবেছি, তখন, ঐ সমস্যাটুকুর যা' যা' ঘটেছিল — অবিশ্যি খুব ঘটনাটি পর্যন্ত স্পষ্ট করে' মনে আনবার চেষ্টা করলাম, প্রত্যেকটি মনে এল। সেদিন খুব শীত পড়েছিল (সেটাও একটা বড় দুর্ঘটনা), ঘর আগুন জ্বলছিল। পরিশ্রম করায় শরীর আমার তখনও গরম হয়েছিল না, আমি একটু দূরে টেবিলের ধারে বসেছিলাম, তুমি চেয়ারখানা টেনে আগুনের খুব কাছে বসেছিলে। আমি যেই পাইপেন্টখানা তোমার হাতে দিয়েছি, তুমিও দেখতে পাবে, এমন সময়ে, আমার কুকুরটা এসে ঢুকল, ঢুকেই তোমার কাঁধের উপর লাফিয়ে উঠল; তুমি বাঁ হাতে কুকুরটাকে টেনে নিলে, পরে তাকে আদর করে চাপড়াতে লাগলে; তার হাতটা কাগজখণ্ড তোমার হাঁটুদুটোর মধ্যে ঝুলে পড়ল, একেবারে আগুনটার প্রায় উপরেই। একবার মনে হ'ল, বুঝি বা পুড়েই যায়, তোমাকে সাবধান করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে তুমি নিজেই হাতটা আবার তুলে কাগজখানা দেখতে সুরু করলে। এইসব খুঁটি-নাটির কথা মনে পড়তেই বুঝতে পারলাম, ঐ আগুনের তাপই একমাত্র কারণ; মড়ার ছবিটা আগে দেখা যাচ্ছিল না — আগুনের তাতে বেরিয়ে পড়েছে। তুমি নিশ্চয় জানো যে, বহু-প্রাচীন কাল থেকে একরকম কেমিক্যাল কালির আবিষ্কার রয়েছে যা দিয়ে লিখলে, লেখাটা তখন অদৃশ্য থেকে যায়, পরে আগুনের তাপ লেগে-ফুটে ওঠে।

"এইবার ঐ মড়ার মাথার ছবিটা আরও সাবধানে পরীক্ষা করে' দেখলাম। তাতে দেখা গেল, পাইপেন্টখানার কিনারার বিন্দুটার ছবিটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অক্ষর তেমন স্পষ্ট নয়; কুকুলাস তাপ সব জায়গায় সমান ধারায় লাগেনি। তখন আমি একটা আগুন জ্বেলে বেশ গনগনে করে' তুলে তাতে কাগজখানা আগাগোড়া তাতিয়ে নিলাম। প্রথমটা ছবির লাইনগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল;

তারও পরে আরও ছাপ লাগাতে দেখি, ঘড়ার মাথার সামনা-সামনি, ফাগজখানার ঠিক অপর কোণে, আর একটা কি আঁকা রয়েছে; প্রথমে মনে হয়েছিল, একটা ছাগলের মুখ, পরে ভাল করে' দেখেশুনে বুঝতে পারলাম — দাড়ী-ছাগল নয়, একটা দাড়া-ছাগলের মাথা।"

হাঃ! হাঃ!—আমি হেসে উঠে বললাম, "এবার বুঝি আর একটা মোগলযুগ আবিষ্কার করলে! — না হাসা উচিত নয়, কারণ প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও' হেসে উড়িয়ে দেবার নয়; কিন্তু তা বলে' ছাগলের সঙ্গেও কি জলদস্যুর কোন দিনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব — সে ও' স্থানের কারবারে লাগে না, মিতাক্ষর নিয়ীহ যারা চাক-আবাক করে, তাদেরই বরং ও জিনিষটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।"

"কিন্তু আমি ও' এখনই বললাম যে, ছবিটা ছাগলের ছবি নয়।"

"আচ্ছা, না হয় বাচ্চারই হ'ল — সে ও' একই কথা।"

"অনেকটা বটে, কিন্তু ঠিক এক কথা নয়। তুমি নিশ্চয় 'ক্যাপ্টেন কিড্' বলে এক ব্যক্তির নাম শুনেছ?' আমি একবার ছবির আকারে নাম-সহি-করা দেখেছিলাম — অক্ষরের বদলে, নামের অর্থ হয়ে' কোন এক রকম ছবি আঁকা থাকে। আমি নামের স্বাক্ষর বলছি এই জন্যে যে, ঐ ছবিটা কাগজের যে জায়গায় আঁকা হয়েছে তাতে ওটাকে ঐ রকম স্বাক্ষর ব'লেই মনে হয়। ঘড়ার মাথার খুলিটাও যে ভাবে ঠিক কোণাকুণি ভাবে দিকে হয়েছে, তাতে ওটাও একটা ট্রাম্প বা শীলমোহর করাই সম্ভব হয়। কিন্তু আসল জিনিষটার দেখা না পেয়ে আমি ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়লাম, কারণ, আমার অনুমান সত্য হ'লে, যার জন্যে এই সহি আর শীলমোহর করবার হয়েছিল, সেই দলিলটা গেল কোথায়? সেইটেই ত' আসল।"

"তুমি তা' হলে একটা চিঠির মত কিছু পেতে পারে আশা করছিলে?"

"হাঁ, ঐ রকম একটা কিছু। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মন যেন গোড়া থেকেই জেনেছিল, খুব সম্ভবতঃ এক জলদস্যুর ধনভাণ্ডার শীঘ্র কোথাও বেরিয়ে পড়বে; এর কারণ কি বলতে পারিনে। হয় ত' ওটা ঠিক বিশ্বাস নয় — একটা প্রবল বাসনা মাত্র। তোমার মনে আছে কি? — ছুপিটাদের সেই বিদ্রোহের মত কথা?' সে যখন বলেছে- পোকাটার লক্ষ্যটা নিজেই নেবো, তখন কথাটা আমার মনে কি রকম জোরে বা বিঁধেছিল? তারপর ঐ সব ঘটনা যে ক্রমে পর পর ঘটতে লাগল — ঘটবার নয়, অথচ ঘটছে! আরবে, লক্ষ্যভেদের যোগও কেমন! জেবে দেখ, এই সব ঘটনা যেন দিনে ঘটেছে যেটা বছরের মধ্যে সেই একটা দিন — হয় ত' শীঘ্র আর কোনদিন পড়েনি, তাই করে আগুন জ্বালতে হয়েছিল; ঐ আগুন না জ্বাললে, আর কুকুরটা ঠিক সেই সময়টিতে ঘরে না ঢুকলে আমি ঐ ঘড়ার মাথার ছবিটাও দেখতে পেতাম না, আর ঐ জলদস্যুর আবিষ্কারও হতে পারতাম না।"

"বলে' যাও, বলে' যাও! আমি আর স্থির থাকতে পারছি নে।"

"এখন, তুমি নিশ্চয় শুনেছ — এ অঞ্চলে বহু গল্প বা কিম্বদন্তী অনেক দিন ধরে চলে আসছে যে, কিড্ নামে এক জলদস্যু আর তার দল আটলান্টিক সমুদ্রের কূলে কোন এক জায়গায় বহু ধনরত্ন পুঁতে রেখেছিল। এই জনশ্রুতির মূলে কিছু সত্য নিশ্চয় আছে। আর ঐ সব গল্প যে বহুকাল একটানা চলে আসছে, আর এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায়, তার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ঐ ধনরত্ন এখনও যেখানকার সেইখানে পোঁতা আছে। কিন্তু, যদি কিছু পরে সে সব পুনরুদ্ধার করে নিয়ে যেত

হবে এই সব চিহ্নগুলি একটু বদল না হয়ে আমার আগমনের কালে পৌঁছত না; তা হলে সেই থেকে এই পত্রের শেষ হয়ে যেত। আমার মনে হয়, কোন দুর্ঘটনায় — সম্ভবতঃ যে কাগজে চিহ্নগুলি বিশেষ খুব নিখুঁত করে টুকে রাখা হয়েছিল সেটা হারিয়ে যাওয়ায় — কিড্‌ আর সেই গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারে নি। তার সঙ্গীরা কিন্তু ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল, কিন্তু, তারপর নিজেরা তার হাতে নি। স্থানটা আন্দাজ করে সব খোঁজা-খুঁজি করেছে, তাইতেই এই সব জমায়েত করা হয়েছিল। তুমি কি বুঝেছ — এরিকের সমুদ্রযাত্রা সেখানে একটা গুপ্তধন না দিয়ে হয়নি?"

"কখনো তুমি নি।"

"কিন্তু যে বিষয় বন সংগ্রহ করেছিল, একথা সত্যিই জানত। অতএব, আমি ভাবলাম, ঐ টাকা-কড়ি কোথাও আছে এখনও ঢাকা আছে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে না, আমি ঐ পার্চমেন্টখানাতেই সেই গুপ্তধনের ঠিকানা-লেখা একটা লিপি রয়েছে বলে অনুমান করেছিলাম, অনুমান ঠিক — ভুল প্রমাণ করেছিলাম।"

"তারপর কি করলে?"

"আমি পার্চমেন্টখানা আবার খুব বেশি করে আগুনে তাতিয়ে নিলাম, তাতেও কিছু বেরুল না। তখন মনে করলাম, কাগজখানার গায়ে যে সব আঁকা-বাঁকা লেখা রয়েছে তারই রকম এ রকম হচ্ছে; সেজন্যে প্রথম জলে সেটাকে ধুয়ে ফেলে তুলে একটা টিনের চাটুতে বসিয়ে কাঠ-কয়লার আঁচে সেঁকতে সুরু করলাম — মিনিট পাঁচের ছবি ছবি নীচের দিকে। কয়েক মিনিটেই চাটুখানা খুব তপ্ত হয়ে উঠল, তখন কাগজখানা তুলে নিয়ে তার গায়ে চাইতেই আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠল না। দেখ না, কয়েক আঁচড়ের মত কতকগুলো দাগ বেরিয়ে পড়েছে, যেন লাটিন কতকগুলো অক্ষরের মত। আমার মিনিটখানেক লেখাগুলোকে চাটুর উপরে রাখলাম। এবার তুলে নিয়েই একেবারে সবটা চোখের উপর ফুটে উঠল — যেমনটি এখনই দেখতে পাবে।"

এই বলে লেগ্রাঁ আবার কাগজখানা আগুনে তাতিয়ে আমার হাতে দিলেন, দেখলাম, হাড়গোড় মাথা আর মড়ার মাথার মাঝখানকার কাগজটাতে নানা রঙ ও লেখার একটু মোটা ছাঁদে এই চিহ্নগুলি আঁকা হয়েছে —

53 ‡ ‡ † 305)) 6 * ; 4826) 4 ‡) ; 806 * ; 48 † 8 ¶ 60)) 85 ; 1 ‡ (; : ‡ * 8 † 83 (88) 5 * † ; 46 (; 88 * 96 * ? ; 8) * ‡ (; 485) ; 5 * † 2 : * (; 4956 * 2 (5 * — 4) 8 ¶ 8 * ; 4069285) ;) 6 † 8) 4 ‡ ‡ ; 1 (‡ 9 ; 48081 ; 8 : ‡) 48 † 85 ; 4) 485 † 528806 * 81 (‡ 9 ; 48 ; (88 ; 4 (‡ ? 34 ; 48) 4 ‡ ; 161 ‡ 188 ; ‡ ?

কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "দেখলাম বটে, তবু আমি এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে। এই চিহ্নগুলির সমস্যা পূরণ করতে পারলে আমাকে যদি গোলকণ্ডার সমস্ত খনিটাই পুরস্কার দেবে বলে, তা'লেও আমি কস্মিনকালে এ কাজ করতে পারতাম না।"

শুনে লেগ্রাঁ বল্‌লেন — "অক্ষরগুলো একবার যায় দেখে তুমি কাজটা খুব দুঃসাধ্য মনে করছ, তাতা নয়। এগুলো দেখেই বুঝতে পারা যায়, এ এক রকম সঙ্কেতিক অক্ষরের অনুলিপি; অর্থাৎ, এই চিহ্নগুলোর ভিতরেই একটা অর্থ লুকিয়ে আছে। কিডের সম্বন্ধে আমার যা জানা ছিল, তাতে আমার বিশ্বাস হয় নি যে, সে খুব দুর্বোধ্য রকমের একটা সাঙ্কেতিক-লিপি তৈরী করেছে। তখনই আমি স্থির করে ফেললাম, এটা একটা সাধারণ অনুলিপিই হবে; তার মত লোকের জ্ঞানবুদ্ধি যে রকম, তাতে সে মনে করেছিল, এ আর কেউ পড়তে পারবে না।"

"তুমি কি সত্যিই পড়ে' ফেলেছ ?"

"অনায়াসে। এর হাজারগুণ শক্ত কত সাঙ্কেতিক লেখার পাঠ উদ্ধার করেছি আমি। আমার এই অবস্থায় ফাটলেও ঘটে, আর আমার মনেরও একটা বিশেষ ঝোঁক একদিকে আছে বলে', আমি এই ধরণের ধাঁধার চর্চ্চাও করেছি; তা ছাড়া, এটাও বিশেষ নয় যে, মানুষের বুদ্ধি থেকে যা বেরিয়েছে তা' বইই হুর্ব্বোধ্য হোক না কেন— উপযুক্ত পরিশ্রম করলে মানুষের বুদ্ধিটেই তার গুট খুলে যাবে। হলেও তাই হ'ল; একবার যখন ঐ চিহ্নগুলোর সঙ্গে বর্ণমালার সম্পর্কটা ধরে' ফেলতে পারলাম, তখন কথাগুলো যা' দাঁড়ালো — তার অর্থ করার ভাবনা আমি মোটেই ভাবি নি।

"বর্ত্তমান ধাঁধাটার পক্ষে — সকল রকম গুপ্ত-লিপির সঙ্গেই — প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ওটা কোন ভাষার সাঙ্কেতিক লেখা। কারণ, প্রত্যেক ভাষার বাক্‌রীতি স্বতন্ত্র। সাধারণ যে ক'টা ভাষা জানা আছে, সেগুলোই এক-এক করে' দেখতে হয়, লাগে কিনা। এই রকম ভাবতে ভাবতে শেষ একটা ভেবে যায়। কিন্তু এটার বেলায় সে হাঙ্গামা পোহাতেই হয়ে ছিলো না — ঐ দ্বাদশটাই ওর ভাষার প্রমাণ। 'ভিড্' — এই শব্দটার যে দুই মানে হয়, তা তো আর কোন ভাষায় সম্ভব নয়, কারণ, ইংরেজীতে 'ভিড্' মানে হাজার-হাজার, আবার তা' মানুষের নামও হ'তে পারে। আমি তখনই বুঝলাম — এ ভাষা ইংরেজী।

দেখতে পাচ্ছ — এই চিহ্নগুলোর কোনখানে ফাঁক নেই, অক্ষরগুলো সব একটানা, অর্থাৎ, কোন্ কথাটা কোথায় শেষ হয়েছে তা' বোঝবার উপায় নেই। তা' যদি থাকত তা হলে আমি এক-একটা ভাগ নিয়ে তার মধ্যেকার অক্ষরগুলো বুঝে রেখে যা হারিয়ে নিয়ে, অন্ততঃ ছোট ছোট কথাগুলো ধরে' ফেলতে পারতাম। আর, এক-অক্ষরের শব্দ — যেমন, a বা I — যদি পেয়ে যেতাম তা' হ'লে ত' ধাঁধাটার সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকত না। কিন্তু ঐ রকম ভাগ না থাকায় আমার প্রথম কাজ হ'ল এই লেখাটাতে কোন্ চিহ্নগুলো সবচেয়ে বেশি, এবং কোন্‌গুলো সবচেয়ে কম বার ব্যবহার করা হয়েছে, তাই ঠিক করে নেওয়া। সবগুলো গুণে আমি শেষে এই রকম একটা তালিকা তৈরী করে নিলাম —

৪	চিহ্নের	হরফ — ৩৩ বার
		— ২৮ ,,
		— ১৯ ,,
		— ১৬ ,,
		— ১৩ ,,
		— ১২ ,,

এখন, ইংরেজীতে যে অক্ষর খুব বার বার আসে সে হ'ল — e; তারপর অন্য অক্ষরগুলো বেশি ব্যবহার হয়, যথাক্রমে এইরকম — a o i d h n r s t u y c f g l m w b k p q x z; e এত বেশি আসে যে, একটা কোন বাক্য যদি ধরা যায় — তার বড় বা ছোট হোক — তাতে ঐ অক্ষরটার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি হবে।

"তা' হলে, এখানে একটা শক্ত করে' ধরবার কিছু মিলে' গেল। আমার ঐ তালিকার সব ক'টাকে দরকার হল না — গোটা কতক মিলেই ও লেখাটার পাঠোদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য পেলাম। এখানে দেখা যাচ্ছে, ঐ ৪৩ চিহ্নটাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, ওটাকেই আসল বর্ণমালার 'e' অক্ষর ব'লে ধরে নিলাম। শুধু অনুমান নয়, প্রমাণ করা যায়। দেখ, ইংরেজী ভাষাতে 'e' অক্ষরটা শেষ জোড়ার জোড়ায় থাকে, যেমন — meet, seen, been, agree, ইত্যাদি। এখানেও, যদিও লেখাটা লম্বা নয়, তবুও ঐ ঠিক পাঁচবার জোড়ার জোড়ায় বসেছে।

"তা' হলে ঐ ৪ কে e ধরে' নেওয়া যাক;

ইংরেজীতে 'the' কথাটার ব্যবহার যেখানে সেখানে হয়; তিনটে অক্ষর তো? তার মানে ঐ ৮ টা থাকবে। এখন দেখা যাক, ঐ চিহ্নের সারির মধ্যে এমন তিনটে চিহ্ন পাশাপাশি আছে কিনা, যাদের আগে পিছে ফাঁক থাকে — শেষ চিহ্নটা — ৮। যদি এই রকম তিনটে দু' চার জায়গায় থাকে — তাহলে পরে দেখা যাবে, তা' হ'লে বুঝতে হবে সেটা ঐ 'the'। দেখা করে' দেখ, এই রকম একত্রে তিনটে চিহ্ন মাত্রই রয়েছে; চিহ্নগুলো হচ্ছে — ', 4h'। তা' হলে ৮-এর জায়গায় বসেছে (;) — h-এর জায়গায় 4, আর ৮-চিহ্নটা এবার ৪' আর পাওয়া হবে

এইবার বেশ খানিকটা এগিয়ে পড়া গেছে।

"ঐ যে একটা শব্দ 'the' পাওয়া গেল, ওর দ্বারা আমরা একটা বড় ব্যাপারে সাহায্য পাব — যেমন হয়, অন্য কথাগুলোর আগে কোথায়, শেষে কোথায়, তা' ঠিক করবার সুবিধে হবে। ঐ তিনটে চিহ্ন — ' 4h' যেখানে যেখানে বসেছে তার ঠিক আগের অক্ষরটার দিকে চেয়ে দেখ, বুঝতে পারবে নিশ্চয় ঐ (;) চিহ্নটার থেকে একটা পৃথক লক্ষ আসছে হয়েছে; আর ঐ the কথাটার পরে যে দুইটা চিহ্ন রয়েছে [(;) 88 ; 4] তার পাঁচটাকে আমরা চিনি, মাত্র একটা চিনিনে। বেশ, যে ক'টাকে চিনি সেই ক'টার আসল অক্ষর লিখে একটার জায়গা যদি ফাঁক রাখি, তা' হলে এই রকম হয় —

এখানে h থেকে th-টা আমরা অনায়াসে বার নিতে পারি, কারণ, ইংরেজী বর্ণমালার যত অক্ষর আছে তার প্রত্যেকটি যদি ঐ ফাঁকটাতে একবার করে বসাও, তা'হলেও এমন কোন কথা তৈরী হবে না যা ইংরেজী অভিধানে আছে। তা'হলে আমরা এমন পাচ্ছি শুধু —

t ee

আমার যদি ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষরগুলো এক এক করে' ঐ ফাঁকটায় বসাই, তা'হলে যে একটি মাত্র কথা সবচেয়ে সঙ্গত বলে মনে হয়, তা হচ্ছে — 'tree'। এইবারে আর একটা চিহ্নের অক্ষর-সঙ্কেত পাওয়া গেল, অর্থাৎ যেখানে ওই)-চিহ্ন আছে সেখানে বসাতে হবে, ওটা — 'r'। তা'হলে পর পর দুটো শব্দই পাওয়া গেল — the tree। এখন এই দুটো শব্দ ছেড়ে একটু এগিয়ে যাও, একটু পরেই আবার এক জায়গায় ঐ '; 8h' — ঠিক তিনটি পাশাপাশি পাচ্ছি; এবার ঐ তিনটেকে একটা কাজে লাগানো যেতে পারে — ওদের ঠিক আগেই যে চিহ্নগুলো রয়েছে সেগুলো যে-কথারই শেষে থাকুক — সেই কথাটি নিশ্চয় শেষ হয়েছে এই তিনটের ঠিক আগে। উপস্থিত টুকুন অংশ আলাদা করে' নিলে দাঁড়ায় এই রকম —

the tree ; 4 (;) 34 the

এর মধ্যেও অনেকটি চিহ্ন আমরা ইতিমধ্যে চেনে নিয়েছি, কাজেই বলে নিতে পারি, যেমন —

the tree thr...h the

— এবং মাঝের কথাটা যে 'through' তাতে আর সন্দেহ থাকে না। এর থেকে আমরা আরও তিনটে অক্ষর পেলাম — o, u আর g; ওদের চিহ্ন হচ্ছে যথাক্রমে — :, (, আর 3।

"তোমাকে বোধ হয় আর এমন ক'রে প্রত্যেকটি দেখাতে হবে না; আমার প্রক্রিয়াটা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আর কিছু নয়, খুব ধৈর্য্য চাই; ধরাই শক্ত হোক, ওটার দুতোটা কোনখানে একটুখানি খুঁজতে পারলেই বাকিটা খোলার জন্যে, বুদ্ধি যতটা তার চেয়ে ধৈর্য্য লাগে বেশি। একটি করে' ধরা এক-একটা সিঁট খুলি তবেই, বাকিগুলো

খোলা জায়গা সহজ হয়ে পড়ল : শেষে যে ক'টা অক্ষর এক্কেবারে চেষ্টায় হয়ে' কেলতে পারলাম, সেগুলোকে এই রকম বর্ণ করে' দাঁড়িয়ে দিলাম, এবং সৌটো হ'ল ঐ গুপ্তলিপিটি খুলে ফেলার চাবি।—

৮৫

৩

৪

১

৩

"যখন এই এলোমেলো অক্ষরের ছবিটা দিলে খেলে, অক্ষরগুলোও যখন এমন এমন অক্ষর — তখন, বাকিগুলো বার করে ফেলা যে খুব শক্ত হ'ল না, তা তুমি স্বীকার করবে। আমি তোমাকে যা বললাম এবং যা দেখালাম তার থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, এই রকম সাঙ্কেতিক লিপি পাঠ করতে হ'লে কোন মন্ত্রশক্তির দরকার হয় না — সহজ বুদ্ধি খাটালেই হয়। একটা কথা বলে' রাখি, এই যে ব'ধাটি দেখছ, এতে বিশেষ কেরামতী নেই, গুপ্তলিপির এ রকম কৌশল অতিশয় সহজ ও সরল। এখন তা'হলে তোমাকে ঐ লিপিটির রহস্যটা খুলে' সুদ্ধো চেহারাটা কি হয় তাই দেখাই —

"A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's-head a bee-line from the tree through the shot fifty feet out."

[ভালো জায়গা বিশপ-কুঠী কুতের আসন উত্তর দিক পূর্ব-উত্তর একচল্লিশ ডিগ্রি তেরো মিনিট তোফার আল সুবের পানে লাফের আড়া মড়ার মাথার বাঁ-চোখ দিয়ে গুলি ছুঁড়ে গুঁড়ির থেকে গুলির লোজা পঞ্চাশ ফুট বাইরে দেখ।]

আমি বললাম, "ধাঁধা ত' যেমন তেমনিই হয়ে গেল; ঐ 'বিশপ-কুঠি,' 'কুতের আসন', মড়ার মাথা' — আর কুতের মন্ত্রণার মত ঐ কথাগুলোর কোন অর্থই ত' হয় না।"

লেগ্রাণ তার উত্তরে বললেন — "হাঁ, হঠাৎ শুনলোয় কোন অর্থ করা যায় না বটে — কাজেই ব্যাপারটা এখনও বেশ জটিল হয়েই রয়েছে। প্রথমে কথাগুলোর ঐ যে সংক্ষিপ্ত ভঙ্গি সেটাই পূরণ করে নিতে হবে; কিন্তু তা' করতে হ'লে কয়েকটা খবর আগে থাকতে জেনে নেওয়া চাই, নইলে ঐ টুকরো টুকরো কথাগুলো জট পাকিয়েই থাকবে। তাই আমিও প্রথম তখনি এর মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক করতে না পেরে, এই অঞ্চলটায় চারদিকে খোঁজ করতে লাগলাম — কোথাও 'বিশপ-কুঠি' বলে' কোন বাড়ী আছে কিনা। কোন খবর না পেয়ে আমি আরও ঘুরে, আরও প্রাচীনতর সন্ধানের সংকল্প করছি, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন সকালে আমার মাথায় চুকল, হয়ত' ঐ বিশপ-কুঠির সঙ্গে 'বেসপ'-নামে একটা বাসের কোন সম্পর্ক আছে — এই দ্বীপটার উত্তর দিকে প্রায় চার মাইল দূরে যে বাগানবাড়ী আছে, তাইতে তারা বাস করত। তখন আমি এখানকার চাষীদের পাড়ায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম — যে সব প্রবীণ নিগ্রো আছে তাদের কাছে কথাটা পাড়লাম। শেষে এক অতি বৃদ্ধা নিগ্রো স্ত্রীলোক বললে যে, 'বেসপের কেল্লা' বলে' একটা জায়গার নাম সে শুনেছে, আমাকে সে জায়গাটা সে বোধ হয় দেখিয়ে

নিচেও পাবে : কিন্তু সে ত' বাড়ী নয়, সরাইখানাও নয় — সে একটা পর্ব্বতের চিবি।

আমি তাকে বকশিস দিয়ে অনেক করে' রাজি করলাম — খুঁজে বার করতেও খুব কষ্ট হ'ল না। তাকে বিদেয় করে দিয়ে আমি একাই জায়গাটা ভাল করে' দেখবার জন্যে এগিয়ে চললাম। জেলাটা আর কিছু নয়, কতকগুলি পাহাড়ের সমষ্টি — দেখলে চোখে পড়বার মত; তাদের সবগুলোই দেখতে উঁচু, তেমনি চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে আলাদা হয়ে আছে; দেখলেই মনে হয়, কেউ যেন মতলব করেই ওটা গড়েছে। আমি ত' সবচেয়ে যে মাঝারী উঁচু তারই উপরে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর যে কি করতে হবে, তা' ঠিক করতে পারলাম না।

মনে-মনে ভাবছি, এমন সময়ে দেখি আমার পায়ের হাত-পঞ্চাশ নীচে, পাহাড়টার পূর্ব-পাশে একটা পাথরের স্তূপ যেন তার গায়ে লেগে রয়েছে। ব্যাপারটা কি হতে পারে, কিছু চট্‌করে এক মুহূর্ত্তের বেশি ঠাহর হবে না; পাহাড়ের গা থেকে সাদাটে বেরিয়ে আছে। ঠিক ঐ ব্যাপারটার উপরে পাহাড়ের গায়ে কৃত্রিম মত "একটা গর্ত্ত — দেখলে সবটাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেই পিঠ-কুঁজো একটা জোয়ের মত মনে হয়। তখন আমার আর সন্দেহ রইল না যে, এই তাহ'লে সেই "ফুয়েগোর আসন;" — এর পর ঐ লেখার কোনখানটা আর অস্পষ্ট রইল না।

ঐ যে 'ভালো আয়না', ওটা আর কিছু নয় — টেলিস্কোপ; কারণ, জাহাজের লোকেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রকেই 'আয়না' বলে। অতএব বেশ বোঝা যাচ্ছে, একটা টেলিস্কোপ ব্যবহার করতে হবে, এবং সেটাকে কোথায় স্থাপন করতে হবে তা'ও নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, একটুও এদিক ওদিক হবার যো নেই। আর ঐ যে 'একচল্লিশ ডিগ্রি' 'উত্তর-পূর্ব্ব উত্তর', ও সব — টেলিস্কোপটার মুখ কোন্ কোণে ঘুরিয়ে রাখতে হবে, তারই নির্দ্দেশ। এইসব আবিষ্কার করার পর আমার মানসিক উত্তেজনা খুবই বেড়ে উঠল, ফিরে এসে একটা টেলিস্কোপ জোগাড় করে' ছুটলাম আবার সেই পাহাড়ে।

ঐ ব্যাপারটার নেমে দাঁড়াবো খুঁজতে পারলাম, ঠিক এক ভাবে একটা বিশেষ জায়গায় না দাঁড়ালে সেটার উপর পা রাখা যায় না। এতে আমার সেই পূর্ব্বের অনুমান আরও দৃঢ় হ'ল। টেলিস্কোপটা এইবার লাগাবার আয়োজন করলাম। আমার একটা পকেট-কম্পাস ছিল তাই দিয়ে টেলিস্কোপের লক্ষ্যটা নির্দ্দেশমত ঠিক করে' নিলাম, আকাশের সেই কোণটায় নিজে খুব ক'রে আমি খুব সাবধানে ধীরে ধীরে সেটাকে বাগাতে উঠাতে লাগলাম। এই রকম করতে করতে হঠাৎ দূরে ঘনের মাঝার সবচেয়ে বড় গাছটার ঘন ডাল-পাতার মধ্যে একটা গোল গর্ত্তের মত ফাঁক চোখে পড়ল, এই ফাঁকের ঠিক মাঝখান দিয়ার একটা সাদা রঙের কি দেখা যাচ্ছে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, পরে টেলিস্কোপের ফোকাস ঠিক করে' নিয়ে তাকাতেই দেখি, সে একটা বড়ার মাথার খুলি।

এই ঘটনার পরে, ঐ গুপ্তলিপির প্রত্যেক কথাটি আমি যে ঠিকই বুঝতে পেরেছি তাতে কোনরকম সন্দেহ রইল না — ঐ যে "গোড়ার ডাল, গাছের আড়া, পুবের পানে" — তখন ঐ বড়ার মাথাটা কোন্‌দিকে আছে তাই মনে করা ছাড়া আর কি ক'রতে পারে? এ 'সবই ত' তখনকার উচিত। আরও বুঝতে পারলাম, — কথা মতন ঐ যে, ঐ মাথাটার বাঁ চোখের যে গর্ত্ত তার ভিতর দিয়ে বন্দুকের গুলির মত একটা ভারি জিনিষ ফেলে দিতে হবে, যেখানে সেটা পড়বে, গাছের গুঁড়ির থেকে তার সমান করে' একটা লাইন টেনে যেতে হবে পঞ্চাশ ফুট যেখে, সেখানে গিয়ে যেন

হবে সেইখানে খুঁড়লে মাটীর নীচে গুপ্তধন মিলবে — অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছিল।"

আমি বললাম, এখন সবই জলের মত পরিষ্কার বোধ হচ্ছে — তবিও খুব বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে, তবু তোমার রহস্যটুকু যেন শেষ তেমনি হয়েও যায়নি। বিশপ-দুষ্টি থেকে নেমে তুমি তারপর কি করলে?"

"আর কি! গাছটা ঠিক কোন জায়গায় আছে বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে' ঘরে ফিরে এলাম। এমনি বলা যে, 'ছুটের আলো'টা যেই মেরেছি, আর সেই গাছের ধারেকাছে কিছুতেই চোখে পড়ল না। পরেও এদিক ওদিক কত তাকালাম আর সেটা দেখা গেল না। সমস্ত ব্যাপারটার ভিতরে এইটেই বড় ভৌতিক মনে হল যে, গাছের ঐ একটা জায়গা থেকেই দেখা যায় — আর কোনখান থেকে নয়, কেবল ঐ পাহাড়েরই গায়ের সেই বড় ঝাউটার ঐখানে।

"আমার ঐ সময়কার মোটামুটি আর অন্যমনস্কতা দেখে ছুপিটার যে রকম চিন্তিত হয়ে পরে প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল, তা' তুমি জানো। তোমারও বিশ্বাস হয়েছিল আমার মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু পরে যা' সব ঘটেছে তা' ত তুমি স্বচক্ষে দেখেছ।"

"আমার বোধ হচ্ছে, তুমি যে প্রথমবার খুঁড়তে গিয়ে ছাতলা ভুল করেছিলে — তার কারণ ছুপিটার অতিরিক্ত নির্বোধ বলে' পোকাটা সে চোখের গর্ত দিয়ে না ফেলে, ডান দিকের গর্ত দিয়ে ফেলেছিল।"

"ঠিক তাই। ঐ ভুল করার জন্যে 'গুলি'র লক্ষ্যটা প্রায় আড়াই ইঞ্চি হটে' গিয়েছিল — অর্থাৎ, প্রথম নিশানাটা গাছের গুঁড়ির খুব কাছে বেধানে বসাতে হবে, যদি সেখানটাতেই জিনিষগুলো পোতা থাকত, তাহ'লে বিশেষ অসুবিধে হ'ত না; কিন্তু গাছের গুঁড়ি আর ঐ নিশানা এক করে' যে লাইন টানতে হবে সেই লাইন একটু এদিক-ওদিক হলে, পঞ্চাশ-ফুটের মাথায় তফাৎটা কতখানি হতে পারে ভেবে দেখো। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে গুপ্তধন ঐখানেই আছে, নইলে সেই ভুলের কথা ভেবে আমার ঐ রকম ক্ষেপে অস্থির না — সব পরিশ্রমই মাটী হ'ত।"

"কিন্তু ঘর থেকে মাপা করবার সময়ে তোমার সেই ভাবভঙ্গি দেখে আমার ভাল ঠেকছিল না — আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ। আচ্ছা, মড়ার মাথার ঐ গর্ত দিয়ে একটা বন্দুকের গুলি না ফেলে, পোকাটাই ফেলবার মনে কোন হ'ল কেন তোমার?"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটু ভয় হয়েছিল, তোমার ঐ সব কথায় — তুমি সন্দেহ করেছিলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তোমাকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে আমি একটু মজা করছিলাম, যাতে ব্যাপারটা তোমার কাছে আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। শুধু এই জন্যে আমি ঐ পোকা-পোকা অমন করে' লাফিয়ে নেমে তোমাকে তাড়িয়েছিলাম, আর পোকাটা বার থেকে ছুড়ে দিতে বলেছিলাম। তুমি যে বলেছিলে, পোকাটা বড্ড ভারি, তার থেকেই, ঐ মতলবটা আমার মাথায় এসেছিল।"

"হাঁ, এখন সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা বিষয় এখনও পরিষ্কার হয়নি। গর্তের ভিতর সেই যে বহুতঙ্কাগুলো ছিল, তার মানে কি?"

"ও বিষয়ে তোমার চেয়ে বেশি কিছু আমিও বলতে পারব না। ওর কারণ কেবল একটা মাত্র হ'তে পারে, কিন্তু এরকমি কিছুর কাজ যে কেউ করতে পারে, তা' বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হয় না। যদি কিড্‌ই ওইগুলো ওখানে পুঁতে রেখে থাকে — আমার বিশ্বাস, কিড্‌ ছাড়া এ আর কারও কাজ নয় — তা হ'লে সে একা করতে পারেনি, অন্তত দু'চার জনের সাহায্য নিশ্চয় নিতে হয়েছিল। যখন কাজটা চুকে গেল, তখন সে নিশ্চয় ভেবে দেখেছিল, তার ঐ গুপ্তধনটির কোন শরিক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়,

[illegible] হয়ে এখানে কাজ করছিল, আমার কাজও শেষ হয়ে এসেছিল, তখন সিঙ্গল থেকে ইংরেজির বদলে বাংলাই [illegible] তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল ; কী বাংলা হবে ? [illegible] কি বাংলা, — কে জানে ?

ইতিমধ্যে 'বঙ্গদর্শনে' যেদিন অক্ষয়বাবু পূর্ব-পশ্চিমের মিলনতত্ত্ব আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল। সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে বেষ্টিতে বেষ্টিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনার করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন কেবল তাঁহারা জানেন যে তিনি বড় তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার শক্তিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

— রবীন্দ্রনাথ

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি—প্রথম, যে রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায় অতিশয় মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী—বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিবা-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

শিল্পী ও সমালোচক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর্ণেষ্ট—কিন্তু এতে বিচার-বুদ্ধির কাজ রয়েছে কোথায়?

হিমেষ্ট—এই যে বহুজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার থেকে একটা ভাবদ্যোতনা সৃষ্টি হয়, সেটাকে ঐ বিচার-বুদ্ধি দিয়েই ত' ভোগন করে নেওয়া সম্ভব;—তাই যা কেন? ঐ ভাবুকতাই এরকমের বিচার-বুদ্ধি। কারণ, সত্যিকার ইঁদুরের বিষ্ঠা ত' নেই—যে অন্তরে অহিফেন সুরক-পরম্পরায় কত রঙ, কত ভাব-চিন্তা, কত অনুভূতি সঞ্চিত হয়ে আছে; সে কাছে কোন ভাব, কোন চিন্তাই অপরিচিত নয়। এই কারণে, সে রসবস্তুদেরকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে', তাদের পার্থক্য বিচার করে', এমন একটি মনোভাব গড়ে তুলে যে,

নিষ্ফল [illegible] হয়

[illegible] নিজেকে [illegible] উপযোগী করতে
[illegible] এই সময় অন্যায়ভাবে [illegible]
উপলব্ধি করতে পারাই ত' কেরোসিনের সমতুল্য
হওয়া।

তবিয়, আর্থেই, এই যে দোকানীর মত জীবন
যাপন করা — এ-জীবনে কিছু করা নয়,
'আছি' বোঝাই অধুনিক করা যায়,
শুধুই 'আছি' নয়, ভিতরে ভিতরে ক্রমেই
ক্ষয়িয়ে চলেছি, ইহাই দুঃখ। এই যে জীবন,
কেবল ঐ ক্রিটক বা অন্য-বিশ্লেষণিস্ট
ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে ধারণ করা
সম্ভব নয়। অর্থাৎ কেরোসিনই কেবল এমন
জীবন ধারণ করে' থাকেন, — আরিস্টোটলের
মতে তাঁরা কেবল নিজেদের মহিমা-প্রচারে
নয় হয়ে আছেন; [illegible]-উইলসের কথা
আরও চমৎকার — তিনি বলেছেন, কেরোসিন
যাদের হাই এই জগতের দুঃখিছু চলতিকারা
নিকটি হলে, শাস্ত অপরকে দুঃখিতে কেবল
ফেলে রেখেন, কোনরকম ভাবান্তর, চঞ্চল না
তাঁদের। আমরাও এই আধ্যাত্মিক শান্তিসুখ
লাভ করতে পারি, যদি জগৎকে একেবারে
ত্যাগ করি; শক্তির ঐ আসন থেকে নিজেদের
মুক্ত রাখতে পারলে আমরাও কেমন কেরোসের
অধিকারী হয়ে পারি, আমরাও যার-চিন্তার
অত্যন্ত শিখরে আরোহণ করে' এই জগতের
পানে কেমনি করে' চেয়ে থাকতে পারি।
ধনপান-তুল্য ক্রিটিক যিনি, তিনি আত্মস্থ,
আত্মচরিতার্থ ও নিরপেক্ষভাবে এই জগৎ-
তত্ত্বের রহস্যপানে তাকান — তাঁর মনের সেই
স্বর্গ খানির কোনখানে একটু ফোড় বা ফাঁক
থাকে না, যেখান দিয়ে বাইরে থেকে চাঁচ এসে
তাঁকে বিদ্ধ করবে। এমনতর তাঁর জীবনই

নিরাপদ — কেমন করে' আমরা জীবন যা
করতে হয়, তা' কেবল সেই জানে।

তুমি হয়ত' বলবে, এ রকম জীবন ধর্মবিরুদ্ধ,
নীতিবিরুদ্ধ: তা' ঠিক। ইতিহাস শিক্ষকের
কাছে সবই নীতিবিরুদ্ধ, কেবল কতকগুলো
ছাড়া — সে সব আছে অতিমুখর ইতিহাসকৃতি
বা নীতি-উপদেশ-মূলক আই। তাদের
অভিপ্রায় হচ্ছে, মানুষকে কোন সৎ বা অসৎ
কর্মে প্রবৃত্তি দেওয়া, কারণ, কর্মমাত্রেই
নীতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আই ত' কোন
কর্মে প্রবৃত্তি দেয় না — মনে একটা
ভাবাবস্থার সৃষ্টি করে যায়। তুমি বলবে,
এ রকম জীবন বাস্তবতাবর্জিত, যা ব্যবহারিক
কোন মূল্যই এর নেই — অর্থাৎ অত্যন্ত
অকেজো। হায়, হায়, অকেজো হওয়া যে
মোটেই সহজ নয়, পাকা মজদারী যারা
তারাই তা' মনে করে বটে। তা' যদি হ'ত,
তা'লে অন্ততঃ ইংলণ্ডের পক্ষে খুব ভালই
হ'ত। পৃথিবীতে এমন আর একটি দেশ
নেই যেখানে অকেজো লোকের দরকার এত
বেশি। আমাদের স্বভাব এমনি যে, বিরক্ত
চিন্তাসত্ত্বও আমাদের পায়ার পরে বিরক্ত
থাকতে পারে না — কার্যকারিতার তাগিদে
তাকেও একটা কাজে লাগানো চাই।
প্রত্যেক কর্ম বা বৃত্তির সঙ্গে এক-একটা ক্ষুদ্র
সংস্কার অধিজোড় হয়ে আছে। কর্মজীবনে
দাক্ষ্য লাভ করতে হ'লে তোমাকে কোন-
না-কোন পক্ষ অবলম্বন করতে হবেই।
আমরা কে-কুলে বাস করছি সেটা হচ্ছে অতি-
পরিশ্রম ও অল্প-শিক্ষার কুল, — এমন হাড়-
ভাঙা খাটুনির ফলে মানুষের বুদ্ধি একেবারে
ভোঁতা হয়ে যায়। কথাটা শুনতে একটু
নিষ্ঠুর হলেও আমি বলব, এ সব মানুষের ঐ

সকল শাস্তি হওয়াই উচিত। জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে থাকার সবচেয়ে সোজা উপায় — নিজেকে কাজের লোক ক'রে তোলা।

আ — তোমার এই মতবাদটি বড়ই চমৎকার!

পি — তা আমি ঠিক বলতে পারিনে, — তবে চমৎকার যদি নাও হয়, তবু ওর একটা ছোট রকমের গুণ আছে — ওটা সত্য। পরহিতৈষীর যত কুফল আছে তার মধ্যে সব চেয়ে কম কি জানো? — ঐ অসংখ্য বেআইনি বর্বরের সৃষ্টি। মানবপ্রেমের বশে যে সব পরোপকার করা হয়ে থাকে, সে যে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী — তাতে করে' যে অনুপযুক্ত অক্ষমগুলোকেই বাঁচিয়ে রাখা হয় — এ কথা চিন্তা করলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও যে ঐ রকম নির্বিচার দয়াকর্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা ভাবুক ও চিন্তাশীল তাঁদের চক্ষে এই রকমের ভাবাবেগ-প্রসূত পরোপকার আর এক কারণে নিন্দনীয় — তার দ্বারা মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধিকে চেপে রাখা হয়, এবং তার ফলে, একটাও সামাজিক সমস্যার নিরাকরণ হয় না। অতএব, আগেই, ইচ্ছে করে' চোখ বুজে থেকে কাজ নেই; যতদিন না ইন্দ্রলোকের সাম্রাজ্যের সঙ্গে সেই উৎকৃষ্ট ভাবরাজ্যও যুক্ত হবে, ততদিন এ দেশ সভ্য হবে না। আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে সেই সব মানুষের, যারা নিজের-পাপপুণ্যের চিন্তাই করে না — যাদের দৃষ্টি বর্তমানকে ছাড়িয়ে ঢের অনেক দূর এগিয়ে যায়। জনসঙ্ঘের নেতৃত্ব করে যারা তারা জনসঙ্ঘের দাবির ওপরে ব'লেই নেতা হতে পেরেছে; কিন্তু নেতাদের চলবার উপযুক্ত পথ যদি তৈরী করতে হয়, তবে, ঐ জনতার কথা — ঐ ভাবোন্মাদের কথা নয় — যে একজন মাত্র মানুষ অবশ্য রোধ করছে, তার কথাই শুনতে হবে।

হয়ত তুমি ভাবছ যে, দেশের সুখের জন্যই দেশ, যা মানে-সুখের জন্যই মানে-ভরা, এ সবের মধ্যে একরকম আত্ম-বিরোধ আছে। তোমার মনে যদি তাই হয়, তবে তা' না বলাই ভাল। দেখ, ঐ যে হাসপাতালে আত্মবিসর্জনের বহরকে অত বড় করে' তোলা, ওটা আমাদের এই যুগের পক্ষেই স্বাভাবিক; কারণ, এমন স্বার্থপরতার যুগ ইতিপূর্বে কখন ছিল না। ওই যে সব ভাব-প্রবণ পরোপকারিণী-প্রতীর হয় — তারা নিজের উদ্দেশ্য নিজেরাই ব্যর্থ করে; তারা নিশ্চিন্তমনে সেই এক কথাই বকে' চলেছে, — কিনা, পরের প্রতি তোমাদের কর্তব্য সর্বদা পালন কর। কিন্তু তাতে ত' মানুষের সত্যিকার কল্যাণ হবে না; তাহলে, একটা জাতকে বড় করতে হ'লে সমষ্টির নয় — ব্যক্তির ইতিহাসের সন্ধানে যেতে হয়। যে-সমাজে প্রত্যেকে নিজের উন্নতির চেষ্টা করে না সেখানে জ্ঞানের আদর্শ বড্ড ছোট হয়ে যায়, শেষে একেবারেই লুপ্ত হয়। যদি কোথাও থেকে ধরে' এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তোমার আলাপ হয় যিনি আজীবন নিজেকে নিজেই তুলিয়ে' তুলেছেন, — এমন লোক অবিশ্যি আজকালকার দিনে প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না, কচিৎ কখনো চোখে পড়ে — তা' হলে তোমার মনে হবে, সেই আলাপের ফলে তুমি যেন একটা মূল্যবান কিছু লাভ করলে; সেই অনুভূতি কখনো যেন বড়-একটা কিছুর স্পর্শ পাবে ব'লে ধন্য হবে, তোমার সারাজীবনে যেন একটা শুচিতার সঞ্চার হ'ল। কিন্তু, বাপ! যদি এমন একজনের

পারে বলতে হয় থাকে, যে সাধারণের কেবল পাকে শিক্ষা দিয়ে থাকিছে। — মনে করলেও শিউরে উঠতে হয়। নিজের মত জাহির করে' বেড়ানো একটা মারাত্মক দুঃস্বভাব, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি জানো? — ভয়াবহ দুর্দশা।

আ — তুমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, সিসবার্ট: সম্প্রতি তেমন কোন ঘটনা ঘটেছে নাকি?

সি — ও রকম ঘটনা ত' অনিবার্য বলেই হয়। না, আর্টেই, মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নিজ আত্মার উপলব্ধি। এ কথা আমি স্বীকার করিনে যে, জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা খুবই দুরূহ; আরও স্বীকার করি যে, এর জন্যে অবসরেরও কোন বাঁধাবাঁধা নেই — অন্ততঃ এখনও যেন কিছুকাল তারা ও কথা ভাবতেই চাইবে না; লোকের দুঃখে সহানুভূতি করা তাদের পক্ষে বড় সহজ, কোন চিন্তা বা ভাববস্তুকে বরণ করে' নেওয়া তেমনই দুঃসাধ্য। চিন্তা জিনিষটা যে কি, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা এমনই যে, যদি কোন বস্তুকে তারা বিপজ্জনক মনে করে, তা'হলেই তার আর কোন মূল্যই রইল না; অথচ, ঐ রকম বিপজ্জনক যা-কিছু, চিন্তাহিসেবে তারই ত' একটা মূল্য আছে। কেতাব আদৌ মারাত্মক নয় — সে ত' একটা তত্ত্বই নয়।

আ — সিসবার্ট, তুমি আমার ধারণা খারাপ করে' দেখ, দেখছি। এখনি আমাকে বলবে যে, সব আর্টই মূলে নীতিহীন; এখন আবার বলছ যে, তত্ত্বহিসেবে যা খাঁটি তা'ও মূলে অত্যন্ত অশান্তিকর।

সি — হাঁ, ব্যাবহারিক জগতে তাই বটে। কেন, সমাজ টিঁকে আছে দুটি জিনিষের জোরে; একটি হচ্ছে, লোকাচার; আর একটি হচ্ছে, মানুষের মনের কতকগুলো অজ্ঞান সংস্কার; তার মানে, সমাজবাদী নর-নারীর স্বাধীন যুক্তি-বিচার না থাকাটাই দরকার। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনের কথায় আর কাজ নেই, ঐ সব দুঃখীন পরহিতব্রতীদের নিয়ে আর মর। এ রকম আলোচনা বড়ই ক্লান্তিকর; আমি এখন সেই আর এক রাজ্যে ফিরে যেতে চাই — যেখানে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতা আছে।

আ — অর্থাৎ, খাঁটি চিন্তা-রস-রসিকতার রাজ্যে?

সি — হাঁ। তোমার মনে আছে, আমি বলেছিলাম যে, সমালোচকও তার নিজের ধরণে, শিল্পীর মতই রূপ-সৃষ্টি করে; কেমন, কথাটা তোমার তখন পুরো বিশ্বাস হয় নি, না? বড় জোর আমারই, আমি তোমার কথাটা ভালো বুঝতে পারিনি।

আ — আমি যে ঠিক অবিশ্বাস করেছিলাম তা নয়; তবে একটা বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ফিউচরা তেমন কিছু সৃষ্টি করলেও সে-রচনা তাদের নিজেদেরই মনোগত ভাবের রচনা না হয়ে পারে না — আত্ম-ভাবটাই তাতে প্রবল হয়ে ফুটে উঠে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যা কিছু হয়েছে, তাতে শিল্পীর আত্ম-মনোভাব যেন মুছে গেছে, নিজেকে একটুও ধরা দেয় নি যাতে; নিজের সঙ্গে যার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, সেই রকম একটা বহির্গত বস্তুকে ঠিক তার মত রূপ দিতে পারাই ত' শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ম।

সি — যত সৃষ্টিকর্ম আছে সবই আত্মপ্রকাশমূলক — শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রীক বা ইংরেজী নাটকে যে সব বড় বড় চরিত্র দেখতে পাও, যাদের দেখে মনে হয়,

প্রত্যেকের একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, নাট্যকার যেন তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাঁর নিজের ভাব একটুও তাদের মধ্যে নেই — সেগুলোকে যদি খুব ভাল করে' চিত্রে ফুটিয়ে তোলে তবে সেগুলো পারে, তারা কবিদেরই এক একটা সৃষ্ট আত্ম-প্রতিকৃতি। তারা নিজেদের যা' বলে' মনে করত তাই অবিকল ঐকে দি — নিজেরা যা'-নয় বলে' তাদের বাসনা ছিল তাই তারা এঁকেছে; এবং একটা আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক নিয়মের বলে — অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্যও — ঐ যা-নয় সত্যিই তাই হয়ে যেত তারা। কারণ, একটা কথা মানবেই হবে যে, কোন মানুষ কখনো তার ঐ 'অহং'টাকে পার হতে পারে না। এমন কোন সৃষ্টির মধ্যেই এমন কিছু থাকতে পারে না যা' প্রষ্টার ভিতরে ছিল না। শেকস্‌পীয়ারের নাটকের যে সব অপ্রধান চরিত্র — সেগুলো তিনি বহু বাইরে থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন — লণ্ডনের চাকার ধুলোও তাদের গায়ে লেগে আছে; কিন্তু হ্যামলেট তাঁর আত্মার অতল থেকে উঠে এসেছে, রোমিওকে তিনি এঁকেছেন নিজেই কামনার অগ্নিবর্ণ দিয়ে। তাঁর প্রকৃতিতে তারা যেন এক একটা পৃথক ধাতুর মত বিদ্যমান ছিল, তিনি সেই ধাতু নিয়ে ঐ মূর্ত্তিগুলোকে গড়েছেন; বাস্তব জীবনের অধোভূমিতে তিনি তাদের খাড়া করান নি, তুলে ধরেছিলেন আর্টের সেই উর্দ্ধলোকে — যেখানে প্রেমকে জয়মালা পরিয়ে দেয় ভূত্য, যেখানে সকলই সম্ভব; পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যে মুখ আড়ি পাতে, তাকে খুন করা খুব সহজ; দম-খোঁড়া কবরের ভিতরে হাসিয়ে দু'জনে ঘনিষ্ঠ হতে কিছু-মাত্র বাধে না; পাপ করেছে যে রাজা, সে নিজের হাতেই নিজের তৈরী বিষপাত্রে চুমুক দেয়; পুত্রও তার পিতার প্রেতাত্মার দেখা পায় — সৌন্দর্য্যের আপাদমস্তক ঢাকা নেই ধূর্ত্তি, ম্লান চন্দ্রালোকে, দুর্গপ্রাসাদের ঘুমানো ঘরের আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পাতাবরণ করে' রেখেছে। শেকস্‌পীয়ার তাঁর বহির্জীবনে কোন কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন নি ব'লেই — সব চেয়ে তীর্থমান হয়েছেন; তেমনি, তাঁর নাটকগুলিতে তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি ব'লেই তাঁর অন্তরের আসল 'আমি'-টার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় ঐ নাটকেই। একথা খুব সত্যি যে, শিল্পকর্ম্মের বাইরের রূপটা যতই আত্মভাববর্জ্জিত হোক, তার ভিতরের মর্ম্মটা আত্মময়। মানুষ যখন নিজের জবানীতে কথা কয় — তখনই তার আসল পরিচয় সে দিতে পারে না; একটা মুখোস দাও তাকে — দেখবে, সহজেই সে সত্যি কথাটা বলছে।

আ — তাই যদি হয়, তা'হলে, যেহেতু ক্রিটিকের হাতে ঐ রকম মুখোস যেমি নেই, তাকে সব সময়ে কেবল নিজের কথাই বলতে হবে,— অতএব, যারা কবি ও শিল্পী, যারা নানা রকম মুখোস ব্যবহার করতে পারে — অর্থাৎ যারা তাদের রচনায় অতি সহজেই বাইরের থেকে একটা রূপ যোগাড় করে' নিতে পারে — তাদের চেয়ে ঐ ক্রিটিকরা আত্মপ্রকাশের সুবিধে চের কম পায়, বলতে হবে।

পি — এমন কোন মানে নেই; বরং ঘোটেই তা' সত্য হবে না — যদি সেই ক্রিটিক বুঝতে পেরে থাকে যে, কোন একটা কিছুকে ধরে' থাকাই তার ধর্ম্ম নয়; যদি এইটে মেনে

দেখেছিল। তেমনি দেশ ভরে পরীক্ষা করে যাওয়া করে দেয়ে তার মোহ আর নাই না। যেন শেষ না হতেই চিত্রকলার এক নতুন রীতি, কাব্যের নতুনতর একটা ঢং দেখা দিলে; বাণিজ্যে — আহে-ভরে বাণিজ্যে — হঠাৎ সেই অমাবস্যার রাত্রিরা উৎসব হয়ে উঠল; অবিশ্যি, ঐ ভাব কোন কালের অধীন নয় — মানুষেরই প্রাণের অবস্থার উপর নির্ভর করে; তার ফলে, আমরা আমার কিছুদিনের জন্য অন্তর্জীবনের যে বাসনা-বেদনা স্বাই ভীরু-মধুর সৌন্দর্যে আকুল হয়ে উঠেছিল। আবার আজ সবাই রোমান্সের নামে পাগল হয়ে উঠেছে, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে পর্যটক-পাবলেশের বীথিকাগুলির উজ্জ্বলত্বের কাঁপন শুরু হয়েছে; বেতনী রঙের পিছিড়ায় বসনভূষী আবার তার ঝুকুমার বর্ণ ও পাতাখানি নিয়ে বিচরণশুরু করেছেন। বসনভূষী পুরোনো ঢং একেবারে লোপ পায় না; কিন্তু প্রথম সমাদরটা — ছন্দের আস্বাদন-রীতি কমাপত্র এদিয়ে গেলেও রসিকচিত্তও সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে।

(ক্রমশঃ)

নিয়ে তার মনে কোন দ্বিধা না থাকে যে, আমরা উৎসুই হয়েছিলেন শুধু এক একটা নির্দিষ্ট দোষেরই জন্য। অতএব কোন একটা ভঙ্গিকে ধরে নাধাকাই সত্যিকার সাধনা। যিনি এদের সাধনা করেন, তিনি যে সকল বস্তুর মধ্যে সেই এক বাস্তবকেই স্বীকার করেন, সেই জন্যই নূতনতর স্বাদের সন্ধান করেন; আটের যত বিভিন্ন পন্থা ও যে কোনোটির থেকে মনোমতের একটি আবিষ্কার করে নিজের কাজে লাগান। যেমনভাবে একের দিকেই টানাপড়েন — কবে কেউ কিনিসের আদর করেছিল তাই মনে রেখে তার উপরে কিছুতেই আমোদ নিতে চায় না — তার মনের প্রতি কথা হয়ে থেকে; যে অতীতের মানুষ তখনকার ঘরে তার আর কিছু নেই। কোন একটা [illegible] করে [illegible] করে [illegible] হয়ে আর সম্ভব নয়। [illegible] কিন্তু তাদের যা বলবার- তা নিশ্চয় নয়। যদি, কারা আটের বাস্তব-পন্থাই ভাল দেখেছিল, তার থেকে যেন একটা নতুন রকমের সাড়া মনে

"রাতের তারার হারাবে দেখেছি প্রাতে
আবার তারার তাহি খুঁজিবারে রাতে।"

সভ্যতা

(৫)

সভ্যতা-সৃষ্টির উপায়

কোন বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের প্রতি আমার নিজের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই; কিন্তু যদি কোন শাসনতন্ত্র এবং তদনুযায়ী সমাজ কোন দেশে, অবস্থা বিশেষে, সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহায়ক হয়, অর্থাৎ সর্বাধিক মানব-সুখকোষের অনুকূল হয়, তবে আমার বিশ্বাস, কেবল দুর্বল আদর্শই সেরূপ শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী হইবে। আমার, এই সব নির্বোধ মানব-হিতৈষীরা যাহাই বলিতে চাহুন যে, স্বাধীনতা, সমদর্শিতা, জনসাধারণের সমানাধিকার প্রভৃতির উপরে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা কিছুতেই রক্ষণক্ষম হইতে পারে না, তেমন সভ্যতার কোন মূল্য নাই। ঐগুলাকেই তাঁহারা পরমার্থ-জ্ঞান করেন; কিন্তু সে স্বাধীনতা যে পরমার্থ-লাভের উপায়মাত্র — উপায়-হিসাবেই তাহাদের যাহা-কিছু মূল্য — তাহা বীকার করে না, তাই হাসাস্পদ হইয়া থাকে। সভ্যতাকে অপরূপ করিবার জন্য কেবলই ইহাই দেখাইলে চলিবে না যে, তাহাদের মূলে অন্যায় বা অসত্য আছে; ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ স্বাধীনতা ও সমদর্শিতা দ্বারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু লাভ করা যায়।

যদি আর সকল দিক ঠিক থাকে, তাহা হইলে আমি স্বাধীনতা ও সমদর্শিতা-মূলক সভ্যতাকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করিব; তাহার একটা কারণ এই যে, সমাজের একটা ভাগ যদি পাপ করে, তবে তাহারাই সভ্যতার উদ্দেশ-স্বরূপ সেই আদর্শগুলিরও অবনতি ঘটাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, ঐ পাপগুলাই সেই নিকৃষ্টতর আদর্শ-সংঘের কীবনে সভ্যতার যে পরমার্থে হইবে। অবশ্য, ইহারা যদি খুব বেশি সংখ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কিছু বা নাড়িবে কেমন করিয়া? — সমাজের ঐ শ্রেণী বলিয়াদের কোন ক্ষতি থাকিবে না। অবশ্য, সমাজ যদি নিতান্তই দুঃখ-ক্লেশী আদর্শের একটা সমস্ত সম্প্রদায় গোপন করিতে চায়, অথবা, যে সমাজ-স্থিত ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য — সমাজের অধিকাংশকে বঞ্চনা করিবার জন্য, পুরিপোষণ করে, তাহা হইলে ; — এ উভয়ের সম্বন্ধে, আমি ঐকান্তিক সমানাধিকারবাদী শাসনতন্ত্রেরই পক্ষপাতী এবং রাষ্ট্রে যাহাতে আপনা হইতেই সভ্যতা-লাভের উদয় করিয়া লইবে। কিন্তু কেমন সুবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রের অনুদয় করে হইবে কে জানে?

এ পর্যন্ত আমরা যত সমাজতন্ত্রের ইতিহাস জানি তাহা হয় কোন বেচ্ছাচারী রাজা, অথবা একটা শক্তিমান শাসক-সংঘের দ্বারা জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা যুদ্ধ করিয়া যাহাকে 'আদেশের রাজত্ব' আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা আসলে, নিম্নশ্রেণীর উপরে একটা শক্তিমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুশাসন মাত্র; ঐরূপ শাসনের উপরেই সভ্যতার সব-কিছু নির্ভর করিত। এই শাসনকারীদের অনেকেই ছিল নিষ্ঠুরস্বভাব কারিকর; ইহাদের প্রভুরা অপরের কাজ করিবার জন্য ইহাদিগকে ভাড়া দিত, অনেকে মনিবের সন্তানেরই শাসন করিত। এই ভৃত্যদলের প্রতি মনিবদের ব্যবহার খুব ভালই ছিল, ইহারাও আদেশের সভ্যতার কতকগুলি গুণ দোষ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলেও

আজীবন 'দাস' থাকিয়া যাইত। 'দাস' বলিতে যদি এমন মানুষ বুঝায় যাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার নাই, যাহাকে পরের জন্যই খাটিতে হয়। কিন্তু এই সকল শিল্পকর্মনিপুণ 'দাস'-এর নিজে আবেগ প্রেরণা দাবীও ছিল, সেগুলিকে মানুষ না বলিয়া ভারবাহী পশু বলিলেও চলে। এই বিংশ শতাব্দীতে এমন শাস্ত্রবৃত্তি মানুষকে আর জুটিতে হইবে না, তাই এখন মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রই সেই সকল কাজ করিতে পারিবে।

যাহারা আধেয়ের দুইটি দিক হইল একদিকে স্বাধীনতা, সমদর্শিতা ও সমানাধিকার, এই সকলের জন্য কি অপূর্ব সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল!— সেই অতি-বিখ্যাত গ্রীক-পলিটিগুলির যে কতখানি মহত্ত্ব, তাহা আপনারা এখনই বুঝিতে পারিতেছেন। এমন কথা বলিলে অযথার্থ হয় না যে, সেই সভ্য ও সম্পদিশালী উচ্চসমাজের মধ্যেই সকলের সকল বিষয়ে সমান অধিকার ছিল, কেবল তাহাদের নিজেদের মধ্যেই অবশ্য তাহা না। তাহাদের মধ্য হইতেই সেই ক্ষুদ্র সেক্সেসগুলিকে চিনিয়া লওয়া যাইবে — যাহারা ছিল সভ্যতার শিক্ষক, গুরু ও প্রচারক। ঠিক তাহাদের নীচেই ছিল একটি নাগরিক-সমাজ; ইহারা ঐ সভ্যতা-দান এমনই ভোগ করিয়াছিল যে, ইহাদিগকে ঐ উচ্চতম স্তরের খুব কাছাকাছি বলা চলে। এখন বাকি থাকে ঐ নিম্ন নাগরিক-সমাজের সঙ্গে, সেই উচ্চ স্তরের মানসিক উৎকর্ষ যতদূর সম্ভব বিকটভাবে করিয়া তোলা। এ কাজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের পক্ষে খুব দুরূহ নয়; গত দুই শত বৎসরের নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সে বিষয়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছে। তাহা হইলে আধুনিক সমাজকে দত্তা করিয়া তুলিতে বাকি কি? ইহার উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাইবে। আধেয় দত্তা হইয়াছিল, তার কারণ আধেয়ীগণ দত্তা হইতে চাহিয়াছিল। শুধু অবস্থাপন্ন লোকগুলাই নয়, শিল্পজীবী শ্রমজীবীরাও জীবনটাকে সুখী করিবার বাসনা অন্তরে পোষণ করিত। এখনও ইংলণ্ডে একটা বিশাল নিষ্কর্মা-সমাজ, উপার্জন না করিয়া ধন ভোগ করিয়া থাকে; যাহারা ধন উৎপাদন করে তাহারাও, লক্ষপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণের বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া, বেশ আরামে ও অনেকটা নিশ্চিন্তমনে তাহাদের সেই ধন ভোগ করে। কিন্তু যে অল্পসংখ্যক সভ্যতাসৃষ্টিকারী ব্যক্তি তাহাদের মধ্যেই থাকিবার কথা, তাহাদের অধিকাংশই সভ্যতার পরিবর্তে বর্বরতার সাধনা করে, অতিরিক্ত লাভের লোভে তাহারা মহদুদ্দেশ্যকারী পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হয় না, এবং মুখরোচক আমোদ-প্রমোদে তাহাদের শ্রম বিনোদন করে; আর যাহারা শিল্পী ও শ্রমজীবী তাহারা নূতন উপায়ে যে অধিক অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থ ঐ ধনীদের অনুকরণে তেমনই অসৎ কার্যে ব্যয় করিয়া থাকে।

যাহারা চিন্তাশীল মনীষী তাঁহারা এই অন্ধকারে একটু আলোকরশ্মির সন্ধানে কেবলই সেই আধেয়ের পানে চাহিয়া থাকেন। আমরাও যখন সভ্যতাসৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, তখন, সকল সভ্য সমাজে — বিশেষ করিয়া সেই আধেয়ীর সমাজে — নারীজাতির মর্যাদার কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইহা সত্য যে, আধেয়ীর সমাজে সাধারণ গৃহকর্ত্রীর অবস্থা দাসীর মতই ছিল, যদিও সেই দাসীকে তাহারা বিশেষ সম্মান করিত। ইহাই স্বাভাবিক; কারণ, গৃহিণীমাত্রেই সংসারের পরিচালিকা, তাহাকে নীতিমত খাটিতে হয়। কাজেই আধেয়ের গৃহিণীগণ দাসীশ্রেণীই গণ্য হইতেন। তাঁহাদিগকে যে সম্মান করা হইত তাহা প্রত্যেক সংসারের কর্ত্রী-মাত্রেরই প্রাপ্য। আধেয়ীগণ যেমন গৃহিণী সেবাকারিণী স্ত্রীর মূল্য বুঝিত, তেমনই সুশিক্ষিতা ও সর্বগুণসম্পন্না নারীর মর্যাদাও বুঝিত — সভ্যতা-মাত্রের পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত।

তাহারা জানিত যে, সভ্যতার সম্পূর্ণতা-সাধনের জন্য শুধু পুরুষের নয় — নারীচিত্তের বিবিধ বৃত্তি ও তাহার ক্রিয়া সেই সভ্যতার উপাদান হওয়া চাই; নারীস্বভাব-সুলভ হৃদয়াবেগ, অনুভবশক্তি, সহজ-জ্ঞান, রসিকতা, মনো-বৃত্তির গোপন-রীতিজ্ঞতা, ঔদার্য্য, দৃঢ়তা, ও অবিশ্বাস, এ সকলই সভ্যতার উপাদানরূপে তাহার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক। এই উপাদানগুলি যোগাইত — 'হেতায়েরা'-নারী এক শ্রেণীর গণিকা। আমার তাহাই মনে হয়। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, আথেনীয়দের জীবনে নারীজাতির প্রভাব প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। এই সব প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি ইহাই বলিব যে, তাঁহারা প্রাচীন সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই, অথচ একটু চিন্তার প্রয়োগ করিলেই দেখিতে পাইবেন — উচ্চতম আথেনীয় সমাজে এই সমাজ্ঞীস্থানীয়াদিগের কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আথেনীয়গণ নিশ্চয় বুঝিয়াছিল — সভ্যতার পুরুষের মত সভ্যতম নারীও কর্ম্মহীন অবসর-জীবন যাপন করিবে। এইজন্য তাহারা স্ত্রীজাতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিল। এক ভাগে ছিল অতি সুস্থ, কর্ম্মঠ, সংযতাচার নারী — সন্তানপালন ও গৃহিণীপনাই যাহাদের অত্যধিক কাম্যবস্তু; ইহাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। আর এক ভাগে ছিল অতি অল্পসংখ্যক আমোদপরায়ণা রমণী; ইহারা চিত্তের উৎকর্ষসাধনেই সমধিক অনুরাগিণী। প্রথম শ্রেণীর যাহারা তাহারা ঘর-সংসার, পুত্রকন্যা ও গৃহিণীপনা লইয়া তৃপ্ত ছিল; তদপেক্ষা উচ্চতর সুখভোগের উপযুক্ত তাহারা ছিল না, কামনাও করিত না। গৃহের গৃহিণীত্বলাভে তাহাদের সম্মানের অভাব ছিল না, সংসারে তাহারাই কর্ত্রী ছিল। কিন্তু তাহারা পুরুষের হৃদয়ের পূজা পাইত না; সভ্যতম পুরুষের পত্নী জননী ও গৃহিণী ছিল তাহারা, কিন্তু সখী হইতে পারিত না। আথেনীয়-যুগের যাহারা চিন্তোৎকর্ষ বিষয়ে অধিকার উচ্চ ছিল তাহারা সমস্তরী ব্যক্তির দাবী কামনা করিত, তাহাদিগেরই হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ও অর্ঘ্য নিবেদন করিত। যদি তাহারও নারীসঙ্গলিপ্সা থাকিত তবে তেমন নারী দুর্লভ ছিল না, সেই নারী ঐ "হেতায়েরা"।

এই 'হেতায়েরা'-দিগের অধিকাংশ সাধারণ বার-বনিতা হইলেও, ইহাদের মধ্যেই এমন অনেকগুলি সুশিক্ষিতা কলাবতী কামিনী ছিল যাহারা ঐরূপ সুন্দরসরসিক আথেনীয় মনীষিদিগের সখী বা প্রণয়িনী হইতে আপত্তি করিত না। যেহেতু প্রেমচর্চ্চা বাহিরেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সাহচর্য্য ঘটিতে পারে না, অতএব এরূপ স্থলে ঐ 'হেতায়েরা'-দেরই পুরুষের উপযুক্তা হইতে হইত। নিশ্চিতরূপে আথেনীয়গণ এরূপ কখনো বিশ্বাস করে নাই যে, পরকীয়া-প্রেমই মনুষ্য-হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ। তাহারা নিশ্চয় অবগত ছিল যে, হৃদয়াবেগের সহিত ইন্দ্রিয়-সুখ মিশিয়া যে একটি অপূর্ব্ব মুগ্ধতার সৃষ্টি হয়, তাহারই পথে, আত্মার অতি সূক্ষ্ম সংবেদন, মনেরও অগোচর এক পরম অনুভূতি—এক চিত্ত হইতে অপর চিত্তে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ গোপন প্রেম-বন্ধন ঘটিলে পর, পুরুষ যে তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া বাহিরে কোথাও যাইবে না, এমন রীতি ছিল না। আথেনীয়গণ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক আলাপ ও লোকসঙ্গ এতই পছন্দ করিত যে, সেরূপ পর্দ্দা-প্রথা তাহাদের অসহ্য বোধ হইত। অতিথির সুসজ্জা সুরনিকেতনের মজলিসেও 'হেতায়েরা'র প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না; তাহারা পুরুষের সহিত সঙ্কোচে মেলা-মেশা করিত, না করিলে আথেনীয়-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এমন সৌরভময় করিল কে? এই 'হেতায়েরা'দিগের মধ্যেই গ্রীসের যত অসাধারণ বুদ্ধিমতী, বিদুষী ও কলাবতী রমণীর উদ্ভব হইয়াছিল; অতএব, তাহাদের নাম বর্জ্জন করা দূরে থাক, তাহা লাভ করিতেই যত খ্যাতনামা গ্রীক পুরুষ যে উৎসুক

হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি !

ইহাতে কখনো সুখের সৃষ্টি হইত না ; যদি বৈধমতে সন্তানের জননী হইত তবে সেই সন্তান পাবে করিত না। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের মধ্যে যাহারা বিশেষ বুদ্ধিমতী, এবং যাহাদের চিত্ত অধিকার আকাঙ্ক্ষিত ও সম্পর্কযুক্ত, তাহারাও এই বিষয়ে একটা কঠিন সমস্যায় পড়েন — পত্নীর না চিরকুমারীর ব্রত গ্রহণ করিবেন ? একজন আধুনিক মহিলা — তাঁহার অবশ্য সেই ভালো হইত, চিত্ত দৃঢ় করিতে হইত, এবং তবেই তিনি স্বর্গবাসিনী হইতেন — যদি সন্তানবতী ও স্বামীর হৃদয়ে অধিকার পাইতেন, তবে তাঁহার পক্ষে সমাজের অন্তর্গামিনীদের সহিত পাল্লা দেওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। ইহার লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ফেনেলাস্-যুগের বড় বড় মহিলারা, শিক্ষা অট্টালিকা সভ্যতার তারিনীগণ শিশুপালন বা সন্তানকে শিক্ষালয়ে প্রেরণ করার দিকে দিয়াও যাইতেন না। যে যুক্তিতর্কের অবিরত প্রেরিতা এমন বিপরীত ফলিয়া মনে হইয়াছিল, সেও সুদূরবর্তী বহুকাল, চার পাঁচ শতের ব্যবধানের ও তখনো সন্তান-প্রসবের কাল, যেন ইয়োরো-বিদ্যুৎগুলার উপর আর উঠিতে পারে নাই. — এমন সোভাগ্যের পরিণাম তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদের কেহ কি আমার এই দুঃখকর সিদ্ধান্তের সমর্থন করিবেন না যে, এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সুদূরতা চিরকুমারীরই বরণীয় ? যৌবন গত হইলে কেহজনের অনেক শক্তিই হ্রাস হয়, অনেক সুখই অন্তর্ধান করে ; তখন তাহাদের স্থলে আমরা কোন্-গুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারি ? তখন আমি চিত্ত-প্রকর্ষের সেই প্রধান সম্পদগুলি স্মরণ করি, তখন সময়ে সময়ে মনে হয়, চিরকুমারী যাহারা তাহারা স্বর্গলাভ ব্যতীত আর কোন স্থানের যোগ্য অধিবাসিনী কি না ?

ঐ 'হেতায়েরা'-শ্রেণীর রমণীরাই ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দবিহারিণী-কুমারী-জীবনের সঙ্গে বিবাহিতা নারীর জীবনযাত্রাও মিলাইয়া লইতে পারে ; একদিকে পারিবারহীন বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জীবন, অপর দিকে সংসার-জ্ঞান, পরদুঃখকাতরতা ও মাতৃত্বের পরিতৃপ্তি। ইহাদের হৃদয়হরণ করিবার জন্য প্রণয়ীর সংখ্যাও অল্প ছিল না ; তাহাদের যে-কোন একজনকে হৃদয়-দান, এবং অপর অনেককে অনুগ্রহভাজন করিবার কোন বাধাও ছিল না। ইহাদের অনেকেরই যেমন বাক্‌পটুতা তেমনই আনন্দ-সঞ্চার করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল ; এবং রূপ-যৌবন অপেক্ষা ঐরূপ প্রখর বুদ্ধি ও আলাপের মোহিনীশক্তির দ্বারাই তাহারা সে যুগের সমাজমনকে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহারা সোক্রাতেস ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলের সঙ্গে হলা-কলা করিতেও ছাড়িত না, আবার প্লেটো কিম্বা এপিকিউরাসের পক্ষাবলম্বন করিয়া ইহারাই তত্ত্বকথা প্রবল করিত। আশা করি, আমি দেখাইতে পারিয়াছি যে, এই সকল জ্ঞানবতী 'হেতায়েরা'-তারিনীগণ তাহাদের প্রণয়ী ও ভক্ত গুরুদিগের উপরে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াই আথেনীয় সভ্যতায় একটা উচ্চশ্রেণীর উপাদান যোগাইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-পরিক্রমা

কবি (উপন্যাস) — শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সেই সহজের প্রেম কাহিনী বাংলা সাহিত্যে
ইতিপূর্বে লেখা হয়নি। সহজাত ভাবোচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে
এমন নিরাবেগ সহজ করিয়া প্রেমের বিশ্লেষণ
সাধারণতঃ সম্ভব বলিয়া বুঝি বলিবার
বিষয় বোধ করিয়াছি। ইহাও মনে হয়
কাহিনী-রচনায় তারাশঙ্করের অসাধারণ কৌশল
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই যে অতিপূর্ণ
আত্ম-প্রকাশ ইহাই যেন সকল কবি-শিল্পীকে,
তাঁহাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভ হইতেই, নিজস্ব
ধারায় চালিত করিয়া থাকে। ইহাই তাঁহাদের "আপন
গানে আপনি-হারানো" চিরন্তন বাণীর অন্বেষণে নিযুক্ত
করিয়া থাকেন। কত ঔপন্যাসিক লিখিয়া থাকেন, কিন্তু
কোনোটিতেই যেন তাঁহার পূর্ণ-নিবেদন হয় না।
পরে তাঁহার সহসা "by the magic hand of
chance" যেন ব্যক্তিত্বটি তাঁহার খুঁজিয়া পায়,
তখন হইতে

সকলেরই যেন
নিজস্ব হয়।

তার

যেন হইয়াছে।
কাহিনীতে নিজের
আত্মপ্রকাশ যে
সকলের যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে
আমাদের এই
রসগ্রহণের
যে অভিজ্ঞতা আমাদের

হয়েছে
করিতে চাহিতে,
কবির তা যেন
বিশ্বাসীর মনে হয়

(৩)

এইবার উপন্যাসখানির কাব্য-সমালোচনা করিব। ইহার ভাবনা-মূলে কবি-মানসের যে জাতিগত প্রেরণার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি, কাব্য-সমালোচনার পক্ষে তাহার সাক্ষাৎ প্রয়োজন না থাকিলেও সেরূপ আলোচনা অবান্তর নহে; কারণ, মানব-জীবন-কাহিনীতেও কবিদৃষ্টির ঐ বৈশিষ্ট্যই জগৎ-সাহিত্যকে অমন এক-একপ সৃষ্ট করিয়াছে। বাংলার একটা বিশিষ্ট কলাকার, যা জীবন-সাধনার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী শুধু নয় — সেই কালচারের বাস্তবৈনিক ক্রিয়ার মানব-চরিত্রেও যে একটা পরীক্ষার দিক ইহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা নিখিল-মানব-প্রকৃতিরই আরেক রূপ। য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যে ও নাটকে আমরা যে অত্যুগ্র ভোগ-পিপাসু, অস্থির সংগ্রাম-শীল মানুষকে দেখি, সেই মানুষকেই আমাদের সাহিত্যে আরেক রূপে দেখিতে পাই; এখানে সে-রূপ আছে কিন্তু ভোগবিমুখ, আত্মসমাহিত: আমি উভয় সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনের তথ্যই বলিতেছি। এই জন্যই আমাদের সাহিত্য, বিশেষ করিয়া বাংলা-সাহিত্যে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের মত প্লটের ঘনঘটা বা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-জনিত চরিত্র-বিকাশের অবকাশ নাই; একেরই আমাদের জীবনযাত্রার নিস্তরঙ্গ প্রবাহ হইতে পরার ট্রাজিডি বা বৃহদায়তন উপন্যাস সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের ঐ আকৃতি বা আয়তনই যেমন মনুষ্যজীবনের একমাত্র দর্পণ নয়, এবং জীবনের বহির্গত আয়তনটাই তাহার একমাত্র নিয়ামকও নয়, তেমনই মানব-চরিত্রের ঐ একটা দিক্ — মানুষের ভোগপিপাসার অসীমতা ও দুর্দমনীয়তা, এবং তাহাতেই তাহার যে শক্তি প্রকাশ পায় — তাহাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়, অন্য পরিচয়ও আছে; য়ুরোপীয় সাহিত্যে তাহা তেমন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ঐ কামনা-বাসনাই মানুষের সমস্যার নিদান ঘটে, কিন্তু উহারও একটা উল্টা-মুখ আছে, তাহাও সেই শক্তিরই আর এক দিক্। বাঙালীর জীবনে এই দিকটার বিকাশ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সাহিত্যে তাহার প্রকাশ তেমন করিয়া হয় নাই। তার একটা কারণ আত্ম-সচেতনতার অভাব; অপর কারণ, ঐরূপ প্রকাশের কোন পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পরীতি ছিল না। কাব্যের কলাশিল্প বা আখ্যানরীতি ইহার উপযোগী নয়, কারণ বাঙালীর হৃদ-জীবন তত্ত্বখানি আখ্যায়িক বা অঙ্গ-প্রাধান্য নয়; তাহা আত্মসমাহিত হইলেও রূপপ্রধান, ইন্দ্রিয়ধর্মী না হইলেও দেহাত্মিক। এক কথায় বাঙালী দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ দেহ ও আত্মার অভেদ-সাধনার পক্ষপাতী। ইহার ফলে সে ঐ কামনা-বাসনাকেও দেহের ক্ষেত্রেই আত্মার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে, দেহেরই অবনীতে দেহাতীতের স্বপনকে এক অপূর্ব গীতিভাষায় অন্তর্নিঃস্রবী করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্তাদের গানে সে একবার তাহার সেই হৃদ-জীবনকে সাহিত্যে একটা বাস্তবরূপ দিয়াছিল — ঐ একরূপ, ঐ গীতি-কবিতার রূপ ছাড়া, আর কোন রূপ সে উদ্ভাবন করিতে পারে নাই; তাহাতেও সে কেবল ভাবকেই রূপ দিয়াছিল, ভাবনার দেহটাকে রূপ দিতে পারে নাই; যে-জীবন হইতে ঐ ভাবের উৎপত্তি, সেই জীবনকে — নরনারীর মূর্তি গড়িয়া, সাকার করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইহার জন্য যে আর্ট — সেই মূর্তি খোলাই করিবার জন্য যে রূপপাতি — তাহাই য়ুরোপ হইতে আমদানি করিয়া, আমাদের ভাষার মাটিতে সেই শিল্পরীতির কর্ষণ ইতিপূর্বে সুরু হইয়া গিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে তারাশঙ্করকে সে বিষয়ে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। বাংলাসাহিত্যের এই যে অঙ্গটি পূরণ করিবার ছিল তাহাই তিনি করিয়াছেন, তিনি বাঙালীর সেই হৃদ-জীবনের গীতি-সুরটিকে ভাবের নিরাকার হইতে মূর্তির সাকারে — জীবন-কাহিনী-রূপে — রূপময়

করিয়াছেন।

এই কাহিনীও একটি বড় গল্প অপেক্ষা দীর্ঘ হইতে পারে নাই, অর্থাৎ রীতিমত উপন্যাসের আয়তন লাভ করে নাই। তথাপি ইহা ছোট-গল্প নহে। ছোট-গল্প হইলে ইহা মানব-জীবনেরই একটা কাহিনী হইতে পারিত না — সেই ঘটনা-মণ্ডল বা প্লট আয়ত্ত করিতে পারিত না, যাহা মিলিলে জীবনের কোন একটা দিক সম্পূর্ণ আকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোট গল্পে তাহা আবশ্যক হয় না, তাহাতে জীবনকে যেমন করিয়া দেখিবার, দেখাইবার অভিপ্রায় নাই; সে যেন ক্যামেরার ক্ষুদ্র প্রেক্ষণ-পরিধির মধ্যে যেটুকু চকিতে দেখিয়া লওয়া যায় তাহারই একটা চিত্র; সে চিত্রকে বিশালের পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার পারিপার্শ্বিকের বিস্তার, বা বহু-আকার হইতেই তাহার বহুলাকার আয়তাই কল্পনার পূর্ণ করিয়া লই — তাহাই তাহার বল। কিন্তু কাহিনী মিলিতে (বড় গল্প ও উপন্যাস) আমরা রীতিমত প্লটের উপরে গাঁথা এবং আদি ও অন্তের গ্রন্থিযুক্ত, একটা জীবন-কাহিনীই বুঝি। কারো (এবং কাফ্‌কার উপন্যাসে) ও নাটকে, সেই পরিচয় ততটা বজায় হয় না বটে তাহা আবশ্যক হইয়া থাকে। ঐরূপ খাঁটি বজায় কাহিনী-রচনাই আধুনিক সাহিত্যে একটা বড় আর্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাকেই সাধারণ অর্থে 'মডেল' বলা হয়। ইংরাজী শব্দটার বাংলা প্রতিশব্দ আমরা তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি নাই, তাই রসবিচারেও আমরা অনেক ভুল করিয়া থাকি। আজকাল আমরা যে-কোন বড় কাহিনীকে উপন্যাস নাম দিই। তাহার একটা কারণ এই যে, অতি-আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের দেখাদেখি আমরা উপন্যাসের কোন form বা বাঁধুনিকে গ্রাহ্য করি না, প্লট বা গল্পবস্তু অনাবশ্যক মনে করি। বাস্তব জীবন-যাত্রাঘটিত যে-কোন রকমের কতকগুলা খণ্ডচিত্রের সমষ্টি, — তাহার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা, এমন কি মতপ্রচারমূলক কল্পনাও উপন্যাস নামে চলিয়া যাইতেছে। ঐ যে প্লটের কথা বলিয়াছি, উহাই মানবজীবন-কাহিনীর রসরূপের অবিচ্ছেদ্য উপকরণ, উহাতেই মূলে আছে একটা সম্পূর্ণ অখণ্ড সৃষ্টি। উপন্যাসের ঐ প্লট বলিতে শুধুই গল্পের সেরা-হওয়া ফুরাইবে না; গল্পহিসাবে সৌরূপ আদি-অন্তের হিদ থাকা চাই-ই, কিন্তু তাহার অভিপ্রায় আরও গূঢ় — ঐ প্লটই কাহিনীগত জীবনকে যে একটি অর্থ-সঙ্গতি দান করে, তাহারই রসরূপ আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়; ঐ প্লটই সেই form-এর — সেই অন্তর্নিহিত রসরূপের — একমাত্র সূত্রের; উহা যে উপন্যাসে নাই, তাহা অবশ্য সম্ভবিত্ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যিক রূপকর্ম — জীবনের রস-রূপ-সৃষ্টি নয়।

এই কথা এইখানে বলিবার তাৎপর্য এই যে, বাংলার প্রায় সকল শক্তিমান কথাশিল্পীই উপন্যাস-রচনায় যেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই — অন্ততঃ আমি যাহাকে খাঁটি উপন্যাস বলিয়াছি, সৌরূপ কলাকার-রচনায়। তাহাতে বাঙালী কথাশিল্পীর লজ্জা পাইবার হেতু নাই, — পাশ্চাত্য যদি আমাদের ঘাটিতে না হয় তবে তাহাতে খোটানি-বিস্তার ঘটে অসুবিধা হউক, বাংলার প্রকৃতি-শোভার কোন হানি হয় না। গীতিকবিতার যেমন, ছোট-গল্প-রচনারও তেমনই, বাঙালী লেখকগণ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আমরা একটা বড় আসন দাবী করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের গীতিকাব্যানুগত রসকল্পনা যাহাদের অভিদর্শনশক্তি বড় কম নয় তাহারাও তারাশঙ্করের ছোটগল্পের অন্ততঃ কতকগুলিতে, তাহাদের বস্তু ও রচনা দুইয়েরই তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিবে, তেমন তৃপ্তি তাহারা য়ুরোপীয় সাহিত্যের কোন ছোটগল্পে পাইবে না; কারণ, মানুষের বাস্তব-জীবনযাত্রাই একাধারে এমন

কাহিনী ও বক্তব্যের ধারণা সেখানেও ফুটিয়া উঠে নাই — সেখানকার পারিপার্শ্বিক, ছোটগল্পের অতি সংকীর্ণ পরিসরে, মানবচরিত্রের পূর্ণ আলোকিত বাস্তব-রূপটাই না, তাহার রহস্য-গভীর রূপও আমাদের চিত্তকে এমন উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে না।

কিন্তু তারাশঙ্কর এই বড় গল্পটিতেই — এই এক-খানি ছোট উপন্যাসে — বাঙালীজীবনের সেই নিবিড় কাহিনী-রসকে একটা সঙ্গীতধর্মী ছন্দ ও সুচোল form-এর আকারে বিন্যস্ত ও সুগ্রথিত করিতে পারিয়াছেন। ইহাতে যেমন প্লট আছে, তেমনই দৃশ্য ও ঘটনা-সন্নিবিষ্টি (situation) আছে; একটি মূল সুর যেমন অব্যাহত আছে, তেমনই তাহাতে নানা বিচিত্র সুর — নানা রং ও রূপের নক্সা-বীচিত্র — একটি ঐকতানে সমাহিত হইয়াছে। ইহা একটি বড় গল্প না উপন্যাস?— আধুনিক সমালোচনা-শাস্ত্রে সে প্রশ্ন অবান্তর। গ্রন্থের উপরই কবি-কর্মের বিচার, তাহার শ্রেণিবিভাগ লইয়া নহে; সেশ্রেণি সম্বন্ধে সচেতন হইলে কোন একটা শ্রেণীতে তাহাকে ফেলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রের সন্ধান রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে সেই কাব্য-সৃষ্টি সৃষ্টিধর্ম হইত না। তথাপি, আমি এই কাহিনীতে সাধারণ অর্থেই উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছি, তার কারণ, ঐ ক্ষুদ্র কলেবরেই উহা ছোট-গল্পের গতি অতিক্রম করিয়া এমন একটা বৃহত্তর ও জটিলতর আখ্যান-রচনায় পৌঁছিয়াছে যাহা উপন্যাসের পক্ষেই সম্ভব; উপরন্তু, একটা নিবিড় ভাবাবেগ, কথার আকারে, খাঁটি নাটকীয় কল্পনার লীলাভূমি হইয়াছে। ইহাও একরূপ মৌলিক সৃষ্টি।

এ কাহিনীতে মানুষের জীবনকে কোন্ রূপে, কোন্ ভঙ্গিতে দেখা ও দেখানো হইয়াছে? আমি পূর্বে বলিয়াছি, এই কাব্যকল্পনার মূলে একটা জাতির বিশিষ্ট সাধনা ও ইতিহাসগত সংস্কৃতির প্রেরণা আছে; এবং তাহাও বুঝিতে হইবে, কারণ জীবনের রূপরস-সন্ধানে, উপাদানের কথা বড় নয়, রূপের কথাটাই বড়; মাটি ও সোনার বিচার একটা বড় বিচার বটে, কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করিবার কালে মাটি বা মালীর কথা আমরা নিশ্চয় ভাবি না। আবার, যে-সমাজের যে-অবস্থায় ঐ জীবন — তাহার বস্তুনিষ্ঠ পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, লাভ-লোকসানের অভিঘাতে একটা রূঢ়-রূপ ধারণ করে, আমরা তাহার সেই অবস্থাকে একটা দুরূপায় বলিয়াই মনে করি,—আমরা চাহিয়া থাকি জীবনের সেই মহিত রূপটার দিকে, সেটা ভিতরের দিক। কিন্তু বাহিরে, ঐ মন্থনের ফলে, যে ফেন-রাশি উৎপন্ন হয় তাহার বুদ্বুদোল্লাসের অন্ত নাই; সেই ফাল ছিন্ন করিয়া তাহার অন্তরলোকের স্বচ্ছ পাত্র যাঁরা দেখিতে ও দেখাইতে পারেন তিনিই জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার। ঐ ফেন-বুদ্বুদের ফাঁকে যে অতিপ্রবুদ্ধ মানব-চেতনা, যাহা জীবনের বন্ধ ঘরটি আচ্ছন্ন করিয়াছে; — য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যে এই ফাঁকটি ছিন্ন না করিয়া, সেই ফাঁকেই সমস্যা জটিল তন্তুগুলিকে নূতন নূতন অনুভবের সাহায্যে আবিষ্কার করা, অর্থাৎ মানুষের সেই অতিপ্রবুদ্ধ মানস-চেতনার জটিলতা প্রদর্শন করাই শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তির নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়াছে; মানুষ যাহা নয় সে-আবরণটা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার প্রকৃত সত্তাকে দুর্দৃশ্য করিয়াছে, তাহারই অন্তরালে অতি-আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কোন একখানি উপন্যাসের পার্শ্বে 'কবি'-গল্পটিকে বসাইলে, মনে হইবে, উহাতে আছে কি? উহাতে মানব-মানসের সেই দুর্জ্ঞেয় জটিলতা, সেই উচ্চ জ্ঞানবুদ্ধি-মুখর সমস্যারাজির দুরন্ত সংগ্রাম কোথায়? না, সে সব কিছুই ইহাতে নাই। ইংরাজী 'Life'-শব্দের যে আর একটি দিক, দুর্বার পশু-জীবনকে

গৌরবান্বিত করা হইয়াছে, যাহাতে দেহের প্রবৃত্তি-গুলাকে অতিশয় ঘৃণার করিয়া — সেই দুর্বলতাকেই শক্তি-নাশ দেওয়া হইয়াছে, ইহার জীবন সেই 'জীবন' নয়। ঐ কবিয়াস নামকটির জীবন তাহার চতুর্দিকে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সেরূপ স্থান অল্প নহে; যদিও তাহাতে প্রবাহ একতানতা যেমন নাই, তেমনই সমতার তরবারি-ঝঙ্কনাও নাই। ইহাতে আধুনিক কালের অতি-বিরাট মানব-সংসারের প্রবল কোন শিল্পপ্রয়োগ চুর্ণিত দেখা নাই; যাহাকে মানুষই তাহার শিল্প-শালায় যেমন গড়িয়া তুলিয়াছে ইহার জীবন তেমন মানুষের জীবন নয়। তাই মনে হইতে পারে, এ কাহিনী নিতান্তই তুচ্ছ — যেমন সরল, তেমনই প্রাণ। কিন্তু কবি যে বলিয়াছেন —

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

— ইহাও তেমনই গভীর, ইহার সত্যও তেমনই চিরন্তন। আবার ইহার শক্তিও পূর্ণ-শক্তি। কবিয়াসের জীবনে যে ঝড় বহিয়াছে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ঝড় মানুষের জীবনে ঘটিতে পারে না; সেই ঝড়ের বেগে যে বীর প্রাণের অবস্থার চালিত করিয়া সে জীবনের পরিণাম সূচিত হইয়াছে, তাহাই জীবনের শক্তিলীলার পূর্ণতম পরিণতি। ঐ শান্তি পরাজয়ের শান্তি নয়, সকল বাসনা কামনাকে মূল পাড়িয়া সরিয়া, তাহার গভীরতম বিক্ষোভকে জয় করার শান্তি। এ জীবন বন্ধন-বন্ধনার মূলের জীবনই বটে; সমাজের ভালোমন্দের — তাহার তীব্র কর্তব্যের আঘাতে, সে মূল উন্মূলিত বা মুহূর্মুহু হয় বটে, তথাপি সেই মূলই অমর, তাহা চিরদিন ছুটিয়াছে ও ছুটিবে। হয় তো' সমাজেরই কোন একটা ভাব-রূপ তাহা পুষ্ট হইয়াছে, আবার সমাজেরই এই নিষ্পেষণে তাহার জীবন-ধারাও বিচলিত হইয়াছে; তথাপি, এবং সেই কারণেও, মানবাত্মার সেই আদি অকৃত্রিম রূপ আরও বেশি করিয়া আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়; একটির জন্য, তাহার মূলে যে রং লাগিয়াছে সেই রং অন্যটির মনুকে আরও মধুর করিয়া তোলে; অপরটির জন্য, তাহাতে যে সকীর্ণতা দেখা দিয়াছে তাহার সেই মূলের দৃষ্টিকে আরও দূর করিয়াছে। উহার যে একটা বিশিষ্ট সাধনার রূপ, পূর্বে তাহা বলিয়াছি, কিন্তু এখানে তাহা তুলিতে হইবে, নতুবা মূলপ্রবৃত্তির সেই অতি-সহজ মানবমহিমা উপলব্ধি করা যাইবে না।

যে-জীবনের রূপ ও রস চরমরূপে করিবার লক্ষ্যে, ঐ নায়ক কবিয়াসের চরিত্রে ও তাহার জীবনের গতি-বিধৃতি দেখা করিলেই চলিবে। এখানের মানব-জীবনের মূল গ্রন্থিটি — যে গ্রন্থিতে দেহের সঙ্গে আত্মার অবিচ্ছেদ বন্ধন ঘটিয়া থাকে — সেই গ্রন্থিই কাহিনীর সূত্রগুলিকে একত্রবদ্ধ করিয়াছে: সেই গ্রন্থির নাম — নর-নারীর প্রেম। ঐ এক গ্রন্থি — হয় বন্ধন, নয় উন্মোচন করিবার প্রয়াসে মানুষ আপনাকে চিনিয়াছে ও চিনাইয়াছে। এই উপন্যাসে সেই প্রেম ভাবে ও অভাবে যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে, একদিকে যেমন দেহের বাস্তব, অপরদিকে তেমনই আত্মার অতি-বাস্তব পরস্পরের সহিত সমান যুঝিতেছে; একের পরাজয় ও অপরের জয় দুইই এক রসের সঞ্চার করে — যেন জয় ও পরাজয়ে কোন প্রভেদ নাই। দেহের সহিত আত্মার যে বিরোধ তাহাকে স্বীকার করিয়াও ঐ প্রেম দেহের অবসান করে না; দেহের যতকিছু জ্বালা ও বীভৎসতা, তাহার আক্ষেপ ও আক্রোশকে সে গ্রাহ্য করিয়া গ্রহণ করে, এবং সেই সঙ্গে দেহের গায়ে পরম স্নেহে হাত বুলাইয়া দেয়। আমি যে মূল-গ্রন্থির কথা বলিয়াছি, তাহা এইরূপ প্রেম: ইহা নর-নারীর যৌন-পিপাসাঘটিত বটে, কিন্তু তাহা

যেমন কবিতাটার একাংশকৃত্রিম নয়, তেমনই একটা পরিচিত শব্দও-চিত্রও নয়। মানুষের দেহের মধ্যেই তাহার বাস বটে, কিন্তু তাহা আসে ঐ দেহেরই অঙ্গোপাঙ্গ হইতে, এবং মনে নয় — প্রাণে। এই প্রাণ-ধর্ম স্বভাবের নিয়মে, এমন এক জনের মধ্যে মূর্তি হইয়াছে — যাহার চারিদিকে দেহের ক্ষুধা, হৃদয়ের পক্ষপাত উন্মেষনাই প্রবল; অর্থাৎ সেই সকলের মধ্যে — যাহাদের মানস-বৃত্তি অতিশয় অকর্ষিত, অতি নিম্নস্তরের প্রাণ-ধর্মে যাহাদের একান্ত সম্বল। ঐ দুর্বার ক্ষুধা কবিয়ালের রক্তেরও বিজয়ন, সেই রক্তের কঠিন আবেগ কেমন করিয়া কোন্ ছিদ্রপথে তখন যে স্বাস্থ্য-অক্ষত্রের জন প্রবেশ করিল, দেহের পিপাসাই প্রাণের গভীরতর পিপাসার পরিচয় হইল — তাহা প্রকৃতি-ঠাকুরাণীই জানে, ঐ দেহ-ধর্মের বশেই তাহা ঘটিয়াছে। মানব-সভ্যতার আদি-ইতিহাসও ইহার সাক্ষ্য দিবে। বাহুর বলে পশুজনন-কারী, অতিদস্যি, দুর্দম আর্য-গণের মধ্যেই আদি কবি-কবির উদ্ভব হইয়াছিল; সেই দেহের শক্তি হইতেই প্রাণ-শক্তি, এবং প্রাণ-শক্তি হইতে বিদ্যা-জ্ঞানের বুদ্ধিশক্তি লাভ হইয়াছিল। তারাশঙ্কর বাংলার সেইরূপ সমাজ হইতেই একটি মানুষকে তুলিয়া লইয়াছেন; এ পুরুষ এক হিসাবে আদিম বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি জ্ঞানপ্রবণ নয়, অনুভূতি-প্রধান; তার কারণ, এ মানুষের জাতি ভিন্ন, ইহার দেশের জল-মাটিও ভিন্ন।

এ কাহিনীর নায়ক কবি হইলেও স্বভাব-কবি, শিল্পী-কবি নয় — মানুষ-কবি; অর্থাৎ সে অন্যান্য মত কাব্যচর্চা করে না, কাব্যপ্রেরণার জন্য বাস্তবকে ছাড়িয়া কল্পনার আরাধনা করে না। — ঐ কবির তাহার বাস্তবজীবনেরই অভিব্যক্তি। তাহার জীবন দুইটা নয়, একও দুই নয়; এক জন্ম হইতে অপর জন্মকে পৌঁছিবার কৌশল তাহাকে শিখিতে হয় না। ঐ মানুষ-কবির সব চেয়ে বড় প্রেরণা — আত্মার ঘনীভূতবোধ; সকল দুর্বলতা, ভীরুতা, ও হীনতাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা। অতএব, ঐ কবি-চরিত্র জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ করিবার মত একটি শক্তিমান পুরুষ-চরিত্রই বটে। উহার ঐ কবিশক্তি — প্রবল প্রাণশক্তি বা প্রেম-শক্তিরই অপর নাম।

এই প্রেমে সবলই সবল। মনি যদি, ইহাতে তাহার চক্ষুশাসন — আত্মনিগ্রহ আছে, তবে তাহা ঠিক হইবে না, কারণ, ইহার ত্যাগেও শুভতা নয় — পূর্ণতাবোধ আছে; সেই ত্যাগের বেদনায় একটা সুখের অনুভূতি আছে, তাহাতেও একটা আনন্দ আছে, একটা চরিতার্থতা আছে; তাহাতে বাধা আছে, কিন্তু দুঃখ নাই। নিজে নিষ্পাপ বলিয়া সে মানুষকে ঘৃণা করে না; ঘৃণা নাই বলিয়াই বেদনা আছে, যাতনা নাই; সেই বেদনার তীব্রতাই তাহার প্রাণে একটি অপূর্ব সুরের সঞ্চার করে — চতুরাকেও অভিভূত করিয়া তোলে। ইহাই দেহ-সাধনা, ইহাই সহজিয়া। এই সাধনাতেও, তারাশঙ্কর খাঁটি তান্ত্রিকের মত — প্রায় অঘোরপন্থীর মত — তাঁহার কাহিনীর ঐ নায়কেতে, দেহের সেই দুর্মতি ও বীভৎস-লীলার মধ্যেই, শবসাধকের মত জয়ী করিয়াছেন, কবিকীর্তিকুল পলিত লালাগন্ধে পঙ্ক-ধাম করাইয়া তাহাকে শুচি ও সুন্দর করিয়াছেন।

ঐ প্রেম মূলে প্রকৃতি-প্রেরণা বটে; তবু মানুষের প্রতিই নয়, জল-স্থল-আকাশ-বিহারিণী বাঙ্ময়ীরূপিণী যে-প্রকৃতি, জননী-জন্মভূমির রূপে, নিদ্রায় ও জাগরণে, মানুষের প্রাণে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া যায় — সেই প্রকৃতির একটি অ-রূপ চিত্তের সত্তার প্রতি যে গভীর আকর্ষণ, তাহাও এই প্রেমের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। ইহাও মানবত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ইহারই বিহনে মানবত্তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। কিন্তু ইহা যে কেমন প্রেম, তাহা এই কাহিনীর ঐ নায়কটিকে না দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাও কবির প্রেম, যা

মানুষের প্রেম। ঘটি মানুষের প্রেম বলিয়াই সেই প্রেমে মানুষ ঐরূপ কবি হইয়া উঠিয়াছে। গল্পটি ভাল করিয়া পড়িলে মনে হয়, লেখকের কল্পনা-মূলে এই তত্ত্বটি অলক্ষিতে বিদ্যমান ছিল। তিনি এই প্রেমকেই তাঁহার নায়কের জীবনযাত্রার মূল-সঞ্চারী করিয়াছেন, উহাই শেষ পর্যন্ত দৃঢ়সঙ্গীতের কাজ করিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের যে প্রেম তাহাতে মানুষের জন্ম সার্থক হয়, সেই মন্ত্র-বিধি হরণ করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য। জন্ম-সংগ্রামের সেই যে ব্রাহ্মণ, তাহার পশ্চাতে ঐ প্রকৃতি মূক-মৌনী শুশ্রূষাকারিণীর রূপে দাঁড়াইয়া আছে — অবশ্য বিশেষে ঐ শুশ্রূষাকারিণীর শুশ্রূষা মানুষ চায় এবং পায়ও। ওই তত্ত্বটিও ঐ কবিয়ালের জীবন-কাহিনীতে বড় সত্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার সমগ্র সত্তা, তাহার সারাজীবন যে প্রেমে তন্ময়, তাহার উপাদান তিনটি — কল্পনা, সৌন্দর্য ও শান্তি। ইহার মধ্যে শেষ দুইটি পুষ্ট হয় যে প্রকৃতির অলক্ষ্য প্রভাবে; প্রথমটি মানুষের নিজ-প্রকৃতি-সম্ভব। আদিকাল হইতেই ইহার বীজ মানুষের প্রকৃতিতে আছে, কালে তাহা অঙ্কুরিত হয়, এবং বাস্তি-জীবনের কোন শুভক্ষণে তাহা মুকুলিত হইয়া উঠে। ওই প্রেমকে ঐ সৌন্দর্য ও শান্তিই অন্তরে লালন করে, সকল আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করে। এ কাজ প্রকৃতিই করিয়া থাকে। এখানেও উহা মানুষের প্রেমকে যেমন পুষ্ট করিয়াছে, তেমনই উহাই তাহাকে বাঁচাইয়াছে — সংগ্রামশেষে সে-ও সেই মহা-শুশ্রূষাকারিণীর অঙ্কে মাথা রাখিয়া তাহার সকল বেদনা জুড়াইয়াছে।

ইহার পর, উপন্যাসের কাহিনী-অংশে, চরিত্র, ঘটনা, ও নাটকীয় সংবিধির যে প্রয়োগ-নৈপুণ্য আছে তাহার বিস্তৃত পরিচয় না দিয়া, আমি কেবল সংক্ষেপে তাহার একটু আভাস দিব। প্রথমে, নায়ক-চরিত্রের বিকাশ ও তাহার সেই প্রেম-সাধনার একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। দুর্বার খুনে-ডাকাতের বংশে তাহার জন্ম, তাহার সমাজে এবং সংসারে দুর্বার আদিম প্রকৃতির। নিতাইয়ের বক্ষে তাহারই প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে, দৈবাৎবশে প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু দেহের ঐ দুরন্ত আগুনই যে প্রেমের দীপ্তিতে পরিণত হইয়াছে, — ঐ সংসারের রূপাবিষ্ট প্রভাবই যে তাহার সেই প্রেম-শক্তির কারণ, লেখক সেই ইঙ্গিতই করিয়াছেন; অথবা, তাঁহার যেমন কোন সজ্ঞান অভিপ্রায় না থাকাই সম্ভব ও স্বাভাবিক, কারণ সৃষ্টির দৃষ্টি অবার্থ; তাই সৃষ্টিকালে চরিত্রের যতকিছু নিহিত-উপাদান আপনা হইতেই আসিয়া মিলিয়াছে। একদিন নিতাই সহসা একটা ঘটনায় আপনাকে চিনিল, নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিল যে, সে সকল সাধারণ উপাধিবর্জিত, বৈশাখুগ্রহময় এক ভিন্ন-শ্রেণীর মানুষ — সে কবি, অর্থাৎ সত্য-সুন্দরের পূজারী; যাহাকিছু মহৎ, অক্ষয় ও পবিত্র, সে তাহারই গান গাহিবার জন্য, মনোহর বাণীর প্রতিমা লাভ করিয়াছে; তাহার মুখে নিরলঙ্কৃত ছন্দোবদ্ধ কাব্য আপনা হইতে আসিয়া পড়ে, প্রাণ ভাবধিক হইলেই ঐরূপ ছন্দে তাহা উৎসারিত হয়। নিজের এই আশ্চর্য শক্তি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল; তাহার ঐ দেহটার মধ্যে, ঐ ঘোর জাতীয় মানুষটার মধ্যে, এ কোন্ দেবতা বাস করিতেছে! এই দেবতাকে সকল অমর্যাদা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। তাহার প্রাণের পিপাসা ঐ দেবতারই পিপাসা; সে পিপাসা বড় মধুর, বড় পবিত্র, বড় সরল। সেই পিপাসা মিটাইবার জন্য সে গান রচনা করিতে লাগিল। সেই গানেরই গায়ক কবিয়াল হইয়া, সে বাংলার পল্লী-সমাজে — তাহারই পরিচিত মানবসমাজে — অকৃত বিচরণ করিবে, মানুষের প্রাণ তাহাতে সাড়া দিবে, তাহার মন-মাত হইবে; তাহাতেই তাহার প্রাণের ঠাকুর পরিতৃপ্ত হইবেন। এই কবির জীবন-চিত্র যে মানব পরিবেশে, এবং যে সুখদুঃখ-সঙ্কুল দেহায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও তারাশঙ্কর একটা বড়

করে তুলিয়াছেন। তিনি এই কাহিনীতে বিলাত-ফেরত বাঙালি কবি-শিল্পী ও কবিওয়ালাকে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন — কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি রহ চোখেও তাহা পড়িবার নয়।

অতঃপর, এই 'কবিয়াল' গল্পটি যেমনে তারাশঙ্কর পাখী যেমন প্রভাতের আলোকে ডাকে, চক্রবাকটি যেমন করুণ-উতল প্রাণের আকুলতাকে ডাকে, — হয়তো বা নির্জনবাসী নিঃসঙ্গ পুরুষ যেমন নৈরাশ্যে অতিষ্ঠিকে ডাকে, এ ডাকাও তেমনই; প্রবল যেমন দুর্বলকে ডাকে, অথবা পঙ্গু যেমন বন্ধিকে ডাকে — তেমন ডাকা নয়। মেয়েটির নাম 'ঠাকুরঝি'. ঐ নামেই সকলে তাহাকে ডাকিত। এই মেয়েটিকেও 'ওদীয়' কবি যে তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও ঠিক শিল্পীর উপযুক্ত. বাংলার পল্লী-দুহিতার চিরন্তনরূপে এ চিত্র অনবদ্য। কিন্তু এ ডাকাডাকা — এই lyric love — ঐ চরিত্রের পূর্ণবিকাশের উপযোগী নয়; তাহার জন্য প্রাণ-শক্তিকে, তাহার প্রেমের সেই নিশ্চিহ্নিত উগ্র কামনাকে অভিনব হইতে হইবে, প্রেমেও তাহাকে শক্তি-সাধনা করিতে হইবে; সে-সাধনার প্রচণ্ড চণ্ডলতা দুই-চোখে নয় — উগ্রচণ্ডী চাপা, হৃদয়ে রক্তে জমা। তাহার প্রেম পরস্পরের পিপাসা-তৃপ্তির প্রেম নয় — সকল পিপাসা জয় করার প্রেম। তাই সে 'ঠাকুরঝির' প্রতি একটি অতিক্ষুদ্র প্রীতির সাধনা উজলা হইয়া উঠিলেও, তাহার কল্যাণ-কামনা করিয়া সে তাহাকে ফিরাইয়া দিল। সে বুঝিল, এ প্রেমের পরিণাম কি; সরল-ভদ্রা অবোধ নারীর এই আত্ম-নিবেদন যতই অকপট হউক, তাহার শক্তি কতটুকু? অভিনয় সরল অকপট হইলেও তাহা দুর্বল, তাহা জীবনের সঙ্গে বেশিদূর যুঝিতে পারে না, সে আগুন নিজেই এক মুঠা ছাই হইয়া যায়। আমার, যাহা বিপুলায়ত, তাহা যাহার দুই জীর্ণ ও জর্জরিত করে, একদিন আত্মহারা হইয়াও যায়। অতএব, ঐরূপ প্রেমের তুলনায় ঘরই বড়; ঠাকুরঝির পক্ষে ঐরূপ প্রেমের পরিবর্তে গৃহলক্ষ্মীত্বের ব্রতই কল্যাণকর। ঠাকুরঝিকে সে তাহার নিজের প্রেম শক্তির বলেই ত্যাগ করিল; সেই ত্যাগের যে দুঃখ তাহাও কল্পনার সন্ধ্যাতারার মত তাহার হৃদয়াকাশে রশ্মি বিকিরণ করিতে লাগিল। ইহাই তাহার প্রথম পরীক্ষা। তাহার দেবরাণী সেই দেবতার মর্মাপলব্ধির জন্য, সে অতঃপর যখন ফিরিয়া বাহির হইয়া পড়িল; ইহার পর সে কে-অভিমুখে ধাঁপ না দিয়া পারিল না. তাহাতেই এই কাহিনী জটিলতর ও গভীরতর হইতে পারিয়াছে — ছোট-গল্পের নগীট উপন্যাসের সাগরাভিমুখিনী হইয়াছে।

নিতাই রীতিমত কবিয়াল হইল। সে একটি কুমুদের দলের প্রধান কবির পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। যে মেয়েগুলিকে লইয়া এই দল, তাহারা রূপোপজীবিনী — অভিনয় নিছকপ্রেমে ধারণেরা। ইহাদের ঐ সমাজই কবির সাধন-ক্ষেত্র হইল, উহাদেরই একজন হইল তাহার সেই সাধনার উত্তরসাধিকা। এই যে সমাজ এ কাহিনীর প্রধান পটভূমিকা হইয়াছে, ইহার চিত্র-অঙ্কনে তারাশঙ্করের কবি-প্রতিভা — তাঁহার সেই যাদুমন্ত্রী তান্ত্রিক রস-দৃষ্টি — সেই সীমায় পৌঁছিয়াছে, যাহার পরে কোন কবিদৃষ্টি পৌঁছিতে পারে না। এখানে নারীজীবন-ট্রাজেডির নায়িকা হইয়াছে এক ফলাওয়া বৈষ্ণবী। একথায় রস-সাহিত্যিক জন্মবৈরাগ্য ছাড়া আর কোন পাশ্চাত্য উপন্যাসিকের বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনা নারীজন্মের এতখানি দুর্গতি ও সেই সঙ্গে নারী-আত্মার এতখানি শক্তি এমন গভীর বর্ণে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ কাহিনীর কবিশক্তি এই কারণে আরও বিস্ময়কর যে, এখানে নারী-জীবনের সেই এক ট্রাজেডি, একই মাত্রায় ও প্রায় একই আকারে

সংঘটিত হইয়াছে — অতি সাধারণ প্রতিবেশে, অতি সামান্য আয়োজন-উপকরণে; ইহা আঙ্গিকের লক্ষণ আত্মগতধর্মিতার। কিন্তু তাহাতেই, ক্লুশবিদ্ধ মহাপুরুষের মত, ঐ ক্লুশবিদ্ধ নারীর অন্তরাত্মার — তাহার নিঃসঙ্গ নৈরাশ্য-যাতনার — মর্মান্তিক রূপ আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্রটি গড়িয়া তুলিতে লেখক যে নাটকীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা কোন শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীর তুলনায় ন্যূন নহে।

মেয়েটির নাম — যাদব বা যাদবা। প্রথম হইতেই তাহার দেহে ও মনে একটা অস্বস্তি, এবং তাহারই ফলে তাহার রূপেও একটা রক্তিমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখা যায়। সে প্রেমকে — নরনারীর সহজ মিলনকে — চাহিয়াছে, করিতে যাওয়া হইয়াছে; তার পর সে আর কিছুকে, কাহাকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধা করে না। তাহার নারী-জীবন সর্বস্বান্ত হইয়াছে — একথা সে কিছুতেই ভুলিতে না; সে নিজের প্রতিও যেমন নিষ্ঠুর, মনুষ্য-জীবনের প্রতিও তেমনই উদাসীন। কিন্তু সে চরিত্রে আছে-অনের একটা মর্মান্তিক আক্রোশ — লাঞ্ছিত নারী-মর্যাদার একটা দুর্জয় অভিমান আছে, তাহাই তাহাকে অন্তরের অন্তরে এমন নিঃসঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। সে বাহিরে একটুও আত্মপ্রকাশ করে না; বরং যাহাতে কেহ তাহার অন্তরের পরিচয় না পায়, — তজ্জন্য সে এমন ব্যবহার করে যে, সে যেন একটা বস্তির মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মবিস্মৃতির জন্য সে মেয়ের সাদরাহ্বানেও জীয়াইয়া রাখে। এই অন্তর-দগ্ধ, আত্ম-স্বল্প নারীকে লেখক যে কৌশলে, চকিত ইঙ্গিত ও ঘটনার অন্তর্ভেদী বিন্যাসে, আমাদের চিত্তগোচর করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাটকীয় দক্ষতার পূর্ণ পরিচয় আছে। এই নারীর ঐ জীবনের অভিশাপে, তাহার অন্তরস্থ আকাঙ্ক্ষার নিদারুণ বেদনা, তিনি যে ঘটনায় ও যে সূত্রে বাহ্যীকৃত করিয়াছেন, তাহাও শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পীর উপযুক্ত। ঐ নারী যে-প্রেমকে জন্ম হইতে চিরতরে নির্বাসিত করিয়াছিল, যে অমৃতের স্বাদ সে জীবনে কখনো পায় নাই, তাহাই যখন ঘৃণা ভিন্ন তাহার প্রাণকে বিপর্যস্ত করিয়াছে, তখনই, যে-মৃত্যুকে সে একদিন নির্ভয়ে তাহার দেহে বাসা বাঁধিতে দিয়াছিল, সেই মৃত্যু আর ধরা সহিল না, করাল মূর্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই অন্তিম কালে, এক দিকে প্রেম, অপর দিকে মৃত্যু — এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া হতভাগিনীর সেই আর্ত-চীৎকার — এবং মৃত্যু অপেক্ষা প্রেমই অসহ্য হইয়া উঠার যে অনিবার্য চেতনা — তাহাতে জীবনের বাস্তবই চিরন্তন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে; লেখকের দৃষ্টি যে বিরূপ অভ্রান্ত, ঐ কাহিনী-নাটকের ঐ সূত্রে তাহারই কঠিন পরীক্ষা হইয়া গেছে।

(পরের সংখ্যায় শেষ হইবে)

বঙ্গ-দর্শন

"অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া, মহাভুজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিস্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। আজি আমার ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

"কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর; আমি যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।"

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর হিংসাপ্রবৃত্তিজনিত বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। যিনি সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দুর্য্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না।

— বঙ্কিমচন্দ্র (কৃষ্ণচরিত্র)

বাংলাদেশ এখন ভারতের অঙ্গীভূত হইয়াছে, একদিন একটা অঙ্গমাত্র ছিল—এখন অঙ্গীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ কে-অঙ্গ হইয়া গেছে, পৃথক সত্তা নাই। পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার মহাকাব্যীয় বক্তৃতার স্রোতে ভারতকেও যেরূপ ভাসাইয়া দিয়েছেন, তাহাতে ভারতেরই পৃথক সত্তা আর থাকে কিনা, সন্দেহ। সম্প্রতি ঐরূপ পদনপর্য্যটনকালীন একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, আমরা জগৎটাকেই একরাষ্ট্রভুক্ত করিয়া তুলিব; দেশ, মহাদেশ বলিয়া পৃথক আর কিছুই থাকিবে না; দেশের একরূপ প্রাদেশিকতা, সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রথমে এশিয়ার একরাষ্ট্রীকরণ; সে কাজ ভারতই করিবে, কেন না, এমন উপযুক্ত দেশ এশিয়াতে তো আর নাই। দেখ, বিনাযুদ্ধে, অর্থাৎ বিনা বিনা রক্তপাতে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; অতএব ভারতের মত শক্তিমান কে? তারপর, এমন অপূর্ব্ব একরাষ্ট্র আর কোথায় স্থাপিত হইয়াছে? সেই ভারত এশিয়ার নেতৃত্ব করিবে, ইহাই ত' স্বতঃসিদ্ধ। এজন্য তাহার কোন ছোট-কাজ করা চলিবে না, কেবলই মহৎ হইতে হইবে — সে এশিয়ার নেতা

ও ধর্মগুরু। পাকিস্তানের ওঁতা সহ্য না করিলে তাহাদের সেই 'প্রেস্টিজ' নষ্ট হইবে; পাকিস্তান একটা পৃথক রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে- সে কথা ঐ সময়ে বুঝিতে হইবে। ভারত দুই ভাগ হইয়া যাইবার পরেই এ পক্ষের মহাপুরুষগণ — বিশেষ করিয়া নেহেরু মহাশয় — আশা করিয়াছিলেন — পাকিস্তান শীঘ্রই ভারতের সহিত মিলিত হইবে — সেই শুভদিন শীঘ্র আসিবে, এইরূপ পরিষ্কার আকাঙ্ক্ষা উহার উদ্ভাবনে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু জিন্নাসাহেব যেমন একটি বিরাট ধমক দিলেন, অমনই (সংবাদপত্রপাঠকের স্মরণ আছে) তাঁবা-তুলসী হাতে করিয়া, শপথ করিতে হইল যে, তিনি ঐরূপ ইচ্ছা ও' করেনই না, বরং যাহাতে পাকিস্তান কখনো ভারত-রাষ্ট্রে যুক্ত না হয়, অন্তরে সেই কামনাই পোষণ করিবেন। ইহাও করিয়াছিলেন ঐ 'প্রেস্টিজ'-রক্ষার জন্য, — যাহাদের এমন ছোট মন, তাহাদের সহিত কলহ করিলে এসিয়া কি বলিবে? আর কি তাহারা ভারতের নেতৃত্ব স্বীকার করিবে? এখনও যে তাহারা ভারতের মুখ চাহিয়া আছে — সেই অবাক্-কাণ্ডের কি হইবে?

•

কিন্তু সে কথায় আমাদের কি প্রয়োজন? প্রয়োজন কিছুই নাই, কেবল ঐ মহাভারতীয় বক্তৃতাগুলি সংবাদপত্রে যখন পড়ি, তখন একটু বে-চাল হইয়া পড়ি — তাবারস একেবারে মাথায় চড়িয়া যায়। বাঙালী আমরা তাবা বড়ই ভালবাসি, কিন্তু মহাভাষা কিছুতেই হজম করিতে পারি না, তাই একটু পাঁচালী করিয়া লইতে হয়। আরও কারণ এই যে, একদিকে ভারত-মহারাষ্ট্রের ঐ মহাভাষা-নিনাদ, প্রাদেশিকতা-বর্জনের মহামন্ত্র-পাঠ — অপরদিকে, সেই প্রাদেশিকতার দাবী ও নব-রাষ্ট্রে বাংলার প্রাণ যাচনার হইয়াছে। নেহেরু-মহাশয়েরই সহকর্মী ও সহীর্থ শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার খাস-বর্ধমানাটিতে সেই প্রাদেশিকতার অতি কুৎসিত ও বিশ্রী অভিধার উল্লেখ করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক — প্রায় অর্ধেক — বিহার গ্রাস করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, এবং তাহাতে সফল হইবারই সম্ভাবনা। বাংলা-সরকার চক্ষু বুজিয়া আছেন, কিছু করিবার বা বলিবার যো নাই — 'ভারত'-প্রভু চটিবেন; তাই ঘরে চোর ঢুকিয়াছে দেখিয়া, বুদ্ধিমান গৃহস্থের মত নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছেন। ও দিকে দিল্লীর দপ্তরে খাতা-পত্র এমনই বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে যে, ঐ অর্ধেক বাংলা বিহারের অঙ্গীভূত হইবার পূর্বে সে দপ্তরে হিসাব-নিকাশের সময় হইবে না। নেহেরু-মহাশয় যে এ সকলের কোন খবরই রাখেন না, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু এরূপ তুচ্ছ কথায় তিনি কান দেন না। প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ঐ বক্তৃতাদানের পরে তিনি নিশ্চয় তাবে-ভরে তাঁহার বর্ণ-সখাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

• •

হয়তো, আমাদেরই বুঝিবার ভুল; ভারতরাষ্ট্রের সকল অঙ্গই যে একাকীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বাংলাকে নিয়াই তাহা আরম্ভ হইয়াছে। আর সকল প্রদেশ এক রকম হইয়াই আছে, কিন্তু বাঙালী বড়ই বেয়াড়া — বড়ই কংগ্রেসপন্থী হউক, কিছুতেই বশ মানিবে না। এতদিন বিহারীদের সহিত বিহারে করিয়াও, এখন যে হিন্দী-তাবা—যাহা এসিয়ার রাষ্ট্রভাষা হইতে চলিয়াছে — সেই তাবাকে ঐ স্থানের বাঙালীরা কিছুতেই কণ্ঠস্থ করিবে না। ও তাহাকে বিষাদ নাই, ও জড় পোড়াতেই মারিয়া রাখা ভাল। কিন্তু শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের মত দূরদর্শী রাষ্ট্রবিদ্, তথা বিহার সর্বাধিকারীগণ বর্তমান বাংলার প্রায় অর্ধেক যে এমন করিয়া বিহারের কবলে টানিয়া লইতেছেন, ইহার গূঢ়তর কারণ থাকিতেও

পারে। যে কারণে আমরা এতদিন অনুষ্ঠান করিয়াছি তাহা খুলিয়া বলিতে আবশ্যক হয় না, কি জানি, শুনিলে ত্রিবর্ণ-বিলাসীরা হয়তো ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন। কাজ কি! একেবারে অন্তিমকালে না হইলেও, তাহার পরে ত' সকলে বুঝিতে পারিবে।

•

কিন্তু বাঙালী আমরা, অর্থাৎ যাহারা প্রাণে-শিবত্ব বর্জন করি নাই, এবং সজন না-করাটা জাতীয় একতানীতির বিরোধী বলিয়া মনে করি না — সেই আমরা যখন শ্রীযুক্ত নেহরু মহাশয়ের ঐ বক্তৃতা পাঠ করি, এবং দেখিতে পাই, বাঙালীও তাহাতে স্বাক্ষরকারক হইয়া উঠে, তখন ভাবি, ব্যাপারটাই কি একটা পাগলা-গারদ হইয়া উঠিল!

•

পাগল আমরাও হইয়াছি, নহিলে ভারত স্বাধীন হইয়াছে, ইহাও মানিব! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আর সকলেও (দৈবাৎ-পত্রের সম্পাদকগণও) তাহা স্বীকার করে, কিন্তু মুখে আনে না, মানিতে মানা আছে। দেখুন, স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধীনতার যত পুরাণো উপসর্গ ছিল, তাহার সবগুলিই — একটা বাদ-নয় — পাকা হইয়া হাড়ে ঢুকিয়া বসিয়াছে। শাসনপ্রণালীটাও ঠিক ব্রিটিশ আমোলের মতই ডিমোক্র্যাটিক; বরং বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হইয়াছে। ব্ল্যাকমার্কেটের যত মহাপুরুষ জন্মেই বাড়িয়া চলিয়াছে — সে কেমন অবাধে স্ফূর্তিসহকারে বাড়িতেছে, তাহা শহরের ত্রিবর্ণবিলাসীদের চোখে বরই খোঁচা দিতে থাকুক, তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না। তার কারণ, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ ত্রিবর্ণ-পতাকা পত্‌পত্‌ শব্দে উড়াইতে আছেন, এবং প্রক্রিয়া করিবার একচেটিয়া অধিকার যাঁহাদের — তাঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান, সুতরাং ধনদাস; তাঁহাদের কন্যা ত' ঐ ব্ল্যাকমার্কেট। ইহা যখন পর্যাপ্ত নহে, তখন তাহা দুর্মূল্য না হইলে, আর সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহারা ভক্ষণে ভোগ করিবেন কেমন করিয়া! কালোবাজারেই তাঁহাদের শাল-দালান, এতবড় সত্যের বাজার বসিলেও হয়। ইঁহারাই যখন সভা-সমিতিতে দাঁড়াইয়া, স্বাধীন ভারতের গুণগান করিয়া, 'common man'-কে স্বর্গ-লাভের আশ্বাস দেন, তখন চাল-কলা-কাপড়-কিরোসী আমরা তাঁহাদের মুখপানে ভাল করে করিয়া চাহিয়া থাকি; ভারত যে কোথায় স্বাধীন হইয়াছে, কেমন স্বাধীন হইয়াছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে একপ্রকার ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইয়া যাই। কিন্তু উপায় কি? ঐ ব্ল্যাকমার্কেটের বড় বড় ব্যাপারীরাই স্বাধীন ভারতের স্বর্ণ-রাজটিকে খাড়া রাখিয়াছে — ওখানে দিং নাড়িবার যো কি। সুতরাং স্বাধীন ভারতের মানুষগুলা বাঁচিতে পাক আর নাই পাক — বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়া, মুখ-ধানের খিস্তা-খণ্ড দেখিয়া, এবং রাজপুরুষদের সৌরবে সৌরবান্বিত হইয়া থাক হইবে। যদি না খাইয়া মরিতেও হয় — তথাপি ইহা দেখিয়াও সুখে মরিতে পারিবে যে, যে সকল বীর-যোদ্ধা তাহাদেরই জন্য, এই স্বাধীনতা জয় করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারাই লাট, বড়লাট, মিনিষ্টার এবং আরও কত ছোট-বড় রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের প্রাণের কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাই স্বাধীনতা; সকলেই প্রাণে-প্রাণে বুঝিতেছে; কিন্তু যাহাদের মুখ আছে তাহারা কিছুতেই বলিবে না; কেন বলিবে না, তাহাই বলিয়া ফেলিয়া আমরা আমাদের অপরাধ বাড়াইতেছি।

• • •

দিল্লীর রাজসভায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নেহরু তাঁহার গবর্নমেণ্টের আন্তর্জাতিক নীতির সমর্থনে যাহা বলিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিবার স্পর্ধা

আমাদের নাই — আমরা যেমন মূর্খ, তেমনই অধিবাসী। কিন্তু ডিমোক্রেসীতে পণ্ডিতেরও যেমন, মূর্খেরও তেমনই, কথা কহিবার অধিকার আছে, আমরা সেই মূর্খের দলের প্রতিনিধি। ঐ বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত মেহের, বাহিরের কাজিনদলের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন ও তাহাতে তাঁহাদের রাষ্ট্রিক আত্মরক্ষার অতি বিচক্ষণ নীতি নির্দ্দেশ করিয়া, পরে, তাঁহাদের অভ্যন্তরের শত্রুভয়-নিবারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভাবনার কারণ নাই — সাময়িক পরিস্থিতি করিবার জন্য অধিক হইবারও প্রয়োজন নাই। কারণ — কংগ্রেস যখন মহাযুদ্ধে এতবড় ব্রিটিশ জাতিকে পরাজিত করিয়াছে তখন সে আর কাহাকে ভয় করে? এ কথা শুনিয়া জিন্নাসাহেব যে কিরূপ চিন্তিত হইয়া পড়িবেন তাহা করিয়া আমরা আনন্দে রোমাঞ্চিত হইতেছি। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ! অর্থাৎ জেলে যাওয়া এবং জেলে বসিয়া বই-লেখা! তাহাতেই ব্রিটিশ-জাতি কাবু হইয়াছে! হিটলার কিছুই করে নাই? নেতাজীর দ্বারা তারস্বরে ঘোষণাতে ব্রিটিশের বিরোধের সমীও কিছু নয়? বিহারিদের গণ-বিদ্রোহ — যারা সাক্ষাৎ কংগ্রেস-পরিচালিত, অথবা অহিংসামূলক ছিল না, একরূপ স্বতঃস্ফূর্ত-প্রণোদিত (spontaneous) বলিলেই হয় — তাহাও কিছু নয়? আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। কিন্তু এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেও কি সেই জেলে-যাওয়া ও সত্যাগ্রহ-সাপ্তাহেই শত্রুকে পরাস্ত করা যাইবে? সেবার কংগ্রেস যদিও যুদ্ধ করিয়া থাকে, ব্রিটিশ তাহার সহিত যুদ্ধ করে নাই; সে যুদ্ধ করিয়াছিল, হিটলারের সঙ্গে — নেতাজীর সঙ্গেও করিয়াছিল আর জাপানের সেই আগষ্ট-বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল। এইবার সে যুদ্ধই করিবে — মেঘের আড়ালে থাকিয়া। শুধুই ব্রিটিশ নয়, তাহার আড়ালে একটু দূরে, আমেরিকাও আছে; শুধুই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যাহাতে শক্ত করিবার জন্য নয়, সমগ্র ভারত মহাদেশের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার জন্যও বটে। সে যুদ্ধের যতকিছু আয়োজন সে সম্পূর্ণ করিয়াছে। এখন সাক্ষাৎ লাভির ডোরের জন্যই সে এত নীচে তাহার দর-কিছু নামাইয়া দিয়াছে: শেষ মোহা-পন্টনও দমাইল, লর্ড-মাউন্টব্যাটেনও পাঠাইলেন। এইবার চাজিনের পালা। বাহ্যতঃ চাজিনকে বাহিরে আনয়ন হইয়াছে। ওদিকে বিপুল অস্ত্র-সম্ভার: চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত, হায়দ্রাবাদ হইতে জুনাগড় পর্যন্ত সমরসজ্জা; ও সর্ব্বত্র — কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও প্রচ্ছন্নে — যুদ্ধ-কারখানা চলিতেছে। আক্রমণের ছোট-খাটো নোটিশ সকল দীমান্তেই পাওয়া যাইতেছে। সৈন্যচালনা করিবে ব্রিটিশ সেনা-নায়ক; অর্থের অভাব হইবে না; খুটের অপরিমিত অর্থও যেমন আছে, তেমনই বড় বড় মহাজনও পিছনে আছে। তাছাড়া, সৈন্য-সংগ্রহের জন্য অর্থেও আবশ্যক হয় না, — 'plunder and paradise'-এর লোভে সেই সৈন্য যেমন যুদ্ধ করিবে — তেমন যুদ্ধ বাহিনী-করা সৈন্যও করিতে পারিবে না। ঐ চাজিন কোম্পানী অনেক পূর্ব্ব হইতে ভারতের বাহিরে বসিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রাখিয়াছে —

"The British would soon be definitely getting out of India. What would happen to India then was anybody's guess; but judging by current indications there would probably be utter chaos and civil war."

ইংরেজী সংবাদ পত্র হইতেই একটু উদ্ধৃত করিলাম — এমন প্রমাণের ত' আর কিছু নাই। সব ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করিয়া তুলিতে না পারিলে সেই Cabinet Mission Plan-এর, এবং ভঙ্গ করিয়া ভারতকে স্বাধীনতা দান

করায় — আদৌ উৎসুক দিল হইবে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাহাকে জন্ম প্রকাশ্যে দায়ী হইবে না বটে, কিন্তু তাহা বিবাদের কোন চেষ্টাই করিবে না। শ্রীযুক্ত নেহরু যেন এ সকলকে গ্রাহ্য মধ্যে করেন না; কাশ্মীরে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা যে কত বড় যুদ্ধ — সেই যুদ্ধনীতিও যে কিরূপ অমার্থ, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার কবি-প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে — তখন লিখা বড় বড় মহাকাব্যে নির্মিত হয়। কিন্তু লিখা-লাহেব তাঁহার মত হাসপাতেই-অভিজ্ঞ করেন না, তাঁহার রাজনীতি আর যাহাই হোক — মহাকাব্যের heroic নয়।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বহির্রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রনীতি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, অন্তর্রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রিক অবস্থা তিনি ভাবনার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। যাহারা প্রত্যক্ষে যুদ্ধোদ্যম, এমন কি, প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে, তাহাদের সঙ্গেই কত রকমের চুক্তি ও বোঝাপড়া এখনও চলিতেছে। যেন সে সকল কিছুই নয় — হাতী কি মশার উপরে রাগ করিতে পারে? পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না। করাটাও পাপ, কংগ্রেসের নীতি-বিরুদ্ধ; তাহাতে হিংসার ভাব আসিয়া পড়ে। পাকিস্তান ত' যুদ্ধঘোষণা করে নাই, তবে যুদ্ধের কথা আসে কেমন করিয়া? পাকিস্তান যুদ্ধঘোষণা করে নাই, করিবে না, করিবার প্রয়োজনও তাহার নাই। কাশ্মীরে সে যুদ্ধঘোষণা না করিয়াই কার্য প্রায় হাসিল করিয়াছে। তারপর পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম-পাঞ্জাব, প্রভৃতি স্থানে — সিন্ধুতেও যেমন, সীমান্ত স্থানগুলিতেই তেমনই, — প্রচার যাহা করিতেছে, তাহাতে যুদ্ধঘোষণার প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু-ধন, মান এবং দেবে উৎসাদন বিনাযুদ্ধেই সম্পন্ন হইতেছে ও হইবে। তা' হউক, ঐ সব দেশ ত' ভারত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না। অতএব, ওসবের মুক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে এই ভাগ্যেরই অধিবাসী, এবং তাহাদিগকে রক্ষা করা, শুধুই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নয়, মানুষের ধর্ম, এবং রাষ্ট্রমাত্রেরই কর্তব্য; এত বড় অন্যায় যে করে, এবং যে সহে উভয়েই সমান দায়ী। কোন অহিংসা নীতি বা আন্তর্জাতিক ধর্মনীতির দোহাই দিয়া এ দায়িত্ব এড়ান করা যায় না, বিশেষত, ঐ প্রকার এড়ানো মানিয়া লওয়ার পরে; কারণ, দেশটা এখনও একই দেশ, মানুষগুলাও পর নহে — তাহারাও এই ভারতরাষ্ট্রের 'nationals'। কিন্তু ভারত-গভর্নমেন্টের কিছুই করিবার যো নাই, করিতে গেলেই যুদ্ধ করিতে হয়, সে কথা মনে আনিলেও পাপ হয়। তাই অতিশয় অল্প ও অর্থহীন ভাবে 'প্রোটেস্ট' করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নেহরু কিছুতেই জল পান না, যাহারা জল পায় তাহারা নিতান্তই ভীরু। জল পাইবার কোন কারণ যে নাই—পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তাহা জানে; পশ্চিম পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অধিবাসীরাও তাহা জানে; আবার, এখন হায়দ্রাবাদের পৌনে-দুইকোটী হিন্দুও তাহা জানিতেছে; পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও সম্ভবতঃ তাহা শীঘ্র জানিবে। কারণ না থাকিলেও হায়দ্রাবাদের হিন্দু-প্রবাসন নাকি অনর্থক চীৎকার করিতেছে। —

"These poor peasants in their present pitiable plight invariably accost you and ask Where is the Indian Union? What is the State Congress doing? How long should the peasants bear? What is all this for? What use would be when nothing would be left behind and everything would be over?"

(Hindusthan Standard, March 18)

প্রায় সর্বত্রই এই আর্তনাদ। 'Every thing

would be over.' — 'সবই যে যাইবে!' না, সব যাইবে না, কী থাকিবে — "নিবনেৎপাদুবাতি হ:" ; পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষে ভারতের শ্রেষ্ঠটীর অমৃত থাকিবে।

• • •

পূর্ব-পাকিস্তানে যে ভয়াবহ অত্যাচার দেখা দিয়াছে তাহাতে মনে হয়, এতদিনে আমাদের বাঙালী মুসলিম ভাইবোনদের চক্ষু ইষৎ খুলিয়াছে — ইষৎ বলিলাম এই জন্য যে, এখনও তাঁহারা 'পাকিস্তানে জিন্দাবাদ' ধ্বনি ছাড়িতে রাজী নহেন, বরং তাঁহাদের যাহা কিছু দাবী-দাওয়াকে ভারতদ্রোহ করিবার জন্য উহারই উপরে বেশি করিয়া জোর দিতেছেন ; না দিলে, এতদিন যে আলোর পশ্চাতে ছুটিয়া যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানটুকু করিতে হয়, তাহাতে আড়াতিনানে যা লাগে। আমরা প্রথম সংখ্যায় এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম সে যে কত সত্য, এখনও তাহা বুঝিবার সময় আসে নাই। ঐ ভাষা-নাশ আর জাতি-নাশ একই কথা। তাঁহারা ভাবিতেছেন, পাকিস্তানও ঠিক এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যও ঠিক। কিন্তু পাকিস্তান ও জাতির ভাষাটীয়তা বা স্বাতন্ত্র্য যে নয়, এজন্যই ধর্মের নামে তাহারের বিভিন্ন জাতির মুসলমানকে, একটা বিশেষ জাতির অধীনস্থ করিয়া নিরুপদ্রব প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চায় ; তুরস্ক কিম্বা, আরব, ইরাণের মত জাতি-স্বাতন্ত্র্যও যেমন মানে না, তেমনই ভাষার স্বাতন্ত্র্যও মানে না। ভাষার স্বাতন্ত্র্য মানিলে, জাতিসকলের স্বাধীন-অধিকার মানিতে হয়, তাহাতে সেই সর্বাত্মবাদী মুসলমানী-প্রভুত্ব অচল হইয়া পড়ে। আমলে কংগ্রেসও যেমন হিন্দীভাষার দ্বারা সমগ্র ভারতের জনসাধারণকে 'উত্তর-ভারতীয় একটা জাতির পদানত করিতে চায়, তেমনই, লীগও ঐ উর্দু ভাষাকে উত্তরাঞ্চলের মুসলমানসমূহের প্রভুত্ব-স্থাপনের অভিপ্রেত অথচ অব্যর্থ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে। কংগ্রেস লীগ অপেক্ষা বুদ্ধিকৌশলী ; সে ইংরাজের রাজনীতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছে, তাই কাজটা অতি সন্তর্পণে গোপনভাবে করিবার পক্ষপাতী ; যেন সে ঐ হিন্দীকে ছলের মত সর্বত্র প্রবেশ করাইতেছে, ক্রমে নানা প্রকারে উহাকে এমনই প্রাধান্য দিবে, যে অপর ভাষাগুলি তাহার আওতায় শুকাইয়া যাইবে। ইহার দুইটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, — বিহারের বাংলা ভেলাগুলিতে বাংলাভাষা উচ্ছেদ করিবার জন্য সাম্প্রতিক-কালী প্রাদেশিকতাবাদ ঠিক ঐরূপ অত্যাচার শুরু করাইয়াছেন ; দ্বিতীয়, দিল্লীর মসনদে বসিয়া যাঁহারা ভারত-ভাগ্য বিধাতা হইয়াছেন তাঁহারা এখনই হিন্দী-সাহিত্যের প্রচার ও পুষ্টিসাধনকল্পে মুক্ত হস্তে অর্থদান করিতে উচ্চত হইয়াছেন ; কোন প্রাদেশিক ভাষা বা সাহিত্য সে সৌভাগ্য লাভ করিবে না। ওখানে ধর্মের নামে, এখানে ভূয়া-জাতীয়তার নামে, গোটাকতক জাতিকে জাতি মারিবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতীয় জাত নয় নিয়াছে, কিন্তু ঐ ভাষা ও সাহিত্যের কারণে সে এখনও সর্বভারতের ব্রাহ্মণ-গুরু ; ইহাই শত্রু-ভক্তের অনুষ্ঠ। উর্দুর যে আভিজাত্য আছে, হিন্দীর তাহাও নাই। আবার, বাংলাভাষা শুধুই সাহিত্য-হিসাবে নয় — আধুনিক হিন্দু-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আধারূপেও যেমন, তেমনই, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে একটা উৎকৃষ্ট জাতীয়তা-বর্ধের বাহক হিসাবেও, সর্বভারতের অমূল্য সম্পদ। তথাপি এই বাংলার প্রতি অন্য-জাতীয়তাবাদীদের এমন অভক্তি কেন? আসল কথা — ধর্মও নয়, জাতীয়তাও নয় — প্রভুত্বলিপ্সা।

• •

কিন্তু বাঙালী মুসলমানের সঙ্কট এখনই দারুণ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বপাকিস্তান ইতিমধ্যেই পশ্চিম-পাকিস্তানের একটি 'কলোনি'তে পরিণত হইয়াছে। বাংলার ঐ শুজলা সুফলা অংশটি শাসন ও শোষণ করিবার জন্য, উত্তর-ভারতের বাবসাহেন্দীগণ, তাঁহাদের

মোগল-পুরুষদের অধিকার পুনঃস্থাপিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইতিহাস পড়িলেই জানা যাইবে, ঐ মোগলের বিরুদ্ধে একদিন পাঠান ও বাঙালী একসঙ্গে লড়িয়াছিল, বাংলার স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সেদিন হিন্দু ও মুসলমান যাহা করিয়াছিল তাহারই ফলে বাংলার জাতি-কুল রক্ষা পাইয়াছিল। আজ যাহারা কেবল জমার ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহারা কি দেখিতে পাইতেছে না — সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিমা মুসলমানের জমীদারীতে পরিণত হইয়াছে? শাসনবিভাগে তাহারাই কর্তৃত্ব করিতেছে, সৈন্য ও পুলিশ তাহাদেরই জাতির লোক? সেই পুলিশ ও সেই সৈন্য ঐ পশ্চিমা পুলিশ ও পশ্চিমা সৈন্যের কাছারীতে কাজ করিবে মাত্র — যেমন তাহারা পুলিশ ও তাহারা সৈন্য গোরা সার্জেন্ট ও গোরা-সৈন্যের পদসেবা করিত। বাঙালী মুসলমানের জন্য অধিকার যেখানেই তাহা তুলিবে সেইখানেই ঐ পাঠান ও পাঞ্জাবী পুলিশ তাহাকে মারিয়া সাবেস্তা করিয়া দিবে। শুধুই বড় বড় চাকরী নয়, ব্যবসায় বাণিজ্যও উহারাই যখন করিয়া থাকিবে; দেশের সন্তান যাহারা তাহারা উহাদের জন্য 'কাঠ কাটিবে ও জল তুলিবে', এবং মাসে পাঁচশ-তিরিশ ছাড়া আর কোন অর্থ স্বাধীনভাবে করিতে পারিবে না। এখনও কিছুদিন, নির্জলা অশিক্ষিত মুসলমানদলকে ভজা করিয়া হিন্দু-কুল তাহা নির্বিঘ্নে চলিবে; সে দুচারদিন যারা গাছটা কাটিতে হইবে, তাহার বাট তৈয়ারী হইবে ঐ গাছেরই একটা ডাল কাটিয়া।

• • •

তাই বলিতেছি, বাঙালী মুসলমান ভাইসাবগণ, এইবার তোমাদেরও সুরু হইল, আমরা প্রায় সারা করিয়াছি। যে পাকিস্তান তোমরা চাহিয়াছিলে, এ সেই পাকিস্তান নয় — হইতেও পারে না। তোমাদের সেই আকাঙ্ক্ষার কারণ বুদ্ধি; শিক্ষার দোষে ও অবস্থার ফেরে, তোমরা যাহা চাহিয়াছিলে তাহা স্বাভাবিক হইলেও, সোজা হইতে তাহাতে ফাঁকি ছিল, মিথ্যা ছিল। একটু ধীরবুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে; আমরা বলিলে তাহা বলা হইবে না, তোমরা যেদিন নিজেরাই তাহা বুঝিবে, সেইদিন ঐ ফাঁকি ও মিথ্যার কথাটা বলা হইয়া উঠিবে। কোন বড় বস্তুকে ফাঁকি দিয়া লাভ করা যায় না; বিনা ত্যাগ ও তপস্যায় মুক্তিলাভ হয় না। ঐ পাকিস্তানের জন্য তোমরা কোন ত্যাগস্বীকারই কর নাই, বরং ইংরেজের আমলে ও প্রসাদে যাহা কিছু করিয়াছ তাহাতে লাভ-লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছুই হয় নাই। হিন্দুসমাজও তখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে নাই — কি উপায়ে ঐ পাকিস্তান-লাভ হইয়াছে, তাহা জগতের সকলেই জানে। তথাপি, তোমরা যদি এই বলিয়া গর্ব প্রকাশ কর যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত লড়িয়া তোমরা দলে দলে শহীদ হইয়াছিলে, তোমরা বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ, অতএব ঐ পাকিস্তান তোমাদের অর্জিত ও বীরত্ব-বিজিত রাজ্য, তবে তাহার মত মিথ্যা যে আর কিছুই নাই। ব্রিটিশের সাহায্যে অসহায়, দুর্বল ও অশিক্ষিত হিন্দু-সমাজকে অনায়াসে পর্যুদস্ত করা বীর-কীর্তি নহে, তাহাকে যুদ্ধও বলে না। এ সকল কথা বড়ই কষ্টপ্রতিকর, তোমাদের ইহা ভাল লাগিবে না; কিন্তু ইহা সত্য। এই সত্যকে আজ যদি স্বীকার করিতে পারো, যদি মুক্তপ্রাণে অনুষ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারো যে, হিন্দু তোমাদের কোন অনিষ্ট করে নাই, তোমার 'বর্গেও নয়, তোমার স্বর্গেও নয় — কিছুতেই হস্তক্ষেপ করে নাই, এবং করিবে না, তবে ইহাও স্বীকার করিবে — এতদিন যে লক্ষ্যে বঞ্চিত ছিলে, তাহা তোমাদেরই শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে; যখনই সেই জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলে, তখনই তাহা শুভবুদ্ধি দান করিয়া, আত্মোন্নতির প্রয়াস না করিয়া — হিন্দু-বিদ্বেষের কুৎসিত

আকার ধারণ করিল; এবং মৈত্রী ও উপকার পরিবর্তে, অতি সহজ উপায়ে রাতারাতি ধ্বংসের, নাশ করিবার উপায়টা তোমাদিগকে পাইয়া বসিল। হিন্দু যাহা দুইশত বৎসরে করিয়াছে, তোমরা তাহাই, জ্ঞানের পথে, ধর্মের পথে, পঞ্চাশ বৎসরে করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিলে; যদি সেই পথ অবলম্বন করিতে, তবে হিন্দুর সমকক্ষ — এমন কি কোন কোন বিষয়ে বড় হইয়া — দুই ভাই, হিন্দু ও মুসলমানে মিলিয়া, মাতৃভূমির স্বাস্থ্য রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিতে, বাঙালীজাতি ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত হইত; কংগ্রেস বা লীগ কেহই বাংলায় প্রভুত্ব করিতে পারিত না। এসব কথা কি এখনও ভাবিয়া দেখিতে পারো? এখনও পূর্ব জাগরণ হয় নাই, এখনও সেই আত্মঘাতী হিন্দু-বিদ্বেষ কিছুমাত্র দূর হয় নাই। যতদিন তাহা না হইবে ততদিন ঐ পাকিস্তান-স্বর্গে বাস করিতে হইবে; তুষের আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে; আর, ঐ পাকিস্তানী প্রভুদের 'জিন্দাবাদ' করিয়া, তাহাদেরই পদসেবা করিয়া, একমুঠা উচ্ছিষ্টের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইবে। ধর্ম ত' বাঁচিল, হিন্দু নির্মূল হইতে চলিয়াছে, তবে আর সুখের বাকি কি?

* * *

গত সংখ্যায় আমরা পূর্বঙ্গ হইতে উৎখাত, নিরন্ন হিন্দুদিগের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়দানের ব্যাপারে বাঙালী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম; এখনও বলিয়াছিলাম যে, এ বিষয়ে অতি উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে সমস্যা ক্রমেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে যে সকল সংবাদ ও বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে ঐ সঙ্কটকে আর চাপা দেওয়া যাইতেছে না। নবদ্বীপে যাহা হইতেছে তাহা সংবাদপত্রে অনেকে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহার ভয়ঙ্কর ভাবটার এখনও সকলে সম্যক উপলব্ধি করেন নাই। ঐরূপ অবস্থায়, সর্বস্ব হারাইয়া, বহু পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া, যাহারা প্রায় একবস্ত্রে পুরুষানুক্রমে হাত ধরিয়া, স্বজাতি ও স্বধর্মী সমাজের আশ্রয়প্রার্থী হইতেছে, তাহাদের প্রতি যে ব্যবহারের কথা শোনা যাইতেছে, তাহা যেমন লজ্জাকর, তেমনই আশঙ্কাজনক। একে দুর্ভিক্ষ ও ব্ল্যাকমার্কেটের দারুণ দুর্যোগ, সেই দুর্যোগে অন্নহীন ক্ষুধার্তের সংখ্যা হঠাৎ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায়, খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িবারই কথা; তার উপর, রাজধানী ও রাজদ্বীপের — ক্ষমতাধিকারী ও ক্ষুধিতদের মধ্যে, যে সম্পর্ক অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও এক পক্ষের ব্যবহার আদৌ মঙ্গলকর নহে। দোষ কোন্ পক্ষের — কাহার অধিক, সে বিচারের সময় এ নহে। অবস্থাটা অবশ্যম্ভাবিক; কেবল ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা ঐরূপ আশ্রয়প্রার্থী, তাহারা পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীর সুখে ঈর্ষান্বিত হইয়া, সেই সুখের ভাগ লইতে আসে নাই। ভগবান যেন এমন অবস্থা না হয়। এখন যদি তাহাদের ঐ অবস্থার কোন প্রতিকার না হয়, পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীরা — যাহারা প্রাদেশিকতা বর্জন করিয়া উদার ভারতপন্থী হইয়াছেন, — বাঙালী জাতিকেও বাঁচাইবার প্রয়োজন যাহারা স্বীকার করেন না, যাহারা রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির পাকোৎক পান করিয়া, ভারত-প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ, তথা ভারত-লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিতে কৃতী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি এই মহাসঙ্কটকে অগ্রাহ্য করেন, তবে ঐ ভারত-লক্ষ্মী আর বেশিদিন নিশ্চিন্ত থাকিবে না, ইহা আমরা বলিয়া রাখিতেছি। এ কাজ মুখ্যত গবর্নমেণ্টেরই কাজ বটে, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট সচেষ্ট নহেন; তাহার ফলে, নৈরাশ্য একটা সমাজ-বিপ্লব ঘটিতে পারে। এতদিন হিন্দু-মুসলমানে যাহা ঘটিতেছিল অতঃপর

বিশ্বের বিস্ময়ের সামগ্রী হইবে। পশ্চিম বঙ্গের — বিশেষ করিয়া, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের — মাসিকী বঙ্গ-সাহিত্য হইয়াছে: বড় হইতে ছোট — ছই-আনিয়া হইতে ডিমাই সাইজ — সকলেই যেমন সচিত্র, সচিত্রীকৃত ও বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সেই শুভসম্ভাবনা অধিক হইতে বিলম্ব নাই; নিশ্চয়ই যেমন, আর সকলেরও তেমনই শুভীকৃত হইবে। আমরা সমাজকে ও সরকারকে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে বলি।

[৭ই চৈত্র, ১৩৪৩]

চিত্র-পরিচয়

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৮৯ —)

১৮৮৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ, নদীয়া জেলার মাজিদপুর গ্রামে জন্ম হয়। সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। কবি বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভক্ত। করুণানিধানের কবিতার ভাষার সাবলা, ছন্দচাতুর্যের অসাধারণ নৈপুণ্য, এবং ছন্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপ ও রস চিত্রিত করিবার শক্তি — এই তিনটি গুণ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। ভাবের দিক দিয়া তিনি যেমন নিছক সৌন্দর্য-প্রীতির কবি, তেমনই ছন্দের অনুযায়ী ভাষা ও ভাবের অনুযায়ী শব্দ-সঙ্গীত ছন্দোজ্ঞানেও তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহার ললিত-মধুর ও উদাত্ত-গম্ভীর — দুই সুরেরই সাধনা করিয়াছেন। তথাপি, করুণানিধানে বাংলা গীতিকাব্যে এবং একটি নূতন ধরনের প্রকৃতিপ্রেম যুক্ত করিয়াছেন বলাই তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা ও কবিত্বের প্রধান নির্দেশ। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম — 'প্রবাসী', 'ধরাকুঞ্জ', 'আত্মিকা', 'ধান-দূর্বা'।

যাদুকরীর একমাত্র কবি — করুণানিধান। যাদুকর বলিয়া কোন ছল নাই। এই কবি যাদুকেও একরূপ ছলে পরিণত করিয়াছেন। সকল প্রকার যাদুকরীর সম্ভোগেই একদিন ক্লান্তি আসে। কাজেই পরিচয় সূত্রে আমরা যে যাদুকরী লাভ করি — তাহাতে ক্লান্তি আসিলেই আমাদের অবসন্ন মন কিরূপ যাদুকরী উপভোগে কবিতা অমল আনন্দ পাইতে চায়। এই যাদুকরী আমরা কাব্যেও পাইতে পারি; — এই যাদুকরী প্রকাশেরই 'ছল' খুঁজিয়াছে করুণানিধানে।

— কালিদাস রায় (সাহিত্য-প্রসঙ্গ)

---

৫৪ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, "প্রবাসী প্রেস" লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে তখন তোর কোন ব্যথা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না, — যদি তোর ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি দিই। কিন্তু তোমাকেও এক খানি খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে যে, "আর ইহাতে সুখ নাই" বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না; ব্যাধি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, অনুতাপ, পরের অপমান প্রভৃতি কোনরূপ ভয় আসিয়া ইহা কখনও ছাড়িয়া দিবে কেমন রাজি আছ?

শিষ্য। তোমাই মহাশয়ের। আমি নই, কিন্তু অনেক লোকই যে এইরূপ?

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। ছাত্রদিগের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ঢের বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই ঢের এ প্রবল। অসংযমের ফোঁকে, জলে ঝাঁপান আসিয়াছে, — তার নিবারণের জন্য তারা জল খুঁড়িয়া দেওয়া; জানে না যে অগ্নিদগ্ধের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে, অনেক লোক আপনে অনুকূল ইন্দ্রিয়বিশেষের চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। অনেক ছাত্রও ত ছাড়ে না — ছাড়িতে চায় না।

ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পালন যাহা নহে — এ একটি পীড়া। ছাড়ে না তাহার কারণ এই। "ছাড়িতে চায় না" — একথা সত্য নয়। একথা সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। ঔপন্যাসিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকট একজন ঔপন্যাসিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔপন্যাসিকতার অনুচিত অঙ্গপুষ্টির ও পরিতৃপ্তির জন্য এরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি যেন জানিতেন, যে ঘৃণাচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোক সকলের অপেক্ষা ঢেঁটা করিতেন, কিন্তু কোন মতেই দুষ্কার্য্য ছুটিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ-প্রয়োগ চাই?

শিষ্য। এমন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। কপিল যে সুখ তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের অধিকাংশ যদি একবারে একটি গোলাপফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর সকলকেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় কপিল সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সবাই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ কপিল অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি?

গুরু। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে — (১) স্থায়ী, (২) কপিল। ইহার মধ্যে —

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন চিকিৎসক ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি কপিল?

গুরু। প্রথমতঃ, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্তমাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ

যদের কতজন? কিন্তু আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও বাধিত করিতে চাহি না। কেন না, অনেক লোক পরকাল মানে না — মুখে মানে ও হৃদয়ের ভিতর মানে না, মনে করে, ছেলেদের দুষ্টুমি ভয়ের মন্ত্র বাদুড়কে শান্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা বলে। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে বর্তমান ভিত্তি, তাহা এইজন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে বর্তমান বলবান্ হয় না। "আজিকার দিনে" বলিতেছি, কেন না, এক সময়ে এদেশে যে ধর্ম বড় বলবান্ ছিল বটে। এক সময়ে ইউরোপেও বড় বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দী। সেই ইজমাগ্রস্ত-পুস্তিলড-পাদিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্‌লোডার - টর্পীডো প্রভৃতিতে সোজিতা রাক্ষসী, — এক হাতে শিরীষ ফল চালাইতেছে, আর এক হাতে কাঁটা ঘষিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা কাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখী, এদেশে আসিয়াও ভালামুষ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্মব্যাধির মত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির গঠিতে পারিব না, আর, আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্মমূলক। এখন, ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখদুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ব্বাবলম্বিত, এবং পরকাল সর্ব্বাবলম্বিত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু "স্থায়ী সুখ কি?" যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয়কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, ইহকাল-পরকালব্যাপী যে সুখ তাহাই সুখ — এতদ্ভিন্ন সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। তুমি কি জন্মান্তর মান?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে; — প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী বৃত্তি-নিচয়জনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা তাহা থাকিবে, অর্থাৎ জীবের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে; সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালেও থাকিবে। পরকালে এইরূপ সুখের অধিকারকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের অধিকারকে নরক বলা যাইতে পারে।

সুখের উপায় যদি ধর্ম হইল, আর

ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখের সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে দুঃখ, পরকালেও সেই দুঃখ। পরকাল নাই মানে, কেবল ইহকালের নাম করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক হওয়া যায়। যথা মিল্ল, দুঃখ ইহকালেও দুঃখদ, পরকালেও দুঃখদ। তুমি পরকাল মান আর না মান — ধর্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

আপনি নিজে পরকাল মানেন — কিন্তু প্রমাণ অভাবে বলিয়া মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন?

যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে প্রমাণগুলি বিচারের স্থল। প্রমাণগুলিতে এমন কোন দোষ নাই যে সে সকল বিচারের অযোগ্য হয়। না হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কুসংস্কারবশতঃ বিচার নিষেধ। বিচারের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই এইজন্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্মাত্মা হও। ইহাই যথেষ্ট। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না মানাতে বড় আসিয়া যায় না। যাহারা পরকাল মানে না, তাহারা এখন সেই বাক্যকে ইহকালসূচক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিষ্য। এখনে আমরা মূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে তাহাই স্থায়ী সুখ। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর বলিয়া ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। একটী না একটী আকারে অবশ্য অবশ্য তাহাকে সে সুখের অন্ত আসিয়া যাইবে। (১) অতিভোজনজনিত গ্লানি বা বিরাগ — অতিতৃপ্তি; কিম্বা (২) ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত অবশ্যম্ভাবী রোগ বা অসামর্থ্য; অথবা (৩) ধরোবৃদ্ধি।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উপরেই বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী?

গুরু। তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, শারীরিক বৃত্তির কথা হইতেছে। পরমায়ুকালে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। নিম্নস্থ বৃত্তির ন্যায়, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বর্দ্ধিত থাকে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক

লোক মরণ-কালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া দিয়াছেন। আফ্রিকান চুয়াকালের মুসলমান-ধর্মাবলম্বী যুবাকে জাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, খ্রীষ্টিয়ান (Christian) কেমন সুখে মরে।" যদি জন্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং এ ধারণাটিও থাকিবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। পরোপকার কর্মবাদের। আমার কর্মেন্দ্রিয়গুলি, আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া যেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম করিব? কোথাও আমরা দেখি নাই যে কর্মেন্দ্রিয়-মুক্ত যে, সে কর্ম করিতেছে।

গুরু। পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র, অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা।

গুরু। আন্দাজি কথা ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এসকল আন্দাজি কথার একটু মূল আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি Law of Continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমাবিচ্ছিন্নতা সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। আমি কিছুই পড়িতে বসি নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, মনের যে মূল ধর্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। ইহলোককে আমি যেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে বৃত্তিগুলি মার্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত সৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে বৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে অপরিণতরূপে পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অনুশীলিত বৃত্তিগুলি পূরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। জন্মান্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরূপ কর্মবাদ মানা যায়।

বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব যে, পরকাল যদি কিছু কথা কহিবেন, কোন কোন সুখকে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে অসিদ্ধ বলা যাইতে পারে।

পূর্বোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—ইহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ হবে, (১) যাহা স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় কর্ম, তখন এই অর্থেই সুখশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারেই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুত দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুতুল্যদিগের অভ্যাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। তেমনি চরমপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা—নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, "এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ণয় করিব? কোন্ কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি

আর যেগুলির অনুশীলনে অধিক সুখ তাহা বাছিয়া লেওয়া অকর্তব্য ; কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। অতএব সুখই সৌ কষ্টিপাথর।

প্রভো, তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি ? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অজ্ঞেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই সৃষ্টিতেও সুখ অল্পপরিমাণে তোমার প্রমাণ, ইহাতে তুমি আবোধ্য হও। ...

প্রভো ! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ মোহ কল্পিত করাইল কে ? তুমি, না আমি ? আমি যে অহং, অহংকার, সেও তোমার, না আমার ? আমার এ দুর্দ্দান্তির যোগান যোগাইল কে, তুমি না আমি ? যাহা তুমি লাঞ্ছনার তাহা তোমাকেই দিব। আজি এ ব্যবসা আর রাখিব না ?

সুখ ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম — পাইলাম না। সুখ নাই — তবে আমার কাজ কি ? যে দেশে ফরি নাই, সে দেশে ইচ্ছন আহরণ করিয়া কি হইবে ? প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।

— বঙ্কিমচন্দ্র (যন্ত্রস্থ)

বৈরাগীর বাংলা

শ্রীকালিদাস রায়

সংসারে কি মন লাগে এই বাংলা দেশে ?
যদ্দাড়া তাক কেবল শুনি সর্ব্বনেশে।
'অকরুণা যাদুর খেলা' —
শুনিয়ে যে যায় চুলুচুলো,
একতারাতে পদ্ম-দিঘীর মিটিয়ে এসে ঃ

বাজিয়ে কেন্দ্রি খেয়ার পথের ধারে,
চুলচুলি কয়, সবই ফাঁকি এ সংসারে।
দাঁকের খেয়াঘাটটি ফেলে
সরল এ মন যায় যে হেঁকে,
জলনদীর পাথারে যে খেয়ার ভেসে ঃ

হাটে গিয়ে ডাকি, ভবের চুলের হাটে
কী বেসাতি করতে এসে জীবন কাটে !
কিরি করে উঠলো রে,
মন লাগেনা নিজের কাজে,
সেদিন অবেলা ছেলে-জলে আর না যেসে।

চোখ-ঢাকা ঐ বলদ দেখি ঘুরছে বাড়ী, —
তার সাথে মোর তফাৎ কিছু বলতে নারি।
পথে বাউল গান গেয়ে যায় —
'মনের মানুষ পাব কোথায় ?'
গাঁয়ের গাড়ির ঘরবাজারে যায় যে ঘেঁষে ঃ

উদাস সুরে রাখাল বাঁশী বাজায় মাঠে,
শেষের দিনের গানে চাষী ফসল কাটে।
মাঝি-বাড়ী গান গেয়ে যায়,
পরপারের ডাক দিয়ে যায়,
মন উধাও বলাকা যায় নিরুদ্দেশে ঃ

শিবের মাথট

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

[illegible]
[illegible]
যে যোজনব্যাপ্ত পরমের সাথ ঃ
এলো অধীরতা — শুরু তাণ্ডবনৃত্য,
মহামহিমার সেই মন্থন
আবার পড়িবে বাধা।

ভাবত স্বাধীন — শিব পুরাতন,
দেখিবে সে নিজে চাহি,
চড়ে দুইদ, চড়ায়, চড়ক,
লোকজন আর লোকারণ্যে,
দোকী ভক্তের উঠে কলরব —
'পুর বাবা, পুর বাবা'।

প্রতি শিবমাথে ঢালিবে মাথট,
প্রতি অঙ্গে তার নিবেদিবে কর,
প্রতি লোক হবে নিজেদের
নয় মন্দির-পুরোহিত সম,
প্রতি বুক হবে দীনবাস,
প্রতি হাত হবে বর।

মন্দির ঘরে ঢাকা দিবে দ্বার
দিবে নিজে আসে ঘরে ;
মহাকাল — ঘরি' দাঁড়াবে সবার,
ঘরে দিবে ঘরি' বাড়াবে আদর, —
তাহাদিকে হাত আঁকিতে অথবা
ঘর-দুয়ার ঘরে।

যাহার পরনে জাতির পরম
ঈশান তার চাই।
উঁচুক দেউল নিরাশ্রয়ী
আকাশচুম্বী — চুমে যার রবি
কনক-কলসে হেরে প্রতিভাত,
আঁখি ভরে' দেখে যাই।

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

১

অন্নদা-দিদি

প্রাই ছয় দিন হইতেছে। সেই জীবনের আদি ও মধ্য, এবং সে সম্বন্ধে অন্য কাহিনীও ই সঙ্গেসঙ্গে পূরণ হইতেছে — অন্য আপনি এসে হয় নাই বটে কিন্তু সে যে কেন, আমরা অনুমান করিতে পারি। আদি একটা অন্নদা নিজেই তাহার চিঠিতে লিখিয়া দিয়াছে, এবং বন্ধুবান্ধবের মুখে আমাদের অনেক পুরাতন আলোচনা হইয়াছে; সেই মধ্যপর্বের শেষে ও অন্ত্যপর্বের আরম্ভেই আমরা অন্নদাকে দেখিতেছি। কাহিনীটি আরও সংক্ষেপে এবং আর একটু তুলিয়া ধরিলে ভাল হয় — আলোচনার সুবিধা হয়। অন্নদা তাহার সেই চিঠিতে লিখিয়াছে —

"আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা করিতের গৃহ স্বামীকে আমাদের দিতের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন [illegible] হইয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হন। তখন কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলে মানুষ, আজ না বুঝিলেও একদিন বুঝিবে।

"এ কথা কি সত্য? তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁহার স্ত্রীর মুখের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়াছিলেন সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। তারপর দশ বৎসর পরে দেখা পাই। যেমন ছেলে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি ছেলে আমাদেরই বাটির সম্মুখে তিনি লাল খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। ... এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে

খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম।" [পৃঃ ৭৮-৭৯]

ইহাই এ কাহিনীর প্রথম পর্ব। অন্ধ-পর্বের যেটুকু আমরা শ্রীকান্তের জবানীতে পাই তাহাই যথেষ্ট। অন্নদাদিদি তাহার জাতিত্রষ্ট সর্বস্বান্ত দাদুটিকে স্বামীর সঙ্গে কি অবস্থায় বরণ করিতেছে, লেখক দুই একটি চিত্রে তাহা আমাদের মনোযোগের মধ্যে — একেবারে চক্ষুগোচর করিয়াছেন। কথা খুব সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু এত বড় কথাশিল্পীর যাদু-তুলিকার স্পর্শে তাহাতেই — ঐ ক্ষুদ্র পট-পরিসরেই যৌবন-দীপ্তিকে ফুটিয়ে করা হইয়াছে। সেই চিত্র এইরূপ —

"আমি যেমন ঘনান্ধকার কখনো জীবনে দেখি নাই! এক ত চতুর্দিকে নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড জৈতুলগাছ ও পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল শুয়োর এবং ছানাগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটাছই ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ভয়ে চাহিয়া দেখি — ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে।" [পৃঃ ৪৩]

অন্নদার স্বামীসহাশয়টিকে একবার মাত্র দেখিলেই, তাহার সেই চিঠির কথাগুলিতে আর সন্দেহ থাকে না। —

"তাহাদিকে চাহিয়া দেখিলাম সেই পর্ণকুটীরের দাওয়ার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলা লোকের লোক প্রবল কাসির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথার জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোট বড় মালা।... তাহার লম্বা দাড়ি বক্ষঃস্থল দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিয়া চিনিলাম সে সাপুড়ে। বার পাঁচ ছয় আগে তাহাকে প্রায় সর্বত্রই দেখিতাম। ... ইন্দ্র তাহাকে সাহেবী সম্বোধন করিল, এবং সে আমাদিকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গালার সাজ-সরঞ্জাম দেখাইয়া দিল।"

[পৃঃ ৪৩-৪৪]

তারপর অন্নদা-দিদির আবির্ভাব। সেই আবির্ভাব এমন সময়ে এমন ভাবে হইয়াছে যে, তাহার উপরে যেন একটা ফ্লাশ-লাইট পড়িয়াছে — তীব্র আলোকের এক ঝলকেই সেই মূর্তির সর্বাবয়ব এবং তাহার দেহের অধিষ্ঠান-ভঙ্গিটি যুগপৎ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। —

"ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল।

এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখ্‌রো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল; এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রর হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। 'মাপ্‌রে' বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশীর লাউয়ের উপরে আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল 'এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই সে নয়'। ইন্দ্র এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল 'কামড়াক্ যাটাকে। বুনো-সাপ্ ঘরে' যাবে ... এই যে দিদি! এসো না, এসো না, ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো —।' আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম।" [পৃঃ ৪৬]

এমনই সেই আবির্ভাব। শ্রীকান্ত দেখিল —

"যেন কথাশাস্ত্রে যাহা। যেন মুসলমানরমণী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটি-বাঁধা কতকগুলি শুকনো কাঠ, এবং ডান হাতে ফুলের

সাক্ষির মত একখানা চেয়ার ঘরে কয়েকটি মাত্র আসবাব। ঘরের বিছানাটী দুজনেরই মত ছোট — একেলা ঘরে ফোলানো, কিন্তু মলিন নয়। ঘরে ঢুকিয়াই বাঁয়ের দিকে দুটি। সিঁথায় সিঁদুরের আভাস-চিহ্ন।

...চিত্র বাঙ্গুল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে!' .....তাহার এই 'বাঙ্গুল' কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি টের পাইলেন। ...হাসিয়া বলিলেন, 'ওরে পাগলা, অত পুরী তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে, — এখুনি ধরে নিচ্চি ছাখ্—' বলিয়া তাঁহার মাতা হইতে একটা কেরোসিনের ডিবা আনিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া কাঁপিতে হুক করিয়া ফেলিলেন।"

[পৃঃ ৪৮-৪৭]

ইন্দ্রনাথের দিদির পরিচয় পূর্বে দিয়াছি — সে পরিচয় চরিত্র-পরিচয় হিসাবে যথেষ্ট নয়; এখানে আমরা তাহার মহত্ত্ব-আভাস পরিচয় করিতেছি। তাহার ঐ পরে পরোক্ষভাবে যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে যাহার ইঙ্গিতমাত্র আছে, অতঃপর— আমি যাহাকে তাহার কাহিনীর অন্যতম বলিয়াছি— তাহাতেই, একটা চরম ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া সেই পরিচয় অতি-তীব্র বিদ্যুৎশিখার মত আমাদের চক্ষু যেন ধাঁধিয়া দেয়। বালক শ্রীকান্তও হেমনই হতবুদ্ধি হইয়াছিল, সেই সঙ্গে তাহার ভাবপ্রবণ স্পর্শকাতর চিত্তে যে একটা কি মহিমা অনুভব করিয়াছিল। সে মহিমা কিসের মহিমা? — নারীর প্রেম, না সতীত্বের, না ধরণের দুঃখ সহন করিবার অত্যাশ্চর্য-শক্তি? এই তিনই যদি সেই মহিমার উপাদান হয়, ইহাদের মধ্যে প্রধান কোন্‌টা? অন্নদা-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে ইহাই মূল প্রশ্ন — ইহারই সমাধানের উপরে আমার এই আলোচনার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তাহার পূর্বে এই অন্নদা-পর্বটি একটু ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিতে হইবে।

ঘটনাটি শাহজীর চড়া — হঠাৎ সন্ধিস্থলে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল। সংবাদ পাইয়া বালক দুইটি অন্নদার কুটীরে ছুটিয়া আসিয়াছে।—

"একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার কোলের উপর শাহজীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখুরো সাপ মরা হইয়া আছে।.....

"অন্নদা কোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে লাগিল, সেও আদর করিয়া শাহজীর গলার উপরে তাঁর চুম্বন দিয়াছে"।

[পৃঃ ৭১-৭২]

তারপর —

"তিন জনে ধরাধরি করিয়া শাহজীর দেহখানা সমাহিত করিলাম .....হঠাৎ দিদি সেই কোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিকট স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন 'মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জ্বালা নেই'.....মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তারপর উঠিয়া তিনজনে স্নানাদি করিলাম। দিদি হাতের মোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গলার চুড়ী আছিয়া ফেলিলেন; মাটি দিয়া সিঁথির সিঁদুর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।"

[পৃঃ ৭৩-৭৪]

ইহার পর, অতি সামান্য যেটুকু সম্বল যাহা ছিল তাহাই বিক্রয় করিয়া অন্নদা স্বামীর ঋণ শোধ করিল — শেষে হাতে কয়েকটি মাত্র পয়সা লইয়া একা বালকটীর জন্য ঐ চিঠিখানি লিখিয়া রাখিয়া সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, শ্রীকান্তের পক্ষে এবং পাঠকের পক্ষেও, তাহাই অন্নদার মহাযাত্রা — পৃথিবী হইতে বিদায়গ্রহণ।

অন্নদার মধ্যে শ্রীকান্ত এক মহা তপস্বিনীকে দেখিয়াছিল, লেখক শরৎচন্দ্র সেই শিখরের উপরেই জোর দিয়াছেন। এ তপস্যা কিসের তপস্যা? উহা কি কেবলই একটা কৃচ্ছ্রসাধন — ইন্দ্রিয় আত্ম-নিগ্রহ? নিশ্চয়ই নয়। শ্রীকান্ত দেখিয়াছিল — সতীত্বের তপস্যা; আশ্চর্য্য হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, সেই সতীত্ব-পালনে নারীর আত্মোৎসর্গ কোন্ সীমায় পৌঁছিতে পারে। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সেই সতীত্বকে সে মানিয়া লইয়াছে — কিন্তু বিশ্বাস করিলেও বুঝিতে পারে নাই, এবং বুঝিতে পারে নাই বলিয়া সে বস্তু যেন তাহাকে আরও অধিক বিচলিত করিয়াছে। সেই স্বামীকেও অন্নদা এমন ভালবাসে! আমরা তাহার চিঠির আরম্ভকথা পূর্ব্বেই পড়িয়াছি, পরে শ্রীকান্ত যে একটি কথা—আমাদের দুই আকর্ষণ করিবার জন্যই লিপিবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় — তাহাতে অন্নদার শুধুই পতিভক্তি নয়, তাহার সুগভীর প্রেমও সূচিত হইয়াছে। শ্রীকান্ত নারী-হৃদয়ের সেই অপার রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই, কেবল অন্নদার প্রতি তাহার ভক্তিই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে কথাটি এই —

"তিনি ডান হাত দিয়া অন্নদার সকর্ণমূলে পাদুকার সুধাবরণ উন্মোচিত করিয়া সতীর প্রেমে তাহার সুকোমল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক্, আজই হ'ল ইন্দ্রনাথ! জগবানকে আমি এইটুকু দোষ দিই যে।" [পৃঃ ৭২]

অন্নদার এই যে অক্ষয় প্রেম-তৃষ্ণা — ঐ একটি আচরণ, এবং তাহার সেই তৃপ্তিতে আমরা যে বস্তুটির নিঃসংশয় প্রমাণ পাই, তাহার নাম কি? তাহা কেবল প্রেম? উহা কি সতীর পতিপ্রেম? না ঐ সম্পর্কটির নর-নারীর স্বাভাবিক প্রেম? আমি পূর্ব্বে, আমাদের দেশে পতি-পত্নী-সম্পর্কের মধ্যেও নারীর যে একটি অস্বাভাবিক রূপবৃত্তির কথা বলিয়াছি — তাহাতে সতীত্ব-সংস্কার ছাড়াও যে এক প্রকার অদ্ভুত প্রেমের উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহা স্মরণ করিতে বলি। অবশ্য, ইহাও সেই আদি নর-নারী সম্পর্কের প্রেম হইতে কোন স্বতন্ত্র নাই, কারণ প্রেমমাত্রই অহেতুক — এত বড় অদ্ভুত অবিচারিত, অন্ধ আসক্তি ত' আর নাই! রবীন্দ্রের কবির একটি শ্লোক-পংক্তি মনে পড়িতেছে —

"But Fate is the name of her;
And his name is Death."

— ইহা আমাদের বুদ্ধিসঙ্গত না হইলেও অতিশয় সত্য। কবি বলিয়াছেন — ঐ প্রেমের এক পক্ষ যে নারী সে যেন নিজেই নিজের নিয়তি-কর্ত্রিণী; আর ঐ পুরুষ, তাহার প্রাণহরণ সেই প্রিয়তমই — তাহার 'মন', অর্থাৎ, সর্ব্বনাশের হেতু। অন্নদা ঐ পুরুষটিকে ভালবাসিয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়; তাহার সেই ভালবাসা যে এত গভীর ও অবিচলিত হইয়াছে, তার কারণ, অন্নদায় — নারী-চরিত্রই বলিব না — নারী-আত্মারও একটা লক্ষণ। এমন পুরুষের প্রতিও নারী-হৃদয়ের ঐ যে প্রাণান্তিক আকর্ষণ, উহার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, অন্তঃস্রাবী যৌন-গ্রন্থি সে বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু তাহাতেও রহস্যের পূর্ণ-সমাধান হয় না। মনোবীক্ষণ দেহধর্ম্মকে কোথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই বটে, কিন্তু সে কাম সর্ব্বত্র দেহের সীমাতেই আবদ্ধ থাকে না; অন্নদা-চরিত্রে ঐ যে ত্যাগ, ঐ কঠোর তপশ্চর্য্যা — যাহাতে দেহ-সংস্কার লোপ পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয় — তাহার কারণ অন্তরতম মনো-বিজ্ঞানে যদি ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, তথাপি তাহাই কি সব? সেও কারণ ত' একরূপ দুর্জ্ঞেয় হইয়াই থাকে। শেষ পর্য্যন্ত দেহ-মন এবং আত্মা — এইরূপ একটা ভেদ মানিতেই হয়; হয় তো প্রকৃতই কোন ভেদ নাই — সকলই একটা পরম তত্ত্বের আশ্রয়ে অভেদ হইয়া আছে;

তথাপি আমাদের বুদ্ধিতে এইরূপ একটা জোর স্থাপন করিয়া না লইলে, জীবনের যে প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারিক রূপ আমরা দেখিয়া থাকি তাহার অর্থ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এই জন্য, যেখানে দুই জোড়-পিপাসা, আত্ম-তৃপ্তির হিসাব প্রভৃতির দেখিতে পাই, সেইখানে তাহা আমরা দেহ-মনের ধর্ম বলিয়াই বুঝি, এবং যেখানে ঐ গুলির ঐকান্তিক অভাব লক্ষ্য করি, সেইখানেই আত্মার সাক্ষাৎ পাই। সোজাসুজি এইরূপ বিচারী বটে, কিন্তু ইহার দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োজন নাই। ইংরেজীতে 'spiritual' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমি কিছু নয়, ঐরূপ একটা আত্মিক ব্যাপার — দাম্পত্যিক দেনা-পাওনার ব্যবহারে, বা তর্কশাস্ত্রের 'এই জন্য এই'-নিয়মের প্রমাণে তাহার হিসাব মেলে না। কিন্তু অন্যায় প্রেম কি সেরূপ বিশুদ্ধ প্রেম হয়? তাহার ঐ আকর্ষণ বা দেহ-মনের মূলে আছে ঐরূপ একটা দেহাতীত বা মনোতীত প্রবৃত্তিই অতিরিক্ত কিছু? আর কিছু কি নাই?

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পতিব্রতাকে, তাহার সেই সতীত্বের শক্তিকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছে; যে পতিব্রতা হিন্দুনারীর একটা বিশিষ্ট সাধনার ও আত্মিক শক্তিবিকাশের অমূল্য সম্পদ, অন্যত্র তাহা লাভ করিয়াছে — এই দেশ ও জাতির 'যুগ-যুগোত্তরাগত সাধনার সহজ উত্তরাধিকারে। রবীন্দ্রনাথ এতদূর ইহার একটা হেতু নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, হিন্দু-স্ত্রীর পতিপ্রেমে স্বামী-পতির স্থানে একটা আইডিয়াল-পতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, হিন্দু-স্ত্রী তাহার স্বামীকে যে স্নেহ-প্রেম ও ভক্তি করে — তাহা সেই ব্যক্তিটাকে নয়; স্বামী একটা আইডিয়াল; ঐ ব্যক্তি যেমনই হোক, তাহার মধ্যে সে একটা আদর্শ-পতিকে দেখিয়া থাকে — ব্যক্তিটা বুঝিয়া যায়। এই যে ব্যক্তিটাকে বুঝিয়া ফেলিয়া, একটা নৈর্ব্যক্তিক 'স্বামী'-বিগ্রহকে সর্বদা মনের মধ্যে বসাইয়া রাখা — ইহার জন্য সাধনা করিতে হয় না, হিন্দু-স্ত্রীর উহা সংস্কারগত, অতএব সহজ শক্তি বলিয়া দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার অধিক বলেন নাই; কিন্তু ঐ যে কথাটার ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহাতেই ঐ শক্তি ও তাহার সাধনার আভাস রহিয়াছে। যে পৌরাণিক প্রতীক-উপাসনা আমাদের কর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ হইয়াছে, তাহাই নারীর নারীধর্ম-সাধনাতেও ঐরূপ প্রতীক-উপাসনার পরিণত হইয়াছে। উহাকেই অ-হিন্দু সমাজ 'পৌরাণিকতা' বলিয়া থাকে, কিন্তু আসলে উহা একটা 'আইডিয়া'কে — ঠিক মূর্তি নয়, মূর্তির সঙ্কেতে — 'রিয়ালাইজ' বা সুলভ-সহজ করা। ঐ স্বামী-ব্যক্তিটাকেও নারী তাহার 'আইডিয়াল'এর প্রতীক-স্বরূপ করিয়া, দুরূহকে সহজসাধ্য করিয়াছে। তাহার ভগবান্‌কে চায়, প্রাণের প্রতীরতম উৎকণ্ঠা যাহার দ্বারা নিবারণ করিতে পারে — বিবাহিত পুরুষ-মাত্রেই ত' সেই ব্যক্তি নয়। এ সমাজে স্বয়ম্বর-প্রথাও নাই, থাকিলেও — 'পূর্বরাগ' মাত্রেই হৃদয়ের অন্যান্য 'রাগ' নয়। তার উপর, আর একটা কথাও আছে; বহুকালের ধর্ম ও সাধনার দ্বারা এ দেশে মানুষের জীবনকে একটা বিশেষ আদর্শ বা বিগ্রহলাভের অভিমুখী করা হইয়াছে, সেই সাধনার সেই 'কাস্টম' একটা সার্বজনীন সংস্কারে পরিণত হইয়াছে; জগৎ ও জীবনের গায়ে এমন একটা রং লাগাইয়া দিয়াছে যে, প্রকৃতিও যেন তাহাই আপন রং বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। অতএব, স্বয়ম্বরীর যৌন-পিপাসার উপরে সেই বিগ্রহলাভকে স্থাপন করিয়া নারীও যে ঐরূপ নৈর্ব্যক্তিক পতি-ভক্তির সাধনা করিবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। আশ্চর্যের বিষয় — নারীর ঐ প্রকৃতি; পুরুষের পক্ষে, ঐ সম্পর্কেও ঐরূপ প্রতীক-উপাসনা কখনই সম্ভবপর নহে। পুরুষের ব্যক্তি-অভিমান অতিশয়

উঠে, নারী সে বিষয়ে ঠিক বিপরীত — ভূমিকায় সে কথা বলিয়াছি।

কিন্তু তথাপি, উহাকে কি প্রেম? প্রেম বলিতে ঐরূপ আইডিয়াল-পূজা নিশ্চয়ই নয়, কারণ প্রেমে ব্যক্তিটাই বড়, নির্বিশেষ নয় — বিশেষই তাহার অবিচ্ছেদ আশ্রয়। আইডিয়াল-পূজার প্রকৃতির নিগ্রহ আছে; তাহাতেও স্বাধীন জলবৃত্তির শাসন বা সঙ্কোচ আছে, তাহাতেও একটা সুন্দর বন্ধন-পাশ স্বেচ্ছায় স্বীকার করা আছে। কিন্তু আমরা প্রেম বলিতে যে অমূর্ত, অন্ধ আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা বুঝি, সে প্রবৃত্তি পূজার স্নেহ-মনের প্রবৃত্তি; তাহা এই অর্থে spiritual বা আধ্যাত্মিক নয় যে, আত্ম-বিসর্জন-মূলক হইলেও তাহাতে একরূপ ভোগ-পিপাসাই প্রবল — ইংরেজীতে ইহাকেই 'passion' বলে। এই প্রেম কোন সংস্কার, কোন বিধি-নিষেধ মানে না, এবং — পূর্বে বলিয়াছি — ইহা একান্তই ব্যক্তিমুখী; ঐ মনোহরণের মূলে আছে — ব্যক্তিটাই রূপ-গুণ; তাহার কুলশীল রূপ, তাহার দোষও গুণ; কারণ উহা যে তাহারই। সুন্দর-কুৎসিত নাই, সাধু-অসাধু নাই, জ্ঞানী-মূর্খ নাই — আছে কেবল সেই ব্যক্তির ঠিক তেমনটি হওয়া। অন্নদার প্রেম কি তেমনই? লেখক তাহার ঐ যে একটি আচরণের উল্লেখ করিয়াছেন — 'সতীর দেহে তাহার ঘৃণীল ওষ্ঠাধরে' ইত্যাদি, তাহাতে অন্নদার প্রেম কতকটা সেইরূপ বলিয়াই মনে হয়। সে যে-ভাবে ঐ পুরুষটার সহিত ঘরকন্না করিয়াছিল, তাহাতেও এ প্রেম প্রায় পুরাপুরি তেমন প্রেম হইয়াই দাঁড়ায়। কিন্তু এই কাহিনীতেই একটা স্পষ্ট প্রতিবাদ আছে; — অন্নদার চিঠিতে, এবং তাহার কোন কোন কথায়, তাহার সেই প্রেমের মূলে যে একটা প্রবল সতীত্ব-নিষ্ঠাও আছে, ইহাই মনে হয়। কিন্তু শ্রীকান্ত-রূপী শরৎচন্দ্র ঐ যে একটি আচরণের উল্লেখ যেন একটু আবেগ সহকারে করিয়াছেন — উহা ত' কেবল সতীধর্মের লক্ষণ নয়। উহাতে গভীর জলস্পর্শের পরিচয় রহিয়াছে। তবে কি লেখক একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন? অন্নদা-চরিত্রের ঐ রহিয়াছেও একটু রোমান্স সৃষ্টি করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই? তাহাও মনে হয় না, কারণ, এ কাহিনীতে, যেখানে কোন অবস্থার বা ঘটনার চরিত্রগত আলোকপাত আছে — এবং সেই চরিত্র যদি এমন হয় যে, তাহা শ্রীকান্তের সারাচিত্ত চমকিত বা অভিভূত করিয়াছে, তবে সে যেন বিবাদনের মতই অভ্রান্ত — সে সম্বন্ধে শ্রীকান্তের একটি কথাও অযথার্থ মনে হয় না: এই দৃষ্টিভঙ্গীই শ্রীকান্তকে শরৎচন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই মনে হয়, শ্রীকান্ত অন্নদাকে দেখিয়াছে ঠিকই, সে তাহার সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছে তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু সেই দৃষ্টিও তাহারই — সে আপনার ভাবে, আপনার সংস্কার বা জন্মগত মনোভঙ্গির দৃষ্টিতেই অন্নদাকে দেখিয়াছে; এই প্রেমকে সে সতীধর্মেরই অনুরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু আমরা প্রেমকে একটু পৃথক করিয়া দেখিতেছি।

এখানে এই প্রসঙ্গে কেবল একটা প্রশ্ন করিলেই, কথাটা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। অন্নদা যদি ঐ পুরুষটার বিবাহিতা পত্নী না হইত, যদি, কোন সংস্কার বা ধর্মবিধানের বশে নয় — কেবল প্রেমেরই প্রবল আবেগে সে উহার সহিত ঘরযোগ করিয়া আসিত, তবে কি সে তাহার জন্য ঠিক এমনই সর্বত্যাগের কঠিন দুঃখ বরণ করিত না? সেও কি একপ্রকার সতীত্ব-নিষ্ঠা নয়? কুলটা নারীও কি এমন একনিষ্ঠা — এমন তপস্যার — অধিকারিণী হইতে পারে না? এমন দৃষ্টান্ত কি বিরল? সমাজের বাহিরে, কুলবতী রমণী অপেক্ষা প্রেমে পাগলিনী বহু নারী এমনই করিয়া কি তাহাদের জীবন উৎসর্গ করে নাই? পাঠক-পাঠিকাগণ হয়তো

এইরূপ ভাবের বা দুষ্মন্ত-বিরহ প্রেমের পূর্ণ-সমর্থন করিবেন, কিন্তু একটা কথা — ঐ প্রেম এক-তরফা হইতে পারিবে না, পরস্পরের মধ্যে সমান আদান-প্রদান থাকিবে; অর্থাৎ ইহাও একটা business-এর মত হওয়া চাই, তবেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন। কিন্তু আমি সেরূপ প্রেমের কথা বলিতেছি না; এ প্রেম এক-তরফা ও আত্মঘাতী, এই জন্যই সতীত্বের সহিত তাহার সেই ত্যাগ ও তপস্যার একটা সাদৃশ্য আছে। এই প্রেমের ট্রাজেডিও কাব্যসাহিত্যের উপজীব্য হইয়াছে। অতএব, অন্নদার প্রেম, ঠিক ঐরূপ ত্যাগ বা আত্মনিগ্রহে মহীয়ান হইবার জন্য, ঐ পুরুষটা তাহার স্বামী হইবার প্রয়োজন ছিল না।

তথাপি, ইহাও সত্য যে, তাহার ঐ সতীত্ব — স্বামী বলিয়াই ঐ পুরুষের প্রতি তাহার অদ্ভুত মমতা, যদি আমরা ধরা দিই, তবে অন্নদাকে আর চিনিতেই পারিব না: তাহা হইলে অন্নদার ব্যক্তি-চরিত্র লোপ পাইবে — সে চরিত্রের যতকিছু গুণ, তাহার সেই আত্মসচেতনতা ঘুচিয়া যাইবে। আসল কথা সেই একটা, — কোন চরিত্রই একটা বিশেষ আদর্শ বা কল্পনার অনুরূপ নয়; প্রত্যেকটি তাহারই মত, এবং সেই কারণেই তাহারা এক-একটি 'চরিত্র'। খুঁজিয়া ফিরিয়া সেই 'ব্যক্তি'র কথাই আসিয়া পড়িল। অতএব অন্নদাচরিত্রে যে সকল বিপরীত বা স্ববিরোধ লক্ষ্য করা হইয়াছে, আমরা তাহার সেই সমষ্টিগত রূপটাই স্বীকার করিব — পৃথকভাবে কোনটার যথোপযোগিতা লইয়া আর মাথা ঘামাইব না। অন্নদাও নারীমাত্র; শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক অবস্থার ফলে তাহার চিত্তরূপার সেই নারীর একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; অতএব, ঠিক সেই সেই কারণে, ঠিক সেইরূপ অবস্থার ফলে আর কোন নারী 'অন্নদা' হইয়া উঠিতে না, তার কারণ, অন্নদার ব্যক্তি-আত্মাটা তাহারই — সেই ব্যক্তিরও ঐ চরিত্র-বিকাশের মূলে একটা বড় কারণ হইয়া আছে।

কিন্তু অন্নদার শক্তি কোথায়? সেই আদি নারীপ্রকৃতির পরিচয় তাহার চরিত্রে কেমন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে? আমি ইতিপূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি, এখনে তাহা কাজে লাগিবে। অন্নদার প্রেম ও তাহার সতীত্ব, এই দুই যদি এক হয়, — অন্ততঃ এই দুইয়ের মধ্যে যদি কোন যোগ বা সম্বন্ধ থাকে, তবে সেই আদি-নারীপ্রকৃতির সেই শক্তির বলেই সে-যোগ ঘটিয়াছে: ইহাকে এমন করিয়া চিন্তা করে নাই, কেমন চিন্তাবৃত্তি তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ইহা যে নিছক প্রেম নয় তাহার প্রমাণ — অন্নদার নিজেরই এই উক্তিগুলিতে পাওয়া যায়।—

(১) "আমার কথা শুধু আমার কথাই নয় জানি, সে আমার স্বামীর কথা। আমার তা'ও ভাল কথা নয়।" [পৃঃ ৭৮]

(২) "শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিথ্যা কথা। শুধু একদিন গভীর রাত্রে স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম।" [পৃঃ ৭১]

(৩) "তিনি যখন হাত দিলেন তখন আমারও সেই সঙ্গে হাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বই ত' নয়।" [পৃঃ ৭৪]

(৪) "যে আমাকে আটক রাখবে সে যে আমার নিজেরই ধর্ম। স্বামীর ধন যে আমার নিজেরই ধন।" [পৃঃ ৭৫]

এই সকল উক্তির অন্য যেন অপেক্ষা হিন্দু-স্ত্রীর মজ্জাগত সংস্কারের প্রভাবই অধিক। তাহার ঐ সহধর্মিণীত্বও প্রেমের নয়; অর্থাৎ সে যদি প্রেমের অনুরোধেই স্বামীর অনুগামিনী হইয়া থাকে — তাহার সহিত ঐ স্নেহ-জীবন যাপন করিতে দ্বিধা না করিয়া থাকে, তথাপি, সেই প্রেমেরও একটা ধর্মবন্ধন সে কিছুতেই অস্বীকার করিবে না; বরং অন্তরের অন্তরে সে ঐ বন্ধনটাকেই শক্ত করিয়া ধরিয়াছে; ঐ দুর্বৃত্ত, কলঙ্কার পুরুষটার সেবা সে

যে-ধর্মের বলে করিতেছে, সেই ধর্মকে সে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, কারণ, ঐ ধর্মই তাহার প্রেমকে ধরিয়া রাখিয়াছে। তাই সে হিন্দু-স্ত্রীর আয়তি-চিহ্ন— সিঁথির সিঁদুর ও হাতের লৌহকঙ্কণ — কখনো মোচন করে নাই, এবং সেইজন্যই সে এমন অদ্ভুত উক্তি করিয়াছে যে —

"আমি নিজে হ'তে জাত দিই নি — কোনদিন কোনো অনাচারও করি নি।" [পৃ: ৭৮]

— অর্থাৎ, জাত দিয়াছে তাহার স্বামী, সে জন্য সে স্বামী নয়; তৎসত্ত্বেও সে তাহার ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে— "কোনদিন কোনো অনাচার করিনি।" তাহারি যে দুর্নাম রটিয়াছে তাহাও হিন্দু-স্ত্রী বলিয়াই রটিয়াছে, কারণ সে যে স্বামীর সহধর্মিণী। অতএব, তাহাদের হিন্দু বলিয়াই সে — হিন্দুপত্নী হিসাবেই — মুসলমানী। ইহা যেন উত্তরাখের সেই গালিরই উত্তর — "হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে তার আবার ধর্মকর্ম!"

আসল কথা, অন্নদা-চরিত্রে হিন্দু-স্ত্রীর ঐ পাতিব্রত্য-সংস্কার অতিশয় প্রবল; তাহার ঐ প্রেম সত্য হইলেও, সতীত্ব-সংস্কার তাহাকে গৌণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমার কথা তাহাও নয় — সংস্কার বা ধর্মবিশ্বাসের বশেও ঠিক ঐ রকমের আত্ম-বিস্মৃত পুরুষের পক্ষে সম্ভব বা স্বাভাবিক নয়; ঐ শক্তি পুরুষের চক্ষে বিস্ময়কর এবং সম্ভ্রমোদ্রেকও হইলেও — উহা যেন দুর্বলতারই মত। পুরুষ মনে করে, নারী আমাদের মত শক্তিশালী না হইয়াও — তাহার সেই অশক্তির কারণেই, কি কাণ্ড না করিয়া বসে! কি অপূর্ব-সুন্দর তাহার সেই আত্মোৎসর্গের— সেই আত্মহত্যার — উন্মাদনা! বোধ হয়, কতকটা এই ভাবেই একদা এক কবি এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন —

"In general it may be apprehended, we like women little the better for excelling us even moderately in our own acquirements and capacities. But what energy springs from her weakness! What poetry is the fruit of her passions!"

(W. S. Landor)

— নারী সম্বন্ধে পুরুষের ইহাই সার্বজনীন ধারণা, এই কথাই আমি প্রথম হইতে বলিয়াছি। নারীকে লইয়া এত যে কবিত্ব, এত যে উচ্ছ্বাস — তাহা এইজন্যই। কিন্তু নারীর শক্তিই যত্র — তাহা পুরুষ-শক্তির বিপরীত, এবং বিপরীত বলিয়াই তাহা দুর্বলতা নহে; এখানের ঐ অন্নদা-চরিত্র একটু ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিলে তাহাই সত্য মনে হইবে। অন্নদা যখন বলে —

"মনে করিও, তোমার দিদি যেখানেই থাকুক ভাল থাকিবে; কেন না, দুঃখ সহিয়া সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাহাকে কিছুতেই আর বাধা দিতে পারে না।"

[পৃ: ৭৯-৮০]

— তাহা শুনিয়া মনে হয় বটে, এ যেন তাহার একটা মর্মান্তিক আক্ষেপ; কিন্তু ইহার মধ্যেও যে একটা তত্ত্বের উল্লাস আছে, আত্মস্থতার আত্মপ্রসাদ আছে — যেন ব্রত-উদ্‌যাপনের কঠিন শক্তি-বোধ আছে, তাহা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ঐ অবস্থায় — ঐ কারণে, ঐরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া — ঐরূপ উক্তি যদি কোন পুরুষে করিত, তবে তাহার প্রতি, শ্রদ্ধা দূরের কথা, আমাদের সহানুভূতিও হয়ত আকার ধারণ করিত; এমন কথা নারীর মুখেই মানায়, পুরুষের মুখে মানায় না। কিন্তু কেন? — অন্নদার ঐ যে martyrdom বা আত্ম-বলিদান — উহা পুরুষের ধর্ম নয়, উহা নারীরই স্বভাবধর্ম। এখানে সেই নারী-প্রকৃতিই একটি বিশেষ সমাজের বিশেষ সংস্কারকে সহায় করিয়া

পূর্ণ-পুষ্টি লাভ করিয়াছে — এমন পূর্ণ-পুষ্টি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে, কিন্তু ঠিক এমন রূপে এমন করিয়া নয়।

সমাজের নারী-চরিত্রে আমরা ইহার বিকাশ দেখিব, নারী-প্রকৃতির যত বিকৃতিই হউক-না কেন লক্ষ্য করি। শুধু দেহগঠনের নানা বিকৃত গঠনের জন্যই নয় — সমাজ ও শিক্ষার প্রকৃতিভেদেও নারীর সেই আদি প্রকৃতির বিকাশ অনেক প্রকারে ব্যাহত হইয়া থাকে। আদি নারীপ্রকৃতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাতেও সব বলা হয় নাই — সেরূপ বিস্তারিত আলোচনার অবকাশও নাই। তথাপি সাধারণ নারী-চরিত্রের দৃষ্টান্তে আমার ঐ মূলতত্ত্বটির খণ্ডন হয় না; কারণ, যেমন পুরুষমাত্রেরই যে পৌরুষ থাকিবে এমন কথা নাই, তেমনই নারীমাত্রেই যে ঐরূপ খাঁটি নারীত্বের দৃষ্টান্তস্থল হইবে, এমন কথাও যথার্থ হইতে পারে না। কেবল তফাৎ এই যে, পুরুষ যণ্ডা পুরুষত্বহীন হইতে পারে, নারী রণ্ডা নারীত্ব-হীন হইতে পারে না — নারীর পক্ষে সেরূপ হওয়া অস্বাভাবিক; যেখানে সেরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেখানে নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অসম্পূর্ণ ধারণাই তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু পুরুষের ঐরূপ কোন 'প্রকৃতি' নাই — তাই তাহার 'আত্মা' যতই আত্মস্থ হয়।

এতক্ষণে অমলা-দিদির প্রতি শ্রীকান্তের সেই বিমল-বিমূঢ় ভক্তির সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় আসিয়াছে। এই অমলাদিদি, নারীচরিত্রের মাহাত্ম্য এবং সেই মাহাত্ম্যের একটি বিশেষ কারণ সম্বন্ধে তাহাকে নিঃসন্দেহ করিয়াছিল। আমরা অমলা-চরিত্রকে যেমন বুঝিয়াছি সে তেমন বুঝে নাই — সে যেমন বুঝিয়াছে তাহাতে তাহার নিজেরই চরিত্রের দুই একটি লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। অমলার স্বামীর প্রতি তাহার ঐ প্রেম সে বিমল শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিত না, যদি না সেই সঙ্গে সে অমলার অসীম আত্ম-নিগ্রহ — তাহার সেই সুকঠোর তপস্যা চাক্ষুষ করিত। তাহার কাছে প্রেমের কোন পৃথক বিভব ধূলা নাই, সে উহা কখনও ভাল বুঝিতে পারে নাই; স্নেহ-দয়া ভক্তি-প্রীতি সে বুঝে; অমলার দুর্বল যে তাহার প্রতি জননীর মত স্নেহ এবং নারীর প্রকৃতি-সুলভ সুকোমল সেবা সে অমলার সহিত উপলব্ধি করে; কিন্তু অমলা যে ঐ পুরুষটার প্রতি কোন প্রকার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া এমন করিয়া সর্বস্ব দান করিয়াছে এমন টিহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক; প্রেমকে সে এতখানি মূল্য দিতে পারে না বলিয়াই অমলার অতখানি আত্ম-নির্যাতন তাহার হৃদয়ে এমন আঘাত করিয়াছে। প্রেমকে না বুঝিলেও একটা কারণে তাহাকে সে শ্রদ্ধা করিতে পারে — সে শ্রদ্ধাও ঠিক প্রেমিক নয়, প্রেমের কমল পরিত্যক্ত সেই নারীকে,—যদি তাহার ফলে ঐরূপ তপস্যা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ, শুধুই প্রবল জন্মবৃত্তি নয়, প্রেমের সাক্ষাৎ তৃপ্তিসুখও নয় — সে প্রেম অমলাদিদির প্রেমের মত বঞ্চিত-প্রেম হওয়া চাই; মিলন নয় — বিরোগ চাই, বিরহ চাই — চাই অসীম দুঃখভোগ। শ্রীকান্ত নিজে স্বভাব-উদাসীন — কোনরূপ প্রবল বন্ধন তাহার রুচিকর নয়, ঐরূপ প্রেমকে সে ভয় করে। তথাপি তাহার হৃদয় বড়ই স্পর্শকাতর — সে কল্পনাপ্রবণও বটে। তাই অমলাদিদির মত একটি অসাধারণ দুঃখব্রতধারিণী নারীকে দেখিয়া সে হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছে তাহা হইতেই নারীচরিত্র ও নারী-ভাগ্য সম্বন্ধে সে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছে, নারী-পুরুষ-ঘটিত সমস্যার একটা বাস্তব-রূপ সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সম্ভবতঃ তাহার নিজ জীবনের একটা উৎকণ্ঠাও তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছে। নারীর প্রেম একটা অদ্ভুত মোহই বটে, কিন্তু তাহার মহিমাও কম নয়। উহারও মূলে আছে কতকগুলি সংস্কার, নারীর জীবন তাহা এমন দৃঢ় হইয়া থাকে যে, তাহারই বলে সে এতখানি পীড়ন বঞ্চনার

তপশ্চরণের দ্বারাই লাভ করে। হিন্দু-গৃহীরূপে নারীর এই যে আত্মত্যাগ — নরনারী-বর্জিত প্রেমের উহাই শ্রেষ্ঠ গৌরব; সে গৌরব নারীর পক্ষে যেমন সুলভ, পুরুষের পক্ষে তেমন নহে। নারীর ঐ শক্তি পুরুষের নাই — প্রেমেরও কোন পুরুষ মূল্য নাই। অন্নদার মত একজন সাধারণ অশিক্ষিত নারীর মধ্যে সে ঐ যে আত্মাহুতির হোমাগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছে, তাহাতেই বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ শক্তি নারীমাত্রেরই অন্তর্নিহিত আছে। শাস্ত্রের কঠিন শাসন এবং সমাজের অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিবার এই যে অসীম মনোবল — নিরুপায় বলিয়াই তাহার এই যে আত্মসংহরণের শক্তি—পুরুষের পক্ষে যাহা অসম্ভব—তাহারই কারণে, নারীর একটি স্বভাব-শুচিতা আছে, শ্রীকান্ত তাহা বিশ্বাস না করিয়া পারিল না, তাই বলিতেছে —

"আমি একটা সত্য বড় দায় করিয়াছি। পূর্বেও একথার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার লিখিতে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এমন এত বড় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তখন, সংসারে পারে না কি? .....তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে মরুক ঢের ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ার সাধ নাই।" [পৃ: ৮২]

ইহাও শ্রীকান্তের আবাল্যলুপ্তা বা আবাল্যসঞ্চিত আর্দ্রে-সমাজসংস্কার প্রমাণ। অন্নদা-দিদি কত বড় সতী, তাহাই ভাবিয়া অন্নদাকে সে প্রায় দেবীর আসনে বসাইয়াছে। —

"তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই বাথা বোঝাইয়া প্রণাম করি, তখন কেবল এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান্! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাধ্বীর দেহে স্বামীর জন্য সহধর্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি।.....কিন্তু আমার লিখিবার জন্যে এত বড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এত বড় সতীর কপালে অসতীর সতীত্ব কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে বিসর্জ্জিত করিয়া দিলে?"

[পৃ: ৮১]

অথচ এই সতীর একটা সংস্কার আছে: অশিক্ষার ফল বলিয়াই ইহাকে লঙ্ঘন করা কোন বিবাহিত নারীর — হিন্দু-নারীর — পক্ষে সহজ নয়। কে নারী স্বভাবতঃ জানিয়া শুনিয়াও তাহা লঙ্ঘন করে না — সে দুর্বল, না শক্তিমতী? দুই-ই হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকান্ত ঐ সংস্কার এবং শক্তিকে কিছু মনে করে নাই, — এ বিষয়ে তাহার নিজের হিন্দু-সংস্কারও কম প্রবল নহে। তাহা হইলে অধিকাংশ কলঙ্কিনী নারীকে নিষ্পাপ-অপরাধজ্ঞানিনী মনে করিবার কালে সে কি তাহাদের চিত্ত ঐরূপ পতিভক্তিও দায়ী করে? নারীকে, কেবল তাহার দুঃখ-বল, তাহার অপার সহিষ্ণুতার জন্যই শ্রদ্ধা করা চলিবে না? নতুবা, শ্রীকান্ত নারীজাতির সম্পর্কে ঐ কলঙ্কের কথাটাই বার বার বলে কেন? আসল কথা, তাহার নিজের মনও সামাজিক নীতি-সংস্কার অতিক্রম করে নাই; সতীত্বের ঐ শুচিতা, এবং তজ্জন্য নারীর ঐরূপ আত্মনিগ্রহ তাহাকে যেমন বাধিত তেমনই মুগ্ধ করে। তাহার কাছে, কলঙ্কিনী হওয়া না-হওয়া এক কথা, কিন্তু ঐরূপ সতী হওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্নদা-দিদি হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁহার সহিত তুলনা করিয়া অপর সকল নারীর বিচার করা অতীব অন্যায়; কিন্তু তাই বলিয়া নারী-হৃদয়ের মর্য্যাদা, নারী-চরিত্রের স্বাভাবিক মহত্ত্ব অস্বীকার করার মত অপরাধ আর নাই। ইহাতে যুক্তির অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীকান্ত-চরিত্রে যুক্তি অপেক্ষা অনুরাগেরই প্রভুত্ব অধিক। তথাপি এখানে তাহার চরিত্রের একটা লক্ষণ আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিব, তাহা এই যে, সে দুই

মুক্ত স্বাধীন হৃদয় বলে। ইহা, সমাজের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে যেই কিছু মত প্রকাশ করুক — এই অতি-প্রাচীন সহানুভূতি লাভের, সে তাহার বক্ষদেশে কিছুতেই ভাগ করিতে পারে নাই — ঐ সতী-সুলভ তাহার প্রমাণ। হিন্দু সমাজের নারী-চরিত্রে সে যেন একটা শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, যাহা বহু-প্রাচীন সাধনা ও সংস্কৃতির ফল; ঐ সমাজের বাহিরে তাহা নাই। তাহার স্বাধীন জ্ঞান-বুদ্ধি সমাজ-ধর্মের যুক্তিকে স্বীকার করিবে না বটে, তথাপি ঐ একটা সংস্কার সে কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে নাই — অন্তরস্থ ঐ ত্যাগশক্তির মূলে যে সংস্কার রহিয়াছে, তাহার পূজা করিয়া সে যেন ধন্য হইয়াছে।

এই সকল কথা, বোধ হয়, বলা বাহুল্য যে, আমি নারীর প্রকৃতিগত শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি শ্রীকান্ত, নারীতে সে শক্তি কিছু কখনো দেখে নাই, তাহাতে দুঃখী বোধ নয়। সে অন্তরস্থ ঐ অন্তর্যামীরূপী প্রেমের মহিমা দ্বারা মণ্ডিত হইতে সে নারী, এটা অন্যায় দুঃখভোগ বলিয়াই মনে করিয়াছে। নারী যে স্বেচ্ছায়, স্বপ্রকৃতির বলে, ঐরূপ দুঃখভোগ করে না, এই সহজ বিশ্বাস, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা সমাজের প্রতি তাহাকে বিরূপ করিয়াছে। নারীর মধ্যে তেমনি শক্তির সম্ভাবনা কল্পনা করিতেও সে বিমুখ; চিত্তের এই দুর্বলতা না থাকিলে সে ঐ দুঃখেই এত বড় কবি-উপাসক হইতে পারিত না। নারী যে ঐরূপ দুঃখভোগের দ্বারাই জীবনের মূল্য পরিশোধ করিয়া একটা অদ্ভুত মুক্তিসুখ লাভ করে, সে তাহা বিশ্বাস করে না; বরং সমাজের মূলতত্ত্বে উৎসর্জিত বলির পশুর ন্যায় নিরানন্দ যাতনা নিরুপায়ভাবে সহ্য করে — ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। পাগলীর ঐরূপ মৃত্যু-ঘটনায় অন্নদা-দিদি যখন বলিয়া উঠিল "যাক, ভালই হ'ল ঠাকুরপো! তখনকেবে আমি একটুও দোষ দিই নে।" — তখন শ্রীকান্ত নিশ্চয় তাহার চিরাভ্যাস সেই নারীটাকে দেখিতে পায় নাই; সে কেবল তাহার দুঃশক্তিটাই দেখিয়াছে; বিধিবিধানকে স্বীকার করিয়া লওয়ার পরিপূর্ণ প্রশান্তি, যাহা ঐ অবস্থাতেও কেবল নারীর পক্ষেই সম্ভব, তাহা সে কল্পনাতেও পারে নাই। শ্রীকান্তের দৃষ্টিই সে দৃষ্টি নয়; সে যেমন প্রেমকে কোন পৃথক মর্যাদা দেয় না, তেমনই শক্তির ঐরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংপূর্ণ মহিমাও স্বীকার করে না। তাই নারীকে সে যতখানি শ্রদ্ধা করে, তাহার অনেক অধিক তাহার সহানুভূতি। আমরা এই কাহিনীতে যতই অগ্রসর হইব ততই শ্রীকান্ত-চরিত্রের এই দিকটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেখিব। এখানে কেবল একটি প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না, তাহাও এই উপন্যাস হইতে নয় — যে উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তাঁহার পরিণত মানসের শেষ সিদ্ধান্ত, কবি-হৃদয়ের সহিত নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধি যুক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি। সেখানে নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সুস্পষ্ট উক্তিটি আছে —

"মনে আছে, সেদিনও তাহাদের কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলুম, কিন্তু অন্নদা স্বীকার করলে না, বললে — মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। ও প্রবৃত্তি তো তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শুধু শূন্যতা থেকে — ওটে বুক খালি করে' দিয়ে। ও তো স্বভাব নয় — অভাব।" [শেষ প্রশ্ন, পৃঃ ৩১২]

একটি অনেক নূতন স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার জবানীতে শরৎচন্দ্রের এই যে একটি উক্তি, ইহাই শ্রীকান্তের অস্পষ্ট মনোভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। প্রেমকে এবং সতীত্ব-সংস্কারকে বাদ দিলে অন্নদার মত শক্তিমতী ও বুদ্ধিমতী নারী যে দৃঢ় স্নেহবিনী মূর্তি ধারণ করিতে পারে — এই উপন্যাসের নায়িকা কমলা সেইরূপ নারী-মূর্তি। শ্রীকান্ত যে শেষ পর্যন্ত

ঐ সংস্কারগুলাকেই অন্নদা-চরিত্রে সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; তাই সে ঐ সংস্কারগুলাকেই উদ্ধৃত করিতে চাহিয়াছে, এবং সেই শক্তিকেই নারী-শক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এ কাহিনীতে ঐ সংঘর্ষের নাই, শ্রীকান্তই আছে; তথাপি কথাটার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, শ্রীকান্ত-চরিত্রে প্রায় শেষ পর্যায়ে যে একটি ক্ষয় আছে তাহা বুঝিবার পক্ষে ঐ ইঙ্গিতটুকু কাজে লাগিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

সতীলোকে বসি' আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাহাদের কথা।
তারি মাঝে বসি আছে পতিব্রতা রমণী —
স্বর্গে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতী-শিরোমণি।
যেথা তারে সতীসর্ঘে গরবিনী যত
লাজহীনা লাজে শির করে অবনত।
তুমি কি জানিতে চাও? অন্তর্যামী তিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্ব-কাহিনী।

— রবীন্দ্রনাথ

বসন্তের লিপি

[কবির অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় একদা ছাত্রদের বসন্ত-উৎসব উপলক্ষে একটি কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন — তাহারই উত্তরে। কবিতাটি হস্তাক্ষরে ছাত্রদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।]

বন্ধু, আমারে পাঠায়েছ লিপি — উৎসবদক্ষ-হিতে
লিখিতে হইবে শ্লোক দুইচারি, 'ফাল্গুন-শুক্ল-গীতে'।
আজি এ প্রৌঢ়-বসন্তে কি গো ফুল-মঞ্জরী-শোভা
চিত্তে নবপ্রাণে হবে শিরুবন্ধু-মনোলোভা?
মনোমন্থীর বাজিবে কি আর চারু তব চাতুরীতে?
মোহিত হবে কি লোহিত-পরাগ মাধবের মাধুরীতে?

আকাশে তবুও বেহি যে তেমনি উদ্ভ্রান্ত নিশীথিনী —
আলোর ফুলেতে নীল শিরীষের রাঙা-রাগ-রঙ্গিনী।
ও কি তারা? না ও কাঁপিছে পবনে অভিসার-দীপশিখা?
অলকের ফুল? — মুক্তার দুল? — ধরিত্রীর ধলাটিকা?
অতিথি যে প্রেম তারো তিথি আছে — চাঁদের পানে সে চায়,
ধনিকা থামে, জোৎস্নার গায়ে চুমরণ করে কায়!
সে টিক-ঘুঘটী ঝিঁঝারে থেকে থেকে আজি এ চৈত্র-রাতে,
একটি কুসুম ফেলিবে সহসা ধরণীর পদপাতে।
সেই ফুললেখা — অনুরাগ-তুলি—জানিবে সে অভিমানী
যৌবন-বনে এক ফাল্গুন জীবন-পৌর্ণমাসী।

ফোল-ফোলনে ঢিলা হ'য়ে লোহাগ-বেণী যাক্ খুলে;
ঢাকা দিয়ে রাখিস্‌নে মুখ, ঢাকা' তোরা
চোখ তুলে'।
মনের কোণে যা রয়েছে,
আকাশ-বাতাস বলতে চেয়ে,
ফাগী-চাঁপা-বুই-বেলাতে যখিন যা'বা যায় ভুলে'—
ঢাকা' তোরা চোখ তুলে'।

চৈত্র-রাতি, আকুল ধরিত্রী ফুলগন্ধে,
ঘর ছেড়ে চল্ তরঙ্গিণীর পথ ধরে'।
ফেলে পুলিনে নীল-সলিলে
খেলুনি খেলা সবাই মিলে,
মন্ত্র নিবি বন্-বিহারীর মন্ত্রে, —
সে যে বাঁশীর তানের তাক দিয়েছে নাম ধরে'!

—করুণানিধান

হোলি

[প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক — স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 'হোলি' এখনও উত্তর-ভারতের উৎসব, এবং তাহাতে সেই প্রাচীন্ বসন্ত-মহোৎসবের প্রকৃতি লুপ্ত হয় নাই। একালের সেই খাঁটি লৌকিক উৎসব এখালে কেমন করিয়া একটা ধর্ম-সম্পর্কিত উৎসবে পরিণত হইয়াছে লেখক তাহার একটু ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি অন্য ভাবেও জ্ঞানপ্রদ এবং শিক্ষাপ্রদ হইলেও, লেখক ইহা রচনা করিবার কালে বাংলার 'দোল'-উৎসব বিশেষ করিয়া স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দোল-উৎসবের ইতিহাস যতই — তাহা বাংলার ইতিহাস, বাংলার বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত জড়িত — সেই পাল্লেরই সৃষ্টি। বাংলার ঐ 'হোলি'-উৎসব কখনো ছিল কি? 'মদন-চতুর্দশী' বা 'অশোক-অষ্টমী' ঠিক ঐ ধরনের উৎসব নয় — যেগুলির অস্তিত্বলোপ অনুষ্ঠিত হইয়, এখনও উহার একটা লৌকিক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব: প:]

'রত্নাবলী' নাটিকায় যে মদন-মহোৎসবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে লুচিত সংবর্দ্ধনার সহিত সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইত। তখন নাগরিকগণ বসন্তসমাগমে আম্রমঞ্জরীর নবোদ্গম প্রতীক্ষায় উৎসুকের সহিত দিন গণনা করিত, এবং উৎসব-দিন উপনীত হইবামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কিয়দ্দিবসের জন্য প্রশান্ত শিষ্টাচার তিরোহিত হইয়া অশ্লীল নৃত্যগীত, ধূলা, কুঙ্কুম ও আবীর প্রভাবে, সমস্তে উদ্ভূসিত হইয়া উঠিত। রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই সে মহামহোৎসবে যোগদান করিতেন। বসন্ত বিজয়-যোগায় নাগরিক-দুর্গোৎসবে নবতন্ত্র শঙ্খনাদ করিয়া তুলিত। ইহা ভারতবর্ষের বহু পুরাতন জাতীয় মহোৎসব।

বহুদিন হইল, এই জাতীয় মহোৎসব তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; কেবল তাহার স্মরণ "হোলী" অধিকার করিয়া অদ্যাপি আবীর-কুঙ্কুমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, — কিন্তু শিক্ষিত সমাজে তাহার প্রভাবও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে।

সম্প্রতি 'রত্নাবলী'-নাটিকার যে অনুবাদটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, — "কোন্ সময় হইতে এ দেশে বসন্তোৎসব হইতে হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব আরম্ভ হয়, ইহা একটি ঐতিহাসিক রহস্য।" এই রহস্য ভেদ করিবার পর্য্যন্ত উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ অতি ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু উৎসবের বাহ্যবেশের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; নামের পরিবর্ত্তনও সংসাধ্য। বর্ত্তমান "হোলি" বা "হোরী" শব্দ পুরাতন "হোলাকা" শব্দের সংক্ষিপ্ত পাঠ। "হোলাকা"র অর্থ বসন্তোৎসব। বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া বসন্তোৎসবকেই বসন্তোৎসব বলিত। জনসাধারণের মধ্যে বসন্তোৎসব "হোলাকা" নামে পরিচিত ছিল; তাহাই এখন "হোলী" নাম ধারণ করিয়াছে। হোলাকার সেকালের নাগরিকগণ আবীর-কুঙ্কুমে সুশোভিত হইয়া, নাগরী সঙ্গে দোলারোহণ করিতেন বলিয়া তাহা "দোল" নামেও পরিচিত ছিল। এই দোল একদিনে শেষ হইত না, সমগ্র বসন্তঋতু করিয়া হিন্দোলা আন্দোলিত হইত;

এক দাদা প্রভৃতি, সকলেই বিবাহের পরে যাইতে যাইতে বাসরঘরে মাতৃ বিস্তার করিতেন। মহাকবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে এই দোলোৎসবের আনন্দ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এই মদনোৎসবের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, কোন্ সময় হইতে ইহার সূচনা বা তাহা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান দোলোৎসবরূপে পরিণতি হইল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা কঠিন হইলেও, একেবারে অসম্ভব নহে। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার তথ্যনির্দেশন-প্রণালী প্রদর্শিত হইল। পুরাণে মদন-মহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; নাটকাদিতে তাহার লৌকিক চিত্র স্পষ্ট চিত্রিত রহিয়াছে। প্রকৃতিনির্ণয়ের তত্ত্ব ইহাই আপাতত যথেষ্ট।

ভবিষ্য, ভবিষ্ট ও মৎস্যপুরাণে মদনমহোৎসবের পদ্ধতির প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে সর্বাধিক বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে এই মদনোৎসব আরম্ভ হইত। তিথিগুলি যথাক্রমে মদনদ্বাদশী, মদনত্রয়োদশী ও মদনচতুর্দশী নামে পরিচিত ছিল। রঘুনন্দন স্মার্ত-শিরোমণির 'অষ্টবিংশতিতত্ত্বে'ও মদনচতুর্দশীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পূজাকালে ব্রত মধ্যে পরিগণিত হইত। অন্যান্য ব্রতের ন্যায় ইহারও ফলশ্রুতি ছিল; সাধারণ ফল আপনের বিনাশ, বিশেষ ফল পুত্রলাভ। মৎস্যপুরাণকার কামনার গুরুত্বহীনতা সুচিত করিয়াই ব্রতপালন করিতেন। তাহাতে উপবাস ছিল, কঠোরতা ছিল, আত্মস্বীকার ছিল; ব্রতান্তে দক্ষিণাদান ও ব্রাহ্মণভোজনেরও ব্যবস্থা ছিল। পূজা, ব্রত, উপবাসাদি ইহার সাত্ত্বিক অঙ্গ, নৈবেদ্য ও কুসুমোদ্যম রাজসিক ও তামসিক অঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার সঙ্গেই জনসাধারণের বৃত্তি সংঘ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে যে অর্থ সংগৃহীত হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাজারে আবীর-কুঙ্কুম সহার্ঘ হইয়া উঠিত, রাজপথে অবাধ্যবিদ্ধে গমনাগমন কষ্টকর হইয়া পড়িত, উদ্যুক্ত বাতায়নে উপবেশন করিবার উপায় ছিল না; ধারাযন্ত্রনিক্ষিপ্ত সলিলসেকে শীতকায় করিতে হইত।

'রত্নাবলী'তে দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী বাসবদত্তা অশোকতরুমূলে কামদেবের অর্চনা করিয়াছিলেন। অর্চনান্তে সৌভাগ্যবতী সবত্নাগণ যে পতিপাদের পূজা করিয়াছিলেন, বাসবদত্তা তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। অশোকতরুই মদনপূজার প্রধান ক্ষেত্র। সিন্ধিয়ারক বলিয়া অশোক পঞ্চবাণীর অন্যতম।

অশোকতরুমূলে মদনপূজার ব্যবস্থা হইবার বোধ হয় আরও একটু কারণ ছিল। অশোক কামিনীকুলের সর্বশোকবিনাশক, স্ত্রীরোগনিবারক অব্যর্থ ঔষধ। চৈত্রমাসে অশোকতরু মঞ্জরিত হইবার সময় হইতেই মহিলামণ্ডলীর সাধারণ অশোকব্রত-পালনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্র-শুক্লাষ্টমীতে অশোকাষ্টমী পুত্রবতীর পক্ষে অবশ্যপ্রতিপাল্য ব্রত; চৈত্র-শুক্লা-অষ্টমীতে অশোকাষ্টমী ব্রতে অষ্ট অশোককলিকা-পানের অন্যে ফল কীর্তিত। এই সকল কারণে মনে হয়, বুঝি বসন্তসমাগমে নানা ব্রতনিয়মব্যপদেশে মহিলাগণের অশোকমূলে সমবেত হইবার ব্যবস্থা করিয়া শারীরবিধান কৌশলে স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল পুরাতন প্রথা কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কি না, তাহা জানিতে না পারিলেও, সেকালের গৃহস্থের বাসনাদের' মূলোচ্ছেদে আর অশোক যে পরম-সমাদরে প্রতি-পালিত হইত - তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন এই সকল স্থান অকস্মাৎ বিচিত্র বিদেশীয় পাদপ ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া লইয়াছে। বিদেশীয় পাদপের ন্যায় বিদেশীয় রুচিও আমাদের আন্তরিক স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়া আমাদিগকে

পরমানন্দপ্রদায়ী দামগ্রাহিতে পরিণত করিয়াছে। এখন অযোক্ত হইবে না কেন?

এই মহোৎসবের উদ্যম দৃশ্য "রত্নাবলী"তে কেমন সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে;—যেন এখনও তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান। রথযাত্রা প্রতিলক্ষিত করিয়া নগরের উদ্যম রাজবিনায় চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়াছে; রাজবন্দিনিগৃহের সুরক্ষিত মালিগণের গৃহাঙ্গন প্লাবিত ও অন্তরাপণবিহঙ্গনিকর কর্দমিত হইয়া উঠিয়াছে। মাতিয়া মাতিয়া বিশোরীগণ পরিশ্রান্ত হইলে, প্রসাধনের কণ্ঠাহারে বিশ্রামলাভ করিয়া, পুনরায় মাতিয়া উঠিয়াছেন,—সে দৃশ্য কি হৃদয়োন্মাদক!

এই মদন-মহোৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীতের ন্যায় নাটকাভিনয়েরও ত্রুটি হইত না। শ্রীহর্ষদেবের সভায় মদন-মহোৎসব উপলক্ষেই 'রত্নাবলী' নাটিকার প্রথম অভিনয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই শ্রীহর্ষদেব সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের বংশের দ্বিতীয় বৈমাত্রিয় নামে পরিচিত। তিনি ৬১০ হইতে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তৎকালে প্রসিদ্ধ চৈনিক সন্ন্যাসী হিউএন্থ্সাঙ্গ ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীহর্ষদেব সমগ্র উত্তর ভারতের সার্বভৌমিক সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রত্নাবলীর প্রস্তাবনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহার রাজধানীতে মদন-মহোৎসব উপভোগ করিবার জন্য বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কথা। তখন পর্যন্তও ভারতবর্ষের প্রবল প্রতাপে এসিয়াখণ্ডের জলস্থল সমুজ্জ্বল ছিল;—স্থলপথে গান্ধার, বাহ্লীক, চিনস্থান, তাতার ও মহাচীন, এবং জলপথে লঙ্কা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও জাপান পর্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হইত; ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরকে বাণিজ্যকুশল ভারতীয় বণিকগণ অর্ণবপোতে দীর্ঘদীপান্তরে গমনাগমন করিত; নালন্দার সুবিখ্যাত বৌদ্ধ বিদ্যালয়ে নানাদেশের নানাজাতির অধ্যয়নশীল ছাত্রবৃন্দ বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন করিয়া ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে দেশ-বিদেশের ধন করিয়া ভারতগৌরব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিত। সেই গৌরবের দিনে মদনোৎসবে যে পুঞ্জীকৃত রাজকুসুমরাশি সমাহৃত হইত, তাহাতে কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারসিক কুসুমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপে ও গন্ধে পার্থক্য থাকায় কুসুম উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীভেদে বিভক্ত ছিল।

এই সময়ে ইসলামের মহোল্কিত মহাশক্তি ধীরে ধীরে পশ্চিমসমুদ্রতীরে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। যখন তাহা তেজ ও তরঙ্গলীলায় সমুপাগত হয়, তখনও ভারতবর্ষে মদনমহোৎসবের প্রাধান্য ছিল। অল্প বেরুনীকৃত ভারতবিবরণীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন পর্যন্তও হোলাকা হোলীতে পরিণত হয় নাই। শ্রীপুরুষোত্তমদেবকৃত 'হারাবলী' নামক সুবিখ্যাত শব্দকোষের 'হোলাকা' বসন্তোৎসব নামেই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাওয়া যায়। মারাঠী-ভাষানিবদ্ধ 'কবিচরিত্র' নামক গ্রন্থে পুরুষোত্তমদেব শালিবাহন-শকাব্দীর চতুর্দশ শতকের কলিঙ্গাধিপতি বলিয়া পরিচিত। এই 'হোলাকা' শব্দ 'হোলী ইতি ভাষা' বলিয়া দশরূপকের টীকায় প্রথম ব্যাখ্যাত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মুসলমানশাসন-সময়েই যে পুরাতন হোলাকা আধুনিক হোলী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

যাহা জাতীয় অনুষ্ঠানরূপে দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে, তাহা সহসা তিরোহিত হইতে পারে না। বৌদ্ধযুগের রথযাত্রা তিরোহিত হয় নাই রথারূঢ় বুদ্ধমূর্তির পরিবর্তে নারায়ণবিগ্রহ আসনগ্রহণ করিয়াছেন। মদনমহোৎসবেরও এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মদনমহোৎসব পরাধীন জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম। অবরোধপ্রথা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সুতরাং মুসলমান শাসনের সঙ্গে এই মহামহোৎসবের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত

করিয়া দিয়াছে। পুরাকালে মদনভস্মের সঙ্গে বিষ্ণু-পূজাও অনুষ্ঠিত হইত; মদনভস্ম অন্তর্হিত হইয়া বিষ্ণুপূজাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। উভয় পূজারই বাহ্যিক প্রভেদ ছিল; সুতরাং আবীর-কুঙ্কুম, দুর্বাদির সমভাবে প্রচলিত আছে; কেবল, যে-উৎসব যুবকগণের বিশেষ অধিকারে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা পুরুষদেরই স্থান লাভ করিয়া যুবতীদিগকে দূরে-গীত, দোলাদোল হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা অন্যান্য আবীর-কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি করেন; কিন্তু তাহাতে মদন-মহোৎসবের উদ্দামতার অভাব।

মদন-মহোৎসব হোলীতে পরিণত হইবার পরেও বহুকাল পর্যন্ত হিন্দুর সর্বপ্রধান পর্ব বলিয়া মুসলমানদিগের নিকট পরিচিত ছিল। কোম্পানী-বাহাদুরের শাসন-সময়ের "কলিকাতা রেকর্ডে" যে দুইটি তালিকা মুদ্রিত হয়, তাহাতেও দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও হোলীর দুটী সর্বাপেক্ষা বড় দুটী ছিল; — দুর্গোৎসব তাহার তুলনায় কিছুই নয়। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে জন-সমাজের আচার-ব্যবহারের ন্যায় উৎসব-আনন্দের প্রকৃতিও যে কতদূর পরিবর্তিত হইয়া যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সেকালে যে সকল জাতীয় মহোৎসব প্রচলিত ছিল, সে সমস্তই বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত হইয়া নূতন মহোৎসবের প্রচলন করিয়া দিয়াছে। ইতিহাসের অভাবে সমাজ-বিপ্লবের প্রচলিত উৎসবগুলিকেই চিরপুরাতন বলিয়া ধৃষ্টতাপূর্ণ করিতেছেন।

মদন-মহোৎসবের ন্যায় আবীরও ক্রমশঃ রূপ পরিবর্তন করিতেছে। আর কিছুদিন পরে আবীরের "লালে লাল" দৃশ্য রহিত হইয়া উঠিবে; এখনই দেশের সমস্ত বিলাতী দ্রব্যের প্রভাবে নাগরিকগণের উত্তরীয় ও পরিধেয় — নীল, বেগুনি, নানাবর্ণে রঞ্জিত হইতেছে। প্রাচীন মদন-মহোৎসবে আবীরের লাল ও কুঙ্কুমের পীত বর্ণেরই প্রাধান্য ছিল; অন্যান্য "কৌসুম" ব্যবহৃত হইত। বাহ্যপ্রকৃতির বসন্তোদ্গমের বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে এই সকল দ্রব্যের বর্ণ-সামঞ্জস্য ছিল। যথা : —

"বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে আজা যেন অরুণ উষা,
কুঙ্কুমের চূর্ণে লেখা চারিদিক্ পীতবর্ণময়।
বর্ণ-আভরণ-আভা "কিংশুকাক্ত" পুষ্প ফোটে কত,
তাহা তাহা পুষ্পভারে তরুলতা বিবশা অবনত॥"

মদনোৎসবে পুষ্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল; হোলীতে সেরূপ পুষ্প-সমারোহ নাই। পুষ্পের সঙ্গে মাসের সৌরভও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

মদন-মহোৎসবে যে সকল প্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে আবীর কুঙ্কুমের নামমাত্রই বর্তমান; দুর্মূল্য বলিয়া কুঙ্কুম পরিত্যক্ত হইয়াছে, বিলাতী-বর্ণচূর্ণ প্রভাবে আবীর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। মদন-মহোৎসবে নাগর-নাগরী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া বিহারোদ্যানে গমন করিত; এখন তাহা ঐতিহাসিক-চরণাঙ্কিত রহিয়াছে। এই পরিবর্তনের মূলে মুসলমান শাসনের ন্যায় বৈষ্ণবাচারের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। "শুষ্ক বৈষ্ণব বিষয়বিরক্ত অনাসক্ত ভাবে আত্মবৎ সেবাপেক্ষতি প্রচলিত করিয়াছেন। যাহাতে আত্মসুখ, তাহাই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে বলিয়া, ভগবানকে এখন অনেকাংশে নিবারণের জন্য মশারি পর্যন্ত ব্যবহার করিতে হয়। অন্নের ন্যায় ব্যঞ্জন ও দোলায়োহণও এইরূপে ভগবানের ভোগোৎসবের মহিমা বৃদ্ধি করিতেছে। পুরাকালের মদনমহোৎসবে এরূপ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যাইত না। তখন মানবসমাজ সরল শিশুর ন্যায় আনন্দে হাসিত, উৎসবে নাচিত, উল্লাসে উন্মত্ত হইত; বুকের মধ্যে চিন্তার আগুন চাপিয়া রাখিয়া মুখে প্রসাদবিকারী দর্শকমণ্ডলীর ন্যায় শুষ্ক মস্তিষ্কে বসিয়া থাকিত না। এখন কাহার ঢাকা বুকের মধ্যে কি থাকে, কেমন করিয়া বলিব?

তাই আমরা যেন বুক ফুলাইয়া দেশবাসীর মনোযোগকে ফুলচিপুর অশ্লীল দেশাচার বলিয়া নিন্দা করি। আমাদের ফুলটি ও সমাজের আবর্জনাকে ফুলিবার অতল দলিলে ভবিষ্যতের ইতিহাস তাহার গভীরতার পরিমাণ করিবে।

আজি দখিন দুয়ার খোলা।
　　তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
　　কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো,
　　এই সঙ্গীত-মুখরিত গগনে
　　তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো,
দিও ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে॥

মোর পরাণে দখিন-বায়ু লাগিছে
কারে গায়ে গায়ে তব হাসি' বাগিছে,
　　এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী
　　কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে?
　　ওগো সুন্দর, বঁধু, কান্ত,
　　তব গভীর আহ্বান কারে॥

— রবীন্দ্রনাথ

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, সংস্কৃতের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

স্বরাজ-সাধনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

[তাহার দিয়া প্রবন্ধটির শেষ অংশ প্রকাশিত হয় নাই (পূর্ণ সংখ্যা হইবা)। তথাপি যতটা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই পাঠকদিগকে উপহার দেওয়া হইল। লেখকের বক্তব্য তাহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে বক্তব্য এই যে, আমাদের স্বরাজের আদর্শ বিদেশী হইতে তাহা প্রেমহীন, শক্তিহীন, ও ধর্মহীন হইবে; অতএব ভারতের সাধনা ও সাধ্যের এবং তাহার চরিত্রনিহিত যে ধর্মজ্ঞান তাহার উপরেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা না হইলে এ জাতি আত্মহারা হইবে; আত্মহারা হইলে স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। এই সম্বন্ধে তিনি আর একটি কথা বলিয়াছেন — গান্ধীজির 'অহিংসা'র অর্থ কি, হিন্দুর 'অহিংসা' হইতে তাহা কিরূপ অহিংসা — তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অহিংসা শক্তিসাপেক্ষ — যে শক্তি প্রকৃত অহিংসা-শক্তি তাহা বৌদ্ধ-জৈন, বা পরবর্তীকালের বৈষ্ণব-সাধকের আদর্শ নয়, তাহা আত্মরক্ষার শক্তি — যে শক্তি শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শ-বীর, তথা আদর্শ-নৃপতির আসনে বসাইয়াছে। তিনিও যত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাতেই ক্ষাত্রধর্মের ও ক্ষাত্রবীর্যের মহিমা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। উহাই হিন্দুর স্বরাজ-সাধনার আদর্শ।]

বৈষ্ণবকুলচূড়ার আবির্ভাবে মহাত্মা গান্ধীর চরণে প্রণামপূর্বক আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, স্বরাজলাভ হইবার শক্তি কি আমাদের আছে যে, তিনি নন-কোঅপারেশন হইতে বলিয়াছেন? তবে কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ ডেপুটি কোন্ কাউন্সিলরে কো-অপারেশন করিতেছিল বা তবে কো-অপারেশনে সমস্ত জন আসিলনের মূলে যাহা আমাদিগের দিকে প্রসারিত হইয়াছিল যে, তিনি কো-অপারেশন করিতে নিষেধ করিয়াছেন?

যোদ্ধবর্গ জন্মভূমি ভারতবর্ষ বহু দিন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৈশ্যদলের মধ্যেও অনেকে ছাগোপকারক জীবন্ত মানবের রক্তপান করাইয়া

অহিংসমন্ত্রের মহিমা রক্ষা করেন; কিন্তু প্রবল শত্রুর সম্মুখে আমাদের ন্যায় প্রবুদ্ধ জাতি কিরূপ আচরণ করিবে কিম্বা করিতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ধারণা আছে কি না সন্দেহ :—

"কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ
দুই সয়ে হয়ে বুঝ
অহিংসা পরমো ধর্মঃ ফিল খেয়ে মরে।"

শক্তিহীনকে কি কেহ কখনও সম্মান করিতে পারে? শক্তিহীনের দ্বারা কি কোথাও কখন কোনও কার্য সম্পাদিত হইয়াছে বা হইতেছে কি? অপরাহ্ণে সেনানী যখন বিজয়োদ্যত অসি-করে অরি-কুলকারী কামানের মুখে অগ্রসর হয়েন, তখন আমরা তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বাহবা দিতে থাকি; কিন্তু অন্তর্নিহিত কঙ্কালসার অস্থিসার বোঝাটি দেখিয়া কি একবার ভাবি যে, তাঁহার ঐ অস্থিপঞ্জর প্রকৃতির উৎপাত-উপেক্ষাকারী কি মহাশক্তি! মনের কি অলৌকিক দৃঢ়তারের প্রভাবে দুর্বল রিপুপ্রপোড়ক বাহেন্দ্রিয় সকলকে তিনি বশে রাখিয়াছেন।

কেবল বাহুবলই বল নহে, সংহারশক্তিই শক্তি নহে। পুরাকালেরা শিবের অর্থই সংহারশক্তির সংস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। শিব অর্থে কল্যাণ; কল্যাণের জন্যই সংহারশক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। ঐ শিবশক্তির যে প্রকাশ কৈলাসের বিলাস ছাড়িয়া শ্মশানবাসী; যাহার উচ্চ, গরল যাহার ভূষা, গলে যাহার হাড়মাল, কটীতে বাঘছাল, সেই শিবের চির-কল্যাণময়-ধ্যান-পরায়ণ পার্বতীরূপী মহাযোগীই ইন্দ্রত্বৈভবধারণে — সংহার-শক্তির প্রয়োগকরণে উপযোগী।

ছুঁৎমার্গী ইংরাজী উপাধিয়া অনেক অজ্ঞ বিজ্ঞের কাছে এ দুর্ভিক্ষ করিয়া বলিয়া থাকেন, চৈতন্যের বৈষ্ণব-ধর্মই বাঙ্গালী জাতিটাকে ভীরু ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। বটে! শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র-কথা কি পড়া-শুনা আছে? — যথার্থ বৈষ্ণব কি চক্ষুতে দেখা আছে, — যা সকালবেলা যবনী বাজাইয়া ভূপতি উঠে করিয়া মঙ্গিরাবোপনস্তরিনী সেবা-বাসী সঙ্গে যে বাবাজী মহাশয়েরা দ্বারে দেখা দেন এবং করতাল কটিতে কৃষ্ণনামের পরিবর্তে রেলগাড়ীর গানও গাহিয়া থাকে, তাহাকে দেখিয়াই বৈষ্ণব-ধর্মের সমস্ত মর্ম অনুভব করা হইয়াছে! বেশী দিনের কথা নাহ, সেই সেদিন অসহযোগের সময় যখন কলিকাতায় পুলিস কমিশনার এক ইস্তাহার জারী করিলেন যে, দশের বেশী ব্যক্তিরা কেহ আর কোন সাধারণ স্থানে বক্তৃতা করিতে পারিবে না — অমনই বড় বড় ছাতধরিকরী বাক্য-বীর অভিমান-দুর্গ হইতে খরশাণ বাণ বর্ষিত করিতেছেন — কাহাকে লক্ষ লক্ষ অনুযায়ী যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, আর যদ্যে মধ্যে শার্ট হইতে 'ওয়েষ্ট ব্যাণ্ড' খুলিতেছেন; আর কোথায় কোন্ অনেইবল হুকুমেদুল বসিয়া আছে তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। বক্তৃতা peroration চলিতেছে; —

"And I say this with courage undaunted twice twenty times trampling down under the soles of my Monteith-made boots all threats of oppression, all fear of man-manufactured law, I say with all the emphasis I can command — ডাহিনের লোহার prompt করিল "ইটা বেজে ১৪ মিনিট", অমনই emphasis-এর পর ellipsis;— খাদিবস্ত্রের বীর ব্রতিতে ট্রামে উঠিয়া সর্বপ্রকার বিলাতী বস্ত্র বয়কটের প্রতিজ্ঞা উঁহাদের মধ্যে দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন।

আর ঠিক ঐরূপ অবস্থায় নবদ্বীপের বীর কৌপীনধারী গৌরাঙ্গের কার্যটা একবার স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। সবেই হিংপ্রক এখনও আছে, তখনও ছিল, তাঁহাদের প্রয়োচনায় কাজী হুকুম জারী করিলেন, নগরে কেহ সংকীর্তন করিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিবেন না। দুই এক জন ভক্ত

এই সংবাদ মুখে মুখে গিয়া মহাপ্রভুকে জানাইল। তিনি বলিলেন, "তাহার কি ভয় যাবে, সন্ধ্যার পর শ্রীবাসের অঙ্গনে যেন সমবেত হওয়া হয় সেইরূপ সেখানে যেও, তার পর যা হয় দেখা যাবে।— আর দেখ, অস্ত্রধারী যারা, যাবার সময় এক এক গাছা লাঠি আর একটা ক'রে মশাল হাতে ক'রে যেও।" সন্ধ্যার সময় শ্রীবাসের অঙ্গনে (যে ভক্তবীর শ্রীবাস একদিন অন্তঃপুর হইতে পুত্রের মৃতদেহ আনয়ন করিয়াও পরে মহাপ্রভুর উদ্ধারকীর্তনে আবদ্ধ হন, এই ভয় পুত্রশোক অন্তঃকরণে রুদ্ধ করিয়া সমাজে সকলের সঙ্গে "জয় জয়" করিয়া বাহিরিয়াছিলেন সেই শ্রীবাসের অঙ্গনে) চারি পাঁচ শত জন করিয়া ক্রমে জন তিন বহির্দ্বার রুদ্ধ সমবেত হইয়া কীর্তনানন্দে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই এক হাতে লাঠী অন্য হাতে মশাল। গাহিতে গাহিতে কীর্তন জমিয়া উঠিল; কীর্তন জমিয়া গেলে কি হয়, তাহা যে কীর্তন করিয়াছে সেই জানে। তখন মনঃপুর ছাড়িয়া নগর ছাড়িয়া পৃথিবী ছাড়িয়া সে ছাড়িয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে; তখন আর কাজী নাই, নবাব নাই, বাদশা নাই; কে তখন ভাবে গায়ের কথা, বেত্রাঘাতের কথা, শূলদণ্ডের কথা, ফাঁসীকাষ্ঠের কথা! ভক্তমন তখন ভগবানের চরণে লীন; অহমদ্বারের অর্গল খুলিয়া প্রেমোন্মত্ত সৌম্যদর্শন ভাবাবেশে গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও বাহির হইলেন। পথে যতই অগ্রসর হয়েন ততই জনতার বৃদ্ধি; যাহাদের লাঠী ছিল না তাহারা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লাঠী করিয়া লইল, গাছের ডালের অগ্রের নিজের উত্তরীয় জড়াইয়া মশাল জ্বালিল, মহানগরচত্বরকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া হরিধ্বনির তরঙ্গপ্রবাহে নিমগ্ন হইল, দিগন্তর ভক্তজনের নর্ত্তনভাবে নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল। তাহার পর মহাপ্রভু কোথায় প্রবেশ করিলেন জান? — কাজীর ঘাটীতে (একবারে কাজীর বাটীতে!); কাজী শক্তিমান — বাদশাহের শক্তিতে তিনি বাদশাহের নামে আইন প্রচার করিয়া তাহার বলে প্রজাশাসন করেন; সেই কাজী দেখিলেন, যিনি বাদশাহের বাদশাহ, বিশ্বসংসারের একমাত্র ঈশ্বর, সেই চৈতন্যশক্তি সহস্র আকারে তাঁহার অঙ্গনে আবির্ভূত; এ শক্তির সম্মুখে তাঁহারও তীক্ষ্ণ সিপাহীর তরোয়াল, গোলন্দাজের গোলা ঘুরে থাক, ইহের বজ্রও নিষ্ফল।

প্রতি পাশবলাকার অগ্রভাগে যেমন অগ্নি-শক্তি নিহিত থাকে, প্রত্যেক মানবের অন্তঃকরণে সেইরূপ চৈতন্যশক্তি অধিষ্ঠিত; অজ্ঞ শিশু যেমন যথাস্থানে ঘর্ষণ না করিয়া দেয়াশলাই নষ্ট করে, অথবা হঠাৎ জ্বালিয়া ফেলিয়া নিজের অঙ্গুলি দগ্ধ করে, সেইরূপ নিঃসঙ্গ মানবও ঐশিক শক্তির অপব্যবহার করিয়া আপনাকে হীনবীর্য করিয়া ফেলিয়াছে।

যে পাশ্চাত্য জাতিকে আমাদের অনেকেই এক্ষণে আদর্শজ্ঞানে নিরীক্ষণ করিতেছে, তাঁহারা কতক পরিমাণে আদর্শস্থানীয় হইলেও সম্পূর্ণ আদর্শ যে নহেন তাহা আমাদের বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রতি প্রভাতে দৈনিক পত্রে জাতিক-সংবাদ-স্তম্ভে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, য়ুরোপে জাতিসকল পরস্পরের ভয়ে সতত শঙ্কিত। জার্মাণী ভাবিতেছে ফ্রান্সকে কিরূপে ঠকিয়ে দিবে; ফ্রান্স বলিতেছে, সেবারে বড় নাকাল করিয়াছিলে, এবার তোমায় হাতে পাইয়াছি, চর্ব্বিয়া খাইব। এখন তোমারে মর্দ্দন করিব; বেলজিয়াম ইটালী সোলোও, যে যাহার তাকে আছেন, কোন্ দিকে ছাতা ধরিলে আমার মাথায় কিছু জমা পড়িবে; রুসিয়া ত একেবারে রুখিয়া আছেন, মুখে বুলি — রক্ত! রক্ত! রক্ত! এখন ত ধরাতল রক্তে প্লাবিত করি, তারপর যদুবংশী আপনার মা খুড়ী কেলিতে পারে খুইয়া ফেলিবে, মা যদি মরাতলে

যাইবে; ইংলণ্ড যদের সকলেই বর্বর, আমাদের সাধু উপদেশ ত কেহই শুনে না, পূর্বেই শুনে করিয়া রাখিয়াছে আমি, একবার আমাদের ঘরাইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেই শান্তিজল ছিটাইয়া দি। কিন্তু ঘোর কলি, ব্রাহ্মণ-ভক্তি কাহারও নাই। ব্রাহ্মণকে আমার রক্ষিত করিতে সকলকে হইতে হইবে, আর কি বলিব!

হা রে মানুষ! তুই আবার বলিস্, একজন পরমেশ্বর আছেন! তুই আবার বলিস, সেই পরমেশ্বর সমস্ত জগতের পিতা! সকল মানুষ তাঁহারই সন্তান! মানুষেরা পরস্পর ভাই-ভাই! তাইতে হেসো করিতে, মানুষকে মারিতে গত আট বৎসরের মধ্যে যুরোপে যে সমস্ত মারিণ বা বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিলে শয়তানও শিহরিয়া উঠিবে! অহিংসা কেমন হয়, মানব-প্রকৃতির সমক্ষে ধরিয়া রাখিবার জন্যই এই সব সাংঘাতিক আবিষ্কার; অর্থাৎ 'হেয়' যখন দানব, তখন 'হ'দিয়ে'তেও দানব না হইলে চলিবে কেন? চমৎকার সিদ্ধান্ত! এই দেবতের পরমেশ্বরের পৃথিবী দানব-পুরীতে পরিণত করাই সভ্যতা! কিন্তু মানব! এক শক্তি আছে, যে তোমায় রক্ষা করে, যে তোমায় বড় ভালবাসে, যাহার অংশে তোমার জন্ম, যিনি তোমার দেবত্বকে কখনই দানবত্বে পরিণত হইতে দিবেন না। মানুষকে দানব হইতে দিবেন না বলিয়াই তিনি মেঘ বাজন করিয়া বারে বারে অবনীতে অবতীর্ণ হন; কখনও বহুরূপিণে রাক্ষস নাশ করিয়া, কখনও বামনীরূপে তোমায় প্রাণ স্নেহে পুলকিত করিয়া, কখনও পরশুরামের ন্যায় তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিয়া, কখনও তোমার জন্য নিজের বক্ষের রক্ত দিয়া, কখনও বা বাহু সত্যের মহিমা, ভক্তির মহিমা, ত্যাগের মহিমা কীর্তন করিয়া আবার তোমাকে তোমার দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় করিয়া যান।

শক্তির প্রয়োগ করিবার পূর্বে অস্ত্রে তাহা দেখা দরকার, অর্জিত করিয়া — জানা করিয়া প্রয়োজন।

মহাত্মা গান্ধীর Non-violent Non-Co-operation-এর (অহিংস অসহযোগ) অর্থ ও উদ্দেশ্য, বোধ হয়, এই শক্তি-সঞ্চয় করা। দেবভূমি ভারতবর্ষকে আবার অসুরাজের দেবশক্তির কেন্দ্রস্থলে উন্নত করিতে হইলে কঠিন সংযম দ্বারা মহাশক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন; গুণ্ডামির দাঙ্গাহাঙ্গামা বা সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃ করিয়া শক্তির অপব্যয় করা অনিষ্টকর জানিয়া তিনি ঐ সকল কার্য করিতে নিষেধ হইতে উপদেশ দেন, এই তাঁহার মর্ম-তাৎপর্য। আমার যাহাদিগকে নিজের দরকার একদিন নিজেই চালাইতে হইবে, আপনার মঙ্গল-কল্পে আপনি চেষ্টা করিয়া দেশ-নীতিতে রাজনীতি পরিচালনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহাদিগকে বলেন যে, বর্তমান জগতে লোভপ্রসূত, স্বার্থোদ্ধার স্বার্থকিঞ্চিত রাজনীতি হিন্দুর শুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত দানব-নীতি, সে কার্যের ব্যবহারিক প্রয়োগে সহযোগী হইয়া তোমাদের আত্মাত্মিক শক্তির অপব্যবহার করিও না। এই তাঁহার বক্তব্য-অভিপ্রেত। সংযম ভিন্ন যে শক্তি সঞ্চয় হয় না, পুরাণের প্রায় পত্রে পত্রে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদিকবি একটি আদর্শ রাজচরিত্র সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্যে সেই চরিত্র স্থান অধিকার করিবার পর কত সহস্রবর্ষ পৃথিবী সূর্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে, তথাপি আজিও লোক সেই সূর্যবংশপ্রদীপ চরিত্র-চিত্র দেখিয়া বলে, এ রাজা সাধারণ রাজা নহে, রামচন্দ্র নারায়ণের অবতার! অবতারের ঐশ আসনে অধিরোহণের পূর্বে একটি দশব্রত কাহিনীর দ্বারা উৎপথে যাইবার জন্য রামচন্দ্রকে যেরূপে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল, দশব্রত জানতে অতি পরিচিত বিষয় হইলেও আমরা একবার তুলাইয়া দেখা যাউক।

মেঘনাদকে শিক্ষা করিয়া বয়:প্রাপ্তির পূর্বে স্বয়ং রাবণকে একদল কটমোটোর সঙ্গে জীবন্ত রাক্ষস রাজধানী বধ করিতে প্রেরণ করিলেন; রাবণ যার কি রাবণ যাহাকে হইলে সমস্তকে বাড়ীর পাশে নিমন্ত্রণে পাঠাইতে — ইন্দ্রার্থ হরধনুর্ভি, সিঁড়ির পাশে দুইজন দারোয়ান, আর দু'পায়ের দু'পাটী জুতা খুলিয়া লইবার জন্য মন্ত্রী ও সেনাপতিকে সঙ্গে দিতেন! তাহার পর বিবাহ — হীরকিত পরীক্ষা দিয়া রামচন্দ্রকে জামাই করা হইয়াছিল; তখন যাকে দিয়া দিবি ছবে "আমি এখন থার্ড-ইয়ারে পড়ছি"-বলা সোজা পরীক্ষা নহে; ইন্দ্রজিতের অস্ত্রাঘাতে লক্ষ্মণের বিশল্যকরণী আনিবার সময় হনুমান যে ঔষধের গুণ দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য রামচন্দ্র সেই হনুমানকে ক্ষমা করিয়া অযোধ্যা-প্রত্যাগত সীতাদেবীকে স্বীয় সহধর্মিণীরূপে লাভ করেন। প্রকৃতির বালিকা।

নিজের বাড়ীতে অভিভাবিকা অপরিচিতার অপরাধের মধ্যে লক্ষ্মণ যখন যৌবনপ্রবেশ সময়েই রামচন্দ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত, তখন রাবণ লঙ্কাকণ্ঠ মহাবিঘ্ন ভাবিয়া বৈদেহীর অর্থে কুম্ভকর্ণ প্রমাদ করিল, পিতৃসত্যপালনার্থ মুষ্টি-মুষ্টি ছাই সিংহাসনের সোপান হইতে পা নামাইয়া জটা-বল্কল ধারণ করিয়া বনগমন করিলেন। রাবণ! হইলে তৎক্ষণাৎ রাজেন্দ্রের অফিসে গিয়া বি, সি, মিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চক্রবর্ত্তী, সরকার প্রভৃতি সমস্তদিগকে নিযুক্ত করিতেন। সঙ্গে যাইতেন, বিদেশী বন্ধু সীতা আর বিদেশের ভাই লক্ষ্মণ! বিদেশ্ গ্রাম হইতে এমন দুর্বল আত্মীয়কে স্বামীর হাতে পড়িয়াছেন বলিয়া নিজের লিখিত অদৃষ্টকে-দের ধিক্কার দিতেন, এবং 'ওয়াইভস্' সম্বন্ধে কড়া রেখে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া নিজের কটোগ্রাফে সমেত কোন মাসিক-পত্রিকায় ছাপাইয়া দিতেন। রাজ্যেশ্বরের প্রাণদণ্ড লক্ষ্মণ ধনু ছোড় বলিতেন, "রাবণ, পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম কোরো।" আর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্বৃদ্ধ ভরত এমন একটা এপয়েন্টমেন্ট ডিক্লী পাইয়াও রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে রামের বিরহ-আমরা একেবিকিটারী করিতে লাগিলেন! শুনিয়াছি, রামের বনগমন সময়ে প্রজারা ধূলায় লুটাইয়া ক্রন্দন করিয়াছিল, বীর-বাহু তোলাইয়া তাঁহাকে টাউনহলে লইয়া গিয়া কেন "গার্লাণ্ডেড" করে নাই!

যাহাতে একদিন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখী প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইতে হইবে এবং সেই দুঃখ মোচন করিয়া রাজ্যসুখের আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে, তিনি দুঃখের পথ বুঝিবার জন্য ভিখারী হইয়া বনে গমন করিবেন বৈ কি! এইরূপে ভিখারী হইয়া, কাঠুরিয়া হইয়া, বাঘ হইয়া রাজপুত্র রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া বনবাসে দুঃখের পাঠশালায় পড়ুয়া হইয়া রহিলেন। রামচন্দ্রের পরীক্ষা এখানেও শেষ হয় নাই। সীতার উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র অযোধ্যার তখতের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না, আপনার ভ্রাতৃ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া কপি-সৈন্যের সাহায্যে লঙ্কা-বিজয় করিলেন। এখনকার কয়জন ধনীর পুত্র গায়ত্রী কাঁধে ঝাড়ি হইয়া নিজের উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারেন বলা যায় না। এই দুঃখের পাঠশালায় এম, এ, উপাধি লাভ করিয়াও রামচন্দ্রের পরীক্ষার শেষ হইল না। লোকমত মান্য করা প্রধান রাজধর্ম; সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়া আপনার হৃৎপিণ্ড আপন হস্তে ক্ষতবিক্ষত করিয়া রামচন্দ্র দেখাইলেন, রাজ-ভক্তে লোকমতের প্রাধান্য কত অধিক।

রাবণ-পালনকর্ত্রী পরাজয়ের প্রতিভূ হইয়া প্রজাপতিরূপে তুমি কোটি কোটি নরনারীর ধর্ম, মন, জীবন রক্ষার ভার লইলে — কিটসের ফুলদল হেলান দিয়া মোটরে গড়ন রাখিয়া মোটা চাঁদা তোলাও রাবণী খাইয়া সেই দেব-দানব মনুষ্যের শক্তি কি দেখানে সঞ্চিত হইতে পারে!

মানব-দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জীবের মতো বাঁচিয়া থাকার পূর্বে, খাদ্যের অন্বেষণে সমস্ত জীবনই তাহাকে ঘোরাঘুরি করিতে হয়। সেই ঘোরাঘুরির ইতিহাস পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আবার দেখিতেছি, রাজসূয়যজ্ঞকালে ভারতের সমস্ত নরপতি যাঁহার সিংহাসনতলে মুকুটধারী মস্তক অবনত করিয়াছেন, সেই যুধিষ্ঠির সিংহাসনের সভায় একজন ঘোষণাকার। অবশ্যই তখনকার পূর্বাবস্থার সুকোমল মস্তিষ্কে-পরিচয় আজ উচ্চ-চক্রবর্তি আসনের ঘোষণা দাঁড়াইতেছেন; যে ত্রিপুরারিবিজয়ী অর্জুন একদিন দুর্যোধনের উচ্চের সিংহাসনের পার্শ্বে আসনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই অর্জুন আবার পূর্বে বেণী বিলম্বিত করিয়া নগ্নায়ক-বেশে উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাকে নাচ গানবাজনা নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। নকুল সহদেব কি না অশ্বপাল — সে-পাল! আর দ্রৌপদী — সিন্ধুমতী স্বাধীনা তেজস্বিনী পাঞ্চালী বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার সৈরিন্ধ্রী, কি না Lady's Maid! ভারতবর্ষ-সংস্থাপনের আদর্শ ভারতবর্ষের যাবতীয় মহাকাব্যের কাণ্ডে কাণ্ডে পর্বে পর্বে আখ্যানে উপাখ্যানে প্রদর্শিত আছে। ইংরেজের পশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি আমাদের আদর্শ নয়। ওঁহাদের মন্ত্র ভোগ, আমাদের মন্ত্র ত্যাগ।

স্বরাজ কি একটা জমিদারী যে, পাট্টা কবুলতী লিখাইয়া জেরেটাকী করিয়া লইবে, বা মাটির আধার বিশাখী চর দখল করিয়া তাহাতে ধানপাতি করিবে?

ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন স্বাধীন হইবে তখন দেশ ও আপনা আপনি স্বাধীন হইয়া যাইবে। একে ত জন্ম-মরণ প্রকৃতির রাজ্যের মানব স্বতাই স্বাধীনতা-সূত্র, তাহার উপর সভ্যতার অর্থ দাঁড়াইয়াছে — অভাবের উপর অভাব সৃষ্টি করিয়া, তাহা পূরণের জন্য লালায়িত হওয়া, এবং এই লালসার বশে, শিক্ষার নামে শিল্পের নামে কলার নামে বিজ্ঞানের নামে ধর্মের নামে, এমন কি ধর্মের নামেও, কেমন করিয়া কাহাকে কাহাকে করিয়া অপরকে শাসিত করা বা শাসিত হওয়া। কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন: —

"কাঠুরিয়া জাতি মোরা কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি নিত্য খাই দুঃখ নাহি জানি॥"

সুস্থ শরীরে নিত্য আন নিত্য খাও, ঈশ্বরানী ঈপ্সিত থাকিলে তাহাকে কিছু বাঁচিয়া যাও — এই একমাত্র নীতিতে দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, নচেৎ সংসারী লোকের দুঃখের হাত এড়াইবার অন্য উপায় নাই। আর পেটের ঝোড়া থাকিলে পীড়াও নিশ্চিত হইতে বাধিত হয়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এ দেশের অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিতই স্বাধীন ছিলেন। পর্ণ-কুটীরবাসী হরিতাদি অগ্নি অগ্নিহোত্রী, অতিথি-সেবার জন্য সদা অনাহূত সকলেরই জন্য প্রস্তুত। রাজা কিনু কি মুসলমান কি খৃষ্টান তাহার জন্য ভ্রূক্ষেপ ও নাই। পাঠশালা বিদ্যার্থী উপস্থিত হইলেই, বিনা উপায়নগ্রহণে বিদ্যাদান, আবাসিত হইলে নিঃস্বার্থ-সেবা ও বিনা-ব্যয়ে, আর গ্রাম্য চতুষ্পাঠীর নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য আর্থিক মাত্র পরিধানে সর্বত্র সমান।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, সকলে চরকা কাটা আর খদ্দর পর, অর্থাৎ সহজ গ্রামভাবে আপনার জীবন-যাত্রা নির্বাহ কর। অমনি ধনকুবের যেমন লোমার ফ্রক্রাক্ষমালা গলদেশে বিলম্বিত করেন, সেইরূপ কি তিনি বলিয়াছেন যে, তোমরা ফুলান-চেয়ারে বসিয়া মার্বেলের টেবিলের উপর মেহগিনির চরকা ঘুরাইয়া দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি বৃদ্ধি কর! আর খদ্দর পরিয়া বিলিয়ার্ড খেল, কি মোটরে পার্কে বেড়াইতে বাহির হও?

ইংরাজ এদেশে আছে কি জন্য? কেবল ইংরাজ বলি কেন, ফরাসী জার্মাণ ইটালিয়ান আমেরিকান সুইস জাপানী চীন এমন কি, মাড়োয়ারী ভাটিয়া

মুহূর্তী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোক আপনার স্থানের কোন ছাপিয়া এই বাঙ্গালা দেশে আসিয়া পড়িয়া থাকে কেন? নিশ্চয়ই পঞ্চাবের ভাকী-পনি চন্দ্রনাথদের ও তাহাদেরও বড়ো দিবার জন্য নহে; নিশ্চয়ই বর্ধমানের সীতাভোগ, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, ক্ষীরের সন্দেশ, নবীনের রসগোল্লা, পশ্চার ইলিশ, তাঁতার মসলিন, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, ফরেটগ্রাম ঝিঁড়ে, আর মৈমনসিংহের ঘী খাইবার জন্য নহে। তাহাদের লক্ষিত বস্তুসমূহ একমাত্র কুটুম্বিতা — তাহারা বিক্রেতা, বঙ্গ ক্রেতা। মুসলমানের ভয় অন্ন-বিদ্বেষের প্রেরণা ঘাড়ে চাপিয়া আমাদিগকে বড়ই আতঙ্ক করিয়াছে, তাহার সময়ে মিউনিসিপ্যালিটী বাস্তব অস্তিত্ব লোপ করিয়া দুইই ধাত্রা বিস্তার করিয়াছেন; আর বিদেশীর লোভান দুইই লক্ষ লক্ষ অন্নহীনের কথা শোনাইয়া চৌর চৌর করিতেছে। এই ভয়ের ভীতা বড়ই অসহায়ের মতই দেখিতে বাঙ্গালার হাওয়া আর সিলেটীর মেয়ে বড়ই হইতে না। অসহিষ্ণু ব্যবহার্য মন্ত্র আপনি প্রস্তুত হয়, আপনি বিস্তৃত হয়।

আমাদের ঘরে পিপীলিকার সার দিলেই যদি কেহ মারিয়া বা কাঁটাইয়া পিপীলিকা নিঃশেষ বা দূর করিতে চেষ্টা করে, আমি তখনই তাহাকে নিবারণ করি এবং খুঁজিয়া দেখি কিসের জন্য এত পিপীলিকা আসিয়া জমা হইতেছে। খুঁজিতে খুঁজিতেই পাওয়া যায় — হয় ত কোথাও এক টুকরা বাতাসা-ভাঙ্গা বা একখানা আতপচালের ঠাঁয়ে পড়িয়া আছে। আমি সেটা উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়া স্থানটায় একটু জলহাত বুলাইয়া লইতে বলি, আর দেখিতে দেখিতে কোথায় কোন্ দিক দিয়া সহস্র সহস্র পিপীলিকা যে মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা বুঝা যায় না। বন হাতে মিষ্টির গুঁড়া ছড়াইতেছে, মরা আতপচাল ফড়িং মাছি খোলতা ছড়াছড়ি করিতেছে, আর বলিতেছে, পিঁপড়ে তুই আমার ঘরে কেন?

আমাদের ঘরখানি শুদ্ধরূপে পরিণত না করিয়া অন্ত আবশ্যক দিয়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাখিলে কেবল যে উহার আয়তনের পিঁপড়ের উপনিবেশ উঠিয়া যাইবে তাহাই নহে; মাছি মশার উৎপাতও কম হইবে। সকলের মধ্যে একটি টিকে দি, তাহার 'কল্‌সিন্‌পোরের' অভাবের জন্য মাসে ক'দিন কামাই, আর এদিকে বিছানার ছারপোকা মরিবে না ও কোথায় মরিবে!

দেহে জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাতন্ত্র্যলাভে ইচ্ছা এবং শক্তিও সঞ্চারিত হয়। জাতী জননী পঞ্চাবের পরে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার গর্ভস্থ ভ্রূণ তাঁহামুক্তির প্রয়াসে তাহার সব-জাত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে; নবম মাস উত্তীর্ণ হইলেই সে কারা-দ্বার মোচন করিবার চেষ্টায় পঞ্জরীকে পীড়িতা করে এবং বন্ধনমুক্ত হইয়া মুক্তালোকে ও মুক্তবাতাসে তাহার মুক্তির সংবাদ কণ্ঠস্বর-প্রয়োগে ঘোষণা করে; সেও শান্তিলাভ করে, আর প্রসূতিও শান্তিলাভ করেন। আমার অনেক সময় ইচ্ছা হয়, কোন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করি যে, কার কষ্ট বেশী — যে ছেলের ভিতর জন্মে থাকে, না যে ছেলের ভিতর থাকে মাসে—তাহার? যে জাতি স্বাধীনতা-সুখলে আবদ্ধ থাকে, সে ত যন্ত্রণাভোগ করেই, কিন্তু যে জাতি সুখল পরাইয়া চৌকী দেয় তাহার যন্ত্রণার সীমা নাই; কখনো হয় ত ঘুমাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু জাগরণে-ই ছেলের-জীবন অতিবাহিত হয়। শিশু একটু হাঁটিতে শিখিলেই মায়ের অঙ্ক হইতে নামিয়া পড়িবার চেষ্টা করে; সে ছেলে চলিতে বলিতে শিখিয়া-ও মায়ের আঁচল ধরিয়া ঘোরে, প্যান প্যান করে — সে হয় রোগা, নয় অসভ্য জানিবে।

এইরূপে মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা প্রসারিত ও বলবতী হইতে থাকে। তাহার শক্তিলাভের প্রবৃত্তি, জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি, বিশ্ব

বিষয় লাভের প্রবৃত্তি, সকল প্রবৃত্তিগুলোই এক উদ্দেশ্য — শান্তিলাভ। তাহার পর তাহার অন্তরের আত্মাও এই দেহের বন্ধন হইতে, অস্তিত্বের শিকল হইতে মুক্তি পাইবার প্রয়াসের তাহার সৃষ্টিকর্তার চরণতলে মুক্তি হইবার জন্য সাধাসাধি হয়। আমরা ইংরাজের Independence বা Liberty-র অনুবাদ করিয়াছি — স্বাধীনতা, কিন্তু সংস্কৃত স্বাধীনতা শব্দটি স্বেচ্ছাচারিতার সপিণ্ড-জ্ঞাতি, ঠিক 'ইন্ডিপেন্ডেন্সে'র সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য আছে। আমাদের আর্য ঋষির মনে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে তাহার নাম — মুক্তি। মানবের আত্মা স্বভাবই তাহার দ্বারা মুক্তির পথে যাইতে ইচ্ছা করে। ইন্দ্রিয়াদির বল একটা আসি পড়িয়া তাহাকে ভোগের পথে লইয়া গিয়া ও অধীনে রাখিয়া ইহকাল পরকাল মাটী করিয়া দেয়। এই ভোগের মায়াই মানবের আত্মাকে মুক্ত হইতে এবং জীবনকে স্বাধীন হতে দিতে দেয় না।

আমি পূর্বে-ও বলিয়াছি, আমার এখন-ও বলিতেছি, যে-য়ুরোপীয়দিগকে আমরা স্বাধীন মনে করি তাহাদের মত পরাধীন আর জগতে নাই। ইংরাজের তুলনায় আমরা ব্যক্তিস্বরূপে প্রত্যেকেই অনেকটা স্বাধীন, তাই এখনও তাঁহাদের স্বাধীন হইয়াও জীবিত আছি।

ইংরাজ অত্যন্ত ধনবান্ হইয়াছেন, স্তূপের উপর স্তূপ সম্ভারের পাহাড় করিয়া তুলিতেছেন। অর্থ উপার্জনের পথ আবিষ্কার অর্থাগমের পথ আবিষ্কার, ও — যাহার অর্থ নিজের কোলে টানিয়া আনিবার সম্ভাবনা থাকে তাহাকে, এবং যাহার দ্বারা আমার অর্থ হরণ হইবার সম্ভাবনা তাহাকে — নিধন করিবার যন্ত্র আবিষ্কার। এই অর্থ-বাহুল্য ইংরাজকে অত্যন্ত ভোগী করিয়া তুলিয়াছে; বিলাসের ক্ষুধার ন্যায় ভোগের পিপাসারও শান্তি নাই। বিলাস ভোগ যেমন অর্থপিপাসাকে বাড়াইতেছে, তেমনই নূতন ভোগের ইচ্ছা আবার অর্থপিপাসাকে অধিকতর বাড়াইয়া তুলিতেছে। সমাজরক্ষার জন্য রাজা ও রাজনীতি প্রয়োজন; যে সমাজ-প্রাসাদের প্রয়োজ ইষ্টক — স্বার্থ অর্থ ভোগ বিলাস — শতসহস্র অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত, সেই সমাজরক্ষার জন্য যে রাজনীতি, তাহার অনুবাদের কষ্টিপাথরে দেখা যাইবে, তাহা রাজপুরুষ রক্ষা নিয়া দেশীয় অস্তিত্ব — ভোগে বিলাসে, অর্থে, স্বার্থে। এই রাজনীতি এ দেশের নয়। ইংরাজই হউন, মুসলমানই হউন, হিন্দুই হউন — মহাভারতের যুগের যিনি এই নীতিকে চালাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই বিফল-যত্ন হইবেন।

জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যলোকে আজিও বড় গোল আছে। যে প্রকারে হউক, আপনার উদরপূর্তি, এবং অপরাপর বাহ্যেন্দ্রিয়ের সকল চরিতার্থ করিয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপূর্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদরপূর্তির পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লোক-সমাজে যথাযোগ্য প্রাধান্য লাভ করাকে মনুষ্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্যতঃ মনুষ্যলোকে সর্ববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায়ে সমাজে সজ্জন্ বলিয়া পরিচিত।

— বঙ্কিমচন্দ্র

মণি-মঞ্জুষা

মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া গাঁটি কাব্যরস বিতরণ করা হইবে—যে-সব সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা কবিতার উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাসাহিত্যের কাম্যও বটে। এদেশের অনেক আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদলের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সত্যকার পরিচয় নাই। 'কল্লোলে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে বর্ণ-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

(১)

সিন্ধুতলে সূর্য্যোদয়

উষার আভাস জাগল কি রে? — নিমগিরি ধূসর,
মণিকোঠা?
তরতারাটির শিউলি-ফুলে লাগল ঘিরে অরুণ-
রঙের রোঁয়া?
পূব-তোরণে চিক্‌ মেলে কি দিগ্‌বালকের নিবিড়
কস্তাবাতে?
মুখরো-মুকুর ভাসি মাথার দুয়ার-গিরি জাগছে
প্রতীক্ষাতে?
মুক্তা-কুলের লাবণ্য কি আমের ঘিল যুক্ত
নীলাম্বরে!
ঘিল্‌মিলা চোখ করে আকাশ-আলোর বিরাট্‌
ঘরিয়েরে!
অলখ্‌ পরী উষারতির রঙ-প্রদীপ বালে,
আলোক-গঙ্গা-স্নানের লাগি' জহ্নু, মুখের অমরু-
কলস জাগে!

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সে যে, এ-বিশ্বরূপ করে
আছে চক্ষু দিয়ে ?
বিভাবরীর নীলাম্বরীর আঁচল ওঠে মোতির ঝালর
কিসে ?
হোরায় কালোচুলের ভারে কোথায় থেকে ঘুপর
ঘোঁয়া লাগে !
বন-কপোতের গ্রীবার নীলে জাফরানী নীল মিলায়
অনুরাগে !
পাশ্-মোড়া ঘায় ঘরে উষা আধ-খোলা আধ-
ঢোকা ফুলের পারা,
সোনা-মুখের ছাই দেশে হয় মুহুর্মুহু আকাশ আপন-
হারা !
বরণ ফলে, মেঘ-মহলে লোলে কমল-মালা,
ছোপ লেখে যায় সোপারে মোহাট্, নীল ফটিকের
বিরাট তোরণ আলা !

পারিজাতের দল ছিঁড়ে কে ছোট ঘুড়ায় ঘরায়
গগন হ'তে —
ফেণ-ডাঙাতে টিপ যাঙাতে আমেজে ঘুম-গজালের
স্রোতে ?
কোন ব্রত আজ দৌড়ী করেন রজতগিরির তালে
সিঁদুর দিয়ে,
হেম হ'ল সা' সরের ওই হৈমবতীর পরশ-পুলক
পিয়ে ?
আড়াল করে মেঘের ঘোলা গিরিবালার রবন দিতে
ঢেকে,
আড়াল করে রবনিকায় মহাযোগীর মনের সিকায়
দেখে।
অলে মেঘে তুষার-তাপে আলো অঘে অংশে,
সেই আলোকে স্নান করে আজ বসুন্ধরার উত্তরণের
লগ্নে।

প্রবাল-বাঁধা ঘাটের পারে তরল পল্লরাগের
মিলন চিত্রে —
কে জানে ? উষ্ণি হ'য়ে কমল-যোনির জন্ম-
কমলটিরে।
কে জানে যে অন্ধ-প্রাণে যাত্রা জীবির পুরিয়ে
যাত্রা যত —
যাদের চোখের আলোর খেয়া বহুপরালা ছুটিয়ে
লক্ষ শত।
একি পুলক দ্যুলোক-ভরা ! আলিঙ্গিছে
হর্ষে অনিবার
আমার চোখের চমৎকারে তোমার আলোর
চিত্ত-চমৎকার !
রোমে রোমে হর্ষ জাগে, জলং ওঠে গেয়ে,
চিত্ত-আলোর লাগর লোলে চোখের আলোয়
দৃষ্টিভুলন পেয়ে।

(২)

কাছে কাছে

হের, সখি, আজি তরি' তব নীরবতা,
পাহাড়ের দু'টি পার্শ্ব, জোৎস্না আর নদী।
নিথর নিশার বক্ষে কি দিবা বারতা,
কান পেতে শোন' বেথা বালুঘাটে বসি'!
নীরবে নদীর জল চলে লাবণ্যে,
দূর মিনারেতে ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু বহে তা'র ধ্যানে —
সঙ্কর্ষণে হাতখানি রাখ মোর হাতে।
বাতুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
রেখা রেখা তুলিয়াছে রূপার ফলক :
মাধবীলতার তাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী দুটি তরি' ধরে চন্দ্রালোক!
পাখী লুকায়েছে আজি পালক-বিধানে —
আজিকার কথা, বঁধু, কহ কানে কানে।

---

(৩)

জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী

তুমি লুকিয়ে বেড়াও যে মুখখানি, দেখেছি কাল রাতে,
আমার পদ্মাচরের তাঁতা-ঘরের শূন্য আঙিনাতে।
সে যে কয় রাতের বিফল ভাসা চক্ষু করে' দিয়ে
শেষে কালকে আমার চোখের তাঁরে পড়্‌লে ধরা, প্রিয়ে!

তখন নিঝুম রাতি, শুধু সবাই রুদ্ধ-দুয়ার ঘরে,
জিকে শেওলা-নীড়ে ঘুমায় মরাল, চখা ঘুমায় চরে :
কেবল ঘুমো তাঁতের বনে বেড়ায় ব্যস্ত ব্যাকুল বায়,
আমি ছিলাম জেগে আমার ঘরের জানোলায়।

তুমি শিশির-ভেজা কাশের বনে বিছিয়ে দিয়ে ছাউনি,
দিত জোৎস্নাবোনা ঘাসের পাখায় এনিয়ে দিয়ে কাঁচলি
সাদা বিদুক-পাতা খালির ভাটী ঘুনিয়েছিলে রাশি,
আমার মুগ্ধ নয়ন হেরেছিল মুগ্ধ সে রূপখানি।
তোমার এতকালের সোপন সোভা পড়্‌ল ধরা ঘাটে,
হাত-ছুসুর পল্লাচরে সহর-পুনিমাতে।

আমি বলব আরো চিহ্ন কি কি তোমার গায়ে আছে?
আমি বলতে পারি, তাবুছি কেবল রাগ ভর বা পাছে।
তোমার পত রাতের মত কথা প্রকাশ করে' দিয়ে
পাছে বঞ্চিত হই চির-জনম প্রসাদ হ'তে প্রিয়ে।
তবু এইটু আমি বলব, তুমি রাগ করোনা তা'তে —
তোমার লুকিয়ে-রাখা মুখখানিকে দেখেছি কাল রাতে।

(৪)

সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি

তোমার আলো সব ফুরালো
লো অমারী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি
চুলের ছায়ায় ঝালা।
পাখীর গানে কাঁকণ তোমার
বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি
তোমার সোহাগ পেয়ে।

অলক-ঢাকা ঘোমটা পলক,
নয়ন গহরী —
কাজল বাদু বাঁচে তোমার
চুলের সুরভি।
কোহিনুরের টীপ্‌টি ভালে
কানে রতন-দুল,
বরণ-কালের ডগল বধূ
যে দুলালী দুল!
এস নেমে আমার ঘরে,
তালী-বনের তলে
এস আনন্দ- নন্দিনি মোর,
এস আমার কোলে।

সংসারে নাই ঠাঁই-ঠিকানা,
একলা কাটাই দিন,
বৈকিরতের ঘর নাহি না
সব পরিবহীন।
মনের কাঁকে লুকিয়ে খেলাই
শুধুনো ধরা-ধুল।
হিজিবিজি- লেখা খাতায়
কাটি কতই ভুল।
(হের) নিখিলে বেগুনি-নীল
সিন্ধিরেখীর চূড়ায়
পরীরা ওই সারি সারি
মণির প্রদীপ উড়ায়।

দেখব যারা তারে আঁকা,
এসে আনন্দ ওলো দিদি মোর
মনে দেখব তাকে,
আমার খেলার ঘরে।
কদম্বতরু বীণার তারে
তোমার তরুর ছিন্নডালে
আনন্দ সুরটি বাজে।
দাও গো বসন ভরে'।
তুহার আলো সব ফুরালো
গো অমরী বালা,
এস এস চকলিয়া
ফুলের ডালায় বালা।

---

(৪)

পৌর্ণমাসী

আজ পৌষ পৌর্ণমাসী বাসিয়াছি বিজন বাসরে —
সুন্দরের কোজাগরী, নিস্তরঙ্গ নিশীথ-সরসী!
শশিলেখা-রমণীর নিমেষের নীরব অন্তরে
উত্তরিল পূর্ণশশী মেঘমুক্ত গগন নীলাম্বরে।
নিম্নে নিশীথের ঘরে জোছনা-সীধু যামিনী-অধরে,
ঘুমে' ঢি'ঢে' ঘুমে' গেল তারকার সিঁথি-সাজনারী।
তারপর সবলিল নীরব-বাঁশ চমকি' শিহরি' —
হেরিয়াছি সেই রূপ অপরূপ প্রহরে প্রহরে।
শেষ হ'ল সুরাপান; ম্লান-হাসি আরো যে বিধুর!
পাণ্ডুর কপোলতলে পূর্ণিমার আলস আভাস;
একটি কণক বুঝা গোলে ঢের, নয়নে বধূর —
পূর্ণ-চুম্ব খুলিবার দুখে সে কি মধুরী উদাস!
অস্ত গেল নিশানাথ, মনে মনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
দিগন্তে হারায়ে গ'ল বিরহার ক্ষৌটায় সিঁদুর।

নামিছে নীরব ছায়া বন-বনান্তরে,
এ দেশ দেখেছে ভাল নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া, খাতাগুলি পড়িয়াছে,
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে।
শুধু এ দোয়ার দ'লে বিজনে পথের ধারে
কলস ভরিয়া বারে ঝরনে।
এ দেশ দেখেছে ভাল নয়নে॥

অন্তঃশীলা

শ্রীনলিনীকুমার বসু

ভোর তখন আটটা। অর্ধশায়িত অবস্থায় তৃতীয় সিগারেটে বক্তিম কালিটা নীচে ফেলে দিলাম। স্ত্রী উপস্থিত থাকলে একাজটা সম্ভব হ'ত না, ঘর নোংরা করা সে দেখতে পারে না, এবং রবিবার হলেও বেলা আটটা পর্যন্ত শুয়ে থাকা, নিতান্ত অসুখের অজুহাত ছাড়া, তার উপস্থিতিতে সম্ভব নয়। অথচ অগোছালো স্বভাব আমার মধ্যে এমন মজ্জাগত যে তাকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বললেও ভুল হয় না। লক্ষ্মীসরস্বতী বেচিলেবী অগোছালো — অবশ্য আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, তাকে মাঝে মাঝে বীণাবাদনা নিয়ে লক্ষ্মন করতে আমার ভাল লাগে। আমার ত মনে হয়, একটানা কোন অবস্থাই কারো কাম্য হতে পারে না। অবিচ্ছিন্ন সুখও একদিন অসহ্য হয়ে উঠবে। সেকালের কোন কোন প্রজাবৎসল রাজা যে ছদ্মবেশে দেশ দেখতে বেরুতেন আমার মনে হয় না, তা শুধুই রাজ্যের ভালো-মন্দর জন্য, মাঝে মাঝে হাঁফছাড়ার প্রয়োজনে যে নয়, এমন কথা কে বলতে পারে? —কিন্তু আমার এই বিশ্লেষণমূলক চিন্তার সূত্র বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছিল, কেন না এবে ত ঘুমানিই আলস্য, তার উপর, পাশের বাড়ীর রোয়াক থেকে গানের ছাট আমার বন্ধ জানালার ফাটল দিয়েও ভিতরে আসছিল। "জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা" বলে' যে গায়িকা বিলাপ সুরু করেছিলেন, তিনি আমার নিজেরই সান্ত্বনা নিয়ে আসর জমিয়েছেন —

"যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
আমি যে আমি তাও হয়নি হারা"

পোড়া সিগারেটটা এবারে এশ্‌ট্রের দিকে হাত বাড়িয়েও ইচ্ছে করে নীচেই ফেললাম, যদি বা এর দ্বারা চিন্তার সূত্রকে আরো কিছুকাল টেনে চলতে পারি। কিন্তু সম্ভব হল না, ভক্তানোয়ার অভাব পেলাম, এবং তাও ৫৬ সংকোচ সত্ত্ব নয় যা আধা-অন্ধকার ঘরে শুয়ে 'শিকলটি কে ঝিমিঝিমি নাড়ে' মনে হতে পারে। সুরবালা ভক্তানোয়ের ডাকা আরম্ভ করেছে। বাচ্চা ভাড়ার জন্য বাড়ীওয়ালা— কিম্বা পুলিশ ছাড়া এমন অমোঘ আহ্বান আর যে জানাতে পারে আমি জেনে পাচ্ছিলাম না, অথচ চেতন আর অবচেতন মন দুয়েরও উধাদের আকস্মিক আগমনের সম্ভাবনা দেখতে পেলাম না। অবশ্য উঠতে হল। যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে দোর খুলে দিলাম, এবং খুলতেই দেখলাম—অপূর্ব। অভাবনীয় বা পূর্বে কখনো দেখিনি এমন বস্তু নয়, আমার বন্ধুবর অপূর্বকুমার রায়। তার মধ্যে অপূর্ব যা আছে তা অবর্তমানও, এখনও সে অবিবাহিত।

আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট হলেও বয়স তার ত্রিশ ছুঁয়েছে। এদিক দিয়ে চেয়ে দেখলে বাঙালী-সমাজে হয়ত বা অপূর্ব হতেও পারে।

"এখনও শুয়ে আছ! বৌদি বুঝি বাপের বাড়ী থেকে ফেরেনি?" নৈয়ায়িক ধরে' তাকে প্রণাম করতে পারতাম যদি না আমার পারিবারিক গোপন তথ্যাদি তার জানা থাকত। সুতরাং সংক্ষেপে বললাম "হুঁ"। অপূর্ব আমাকে বদনাম করতে পারে, কিন্তু আমার অগোছাল বা অলস স্বভাব বরদাস্ত করতে পারেনা। এ কথা সে প্রায়ই শোনায়, শুধু তার মুখে আমি তা গায় মাখি না। সে বলে, "তোমার কোন দায়িত্ববোধ নাই! ছেলেমেয়ে আছে, একটা

...ছেলে ঘাড়ের উপর আর তুমি ন'টা পর্যন্ত শুয়ে আছ।

"তবে উঠলে যদি সংসারের কিছু সুবিধে হয়, আমার বাজনুরুর্তে যা আরও একটু পেছিয়ে যেমনটে উঠে বসে থাকতাম, কিন্তু সুবিধেটা চোখে পড়ছে না।" আমি কৈফিয়ৎ দেবার মত করেই বললাম। অপূর্ব অত্যন্তিক বিরক্তির সঙ্গে বললে, "থাক্ থাক আর বক্তৃতা দিও না।"

অপূর্ব আমার বিপরীত। পোষাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরায় সে সাহেব, সুতরাং কথাও বলে কম। একটু চুপ করে' থেকে হঠাৎ সে বলে, "আজ তোমরা, চল —"

এমন জায়গায় নাম করলে, যা' কলকাতায় কিছুতে একটা মহড়া সহ্য। এ প্রস্তাব আমার অনভ্যস্ত বিবেকে নিষ্কিন্ত কিনা বুঝবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?" দৃষ্টিবিভ্রম কিনা জানিনা, মুখে যেন হাসির রেখা দেখলাম, অপূর্বর মুখে যা পূর্বে কখনো দেখেছি। সে বলে, "নিরীহবাবু বাড়ী ওখানে — ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন।"

"বেশ ত। তা আমাকে টানছ কেন?"

"লেখাপড়ার সহকারী উকিলের ছোটবোনের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করে' পাঠিয়েছে।" আমি উৎসুক ও উৎসুল্ল হয়ে উঠলাম। তবু বাহিরে যেমন করে প্রশ্ন করলাম, "বল কি! তুমি না বলতে আমাদের মতো করবে না, মানে 'পাত্রী' বিয়ে করবে না।" হেসে অপূর্ব বললে, "ঠিক তা নয়, ওরা নাকি বেশ আধুনিক শিক্ষিত পরিবার, মেয়ে এফ এ পড়ছে — নিরীহ লিখেছেন আগে আলাপ পরিচয় হওয়াটা তারা ভালো বলেই মনে করে। আমার মেয়ের নিরি পিসি তিনি দূর সম্পর্কে আমার মাসী হন। তবেই দেখছ ঠিক পাত্রী-বিয়ে নয়।"

মুখে গাম্ভীর্য এনে আমি বললাম, "তবে উৎসাহ পাচ্ছি না।" 'কেন'? অকপট বিস্ময়ে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলে।

"আমি ভালোবাসি হয় সহর না হয় গ্রাম। মহকুমা-সহর আদলে গ্রামও নয়, সহরও নয়।"

"তা হোক না, সহর দেখতে ত যাচ্ছনা।"

"সেদিকেও উৎসাহ পাচ্ছি নে। হয় পূর্বরাগ দেখে বিয়ে, না হয় পাত্রী-বিবাহ। আলেয়াটার মধ্যে রোমান্স্ আছে, আর দ্বিতীয়টার মধ্যে দেখা নেই জানা নেই, শুরুদুইয়ের সময় থেকেই সম্পূর্ণ আপন জনে' গ্রহণ করা, তার মধ্যে রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু তোমার যে এ দুটোর কোনটাই নয়।"

অপূর্ব উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আজে মোকোমা-. . . তেই হবে।"

ট্রেনে উঠে আমি প্রথমেই বললাম, "একটা সর্ত থাকল, এই পথটুকু — যাকে এখনও দেখনি তার কথা আলোচনা করা চলবে না, — মানে সেই যাকে চোখে দেখিনি শুধু বাণী শুনে এসেছি।" অপূর্ব একটু যেন অন্যমনস্ক হয়েছিল, গানের দুটো শুনতেই কিরে তাকিয়ে বললে, "লাইনটা কি, আমায় বল ত?" আমি আবৃত্তি করলাম। অপূর্ব একটু কি ভেবে বললে, "বাণী শুনেছি কথাটা যেন কেমন লেগেছে লাগে।" সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম, 'বাণী ফেলে দিয়ে না হয় 'হাসি' কিংবা 'কান্নি'ও বলতে পার — যা ঝিকমিকে, মোর যা আলোয়ায় পেছনে যা হতে পারে যা হয়ে থাকে।" শেষের কথাগুলো অপূর্ব শোনেনি, কেননা সে বলে, "একটা কথা বলিনি, এর দিদি গ্রাজুয়েট, কিন্তু বিধবা —"

"গ্রাজুয়েট হ'লে যে বিধবা হ'তে পারবেনা এমন কথা কোন শাস্ত্রে নেই, ইংরেজী শাস্ত্রেও নয়।"

আমার কথার বাধা দিয়ে অপূর্ব বললে, "আঃ! শোনই না — বিয়ের একবছর পরেই বিধবা হয় এবং স্বামীর রোগটা ছিল থাইসিস্। অনেকে এখন বলছে, বিয়ের আগেই নাকি রোগটা আরম্ভ হয়েছিল। তাই ভাবছি —"

"তোমার ও নেই — তোমার ভাবনা এখানেই শেষ।

এর পরেও যদি আসতে চাও তাহলে কষ্ট আমো, এত দীন দিয় ভঙ্গ কোরো না।"

অপূর্বর পিসীমা আমাদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, "এমনিতে দেখা নেই, এখানে ত চিঠি পেয়েই এসেছ", এবং পরক্ষণেই আমায় বললেন, "যাই ওদের জানিয়ে আসি।" সঙ্কুচিত ভাব করে অপূর্ব বলল, "না না পিসীমা, এত ব্যস্ত হ'য়োনা, যাই-যাই, বিশ্রাম করি—" কথাটা পিসীমার হয়ত সমীচীন মনে হল, ব্যস্ততা থামিয়ে বললেন, "আচ্ছা না হয়, আর কাউকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছি—"

শীতের বেলা, চারটে বাজার আগেই রোদের তেজ কমে এসেছিল। অপূর্ব একখানা বহুপুরাতন মাসিক পত্র চোখের সামনে খুলে নীরবে পাতা উল্টে যাচ্ছিল। আমার সমবয়সী সঙ্গী সিনারেট নিয়ে—যে সঙ্গী পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিবদ্ধচিত্ত নীরবতা-জনিত একাকীত্বের চাপও তুচ্ছমাত্র ধোঁয়া দিয়ে হালকা করে দিতে পারে—তাকে নিয়েই খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিলাম। একবার শুধু দেখে নিয়েছিলাম মাসিকপত্রখানি উল্টা ধরে' ধরে' অপূর্ব পাতা ওল্টাচ্ছে কিনা।

বাইরের দিকেও এমন কোন দৃশ্য ছিলনা যা দেখে সময় কাটানো যায়। এমন কি, আধুনিক অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিও মনে মনে যে পছ তৈরীর চেষ্টা করত তার প্রেরণা জোগাবার মত বস্তুও ত চোখে পড়ে না। সামনে রাস্তার সংকীর্ণ কঙ্কাল—অর্থাৎ বর্তমানে যে প্রায় ভূতপূর্বের পর্য্যায়ে পৌঁছেছে। ওপারে খানিকটা খোলা মাঠ এবং তার পরে কতগুলি ছোট-বড় গাছ। গাছগুলির একটু যা নূতনত্ব—তাদের পাতার রঙ্, ধরা সুরু হয়েছে; বসন্ত সমাগমের রঙ্ নয়, বিদীর্ণ হয়ে ঝরে-পড়ার পূর্বের রঙ্। ও দু' দৃশ্যের অর্থ দাবীর নিশ্চয় নেই, থাকিও বা কিছু থাকে তা' —ভোরের আকাশ আর গোধূলি-আকাশের মত ভিন্ন প্রকৃতির। বাড়ীর অন্য নারী-কণ্ঠের সাড়া কানে এল।

"মাসীমা—" "কে! মলি? ওমা, মৌরীও এসেছ, এস মা এস।" এ কণ্ঠ পিসীমার। পূর্ব কণ্ঠস্বর আবার শুনলাম, "অপূর্ববাবু নাকি এসেছেন?" পিসীমা উত্তর দিলেন, "হাঁ, মা, যাও ওঘরে নিয়ে আলাপ কর, আমি আসছি।" আবার প্রশ্ন শুনলাম, "চিনবো কি করে'! সঙ্গে নাকি একজন বন্ধু এসেছেন!" "চিনবে, ওর মধ্যে কার্তিক-মুখর চেহারা—ঐ আমার ভাইপো।" কথাটা তার কানে কি রকম লেগেছিল জানিনে, আমার কানে ভালো লাগার কথা নয়; অন্তত যদি বলতেন, "সাহেবী পোষাকে যে ছেলেটি ঐ আমার ভাইপো" তাহ'লেও মনোভাবের চিনে নিতে অসুবিধা হত না।

মলিনা আর মৌরী ভিতরে এল, এবং হাত তুলে অপূর্বকে নমস্কার জানালে, পিসীমার নির্দেশ অনুসারে তাকে চিনে নিতে কোন অসুবিধে হল না। আমাকেও নমস্কার জানিয়েছিল কিনা আমি দেখিনি! একবার শুধু তাদের চেয়ে দেখে আবার বাইরের দিকে মুখ করে' আমি বসেছিলাম।

মৌরী সুন্দরী, তার সৌন্দর্য নিয়ে মতদ্বৈধেরও অবকাশ নেই। মলিনাকে মৌরীর পাশে সুন্দরী বলা চলে কি না, তা নিয়ে মতবিরোধ হয়ত হতে পারে, কিন্তু তাকে চোখের সামনে দেখে সে বিদ্বেষ মনে আনতে পারে—অন্তত: আমি তা মানতে পারিনে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমার সময়ের প্রয়োজন হয়নি, তারও সেকেণ্ডের দেখাতেই এই ধারণা জন্মেছিল। সৌন্দর্য-আলোচনা নীরবেই হতে পারে, সুতরাং মুখে আমি কৃত্রীর সুন্দরের নির্দিষ্টতা রেখে বাইরের দিকেই চোখ রেখেছিলাম।

মলিনা বলছিল, "দুপুরের গাড়ীতে এলেন! কেমন দেখছেন আমাদের এই ছোট সহর?" অপূর্বর উত্তর কাণে এল না। হয় এমন চুপি-চুপি বলেছে যা এত কাছে বসে'ও শোনা যায়না, না হয় উত্তর এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ

তুলনায়—অপূর্ণ আমের মত, যার গুণাবলীর বিস্তৃতি নিয়ে আমরা কথনো আলোচনা করিনে। আড়ষ্টতাহীন সহজ মনে হওয়ার সুযোগ পেয়ে সে তা পুরোমাত্রায় ব্যবহার করে' খুশী হচ্ছিল: কিন্তু আমার কথা নিয়ে কেন? এই ছোট শহরের সঙ্গে আমার পরিচয় নিতান্ত প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষেও তাই নয়। খুব লম্বা মন্তব্য পূর্ণ করার উৎসাহ অপেক্ষা না করে' তখুনি চোখ দিয়ে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল। নিজের কানে নিজের প্রশংসা শুনতে খারাপ অবশ্যই লাগেনা, তবে যারা তেমনটা চতুরভাবে চাইতে। আমি মুখ ঘুরিয়ে বললাম, "এখানে একটা চাঁচাড়ি দিয়ে সেরে করে।" মলিনা, সৌরী হেসে উঠলো। অপূর্বও হাসল, তবে তা ক্ষীণ। কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সে খুশী হয়নি, বন্ধুর গুণাবলী কীর্তন নিজেই তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তবু আমার দাবী মিটে গেল, বাধা দেবার মধ্যে অসুবিধা পক্ষে লাভও ছিল, — নিজের মুখে স্বীকার করাও হল না, আবার বিস্তৃতির মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে যেতেও হলনা।

মলিনা আমাকেই এবার জিজ্ঞাসা করলে, "থাকবেন ত দু'চার দিন?" পাল্টা উত্তরও দিতে পারতাম, কিন্তু সংযত হ'য়ে লজ্জা-সংগৃহীত উত্তর আদলা ভাবে ছুঁড়ে দিলাম "অপূর্ব দু'চার দিন থাকবে, আমি রাত্রের গাড়ীতে ফিরবো।" এই নতুন ব্যবস্থার কথা অপূর্বর অজ্ঞাত ছিল, একটু বিস্মিত হ'লেও তার অসুখী হবার কথা নয়। তবু বললে, "তোমারই বা এমন কি তাড়া!" বাকি উত্তর আমি আগেই ভেবে নিয়েছিলাম, "আজ ত আর হল না, কাল ছেলেটার বই কিনে দিয়েই যাব, পড়ার ক্ষতি হচ্ছে।" কর্তা-ভক্তের অসুবিধাও আছে — তার অনুকূল সহজেই চোখে পড়ে, তা রাগেই হোক্, কিম্বা উপলব্ধি বোধ করে' অনুরাগেই হোক্। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রথমটার জন্য মুখ লাল করে' অপূর্ব আমায় নীচু করলে। অথবা, যা আমার হওয়ার কথা সেই লজ্জায় অন্যের মুখের রঙ্ লাল হয়ে থাকতে পারে। কথাটার মধ্যে নীতিবিগর্হিত কিছু ছিল ব'লেও ত আমার মনে হয় না। অথচ এই সামান্য উত্তরে সব নীরব হয়ে গেল। আমার কথার এীমাংসা অবশ্য করা যেতে পারে যে, পুত্রের উল্লেখে কার্যকারণ-সম্বন্ধ-হেতু পুত্রের মাতার অস্তিত্বও জানানো হয়েছে, আর বাবার উল্লেখে পুত্রের বয়স, যা তার মাতার বয়সের চেয়ের আন্দাজ দেয়া হয়েছে—আমার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘতা সম্বন্ধে। তবে এদিকের সংবাদাদি বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক এবং অশোভন। কিন্তু নীরবতার কিন্তিকালও শোভন হচ্ছিল না। মলিনা তা বুঝেছিল, সে বললে, "আমাদের এই ছোট শহর আপনার বোধহয় ভালো লাগেনি?" আমি হেসে উঠলাম, "সেই জন্যে পালাচ্ছি ব'লেই কি আপনার মনে হল?" থেমে আবার বললাম, "শহর হয় ছোট না হয় বড়, তার মধ্যে ভালো লাগার কথা নেই। শহর সম্বন্ধে প্রশ্ন হতে পারে, তার সুবিধে-সুযোগের জন্য বেশী নিয়ে।" উত্তরে মলিনা বললে, "সে কথা সত্যি হতে পারে, কিন্তু আমাদের এ শহরকে গ্রামও বলা চলে — এখানে মাঠ আছে, বন, নদী, কয়েকটা ফলফুলের বাগানও আছে। এগুলোর সম্বন্ধে ভালো লাগা না লাগা ত প্রশ্ন করা যায়?" "তা যায়, এবং অনেকের হয়ত এগুলো ভালোই লাগে।" মলিনা একটু যেন বিস্মিত হয়ে সোজা প্রশ্ন করলে, "আপনার?" অপূর্বর দৃষ্টি লক্ষ্য ও লক্ষিত, আমার অনাকাঙ্ক্ষা তার কাছে অজ্ঞাত নয়। আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠেই বললাম, "আমার তেমন লাগে না।" সৌরীর মন বোধ করি আহত হল, সে অকপট বিস্ময় প্রশ্ন করলে — এবং এখানে এসে এই তার প্রথম উক্তি, "ফুলের বাগানও আপনার ভালো লাগেনা?" হেসে বললাম, "লাগেনা বলিনি ত, তেমন লাগে না।" এবারে মলিনা অর্থহীন প্রশ্ন করে বসল, "কেন?"

"কেন? ভেবে ক'রুন, এই পৃথিবীতে আপনি ছাড়া যত নারী সব প্রাণী একটা মহাপ্রলয়ে শেষ হয়ে গেছে। ঘরে'নিম্ ফুলের অভাব নেই। কলমূল ছাড়া, একটু চেষ্টা করলে রান্না করেও খেতে পারেন। প্রকৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, কেমন লাগবে আপনার?" প্রশ্নের কোনটা উত্তর দিলে না। সুতরাং আমাকেই কথার জের টেনে চলতে হল, বললাম, "তখনও যে কারণে, এখনও সেই কারণেই আমার ভালো লাগার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ, ভালো লাগে আমার মানুষ, নিতান্তপক্ষে জীবন্ত প্রাণীও স্বীকার পেতে পারি। ঐ যে সুমুখের জঙ্গল দেখছি, কিছুতেই আকৃষ্ট করছিল না, কিন্তু, যদি এক ঝাঁক বন্যও উড়ে এসে ওখানে বসে, নিশ্চয় লাফা পড়ে যাবে, তখন হয়ত ভালোই লাগবে।" মৌলী আমার কথা কিছুকাল বুঝবার চেষ্টা করে' শেষে নিশ্চেষ্ট হয়েছিল। মলিনাই আবার বললে,- "তবু কথাটা ঠিক—।" শেষ করার পূর্ব্বেই আমি বললাম, "বলতে পারেন না? ও হল আমার কথা, তা যে আপনার মুখেই হবে এমন দাবী ত আমি করতে পারিনে। তবে বড় জোর আরও খানিকটা হয়ত বলতে পারি।" স্পষ্ট না হলেও মৌলীর চোখে একটু ক্লান্তি বা বিরক্তির আভাস যেন দেখা গেল। কিন্তু মলিনার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে তখনই ছেদ না টেনেও কথাটা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশে বললাম, "আমি যদি বলি, আপনাদের এখানের মাঠ-বনী বাসার সবগুলি জড়ো করে সামনে এসে দিলেও যেমন কিছু লাগবে না — একটি মাত্র মানুষ এখানে উপস্থিত থাকলে যেমন ভালো লাগবে এখন আপনি মানবেন?" যার জানার জন্যে বললাম, সে তখন আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে আকৃষ্ট হয়ে বসেছিল। আলোচনা নৈর্ব্যক্তিক হওয়াই রীতি, হঠাৎ আমার কথায় বাক্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় সব আবার নীরব হইল।

রক্ষা করলেন সিসীমা। চারজনের মত জল-খাবার চা নিয়ে তিনি ভিতরে এলেন। মলিনা যেন হাঁফ ছেড়ে উঠলো, "ও আমি এখন খেতে পারব না সিসীমা, শুধু এই চা খাচ্ছি।" মৌলী কিছু না বলেও শুধু চায়ের কাপ তুলে নিলে। অপূর্ব্বর হ'ল কি জানিনে, এমন থেকেই পলাশ অনুসরণের নির্দ্দেশ দিতে হয়ত বা ভুল করেছে, সেও বলে, "বল কি সিসীমা, এইত খেয়ে উঠলাম। ও এখন হবেনা।" সিসীমা দুঃখিত হলেন। আমি খাবার ডিস আর চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বললাম, "দুঃখিত হবেন না, আমি তৃতীয় পুরুষ — আমার খেতে আপত্তি নেই।"

খাওয়া শেষ করে' আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আপনারা গল্প করুন, আমি রাস্তায় একটু পায়চারি করি।" এবারেও মলিনাই কিফিয়ৎ করলে, "একা কোথায় ঘুরতে যাচ্ছেন?" অপূর্ব্বর তীব্র দৃষ্টি সত্ত্বেও নির্ব্বিকার মুখে আমি বললাম, "ঘুরতে ঠিক নয় — একটা বদ্ অভ্যাস আমার আছে, চায়ের পর তার প্রয়োজন আরো বেশী বোধ করছি," একটু থেমে অপূর্ব্বর দিকে চেয়েই বললাম, "সিগারেট খাওয়ার প্রয়োজন।" হেসে মলিনা বলল, "সেজন্য বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই।" "থাকলেও, বাইরে যাবার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমার ছিলনা।"

মলিনা অপূর্ব্বকে বলছিল, "চলুন, আমাদের বাড়ীতে বেড়িয়ে আসবেন।" কিংকর্ত্তব্য স্থির করতে না পেরে অপূর্ব্ব একবার আমার দিকে চেয়ে, একবার নিজের কবজন্থ নিরীক্ষণ করে' শেষে চায়ের পেয়ালায় উপর দৃষ্টি-নিবদ্ধ করলে। পূর্ব্বকথার সূত্র মলিনা ছেড়ে দিল, "আপনার মামীমার সঙ্গে দেখা করবেন না?" "হাঁ, চলুন।" এমন সহজ সীমাংসায় এসে সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। মলিনা আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে, "আপনিও চলুন।" আমিও হেসেই উত্তর দিলাম, "আমার ত কোন মামীমা এখানে নেই।" "নাই বা থাক্, আমাদের সঙ্গে ত পরিচয় হল।" "যাচ্ছি, কিন্তু একটা সর্ত্ত,

সেখানে গিয়ে আমার কিছু খেতে বলবেন না। কেননা, আমার ঘরে একটা সোডা-জলবাদ খেয়ে যেতে চাইনে। তবে, তাঁদের বেলা অবশ্য সেরূপ প্রয়োজন নেই, আমার বহু অভ্যাসের তালিকায় সিগারেটের পাশেই তার স্থান।" মলিনা বললে, "সোডা-জলবাদের তত্ত্ব পাচ্ছেন কেন? খেতে দিলে তা গ্রহণ করার সোডী আর বলা চলে না।" সৌরী দ্বিতীয় বার কথা বললে, "আপনি বুঝি খুব চা খান?" প্রশ্নটা আমাকে হ'লেও হাসল সে তার নিজের দিকে চেয়ে।

বেশীদূরে নয় বলে' আমরা হেঁটেই যাচ্ছিলাম। সঙ্কীর্ণ রাস্তা, সকলে একসারে চলা সম্ভব নয়; অপূর্ব সকলের আগে, তার পাশেই সৌরী, তার পরেই মলিনা আর আমি প্রায় পাশাপাশি। কথা বলতে বলতে চলেছিলাম। আমার এক একবার মনে হচ্ছিল, যেন কথাকে আর চালিয়ে নিচ্ছিনে, বরং কথাই আমাকে যথেচ্ছ ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

অপূর্ব বলল হঠাৎ, "দেখ, একদিন থেকে যাবে কিনা? ঐ দেখ, ভাল একখানা সিনেমার একটা ইংরেজী বই আসছে।" আমি হোর্ডিং-বিজ্ঞাপনটা পড়ে' বললাম, 'Under current' — ভালো বই, দেখেছি একবার।" চলতে চলতেই অপূর্ব মলিনার দিকে একটু ফিরে বলে, "তার বেলায় তালিকায় এই আরেকটা লিখে রাখতে পারেন। ইংরেজী বই হলে ত নিশ্চয়ই।" আরো কিছুদূর এগিয়ে যেতে আমার চোখে পড়ল, এইবার পাশের গলি থেকে একটা ছত্রধারী রিক্সা বেরিয়ে আমাদের পাশ কেটে ছুটে যাচ্ছিল। আমরা হাঁক দিলে মলিনার হাতে অন্ততঃ চাকার ঘাড়া লাগতে পারে। তার যেন নজরে পড়েনি, বৃষ্টি আকর্ষণের তখন সময়ও আর ছিল না। আমি ঘাঁ করে' তার হাত ধরে' নিজের দিকে একটু টেনে নিলাম — পাশ কেটে রিক্সটা বেরিয়ে গেল। প্রথমে চমকে মলিনা আমার চোখের দিকে চেয়েছিল, রিক্সটা দেখেই সে ব্যাপারটা বুঝল। আমি হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম। কপট গাম্ভীর্যে বললাম, "সাবধান হ'য়ে পথ না চললে একসিডেন্ট হতে পারে মনে রাখবেন।" সে হেসে উত্তর দিল, "একসিডেন্ট একসিডেন্টই, সাবধানে হয়ে চললে আর কি করে' হবে?"

মলিনার বাবা বাড়ী ছিলেন না। আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অন্তরঙ্গলোক। সুতরাং স্নানঘর ছাড়া আগন্তুক লক্ষীর আকৃতি বা প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হল না। শুধু সময়েরই কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছে।

জলযোগান্তে অপূর্বকে উঠতে হল, তার আহ্বান এসেছিল বাড়ীর ভিতর থেকে। তারও পূর্বে সৌরী ভিতরে চলে' গিয়েছিল। মলিনা অপূর্বকে পৌঁছে দিয়ে এসে আবার বসল। বসেও সে কিছু বললে না, আমার দিকে তাকালো না, টেবিলের উপর দৃষ্টি রেখে আঙুল দিয়ে আলিপনা কাটতে লাগলো। আমি নিরিষ্ট মনে দেখছিলাম, আমার আধপোড়া সিগারেট থেকে ধোঁয়ার লম্বা রেখা, উপর দিকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মুখ না তুলেই একসময়ে মলিনা বললে, "একটা দিন থেকে যান না?" সিগারেটের ধোঁয়া-আঁকার মত উত্তর আমার মুখ থেকে সহজেই বেরিয়ে এল, "তুমি আমায় একটু আগে তাই ভাবছিলাম, একটা দিন থেকেই যাই।" আমার সদ্যো-অর্জিত নতুন সম্বোধনটাও যেন প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়বোধক চিহ্ন হয়ে চোখের সামনে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করলে হয়ত ক্ষতি শুধরে নেয়, কিন্তু সে সময়টাও পার হয়ে গেছে। মলিনার মুখ আর একটু নীচু হয়েছিল। আমি তার দিকে কিছুকাল চেয়ে নতুন পথে ভুল শুধরে নেবার জন্য বললাম, "কিন্তু আমার এখানে থাকার আর প্রয়োজনও

দেখছি যে, তাই আবছি চলেই যাই।" মলিনা মুখ তুললে, নিঃসঙ্কোচ সহজ দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে সে বললে, "খাও।" আমার উত্তর যেন প্রস্তুতই ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, "হাঁ, থাকবো।"

মরীর সঙ্গে বাঁধেও যদি একবার ঠিক খাল প্রথমে হয়ত সামান্য জল কাটল চুঁইয়ে পড়বে, কিন্তু মরু অবিলম্বে যে বাঁধ চূর্ণ করে' উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বাস বেগে ছুটে বেরুতে পারে সে সম্ভাবনার কথা আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু, আমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে' সেই ক্ষীণ স্রোত-ধারা চোখ মেলে দেখছিলাম।

মলিনা উঠে দাঁড়ালো, বললে, "চা খাবে? নিয়ে আসিচি।" এবং অতি সামান্য সময়ের মধ্যে সে দু'কাপ চা নিয়ে এসে বসল। দুধ চা প্রস্তুতই ছিল। আমি হেসে বললাম "তুমিও দেখছি আমারই মত চা বেশী খাও।" একটু হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে সে বলে, "হাঁ। সৌরী তখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করে' আমার দিকে চেয়ে যে হেসেছিল — এই জন্যেই।"

আমি চা শেষ করে' আধেকটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। টুকরো কথার বেড়ার পাশে পাশে এই যে আমরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি জানি এ স্বাচ্ছন্দ্য যে কোন সময় লুপ্ত হতে পারে; যে কোন সময় এই বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।

চোখ চায়ের কাপের দিকে রেখে মৃদু হেসে মলিনা বললে, "আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল।" আমি প্রশ্ন করলাম, "কি মনে হয়েছিল?" একটু ভেবে সে বললে, "না কিছুনা, সে অন্য কথা।" আমার মনে কৌতুক বোধ হল। হেসে বললাম, "আমি বলতে পারি।" "কিছুতেই পার না," সে মুখ তুলে বলে। "বলবো? প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, এ আমার অচেনা নয়।" অকপট বিস্ময়ে মলিনা বললে, "কি ক'রে বুঝলে?" "এবারে তুমি বল, কি করে' বুঝলাম?" সৌরী আসছিল, তার সাড়া পাওয়া গেল। মলিনা বলে, "সৌরী আসচে।" এবং তাড়াতাড়ি পূর্বকথার উত্তরে বলে, "বুঝেছি।"

সৌরী ভিতরে এসে চায়ের কাপ দেখে বললে, "দিদি আমার চা খাচ্ছ? বেশ মিলেছ তোমরা।" মলিনা দু'হাতে কাপ ধরে' মুখের কাছে তুলে রাখল। তার মুখের উজ্জ্বসিত হাসির রেখা সৌরী দেখতে পায়নি, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ক'টার গাড়ীতে যাবেন?" "যাবে যাবার তাড়া দিলে এখনই যেতে পারি।" "যাবে! আপনিই ত বলছিলেন —" কথা তার সমাপ্ত হলনা, অপূর্ব ভিতরে এল। চায়ের কাপ মলিনার মুখ থেকে তখন নীচে নেমেছে। আমি অপূর্বকে বললাম, "তাহলে একটা দিন থেকেই যাই, কি বল?" অপূর্ব খুশী হয়ে বলে, "তাই ত। কিন্তু হঠাৎ যে তোমার মত বদলালো?" সৌরীর সঙ্গে বললাম, "ঐ যে বললে — Under current!" "Under current? — ও"। মলিনার দিকে চেয়ে সে বলে, "বলিনি তখন, ওর লেখার হাসিকান্নার ইংরেজী কিছু লিখে রাখতে পারেন? এই দেখুন —।" আমি উঠে বললাম, "এবারে চলি। চল অপূর্ব।" অপূর্বকেও তাড়াতাড়ি উঠতে হল। আমি সিঁড়ির দিকে চেয়ে বললাম, "বেশ অন্ধকার দেখছি, একটু আলো দেখাতে হবে।" আমার এই ঠাট্টার প্রতিবাদে অপূর্ব এগিয়ে দশকে নীচে নেমে গেল। সৌরী অবশ্য আলো নিয়ে সিঁড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি মলিনার প্রায় গা ঘেঁষে যেতে যেতে বললাম, "সাবধান হয়ে আর লাভ অবশ্য নেই, এক্সিডেন্ট যা হবার হয়েই গেছে।" মলিনা আমার আঙুলে ঈষৎ চাপ দিয়ে স্মিতমুখে দৃষ্টির সাহায্যে আমার বাচালতাকে বাধা দিলে। সৌরী রসিকতাটা তার আর অপূর্বর প্রতি নিক্ষিপ্ত মনে করে' মুখ নীচু করে' হাসল। কিন্তু মলিনার হাতের ইঙ্গিতে আমাদের মধ্যেকার তখনও বর্তমান ব্যবধানের পাতলা পর্দাখানা সম্পূর্ণ সরে' গিয়েছিল।

পরদিন বিকেলের গাড়ীতে আমাকে তুলে দিতে এসেছিল হরিদা, মনিবের বাবা আর অপূর্ব। গাড়ী ছাড়বার পূর্বক্ষণেও মনিবার বাবা বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্য বার বার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন। গাড়ী ছাড়ার পর মনিবার দিকে চাইলাম, দৃষ্টি একাগ্রই আমার মুখের উপর ছিল। সে দৃষ্টিতে অসুখর ছিল না, কোন দ্বন্দ্বের চিহ্নও নয়, ছিল আমাকে নিঃশেষে বুঝে নেবার চেষ্টা। কিন্তু তার দৃষ্টিকে, তাদের সকলকে যেন উপেক্ষা করে গাড়ী আমাকে নিয়ে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেল।

বিয়েতে আমার দাওয়া হয়ে ওঠে নাই। অপূর্বর সঙ্গেও এক মাসের উপর আমার দেখা নেই। সেদিন আমার বাড়ীতেই তার গলার আওয়াজ পেলাম — "বৌদি ভালো আছেন?" আমার গৃহিণীর তখন বোতলের ছাত্র জোড়া ছিল, সংক্ষেপে বললেন, "বসুন, আসছি।" অপূর্বর উত্তর শুনলাম "আজ আর বেশী দেরী করব না, একটু কাজ আছে। আপনার কর্তা কোথায়?" "আছে ঘরেই"। "কি করছে?" "ঘুমোচ্ছে নাকড়ছে হয়ত।" অপূর্ব হেসে বলে, "যাহোক্, তবু সেজ নাড়ছে না ত!" গৃহিণীর উত্তর শুনলাম, "সেই বালে"। আমি ভাবছিলাম এখনই বেরিয়ে পড়ে কয়েক মাস সতী স্বামীনিন্দা শুনে একদিন দেহত্যাগ করেছিলেন, আর তুমি — কিন্তু বেরলাম না, বাকীটা মেলাতে পারছিলাম না বলে'। স্বামীনিন্দা শুনে দেহত্যাগের কাহিনী সকলেই অবশ্য জানে, কিন্তু স্বামীনিন্দা করে' কি হয়েছিল এমন কোন পৌরাণিক কাহিনী সম্প্রতি মনে আসছিল না।

অপূর্ব ভিতরে এসে বলল, "ব্যাপারটা আছ দেখছি!" সাদাসিধে হলেও অপূর্বর মুখে রসিকতা কোন দিন শুনি নি। আমি মনে মনে গৌরীকে ধন্যবাদ দিলাম। মাত্র একমাসের মধ্যে অপূর্বর এই উন্নতি গৌরীরই গৌরব প্রমাণ করে দিচ্ছে। তারপর অপূর্ব যা কিছু বললে রসিকতার সামান্য ছোঁয়াও তাতে নেই, সবই গুরুগম্ভীর। সে বিনা ভূমিকায় বললে, "বিয়েতে না গিয়ে তুমি খুব অন্যায় করেছ।" আমি কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলাম, "বুঝতেই পাচ্ছ —" "বুঝতে পাচ্ছি, না গিয়ে তবু অন্যায় করেছ। পরদিনও দিদি আশা করছিলেন, তুমি যাবে।" "দিদি! দিদি কে? ও ঠিক মিঠু, বীর দিদিকে দিদি বলাই ত রীতি। আমার আবার ঐ সব সম্বোধন কোনদিন আসেনি ব'লে হঠাৎ মুখতে পারিনি। কি বলছিলেন বলিনা দেবী?" "নিজের গুরুজনের সম্বন্ধে বলা ঠিক নয়, তুমি না যাওয়াতে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন, আমি নিজে দেখেছি।" আমি একটা সিগারেট মুখে দিয়ে বললাম "কি যে বল! আমার জন্যে কাঁদবেন কেন? একটা ঝিয়ের দিন; স্বামীর কথা মনে করে' হয়ত কেঁদেছিলেন।" বাধা দিয়ে অপূর্ব বললে, "যাক্ বোকোনা, হয় স্বামীর জন্যে আশ-ট্রেটার পর পেলেই বারে বারে জানলার দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, না?" আমি চুপ করে রইলাম। অপূর্ব বললে, "আজ আমার সঙ্গে চল।" "কোথায়?" "এক্সিডেন্ট হয়েছে — হকের উপর থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে, মাথায় দারুণ চোট পেয়েছে। বাইরে থেকে বোঝা যায়নি, কিন্তু ঘাড়ো তার মোটেই ভালো ছিলনা। ডাক্তার এমনও বলছে যে —" "উঁহু" — আমি পাল্টা প্রতিবাদ করলাম। একটু চুপ করে থেকে অপূর্ব বললে, "হাঁ — চল আমার সঙ্গে।" আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম "কেপেছ? আমি কোথায় যাবো? ডাক্তারও নয়, কোন আত্মীয়ও নয়। ছোটবোনের স্বামীর বন্ধু — এ কি একটা পরিচয়।" অপূর্ব আর কথা না বলে' উঠে বেরিয়ে গেল। হয়ত বা রাগ করেই গেল।

অপূর্বর কাছে প্রকাশ না করলেও মনে আমি ব্যথা বোধ করছিলাম, তবু সেখানে যাওয়া সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। সেই একটি দিনকে আমি ভুলিনি বা ভুলতে চাইও নে। ঐ দিনটির জন্য মনে অনুতাপও

কোনদিন বোধ করিনি। ভবিষ্যৎ-শূন্য একটা নিঃসঙ্গ জীবন সে ঘরে নিয়ে চলেছিল, একটি শিশুর জন্য সে-বোঝায় তাহাকে যদি একটু হালকা করে দিতে পারি — কিন্তু অসম্ভব, মনে মনে আলোচনা করারও উপায় নেই; পাশের বাড়ীর তরুণী একমাস পূর্বে যে গানটা শিখতে আরম্ভ করেছিল বোধকরি অদ্যাপি তা' তার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়নি, এখনও সুরে সুরে সেই একই আখাল দিয়ে চলেছে —

'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি যে জানি তাও হয়নি হারা —'

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব-হৃদয়!
বলিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের স্বর্গতট হ'তে?
যার লাগি' চলা তব
পরশ নাহিক সয়, —
কে তারে আসালে হেন জনমের স্বজনের স্রোতে?

তুমি কি শুনিয়া বলি' হে বিধাতা, হে অনাদি,
করি, —
ক্ষুদ্র এ মানব-শিশু রচিতেছে প্রলাপ-জল্পনা!
সত্য আছে শুদ্ধ-রবি
যেমন উষার রবি,
মিছে তারি তাপে পড়ে বিধা যত মুগ্ধ-কল্পনা।

— রবীন্দ্রনাথ

হিন্দুধর্ম ও অহিংসা

শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত

"অহিংসা পরমো ধর্মঃ" — এই মহান্ আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া মুসলীম শাসনকর্তাদের যে মহত্তম আদর্শ জনগণের বুদ্ধ ও ভৈষ মহাবীর সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মুগ-প্রয়োজন-নিরপেক্ষে নিত্যকালের আদর্শ হইয়া বিশ্বমানবকে চিরকাল আত্মবিকাশের এক অমোঘ নির্দেশ দিয়া যাইবে। এই দুই মহামানব-প্রবর্তিত অহিংসা-সাধনের পর অধিকারী-বিশেষে ভিন্নরূপা বিশ্বশান্তিকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সন্ধান দিয়া গেছে। কিন্তু সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে এই দুরূহ আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলা কতটুকু সম্ভবপর, সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রহিয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম মানুষের স্বাভাবিক এবং সহজাত প্রবৃত্তিগুলি অস্বীকার করিয়া "ধর্ম, অর্থ, কাম" হইতে "মোক্ষের" উপরেই জোর দিয়াছে বেশী। বৌদ্ধধর্ম অধিকারী এবং অনধিকারী বিচার না করিয়া প্রত্যেক মানুষের কাছে অহিংসা-সাধনাকেই মোক্ষলাভের অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে প্রচার করিয়া আসিয়াছে। ফলে শুধু মোক্ষপ্রিয়তার প্রভাবে জনগণের মনে সামাজিকতার পরিবর্তে তামসিকতাই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। একমাত্র নিবৃত্তিনিষ্ঠ অতিপুরুষগণই সমগুণের প্রাবাল্যবশতঃ পরিপূর্ণভাবে অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ। অন্যান্যদের পক্ষে অহিংসা-সাধনা শুধু নৈতিক নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের অহিংসা-সাধনার পশ্চাতে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং অহিংসা-সাধনার ফলে প্রবৃত্তিপন্থী জনসাধারণের মনে শুধু তামসিক নিষ্চেষ্টতা বেশী স্থান পাইয়া থাকে। জনসাধারণকে পরিচালন করিতে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম এ ক্ষেত্রে একটা বড় ভুল করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু এইখানেই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু-আধ্যাত্মিকতা অধিকারী নির্বিশেষে কখনই জনসাধারণকে অহিংসার অলৌকিক সাধনায় অনুপ্রাণিত করে নাই। স্বধর্মে থাকিয়া "বহজনহিতায় সুখায় চ" অনুষ্ঠান দ্বারাও যে অহিংসার সাধন হইতে পারে, ইহাই হিন্দুধর্মের অন্যতম শিক্ষা। মহাভারতে দেখি, কুরুক্ষেত্রে সর্বসুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মহাবীর অর্জুনের উপরেও তামসিক দুর্বলতা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।" যে ধর্মক্ষেত্রে এতবড় ভয়াবহ সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আমাদের শাস্ত্রে "ধর্মক্ষেত্র" নামে উল্লিখিত হইয়া আছে। এই মহাযুদ্ধে বিজয়ী পক্ষের পরিচালক অবতারবরিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে অস্ত্র-ধারণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তবে কি বলিতে হইবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহিংস ছিলেন না? কিন্তু ইহাই চিরন্তন অহিংসা-আদর্শ। পরোক্ষ অহিংসার সাধনাই হিন্দু-আধ্যাত্মিকতাকে প্রকৃতপক্ষে মানবধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। বৃহত্তর মঙ্গল এবং বহুজনের কল্যাণের জন্য স্বার্থকার্যেরও প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়। সৌজন্যই অনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে, "গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।" স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "শত্রুদলকে বীর্য-প্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের কর্তব্য। গৃহস্থের পক্ষে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিলে আর 'অহিংসা পরমো ধর্ম' বলিয়া যাহে বকিলে চলিবে না। যদি তিনি শত্রুদলের নিকট দীর্ঘ প্রার্থনা না করেন তাহা হইলে তাঁহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়" (কর্মযোগ)। অহিংসার সাধনা করিতে গিয়া যাহাতে জনসাধারণের মনে ক্লীবতা, তামসিক নিষ্চেষ্টতা ও দুর্বলতা আসিয়া

আত্মা না মরে কেহই হিন্দুধর্মের এই বিধান। তাত্ত্বিকতা হইতে হিংসা আসে। তাহার হিংসা রাজসিকতার লক্ষণ। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "... ...অবশ্য কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভালো নয়? কিছু না করার চেয়ে, মন্দের চেয়ে — ভাল-মন্দ মিশ্রিত কর্ম করা ভাল নয়?" হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, ইহা মানবের মানুষের স্বভাব, প্রবৃত্তি এবং মনের সহজাত প্রেরণা-গুলিকে অস্বীকার করিয়া কোন আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দেশ দেয় নাই। এইখানেই বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের পার্থক্য। তাই বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "অহিংসা পরমো ধর্মঃ — বৌদ্ধদের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না করে' বলপূর্বক মঠ-মন্দিরের দ্বারা ঐ মত ইতর-সাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে।"

তথাপি যদি এই প্রশ্ন উঠে যে, অস্ত্রধারণ দ্বারা হিংসা-বৃত্তির উন্মূলন সাধনাই বেশী প্রকট হইয়া থাকে— তবে বলিতে হইবে যে, অহিংসা সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা রহিয়া গিয়াছে। অস্ত্রধারণ অহিংসা-বিচারের ব্যতিক্রম নয়। অহিংসার স্থান অন্তরে; শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, ক্ষুদ্রের বিনাশসাধন এবং ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্জুনের পক্ষে অস্ত্রধারণের প্রয়োজনীয়তা আছে। হিন্দু-দর্শনে ইহাই অহিংসা-সাধনার লৌকিক পথ। অন্যায়াচারীর বিরুদ্ধে ন্যায়, ধর্ম ও নীতি রক্ষা করিয়া অবিরাম যুদ্ধ করিয়া চলা — ইহাই বীরের ধর্ম, ইহাই মানব-ধর্ম। এই আদর্শেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনুপ্রাণিত করিয়া-ছিলেন। এই অস্ত্রধারণের দ্বারা সাধকের মনে হিংসাবৃত্তিরই চরিতার্থতা হয় না। চিকিৎসক যখন প্রয়োজনবোধে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করেন তখন তাঁহার মনে রোগীকে অযথা যন্ত্রণা দেওয়ার কোন দুরভিসন্ধি থাকে না। সেইরূপ যখন আসুরিকতার হীন প্রভাব সমাজ-জীবনকে কলুষিত করিতে থাকে তখন লৌকিক উপায়ে সেই হীনশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাওয়াই বীরের ধর্ম। বহুজনের মঙ্গল ও সুখের জন্য সাধক যদি অস্ত্রাঘাত করিয়া নিহিত থাকিতে সমর্থ না হন তাহাতেও ক্ষতি নাই। হিন্দুধর্ম দুষ্টবিনাশের জন্য হিংসা অনুমোদন করিয়াছেন।

ভগবান বুদ্ধ এবং জৈন মহাবীর-প্রবর্তিত অহিংসা-সাধনার মূল্য নাই একথা আমরা বলি না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, জনসাধারণের পক্ষে নিরস্ত্র অহিংসার পথ কখনই কার্যকর হইতে পারে না। যুগপ্রয়োজনের এবং সর্বকালের জনগণের পক্ষে ঐতিহ্যোক্ত অহিংসার আদর্শই শ্রেষ্ঠ। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিব যে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি লোকোত্তর মহাপুরুষ-গণও লোকশিক্ষা এবং যুগপ্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অহিংসাময়ীয় কর্ম-বহুল জীবনে আমরা হিংসা-অহিংসা দ্বন্দ্বের সুন্দর এবং সুষ্ঠু মীমাংসা খুঁজিয়া পাইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আমরা উহাদের জীবনের সুমহান্ আদর্শের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা ইহাও ভুলিয়া গিয়াছি যে, নিরস্ত্র অহিংসার আদর্শ ই খাঁটী ভারতীয় আদর্শ। এই সুমহান্ আদর্শের পথ হইতে যদি আমরা বিচ্যুত হই তবে আমরা জাতীয় জীবনের সনাতন আদর্শ হইতেই বিচ্যুত হইব।

যত্র যোগেশ্বরো কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

হিন্দুধর্ম্ম ও ভারত-পন্থা

[পূর্ব্বের প্রবন্ধটি পাঠ করার পর সঙ্গে সঙ্গে নিম্নের আলোচনাটি পাঠ করিলে — পাঠক-পাঠিকাগণ বিষয়টি সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে আমরা যে মহা-অন্ধকারের মুখে পড়িয়াছি, তাহাতে তিন হাজার বৎসরের হিন্দু-সংস্কৃতি ও সাধনা বিপর্য্যস্ত হইতে চলিয়াছে। সেই সাধনার প্রয়োজন যদি শেষ হইয়া যাইত, তবে তাহা অথাকালে ও অস্বাভাবিক হইয়াছে মনে করিয়া আমাদিগকে আমূল হইতে হইবে, এবং মুসাম্বরের মতবর্ত্তও বরণ করিতে হইবে। কিন্তু মতবর্ত্তকে মতবর্ত্ত বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, হিন্দুত্ব বলিয়া নহে। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র এই তিনের যে-কোন এক পন্থাই হিন্দু পন্থা। কারণে বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ তিনের একটিরও অনুমত নয় যাহা — তাহা হিন্দু-ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয় নাই। আজিকার মতবর্ত্ত যদি ঐ অর্থে হিন্দু না হয়, অথচ তাহাই যুগধর্ম্ম হয়, তবে সকলেই তাহা মাথা হইয়া বরণ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে 'হিন্দু'-নাম দিয়া প্রচার করিলে, যাহারা একেবারে হিন্দু-সংস্কৃতি ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাদের 'ঘুষিয়ে' মারানো হইবে, এবং তাহা মঙ্গলকর হইবে না: মতবর্ত্তের সত্তাও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। অতএব এই বিষয়ের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে 'মতবর্ত্তনে' সেই আলোচনা আরও বিস্তারিত করিবার ও করাইবার ইচ্ছা রহিল। যঃ সঃ]

ভক্তি বা প্রেমের তত্ত্ব মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সাধনার তত্ত্ব — উহা তাহার নিজের মুক্তি বা পরম-পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়; বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্ক থাকিলেও তাহা গৌণ। যে ক্ষুধা মানুষের অন্তরাত্মার ক্ষুধা — যাহা অন্তরের নিগূঢ় হইতে জাগে, উহা সেই ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন। ইহা সব সময়ে সকলের জগতে জাগিবার কথা নয়। যাহার এই ক্ষুধা জাগিয়াছে, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া আসিয়াছে; বাহিরের জগৎ তাহার নিকটে অবাস্তব হইয়া উঠে, সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করাই তাহার প্রয়োজন। এই অবস্থা কোনপ্রকার যোগ, আত্মনিগ্রহ বা বিশেষ তত্ত্বজ্ঞানলাভের দ্বারা হয় না — জীব-স্বভাবের নিয়মেই হইয়া থাকে; ঐ ক্ষুধা যথাকালে আপনি সঞ্চারিত হয়, তখন মনে হয় — কোন উপদেশ নয়, যেন তাহার অপার কৃপার যে একটা কিসের অভাবে আকুল হইয়াছে। ঔপাধিকারী বৈষ্ণবের যা অন্তর এইরূপ প্রতীতি হয়।

কিন্তু ইহা তো সকলের পক্ষে সত্য নয়; এইরূপ নিঃসঙ্গ একক-মানুষের যে সাধনা, সামাজিক মানুষের সাধনা তাহা নয়। ঐ প্রেম বা ভক্তির সত্তাও এক বা দুই নয়, তাই তাহাকে আশ্রয়িয়া মানুষের ব্যক্তিগত সাধনাকে সামাজিক কর্ম্মসাধনার কাজে লাগানো যায় না। ভারতীয় সাধক মহাপুরুষগণ এই সত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ঐ দুই বর্ত্মকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্য-ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহারও চূড়ান্ত ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন, এবং তাহাও ঐ ব্যক্তিধর্ম্মকে যতদূর সম্ভব লক্ষ্য করিয়া। তথাপি অধিকার-ভেদ কখনো বিধিছাড়া করেন নাই।

মানুষের জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা মূলে দ্বন্দ্বাত্মক, তাহাতে ব্যষ্টিকে — ব্যক্তিকে — ঐ

সমষ্টির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়। সেই জীবনের যে ধর্ম তাহাই সাধারণ মনুষ্য-ধর্ম, সে ধর্মের অভিব্যক্তি অন্তরূপ। সে ধর্মকে মানুষ কখনো লঙ্ঘন করিতে পারে না, করিলে সমষ্টির অকল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তিরও মহৎ অকল্যাণ হয়; সেই প্রাথমিক কল্যাণ যদি বিহিত হয় তবে মানুষের পরবর্তী উচ্চ অবস্থার সেই একক-সাধনাও সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। অতএব, নিঃসন্দিগ্ধভাবে ঐ সমষ্টি-কল্যাণ-মূলক ধর্মই আদি-মানবধর্ম; যে-জাতি বা যে-সমাজ এই ধর্ম যত সরলরূপে নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে, সেই জাতিই তত শ্রেষ্ঠ।

ভারতবর্ষে আর্যজাতি প্রথমে কর্ম ও পরে জ্ঞানকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া স্থির করিয়াছিল। বেদের কর্মকাণ্ড ও পরে জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষৎ প্রভৃতি) ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান যেমনই হোক, তাহার মূলে একটা বড় তত্ত্ব ছিল, তাহাকে শক্তি-তত্ত্ব বলাই সঙ্গত; আত্মশক্তি বা পুরুষকারকেই দেবানুগ্রহের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছিল — জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার উহাই ছিল প্রকৃষ্ট পন্থা। যজ্ঞ আর কিছুই নহে — আত্মশক্তির উদ্বোধনে বলদান; ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান একটা সামাজিক কর্মও বটে; ঐ যজ্ঞের যজমানই সমাজ-যজমান; ঐ বলদানও সমাজের হিতার্থে। আদি মানব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা ভারতে এমনই করিয়া হইয়াছিল।

পরে জ্ঞানের দ্বারা শক্তিসাধনাই সত্য ও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল; সমাজ হইতে দূরে একটা সাধন-চক্র বলিয়া ব্যক্তির জ্ঞান-সাধনাই হইল আত্মার মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়; যজ্ঞমূলক কর্মসাধনাকে হেয় করা হইয়াছিল। ঐ জ্ঞানপন্থা মুখ্যত ব্যক্তি-পন্থা — সমাজ সে পন্থা গ্রহণ করে নাই, যজ্ঞের কর্মপন্থাই সাধারণের কর্মপন্থা হইয়া রহিল।

তথাপি কালক্রমে বেদান্তের ঐ তত্ত্ব এমনই মর্যাদা লাভ করিল যে, আর্যের সমাজ-ধর্ম হয়া একটা ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিল; যাঁহারা গুরুস্থানীয়, অতএব সমাজের নেতা থাকেন, তাঁহাদের ঐ ব্রহ্মজ্ঞানে আর যেমন আস্থা না থাকায় — কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর বিবেচিত হওয়ায় — ঐ কর্মযজ্ঞকে, ঐ পুরুষকার-বাদকে শোধন করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক হইল; কারণ, ঐ কর্মমূলক ধর্ম ব্যক্তিবিশেষকে লোকোত্তরস্থিতি দান করিলেও, 'ধর্ম' বলিয়া তাহা তখনো পূজিত হয় নাই। 'ধর্ম'ই মানুষের ধারণাতীত, তথা আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের একমাত্র স্বাভাবিক বা প্রকৃতিনির্দিষ্ট উপায়—ইহা সে সত্যই স্বাধীন উপলব্ধি করিয়াছিল। জীবন ও জগৎ কর্মময়; এই কর্মকে উচ্চতর রূপে জানা, তাহার অন্তর্গত সেই বিশ্ব-নিয়মকে উপলব্ধি করা এবং জীবনে তাহাকে প্রযুক্ত করা — ইহাই শ্রেষ্ঠ 'ধর্ম' বলিয়া সমগ্র আর্যচিত্তে একটা দুরূহ তত্ত্বের অভিমুখী হইল। বেদান্তের পর গীতা; গীতায় এই তত্ত্বের পূর্ণ উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা বেদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত সেই আদি ও অবশ্যকীয় তত্ত্বটিকেই বেদান্তের আত্মতত্ত্বের দ্বারা শোধন করিয়া একটি পূর্ণতর ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিল; সেই শোধিত কর্মতত্ত্বের আলোকে জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া মানুষকে অনুদ্বেগচিত্তে জীবনের সম্মুখীন হইতে বলিল। ইহাও শক্তি-সাধনা; আত্মশক্তির দ্বারাই মানুষকে সব-কিছু জয় করিতে হইবে। তফাৎ যে তত্ত্ব উহাতে আছে — জ্ঞান করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তাহাও দ্বৈতের আবরণে অদ্বৈতের সাধনা, তাহাতেও নিজ-আত্মাই আত্মার একমাত্র সহায়; যে পরম-পুরুষের শরণ লইতে হইবে সেই পুরুষও ব্যক্তি-আত্মার একটা গূঢ়তর স্বরূপ, ভক্তিও সেই আত্মার প্রতিই ভক্তি। গীতা বেদান্তের সেই তত্ত্বকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই, অথচ তাহারই উপরে তদতিরিক্ত যা

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আসল কথা, বাহিরের সহিত মানুষের যে সংগ্রাম তাহাই জীবন; সেই সংগ্রামে জয়ী হইবার একমাত্র রীতি — উৎকৃষ্ট কর্মনীতি; অর্থাৎ পুরুষকার সহকারে 'duty' বা 'আর্য্য কর্ম'-সম্পাদন করা। সমগ্র ইউরোপ এই 'duty'কেই উচ্চতম আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা দান করিয়াছে। 'তদ্বৎ যুদ্ধায় ভারত!' 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!' — ইহাই জীবন-কুরুক্ষেত্রে, তথা কর্মক্ষেত্রে তাহার একমাত্র পাথেয়-নির্দ্দেশ। সারা বিশ্বকে সে ঐ শক্তিসাধনায় — সেই duty-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের বহুভূমিকায় দেখিয়াছে; কোন সেটিমেণ্ট, রাগ-দ্বেষ, বা হৃদয়বৃত্তিকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেয় নাই — হিংসা-অহিংসার মোহজনিত সংস্কারকেও দলন করিয়া, আত্মাকে বন্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে বলিয়াছে। প্রেম ও করুণার নামে সে যাহার গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছে তাহাও 'হৃদয়দৌর্ব্বল্য' নহে — 'কৃপা' নহে। ঈশ্বরের একমাত্র স্তব হইয়াছে — জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার স্তব। মানুষের যত ভিন্ন, যত দুর্বলতা, প্রকৃতি-সংসর্গে যত-কিছু উৎপাত — সেই সকল হইতে অব্যাহতি পাইবার উৎকৃষ্ট-পন্থা সে নির্দ্দেশ করিয়াছে।

ঈশ্বর জীবন ও জগৎকে তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিয়া যে শক্তি-সাধনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, উহাই খাঁটি আর্য্য-চিত্তার সর্ব্বশেষ পরিণত ফল। উহাও শক্তি-বাদের কথা — দুর্বলের নহে। তথাপি তত্ত্বহিসাবে, ঈশ্বর একটা মূল-সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে — বিশুদ্ধ চিন্তার দিক দিয়া তাহা অখণ্ডনীয়। ঈশ্বর শক্তিকে স্বীকার করিয়াছে, তাহার সাধনাও মূলে শক্তি-সাধনা — ভক্তি বা প্রেমের সাধনা নয়। অতিমাত্রায় Idealist হইলেও, এইখানে সে Realist। সে জীবনের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাকে পাশ কাটায় নাই। সে কে-সাধনার ব্যবস্থা দিয়াছে, তাহাতেও অধিকারী-ভেদ ও স্তর-ভাগ আছে; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম প্রত্যেকটির পৃথক মূল্য-নির্দ্দেশ আছে — এবং এত অধিকারে এক-একটির উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে; ইহাই তাহার বাস্তব-নিষ্ঠা। কিন্তু সকলই ঐ কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া — কর্ম্মই তাহার মূলতত্ত্ব। এই কর্ম্ম আর কিছু নয় — মানুষের যে দুর্জ্জয় শাসন, সেই শাসনকেই স্বাধীন আত্মার অনুমোদিত করিয়া লওয়া।

এই কর্ম্মতত্ত্বে হৃদয়বৃত্তির স্থান নাই; অথচ ঐ কর্ম্ম বা duty-র অনুষ্ঠানে মানুষের সকল প্রবৃত্তিকে — প্রত্যেকের প্রয়োজনকে — মানিয়া লওয়া হইয়াছে; চাতুর্ব্বর্ণ্য, যা মানুষের প্রকৃতিভেদে প্রত্যেক বর্ণের যে 'স্বধর্ম্ম' তাহাকে পূর্ণস্ফূর্ত্তির অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ, duty-বাদের সহিত স্বধর্ম্মের সমন্বয় — ইহাই ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ইহার দ্বারা সে কর্ম্মকে মানুষের স্বভাবের অনুকূল করিয়াছে — প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুয়েরই যোগসাধন করিয়াছে, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সন্ধিস্থাপন করাইয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে ঈশ্বর এই বাস্তব-জীবন-নিষ্ঠাকে নানা অবাস্তব আদর্শবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন করা হইয়াছে, সেইজন্য ঈশ্বর একটা উৎকৃষ্ট তত্ত্বগ্রন্থ হইয়া আছে, জীবনের সহিত তাহার যোগ ছিন্ন হইয়াছে। দেশে, সম্ভবতঃ যখন তাহার নির্জ্জীব, শক্তিহীন এবং পর-পদানত হইতে সুরু করিয়াছে, তখনই ঐ শক্তি-বাদকে অক্ষিমায় পরাস্ত করিয়াছে; ভাববাদী অধ্যাত্মবাদীর দল, মানুষের প্রকৃতিগত যে মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ, তাহার উপরে এক অপ্রাকৃত অবাস্তব আদর্শকে স্থাপন করিয়া, দুর্ব্বলের স্বপ্ন-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে — সেই স্বপ্নই সত্য, এবং তাহাই নিরাপদ আশ্রয় বলিয়া কাপুরুষকে আশ্বস্ত করিয়াছে। স্বপ্রকৃতিকে জয় করিবার যে সাধনা — ইহা সেই সাধনা নয়; বরং, অনেকে সেই প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া, আত্মহত্যা নয় — আত্মবাসের সাধনা। বর্ত্তমানে ভারতবাসীরা তামসিক নির্জ্জীবতায়

চরম সোপানে নামিয়াছে, তাই পর এক হাজার বৎসর ধরিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাপার ধারা যে ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করা হইয়াছিল, আজ তাহারই অবলোপে সে যে এমন উল্লুসিত হইয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। গীতারও দু-রাখা চরমে পৌঁছিয়াছে, শ্রীভগবানের উক্তিগুলি শ্লেষের দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে — যাহা জীবনযুদ্ধে অবসাদের উৎকট মন্ত্রবাণী, তাহাই হইয়াছে পরাজয় ও দুর্ভাগ্যের আশ্বাসবাণী! গীতা, তথা হিন্দুধর্মের এই বিকৃত ব্যাখ্যা নিরসন করিয়া একালে যে একজন মহামনস্বী হিন্দু অসামান্য পাণ্ডিত্য ও সত্যনিষ্ঠা সহকারে, 'গীতারহস্য'-নামে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রয়াসও ভাসিয়া গিয়াছে, এবং গীতারও যেমন, হিন্দুধর্মেরও তেমনই, এমন ব্যাখ্যা করা হইতেছে, যাহাতে পোলিটিক্যাল জাতীয়তাবাদের মূলতত্ত্ব নিখাদ সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই অবলুপ্ত হয়; অর্থাৎ, যাহাতে তিন হাজার বৎসরের হিন্দু-ভারত নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বধর্ম ভুলাইয়া দিয়া, হেয়ের সঙ্গে অন্যোন্যতার পথের নিকটে বিক্রয় করিয়া, সর্ববিধ সংগ্রাম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। হিন্দুর ধর্ম যদি পলিটিক্সের বাহন হয়, তবে হিন্দুর মনুষ্যত্ব যে কি আকার ধারণ করে তাহাই এক্ষণে সকলে চাক্ষুষ করিতেছে।

উইলো-পাতা

[আনাম দেশের কবিতা — অনুবাদক **শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত**]

জানালায় ব'সে স্বপন দেখে যে
ভালবাসি সেই মেয়েটিরে।
পিঙ্গ-বাহার সৌধ তাহার
আছে বটে শীত-নদীতীরে,
তবু সেইজন্যে ভালবাসিনে সে মেয়েটিরে;
উইলো-পাতাটি তারি হাত হ'তে
ঝ'রে পড়েছিল নদীনীরে,
তাই ভালবাসি মেয়েটিরে।

বড় ভালবাসি পুবে-হাওয়া।
পুব-পাহাড়ের ফুলে-ফুলে সাদা
শীতের সুরভি যায় পাওয়া,
তবু সেইজন্যে ভালবাসিনে সে পুবে-হাওয়া
উইলো পাতাটি সেই এনে দিল
চেনাদিন হবে তরী-বাওয়া,
তাই বড় ভালবাসি পুবে-হাওয়া।

উইলো-পাতাটি বাসি-বাসো।
তারি মুখে শুনি নবরসের
কবে কের ধরা হবে কালো,
তবু সেইজন্যে পাতাটিরে নাহি বাসি ভালো;

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি — প্রথম, যে রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায় অতিশয় মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী — বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিব্য-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

শিল্পী ও সমালোচক

(পূর্বানুবৃত্তি)

মিলবার্ট — আমার, ক্রিটিক যে কেবল তার নিজের জবানীতেই লিখতে পারে, তা' নয়; কখোপ-কথনের ভঙ্গিতে যেমন, তেমনই গল্প বা বিবৃতির ভঙ্গিতেও লিখতে পারে। কথোপ-কথনের মত এমন অপূর্ব ভঙ্গি আর নেই — প্লেটো থেকে সুলিয়ান, সুলিয়ান থেকে গল্সো ঐ ভঙ্গিটিকে অমর করে' গেছেন। তাঁরা সত্যিকার সৃষ্টিধর্মী সমালোচক তাঁরা ওই রকম রচনার দ্বারা আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ দুইই করতে পারেন; নকল রকমের খেয়ালী কল্পনাকে রূপ দিতে পারেন, মনের প্রত্যেক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করে' তুলতে পারেন। ওরই সাহায্যে তিনি তাঁর ভাববস্তুটির সকল দিক খুলিয়ে দেখাতে পারেন, — তাঁদের তৈরী

বুদ্ধিকে যেমন দেখাতে পারা যায়।

অ — হাঁ, আরও তিনি পারেন, — একটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষী খাড়া করতেও পারেন, তারপর কতকগুলো অদ্ভুত যুক্তি ও কুতর্ক তার মুখে বসিয়ে দিয়ে তাকে নিজের বলে টেনে আনতেও পারেন।

সি — ব্যাপার কথা এই যে, পরমত নিজের মতে আনাটাই সহজ, — নিজের মতটা পরিবর্তন করাই যে সবচেয়ে শক্ত। নিজের বিশ্বাসটা যে ঠিক কি, তা জানতে হ'লে পরের মুখ দিয়ে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করাতে হয়; সত্যকে জানতে হ'লে সহস্র মিথ্যার সৃষ্টি করতে হয়। আসলে সত্য জিনিষটা কি? স্বর্গের ব্যাপারে, যে-সত্যটা শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে, তাই সত্য। বিজ্ঞানের সত্য হচ্ছে — সেই বস্তু যা ইন্দ্রিয়গুলোর সর্বসম্মত অনুভূতি; ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি, আমাদের মনের সর্বসম্মত ভাবাবস্থা যেটা সেইটেই সত্য। এখন তা হ'লে দেখতে পাচ্ছ, শিল্পীরও যেমন, ক্রিটিকের হাতেও তেমনই, ভাবপ্রকাশের সেই সবগুলো জমিই আছে — যেগুলোকে তুমি আত্মবিদ্রোহক ঘটনাভূমি বলছ। যাদিন ওঁর শিল্পসমালোচনাকে ভাবের গণ্ডীর ছাঁচে ঢেলেছিলেন; তাতেও বিপরীত চিন্তা এবং দিক্-পরিবর্তনের অবকাশ রয়েছে। ব্রাউনিং ওঁর নিজস্ব ভাবচিন্তা অভিব্যক্তির-ছন্দে গেঁথে দিয়েছেন, তাতে কবিও যেমন, চিত্রকরও তেমনই, তাদের অন্তরঘরে উঁকিঝুঁকি করেছে। কেন? ওঁর রচনায় কথোপকথনের ভঙ্গি আশ্রয় করেছেন; অনেক সনেটের ভাবাভ্যুদয়েই বর্ণ-চিত্রীদের বর্ণ ও রেখাচিত্রীদের রেখার মত কিছু না কিছু অপরোক্ষতা করেছিলেন — ওঁর নিজের আঁকা ছবি ও রেখাচিত্রকেও বাদ দেন নি; যেহেতু তিনি শিল্পকলার সবরকম ভাষাকেই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তাই ওঁর শিল্পী-মন বুঝতে পেরেছিল যে, কাব্য-সাহিত্যই শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা — আর, ভাবাভিব্যক্তির পূর্ণতম ও সুন্দরতম প্রকাশ হয় বাক্যে।

অ — আচ্ছা, এখন তা'হলে স্থির হয়ে গেল, ক্রিটিকের হাতেও সব রকমের কল্পনাভঙ্গি রয়েছে; এর পর তোমাকে আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই — খাঁটি ক্রিটিক হতে হলে কি কি গুণ থাকা দরকার?

সি — এ বিষয়ে তোমার মত কি?

অ — আমার মতে, ক্রিটিকের সবচেয়ে বড় গুণ — অপক্ষপাত।

সি — না হে, না। সাধারণতঃ অপক্ষপাতী বলতে যা বোঝায়, ক্রিটিক তা' হতেই পারে না। যে-বস্তু আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে না, অর্থাৎ যার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন — তার সম্বন্ধে কিছুই মনে করিনে — তার সম্বন্ধেই আমরা সম্পূর্ণ অপক্ষপাত প্রকাশ করতে পারি; এই জন্যেই যে-সব ঘটনাও পক্ষপাতহীন, তাদের কোন মূল্যই নেই। যে-মানুষ কোন বিষয়ের দুটো দিকই দেখে, সে কিছুই দেখে না। আর্ট জিনিষটাই হচ্ছে অনুরাগের ব্যাপার, ওখানে সকল চিন্তা সকল তত্ত্বই আবেগের রঙে রঙীন হয়ে ওঠে, ভাবাবেগে উদ্বেল করে, — কাজেই, কোন কঠিন আকার ধারণ করতে পারে না; বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাকে যাচা যায় না, অবশ্য-স্বীকার্য বলে' প্রমাণগুলোর যে গৌরব আছে, সে গৌরব তার নেই। অবিশ্যি, কোন রকম অকারণ বিদ্বেষ থাকাও উচিত না;

কিন্তু প্রায় একশো বছর আগে সেই এক ফরাসীদেশের যে মনীষিরা বলেছিলেন — এ সব বিষয়ে মানুষের নিজস্ব ভাল-মন্দ লাগার প্রয়োজন আছে, তা যদি সত্যি হয়, তা' হলে পক্ষপাত না থাকবে কেমন করে? যে-ব্যক্তি নিজের কথা বলার সেই কেবল অপক্ষপাতে সবরকম শিল্পবোধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। না, ও কথা ঠিক নয়; অপক্ষপাতী হওয়াটা খাঁটি ক্রিটিকের গুণ নয়। এমন কি, অপক্ষপাত নইলে সমালোচনাই সম্ভব নয়, একথাও মিথ্যা। কোন শিল্পসৃষ্টি — তাকে যা চিত্র বা আর কিছুই — সম্বন্ধেই মূল্য নিতে হ'লে, সমস্ত মন-প্রাণ তাকে অর্পণ করতে হবে; সে সময়ে আর কিছুর চিন্তা মনে আসাই উচিত নয় — আসেও না।

আ — খাঁটি ক্রিটিক যিনি তাঁর অন্ততঃ অন্ধ হওয়া চাই — না, তাও নয়?

বি — বিচার বুদ্ধি! দেখ আগেই, আর্টকে অনুভব করবার দুটো উপায় আছে — এক হচ্ছে, সোজাসুজি সম্ভোগ করা — আর একটা হচ্ছে, তাকে বিচার করে' সম্ভোগ করা। কারণ, প্লেটোও একথা বুঝতে পেরেছিলেন, পেরে সুখী হ'তে পারেন নি — যে, ঐ সৌন্দর্যবোধ — শ্রোতাই হোক, অথবা দর্শকই হোক — সকলকে কেমন একটা বিশ্লেষণের দাসীবৃত্তি করে। আর্ট আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেবা করে না — সে সম্পূর্ণ অন্য একটা বৃত্তি। আমরা যখন সুন্দরের উপাসনা করি, তখন আমাদের মাথাটা সুস্থ থাকে না; তার গরিমা এমন যে, মনটাকেই সে হরণ করে। যাদের জীবনে ঐ সৌন্দর্যবোধের কিছু প্রবল, তাদের চক্ষে তারা একরকম উন্মাদ বই ত' নয়!

আ — আচ্ছা বেশ, কিন্তু তা'হলেও ক্রিটিককে অন্ধপটু হতে হবে ত'?

বি — সত্যিকার যারা তারা সৌন্দর্যের মূল নীতিটিকে অন্তরের সহিত স্বীকার করবে, সেখানে তারা বিশ্বাচারী হ'বে না নিশ্চয়; কিন্তু তাই বলে' তারা অন্যদের জন্য কোন চিন্তা বা তাদের শাসন করবে না। বহু প্রকার এবং বহু আকারের ভিতর দিয়েই তারা আত্মোপলব্ধি করবে — সহানুভূতির নিত্যনূতন আস্বাদ এবং নব নব সৃষ্টিতত্ত্ব তাদের কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখবে; ঐ বহুর অনুভবই তাদের মন-জীবনের একনিষ্ঠা। দেখ, আমেই, তুমি অনেকগুলো কথা শুনে রস পেতো না; লোকে যার নাম দিয়েছে বিশ্বাচার, একনিষ্ঠতার অভাব — সেটা আর কিছু নয়, আমাদের এই ব্যক্তিত্ব-টাকে 'এক'-এর বদলে 'অনেক' করে' তোলা।

আ — এখন দেখছি, আমি যা' বলেছি তা বুদ্ধিসঙ্গত হয় নি।

বি — তুমি যে তিনটি গুণের উল্লেখ করেছ তার মধ্যে দুটো গুণ — একনিষ্ঠা আর জ্ঞানপ্রভা — ঠিক চরিত্রগত গুণ যা বলেও, প্রায় নৈতিক সাধুতার কাছাকাছি এসে পড়ে; কিন্তু একটা কথা সকলের আগে মনে রাখতে হবে ক্রিটিকের — সে হচ্ছে এই যে, আর্টের জন্য আর নীতিশাস্ত্রের জন্য একেবারে স্বতন্ত্র, ও দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। আমাদের আধুনিক নীতিবাদীরা তাদের ঐ অদ্ভুত ওচিবায়ুর ধমক দিয়েও সুন্দর-বস্তুর সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারেন না, কিছুক্ষণের জন্যে তার গায়ে একটু কলঙ্ক ছিটিয়ে যেন যায়। এ কথা আমাকে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে,

কেবল সাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠাতেই তাঁদের অত্যন্ত প্রকাশ করায় সুবিধে হয়। দুঃখের কথা এই যে, ঐ সাময়িক-সাহিত্যের পত্রিকাগুলো নিয়ে আজকাল একটা উপদ্রবও হচ্ছে, — দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিদ্যে-বুদ্ধির যে পরিচয় ওইগুলোতে প্রকাশিত হয়, তাতেই সমাজের মূর্খরা যে কত গভীর তার একটা হদিস আমরা পাই, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূর হয়। যা' অতিশয় তুচ্ছ তারই আলোচনা ছাড়া ঐ সব পত্রিকায় প্রায় আর কিছু থাকে না ব'লেই, আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি — প্রকৃত কারিগরের পক্ষে কোন জিনিষগুলো দরকার আর কোনগুলো নয়। ঐ সব সাময়িক লেখকেরা আর যাই করে করুক, আর্টের সম্বন্ধে তাদের কোন কথা বলা উচিত নয়। একজন ঐ জাতের লেখক যখন খুব গভীর-ভাবে — শিল্পীর বিষয়বস্তু কি হবে, আর কি হবে না, তাই নির্দেশ করে দেয়, তখন না হেসে থাকা দুষ্কর; ওরকম প্রলাপই হাস্যকর। যাক, এই সব মন্তব্যদের কথায় আর কাজ নেই, এখন সেই আলোচনায় যোগ — সত্যিকার ক্রিটিক হ'তে হ'লে রসিকতার কোন্ কোন্ লক্ষণ থাকা চাই।

আ — আমি ত' তাই জানতে চাই, তুমিই বল।

দি — এত বড়ের একটি বিশেষ মানস-প্রকৃতি হচ্ছে ক্রিটিকের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন — মনের সে এমন একটি ধর্ম যে, সৌন্দর্যের চূড়ান্ত স্পর্শেও সাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের সকলের মধ্যেই একটা পৃথক ইন্দ্রিয় আছে, তাকে সুন্দর-বোধের ইন্দ্রিয় বলা যেতে পারে। এরই কারণে, কেউ বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, আর কেউ বা সৌন্দর্য্যকে কেবল ধ্যানে আস্বাদন করে; আমার মতে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দারা তারাই আরও বড় হবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়টিকে নির্দোষ এবং পূর্ণ শক্তিমান করে' তোলবার জন্যে একটা খুব অনোহর প্রতিবেশের মধ্যে তাকে রেখে দেওয়া দরকার, তা' না হ'লে সেটা শুকিয়ে যাবে, তার সে শক্তি আর থাকবে না। তোমার মনে আছে, গোটে এক জায়গায় তাঁর চরিত্র-কার তাঁদের কি লিখেছেন! সেখানে তিনি ঐ প্রতিবেশের উপরেই বিশেষ ক'রে জোর দিয়েছেন — বলেছেন যে, কতিপয় ও নয়-রঞ্জন বস্তুকিছু আছে বালকটিকে যেন সেই সকলের মধ্যে রেখে মানুষ করা হয়; বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগতের সৌন্দর্য্য পান করতে করতেই, তবে না তার অন্তর-ইন্দ্রিয় বিকশিত হয়ে উঠবে, তবেই না সে অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য অনুভব করতে শিখবে। এমনি ক'রে যার অন্তর-পুরুষ সুশিক্ষিত ও উন্মুক্ত হয়ে উঠবে, তার রসদৃষ্টি এমন স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত হবে যে — প্রকৃতিই হোক, আর আর্টই হোক — কোথাও কোন দোষ থাকলে তার চোখে পড়বেই; কোনকিছুর প্রশংসা করতে গিয়ে সে ভুল করবে না; যা' ভালো তাতেই সে সুখ পাবে — সেই ভালো তার হৃদয়ে প্রবেশ করে' হৃদয়টাকে মহৎ ও সুন্দর করে তুলবে; সেই যাচাইয়ে সে যাকে মন্দ বলবে, তাকে ভাল বলবে — কেন ভাল, কেন মন্দ, সে-জ্ঞান হবার আগেই। তারপর যখন বয়সে তার আত্মজ্ঞান হবে, বিচারবুদ্ধি জাগবে, তখন সে তার সেই বুদ্ধিকেও চিনতে পারবে, বন্ধুর মত তাকে বিশ্বাস করবে — কারণ, তার নিজের গুণে ঐ বুদ্ধির সঙ্গে অনেক আগে থেকেই যে তার পরিচয় ছিল। যারা টাকা-আনা-পাই

ছাতা আর কিছু বোঝে না' ও তবে কাকে বলি হলা বোঝে। বিশ্বাস আমরা ইচ্ছে হচ্ছে দর্শকের মনে সৌন্দর্যপ্রীতির উদ্রেক করা, এবং সে বিষয়ে উপায় অবলম্বনে, তিনটি — ঐ রকম মানস-প্রকৃতি গ'ড়ে তোলা, বলাবাহুল্য বা কচিৎ উৎকর্ষ-সাধন, আর ঐ ভাব-রস-বিকাশের অনুকূল সৃষ্টি তৈরী করে দেওয়া — তা' হলে তাদের সেই শিল্পিকরা মুখগুলো যে কি রকম হাস্যকর হয়ে উঠবে তা আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

ঐ যে মানসপ্রকৃতির কথা বলেছি, ওটা গ'ড়ে তোলবার জন্যে ফটোগ্রাফে ধরা পড়ে না — অর্থাৎ সেই সব চিত্রবস্তু, যা আমাদের মনকে কিছু দোলায় না, কেবল দেখায়। আধুনিক চিত্রকরদের আঁকা ছবিগুলো দেখতে খুবই ভালো, অন্ততঃ কতকগুলো তা বটেই; কিন্তু তাদের মিনিট দশ-বার' বেশিক্ষণ নয় — বড়-জোর পাঁচ, সেও চিত্রা আর বক্তব্যের স্পষ্টতা থাকে কিনা। তাদের ছবিগুলোর তাৎপর্য বুঝে নিতে বেশি সময় লাগে না; তারপর, অতি-পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের মত, সেই সব ছবির সঙ্গ আর সুখকর বোধ হয় না। যে-আর্ট কেবল কান-ভুলা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাকে নিয়ে বাস করা চলে। দুঃখ বলতে যত কিছু কলাশিল্প আছে তার মধ্যে ঐ একটা শিল্পই আমাদের মনে কেবল একটা ভাবাবস্থাই সৃষ্টি করে; আবার, রসাস্বাদের জন্যে যে মানস-প্রকৃতির প্রয়োজন সেটাও তৈরী করে দেয়। এর কারণ, ঐ কারুশিল্পের দুটি গুণ আছে; প্রথম, তার সৌন্দর্যের আদর্শ প্রকৃতির আদর্শ নয়; দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ চিত্রকরেরা যা কিছু আঁকে তা একটা কিছুর প্রতিলিপি বা অনুকরণ; কারুকলার পদ্ধতি তা' নয়। এই জন্যে ঐ শিল্প আমাদের অন্তরে সৌন্দর্যের ধারণাকে ঘনিয়ে দেয়; কোন ভাব বা অর্থ নয়, যেমন ভঙ্গিটি, ছাঁদটি, — যাকে কেবল সুষমা বা ছন্দ বলে, তারই একটা বোধ সঞ্চার করে দেয়। সেই বোধটাই রঙ-সৃষ্টি ও রসাস্বাদ দুটোরই মূলে বিদ্যমান থাকে। ঐ ছাঁদটা, বলেছি ঐ ভঙ্গিটাই — সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টি-তত্ত্বের আদি-প্রেরণা; পরে একটা আবেগময় অনুভূতি বা ভাববস্তু এসে যোজিত হয়। ছাঁচটাকেই প্রথমে মনোগত করে' পরে সে ভরে না, আমি ঐ ভাববস্তুটাকে একটা বিচিত্র ছন্দের ছোঁচনাটনে ঢেলে দেবো; বলা, প্রথমে যে সনেটের গঠন-সুষমার আকৃষ্ট হ'য়ে ছন্দ এবং মিলের কারুকটা ভঙ্গি মনে মনে ভেবে নেয়, তারপর কি দিয়ে সেটা ভর্তি করবে, তা ঐ ছাঁচটাই তাকে বলে' দেয়; তখন সেই নিশ্চিন্ত ভাবচিন্তায় এবং আবেগে আপনা হতেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। প্রথমেই কোন ভাববস্তু বা ভাবাবেগ নয়, — একটা নতুন কোন সুষমার ছাঁচটি যার তার প্রাণে সৃষ্টিপ্রেরণা জাগায় — তাকেই বলে খাঁটি শিল্প-প্রেরণা। বাস্তবজীবনের কোন ভাবাবেগ যদি তাকে অভিভূত করে, তবেই সর্বনাশ। বেটা জীবনে আমরা সচ্চিাই অনুভব করি, আর্টের পক্ষে তা' মাটি হয়ে যায়। যত নিম্নশ্রেণীর কবিতা দেখতে পাও সে সবের মূলে রয়েছে ঐ রকম সচ্চিাকার ভাবাবেগের সুখ। যা' স্বাভাবিক তাকে ত' আমরা সহজেই বুঝতে পারি — যা' সহজে বুঝি তাতে রস কোথায়?

(ক্রমশঃ)

সভ্যতা

(পূর্ণানুবৃত্তি)

(৫)

সভ্যতা-সৃষ্টির উপায়

কেবল অত্যাচার করিবার ক্ষমতা থাকিলে — আমি হয়তো শাসনকার্য্যে ত্যাগ করিতাম। কিন্তু সেই স্বেচ্ছাচার-শক্তির সঙ্গে যদি হিত-সাধনের সুযোগ থাকে তবে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইবে — মানুষকে সভ্যতা-দান। তাহার জন্য সর্ব্বপ্রথম কাজ হইবে, সমাজে একটী অবসরভোগী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করা; তাহাদের প্রত্যেকের ঠিক যেটুকু প্রয়োজন তাহার অধিক তাহারা পাইবে না। আরও, আমি তাহাদিগকে নিজ নিজ আয়বৃদ্ধির কোন উপায় অবলম্বন করিতে দিব না। আমার দ্বিতীয় চেষ্টা হইবে — সমাজকে এমন ভাবে গঠিত করা যে, প্রমজীবী ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ যাহারা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে এমন একটুকু অবসর পায়, যেন একটু স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে — যাহাতে ঐ নিষ্কর্ম্মা-শ্রেণীর দ্বারা যেটী যে উপকার, তাহার কিঞ্চিৎ অংশ পাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে, আমাকে দুইটি বিষয় তৎপর হইতে হইবে; এক, যন্ত্র নব বলের উদ্ভাবন — তাহাতে একটা মানুষের দ্বারা একশত মানুষের কাজ হইতে পারিবে; দুই, জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে না দেওয়া। পরিশ্রম-লাঘবের কাজ ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু উহার দ্বারা যে ধনবৃদ্ধি হয়, সেই ধনের দ্বারাই অধিকতর ধন সৃষ্টীকৃত করা হইতেছে; এই ধনরাশি মুষ্টিমেয় মানুষের অহমহমিকা-নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে, নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদেও তাহার অনেক অংশ নষ্ট হইতেছে, এবং অতিরিক্ত সংখ্যক সন্তানের পালনকার্য্যেও ব্যয় হইতেছে। জনপদ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের বলে যখন এক জন মানুষের একশত জনের কাজ করিতে পারিতেছে, তখন সেই সুদ্ধা একশত জনই, কিছুমাত্র অন্নাভাবগ্রস্ত না হইয়া, অতিরিক্ত সময় নিজের উন্নতিসাধনে লাগাইতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ নিষ্প্রয়োজন জনই সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে; অতএব উদ্বৃত্ত সময়টা তাহাদের পিছনেই ব্যয় করিতে হয়; কাজেই তাহারা পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, এখনও ঠিক সেই অবস্থায় আছে, অর্থাৎ, সর্ব্বদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-জীবনই যাপন করে। এ অবস্থায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কেবল এই হয় যে, উহারা ঐ বর্দ্ধিত জনসংঘের খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য সর্ব্ববয়স্ক উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করা যায়। তেমনি ঐ সকল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমান অনুপাতে জনবৃদ্ধিও হইতে থাকিবে ততদিন সভ্যতালাভের আশা সুদূরপরাহত হইবে।

আমার রাজ্যে আমি সকলকে স্বল্প শ্রম ও চিন্তা-প্রয়োগের পর স্বাধীনতা দিব, তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরীক্ষামূলক আচার-আচরণের অধিকারও দিব। কিন্তু ঐ আহরণ-বিতরণের ব্যাপারে করিবার অন্য স্বাধীনতা থাকিবে না, কারণ সভ্যতার সহিত কর্ম্মনীতি-প্রচারের কোন সম্পর্ক নাই — সভ্যতা কর্ম্মগত নয়, তাহা মানসিক অবস্থা মাত্র। ইহাতে সেই সকল সর্ব্বের দুর্ভাগ্যক্রমে বড়ই মুস্কিলে পড়িবে, তাহারা কখনও কিছু দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তথাপি, সভা হইতে কমিটিতে বসিয়া তাহারা বক্তৃতা করিতে

পারিবে — তাহাতে আমি শিশুকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কোন কর্ম করাইবার জন্য নহে, কেবল তাহাদের সেই সব অস্ত্রের দাহিকা ফুরাইবার জন্য। এমন লোকদের অনেক জনকে আমি পুলিসের চাকরি দিব। যাহারা জন্ম হইতেই চোর ডাকাত ও খুনে; যাহারা পরদ্রব্যাপহারী, অতএব এশ্রেণীর দুর্জন; অথবা, যাহারা এক-একটী হুলু-বেপোলিয়ন, বা আইন-অমান্যকারী মহাপুরুষ; — সেই সকল ব্যক্তিকে আমি ঠেলে পুরিয়া রাখিব। কারণ, যে-কোন কাজ করিবার অবাধ স্বাধীনতা সভ্যনীতির বিরোধী। জগতে এমন কতকগুলা পরদ্রব্যহরণী, দুর্বাক্য প্রয়োগী, দুরাচারী ও হিংস্র মানুষ আছে যাহারা সুযোগ পাইলেই এমন সব কার্য করিবে যাহাতে আর সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, এবং সভ্যতা-শাসন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আমার রাজ্যে তাহাদিগকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না।

ইংরেজের মত যাহারা এমন একটা জগৎ মনে মনে গড়িয়া থাকিতে পারেন, যেখানে প্রত্যেক মানুষ এমন সংপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হইবে যে, তাহাদের স্বাধীনতার দ্বার রোধ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে জগতে লোভ হিংসা ঈর্ষা বা অন্য অনিষ্টের কিছুই থাকিবে না; যদি বা কাহারও চিত্তে সেরূপ কুপ্রবৃত্তি থাকে সে তাহা আপনিই দমন করিবে। খুব সম্ভব ইংরেজ ইহা জানিতেন যে, যেমন পশুপ্রকৃতির মানুষ সর্বত্রই আছে ও থাকিবে; কিন্তু তিনি তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না, কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল — আর সকলে যদি দেবতুল্য সদাচারী হয় তাহা হইলে ঐ দুর্জনেরা কিছুই করিতে পারিবে না। * ইংরেজের মতে মানুষ যদি কিছুমাত্র প্রতিরোধ না করিয়া, হাসিমুখে সকলই সহ্য করে, তাহা হইলেই তাহারা ঐরূপ দেবত্ব রক্ষা করিতে পারিবে। অবশ্য তাহা পারিবে, — দেবতও অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জগতে সভ্যতা বলিয়া কোন বস্তুই আর থাকিবে না। যে ক্রীতদাস একটা বর্বর-স্বভাব মনিবের পর অত্যাচার নীরবে সহ্য করে সেও ঐরূপ সাধু বা দুঃখজয়ী মহাত্মা হইতে পারে, কিন্তু সর্বজনাধিষ্ঠিত সুসভ্য মানুষ হইতে পারিবে না। সমাজটা যদি দেবতা অথবা পশু এই দুইয়ের একটার সমাজ না হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, দোকানের সমন করিবার জন্য একটী কার্যকুশল পুলিস-বাহিনী অত্যাবশ্যক না হইয়া পারে না।

কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পুলিসের কাজ যাহারা করে তাহারা কখনো পুরাপুরি সভ্য জীব হইতে পারিবে না। ঐ যে শক্তির প্রয়োগ — শরীর উপরে সুলুম, উহা মানুষকে কতকটা বর্বর করিয়া তুলিবেই। অতএব এই সকল অত্যাবশ্যক সভ্যতা-রক্ষার কাজটা কিছু পরিমাণে অসভ্য থাকিতে বাধ্য হইবেই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা যে প্রায় ব্যর্থ হয় তাহার কারণ — অত্যাচারের দোষ নয়, বুদ্ধির দোষ। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে, বুদ্ধির উন্মেষ ও সৎ-শিক্ষার জন্য কতকগুলি আচার-ব্যবহার প্রচলন করা আবশ্যক; এবং সমাজের যাহারা নেতৃস্থানীয় তাহাদের পক্ষে এই কাজ দুরূহও হইবে না। আমি যদি হিন্দুস্থানের মত অতি-উচ্চ সভ্যতার অধিকারী হইতাম, তবে এই পন্থাই অবলম্বন করিতাম। ঐরূপ উচ্চ শাসন-কর্ম আমি বর্বরতুল্য ইংরেজ মুরুব্বের হাতেই ছাড়িয়া দিতাম; কিন্তু যেমন করিয়াই হোক, সেই সব প্রধানবান ইংরেজ-মুরুব্বের বুদ্ধিটা একটু মার্জিত করিয়া দিতাম।

যাহারা পূর্ণ-সভ্যতা লাভ করিয়াছে — অর্থাৎ

---

* এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। বঃ সঃ

যাহারা পূর্ণমাত্রায় মনের উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহারা আত্মরক্ষার বিষয়ে বড়ই নিরুপায়; তাহারা এমনই বেসামাল যে, উচিত মনে হইলেও কাহাকে আঘাত করিতে বা হত্যা দিয়ে কারার হয়। দেশের শাসনকর্তৃগণ যদি তাহাদের পক্ষে না থাকে, তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্তব্য বলিয়া মনে না করে, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব — থাকিতে হইলে বল-প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। আমি জানি, আমার প্রবন্ধের এই জায়গা তাহাদের মনোমত হইবে না যাঁহারা এমন এক খাজনামা কলাশিল্পীর নাম করিবেন যিনি কর্মবীর বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তেমন পাঠককে আমি পূর্বে অনেকবার যাহা বলিয়াছি তাহাই স্মরণ করিতে বলি, অর্থাৎ, বড় বড় কবি ও শিল্পীদের অনেকেই লড়াইয়ে ঠিক দিয়া খুব বড় ছিলেন না, হোমারও নয়, দান্তেও নয়, শেক্সপীয়রেরও নয়; — আর কত নাম করিব?

ঐ যে পুলিশ-বাহিনীর কথা বলিয়াছি, উহারা লড়াই রক্ষা করিবার জন্যই নিয়োজিত হইবে — লোকের উপরে তাহা চাপাইবার জন্য নয়। কতকগুলা বড় আনিয়া লইলেই যদি লড়াই করা যাইত, তাহা হইলে জোর করিয়া মানুষকে তাহা গিলাইয়া দেওয়া শক্ত হইত না। অপরকে লড়াই থামাইতে হইলে, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে সে নিজেই সেই উদ্যত-জীবনের পথটি খুঁজিয়া লইতে পারে।

গ্রন্থ-পরিক্রমা

কবি (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

[illegible]

বিশ্বসাহিত্যে যে সৃষ্টি মহৎ চরিত্রসমূহের সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। সেখানে একটি চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলিব, এ চরিত্র আমাদের মহৎ লেখক-সৃষ্টিরই সৃষ্টির মধ্যে — যে ঐ কুলুয়ের দলের কর্ত্রী, তাহার নাম 'মালী'। এই 'মালী'টির জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত-বিপর্যয়ের যে ছক লেখিকা অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে মহৎ সৃষ্টির [illegible] কিছু করিবার নাই। যে তাহার সম্মুখে দর্পণ ধরিয়া, সেই দর্পণে, তাহাতেই মহৎ লেখকটি নারীর আত্মাকে সেই সর্বকাল ধরিয়া পরিচালনা করিয়াছে; সকল [illegible] করিয়া — ভেদ-পার্থক্য করিয়া, পাশের নিযুক্ত করিয়াছে। সংসারের যে দিকটা তাহার ভাগে পড়িয়াছে সে দিকটার ভোগ-পাওনা সে এমন পাকা করিয়া লইয়াছে যে, কোন [illegible] তাহার মত নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ

কিন্তু সেই নিশ্চিন্তার ভোগ [illegible] তার একটা দিকের অবসান ঘটাই রহিয়া আছে — যে আলো পড়িয়া উপরের দিকে প্রতিফলিত হয় না যেন — মনের চিন্তা সাজাইবার কালে, কথার ও কাজে, যে তাহার একটা চকিত আত্মবিস্মৃতি রহিয়াছে। এ চরিত্র যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার [illegible] চক্ষুই দৃষ্টিতে নয় — স্নেহ-চেতনারও মূলে — যাহার সেই তাত্ত্বিক জ্ঞান-সত্তার অস্তিত্ব রহিয়া আছে। পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে ইহার সমান চরিত্র মিলিতে পারে — কিন্তু তাহাতে মানব-জীবনেরই অসীমতায় সৃষ্টির পরিবর্তনের রহস্যের এমন ইঙ্গিত মিলিবে না, সেই তাত্ত্বিক শক্তির বিশ্লেষণ লীলা এমন [illegible] পরিধির মধ্যে ধরা দিবে না।

কথাবস্তুর পরিচয় এই পর্যন্ত। তাহার আয়োজন-উপকরণের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি; জীবনকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে — এবং সে দৃষ্টি কেমন সহজ অথচ কত গভীর এবং দৃঢ়, তাহার

বিস্তারিত আলোচনাও করিয়াছি। এই জীবন নিখিল-মানবজীবনের মানবতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতেও, তাহা যে একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতির রূপ ধরিয়াও সে কথাও বলিয়াছি; কাব্যখানির রচনায়, কবিকল্পনা বা কবিদৃষ্টির অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়ও কিছু কিছু দিয়াছি। এখন দর্শকের, এ কাব্যের বাণী-রূপ বা ভাষার কিছু পরিচয় দিলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়। কারণ, একটা কথা কখনো বিস্মৃত হইলে চলিবেনা যে — ভাব নয়, অর্থ নয়, তত্ত্ব নয়, এমন কি, ঘটনা বা কথাবস্তুও নয়— সেই ভাবনা-কল্পনা তখনই কাব্য হইয়া উঠে, যখন তাহা একটা বাণী-দেহ ধারণ করে; সেই দেহের অন্তরালে, বাহির আলোকে যাহা থাকে, তাহার কোন মূল্যই নাই, — যতক্ষণ না একটা রূপায়ন, রূপবিচ্ছিত্তি, রূপবন্ধ বাণীমূর্তিতে তাহা প্রকাশ পায়। সেই প্রকাশের প্রেরণা যদি সুনিশ্চিত বা সত্যকার প্রেরণা হয়, তবে প্রথম হইতেই রচনার ভাষা সেই ছাঁচে ঢালাই হইতে থাকে, প্রতি শব্দ প্রতি বর্ণ সেই রূপের ধ্বনি-মূর্তিটিকে সাকার করিয়া তোলে। ভাষা বলিতে শব্দযোজনারীতিই নয় — শব্দময়-প্রবাহ বুঝিতে হইবে। এই প্রবাহ যতক্ষণ ঠিক থাকে, ততক্ষণ রচনার জন্য লক্ষণগুলির ভাবনা করিতে হয় না, তাহারা আপনা-আপনি রচনায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। আমি সেই ছাঁচের কথা বলিতেছি। তারাশঙ্করের এ গল্পটিতে রচনার সেই গুণ যেরূপ লক্ষণীয় হইয়াছে, আমার মনে হয়, তাঁহার আর কোন উপন্যাসে তেমনটি হয় নাই। চরিত্রগুলির কথোপকথনের ভাষাও যেমন, লেখকের বিবৃতি ও বর্ণনার ভাষাও তেমনই, একটি অখণ্ড ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে; একটিতে ঐ মূর্তিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, অপরটিতে সেই মূর্তিরই উপযোগী অধিষ্ঠান-ভূমি প্রস্তুত হইয়াছে — যাহাতে ছায়া-আলোকের সঙ্কেত সম্পাত আমাদের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। উপন্যাসখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে পারি, আমরা একটা নূতন ভাবমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছি; সেই ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে কবিয়াল নিতাইয়ের ঐ গানগুলি; সেই গানের অন্তর্নিহিত সুরই যেন সর্বত্রঅনুরণনশীলতা হইয়া রহিয়াছে। নিতাই কবিয়ালের প্রাণে প্রেমের সঙ্গে সঙ্গেই যে আধ্যাত্মচেতনার সঞ্চার হইয়াছে এই দুইপংক্তিই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ —

"ভালো যদি মন্দ হয়ে কেন পাকিলে তাঁর কেনে।
কালোতেমে যাওা কোলে যেয়েছ কি নয়নে ?"

— এ যেন আদি-কবির অনুচ্চারিত সেই প্রথম শ্লোক, যাহার ছন্দে ও সুরে সমগ্র রামায়ণ গানের আকারে ধরা দিয়াছিল। তারাশঙ্করও যেন ঐ দুইটি পংক্তির মন্ত্রবলে, নিতাই-কবিয়ালের দেহটির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাহারই সাহায্যে সমগ্র কাব্যখানিকে একমুহূর্তে দৃষ্টিগত করিয়াছেন — তাহাকে আর ভাবিতে হয় নাই, ঐ একটি বজ্রাঘাত হইতে পুরা-কাহিনীটি আপনিই আপনাকে বুনিয়া তুলিয়াছে। এ কাব্যের ভাষা যেখানে যেমন হোক — ঐ এক সুরের ভাষা। তাহার সেই দৃষ্টি খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখানো যাইবে না, কেবল সেই ভাবমণ্ডলটির আভাস দিবার জন্য, লেখকের জবানীতে, ইহার কিছু পরিচয় করাইব। —

"ঠিক এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল আর এক জন। পনেরো-ষোল বছরের একটি কিশোরী মেয়ে। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু নিখুঁত দেহ-ভঙ্গিতে দু'ই-তিনটার সদ্যফুল সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তক্তকে মাজা একটি বড় ঘটী, হাতে ছোট দোলাই; পরনে মেলে তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়।···সে এই ঝকঝকে গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে।···মেয়েটির সরল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন কালো জলের স্বচ্ছতার মত লেগেছে।···সবিস্ময়ে

কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল — অনর্গল খিল-খিল হাসি।"

[পৃঃ ১৭]

• •

"মেয়ে পুরুষের একটি দল আসিতেছে। . মেয়েদের বেশভূষা বিচিত্র, পুরুষগুলির চেহারাও বিশিষ্ট একটা হাপসমেনা চেহারা। এ হাপ নিতাই চেনে।

— 'গা ধাও ভাই, মনে সোনায় যাইবি!' কথাটা সে বলিল সে ছিল মনের পিছনে, হঠাৎ দাঁড়াইতেই সে আসিয়া সর্বাগ্রে দাঁড়াইল। একটি দীর্ঘ কৃশতনু সৌন্দর্যী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। যে মত চোখ দুইটায় পালা ফেলে মেন দুরীর ধার — সেই ধারিত দীঘির মতো কালো তারা-দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। পাশা আগুনের শিখার মতো নাচিয়া ফিরিতেছে মেন দুইটা কালো পতঙ্গ — মনোলোভী কালো ভ্রমর দুইটা।

মেয়েটা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল — 'ওই তুমারো ভাতার না কি? অ — মা — গ!' বলিয়াই সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশতনু থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। মেয়েটা শুধু হাসে করিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ করিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার! মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।" [পৃঃ ৫৮]

• •

"রাত্রির শেষ-প্রহর অদ্ভুত কাল। ..ঘোর-কালিমাময় নৈঃশব্দের মধ্য দিয়া একটা বিশ্বব্যাপক সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।...মাটির মুকের মতো, গাছে-পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য-কোটী কীটপতঙ্গ অধিবাস রচনা করিয়া থাকে, তাহারা পর্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, আচ্ছন্নের মত। ..আকাশে জ্যোতির্লোকে যে গ্রহ-তারা, সে লোকেও যেন বিশ্ব-জগতের স্পর্শ লাগে। যেমন অধিকাংশ বড় বড় করিয়া জ্বলে ওকতারা — অন্য রাত্রি-শেষের মতো চঞ্চল নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন-করা মহত্তম এই গভীর নৈঃশব্দের স্পর্শে নিতাই সচেতন সত্ত্বেও আসিয়া থাকিতে পারে নাই, আচ্ছন্নের মত কেমনতরো পায়ে কখন চলিয়া পড়িয়াছিল।"

[পৃঃ ১৩৭]

•

"চিতার উপর শবদেহ চাপাইবার পূর্বে প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল — 'আঃ জগন, আমার সোনায় যদন!' দুইফোঁটা জলও তাহার চোখ হইতে করিয়া পড়িল।...

"নিতাই বেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল, প্রৌঢ়া বলিল, 'দাড়াও, বাবা, দাড়াও'। সে আসিয়া যদনের আকণ্ঠ ধুলিতে বলিল।..কিই বা আভরণ! কানে দুইটা দুল, নাকে একটা বাক-দাবি, হাতে দুইগাছা শাঁখা-পলা, তাহার উপর যদনের ছিল একছড়া হালকা বিছা-হার।

"নিতাই হাসিল। বলিল, 'খুলে নিজ, মাসী!'

মাসী তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর আপনার কাজে মন দিল। গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল — 'সুকের বিধি চলে' যায় বাবা, মনে হয়, দুনিয়া আঁধার, খাদি কিছু, আর কিছু ঠোর না — কখন কিছু খাব না। আবার একবেলা খেতে না খেতে চোখ জলে ভাসতে হয়, উঁয়তে হয়; পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয়...বাঁচতেও হবে, খেতে পরতেও হবে, এগুলো ভিতের দিকে জল কি জল?' বক্তব্য শেষ করিয়া সে বলিল, 'এগুলি আমার পাওনা, বাবা'।..প্রৌঢ়া আবার বলিল, কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল — 'আমার অদেষ্ট দেখ বাবা! আমিই হ'লাম জনের জ্বালিনাম।' প্রৌঢ়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।" [পৃঃ ১৪১-৪২]

• •

"বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সে সন্ধ্যায় আসিয়া বসিল। ডোমের ছেলে সে, মন্দির-প্রাঙ্গণের অধিকার নাই — সে জন্য তার আক্ষেপও নাই। প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিয়া মন্দির-সৌধের অন্ধকার দিকে চাহিয়াই সে অন্য হইয়া গেল। তার পর সে গান ছন্না আরম্ভ করিল —

ভিখারী রাঘবে ভাঙা দেখরে মন ভোলে।
লাক্ষহলা সোনার মেউল ফেরেছ সে ভাবান ভোলে॥

ঘন্ ঘন্ করিয়া মুণ্ড ঝাঁকিয়া গানখানি ছন্না শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল।

"এখানে ওখানে আরও দশ জনে গান গাহিতেছে। হিন্দী গান। সেও উঠিয়া আসিয়া একটা জনতার পাশে দাঁড়াইল। সুর তাহার মন্দ লাগিল না; মন্দ কেন, ভালই লাগিল। কিন্তু গান সে বুঝিতে পারিল না, তাহাও লাগিল না। তাহার মনে পড়িয়া উঠিল রামপ্রসাদের গান —

আমার কাশীতে কেউ মন ভাই নাই।
সর্ব্বনাশী এলোকেশী — সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে॥

আহা রে! ইহার চেয়ে কি ভাল গান হয়! তাহার সমস্ত অন্তরটা একটা গভীর বেদনার উপলব্ধিতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল গ্রামের মা-চণ্ডীকে। রামপ্রসাদের এলোকেশী মা-চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহার আশে-পাশে ফিরিতেছে।" [পৃঃ ১৫৭-৫৮]

• •

যেখান-যেখান হইতে এই যে অংশ টুকরা উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে কাহিনীর কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না, কেবল ভাবকল্পনার ভঙ্গি এবং তাহার ভাষা কেমন, তাহাই একটু ইঙ্গিত মিলিবে। নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণ, বা ঘটনাবস্তুকে পাত্র-পাত্রীর রূপের অঙ্গ করিয়া চিত্রিত করিবার জন্য, লেখক যে মুখের-ভাষা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাও ঐ কবি-গানের যেমন রসলোকীয়, তেমনই তাঁহার সাহিত্যিক ভাষার সহিত কোথাও তাহার তাল কাটে নাই। ইহার কারণ দুইটি, — প্রথম, লেখকের নিজের ভাষাও ঐ ভাবমণ্ডলের ভাষা অতিরিক্ত; দ্বিতীয়, বাংলা সাহিত্যিক ভাষার যে রস তাহাও ঐ সমাজের ঐ ভাষা হইতেই সঞ্চারিত হইয়াছে। সে ভাষাতেও উচ্চ ও নিম্ন — সমাজ-ভেদে যে স্তর আছে, তাহা কৃত্রিম; ঐ ভাষার রস একই আত্মভাষার রস: অর্থাৎ যাহাকে আমরা খাঁটি কথা-বুলি বলি, অর্থাৎ যাহা 'সাধু' বা মার্জিত নয়, তাহাই আরও রস-ঘন। ঐ আত্মভাষাই অনুবিদ 'পিতৃভাষা'কে প্রাণের দীপ্তি দান করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও যেমন, কবি-গান, পাঁচালী, রামপ্রসাদের গানেও তেমনই, বাঙালীর অন্তর্জীবনের সেই ভাষাকে যে ছাঁদে গড়িয়া দিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই নব্য-সাহিত্যের ভাষায় ধরিয়া — বাঙালীর রস-জীবন উন্মুক্ত এবং উন্নত করিয়াছিলেন। তাঁহারপরেই সেই ছন্দের রসায়ন-চাতুর্য্য, এবং অব্যভিচারী ভাষা অন্বয়ের অন্বেষণ নিয়ম — এই কাহিনীর ভাষায়, রূপের বাস্তবতেও যেমন, রূপের অন্তরঙ্গী ভাবকেও তেমনই, এক বলীয়ছন্দে মিলাইতে পারিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই কাহিনীর ভাষায় সমগ্রভাবে আছে — বিচ্ছিন্ন পংক্তি-সমষ্টিতে তাহা পাওয়া যাইবে না। তাই আমি তেমন ভাষার দৃষ্টান্ত বেশি উদ্ধৃত করিলাম না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিব। ঐ যে প্রাদেশিক বুলি (dialect), উহাও কৌম-সংস্কৃতির ফল, সে-সংস্কৃতি যেমন প্রাচীন তেমনই গভীর — বাঙালীর ভাব-জীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ উহাতেই প্রতিফলিত হইয়াছে—প্রাদেশিক হইলেও ঐ প্র দেশিক-তার একটি বিশেষ মূল্য আছে। আমার ঐ ছাঁচটিতেই এ পর্যন্ত বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ রস-সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সেকালের শ্রেষ্ঠ নাগরিক লঘু-কবি ভারতচন্দ্রের যেমন, একালের শেষ ও শ্রেষ্ঠ

অভিধান ও বৈয়াকরণের হেফাজত হইতে ঐ ভাষাকেই আমরা আমাদের করিতে চাহিয়াছি। বাংলা সাহিত্যের আদি বা গোড়ার ইতিহাসকর্তা সম্পাদন করিয়াছেন; একজনের চৈতন্য এবং অপর জনের পরম-কৃষ্ণ-বিশ্বাস তাহার ঐ কৃষ্ণকেই আমরা করিয়াছে, না করিয়া পারে নাই। অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্য যে সেই প্রাণ-রস-বঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে — অভিধান কুৎসিত কৃত্রিম রূপ ধারণ করিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ, ভাষার সেই হৃদ-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে, বাঙালীর মুখের বুলির বিজাতীয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই মুখের বুলিই সাহিত্যের ভাষা নয়। ইংরাজী সাধুরীতি ও কথ্যরীতি মানে ভাষার যে দুই রীতির চলন হইয়াছে, তাহাতে এই বুলির কোন তারতম্য নাই — বরং ঐ কথ্যরীতিই ভাষার স্বেচ্ছাচারী; অতএব উহা রীতিই নয়। রচনাবিশেষে, ভাবকল্পনার প্রকৃতিভেদে, ঐ দুই রীতির পৃথক উপযোগিতাও আছে। ইংরাজদের আধুনিক রচনাগুলিতে ভাষার ঐ কথ্যরীতির প্রতি যে পক্ষপাত দৃষ্ট হয় তাহাও অকারণ নহে, আমি পূর্বে তাহার কবি-কৃতির যে ভাবান্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছি এ প্রসঙ্গে তাহাই স্মরণীয়।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এইখানেই আমি একটা কথা বলিবার সুযোগ লইব। যাঁহারা বলেন, সাহিত্যের ভাষার জাতিভেদ নাই, অর্থাৎ যে-কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই — তাঁহারা একটা অর্ধ-সত্যকে সত্যের গৌরব দান করেন। ভাষাই জাতিভেদ বিধান, এবং সে "জাতি" সমাজ-রাষ্ট্রে এমন কি ধর্মবন্ধনের জাতি নয় — একেবারে মানুষের অন্তরাত্মার ভাব-পুরুষের 'জাতি' — ভাষা সেই জাতিভেদ করিয়াছে। ঐ 'জাতি'র প্রক্রিয়ায় 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষে'র সমান দায়িত্বশীলতা আছে। ইংরেজের দয়ামায়া লোপ পাইলেও ইংরেজ মরিবে না; কিন্তু তাহার ভাষার স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ স্বরূপ যদি লোপ পায়, তবে ইংরেজ-জাতীয় মানুষটা লোপ পাইবে — মহামানবের একাকারে বিলিয়া যাইবে। সেই 'মহামানব' বস্তুটি কি, তাহারি চেহারা কেমন, ভাষা কেমন, তাহা এখনও নির্ণীত হইয়াই আছে। দুনিয়ার যদি মোক্ষ বা নির্বাণলাভ হয়, তাহা হইলে ঐ 'মহামানবে' লীন হওয়া সেইরূপ উচ্চ অবস্থা নয়। যাহাদের সেই মোক্ষলাভ আসন্ন হইয়াছে, তাহারা ঐ মহামানবের 'তারকব্রহ্ম-নাম' জপিয়া থাকে; তদ্দর্শনে আর সকল জাতির বহুজের একটু শ্মশানে-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাই তাহারাও মাঝে মাঝে 'হরিবোল' করে। যাক, উপস্থিত সে কথায় কাজ নাই। আমি বলিতেছিলাম, ঐরূপ উক্তি একটা অতিশয়তা মাত্র। সাহিত্যের ভাষায় বিজাতীয় শব্দের ব্যবহারে দুঃখবাদী নিরুদ্যম; তাহার অর্থ এই নয় যে, এক ভাষার অপর কোন ভাষার শব্দরাশি অবাধে গ্রহণ করিতে না দেওয়া অন্যায়। ভাষার নিজস্ব প্রয়োজনে, তাহার অন্তরাত্মা পুরুষার্থে — অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি-সাধনে — নূতন ভাব ও নূতন বস্তু-বাচক শব্দ বিদেশ হইতেও আহরণ করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেইরূপ আহরণের একটা মাত্রা বা সীমা আছে; অসাবধান আহরণ ত' নহেই — মূল ভাষার শব্দের পরিবর্তে অপরুষ্ট বিজাতীয় শব্দ সর্বদা বর্জনীয়। তারপর, সেইরূপ শব্দের দ্বারা মূলভাষার প্রকৃতি পরিচ্ছন্ন না হয়, ইহাও দেখিতে হইবে — আর কিছু না হোক, ধ্বনিপ্রকৃতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহা না হইলে, সেই সকল শব্দ কালে আপনা হইতেই বহিষ্কৃত হইয়া যায়। বিভাষার মানে-শব্দগুলি অনায়াস লভ্য করিতেই হয় — কিন্তু ভাবার্থমূলক শব্দ সম্বন্ধে বড় সাবধানতার প্রয়োজন আছে; শক্তিমান শিল্পী ভিন্ন আর কেহ সেইরূপ শব্দ স্বভাষায় আত্মসাৎ করিতে পারেন না। যাহার সেই সহজ-রসজ্ঞান আছে তিনিই বুঝিতে পারেন, কোন্ শব্দটি কেমন আকারে ও

কেমন করিতে গ্রাহ্য হইতে পারে। প্রত্যেক ভাষার মত, বাংলা ভাষারও একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে; একটা অপেক্ষাকৃত নিকট ভাষার—যেমন, হিন্দীর—সহিত তুলনায় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। মূল একই সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ উভয় ভাষায় প্রবর্তিত হইয়াছে (হিন্দীর উচ্চারণ সম্বন্ধে বাংলার তুলনায় অধিকার অপর্যাপ্ত এবং অপরিস্ফুট, তার কারণ, ঐ ভাষা এখনও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে নাই) সেই গুলিরও মধ্যে আমরা-প্রকাশ চলে না। ইহার যে দৃষ্টান্ত আছে, একটা সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সদ্‌মতি যে জনধান্' — ভারতের নক্ষত্রের এই 'জন্মা'-পীঠি হইতে ঐ 'সদ্‌মতি' শব্দটি সংগ্রহ করিতে পারে। ঐ শব্দটি কাণে বাংলা নয়; 'সৎ+মতি' — সংস্কৃতও বটে, অর্থও খুব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার, উহার ভাবও নূতন নহে; তথাপি বাংলাভাষায় — সংস্কৃতের হরণ লাগটের দিনেও — এমন শব্দ তৈয়ারী হয় নাই। আমরা 'সুমতি', 'সুবুদ্ধি', এমন কি, 'সদ্‌বুদ্ধি'ও 'শুভবুদ্ধি'-ও বলি, কিন্তু 'সদ্‌মতি' বলি না। কেন বলি না? আমাদের নিজস্ব ভাষা-জন-বোধে (instinct) বাধে বলিয়াই বলি না। এরূপ শব্দ-নির্মাণ বিশেষই হয়ত সঙ্গত অভিধান-ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য আবশ্যক হয় না; আমার, বাঙালী বহুকাল সংস্কৃত চর্চা করিয়াছে, বাংলাভাষা সংস্কৃতের সঙ্গরাশি যে পরিমাণ আত্মসাৎ করিয়াছে, এমন আর কোন ভারতীয় ভাষা করে নাই, তথাপি আমরা কখনো 'সদ্‌মতি' শব্দ ব্যবহার করি নাই, — শুনিলেই মনে হইবে, উহা অ-বাংলা; যে-বাঙালীর বিন্দুমাত্র নিজভাষার 'সংস্কার' আছে, তাহারাই ঐ শব্দটি কেমন-যেন অদ্ভুত ঠেকিবে। ইহা একটা 'প্রেজুডিস' নয়; ইহাই জাতির ভাব-দেহী সেই অন্তর-পুরুষের প্রতিবাদ। খাঁটি বিদেশী-শব্দ হইলে এমন বোধ হইত না, কারণ, তাহা বাংলার এমন স্থূল নয়; ঐ যে স্থূল হইয়াও বিস্থূল, উহাই উহার অ-রুচির কারণ। আমি জানি, ঐ স্থানের ঐ শব্দটির সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য নামবর্ম-বিলাসী বাঙালীর ভাল লাগিবে না; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আমি এখানে ধর্মমত বা ব্যক্তিবিশেষের আলোচনা করিতেছি না, — সাহিত্য ও ভাষার কথাই বলিতেছি। যাহারা খৃষ্টান বা মুসলমান তাহারাও তাঁহাদের মাতৃভাষায় উৎকট বিদেশী শব্দ ব্যবহার করিয়া ধর্মভাবের গভীরতা অনুভব করিয়া থাকেন — সেখানে ভাষার কথাটাই বড় নয়, এবং সেই সকল শব্দের প্রয়োজনীয়তাও অনুরূপ। তথাপি ইহাও সত্য যে, সেই সব বিদেশী শব্দ বাংলার প্রকৃতি-সহ না হইলে, তাহারা চিরদিন ভাষার বহিরঙ্গেই থ বিদ্ধ থাকে।

এবার 'কবি'র কবিতা-আলোচনা শেষ করি। আমি পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি, এ কাহিনীর মূল-সূত্র গীতি-সূত্র হইলেও, সেই গীতি-সূত্রে বাস্তবের কাহিনী-রূপ মণি বিদ্ধ রহিয়াছে। সেই বাস্তবতা (Realism) কোন তত্ত্বকথা বা মতবাদের নয়, বস্তু-তন্ত্রের বিরোধী নয়। যে-বাস্তব মানুষের মনুষ্যত্বের বাস্তব, তাহার মূলে আছে খাঁটি humanity বা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, — অর্থাৎ 'দেবতার উপরে মানুষ সত্য' এই ঋষিবাক্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। এ কাব্যে পঞ্চজের পতনও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে — সেজন্য পঞ্চের পঞ্চত্বকে অস্বীকার করিতে হয় নাই। এ যুগের বাংলা কাব্যে কবির দৃষ্টি সতীর অসতী-অপবাদ মোচন করিয়াছে: রাহাতেও সেই হইতে আমার পৃথক গুচিতা রক্ষা করিয়াই পতিতা নারী সতীশিরোমণি হইতে পারিয়াছে। ঐ শুচিতার সংস্কারই চিরন্তন আধ্যাত্মিক সংস্কার — যে সংস্কার খাঁটি 'humanity'র বিরোধী। যাহাদের যে বিশিষ্ট সাধনার কথা বলিয়াছি, তাহার নাম দিতে হইলে, এই humanity-তত্ত্বকেই পঞ্চের তত্ত্ব বলিতে হইবে — উহাও প্রকৃতিপন্থী, তান্ত্রিক। সুতরাং তাহার আমরা

যাহাকে শাক্ত ও বৈষ্ণব বলি, কবিরাজের চরিত্রে সেই দুই ভাবেরই অদ্ভুত সুসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে যেন দুই বিপরীত ধারা একসঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। যে পরিপূর্ণ প্রীতির বলে তাহার প্রাণের প্রসার ঘটিয়াছে, সেই প্রীতি কবিনিষ্ঠার স্পর্শে শুষ্ক হইয়া যায় নাই; তাহার হৃদয়ের উত্তাপ সেই নিষ্ঠার উত্তাপকেও পরাস্ত করিয়াছে — ইহাই তাহার শাক্ত-সাধনা। কিন্তু তাহার বৈষ্ণব-সাধনাই ঐ শাক্ত-সাধনার মধ্যে মুক্ত হইয়া এমন দিব্যি-লাভ করিয়াছে। ইহাতে কোন বিষয়ের মহত্ত্ব হানতা বা আত্মবঞ্চনার কথা হয় নাই। বাঙালীর জাতিগত প্রতিভার ধারা বরাবর অনুরূপ হইয়াছে — যাহাকে একদা এক মহা-প্রতিভা আপন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া একটা বিশেষ সাধন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল — ইহা সেই আদি বাঙালী-সাধনা। এ সাধনা বৈষ্ণব না শাক্ত? — সে প্রশ্নের উত্তর ঐ কবিরাজের জীবন-সাধনা হইতেই পাওয়া যাইবে, কোন শাস্ত্রের সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। উহা একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণব — উহাই স্বাভাবিক।

এই উপন্যাসের সম্বন্ধে আরও একটি কথা আমার মনে হইয়াছে — আমাদের কথা-সাহিত্যে পুরুষ-চরিত্র তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, এমনই একটা অপবাদ আছে। কিন্তু এই উপন্যাসে সেই ধারণা বিচলিত হয়। আমার মনে হয়, ঐ অপবাদ সম্পূর্ণ সত্য না হইতেও পারে। একালে আমাদের পৌরুষের ধারণাই ইয়োরোপীয় আদর্শের দ্বারা একটু বেশিমাত্রায় প্রভাবিত হইয়াছে। একথা সত্য যে, সাধারণ জীবনে, আমাদের সমাজে ও সংসারে, পুরুষের যে-চরিত্র সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা একরূপ অ-পুরুষই বটে। কিন্তু পৌরুষের যে আর একটি আদর্শ আছে তাহা আমাদের কথা-কাহিনীতে ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই, ইহার একটা কারণ, একটি বিশেষ ছাঁচের প্রতি আমাদের পক্ষপাত; দ্বিতীয় কারণ — ঐ পাশ্চাত্য আদর্শের মৌল প্রভাব। পৌরুষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যদি ইহাও হয় যে, সকল অপমান সকল পাপকে সে ক্ষমা করিতে পারে; নীলকণ্ঠের মত সকল বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়াও শুভ্র কল্পনায় সুধা-হাস্য করিতে পারে; হৃদয়ে বজ্র-কঠোর উন্মুক্ত করিয়া দেয় — তাহার পুণ্যবেগে আপনাকে ছাড়িয়া বিরাট ঘটন ও অকিঞ্চিৎকে ধারণ করে; সে একটি জ্ঞান বা বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাহা শক্তিরই আরেক রূপ; — তবে ঐ নিষ্ঠাই-কবিরাজের চেয়ে কাহারও পৌরুষ বড় নয়। সে পৌরুষ একটা পূর্ণতর শক্তির পৌরুষ বলিয়াই তাহা এমন শুভ্র; তাহার কোন কীর্তি নাই, কোন ছলনা নাই। আমার, রাজা-মহারাজা, বীর বা রাষ্ট্রনায়ক নয় বলিয়া তাহার পৌরুষ যদি তুচ্ছ হয়, তবে মানুষ বলিয়াই মানুষের কোন মূল্য নাই — 'সবার উপরে মানুষ সত্য', একথাও মিথ্যা।

•

'কবি'-উপন্যাসখানির এই যে বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহার কারণ, আমি তারাশঙ্করের এই রচনাটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করি কেন, আমার পক্ষ হইতে তাহার একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন ছিল। আমি জানি, বাংলার পাঠক-পাঠিকাগণ যেমনই মনে করুন — 'বড়-বড়' সাহিত্যিক, তথা সমালোচকেরা আমার এ কথায় সায় দিবেন না। কিন্তু এই সমালোচনা উপলক্ষ্যে, আমি কেবল ঐ একখানি উপন্যাসেরই আলোচনা করি নাই, বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার একটা ধারা নির্দেশ করাও আমার অভিপ্রায়। বাংলাসাহিত্যও যেমন 'সাহিত্য', তেমনই বাঙালীর সাহিত্যও বটে; ইহার মূল্যনির্ণয়ে কেবল আটের মাপকাঠি ধরিয়া থাকিলেই চলিবে না, জাতির আত্মার যে অভিব্যক্তি সাহিত্যেও অনিবার্য তাহার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কারণ, ইহা একটি স্বীকৃত সত্য

যে, আর সকল কলাশিল্পের মত, সাহিত্যেও — 'expressive of the soul of the country'। যে সমালোচকের সে দৃষ্টি নাই তাঁহার সকল পাণ্ডিত্যই নিষ্ফল; ঐ দৃষ্টিরই একান্ত প্রয়োগের অভাবে বাংলাসাহিত্যের সমালোচনা পঙ্গু হইয়া আছে।

"চক্ষে তোমার ঘনায় আঁধার — দু'চোখ বীথির অতল-কালো! —
বুকে' আছে ডুবে'-মরা কোন্ রূপসীর হাসির আলো!
এখনো তার নীলাম্বরী
সেই গো রেখা সোপান 'পরি,
কলস-বুকের বুদ্‌বুদেরা কখন্ গেছে হাওয়ায় মিলে,
আলের তলে নিথর নিশা শিউরে' ওঠে তাহার খিলে!"

বঙ্গ-দর্শন

অতএব জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থে আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম।

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত-ধর্ম্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা-ধর্ম্মের গৌরব অধিক। যদি জগতের লোকে পরস্পরের হিতসাধন না করে, পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার উদাহরণ। কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে সভ্য কি অসভ্য কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না। অতএব, পরহিতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা।

যে সর্ব্বভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান দেখে সে পরকে যেমন দিতে পারে আপনি তেমনই খায়। ইহাই ধর্ম্ম — আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম্ম নহে; কেন না, আপনাতে ও পরে সমান করিতে হইবে।

ভারত স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনতা কি বস্তু তাহা আমরা জানিয়াছি না, প্রায় হাজার বৎসর পরাধীন হইয়া থাকিলে স্বাধীনতার স্বাদগন্ধও ভুলিয়া যাইবার কথা। যেন নূতন করিয়া সেই স্বাদ লইতেছি। তাহাতে একটু বিদ্রূপ ঘটই ঘটিয়া দাঁড়াইতেছে — স্বাধীনতার সঙ্গেটা ঘটই উগ্র, স্বাদটাও তেমন মিষ্টি নয়। কিন্তু তাহাতেই চরমপন্থী পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারিবেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" অর্থাৎ কিনা, যাহা অল্পে বিপদ কিন্তু পরিণামে অমৃতময়, তাহাই শ্রেষ্ঠ সুখ; আমরা ইহার অর্থ আর একটু বাড়াইয়া লইতে পারি — যাহার বিষ জ্বালা যত অধিক তাহার পরিণাম-সুখও তত গভীর। অতএব, আমরা যে স্বাধীনতার অমৃতপাত্রটি হস্তগত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ কি? ভারতবাসী আমরা (বাঙালী চটিয়াও এবং হিন্দুমাত্র ভাগ করিয়াও) সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি।

* *

কিন্তু ভারতবাসীদের সঙ্গে সমান সৌভাগ্য লাভ করিলেও একটি কারণে, আমাদের কর্ম্মদোষে, সেই সৌভাগ্যের ষোলআনা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। যাহারা স্বাধীনতা নিল সেই উপলক্ষে আমরা বাঙালীরা কি লড়াইটা না করিয়াছি! অহিংসা-ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে ভুল বিলম্ব করি নাই — প্রবেশ করিয়াও লাফাইয়া হিংসায় তাল ভাঙিতে পারি নাই। প্রভুদের সহিত আধ্যাত্মিক সমতা

না করিয়া — পরমুহূর্তে কেবল মরক-যাতন ও সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যমর্দন না করিয়া, বহু যাত্রে ভক্ত যায় খাইয়া এবং বীর পরক্ষেপে কারাদুর্গে প্রবেশ করিয়া — তাঁহাদের ঋণ শোধ করিতে পারি নাই; সেদিন যে চেষ্টাই যখন পুরাদমে চালাইতে সুরু করিয়াছি, ঠিক সেই সময়ে বাঙালীর সর্বনাশ করিল নেতাজী সুভাষ — একজন বাঙালীই বাদ সাধিল! সেই অস্ত্রোপ-হিন্দ ফৌজ এখনও চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এখনও আমাদের মাথা খাইতেছে। তাহাদিগকে দেখিলেও স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহাসভা রাতদিন জেগেই হইয়া পড়েন। আছে এই সাধা-সাধনার এই স্বাধীনতাটি আবার কোনরূপে হস্তগত হইয়া পড়ে, তাই তাঁহারা তাহাদিগকে 'পঞ্চমস্তম্ভ বাহিনী' করিয়াছেন, দৈনন্দিনভাবে হইতে বহুদূরে রাখিয়াছেন, এবং তাহাদিগকেই বাহাল রাখিয়াছেন যাহারা প্রভুদের প্রতি তাহাদের ভক্তিকে অটল রাখিয়া স্বাধীনতা লাভের পথটি সুগম করিতেছিল। চৌ-যাজংপন্থীরাও সে বিষয়ে তত সাহায্য করে নাই — আই-সি-এস ও আই-পি-এসের ত' কথাই নাই। আর সবচেয়ে প্রীতিভাজন হইয়াছিল কে বল দেখি? স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় ঠাকুরী কে পাইতে পারে? ইহাদের ঋণ যে অপরিশোধনীয়! বাঙালীর কি আর মুখ আছে? ভালো হই চাক্ষিত্য আই-সি-এস্ ও পুলিস-পুরুষ ছিল, নহিলে আমরা কোন্ মুখে ঐ স্বাধীনতার ভাগ চাহিতাম! কল্পনোধ হয় কি! আজ বাঙালী যদি স্বাধীনতা-প্রাঙ্গণের একপাশে একটু স্থান পাইয়া থাকে — তাহা কি কম অনুগ্রহ!

* *

তা' ছাড়া স্বাধীনতাটি ভাগ করিয়া লইতে হইয়াছে — নহিলে শোধ করা যাইত না যে। হিংসার সহিত অহিংসার রফা করা কি সোজা কথা! তাহাই করিতে হইয়াছে, নহিলে পৃথিবীতে কাহারো স্থাপন করা হয় না। তোমরা যে উদয়াস্তের খাদ-মহলের প্রজা — মারামারি কাটাকাটি করা কি তোমাদের সোজা পায়? হিংসার সহিত অহিংসার মৈত্রীবন্ধন করিতেই হইবে তাই স্বাধীনতাটির ভাগ দিতে হইয়াছে। যাহারা কাড়িয়া লইতে চায়, তাহারা আর কত লইবে? লউক না উহাদের দুই হাতে যত ধরে তাহা কিছু অবশেষ থাকিবে। গোটা পাঞ্জাব আর গোটা বাংলা লইয়াও যদি নিশ্চয় হয়, ক্ষতি কি? আমাদের মহামনা এক আচার্য এই বন্দোবস্তের সম্ভাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজে তাহা হইল না, দুই দেশের পাকীরা গোলমাল বাধাইল — তাহাতে কেমন হইলে আরও নিরাপদ হইত তাহা, হইতে দিল কই? শেষে 'সার্জিকাল এওয়ার্ড'-এর দ্বারা তোমে একে দুষ্কিন-আনান করিতে হইল। কিন্তু তাহাতেও সুখ হইল না, কাটাকাটি ছেঁড়াছেঁড়ি করিয়া দিয়া এমন চালাক বাধিয়াছে যে স্বাধীনতাটা বেশ একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিতে আরও যে কতদিন কাটিবে কে জানে!

ঐ পাঞ্জাব আর বাংলাই ত' বড় মাছের মূল — সবটা পাকিস্তানে গেলে এত হাঙ্গাম হইত না। জিন্নাসাহেবও যে রাজী হন না! পাঞ্জাবে যেমনই হোক, বাংলার বাকি আনটা ত' — কতটুকুই বা? — ওর নাম কি —। জিন্নাসাহেব যদি তেমন করিয়া বুকে বুক দিয়া আলিঙ্গন করিতেন, তবে পূর্ব-পাকিস্তানটি আরো-দীঘে আর একটু লোভালো করিয়া লইতে পারিতেন। অধিস্তি উহার আয়তন-শুদ্ধি — ভারতরাষ্ট্রে যতটুকু টানিয়া লওয়া যায়, তাহা যাকে সেটুকু যাকে তত্টুকুই ঘটে। কিন্তু সেটুকু ত' যে-কোন মুহূর্তে তাঁহার হইতে পারে। বিহার উড়িষ্যা ও আসাম আর কত লইবে? কিন্তু জিন্না-সাহেব কিছুতেই রাজী নহেন, কি যে তাঁহার মতলব

তাহা তিনিই জানেন। অহিংসার এত প্রসার হইলেও, তাঁহার নিজের কি কেবল বাড়িয়াই চলিবে! এত করিয়া স্বাধীনতা লাভ হইল, এখনও জ্ঞান লেখা হইল না!

তবে কথিতেছিলাম, স্বাধীনতালাভে যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই — বাঙালীও স্বাধীন হইয়াছে; কেহটা স্বাধীন হইলে সেইটাও হয়। উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা নিন্দা নহে — বিশ্লেষণ করা মাত্র। নিন্দা করা। বাঙালীর প্রতি ভারতরাষ্ট্রপতিগণের মনোভাব এতই সুস্পষ্ট যে, চোখ করিয়া তাকিয়ে চুলি চোখে না পড়িলে, ইচ্ছা করিয়া অন্ধ না হইলে তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবে না। তথাপি, সেই উপায় মনোভাবের কয়েকটি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিব — সকলেই তাহা দেখিয়াছেন, সকলেই তাহা জানেন, তবু দিব। অতঃপর ইহার প্রত্যেকটির কি ব্যাখ্যা করিবেন তাহা জানি, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতেই হইবে, নতুবা এতবড় একটা দুঃস্বপ্ন যে তাকিয়া বসে! বসু তাকিয়েই; তাহাতে জাতি-হিসাবে বাঙালীর অবস্থার কোন ইতর-বিশেষ হইবে না, কারণ, এখনও যেমন তখনও তেমন — করিবার কিছুই থাকিবে না; কেবল যাহারা অতি-লোভে জান হারাইয়াছে, যাহারা এইরূপ স্বাধীনতালাভে বড় সুখ পাইয়াছে, এবং সেই সুখ স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও করাইতে চায় তাহারাই বড় আঘাত পাইবে। তাহারা বাঙালী নয়, উহিদেরই জন্ম-পরিবর্তন করিয়া, অহিংসার তুলসী-বাসা কণ্ঠে ধারণ করিয়া ভারতীয় অধিক-জাতির সমোত্র হইয়াছে — এবং ধর্ম প্রভৃতি বড় বড় জিনিষগুলাকেও ব্যবসায়ের দ্রব্য করিয়া তুলিয়াছে।

* *

বাংলার প্রতি ভারত-রাষ্ট্রপতিগণের উপরোক্ত বিধির ও নিষ্ঠুর উদাহরণ সংখ্যায় অল্প নহে। (১) বাংলাদেশের ঐ 'এলাকাটা'র মুখে ফেলিয়া — বাংলা, তথা হিন্দু (!)-জাতির পরমবন্ধু ও অভিভাবকের অধিকারে — তাহার দুই-তৃতীয়াংশকে বঞ্চনের ব্যবস্থা করা; তাহাতেও কোনরূপ ন্যায়-নীতির প্রশ্ন উঠিতে না দেওয়া। ইহার একমাত্র কারণ, উপরূপ ব্যবস্থায় রাজী না হইলে, রাজ্যলাভ নির্বিঘ্ন হয় না, ভারত-রাষ্ট্রপতিদের বড় হাঙ্গামা ঘটে; অতএব সেই লাভের নিমিত্তে বাঙালীর প্রাণ থাক বা না থাক। পাঞ্জাবে অনুরূপ ঘটিয়াছে — সেখানে তাদের ব্যাপারে এতখানি উদারতা করিবার সুবিধা হয় নাই। (২) পূর্ব-অপছত, বিহার-অবলিষ্ট যে স্থানগুলি বাঙালীকে ফিরাইয়া না দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প; ইহা বিহার-সরকারের প্রাদেশিক স্বার্থ-বুদ্ধির কারণে নহে — পশ্চাতে ভারত-সরকারের সম্পূর্ণ সম্মতি ও সমর্থন আছে — এমন কি, যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের শিরঃচূড়ামণি-রূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিও প্রায় প্রকাশ্যে এই 'সত্যাগ্রহে' যোগদান করিয়াছেন। (৩) বাংলার আশে-পাশে যে ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি আছে — যথা, কুচবেহার, আগরতলা — সেগুলিকে বাংলার সহিত যুক্ত হইতে না দেওয়া। উড়িষ্যার নীমাংসেও এমন রাজা আছে, যারা বিহারে যুক্ত না হইয়া বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু বাংলা দেশটা ও বাঙালীকে দেওয়া যাইবে না — সর্বপ্রকারে তাহার সীমানা-সংকোচ করিতে হইবে — কেহ দশ-আনা, কেহ দুই-আনা, কেহ তিন পাই — এমন কি এক-পাইও ভাগে পাইতেছে। ভারত-সরকারের কি দোষ? এসব প্রাদেশিকতার দুষ্কৃত। বাঙালী জাতি, আহা! যাহারা এত করিয়া স্বাধীনতা আনিয়া দিল, তাহাদিগকে দোষ দাও কেন? — পৃথিবীতে এমন বীর এমন নিঃস্বার্থ মহা-প্রাণ মনুষ্যগুলী আর আছে? এমন পরোপকারিতার দৃষ্টান্ত আর কোন দেশে উঠিয়াছে? তাহাদের মনে কোন পাপ নাই, বরং নিজীব ভালমানুষে

বলিয়া রাজকীয় মহিমায় অবতরণ করিয়া পীনস্বরে কেবলই প্রার্থনা করিতেছে — "দয়ো দয়ো দয়ো তে ভবামঃ।" আর কি করিতে পারে? বিহারের যদি 'সম্মতি' না হয়, বাঙালীর তা' হওয়া উচিত! আমরাও কি ঐ অর্থি লইয়া বিহারের সঙ্গে বিবাদ করিব! আমরাও প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দিব! পরে অবশ্য বলিয়া আমরা কি উদ্ধার হইব না? অতএব, ভারত-রাষ্ট্রপরিষদের এই উপায়টা বাঙালীর পক্ষে যেমন কল্যাণকর, তাঁহাদের পক্ষেও তেমনই সুফলপ্রদ হইয়াছে। (৯) বাংলার কিছু নিজস্ব উপার্জন আছে — পাটশুল্কাদির যে অংশ আদায় হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ অল্প নহে। ইংরেজ প্রভুরা কৌশলে তাহা হইতে বাঙালীকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। স্বাধীন-ভারত সেই ইংরেজের প্রতিনিধি-রূপে — আর সকল বিষয়ে যেমন, এবিষয়েও সেই নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। গরীব বাংলাকে সাহায্য কিছু দিবা, অন্যান্য প্রদেশগুলির অবিবেচক বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। অথচ বাংলার মত — বিশেষ করিয়া এই দুর্দিনগ্রস্ত পণ্ডিত বাংলার মত — নিঃস্ব দেশ আর নাই! (৯) পাশাপাশি প্রদেশগুলিতে (বিহার, উড়িষ্যা, আসাম) বাঙালীকে কুকুর-খেদানো করা হইতেছে — নূতন যাহারা প্রাদেশের আশ্রয় লইতে চায় তাহাদের ত' কথাই নাই, যাহারা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে উৎখাত করিবার উৎসবই যেন চলিতেছে। ইহারা সকলেই সমধর্মী, সঙ্ঘ ও অহিংসার নামমাত্র শরীর পাত করিয়াছেন — সঙ্ঘশ্রী ভারতরাষ্ট্রটিকে একটি কর্মশালা করিয়া তোলাই ইহাদের জীবনের মহাব্রত, কিন্তু যেমন ব্রহ্মজ্ঞানে, তেমনই এই লাভ-খাতেই সমস্ত তাঁহাদের তিতিক্ষা ব্রহ্মনির্বাণের প্রায় কাছাকাছি। (৯) পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু-বাঙালীর যে অবস্থা হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি হুকুম হইয়াছে, সেই পাকিস্তানেই বাঙালীকে 'loyal citizen' হইয়া থাকিতে হইবে। বাঙালীর প্রতি কি করুণা! — অহিংসা-ধর্মের কি 'ইচ্ছা গতি'! 'loyal citizen' অর্থাৎ কিনা ইসলামী-রাজ্যে ইসলামী-প্রভুদের বিশ্বাসভাজন হইতে হইবে। সে যে কিরূপ হওয়া তাহা ভবাদৃশজনেরা উত্তমরূপেই জানেন — পাকিস্তানীরা সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে নাই। তথাপি বাঙালীকে হাসিমুখে ঐ আদেশ পালন করিতে হইবে — নহিলে ভারতরাষ্ট্রের অকল্যাণ হয়, ভারতের স্বাধীনতা (যে স্বাধীনতা বাঙালীও লাভ করিয়াছে) বিপন্ন হইয়া পড়ে।

* *

কিন্তু সম্প্রতি ঐ ভারত-প্রভুরা যে আর একটি বিধি আইনবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে বাঙালীজাতির প্রতি তাঁহাদের মনোভাব আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, তাঁহারা বিশেষ করিয়া বাঙালীর ক্ষতি করিবার জন্যই ঐ আইন করিয়াছেন, বরং, ইহা বলি যে, বাঙালী বলিয়া যে একটা জাতি আছে প্রভুরা তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। আমি ভারত-শাসন-বুদ্ধিমূলক অর্থনীতির কথা বলিতেছি। বাঙালী নেতারা, অথবা দায়িত্বশীল-দলপতিরা উহার সেই অর্থ ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই, তাহার কারণ অনেক; তা ছাড়া এমন পাপ-মন ত' তাঁহাদের নাই! হঠাৎ একদিন শোনা গেল, যেহেতু পাকিস্তান বিশেষ সেই হেতু, যত বড় স্বাধীন রাষ্ট্রে যে আইন প্রচলিত আছে তদনুসারে ভারতাগুলের হাত নিষিদ্ধ করা হইল। প্রথমেই মনে হইল, ঠিক ত' — স্বাধীন রাষ্ট্রের যতকিছু সুখ-সৌভাগ্য এবং গৌরব সকলই লাভ করিয়াছি, এটাই বা বাকি থাকে কেন! — তবে আমরা স্বাধীন হইলাম কেন? স্বাধীন রাজ্যের পূরা মর্যাদা আদায় করা চাই ত! সেই, ঐ মর্যাদা-রক্ষার জন্য সতর্কীপা

পৃথিবীর ইতিহাস স্মরণে [illegible] হইতেছে — [illegible] হইবে না! যাহা ভাঙা যায় তাহাকে ভাঙিতে হইবে, যাহা গড়া যায় তাহাকে গড়িতে হইবে। ইহাই ত' ইতিহাস-বিধান! সেই ধর্মাধর্ম বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু এ বিচারের কর্তৃত্বের অধিকারী; দুই দার্শনিকের তথা-খরচ বিচারবিবেচনা করিয়া অতি প্রসন্ন উদার! তা ছাড়া, আরও গভীর রহস্য-তত্ত্ব আছে — রাজনীতির কথা। ট্রেজারি চালানোর বুদ্ধির কথা — পাকিস্তান আমাদের হাতের বিষয়, অর্থাৎ কোন সময়ই আমরা হাত ছাড়া হইব না, এক রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ ছাড়া। ইহাতে ভিন্ন-রাষ্ট্রের কতখানি আপত্তি হইবে! এতদিনে ব্রিটেনরাষ্ট্রপতিরা আমাদের পাকিস্তানের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন — পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাদের যে আর কোন দুরভিসন্ধি থাকে না — মোহন মহাত্মার সেই আমা-তুলসী হাতে করিয়া প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ, ইহা ত' তাহারই একটা বাস্তব অনুষ্ঠান! এত দিনে কতগুলি বাধা মিটিল! কিন্তু আমরা যেরূপ সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করিতেছি না। এমন আইন যে আগে করা সম্ভব হইয়াছে, তাহার মূলে যে মনোভাব রহিয়াছে — বাঙালীর পক্ষে তাহা কেমন সেই কথাই বলিতেছি। ভারত-সরকার স্থির করিয়াছেন পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের বিদেশ — যেমন ইটালি ফ্রান্সের বিদেশ। অর্থাৎ, যে দেশে এখনও প্রায় সেই কোটী বাঙালী-হিন্দু বাস করিতেছে সে দেশ এই রাষ্ট্রের বিদেশ। এমন বিদেশের সৃষ্টি ত' জগতে আর কোথাও হয় নাই! দেশ-বিদেশ-বিচারে দেশবাসী জাতি বা সমাজের কোন সম্পর্কই নাই! বাঙালীর দেশ বাঙালীর বিদেশ হইল কেন? না, হয়ত প্রতিবেশের ভয়ে প্রভুরা উহা পাকিস্তানকে নিঃস্ব হইয়া দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ যেন খোয়াড়-মহেশ ভেড়া-পক্ষ দেখিয়া দেওয়া! কিন্তু এ যে খোদার উপর খোদকারী! ভগবানও এমন কথা বলেন না — কোন ধর্মশাস্ত্র ত' এমন বিধান নাই। তবু তাহা হইতে হইবে, প্রভুর করিতে হইবে। ধন্য তাহাদেরই! ধন্য স্বাধীনতা! কিন্তু মোসাও চুপ করিয়া থাকিবেন কি?

* * *

তবেই দেখা যাইতেছে, এই স্বাধীন ভারতের পার্লামেন্ট চুম্বন করিয়া এবং তাহারই জলপান করিয়া বাঙালী আজ মিশ্রিত হইতে বসিয়াছে। ছাই-চুটীয়াশে মেশ। বাকিটার প্রায় অর্ধেক বিহার গ্রাস করিল। চা-বিলাসের রাজ্যগুলিতে বাঙালীকে কুলুপ-চোরাবো করিয়াছে। বাংলার উপার্জিত ধনেও বাঙালীর অধিকার নাই। আপনাকেই জাতির একটা বড় সমাজকে একেবারে পর করিয়া দিতে হইবে। সেই অংশের বাঙালীকে, শুধুই বিশ্বাসভাজন পরবাসী নয়, loyal citizen হইতে হইবে, অর্থাৎ দেশের কথায় ধর্মাধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙালীর কি দৌড়াদৌড়ি! সংবাদপত্রগুলিতে এবং সভাসমিতির বাহ্যতঃ অনুষ্ঠানে বাঙালীকে শুনাইতে হইবে, যে সে স্বাধীন হইয়াছে। আশ্চর্য হইবার কিছু নাই — এই সকল লেখক ও বক্তারা এই স্বাধীনতার জন্য কোনদিন কিছু করিয়া থাকিবে, নয় কৃতকর্মাদের মুখাপেক্ষী হইয়া, অন্তত এই ট্র্যাজেডিটের ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা একটু আলগা করিয়া লইতে চায়। বেঁচে থাক্ ট্র্যাজেডি! বাঙালীকে স্বাধীন ভারতের জলপান করাইবার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা আর নাই। বাঙালী মরিতে বসিয়াছে, কিন্তু নির্বুদ্ধি ও বুদ্ধিমানে মিলিয়া কি প্রযত্নে তাহাকে বিষের ভাণ্ড দিয়াছে!

* * * *

কিন্তু এতক্ষণ আমরা কি বকিতেছিলাম! বাঙালীর এই দুর্দশার জন্য দায়ী ও বাঙালীই — এ কথা স্বীকার না করিয়া আমরা ভারতভুক্ত সেক্যুলার নিন্দা করিতেছি! এত বিদ্যাও আমরা বাগাইতে পারি! কারণও খুব স্পষ্ট — আমরা যে বেকার!

আমিকার এমন নিদেও যে বেকার থাকে, তাহার বড় পার্শিট আর আছে! কলিকাতা রাজধানীর পণ্ডিতপাড়া হইতে একজন সদ্বংশ-পরাজয় বাঙালী-পরিচয় ইতিমধ্যেই আমাদিগকে বঞ্চক দিয়াছেন। বাঙালী যদিবে না ত' যদিবে কে? বাঙালী যে ভারত-মন হারাইয়াছে! তাই না তার আজ এই দুর্দশা। বাংলার এই ডুবাডুবি হইতে চলিয়াছে — এখনও ঐ ডাঙা দুটা নৌকাটায় যাহারা ঠেলাঠেলি করিয়া বসিয়া আছে, ঐ ভারতপন্থী সাধু তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধিমান যাহারা তাহারা অনেক আগেই দুটা-নৌকা ত্যাগ করিয়া ভারত-জাহাজে উঠিয়া বসিয়াছে। ভোলা ভালো। জাহাজখানিও বেশ নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে, তত খুনী মালদার চাপাও তাহাকে কিছুই বলিবে না, কেবল ঐ 'ভারত-মন'টি ভাল করিয়া গাঁটে বাঁধিয়া রাখিলেই হইল। আহা, ভারত-মনের কি মহিমা! তাই বাঙালীর ভোলা মনকে চেতাইবার জন্য সাধু মহাশয় গাহিয়াছেন —

ওরে ও ভোলা মন!
সোনারে সোনা সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি —
সেই মুক্তি কর গ্রহণ।
ওরে ও ভোলা-মন, ভোলা-মন রে!

• • •

আঃ, বলক্ষাপারী, আবার বুঝি একটা কাণ্ড করিয়া বসে! বল-ক্ষাপারের সেই ত' জয়। তুই কি বল? তোর সঙ্গে জাহাজটাই বাদ! কিন্তু ঐ জাহাজে জাহাজের কথা বলক্ষাপারো বুঝিবে না, সে বুদ্ধি কি উহাদের আছে? যদি একটু মন চেতাইয়া ঐ মনের নেশা ছুটাইতে হইবে — বিলক্ষ বিদেশীরা কি না। দেখ, ভোমাদের দেশে যে এত মন এত রসিক — তাহার গর্ব করিবে বৈকি। কিন্তু এই যে 'মনে মানুষ'-এর এত সাধনা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই অমর্যাদা, ইহার কারণ কি জানো? তোমরা ভারত-মন হারাইয়াছ। তোমরা বাঙালী বাঙালী বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিতেছ — কিন্তু তোমরা যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের এত গৌরব কর তাঁহাদের কাহারো বাঙালী-মন ছিল কি! সকলেই বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙালী নহেন — খোট্টা। তবে না তাঁহারা এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন? তাঁহারা সকলেই কংগ্রেসের জন্ম-কামনা করিয়া ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, নেহেরু, পাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারীরা এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইতেছেন। ঐ কংগ্রেসের দেশোদ্ধার-নীতি, এবং উহার ঐ অহিংসা মন্ত্র তাঁহারা জীবনভোর জপ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও বাঙালীর দুর্গ-উপাধি বর্জন করিয়াছিলেন, হিন্দু-মাষ্টা মুখেও উচ্চারণ করিতেন না।

•

প্রমাণ চাই? দেখ, রামমোহন 'দেশের সেদিন হবার' কথা ভাবিয়া কেমন উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই উৎফুল্ল 'নিবারণের জন্যই ত' "রঘুপতি রাঘব রাজারাম" গাহিতে হইতেছে। বাঁচিয়া থাকিলে তিনিও ঐ গান গাহিয়া ভবপারে চলিয়া যাইতেন, ত্রিচেল পল্লীতে ঐরূপ সমাধি জোগ করিতে হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র যে ঐরূপ ভারত-পথিক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহার 'বন্দেমাতরম'-গানেই ত' তাঁহার প্রমাণ — দেখিতেছ না উহাতে ঐ 'সপ্তকোটী' কথাটা রহিয়াছে! তারপর, আরও দেখ, আকিংখোর কমলাকান্ত ভারতের জন্য কি কম্‌টাই কাঁদিয়াছিল! বিদ্যাসাগর ত' বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা চালাইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এমন কি, ভারতীয় শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চা যাহাতে ভাল করিয়া হয় তাহার জন্য সরকারের সঙ্গে কি যুদ্ধই না করিয়াছিলেন! এ কথা হয় তো সকলে জানেও না। তারপর, বিবেকানন্দ?

হা. তিনিও যে ঐরূপ কাঙ্গালপনা দিবেন তাহা কে না জানে! এই বিশ্বনাথ-বক্ষিত, পাছপতে খচিত বণিক-পরিচিত ভারতের স্থান করিয়াই ত' তিনি দেশে ব্রহ্মসমাজের আয়োজন করিয়াছিলেন। কেন, সে কি এই 'ভারত' নয়! তাহাতেই বা কি? নামটা ত' 'ভারত'ই বটে। 'প্রজাপতি' বলিতে ব্রহ্মও বুঝায়, আবার একটা পাছকের নামও প্রজাপতি — কিন্তু ছুটাই ত' সেই এক প্রজাপতি! অতএব বিবেকানন্দ যে ভারত-মন হারায় নাই তাহাতে সন্দেহ কি?

আর শুভাকাঙ্ক্ষী? তাহাও কি বলিতে হইবে! ঐ কাঞ্চনী ভারত-মন লইয়াই ত' তিনি 'সেভিয়ার' হইতে পারিয়াছিলেন। যদি সেই মহা-আয়োজনের তিনি এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিতেন, তবে কিন্তু 'ভালো ভাত খাবি!' না, চাউল কোথায়? করিয়া কার্নিগেই-মিলনের ভাণে ছুটিয়া যাইতেন, এবং 'যারা পাই তারা খাই' বলিয়া অর্থের ভারত ধরুকাগরে ভাসাইয়া দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার হাজরোগ ধরিয়া তাঁহার সেই ভারত-মনটিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেন।

• •

সেই 'ভারত-মন' বাঙালী আজ হারাইয়াছে! সে ছঁস তাহার নাই। এমনই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে যে, ভারত-মনের সেই দেব-বিগ্রহগুলিকে — বেদের, পাণিনি, রামেশ্বরপ্রসাদকে ভক্তি না করিয়া, ঈর্ষা-করে হয়! কোথায় তাঁহাদের জ্যোতির্ময় ব্রহ্মপুর পাদোদক পান করিয়া সে মন পবিত্র করিবে — তবে না বাঙালী একদিন বিশ্বের রাজসাটে বসিয়া জগতের বিদ্যা উৎপাদন করিবে! — তা নয়, উল্টিয়া তাঁহাদেরই নিন্দা! এমন ত' এই দশা — পরে যে ছুই চারিটা ভেমন সন্তান বাঙালীর ঘরে জন্মিবে তাহার ভরসাও নাই! আবহাও তারা যদি — বাঙালী পুরুষেরা বড়ই ঈর্ষাকাতর — এমন ছোট আর ভারতবর্ষে ত' আর নাই! পুরুষদের দ্বারা কিছু হইবে না, যদি বাঙালী মেয়েরাই এইরূপ ভক্তিমার্গে সহজে নিষিদ্ধাচরণ করিতে পারে। তাই ছুরুদ্ধিপরায়ণ বাঙালীদের নিকটে আমাদের প্রস্তাব এই যে, অতঃপর, বাঙালীর ঘরে যেখানে যত সন্তান-সন্ততি বাঙালিনী আছে তাহাদের শয়ন-কক্ষের দেয়ালে ঐ সকল মহাপুরুষের এক-একখানি ফুল-সাইজ প্রতিকৃতি টাঙাইয়া রাখিলে কেমন হয়? শুনিয়াছি, ছুপ্রজনন-শাস্ত্রে নাকি এমন কথাও আছে যে, ঐ অবস্থায় ভাবী জননীরা যাহার মূর্তি দর্শন দেখিয়া থাকেন, সন্তানে তাহার রূপ-গুণ বর্তায়। আহা, তবে ত' আর ভাবনাই নাই! পুরুষেরা যাহাই করুক, মেয়েরা আমাদিগকে উদ্ধার করিবে।

• •

না, ঠাট্টা নয়। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের অবশ্যই ভারত-মন ছিল, তাঁহারা আজিকে বাঙালীও ছিলেন; কিন্তু আজ বাঙালীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে হইবে, তাঁহাদের মত হইলে চলিবে না — ঐ কাঞ্চনী রামমোহন ও ডুবিয়েরের মত সন্তান কামনা করিতে হইবে; কারণ, তাঁহাদের দ্বারা এমন মহাভারত তৈয়ারী হইত না। তথাপি বাঙালীকে ভারত-ভক্ত করিবার জন্য ঐ নামগুলা গড় গড় করিয়া আওড়াইতে হয় বলিয়ে রসনাপাতা যে বাদ সাধে না। তবু স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহারা বড় ভালো লোক — ভদ্রলোক ছিলেন, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য লইয়া কখনো মাতৃ কাহন করেন নাই। এ কথাটা কিন্তু স্থির হইল না। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যে কি তাহা ভাবিবার প্রয়োজনই যে তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা কি জানিতেন যে, একদিন বাঙালী ঐ ভারত-মনের মন রক্ষা করিবার জন্য তাহার জন্য মেচিবে — পিতৃনামটাও ত্যাগ করিবে! বাঙালীর বংশে এমন ছুলালেরা জন্মিবে তাহা কি বাঙালী কোমকালে —

গত এক হাজার বছরেও — ভাবিতে পারিয়াছিল? তা ছাড়া, বড় বাপের ছেলে যে — যতক্ষণ বড়ই থাকে — ততক্ষণ তাহাকে বাপগৌরব স্মরণ করাইতে হয় না; সেই ছেলে যখন ভাত-জল যোগাইয়া নীত-সম্ব করে তখনই তাহাকে স্মরণ করাইতে হয়- সে কোন্ বাপের ছেলে। তাহাতেও যদি চেতনা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার ভূতে পেয়ে বসিয়াছে।

* * *

সত্যই কি ভারত-মন হারাইয়াছে বলিয়াই বাঙালীর এই দুর্গতি? না, সে তাহার বাঙালী মন হারাইয়াই আজ সকলের কৃপাপাত্র হইয়াছে। ভারত-মন বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে বাঙালীই তাহা সৃষ্টি করিয়াছিল, এ কথা সে বুঝিবে কেমন করিয়া? আজ যদি সে তাহা হারাইয়া থাকে, এবং সেই কারণে — সারা-ভারতের গুরুপুত্র হইয়াও, তাহাকে এমন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়, তথাপি 'বন্দেমাতরম্' বা বাংলাসাহিত্য কি অপরাধ করিল? 'বন্দেমাতরম্' আজ ভারত-সমাজে স্থান পাইবে না? বাংলা-সাহিত্যও সোনার কেন? গুরুপুত্র বলিয়া শিষ্যকে যদি গুরুকেও জুতা মারিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে? ঐ 'বন্দেমাতরম্'ই যে ভারত-মন-আকাশের ধ্রুবতারাকে চিরকালের পথিচিহ্ন চিনাইয়াছে! ঐ গুরুমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই যে তাহারা ভূতের ভয় নিবারণ করিয়াছে — এবং উহারই সৌরভে এখনো কীর্তন গান নবমী খাইয়া এমন মোটা ও নধর হইয়া উঠিয়াছে! আর বাংলাসাহিত্য? হিন্দী যে তাহারই উঠান আস্তাকুড় কাঁটা দিয়া নিজের ঘর ঝোঁয়াই করিয়াছে! এখন গুরুপুত্র যদি তাহাকে পাদোদক পান না করে — খুবই অন্যায়, কিন্তু তাই বলিয়া গুরুও ঘো-টু-হেল হইবে? যুক্তিটা অকাট্য হউক, কিন্তু যুক্তিটাই বড় নয় — বড় ঐ ভারত-খানায় চড়িতে পাওয়া।

*

কিন্তু সে কথা এখন থাক, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য থাকিয়াও তাহে নাই — এমন কি সে প্রাদেশিক হইতেও পারিবে না? কর্তারা বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিম অঙ্গগুলি কাটিয়া দিয়া এখন মধ্যেরটাই যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার বাঙালী দেখাইতে, বাঙালীকে 'loyal citizen of Pakistan' হইয়া জীবন যাপন করিবার উপদেশ ও হুকুম দিয়াছেন। এমন হুকুম দিতে সোনা-বাঁধা বা পরশ-পাথর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। জিন্না-সাহেবও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুনেতাদিগকে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন — শেষ তান করিয়াই মুরকীয়ানা দিয়াছেন যে, ইসলামী সরকার তাহার প্রজাদলের উপরে কোন অন্যায় বা অবিচার করিতে পারে, ইহা অবিশ্বাস্য: প্রজা যদি বিশ্বাসী, অর্থাৎ ইসলাম-অনুসারে শরিয়ৎ-ভেদী হয়, যদি কাফের না হয়, তবে তাহাদের প্রতি কোন অবিচার হইতেই পারে না। কথাটা জিন্না-সাহেব বড়ই গুরুত্বপূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুও জিন্নাসাহেবের সহিত একমত। তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন কেন? প্রয়োজন কি? Loyal citizen of Pakistan হইলেই ত' সব গোল মিটিয়া যায়। অন্তর-মন্ত্রী (Inter-Dominion) বৈঠকগুলির কেমন সাফেই সব নিষ্পত্তি হইয়া যায়! উক্ত সভায় সভ্যগুলির আননে আধীন-সুলভের যত হাসি দেখানো যাকে — পরস্পরে রাখী-বন্ধন করেন। পোয়েরেলাল ও শ্রীপ্রকাশ — দুটি সভ্যের হাবভাব — ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গে সফর করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা ভারত সরকারকে রিপোর্ট করিয়াছেন — সব-ঠিক আছে, অন্তর-মন্ত্রীর বড়ই কাজ হইয়াছে: অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ-বাসী বাঙালীর অস্তিত্বের জন্য আর ভাবিতে হইবে না। ইহাকেই বলে নিশ্চিন্তে বাজার করা। পূর্ব-বঙ্গ loyal citizen হইল; পশ্চিম বঙ্গের প্রায় অর্ধেক মুসলমানদিগের উদ্ধারাধিকারে বাকেরগঞ্জ

হইয়া গেল ; এখন আসে ঐ মহাসমরের কলিঙ্গটুকু : তাহাও আবার কোন্ 'ওয়াটার্লু' ভবে যে কোথায় হইয়া যাইবে তাহাই বা কে জানে ! এই কাণ্ড পাঁচ-ছয় কমিটি মারা না হয় আমরা ভাবিয়াই করিলাম ; কিন্তু তাহাতেও কি নিস্তার আছে ? জানে বাঁচিবে কি ? কাশীতে যারা হইয়া গেছে-এবং ব্রহ্মদেশে যারা হইতেছে তাহা এখানে হইতে কতদূর ! তোল যারা নাই ত ! মুখের কথা নয়, তারতরাষ্ট্রে যে কতদূর শক্তিমান তাহা আমরা জানি। কিন্তু সংবাদপত্রে ক্রমাগত মুসলমান বীরত্ব-কাহিনী ছাপাইয়া করিতেও — এই ভেড়া-লোকের পালকে ছয়া ও সুচন হইতে দাঁড়াইবে কে ! সে সম্ভাবনা যে একেবারে ঘুচিয়া যাইতেছে !

আমাদের এতথা শুনিয়া স্বাধীনতাপ্রেমী, নিভিক-নির্ভীক, জাতি-উদ্ধারকল্পে যে কিরূপ অস্থির তাহাতে বৈঠকখানায় স্থির করিতে পারি, কিন্তু — 'He laughs best who laughs last' ; এবং ত' স্বাধীনতার নব-বিধান হইয়া ডিনামাইটে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আমরা ফোটাইয়া অনেক মেহনত করিয়াছিলাম, অনেক মূল্য দিয়াও আমাদের শিরে স্বাধীনতার মাসী-পিসীকে বসাইয়া দিয়াছে — পুষ পাড়াইতেও হয় নাই, জন্মিয়া জন্মিয়াই আমরা স্বাধীনতার 'দোয়াত' করিতেছি। যাহিরের অবস্থা হয়ত ঘোলাটে হইয়া উঠিতেছে তাই 'হিঃ হিঃ হুঁ' চীৎকার করিতেছি। তারতেই পাকিস্তান ভস্ম হইয়া যাইতেছে, এবং তারতরাষ্ট্রের বীর-মূর্তি গগনস্পর্শী হইয়া উঠিতেছে। হিঃ হিঃ হুঁতের কি মহাশক্তি ! একেবারে চোখের উপর এতকিছু ঘটিতেছে — তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাই ! চোখ খুলিবার চলুন নাই, খুলিলেই অপরাধ। মূর্খ-নির্বোধ, পণ্ডিত-মূর্খ, ভেড়ে-মুড়া সকলেরই ঐ এক ডাক — কিছু বলিবার যো নাই, বলিলেই অতিমূর্খ বেকুবের খাতিরে থাকে। আমার আর কিছুই নাই ! প্রায় চল্লিশটি বৎসর কাটিয়াছে, এখন ত' প্রায় অবসর বলিলেই হয় ; এখন ঐ হিঃ হিঃ হুঁ ভরা আর সহ্য কি কিন্তু বলা যাইতে যে আর বেশী নাই — তখন কোন্ হিঃ-পুরুষ বাঙালীকে বাঁচাইবে ? শক্তি ত' নাই-ই, তার উপর বাঙালীর প্রতি ভগবানের প্রেম যে কত, তাহার প্রমাণ কি আরও চাই ?

* * *

'বঙ্গদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণ এসব কথায় কষ্ট হইবেন না। কি করিব ? আমাদের যেমন কপাল ! নহিলে স্বাধীনতার এত সুখ সত্ত্বেও আমরা তাহা ভোগ করিতে নারাজ ! ভোগ যে করিতেছি না তাহা নয়, দেহের সুখ সবই তাহাদের সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করিতেছি ; কেবল ঐ অন্তরের সুখটা চর্ম-চক্ষুর বলে ভোগ করিতে পারি না। দেবতা আমাদের উপরে কষ্ট হইবেন না, বরং আমোদিদকে করুণার চক্ষে দেখিবেন, এবং 'রঘুপতি রাঘব রাজারামে'র নিকটে আমাদের জন্য 'সন্মতি' প্রার্থনা করিবেন। দেখুন আমরা পাপী-তাপী, ধর্মহীন ; আপনারা নবধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একরূপ জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ; স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীকে হরণ করিলে, কিম্বা শিশুপুত্র সমেত হত্যা করিলেও, আততায়ীকে ক্ষমা ও আশীর্বাদ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবেন। আমাদের আত্মা যে এখনও স্নেহের মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই — আমরা এখনও ততটুকু স্বাধীনও হইতে পারি নাই। আমরা স্ত্রীপুত্র লইয়া নিতান্ত বাঙালীর মতই ঘর করি। তার উপর, গ্র্যাজুয়েটের রাজপথ বা পলিপথ আবিষ্কার করিয়া, নিজ মহাপুরুষদের আত্মহত্যা লাভ করিতে পারিলাম না ; তাই অর্ধাসনে অনশনে দিন কাটাইতেছি, কারণ চাকরীতে যে কিছু হয় না ! এত প্রলোভন করিয়াও কেন্দ্রাপ ধারণ করিতেছি, তাহা যদি হঠাৎ কোথাও অপরাধে

বাহির হইয়া যায়, তবে বলুন দেখি, সে কথা ভাবিয়া আমাদের মনের কি 'অবস্থা হয়'? হাঁ, সেই আমাদেরই, আমরা যে মনে-মনে — অর্থাৎ বক্তৃতা শুনিয়া ও কাগজে পড়িয়া — স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি নাই! — পারিলে কোন জাতিরই থাকিত না। কিন্তু বলিয়াছি — সেও আমাদের অদৃষ্ট!

* * * *

এবার কলিকাতায় 'হোলি'-উৎসব স্থগীতি সম্পন্ন হইয়াছে — সংবাদপত্রে তাহার কিছু কিছু বিবরণ সকলেই পাঠ করিয়াছেন। এখন ভারতবাসীর মহা-অশৌচ চলিতেছে — গান্ধীজির শোকে সকলেই অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ। এমন অবস্থায় উৎসব করিতে গেলে একটু অপ্রস্তুতির হইবারই কথা। কলিকাতার কংগ্রেস-গুরু আদেশ করিলেন, এবার যেন হোলি-উপলক্ষ্যে কোন উৎসব না হয়। জনগণ তখন ক্রন্দন করিবে, তখন আমরা করিব, তাহাও শুনিতে পায় করিয়া দেন। অতএব, পাছে এমনই তাহারা শোক পরিহার করিয়া হোলির-উৎসবে মাতিয়া উঠে সে ভাবনা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এবারে বোধ হয় আদেশটা ঠাণ্ডা করিয়া প্রচারিত করিতে বিলম্ব হইয়াছিল, - তাই নিরীহ জনগণ একটু বেয়াদবি করিয়া ফেলিয়াছে। শোকে উন্মত্ত হইয়া তাহারা যেমন চারিদিকে মার-মার করিয়াছিল, আমাদের উৎসবানন্দেও তেমনি তাহারা দিক্-বিদিক জ্ঞান স্থির রাখে নাই; হয়তো আদেশের সময়ের জ্ঞান করিয়া শোক তবে নাই তাহারিগকে যেমন 'গুঁতার চোটে মানুষ বানাইয়াছিল', তেমনই উৎসবকালে যাহারা 'বন্ধীর' হইতে চাহে নাই, তাহারিগকেও গুঁতার চোটে 'হোলি ঠাণ্ড' বানাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, পঞ্চাশিনী স্ত্রীলোকদের উপরেও জুলুম করিয়াছে — কুৎসিত কদর্যতা করিয়াছে। আমরা ইহাতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা জানি সকল অবস্থাতেই প্রতিক্রিয়া আছে; শোকে মুহ্যমান, হওয়ার পর আনন্দে লক্ষ্যমান হওয়াই তুল্য ঔৎসুক্যের লক্ষণ। তা ছাড়া, আর একটা বড় কথাও আছে। বাংলার দেশনায়কেরা এই যে খৃষ্টি জাতীয় উৎসব যেন জাতীয় ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহাতে আশা হয় বাঙালী ক্রীশ্চান যে আড়াই-জন হইয়াছিল, এইবার তাহা ফিরিয়া পাইবে। সে তো তখনো হোলি-উৎসব করে নাই, এখন হইতে উহাই তাহার জাতীয় উৎসবে পরিণত হইবে। আর ভাবনা নাই, বাঙালী নিশ্চয় বাড়িয়া যাইবে।

[২৮শে চৈত্র

চিত্র-পরিচয়

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি

(১৮৭৮—১৯৪৮)

নদীয়াজেলার মহম্মদপুরের সন্নিকট বাগচি-পরিবারে, সন ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়; গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। অতি অল্পবয়সেই যতীন্দ্রমোহন কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; ছাত্রাবস্থা শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহার কবিতা সেকালের 'ভারতী' 'সাহিত্য' প্রভৃতি বড় বড় মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন হইতে

মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার কবিতা-লেখার বিরাম ছিল না। তিনি অনুবাদমূলক 'বাসন্তী' ও 'বহুমা' — দুইখানি মাসিকপত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম — কবিগুরুর সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাও ছিল। এজন্য তাঁহার কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কিছু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। তাহাতে বিস্ময়ের ও বাহুল্য এবং ইহা বাংলাসাহিত্যের ঘাবহারে কবিজনসুলভ নৈপুণ্য তাঁহার রচনায় প্রমাণ করে। অতিসাধারণ বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ এবং বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁহার কবিতায় যেমন মধুর হইয়া উঠে। মানব-প্রীতির সহিত কবিজনোচিত এই সহজ মিলনই যতীন্দ্রমোহনের কবিপরিচয় বিশিষ্ট করিয়াছে। এ পর্যন্ত তাঁহার এই কাব্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছে — 'রেখা', 'রেখা' 'অপরাজিতা', 'বিরহী', 'মানসকমল,' 'নীহারিকা', 'মহাভারতী', ও 'পাকচক্র'।

ভ্রম-সংশোধন

... ছাপা হইয়াছে তাহার শেষে এই কয় লাইন বসিবে। —

ভুল-হেথো যুগে মোর নাম তাহে
যেহেতু যে উৎকীর্ণ হলো,
তাই উল্টো-পাল্টাই যদি ভালো।

---

২৪ নং চৌরঙ্গী রোড, "এডেলফি প্রেসে" পিনকল্ প্যাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

করিলে, ইহার সহজে মীমাংসা হয়।

ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়ে দুইটি কথা নির্দ্দিষ্ট আছে — "Liberty", "Independence", ইহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থ বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি বিজাতীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজা পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা নেপোলেঅঁর শাসিত ফ্রান্সকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সাধারণের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইংরেজরা রাজা বলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহারা জার্ম্মান। সেকালের কুতবুদ্দীন প্রভৃতি প্রাচীন তুর্কী-ঘরাণীয় বাদশাহ তুর্কী ছিলেন। মোগলসম্রাটের সিংহাসনে অনেক বর্ব্বরজাতীয় সম্রাট আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সকল রাজা তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা জেম্‌স-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহজাহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আরঙ্গজেব-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

শাসনকর্ত্তা বিজাতীয় হইলেই, রাজা পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজা যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

তবে পরতন্ত্রতা এবং পরাধীনতার প্রভেদ কি? অথবা, স্বতন্ত্রতা এবং স্বাধীনতার প্রভেদ কি?

বিজাতীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। রাজারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাবাল্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতি-পীড়িত হয়।* যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজা পরজাতি-পীড়নমুক্ত, তাহা স্বাধীন। আমরা কুতব-উদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

রাজা বিজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া ঘটে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক, রাজব্যবস্থাজনিত; আইন বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা হইবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার হইবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজার কার্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন।*

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধ করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে।—

১। বিজাতীয় রাজা হইলেই রাজা পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

২। বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে বিজাতির প্রাবাল্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে; কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ।

* বর্ত্তমানে কথাকথিত ভারতরাজ্যে বাঙ্গালাদেশের যে অবস্থা হইয়াছে। ঃঃ ঃঃ

যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্য ও পরাধীনতার আধুনিক আদর্শে এখন কি পরিমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচ্য।

অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টাণ্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্মের বিদ্বেষ আর একটি উদাহরণ। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা বেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। ইংরাজি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বাধীন হইতে হইবে। স্বদেশের রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

— বঙ্কিমচন্দ্র (কমলাকান্ত)

স্নেহ-ভিখারী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যেথায় বুকের স্নেহ না ফুরাতে
ফুরায় তোমার ক্ষুধা,
তোমারি ভিতরো সে স্নেহ আমারে
ভিখ্ মাগে এ বসুধা।
নীল দিগিবালা দিগন্তচারী
কে জানিত মোর স্নেহের ভিখারী?
যাচে বসনদী গহন-গভীরি
তোমারি প্রসাদী সুধা।
অসাধ্য তারা ছিনিয়ে চায়
এ স্নেহের কণা কে পায় না পায়,
বনের ছুতুম পক্ষ ঘ'ড়ায়
পাঠায় আমারে যাচে,
ক'রালে কাঠে বুভুক্ষিত শিশু
যাচে স্নেহ যাচে যাচে।

বাটি দিয়ে গড়া সুখের কটোরা, —
কতটুকু স্নেহ ধরে?
তোমারে ফুরাই মিটিবে না, তাই
রাখিনু তোমারি তরে।
বঞ্চিত আমি করিনু সবারে,
কিবে না চাহিনু কারো এ দ্বারে,
সাধিয়া মাগিয়া তোমারি অধরে
ধরিনাম মুখপাত্র;
স্নেহ হ'তে তব নিঃস্নেহ পান
মাটির কটোরি ধুয়ে যান যান, —
ওই আশা ধরি' তোমা সাথী করি'
জাগিলাম অন্ধরাত্র।

স্নেহ যাচে তুমি কহিলে সহসা
'বন্ধু, চাহিনা আর।'
যা ফুরাতে কথা শিখিনে অধর,
এলায়িত মাথা শিথানের 'পর,
অসীম-তৃপ্তি স্নিগ্ধ ললাটে,
নয়নে ঘুমের ভার।
চাহিয়া দেখিনু, — মাটির কটোরা
তোমার-প্রসাদী-স্নেহে আধ-ভরা।
যা মোহাতে রাতি আসে ভিক্ষ-ভরা
স্নেহভিখারীর দল।
আকাশের তারা বাড়ায়েছে কর
দূরে নীলগিরি ফেলে নির্ঝর,
ঘুমন্তি পবন, বন-উপবন
স্বর্গীয় চঞ্চল।

তুমি ঘুমাইলে, আমি ব'সে জাগি, —
কাহে রাখি' কার স্নিগ্ধতা যে মাগী।
স্নেহ যাচিবার দুর্জয় তার
আমারে কি আর সাজে?
তোমারি অধর-বিচ্যুত স্নেহ
বাসা হ'য়ে থাক বুকে।
উদিবে তপন ভরিবে ভুবন
নূতনে ফুলায়ে; —
নূতন ফুলায়ে সহসা আসিয়া
যাচিবে যদি সে আসিয়া
তব কল্যাণে, হে কল্যাণিয়া,
যেচে যাই আমি ফিরে।
তোমা হ'তে হ'য়ে নিঃস্ব
এবারের মত ফাঁকি দিয়ে যাই
ফুরাতুম যাহা বিশ্ব।

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( )

রাজলক্ষ্মী

(উপক্রমণিকা)

ফুটাও ফুটাও শির, প্রেমে রবি
সেই মহাকাশে ; তার মহাচক্ষুমণি
দূর কল্পলোক হ'তে বহু-বর্ষবিভা
ওই দেখা যায়। তোর আর্ত্ত জর্জ্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্, তার স্পর্শতলে।

— 'পাঞ্জরীর আর্ত্ত'

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি তাহা এই কাহিনীর এক্‌রূপ বহির্ভাগের কথা বলিলেও হয় — সেই পর্ব্ব শেষ করিয়া এখন আমরা ইহার প্রকৃত উপন্যাস-ভাগের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। সেই উপন্যাসের নায়িকা রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর কাহিনীই ইহার মূল কাহিনী, তাহা যেমন দিটির, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। শ্রীকান্ত নিজেই তাহার নায়ক বটে, কিন্তু নায়ক-চরিত্র হিসাবে নয়, সে ঐ প্রেম-কাহিনীর নিমিত্তমাত্র হিসাবেই সে আত্মপরিচয় দিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু নায়ক-লীলা করিয়াছে, তাহাতেই নায়িকা রাজলক্ষ্মীর চিত্র এমন গভীর বর্ণে ও পূর্ণ রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি পূর্ব্বেও শ্রীকান্তের এই আত্মকাহিনী-রচনায় একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সেই আত্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি। এখানে সেই কাজ আরও দুরূহ হইলেও — তাহার নিজের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠা সত্ত্বেও, সে সেই ব্যবধান রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে — একটি নারীর চরিত্র ও তাহার মনস্তত্ত্বকে কবিজনোচিত গভীর প্রেমদৃষ্টি ও অসঙ্কোচ সহজভাবে সে যতদূর সম্ভব সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। ইহাই

তাহার অন্তর এই যে, শ্রীকান্তর মত বড় প্রেমিক নয় বলিয়া কবিতাটী, এতবড় প্রেমের পাত্রে হইয়াও সে তাহাকে গ্রহণ করে নাই, — তাহার সেই খোলা ও মাধুর্য্য ভোগ সে কখনও উপভোগ করিয়াছে। শ্রীকান্ত-চরিত্র আমরা এ পর্য্যন্ত যতটুকু বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহাতে প্রেম-বস্তুটি তাহার পক্ষে কেমন উপাদেয় হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। সেই শ্রীকান্তের উপরে অতিমর্ত্য অন্তর্দৃষ্টির ও অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রেমের এক অদ্ভুত আক্রমণ ঘটিল — বেচারী শ্রীকান্ত যেন অসহায় হইয়া পড়িল। তাহাকে বাধ্য হইয়াই যে প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতেও সে মাঝে মাঝে যেরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছে — কিন্তু সেই পর্য্যন্ত শ্রীকান্তর চরিত্র বিশ্লেষণ করে নাই, আমরা পরে সেই রোমাঞ্চকর অথচ কৌতুককর কাহিনী অনুসরণ করিব। এখন আর একটি নারীচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে; উপস্থিত সবিস্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া তাহার সেই জীবনকে একবার এক পলকে দেখিয়া লইব। এ কাহিনী কিছু বড় তাই আমি এখানে একটা উপক্রমণিকা করিতেছি। তাহাতেও কোন অসুবিধা হইবে না, কারণ উপন্যাসখানি ত' সকলেই একবার পাঠ করিয়াছেন।

এ নারী অচল নয়। নারীর সেই আদি শক্তি-মূর্ত্তির নিরাবরণ প্রকাশ ইহাতে নাই — সংসার হইতে দূরে, প্রায় শ্মশানে সর্ব্বত্যাগের সাধনা এ নয়। সংসার-সমুদ্র হইতে একটু পৃথক — তাহারি পুরোভাগে যে পরম-সুন্দর মণিক-দ্বীপের মেউলখানি দাঁড়াইয়া আছে, এই নারী তাহারই প্রাঙ্গণে শিবনের দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছে; সেইখানে সকলের অলক্ষ্যে সে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশে কীর্ত্তন করে; দর্শিতের কর্ণকুহরে পশিলে সামান্যেরই আরতির দীপ জ্বালাইয়া সে যখন নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহার অঙ্গের মণিভূষণ সেই দীপরশ্মিতে ঝলসিয়া উঠে, মহার্ঘ দুকূল-বসনে অতিপিনদ্ধ কটিতট ও উরুযুগ সেই নৃত্যাচ্ছন্দে ঘুরিয়া উঠে, কণ্ঠের রত্ন মালিকা চলের মণীচ-ঝলকে ঘুরিতে থাকে। নারীর এ আরেক রূপ, সেই এক নারীই এখানে এক পরম রসের পিপাসায় জীবনের ঘর-কন্টক-কাননে কত-বিক্ষত হইয়াও বিরূপ হইতে বন্ধুপানের ছলনায় লাভন করে।

রূপের এই ভিখারিণী-মূর্ত্তি সত্ত্বেও আমরা সেই শক্তিরূপিণী নারীকে এখানেও আর এক মূর্ত্তে বিভঙ্গিতরূপে দেখিতে পাই। দেহের রূপ-যৌবন বাসনা-কামনার নির্ম্মাল্য, বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রখরতা, এ সকলই তাহার অন্তর-তীর্থের পাথেয় হইয়াছে — তাহাকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করিয়াছে; জীবনের কপালে নয় — তাহার এলোকেশ বাস করিবার জন্য যে রাজকর দিতে হয়, তাহা চুকাইয়া দিবার সামর্থ্য সে লাভ করিয়াছে। সেজন্য তাহাকে কোন পুরুষের দুয়ারাপেক্ষী হইতে হয় নাই — পুরুষের সমাজ তাহার সেই ভার লইত না। কিন্তু সমাজে স্থান না হইলেও সেই সমাজ তাহার জন্যে যাহা বরাদ্দ দিয়াছে, অন্ধ-অন্ধাত্মরের অপূর্ণ কামনা, উপবাস ও দুঃখসাধন তাহার রূপসজ্জাকে যে ছাঁচে গড়িয়া দিয়াছে — সেই সুকুমার-পেলব অথচ নিগ্রহ-কঠিন প্রকৃতি হইতে তাহার মুক্তি ঘটে নাই। অতঃপর আমি এই প্রসঙ্গে, নর-নারীঘটিত প্রেম সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করিব, পাঠক-পাঠিকাগণ অবহিত হউন। কেহ মনে করিবেন না যে, আমি সেই অতি-পুরাতন এবং "Too much profaned" বস্তুটির নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিব। আমি কেবল এই উপন্যাসে প্রেমের যে একটি বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, এবং সেই সঙ্গে বাঙালী-সমাজ ও বাঙালী-মেয়ের বেটুকু পরিচয় অত্যাবশ্যক, তাহাও দিব।

প্রেমের এমন সাধনা নারীই করিতে পারে

হয়ে — কিন্তু তাহার হর লেখকের আত্মিকের ছিল। আর কোথাও, আর কোন সমাজে প্রেমের এমন ভিখারী-রূপ, নিপীড়ার এমন উপবাস-ব্রত, ধারার এমন দীনতা-বোধ, যাচিয়া এমন সর্বস্বদান এবং তাহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি — সর্বত্যাগের এমন হর-সন্তোষ কবি-কল্পনারেও ধরা দেয় নাই। আমাদের দেশে এই প্রেমের বিরহ ব্যাখ্যা ও তত্ত্বচিন্তার বৈষ্ণব-সাহিত্যে হইয়াছে — তাহাকে লৌকিক না বলিয়া অলৌকিক বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, সে প্রতিবাদ অতিশয় সঙ্গত ও সঙ্গত। বৈষ্ণব সাধক ও তত্ত্বচিন্তা যাহার এমন গৌরব কীর্তন করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের ঐ নারীর দেবতার মূরতিয়া উঠে, সেই মাটির মূরত দেখে সাধনার কল্পনায় পরিণাম হইয়া উঠে। প্রেমের প্রকৃতিতে, অর্থাৎ নারীর দেহভূমিতে, ঐ রস যেখানেই গাঢ় ও মূলাকেন্দ্রী হয়, সেইখানেই সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে অর্থাৎ প্রেমেও আধুনিক কালের আমরা যে ব্যক্তির আত্মাভিমানকে মর্যাদা দিয়া থাকি, আমাদের দেশের নারী প্রথম হইতে তাহাই ত্যাগ করে, একপ্রকার রসে বিগলিত ও মূর্ছিত হইয়া পড়ে। আমি এই রসের নাম দিব 'স্নেহ' — সাধারণ ও বিশেষ দুই অর্থেই। ঐ স্নেহ যে কি বস্তু তাহা নারী-প্রেমের ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।। আমাদের সাহিত্যে ও কাব্যে প্রাচীন-কাল হইতে আজ পর্যন্ত আমরা যে প্রেমের গান শুনিয়াছি — কীর্তনের আখোরে আখোরে আমাদিগকে যাহা উন্মাদিত করিয়াছে, তাহা আর কিছু নয় — প্রেমকে জানিয়া তাহার ঐ অমৃত-মরণীর আস্বাদ। তাহাই স্নেহ, তাহাই সেই প্রেমের সারভূত। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে রাধার প্রেমই গরীয়ান, সেই রাধা-প্রেমের রস পাইয়া বাঙালী এই পাঁচশত বৎসরেও শেষ করিতে পারিল না। পুরুষ ঐ নারী-স্নেহের মর্যাদা রাখিতে অসমর্থ বলিয়াই নারীকেই সকল অভাব পূরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। পুরুষের উপরে তাহার প্রেমের অভিমান বার্থ হয় বলিয়াই, সেই প্রেমের মর্যাদা-রক্ষার জন্য নারী-হৃদয়ে যে একটি অপূর্ব গুণের বিকাশ হয় তাহাকেই আমি স্নেহ বলিয়াছি — বৈষ্ণব-কবি বোধ হয় ইহাকেই 'স্নেহ' বলিয়াছেন। সকল অভিমান সকল অধিকার ত্যাগ করিয়া, অ-প্রতিদান ও অকৃতজ্ঞতার সকল দুর্ভাগ্যের সত্ত্বেও প্রেমাস্পদের সুখকামনায় যে অকাতর আত্ম-নিবেদন তাহার মূলে আছে ঐ স্নেহ। প্রেম বলিতে যে সাধারণ হৃদয়বৃত্তি বুঝায় সেই অনুগ্র কামনা বা বস্তুতুর চিত্তবিকারের মধ্যে ওই বস্তু নাই। বৈষ্ণবের মধুর রসের 'ত' কথাই নাই — সে রসের প্রেমের এই হেতু যে, তাহাতে সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য প্রভৃতি সকল রসের মূলাভূমি আছে। তথাপি আমার মনে হয়, বাঙালী সাহিত্যের প্রেম-বৃন্দাবনে গোপিনী-প্রেমের যে আরতি করা হয়, তাহার মূলে ঐ স্নেহই মাত্রাপূর্ণ হইয়া আছে। এই যে প্রেম ইহা পুরুষের নিকটে একটি তত্ত্বময় হইয়া আছে — সেই তত্ত্বের অভিসন্ধি বিচারের পুরুষের কি উৎসাহ! নারী কিন্তু কোন তত্ত্বের ধারই ধারে না—তাহার প্রেম রাধার প্রেম, কি ললিতার প্রেম, কি সাধারণ গোপীদের প্রেম, সে জিজ্ঞাসা, সে ভাবনাই তাহাদের নাই।

আমাদের দেশের পুরুষ নারীহৃদয়োদ্ভিত ঐ প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ প্রেমরূপে বর্ণনা করিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেমের অন্য কোন রূপ — পুরুষের পৌরুষযুক্ত রূপ — তাহার চেতনায় পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। শুদ্ধ-আত্মবহনক্ষম যে প্রেম, যে-প্রেম ঐরূপ স্নেহের অপেক্ষা রাখে না, পুরুষের পৌরুষ হইতেই যাহার উদ্ভব, সেই প্রেম তাহার পক্ষে সুলভ নহে। এইজন্যই বোধ হয় আমরা প্রেমের প্রকৃত প্রকাশ দেখাইতে হইলে নারীর শরণাপন্ন হই। আমাদের সাহিত্যে যে একজন কবি প্রেমের এই শক্তি-মূর্তিকে কাব্যে মহিমান্বিত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ নারীকে তাহার আশ্রয়

করিতে দেখা যায়। তেমন প্রেম নারী-প্রেমের ঐ প্রেমের চেয়ে কিছুমাত্র নিকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তরের বিষয়। তাঁহার ও তাঁহাদের পুরুষ-মানসস্বভাবে এরূপও এই প্রেমের অর্থাৎ দেহ আছে বলিয়া ধরিতে পারে নাই — সকলেই উহারা অভিজাতের উপরাগে উজ্জ্বল হইয়াছে — আসল যে ও পদকে ভস্মীভূত করিয়াছে। সেই নির্মোক, দুরন্ত, আত্মঘাতী পুরুষকে নারীই তাহার অসীম প্রেমের অক্ষয়ত্বদানে রক্ষা করিয়াছে, যা করিতে গিয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছে। পুরুষের প্রেম যেন একটা দিন — যেন একটা অনুচ্ছ্বাস, নারীর প্রেম একটা চিরন্তনী — যেমনটুই নীল-বর্তিকা। এইজন্য বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে, তাহার সাধনায় ও ভাবকল্পনায়, যে প্রেমকথা আছে আমি যাহাকে প্রেম বলিয়াছি সেই প্রেমই তাহাকে মহনীয় করিয়াছে; সেই প্রেম নারীর। অতএব আমাদের জীবনে প্রেমও পুরুষের দান নয়, নারীর দান; ঐ প্রেমটুকু না হইলে আমরা প্রেমেরও রসাস্বাদন করিতে পারিতাম না। কিন্তু বাঙালী-মেয়ের প্রেমে ঐ প্রেমই এমন অতিনব হইয়া কেমন করিয়া? যৌন-পিপাসা হইতেই যাহার আদি প্রবৃত্তি সেই রসের এমন রূপান্তর ঘটে কোন্ কারণে? ঐ রূপান্তরের মূলে যাহা আছে আমি পূর্বে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি; তাহার মূল অভিব্যক্তি হয় মাতৃভাব বা মাতৃ-ভাবের কথা দিয়া। বাঙালী-মেয়ের সেই সহজ মাতৃত্ব-সংস্কারের কথা আমি বলিয়াছি; এখানে তাহারই সম্পর্কে আরও কিছু বলিবার আছে। ঐ যে প্রেমের কথা বলিয়াছি — উহা আরও গভীর, আরও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক; উহাই বিশ্বের পুরুষিত — নারী-জীবনের সহজ চরিতার্থতায় মাতৃভাবকেই আশ্রয় করে। পুরুষকে প্রেমের বন্ধনে ধরিতে পারে না বলিয়াই, সে যেন গর্ভের সন্তানরূপে তাহাকে সেই ভূমার পাত্র করিয়া লয় — সেখানেও বাৎসল্যরসের সহিত সেই প্রেম প্রচুর মাত্রায় মিশিয়া থাকে — প্রেমের কেবল মায়ের প্রেম নয়, ইহাকে আমি নারী-প্রেমের অভিধেয় বলিয়াছি। এতক্ষণে, বোধ হয়, ঐ 'প্রেম' কথাটির অর্থ — খুব স্পষ্ট করিতে না পারিলেও, তাহা যে একটা প্রচণ্ড বস্তু, অন্ততঃ সাধারণ অর্থের প্রেম নয় — ইহা আমি বুঝাইতে পারিয়াছি। সকল জাতিই নারীর মাতৃত্বকে সম্মান করিয়া থাকে; সেই মাতৃত্ব নারীর প্রকৃতিগত — এটা সেইটুকু সংস্কারও বটে। কিন্তু বাঙালী-মেয়ে নারীর ঐ স্বাভাবিক রূপবৃত্তিও যে কারণে মাত্রাতিরিক্ত হইতে দেখা যায়, তাহার মূলে আছে যে আর একটি বস্তু, তাহাকেই আমি প্রেম নাম দিয়াছি। ঐ প্রেম প্রেমেরই গভীরতর স্বরূপ, বাঙালীর নারী-প্রকৃতিতেই উহার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কারণ, সকলই প্রকৃতির, এবং প্রকৃতিও দেশভেদে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। প্রেমের রহস্য অতিশয় গভীর তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি, আমি এই একান্ত বাঙালী-জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনীটি ধ্যান করিয়া — এ সমাজে নারীর সেই অবগুণ্ঠিত, অবজ্ঞাত, ও অবহেলিত হৃদয়-রহস্যের মর্মবিকা অপসারিত করিতে গিয়া — ঐ একটি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি; তত্ত্বটিকে আরও ভাল করিয়া পাঠক-পাঠিকাদিগের বুদ্ধি-গোচর করিতে হয়তো পারিলাম না, কিন্তু কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে পারি নাই কি?

পূর্বে বলিয়াছি, এ নারী আত্মার নিগূঢ় নির্জনে আপনাকে সর্বপ্রকারে নির্বাসিত রাখিয়া, কঠিন আত্ম-নির্ভরতার সাধনা করে না — ইহার সাধনাও ত্যাগের বটে, কিন্তু তাহাতে রস-সম্ভোগ আছে, অতএব সেই ত্যাগ ভোগেরই অনুগামী। সে তাহার সেই প্রকৃতিগত শক্তিকেই তাড়াইয়া — সেই মূলধনকেই জীবনের হাটে বিকিকিনিতে খাটাইতেছে। এ চরিত্রে সেই কঠিন শক্তিই তরল হইয়া অতি গভীর স্রোতোবেগ হৃদয়ের দুই কূল প্লুত করিতেছে।

এ কাহিনী একটি প্রেমের কাহিনীই বটে — কিন্তু সে প্রেম এক বিচিত্র জীবনের বিচিত্র প্রেম। প্রেমের সহস্র গল্প কাহিনী আমরা ইতিপূর্বে পড়িয়াছি, তবু কি তাহার বৈচিত্র্যের শেষ আছে? জীবন-রাজ্যের সেই রাজ্যান্তের মূলে স্থান-কাল ও পাত্রের কি অদ্ভুত অপূর্বতা! হয় সেই একই — অভিনয়ের ক্ষেত্রে রূপের; রূপ যদিও সেই এক হয়েই স্থান-কাল-পাত্রভেদে অতিশয় বিশিষ্ট ও বিলক্ষণ যে প্রকাশ-ভঙ্গি, তাহাই। রাজলক্ষ্মীর সেই এক নারী, তাহার প্রেমও নারী-জীবনের সেই এক পিপাসা; কিন্তু তাহার জীবনের গ্রন্থিবন্ধনটি কি অভিনব! — সেই এক মূলগ্রন্থি হইতেই কত নূতন গ্রন্থি পড়িয়াছে! তথাপি, তাহার জীবন সে নিজেই গড়িয়া লইয়াছে, সে নিজেই সেই গ্রন্থিবন্ধনকে আপন প্রয়োজনের অনুকূল করিয়া লইয়াছে — জীবনের একটি ডিজাইন বা প্যাটার্ন নিজেই স্থির করিয়া লইয়াছে। সেই মূলগ্রন্থি মোচন করিবার শক্তি আমার ছিল না; সে নারী — সমাজ-পরিত্যক্তা, তথা পাইবার সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত (যেমন সহস্র শত নারী এখনও হইতেছে), সম্পূর্ণ অসহায় এক নারী। এই অবস্থায় সে তাহার নারীপ্রকৃতিরই শক্তির দ্বারাই আত্মরক্ষা করিয়াছে; সে আমার রক্ষিবার শক্তি তাহার ছিলনা, সে তাহাই অন্যত্র সন্ধান করিয়া লইয়া, সাহিত্যে তাহাকেই সত্য করিয়া, নিজ-জীবনের প্রেম দ্বারা তাহাকে জিয়ন্তে অমর করিয়াছে — অন্তরবাসী সেই ইষ্টদেবতার ভোগরাগ সংগ্রহ করিয়াছে। তথাপি বাহিরের সহিত ভিতরের সেই যে দ্বন্দ্ব — সেই যে ভোগের মধ্যেই ত্যাগের সাধনা — কবির ভাষায় সেই যে —

মিলিছে আমার সনীড় সদনে বিজনে।
কাঁদিছে একাকিনী বিরহ-বেদনা॥

— তাহাকেই বাস্তবে অনুবাদ করিলে যাহা হয় — এ কাহিনীর অপূর্বত্বের বিধানে তাহাই।

উপন্যাসের আরম্ভ যাহাকে যে একটি রস প্রদান করিয়া আসে তাহা যে একরূপ অভাবনীয়তা বা অদ্ভুতপূর্বতার রস, তাহাতে সন্দেহ নাই — ইহার প্রায় সকল ঘটনা ও চরিত্রেই যেন কিছু বেশি বা অতিরিক্ত আছে বলিয়া মনে হয়; অথচ তাহারা যেন একটা সাধারণ অনুভূতি ও আন্তরিকতার গুণে মনুষ্যজন যে, আমরা সেগুলিকে কবিকল্পনার কৃতিত্ব বলিয়াই উপভোগ করি না। যে যেন অপরিচিতের পরিচয়লাভের; যাহা মামুলিই ঘটে, অর্থাৎ সর্বদাই ঘটিয়া থাকে বা ঘটিতে বাধা নাই — কিন্তু আমরা দেখিয়াও দেখি না, এ যেন তাহাকেই টানিয়া আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করা: এক কথায়, ইহা নূতন কিছু সৃষ্টি-করা নয়, যাহা আছে তাহারই আবিষ্কার।

তথাপি রাজলক্ষ্মীর এই কাহিনীটির একটা ভাগ— উহার উপরিভাগে — অতিশয় সম্ভব বা সম্ভব বলিয়া মনে হইলেও, দ্বিতীয়ের কাহিনীটি এমন অ-সাধারণ, এমন অতিরিক্ত রোমাঞ্চকর বলিয়া মনে হয় কেন? তাহার কারণ অনেক। প্রথমতঃ জীবনের যে দিকটা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি তাহাতে কাজ-মাত্রই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে: যদি তাহা না হইত, যদি আমাদের সঙ্কল্পগুলা বাস্তববুদ্ধিকে পদে পদে পরাহত করিত, তবে সংসার এ পর্যন্ত টিকিত না; জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে আমাদের দৃষ্টিকে অতিশয় সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। কোথায় কিরূপ কোন্ স্থানিক বা সাময়িকের জন্য অভিপ্রেত হইয়া গেল, তাহার জন্যের একমাত্র কামনা যাহা বা যৌবনে অন্তর্হিত হইয়া কোন্ অদৃশ্য অন্ধকার পথে ঘুরিয়া ফিরে শুকাইয়া মরিয়া গেল, অথবা সে নিজেই নিজের কি দাবদাহ করিয়া দিল — সমাজ তাহার সংবাদ রাখিতে পারে না; ব্যক্তির জীবনের যেটুকু তাহার শাসনাধিকারভুক্ত সে কেবল সেইটুকুর সুব্যবস্থা করে — তাহাও অতি সহজ ও সহজ উপায়ে করিয়া

খাকে। আমরা সেই সমাজের চক্ষু দিয়া সবকিছু দেখিতে শিখি, সমাজের বিচার বিবেচনা করি; এবং মানুষকে তাহারই সাহায্যে শ্রেণীতে ফেলিয়া এমনই চিনিয়া লইয়াছি যে, তাহা হইতে ভিন্ন কিছু দেখিলেই অস্বীকার করি, নিন্দা করি, নয়তো করুণা-মিশ্রিত তাচ্ছিল্য প্রকাশ করি। দ্বিতীয়তঃ, এই উপন্যাসে যে-সমাজের চিত্র মাঝে মাঝে উঁকি দিয়াছে—মধ্যবিত্তের বাঙালীর পক্ষে তাহা কিছু দূর, কিছু অপরিচিত, একটু বা অস্বস্তিকর। এ সমাজকে আমরা এখন শহীদমাজ বলিয়া থাকি, এবং তাহা শহর ও মফস্বলের এক নূতন সামাজিক প্রথা ও পদ্ধতির দ্বারা সহরাঞ্চলে তাহা জমিয়াও গিয়াছে। সেইজন্য জীবনযাত্রার ভঙ্গি কি ধরিয়া থাকে, মানুষ মানুষকেও ছাড়াইয়া যায়। তাহারই দুই-চারিটা উপন্যাসের কাছে লাজিলে মন্দ কি? বড় অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু সে যেন কোন্ দূর কালের, দূর দেশের কাহিনী, তাহার বাস্তবতাও রোমান্সে পরিণত হইয়াছে। মফস্বলের উপন্যাস-গুলিতে এই সমাজের কাহিনীই আছে, কিন্তু তাহা অতীত ইতিহাসের কাহিনীরূপে নয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও, অর্থাৎ সহরাঞ্চলে ঘোড়া ও সেবকশ্রেণীতে, বাংলার কতকটা যা কুলীনতন্ত্র শহীদমাজের রীতিনীতি ঠিকই ছিল; সহরের যে সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বাংলার হিন্দুসংস্কৃতির সেই পীঠস্থান। ব্রাহ্মণই এই সমাজের ব্রাহ্মণতন্ত্র। সে সমাজ এখনে ভাঙিয়া গিয়াছে — তাহার সেই তন্ত্র পরিপাশ্বের উপরে ধাক্কাইয়া কেবল ইহাই মনে হয়, যাহা এত দৃঢ় ছিল তাহা গেল — ভালই হইল; কিন্তু তাহার ফলে পড়িলাম কি? দাঁড়াইব কোথায়? বেশ বুঝিতেছি, কোন ছাঁচ-ঢালাইয়ের যন্ত্রচালা-সংসার তাহাতে আর ছিল না, কতকগুলি চিরাচরিত প্রথার অন্ধ অনুবর্তনই ছিল তাহার একমাত্র ধর্ম — অর্থাৎ টিকিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়। সেই ধর্ম প্রকৃতি ভগ্নস্তূপকেও বাঁধা হইয়া যদি দিতে হইবে, নতুবা সেই জীর্ণ আটচালার বাঁধনগুলি খসিয়া যাইবে। অন্ধ কাঠামোর তা' ছাড়া নয়, বরং প্রাণটা কিছু বেশি মাত্রায় অনুভব-কাতর; ভগ্নাবশেষের প্রবণতা কম, নয়, আত্মাভিমানও অতিশয় প্রখর। তাই এ জাতির ঐ অবস্থা দেখিয়া অনেক কিছুই মনে হয়। আমরা এই যে কাহিনী পাঠ করিতেছি—এ যাহার জীবনেতিহাসের সেই অংশিশ্রু আত্মিকায় নিয়ে কোন্ বাঙালীর বুক হেঁট করিয়া দেয় না? এখন কেবল অবসাদের ও অবসন্ন অবস্থাই দেখিতেছি। অথচ ইহার আরম্ভ? বাঙালী হিন্দু কি কোন এক কালে কেবল জাতিকুল রক্ষার জন্য সমাজকে এমন দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়াছিল যে, এখন আর কোন আঘাতই জাগিতে পারে নাই? বাংলার ইতিহাস নাই, তাই সে যুগের সেই মহাসমরের কথা আমরা জানিনা, কেবল অনুমান করিতে পারি। তখন অর্থের উপরতর সত্তা, মানব-সত্ত্বের সত্তা—এ সকলের দিকে চাহিবার উপায় ছিল না, কেবল জাতিটাকে বাঁচাইতে হইবে, অস্তিত্বকালটাকে সমগ্র রাখিতে হইবে। ইহাই বুঝি মধ্যযুগ ও রঘুনন্দনের যুগ? সেই বোধ হয় বাঙালী প্রথম তাহার তান্ত্রিক, সংহিতা—স্বাধীন আত্মধর্মকে সবলে দমন করিয়া অতি কঠিন ব্রাহ্মণ্য বিধি-নিষেধের পাশে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহার জাতি ও ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য-পিপাসাকে সমাজের হিতার্থে সঙ্কুচিত করিয়াছিল। পরযুগে কুলীন-জাতি যেমন করিয়া সকল ব্যক্তিগত অধিকার — বুদ্ধি ও বিদ্যার — এক নেতা ও নীতির পরতলে সমর্পণ করিয়া মহাসমরে আত্মরক্ষা করিয়াছে, আমার মনে হয়, বাংলার ইতিহাসে একদা অনুরূপ মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল এবং সমগ্র বাঙালীজাতি তেমনি করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য, এক নেতা ও নীতির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তারপর, শাক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গোস্বামীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, এবং দীর্ঘকাল পরস্পরের অধীনতা ও

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার মন মন উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়াসে, তাহার ধর্ম ও সমাজনীতি ক্রমে কিরূপ কলুষিত হইয়াছিল, সমাজের ঐ কাঠামোখানাই বজায় রাখিতে গিয়া মানুষের মুখ ঘষিয়াছিল — সেই দীর্ঘ ও জটিল কাহিনী ঐতিহাসিকের জন্য রাখিয়া, আমরা উপস্থিত এ সমাজের ঐটুকু কোঁটা না উল্টাইয়া পারিলাম না, কারণ রাজলক্ষ্মীর জীবন ও চরিত্র ঐ সমাজকে বাদ দিয়া নহে; সেই সমাজের অসহায়ও অন্ধ নহে।

কিন্তু সমাজ যেমনই হৌক, ধর্ম উপায় বা ব্যবস্থা হউক, পুরুষের তুলনায় নারীর অধিকার সর্বত্রই সীমাবদ্ধ, পুরুষ তাহার অনেকখানি ভার নারীকে দিয়া বসাইয়াছে। পুরুষ নারীকে রক্ষা করিবে, তাহার ভর্তা বা ভরণপোষণের কর্তা হইবে; নারী তাহার সেবা করিবে, তাহার আরামের উপচার রচনা করিবে, ইহাই যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত। পুরুষ লড়াই করিতে পারে, নারী পারে না, তাই পুরুষ নারীকে ঘুমাইয়া দিয়াছে — তার দুইজনেরই সমান, কাহারও কম নহে। পুরুষ যাহা করে বাহির করে, নারী তাহাই ঘরে বসিয়া করে; পীড়ন একই, কেবল স্থানের পার্থক্য মাত্র; কিন্তু তাহার জন্য প্রকৃতিই দায়ী — কথাটা ঐরূপ পুরুষ বলিয়াই ব্যাপারটা মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু হইয়া পড়ে। কথাটার মূলে যে একটা সত্য আছে আমরা পূর্বে সে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু পুরুষের জন্য বলীবর্দের মত আয়ত এবং ঘুণ হইলেও, তাহার বস্তিষ্কটা আদৌ প্রকৃতির ঘুনিয়ম মানিয়া চলে না; উহা যেমন দেবতার আসন হইতেও পারে, তেমনই ছুঁচা-শয়তান হইতে কাল-ভৈরব পর্যন্ত সকলেই ওখানে আস্তানা করিয়া থাকে। কাল-ভৈরবকে শায়েস্তা করিবার মত দুই একটা কাল-ভৈরবী যে দেখা দেয় না এমন নহে, কিন্তু সাধারণ পুরুষের মধ্যে ঐরূপ ছুঁচা-শয়তান যেমন উৎপাত করিয়া থাকে, সাধারণ নারীর মধ্যে তেমন কিছুর সাক্ষাৎ মেলে না; নিরীহের অস্তিত্বের সহজাতীয় সঙ্গে পাশাপাশি টিকিবে কেন? নারীর বাহ্য বস্তুপ্রকৃতির বিকৃতি, পুরুষের তাহাই বস্তুপ্রকৃতির পূর্ণতির বিকাশ।

এ আলোচনা এই পর্যন্ত, আমি পুনরায় আমার মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিব। রাজলক্ষ্মীর কাহিনী আপাতদৃষ্টে একটি অপূর্ব প্রেমের কাহিনী — বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে তাহাকে একটি বিশেষ আখ্যার পর্যায়ে ফেলাইয়া উহার মূলের একটি চরমতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই প্রেমের সাধারণে আমার যেমনই দুইটি কথা মনে হইতেছে; প্রথম, — বাঙ্গালার প্রাণগত সেই প্রেমনীতি — বৈষ্ণব পদাবলীর গান; দ্বিতীয়, রাজলক্ষ্মীর প্রেমে তাহার সেই বিদেশী-জনের পূর্বরাগ। তাহার কথা পরে আসিবে, কিন্তু এখানে সাধারণ ভাবে একটা তত্ত্বকথার অবতারণা না করিয়া পারিলাম না। আমি পূর্বে এই প্রেমের প্রসঙ্গে আর একটা তত্ত্বের সাধারণ উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি; এখানে ঐ প্রেমের কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত ঐ বস্তুর কথাটাও ভুলিতে পারিতেছি না, এবং উহা যে এই প্রেমের মেরুদণ্ডের সবটেই বিশেষ করিয়া সত্য, বৈষ্ণব কবিতার গানে যেন তাহারই সাক্ষ্য পাই। ঐ মাধুর্য যদিও উহার রক্তিমাভার মত ক্ষণস্থায়ী হয়, তথাপি উহাতেই বৈষ্ণব সাধকেরা তাঁহাদের ভাব-বৃন্দাবনে চিরস্থির করিয়া উহারই মাধুরী-পানে বিভোর। বিদেশীর সঙ্গেও এমন প্রেম যে সম্ভব, শুধু সম্ভব নয়, স্বাভাবিক তাহাকে রূপের পোষাক পরা এবং তাহা হইতেই পরম পিপাসার পরিতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব — রাজলক্ষ্মীর কাহিনীতে তাহাই আছে। আমার বিশ্বাস, এখানেও যে বাঙ্গালীর মেয়ের কথা একটু বিশেষ প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয় — যেন সে যেমনই স্বচ্ছ ও কোমল-নির্মল হৌক তাহাতে বা হইতে বিশেষ ক্ষয় হয় না। আর উহাতে সে এত কি পরিপক্ক প্রেমের

হয়? না, তাহা নহে। তাহাতে বৃদ্ধির খেলা নাই — তাহা সেই নিষ্টিক প্রেমাবেশ, যাহা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহপদ্মে মধুর মত করিয়া উঠে — তাহা অতত্ত্ব নহে, তাহা মনস্তিক নহে; তাহা আত্মহারা, তাই তত্ত্বতেই তন্ময় হইয়া থাকে। ঐ তত্ত্ব যদি বাঙালীমেয়ের তত্ত্ব হয়, তবে তাহা কি শিক্ষা নির্ভর? ওই বাজারে ঘাটিতে কোন্ দল আছে? সেই ঘাটী হানিয়া কোন্ নবীন নবনীত প্রভৃত হয়, যাহাতে এমন ঢঙের এমন ছলা পড়িয়া উঠে?

আমি বাঙালীর মেয়ের শ্রেণিবিভাগ-চেষ্টায় নিরত, এখানে সেই বিচার করিতেছি না — তাহার প্রাণের একটা বিশিষ্ট ধর্ম বা প্রকৃতির কথা বলিতেছি। প্রেম বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝিতে শিখিয়াছি তাহা ঐরূপ প্রাণের ধর্ম নহে। আবার, অতি-আধুনিক যাহারা গায়ে উপন্যাসের তাহার যে রূপটিকে খুঁটি ধরিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, অথবা যাহারা মিটারিয়া চুম্বিয়ের মৈথুনকে জানে, আমি সেই প্রেমের কথাও বলিতেছি না। প্রথমতঃ, তাহা সাধারণ হইলেও তত্ত্ব প্রকৃতির নহে — প্রকৃতির বিকৃতি; দ্বিতীয়তঃ, তাহা এই দেশের জলমাটি, সমাজ, ও ধর্মকে সাধারণের বিরোধী। সে-প্রেম অপর জাতি ও অপর সমাজের পক্ষে-ধর্ম হইতে পারে। — সেখানেও তাহা সুস্থ ও অক্ষুণ্ণ ছাঁচটি হইতে পারে; এ দেশে তাহা খাটি জিনিস আর কিছুই নয়। মরু যেমন এ দেশের পানীয় নয়, ঐ প্রেমও তেমনই এ দেশের খাদ্য নয়। আমাদের দেশেও সমাজের বাহিরে, শাস্ত্রশাসনের অন্যোচরে, প্রেম যেখানে আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখে, সেখানেও তাহার প্রকৃতি একই — যদি তাহা সেই প্রাণের বস্তুই হয়। ঐ প্রেমের অন্তরালে তাহার সারভূত হইয়া আছে যাহা — তাহার নাম — দেহ, সেই দেহ লইয়াই বাঙালীর মেয়ের কুলের ঐ গর্বনে — দেহের ঐ চাঁচে, ঐ ঘটিতে। আমি এই যে বিষয়ের আলোচনা করিলাম — বাঙালীর মেয়েকে বাঙালার প্রকৃতির পক্ষে এক করিয়া যে একটি তত্ত্বের উদ্ভিদ্যমান করিলাম, পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাহারা কেবল তর্কভূষণ নয় — ভাবুক, সঙ্কল্প ও বিজ্ঞানী — তাঁহারা যেন, এ বিষয়ে, প্রতি ও বৃদ্ধি, এবং যাহার যেমন অভিজ্ঞতা, তাহা হইতে একটা পূর্ণতর তত্ত্ব উদ্ধার করিবার প্রয়াস করেন, কারণ, বিষয়টি যেমন গূঢ়-গভীর, তেমনই মূল্যবান।

বাঙালীর মেয়ের কথা উপস্থিত এই পর্যন্ত। এখন আর একবার বাঙালী-সমাজের অর্থাৎ পুরুষের কথা বলিতে হইবে। আমাদের সমাজে ঐরূপ কোমলতন্বী, প্রেমবিলাসিনী, চিত্তবিনোদী-প্রাণা নারী তাহার জীবনে পুরুষের নিকট হইতে যেমন আদর, যেমন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পাইয়াছে আমি এমন কথা বলি না যে, আমাদের শিক্ষার বা সংস্কারে আমরা নারীকে হীন ও হেয় মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি; বরং ঠিক তাহার উল্টাই অর্থাৎ তাহার প্রতি সহজাত সম্মান দেখানো করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য বাঙালী নারীকে তাহার উচ্চাসনের আসনে বসাইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্বের অন্তরের গভীরতম ভক্তি সে ঐ নারী-দেবতার পায়ে উজাড় করিয়া দিয়াছে। এমন কি, সমাজ-জীবনে ও গৃহজীবনে নারী যে তাহাকে কতখানি জয় করিয়াছে, তাহার কথা যে সকল সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে, সেই সকল শ্লোক শাস্ত্রবচনের মত উদ্ধৃত করিয়া সে তাহার নারী-ভক্তি চরিতার্থ করে — অথবা ভক্তির অভাব তাহারা পূরণ করে। এ সকলই সত্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত দুই তিন শত বৎসরের (আরও পূর্বের কথা তেমন স্পষ্টভাবে নয়) যে ইতিহাস এখনও লুপ্ত হয় নাই — যত্রতত্র তাহার জের চলিতেছে, তাহাতে দেখা যায়, বাঙালী তাহার এই সর্বোত্তম নারী-সম্পত্তি গুলিকে মানব-সমাজের চির-বিচিত্র

করিয়া পথের পঙ্কে, নদীর জলে, জঞ্জাল-স্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছে; সে তাহার সমাজ-সমস্যার সহজ সমাধান, কিম্বা সংসারের কণ্টক-উদ্ধারের জন্য, নারী সম্বন্ধে তাহার ধারণা প্রায় দেবতার উপরেই চাপিয়া গিয়াছে, — মর্ত্যলোকের উপরে মনুষ্যত্বে কিছুমাত্র প্রভেদ দেয় নাই। শুধু শাস্ত্র নয়, লোকাচার ও কুলাচার নারীর ভাগ্যদিদি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ইহার ফলে সমাজ যাহাদিগকে ছুড়িয়া যে নারীদের-পক্ষ চাঁদিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে বিষেরিয়া উঠিতে হয়। অপদস্থা ও ঘৃণিতা নারী, বিধবা নারী, বন্ধ্যা নারী, বহুপত্নীক স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ নামমাত্রে বিবাহিতা নারী, বহুপত্নীক নিরাকরণ নির্যাতন-ভোগের জন্য নারী, — এমনই বিভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যিক নারী-নিগ্রহের জন্য কিন্তু না। আমাদের সমাজ যাহারা প্রাচীন ভাবিতে অবশ্যই এমন স্থা একটি ঘটনা স্মরণ করিবেন, যাহাতে অযাচিত বন্ধুকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া স্বামীর জন্য নূতন বধূ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এরূপ ঘটনা এখনও বিরল নহে, একদা ইহা বিরল ত' নহেই, বরং একরূপ প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। এমন বহুলভাবে ঘরে কন্যাদান করিতে পাত্রপ্রস্তু পিতার অভাব হইত না, তখন যেমনই সস্তা ছিল। রাজসভার ভাবিনীতে কন্যাদানের যে প্রসঙ্গ আছে তাহা আর এক কারণে; সেই কারণেও যাহোক ঘরে ঘরে বিষয়িতা কুমারীদের যে রুদ্ধ আর্ত্তশ্বাস শুনিয়া উঠিত, এবং পতিত্বে সেই সব দাবী কুলকন্যাদের যে দুর্লভও হইত, তাহার ভাবিনী এখনও লুপ্ত হয় নাই। অন্ততঃ চারশত বৎসর ধরিয়া বাঙালী এই নারীদের করিয়াছে — সমাজের মূলের উপরে, তাহার দর্শনে ও সংহিতা-ক্রমে। এখানে এই প্রসঙ্গে, আধিকার নিয়েও এই পাপের কথা এমন করিয়া স্মরণ করিবার কারণ আছে।

এতকাল ধরিয়া এই পাপ যে জাতি করিয়াছে — এবং ধর্ম্মের শাস্ত্রের দোহাই দিয়া করিয়াছে, সে জাতি: পৌরুষ, চরিত্র বা মনুষ্যত্বে যে স্তরে একেবারে লোপ পাইবে — ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! সে জাতি যে নির্বংশ হইবে তাহাই ত' সুনিশ্চিত! আজ যখন সেই মহাদুর্যোগ আসন্ন হইয়াছে, তখন বিধাতাকে ঠাকি দিবার আশায় সে ছাঁচে ঢালাই সাধু বনিয়া গিয়াছে। তাহার চরিত্র ঠিক তেমনই আছে, কেবল দুঃসময়ের তাড়নায় সে এক নূতন ছক কষিয়া বিধাতার চালটা পর্য্যন্ত সোজা করিয়া লইয়াছে। নারীকে সে এখনও পূর্ব্বের মতই সম্মান ও স্নেহ করে। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার পুরুষ-প্রাণ তেমনই আকুল। সেই পুরাতন দাম্পত্যের কষিতায় বজায় রাখিবার সাধ আর নাই, প্রয়োজনও নাই; যাহারা নির্ধনী তাহারা এখন প্রকৃতির বশে নারীকে পত্নী-নামে দিয়া সুখের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে; যাহারা ধনী তাহারা তাহাকে বিলাসেঙ্গিনী করিয়া, নূতন সভ্যতার পালিশ দিয়া, পরকীয়া-পিপাসা মেটাইবারই মিটাইতেছে। নারী-পক্ষে তাহার সেই প্রাচীন ধর্ম্ম-মনোভাব — সে যে হৈজস নয়, হৃৎ-কমল মাত্র, বাজারে রাশি রাশি পাওয়া যায়, আসিতেও যেমন ফেলিতেও তেমন বাধে না — এই মনোভাব যে এখনও, শত বক্তৃতাসত্ত্বেও, তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে, তাহার অনন্ত প্রমাণ একালেও পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সেই সমাজ-বিধির দোহাই দেওয়া আর চলে না, সেই পুরাতন শাস্ত্রবচন তাহার শিক্ষিত রুচির তেমন উপযোগী নয়, তাই একটা নূতন ধর্ম্মমত তাহার মত করিয়া লাগিয়াছে — তাহার নাম অহিংসা-ধর্ম্ম। ঐ এক মন্ত্রে সে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছে; যেটুকু সজ্জা হয় ত' অবশিষ্ট ছিল তাহাও আর রহিল না। ঐ মন্ত্রের বলে সে একযুগের বিদ্যাশক্তি ও বিদ্যাজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে — নারী সম্বন্ধে তাহার যে দায়িত্ব ছিল তাহাও সে বিসর্জন করিতে পারিয়াছে। যখন হাজার হাজার নারী বিধবা, অপদস্থ বা নিরন্ন হইতেছে, তখন সে গুরু-মহারাজের জন্য-মণ্ডলীতে

হইয়া যাওয়ার বিরোধে হইয়া 'জাতমূল' খাইতেছে আমি ঐ ভদ্রলোকের বা মহাত্মার ঐ মহাধানীর নিন্দা করিতেছি না, আমি কেবল তাহাদিগকে দেখিতেছি — তাহার সেই মহত্ত্বের নবতম মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। তবুও এমন দুর্মতি ঘটে : যে জাতি হারিয়া যাইতে চায় — অন্ততঃ এখনও বলে নাই যে, হারিতে চাই না, বরং স্বাধীন জীবন লাভ করিবার বলিয়া হুঙ্কারনিনাদে আকাশ ফাটাইতেছে, — যে জাতি সম্মান কামনা করে, যাহারা ইজ্জা করিতে চায় (মানুষমাত্রেরই যেমন মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা,) সেই জাতি — নারীচরিত্রের কথা ছাড়িয়া দিই — সেই জাতিরও, তাহার নারীগুলাকে, সর্বদা ও সর্বত্র এইরূপ হরণ অপহরণ ও ধর্ষণের মুখে ঠেলিয়া দিয়া কেমন নিশ্চিন্ত নিদ্রা উপভোগ করে! ভারতবাসীর পৌরুষে যে মরচে ধরিয়াছে তাহা ইহা হইতে ; অহিংসার ধর্মবুদ্ধি করে : নিরাত্মরি নিরোধের-সেবার উপকরণ-সংগ্রহে ছুটাছুটি করিয়া তাহারই ফলে তাহাকে পথে-ঘাটে নিরোধী দুর্বৃত্তদের হাত হইতে কখনও তখন গাহিয়া নিজের ঐ দুর্বল ও কুণ্ঠিত লালসার সমাধান করে!

আসল কথা, ইহাও সেই পুরুষানুক্রমিক মহাপাপের শেষ কথা। এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। ভগবান ক্ষমা করেন বটে, কিন্তু নিজের ক্ষমা নাই। ভগবানের ক্ষমা সে পাইবে না, কারণ সেই নির্যাতিত নারীকুলের অভিশাপে তাহার অন্তরের শেষ কণাটুকুও লোপ পাইয়াছে। পাপ সে স্বীকার করে না, তাহার মুখে এতটুকু ভয় বা অনুশোচনা নাই ; পৌরুষের যে শেষতম সম্ভাবনাও ছিল তাহা ঐ ধর্ষ-তত্ত্বাগীর দ্বারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সে বাঙালী হইতেও চাহে না — বাংলাদেশটা উৎখাত, খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া আর কোন দেশের সহিত মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও তাহার অন্তরের অন্তর বাজিবে না — মুখে এখনও যাহাই বলুক। কিন্তু ইহাই ত মিলন-কামের চরম লক্ষণ ; সে যখন নির্লাজ হইতে বসিয়াছে, তখন তাহার বাসভূমির কি প্রয়োজন? দেখিতেছে না, জাতির জননী যাহারা তাহাদিগকেও সে এখন স্বচ্ছন্দচিত্তে পরের ঘরে বাঁদী হইবার জন্য ছাড়িয়া দিতেছে ; পাছে কিছু অটিতে হয় — তাহার পৌরুষে কেহ সন্দেহ করে—তাই ক্ষুদ্র-পৌরুষের নিন্দা করিয়া সে অহিংসা-নামক মহা-পৌরুষের জয়গান করিতেছে।

একটা একখানি বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ পুস্তকে আমি একটি নির্মম সত্যবাণী পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম — বড় ব্যথা পাইয়াছিলাম, তার কারণ, ঐরূপ আশঙ্কা হৃদয়ে আমার হইয়াছিল। গ্রন্থকার নব্য-শিক্ষিত সমাজের বাহিরে, আমাদের দেশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করিয়া তাহাদের মুখ হইতে অনেক তত্ত্বকথা সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একস্থানে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছে —

"আসলে দেশের পুরুষ নিজেরাই ত' সমাজকে গড়েছেন তাহলেন। স্ত্রী অথবা শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েই ত' এক একটি পূর্ণ জীবন, আর সেই জীবনের সমষ্টিই ত' সমাজ বা দেশ। পুরুষেরা ইন্দ্রিয়-সুখটাকে বড় করে' নারী বলতে যে শক্তি সেটাকে ভুলে' সমাজে যথেচ্ছা শক্তির অপব্যবহারে গা ভাসিয়ে দিলেন। আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন। তার ফল যা' হয়,— পুরুষ দেশ তাঁদের বলবীর্য, বুদ্ধি, উদ্যম তার সেই আগুনে। তখন বাইরের কোন শক্তিশালী জাত এসে সেই বিকৃত সমাজকে পদানত করে — সেটা কি বেশি আশ্চর্যের কথা? ... নারীর মধ্যে শক্তির আবির্ভাব এই দেশেই হয়েছিল, আর তার অধিষ্ঠানও এইখানেই চরম সীমায় উঠেছিল। এখনও তার ঢেউ পুরো বন্ধ হয়নি। ...

আমি বলিলাম, আমাদের এই হিন্দু সমাজ কি এই ভাবে ধ্বংসের পথেই যাবে ?

তিনি — আত্ম-প্রবঞ্চনা আর শঠতায় যে এমন সর্বস্তরে প্রবল হ'য়ে উঠেছে। সর্বনাশের সকল লক্ষণই ত বর্তমান, আর ধ্বংসের বাকি কি ?

[শ্রীকান্তিলালীয় সাধুসঙ্গ, পৃঃ ১১৪, ২১২]

সেদিন এই কথাগুলা সাধারণ ভাবেই বুঝিয়াছিলাম, অর্থের কারণ খুঁজিলেও নিরাশ হই নাই, তখনও বাঙালীর ভাগ্য এমন স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই — ধ্বংসের সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ 'আত্ম-প্রবঞ্চনা ও শঠতা' এমন সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হইতে দেখি নাই। হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মাৎসর্য অন্যান্যের মত-কিছু দুর্নীতি, ঐক্যের দর্প, বিলাসের আক্ষেপ — এই সকলের মধ্যেও তারতম্য-প্রভেদের কি সৌখীন অভিনয় ! এমন বিদ্যা, আত্মার এমন অবমাননা পূর্বে কল্পনা করিতেও পারি নাই। চারিদিক দেখ, আজ এ জাতির মধ্যে, প্রত্যেক সমাজে, যে যত বড় পদগৌরবে লাভ করিয়াছে সেই তত বড় বিদ্যাচোরী ; যে যত অযোগ্য সেই যোগাভ্যস্ত হইয়াছে ; যে যত ঘর অসার তাহার মূল্য তত বেশি — প্রকাশ্যে জনসভা ডাকিয়া তাহাকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়। সম্পষ্ট নীতি-বিকার শুরু হইয়াছে : অর্থলোলুপ বণিকবর্গ শঠচূড়ামণি হিসেবে নিজ স্থাপন করিয়া সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমন কি বিজ্ঞানবিভাগেরও পরিচালক হইয়াছে। যাহার সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল সেও অহিংসা-মন্ত্র, অর্থাৎ বাড়ী, গাড়ী ও নগদ-টাকার সাধনায়, দেশকে মহামুক্তির আশ্বাস বিষয় পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে। যে দিকে তাকাও ঐ এক দৃশ্য। তাই আজ ঐ কথাগুলি আর সাধারণ অর্থে লইবার উপায় নাই — নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াই মনে হইতেছে।

আবার প্রসঙ্গ হইতে কিছুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, হয় তো কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাও করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সাহিত্য যে জীবন হইতে কোন-ক্রমেই এবং কোন কালেই পৃথক নয়, আমার এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আমি শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতেছি, তখন আমি তাহাকে যে ভাবে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছি — এবং যেমন দেখিবার কারণ কি — তাহাই আপনাদিগকে পূর্বাহ্নেই সবিস্তারে জানাইয়া রাখিলাম। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানির প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্যন্ত দেখক হিসেবে ও নারীর জীবন এই দুইয়ের সম্পর্কে তাঁহার অনেক কথা নানের ভঙ্গীতে লিখিয়াছেন — এবং নারীর সেই জীবনের মত কিছু দুর্গতিই এই উপন্যাসকে এমন করুণ করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই সকলের মধ্যে ঐ রাজলক্ষ্মীর ভবিষ্যতটি একটু বড় করিয়া একটু সম্পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; সে চরিত্রের বিকাশ আছে, পরিণতি আছে। আমার, সে চরিত্রের সম্পর্কেই শ্রীকান্ত নিজের আত্ম-পরিচয় সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে একটু বেশি করিয়াই দিয়াছে। আমি কিন্তু এই রাজলক্ষ্মীর মধ্যে বাঙালী-মেয়ের অভিনব রূপ ও সবল প্রাণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দেখিয়াছি ; তাহার শক্তি ও দুর্বলতা, তাহার সহজ ক্ষমাবৃত্তি, ভদ্র-গত ধর্ম-সংস্কার, তাহার প্রেমে মধুর ও ঘরোয়াভাবের সমান পিপাসা, এবং সর্বশেষে, যে-বুদ্ধি নারীর সহ-জাত — যাহা মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, অন্তরজাত, যাহার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে পুরুষ একটা শিশুর মতই মুগ্ধ ও নগণ্য হইয়া যায় — এবং যে-বুদ্ধি নারীকে এমন আত্মভরী ও ত্যাগে মহীয়সী করিয়া তোলে, আমি এই প্রাচীনযুগ-প্রসূতা বাঙালী-মেয়ের মধ্যে তাহার যে পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছি তাহাতে মুগ্ধ হইলেও বিস্মিত হই নাই। কিন্তু তথাপি আমি সেই একটী কথা কদাপি বিস্মৃত হইতে পারি না যে, এ হেন নারী-হৃদয়, বাঙালী-জাতির এ হেন 'প্রকৃতি-শক্তি' — যাহার তুলা সম্পদ আর কোন জাতির ছিল বা আছে

ঘটিয়া থাকে। সেই ঘটনা এমন কিছু বিশেষ, আমরা তাহার কি দুর্ঘটিই না করিয়াছি বৈ! 'Tragic wonder' নয়—অবজ্ঞার হাস্য ছাড়া বস্তুত অন্তর ও অবধারণা। শরৎচন্দ্র কেলেঙ্কারের বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ ও অভ্যাচারের অভিযোগ করিয়াছেন। আমি সেই সমাজের শতাব্দীব্যাপী আত্মপ্রতারণার শেষ অবস্থা দেখিতেছি। উপরে ঐ যে সন্ন্যাসিনীর কথা বলিয়াছি, তাহা অর্থে অর্থে সত্য। শরৎচন্দ্র আজ বাঁচিয়া নাই, তিনি সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, তাহার উহাতে যে দুঃখ হইত অন্যান্যদের তিনি হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়াছেন; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে তিনিও তাঁহার এই কাহিনীগুলি পুনরায় বলুন, করিয়া আমার মতই বলিতেন, ঐ পাপেই এ জাতি ধ্বংস হইয়া যেত — ধ্বংস হইবে বলিয়াই তাহার সেই 'আত্মপ্রবঞ্চনা ও শঠতা' আজ চরমে পৌঁছিয়াছে, কাপুরুষতারও সীমা নাই। আজও সেই নারীকুল হেমনই যাতনায় মরিতেছে, বাঁচাইবার কেহ নাই, বাঁচিবেই বা কে?

(ক্রমশঃ)

রাজপুতের ঘরে জোহরের চিতা,
ধূমে ঢাকি' তোরা গেলি কোথা?
ও বিশ্বতপিসী! মা জানি কেমনে
সেদিন হতনি ধৈর্যহারা।

সেদিন গলো বিশ্বসৃষ্টি
দৃষ্টিল তোমার নয়নপাতে,
দেখিতে চাহিয়া কেহ কেহ নাই
দুর্বিষহের শঙ্কুনি সাথে। *

সেদিন আকাশে লিখে দিলে পণ
কলঙ্কটাকে ঘুচাবে না,
মরমুক্ত না তলিলে কখনো
নারীর বোঝা হবে না ধরা!

ভেঙ্গে মন নিঃশেষ হবে
নারী-হৃদয়ের প্রতিষ্ঠাতে,
কে জানে সেদিন কোন ব্যথা, নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে।

বাহিরিলে মহাপথে যে তাপসি,
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা?
বিজনারীর সাধনা না ও
বজ্রশেখর ভবিতব্য!

অরুণাভাতে গগনপ্রান্তে
ঘুমের শঙ্খ বাজিছে ও কি!
তোমারে জাগাতে কে জানে অমল,
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি!

— 'কৃষ্ণা', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নববর্ষের অভিনন্দন

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(বাংলার সাহিত্যসাধকগণের করকমলে)

বাংলাদেশের শিক্ষাস্থানের তাজমহল
গড়লো যে-সব মহান্ ত্যাগী সাহিত্যিক,
তাদের সাধন দুঃখসহন অশ্রুজল
শান্তি আজি চালুক যাদী দশদিক।

মলো সেই তাদের প্রতীক বন্ধুদের —
পুণ্য নিয়া যৌত যাদের শতধার,
আজকে তাদের এই দুপেরি দুপান্তের
ফুল চিতে প্রণামে দিই নমস্কার।

বিশেষি সব সাহিত্যিকের বরণীয়
যেথায় হল পুণ্যধারার সম্মেলন,
সেথা তারির দুঃখজয়ী উচ্ছ্বসির
বাংলারি এই সাহিত্যিকের অভ্যুদয়।

যারা তারো দুঃখ দুয়ার অরি ধরি'
সাহিত্যে যে অমৃতেরি ফুল ফোটায়,
নিয়া পর উপেক্ষারি বক্ষে পরি'
সাহিত্যেরি দুলায় স্নেহে প্রাণ জোটায়।

তবুও তারা জোটায়নি যান উচ্ছ্বসির,
প্রাণের চেয়ে তারাই জানে যান বড়ো,
বাংলা-মা'র এই সাহিত্যিকই সত্যি বীর
সকল দেশ আজ তাদের পায়ে পর নতো।

তাদের আমি পুজবো আজি কোন্ ফুলে?
দুঃখী আমি দরদভরা অশ্রুজল —
তাই দিয়ে আজ দুঃখজয়ের ফুল তুলে'
লুটিয়ে দিনু তাদের চরণপঙ্কজে।

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গতযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জ্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

পরাধীনতা

[এই অতিসার যৌক্তিক ও সুচিন্তিত প্রবন্ধটী ১৩০৪ সালের 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক — স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ইহাতে তিনি ভারতের হিন্দু-ইতিহাস-ঘটিত একটী বহুবিস্তৃত প্রশ্নের সমাধান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিলাতী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও ইতিহাসে 'স্বাধীনতা' নামে যে বিশেষ বস্তুটী পরমার্থ হইয়াছে আমাদের ইতিহাসে ঠিক সেটী বস্তুর সন্ধান মেলে না। এজন্য সেকালের ইংরাজের মিত্র (এ কালেরও ইংরাজীনবীশ) বড়ই অপ্রতিভ ও বিপন্ন হইয়াছিলেন, এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রও ঘুরিয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজকে তজ্জন্য দায়ী করিয়াছিলেন। আজ আমরা সেই বিলাতী আদর্শের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি — অন্ততঃ মনে মনে করিয়াছি, এবং তাহার ঘৃণাস্বরূপ আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজকে ইতিমধ্যেই ত্যাগ করিয়াছি। আমাদেরও যে স্বাধীনতা ছিল, সে স্বাধীনতা যে য়ুরোপীয় প্রকৃতিপুঞ্জের ঐ স্বাধীনতার তুলনায় আরও মহা, আর, প্রয়োজনীয় ছিল,—এই প্রবন্ধে লেখক বোধহয় এই প্রথম তাহার যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধের সেই অংশের প্রতি পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিতেছি। লেখক এই আলোচনা দুর্লভ বা অসম্পূর্ণ বিবেচনা করিয়াছেন; সংসারে কোনও বস্তুই নিখুঁত হইতে পারে না।]

(১)

হিন্দুজাতির পরাধীনতা কেন ঘটিল, এই প্রশ্নের মীমাংসা উত্তর ইতিহাসপ্রসঙ্গে প্রচলিত আছে।

কেহ বলেন, হিন্দু ভারতবর্ষে একক নহে। তাহার মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথম কীর্ত্তি স্থাপিত হয়। সুতরাং যত মুসলমানের সঙ্গে লড়াই করিয়া বিজেতা হয়েন নাই ইত্যাদি।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। দুই একটা লোকের দোষে এত বড় একটা ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে হইলে আরও তলে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত

হইলে ভারতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা আসিয়া পড়ে। ভারতীয় প্রকৃতির শোচনীয় অবনতি না ঘটিলে সহজে পরাধীনতা ঘটে না। সে পরাজয়ই বা আসিবার কেমন? ভারতের কর্তৃক নিমন্ত্রণ ব্যাপারের তিনশত বৎসর পূর্বে মুসলমানেরা হিন্দুস্থিন হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিল। হিন্দুদের দেবতার উপর ও হিন্দু গৃহস্থের স্ত্রী-কন্যার উপর মুসলমান কিরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতেন, তাহা হিন্দুগণ সেই আশিলেই জানিতে পারিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা রক্ত গরম করিবার যে সকল উপাদান আবশ্যক, মুসলমানকৃত ব্যবহারে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। অথচ তাহাতেও হিন্দুর রক্ত গরম হয় নাই, একেবারে ভূয়ারের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। যখন শোনা যায়, এক জন অতিথিকে সমরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে একজন হিন্দু রাজা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, তখন ভারতীয় অবনতি যে নিম্নতম সোপানে উপস্থিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণমাত্র থাকে না।

সুতরাং এই দুরবস্থা হইতে হইলে ভারতীয় দুর্গতিরই কারণনির্দেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং ভারতেতর ঐতিহাসিকমাত্রেই এই ভারতীয় প্রকৃতির অবনতির একটা না একটা মৌলিক কারণ দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, কিন্তু ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখাইয়া দিলেও সেই সমস্ত একটা খাঁটি কথাতে গিয়া দাঁড়ায়, এবং আমাদের বৈদেশিক ও স্বদেশীয় সমুদয় ঐতিহাসিকগণ প্রায় একবাক্যেই সেই কথার সমর্থন করেন। এক কথায়, হিন্দুর যত দুর্গতির মূল — হিংসানি ও হিংসানির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তক ব্রাহ্মণঠাকুর।

ফলে, অন্যের যখন বিদ্যাবিদ্যের জন্মের সময় হইতে পুরার ডাক্তার সাহেবের বক্তব্যকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ যে একটা প্রকাণ্ড ও ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আছে, অন্যান্য অনন্ত মহাকালের আদি ও অন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের আদি আবিষ্কার করিতে পারা যায় না ও অন্যেরও কোন উপস্থিত সম্ভাবনা নাই, ইহা বৈদেশিকগণের এবং আমাদের স্বদেশীয় শিক্ষিতগণের নির্ধারিত অবিসংবাদিত সত্য; এবং এই ষড়যন্ত্র হইতেই ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির যত কিছু দুর্গতি দুঃখ ও যন্ত্রণা। এক কালে হিন্দুজাতি অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং সেই উন্নতি আবহমানকাল চলিতে পারিত, কিন্তু দুই ব্রাহ্মণের কূট চেষ্টা পদে পদে সেই উন্নতির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও অবশেষে হিন্দুজাতিকে কাল্পনিকতার শিখর হইতে সেখানের ভূমাভূমিতে নামাইয়া আনিয়া ইক্ ছাড়িয়া প্রণাম লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণই প্রাচীন ভারতের দুর্ভাগ্যের মূল।

এতগুলি বুদ্ধিমান্ লোকে একবাক্যে যাহা বলেন, তাহা মানিতে আমরা বাধ্য, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে ব্রাহ্মণকে পুঁছিয়া ফেলিলে কি অবশিষ্ট থাকে তাহার কোন ঠাহর পাই না; এবং বাকী যাহা থাকে, তাহার উন্নতিই বা কি অধঃ অবনতিই বা কি, তাহাও বুঝিতে পারি না।

কিন্তু এইখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইতেছে। বর্তমান প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ অধঃপতন ও অবনতির কথা উল্লেখ করাটা ঠিক হইতেছে কি না, তাহা লইয়াই তর্ক উঠিতে পারে; কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবে এ কালের কোন কথা আলোচিত হইতেছে না। এ কালে আমরা হিমালয়ের নিম্নদেশে কেন, রাজা ত্রিশঙ্কুর মত একবারে বিমানমার্গে উত্তীর্ণ হইয়াছি, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই, মুসলমানের সময়েও সেইরূপ আমাদের দুর্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ কথা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের আচরণনীতির বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের অবনতির কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায়।

প্রথম — ব্রাহ্মণেরা সমুদয় বিদ্যা একটা শিকুলের মধ্যে পুরিয়া তাহার চাবি আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় — দুর্বলতা হইতে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণেরা সেই কুসংস্কারগুলির প্রশ্রয় দিতেছিলেন। জলদস্যুদলের সর্দারের আত্মাকে জাগ্রত ও নিষ্পাপ করিয়া রাখিতেছিলেন।

তৃতীয় — ব্রাহ্মণেরা যে অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিদেশীর অধীনতা ও অত্যাচারও তাহার নিকট সুখের বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

চতুর্থ — ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া বিবিধ জাতির মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জাগাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহবিবাদে হীনবল সমাজের পরের আক্রমণ নিবারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

পঞ্চম—ব্রাহ্মণের অনুমোদিত কন্যাবিবাহাদি সামাজিক কুপ্রথায় সমস্ত জাতি হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে ক্রী, সন্তান, অর্থ ইত্যাদিসহ বিদেশের সংসর্গ সুখের বাড়াইতে পারা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এতেও মনের তৃপ্তি জন্মে না। যেন আরও একটা কিছু অভাব রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

(২)

ভারতবর্ষ তখন কতকগুলি রাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইঁহারা একত্র হইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই; যিনি একা দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছিলেন, তিনি সেই একত্ব প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই, হিন্দু রাজার সহিত স্বাধীনতার মুসলমানের লড়াই ঘটিয়া থাকিলেও হিন্দুপ্রজা সেই লড়াইয়ে একেবারে যোগ দেয় নাই। তাহারা নীরবে ও নির্বিবাদে এই রাজনৈতিক বিপ্লব চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে দেখিল।

হিন্দু প্রজার প্রকৃতিতে এ বিষয়ে একটু অসাধারণত্ব আছে। এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় প্রজা নির্লিপ্তচিত্ত। সে সময়ে তাহার নিজের যে একটা কর্তব্য আছে, তাহা সে অনুভবই করিতে পারে না। যুদ্ধ করিয়া দেশরক্ষা রাজারই কর্তব্য, তাহাতে আমাদের যে কোন দায়িত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝি না। রাজা আপন সিংহাসন রাখিতে পারেন ভাল, তিনি সুখে থাকুন। অপরে আসিয়া যদি তাঁহার রাজত্ব কাড়িয়া লয়, ভাল, তাহাই হউক, আমরা নূতন রাজাকে খাজনা দিব, এবং তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা পালন করিব। তাথাস্তু।

ভারতবাসীর নিকট রাজনৈতিক বিপ্লব কতকটা দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও ঝড়ের মত সম্পূর্ণ দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা। দৈবঘটনায় আমার প্রতিবিধান কি?

আজ সেকাল হইতে আজি পর্যন্ত ভারতবাসীর প্রকৃতি ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। মুসলমানের হাত হইতে যখন রাজশক্তি ইংরাজের হাতে গেল, তখনও ভারতীয় প্রজা তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই; তাহার মনে তখনও কোন দুঃখের উদয় বা আনন্দের উদয় হয় নাই। মুসলমানের কর্মচারী খাজনা আদায় করিতে আসিলে যাহারা আপত্তি না করিয়া খাজনা দিত; এখন ইংরাজের কর্মচারী খাজনা আদায় করিতে আসে, আমরা তাহার হাতে খাজনা দিই। তাহার খাজনাগ্রহণের অধিকার আছে কি না, জিজ্ঞাসার দরকার হয় না।

আর একটা লক্ষণ এই। আসমুদ্র হিমাচল আমাদের জন্মভূমি। হিমালয়ের গুহায় ও সমুদ্রের পারে জন্মভূমি। কামরূপ হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত এবং কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত আমাদের কর্মক্ষেত্রের স্থান, এই দেশে আমাদের দেবমন্দির, আমাদের তীর্থসকল সমস্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের স্বজাতি, স্বধর্ম, স্বাধীন-অস্তরঙ্গ সকলেই এই পরিধির মধ্যে বাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া বিদেশী আসিয়া পায়ের আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর মাথাব্যথার প্রয়োজন কি? অথবা বাঙ্গালী বিদেশীর পদানত হইল, তাহাতে মহারাষ্ট্রের কি আসে যায়?

জাতীয়তার ও রাজনৈতিক জীবনের যে-সমস্ত লক্ষণ, এ দেশে তাহার কিছুই নাই। কোন কালে যে ছিল তাহারও প্রমাণ বর্তমান নাই।

কিন্তু অন্য দেশের ইতিহাস ঠিক এমন নহে। সেখানে রাজা-প্রজায় সতত অন্তরূপ। রাজার প্রজায় এমন সম্বন্ধ-সৌহার্দ্য নাই। কথায় কথায় প্রজা রাজার দৈবিক চাহিয়া থাকে। কিন্তু আমার দৈবেবিক আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিলে তখন রাজায় রাজায় বিপক্ষে নিজের বিপক্ষ ভাবে; তখন তাহারা দল বাঁধিয়া অস্ত্র হাতে রাজাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, রাজার ও তাঁহার বেতনভুক্ সৈন্যের বাহুবলের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। যতদিন বহিঃশত্রুর আশঙ্কা না থাকে, সে ততদিন রাজার সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত থাকে। অহর্নিশ যুদ্ধ — উৎকট কলরব। তাহার প্রজার নিয়ত অধিপ্রায় মারমুখ — কে তাহাকে ঠেকায়? ইউরোপের ইতিহাসই এই।

ভারতের প্রজা শান্তির সময় রাজাকে অন্তরিক্ষ-ভাবে পালন করে, কিন্তু রাজার নাম পর্যন্ত জানিবার আগ্রহ রাখে না; আমার এক রাজার হাত হইতে যখন রাজদণ্ড খসিয়া অন্যের হাতে যায়, তখন নির্বাক নিস্পন্দভাবে চাহিয়া দেখে। ইউরোপের প্রজা শান্তির সময় রাজার প্রত্যেক কথায় ও প্রত্যেক কার্যের দৈবিক না লইয়া চলে না, কিন্তু বিপ্লবের সময় ও বিপ্লবের সময় সে পরক্ষ রাজার আসনে আসিয়া দাঁড়ায়।

(৩)

কেন এমন হইল? ইতিহাস কি এ কথার উত্তর দিতে সমর্থ নহে? কেবল দুই রাজ্যের উপর দোষ চাপাইয়া দিলে এ প্রশ্নটার প্রতি অবিচার হইল, দোষ হয় না।

আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, ঐ প্রশ্নের কতকটা এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ, ইউরোপে প্রজা চিরকাল থাকিয়া স্বাধীন ও ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল থাকিয়া স্বাধীন।

উত্তরটা নিতান্তই হেঁয়ালিগোছের হইয়া পড়িল। সাধারণতঃ শুনা যায়, ইউরোপের প্রজা স্বাধীন ও ভারতের প্রজাই চির-পরাধীন। ইউরোপে এক হিসাবে আবহমান কাল হইতে প্রজাতন্ত্র-শাসননীতি চলিয়াছে; ভারতে হিন্দুরাজার সময়েও রাজশক্তি স্বেচ্ছাচারপদ্ধতিক্রমে চালিত হইত। ইহাই ইতিহাসের সর্ববাদিসম্মত কথা। কিন্তু এই প্রচলিত মীমাংসার বিরুদ্ধে একটা কথা যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন তাহার সমর্থন আবশ্যক; তাহা শাস্ত্র ও যুক্তিপ্রয়োগ টানিয়া বুনিয়া যেমন করিয়া হউক সমর্থন করিতে হইবে।

পরাধীন ও স্বাধীন শব্দ দুটা একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি। আমি হিন্দুর রাজ্যে কি মুসলমানের রাজ্যে কি খৃষ্টানের রাজ্যে বাস করি, তাহা দেখিয়া আমাদের স্বাধীনতার পরিমাণ হইবে না। আমার নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের কতখানি রাজার অধীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন; জীবনের কতগুলো কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদন করিতে হয়, আর কতগুলো কাজই বা আমার ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারি, তাহা দেখিয়াই আমার স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করিতে হইবে। আমি বলিতে চাহি যে, এই হিসাবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীয়ের অপেক্ষাও অধিকতর স্বতন্ত্র উপভোগ করিয়াছে।

ইউরোপের ইতিহাস ব্যাবহারিক সূত্রে আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? রোম নগরীর সম্প্রসারণ হইতে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভ। রোম ক্রমে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া আপনার কলেবর সম্প্রসারিত করিতে

করিল, এবং যেখানে যাহাকে পাইল, সকলকেই সে আইনের অধীন করিল, সকলকেই সমান রাজনৈতিক অধিকার দিল, সমান অর্থে দেশের করিয়া তুলিল। মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে; কিন্তু একটা মহাজাতির সৃষ্টি হইল না। ব্যক্তিমাত্রেই হইল, কিন্তু মহাসেবক-জাতির প্রতিষ্ঠা হইল না। ইউরোপীয় বর্বরগণ সাম্রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। যেমন উহারা, তেমনই পড়িল। সেই অবসরে বিপুল ইউরোপের ইতিহাসের প্রাচীন পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। এই নূতন পরিচ্ছেদে চারিটি নূতন ঘটনার অবতারণা দেখা যায়।

প্রথম, পূর্বে যে একটা বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, তাহার মতো আবার সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপায় ছিল না। রোমক ছাড়া অন্যথা লক্ষ্য করিয়া লড়াই করিতে যাওয়া হইত, রোমক সেনানী রোমক সেনানীর বিরুদ্ধে লড়াই করিত কিন্তু রোমক প্রজা কখনও রোমক প্রজার বিরুদ্ধে লড়াই করে নাই। কিন্তু এই নূতন অবস্থার সূচনায় ইউরোপ করিল অফুরান্ত বিভক্ত হইল; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ; সেই যে রক্তকোলাহলের আরম্ভ হইয়াছে, আজ পর্যন্ত তাহা থামে নাই। দ্বিতীয়—রোমে রাজা ছিল না; যিনি সম্রাটের মুকুট ধারণ করিতেন, তিনি রোমক জনসাধারণের বিষয় ও অনেকটা তুচ্ছ ও সেনানী-মাত্র ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের এই নূতন পরিচ্ছেদে প্রত্যেক রাজ্যে এক একজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজার অভ্যুদয় দেখিতে পাই। রাজার প্রথম কাজ প্রতিদেশে রাজার গৌরব বৃদ্ধি;—প্রজার অর্থব্যয় ও প্রজার শোণিতপাত আপন স্বার্থের জন্য। রাজার দ্বিতীয় কাজ, প্রজার নিষ্পীড়ন—প্রজার ঐহিক ও আত্মিক-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করিয়া আপনার সর্বতোমুখী প্রভুশক্তির স্থাপনার জন্য। ইউরোপের সেই তামস যুগ। পরে নূতন ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ—নূতন নূতন স্বতন্ত্রতা তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপের এই অসাধুতা। এই সময়ে সুবিধাবাদ কিউয়াল-তত্ত্বের উৎপত্তি। কিউয়াল-তত্ত্বের অর্থ কি? অসভ্য বিজেতা বৈদেশিক রাজা আসিয়া প্রজার সমস্ত ভূসম্পত্তি একেবারে আত্মসাৎ করিলেন। তাহার, সেই ভূসম্পত্তি আপনার আশ্রিত ও অনুচর-গণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাজা দাতা ও প্রজা গ্রহীতা। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা চুক্তি বিধিবদ্ধ হইল। দাতা প্রতিবেশীর সঙ্গে চিরদিন যুদ্ধ করিবেন। গ্রহীতা আপনার জীবন, আপনার শোণিত দিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে দাতার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। যে পর্যন্ত দাতা-গ্রহীতা এই, যাহার একটুকরা জমি আছে, তাহার জীবনের প্রধান কার্য যুদ্ধ; নিজের জন্য নহে—পরের জন্য। প্রজাসাধারণ অনুচারী যুদ্ধিবৃত্তি সৈনিক ও কৃষ্ণ; তাহাদের প্রধান কার্য রাজার স্বেচ্ছাচার ও জীবনরক্ষা। রাজার প্রজার আর এক অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। রাজা শাস্তা, রাজা বিচারক; রাজা ব্যবস্থাপক, রাজার আদেশের নাম আইন। কেবল তাহাই নহে—রাজা গুরু, রাজা শিক্ষক, রাজা উপদেষ্টা। সর্ববাধক রাজশক্তির সহকারী লোপ এবং ধৈর্যের উভয়েই পরস্পরের মধ্যে-অবতার। প্রজা যদি মানিয়া চলে, তাহার পক্ষে মঙ্গল, নতুবা তাহাকে পোড়াইয়া ফেলাই যুক্তিসিদ্ধ। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে; এবং ইহাকে যদি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বলিতে চাও, শব্দশাস্ত্রের পরিবর্তন করিতে হইবে।

আরম্ভ এইরূপ, কিন্তু এই আরম্ভের পরিণতি কোথায়? রাজা মানুষের আত্মাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন, কিন্তু মানুষের আত্মা মুগ্ধ হইবার পদার্থ নহে। মানুষের আত্মা এক অপরূপ জিনিষ।

মানুষের আত্মাকে স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত বায়ুমণ্ডলে বিকশিত করিতে হইলে, সে মুক্ত বায়ু তাহার করিয়া তাহাদিগকে আত্মীয়ে নিত্য বাঁচিতে থাকিবে। তাহাকে দলিত ও পীড়িত হয়, সে কুসুমের মত শুকাইয়া উঠিবে। ইউরোপে তাহাই ঘটিয়াছে। সেখানে রাজার প্রজার সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজার জয়।

পরবর্তী ইতিহাসে প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, রাজের আবিষ্কারে সুশাসন সামরিক পরাজিত একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছে। রাজা তখন বেতনভুক্ সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রজাও তাহাতে আত্মরক্ষার অনুরোধে অস্ত্র ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজার নিকট প্রজার ভয়টা কম নাই, কিন্তু রাজার ও তার সৈন্যের, রাজা রাজ্যে সৈন্যের সম্ভাবনা পূর্বের অপেক্ষাও বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রজা অস্ত্রধারণ করিয়া থাকে। জার্মানি প্রভৃতি রাজ্যে প্রজামাত্রেই সৈনিক, আবশ্যক মত সকলেই যুদ্ধে বাহির প্রস্তুত।

প্রজার পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সমস্ত কার্যেই ইউরোপের রাজা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন; ধরাবন্ধনে বাঁধিয়া তাহার দেহ ও মন উভয়কেই অভিভূত করিতে চাহেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে সনাতন দ্বন্দ্ব। এই সনাতন দ্বন্দ্বের ফলে সেখানে মুহুর্মুহু রাষ্ট্রবিপ্লব। রাজার প্রজার বিবাদ অদ্যাপি থামে যায়। কখনও যে থামিবে, তাহার আশাও নাই।

ঠিক এই কারণেই ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাতীয়তার এত উগ্রমূর্তি বাহির হইয়াছে। বাহিরে জাতির সহিত জাতির, ভিতরে রাজার সহিত প্রজার সনাতন বিরোধ। এই অংশে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সমগ্র জাতি কখনও এক হইয়া জমাট বাঁধে নাই। এক মহাসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে সকলেই কখনও স্থান লাভ করে নাই। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা সমগ্র ভারতবর্ষকে বিভক্ত রাখিয়াছিল। কিন্তু এই এক একটী রাজ্যের অধিবাসীরা কখনও একজাতীয় হয় নাই। ইউরোপে যেমন ফরাসী, জর্মান, ইতালীয় প্রভৃতি কয়েকটী সুগঠিত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেরূপ কয়েকটী বড় জাতি গঠিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা অনেকটা ইহার জন্য দায়ী। ইতালীর একটা ভৌগোলিক সীমানা আছে, স্পেনের আছে, গ্রীসের আছে, ফ্রান্সও জর্মানির মধ্যেও একটা সীমানা খুঁজিলে মিলিতে পারে। বাঙ্গলার কোন নির্দিষ্ট সীমানা নাই, পাঞ্জাবেরও সীমানা নাই, মহারাষ্ট্রেরও নির্দিষ্ট সীমানা নাই। এক বিশাল সমতল প্রান্তরের এক এক অংশ লইয়া এক এক জাতি বাস করে। সেইরূপ, জর্মাণ ও ফ্রান্সিসের মধ্যে, ফ্রান্সিস ও স্প্যানিয়ার্ডের মধ্যে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয় নাই। উৎকলের ভাষাকে বাঙ্গালী পরিহাস করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন্ স্থানে বাঙ্গলার শেষ এবং কোথায় উৎকলের আরম্ভ তাহার নির্দ্দেশ একেবারে অসম্ভব। তাহাই প্রজাপুঞ্জের মধ্যে জাতিবিভাগ ও জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টি হয় নাই। বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশী বিহারীকে বিদেশ প্রেমের চক্ষে দেখে না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন ধর্মগত বিদ্বেষও বর্ত্তমান নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র।

কোন রাজারই রাজ্যের স্থায়ী সীমানা ছিল না। যিনি যতটা অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন, তাহাই তাঁহার রাজ্য। রাজায় রাজায় লড়াই হইত বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বস্তুগত বিরোধের উদাহরণ প্রায় ঘটিত না। ইঙ্গলণ্ডের ইতিহাস স্কটলণ্ডের সহিত ইংরাজের বা আর্লণ্ডের সহিত স্কটলণ্ডের যে-সম্বন্ধের উল্লেখ করে সেরূপ সম্বন্ধের উদাহরণ ভারতবর্ষের মধ্যে নাই।

(৪)

ভারতবর্ষে জাতিভেদের উল্লেখ করিয়া যাঁহারা

একটা প্রকাণ্ড অনর্থের কারণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন, উহারা ঠিক বুঝাইয়া দেন না, আফ্রিকেন-দের রাজনৈতিক দুর্বলতা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে। আফ্রিকেন একটা বৈষম্য বটে, কিন্তু তাহা রাজনৈতিক অধিকার লইয়া নহে, তাহা সামাজিক অধিকার লইয়া। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্রদের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক বিধানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ কখনও অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয় নাই, যুদ্ধও কখনও অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ধর্মক্ষেত্রে উদ্যত হয় নাই। ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধ শূদ্রের না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে নিরাকরণ বিদ্বেষ ও ঈর্ষার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান নাই।

বিদ্বেষ ও ঈর্ষার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও মূল বিষয়ে কিছু আসে যায় না। ব্রাহ্মণও ভারতবর্ষের সর্বত্রবাসী, শূদ্রও ভারতবর্ষের সর্বত্রবাসী। উভয়ে কিছু স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বাস করে না। কোন জাতির বিপদ উপস্থিত হইলে উভয়েই তাহা বা উভয়েই অতি সমভাবে।

আরো দেখা যাইতেছে, ইউরোপে একটা জাতি বিভিন্ন আছে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্য উভয়েই বর্তমান, কিন্তু ভারতবর্ষে ভিন্ন বিরোধী জাতির বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষে যে কিছু বর্ণগত বা ধর্মগত বা সম্প্রদায়গত বিরোধ আছে তাহা রাজনৈতিক বিরোধ নহে, তাহা সামাজিক বিরোধ; তাহা প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেই বর্তমান। তাহা জমাট বাঁধিয়া এক একটা নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট ভূখণ্ড অধিকৃত করিয়া রাখে নাই। ফলে, ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, রাজ্যে রাজ্যে বহুদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছে, কিন্তু জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে ধর্মঘাতী যুদ্ধ কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমার বিবেচনায় ভারতবাসী প্রজার এই প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতাই তাহার পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। ভারতবাসী পরাধীন, কেন না, বাহির হইতে সহজ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে তাহাকে যে আপত্তি করিতে হয়, সে তাহা জানে না। ইংরাজীতে যাহাকে প্যাট্রিয়টিজম্ বলে, সে ভাবটা তাহার মনে কখনও অনুদিত হয় নাই। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয়তার বিকাশ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা আলোচ্য বিষয়; এবং ইহা ব্রাহ্মণের ঘাড়ে সমস্ত নিক্ষেপ করিলেও যে উত্তরটা সম্যক্ হইল, তাহা বিবেচনা করিতে পারি না।

মনে করিও না যে, ভারতবাসীর প্রাণের মমত্ব অন্যের অপেক্ষা বেশী, বা ভারতবাসী সাহসবিষয়ে অন্যের অপেক্ষা হীন। একথা যে বলিবে, সে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই।

জাতীয় ভাব কেন যে এ দেশে বিস্তার লাভ করে নাই, তাহার একটু অনুসন্ধান দরকার। সমুদায় হিন্দুজাতি কেন যে একটা মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

এক রাজার অধীনতা জাতীয় ভাবের বিকাশে সহায়তা করে। রাজনৈতিক বন্ধনের মত বন্ধন খুব কম আছে। সমগ্র ভারতকে মহর্ষি করিয়া একছত্র করিয়া বাঁধিতে কোন রাজবংশই বোধ হয় সমর্থ হন নাই।

আরও কয়েকটা কথা আছে। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নানাজাতীয় নানা ধর্মের লোক বাস করে। এই বর্ণভেদ ও জাতিভেদের সহিত আমার সহানুভূতি নাই। ভাবগত ঐক্য না থাকিলে সামাজিক বন্ধন কোন কাজের হয় না। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক দেশ বলাই কঠিন। বরং সমগ্র ইউরোপকে এক দেশ বলা যাইতে পারে, সমগ্র ইউরোপীয়কে একজাতিভুক্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষকে একটা দেশ ও সমস্ত ভারতবাসীকে একজাতিভুক্ত বলিয়া ধারণা একরকম বিড়ম্বনা।

বন্ধনের অর্থ কেবল একটা বন্ধন ছিল। বস্তু ও পার্থিবতাসমূহকে ছাড়িয়া দিলে প্রায় সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভেদ, বিভিন্ন আচারভেদ ঘটিয়া সমস্ত জাতিকে কখনও একাট বাঁধিতে দেয় নাই। জাতীয়তার অভাব বুঝাইবার জন্য এইরূপ অনেকগুলো কথা বলা যাইতে পারে। ভারতবাসী এক জাতিতে পরিণত হয় নাই, কেন না, ইহা একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ইহা এক জাতির আবাসভূমি নহে — ইহাতে নানা ভাষা, নানা আচার, নানা ধর্ম।

কিন্তু এই পর্যন্ত বলিলেই কি মনের তৃপ্তি হয়? ভারতবর্ষ জিনিস অন্তত বুঝিবার কি কিছু বাকি থাকিলেও অন্তরিক্ষ ফলের উৎপত্তি হয় নাই?

মনে কর ইউরোপ। ইউরোপ একটা মহাদেশ। কিন্তু কলিঙ্গখণ্ড ছাড়িয়া দিলে এই মহাদেশের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আয়তনে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক বড় হইবে না। সেখানেও ঠিক জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আচারভেদ আমাদের মতই বিভিন্ন। তার পর ভাষাভেদ, সেও নিতান্ত কেলিবার নহে। ইউরোপে যতগুলা বেশ ভফতগুলা ভাষা। একটা বর্ণের বন্ধন উপর উপর দেখা যায় বটে, কিন্তু সে বন্ধনটা কেবল নামমাত্র, কাজে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কেন না, খৃষ্টানের সঙ্গে খৃষ্টানের যেমন বিবাহ, অন্য কোন বর্ণাবলম্বীর সঙ্গে তত নহে। ফলে, ভারতবাসী একত্র হইয়া যেমন মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, ইউরোপবাসীও সেইরূপ মহাজাতিতে পরিণতি লাভ করে নাই। উভয়ের একই কারণ। ভারতবাসীর যেমন ভারতের জন্য প্রাণ কাঁদে না, ইউরোপবাসীরও সেইরূপ ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না।

কিন্তু উভয়ে সাদৃশ্য এই পর্যন্ত। ইহার পর আর সাদৃশ্য নাই। ইউরোপবাসীর ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না বটে, কিন্তু ফরাসীর প্রাণ ফ্রান্সের জন্য কাঁদে; জার্মানের প্রাণ জার্মানির জন্য আবেগের সহিত কাঁপিতেছে; ইংরাজের প্রাণ 'হোমে'র জন্য কাঁদিয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গলার জন্য কখনও কাঁদে নাই, পঞ্জাবীর প্রাণ পঞ্জাবের জন্য কাঁদে নাই — সে একবার কাঁদিয়াছিল অত্যাচারী ধর্মদ্বেষী মুসলমানের রক্তপানের অবসর না পাইয়া। মরাঠা মহারাষ্ট্রের জন্য কাঁদিয়াছিল; সে বোধ হয় আমেদের জন্য — যখন রাজার টুপি কাড়িয়া ও লাঠি মুড়াইয়া আপন উৎকট পরিহাসরসিক-বৃত্তির চরিতার্থতার। ভারতবাসী কেহ কখনও স্বদেশের জন্য বা স্বজাতির জন্য কাঁদে নাই; ইহাই সাধারণ নিয়ম, কেবল একটা যাত্র উদাহরণ ইতিহাসে দেখে, সে উদাহরণ রেওয়ারের রাজপুত।

এইখানে ইউরোপ ও ভারতবাসীর তফাৎ। সমগ্র ইউরোপ-মহাদেশ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এক এক একটা রাজ্যে এক একটা দুর্দম্য দৃঢ়বদ্ধ সবল জাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ফরাসী জার্মানির লোহিতপানের তৃষ্ণায় ব্যাকুল; কিন্তু ফরাসী আবার ফ্রান্সের জন্য আপন শরীরের শেষ রক্তবিন্দু প্রদান করিতে প্রস্তুত। ইউরোপে এই অর্থে প্যাট্রিয়টিজম্ উদ্ভূত হইয়াছে।

তারপর রাজার প্রজার সম্বন্ধ। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের প্রাচীন শাসন-প্রণালীকে রাজতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারপ্রণালী বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় সেকালের শাসন-প্রণালী সম্পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক ছিল; প্রজা যে-পরিমাণে স্বাধীনতা-ভোগের আশা হইতে অধিকার পাইয়াছিল শতশত বৎসরের বিবাদের ফলে আধুনিক ইউরোপীয় প্রজা তাহা পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। অন্তত প্রজার সহিত রাজার যে একটা বিরোধ দেখা যায়, এখানে সেটা তেমন প্রবলমাত্রায় ছিল না। রাজায় ও প্রজায় অন্য-তেমন গুরু বন্ধনই বোধ হয় ছিল না। প্রজা

খুব সাধারণ ভাবেই রাজার শক্তির অধীন ছিল। প্রজার রাজার নিকট নিবেদিত হইবারও বিশেষ অবসর ঘটে নাই, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবারও তেমন দরকার হয় নাই। অবশ্যই কতকটা বিষয় আলোচনা করিলে এ বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

দেশের রাজার যেমন একটা কাজ। তিনি রক্ষক। তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া শত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করেন এবং রাজ্যের মধ্যে দুষ্টের শাসন দ্বারা শান্তি রক্ষা করিতেন। সর্বত্র না হউক, অনেক স্থলে দস্যুদমনে ও বিচারের ভার রাজারই হাতে ছিল। শাসনবিষয়ে ও বিচারবিষয়ে রাজার যোগে দুইটা কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু এই দুইটা ছাড়া আর প্রজার সহিত রাজার সম্বন্ধের শেষ। রাজা কর আদায় করিতেন, তাহার দ্বারা আপন সেবা পোষণ করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন, বাজুয়ানা করিতেন এবং ইচ্ছা হইলে কর সংগ্রহের কিছু কিছু অংশ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু প্রজার স্বাধীনতা সংরক্ষের জন্য এর অতিরিক্ত আর কিছু করিতেন এমন শুনা যায় নাই।

প্রজা আপন চিরাগত প্রথানুসারে সমাজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। আইনের ব্যাখ্যাটা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের হাতে ছিল বটে এবং তিনি অপরাধীর সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া একেবারে গণনার বাহির করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল অপরাধের অধিকাংশ স্থলেই বস্তুতঃ প্রায়শ্চিত্ত, কোন একটু আধটু সামাজিক বিদ্রূপের বিধান ছিল। রাজদ্বারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর পঁহুছিত না; বিচারাদি কার্য্যও অনেক স্থলে সমাজের দ্বারা ও সমাজের সুবিধার দ্বারা সম্পাদিত হইত। রাজার সহিত কোন বিষয়ে কোন সম্বন্ধ ছিল না, যা সংঘর্ষ ঘটিত না। সমাজের পাঁচজনে কর্তা হইয়া সমাজের কাজ সম্পাদন করিত। রাজার নিকট উপস্থিত হইতে হইত না, রাজারও কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আত্মতন্ত্রীয় রাজনীতি রাজার অধিকারবহির্ভূত ছিল। হইতে পারে এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপরের বিরোধ ঘটিত, বা বিদ্বেষ ঘটিত। কিন্তু সে বিরোধ প্রজায় প্রজায়; রাজার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

(৫)

আর একটা প্রকাণ্ড স্বাধীনতা ভারতের প্রজার স্বাভাবিক ছিল, — ভারতের বাহিরে অন্যত্র যেমন হইয়াছে বলাবাহুল্য আজি পর্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে রাজা কখনও প্রজার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইউরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যাজক-সম্প্রদায় জন-সাধারণের জন্য ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। রাজা সেই যাজক-সম্প্রদায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। যে ব্যক্তি প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশে দোষী হইত, সমগ্র রাজশক্তি যন্ত্রের মত তাহার মস্তকের উপর নিপতিত হইত।

ভারতবর্ষে বিধান অন্যরূপ। এখানে যে মানব-সম্প্রদায়ের হস্তে জ্ঞানালোকনের ভার অর্পিত ছিল, রাজশক্তি সমরে তাহার নিকট প্রণত থাকিত। মনুষ্যের স্বাভাবিক অপ্রতিহত প্রভাবে সমাজ আর উন্মুক্ত করিয়া সমাজ দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল; কেহ বলিতে সাহস করে নাই, ঐ পথে তুমি চলিও না। যিনি বলিতে চাহেন, ভারতের ব্রাহ্মণ মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিকে পুথপিত ও নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি হয় অজ্ঞ, নতুবা বিদ্বেষবশে। তাঁহার সহিত বিচারের অবতারণা বিড়ম্বনা।

সামাজিক, নৈতিক, লৌকিক ও ব্যবসায়িক, সকল ব্যাপারেই ভারতীয় প্রজা সর্বতোভাবে স্বাধীন ছিল; ঠিক এই কারণে রাজার সহিত কখনই তাহার বিরোধের আশঙ্কা ঘটে নাই। এই জন্যই সে কখন

অস্ত্রধারী সৈনিকের ব্যবসায় অবলম্বন করা হয় নাই। রাজার সহিত রাজার যুদ্ধ হইত; এক রাজার হস্ত হইতে রাজত্ব অন্যে কাড়িয়া লইতেন; কিন্তু প্রজার স্বাচ্ছন্দ্যের বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হইতেন না। প্রজাও সেই জন্য রাজপরিবর্তনের ও রাজবংশের রাজ্যপরিবর্তনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। রাজার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে রাজার নিজেই আপনার পাওনাগণ্ডা বুঝিয়া লইতে হয়, কথায় কথায় রাজার সৈন্যসিংহ চাহিলে হয়, তাহাদের প্রজার এই শিক্ষানবিসের অবসরই ঘটিয়া উঠে নাই। যে শিক্ষা ও যে পরীক্ষা, যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব হইতে জাতীয় ভাব, রাজনৈতিক ভাব বিকশিত হয়, সে শ্রেণী তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তাহাদের অভাব ফলেও সেইরূপ।

অতি প্রাচীনকালে যুদ্ধ-ব্যবসায় চালাইবার জন্য একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের নাম ছিল ক্ষত্রিয়। রাজার সিংহাসনরক্ষার জন্য, প্রজার হস্ত হইতে শস্যরক্ষার জন্য এই ক্ষত্রিয়জাতি প্রয়োজনমত অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইত। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতির উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যুদ্ধব্যবসায়ী মনুষ্য-সম্প্রদায় কোনো কালে ছিল না; যাহারা কেবল প্রবল হইয়া যুদ্ধের ব্যবসায় চালাইত, তাহাদের কোনরূপ নৈতিক শক্তিসম্বন্ধ ছিল না। প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির লোপ হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজ কাড়িয়া নিয়াছিল, নূতন সমাজগঠনের কার্য্য আরম্ভ হইতেছিল মাত্র। এই সময়ে পশ্চিমদেশ হইতে যবন, শক, হূণাদি বিবিধ সমরপ্রিয় বর্ব্বর জাতি হিন্দুস্থানে দলে দলে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে; অনেকে বড় বড় রাজ্যস্থাপনেও কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু অল্পদিনেই তাহারা হিন্দুস্থানের সামাজিক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সকল নবাগত সমরপ্রিয় জাতিসংঘের লইয়া ভারতবর্ষের নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুতের অভ্যুত্থান হইল। যখন মুসলমান আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুত তো সেই দুরন্ত শত্রুর প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিল। বেদবতী প্রবর্ত্তিনীর পরিত্যাগ তাহাদের অসাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মুসলমানের মত প্রচণ্ড শত্রুর সঙ্গে তাহারাও সমান লড়িয়াছিল, তাহার বিফল পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকিবে।

আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোন বিষয় তাঁহার হাত হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতা পাশে গ্রথিত হইয়াছি, কিন্তু সমাজে চিরদিন আপনার মস্তক আপনি নির্ব্বাহ করিয়াছে। মুসলমান কোন বিষয়ে বাহিরের জন্য তাহাদের হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজ-লক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।

— রবীন্দ্রনাথ ('স্বদেশী সমাজ')

তাগাদা

(প্রেমচাঁদের হিন্দী অবলম্বনে)

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

[প্রসিদ্ধ হিন্দী লেখক পরলোকগত প্রেমচন্দের রচনা আমরা ইতিপূর্বে, অনুবাদ সাহায্যে 'পরশমণি'র পাঠক-পাঠিকার গোচরা করিয়াছি। এবারে তাঁহারই আরেকটী গল্পের — ঠিক অনুবাদ নয় — অবলম্বনে রচিত এই গল্পটীও তাঁহাদের মনোহরণ করিবে। তবে অনুবাদ না হইলেও মূলের গুণটী অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই মনে হয়। তারাচরণ-চরিত্রটী এই অভিনব লেখকের একটী সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়-কাহিনী আমরা শীঘ্রই পত্রস্থ করিব। [ব: স:]

তাগাদা আপাততঃ তিন প্রকার, — অর্থের, অর্থের ও কাব্যের। মোক্ষের তাগাদা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সে কচিৎ কখনো চোখে পড়ে। বর্তমান কাহিনীর নায়ক শেঠ চেতরামের জোড়াসার খেকে ও কাপড়ের কারা একেবারে মোক্ষ লাভ করিয়াছিল — এই মাত্রই। সুতরাং মোক্ষের তাগাদা নিরাপদে তাঁকে ভোলা যাইতে পারে।

চেতরামের জীবনে যাচ্ঞা তিন তাগাদাই উপস্থিত হইয়াছিল, — তবে শাস্ত্রবিহিত পারম্পর্য রক্ষা করিয়া নহে। চৈতন্য হইবার পর হইতেই চেতরামের চিত্তে একটিমাত্র তাগাদাই তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল, — সে অর্থের তাগাদা। চেতরাম লক্ষ্মী-কারবার করিতেন, আর সম্প্রতি পাঁচদিন টাকার তাগাদায় বাহির হইতেছেন। তাগাদার ও হুঁকার পিতামহ শব্দ, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র।

একটি লোক লোটার জলের পাঁচ সাত ইঞ্চি উপরে ঘটোলা ধরিয়া প্রতিদিন যাহা তাহার মাধুর্য সম্পাদন করিত এবং পরমতৃপ্তিভরে তাহাই পান করিত। চেতরাম সেই ধরণের লোক ছিলেন না। আর কিছু না হোক, তিনি ভোজনবিলাসী ছিলেন। হবে নিজের বাড়ে নহে। এমন কি উপরোক্ত রূপের মত মাসে একটি বারোদাও বন্ধ করিলেন না। কাঁঠাল খাইবার লোভ যতটুকু, পরের বাগান হইতে কাঁঠাল করিবার ও পরের মাথায় ভাঙিবার ভেরাসতি ততোধিক।

যে-লোক পুত্রের উপর পুত্র, তার উপর পুত্র আনার করে, সে নিজের বাড়ীতে বসিয়া আহার করিলেও পরের উপার্জনে ভাগ বসান বলা যাইতে পারে। সেই অর্থেও বটেই, আক্ষরিক অর্থেও চেতরামের ভোজনব্যাপার পরমৈপদী ছিল। তিনি সকালে বাহির হইতেন, সন্ধ্যায় ফিরিতেন। প্রত্যহের বালা-ভোগ ও দুপুরের বাকস্থালা বরাদ্দ, দুই খাতকের খাতায় ঘটিত। খাতার অবশ্য কথা নয়, একেবারে নগদ আদায়। এই বেহেবেলায় ভোজনের ব্যয় সপ্তাহান্তে দিনে দেড়-আনা হিসাবে ধরিলেও হিসাবসরে নেহাৎ কম নহে। তার উপর, ফিরিবার সময় খাতকদের ক্ষেতের আনাজপাতি, ঘরের ঘুঁটে দই ঘি লইয়া আসা, সেটুকু ত ফাউ।

শেঠজী সকালে পায় হইয়াছেন। মাথায় বিরাট টাক, যেন পরচীন ক্ষেত। চোখ ছোট ও

ঘর্ঘরাকার। মাথার পাগড়ী ছাড়াইতে না ছাড়াইতে দু'টির মাথা আসে, দু'টির বিপুলত্বের তুলনায় পাছটি ছোট, — যেন শিপ্পীর ভুল করিয়া পাছটি ঐখানে আঁকিয়া ফেলিয়াছে। শিপ্পী একজায়গায় ঠায় পড়িয়া থাকিবার শিপ্পী নয়। সে থাকুক তার বাকী খেলা, তাহার সামনে শিপ্পার পাগেয়ারা দেখিয়া কোন বুভুক্ষু শিপ্পী-বুভুক্ষু নানক নূতন নাম আবিষ্কার করিতে পারিবেন। অর্থের তাগাদায় খাতকগণের ভক্তিভাব শুকাইয়া আসে বলিয়াই তাহারা এমন উপভোগ্য বস্তুতে কৌতূহলশেষে ধরে না — বরিশের চেহারার নাসিকাকুঞ্চন ও প্রকোষ্ঠ আস্ফালন, মাথার (কপালে নয়) বলিরেখার উদ্ভব — এই সব দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিত না।

এহেন চেহারা লইয়া ত্রিশবৎসর সহরে পাঁচদিন ফেরু-খেলা করিয়া পরোপজীবী আহারের কলাপোষণ পরিবার অর্থ যোগাইয়াছেন, এক পয়সা ছুঁড়িলে প্রত্যেকে তাহার অধিক অর্থ ফিরিয়া দিয়া গেল। নূতন খেলোটী শুরু করা পর্যন্ত পারিলেন না। বুভুক্ষিতাও যাহা কিছু যৌক্তিকার সময় ঐটুকু যাইয়া পড়িয়া যাইবেই বুঝিয়া মোষ-প্রহার করিতে পড়িয়াছিল, কোন রকমে, ঠাকুরাইয়া ধরিয়া সেটি রক্ষা করিলেন।.....

দেখিলও নিজস্বার মত প্রাতঃকৃত্যাদি করে তাগদের বাহির হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্নান, নিত্যকার শিবপূজা (শিবের মাথায় লোটা উপুড় করিলেই পূজা হয়, ওর বাজ নাই), দুই দানা সোনমাছি চিবানো, একলোটা জলপান, হাটবাট ঘুরে ফেরুওয়ালা, — এই হইল বাঁধাধরা নিত্যক্রিয়া-পদ্ধতি। আর একটু আগে, সেটি পত্নীর দিন হইতে। গাছের ডালের মত বৃহৎ যষ্টি গাছা বাগাইয়া ধরিলেই পত্নী জিজ্ঞাসা করেন — যেরে যাবেনা !

স্বামী অবিচল-গম্ভীরমনে জবাব দেন —নহী।

কিরবে কখন ?

সন্ধ্যার আগে।

খাবার খাবার ক'রে রাখব ?

সে এলে পর দেখা যাবে।

চিরপরিচয়ের ধরিয়া এই তিন প্রশ্ন ও তিন উত্তর চলিয়াছে।

(২)

আজ যেখানে যাইতেছিলেন, খুব হিসাবে সেটা তেমন কিছু নয়। আয় খুবের পাল্লায় আপত্তিও নাই, যদি অনুরূপ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এলোকসানের ভয়। এক চাষা পাঁচটাকা নিয়া সেই যে গিয়াছে, ফেরবারও তার দেখা নাই। সেটা অবশ্য জানা কথা। পরের দিনের দিন আসিয়া সুদ দিবার কড়ার সকলকেই করিতে হয়, প্রায় কেহই আসে না। ধরে আসিয়া যদি সুদ ধরিয়া দিত, তবে তাগাদার প্রয়োজনই হইত না। চেহারায় জানেন যে কেহই আসিবেনা, তাঁহাকেই বাকী বাড়ী বাড়ী খাতক ছাড়াইয়া বেড়াইতে হইবে। তাহার খেলাটুকু তিনি আদায় করিতে ছাড়েন না। বিনামূল্যে ভোজন, কলামূল্যে দাসত্ব ত আছেই, তবের হাতও চড়া। তার আশপাশের কারণ এই যে, পাঁচ টাকার বদ আদায় করার জন্য দুর দাইলের উপর পথ হাঁটিতে হইবে। ঐ গ্রামে আর খাতক নাই। সুতরাং পয়লা আদায় হইলেও মেহনত পোষাইবে না। পাঁচ মাইল ফেরু, চেহারায় পিপা চিতাইয়া পড়িল মাইলও সরাইতে পারেন, যদি মেহনতের উপযুক্ত মাল আদায় হয়।

তবু না গিয়া উপায় কি। খেলকালে চর্চিতের অভাবে যদি মন আনা অলক্ষ্যে মাঠে মারা যাইবে ?

দুর মাইল চলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চেহারায় পথে পা দিয়াছেন, দেখেন একটা ভয় (আসল যাহাকে মনে টাকা) যাইতেছে। বিনাশকালে চেহারায় বিপরীত-বুদ্ধি হইল। ত্রিশবৎসরে চেহারায় একবারও

ঘর ভাড়া নাই। আজ বিনা ভাবেই মনে হইল, দুবেলা খাইলে, ভাড়াটেরও মন রহিবে না। কিন্তু মন আনা পয়সা উপরের জন্য আমার খরচ? চতুরে টাকাওয়ালা গাড়ী যাতায়াত করে। বোধ যাইতেছে, সে নূতন লোক; নহিলে চেহারার ঘটীর সামনে আজ পর্যন্ত কোন টাকাওয়ালা টাকা খোয়াইবার ভাবিয়া অনুভব করে নাই। অথবা খাওয়া, তাহাদের ত কথাই নাই।

চেহারাও চাহিয়া দেখিলেন — না, এ লোকটি তাঁহার অচেনা নয়, সময়ে নূতন আসিয়াছে মাত্র। চেহারা খিদমতে আগাইয়া গেলেন। নূতন হইলে শুধু অসুবিধাই হইবে, তাহা ত নয়; — সুবিধাও হইতে পারে। বয়স হইয়াছে, এখন আর হাঁটিয়া তাগাদা করা তেমন সুসহ নহে। কিছু টাকা বার দিয়া যদি সুদের উপর টাকার কারবারের ব্যবস্থা করা যায়, মেহনৎ কম হইবে না। পরিচিত কোন ভদ্রলোকের ত এই ব্যবসার দালালী হইবে না। নূতন লোক যদি ঠকে পড়ে — মন্দ কি? বিশেষতঃ, এই প্রথম ছেলের টাকা নয়, ঠেকিয়াও লোকটার ঘাট কম হইবার কথা।

এক্কা মাত্রক অবশ্য সবাই পৌরাণিক রথবিশেষ। ছাদ ত নয়, যেন একটা ঝুড়ি উপুড় করিয়া রাখা আছে। বোধ হয় একজন বসিবার কথা, তাই এক্কা নাম। কিন্তু বসিবার স্থান যেই আসি মুখের মত হইলেও জনা-তিনেক বসেই। আজ এখনও গাড়ী কেহ ভোটে নাই। এই সকালে লোকজন চলিতে আরম্ভ করে না, ট্রেনের গাড়ীও দশটার আগে আসিবে না।

এক্কাওয়ালা পুছিল: লালাজী, কোথায় যাওয়া হবে? চেহারা জবাব দিলেন — তেমন কোথাও যাচ্ছিনে, এই চুপা এগিয়ে ফেলেই হয়। তা তোমার টাকা ত খালিই আছে দেখি।

একাকে টাকা বলা কানাকে পদ্মলোচন বলার

সামিল; টাকা ওয়ালা শোনে বোধ করিল, কিঞ্চিৎ অপমানও হইল। কিন্তু সে যে শুধু শোনার বোধ করিবার শক্তি হারে তাহা নয়; রসিকতার চর্চ্চাও করিয়া থাকে। বলিল, — না, তেমন যে খালি, তা নয়। তবে আপনিও ত নিকোই যাচ্ছের দেখছি।

এবার দুইজন পরস্পরকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। দুইজনই বুঝিলেন, শক্ত পাল্লা, আগে লোহার কড়াই চিবাইতে হইবে।

কিন্তু নিয়তি অন্যরূপ। শক্ত সত্ত্বেও চেহারা চড়িয়া বসিলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া দুই তরফ মাটিয়া লইয়া আলাপ সুরু করিয়া দিলেন। দেখাই যাক না, যদি তরফার চিঁড়া ভিজে।

— তারপর, মিঞা সাহেবের বাড়ী কোথায়? প্রথমে এক্কাকে তরফে টানিয়া চেহারা খুশী হইয়াছিল, এখন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও ইজ্জত বাড়িয়া যেন আর একগ্রস্থ প্রবল হইল। লালাজী বলিতেছেন — 'মিঞা সাহেব'! কিন্তু ফুটফুটে রোদের দিনেও আকাশের কোণে যেন খানিকে পারে; মিঞার মনেও সন্দেহটুকু জাগিয়াই চলিল। চতুরে চেহারা বলিতেছেন — আপ ত জী বড়ে আদমী বোলে যায়।

'আপ'-শব্দের অর্থ অবশ্যই 'আপনি'। কিন্তু তাচ্ছল্যেও আপ বলার রেওয়াজ আছে। ইংরেজী 'ইউ'-শব্দের মত আপও বোলে ঝালে অম্বলে বেখানে, খুশী লাগানো যায়। তুমিও ঘটে, আপনিও ঘটে, তুইয়েও আপত্তি নাই। সুতরাং আপ শব্দে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা বিকিরিত হইতেছে তাহা ভাবভঙ্গী দ্বারা স্পষ্ট করিতে হয়। তা, এই দিক দিয়াও মিঞা সাহেব অখুশী হইবার কারণ পাইলেন না। কিন্তু মিঞা পাকা জিয়োগ্রাফি ত বটেই, উকীলও। জৌকারায় ও জজালক যদি চোখ কাণ খুলিয়া রাখে, তবে অনেক দেখে, অনেক শোনে। তাহার ফলে জৌকারের খুরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জিহ্বারও

শান পড়ে ; টাকাওয়ালার ঘোড়ার খুর, হাতের লেজ ও অন্যবিষয়ে রসনা একত্রে প্রখর হইয়া উঠে। সে সময়ানে সময়ানে জবাব দিল — যব আর ঘোড়ার হুজুর ; যেখানে আর ছোলা, সেখানেই ঘাস আসবে। চিরকালই কি তরকীর এমন পোক্কা ছিল হুজুর! এমন না ছিল 'মিঞা কিতা তহুরুদা'। কিন্তু আমার ঠাকুর্দা ছিলেন নবাবী আমলের তালুকদার।

— তাই বল মিঞা! খানদানী আদমী না হ'লে চেহারায় অমন বাহার!

— এখন কি আর আছে শেঠজী, পুরুষানুক্রম চাল চালাচ্ছি, আমি এলা চালাই। আমার ঠাকুর্দার প্রতাপে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত, আমার নামা, যখন খুশী যাকে ইচ্ছা ফাঁসী চড়াতেন। আজ আমার এমন হাল হয়েছে যে যবের বিবিও তোয়াজ্জা হয় না।

শেঠজী সখার রঙ্গ ছাড়া আর কিছু করিবার ছেলে ছিলেন, টাকাওয়ালার পৌঢ় বয়স। বুঝিলেন, ঘোড়া পাকা খুব, খুশীদিল। যে পরিমাণে ঘাস-পাট জানে, ইহাকে ফাঁকিয়া ঠকা সহজ হইবেনা। কিন্তু এখন রঙ্গরসিকের অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিছু ঘটিবার উপায়ও নাই। অগত্যাসহকারেই আবার তিনি টাকাওয়ালার চেহারার তারিফ সুরু করিলেন —

-আমি তখনই বুঝেছি, এ যে-সে লোক নয়। চেহারা দেখে যাকে নবাবজাদা বলে ভুল হয়, তার এমন এই হাল! তা, এখন কি করবে বল, আপশোষ করে লাভ নেই। যখন যেমন, তখন তেমন চলতেই হবে। আমাদের শাস্ত্রে লক্ষ্মীকে বলে চঞ্চলা। স্থায়ীত্ব চলেছেনই, বদনাম আমাদেরই নেই। অন্যে আমার গরীবখানার যে কাল তোমারে লোলচখানায়। তা, সাবেক কালের ঠাঁকেজমক না থাকলেও সোনাদানা কিছু আছে নিশ্চয়ই!

— শেঠজী, দুঃখের কথা কাকেই বলব, কে বিশ্বাস করবে! ঠাকুর্দার আমলে কত্তাবত্তা ছিলা, কতই দেখা, তাই কিনি। কিন্তু তিনি চক্ষিতে পা দিতে না দিতেই নবাবী-আমল শেষ হয়ে গেল। অন্ন সব ঘড়ানোকদের মত আমাদের ঘরও শূন্য হয়ে গেল। তবু আমাদে কানাদে এত পড়ে রয়েছিল যে আমার আব্বাজান যারা কিশতী আশ মিটিয়ে আমার আদেশ করেছেন। খোল আমারের পাকী তাই বেরুতেন, পেছনে চোপদার চলত। এত করেও আমার জন্য কম রেখে যাননি। বিদেশ করে চলছে এখন এলা চালাচ্ছে হুজুর। কিন্তু আমীরের বেটা আমিরী যেমনে নিয়ে আসে, পরে কি হবে জানে না। কে বেতের না টেনে বিছানা ছাড়তুম না, রাত-রাত ঘুমতো না ইয়েজদ। তারপর এখন এই দশা।

শেঠজী মর্মাহত হইয়া বলিলেন — আল্লা মিঞার দয়া আছে তোমার উপর। এই যে সেদিন অন্ধকার রাতে ইমানবাগীর পথে ছেলেপিলেকে খাওয়াচ্ছ, সে কি কম কথা! তাতেই ত আমিরী আছে যোলা ঠাহরাচ্ছি নামে। আসল কথা হল ইমান। তোমায় চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম, এ একেবারে সাচ্চা হীরা। চোর ঘাঁচড়ের ঘাঁচই আলাদা।

— হাঁ হুজুর, আপনার মেহেরবানিতে ইমান ঠিকই আছে। দশ বছরের ঘুষে দুপয়সা হয়ে যায়, যেদি কিছু না হোক চাউনী কষ্টি ত ফুটে? ওই ঢের। আর অত এজাজ্জালা! নাম নিলেও গুণা হয়, সুরত দেখা ত দূর।

— হাঁ, মিঞা, তোমার হুরত দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

— কি করি হুজুর, এত খেটেও কুলুতে পারিনে। আট আটটী ছেলেমেয়ে, তিন বিবি, তার উপর মা — সকল ত ওই এলা।

— তিন বিবি!

— হাঁ হুজুর, নইলে মান থাকে না। তা ছাড়া দু বিবি ত সাবেক কালের, চাচা আমার ঘরের মেয়ে।

জানেন ও 'ঘর কী দুই পাশে ধরবার'। তাড়াতাড়ি আধসুকে ধরে ছাই হাতে আর একটি ধরেছি।

চেয়ারম্যানের চিত্তে কিঞ্চিৎ আলোড়ন জাগিল। অর্থ ছাড়া অন্য কোন প্রশ্ন তিনি করেন না, তাকে কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে। সেটের ছেলেপিলে নাই, পত্নী আন্তিকালের বস্তিবুড়ীর সহকন্যা। সেই কোন বাল্যকালে পিতা ছুটাইয়া দিয়া দিয়াছিলেন, মুখ বদলাইবার কথা কুলত মনে পড়ে নাই। বহিতে দ্বিতীয়বার একাধিক পত্নী সংগ্রহে কি বাধা। আজকাল ঘর একটা মেয়ে এনের হেলে ছুটানো বটে, কিন্তু সে ত পুষিতে পারে না ধরিয়া।

অকস্মাৎ তাহার খাপোখা চেয়ারের তাড়িক করিয়া বলিলেন — তা মিঞা, তোমার যে চেয়ারা, তাতে যে জেনারালের মেয়েই জোটিত হবে, এ আর আশ্চর্য কি!

এমন যে কবিকল্পা একবার, যে দুনিয়াশুদ্ধ লোককে এক হাটে কিনিয়া সেই হাটে চড়া দামে বিক্রী করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে, তাহারও একটা দুর্বলতা ছিল, যাহাকে বলে—blind spot। সাক্ষাৎ যমদূতের মত চেহারা তার। তাহার চেহারার দুষ্টি একমাত্র তাহার ঘোড়া। সে কিন্তু নিজেকে সাক্ষাৎ মন্মথ ভাবিত। কোন্ দৈবদুর্বিপাকে যদি সেই চেহারায় তাহার এই মরণ জানালীর মনোযান পাইয়াছিলেন, কে জানে! কিন্তু তাল জিনিসকেও বারবার ভাল বলিলে সন্দেহ জাগে। অনেকক্ষণ ভাবিল; এতদিনে একজন পাকা সমজদার মিলিয়াছে। অতটা না হইলে কদর তিনিবে কে? কিন্তু ব্যাটার মতলবখানা কি! এক কথা সব বলিতেছে বটে, কিন্তু কত চোট্টাও ত তোষাণ আওড়ায়।

তবু গভীর সন্দেহ সত্ত্বেও মিঞা ঘোড়া হাত মেলিয়া পড়ন আপ্যায়িতকণ্ঠে হাসিল। তৎক্ষণে সেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার শুরু করিলেন — তা আলা দেবেন মিঞা, কিন্তু ছেলে না। কথায় বলে, বিবি নিজেরে বিবি, বাচ্চাও সেম তিনি, আমার তাদের আহারও। বাসস্থান ঘর।

— না হুজুর, খাবারদাবার বান্দা আমি নই। অল্প টাকাওয়ালা। বলেন ত আলাপ করিয়ে দেব।

— থাক, ওই করতে হবে না। দেব কি আর তোমার মত পরীক্ষে হবে।

— ওই যে বলিলাম না, আপনাদের মত আমীরদের সৌদতে আমার কোন অভাব নেই।

অবশ্যই সে আসে এসে কথা বলে যাই। কিন্তু আগে-পরের কথা পরে, — চেয়ারম্যানের চিত্তসাগরে এই মুহূর্তেই তুফান উঠিল। এতকথা বৃথা বিয়াছে দেখিতেছি, ব্যাটা আমার দেহের দিকে ঠিক নজর দিয়াছে। যাহোক, আর একপ্রস্থ তাহার সহিতের তারিফ করিয়া বলিলেন, আচ্ছা যার মুখ দেখে উঠেছিলাম সে জানে, তোমার মত পরীক্ষের সঙ্গে মোলাকাৎ হল। আমি ত একা টাকার ত্রিসীমানায় যাইনে, ই আতঙ্কেই আমার ভয়। আমাদের শাস্ত্রের বচনের ঘোড়া দেখে একদম হাত ছুরে যাবেন। তা তোমার কথাই আলাদা। জান মিঞা, সহরে যত মেয়ে ওস্ত হয়, তাদের আদ্ধেকের মেলায় হাতের হাতলাকাই আছে।

টাকাওয়ালা বুঝিয়া সেই শুধু বাক্যালাপ বর্ধিত করিয়াই ক্ষেহাই পাইতে চায়। সে মোক বুঝিয়া চেয়ারম্যান চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, এদিকে ত পথ নয়, তুমি গাড়ী ঘুরালে যে!

— হুজুর বড্ড দেরী হয়েছে, পথেই গাড়ী পড়ে। একটোক জল খেয়ে যাব। আপনাকে পৌঁছে দেব ঠিকই। নতুন এলেও মুরাদী গাঁ আমার জানা আছে। আমার বাড়ী ত পাশের এক গাঁয়েই — তবে এ্যাদিন বিদেশে ছিলাম।

শেঠের সংশয় ঘোচেনা, তবু বলিয়া বসিলেন। টাকাওয়ালা বেশ কিছু দূর আসিয়া এক খোলার ঘরের সামনে গাড়ী দাঁড় করাইল।

ডাক দিতেই ভিতর হইতে এক যুবতী বাহির হইয়া আসিল। রং কালো, মাঝারি গোছের চেহারা। যৌবনের জলুষ দেহে একটা ঢেকমাই খেলিতেছে। সে একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজ এখনই ফিরলে যে? মেরেটাকে এই টাকাওয়ালা সঙ্গে আসাইয়া আনিয়াছে। মূলন সহরে আগমনের ইহাই আসল রহস্য।

শেঠের বাক্যস্ফূর্ত্তি ভাব দেখাইয়া জবাব দিল — ফিরব না? দেখ্, দেখি কেমন লোকের পায়ের ধূলো আজ টাকায় পড়েছে। এখন তোর লোকও পড়ুক। নে, ঘাটিয়া পেতে দে, হাওয়া কর দেখি একটু। বাপরম, এই দাত-সকালেই হজুর যেমে উঠেছেন।

দালালী খাটিতেছিলেন বটে, একটু লাল হইয়াও উঠিয়াছিলেন, তবে সে ভিতরের গরমে। তিনি কাঁপা গলায় বলিলেন — না ঝিঙ্কা, বসব না, তুমি শীগগীর নেয়ে নাও। জল খাবে বলছিলে না? আর, আমি না হয় এখানেই নামি। এই নাও তোমার ৪ আনা।

বলিয়া দুআনি বাহির করিলেন। ঝিঙ্কার ধৈর্য্য থাকিল না। দোক্তা দাঁত দেখাইয়া ও দুর্গন্ধ ওঁকাইয়া বলিল — হজুর একটু জিরোন ত, পরসা পরে হবে। আমি আপনার জন্যে মিঠাই নিয়ে আসি।

শেঠ হকচকাইয়া গেলেন। ভূতলাই একটা ভদ্র জবাবও জুটিতেছিল না। তবু বলিলেন — কেন খরচ করছে বাপে মিছিমিছি?

ইতিমধ্যে তাহার ঝঙ্কিতা ঝঙ্কির খাটিয়া বিছাইয়াছে, হাত-পাখা বাহির করিয়াছে। আসিয়া দালাল ফটাকে শেঠের সম্বন্ধে করিয়া বলিল — আহারে হজুর, ভদ্দরলোক মানুষ। মাঁয় কিতনী ভাগ্যমানী হুঁ।

ছেদরাম জীবনে প্রথমবার মূলন এক ভাষার অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার চাইতেও ফরাট ও ভারী। এরদিন তাহা নজর করেন নাই, জানেনও নাই। এখন হঠাৎ বক্ষ তোলপাড় করিতে লাগিল, শরীরের অর্দ্ধেক শোণিত আসিয়া মুখে মাথায় খরস্রোতে বহিতে লাগিল, মাথার ঘুলিটা পর্য্যন্ত যেন ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়াও শেঠজী না নামিয়া পারিলেন না, নামিয়া খাটিয়ায় উপবেশন করিলেন। সেই মহিষবাহিনী মহিলা সবেগে পাখা করিতে আরম্ভ করিল।

টাকাওয়ালা খুসিতে ডগমগ হইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল। কত কষ্ট কাটলাই না সে এই ঠোপে খেলাইয়া তুলিয়াছে। মজা দেখিবার জন্যই সে নানা অছিলায় দেরী করিতেছিল; তাহার মানসিক কাতুকুতু আরও প্রবল হইয়া উঠিল, যখন শেঠ ছেদরাম, এদিক ওদিক তাকাইয়া, কোমরের গেঁজের মুখ হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। বলিলেন— ছেলেপিলেদের জন্য মিঠাই নিয়ে এসো ঝিঙ্কা। এরা কই, কাউকে দেখছিনে ত!

দেখিবেন কোথা হইতে? বর্ত্তমানে ছেলের মধ্যে একের, পিলের মধ্যে একেবারী। সবের কিনি-বাচ্চা ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া লোকটি এখানে আসিয়া আস্তানা গাড়িয়াছে।

একের জবাব দিল — সব মুজুদ হজুর। বড় দেরী করে ওঠে ওরা। আমীরের রক্ত কিনা, খানদানী মেজাজ চাল-চলন এখনও আছে। তা মিঠাই নিয়ে এসে ডেকে তুলব।

একা হাকাইয়া সে মিঠাই আনিবার অছিলায় বাহির হইয়া গেল। মিঠাই আনিলে শেঠ খাইবেন কি খাইবেন না, এই কথাই বোধ হয় ভাবিতেছিলেন,

এবার সময় একেবারে শুভ দিয়া তাহা এক গ্রাস নেবুর রসের সহিত মিশাইয়া চুমুক দিতে করিল। বলিল—তোমা আপনার পেয়েছে নিশ্চয়ই। এটুকু খেয়ে ফেলুন। আর এখানে কেন, ভেতরে বসবেন চলুন।

জল খাইবার কথায় শেঠের চমক ভাঙিল। তাড়তক খেয়াইবেন না কি? উঁহার পায়ে জল পড়িলেই কাজ যায়। সুতরাং ধর্মের তাগাদায় আবার একেবারে চেতন হইয়া উঠিলেন। কি ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলে সমবড়-পাত্রী রক্ষা হইবে না, এই সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত পথে মুসকিল আসান হইয়া গেল। শেঠ ভিতরে আসিয়া বসিয়াছিলেন; তারী খুটির ফাঁকে চমকাইয়া দেখিলেন, সত্যই পুলিশের লোক।

স্বস্তিমাত্রই শেঠের প্রতিক্রিয়া হইল—বং পলায়তি স জীবতি। পুলিশ কেন আসিয়াছে, তাহা তিনি জানেন না, কিন্তু যে-কারণেই আসুক, লালপাগড়ী তো! যে ছুতো-নোতায় উপায়ওয়ালা, অক্লেশে কাহারও খুন করিতে পারে। হয়ত লোকটা কোতোয়ালী আসামী।

শেঠ ঘরি-বাড়ি করিয়া সেই ক্ষুদ্র গলিপথে ছুটিতে লাগিলেন। ঘুরিয়ানা বলিয়া পড়িবার মত হইল। রাস্তার ধারে ধারে নালা আবর্জনা-সঞ্চয়ের জন্য পিপা থাকে, তাহার পাশে কখন কখন ইট পাথর পড়িয়া থাকে। তেমনি এক ইটে হোঁচট খাইয়া শেঠ পড়িয়া গেলেন, পিপার সঙ্গে তাহার চেপ-পিপার চক্কর লাগিয়া শিশি-বোতল ধুতির ফাঁক হইতে কোমরের গেঞ্জিটা ছিঁড়িয়াইয়া পড়িল এবং নর্দমার পাতলা পাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পুলিশ আসিয়া আস্তে ধীরে তাহাকে খাড়া করিল। তাহারা চেতনার চিত্তের খানাতল্লাসী করিতে আসে নাই। একেবারের মামলা আছে, তাই তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে। পথেই তাহার সঙ্গে মোলাকাত হইয়াছিল, তবে চেহারা চিনিতে না পারিয়া টাদাওয়ালা এবারে ধরিয়া দিয়াছে। প্রথমে সেও পুলিসকে লক্ষ্যে করে নাই। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময়, দূর হইতে মোর মোড়ার ভীড় ও লালপাগড়ী দেখিয়া উঁকি হইয়াছে।

পুলিশ চেতনাকে চিনিত। তাহা তামাসা করিয়া, পেটে পিঠে ছুঁচাবার তবলা বাজাইয়া বলিল — শেঠ, এখন তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। আসলকে ধরে' নিয়ে যাব। পরে দরকার হলে তোমারও ডাক পড়বে। তোমাকে অক্লেশে পেলাম কিনা।

চেতনাদের চিত্তে গেঞ্জের শোকে চিরা বসিতেছিল। পেটে পিঠে যে ছুঁচার চোক্ত মারিয়াছে, এত লোকের সামনে যে অপমান হইয়াছে তাহাও যেন উঁহার নিকট তুচ্ছ। মোরা নর্দমা দিয়া কত বলদুত বহিয়া যায়, তাহাতে নামিয়া গেঞ্জের সন্ধান করিলে লোক আরও হাসিবে। কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া শেঠ নর্দমায় নামিলেন। খোলাসের মধ্যে ঠিক কতগুলা ঠাহর ছিল না। তাই তিন চারিশ হয় পরিমিত স্থান হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেই পাঁয়ত্ত যখন গেঞ্জে উদ্ধার করিলেন, তখনকে গেঞ্জের ভিতরের কাজলের নোট মোরা জলে ভিজিয়া গোবর হইয়াছে। অতি সন্তর্পণে বাহির করিতে গিয়াও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। দশ টাকার দুটি খানা নোট ছিল। রুপার টাকা যাহা ছুই একটি ছিল, কওয়ায়ম পুলিশ তাহা বরখাস্ত করিল।

কবির দুখের সাথি কবির দুখের ভাগী,
অমৃতে উঠিল ফলাফল।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে

[এই বক্তৃতাটি দুই বৎসর পূর্বে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান-সভার সভাপতির অভিভাষণ-রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। সে দিনের উৎসবে ও আজিকার উৎসবে দেশের অবস্থার বিশ্ব দিয়া কোনরূপ পার্থক্যের কারণ নাই — বরং অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তখনও দেশ স্বাধীন হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা সর্বজনীন উৎসবে দেশবাসীর উৎসাহ ও আনন্দ বিগুণ বা চতুর্গুণ হওয়া উচিত মনে করেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত নহি; কারণ, তাহাতে রাষ্ট্রের অমঙ্গলকামনা হইতে, এমন প্রার্থনা করিবার সুযোগ-সৌভাগ্য আর কোনও জাতির (যথা, বিহারী প্রভৃতির) ঘটে নাই। বাঙালীর তাহা ঘটে নাই? তাই দুই বৎসর পূর্বে বাঙালীর উৎসব-করার লক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলাম, আজ আরও আর্তকণ্ঠে তাহাই বলিতেছি। — যঃ সঃ]

আজিকার এই অনুষ্ঠান আমাদের একটি জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে — সাহিত্যিক পর্যায়ের হিসাবেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। এ সঙ্কল্প প্রথম আপনারা করিয়াছেন, আজ উহার সমাধা হইবে। আমি ইহার আরম্ভ বা আদি-অন্তের সহিত যুক্ত ছিলাম না, কাজেই উৎসবের প্রকৃত রূপটির বিষয়ে কিছুই জানিনা; শেষ বক্তিবাচনের ভার পড়িয়াছে আমার উপরে—আজ আমাকে এই উপলক্ষে কিছু বলিতে হইবে। কিন্তু আমার বক্তব্য আপনাদের প্রীতিকর হইবে না। না হইলেও আশা করি আমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে আপনারা সন্দেহ করিবেন না।

রবীন্দ্র-জন্মদিন উপলক্ষে এ জন্মদিন অন্যান্য উৎসব সম্পন্ন করিয়া আজ আপনারা কিসের করিয়া সাহিত্য-সভার আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্য-সভা ঠিক বারোয়ারী পূজা বা বিদ্যুৎ-সম্মিলনের মত সামাজিক ব্যাপার নয়। আমাদের সাহিত্যিক সভাগুলি প্রায় সামাজিক, যা সেইরূপ কোন উৎসবের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-পূজা উপলক্ষে তাহা যতই শোভন ও প্রয়োজনীয় হউক, সেখানেও সাহিত্য মুখ্য না হইয়া নানাবিধ জনবিনোদন আয়োজনের তালিকাই বেশির ভাগ স্থান অধিকার করে। যাঁহারা এইরূপ সভার প্রস্তাবক বা অনুরোধে উপস্থিত হন তাঁহারা প্রায়ই সাহিত্য-সেবক বা সাহিত্য-প্রেমিক নহেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। অতএব এইরূপ উৎসব-সাহিত্য-সভা সাহিত্যের পক্ষে প্রহসনেই পর্যবসিত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যাঁহারা এইরূপ সভার কর্তাব্যক্তি হইয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত স্পর্শ বা শ্রোতৃবর্গের মনের যোগ নাই; তথায় যে সমস্ত বক্তৃতা-পাঠ হইয়া থাকে তাহা পাঠকের আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কোন সুফল প্রসব করে না। এ জ্ঞান অল্প-স্বল্পীদের সর্বক্ষণ থাকে, তাই কোনমতে ঐ শাস্ত্র-কর্মপদ্ধতিটা সারিয়া লইয়া, ঠাকুরের কাহিনীটা শেষ করিয়াই—আমোদপ্রমোদ-বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হয়; এই "শিষ্টাচারবিরোধিনী" সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষেও সবচেয়ে প্রশস্ত ও ফলিষ্ণুর বিষয়। গলায় মালা পরিয়া যিনি সভাপতির উচ্চাসন অলঙ্কৃত করেন তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয় অভিনেতার বাজার-খ্যাতির মত হইলেই যথেষ্ট। তিনি যদি প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়া, চা-পান-বিলাসীর মত, বাংলার ভদ্র-সমিক মহিলাদের সাহিত্য-পিপাসা মিটাইয়া থাকেন, তবেসাহিত্যসভার সভাপতি হইবার যোগ্যতা তাঁহারই সর্বাধিক। সে সৌভাগ্যও অনেক সভার ঘটেনা; না ঘটিবার

কারণ, প্রায়ই পত্রিকা-অনুসারে ঐরূপ সভার 'রেজল্যুশ্যন' পড়িয়া যায়; তখন বাজারে সন্দেশের মত, সভায় সভাপতিও বড় আক্রা হইয়া উঠে — কোন কোন অঞ্চলের দুটী ব্যক্তি সাহিত্যসভার পতি হইয়া বসেন, অর্থাৎ, তখন সন্দেশের স্থানে বড়বাজারের মাস্তা-মোড়া মিঠাই নৈবেদ্যের চূড়ায় আরোহণ করে! অতঃপর সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটী অনেক পুরোভাগে বসিয়া — যাহার যেমন দৌড় সেই অনুপাতে — মুচ্-কিহাসিয়া, তাম্বুলরঞ্জিতাধরী অনেকের দুই আকর্ণ করিতে পারিয়া কৃতার্থ বোধ করেন: বিবাহ-সভায় বরের যেমন অবস্থা হয়, সেইরূপ তাঁহারও অঙ্গে ঘেম, রোমাঞ্চ, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমারও এ অবস্থা হইয়াছে — স্ত্রী-মহাশৌচের যখন এইরূপ ধুম-ধড়াক্কা হইয়া থাকে, তখন আমার মত পাইক-পেয়াদার অবস্থা যে কিরূপ মহারাজের নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন।

কিন্তু অদ্য আমি সাহিত্য-সভার কথাই বলিব না — আমি জানি, আজিকার এ সভা একটা উৎসবেরই আনুষঙ্গিক; ইহাও জানি যে, আজিকার আলাপ-আলোচনায় সেই উৎসবের সুরটী না পাইলে তাহা শোভন হইবে না! রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে আনন্দ ছাড়া আর কি করিবার আছে? কিন্তু তথাপি আমার মন সুস্থ নয়, এত বড় উৎসবে যোগদান করিতেও আজ প্রাণে তেমনতর প্রেরণা পাইতেছি না। এরূপ অনুষ্ঠানের আন্তরিকতা ও আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগ যদি না থাকে তবে আমি তাহাকে একটা বড় অনাচার মনে করিব। কিন্তু আজিকার দিনে সেই আনন্দ যে সত্যই অসম্ভবনীয় হইয়া উঠিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের মত ধারোয়া এ জাতির গুরু ও উপদেষ্টা তাঁহাদিগকে একাধিক উপলক্ষে স্মরণ করিয়া হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার আবশ্যকতা আছে — তাহাতে নিজেদেরই কল্যাণ হয়; বিশেষতঃ বাঙালীর মত এমন বিস্মৃতিপরায়ণ অকৃতজ্ঞ জাতি আর নাই। এ জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান শাস্ত্রানুশাসনের মতই পালনীয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এ জাতির প্রাণ যেরূপ ভয়াবহ রূপে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বাঙালীমাত্রের ব্যাকুল হইবার কথা; সে ব্যাকুলতা এমনই যে, তাহাতে আর কোন চিন্তার অবকাশই থাকিতে পারে না; যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, আমরা একেবারে ভাবনা-চেতনাহীন পশুর অবস্থায় পৌঁছিয়াছি। দেশে যে দুর্ভিক্ষ আর নৈমিত্তিক নয়, একেবারে নিত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই ত' এ জাতির নিশ্চিন্ত-ভঙ্গ রচনা করিয়াছে; এই দুর্ভিক্ষের অবস্থা সে অনেকদিন হইতেই লক্ষ করিতেছে, এখনে তাহা সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে; এমন অবস্থা জাতের আর কোন দেশে হয় নাই, কেন হয় নাই তাহা ভাবিয়া পাই নাই। অন্য তাহার যে একটা করাল আক্রমণ আমরা দেখিয়াছি -- যে আক্রমণ কেবল এই বাংলার উপরেই হইয়াছে — তাহার কারণগুলা এতই স্পষ্ট ও এতই নৈসর্গিকতাপূর্ণ যে মনে করিলেও অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হয়। এখন সেই দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হইয়াছে, এবং যদি বা কোনকালে তাহা দূরীভূত হয়, তাহার পূর্ব্বে এ জাতি হয় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, নয় পঞ্চজাতির উদ্ভিষ্টভোজী পশু-কুকুরে পরিণত হইবে। এই অনাহার, অর্দ্ধাহার — এবং যাহাতাহা অখাদ্য খাইয়া জীবনধারণ এখনে গতানুগতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশুরা আর মাতৃস্তন্য পায় না; যুবারা বলোচিত পোষণের অভাবে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইতেছে — মহামারী এখন একটা অতিপরিচিত বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কেবল সহরবাসী দুই-দশজন সৌভাগ্যবান—যাহারা পরের সর্ব্বনাশেই (পলিটিক্স্ এসাদাৎ) নিজেদের পৌষমাস করিয়া লইয়াছে, এবং তাহাদের সেই সৌভাগ্য বজায় রাখিবার জন্য

সংবর্ধনাকে প্রণাম নিবেদন করিতেছে — সেই মৃত্যুকেই মহাজীবন-লাভের লক্ষণ বলিয়া সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিতেছে — সেই কর্মহীন নৃশংস আত্মসুখপরায়ণ মানুষগুলা দ্বারা, আর দশকে যে-ভাবে নিরাপদ করিতেছে তাহা ভাবিলে ভয়ে অন্ধকার হইয়া যায়। সবচেয়ে দুঃখের ও লজ্জার বিষয় এই যে, সমাজের প্রতি, জাতি-সাধারণের প্রতি কোন সমর্থ বাঙালীর যেন কোন সহানুভূতি আর নাই, চেতনাই, ঐ শ্রেণীর দুর্ভাগ্যের অনেকেও সমাজ-চেতনা হারাইয়াছে, তাহারাও মনের পশুর মত একার জীবন যাপন করে — মনুষ্যোচিত পরানুরাগ একেবারে লোপ পাইয়াছে; ইহাও বোধ হয় এই দেশ-কালের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ! যাহারা ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির লোভে জাতির সর্বনাশ করিতেছে — তাহারা তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, পদ ও প্রতিপ্রশ্রুতিকেই সেই কাজে লাগাইয়াছে, এবং তাহারাই সমাজে নীতি-জ্ঞান দাবী করে। এই যে অবস্থা ইহার মত ভয়ানক আর কিছু হইতে পারে?

পৃথিবীর ইতিহাসে, কোন সভ্যজাতির মধ্যে যে ঘটনা কখনো ঘটিতে শোনা যায় নাই তাহা আমাদের দেশে ঘটিয়া গেল — আমাদের আর কোন দেশে নয়, এই বাংলাদেশে। সেই লক্ষ লক্ষ অনাহার-ক্লিষ্ট নর-নারীর — শিশু ও বৃদ্ধের — অন্তিম নিশ্বাস বাংলার আকাশে বাতাসে এখনও পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। পূর্বে বলিয়াছি, তাহার কারণ অনেক, এবং সুস্পষ্ট, কিন্তু তথাপি সেই মহাপাপ আমরা নিশ্চল ভাবে ঘটিতে দেখিয়াছি ও ঘটিতে দিয়াছি। জাতির দিক হইতে চেষ্টামাত্রও করিবার তাহা কি করিয়াছিলাম? কলিকাতা রাজধানীতে এবং দেশের ইতস্ততঃ বহুস্থানে সমর্থ 'বড় মানুষ' কি ছিল না, যাহারা সেই পিশাচ-প্রসাদিত জনশন-মৃত্যু কিয়ৎ-পরিমাণেও নিবারণ করিতে পারিত? নিবারণ দূরে-থাক্, তাহারাই কি, অনেকক্ষেত্রে, সেই মৃত্যুকে ইচ্ছন্‌পুই করে নাই? তাহারাও এই দেশেরই মানুষ — সমাজের একটা এমন স্থান তাহারা স্বভাবতঃই অধিকার করিয়া আছে যে, ঐরূপ আপদ্-কালে সমগ্রজাতির দায় তাহাদেরই দায় হইয়া উঠিবার কথা; সে দায় তাহারা স্বীকার করে নাই, অথচ এখনও তাহারাই সমাজের সেরা সেরা বুদ্ধি করিতেছে। তবু তাহাদের সেই পাপ সমস্ত সমাজকে বহন করিতে হইবে। সে ঘটনা আমরা অতিশয় বিস্মৃত হইতে পারি, সে লজ্জাও আমাদের না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমি আপনাদিগকে নিঃসংশয়ে এবং তীব্র স্বরে বলিতেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ জাতিকে করিতেই হইবে। সেদিন যাহাদের কঙ্কাল-সার ক্ষীণকণ্ঠের যে অন্ন-ভিক্ষা আমরা পথে ও প্রান্তরে দুর্ভাগ্যদের সহিত নীরব হইতে শিখিছি, আজ তাহাই সমাজের আকাশ স্তরে পুঞ্জ-প্রাচীরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে সুরু করিয়াছে — সে আর্ত-চীৎকার হয়তো বাহির হইতে শোনা যাইবে না, হয়তো আপনিই নীরব হইয়া যাইবে। সমাজ যদি জীবিত থাকিত, যদি মানুষে মানুষে সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকিত; যদি ঘরে-ঘরে একা বসিয়া সংবাদপত্র-প্রচারিত বেদবাক্য-পাঠ এবং তাহাদেরই, সৌজন্য, মনুষ্যত্ব ও ধর্মবোধের সুপথ্য সেবন করিয়া প্রতিবেশীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ না করিতাম — তবে হয়তো আমাদের লাঞ্ছিত অবস্থা-বোধ জন্মিত, একটা অতিশয় অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যে বাস করিয়া আমরা সর্বনাশের প্রত্যক্ষ ঘনঘটা উপেক্ষা করিয়া, এমন নির্লজ্জভাবে পরিচয় দিতাম না, আমরা কোন উৎসবই করিতাম না।

আমি এতক্ষণ আপনাদের নিকটে যাহা বলিলাম, তাহা উৎসবে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে শোনাইবার কথা নয়; কিন্তু এ দুঃখ এ লজ্জা শুধুই আপনাদের নয়, সমগ্র বাঙালীজাতির; আমি আপনাদিগকেই অপরাধী করিতেছি না, — অপরাধ যদি ব্যক্তিগত

হয়, তবে সে অপরাধ কি আমাদেরও নয়? আমি কেবল আপনাদের মুখপাত্র হইয়া, আপনাদেরই অন্তরের কথা আপনাদিগকে শুনাইতেছি। আমার এই কথা যদি আপনাদেরও অন্তরের কথা না হয়, তবে আমাকেও ধিক! আজ এই উৎসব-উপলক্ষে আপনাদের সম্মুখীন হইয়া আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝিয়া পাইতেছি না — তাহা এই যে, আমরা বড় ছোট হইয়া গিয়াছি। কোন কিছুর প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধাবোধ আর নাই। আমরা যাহা করি তাহা নিতান্তই একটা হুজুগ, একটা রঙ্গ, বা একপ্রকার ছায়াভঙ্গীর মত। আজ এ জাতির জীবনে এমন দিন আসিয়াছে যখন সাহিত্য বা কলাবিদ্যা, পরমুখ বা ভাববিলাস, সকলই তিক্ত হইয়া উঠিবার কথা; কারণ, ক্ষুধা ক্ষতি-ক্ষুণ্ণ নয়, প্রাণটাও যাইতে বসিয়াছে। তবে যখন আকাশ ভাঙে, যখন আকস্মিক বন্যার ভয়োদ্ধামে অন্তরে গর্জন করিতে থাকে, যখন প্রতিপক্ষের অনাচারের বিভীষিকা কল্পলোকে শুনিয়া উঠে, তখন হঠাৎ করিয়া উৎসব করে কোন্ বাঙালী? বাংলাদেশে আজ আর কেহই পৃথক নয় — সকলেই নিরন্নতার দুঃখ-দুর্দশার কোলঘেঁষা হইয়াছি। নিত্যের ইতর নাই; আজ বাংলাদেশে, প্রাণ দিয়া কোনো উৎসবে যোগ দিতে পারে এমন বাঙালী কয়জন আছে? যদি এমন কেহ থাকে যে পৃথকভাবে অযোধের আয়োজন করে — সেই একান্তবঞ্চিতা তাহা করে, তবে তাহার সেই অনুষ্ঠান পূজা-অনুষ্ঠান নহে, কারণ "বুভুক্ষিতৈ র্ন ব্যাকরণং পঠ্যতে ন পচ্যতে" — যে যা যাহারা আপনার জন্য অন্ন পাক করে — সে-অন্ন পাপ-অন্ন, তাহার কোনও পাপ-ভোজন, এই শাস্ত্রবাক্য আমাদের পক্ষে আজ বড় সত্য হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত মহাপুরুষকে আমরা যে অর্ঘ্য নিবেদন করি তাহা কি শুধুই রবীন্দ্রনাথ বা আমাদের ব্যক্তিগত কারণে? না — সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে? সেই জাতি আজ দুয়ার আরও বন্ধ করিয়া মুহ্যমান; জাতির সে অবস্থাও যদি আমরা বুঝিতে না পারি, তবে রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই বা কি করিব? তিনিও আর বর্ষিবেন?

তাই বলিতেছিলাম, আজ আর কোন উৎসবই আমাদের সাজে না। জানি, আমরা অশ্রুর ভাষা প্রথম জানি — একটুতেই হাসি, একটুতেই কাঁদি। মন হাসি নয় কান্না — দুইয়ের একটার নিরন্তর সুযোগ আমাদের জীবনে চাই। অতি দুঃখের দিনেও আমরা কাঁদিবার ছলে হাসি, তখন সে হাসিও কান্না ছাড়া আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আজ যে উৎসব করিতেছি তাহাতেও হাসির চেয়ে কান্নার ভাগই বেশি হওয়া উচিত। তথাপি আজিকার মত দুর্দিন আমাদের জীবনে কখনো আসে নাই। আজ যদি হাসি ও কান্না দুইকে স্তম্ভিত করিয়া, আমরা এই শ্মশানে অমানিশার নিবিড় নীরন্ধ্র অন্ধকারকেই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই অন্ধকারে চিতানলকেও ডুবিয়া ফেলিতে না পারি,—যদি সেই অন্ধকারে নগ্নাসনে বসিয়া সেই এক ঘর জল করিতে না পারি, যাহাতে মৃত্যুও ভয় পায়, এবং আসনতলী সেই সব আমাদের করুণ কপালপাত্র হইতে আসব পান করিবার জন্য তাহার গ্রীবা উত্তোলন না করে, — তবে আমাদের বাঁচিবার আশা কোথায়? এখন এ দেশে পুলিসা নাই, পলস নাই; শাসনীয়া নাই, পৌরপার্ষদ নাই; যাহা নাই তাহার বিধা অক্ষিয় কেন? এ কথা যে ভোলেনা সে বাংলাদেশে বাস করে না, সে বাঙালী নয়।

আমি আজিকার এই উৎসবের কথাই বলিতেছি না, আমি বলিতেছি বাঙালীর এখনও এই আমোদ-উৎসব-প্রবণতার কথা। ফাঁসি যাইবার পূর্বে অভাগাকে তাহার শেষ সাধ মিটাইতে বলা যেমন একটা নিরাশ্রয় দয়ার কাজ, তেমনই, বাঙালীকে তা যায় এই অবস্থায় যাহারা উৎসবে আহ্বান করে তাহারাও সেইরূপ দয়ালু। বাংলাদেশের উৎসবশালাগুলিতে

এখনও লোক হয় না, — তাহাতে মনে হয়, বুঝি মৃত্যুপথযাত্রীদের এইরূপ প্রমোদনিশাযাপই স্বাভাবিক। উপলক্ষ যেমনই হোক, আজ এদেশে উৎসবের দীপমালা নিতান্তই বিরল ও কৃত্রিম; জাতির এতবড় অন্তর্লোকের দিনে বৈষয়িক অন্ধকারও নিবিড়।

আশা করি, আমার বক্তব্য আপনাদের তৃপ্তিকর না হইলেও আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আপনাদের এই অনুষ্ঠানের আমি নিন্দা করিতেছি না; হয় তো আপনারা যে পদ্ধতিতে ইহা পালন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক, তাহাতে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার অভাব হয় নাই। আমি সাধারণভাবেই আমার কথাগুলি বলিয়াছি, যদি তাহা বিষাদ না করে, তাহার মত আনন্দ আমার কাছে আর কিছুই নাই। আপনারা যেন মনে না করেন যে, আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাহীন — রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়া ত দূরের কথা, আমার ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ আমার গুরু, এ বাণী বোধ হয় প্রকাশ্যেও আমি ঘোষিত করিতে পারি; সেই গুরুকে অস্বীকার করার মত মহাপাতক যে আর নাই! আমাদের সঙ্গে আমাদের জীবনে আমরা রবীন্দ্রনাথকে যে-ভাবে পাইয়াছিলাম সেভাবে আজিকার তরুণেরা পায় নাই — পাওয়া সম্ভব নয়; পাইলে বুঝিতে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের চক্ষে কি স্বপ্ন, এবং অন্ধে কি মণিহার তুলাইয়া দিয়াছিলেন-! রবীন্দ্রনাথের সেই রূপও তাহারা দেখে নাই, সেই কণ্ঠও শোনে নাই; যাহারা দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে তাহাদের মত ভাগ্যবান্ কে? রবির উদয় এবং অস্ত দুই-ই এ দেশে হইয়া গিয়াছে — এখন ঘোর তমিস্রা যামিনী। আমি জানি, আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন! না, তিনি পুণ্যাত্মা, তাই সময় থাকিতেই, অথবা কাল-রাত্রির প্রহর আরম্ভ হইতেই, তিনি এই অভিশপ্ত দেশ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজিও বাঁচিয়া থাকিলে আমরা তাঁহাকে আর কোনক্রমে বাঁচাইতে পারিতাম না; তাঁহার সেই বিশ্বদৃষ্টিবলে তিনি হয়তো জানিয়াছিলেন, এ জাতির আর ভরসা নাই — ইহার ধর্ম গিয়াছে, আত্ম সম্মান গিয়াছে, মস্তিষ্কে কিছু নাই, প্রাণের চেতনাও অসাড়। আজ যাহারা দিকে দিকে তাঁহার জন্মোৎসব করিতেছে, তাহাদের সেই উৎসবের মূলে যাহা আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি নিশ্চয় শঙ্কাহত হইতেন। এখনও এদেশে এমন মানুষ আছে যাহারা এই উপলক্ষে, তাঁহার এবং বাংলাসাহিত্যের নামে, আত্মপ্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছে। যখন দেশের বাতাসে পচার জলকণা নাই, মানুষের চোখের তলও জমাট হইয়া উঠিতেছে, তখন সেই পিপাসার্ত জনমণ্ডলীকে যাহারা নাচ-গানের প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে চায়, তাহারা শুধু দেশের মানুষই নয় — উচ্ছিষ্টের সংসর্গের প্রতিনিধি — তাহারা, কবি ও সাহিত্যিক! এইরূপ একটি সাহিত্যিক সমিতির অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-সপ্তাহের কার্যসূচী আমি দেখিয়াছি; তাহাতে সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ের যে ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয়, ইঁহারা বাংলাদেশের অধিবাসী নহেন, এমন কি মর্ত্যভূমির কেহ নহেন, — স্বর্গের কোন এক পল্লী হইতে যাদুমন্ত্র লইয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেশ মরিতে বসিয়াছে, হয়তো আর অল্পকালেই মহাশ্মশানের হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হইবে; — হউক, তথাপি আমোদ চাই, তাহার উপলক্ষ্যেরও অভাব নাই! রবীন্দ্রনাথ নাই, তাঁহার নামটা আছে ত? সেই নামটাকেই ইহারা কত প্রকারে কাজে লাগাইতেছে — আত্মপ্রচার, বৈষয়িক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা, আমোদ-প্রমোদ — কোনটারই কম নয়।

আমি জানি, আমার এই কথাগুলা এতই কঠিন ও নির্মমভাবে সত্য যে, প্রাণ তাহাতে সায় দিতে বাধা হইলেও, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, এমন কি, বাহিরে স্বীকার করিতেও বাধা কারণে বাধে।

বাংলার একটা হেয়ালী প্রচলিত আছে — "যে কাঁদে সে কি চুল বাঁধে না," আপনারাও বলিবেন, মানুষের তথা সমাজের জীবনে যত দুঃখ-দৈন্যই থাকুক, একটু আমোদ-আহ্লাদের অবকাশ থাকা চাই বই কি। কিন্তু এ যুক্তি দুর্বলের যুক্তি, কুপথালোভীর যুক্তি। আজ আমাদের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা আদৌ স্বাভাবিক নয়; এ অবস্থায় মানুষকে বাঁচিতে হইলে, তাহার সকল শক্তি, সকল বুদ্ধি ও ভাবনা-চিন্তাকে একমুখী করিয়া একটি অতি-কঠিন ব্রত পালন করিতে হইবে; ব্রতধারীর পক্ষে ব্রতের বহির্ভূত সকল মিলনই নিষিদ্ধ। মানুষকে কোন সৎকার্যে বা উচ্চ আদর্শে প্রবৃদ্ধ করিবার অনুরোধে এইরূপ বাচ-খানের অনুষ্ঠানও একটা প্রশংসনীয় রীতি বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে — একটা তথাকথিত সাহিত্য-রসের মোহে নর-নারীকে প্রেমপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে অভিনব কলাকৌশলের বাহুল্য হইতেছে, তাহাতে ঐ দুর্বলতার প্রশ্রয়দাতা এবং সমর্থকেরা দুষ্ট হইতেছে — সে কলার অভিপ্রায় উচ্চাঙ্গের। ধর্মসঙ্গীতের ন্যায় এবং সাহিত্যিক রসানুভূতি একযোগে দিবা যাইবার কথা আছে! কিন্তু ইহারা যে এখন প্রশ্রয় পাইতেছে তাহার জন্য দায়ী কাহারা? আপনাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলি।

আমি সকলই দেখিতেছি — দেশ দুর্দিনের এই ঘনায়মান অন্ধকারে আমি বড়ই আশঙ্কা বোধ করিতেছি। আমি, এ আশঙ্কা ভিতরে ভিতরে সকলেই বোধ করিতেছে, কেবল বিদ্যা আমার ও সাধনার বিশ্বাস-বাটিকে কোনরকমে তাহা ঘুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে! কিন্তু আমি যে কোন সান্ত্বনা, কোন আশ্বাস, কোন অনন্যমোহন ভরসা-বাক্যে কিছুমাত্র শান্তি পাইতেছি না, — বড় একা বড় দুশ্চিন্তা ভোগ করিতেছি! রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলিব না, সেখানেও বাঙালীর উপরে বাঙালীরই ধারাবাহীর চুড়ান্ত চলিতেছে — বাংলার 'নেতা'রা বাঙালীকে লইয়া, বাঙালিত্ব বা বলদৃপ্ত মানের লোভে জুয়া খেলিতেছেন। আজ রবীন্দ্র-জন্মতিথির এই বজ্রমন্ত্রে আপনাদের বিদিত করিতে আমি যদি আমার বেদনাতেই আহুতি দিয়া থাকি, তবে সেজন্য আপনারা উদ্বিগ্ন হইবেন না — আপনাদের বক্ষ পশু হইবে না। কবি, যে মহাপুরুষের নামে আপনারা এই সভা করিতেছেন, তাঁহাকে আপনারা যদি বুঝিয়া থাকেন — অন্ধ ভাবাবেগ ভক্তির দ্বারা নয়, যদি মানসিক প্রজ্ঞার সহিত তাঁহার গুণনাম কীর্তন করাই আপনাদের বাসনা হইয়া থাকে, তবে বিশ্বস্ত জানিবেন, তিনি আমার আজিকার এই কঠিন বাক্য-স্তম্ভিক অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতেছেন; তাঁহার মত পুরুষ কোন অনুষ্ঠানেই প্রীতিলাভ করিতে পারেন না — যাহাতে প্রাণের সত্তা নাই। তাই আমি সেই শুভ-বুদ্ধিকে আমার মানস-নেত্রের সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতেই সমগ্র জাতির জন্য সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রবাণী প্রার্থনা করিব, যাহাতে আমার এই অবসাদ দূর হয়, এবং তাহাই উচ্চারণ করিয়া এ-সভার উদ্বোধন বা সমাপন করিব — আপনারাও মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিয়া মহাকবিকে প্রণাম করুন। —

ওরে ভাই, তার নিন্দা তব তুমি ? বাধা কর নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহ্নিরূপ ধূমে যদি' বাহুড়ায়ে আনিবে আমায়,—
জীবন জীবন্তপুর, প্রবলের উদ্ধত আঘাত
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
ধনিকের নিত্য চিত্তক্ষোভ ..
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঘটিবার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

ওরে যাত্রী
দূরের পথের সূত্র সেই তোর বাঁশী ;
　　ওরের মঙ্গল-শঙ্খ রয়ে তোর তরে,
　　রয়ে যে সন্ধ্যার দীপালোক,
　　রয়ে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
　　ঝঞ্ঝাঝরাজির ঝঞ্ঝনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে ভয়স্পর্শ সূচনা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।···
সে ত' নয়ে সুখ, ওরে, সে নয়ে বিশ্রাম,
　　নয়ে শান্তি, নয়ে সে আরাম।
চলা তোরে দিবে ডাকা,
　　ঘরে ঘরে পাবি হানা,
এই তব নব-বৎসরের আশীর্বাদ,
　　এই তোর রুদ্রের প্রসাদ!
　　ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঝঞ্ঝাকাঁ, বিদ্যুল্লতা, অনন্তী তোমার ঝঞ্ঝাত্রী।
　　পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ভার যত
　　ওই ফেলে গেল, ওরে যাত্রী!
　　ওরেরে নিঠুর,
　　তোদের দ্বারের বজ্র দূর,
　　তোদের ঘরের পাত্রে ভুর!
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
　　তবু তার পাণি ;—

ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তা'র দীপ্ত বাণী!
ওরে যাত্রী
ফেলে ফেলে, ধাক ফেলে পুরাতন রাত্রি!

কল্পনাধারায় কাব্য ক'রে চোখের জলে আঁজল ভরি —
আত্মা যে তা'র মিটাই ক্ষুধা, আমরা যে তা'র পিয়াস হরি।
মরম উজাস প্রণাম ক'রে — শব হ'রে এই শব-সাধনা।
নিজের সুখেই আগুন দিয়ে চিতার ধোঁয়ায় কাজল পরি।

* * *

সুখের সোহাগ পায়ের যোগ্য, দুখের মেশায় ঘুম লেগেছে ;
আলোর আশা আর কতদিনে, অন্ধকারে ঘুম লেগেছে!
নক্ষ-বরষ সুখ যে হাসে — কোথায় আছে তেমন হাসি?
শিবের চেয়ে শবের শোভা!— শিব যে হেথায় মূর্ছা গেছে!

— 'বিজয়ী'

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া খাঁটি কারণসহ বিবৃত করা হইবে—যে-সব সহৃদয়ের রসিকসঙ্ঘে উপস্থিত করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাভাষার আবহমান ঘটে। এদেশের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদলের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সম্যক্‌রূপ পরিচয় নাই। 'রূপদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে বর্ণ-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

(১)

"ছোটে যদি ছোটে একটি পয়সা
খাস কিনিয়ো খুশার লাগি,
দুটি যদি ছোটে তবে আধসের
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।

বাজারে বিকায় ফল তরুল —
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
সুখ প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল —
দুনিয়ায় যাহে সেই তো সুধা।"

(২)

অশোক

হে অশোক, কোন্ রক্তাচরণ-চুম্বনে
অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া হ'লি লালে লাল !
কোন্ মেলে-পূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্, প্রকৃতি-দুলাল ?
কোন্ চির-সধবার ব্রত-উদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দূর-বরণ !
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
একরাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন !
মৃষা চেষ্টা ! — হায় ! এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে সাক্ষিময় — তরু জীব-প্রাণী !
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে
তবুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !
শৈশবের আবছায়ে পিতর 'মেহালা', —
কেমনি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা !

---

(৩)

চম্পা

আষাঢ়ে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশাসে,
বিরহ যখন বিশ্ব নিদাঘ গ্রীষ্মের পরানেত ;
রুদ্র তপস্যায় ফলে আম-জামে আখেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল — সাহসিকা অসময়ের ব্রত ।

ঘনালী শোভা-স্নিগ্ধ বর্ষারি' উঠিল একবার,
বারেক বিরহ ভুলে সোনা মেঘ ক্লান্ত সুন্দর ;
অন্ধ-রজনিকা-প্রান্তে মেলি' নয়নের সুষুমার
দেখিলাম অসময়, — শূন্য, শুষ্ক, বিরহন, ধূসর ।

তবু এনু বাহিরিয়া — বিষাদের সুরে বেণুখান,
চম্পা আমি, — ধরতাপে আমি তবু ঝরিয়া না পড়ি' ;
উগ্র যত নদ রৌদ্র, — যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান, —
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা' সহজে পান করি ।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ কর ধরি ;
মূর্ছে মেঘ, যে যে ঘন, — মুহুর্মুহু করি অনুভব ।
সূর্য্যের বিভূতি তবু দাবদগ্ধ দিতেছে তবু ভরি ;
দিনান্তে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্য্যের গৌরব !

---

(৪)

ডুঁই চাঁপা (১)

১

হঠাৎ ধরার বক্ষ চিরি
কে গো তুমি এলে ধেয়ে !
নয়ন আমার ঝুকিয়ে গেলো !
কোন্ চাকিনীর যাদুর বলে
ঘুমিয়ে ছিলে অতল তলে,
পরশে তার জীবন-কাঠি
রাজকুমারীর চেতন হলো !

২

দলিল থেকে উঠলো যেন
মুখটী ছুঁয়ে বরণ-বাণী,
শীত থেকে আজ তুললে মাথা
কোন্ মালিনীর পুটিখানি !
বর্ষা-বাণীর মিষ্টি হাসি
জমাট হয়ে জমলো আসি,
তুলোট-পুঁথির মলাট তারি
শকুন্তলা বেরিয়ে এলো !

(৫)

ডুঁই-চাঁপা (২)

দিনের আলোর লাগ্‌লে রে নীল তন্দ্রা-রেখা !
নিবিড় সুখে কি কৌতুকে যাদু দে কেরা !
হাসিয়ে রবিরশ্মি দোঁহা
পুবে হাওয়ায় বইল সোঁতা, —
আজ পাতাল-পুরীর নাগিনী ওই বাইরে একা !

কৌতূহলী কেকাধ্বনি পুরি ঘরে ! —
ফুটল সে ডুঁই-চাঁপা হ'য়ে মাটির পরে !
বিস্ময়েরি ঘোর্ লেগেছে, —
বিনা-ভাষেই ভুল ভেঙেছে ! —
নূতন গায়ের গোপন ভুলে কী ধন্দরে !

শীতল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি,
মাটির কোলে পাপ্‌ড়ি মেলে ডুঁই-চাঁপাটি !
মগ্ন ছিল পাতাল-তলে
জাগ্‌ল সে আজ কিসের ছলে !
বুঝি ঠেকল মাথায় পুটিমায়ের জমাট কাঁথা !

দিনের আলোয় লাগ্‌ছে আজি তন্দ্রা চোখে,
নিবিড় নীলে ডুবিয়ে দিল ধরণীলোকে !
পাতাল-পুরীর মুক্ত হ'য়ে
অমৃত কে যায় বোয়ে ! —
এলো জন্ম-মরণ মুক্ত ক'রে ফুটল ও কে ।

আজ্‌কে খালি ঝিরে-পাওয়ার বইছে হাওয়া !
নেই কিছু নেই চিরতরেই হারিয়ে-যাওয়া !
যারানো ফুল ফুটছে ঝিরে
শীতল মাটির আঁচল ঘিরে ।
ওই মূলের ঘরে মিশ্‌ছে আছেই — যাবেই পাওয়া !

(১)

আলোর ফুল

এই আলোর ফুলে ফুলে ফুল, ফুলে ফুলে অফুরন্ত,
আমলে সবুজে ঘুণাবাষ্টিভাঙা আলোকের আলিপনা !
দুই-দেহলীর গন্ধে আকুল দক্ষা যৌবনবতী,
সমীরে নীরব কবে সে বকুল — পুরাতি তুষার-কণা !

হেরি যে হোথায় ভোরা-বাঁধা বেণু লুটিয়াছে অঙ্গন,
উপরে তাহার শাখা মেলিয়াছে নবীন কনক-চাঁপা ;
কোন্ উপাসিকা গোপালীর মনে ছিটাইয়াছে চন্দন !
পাতা হাসিতেছে আঙিনার কোণে — হাসিখানি তার চাঁপা ।

কোমল-বরণ-সমীর-সেবিত শশিক-সভার মনে
ফুটে আছে কত উষর, করবী, অতসী, অপরাজিতা ;
মাঝকে ঘেরে মিলেছে যাবতী মধুমালতীর সনে,
কত না ফুলুর কবে কটাক্ষ — ফুটিং অপরিচিতা ।

সেঁদালের সোনা, কাঁটের মুকুতা, চুমি সে কৃষ্ণকলি,
শরীরের শাখে মল্লি-কলিকা, যুঁইরাও সেথি আছে ;
রজনীগন্ধা — গন্ধরাজের নাকিনী তাহারে বলি,
সর্বজয়ার রঙীন রুমালে কৌটা কেবা রাখিয়াছে !

সহসা হেরিনু ঘুরে এতক্ষণে সোনল-চাঁপার সনে
একটী সে গাছে আগুনের মত ফুটিয়া রয়েছে কিবা !
লহমা শাখায়, টুটিবে এখনি ফুলের বন্ধনে —
চিনিনু তখনি — লবঙ্গ জবার সে যে সিন্দুর-টিবা !

ফুলকার খোপা মানায়েছে ভালো, কেতকী এনেছে চুল
কাঁটাল-হিবা-রেণুরা লিপি তার লুকিয়াছে পরিপাটি !
তারকীতিনির প্রেয়ের মত নীল সে কল্পী-ফুল,
কামিনী মাটিতে বিছায়েছে তার শুভ্র-সুরভি মাটি ।

কহিনু, 'তুলোনা, তুলোনা তা' বলে' !' — কহিনু সকল ফুল,
হৃদয়ের ফুলে ফেরে থাকি শুধু শুনে সে করুণ কথা ;
মনে হয় শুধু হাসিছে তাহারা — ঝরে যায় বিকুল, —
কল্পী-সভায় উপবিষ্ট আমি ঘুরে ফিরে যথা-তথা ।

---

(২)

কল্প-সাজির

মনে যে সব ইচ্ছা আছে
　　পূরবে না সে তোমায় দিয়ে,
তাইতে প্রিয়ে ! মন ভরেছি
　　আরেকটি আর ভরব বিয়ে ।

মন ধরেছে বাসুর তরণী
পুরবে হবে এক চিতাতে ;
তবু আমায় কইলে দোষী —
মরতে তুমি পারবে সাথে ?

এবার নিয়ে ফুলের ফুলে,
জোৎস্না-রাতের অন্ধ ঘুমে,
হ'ক সে ডালা কিম্বা সোলাপ
আপত্তি নেই মরতে ঘুমে।

আমার ঘরে কিসোর কবি
মনের সোপন খাঁজী রেখে,
হাসীর মত আমায় রেহে
বনের বাহার-বাজার থেকে।

সোহাগ দিয়ে রাখব ঘিরে
চোখের জল প্রণের নীড়ে,
ইচ্ছা হ'লে তুলব গিরে,
ইচ্ছা হ'লে ফেলব ছিঁড়ে।

মজি হ'লে হাজারটিরে
পরব গলায় গেঁথে মালা,
কপড়া-কাঁটির নেইকো পরা
নতীন-কাঁটার নেইকো জ্বালা।

ফুল-সাজি যে ফকির আছে
ফুলকে তারা ভালবাসে,
তাদের বাড়ী মরব এবার, —
থাকব সদন ফুলের বাসে।

থাকব ভুবে আমার ফুলে
কুরুপ কাঁটা দেখ্‌বে নাকো :
ফুল নিয়ে ঘর করব এবার,
তোমরা সবাই সুখে থাকো।

তার পরে দিন আসবে যখন
মরতে আমি পারব সুখে,
ইতস্তঃ কইবে না কুল
থাকতে একা পরের দুখে।

ফুল — সে আমার সঙ্গে যাবে —
পুরুল যোরা এক চিতাতে ;
দেখিস্ তোরা দেখিস্ সবাই,
যেতে সে ঠিক্ পারবে সাথে।

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পরিত না বয়নে,
তখন কেবল বাস্ত ছিলাম চয়নে।
মধুকর-সম ছিনু সফল-প্রয়াসী,
কুসুম-জাতি দেখি নাই, মধু-পিয়াসী,
বকুল কেবল বসিত করেছি আসনে,
ছিলাম যখন বিলীন বকুল-বয়নে।

স্বাধীনতা-হীনতায়

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ, ডি-ফিল্ (মিউনিক), ডি-লিট্ (প্যারিস্)

[এই প্রবন্ধের মনস্বী লেখক বাংলাদেশের বর্তমান দুর্গতি ও তাহার কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সত্য-মিথ্যা-বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের উপরে দিয়া, আমরা কেবল একটি কারণে এই লেখাটির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঐ প্রসঙ্গে, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক, প্রবন্ধটির মধ্যে এমন কয়েকটি চিত্তা এবং যুক্তি সহকারে উপস্থিত করিয়াছেন, যেমনটি আমাদের ভাষায় ইতিপূর্বে আলোচিত হইতে দেখি নাই। এ জন্য এই প্রবন্ধটি আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ একটু বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে আমরা বড়ই সুখী হইব। ব: স:]

বাঙলার অংগ্রেসী রাষ্ট্রনেতাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া বাঙালী মাত্রেরই মনে নিশ্চয়ই আজ ধিক্কার আসিয়াছে। সমগ্র বাঙালী জাতি আজ গভীর লজ্জার অবোকদন, নিজের ছায়া প্রাণ্ত ঘৃণা করিতেও বাঙালী আজ সাহস খুঁজিয়া পায় না। বিদেশের বন্ধনে "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" এই চরম আবৃত্তি করিতেই জন্ম উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। আর আজ! আজ সেই ছত্র আবৃত্তি করিবার আমাদের অধিকারও নাই। কারণ অধিকন্তু বেয়াদপি আজ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, একদিন আমাদের যাহা মনের কথা—অন্তত কেহ করিয়া যে-কথা প্রতি মুহূর্তে কাটিয়া বাহির হইতে চায়—তাহা হইল "স্বাধীনতা হীনতায়—কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!"

এমন স্বাধীনতা কোনদিন বাঙালী কল্পনা করিয়াছিল কি? এই স্বাধীনতার জন্যই কি বাঙালী জাতি এত পীড়ন, এত অত্যাচার একদিন ধরিয়া সহ্য করিয়া আসিয়াছে? এই কি সেই স্বাধীনতা যাহা দেহের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনেরও মুক্তিবিধান করিয়া মানুষকে দেবত্বের পথে পরিচালিত করে? বিদেশ অধীন মনকে সম্পূর্ণ নিজের অধীন করাতেই যে স্বাধীনতার প্রকৃত সার্থকতা সেই স্বাধীনতার কোন চিহ্ন কোন দিকে আজ দেখা যায় কি? দেখা যায় শুধু একটা জঘন্য নির্লজ্জ অনাবৃত উল্লাস। অত্যন্ত দুঃখের দিনেও বাঙালী গাহিতে পারিয়াছিল — "কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ," কারণ তখনও বাঙালীর নিজের উপর বিশ্বাস ছিল,—তখনও বাঙালী বিশ্বাস করিত যে, দুঃখ জিয় অসম্ভবসাধ্য হয় না, দৈন্য কেবল মনেরই কল্পনা, লজ্জা—কর্তব্যচ্যুতির গ্লানি, এবং সঙ্কীর্ণ চিত্তে বিপুল আবেগের উচ্ছ্বাসই হইল ক্লেশের কারণ। আর এখন? এখনও বাংলার রাষ্ট্রনেতারা এই গান গায়—নহিলে চাকরী থাকেনা। কিন্তু কি অর্থে তাহারা এই গান গায় তাহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির বুদ্ধিতে আজও বাকি আছে কি? দুঃখ কিসের—এখন তো সুখসাগরে ভাসিতেছি! আর দৈন্য! চোরাবাজারের কারবারীরা দেশের না হউক, দলের দৈন্য তো দূর করিয়াছে—গাড়ী করিয়া নোটের তাড়া বড়দের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতেছে। লজ্জার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কারণ পেটে ক্ষুধা থাকিলেই মানুষ মুখে লজ্জা দেখায়, আমাদের পেটেও ক্ষুধা নাই, মুখেও লজ্জা নাই। আর যদি জিজ্ঞাসা কর, ক্লেশ পাই কিনা, তবে বলিতে হয়, সে আমরা আর নাই; প্রাণ যে আমার কত উদার তাহা আগে বুঝি নাই, তাই নিজেকে সঙ্কীর্ণ ও অযোগ্য জ্ঞান করিয়া অনর্থক চিত্তকে ক্লিষ্ট করিয়াছি; তারপর চাকরী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেগের উচ্ছ্বাস এমনই প্রশমিত হইয়া গিয়াছে যে, চিত্ত আমার সঙ্কীর্ণ হইলেও কোন ক্লেশ যে অনুভব করিতাম

তাহা মনে হয় না।

এমনই আজ বাংলার কংগ্রেসী রাষ্ট্রনেতাদের মনোভাব। বেআইনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর জীবিকার্জনের অন্য উপায় না দেখিয়া যাহারা দেশ সেবার আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে বাস্তবিকই ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করা যায়! কংগ্রেস যখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিল তখন আমাদের এই নেতারা — যাঁহারা আজ বাংলার রাষ্ট্রপরিষৎ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন — দেশের জন্য কিছুই যে করেন নাই তাহা আমরা বলিতেছি না, কারণ যুদ্ধ যখন উপস্থিত হয় তখন দেশোপরিরাই সর্বস্ব করে, আর সাধারণ পরাজিত কিছুই করে না — এ-কথা বলা যায় না। এক যুদ্ধের হাঙ্গামে যদি জান হাতটা অজ্ঞানসারে এমন কিছু করিয়া ফেলে যাহা বাঁ হাতের পক্ষে না জানাই ভাল, তবে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই, কারণ মানব চরিত্রই ঐরূপ। বিজয়ের আনন্দে মত্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের পর প্রত্যেক পরাজিত বলিতে আরম্ভ করে "বিজিত দেশের আমিই হইব সর্বময়কর্তা।" বিষয়টা গভীর হইয়া উঠে যখন দুই একটা প্রয়োজনের পর আমাদের বীর পরাজিত স্বীকার করে যে যুদ্ধে তাহারা বাহুপরাক্রমে অযোগ্য হইয়া শত্রুপক্ষ পলায়ন করিয়াছিল কিনা সে জানেনা, তবে শত্রুপক্ষের পলায়নকালে সে যে ছলনার ঘুষাইতেছিল তাহা সে হলপ করিয়া বলিতে পারে। ইহার পরেও কেন সে ছলনার ঘুষাইতেছিল সে সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করা বাস্তবিকই নিষ্ঠুরতার কাজ হইবে, কারণ ফোপ-ঠানা হইলে সে হয়তো স্বীকারই করিয়া বসিবে "বহিলে মাহিনা পাইতাম না।"

আমাদের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই 'বহিলে মাহিনা পাইতাম না'র সংখ্যা, কত তাহা আজ ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কথায় কথায় ইহারা ত্যাগের দোহাই দেন। যেন ত্যাগ একটা investment। যাহা "ত্যাগ" করিয়াছ তাহার প্রতিদান চাও কোন্ মুখে? নির্লজ্জভাবে যদি প্রতিদানে ও পুরস্কারের দাবী করিতে থাকে তবে 'ত্যাগটা' কোথায় থাকে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? মারোয়াড়ী মহাজন প্রতিদিন কটকা খেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা বাহির করে, ইহা কি তাহার ত্যাগ? মানুষ যখন কোন প্রকার ফলের আশা না করিয়া আপন স্বার্থ বিসর্জন দেয় তখনই সে ত্যাগী নামের অধিকারী হয় — একথা কি তুমি জান না? তুমি কি জান না যে, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মবলি দেওয়াটাকে "ত্যাগ" বলিয়া মনে করাই একটা মহাপাপ! মোক্তারী-কেল পেশার দেশপ্রেমিক ভিন্ন আর কেহ এই ভয় চিন্তা মনে স্থান দিতে পারে কি? একটু যদি স্থিরভাবে চিন্তা করিবার চেষ্টা কর তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে তুমি যে আজ বাংলার রাষ্ট্র পরিষদে স্থান পাইয়াছ তাহার প্রধান কারণ —প্রকৃত দেশপ্রেমিক তুমি নও! তুমি আসলে পেশাদার দেশপ্রেমিক এবং ইহাই তোমার কৃতকার্যতার প্রধান কারণ। Professional Politician সংসারে নূতনত্বের দাবী করিতে পারে, এবং মানবীয় সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় এই পেশাটা লুপ্ত হইলেও পরিবর্তন করিবার উপায় নাই। কিন্তু তুমি নিজেকে Professional Politician বলিয়া দাবী করিতে পারনা, কারণ এই পেশায় যে কঠোর শিক্ষা ও গভীর বিষয়ে প্রয়োজন তাহা তুমি কোন দিনই অর্জন করিবার চেষ্টা কর নাই। একটা ডিভিসনও তুমি জবাব দিতে পারিবে কিনা সন্দেহ — যদি সরকারী Permanent Secretary তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য সর্বদা উপস্থিত না থাকিত। আর প্রকৃত দেশপ্রেমিক — Patriot যে তুমি নও তাহা সুস্পষ্ট, কারণ তাহা হইলে কথায় কথায় দেশবাসীকে তোমার "ত্যাগের" কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নির্লজ্জভাবে quid pro quo দাবী করিতে না।

কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় তুমি একজন পেশাদার দেশপ্রেমিক! সাবধান, পেশাদারী প্রেমে কাজ কিনিস নয়! স্বাধীনতার মোহটা টানিয়া বহু বছরকাল জল ঢালাও নাই। কিন্তু পকেটের আধা ঝন্ঝনি-কিছিনী প্রবণের ফলে তোমার মত চতুর লোকেরও আজ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিতে বসিয়াছে। তাই খেয়াল কর নাই যে, তুমি যখন আজাদে আটখানা তখন তোমার মুখের বদন কখন লটিয়া গিয়াছে! লোকে তোমায় চিনিয়া ফেলিয়াছে, বুঝিয়াছে তুমি একজন Political gigolo।

অথবা, তুমি কিছু তাদের সেই "বাহবা নন্দলাল!" চরিত্রটি ভাবিয়া লইয়া তুমি যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ তাহা হইল, "খাঁচাটা আমার বড় দরকার।" তুমি মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে স্বধর্মা অনাথিনী হইবেন — ইহাই তোমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই বাংলাদেশ আহাম্মকে ধাইক, তবুও তুমি মন্ত্রিত্বের দাবী ছাড়িবে না। কিন্তু হে পেশাদার দেশপ্রেমিক মন্ত্রীপ্রবর, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বেতন-আহরণ ও প্রসাদ (Patronage)-বিতরণ ছাড়াও যে মন্ত্রীত্বের অন্য কাজ থাকিতে পারে তাহা কোনদিন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এবং সেই সব কাজে তোমার যোগ্যতা আছে কিনা তাহাও কি একবার চিন্তা করিয়াছ? প্রকৃতই দেশপ্রেমিক যদি তুমি হইতে তবে তুমি যোগ্যতর ব্যক্তির পথ রোধ করিয়া বসিয়া থাকিতে না। মঙ্গলাল হইলেও এটুকু বুদ্ধি তোমার নিশ্চয় আছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু যখন সম্মুখে তখন একবার যথোচিত ঘুষাইয়া দেশ-শত্রুর যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। হঠাৎ ইংলাণ্ড বা আমেরিকার মোহাই দিয়া ঘুষাইতে চাহিও না যে সে-সব দেশও তোমার মত অযোগ্য ব্যক্তিই মন্ত্রী হয়। যদি জানা না থাকে তবে শুনিয়া রাখ যে তোমার মত অযোগ্য ব্যক্তি কেবল তোমার দেশেই মন্ত্রী হয়, অপর কোন দেশেই হয় না, হইতে পারেও না। কারণ ইংলাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক পার্টির পৃথক্ একটা Secretariat আছে, যাহার কাজ হইল পূর্ব হইতেই প্রয়োজন মতের জন্য উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করিয়া রাখা। কাজেই সময় বুঝিয়া একবার তদোয়ার ঘুরাইলে কোন দেশেই মন্ত্রী হওয়া যায় না — আমাদের এই দুর্ভাগা বাংলাদেশ ছাড়া।

প্রকৃত দেশপ্রেমিক তুমি নও — কারণ দেশের লোকের প্রতি যে তোমার কোন লক্ষ্য ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতই যে দেশ-প্রেমিক—দেশের জন্য প্রকৃতই যাহার মন কাঁদে — সে কখনও সকল স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া Partisan হইতে পারে না। পার্টির নির্দেশ না পাইলে যাহার মন দেশের জন্য কাঁদিতে পারে না সে যে কিরূপে নিজেকে দেশপ্রেমিক বলিয়া প্রচার করে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে কোনদিন কোন পার্টির অধীনতা স্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেস পক্ষ হইতে শত নির্যাতন সত্ত্বেও নেতাজী কোনদিন দেশের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার — জাতির দুঃখে বিদলিত চিত্তে দুঃখ প্রকাশ করিবার ও সেই দুঃখ দূর করিতে জাতিকে উদ্বুদ্ধিত করিবার — অধিকার পরিত্যাগ করেন নাই। ইংলাণ্ডের শ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমিক Churchill। সেইজন্য ভারতে নেতাজীর যে-দশা হইয়াছিল ইংলাণ্ডে Churchill-এর সেই দশা হইয়াছে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলিয়াই Churchill তাঁহার দীর্ঘ-রাজনৈতিক জীবনে কোন-দিন পার্টির সহিত বনাইয়া চলিতে পারেন নাই। কিন্তু ইংলাণ্ডের জনসাধারণ চিরদিন তাঁহাকে ভালবাসিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, এবং দুইটি মহাযুদ্ধেই Party Politics-এ পরাস্ত ও লাঞ্ছিত এই Churchill-কেই তাহারা জাতির অসময়ে

নিজের রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করিয়াছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে দেশপ্রেম অপেক্ষা পার্টি-প্রেমই যে অধিকতর কার্যকরী তাহা নেতাজী ও Churchill-এর দৃষ্টান্তের পর কাহারও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু পার্টি-প্রেম যে দেশ-প্রেমকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা কি কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় আছে?

দেশপ্রেম ও পার্টি-প্রেমের বিরোধ কিরূপে সম্ভব হয় তাহা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার। দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহারা কেবল পার্টির আদেশ পালনেই ব্যস্ত, তাহারা দেশেরই পার্টির স্বার্থের নিকট দেশের স্বার্থ বলি দিতে বাধ্য হয়। এই দিক হইতে তাহারা দেশদ্রোহী। প্রশ্ন উঠিতে পারে, দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা না করিয়া কোন মানুষ যদি কেবল আপন স্বার্থের জন্যই জীবন কাটাইয়া দেয় তবে কি সে দেশদ্রোহিরূপে পরিগণিত হইবে? তাহা হইলে তো দেশের অধিকাংশ নিরানব্বই জনই দেখিতে পাই দেশদ্রোহী! নিজের দেশের কথা ভাবে না বিশ্বের কল্যাণের কথা ভাবে? সাধারণ মানুষ আপন পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন লইয়াই ব্যস্ত, দেশের স্বার্থ তো দূরের কথা, পাড়া-প্রতিবেশীর সম্বন্ধেও তাহার ঔদাসীন্য বিস্ময়কর, এবং এ কথাও ঠিক যে পরের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখাইলে সাধারণতঃ তাহাকে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার উপযোগিতা সম্বন্ধে তীব্র একটা ইঙ্গিত সহ্য করিতে হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাষ্ট্রনীতিতে যাহা natural rights নামে পরিচিত তৎসম্বন্ধে অন্ততঃ খানিকটা সজাগ ভাব সমাজের সকল লোকেরই অন্তরিন্দ্রিয় আছে, এবং এই natural rights ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিলে মানুষ আপনা হইতেই — কোন Duce বা Fuehrer-এর নির্দেশ না পাইলেও — সচেতন হইয়া উঠে। মানুষের স্বাভাবিক অধিকার এই স্বাভাবিক যে মানুষ সে-সম্বন্ধে সাধারণতঃ সচেতন থাকেনা, আহার সম্বন্ধে এবং পানীয় হাওয়া সম্বন্ধে যেমন সাধারণ অবস্থায় অচেতন ও সৌজন্য উদাসীন, মানুষও সৌজন্য তাহার স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে সাধারণ অবস্থায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দেখিলেই মানুষ এক মুহূর্তে তৎসম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে এবং বুঝিতে পারে যে তাহার জীবন ধারণ এই স্বাভাবিক অধিকারের উপরই নির্ভর করিতেছে; তখন সে হঙ্কার মুখর করিতে মরণপণ হয়, এবং প্রত্যেকেই সমস্বরে বিপদ্‌ঘ্ন বলিয়া মুহূর্তে সকলে মিলিয়া করিতে থাকে। ইহাই হইল দেশপ্রেমের Psychological Foundation। কোন বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশপ্রেম উদ্দীপিত হইতে পারে না, কারণ বিশেষ অধিকার সমগ্র জাতির অধিকার নহে। বিশেষ অধিকার সর্বদাই কোন না কোন শ্রেণীর অধিকার। কিন্তু স্বাভাবিক অধিকার সকলেই সমান ভাবে ভোগ করে বলিয়া যতদিন না তাহা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা ঘটে ততদিন কেহই তৎসম্বন্ধে সচেতন হয় না। জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত দেশপ্রেম সেই জন্যই এত বিরল। আমরা যে স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের আশায় "দেশপ্রেম" নামে পরিচিত, সেই অধিকার মানুষের নিকট এতই স্বাভাবিক যে তাহার অস্তিত্ব আছে কি না তাহাও সহজ মানুষ সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। যাহারা অস্বাভাবিক তাহারা কিন্তু সকলের মধ্যেই দেশপ্রেম অন্ততঃ সুপ্তাবস্থায় বর্তমান, কিন্তু কেবল বিপৎকালেই তাহা সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে। এই জন্যই বিপৎকালে ভারতবর্ষে নাস্তিক নেতাজীকে মাথায় তুলিয়া আমরা করিয়াছিলাম। যুদ্ধশান্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেম আপোষ-পার্টিপ্রেম প্রবলতর হইয়া উঠায় ইংলণ্ডে চার্চিলেরও এইরূপই পতন ঘটিয়াছে।

দেশপ্রেম ও পার্টিপ্রেমের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে

আলোচনা করিতে হইলে Ostrogorski-র মত একটা এতটা গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। বলাই বাহুল্য, সে-ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ-সম্বন্ধে যেটুকু স্পষ্ট করিয়া বুঝা দরকার তাহা উপরে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পার্টি-প্রেম শ্রেণীস্বার্থেরই বাহ্যরূপ, সুতরাং জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী, দেশপ্রেম কিন্তু কোন স্বার্থের প্রতীক নহে। এমন কি দেশের স্বার্থেরও নহে। ইহা হইল দেশের সহিত অন্তরঙ্গতার উপলব্ধি-জনিত সহজ ও স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস আবেগ। এই অন্তরঙ্গতার উপলব্ধি একেবারে আক্ষরিক অর্থে "স্বাভাবিক" কারণ, বুদ্ধির তাড়নায় এই উপলব্ধি কখনও জাগ্রত হইতে পারে না। "মাটির মাটি, মানুষ মানুষ।" "Breathes there the man with soul so dead." "Aux armes citoyens, formez vos bataillons." "Deutschland uber Alles" প্রভৃতি কবিতার বুদ্ধির বিচারে যাহাতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু National snobs ও International Communists কিন্তু সকলেই স্বীকার করিবেন যে এই সকল গানের মধ্যেই প্রকৃত জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া যায়। গানের ভাষা বা সুর হইতে নয়, কারণ ভাষা ও সুর হইই বাহ্য প্রকাশ-রূপ বা প্রতীক মাত্র। প্রকৃত কারণ এই যে, এই ধরনের গান সম্বন্ধে সকলই বলা যায় যে তাহা "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" যে-কারণেই হউক, এই ধরনের গান শুনিলেই মানুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য কিছু পরিমাণে হারাইয়া ফেলে এবং দেশের সহিত অন্তরঙ্গতার একটা মধুর অনুভূতি আপনা হইতেই তাহার মনে স্বাভাবিক ভাবে জাগ্রত হয়। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সুরেও ইহার নাগাল পায় না, যুক্তি ইহার ধার ধারে না। কারণ দেশের সহিত অন্তরঙ্গতার উপলব্ধিজনিত মধুর অনুভূতি পূর্বোক্তরূপ স্বাভাবিক; ধর্মের অন্তরতর প্রদেশে তাহার উৎস, ভাষা ও সুর তত্ত্বদর্শনের বাহ্য। এক কথায়, দেশপ্রেম একপ্রকার mystic realisation।

পার্টি-প্রেম কিন্তু mysticism-এর ধারেকাছে নাই। 'বাদে বাদ' করিয়া গুণিয়া গুণিয়া ইহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। অন্তরাত্মা দেশ-প্রেমের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। দেশকে প্রকৃতই যে ভালোবাসে তাহার পক্ষে Party-man হওয়া কৌতুক কোনক্রমেই সম্ভব নয়। প্রকৃত প্রেমস্পর্শ যাহার জীবনে ঘটিয়াছে সে কি কখনও অন্যের মত ভালোবাসিতে পারে? সত্যকারের অখণ্ড স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেম বিসর্জন দিয়া সকলেরই পার্টির নির্দেশ বিনা বিচারে মানিয়া লইতে হয়; কিন্তু তাহারও প্রমাণ আছে এই যে, ঐ সময় সমস্ত জাতিই আপনা হইতে একটি পার্টিতে পরিণত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বহুমুখী জাতীয় জীবন মুহূর্তমাত্রে একমুখী দেশ-জীবনে রূপান্তরিত হয় বলিয়াই পার্টি ও পার্টির মধ্যে তখন আর প্রভেদ থাকে না। কিন্তু বাহির হইতে শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা না থাকিলেও জাতীয় জীবনকে স্বাভাবিক একমুখী করিবার চেষ্টা অতিশয় বিপজ্জনক। **জাতীয় জীবন যতদিন একমুখী হইয়া না পড়ে ততদিন জাতির স্বাধীনতা অপহরণ সহজসাধ্য হয় না।** Stalin কিরূপে রুশজাতির স্বাধীনতা অপহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা চিন্তা করিলেই এই কথা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। বাস্তবিকই আমেরিকার সহিত যুদ্ধ করা যে Stalin-এর অভিপ্রায় এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু দেশের সমস্ত যুবকের আত্মত্যাগে প্রস্তুত ও একমুখী করিয়া না রাখিলে Stalin-এর নিজেরই যে পরিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা আছে এ-কথাই বা কে অস্বীকার করিবে? এবং Stalin-এর মত দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতার যে এ-কথা জানা নাই তাহা

অবশ্য করনা করাই অসম্ভব। আমেরিকারও মুখোস জনে প্রকৃত কারণ মনে হয় — Truman ও তাঁহার Party-র, অন্ততঃ আসন্ন কালের জন্য, জাতির শক্তিকেন্দ্র আপন মুষ্টিগত করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়। ইতিহাস দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতার যাহারা অগ্রণায়ক তাহারাই জাতীর জীবন একমুখী করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হয়। Hitler ও Mussolini সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুক্ত্য এবং জাতীর জীবন একমুখী করিয়া তুলিবার প্রধান যন্ত্র যে পার্টি, তাহাও সুস্পষ্ট। এইজন্যই বলিতেছিলাম, পার্টি-প্রেম স্বাধীনতার পক্ষে অহিতম বিপজ্জনক। যুদ্ধে জাতিবিশেষ জয়ী হইলে অবশ্য পার্টি-প্রেম বিনষ্ট হয়। কিন্তু চারিদিকের এই সর্বগ্রাসী পার্টি-প্রেম বিনষ্ট করিবার আর কোন উপায় যদি থাকে তবে তাহা হইল প্রকৃত দেশপ্রেম, যাহা স্বরূপেতেই বহুমুখী।

এই পার্টি-প্রেমে অনুপ্রাণিত বাংলার কংগ্রেসী নেতৃবর্গ আজ দেশের সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গান্ধীজীর নাম তুলিলে এখনও এই দুর্ভিক্ষ কবলিত জনতা ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া পড়ে। কিন্তু গান্ধীজীর আদেশ উহারা পালন করে নাই। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে যে কংগ্রেস সৃষ্ট হইয়াছিল, স্বাধীনতা-লাভের পর যে সেই কংগ্রেসের কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না এ কথা সহজ বুদ্ধিতে সকলেই বুঝিতে পারে। কংগ্রেসী মন এ কথা বুঝিয়াও বোঝে না দেখিয়া গান্ধীজীকে শেষে মুখ ফুটিয়া বলিতে হইয়াছিল, "কংগ্রেস ভাঙিয়া দাও"। এই কথায় বিপর্যস্ত হইয়া বিনা ভরতে কোনরকমে কাটাইয়াই সৌভাগ্যক্রমে গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটিল। এখন আর ইহাদের পায় কে? বাংলার জীবনের অন্তর এই পেশাদার কংগ্রেসী দেশপ্রেমিকের দল এবং উহার উদ্ধারে দেশের মুক্ত মুখ সৃষ্টি করিতেছে। প্রত্যেকের হাতে এক একখানি তাদের ডিগ্রিস্তি! দেশের জন্য লড়াই যাহারা মুখে করিয়াছিল — বাংলার সেই সোনার ছেলেরা কোথায় আজ? জন্মভূমির এই অপমান কি বীরের তাহারা সহ্য করিবে? ফলের আশা তো দূরের কথা, ফলের আশাও না করিয়া, স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা সকলেই কি মরিয়া গিয়াছে? এ কথা মনে হয় না। মনে হয় শুধু পুরুনীয় নেতৃবর্গের স্বার্থসোচিত নির্দেশ অনুসরণে গভীর দুঃখে তাহারা আজ স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ অবস্থা সাময়িক মাত্র। কপালেরও সহ্যের থাকিলে মানুষ কখনও এই রকমের অবস্থা অনাচার সহ্য করিতে পারে না। বাঙালীও তাহা করিবে না। তাই বলিতেছি, যে পেশাদার দেশপ্রেমিকের দল, সময় থাকিতে সরিয়া পড়, বাংলার রাজনৈতিক জীবনকে আর ভেজালী করিও না। চেষ্টা করিলে এখনও হয়তো মোক্তারী পাশ করিয়া অন্ন-কাপড়ের সংস্থান করিতে পারিবে। কিন্তু যদি লোভের বশে উপরওয়ালা মারোয়াড়ীর পুচ্ছপাষকতায় রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিয়া বসিয়া থাকিবার চেষ্টা কর, তবে যাহার বাড়া আর গাল নাই অদূরে তাহাও ঘটিতে পারে, কারণ, দেশের লোক তোমাদিগকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে যে, করিটনিষ্টদের অন্যেও যেটুকু সততা আছে তোমাদের মধ্যে সেটুকুও নাই। করিটনিষ্টদের সম্বন্ধে অন্ততঃ বলা যায়: They honestly believe that dishonesty is the best policy। কিন্তু তোমাদের যাহা মূলমন্ত্র তাহা হইল—dishonesty is the only policy! তোমাদের অনাধুতা একেবারে — প্রত্যেকটি অবশ্য, অনিবার্য, অবশ্য! তোমাদের খুবে নমস্কার।

"আরাম-জান"

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পি-এইচ-ডি

[এই লেখাটিতে বাংলার অন্যতম প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক এবং সুনিপুণ সাহিত্যিক ইতিহাসের রাজপথ ছাড়িয়া গলিপথে বিচরণ করিয়াছেন। 'আরাম-জান'-নামী হতভাগিনী রমণীটি উপলক্ষ মাত্র; তিনি উহাকে ভাবিনী অবলম্বন করিয়া, মোগলরাজত্বের রাজধানীতে, মুঘল আভিজাত্য-লীলার সহিত যে এক অতিশয় অপ্রাসঙ্গিক ভাব-সাধনা — সোলাপ ও খসখসের মত, আরকরূপে আমদানি হইয়াছিল তাহার একটি সরস অথচ তথ্যপূর্ণ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে যে একটি ব্যাপার উঁকি দিয়েছে, তাহা তাহার বাহিরে — প্রাচীন গ্রীস ও পারস্যদেশে-সুবিদিত থাকিলেও, এদেশে, অন্ততঃ বাংলাসাহিত্যে, তাহার উল্লেখ এই প্রথম। পৃথিবীও যেমন বিশাল, মানব-প্রকৃতিও তেমনই বিচিত্র। যঃ সঃ]

(১)

আরাম-জান আবুলফজল-রচিত আকবর-নামার একটি ঐতিহাসিক নারীচরিত্র। আলীকুলী ও আরাম-জান বিষয়ক কাহিনী আবুলফজল অপেক্ষা মোল্লা বদায়ূনী অধিকতর সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ঐতিহাসিকদ্বয় সংপাঠী এবং বালাবন্ধু হইলেও আকবরশাহী দরবারে নানা কারণে তাঁহাদের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক ইতিহাসে যেখানে উক্ত ইতিহাসবেত্তাদ্বয় কোন ব্যক্তি বা ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্নমত, সেই স্থলে সত্যনিষ্ঠা বিচার করিতে বসিলেই বর্তমান ঐতিহাসিকগণ সংশয়গ্রস্ত হইয়া থাকেন; যেখানে উঁহাদের মধ্যে মতের মিল আছে, সেখানে উহাকে অগ্রাহ্য করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং আরাম-জান সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলিয়াই আমরা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারি।

অতঃপর ভাবিবার কথা —, ঘাদশবিলাসিনী আরাম-জান-কে ইতিহাসে স্থান দেওয়া কি শিষ্টাচার? মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বলিতেই আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি — রাজা-বাদশার, আমীর-উমরাহ; আলেম-পণ্ডিত, শিল্পী-কারিগর, জ্ঞানী-গুণীজনের; যুদ্ধবিগ্রহ-অভিযানসমূহ, রাজনারী-বেগমদের জীবন-কাহিনী; নরমুণ্ডের মিনার, রক্তের বৈতরণী, রাজ্যের উত্থান-পতন ইত্যাদি বড় বড় ব্যাপার। ঐতিহাসিক গবেষণা-কে কটাক্ষ করিয়া স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন,

আকবরের কটা ছিল দাড়ী,
সাজাহানের কটা ছিল বাতি।

আমরা এবার ঐ কথাই করিয়া আসিতেছি। স্কুল-কলেজ হইতে ইতিহাসটাকে সরে হটাইয়া পড়িয়াছে, বস্তুঃ ঐতিহাসিকের পর্যায় এই কীর্তি কালক্রমে জনসাধারণের মত ব্যাপকতর হইতে পারে। কবি কিংবা ঔপন্যাসিকের বিরূপে যিনি চটিয়া উঠিলেন, তিনি ইতিহাস-চর্চার অধিকারী নহেন। প্রায়ই দেখা যায় প্রেমসার ন্যায় সামান্যাদির সূত্র ধরিয়া সত্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যাঁহাদের ধাতে ইতিহাস সহ্য হয়না তাঁহাদের কাছে ইতিহাস বলিতে তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন — মোগলযুগ

কি হয়েছিল, ঠিক না বৈশাখ, মধু না মধু, অজাতশত্রুর বয়সটা কত, কেতাবেপুত্র নয়কারো, — যত জোর একটা "নদী"। এইরূপ যাকি দ্যাখিয়ে দিলেই ছাত্রদের কেবল ঘরে ঐতিহাসিক হইয়া পড়েন, কেননা, আমির ইতিহাস না হইলে মোদের রহিল পাওয়া যায়না। সেখানে কার্যকারণসম্বন্ধ সেখানেই সন তারিখ না হইলেও একটা সময়ানুক্রম চলিতে থাকে। যারা হোক, আধুনিক ইতিহাসে সেকেলে, — অন্ততঃ বিলাতে — সন তারিখে ঐতিহাসিক কত বাহুল্য করিয়া থাকেন, এবং তাহাও প্রায় পাশ্চাত্যে। ইতিহাস একেবারে বিজ্ঞানে অথবা সাহিত্য না হইলে অন্যায় হইয়া থাকে; কিন্তু বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মাত্রা এবং সংমিশ্রণের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি হইলেই ইতিহাস পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ, সাহিত্যের মাত্রা অধিক হইলে ইতিহাস উপন্যাসের পর্যায়ে নামিয়া যায়।

ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ এবং অনপ্রিয় না হইবার দ্বিতীয় কারণ — প্রাচীন কাল হইতে ঐতিহাসিকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি এবং ইতিহাসের সংকীর্ণ-সজ্জা। ইতিহাস বলিলেই মুখ্যতঃ আমরা বুঝি Political History বা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া রচিত জাতির উত্থান-পতন, সভ্যতার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি। এইরূপ ইতিহাসে রাষ্ট্র-ই মুখ্য; সমাজ, ধর্ম এবং অর্থনীতি নিতান্তই গৌণ; সুতরাং, ইহাতে যথা আমরা দেখিতে পাই কেবল সন-তারিখ, যাদ্ধবিগ্রহ-কাটাকাটি, বিপ্লব, কূটনীতি, রাজা-রাণীর জন্মকোষ্ঠী; একদিকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন, অন্যদিকে লেখকরা নিরানব্বই জনের দুর্দশার ধারাভাষ্য। এইরূপ ইতিহাসে আমরা সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ পাই কেবল মাত্র যখন তাহারা মহামারী কিংবা দুর্ভিক্ষে পাইকারী হিসাবে অনাহারে মরিতে থাকে, কিংবা নাবিকসেনা হলোয়ারে জবাই হইয়া যায়। মধ্যযুগে, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে, ইতিহাসে ছিল আমীরী ব্যাপার, আমীরের জন্যই অভিপ্রেত; অর্থনীতি, জাতিতি, পারিপার্শ্বিক নিশ্চিহ্ন ছিল কেরানী ও দোকানদারের জন্য। সুতরাং এমন ইতিহাস কেরানী দোকানদার পড়িবে কেন?

সাহেবদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি হিন্দুর ইতিহাস নাই। হিন্দুর অভিধানে "ইতিহাস" শব্দটা আছে অথচ বস্তু নাই — ইহাই বা কেমন কথা? আসল কথা, আমাদের জাতি যেমন ইতিহাস বলিতে একটা খিচুড়ী বা ভরভাজ বুঝিয়া থাকে, আমাদের আর্যাগণ সেইরূপ ইতিহাস বলিতে মানবকল্যাণের যথার্থ-কামযোগ চতুর্বর্গ-লাভের যাবতীয় শাস্ত্রই বুঝিতেন। এই জন্যই হিন্দুর আদর্শ ইতিহাস হিসাবে মহাভারতকেই গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাণ পাঠ করিতে গেলে সব পুরাণেই দেখি সৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথমে কিছু কাটিয়া আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি, ক্রমশঃ স্থাবরাদি, পশু, উদ্ভিদ ইত্যাদির উৎপত্তি; অথচ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন এগুলিই ইতিহাস। মুসলমান ঐতিহাসেরও প্রায় অনুরূপ ব্যাপার — যারা আদম হইতে ইতিহাসের আরম্ভ। বর্তমানে দেখিতেছি খাদেমুল ঐতিহাসিক বিলাত সাহেব তাঁহার History of Europe-এ একটা সৃষ্টিপ্রকরণ জুড়িয়া দিয়াছেন। ইহার কারণ কি? এখন বুঝিতে পারিতেছি শুধু পৃথিবী নয়, দুনিয়ার সবই সোনাকার। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও আমরা পুরাণ মহাকাব্যের সনাতন আদর্শে কিরিয়া চলিয়াছি; ঐতিহাসিকের চোখ খুলিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি ইতিহাস মহান্ বিরাট; "বিরাট" পুরুষের ন্যায় "সর্বতঃ প্রতিষ্ঠিতোক্তে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"।

জগতে যত ছোট বড় যারা কিছু আছে, অনুসন্ধান করিলে সব কিছুর ইতিহাস পাওয়া যায়। ইতিহাসের মাহাত্ম্যকীর্তন আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কারণ, গোরালার দুধে জল যত বেশী তাহার দোষে আওয়াজও তত চড়া হইয়া থাকে।

কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, ইতিহাসের ছোট-বড় পার্থী স্থানী সকলেরই স্থান আছে। বর্তমান আরব-জ্ঞানের ইতিহাসকে অন্তত করিবার আশা নাই। তবে-বন্ধ দানা বাধ হইতে ঘটনা-প্রবাহ ইতিহাস-খণ্ডের মিত্র আসিয়া পড়িতেছে; কিন্তু সাহসে কেহ অগ্রসর হইতে পারেনা। তরু কবিবাক্য গাইয়াছেন —

"ধনী গণী কো জল বহি আরো
সুরসরি জাব সহারো।
সকল কে পরতাপ মহারুদ্র মাব অনোরুক পারো।"

আরবী আমলের ভীমকর্মা উজবেক সেনাপতি বখ্তিয়ার আলীকুলী-কে আশ্রয় করিয়া আরব-জ্ঞান ইতিহাসে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমরা আরব-জ্ঞান-কে উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধে তৎকালীন সমাজচিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব। আসল ইতিহাসের উপর হাত বুলাইবার সাহস আমরা করিবনা।

(২)

বর্তমান আরব জ্ঞান জৌনপুর শহরের অধিবাসী। তাঁহার পূর্বপরিচয় কিছুই জানা যায় না। আবুলফজল তাঁহাকে "বহতোজা", অর্থাৎ নরপিশাচ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে "বহতোজা" বলিয়াছেন মাত্র। মুসলমান আমলে নাচওয়ালীর কোন সাধারণিক মর্যাদা ছিল না, ঐশ্বর্যেরও প্রাচুর্য ছিলনা। অবশ্যই মুহীর বসন্ত-শোভা বসন্তসেনা-র প্রাসাদের ন্যায় আরব-জ্ঞানের বাড়ীর "অন্ত প্রথম প্রকোষ্ঠ" ইত্যাদির বর্ণনা ইতিহাসে আশা করা যায় না; পাটলীপুত্রনগরীর বাসবদত্তা মাধবসেনা-র সৌভাগ্যও জৌনপুরী নাচওয়ালীর হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরনগরী ছিল পূর্বী-মুসলমানদের রাজধানী — হিন্দুস্থানে ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বারাণসীধাম, মুকুমার শিল্পচর্চা এবং সঙ্গীতে নিজীর প্রতিদ্বন্দ্বী। আকবর-রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে ইব্রাহিম-কে পরাজিত করিয়া উজবেক-সর্দার আলীকুলী খান-জমান জৌনপুর দখল করিলেন। এই বৎসরেই আরব-জ্ঞানের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত; তাহার প্রতি আলীকুলী-র প্রেমের দুর্বার-বাণ সহসা অন্তাচলবিলম্বী মেঘের কোলে সন্ধ্যার অরুণিমার ন্যায় মিলাইয়া গেল।

(৩)

আলীকুলী মধ্য-এশিয়াবাসী উজবেকজাতীয় যোদ্ধা। তাঁহার পূর্বপুরুষ মৈমনসী উজবেকদের মাবর খাঁদলাকে কলমবা হইতে তাড়াইয়া হিন্দুকুশ পার করিয়া দিয়াছিল। সেকালের পূর্ব ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সমাট হুমায়ুন অল্প-বিস্তর বিরোধিতাসত্ত্বে মধ্য-এশিয়ার তাতার, মোঙ্গল, উজবেগ, তুর্কমান-জাতীয় তাঁবেদারী ধারাদের ভাগ্যিক সৈন্য-দল সৃষ্টি করিয়া ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন পুনরধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে আলীকুলী এবং তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ এবং অন্যান্য বহু উজবেক সর্দারিবাহে যোগদান করিয়া হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন। দিল্লী দখল করিয়া মোগল সম্রাট হুমায়ুন আলীকুলী এবং অন্যান্য উজবেকসর্দারকে মুলুকের পূর্বাঞ্চলীয় হইতে বিদ্রোহ পর্যন্ত ভূখণ্ডে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। আলীকুলী জৌনপুরের নিকটবর্তী জোমরাণে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং হামজা খাঁ "বহতোজা"-কে [মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত বাংতোজা'র জ্যেষ্ঠপুত্র বাবর] পরাজিত করিয়া জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া পাঞ্জাবের দিকে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে, কোথায় এবং কি ভাবে আলীকুলী আরবজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছিলেন-জানা যায় না।

আলীকুলী ছিলেন শৌর্যে অপ্রমেয় এবং ক্রোধের অপরাজেয়। প্রেমে পড়িবার বাতিক তাঁহার অত্যন্ত

প্রাণ, কন্যুকা হতে ভিন্ন ছিল। আবুলফজল তাঁহার ভগিনী ছিলেন; যে দুর্লভ কাহিনীতে সেই ভগ্নির বর্ণনা দিয়াছেন — বাংলাভাষায় উহা প্রকাশ করা নিতান্ত লজ্জিতের দ্বারা সম্ভব কাজ নহে। তবে এই মাত্র বলা যায়, আবুলফজলের কথা এবং চলনভঙ্গী ছিল যেন হুকোমারী কবিতা — যাহার "পাঠবিচ্ছাসবাক্যে" যেহেতিকেরও মন চুরি যাওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। আলীকুলী সর্ববিষয়ে বেপরোয়া হইলেও তুর্কী মতে খাঁটি মুসলমান ছিলেন; সুরাপান এবং স্বাধী-গ্রাহ্য বস্তুর জন্য কোন হারাম কাজ তিনি করেন নাই। সুরাপান মুসলমান আমলের প্রারম্ভ হইতে হিন্দুস্থানের অভিজাত সমাজে প্রায় সর্বত্র খাওয়ার মতই ছিল। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন হিন্দুরা ভোজনের পূর্বে এবং মুসলমানেরা খাওয়ার পরে পান করে। জিয়াউদ্দীন বারানী-র ইতিহাসপাঠে জানা যায় — সাহেবাপরগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া সুলতানের নিকট হইতে শরাব খাওয়ার অনুমতি পাইতেন; তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শরাব সহ্য করিবার উপযুক্ত বিবেচিত হইত না, তাঁহারা এই অনুমতি হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। এই কারণেই সুলতান বলবন্ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বোঘরা খাঁকে (বাঙ্গালার সুলতান নাসিরউদ্দীন) শরাব খাওয়ার অনুমতি দেন নাই। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর আমলে মদ্যপান বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বাদশাহী শরবতখানা হইতে মটকা মটকা মদ দিল্লীর পূর্ব দরওয়াজার [কলালুন-দরওয়াজা] সামনে চালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সুযোগে দিল্লীর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান রাস্তার উপর উপুড় হইয়া শরাবে মুখ চুমুক দিতেছিল, পিঠের উপর সাহারাওয়ালার ডাণ্ডা তাহাদিগকে তাড়াইতে পারে নাই। যাহা বলিতেছিলাম — কাফের রাজা সংগ্রামসিংহকে পরাজিত করিতে পারিলে তিনি ঢোলপুরী লালে পাথরের প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা খোদাইয়া শরাবে ভর্তি করিবেন। আকবর বাদশা চিতোরী হইতে ফিরিয়া পর্যন্ত সর্বদিন নিষিদ্ধ পানীয় আস্বাদন করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব বাদশা শেষ বয়সে সর্বত্র অন্ধকার দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, সারা হিন্দুস্থানে আমি এবং আমার শেখ-উল-ইসলাম ছাড়া কৃতীয় ব্যক্তি নাই যে শরাব খায় না। বে-ইমান বাদশাহী সমাজে অনেক সেরোক ব্যক্তিও এই বিষয় সন্দেহমুক্ত নহেন। এহেন মুসলমান শরাব খাইলেও আলীকুলী খাঁকুরার হন নাই।

যাহা হৌক, আবুলফজলকে পাইয়া আলীকুলী কাঁপরে পড়িলেন। আবুলফজল ব্রাহ্মণিতা, সুতরাং মুসলমানের পক্ষে হারাম। ইসলাম-রাষ্ট্রে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের স্থান নাই। শরিয়ত অনুসারে বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা ক্রীতদাসী বাঁদীর অন্য কোন স্ত্রীলোককে কাছে রাখা পাপ, সংসর্গ সাক্ষাৎভাবে নিষিদ্ধ — তাহা 'কিন্নুরা' বা খাজিরার জন্যই হউক। আলীকুলী কিন্তু হটিবার পাত্র নহেন; তিনি এই বাদশীকে শরিয়ৎ অনুসারে বিবাহ করিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন — একদিকে মনুপ্রোক্ত "অক্ষত যোনি প্রিয়াস্থনঃ", অন্যদিকে শরিয়ত-প্রোক্ত পুণ্যকাজ। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেব হুকুম দিয়াছিলেন — দিল্লী শহরে কোন পেশাকার বাঈজি পাকিবেনা, হয় সে কাহারও সহিত "নিকা" করিবে, না হয় শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। ইহার পর হইতে নটনাগিনীগণের অদৃষ্ট ক্রমশঃ সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, দিল্লীর বাজারের দুইজন বারনারী দিল্লীশ্বরী হইয়াছিল; একজন আওরঙ্গজেবের মাতি তাহাদের সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিমা লালকুমার; দ্বিতীয় জন অধিক নামজাদা উধম বাই। সম্রাট মহম্মদ শাহ উধম বাইকে বিবাহ করিয়া কুতুসিয়া বেগম উপাধি দিয়াছিলেন; বর্তমান পুরানা দিল্লীর ফাঁসিরী দরওয়াজার বাহিরে কুতুসিয়া বাগ" নামাঙ্কের অম্লান-কুসুম — এই বারনারীর কীর্তি।

(৪)

আয়না-মহলকে বিবাহ করিয়া আলীকুলী খাঁর কিছু দিন আনন্দে কাটিয়াছিল। আলীকুলীর রূপযৌবন, বুদ্ধিমত্তা এবং রাজনীতি পরাক্রমেই মোগল-ধাত্রিনী দ্বিতীয় পানিপত যুদ্ধে জয়ী হইয়া হিন্দুস্থানে মোগল-অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার করিয়াছিল। দিল্লী উদ্ধারের পর আকবরের অভিষেকের বৈরাম খাঁ মোগল সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে অবিজিত দেশগুলি জায়গীর হিসাবে ভাগবাটোয়ারা করিয়া দিলেন। আলীকুলীও এই সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার ভাগে পড়িল অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত সম্ভল। তিনি সরাসরি তাঁহার জায়গীরে না যাইয়া কিছুদিন রাজধানীতে কাটাইলেন—ইহার আসল কারণ, খাঁ-সাহেব আবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন; এবারে কোন ত্রীসঙ্কট ব্যাপার নয়, বাদশার দেহরক্ষী কুতুবী [তূণধারক] বিভাগের শাহম্ বেগ নামক এক অনিন্দ্যসুন্দর কিশোর ছোকরাকে দেখিয়া কামমোহিত হইলেন। পুরুষের প্রতি পুরুষের এইরূপ প্রকৃতিবিরুদ্ধ আসক্তি এবং আনুষঙ্গিক কেলেঙ্কারীকে আবুলফজল বলিয়াছেন, "ebullition of bestial desire in the name of Love." তাঁহার মতে এটা সেই যুগের আরব "বিদাবেতী" (Oxus নদীর পূর্বতীরবর্তী তুর্কিস্থানের) পাপ; কিন্তু মুসলমান ইতিহাসে দেখা যায়, এই পাপ খলিফা হারুণ অল্-রসিদের সময়েও প্রবল ছিল। হারুণ এবং তাঁহার প্রিয়তম বাদ্যযন্ত্র ওয়ালা ধারণকী সম্বন্ধেও আরব ঐতিহাসিকগণ এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রাচীন আরবে এইরূপ পাপ ছিল কিনা জানা যায় না, তবে মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপ হিন্দুস্থানের উচ্চ-নীচ সমাজের সর্বস্তরে শিকড় গাড়িয়াছিল। তিমাউদীন বাবরী সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর উপর ক্রীতদাস মালিক কাফুরের অসীম প্রভাবের মূল কারণ সুলতানের এইরূপ বিপুল আসক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভালমন্দ লইয়াই মানুষ এবং মানুষের সমাজ; সুতরাং মন্দ এবং অশোভনকে বাদ দিলে ইতিহাস রহে না।

এই শাহম্ বেগ আয়না-মহলকে ভালবাসিয়া প্রেমের শহীদ হইয়াছিল; অতএব শাহম্ বেগের পূর্ব-পরিচয় কিছু জানা আবশ্যক।

(৫)

শাহম বেগ্, ইরাণের শাহ্ তহমাস্পের উইগানকের পুত্র। ইরাণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় হুমায়ুন বাদশাহ্ উইগানকের এই পুত্রকে দেহরক্ষী কুতুবী-পর্যায়ে ভর্তি করিয়াছিলেন। এই তূণধারকদলকে অশ্বারোহণে বাদশার সঙ্গে বিশ্বস্তরূপে (loyal page) হিসাবে কাজ করিতে হইত; ইহাদের মধ্যে রূপের, কুৎসিতের স্থান ছিল না। রূপে, গুণে, লাবণ্যে শাহম্ বেগের জুড়ি ছিল — তাহার সহকর্মী খুশ্‌হাল বেগ নামক আর একটী কিশোর বালক। শাহম্ বেগ লেখাপড়া শিখিয়াছিল, এবং কিছুদিন মীর আবুল্ সিয়াদ্ বোখারী নামক শিল্পীর এক পটের চেলাগিরিও করিয়াছিল। হুমায়ুন বাদশার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আত্মীয় দুই-বেগের পুত্র আব্দুল রহমান শাহম্ বেগকে দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছিল। দুই জনের মধ্যে এই সূত্রে পবিত্র প্রেমে আশেক-মাশুকের [Lover and the Beloved] সুধিয়ানা প্রেমে পরিণত হইল। এইরূপ অনেকটী ব্যাপার আকবর বাদশার রাজত্বের প্রথম ভাগে ঘটিয়াছিল। শাহকুলী খাঁ (১) নামক উচ্চপদস্থ আমীর এইরূপ কোন কারণে আকবর-রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে চাকরী ইস্তফা দিয়া মোগি

১। Akbarnama (Eng. trans.) vol. ii, p. 121.

করিয়াছিলেন। তাহার খাঁ নামক এক ব্যক্তির হত্যা-সাধনে জানিত। শাহজাদা খাঁ এই ব্যাপারের তদন্তে প্রেরণে পড়িলেন, তখন তাঁহার হয়ত হুমায়ুন-বৈরাগ খাঁ হইতে খুব কম ছিলনা। আবুল ফজল বলিয়াছেন, "এই হত্যা ব্যাপারে হয়ত নিশ্চিন্ত পরিত্রি হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জানেন, ইহাতে পরিত্র হওয়া এবং কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ কাহাকে ভবিষ্যতে থাকিতে পারে। আমরা হজরত [আকবর সম্পর্কে] কোন প্রকারেই কল্পনা করিতে পারি যে, তিনি এইরূপ কাজ নিজেই করিয়া মনে করিবেন। তাঁহার হুকুমে শাহজাদার নিকট হইতে ঐ ব্যাপারে প্রেরণ করিয়া যাহা-খানার কথা বলা হইল। ইহাতে তিনি জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া রাজ-ঐশ্বর্যের ভোগ না করিয়া মৃত্যু-অভিমুখে চলিয়া গেলেন। ইহার খাঁ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া একটী কবিতা পর্যন্ত আওড়াইলেন, কিন্তুতেই কিছু হইল না। কিছুদিন পরে হৈয়দ বরহার আঘাত তিনি পুনঃ ফিরিয়া চাকুরীতে যোগিত হইলেন। কয়েক বৎসর পরে 'জুহুরী'-পটনের জন্য একজন সম্রাটের বিশ্বস্ত সৈনিক জাহাজ খাঁ ঐ একই ভাবে পলাইয়াছিল। একটী সুন্দর ছেলের কবিত্ব জাহাজ খাঁ বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছে শুনিয়া আলা হজরত হুকুমকে পুনরায় কবিবার হুকুম দিলেন। একদিন রাত্রে ঐ ছেলেকে লইয়া জাহাজ খাঁ উধাও হইল। বাদশার হুকুমে বিজ্ঞা উজুক খাঁ তাহাদের ধরিয়া আনিল এবং তাহাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইল।" (১)

সৌভাগ্যে পরস্ত ব্যক্তিরা কেন এই পাপ করিত ঐতিহাসিক বলিতে পারিবেনা; তবে পূর্বাপর সম্বন্ধ হইতে দিল্লী পর্যন্ত এই পাপের প্রসার ছিল এবং বর্তমানেও আছে — ইহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বাবর বাদশা তাঁহার "তুজুক"-গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন সমরকন্দ এবং কবিবার পর যখনই সুযোগ পাইলেই তাঁহার সুন্দর সৈনিকদলকে জোর করিয়া করিয়া লইয়া যাইত — অবশ্য ইহা করিবার মতলবে নয়। এক হিন্দুস্থানী যোদ্ধাদলের সুন্দরী-র সেবকী পরদেশে বিদেশে অন্যায়ভাবে দেখিয়া কাদবিহ্বলিত হইয়াছিলেন। এক / কবি কবিতায় তিনি এই সমস্ত অসহায়তাকে "ফিজিবোশ," (মাদুকুলীওয়ালা) দলের জন এবং তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন — এই কবিতার ইংরেজী অনুবাদ আছে। হালের দুইটী ঘটনা আমাদের জানা আছে — ঐতিহাসিকের কান হুজুর হইয়া যেতাম-মহল বন্ধ না হইলে তাহার পেশা অচল হইয়া পড়ে। প্রায় ২৬ বৎসর পূর্বে দিল্লীর St. Stephen's College হইতে এইরূপ পাপব্যাধিগ্রস্ত এক যুবক, পরীক্ষার খাতায় তাহার "থাওক" বা প্রেয়সীকে কল্পনার সাহায্যে চুরি করিয়া — কি কি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবে — পরীক্ষকদিগকে নিবেদন করিবার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল — অন্ততঃ হইবার কথা ছিল। ৮১১ বৎসর পূর্বে তখনটা দেখিতে গিয়াছিলাম। অন্য কোন সরকারী পদস্থ পর্যন্ত না পাইয়া ঐ ষ্টেশনের একজন অল্পবেতনভোগী কুলীকেই সঙ্গে লইলাম — নাম সরওয়ার খাঁ, জাতি মোঙ্গল, দাদী দ্বিতীয় বার আসল বাদশার অশ্বারূঢ়। লোকটী হতাশ প্রেমিক, একটু সময় ব্যবহারে পরিচয় যায় — পথিককে নিজের দুঃখ জানাইয়া শান্তি পায়। আমার সহিত কথাবার্তায় সরওয়ার খাঁ-র মনের দুয়ার খুলিয়া গেল। সে বলিল, — "পূর্বে আমি রেলে বিল্লীর কাজ করিতাম, এক নাপিতের ছেলেকে ভালবাসিয়া আমি ফেরারী হইয়াছিলাম, এবং ফেরারি হইয়াছি। "থাওক"-কে [উক্ত সৌভাগ্য-বঞ্চন] আমি সমস্ত রোজগার

১। Akbarnama (Eng. trans.) vol. iii, p. 404.

পাওয়াইয়াছি। সে অতি গরীব, ঘর বাড়ী কিছুই ছিলনা। আমি তাহাকে একটা আলী করিয়া তাহাকে সংসারী করিয়াছিলাম। সে কাজের, যৌবান; আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার কাছে আমি নিজের রক্ত দিয়া চিঠী লিখিয়াছিলাম — [এই বলিয়া তাঁর হাতে ক্ষতীর উপরে ক্ষতচিহ্ন দেখি]। "জলেম" [প্রেমের অত্যাচারী] ইহাতেও সাড়া দেয় নাই; হাতের যা শুকাইয়াছে; কিন্তু কলিজার খুন [রক্ত] এখনও ঝরিতেছে। আমি চাকরী করিব আর কাহার আশায়? শুকাইবার জন্য এখন কুলীর কাজ করিতেছি।"

সাহজাদা দারার গুরু "লরমন" সাধনার প্রারম্ভে অস্টিন নামক এক ফ্রেঞ্চ ধনিক-পুত্রকে দেখিয়া তাহাকেই প্রেমধন সমর্পণ করিয়াছিলেন। অস্টিনকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সুফী সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল — ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি বলিতেন —

"ম বি-বয়ম্ খোদা-ইশ্‌ক্ অস্টিনে আস্ত ইমা বিয়ম" [তাহারা আমার খোদা অস্টিনে বিশ্বাস করে।]। শাহ্ বেগ-কে দেখিয়া আলীকুলীর সুপ্তিমানা প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছিল কিনা জানা যায়না; তবে দুই এক ছত্র কবিতায় তাঁহার প্রবল বিরহবেদনা সুফী ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন — "[স্বার্থ] দুঃখ আমার নেস্ত; খুন (রক্ত) আমার পরাব, বেদনা আমার মিঠাই, নিজের কলিজাই আমার জন্য।"

(৩)

দিল্লী হইতে আসা-মন লইয়া আলীকুলী দক্ষিণে ফিরিলেন। সেখানে বিরহ-বেদনা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। লোকলজ্জা এবং রাজ-দণ্ডের ভয় উপেক্ষা করিয়া শাহ্ বেগ-কে হরণ করিবার জন্য তিনি দিল্লীতে চর পাঠাইলেন; সকলের অলক্ষ্যে শাহ্ বেগ আলীকুলীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল। আলীকুলীর কাছে শাহ্ বেগ স্বর্গের দেবীস্বরূপা, তেমন জানা নাই। শাহ্ বেগ সর্বদা নমাজ এবং কোরান শরিফ পাঠে মশগুল; হারেমে কোন সময় উপর তাহার নজর ছিলনা। কামাসক্ত কুলিরা তাহাকে সাহজাদা দুর্দান্ত আলীকুলী নাকি যাদু করিয়া গেল; সাহ্ বেগকে সহজে ধর্ষণিকা দেওয়ার জন্য বহু কুলীন-কন্যাকে ওস্তাদ, যাঁর হৈমন নামক কন্যাকে নিযুক্ত করা হইল, পরমধ্যান কুলিয়া বাঁ খানজমান্ খানসামার মত শাহ্ বেগের সেবা করিতে লাগিলেন। আলীকুলীর চোখে শাহ্ বেগ বাদশার উপর বাদশা। শাহ্ বেগকে তিনি "আলা হজরত" বলিয়া অভিবাদন করিতেন এবং পরবারী তারিখে কুর্নিশ করিতেন। আলীকুলী-কে শাস্তি দেওয়ার মত ক্ষমতা আকবর তখনও অর্জন করেন নাই। অভিভাবক বৈরাম খাঁ উজবেগদলকে সঙ্গে করিয়া চলিতেন। খান্-জমানের জন্য বেগার একটী হেরুম বেগার পাঠাইয়াছিলেন; তিনি ঐ বেগার শাহ্ বেগ-কে পরাইয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন। শাহ্ বেগের ইচ্ছা অনুসারে আলীকুলীর শাসনাধীনে প্রদেশে সমস্ত শরিয়ত-বিরোধী কাজ নিষিদ্ধ হইল; মুসলমানদের উপর ধর্মের অনুশাসন জারি করিবার জন্য "মোহতিব" (Censor of Morals) নিযুক্ত হইল।

নূতন প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আলীকুলী খান্-জমান বিবাহের জন্য একটী নূতন পন্থা গ্রহণ করিলেন। ইহার নামকরণ হইয়াছিল "ঈদ মেবারক" (৩) বা মঙ্গলবীর্য; বর্তমানে ইহা হতভ্রী হইয়া খান জমানের মূর্তি "কামনিয়া" নাম ধারণ করিয়াছে। সংক্ষেপে, আলীকুলী শাহ্ বেগের কাছে প্রেমের ব্যাপারে কোনা

৩। Akbarnama ii p. 397.

হোসেন হইয়া পড়িলেন. প্রেমাস্পদের জন্য তাঁহার "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর", অবস্থা।

(৭)

অন্য চিত্রে দাদুভাই বেগ কুচুপাত্তার উপর বুদ্ধির খেলা। কয়েক মাসের মধ্যে শাহ্ বেগের দৃষ্টি-শক্তি খসিয়া পড়িল. আলীকুলীরও অনুরূপ অবস্থা, তবে শাহ্ বেগ-কে অন্ধ কিছু তাহার রহিল না। যাহা কিছু হয়োন তাহাই এই দুইজনের হাতোন হইয়া উঠিল। বদাউনী বলিয়াছেন যেখানে প্রেম বা কাম, সেখানেই শয়তান, নাচ-গান, ও শয়তানী কারবারী। ছয়তাত্রিংশী আরামজান একদিন ঘরে অন্ধকার অবস্থায় আলীকুলীর অন্ধকারে তাকাই ছিল। এখন আলীকুলী ও শাহ্বেগের প্রেমের অভিনয় নাচ-গানে জমজমাট করিবার জন্য আরাম-জানের ডাক পড়িল। কিছুদিন যাইতে না যাইতে আমিরের উপর শকুনের দৃষ্টি পড়িল। একদিন শাহ্-বেগ আলীকুলীর কাছে আরামজানকেই চাহিয়া বসিল। আলীকুলী বিনা দ্বিধায় বিবাহিতা স্ত্রীকে শাহ্ বেগের অঙ্কশায়িনী করিল। আলীকুলীর সর্বস্ব ত্যাগ করেও শাহ্ বেগ তাহার পূর্ব প্রেমী আব্দুর রহমানকে ভুলিতে পারে নাই। আব্দুর রহমানের জায়গীর ছিল কৈথাবাদ জিলায়। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রায়ই হইত। একদিন শাহ্ বেগ রহমানের আবদারে আরাম-জানকে তাহার হাতে ছাড়িয়া দিল। আব্দুর রহমান পরিতৃপ্ত অনুরাগে বিভোরবা আরাম-জানকে "নিকা" করিয়া আবার সেবা করিল।

ইতিমধ্যে শাহ্ বেগের অপহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিবা ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য আলীকুলীর কাছে বাংলাদেশ দরবার পৌঁছিল; মরু সম্রাট যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। খান্ জমান যুবা আলী-কে বৈরাম খাঁর নাবের পীরমহম্মদ খাঁ নাসির-উল-মুলুকের কাছে এক পত্রসহ প্রেরণ করিলেন। খান্ জমান্ বাহাদুর হয়াকে সদা জান করিতেন। চিঠিতে এমন কিছু লেখা ছিল (৪) যাহা পড়িয়া পীরমহম্মদ আগুন হইয়া গেলেন। পত্র-বাহকের সহিত কোন বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি হুকুম দিলেন, হাত পা বাঁধিয়া ইহাকে নিলী-দুর্গের বুরুজ হইতে নীচে ফেলিয়া দাও। পত্রবাহক যুবা-আলী নিজ নাম সার্থক করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইল। ইহার পর আলীকুলীর উপর কড়া হুকুম হইল শাহ্ বেগ-কে পত্রপাঠ পাঠাইতে হইবে। আলীকুলী বশ্যতা স্বীকারের জন্য কিছুদিন পা-টাকা দেওয়ার জন্য শাহ্ বেগকে অন্তত পাঠাইলেন। শাহ্ বেগ আমিরী চালে তাহার পুরাতন খরিদার আব্দুর রহমান বেগের আস্তাবলে চলিল। জৌনপুর শহরের আঠার ক্রোশ দূরে কৈথাবাদ জিলায় মুহম্মদ-পুর নামক স্থানে আব্দুর রহমানের এক সুন্দর প্রমোদ-ভবন ছিল। দুধের উত্তানের মধ্যস্থলে একটী কৃত্রিম হ্রদ। হ্রদের জলরাশির মধ্য হইতে উঠিয়াছে জল-মহাল. কামুক ও অঙ্কশায়ীর দেহ-মনের তাপ জুড়াইবার এমন স্থান আর হয় না। এইখানে কয়েকদিন পরম সুখে থাকিয়া আরাম-জানের অভাবে সে বেশ-আরাম অনেকাংশে অনুভব করিতে লাগিল। আলীকুলীর ক্রুদ্ধের ভয় এখানেও শাহ্ বেগ সদা করিল, সেই বাদ্‌শা. আব্দুর রহমান তাহার কথার কথা। একদিন শাহ্ বেগ আরাম্-জানকে প্রত্যর্পণ করিবার বাণী আব্দুর রহমান-কে জানাইল। আলীকুলী অপেক্ষা আব্দুর রহমানের আভিজাত্য ও

৪। Badayuni, vol. ii, p. 16. আবুল ফজল লিখিয়াছেন, যুবা আলীর ঔদ্ধত্য এবং অন্যান্য কথাবার্তায় ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। (Akbarnama ii p. 107).

আড্ডা-স্থান কিছু অধিক ছিল ; ঘরের বিবিকে বাঁদীর মত শাহ্ বেগের ভোগের জন্য বাহির করিয়া দিতে সে রাজী হইল না। শাহ্ বেগ আব্দুর রহমানের আস্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারিল না। তাহার অনুচর বর্গের সাহায্যে শাহ্বেগ আব্দুর রহমানের হাত পা বাঁধিয়া বলপূর্ব্বক আরাম-জানকে নিকটবর্ত্তী উদ্যান বাটিকায় লইয়া গেল। সেখানে একদিন মাতালের আলয়ে আরাম-জানের রূপ ও পরাণের মেলায় শাহ্ বেগ বিহ্বল — এমন সময় আব্দুর রহমানের ছোট-ভাই সদল অনুচরবর্গের সহিত ঐ বাগান চড়াও করিল। শাহ্ বেগ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া কাবুলের দিকে যাইতেই তীরবিদ্ধ হইয়া গতাসু হইল। (১৪৫১ খ্রীঃ)

গজার পূর্ব্বতীরে আলীকুলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে কাহারও রক্ষা করা হয়ের সাধ্য নাই। আব্দুর রহমান বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র প্রাণপণে পশ্চিমমুখী পলাইতেছিল. পশ্চাতে আলীকুলী রক্তপিপাসু বাঘের ন্যায় ধাবমান। অবশেষে ধরা পড়িয়া আব্দুর রহমান রক্ষা পাইল। আলীকুলী মাতৃকের জন্য শোকবস্ত্র ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরপুর ফিরিয়া আসিল। গৌরপুর শহরে গোমতীতীরে এক তালাবের কিনারায় শাহ্ বেগকে সমাধিস্থ করিয়া আলীকুলী উহার উপর এক সু-উচ্চ মকবরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

শাহ্ বেগের শোকাবহ চড়ুয়ার তারিখ লইয়া প্রেমিক-মোল্লা বদায়ুনী জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন — শহিদ শহীদ গুল।

স্ত্রীলোকঘটিত কোন ব্যাপারে প্রাণ হারাইলেই বদায়ুনী তাহাকে শহীদ বলিয়াছেন। তিনি স্বয়ং একবার এইরূপ অপরের জন্য শহীদ হইতে পারেন নাই। বদায়ুনী-শ্রেণীর মোল্লারা যাহাকে "প্রেম" বলিতেন, শেখ্-উল্-ইসলাম উহাকে বলিতেন "ব্যভিচার"। আজকাল "শহীদ" উপাধিটা কাজে হারাইয়া হিন্দুস্থানেও ঢুকিয়াছে। স্বাধীনতালাভের পর শহীদের যে রকম ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে উহাতে মনে হয় হিন্দুস্থান পাকিস্থান হইবার অচিরে শহীদস্তান হইয়া উঠিবে।

(৮)

শাহ্ব বেগের চড়ুয়ার পর আলীকুলী প্রায় একাকী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। আকবর চিনিবার তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পরাজয় চাকিবার জন্য তাহাকে ক্ষমা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধকে আলীকুলী একটা খেলা মনে করিতেন। তিন চারি হাজার সৈন্য লইয়া লক্ষ্ণৌর নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি বিশ হাজার পাঠানে সৈন্যকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঊনুতে বসিয়া পানা খাইতেছিলেন — এমন সময় চর সংবাদ লইয়া আসিল — শত্রুসেনা শিবির আক্রমণ করিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া আলীকুলী মোসাহেবগণের সঙ্গে পাশা খেলিতে বসিলেন। ইতিমধ্যে আর একজন ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া খবর দিল — পাঠানেরা উজবেগ সৈন্যকে হটাইয়া শিবিরের পশ্চাদ্ ভাগে লুট আরম্ভ করিয়াছে। এইবার খান্ জমান খেলা ছাড়িয়া যুদ্ধের পোষাক পরিলেন। কাজেই তাঁহার অশ্বারোহিণী কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ সমর যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাকে হুকুম থাকিবার আগে দিয়া আলীকুলী মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া একাকী ভীম-বিক্রমে লুণ্ঠন-ব্যস্ত পাঠানদলের উপর আপতিত হইলেন।

শাহ্ব বেগের চড়ুয়ার ৮ বৎসর পরে ৮ই জুন রবিবার (১৪৫৯ খ্রীঃ) গজার দক্ষিণতীরে আলীকুলী এবং বাহাদুর খাঁ যখন রাত্রিবেলা শিবিরে বসিয়া প্রধানামাত্যগণের সহিত নাচগানের আসরে জীবনের শেষ পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল, তখন রাত্রির অন্ধকারে কাহারা নগর হইতে গোপনে কুচ করিয়া গঙ্গা পার

হইয়াছিল। শাহের তিন দুটি বিশ্বস্ত আমলের বিরুদ্ধে আলীকুলী হইল। উহার মধ্যে একটি পলাতক বাদশাহী কুচী খুশরোজ বেগের অন্তর। শাহের বেগের লোক বুলিবার জন্য আলীকুলী খুশরোজবেগকে হাত করিয়া তাহাকে "আহ-ই-হারেম" বা অন্তঃপুরের হরিণ নাম দিয়াছিল। বিরাট ভিন্নত্ব এক অদ্ভুত উপায়ে সনাক্ত করা হইয়াছিল। আলীকুলীর পরিচিত এক ব্যক্তি উহা চিনিয়াছিল; কিন্তু আকবর বিশ্বাসের হাতের না পারিয়া প্রমাণ পাবী চলিলেন। আলীকুলী সর্বদা মুখের ডান দিকে বাঁধিয়া পান চিবাইত এবং এই জন্য ঐ দিকের হাতের দাঁত কালো হইয়া গিয়াছিল। মরা মাথা ইকড়াইয়া দেখা গেল সত্য সত্য একদিকের দাঁতগুলি কালো। দরবারের বৃদ্ধ মুসলমান ব্যক্তি এতদিন চাঁদিয়া বলিয়াছিল সেই আলীকুলীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া আকবর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

শাহম বেগের মৃত্যুর পর হইতে আমাদ-জানের কি হইয়াছিল কেহ বলিতে পারে না। আলীকুলীর জীবনরাত্রির সে অংশে আমাদ জানের কোন সন্ধান নাই।

"প্লেটোর 'সিম্পোজিয়মে'র কথা সকলেই জানে; উহা একটি বন্ধু-বৈঠকের আমোদ-প্রমোদ ও আলাপ-আলোচনার বিবরণী — বন্ধুরা সকলেই মহামনস্বী ও মহারসিক, প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি। ঐ বৈঠকের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল — প্রেম। প্রেমের মত তুচ্ছ ও প্রলোভনীয় প্রকরণকে আজ যে সকলের আলোচ্য হইল, সেখে তাঁহারা এমন এক প্রকার প্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, যাহা ইংরেজের আইনে আদালতে বন্ধনীয়! সমাজের অধিকাংশ লোকের মতই আমার মনেও, এরূপ প্রেমের কথায়, চিরদিনের অভ্যাসবশতঃ একটা ধাক্কা লাগে — যেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়, একটু বিরক্তির উদ্রেকও হয়। কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন মহামূর্খ নই যে, নিজের রুচি-অরুচিকেই অভ্রান্ত বিশ্বাস করিয়া, মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠদলের সুবিচারিত মত-জ্ঞানের নিন্দা করিব! যে সকল কুশিক্ষিত ও কর্কশ প্রকৃতির মানুষ 'টীজ' বানর অপেক্ষা বড় ভক্ষণ করে, আমি তাহাদের সম্বন্ধেও আমার মাথা ঠিক রাখিতে পারি। আমার রুচি এবং সোক্রাতেস (Socrates) ও তাঁহার বন্ধুদের রুচি — এ দুইয়ের মধ্যে কোনটি উচ্চতর সে বিচার করিবার স্পর্ধা আমার নাই; — আমি কেবল আমার বিরুদ্ধবাদী ঐ মহামান্য ব্যক্তিগণের যুক্তি ও বাদানুবাদ অতীব শ্রদ্ধাসহকারে শুনিবার অধিকারী। — যে সংস্কার একটা সহজাত অবোধ সামাজিক সংস্কারমাত্র, তাহাকেই ধর্ম বা নীতিজ্ঞানের মাপকাঠি জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; এবং যে কর্ম বহু মহাপুরুষের চক্ষেও নিন্দনীয় হয় নাই তাহাকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

— ক্রীতদাস বেদ ("দাসত্ব")

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি — প্রথম, সে রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায় অভিনব মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী — বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিবা-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

শিল্পী ও সমালোচক

(পূর্বানুবৃত্তি)

আনেই — তুমি যা' বলছ, তা কি তুমি সত্যি বিশ্বাস কর!

পিগমেলিয়ন — তোমার এমন সন্দেহের কারণ কি? চেহারাটা যে আমার! এ শুধু আমি বলে' নয়, জীবনের যে দিকেই দেখ — ঐ আকারে, ঐ রঙটাই ত' সৃষ্টির মূলে রয়েছে। প্লেটো বলেছেন, নাচের সময়ে দেহের যে ছন্দোময় সীমাবদ্ধ ভঙ্গিমা দেখা যায় তাইতেই আমাদের চিত্তে ছন্দ এবং সুষমাবোধ জাগে। মিউজাদের ওপর যখন যখন যে অপূর্ব সঙ্গীত প্রেরণা জাগাত, সে সমস্ত অনুভূতি তাঁর ছিল — যার জন্যে মানুষটার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয় — সেই মিউজাদের তেমনই একটা প্রেরণার বলে বলে'

উঠবেন, — বিশ্বাসের জন্যে একটা দৃষ্টি, একটা সংস্কার কিছু চাই। বড় সত্য কথাই তিনি বলেছিলেন — যদিও সে যে কি জানবে সত্য তা তিনিও জানতেন না। হাঁ, ঐ আকার বা মূর্তির ভেতর বড় আর কিছু নেই — সৃষ্টির পরীক্ষায় সহজ ঐ মূর্তিটা সহজ। দুঃখকে যদি একটা রূপ দিতে পারো তবে দুঃখও রমণীয় হয়ে উঠবে। সুখকে একটা কিছু দ্বারা যদি ব্যক্ত করতে পারো, তবে সুখও একটা আনন্দ-ঘন আবেশ হয়ে উঠবে। কোন লোক দুঃখে তোমার হৃদয় যদি জর্জরিত হয়, তা হ'লে ছন্দেতে বা ধ্বনির ঝঙ্কারের (Constance) মুখ থেকে তাদের সেই ভাষা শিখে নাও, দেখবে সেই বাঁধনের প্রান্তটা অতিরিক্ত ধর, তখন দেখবে যে, ভাষায় রূপ দিতে পারলেই অত বড় দুঃখেও সান্ত্বনা পাওয়া যায়; ঐ যে রূপ — ওটাই বেদনাকে যেমন প্রকাশ, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তার নিরাকরণও হয়ে যায়। আনন্দের বেলাতেও তাই — ঐ আকার বা রূপের সাধনা করলেই দেখবে, রসসৃষ্টির, এমন কোন যন্ত্র নেই যা তোমার কাছে ধরা দেবে না।

আ — তুমি যে শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছ তা বড়ই প্রীতিকর বটে। কিন্তু ঐ রকম চমৎকার প্রতিবেশের মধ্যে যে সব ক্রিটিক তৈরী হবে তাদের প্রতিভাটা কি রকম হবে শুনি? তুমি কি বিশ্বাস কর যে, যারা সৃষ্টি করে সেই সব শিল্পীরা ক্রিটিকের কথায় কিছুমাত্র কান দেয়?

পি — ক্রিটিকরা অবিশ্যি আর্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চাইবে। কিন্তু তার জন্যে কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে তারা নজর দেবে না, সেই মূলটারই তৈরজসম্পাদন করতে চাইবে; নতুন রকমের পিপাসা, নতুন কায়দা জাগিয়ে তুলবে, নিজেদের হৃদয়ের দৃষ্টি, ও মহত্তর মনোধর্ম নিয়ে তাকে এমন সহজ করবে যে, সে মূলের আর বাধা না দিয়ে পারবে না।

আ — তবু এটাই কি ঠিক নয় যে, কবিরাই তাদের কাব্যের গুণদোষ সবচেয়ে ভাল বোঝে — চিত্রকর তার ছবির বিচার নিজেই যেমন করতে পারে তেমন আর কেউ পারে না? প্রত্যেক শিল্পকলায়, শিল্পকর্মটির সোজাসুজি অনুভবের ভার সেই শিল্পীরই মনে, অতএব তারই বিচারটা হবে সবচেয়ে মূল্যবান।

পি — তা ত' বটেই! শিল্পীর শিল্পকলায় শ্রেষ্ঠ সমালোচক, এ কথা সত্য হওয়া দূরে থাক, কোন লেখিকার বড় কবি বা শিল্পী কখনো পরের রচনা বুঝতে পারে না, নিজের রচনারও সঠিক বিচার করতে পারে কিনা সন্দেহ। কল্পনায় যে একাগ্র দৃষ্টি না হলে কেউ শিল্পী হতে পারে না, তারই তীব্রতায় মুখ রূপ-গ্রাহিতাশক্তি কমে যায়। সৃষ্টিকাজনায় প্রবল আবেগে সে কেবল নিজের লক্ষ্যটির পানে অন্ধভাবে ছুটে চলে। তার সেই রথচক্রের ধূলিজালে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়; ঐ কাজে মহাজনীরা — সেই সব দেবতারা — কেউ তাঁদের দেখতে পান না; কেবল কতকগুলোকেই চোখে পড়ে — যাদ, ঐ পর্যন্ত।

আ — তুমি বলতে চাও, খুব বড় কবি-শিল্পী যাঁরা তাঁরা তাঁদের থেকে ভিন্ন যে সব কবি-কর্ম তার সৌন্দর্য বা রসরূপত্ব স্বীকার করেন না?

পি — সেটা তাঁদের পক্ষে অন্যায় — অসম্ভব। কীট্‌সের 'এণ্ডিমিয়ন' পড়ে' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন, "চিন্তাসেবহীন রূপ-পিপাসায় বেশ একটু কবিত্ব আছে বটে"; সেলী সর্বপ্রকার

ধর্ম-নীতির বিরোধী ছিলেন বলে' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নতুন ধর্ম-মতে তাঁর মন সায় দেয় নি; তার কারণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার রূপ-সৌষ্ঠব যোটেই ছিল না, তার বাঁধুনি কেমন ঢিলে ঢালা। আর বায়রন—যিনি ছিলেন একটা বিরাট অথচ আধখানা মানুষ—যাঁর অদ্ভুত-সুন্দর ব্যক্তিত্ব ছিল অক্লান্ত — সেই বায়রন, ঘোষবিহারী কবিকেও যেমন, চুল-চুলচেরা কবিকেও তেমনই, গ্রহণ করতে পারেন নি; কীটসের কবিতার অপূর্ব সৌন্দর্য তাঁর চোখেই পড়েনি। মিলটন কাব্যের উপাদান-গুলোর আলাদা উল্লেখ করতেন বলে' শেক্‌স্‌পীয়রের কারুরীতি বুঝতে পারেন নি। অ-কবি যারা তারাই পরস্পরের কাব্যের গুণকীর্তন করে' থাকে, এবং তাই হ'ল তাদের মতে উদারতার পরিচয়। কিন্তু সত্যিকার স্রষ্টা কবি-শিল্পী, যাঁরা তাঁরা তাঁদের নিজের প্রতিভে নিজেদের দৃষ্টিতে যেমন ক'রে জীবনকে দেখেছেন, তার থেকে অন্যরকম করে' দেখানো বরদাস্ত করতে পারেন না। দ্রষ্টার যতকিছু বিচার-বুদ্ধি ঐ সৃষ্টি-কর্মেই ব্যাপৃত থাকে, সে-বুদ্ধিকে অপরের সৃষ্টিকর্মে প্রয়োগ করবার অবকাশ না পাওয়াই সম্ভব। যে নিজে কিছু করে না, সে-ই কর্মের বিচারক হবার উপযুক্ত।

আ — তুমি কি সত্যিই তাই মনে কর?

শি — হ্যাঁ, সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিটা সঙ্কীর্ণ, গতিবদ্ধ হয়ে পড়ে; আর ধ্যান-চিন্তায় সেটা প্রসারিত হয়।

আ — তা' হলে' টেক্‌নিকের সম্বন্ধে কি বলবে? প্রত্যেক আর্টের এক, একটা স্বতন্ত্র টেকনিক আছে তা'তো মানো?

শি — নিশ্চয়। প্রত্যেক কলা-শিল্পের ব্যাকরণ আছে, তার করণ-উপকরণও আছে। ও দুটোর সম্বন্ধে তর্কেরো কিছু নেই; যাদের আদপে কোন যোগ্যতা নেই তাদের ঐ টেকনিকটাই খুব নির্ভুল হতে পারে। কিন্তু ওর নিয়মগুলো খুব নিখুঁত ও নিঃসন্দেহ হ'লেও কল্পনার যোগে সেগুলোকে এমন সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে হয় যে, মনে হবে, তাদের প্রয়োজনটাই যেন অপূর্ব। টেকনিক জিনিসটা আসলে শিল্পীরই সৃষ্টি। বড় কবি যিনি তাঁর ছন্দোরীতি তাঁর নিজেরই। যিনি বড় চিত্রকর তিনি এক বই দুই রীতি মানেন না, সে-ও তাঁর নিজেরই রীতি।

আ — যাক, আমার যা জিজ্ঞেস করবার ছিল তার সবই করা হয়েছে। এখন আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে —

শি — আহা! আমি বলছিলুম তুমি আমার সব কথা যেন নাও। লোকে যখন আমার কথা যেন নেয় তখনই আমি বুঝতে পারি যে আমার বক্তব্য ঠিক নয়।

আ — যদি তাই হয়, তাহ'লে আমি আর তোমাকে জানতে দেবো না—তোমার কথা আমি যেনে নিয়েছি কিনা। কিন্তু আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে। তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছ যে, সমালোচনাও এক রকম সৃষ্টিকর্ম। ওর দ্বারা যত-কিছু আশা করা যায়?

শি — এর পর যা' কিছু বড় কাজ তা ঐ সমালোচনার দ্বারাই হবে। সৃষ্টির কাজ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে — বিষয়বস্তুও যেমন, বৈচিত্র্যও তেমনি কমে আসছে। আমার ত' মনে হয়, সৃষ্টি করতে যা' বোঝার তার সিকি ফুরিয়েছে। যে আবেগ থেকে ওর জন্ম হয় সেটা বড়ই আদিম, বড়ই সরল আর স্বাভাবিক। সে যাই হোক, এটা খুবই

সৃষ্টির যে সৃষ্টি করবার বিষয়-বস্তু যেমন একদিকে তেমনি আরেক দিকে সমালোচনার বস্তু দিন দিন বেড়ে উঠছে। মানুষের মনোভাব যেমন বদলাচ্ছে তেমনই দৃষ্টিভঙ্গিরও অন্ত নেই। জগৎ যত এগিয়ে চলেছে, ততই অবিরত বস্তুরাশিকে একটা নূতন দেখার প্রয়োজন বাড়ছে বই কমছে না। সমালোচনার কাজ এখন যেমন আবশ্যক হয়েছে এমন আর কখনো হয়নি। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে — সমালোচনার কোন প্রয়াস আছে কিনা। আমার মনে হয়, তার জবাব আমি এর আগেই দিয়েছি, কিন্তু আরও একটা কথা বলবার আছে। এই যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি, এই যে তারতম্যবিচার ও রস-বিচার, এর থেকেই আমাদের চিত্তের প্রসার হয় — শুধু যা জগতের সঙ্কীর্ণ সংস্কার ভাঙিয়ে উঠতে পারি। এক সময় ছিলেন যাঁরা মানুষে মানুষে অস্পৃশ্যতা-দূষণের জন্য সবাইকে দুষিয়েছিলেন যে, বিবাহ করলে যবনদাস-বাণিজ্যের ক্ষতি হবে। আমাদের কালে আর একদল উঠেছেন, এঁরা মানুষকে প্রেরিত হতে বলেন, অথবা এমন একটা ধোঁয়াটে রকমের নীতি-কথার লোহাই দেন, যা' সূক্ষ্ম তর্কের বস্তু, যেহ সাধারণের কাছে একটা ঢেলো কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। এঁদের নানারকম শান্তি-সমিতি ও শান্তি-বাহিনী আছে, তারপ্রবণ মূর্খেরা তাতেই মেতে ওঠে; যারা কখনো ইতিহাস পড়েনি তাদের বড় ভাল লাগে ঐ সব। কিন্তু এরকম হল্লাবোলের কথা নয়; কারণ তার কোন স্থিরতা নেই, তার মূলে রয়েছে তারাবাজির আতিশয্য। যারা ঐ রকম শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দিতে চাইবে, তাদের বিচারে যা' স্থির হবে তা কিছুতেই অমান্য করা যাবে না, কাজেই সে বিচার নিষ্ফল হবে। অন্যায় ও অবিচারের চেয়েও বড় যদি কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে — সেই রকমের সুবিচার যার হাতে কোন দণ্ড নেই। শাসনদণ্ড যদি বলহীন হয় তবে তার মত অকল্যাণ আর কিছু নেই।

না, ওই সব ফন্দি-ফিকির দিয়ে কিছু হবে না, ওর দ্বারা বিদ্বেষকে শান্তির করা যাবে না; জাতি-দ্বেষের সঙ্কীর্ণ মনোভাব দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ঐ মানসিক রস-গ্রাহিতার উৎকর্ষসাধন। তাতে করে' পরজাতি-বিদ্বেষ বই হবে — সকল জাতির সকল রকম বৈশিষ্ট্য, মানুষের মনের যত বিচিত্র ভঙ্গি, সব ঐ রসগ্রাহিতার ঐক্য-বোধে মধুর হয়ে উঠবে; পরিপূর্ণ জ্ঞানের থেকে প্রাণে যে শান্তি লাভ করা যায়, আমরা সেই শান্তির অধিকারী হব। দোষে গুণীকে এরা গালিগালাজ করে, — কিন্তু গুণী তো নয়, মূর্খেরাই মনুষ্য-সমাজের কলঙ্ক। মূর্খতার মত পাপ আর নেই।

কিন্তু রাত্রি আর বেশি নেই, বাতির আলোও ভাল জ্বলছে না। কেবল আর একটি মাত্র কথা আমি না বলে' পারছি নে। কলা-শিল্পীরা যা' কিছু সৃষ্টি করুন না কেন, তাঁদের সেই সৃষ্টি সর্বদাই কালের পিছুপিছু চলে; সমালোচনার কাজ যে সৃষ্টি-শক্তি আছে তা' ক্রমাগত সামনের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায়। তা' হলে, জগৎ-সভায় ঐ সমালোচনার অন্তর্নিহিত যে মন - ও চলেছে একই, বলতে হবে।

অ। — আর, ঐ যে ধর্ম আছে, সে কিছুই করবে না — নৈষ্কর্ম্যই হবে তার পরম ধর্ম, এটাও

তা হ'লে ঠিক !

মি — আহা, সেই যে পানিকোনির কথা লাওত বলেছেন — মধুর ভাবনায়-ভরা তার বৃষ্ণ, মৃত্যুপুরীর নির্জন গুপোধানে সে ঘুমে' রয়েছে, তার শুভ্র চেলমুকানির চারিপাশে আস্তোচেন আর অবলম্ব ফুল ফুটে উঠছে — তারলপিপাহু ক্লিটিক যারা তারাও ঘুমে' থাকবে তেমনি অনুবিদ্ধ চিত্তে, পান করবে সেই গভীর নিস্তব্ধ প্রশান্তি-সুখের অমৃত-রস, যাতে মরণধর্মী মানুষই অমরতা লাভ করে, কিন্তু হা' দেখছো ! হাঁ, আমি স্বপ্নবিলাসী বটে, কারণ স্বপ্ন-দেখা ছাড়া আমার সে জ্যোৎস্নার আলোকেই পথ চলে, আর তার শান্তি হয় এই যে, সকলের আগে উষার আলো দেখতে পায় সেই।

অ — শান্তি !

মি — পুরস্কারও বটে। কিন্তু ঐ দেখ, এরি মধ্যে ভোর হয়ে গেছে। পর্দা সরিয়ে জানলাগুলো বেশ করে খুলে দাও। আঃ, ভোরের বাতাসে কি মধুর গন্ধ আছে ! নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ, পিওনিগুলি যেন একটা লম্বা রুপালী ফিতের মত পড়ে রয়েছে। দূরে পার্কের গাছগুলোর উপর একটা খুব ফিকে বেগুনী রঙের কুয়াশা ঘুরছে, আলো বাড়ীগুলোর ছায়া গায় ধরে উঠছে — সেও বেশ হবে। এত বেলা করে' আর ঘুমোনো চলে না। তার চেয়ে চল, রয়েল্ট পার্কে গিয়ে বেড়ানো যাক। চল, আমি ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আর কথা বইতে ভাল লাগছে না।

সমাপ্ত

"কোন্ আর্ট খাঁটি আর কোন্ আর্ট মেকী তাহা নির্ণয় করিবার একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ আছে, সেই একটি লক্ষণই যথেষ্ট — তাহার সেই গুণের সংক্রমণশীলতা, অর্থাৎ তাহা সকলের চিত্তে সহজে সঞ্চারিত হয় কি না। কোন ছলনা খাঁটি ঘন-ছলনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তখনই — যখন তাহা পাঠ, বা শ্রবণ বা দর্শন করিয়া মন-প্রহরের কালে কিছুমাত্র চেষ্টার আবশ্যক হয় না, কাহারও নিজস্ব অভ্যাসের পরিবর্তন করিতেও হয় না; অন্তঃ, এমন একটি মানসিক অবস্থা হয়, যাহাতে কবি-শিল্পীর সঙ্গেও যেমন, অপর সকল শ্রোতা বা দর্শকের সহিতও তেমনই, একটি সমপ্রাণতা বোধ করি।) তাই কবিত্বপূর্ণ, তাই বাস্তব-অনুকারী, বা চমৎকার হউক না কেন, কোন ছলনাতেই খাঁটি রসসৃষ্টি বলা যাইবে না, যদি তাহার দ্বারা সেই অপূর্ব ভাব আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত না হয় — যে ভাব আর সকল ভাব হইতে স্বতন্ত্র ; সে একটি আনন্দময় অনুভূতি, তাহাতে অপর কেহনের সহিত অন্তরের যোগস্থাপন হয়—আমার, যাহারা সেই এক ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সহিতও একটি গভীর আত্মীয়তা-বোধ জাগে।

"ঐ ভাবের প্রধান লক্ষণই এই যে, তখন মনে হয়, আমি ও শিল্পী একই ব্যক্তি, ঐ ছলনা যেন আমারই ছলনা — আমি যাহা এত কাল প্রকাশ করিতে চাহিয়াছি, কিন্তু পারি নাই, তাহাই উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই যে ভাবাবস্থায় আমাদের ব্যক্তি-সত্তা 'আমি-পর-ভেদ' হইতে মুক্তি পায় — শুধুই শিল্পী নয়, সেই রস যত লোকে উপভোগ করিতেছে তাহাদের সহিত একাত্ম হইয়া যাই — ইহাই সকল শ্রেষ্ঠ আর্টের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ, ইহাই তাহার প্রধান আকর্ষণী শক্তি।"

— লিও টলষ্টয়

সভ্যতা

(পূর্ণানুবৃত্তি)

(৫)

সভ্যতা-সৃষ্টির উপায়

সভ্যতা-সৃষ্টির পূর্ব্বোল্লিখিত উপাদানগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও একটা বস্তুর অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিবেনা। সভ্য হইবার ইচ্ছা থাকাও চাই। সভ্যতালাভের ঐ ইচ্ছা মানুষের স্বভাবেই নিহিত আছে এবং চিরদিন তাহা সক্রিয় হইয়া আছে এমন বিশ্বাস যেমন অমূলক, তেমনই, উহা যে কখনো তেমাত্রও ছিল না, এমন কথাও যথার্থ নহে। বরং বলা যাইতে পারে যে, ঐরূপ বাসনা মানুষের হইয়াছে, এবং সেই বাসনা কখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, মানুষের একটা ইচ্ছা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে স্বতঃসিদ্ধ, ইহাকে জ্ঞান-ইচ্ছা, কল্যাণ বুদ্ধি বলা যাইতে পারে; ঐ সভ্যতালাভের ইচ্ছাটাও তাহার আনুষঙ্গিক, এমন বলাও হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, উপায় ও উপেয়, সাধ্য ও সাধন এই দুইয়ের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা এতই দুরূহ, যে, যাঁহারা সমাজসংস্কার-নীতির উপাসক তাঁহারা প্রায়ই প্রেম-বস্তুর পরিবর্ত্তে তাহার উপায়গুলাকেই আসলবস্তু বলিয়া মনে করেন, এমন কি, যে-সকল প্রথা বা উপায় একালে একেবারে অচল, তাহাকেও সযত্নে বিবেচনা করেন। এই জন্য সদ্ভাবও সব সময়ে সফল হয় না, সফল হওয়া ত' দূরের কথা, উহাই সভ্যতালাভের গুরুতর অন্তরায় হইয়া থাকে।

ঐ হিসাবনের নৈতিক উপাদান বা ইচ্ছাশক্তি ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে আছে, আমি ইহাকে কেবল বিকৃত শুভ-কামনা বলিব। কিন্তু সেই সঙ্গে সভ্যতালাভের ইচ্ছাও কি আছে? এ যুগের প্রবৃত্তিই অন্যরূপ; এখন সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তনা ধর্ম্মের স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। আবার এমন দাঁড়াও হইয়াছে যে, মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে হইলে এই কয়টি বস্তুরই প্রয়োজন করা চাই, যথা — টাকা-উপার্জ্জন, নানা রকমের খেলা, সিনেমা-দেখা, রেস (Race)-এর বাঁটিং ভলারে হাজির-খাতা, মোটর-চড়া, এবং পুরস্কার জন্য বেওয়া। অর্থ যাহারা উৎপাদন করে ইহাই তাহাদের ধর্ম্মমন্ত্র — এমন যন্ত্র যাহাদের তাহাদের সভ্যতালাভের ইচ্ছাই নাই — অন্ততঃ যথেষ্ট সামর্থ্য আছে।

ইংলণ্ডের শাসন-তন্ত্রে দুই দলই কোনক্রমে স্বার্থের মিল করিয়া লইয়াছে — একদল যাহারা অধিক ধন উপার্জ্জন করে, এবং অপর দল যাহারা অল্প উপার্জ্জন করে। উহা ধনিক-শ্রেণী নয়, কিন্তু প্রমজীবী-সমাজ একত্রবদ্ধ হইয়া উহার প্রভুর অনেকটা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি রাষ্ট্রিক ব্যাপারগুলিতে ধনিক প্রভুরাই অনেকখানি কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছেন, বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়া থাকে। সে ইচ্ছা যে কেমন তাহা জানিবার জন্য বেশিদূর যাইতে হইবে না — দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতেই তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহাদের জীবনের ইষ্ট কি, আদর্শ কি — ঐ পত্রিকাগুলি হইতে তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। লোকেও তাহাই চায়, তাহাদের মতে উহাই সভ্যতার লক্ষণ। এই সভ্যতারক্ষার জন্যই তাহারা একবার ঐ ধনিক প্রভুদের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিল, আবশ্যক হইলে আবার উহার জন্যই লড়াই করিবে, এবং তাহাতেই পরম সুখ লাভ করিবে।

ছোট ও বড় ধন-পিশাচদের মধ্যে এই যে একটা মিত্রতাবন্ধন, ইহাও অতি স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়; এই জন্যই যখন-তখন বিপ্লবের কথা শুনিতে পাই। সম্প্রতি যখন কথা এই যে, এমন মানবহিতৈষী লাভজনকও সকলকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ঐরূপ বিপ্লবকে মঙ্গলপ্রদ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা এই বলিয়া আমার মত ব্যক্তিকে আশ্বাস দেন যে "জনগণ যদি একবার তাহাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া পায়, তবে তোমার ঐ সভ্যতা-গাছের ফল এক মুহূর্তে সকল হইবে। জনগণ সত্য ও শুভকে চিরদিন পূজা করিয়াছে — যাহা বরং তাহাকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছে; অতএব তুমি যাহা চাও তাহা এই পথেই মিলিবে।"

আমি কিন্তু এপর্যন্ত দেখি নাই যে, ইংলণ্ডের ঐ জনগণ — যাহারা নীরবে শাসনকার্যে কর্তৃত্ব লাভ করিয়া সেই জনগণ — সভ্যতাগাছের যে উপাদানগুলি হাতের কাছেই পাইয়াছে, সেইগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়াছে। সভ্যতাগাছের ইচ্ছা ও মূলের কথা, আমি বরং স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, ব্রিটিশ প্রমজীবীগণ তাহাদের ঐ ধর্মঘট-মূলক জীবনই সমধিক পছন্দ করে। আসল কথা, ধনপতি ও তাহাদের দাস ঐ শ্রমিক, ইহাদের মধ্যে কেবল একটি মিল ছাড়া, আর কিছুতেই মতবিরোধ নাই — উৎপন্ন অর্থের বখরা লইয়াই যাহা-কিছু বিবাদ। বিপ্লববিরোধী বাল্কিকেরাও যেমন জীবন পছন্দ করে — তাহাদের আদর্শ যেমন, কলমার ধনিক বিপ্লবপন্থী মজুরেরাও তদপেক্ষা কোন বড় আদর্শ মনে মনে পোষণ করে না। তাহারাও সেই এক স্বর্গলাভের জন্য লালায়িত — ছোট হাজিরার আশে 'রম' ও চুরুট; বড়-হাজিরার চারিটি উপচার থাকিবে — ব্রাণ্ডির ও পরে একটি বড় সিগার; হাতে সিনেমা অথবা সঙ্গীত-সাময়িক; অবসর বিনোদনের জন্য মেরী করেলির মতের কিছা 'অবসুন' 'ব্লাক্‌উড্‌স ম্যাগাজিন' প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা; বিবাহ-বন্ধনটা যে অতিশয় পবিত্র ঐরূপ একটা মস্ত মূলভাবে পোষণ করা মাত্র; ডিভোর্স লোক, আইরীশ এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি একটি আন্তরিক অশ্রদ্ধা। জীবন-যাত্রার এই যে আদর্শ, ইহা যিশু ক্রোনসের যেমন, লর্ড নেভেনহেডের তেমনই পরম প্রীতিকর। ইহারই জন্য যে বিপ্লব করিতে চায়। স্বর্গরাজ্যের ঐ সুপক্ক ফলটিকে লাভ করিবার জন্য ক্রোনস্ ও তাহার মনিবের মধ্যে এই যে মারামারি, ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। উহা একান্ত ভাবে উহাদেরই মামলা। এমন কোন উচ্চতর নীতির সমস্যা উহাতে নাই যে বাহিরের লোকও উহাতে কোনরূপ আগ্রহ বোধ করে। সভ্যতার জন্য যাহারা কিছুমাত্র চিন্তিত, তাহাদের নিকটে এমন ভাবনা — নিতান্তই তুচ্ছ যে — কে কয়খানা কোটা রাখিবে বা কে কয় বোতল মদ বেশি সংগ্রহ করিতে পারিবে। ধনতন্ত্রবাদী ও ট্রেড-ইউনিয়ন-বাদী উভয় দলই একেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। উভয়পক্ষই নির্বোধ, কুরুচিগ্রস্ত, সুস্থির ও সুযোধ, ভাবপ্রবণ, লোভী, এবং সর্বপ্রকার রসবোধ-বর্জিত। যেহেতু দুই দলই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট, অতএব কোনরূপ পরিবর্তন কামনা করিবে কেন! সিংহল দ্বীপের 'বেদ্দা'জাতি, অথবা আফ্রিকার উপকূলবাসী 'বেদে' জাতিরও যদি সভ্য হইবার বাসনা থাকে, তথাপি ষ্টক এক্সচেঞ্জের (Stock Exchange) কিংবা ট্রেড্-ইউনিয়ন-কংগ্রেসের তাহাদের মধ্যে তেমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

সমাপ্ত

বঙ্গ-দর্শন

কৃষ্ণ অভিমন্যু-জননী সুভদ্রাকে বলিলেন —

"সৎকুলজাত ধৈর্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপ প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপ প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহারথ, বীর, সিংহকুলা-পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু কৃতি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্র ও প্রজ্ঞাদ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিলাভ হইয়াছে। যে সুভদ্রে। তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরভগিনী ও বীরবান্ধবা, অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে।"

এই সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ কথা শুনি ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে।

— বঙ্কিমচন্দ্র (কৃষ্ণচরিত্র)

বৈশাখের 'বঙ্গদর্শন' লৈঠে লিখিতেছি — আমাদের পক্ষে নানা কারণে তাহা সুবিধাজনক। প্রথমতঃ, যাহা ভবিষ্যতে তাহাকে আরও বেশী করিয়া একসঙ্গে দেখিতে পাই; দ্বিতীয়তঃ, দেশের দ্রুত ঘূর্ণায়মান (revolving) রাজনৈতিক নাটাবঙ্কটির নব-নব দৃশ্য একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিবার সুযোগ পাই; তৃতীয়, স্বাধীনতার ঝাঁকাঝাঁকি-খান যেরূপ হজমুক করিয়া বঙ্গদর্শন আসিয়া, রাজাবজ্ঞানি আসাইয়া — স্নেহে শোবার ঘরের জানা-বালিশ টানাটানি করিয়া, কেদারের কাপড়খানা পর্যন্ত টানিয়া ফেলিতেছে, তাহাতে যতক্ষণ পারি কথা না কহিয়া, — স্বাধীনতা-সুখের পাইকারী সস্তুতার ধরিতে পুচরা খরিদারের সকলেই হাটে-বাজারে কেমন সুখে ও কেমন করে পরস্পরে ভাব-বিনিময় করিতেছে তাহাই জান পাতিয়া শুনিতে আরও ভাল লাগে। চতুর্থ এবং পঞ্চম এবং আরও কত কারণে আমরা কিরূপ সুবিধা বোধ করিতেছি তাহা পাঠকপাঠিকাদলকে জানাইলে, কি জানি ওঁহারা হয়তো অজ্ঞানের ধাঁধিয়া বসিবেন — একে তো' আমাদের এইরূপ কিংবে প্রকাশ দেখিয়া তাঁহারা 'অজ্ঞানের অজ্ঞ কথা' বলিতেছেন! অতএব সে সব কথা আপনারা নাই বা শুনিলেন; পত্রিকা বাহির চলা যে সুসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে সে কথা কবুল করিতেছি, কোনরূপ সত্যরকার অভিযোগ বা সমাজে গণ্যমান্য হইবার লোভী আমরা আর কবিব না। অপরাধ আমাদেরই ঘটে, কিন্তু কে-দেবতা এই ভীষণ ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্র-স্বরূপে আমাদিগকে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহ অপেক্ষা নিগ্রহই যে এক অধিক হইয়াছে, তাহাতেই [illegible]

করে ; মুখুয্যের দায়া কি যে সেই স্রোতের বেগ রুদ্ধ করে—তবু আমরা তাহার বিপরীত মুখে দাঁড়াইয়াছি। উদ্যম আমরা, ত্রিকোটির কণ্ঠস্বরে যোগ না দিয়া এমন কথা উচ্চারণ করিয়াছি যাহা তাহারও শ্রবণে প্রবেশ করিবার পথই পায় না, যদি বা কোন ফাঁকে সেই ত্রিকোটির ঐকতানে ভেদ করিয়া কোথাও একটু প্রবেশ করিতে পারে, তবে চারিদিকে ছিটকিয়া পড়িয়া যায়। এ হেন আমরা সমাজের সত্য-সুজনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া পত্রিকার নিজস্ব বানিয়া পথ চলিতে পারি কি? আমাদের মত চর্চাপদ যে কেহ নাই, — আমরা যে স্বাধীন হইতে পারি নাই, হইলে ভাবনাই ছিল না। স্বাধীনতার বড় বড় আপিস আছে; সভা-সমিতি ও বৈঠকখানার নিত্য-নৈমিত্তিক জল্পনা আছে; সাংবাদিক পত্র ও পত্রিকাদির সম্পাদকমণ্ডলে এক স্বাধীনতা-রক্ষণে বাঁধিবার শোলোপাল আছে; সোভিয়েট সাহিত্য-সংঘের অনুরূপ একটি সাহিত্য-সংঘের প্রতিষ্ঠাও বহুপূর্বেই মুদ্রিমান ও বিচক্ষণ সাহিত্যিক জমিয়াছেন জমিয়া রাখিয়াছেন। আমরা যদি ইহাদের মেরুদণ্ডের এবং গাত্রবর্ণের সঙ্গে চলিতে পারিতাম, তাহাতেই আমাদের এই 'বঙ্গদর্শনে'র — পথের না হউক, পথটা একটু প্রশস্ত হইত; পত্রিকা কেন করিতাম না, আপনারাও 'ভুতোর' বলিয়া এমন মুখ বিকৃত করিতেন না। তবু যে পথে বাহির হই, তাহার কারণ, বাঙালীকে — জাত-বাঙালীকে — এখনও বিশ্বাস করি। 'বঙ্গদর্শন' ও' দোকানের কিনিস নয়, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-বুদ্ধি ইহাতে নাই। আপনারা, যাহারা গ্রাহক বা ক্রেতা, তাঁহারা হয়তো জানেন না, এ পত্রিকার ঐটুকু চাহিদা মিটাইবার জন্যও 'বঙ্গদর্শন' প্রতি সংখ্যায় খরচায় করিতেছে; যতগুলি ছাপা হয় তাহার অনেক বেশি ছাপিবার তাগিদ প্রত্যহ বাড়িতেছে; কিন্তু তাহার দামের বেশি সে পারিতেছে না। এ দুঃখ তাহাদেরও বেশি, আমার — সম্পাদকেরও — বেশিই। পত্রিকার দান আমরা বাড়িতে পারিনা বটে, কিন্তু যে বৃহত্তর পত্রিকার কাল-গণনা আমরা করিয়া থাকি, তাহাতে কি কোন শুভফল ফলা এ পর্যন্ত ঘটিয়াছে? মহাকাল যে ছন্দে নৃত্য সুরু করিয়াছেন, তাহাতে যাদের লাজাকাজি তাঁ মুক্তির কথা, বৎসরের ফেরটিছও আর নাই। এই যে চৈত্র গেল, বৈশাখ আসিল — বাংলাদেশে সেই বর্ষবর্তনের কোন সাড়া কি কেহ পাইয়াছে? একই তমসায় ঘনায়মান প্রহর অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে — কোন্ শেষের দিকে, কে জানে? কেবল তাহারই মধ্যে একদল পিশাচ ফলাল আসাইয়া অট্টোৎসব করিতেছে, তাহাদের সেই লালসার রক্তমিছিলের 'খুন হাম খুন' কলরবের দুর্বাচ্যোচ্ছিত. আপনপক্ষিই মুখমণ্ডলে হতাশাকেই লিখা আমাদের উদ্বাসিত করিতেছে। তাই আমাদের বর্ষশেষও নাই নববর্ষও নাই — মাসের হিসাবও মুলিয়াছি। কেবল একটি চরম লগ্নের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছি — সে যে কখন, কোন্ দিক দিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না।

* *

যাক্, 'বঙ্গদর্শনে'র কথা! এতদিনে বোধ করি পূর্ণ হইল। আমরা কিন্তু এ সংবাদে বড়ই খুশী হইয়াছি — যেন প্রাণের ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, ইহাই ত ঠিক হইয়াছে — তাহার তাগাবিধাতার জন্য যে অবস্থাধীন! আপনারা বোধহয় একথা শুনিয়া অবাক হইতেছেন — কিন্তু বুঝাইয়া দিতেছি, তত্ত্বকথাটা একটু ভাঙিয়া বলিতে হইবে বই কি। দেখুন, মন খুশী হয় অনেক কারণে — খুশী হওয়ার কি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে? যার যেমন প্রাণ তাহার খুশীও তেমনই। আমাদের প্রাণটা একটু শৌখিন ভাবাপন্ন, আমাদের কেন — বাঙালী মাত্রেরই। কোন কিছুর গভীর তত্ত্ব জ্ঞানময়

করিতে এমন ভাগ্য-ভাঙি তাহার আর আছে কি? অহিংসার দুইটি অর্থের এমন দুর্ঘিয়াছি, আর কোন অনুসন্ধান আছি তাহা বুঝিয়াছে? বলুন, ঝুক হয় দিয়া বলুন! সেই দার্শনিক ভাবটি এবার বড় কাজে লাগিয়াছে — সে ভাবের আবেশে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। ভারতরাষ্ট্র বড় ভাল কাজ করিয়াছে — গ্রাম উঠাও করিয়া দিয়াছে। শুনুন, আমরা সৌন্দর্য্য বড় ভালবাসি; দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, সৌন্দর্য্য আর কিছুই নয় — সর্ব্ববিষয়ে একটা সর্ব্বাঙীণ সুসঙ্গতি বা সামঞ্জস্য। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দেশের লোক অতঃপরি 'সত্যং শিবং' সে বিষয়ে সচেতন থাকিলেও, তাহাতে সুন্দরের যে একটি সুন্দর সুসঙ্গতি আছে, তাহা বাংলার সংবাদপত্র-সম্পাদকেরাও প্রথম প্রথমে, 'অহিংসত্ব' আবৃত্তি করিয়া অত্ত শোনাইতে সমর্থ হইয়া দিয়াছেন। সেই সুসঙ্গতি এইবার মোক্ষ-ভাবে লাভ করিয়াছে, আমরা তাঁহাদের এই শেষ কার্য্যটিতে সেই সৌন্দর্য্যের 'দর্শন' করিয়াছি। আমাদের আশঙ্কা আছে যে কারণে এই যে এই রাষ্ট্র যে দীর্ঘজীবী হইবে, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। সকল সকলই দেখা দিয়াছিল, এখনে শেষ লক্ষণটিও বাকি রহিল না। আমাদের আনন্দ যে আর ধরে না, গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে ইচ্ছা হইতেছে! কিন্তু গলাটা তেমন সুবিধার নয়, মোরিয়া হইয়া একটা কলিই ভাঁজি — "বেঁচে থাকো মেহেরুন্ নো, চিরজীবী হয়ে"; দ্বিতীয় কলিটাও গলার ভিতরে সুর সুর করিতেছে; না থাক্, আবার "ব্লক প্রেসার" আছে।

* * *

তবু পাপ-মন কি উহাতেই নিবৃত্ত হয়? বিলীর অধিপতি — মেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি রাজন্যগণ কালিদাসের 'রঘুবংশের' সেই বিলীপ-রাজর্ষির তুল্য; জাতীয়তা-নাম্নী কামধেনুটির তাঁহারাই সেবক ও রক্ষক। একদা এক পাহাড়িয়া দেশে বিচরণ কালে ছত্রোত্তেজনাকারী সিংহ জাতীয়তারূপিণী ঐ নন্দিনী-গাভীটিকে আক্রমণ করে; তাহাতে ঐ বিলীপ-নরপতিগণ বড়ই বিব্রত হইয়া অনুক্ষণ অহিংসা-মন্ত্র জপ করিতে থাকেন। তখন সেই হিংস্র সিংহ হতাশ্বাস হইয়া গাভীটিকে ছাড়িয়া দেয় — একটি সর্ত্তে; সে আর হাম্বা-রব করিতে পাইবে না। ঐ হাম্বা-রবই 'অহিংসাত্মক'। প্রথমে 'হাম্বা'র একটা অংশ বাদ দিয়া কেবল 'বা', অর্থাৎ 'বা-বা' দুইই রাখা স্থির হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহা 'বা-বা'র বড় দোমাইতে লাগিল, এবং চতুর্দ্দিকে মেষচেতনার সৌরাত্ম্য ছড়িয়া উঠিল। কিন্তু 'বাবা'-ডাক সিংহ সহ্য করিবে না, সিংহ শুনিলে বিলীপ-কুলের মনপ্রাণের আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, সিংহ, অহিংসা-অর্থের ভক্ত না হইলেও, সকল অর্থের বাবা, কালিদাসও তাহাই বলিয়াছেন। সেই সিংহ তাহার তীক্ষ্ণ দন্তরাজি বিকাশ করিয়া একটা বড় ধমকানি দিয়াছিল — "একত্র বেদোপনিষদ্ধুমিজন্ বিচারভূঃ প্রতিভাসি মে মনঃ" — অর্থাৎ কিনা, "ঐ একটার জন্য তুমি তোমার এমন রাজ্যত্রয় এর সমাজ, এমন দেশ-বিদেশের বাহবা, বক্তৃতার এমন বিদ্যা-বুদ্ধি সকলই ত্যাগ করিতে চাও, ইহাতে বুঝিতেছি, তুমি একটি খাঁটি আহাম্মোক।" সিংহের সেই কথা স্মরণ করিয়া এবং তাহার সেই দন্তরাজিকাশ ভুলিতে না পারিয়া, অতঃপর ঐ বিলীপ-বংশীয়গণ জাতীয়তার গাভীটি ও তাহার হাম্বারব একসঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়া, জীবনের পরিবর্ত্তে, জাতীয়তার একটি কল গড়িয়া লইয়াছেন, এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটি বাজাইবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

* *

পূর্ব্বের সেই হাম্বারব আসলে সংস্কৃত 'অম্বা' ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু উহার ঐ সংস্কৃত আওয়াজ ও উগ্র পক্ষ সিংহের ত' প্রীতিকর নহেই, ঐ গাভীটি

একদল মহামান্য ভূতের চিত্তে বড়ই হিংসার উদ্রেক করে, এমন কি রসনাগ্রেও তাহা সঞ্চারিত হয়। এখন ঐ গান্ধীটীর পরিবর্তে যে বহু-লাঞ্ছিত জাতীয়তা প্রভুত্ব হইয়াছে তাহাতে জাতি-জন্ম, এমন কি দেহ-প্রাপ্তিরও কোন সংস্রবের ধারাই নাই, ইতিহাস বা বংশপরিচয়ের প্রয়োজন নাই — একেবারে গড়া কলে-তৈয়ারী, কারখানার প্রস্তুতখানায় 'কপি বেল'-এর মত। সেই জাতীয়তাকে চিহ্নিত করিবার জন্য পতাকায় যেমন একটী জ্যামিতিক মুদ্রা-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনি, তাহাকে গীতময় করিবার জন্য সর্বজিপ্ত-বর্জিত একটী গানের পত্তনপাত্র হইয়াছে। কিন্তু গানখানি যে প্রভুদের এত রাগ লাগিয়াছে, উহার ঐ আরম্ভটী এত ঘনঃপূত হইয়াছে, তাহার আরও কারণ আছে। 'বন্দেমাতরমে' যে মূলের দোষ ছিল, সে দোষ ইহারও আছে — দুই-ই বাঙালীর। কিন্তু উপায় কি? এতবড় হিন্দী-ভাষা, যাহার তুলা ভাষা ভারতে আর নাই, এক যাহাকে রাষ্ট্রভাষা না করিলে ভারতীয় জাতিসকল একটী মহাভাবের ঐকান্তিকে অভীপ্সায় বদ্ধ হইতে পারিবে না, সেই ভারত-ভারতীর রসনাস্বরূপা যে হিন্দী — সেই অনুভূতিনিঃস্রবী রাজ-রাজেন্দ্রী ভাষায়, একটা ভক্তি-রসের গান বা কবিতা কি ছাই আছে? অবশ্য! কি দুর্দৈব! কিন্তু ঐ একটা গান — কংগ্রেসী ভারতের গায়ত্রী-সাথীকে যেন অক্ষরে অক্ষরে ধরিয়া দিয়াছে! গানটার কথা বা সুর উৎকৃষ্ট, অথবা উহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই নহে, ঐ যে "জনগণমন-অধিনায়ক জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা" — উহা কাহার কল্পনা? বাঙালী রবীন্দ্রনাথ কি ঐ গান রচনা করিবার কালে ভাবিয়াছিলেন, তিনি কাহার বন্দনা করিতেছেন? ভিক্ষা রহো রবিন্দ্রনাথ! ইহার কাছে 'বন্দেমাতরম'! ছোঃ! কিন্তু ভারত-ভাগ্যবিধাতাও এতটা ভাবিতে পারেন নাই। 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'র কথাও উহাতে আছে, কিন্তু অপলীলী পত্তনেরা তাহা শুনিবে কেন?

* * *

আমরা বলিয়াছি, এই যে 'বন্দেমাতরম্'কে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ ক'রা — কংগ্রেস-সরকারের এই কাজটী অতিশয় দুরূহ হইয়াছে; স্বাধীনতা-লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত ঐ সরকার যে-নীতির অনুসরণে কহিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা যে কোন্ নীতি, সে কথা উঁহারা ভালরূপই জানেন। বড়ই নিরুপায় হইয়া পড়িতেছেন, তবুই উঁহারা যাহা কিছু করিতে যাহা হইতেছেন — তাহাতে যে বিদেশের স্বাধীন ইচ্ছা ও সুচিন্তিত নীতির বলে করিতেছেন, ইহা না বলিয়া উপায় নাই। নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ও যে কারণে অপাংক্তেয় হইয়াছে, 'বন্দেমাতরম'ও ঠিক সেই কারণে বর্জনীয় হইয়াছে। কিন্তুরে যে পলায়ন বন্ধনপাশ ক্রমেই আঁটিয়া বসিতেছে, স্বাধীনতার বীর-যন্ত্রণাগণ তাহা হাড়ে হাড়েই বুঝিতেছেন — হয়তো এখনও আশা করেন, ফাঁসটা আলগা করিয়া ছাড়াইয়া লইবেন, কিন্তু সে আশা যে বিড়ম্বনাই হইবে। যাহা বাধ্য হইয়া করিতেই হইবে, তাহা স্বেচ্ছায় করিতেছি বলিয়া এই যে আত্মপ্রবঞ্চনা — ইহা আর কতদিন টিকিবে! 'বন্দেমাতরম'কে বর্জন করার মূলে যাহার যা মতলব যে অভিপ্রায় বা দুরভিসন্ধি থাকুক — উহার দ্বারা কি ইহাই কবুল করা হইল না যে, এতদিনের সেই যে ভারতব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রাম তাহার মূল প্রেরণাই ছিল মিথ্যা? অর্থাৎ, স্বাধীনতা নয় — লাভের রকম-ফেরই ছিল কাম্য! এত বড় বুদ্ধিভ্রম সহজে ঘটে না, ইহা বুদ্ধিভ্রম নয় — সজ্ঞানে বুদ্ধিকে বিসর্জন-দেওয়া। 'বন্দেমাতরম'কে ত্যাগ করা যে জাতির মর্মাকাশকেই ধূলায় লুটাইয়া দেওয়া! এই কলঙ্কালেই অধঃপতনের শেষ ধাপটাও বাকি রহিল না! আমাদের, অর্থাৎ বাঙালীদের — তাহাতে কোন বাধিবেই নাই বটে,

ফাঁকে, আমরা একজন পণ্ডিত হইয়া যাই, আমাদের তাহাতে দুঃখ করিবার অধিকারও নাই; তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের ইচ্ছা, এবং তাহাদের অধিকার একেবারে হইতে বাঙালী এখনো মুক্তি পায় নাই। কিন্তু শুধু মহাকবির ভাষায়, এই বাঙালীর মুখ হইতেই দীর্ঘশ্বাস সহকারে বাহির হয় — "What a falling off was there!" যে ইচ্ছা এবং যত্নটুকুর জোরে ও হইতেছে, সেই আগ্রহ সেটাও থাকিতে পারিলে না? আমার চারি দিকে অন্ধকার ঘোর হইয়া আসে! — কি করিলে তাহাকে ফিরিয়ে? এই "ঘরে-বাইরে"র যে বুদ্ধি-বিভ্রমের অবস্থা এবং তাহার ইচ্ছার একমাত্র অন্তরায়-স্বরূপ বলিয়াই উহাকে সহ্য করিয়াছিলে না? এবং ইহাতেও যে একটা আপোষ রফা করিয়া নিজের জন্য নিশ্চিন্তের নিরাপদে তোমাদের কাহে নিরাপদিত করিতে চাহে নাই? আজ তুমিই স্বীকার করিবে — সে মন তোমার নয়, তোমার স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাহার কোনো সার্থিক প্রয়োজন ছিল না; সে চিল একটা অন্ধতা টানিবার — মানুষগুলাকে তোমাদের কাছে লাগাইবার — তাহাদের মন ও প্রাণ জয় করাইবার একটা কৌশলমাত্র! চল্লিশ বৎসরের সেই বর্ম ও সেই অস্ত্র তুমি আজ ত্যাগ করিলে! কিন্তু সে কি স্বেচ্ছায়? তোমারই নিজের ধর্মান্তর-গ্রহণের প্রয়োজনে? না, অতি প্রত্যক্ষ বর্তমানের ঘনায়মান সঙ্কটে, তুমল প্রতিঘাতের সম্মুখীনতার জন্য? বলিয়াছি, বাঙালী আমরা, আমাদের সে কথার প্রয়োজন নাই — কিন্তু রাজনৈতিক রাষ্ট্রের অধীন বা অন্ধ-রূপে, আমাদিগের অবস্থা যে কারণে যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিয়া লইতে হইলে, আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। তাই এবার আমরা ছোট হইয়াও, ছোট মুখে কিছু বড় কথা বলিব।

•

বাংলা ভারতের অঙ্গ হইয়াছে, সে যেমন অঙ্গ সকল, যকৃৎ, বাহু, পা অথবা পাকস্থলী? অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাদেই বাংলার স্থান কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। বিহার তাহাকে মুষ্টাঘাত করে, তাহা হইলে বিহার কি যায়, এবং বাংলা নাসিকা, জিহ্বা সদৃশ কি? আসাম ও উড়িষ্যা যে-কারণে তাহাকে তাড়না এমন কি প্রহার করিতেছে, তাহাতে এই দুই দেশ ভারতের পদস্থানীয় এবং বাংলা পশ্চাৎ ভাগের কোন একটা অঙ্গ হওয়াই সম্ভব: কারণ ঐরূপ 'পদস্থানানুরূপ' 'শিরসি' বা হইয়া পৃষ্ঠে যাওয়ার বেশি। যেহেতু বিহার এখনও বৃহ বা নাসিকাটাকে ঠিক হাত করিবার পাইতেছে না, অতএব মনে হইতেছে, বাংলাদেশটা ভারতের পৃষ্ঠাবলম্বনেই হইবে, অর্থাৎ উহা তাহার বস্তিপ্রদেশের সন্নিকটবর্তী — এখানেই হেতিছু ফেরবর্জন বা শৌচক্রিয়া নির্বাহ হইয়া থাকে।

• •

সেই বাংলার সঙ্গে বিহারের সীমানা লইয়া তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে, অর্থাৎ সভাসমিতি বাদ-প্রতিবাদ কাগজের সম্পাদকীয়গুলির মাঝের কাজ — আরও কত কি! আমাদের কথা ও নিতান্তই হাস্যকর — সে বিষয়ে অতি-বড় পণ্ডিতেরা অতি-বড় যুক্তির সঙ্গে একমত। তবু এই বিহার-বাংলার মামলা সম্বন্ধে আমরা স্বাধীনতা-লাভের কালেই যাহা বলিয়াছিলাম আজ তাহা স্মরণ না করাইয়া পারিলাম না। কাশীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাও বেমালুম হইয়া উঠিয়াছে। আসাম, ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে এবং আরও দুই একটি কাছাকাছি ব্যাপারের সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিয়াছি তাহা বলিতে বিলম্ব নাই। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয় — আমরা ভোটার-চড়া নেতা-পলিটিশন নই; স্বাধীনতায় নিরাকার ভোজে বসাইয়া সকলকে 'পীরতা জুলাতাং' করিয়া নিজের

ইহাকে ভারী করিতে পারি না; অথবা, প্রাণ-দর্শ ও সত্যের যোগসূত্রের একরূপ পুরোভাগ বুঝাইতে পাত করিয়া, কাজকে বুঝিয়া দেখার বিরাম করিয়া এবং তদ্বারা দেশবাসীর মস্তিষ্কটি উদ্ভরূপে কাটা করিয়া মালিকদিগের মালখানার পাহারাদারী করি না। আমাদের তেমন সাজসজ্জা তেমন কল-কারখানা কোথায়? জন-গণ-মন-হরণের নাটকীয় নটবর-বেশও নাই। মনে আছে, কৌশীন ও ছিন্নকাঁথার সম্বল করিয়া বিশ্বনাথমূলে ধূনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছি; নগর হইতে কোন স্বাধীনতা-রস-বিতোর, ফোকল-কলেবর মাসিক আসিলে সেই চিন্টা তুলিয়া তাকা করি; তাহার নমুনা ইতিমধ্যে অনেক অভদ্রলোকেই পাইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আমাদের কথাগুলাই ফলিয়া যায়। যদি এখনও কাহারও সন্দেহ থাকে, আর কিছুদিন পরে থাকিবে না।

* *

সেই আমরা বহু পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি স্বাধীনতা বস্তুটি যেমন একটি অখণ্ডিত, তেমনই তাহার সংক্রান্ত যতগুলি দাবী-দাওয়া যতদাবার চীৎকার মাত্র। ভারতে যেমন স্বাধীনতা-দিবস ঘোষণা করিয়া ঘোলা হইয়াছিল, কাশ্মীরেও তাহা হইয়া গেল; অন্তত তাহার যে কতটুকু রক্ষা পাইল, এবং শেষ পর্যন্ত আপেলো-আমেরিকান যৌথ-শক্তির সম্বন্ধে তাহার কি দশা হইবে,—পাকিস্তান যে সেখানে কিরূপ আধিপত্য করিবে, তাহা প্রায় চাক্ষুষ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি শ্রীনগরে স্বাধীনতা-উৎসব হইয়া গেল; এবং নেহেরু মহাশয় সেখানকার হ্রদে নৌকা-বিহার করিয়া এবং ফোন প্রভৃতি দেশকার্য সম্পাদন করিয়া, ভারত-রাষ্ট্রের মহিমা বিস্তার করিয়া আসিলেন; আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে তাহার জয়জয়কার — চিত্র-চরিত্র ও আখ্যান সহকারে — বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিতে লাগিল। বীরত্বের দরবারীও যেমন — তাহা

* *

তখনই দেখা যাইতেছে, ইহারা ধর্মধর্ম করিয়া সত্যের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে। বাংলাদেশে যে কয়খানি ইংরেজী ও বাংলা প্রচারসর্বস্ব দৈনিক পত্রিকা আছে, তাহাদের মত মোসাহেবী-নিপুণ পত্রিকা আর কোন প্রদেশে আছে কিনা জানি না। প্রচার-বাহুল্যের বলে বাংলাদেশের জনমত গঠন ও পরিচালন করে ইহারাই; কিন্তু ইহাদের দ্বারাই বাঙালীর সত্য-চিন্তা ও শুভবুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে যে নিরঙ্কুশ সততই তখনই প্রতিকারহীন মহাবিনাশের দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে, তাহার পরিষদ, অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ সম্বন্ধে ইহারা একটি সত্য কথা বলিবে না। তৎপরিবর্তে প্রতিদিন ভারতসাহের ছেঁড়া পায়জামায় তালি দিয়া রাজা-উজীর-মারা বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া থাকে। পাকিস্তান যে তাহাকে এখন নাস্তানাবুদ করিতেছে—সে যে কতবড় দুর্বৃদ্ধিগ্রস্ত, সে যে উন্মাদ হইয়াছে, এবং সত্য ও অহিংসার বর্মটি উপরের অস্ত্রাঘাত করিয়া ভারতের স্বাধীনতাটিকে প্রস্ত ও অরক্ষিত থাকিতে দিতেছে না — এই সবই কখনো হুঙ্কারে, কখনো ধিক্কারে, কখনো হুংকারে, কখনো বা বিদ্রূপধ্বনি করিয়া থাকে। পত্রিকার সম্মুখ-পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে যে সকল সংবাদ মুদ্রিত হয় তাহা স্বাধীন-ভারতের স্বাধীন পাঠকগণের সর্বাগ্রে জানিবার; ও দিকে যে রাজার হাজার নর-নারী গৃহহীন হইতেছে, অন্তর্বাহিরে বাঙালীর যে প্রাণ সংশয় হইতেছে — বাংলায়, ও বাংলার বাহিরে যথা রাজস্থানে—এমন সকল দুঃখ-দুঃখ ঘটনা ঘটিতেছে যাহা শুনিলে ও জানিলে স্বাধীনতার চক্ষু ছুটিতে সর্বহেতু দেখিয়া থাকে — সে সকল কথা ছোট হরফে পত্রিকার খিড়কির পাশে, আনাচে-কানাচে অতিশয় সাধারণ সংবাদের মত ছড়ানো থাকে।

আজকাল পশ্চাদ্ভিত্তি যানে পশ্চিত মেয়েরা যদি — যদিও সম্ভব — প্রতিদিন লাটে ধাক্কা খাপা যায়; ঐ মুখচন্দ্রমা দর্শনি লাভে মানুষ—ভারত-ধর্মের অধিবাসী যারারা — পথরোধ করিয়া যাইবে, অর্থাভাবে ভ' বুঝ! তাই শেত-মুখ-কারক পত্রিকাধিকারীগণ সে দিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছেন — এবং নীরব নিষ্ঠুর হিত-সাধন-বুদ্ধি আর কাহারও আছে? আজকালই যাহা ঘটিতেছে — এক জোন্ মুহূর্তে কোথায় যে কি ঘটে তাহার ও ঠিকানা নাই — সে সম্বন্ধে যাহাদের মন্তব্যাদি ও সমালোচনা প্রায় ত্রিকালদর্শীর মত, তাঁহারাই আমার পরাধীন ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে এক-একজন দূরদর্শি হইয়া বসেন,—মনে হইবে, এমন সব-জান্তা পণ্ডিত — অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি লইয়া যেরূপ তুলা-ধুনা করিতেছে, তাহাতে তাহারাই সমস্ত ইহলোকের ঐ অত্যুচ্চ বাক্সের এক পার্শ্বিস্থান-সম্বন্ধে যেমনই অন্যমনস্কতা — অমিতুলা না হইয়া পারে না। আসল কথা, যাহা না বাহাদেশে, তাহাদের কাছে ঐ বাক্সের ঐশ্বর্যটি যতই মূল্যবান হউক; তাহাদের কাছে ঐ বাক্সের ছায়াটুকুও আদর পাইবে। আর যদি ঐ বাক্সের ঝাড়িয়াই যায়, তাহাতেই বা কি? তাহা আবার হইতে লাফাইয়া নূতন শক্ত আধারে চড়িয়া বসিবার কৌশল বাঙালী তুলপাড়িয়া কণ্ঠাস্তরকে আয়ত্ত করিয়াছে। যুগাবতারিত মহাযুগের ঐ আসনখানি টলিতে দেওয়া যায় কি? তাহা হইলে যদি লক্ষ্মী যে তখনই বিমুখ হইবেন। যাঙালী ত বলিবেই, তাই বলিয়া "যো প্রবাসি পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করা যায় কি?

* *

এই জন্যই "কংগ্রেস বনাম বাংলা ও বাঙালী" বলিয়া যে একটি নীতি ঐ শিরীভারতের মধ্যে বহুপূর্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহার সত্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে বাঙালীকে তাহা জানিতে দেওয়া হইবে না। ঐ বিহার-বাংলা-ঘটিত ব্যাপারটি তাহারই একটি স্পষ্ট নিদর্শন; উহার মূলে যে গভীর চক্র উঁকি দিতেছে, আজ তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিলে, বাঙালীকে তাহার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে এখনও সচেতন করা হইবে না। আমরা বহুপূর্বেই ইহার ভবিষ্য উপলব্ধি করিয়াছিলাম; উহার মূলে যে চক্রান্ত বা কূটনীতি আছে তাহা যে প্রাদেশিক নয়, তাহার কারণ যে অতিশয় গূঢ়, সে সম্বন্ধে আমরা গত ভাদ্র-সংখ্যার 'মন্তব্যে' একটা ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, যথা —

> "সকলেই জানেন, বাংলার পশ্চিম সীমানায় কিয়দংশ একদা অতিশয় অবিচারে বিহারের সীমানাভুক্ত করা হইয়াছিল। আমরা আশা করিয়াছিলাম, নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রী-নির্দ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অংশ বিনা বাক্-বিসম্বাদে বাংলাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে।...কিন্তু তাহা যে হইবে না, ইতিমধ্যেই তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই ব্যাপারটি শুধুই প্রত্যক্ষ লাভ-ক্ষতির জন্যই নয়—আরও অনেক কারণে, সকল বাঙালীর বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। কেন যে তাহা সম্ভব হইল না, হইতে দেওয়া হইবে না—তাহা আমরা প্রত্যেক বাঙালীকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। ঐ একটি তথ্যকেই প্রমাণ, সত তত্ত্ব বা উচ্চভাবের যুক্তিকে ধূলিসাৎ করিতে পারে। এমন কি, যদি ঐ একটি ব্যাপারে আমরা আমাদের দৃষ্টিকে দ্বিধা-বিবশ করি, তবে নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ভারত-স্বাধীনতার প্রয়োজনে হিন্দু-বাঙালীর যে কি দশা হইল, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।" [পৃঃ ১৭৪]

ইহার পরেও কার্ত্তিক-সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম —

> "কিন্তু শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের মত মুরুব্বী রাষ্ট্রবিদ তথা শিরীর সর্দ্দারাধিকারীগণ বর্ত্তমান বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক যে এমন করিয়া বিহারের কবলে

টানিয়া লইতেছেন, ইহার গূঢ়তর কারণ থাকিতেও পারে, যে কারণ আমরা যাহা অনুমান করিয়াছি তাহা খুলিয়া বলিতে ভরসা হয় না; কি জানি, শুনিলে ত্রিবর্ণ-বিলাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন। কাজ কি? একেবারে অন্তিমকালে না হইলেও তাহার পরে ত' সকলে বুঝিতে পারিবে।" [পৃঃ ৮১৭-১৮]

কিন্তু আজ খুলিয়া বলিতেই হইবে, তার কারণ, আমরা সম্প্রতি একটা বড় সংবাদ পাইয়াছি;—তাহা যেমন কৌতুককর তেমনই অর্থপূর্ণ; তাহাতে বিস্মিত হই নাই, বরং আমাদের অনুমানটির একটা বড় সাক্ষ্য পাইয়াছি। বাঙালীসাধারণ ত' বটেই — বাংলার নেতৃবর্গও এখনও বিশ্বাস করেন যে, ঐ বিবাদটা একটা প্রাদেশিক সীমানাঘটিত বিবাদ; উহার জন্য যে ভয়খানি ভিতর পর্যন্ত বিদ্ধ হইয়া আছে এ সংশয় কাহারও মনে উদয় হইল না! তাহার কারণ, সকলেই ভারতরাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং তাহার গৌরবশিখরের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া আছে! ভারত যে বিখণ্ডিত হইয়াছে, এবং সেই বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতাও যেমন, তাহার রাজ্যতন্ত্রের সীমানাও তেমনই — ভয়খানি দুর্বলতা ও দলাদলিপরতার আবর্তে অনিশ্চিত হইয়া রহিয়াছে এ জ্ঞান কাহারও নাই! বাংলাদেশটা যে ভারতরাষ্ট্রের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা যে পাকিস্থান ও ভারতের সীমানার মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলিতেছে, এই সত্যটা এখনও বাঙালীর চোখে পড়ে নাই। যে একখানি-মাত্র বাংলা দৈনিকে নির্ভীক সত্য কথা, এবং অনেক হাটে-হাঁড়ি-ভাঙা সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহার প্রবীণ দেশপ্রেমিক সম্পাদকও এ বিষয়ে যে ধরণের মন্তব্য করিয়া থাকেন, তাহাতে মনে হয়, তিনিও ইহার ভিতরকার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। বাংলাকে বিহার-কবলিত ভূমিগুলি ফিরাইয়া দিতে কেবল রাজেন্দ্রপ্রসাদেরই আপত্তি নয় — বরং শ্রীযুক্তশরৎবাবুও যোরতর বিরোধী — এ সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ প্রস্তাবে তিনি নাকি ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন "আমার জীবন থাকিতে উহা হইতে দিব না।" আশ্চর্য নয় কি? আহা পণ্ডিতজী! খুলিয়া বলিবার উপায় নাই যে। তোমার প্রাণের কথাটি আর কেহ না বুঝুক, আমরা যে অনেকদিন বুঝিয়াছি; স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-নায়ক হইয়া তোমার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা যে কেবল তুমি বুঝিতেছ তাহা নয় — বড় হওয়ার গৌরবটাই সকলে দেখিতেছে, অন্যথা তত্ত্ব করমচি করিয়া তোমার ঘাম ও রক্তের লাভ্যুপযোগ প্রমাণিত করিতেছে — কিন্তু আমাদের মত দুই একজন — খুব বেশী নয় — তোমার নিশীথ-নিদ্রার দুঃখের অনুমান করিতে পারি; এতবড় মহিমার ভার বহন করা কি সহজ? বাড়ীর যিনি দর্শনের কর্তা তাঁহার মুখে ঐ কথা; আমার, চাকরটাও এমন কথা বলে যাহাতে মনের কথা ঢাকা হইয়া যায় — কারণ, শিক্ষিতের মত চাকরবাকরেরাও অনেক কথা শোনে, এবং বাহিরে অবিকল বলিয়া ফেলে। কলিকাতার হিন্দুস্থানীরা নাকি উত্তেজনার মুখে এমন বলিয়াছে যে "হিন্দুস্থান হিন্দুস্থানীর — বাঙালীর জন্য পাকিস্থান।" কথাটা নিতান্ত দুর্মুখের কথা বলিয়াই হয়তো মনে হইতে পারে, কিন্তু উপরের দিকে যে হাওয়া বহিতেছে, তলাকার ক্ষুব্ধ পাতাটিতেও তাহার নিশানা পাওয়া যায়।

* * *

আমরা যে কথাটি এতদিন বলিয়াও বলিতে সাহস করি নাই, আজ আর তাহা চাপিয়া রাখিবার প্রয়োজন দেখি না, সত্যই হোক, বলিয়া ফেলাই ভালো। কথাটা আংশিক সত্য বা আংশিক মিথ্যা নয়, ঐ ভয়ই হয়ত করা বড়ই শক্ত। কিন্তু আশা হয়, অন্ধের চক্ষু একটু খুলিতে সুরু করিয়াছে — এখন আর কেহ আমাদের কথায় আগের মত বাক্যমুখো হইয়া উঠিবে না। কিন্তু কথাটা একেবারে

লোকার কথা, সেই সোড়া হইতেই ধরিতে হইবে। বিহার-বাংলার ব্যাপারটা বুঝিতে হইবে, শুধু প্রাদেশিকতার দৃষ্টিতে নয় — ভারত স্বাধীনতার এই উষার শুভ-আরম্ভে একেবারে গোড়াতী হইতেই অনুসরণ করিতে হইবে। তবু টানিয়া দেখাইতে হইলে ছিঁড়ে পর্যন্ত অনুমি টানিয়া করিতে হয়, কিন্তু সে যে এত কোটি লোকের প্রাণের "জীবনী অমরতরী" — সেখানে এমন খোঁচাখুঁচি করা হইবে কি? আচ্ছা, একটু উপরে-উপরেই চান দুলাইব — আপাতত তাহার বাধা কি না!

* * *

বিহার-বাংলার ঐ সীমান্ত-প্রদেশ বিহারকে একটা প্রাদেশিক বিবাদ হেতু শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদই বহুদিন যাবৎ উহার মূলে আছেন; — ধরা যাক ইহাই সত্য। কিন্তু বিহারকে বাংলাকে ছাড়িয়া ঐ শ্রীরাজেন্দ্র-প্রসাদকে একবার কংগ্রেসের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দেখিলে কেমন হয়? কংগ্রেসে তাঁহার আসন কত উচ্চ, তাঁহার মান কতখানি? তাহাতে প্রমাণ হয় যে তাঁহার ঐ প্রাদেশিক স্বার্থবুদ্ধি কংগ্রেসের অর্থ কিছুমাত্র মানে নাই। কেন মানে নাই? বাংলা-বর্জিত সারা ভারতের তিনি এখন প্রীতির পাত্র হইয়াছেন কেন? তিনি গান্ধিজীর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে প্রায় সর্বপ্রধান; সেই কংগ্রেসের কর্মনীতিতে তাঁহার এই — প্রাদেশিকতাই নয় — ঐ বাঙালী-বিদ্বেষ — কিছুমাত্র দোষাবহ হয় নাই, যে কংগ্রেস সারা-ভারতের মোহিনীমূর্তি সেই কংগ্রেসের অন্যতম গুরু তিনি তাঁহার ঐ অন্ধ মনোবৃত্তি কাহারও শ্রদ্ধা-ভক্তি কিছুমাত্র হ্রাস ত করেই নাই, বরং মনে হয়, ঐ কারণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ কংগ্রেসের মহাজন-বৈঠকে — উচ্চমঞ্চ-গুলে — বাঙালী-সমাজের বা বাঙালী-জাতির কোন সত্যকার প্রতিনিধি কখনও স্থান পায় নাই; যে দুই তিন জন পাইয়াছিল, তাহারা সেই প্রভুদের পাদুকা মাথায় বহিয়া বাঙালীর মুখ এই করিয়াছে, ও সেই কারণেই কংগ্রেস-কর্তাদের যথেষ্ট লাভ করিয়াছে — ঠিক যেমন ইংরেজ প্রভুদের পদসেবা করিয়া অনেক বাঙালী উচ্চপদ ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

* * *

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। এত বড় বাঙালী-বিদ্বেষ আরও একবার — সেই ব্রিটিশ ধর্মের আমোদের কংগ্রেসী শাসনকালে — যে মহাপ্রভু বাঙালী নিজেই তাঁহার কংগ্রেসী প্রভুত্বটুকু আজও রক্ষা করেন নাই, তিনিই কংগ্রেস-মহাসভাতে সভাপতির পদ যেমন করিয়া! প্রশ্নটা তখনও যেমন, এখনও তেমনই, আরও বহুগুণ হইয়া উঠিয়াছে; এ প্রশ্ন উড়াইয়া দেওয়া এখনে আরও কঠিন। তবে কি বাংলাদেশটাকে কোন কারণে, কোন ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিক স্বপ্ন নিশ্চিত জানিয়া, তখন হইতেই খতমের খাতায় লেখা হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বড় বড় অ-বাঙালী পুরুষের — বিশেষ করিয়া রাজনীতির অভিজ্ঞমহল নীতিকিপ্রণের যে অনোভাব মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অকারণ নহে; একবার তার চক্রবর্তীর বেতবাসন যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা বাঙালী ছাড়া আর কাহারও যে কটু বোধ হইয়াছিল, এমন মনে হয় না।

* * *

কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর প্রতি এই যে অনোভাব, ইহার যে শুধুই রাজনৈতিক বা সামাজিক হার-জেতুপক একটা কারণই আছে তাহা নয়; শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের বিহারী-নীতিটি নয় — ইহার মূলে কংগ্রেসের আপোষ-নীতি-রচিত একটা বড় প্রয়োজন অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস বৃটিশের সঙ্গে আপোষ করার নীতিকেই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিল; এই কাজেই সে প্রজাতন্ত্রকে কিছুতেই

সমস্যার শেষ নাই ; মন্ত্র পরিবর্তনেও সে সেই নীতির কিছুমাত্র পরিবর্তন করে নাই। সেই নীতির চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ ভারতের এই 'স্বাধীনতা'-দান হইয়াছে। দুষ্টের দমিত রক্ষা করিতে হইলে, দুষ্টের দাবী ষোল-আনা স্বীকার করিয়া লইতে হয় : কারণ দুষ্টই তাহা মেজাজের দাম ধরিবে। সে দাবী — ভারত-বিখণ্ডীকরণ, ও পাকিস্তান-সৃষ্টি। দুষ্টবুদ্ধি দুষ্টের বলের বলিয়া এই শেষ দাবীও করিয়াছে, তাহাদের মত কূটনীতিজ্ঞ জাতি জগতে আর নাই। ভারতকে স্বাধীনতা দিবার ছলে, তাহার শেষ শক্তি ও সামর্থটুকু পর্যন্ত শোষণ করিয়া, অবশেষে উপরন্তু তাহার উপরে প্রভুত্ব স্থাপনের কৌশল সে পাকা করিয়া লইয়াছে। সকল বড় কূটনীতির অন্তর্নিহিত প্রমাণ এই যে, তাহাদ্বারা অন্তিম কটিল গ্রন্থির খুলিয়াছে বহু। এত ভিন্ন দলগুলি পাখী মারা যায়। বৃটিশ পার্লিমেন্টের দেওয়ালীতে তাহার নিজের জন্ম উপস্থিত যে পাকাবাসটী লাটিয়া পূর্বর করিয়া লইয়াছে, তাহারই মধ্যে দুইটি দলের উদ্ধারের উপায় করিয়াছে : কংগ্রেসের সম্মতিক্রমেই তাহা হইবে — শিখ ও বাঙালীকে উস্কাইয়া তাহার এমন সুযোগ আর মিলিবে না। কংগ্রেসের পূর্ণ-মনোভাবের কথা বলিয়াছি, এবং ইংরেজের সঙ্গে রফা করিয়া রাজের (যতই খণ্ডিত হউক) পত্তনীদার হইবার জন্ম উহা আগ্রহ, সে কথা বলাই এখন একটি চুক্তিতে সম্মত হইয়াছে যে, শেষ পর্যন্ত বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্ম তাহার কিছুই করিবার সামর্থ্য রহিবেনা — ইহার কথা স্বতন্ত্র। সে তখন স্বাধীনতা-রূপ আকাশ কুসুম গ্রহণ করিয়া তাহার সেই অপরূপ রূপ হইতে বিরতি এবং সক্রিয় সুযোগের জন্ম অধীর হইয়াছে।

* * *

আকাশ-কুসুম কলহত করার পরেই তাহার চৈতন্য হইতে বিলম্ব হইল না যে, বাস্তবে সে শেষ শাসনের অধিকার পাইয়াছে বটে, কিন্তু কিসের তাহার ডিক্টেট করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রসঙ্ঘের (U. N. O.) দুষ্ট বুদ্ধিতে লক্ষ আছে। উহার প্রমাণ এই যে মাসেই যাহারা পরে পরে লক্ষ নাই, তাহারা দুষ্টুদের গর্বাকেও দেখিতে বা বীকার করিতে রাজী হইবে না। সে জন্যই, উপস্থিত কিছুকালের জন্ম, ব্রিটিশরাজ পৃথক করিয়া লইয়াছে, তাহার শক্তি, সুবিধা, ও সুযোগ-বৃদ্ধির জন্ম সে সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছে ; তাহার ডালহাউসি ও মাউন্টব্যাটেনও সে প্রকারান্তরে সাহায্য করিয়াছে : তাহারই ফলে ভারত-সরকার মহাত্মাজীকে হত্যা করাইয়া থাকিতে চাহার্ন। ধর্ম ও নিরপেক্ষতাবিরোধের দোহাই দিয়া সে ভারতের তাহার সেই পরাধীন উপনিবেশের দাবী খারিজ করিয়াছে। বাকিতে স্ব তাহার স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের কৌড় ই পড়িয়া। বিদায়ে নিজ রাজশাসন-প্রণালীতেও সে বিটিশ প্রভুত্বের বিচ্ছিন্নির নীতি একটুকু অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণও সে দিকে তাও পাইবে ; সেবল ওজস্বিনী বক্তৃতা ও — তর্কের বল — ধর্মের দোহাই দিয়া তাল আর কত দিন ঠাকিয়া রাখা যায় ? পণ্ডিত জবাহরলালের বক্তৃতাগুলি দিন দিন এমনই মান-সম্ভ্রম-ভয়ের অতি সামান্য সংস্কারও বর্জন করিয়া, কোন রকমে প্রাণটা বজায় রাখিবার আকুলতা প্রকাশ করিতেছে, যে, তাহাতে সত্যই দুঃখ হয়। এত দুর্গতির কপালে ছিল ! দুরাকাঙ্ক্ষের কথা ত' তুলিলে না — সেই সর্বনাশ ত' ঘনাইয়া আসিল ! দেখ, বৃটিশ রাজনীতির সেই ধনতান্ত্রিক কাঠামোখানাই জবাহরলালজীর মত বিপ্লবিপ্রভ সমাজ তান্ত্রিক দোহাইকে একেবারে পুরাপুরি বজায় রাখিতে হইল ! ব্রিটিশের ভারত-শাসন-পদ্ধতির — তাহার সেই 'ষ্টীল-ফ্রেম' খানাকেই বাঁচায় করিয়া রাখিতে হইয়াছে — ব্রিটিশরাজ যদি বা তাহাকে একটু নমনে রাখিয়াছিল, স্বাধীন ভারত-সরকার সেই আই-সি-এস ও আই পি কে ভগবানের

ছড়িয়াছে! এ সকলেরই দাম্ভিক আছে — দাম্ভিক কিসের নাই! কিন্তু মুখের দাম্ভিক আর প্রাণের দাম্ভিক এক নয় — ধরা পড়িতেই হয়। তার পর দেখ, ভারত যখন 'অধীন' ছিল, — যখন সৌজন্যীনতা-পাশ ছেদন করিবার জন্য কংগ্রেস ঘোষণার সংগ্রাম করিতেছিল, তখন যে ব্রিটিশ-অনুচরগণ সেই কংগ্রেসের ও ভারতীয় প্রজাসাধারণের অন্যের পক্ষতা ও অক্ষমতার বলিহারি — ব্রিটিশের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে হইবার জন্য সর্বপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা ও লেজ-নেড়িছা করিয়াছিল, তাহারাই ভারত-সরকারের অতি-উচ্চ পদগুলি অধিকার করিয়া আছে। কংগ্রেসের কি অক্ষিপ্ত মহা-মনোভাব! — কি উদারতা কি গুণগ্রাহিতা! ইহারও চমৎকার জবাব আছে — ভক্ত জনগণকে শ্রীবৃদ্ধকল্পে শান্ত করা যে বড় সহজ! আরও প্রমাণ আছে। এই ব্রিটিশ-শ্রীবৃদ্ধিকল্পের মধ্যে একজন এমনই চতুর যে, তিনি 'হৃদয়ের হৃদয়ের সিন্ধি ও মনের মনের মানী' হইয়া লেখে ও বিদেশে পূজালোক হইয়া উঠিয়াছেন। তিনিই একদা কংগ্রেসের মহাসেক্রেটারি-কালে — প্রায় বাকিংহামের উপক্রম-কালে — তাহার সময় বন্ধ হইয়া, কাণে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহাতেই ব্রিটিশের অনুচরবৃন্দ হাদিল করা এখন সহজ হইয়াছিল। এইজন্য ব্রিটেন ও আমেরিকা এখনও তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইহা আমাদের রূপ-কথা নয় — ভারত-ইতিহাসের একটা মীমাংসাকারী কলঙ্কের কথা; একথা খুব বড় করিয়াই ইতিহাসে লেখা থাকিবে। এই মহৎ কার্য-সাধনের জন্য সেই মহাপুরুষ আজ ঐ — বৃটিশকর্তৃক 'গৃহীত ইব কেশেষু' — কংগ্রেসের স্বাধীন ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের ভাজন হইয়াছেন! যে হাতে এই সকল সম্মান ও পুরস্কার বিতরিত হইতেছে তাহা কংগ্রেসেরই বটে, কিন্তু হুকুমটা যে কাহার — সে হুকুম সব সময়ে মুখে ব্যক্ত করিতেও হয় না, অপার সৌজন্যের আবহে তাহা যে কেমন অনায়াসে পালিত হয়, — তাহা কি এই ত্রিকোটির এক কোটির — এক দফত — অথবা এক হাজার চক্ষুষ্মান ব্যক্তিও দেখিতে পাইতেছে না? ব্রিটিশ-প্রভুর মনোরঞ্জনের আরও প্রমাণ চাই? আছেও না — ব্রিটিশের সকলের বড় শত্রু যে — সেই সুভাষের নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; আই-এন্-এ সেনার কি অপমান, কি লাঞ্ছনাই স্বাধীন ভারত করিল! সেই ব্রিটিশ-ভক্ত ভারতীয় সেনা ও সেনানীরাই এখনও স্বাধীন-ভারতের সৈন্যবিভাগে সদর্পে বিরাজ করিতেছে। ইহাদের মনোভাব যে কেমন তাহা, একটু আড়ালে থাকিয়াও ভাবে বিলিতেই, বুঝিতে পারা যাইবে। আমরাও ব্রিটিশ আমোদের একজন পেশনভোগী বড় পুলিস কর্মচারীর সহিত যাচিয়া ভাবে আলাপ করিয়া, এই স্বাধীন ভারতের স্বাধীন-কর্মীদের সম্বন্ধে তাহাদের যে মতামত শুনিয়াছি, তাহা আর লিখিয়া স্বাধীন ভারতীয়-প্রজার অধিকার-ভুক্তি হইব না। ইহারাই, এখনও প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশের অনুচক্র রূপান্তরে, ভারতের শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেছে। এই যে 'অন্তর্যাতন' আজাদ হইতে পারিবে না — ইহার অস্তিত্বের এবং অতি গভীর যুক্তিপূর্ণ কারণ রহিই থাকুক — ঐ 'অন্তর্যাতন'-অরি তাহাদের কর্ণে বিষ এবং হৃদয়ে আগুন ঢালিয়া দেয়? উহাকেও বর্জন করিতে হইবে। সত্যই কি কংগ্রেস-মহাসভাগণ, 'অন্তর্যাতন' যে কি, তাহা জানেন না? ঐরূপ প্রস্তাব যে কিরূপ লজ্জিত ও বিদ্রূপ, উহা দ্বারা সমগ্র ভারতের কিরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে — এখনই তাহা প্রকাশ না পাইলেও, ঐ কাণ্ডটি যে বহু ভারতীয় দেশপ্রেমিকের অন্তরে একটা অনাস্থার উদ্রেক করিবে, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? তাঁহাদের নিজেদের দিক দিয়া উহাকে আগে করার কোন গুরুতর প্রয়োজন ছিল কি! (অন্ত যে

প্রয়োজন বা কারণের কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি, তাহা এখন গুরুতর নয়)। তবু ঐ 'অন্তর্বর্তী'কে ত্যাগ করিতে হইবে, না করিলে কোথায় যে কি সর্বনাশ হইবে, তাহা আমরা কি বুঝিব! সম্প্রতি একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সত্য কি মিথ্যা জানিনা, — মিথ্যা না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক — তাহা এই যে, বর্তমান 'স্বাধীন' গবর্মেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য একদল ভারতীয় সৈন্য নাকি প্রেরিত হইয়াছে বা হইবে! ইহাও ঐ একই যাদুমন্ত্রের বলে, — স্বাধীন ভারতের স্বাধীন কার্য ইহা নহে।

• • •

এমনই সর্বদিকেই ভারত-সরকার অতিশয় স্বাধীন হইয়াছেন। বক্তৃতা ও বড় বড় পরিকল্পনা বা ভীম ঘাড়া আর কিছুর রক্ষতা এখনও দেখাইবার সুযোগ ঘটে নাই। সম্প্রতি গান্ধী-কণ্ডের টাকা-সংগ্রহই সর্বপ্রথম বড় রাজ-কর্তব্য হইয়াছে। দেশের লোক ভাত-কাপড় অভাবে দুর্গতির চরম-অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, — তাহার কোন প্রতিবিধান করা দূরে থাক — এমন সকল কার্য ঐ কেন্দ্রীয়-সরকারও করিতেছেন, যাহার মর্ম বুঝিতেও সাহস হয় না। এতবড় অকর্মণ্যতা — প্রজাপালনের প্রাথমিক নীতি পালন করিতেও এমন আগ্রহহীনতা, এবং তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, পণ্ডিত জবাহরলাল সেদিনও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রজার সর্ববিধ অভাব-মোচনই ভারত-সরকারের প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম। নির্লজ্জতা ও মিথ্যাচারেরও সীমা আছে। হাত-পা যদি এমনই বাঁধা হয় যে, কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই, সেই ব্রিটিশ-নীতি পালন করিয়া, তাহাদেরই মুখোস মাত্র হইয়া, এই যে ভারত-শোষণ, এবং প্রজার যেটুকুও একেবারে জানিয়া লওয়া — না খাইতে দিয়া তাহার শেষ বুদ্ধিশুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব হরণ করিবার জন্য এই যে বিরাট ষড়যন্ত্র — ইহাতে যোগ দিয়া কাহার কূটনীতির সহায়তা হইতেছে! হাত-পা যে কেমন বাঁধা তাহার চাক্ষুষ প্রমাণও দিন দিন বাড়িতেছে। কাশ্মীরে ও হায়দ্রাবাদে যাহা হইতেছে তাহা এতই দৃষ্টিকটু, এতই ইজ্জতহানিকর যে, তাহা কোন স্বাধীন গবর্মেণ্ট একদিনও সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু কিছু করিবার কি যো আছে? একদিকে প্রায় প্রকাশ্য ধমক, আর একদিকে হায়দ্রাবাদে ব্রিটিশ অফিসারের প্লেন ওয়াণ্টার মাউন্ট এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন, এই দুই বন্ধুতে মিলিয়া যে ব্যবস্থা পাকা করিয়া দিয়াছে। হায়দ্রাবাদ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, নাক-কানও কাটিয়া দিয়াছে, তথাপি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার প্রকাণ্ড ঘরে, প্রকাণ্ড চেয়ারে বসিয়া, প্রকাণ্ড কাগজে প্রকাণ্ড বাঙ্গালী প্রকাণ্ড ভাষাবেগের সহিত লিখিয়া চলিয়াছেন। সোজা কথা কিন্তু এই — "যাপধন! যুদ্ধ আমরা করিব না, করিতে নাই, করিলে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইবে; অতএব, তোমরা একটু অন্যভাবে যাহা করিতেছ তাহাই কর; দেখিও যেন আমাদের ইজ্জতহানি না হয় — তোমাই তোমাদের! "বল ও বিক্রম নাকে দিব খৎ করিব বলিবে যাহা" — কিন্তু বাহিরের ঐ অর্জিনটা আমাদিগকে করিতেই হইবে — উহাতে তোমরা রাজী হইও না।" এমন হাস্যকর অথচ করুণ স্বাধীনতার আস্ফালন পৃথিবীতে তেমন কোথাও দেখিয়াছে? কিন্তু উপায় কি? কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষগণ 'ধন্নাচ্চানি মায়য়া' হইয়া, চতুর্দিকে মায়ার খেলা খেলিতেছেন।

• •

কিন্তু এত কথায় আমাদের কাজ কি? আমরা 'অকর্মণ্যে'র ব্যাপারী — আমাদের ঐ জাহাজের খবরে কাজ কি? কাজ না থাকিলেই ভাল হইত, বাঙালী আমরা ঘরে বসিয়া — 'খাই-দাই কাঁসি বাজাই' করিয়া দিব্য আরামে স্বাধীনতা ভোগ করিতাম। কিন্তু তাহা যে করিবার যো নাই।

উপরে যে একথা বলিতে হইয়াছে, তাহা নিজেদেরই প্রাণের দায়ে — চোখে না ধরিলে, এই এত দূরের পাখাটির অবস্থা যে ভাল করিয়া জোকানো যায় না, — কেহ কি এ পর্যন্ত বুঝাইয়াছে? এমনি তা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা কেবল চক্ষু কেন — উপরে ও বলে, বেশ তাহারও জানান্ দিয়েছে। ভাত-কাপড়ের কথা না-হয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তবু বোধ হয়, বাঙালার অবস্থা বাঙালীর বলিবার একটু সুখের। দুই তৃতীয়াংশের বাঙালী একেবারে কতুর হইয়া গিয়াছে — এত যারে। বাকি অংশে যাহারা আছে তাহাদের অবস্থা ঠিক জীবন্মৃতের মত; টি-বি ও এপিডিমিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপরে, বাঙালীর মত লুট করিবার জন্য বড় রকমের দুনিয়া — তাহা অবাঙালীরা পাইতেছে; এখানে সে তাহিনী সবিস্তারে বলিবার অবকাশ নাই। সেই সুবিধার মূলে আছে হিন্দুস্থানী সাহায্যারা। অন্যান্যের ছেলেরা কর্মচারী, প্রায় ৪০ লক্ষের বাঙালী, মায়ের চেটে চাকরীরই হাটে বসিয়াছে। দেখিতে অনেক উল্টা কথা, অর্থাৎ প্রাণ ঠাণ্ডা করিয়া-দেওয়া কথা, তবে ও পক্ষেরই সর্বনাশ হইতেছে — যেমন যোগিনী চৌধুরী কাহারের বর্ষা-সুরহিসাবে কলিকাতার 'জনসাধারণকে অনুরাধা অপাঙ্গে দিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার কাশীপুরে যে একটা 'ফটাকল'-কারখানী বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা তুলিয়া লওয়া হইতেছে; তাহাতে প্রায় তিন হাজার বাঙালী পরিবার অধীন হইয়া পড়িবে। শোনা যাইতেছে, লাখোপতি-বিড়লার যে বিহারে একটী সিমা-কারখানা স্থাপন করিতে সরকার সহিতেছেন, তাহার কর্মক্ষেত্রটী বিহারের রাজধানীতে স্থাপিত হইবে, অর্থাৎ যাহাতে বাঙালীর অন্নসংস্থানে যেন একটু দেরী পাইতে হয় তাহারই পাকা বন্দোবস্ত হইতেছে। পত্রান্তরে আমরা একটা ভুল করিয়াছিলাম — বাংলার প্রতি আমেরিকার কৃপার দৃষ্টান্ত স্বরূপ — বাংলার একটা বিজলী আলো হইতে ৮০ হাজার বাঙালীকে বঞ্চিত করার কথা বলিয়াছিলাম। কথাটা ঠিকই, তবে সেটা পাটনা-প্রান্ত আছে নয় — মৈকাম্বাঞ্চলের আছে। এ বিষয়ে গত মার্চমাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য। আমরা বাঙালীর গলাবাজীর একটা অভিনব মোহমুগ্ধ আমার ছিলাম। ছিদ্রে ছিদ্রে আয়োজন যে আরও পরিপাটী হইয়া উঠিয়াছে তাহার মহবিধ খুলিয়া বলা একটু চোখ কান খুলিয়া রাখিলেই পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি আর একটি চমৎকার খবর বলিয়াছে, তাহার জন্য অবশ্যই সাক্ষাৎভাবে মন্ত্রিমহাশয়রাই দায়ী নহেন। অনেকেই শুনিয়াছেন, দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দর-বনের দিকে প্রায় ২০ লক্ষ বিঘা ধানের জমি বিজয়ীর গ্রাসে চলাইয়া দিয়াছে। বাঁধটা নাকি অনেকস্থানে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; বাংলার জাতীয় নেতা-পরিষদ তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনের মহাসময় এ সকলের কোন সংবাদ রাখিতেন না। — তৎপরিবর্তে একজন কেবল মন্ত্রির সুটের মাত্রাটা বড়াইয়া এবং অপর কয়জন সুবেশীর দন্ত বিলাইয়া, বাঙালীর মাথায় হাত বুলাইয়াছিলেন। সেদ ২০ হাজার বিঘার ধান! কত হাজার পাখিরও সেই সঙ্গে মূলহীন হইল! কিন্তু তাহাতে কাহার কি? কলিকাতার মাড়োয়ারীর থুঁড়ি আরও বাড়িতেছে! সে থুঁড়িতে হাত বুলাইয়া, যে কয়জন পারে বেশ 'স্বাধীনতা' করিয়া লইতেছে।

* * *

দেখুন, কি বলিতে কি বলিতেছি। এসব কি কয়জনাকে বলিবার কথা; কিন্তু কথাটা বীজু হইলেও উহাতে তোমার সেই বড় কথাটাই আছে — আমাদের ছোটমুখে যে কথাটা বলিতে বলিয়াছি। বাংলা দেশ ও বাঙালীকে বুঝিয়া ফেলিবার — তাহার জাতি, তাহার দেশ, তাহার ধর্মটাকে পর্যন্ত তাহাদের অঙ্গ হইতে ছুঁইয়া ফেলিবার যে চেষ্টা, এবং

ইন্দিরাপন্থী কার্যকলাপ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আমরা তাহার কারণ অনেকদিন হইতেই বুঝিয়াছি, এবার একটু খুলিয়া বলিলাম। সেই কারণ তিনটি —

(১) বাঙালীর প্রতি "ভারত-আত্মা"র বহু কালাগত অশ্রদ্ধা এবং অমূলক-প্রসূত ঈর্ষা; বাঙালীকে উহারা হিন্দু-ভারতের একটা অতিপল্লবিত, অনাচারী, ও উপদ্রবকারী অস্বাস্থ্য জাতি বলিয়াই মনে করে (বাঙালী-মুসলমানের ক্ষেত্রেও তথা)। এই বাংলাকে শাসন করা দুরূহ; ইহার বিপ্লবী-অন্তর্বাদ (ব্রিটিশের পক্ষেও যেমন) ভারতের পক্ষেও তেমনই, অনেক কারণে অন্তরঙ্গ; তাহা যাদুমন্ত্রী ধনপতি-গণের দ্বারা তাহাদের ধনবৃদ্ধির যেমন অন্তরায়, তেমনই 'রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র'-তন্ত্রের উপযোগী নহে। বাঙালী হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, জৈন-বৌদ্ধ নয়, — সে ভারতমাতার এক রূপ পৃথগ্‌ভাব! ইহার উপর বর্তমানে ভারত যে মুখবন্ধে অবতরণ করিয়াছে, তাহাতে স্থায়ীভাবে কিছুদিন বাস করিতে হইলে বাংলা-প্রেমিকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে; তাহারও বড় কারণ —

(২) বাংলার বৃটিশ কর্ণধারীগণ ঐ বাঙালীকে ঐক্যে করিতে কৃতসংকল্প; প্রায় সেই করিয়া আনিয়াছেন, বাকিটুকু কয়টা দিন সেই করিতে না পারিলে তাঁহারা বড়ই অসহায় হইবেন। তাহাতেও ভারতের লাভ বই লোকসান নাই।

(৩) আর এ হিন্দু ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ঐ বিহার পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে পাকিস্তানকে ঝিমাইয়া কাঁকি দিয়া সেই সীমানা বাড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই; ইতিমধ্যেই একটা বিপদ ঘটিয়াছে — ত্রিপুরাতে আবার একটা 'এজেন্সি'র দ্বারা সে বিপদে উদ্ধার পাইতে হইবে। বাংলার প্রায় সবটাই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, টিকিয়া হইয়াছে — হিন্দু-বাঙালী আর মুসলমান বাঙালীতে তফাৎ কি? দুই-ই ত' বাঙালী; ধর্মটা ত' আমরা উঠাইয়া দিয়াছি, মহাত্মাজীও বলিয়াছেন — "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম"; অথচ আর ও হাঙ্গামে কাজ কি! বাকি যেটুকু আছে তাহা যে-কোন মুহূর্তে আপদে পাকিস্তানের গর্ভে যাইবে — ঠেকাইবে কে? আমরা ভাবের সহজেও বাংলাদেশটা পাকিস্তানের অঙ্গ হইবার কথাই ত' একরকম মানিয়া লওয়া হইয়াছিল — যেটুকু তা-না-না-না না করিলে নয় তাহা জিন্নাসাহেবও বুঝিয়াছিলেন। এখন উহাতে খরচের খাতায় লিখিয়া রাখাই সঙ্গত।

*

তাই বিহার ও অসমীয়া বাংলাকে ফেরৎ দিবে না! বাঙালী ধর্মমুখরে ইহাতে বিস্ময়ের অন্ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। "ছি-ছি, স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষটি কি এমন করিয়া কলঙ্কিত করিতে হয়? ছি-ছাই! এমন কথা বলিওনা — ধর্মের দাবী ছাড়া একটু বেশী আশা চাই না। আমরা যে বাঙালী, আমরা স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষটি ছুতে করিয়া ধর্মের পানে চাহিয়া আছি; আমরা রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মুখের অবস্থান-স্থানে পূজা করি! যদি তোমরা রাগ কর, তাহা হইলে আমরা ধর্মের দাবীও করিব না — আমাদের কর্তারা তোমাদের কর্তাকে ডাব এবং হরবৎ খাওয়াইয়া যতটুকুতে রাজী করিতে পারেন, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব।" বাঙালীর দোষ কি? সে এখনও বিশ্বাস করে, তাহার ভাষা দাবী বলিয়া কিছু আছে।

*

বাংলার ঐ যে অবশিষ্ট ভূমিটুকু আছে তাহাতে আর এতটুকু ভূমিও কেন যুক্ত করা হইবে না, তাহা বলিয়াছি — হইলে ভারতরাষ্ট্রের ভারাক্রান্ত হইবে। তাই ঐরূপ প্রস্তাবে, ভারতরাষ্ট্রের ধনপ্রাণরক্ষক যিনি, সেই পণ্ডিতজী এমন বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ফরিদপুরের একখানি ইংরেজী সৈনিক পত্রিকা তাঁহার সেই উক্তিকে stupid ও irresponsible বলিয়াছিল, বলিবে তাই কি, কিন্তুর কথাটা অধিকতর বে জব পায়। বাংলাকে কেহ দেওয়া যাবেই পাকিস্তানের পার্শ্ব ফেলিয়া দেওয়া; কারণ, বাংলার সহটাই যে এতদিন পাকিস্তানের অন্তীভূত হইবে, ইহা পণ্ডিতজী যে, জানিতেন। আমরা কতখানি যে পাকিস্তানের অবলে যাইবে, পণ্ডিতজী এখনও তাহার সঠিক হিসাব করিতে পারেন নাই; তবে ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী বজায় রাখিতে হইলে আরও অনেক দিকে অনেকখানি ছাঁটিয়া দিতে হইবে ইহা তিনি এখনই বুঝিতে পারিয়াছেন। তবু বজায় থাকিবে কি? অবশ্য বিটীশ, এবং তৎপরতার সহিত রাষ্ট্রসংঘকে, কূটনীতির অনুরোধে, যদি জিন্নাসাহেবকেই সমটার মাঝেনী হাকিয়া দিতে রাজী না হন। আমার সেই ভিটীশের কথাই আসিয়া পড়িল, এবং বাংলা ও বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাহার সেই দুই সংকল্পের কথা ও মনে পড়িল। কোথায় জবাহরলাল! কোথায় বা শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ! 'মহাত্মাজীর মায়া' বাংলা নয়। বাঙালী, ইহাই কোথায় বর্তমানের কোটিকিতে বিশ্বাস করিতে না পারো, তাহার ইতিহাস পড়ুক, সবই চোখে দেখিতে পাইবে। কেন তার নিজের দেশ ঐ বঙ্গ-ভেদের লড়াই করিয়াছে? কিন্তু হইবে না — একটা কাজ করাও মিলিবে না।

চিত্র-পরিচয়

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(১২৮৮—১৩২৯)

ইনি বিখ্যাত গদ্য-লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র; পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কিরূপে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। ইনি খাঁটি বাঙালী, অর্থাৎ যাহা বাঙালীর মুখ্যতিথির ও ঐতিহ্যের বাহক তাহা এবং তাহাই এই কবির হৃদয়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়; এই দুই বিষয়ে তিনি অসাধারণ রস-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেমন পুরাতন ভাবাকেও নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তেমনই বহু নূতন বিদেশী শব্দের দ্বারা তাহাকে প্রসাধন করিয়াছেন। ছন্দের নিয়ম কানিদিকেও তিনি এ যুগের সকল কবির অগ্রদূত। তাঁহার রচনার বিষয়, ইতিহাস, পুরাণ এবং আধুনিক কালের সমসাময়িক নানা কথা এবং কবিতে এবং এমন যুক্তি ও চারুতার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে যে, কেবল সত্যেন্দ্রনাথের ঐ কাব্যরাশি আদ্যোপান্ত আন করিয়া পাঠ করিলে যাহা তাহার প্রতীয় জ্ঞান, চারুতা ও পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ করিয়া এবং রবীন্দ্র-শিষ্য হইয়াও প্রাচীন ভাষা-রীতির পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁহার কবিতার শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য:— 'তীর্থসলিল', 'তুল ও কেরা', 'অন্ন-আবীর', 'তুলির লিখন', 'বিদায়-আরতি' ও 'বেলাশেষের গান'।

('কাব্যমঞ্জুষা' হইতে)

২৩ নং প্রেমচন্দ্র বোস, "মডার্ন প্রেসে" লিমিটেড্ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এ পর্যন্ত হয় নাই।

যাহা হউক, এটা কিছু — আর কিছু হউক না হউক, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অন্তরে এবং বাহিরে মানে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য তাহা সর্বজনস্বীকৃত নহে, যেখানে স্বীকৃত সেখানে সে বিশ্বাস গৌণিক মাত্র।

জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যসমাজে বড় গোল আছে। যে প্রকারে হউক, আপনার উদরপূর্তি, এবং আপনার বাহেন্দ্রিয়সকল চরিতার্থ করিয়া, আত্মীয়-স্বজনেরও উদরপূর্তি সম্পাদিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। তাহার উপর, কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যস্থাপনও উদ্দেশ্য। উদরপূর্তি পর, হয় হউক বা অন্যপ্রকারে হউক, লোকহিতা স্বাধীনতা প্রভৃতির অনুরোধে অনেক আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য করে। এই প্রায়ঙ্গলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, দৈবের রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মূলে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্যতঃ মনুষ্যলোকে সর্ববাদিসম্মত। এই তিনটীর সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়া পরিচিত।

যাহারা ধর্মে বা ইউরোপে এমন অনেকই দুনিয়ার মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে তাঁহারা বাহ্য সম্পদকে তৃণবৎ ঘৃণা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে ঐহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টকর, মনুষ্য সর্বত্যাগী হইয়া নির্বাণাকাঙ্ক্ষী হউক। তাহাতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেকানেক দুনিয়ার মহাপুরুষ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, ঐহিক সম্পদে অনুরক্ত হইয়াও, সমাজের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সাধারণতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সর্বত্যাগীর বৈরাগ্যসম্ভ্রমের সমস্তকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিলেই, একথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে।

ফল কথা এই যে, ধনসম্পত্তির ন্যায় সুখসুহৃৎ, স্বচ্ছন্দসম্বন্ধ, সংরক্ষণ ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও তখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র — পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্মভূমি মাত্র — এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্যের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে। কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য কি তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চয়তায় একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের প্রমাণাভাব। তৃতীয়তঃ, পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষাভূমিমাত্র হইলেও ঐহিক এবং পারত্রিক সুখের মধ্যে মিলিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না, যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্যেই ইহলোকেও শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন হবে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দেশ এ পর্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই।

যাঁহারা বলেন যে, ইহলোকে অধার্মিকের শুভ এবং ধার্মিকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাদিগের মূলে কেবল ধনসম্পদাদি শুভ। তাঁহাদিগের বিচার এই মূল ভ্রান্তিতে দূষিত। কেহ যদি কেবল দাতব্যিটে সাহেবের তাড়নায় কষ্টকৃত হইয়া, অথবা ধনের লালসায়, অপ্রদাতাদিগের দুষ্কৃতিনিবারণের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার পারলৌকিক মঙ্গল সফল হইল কি? দান পুণ্যকর্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকে কোন উপকার হইবে ইহা কেহই বলিবে না।

অতএব অনোন্নতিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুনরুৎপত্তি তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ হয়: বিনাশিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই পরলোকে সম্বন্ধেও বলিলে কথা প্রায় কহা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে।

বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সমাক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সর্বোচ্চির উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধন অবলম্বন করিয়া, জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই এমন নহে। তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত মনুষ্যমাত্রের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদিগের জীবনের মূল তত্ত্বসকল অপরিজ্ঞেয়। কেবল দুইজন আপন আপন জীবন-বৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন — একজন সেণ্ট্, দ্বিতীয় জন জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্।

যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, ভবিষ্যতে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ একটা আদর্শ যে সে কালের ব্রাহ্মণ কবিদিগের সম্মুখে ছিল, আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে।

— বঙ্কিমচন্দ্র

অঙ্গুলিমাল *

শ্রীকালিদাস রায়

হে বিংশ শতাব্দীর হে অঙ্গুলিমাল!
দণ্ডিত কণ্ঠের তব ও বক্ষ জ্বলাল—
নর-মানবের নখ অঙ্গুলিতে গাঁথা মালা নয়,
হৈরি গৌরব তব পশুত্বলোহত।

তুমি ত' মানুষ নও, তোমা 'পরে নাই কোন রোষ,
তোমারে চিনিনি বোঝা—আমাদেরি দোষ।
তুমি নিজে কর্ত্তা নও, তুমি ত' করণ,
হে যন্ত্র, তোমার মর্ম্ম জীবন-হরণ।
বরষ পালিছ তুমি, হে অপরাজেয়!
বরষে নিবন জান শ্রেয়ঃ।
বিধাতার রুদ্ররুদ্র! ঘুমেঘুমে আসি'
ধরায়ে চৈতন্য দাও মোহরুদ্ধ নাশি'।
শুধু তব ত্রাস ত্রাস, হে ভয়হীন,
মানুষের হৃদয়ের ক'রে দাও কিনাত কঠিন?

চিরজীবী নও তুমি! তোর তব নহে ত' বারণা,
ক্ষয় তব নিত্যের সাধনা।
ক্ষণে ক্ষণে তব সর্ব্বকর্ত্তৃবল,
সর্ব্বপাপমুক্ত হস্তা নির্ম্মম নির্ম্মল।
বীরত্বের, বিক্রমের, ধ্বজা-কেতা, ভূমিকম্পসম..
হে ভৈরব! তোমা নহে নমঃ।

কুয়াশা আর বরফের শুধু নয় শুধু আঁধার
বন্ধ-বাজনা ধ্বজ-পতাকা আরো যে ভয়ংকার!
শুধু ঝিকিমিকি তারার লাগিয়া আকাশের পানিয়ানো!
ধূমকেতু আর উল্কার মনে পাতে নি সেথায় থানা?

শিশুর অন্তরে যার পরোক্ষের বিনায় খেলার ছলে,
তেমনি খেলার খেলালে ছড়ায় মারীবিষ খলে-জলে!
যাবো কি যাবো না!
আমার মত নিরুপায়ের বেটে—এ খেলা খেলিতে পারে।

—যখন-পসারী

---

* অঙ্গুলিমাল মহাকারুণিকের বিখ্যাত শিষ্যদের একজন, তাঁহার উল্লেখ আছে।

আর্যোদয় *

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ, ডি-ফিল্ (মিউনিক), ডি-লিট্ (প্যারিস্)

পূর্বগামী আলোচনায় যে-সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছান গিয়াছে তাহা এই যে—(১) ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণের আদি জন্মভূমি ভারতবর্ষে অবস্থিত ছিল না; (২) খুব সম্ভব তাহা খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশশতকেই অবস্থিত ছিল, এবং (৩) ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যগণ যে কতকালের পথে ইউরোপ হইতে এশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন (যাহা Hirt প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত ছিল, এবং Eduard Meyer যে-মতের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন) তাহা স্বীকার করা যায় না; বরং (৪) স্বীকার করিতে হইবে যে ইন্দো-ইউরোপীয় আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ইন্দো-ইরানীয় আর্যগণ প্রথমে দক্ষতঃ Oxus ও Jaxartes নদীর অন্তর্বর্তী প্রদেশে বাস স্থাপন করেন, এবং পরে (৫) তথা হইতে তাঁহাদের কতক অংশ পশ্চিমাভিমুখে অভিযান করিয়া মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ অধিকার করে, কিন্তু (৬) প্রধান অংশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে ইরানে ও ভারতে আর্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করে।

ভারতীয় আর্যসভ্যতা সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে ইন্দো-ইরানীয় আর্যসভ্যতার অন্ততঃ কথঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন, কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য সভ্যতা ও ভারতীয় আর্য সভ্যতার ইহাই যেন যোগ-সূত্র—বীজ ও ফলের অন্তর্বর্তী মধ্যবর্তের মত। কিন্তু এই মধ্যবর্তের আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নাই, কেবল দুইটি আছে; উপরন্তু ইন্দো-ইরানীয় সভ্যতার দুইটিও যেন সেটি প্রাচীনতর (অর্থাৎ ইরানীয় আর্য সভ্যতা), সেটির প্রাচীনতম অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নাই। কিন্তু তৎসম্বন্ধে অনুমান কিছু সম্ভব। কাজেই ভারতীয় আর্য-সভ্যতার বিষয় আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে ইরানীয় আর্য সভ্যতার কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

আর্যগণ আদি ইন্দো-ইরানীয় বাসভূমি (যাহা Oxus ও Jaxartes নদীর অন্তর্বর্তী প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে) হইতে ইরানে আসিয়া বসতি স্থাপন করার পূর্বে ইরানের অবস্থা কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে আসীরীয় ইতিহাস ও গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিক্ষিপ্ত উক্তাদি হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব ইরান ও বালুচিস্তানে (Gedrosia) আর্যগণের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই কৃষ্ণবর্ণ এক জাতির বাস ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া গ্রীকগণ মনে করিয়াছিল যে তাহারা এথিয়োপিয়া হইতে সেখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে (Herodotus VII, 20)। খুব সম্ভব বালুচিস্তানের এই এথিয়োপীয়গণ আসলে ছিল দ্রাবিড়। দ্রাবিড় ভাষা একটি দ্রাবিড়ী ভাষা, কোন আর্য ভাষার সহিত ইহার অন্তরঙ্গ কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চতুর্দিকে আর্য ও আর্যেতর ভাষার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও ব্রাহুই ভাষা আজও তাহার দ্রাবিড়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্গণ কিন্তু কেবল কঙ্কালেরই দ্রাবিড়ী, কারণ তাহাদের গায়ের রং ও দেহের গঠন হইতে তাহাদিগকে আর দ্রাবিড়ী বলিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু প্রাচীন যুগে ব্রাহুইগণ যে দেহেও দ্রাবিড়ী ছিল তাহা

* বঙ্গীয়-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রবোধ চন্দ্র বসু-বক্তৃতা, নং ৩।

Herodotus-এর ঐ কথা হইতে মনে হয়।— মরুময় ঈরাণ-ইরানে এখনও জনবসতি খুব অল্প, এবং আলোচ্য যুগেও ঐ ভূখণ্ড বিস্তীর্ণ এলাকায় মরুই বা তদনুরূপ অবস্থিতির ছিল। কিন্তু এতদ্ভিন্ন এখনকার মতই যা তদানীন্তন

কোন না কোন আদি "পুরুষ" হইতে উদ্ভূত; কিন্তু এবার অনুযায়ী এলামের রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছে একজন আদি 'নারী' হইতে। এলামীয় রাজবংশের বংশপরম্পরায় কেবল কন্যার পর কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, পুত্রের পর পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর্যপূর্ব সভ্যতাতেও (আধুনিক সীমানা) উত্তরাধিকার ছিল কন্যামুখী। এমন কি সেই প্রাগৈতিহাসিক আর্যভাষী হখামনিষ্, সম্রাট সাইরাস ও ইরানে আর্যপূর্ব যুগ হইতে প্রচলিত সেই অতি অসার্থ মাতৃপ্রধান (matriarchal) সমাজবিধান অনিবার্যভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। হখামনিষ্, সম্রাটগণ যে পরাজিত আর্যপূর্ব রাজবংশের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার পিছনে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ইরানের অনার্য অধিবাসীদিগকে বোঝানো যে, তাহাদের রাজবংশে প্রকৃত কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, যেহেতু আর্যবিজয় বা হউলেও যে মাতার পুত্র ইরানের রাজা হইত, আর্য-বিজয় হওয়ার পরও সেই মাতার পুত্রই সিংহাসনের অধিকারী হইতেছে। ইরানের অনার্যদিগের সঙ্গে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহও প্রচলিত ছিল। এই সম্পর্কেও হখামনিষ্, সম্রাটদিগের আর্যনীতি খুব করিয়া অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে অনার্য প্রথা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; কারণ সহোদরা ভগিনীর সহিত না হইলেও, বিবাহযোগ্যতার সহিত বিবাহ হখামনিষ্, রাজবংশে প্রচলিত ছিল। অনুরূপ আরও বহু তথ্য আলোচনা করিয়া Herzfeld দেখাইয়াছেন যে ইরানের আর্যপূর্ব অধিবাসীগণ এলামীয়দিগের সমজাতীয়ই ছিল। ঐতিহাসিক যুগে কেবলমাত্র সভ্যতাতেই মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করা চলিবে না যে, কেবলমাত্র ইরানের অংশবিশেষে এলামীয় বা তদনুরূপ সভ্যতার নিদর্শনের ছিল। বস্তুতঃ, নারীর বহুভর্তৃত্ব ও বাসরশয্যা প্রভৃতি যে আর্যপূর্ব ইরানীয় সভ্যতার অনুকরণ ছিল, সেই সভ্যতা ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে একেবারে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। মহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতার যুগেও ভারতে বাসরশয্যার প্রচলন ছিল, এবং ভারতের প্রাগৈতিহাসিক নাগেশ প্রভৃতি অঞ্চলে নারীর বহুভর্তৃত্ব এখনও প্রচলিত। কাজেই Herzfeld প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিৎ যখন বলেন এলামীয়দিগের মতো যে-সভ্যতা আর্যোদয়ের পূর্বে সর্বোৎকর্ষ লাভ করে সেই সভ্যতাই একসময়ে ন্যূনাধিক বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপে ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই বিরাট ভূখণ্ডে এককালে বিস্তার করিয়াছিল, তখন তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে এই মত পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে আরও বহু গবেষণা ও প্রাত্নতত্ত্বিক খননাদি প্রয়োজন তাহা নিঃসন্দেহ। Herzfeld কিন্তু এসম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ না রাখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: "Western Indian and some Iranian aborigines belonged to the same or a homogeneous ethnical group, which included the ancient Elamites. They are opposed to the aboriginal population of Sumer, whether Sumerian or Semite, but stand in close relationship to the aborigines of Mesopotamia, the so-called "Subaraeans."* ঐ আর্যপূর্ব ইরানের অন্তর্গত পারস্যের (১) সভ্যতায় মৃৎশিল্পের বিশেষ কোন স্থান ছিল না বলিয়াই মনে হয়। Herzfeld প্রাত্নতত্ত্বিক খননাদির দ্বারা Persepolis-এর প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু আর্যপূর্ব পারস্যে যে

* অবশ্য এই ভূখণ্ডের নাম তখন 'পারস্য' ছিল না।

অবশ্যই অনুমানের ব্যাপার ছিল তাহা তিনি প্রমাণ করিতে পারেন নাই। মনে রাখিতে হইবে যে অনুসন্ধানের প্রথাপ্রকরণও ইহাই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, কারণ সেখানেও এপর্যন্ত কোন নিশ্চয়তা অস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। কাজেই এই দিক দিয়াও আর্যপূর্ব ভারত ও আর্যপূর্ব ইরানের মধ্যে একটি বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যাহার কারণ কৌতূহল হয় যে এই দুই দেশই আর্যপূর্বযুগে অতি পারিপ্রিক একই জাতির বিভিন্ন শাখার বাসভূমি ছিল।

এলামীয় চাক্ষুষলিপি ব্যতীত বিভাবিধি না হইলেও এলামীয় দুই ও সভ্যতার ধারা বিভাবিত ও অনুপ্রাণিত এই ইরানভূমিতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি বা তাহার কিছু পূর্বে আর্যজনের আবির্ভাব ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে সম্পূর্ণ নূতন একটি সভ্যতার পত্তন হয়। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে প্রাচীনকাল হইতে যে-ভূখণ্ড 'ইরান' নামে পরিচিত, আলোচ্যের পূর্বে সেই দেশের ঐ নাম ছিল না, কারণ 'ইরান' কথাটিই মধ্য-ইরানীয় 'ইরানশহর' এই নামের পরবর্তী রূপ — যে নামের আক্ষরিক অর্থ হইল "আর্যজনের দেশ" (অবেস্তীয় "ঐরিয়ানাম্ খ্‌শথ্রম্")। বাস্তবিক আর্যপূর্ব ইরানের সম্পর্কে 'ইরান' কথাটি প্রয়োগ করা অনুচিত। অতি প্রাচীন অবেস্তীয় প্রত্নলিপিতে মাঝে মাঝে ইরান-প্রদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাতে এই সম্পর্কে যে নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা 'মাদা' অর্থাৎ 'মাদ্‌রাম্'। অসুর (Assyria) ও বাবিলন্ (Babylonia) রাজ্যের প্রত্নলিপিতেও 'মাদা' নামটি পাওয়া যায়, এবং আধুনিক 'আদেরবৈজান'ই, (Adherbaijan) যে অসুর ও বাবিলন্ রাজ্যের প্রত্নলিপিতে 'মাদা' নামে অভিহিত হইয়াছে এসম্বন্ধেও প্রায়তত্ত্ববিদগণ প্রায় একমত; কিন্তু এই 'মাদা' ই যে ঐতিহাসিক মাদ (Medes)-গণের প্রাচীন অভিধা — সে সম্বন্ধে অধিকাংশ গবেষকের যোরতর সন্দেহ দেখা যায়। তবে, 'মাদ্‌রাম্' যে পারস্যের আর্যপূর্ব অধিবাসীগণের নাম ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। (৩) 'মাদ্‌রাম্' এই আর্যপূর্ব নামের পরিবর্তে 'পার্স' এই আর্যনাম পারস্যে আর্য বসতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রচলিত হয়। 'পার্স' এই নামটির প্রাচীনতর রূপ ছিল 'পর্স', কিন্তু ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে ভূখণ্ডের প্রতি 'পর্স' এই নাম প্রযুক্ত হইতেছে দেখা যায় সে-ভূখণ্ড আজে ঐতিহাসিক যুগে যাহা খাঁটি পারস্য বলিয়া পরিচিত (Persepolis) তাহা ছিল না। অসুর সম্রাট তৃতীয় শাল্‌মনেসর্ (Shalmaneser III) খৃষ্টপূর্ব ৮৪৩ অব্দের একটি প্রত্নলিপিতে সর্বপ্রথম 'পর্স' এই নামটির উল্লেখ করেন, এবং এই 'পর্স' ও 'পার্স' যে অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, যে-ভূখণ্ডের প্রতি শাল্‌মনেসরের এই লিপিতে 'পর্স' নামটি আরোপিত হইয়াছে তাহা খাঁটি পারস্য দেশের অন্তর্ভুক্ত নহে। যে ভূভাগ আধুনিক যুগে কির্মান্‌শাহ্ প্রদেশ রূপে পরিচিত সেই ভূভাগই শাল্‌মনেসরের প্রত্নলিপিতে 'পর্স' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ভূভাগ কিন্তু মেডিয়া-র অন্তর্গত, যাহা ইরানীয় মাদ (Mede) জাতির জন্মভূমি ছিল। কাজেই মনে হয় যে, মাদ জাতির 'পর্স' নামক কোন উপশাখা প্রাচীন কালে মাদ দেশ হইতে আসিয়া এখন যে-ভূখণ্ড 'পার্স' (অর্থাৎ Persepolis) নামে পরিচিত সেখানে বসতি স্থাপন করে, এবং সেই উপশাখাটির নামানুসারেই Persepolis অঞ্চলের নাম হয় 'পর্স' 'পর্স' 'পার্স' বা 'পারস্য'। উপরি-উক্ত অসুরীয় প্রত্নলিপির

৩। Herzfeld, Op. Cit., p. 181.

পাখা যদি সত্য হয় তবে — তাহা বিশ্বাসকর হউক না কেন — এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইতিহাসের পূর্বার যার ও পারসিক দুইটি বিভিন্ন ইরানীয় জাতিরূপে দেখা দিলেও মূলতঃ পারসিক জাতি যার জাতির একটি উপশাখা মাত্র ছিল। — এই সম্পর্কে আরও একটি সত্যতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবেস্তা 'পর্ত' নামক এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। খারেমন্দরের উপরি-উক্ত যে গ্রন্থলিপি হইতে 'পর্ব' এই ইরানীয় নামের পূর্বাংশের প্রমাণিত হয় সেই গ্রন্থলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্বেই বেস্তাস্থের সুপণ্ডিত কোন কোন মনীষী (বিশেষ করিয়া Ludwig ও Hillebrandt) এই মত প্রকাশ করেন যে, অবেস্তার এই 'পর্ত' প্রাচীন পারসিকদিগেরই নাম। তাঁহাদের এই মত তখন গ্রহণ করা হয় নাই। এখন কিন্তু সেই কথা নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বালোচনা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে আর্যপূর্ব ইরানের সহিত অবশ্যই এলামিদের, জাতিগত ঐক্য যা না হউক, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিল, এবং ইরানের আর্যপূর্ব অধিবাসীদের নাম যে ছিল 'অনশান্' তাহাও বিভিন্ন কল্‌দীয় গ্রন্থলিপির সাক্ষ্যানুযায়ী নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইরানের আর্যপূর্ব অধিবাসীদের অন্য আর একটি জাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল যাহাদের সম্বন্ধে এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা নিতান্তই প্রয়োজন। এখন যাহা ইরাক ও ইরানের প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে পরিচিত, ইরানে আর্যোৎপত্তির পূর্বে সেই অঞ্চলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটি বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা হইল কস্‌দু (বা Kassite) সভ্যতা। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথমার্ধে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই কস্‌দু-গণই বাবিলনে রাজত্ব করিয়াছিল। Herzfeld অনুমান করেন যে, কস্‌দু এই নামের মূলে আছে 'কস্'-ধাতু; 'কস্' এই ধাতুরই রূপভেদ হইল 'কশিস্'। 'কশিস্' এই শব্দটি এলামীয় দেবতা "অম্‌ন্‌ কশিয়াহ্"-এর নামের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং এই 'কশিস্' হইতেই আবার গ্রীক্‌ শব্দ Kaspioi উদ্ভূত। উত্তর-ইরানের জাতিগুলির গ্রীক্‌ নাম ছিল এই Kaspioi, এবং এই নাম আজও যে বিলুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ 'কাস্পিয়ান্ সাগরে'র অস্তিত্ব হইতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যে কস্‌দু-জাতির নাম হইতে কাস্পিয়ান সাগরের নাম হইয়াছে সেই কস্‌দু-জাতির কথা সকলেই প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। ইতিহাসেও কস্‌দু-জাতির উল্লেখ কমই পাওয়া যায়। কিন্তু আসলে Kassite ও Kaspian একই জাতির দুইটি নাম। কস্‌দুদের ভাষা সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তাহা হইতে মনে হয় যে, এলামীয় ভাষার সহিত এই ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য ছিল, যদিও নিঃসন্দেহে এই সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। কস্‌দুরা যে অপর কোন দেশ হইতে আসিয়া কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণস্থ ভূভাগ অধিকার করিয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এবং তাহারা যে সর্বপ্রথমই অনার্য ছিল সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আর্যদের সম্পর্কে তাহাদের উল্লেখ করিতে হইতেছে তাহার কারণ — এই অনার্য কস্‌দুদের মধ্যেই সর্বপ্রথম এমন একটি শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় যাহা সকলকেই ইন্দো-ইরানীয় আর্যদের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এই শব্দটি হইল 'সুরিয়স্'— ইহার ছিল কস্‌দু-ভাষায় সূর্য-দেবতার নাম। ইহা যে অনার্য কস্‌দু-ভাষার কাহন শব্দ সুমেরু-ভাষা বলাই বাহুল্য। তবে শাখায় আর্য ভাষার মধ্যেও যে এই শব্দটি ঠিক এই আকারে পাওয়া যায় তাহা নহে। কেবল ইন্দো-ইরানীয় আর্য ভাষার মধ্যেই সূর্যদেবের নাম এই আকারে পাওয়া যায়। ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদলের মধ্যে যে সূর্যদেবের নাম এই আকারে প্রচলিত ছিল তাহাও বলা যায় না, কারণ গ্রীক্‌ প্রভৃতি আর্য-ভাষার সূর্য-বাচক শব্দের (গ্রীক 'হেলিয়স্',

ইত্যাদি) সহিত এই 'ঈর' শব্দটির সম্পর্ক অত্যন্ত অধিক। সুতরাং বিশ্বাস করিতে হয়, খৃষ্টপূর্ব সহস্রকের মধ্যভাগে কোন ইন্দো-ইরানীয় আর্যভাষী উপজাতির নিকট হইতে এই 'ঈর' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাই যদি হয় তবে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃঃ পূঃ ১৮০০ অব্দের কাছাকাছি ইন্দো-ইরানীয় আর্যদের অবিভক্ত অবস্থার কাস্পীয় হ্রদ হইতে অনতিদূরে বাস করিতেছিলেন, কারণ পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে, ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যদের মধ্যে বিশেষ এই প্রাচীন যুগে ঘটে নাই.

এই অবিভক্ত ইন্দো-ইরানীয়দের সহ-বাসস্থান কাস্পীয় হ্রদ হইতে অন্যত্র বিপ্রকৃষ্ট হইলে যে তাঁহাদের ভাষা হইতে অসুরদিগের ভাষার 'ঈর' শব্দটি সংক্রামিত হইতে পারিত না তাহাও সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ইন্দো-ইরানীয় আর্যদলের আদি বসবাসভূমি — যাহার অবস্থান ছিল "ইরিয়ানাম্ বাজো" (আর্যদের বীজভূমি) এবং অবেস্তার মতে যাহার অবস্থান ছিল বঙ্কু নদীর (Oxus) ও জাক্সা (Jaxartes) নদীর অন্তর্বর্তী ভূখণ্ডে — পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ আদি বসবাসভূমি হইতে নির্গত হইয়া ইন্দো-ইরানীয় আর্যদলের একটি শাখা প্রথমে ইরানে ও পরে ভারতে এবং আর একটি শাখা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি বা তাহারও কিছু পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার মিতান্নি, পালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকার করে। এখানে ইন্দো-ইরানীয় আর্যদলের পূর্বাভিমুখী শাখাটিই আমাদের আলোচনার বিষয়।

পূর্ব ও পশ্চিমাভিমুখী দুইটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িবার পূর্বে অবিভক্ত ইন্দো-ইরানীয়গণ নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল তাঁহাদের সহবাসভূমিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কারণ অবিভক্ত ইন্দো-ইরানীয়দিগের মধ্যে যে একটি সুপরিচিত বিশেষ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহারা দীর্ঘকাল একত্র বসবাস না করিয়াছে তাহাদের মধ্যে যে এইরূপ একটি সাধারণ সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে না তাহা সহজেই বুঝা যায়। এখন এই অবিভক্ত ইন্দো-ইরানীয়দের সাধারণ সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা আবশ্যক। আর্য ভারত ও আর্য ইরানের সভ্যতা পরস্পর তুলনা করিয়াই আমাদিগকে প্রাচীনতম ইন্দো-ইরানীয় সাধারণ সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা সম্ভব অনুমান করিতে হইবে, কারণ, বলাই বাহুল্য, এই ইন্দো-ইরানীয় সাধারণ সভ্যতার মূলের কোন পুঁথিপত্র বা প্রত্নলিপি পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল এদিকে বেদ এবং অপর দিকে অবেস্তা। সুতরাং বেদ ও অবেস্তার তুলনামূলক আলোচনাই এ-ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

এই আলোচনার অগ্রসর হইলে প্রথমেই যাহা চোখে পড়ে তাহা কিন্তু এই যে, বেদে ইরান সম্বন্ধে অথবা অবেস্তায় ভারত সম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। অবেস্তার অর্বাচীনতম অংশে তাহাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীনতম অংশে সেরূপ কোন ইঙ্গিতে পাওয়া যায় না; এবং বেদের প্রাচীন বা অর্বাচীন কোন অংশেই যে আর্য ইরান সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে তাহা প্রমাণ করা দুরূহ। মনে হয় যেন বৈদিক আর্যগণ ইচ্ছা করিয়াই ইরানীয় আর্যদের কোন উল্লেখ করে নাই, এবং ইরানীয় আর্যগণও যেন ইচ্ছা করিয়াই ভারতীয় আর্যদিগের সহিত সকল সম্পর্ক অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল। ভারতে আর্যদলের আগমন এবং এখানে সুপরিচিত ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার আরম্ভ — এই দুই ঘটনার মধ্যে কালের যে ব্যবধান ছিল তাহাও বলা যায় না। কারণ পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথমার্ধের পূর্বে আর্যদলের

পক্ষে ভারত অধিকার করা সম্ভব হয় নাই, এবং ভারতে ইরানের সহিত সর্বপ্রকার সাক্ষাৎ সম্পর্কশূন্য বৈদিক সভ্যতার আরম্ভ যে খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের পরে ঘটিয়াছিল তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ইরান হইতে আর্যদেশের ভারতে আগমন যদি বহু বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকিত, এবং ভারতে আগমনের পর আবার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে তবে যদি বিশিষ্ট বৈদিক সভ্যতার সূচনা হইত — তাহা হইলে হয়ত মনে করা যাইত যে ভারতীয় আর্যদের মন হইতে ইরানীয় আর্যদিগের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা যখন নহে, আদিদেশের ভারতে আগমন ও বৈদিক সভ্যতার সূচনার মধ্যে দুইশত বা তিনশত বৎসরের অধিক ব্যবধান যখন স্বীকার করা অসম্ভব, — তখন ভারতীয় আর্যদের মন হইতে ইরানীয় আর্যজাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্মৃতিলোপ সম্ভব বা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। উপরন্তু স্মৃতিলোপ যে বাস্তবিক ঘটে নাই তাহার অকাট্য প্রমাণও আছে। "হরা" ও "সরস্বতী" এই দুইটি নদী-নাম, এবং "বাহ্লীক" এই দেশ-নাম অবেস্তা ও বেদ উভয়েই পাওয়া যায়। বেদপাঠে পারংগত পণ্ডিতপ্রবর Heinrich Zimmer বলিয়াছেন যে বেদের 'হরা' অবেস্তায় 'হরয়া' (অর্থাৎ Jaxartes) ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইরানের আর্যভূমি সম্বন্ধে ভারতীয় আর্যদের স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে এই ইরানীয় নামগুলির ভারতভূমিতে পুনরাবৃত্তি কখনও সম্ভব হইত কি? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ইরানের অন্ততঃ একটি দেশ ও দুইটি নদীর নামে আর্যগণ ভারতে বহন করিয়া আনিয়া ভারতেরই একটি দেশ ও দুইটি নদীর প্রতি সেই নাম তিনটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আরও কয়েকটি বৈদিক নাম সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেগুলির কথা বলিতেছি না, কারণ তাহাদের সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। (৪) কিন্তু উপরে যে-তিনটি নামের উল্লেখ করা হইয়াছে সে-তিনটি নাম সম্বন্ধে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে সেগুলি প্রথমে ইরানে সুনির্দিষ্ট দেশ ও নদীর নামরূপে প্রচলিত ছিল, এবং পরে সেগুলি ভারতের সুনির্দিষ্ট দেশ ও নদীর নামরূপে প্রচলিত হয়। অবশ্য বেদ ও অবেস্তার অন্যথা অন্যের মধ্যে অনুরূপ বা তদ্রোধিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ভারতীয় আর্যগণ ইরানের স্মৃতি ভারতভূমিতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, কারণ সেগুলির সবই অতিরিক্ত ইন্দো-ইরানীয় সভ্যতা সম্ভবীয় শব্দ হইতে পারে, এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইবার সময় মানুষের সভ্যতার যখন কোন অতর্কিত পরিবর্তন ঘটে না, তখন সেই সভ্যতার বাহকস্বরূপ শব্দাবলীরও কোন অতর্কিত পরিবর্তন না ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভৌগোলিক নামের কথা স্বতন্ত্র। London, York, Boston প্রভৃতি ইংরাজী ভৌগোলিক নাম যদি আমেরিকায় পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে ইংলণ্ড হইতে যাহারা আমেরিকায় আসিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিল তাহাদের মনে ইংলণ্ড সম্বন্ধে ভারত স্মৃতি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। কেবল ইংলণ্ডের ভাষা আমেরিকায় চলিতেছে বলিয়া এই অনুমান করা যায় না, কারণ ইংলণ্ড হইতে নানা দেশ ঘুরিয়া পশ্চিমদেশে আমেরিকা পৌঁছিবার পূর্বে অভিযাত্রী-গণের পক্ষে ইংলণ্ডের ভূয়োদর্শন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু ইংলণ্ডের ভাষা

৪। এ-সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য Jackson, Cambridge History of India, Vol. I, pp. 322f, এবং Keith, Woolner Commemoration Volume (1940).

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক হইবে। অধিকন্তু, ইরানদেশের ভৌগোলিক নাম আমেরিকার অনুরূপ দেখিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যাহারা ইরানদেশ হইতে আমেরিকায় আসিয়াছিল তাহাদের মনে ইরানদেশের স্মৃতি যথেষ্ট বর্তমান ছিল, ঠিক যেইরূপ, ইরানীয় ভৌগোলিক নামের স্থানে পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আমরাও স্বচ্ছন্দে অনুমান করিতে পারি যে, সেই প্রাচীন যুগে ইরান হইতে যে-সকল আর্য তাহাদের আসিয়াছিলেন তাঁহারা ইরানের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন নাই।

কিন্তু প্রত্ন-ইরানীয় আর্যগণের কথা ভারতীয় আর্যগণ যখন বিস্মৃত হন নাই; তখন বেদে ইরান সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ নাই কেন? ইহার উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে তাহা হইল এই যে, কোন না কোন কারণে বৈদিক ভারতীয় আর্যগণ ইরানীয় আর্যগণের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তাহাদের নামোল্লেখ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না যে, কোনকালে ইরানীয় আর্যগণের নামোল্লেখ করিতেও ভারতীয় আর্যগণ ঘৃণা বোধ করিতেন, অন্তত: অন্যত: সেই কারণেই তাঁহারা ইরান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ধরিয়া লইতে হইবে যে ইন্দো-ইরানীয় যুগে আর্য সমাজের মধ্যে এমন একটী ভেদের সৃষ্টি হয় যাহার ফলে সেই সমাজের একটী অংশ ইরানের অনার্য জাতির সহিত শান্তিতে অবস্থান অসম্ভব বোধ করিয়া নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির সন্ধানে পূর্বাভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া অবশেষে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ইহা অনুমানমাত্র নহে। ইন্দো-ইরানীয় যুগেই যে আর্যগণের মধ্যে ধর্মগত ও কৃষ্টিগত ভেদের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে।

আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্মে আকাশ, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি বৈসর্গিক দেবতা ভিন্ন শুদ্ধ নীতির দেবতার (abstract deity) স্থান ছিল না; কিন্তু ইন্দো-ইরানীয় যুগে দেখা যায় যে 'ঋত' প্রভৃতি শুদ্ধ নীতির দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, এবং আচারের দিক হইতেও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্বে যে অন্ত্যেষ্টির আর্যধর্মের প্রাক্-স্বরূপ ছিল, ইন্দো-ইরানীয় যুগে সেই অন্ত্যেষ্টির সঙ্গে সোমাচার যুক্ত হওয়ার ফলে আর্য-গণের আনুষ্ঠানিক ধর্মেও একটা বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। অগ্নিপূজা আর্যভাষী প্রায় সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, সুতরাং ইন্দো-ইরানীয়দিগের মধ্যে অগ্নিপূজার অস্তিত্ব আদৌ বিস্ময়কর নহে। কিন্তু এই আদি অগ্নিপূজার সহিত সোমাচার সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইন্দো-ইরানীয় ধর্মের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

প্রাচীনতর অগ্নিপূজার সহিত অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের সোমাচার যে ইন্দো-ইরানীয় সমাজের সর্বস্তরেই সমভাবে সংবিধিত হইয়াছিল তাহা নহে। অবেস্তা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইরানে আর্যযুগে জন-সাধারণের ধর্ম ছিল বিশুদ্ধ অগ্নিপূজা, যাহাতে সোমাচারের স্পর্শমাত্র ছিল না। ভারতীয় আর্য-গণেরও ঠিক ঐ একই অবস্থা। বৈদিক যুগে ভারতের আর্য জনসাধারণের ধর্ম ছিল সোম-সম্পর্কশূন্য অগ্নিপূজা, অথর্ববেদ ছিল এই ধর্মের বেদ, এবং মনে রাখিতে হইবে যে 'অথর্ববেদ' এই কথাটির আক্ষরিক অর্থই হইল "অগ্নিবেদ"। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ঋত্বিক্-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কিন্তু এই সরল অগ্নিপূজায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া তদসহিত সোমাচারের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া নিজেদের জন্য অতিরিক্ত পৃথক্ একটি ধর্মাচারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার পরিচয় আমরা বেদের অপর তিনটী সংহিতা হইতে (ঋক্,

নাম ও বহু:) পাইয়া থাকি।

অবেস্তা ও বেদ উভয়ই প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় অনুষ্ঠানের সহিত অর্বাচীনতর সোমাচারের যোগ স্থাপনের দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে এই সংমিশ্রণ ইন্দো-ইরানীয় যুগেই ঘটিয়াছিল। এই দিক্ হইতে ইরান ও ভারতের আর্যকৃষ্টির সমতুল্য প্রণালিত হয়। কিন্তু অপর দিকে উভয় বেদে পুঁথির দেবকলের পর্যালোচনা করিলে এতদুভয়ের মধ্যে আবার একটা বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। অবশ্য অবেস্তা এখন যে-আকারে পাওয়া যায় তাহার সহিত বেদের তুলনা করা ঠিক হবে না। অবেস্তা ইরানের প্রাচীন আর্যযুগের ধর্মগ্রন্থ — ভারতের চতুর্বেদ যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্যযুগের ধর্মগ্রন্থ, তদ্রূপ। পার্থক্য এইখানে যে, বেদের বক্তিভাগ অপরিবর্তিত আকারেই আজ পর্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে, কিন্তু অবেস্তার সম্বন্ধে এইরূপ দাবী আদৌ করা যায় না। অর্বাচীন বা বুদ্ধ বৈদিক সাহিত্য আপন ধর্ম-বিধানে অনুযায়ী সংস্কৃত, পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে স্বরচিত কয়েকটি স্তোত্র যোগ করিয়া সাধারণে প্রচার করিলে বেদের আজ যে অবস্থা হইত অবেস্তার হইয়াছে সেই অবস্থা। অনেকে আজও মনে করেন যে, অনুষ্টুপ ও তাহার নিকটতম বিষমবর্ণ-রচিত গাথাগুলিই অবেস্তার সর্বপ্রাচীন অংশ। আধুনিক গবেষণায় কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে এই মত ভ্রান্ত। অনুষ্টুপ-রচিত গাথার সর্ব-প্রাচীনত্ব কেবল ভাষার দিক হইতেই স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিষয়-বস্তুর দিক হইতে গাথাগুলিকে অবেস্তার সর্বপ্রাচীন অংশ মনে করিলে যুক্তিসঙ্গতকে অনুষ্টুপ অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে করার মত ভুল করা হইবে। বিষয়বস্তুর দিক হইতে গাথা অপেক্ষা যশ্ত্-গুলিই প্রাচীনতর। যশ্ত্-গুলি প্রধানতঃ প্রাক্-অনুষ্টুপ যুগে রচিত হইয়াছিল, এবং বিষয় বস্তুর দিক হইতে ইহাদের আলিঙ্গন এখনও খানিকটা অক্ষুণ্ণ আছে। অনুষ্টুপের অভ্যুদয়ের পর ইরানের আর্যধর্ম অনুষ্টুপরচিয়িতাদের হস্তে আমূল সংস্কৃত হইয়াছিল, এবং ইরানীয় আর্যদলের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তাও এই অনুষ্টুপ সংস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। কিন্তু তথাপিও সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা অনুষ্টুপোত্তর যুগে রচিত — যেমন গাথা, বিদেবদাত্ (Vendidad) ইত্যাদি—তদপেক্ষা যাহা অনুষ্টুপোত্তর যুগের দ্বারা সংস্কৃত (যেমন যশ্ত্) তাহাতেই প্রাক্-অনুষ্টুপযুগের ইরানীয় আর্যধর্ম অপেক্ষাকৃত অল্প বিকৃত আকারে টিকিয়া থাকিবে। সুতরাং বেদের সহিত যদি অবেস্তার তুলনা করিতে হয় তবে বিষয়বস্তুর দিক হইতে প্রাচীনতর বেদ অংশের সহিত অনুষ্টুপ-রচিত গাথাগুলির তুলনা অংশতঃ ভ্রান্তিকর না হইয়া পারে না, যদিও অবশ্য ও গাথাগুলির মধ্যে এই দিক্ হইতেও যে কোন সাদৃশ্য নাই একথাও সত্য নহে। মোট কথা এই যে, গাথাগুলিতে টিকিয়া রহিয়াছে অনুষ্টুপের অপ্রাকৃত ও অসংস্কৃত ধর্ম, কিন্তু যশ্ত্-গুলি অনুষ্টুপীয় গাথা অপেক্ষা ভাষার অর্বাচীনতর হইলেও সেইগুলি হইতেই ইরানের প্রাক্-অনুষ্টুপীয় প্রাচীনতর আর্যধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক হইতে বিবেচনা করিলে অনুষ্টুপীয় গাথা অপেক্ষা যশ্ত্-গুলিই অবেস্তার সহিত তুলিত হইবার যোগ্য।

জ্যোৎস্না-জাগর

শ্রীসরসীমোহন

সন্ধ্যা হ'ল, পুব-গগনে
ছিন্ন মেঘের পাশ থেকে,
পূর্ণিমা চাঁদ উঁকি দেয়
কে কি বি তোরা আয় দে দে !
আজকে মধুর চৈত্রী রাতে
বাঁধ্‌বে রাখী বঁধুর হাতে,
ঘাস-পাখিরায় পড়িয়ে পড়ে'
চাঁদের আলো নিস্ মেখে !

উজাড় ক'রে সোহাগরাশি
অধরে তা'র দিস্ ঢেলে,
হালকা হাওয়া আল্‌গা চুলে
দুরদুরিয়ে যাক্ খেলে।
আঁচল তাহার খস্‌বে কুসুম,
টুটবে সরম একটি চুমে,
কর্ণা পেলে কর্ণা মোর
চাইবে তখন চোখ মেলে।

পরাণে তার লাগবে দোলা,
বাঁধ্‌বে বুক জাঁতাতে, —
দুখন পরশ উঠ্‌বে ভ'রে
দুই পরাণ এক সাথীতে।
গোলাপ-বনে বুলবুলিটি
খুস্‌বে সুরের বুলবুলিটি, —
চাঁদ্‌নি তারে হাত্‌ছানিবে
কুঞ্জবনের কোন্‌টিতে।

(২)

জোছ্‌না-পাখী পাত্‌বে আড়ি,
জান্‌বে না তা' দুইজনে ;
জানলে তবু যাব্‌বে না লাজ —
গড়-জোয়ার দুই-বনে।
ওই সিরির ওই উপত্যকায়
যখন তাহার শকট থাকায়,
লাল্‌চে গালের গুল্‌বাগিচায়
জল্‌বে আগুন পল্‌বনে।

চাঁচ-চিকুরে নূপুর কাঁকণ
উঠুক যেমন রণিয়া ;
মল্লবানি নিংড়ে যে লো,
দু'হাতে আজ প্রেম বিলা।
তার পেয়ালা আঙুর-জলে,
চুমায় চুমুক যে হরষে,
অন্তরে অন্তরে
লক্ষ বাঁধন যোক্ ঢিলা !

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গতযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জ্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস

[এই প্রবন্ধ ১৩২৮ সালের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক — স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালীর সমাজ ছিন্নভিন্ন, পরিবারও ধ্বংস যায়। তথাপি স্বাধীন হইয়া সে যে সমাজ গঠন করিয়াছে এবং তাহার ফলে যখন স্বর্গবাসী হইবে, তখন পূর্ব্বে সে কি ছিল, কেমন ছিল তাহা স্মরণ করিয়া, অন্ততঃ একটু আমোদ বা কৌতুক বোধ করিবে। — ব: স:]

পুরুষানুক্রমে হইতে সাতশতের পাঠালী পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরের খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে, বিশেষতঃ পুরুষানুক্রম, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন এবং বৈষ্ণব মহাভাষ্য সকলের সম্যক আলোচনা করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালীর প্রতিমুখের সমাজ-বিন্যাসের পটখানা এমনভাবে মানসনয়নে প্রতিভাত হইবে, যাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে জানিলে সভ্যই মনীষীমাত্রেই হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, অনেকেই চমৎকৃত হইবেন। আমার বড় সাধ যে আধুনিক ইংরেজীশিক্ষিত যুবকগণ, Scientific method বা ফারাডেসই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আর্য্য ও অনার্য্যের বাঙ্গালা মহাকাব্য সকলের Analysis বা বিশ্লেষণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতার পরিচায়ক সামাজিক ইতিহাসের বেদী সৃষ্টি করেন। তাই শুধু অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার উদ্দেশ্যে, অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছি যে, কোন্ মহাকাব্যের আলোচনা করিলে সমাজের কোন্ চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

পরে যদি বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চণ্ডীমণ্ডল, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ — এই তিন ধারার সামাজিক মহাকাব্য সকলের বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের উক্তিসকলের যাথার্থ্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। মানিক পত্রের সম্বন্ধে ইহার অধিক বলা বাহুল্য, বলা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়। এইবার পারিভাষিক শব্দের বিচার করিয়া দেখিব, এই বিচারে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আনুষঙ্গিক ফুটিয়া উঠিতে পারে।

বৌদ্ধ যুগের সন্ধ্যা হইতে নব ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের অভ্যুত্থানের কাল পর্যন্ত প্রায় দেড়হাজার বৎসরকাল বঙ্গদেশে, মগধে ও উৎকলে, এবং ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশেও বৈদিক চাতুর্বর্ণ্য লোপ পাইয়াছিল। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছাড়া সর্ব-ব্রাহ্মণ সকল বৌদ্ধ সমাজের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। তাই মনুসংহিতা লিখিয়া বিধাতার যে কলিকালে, অর্থাৎ বৌদ্ধপ্রচারের সময় হইতে, ভারতবর্ষের সমস্ত দ্বিজবর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল বা হইয়া আসে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য বর্ণ নাই এবং থাকিতেও না।

এটা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বৌদ্ধমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পৌরোহিত্য কার্যে বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদেরই নিযুক্ত করিতেন; খাঁটি ব্রাহ্মণ পাইলে তাঁহারা প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন না; প্রধানতঃ প্রধানতঃ প্রচারকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই নীতি জৈন প্রধানগণ অবলম্বন করিয়া চলিতেন, এখনও সকল জৈন মন্দিরে দাক্ষিণাত্য বা গৌড় ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্যের কাজ করেন। প্রবলদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরা আদি অন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার ফলে বৌদ্ধ একাকারের প্রভাব-কালেও ব্রাহ্মণজাতির বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। অপরোক্ষের সম্বন্ধেও ব্রাহ্মণের একটা খাতির সদা ছিল। পক্ষান্তরে শক, হূণ, অহীর বা আভিরীয় ও ইরানী প্রভৃতি বলবান জাতিসকল ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ-শক্তির প্রভাবে দেখাইয়া ক্ষত্রিয়সংজ্ঞা হন। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়া এই সকল জাতি ক্ষাত্র-ধর্মের বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। শ্রেষ্ঠী বণিক জাতিসকল পূর্বেই জৈন প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পরে বৌদ্ধ একাকারের কালে বৈশ্য ও শূদ্র এক বর্ণে পরিণত হয়। ফলে কয়েকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া, আর সকল বৈদিক শ্রেষ্ঠীযুক্ত জাতি শূদ্রের সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হয়। বৌদ্ধগণ পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়ীর প্রতি আধাবান ছিলেন, তাই যখন যে সম্প্রদায় যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে সেই বৃত্তি সেই সম্প্রদায়কে পুরুষানুক্রমিকভাবে ধরিয়া থাকিতে হইয়াছে। ফলে ক্রমে ক্রমে সমাজের অন্যে বৃত্তিগত এক একটা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই Profesion-Caste-সৃষ্টির মূল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সামাজিক অংশের খাদ করিয়া বিশ্লেষণ করিলে, তাহার জাতিনিকেতনের পরিবর্তন ঘটিত। আজকাল নাপিত কেবল দাড়ি গোঁফ কামায়, নখ চুল কাটে, বৌদ্ধযুগে নাপিত শল্যচিকিৎসক ছিল, অনেক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নাপিত আখ্যা লাভ করিত। রাজা সম্ভ বা সংগ্রামসিংহের নাপিত (Royal Surgeon) একজন বৌদ্ধ মহাযানী ব্রাহ্মণ ছিলেন; তার বর্ণনের পুস্তকে এইটুকু বেশ খোলসা করিয়া দেখা আছে। মূলে মহাযানী ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ হইলে কি হয়, নাপিত-বৃত্তি অবলম্বন হেতু সে ব্রাহ্মণ নাপিতজাতিভুক্ত হইয়াছিল। বৃত্তিগত জাতিবিকাশে rigidity of caste, জাতিভেদের অলঙ্ঘ্য গতী যে ছিল না, তা এখনও নাই, আমি তাহাই বলিতে চাহি। মহামহিম, তিলি, তাম্বুলী প্রভৃতি জাতির আদল ও পুরাতন ইতিবৃত্ত পাশ্চাত্য অনুসন্ধান করিলে বেশ জানা যায় যে, পুরাতন জৈন ও বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীর দল বিপ্লব প্রভাবে প্রপীড়িত হইয়া ক্রমে এখনি বৃত্তিগত বণিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কায়স্থের

যাহাদের মনের পরিচয় বিশ্লেষণ করিলে বেশ জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগের অনেক বৃত্তিগত জাতি ব্রাহ্মণ্য হইয়াছে, — অনেক শ্রেণী, অনেক পুরাতন বণিক ব্রাহ্মণ আখ্যা লাভ করিয়াছে।

বৃত্তিগত জাতি মূলতঃ বৌদ্ধ বণিকদের উপর প্রতিষ্ঠিত; মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যই ইহাদের সোপান হয়েছে। মধ্যযুগ বলতে অর্থই এই যে, অভিনব ব্রাহ্মণসমাজ সমাজের উপরে নূতন শাখা — নূতন জাত; পূর্বে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, এখন ব্রাহ্মণ্য সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছে। ইহাই Rigidity র পরিচায়ক নহে।

পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে, স্মার্ত রঘুনন্দন হিন্দুর আচার-ব্যবহার একটা কড়া বিধানে চলা করিয়াছিলেন। এই আচার-ব্যবহারে Typical Evolution বলিয়া আমি মনে করি; বাস্তবপক্ষে ইহা Typical Evolution দ্বারা অল্প কিছু নহে। একটা গল্প বলিব। তান্ত্রিক নিত্যানন্দ গিরি এক পাঠান যুবতীর প্রেমে পড়িয়া যৌবনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নামে, পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে, ভাবে, ভাষায় পুরাদস্তুর মুসলমান হইয়া যান। পরে তাঁহার কুলগুরু আসিয়া বিচারে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বলেন, তুমি পুনরাভিষিক্ত হইয়া তন্ত্রধর্ম অবলম্বন কর. তোমার পত্নী ও সন্তান সন্ততি সকলকে আমি পুনর্দীক্ষিত করাইয়া পুনরাভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত। সেকালের মানুষ বিচারে হারিলে, অকিঞ্চিৎহিতচিত্তে বিজেতা পণ্ডিতের আজ্ঞা অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। নিত্যানন্দ গিরি তাহাতেই রাজী হইলেন। পরন্তু গুরু বলিলেন, তোমার পক্ষে তন্ত্রধর্ম অবলম্বন করিতে কোন বাধা নাই বটে, সমাজ তোমাকে গ্রহণ করিবে কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না; কেননা তোমার আকারে এবং আচারে এখনও পাঠানী বা ইসলামী গন্ধ যেন অলক্ষ্যের লেখায় চিহ্নিত রহিয়াছে। ঐ লেখা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অবয়ব ও রুচিগত দাগা না যাইলে হিন্দু তোমাকে গ্রহণ করিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ গিরি এই আকার-দাগা-সমেত কত বৎসর কাল তপ ও তপস্যা করিয়াছিলেন। শেষে সাধনবলে এক মহাপুরুষের কৃপাবলে তিনি পাঠানী সাহচর্য্যমুক্ত হন, এবং ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে পরিচিত হন। ইহাই ত' Typical Evolution! পাঠান, তুর্কী, তিব্বতী, আরাকানী, মোগল প্রভৃতি সকল জাতির মানুষকেই তন্ত্রধর্মে দীক্ষিত করা চলে, পরন্তু তাহাদের অভিনব ব্রাহ্মণ্য সমাজে চালাইতে হইলে, জাতীয় বিশিষ্টতার পরিচায়ক আকারগত, অবয়বগত, আচারে, ব্যবহারে লাঞ্ছনের সকলকে তিরোহিত হইত। Dom Pedro নাম লাঞ্ছনার সিঁড়ি লাভ করিয়া 'গুরু পুত্র' নাম পাইয়াছিলেন। কাপালিক ব্রাহ্মণ, কাপালিক জাতি এই পদ্ধতির ভিতর দিয়া আসিয়া হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কুলাচার্যগণ ত' মূলতঃ Scythian বা Babylonian অথবা Chaldean ছিলেন। আকার দাগা ঘটাইয়া এবং নৈবেদ্যের মূর্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সমাজে ব্রাহ্মণের আসন লাভ করেন। বিহারে ও মুক্তপ্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণের সমান পাইয়া থাকেন।

এই সঙ্গে পশ্চিমের—"কৃষিবল ব্রাহ্মণের" কথাও তুলিতে হয়। ভোজা সরাই বা শাকদ্বীপী, ইহারা শাকসিংহ সিদ্ধার্থের শত ছিলেন। আকার-দাগা ঘটাইয়া কালে ইহারা হিন্দুসমাজভুক্ত হন। স্মার্ত রঘুনাথ রঘুনন্দন আচার অনুষ্ঠান বেদীয় মধ্যে সকলকে বাঁধিয়া, ব্রতনিয়ম, বিধিনিষেধের বন্ধনীতে আবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ্য Type বা আদর্শের উপযোগী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাই তিনি সংস্কৃত বলিয়া এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন,

ব্রাহ্মণ-আচার-আদর্শটিই, ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনুকূল বৈশ্য ও শূদ্রগণ সংঘবদ্ধ আকার লাভ করেন। তিন শ্রেণী যখন আকারে ও অবয়বে ব্রাহ্মণ অনুরূপ হয়, তখন বৈশ্য রাজাদের বিরাট হইয়া; উহাই হিন্দু জাতির বিশিষ্টতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আমি ইহাই আচার-সাম্যকে Typical Evolution বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

বৌদ্ধযুগের অবসানের পরে শঙ্করাচার্যের সময় হইতে যখন নূতন ব্রাহ্মণ সংঘের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়, তখন সেই একীভূত, সমীকৃত বৌদ্ধ সমাজকে ভাঙিয়া চুরিয়া, বাছিয়া বাছিয়া তবে হিন্দু সমাজ-বিন্যাস ঘটান হইয়াছিল। মহাযানী এবং হীনযানীদের সাম্যবিধি শঙ্কর-উপশাখার প্রভাবে ব্রাহ্মণীয় সমাজে এইটাই কর্মী হইয়াছিল। এখনই লক্ষ্যযোগ্য হইয়াছিল যে এই ছাঁকা, ছানা, বাছাই-করার কাজ পরাজীয় মধ্যে শেষ হয় নাই। শঙ্করাচার্য ও তাঁহাদের চেষ্টায় ও প্রভাবে সর্বাগ্রে দীক্ষিতেরা — তখন, সর্বত্র, ক্রমিক ও ক্রমবিকাশে — এই দীক্ষিতদের কাছে আসিতে লাগিল, পরে কাছাকাছি ও মিথিলার উচ্চ ও সম্ভ্রান্তদের ঘটে, শেষে বঙ্গদেশে উহার সাড়া পড়ে। একপক্ষে দীক্ষিতদের চেষ্টা ও পাণ্ডিত্যের সংস্পর্শের প্রভাবিকারী হওয়াতে, অন্য পক্ষে কাছাকাছি হইতে সমাগত দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠা স্থানীয় সমাজে হওয়াতে, কতকটা দীক্ষিতের আদর্শে, কতকটা কাছাকাছি ও মিথিলার আদর্শে, বাঙ্গালার নব সমাজকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হয়। পুরাতন একটা সমাজের উপর নূতন একটা কিছুর প্রতিষ্ঠা করাইতে হইলে অনেকটা আপোষ (Compromise) করাইতে হয়। বাঙ্গালায় যে আপোষ একটা পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছিল, তাই বাঙ্গালার বিশিষ্টতা একটু স্বতন্ত্র আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই বাঙ্গালী এখনও তাহার এই স্বতন্ত্রতা অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। এই সামাজিক শুদ্ধি-সাধনটা ঠিকমত বুঝিতে হইলে গোটা কয়েক কথা আগে বলিতে হইবে।

(১) বৌদ্ধ-ধর্ম — জগতের প্রথম ও প্রধান প্রচারের ধর্ম, (Proselitising Religion); বৌদ্ধ-ধর্মই সর্বাগ্রে অব্রাহ্মণসমাজকে ধর্মের আসনে বসিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

(২) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ধর্ম হওয়াতে উহাই আদি গণতান্ত্রিক (Democratic Religion) ধর্ম বলিয়া গণ্য ও প্রাহ্য হইয়াছে।

(৩) বৌদ্ধধর্মই সর্বাগ্রে প্রাকৃত ও পালিভাষায়, অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষায় প্রচারিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মই সংস্কৃত ভাষাকে পরিহার করিয়া জনসাধারণের পালি ভাষায় ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তরাশি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করে।

(৪) শাক্যসিংহ শক বা Scythian ছিলেন, তাঁহার ধর্মের প্রথম প্রচারকগণের অনেকেই শক বা Chaldean বা চুলদেশীয়গণ ছিলেন। ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে বলিতেই হইবে যে, প্রচার-ধর্মের আবির্ভাব এবং ধর্মের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শক-মনীষা-প্রসূত; উহা আর্য-মস্তিষ্ক-প্রতিষ্ঠিত নহে।

সর্বাগ্রে বলিয়া রাখি যে, বাঙ্গালার তথা উত্তর ভারতের জাতিবিভাগ বর্ণাশ্রম-ধর্ম নহে, উহা বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ছাড়া অন্য কিছু নহে। তখন উহা বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ তখন উহার যা ধর্ম হয়ই; অর্থাৎ বংশের প্রবেশ হয়তখন। উহাতে কোন কালে তখনই Rigidity বা কঠোরতা ছিল না। ইংরাজের আসনের পূর্বে বাঙ্গালায় জাতিবিভাগ বিভিন্নাপকতা-গুণসম্পন্ন ছিল। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আচার-ধর্মের প্রভাব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের অনেকদিন পূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছিল। উত্তরে বরেন্দ্রের নাটোর, পুঁটিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জমিদারবংশের উদ্ভবের ফলে ব্রাহ্মণ্য আবরণ সমাজ-শরীরের উপর একটু কঠোর হইয়া বসিয়াছিল। সেই আবরণ সমেত হিন্দু সমাজকে ইংরেজ হাতে তুলিয়া

হয়েন এবং নবদ্বীপ, ত্রিবেণী ও ভট্টপল্লীর পণ্ডিতমণ্ডলের পরামর্শ অনুসারে, অন্য পণ্ডিতমণ্ডলির বিচার-সিদ্ধান্ত অনুসারে, এবং হাইকোর্টের ফুলিং এবং আইন আদালতের প্রভাবে, এই ব্রাহ্মণ আবহমান এখন যেন সমাজের উপর ভাঁড়িয়া বসিয়াছে। Orthodoxy বা গোঁড়ামী ইংরেজের আমলে, এবং শিক্ষা প্রভাবে যত উৎকট হইয়াছে, ইহা এত উৎকট পূর্বে কখনই ছিল না। তাহার উপর নবীন ইংরেজিশিক্ষিত সমাজ সনাতন সমাজের দিকে একেবারে তাকাইতেন না, কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন না, ইংরেজ পাদ্রী এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহা বলিতেন, তাহাই বেদবাক্য বিবেচনা করিয়া সেই সুরে গলা মিলাইয়া ইহারা গাহিয়া উঠিতেন। ফলে সমাজ-বিজ্ঞের অজ্ঞতা সমাজের স্কন্ধে ভূতের মত যেন ভাঁড়িয়া বসিয়াছে, উহাকে যেন অপসারণ করিবার উপায় নাই। এমন কি আজকাল যাঁহারা ইংরাজি ছিসাবে আস্তিকের বাড় করিয়া তুলেন না, তাঁহাদের অনেকের আস্তিকতা মূল উৎপত্তির ইতিহাস-কথা যদি খুলিয়া বলি, তখনই তাঁহাদের ইংরেজি Orthodoxy চটিয়া উঠিবে, লেখককে জব্দ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিবেন। আসল কথাটা কি জান? এখনও বাঙ্গালী জাতির বারো আনা অংশ বৌদ্ধ ও সহজ তন্ত্রের সিদ্ধান্তে ও আচার-পদ্ধতিতে আছন্ন। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম — চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম সহজ তন্ত্রের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। তান্ত্রিক শাক্ত ধর্মের পনর আনা অংশ বজ্রযান এবং কালচক্রযানের স্তম্ভের উপরে দণ্ডায়মান। কি শাক্ত তান্ত্রিক, কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাহারও সাধন ধর্মে জাতিবিচার নাই; আর এই দুই ধর্ম এখনও বাঙ্গালীর সমাজ শাসন করিতেছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ এবং সহজযানপ্রধান সমাজের মসলা দিয়া আধুনিক হিন্দুসমাজ গঠিত; ইহাই পণ্ডিতের পুরুষানুক্রম হইতে পাতুয়ারের পাঁচালী পর্য্যন্ত সমস্ত খুঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য ইহার সাক্ষী ও প্রমাণ। এমন অবস্থায় বাঙ্গালীকে বেদোচারসম্পন্ন আর্য্য হিন্দু বলিয়া দাঙ্গাবাজি করিলে অন্তর্যামীই উপহাস হাসি হাসিবে।

বাঙ্গালার কুলজী-সাহিত্য অনুসারে জাতি শব্দের অর্থ বৃত্তি — ব্যবসায় — জীবিকা। "জাতপাৎ" হওয়ার অর্থ বৃত্তিচ্যুত হওয়া, জীবিকার্জ্জনের পন্থা হইতে বঞ্চিত হওয়া। আদিম বৃত্তি, ব্যবসায়, জীবিকা সকলেরই জাতিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রাহ্মণই যে অন্য জাতীয় মনুষ্যকে একঘরিয়া করিত তাহা নহে, অনেক সময় অন্য জাতীয় মানুষে উৎকট চরমে ব্রাহ্মণকে একঘরিয়া করিয়া রাখিত। একটা গল্প বলিব। যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের মাল, কাপড় বুনি এদেশে আমদানী হইত না, কার্পাস-শিল্প এই ভারতবর্ষের ভারতবাসীর একচেটিয়া শিল্প ছিল, ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস বস্ত্র অন্য বিদেশে রপ্তানী হইত, তখন শিল্পী ও বণিক জাতিসকলের প্রভাবে সমাজের উপর প্রবলভাবে প্রকট ছিল। তখন সকল জাতিই অন্যান্যভাবে একে অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিত। তাতুরের অর্থাৎ রামপুরহাটের নিকট তাহুপুরের নন্দকুমার (মহারাজ নন্দকুমার) মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবী দেরেস্তায় বড় চাকরী পান। নূতন বড় মানুষ হইয়া তিনি একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে সকল প্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং আচ্ছাদন বুনিবার হইতে বরিদ করিয়া আনেন। তাতুরের তন্তুবায়ের দল বলিল, 'একি ঠাকুর, তোমার দুর্গোৎসবে, আমরা চিরকাল, —অনন্তরে ও দুসন্তরে — তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে কাপড় যোগাইয়া আসিয়াছি, আমাদের বস্ত্র-কন্যা বস্ত্রেশ্বরী এতকাল দেবীর আবরণ-বস্ত্র হইয়াছে, আর আজ তুমি হঠাৎ নবী হইয়াছ বলিয়া কি বাজারের চেলী দিয়া পূজার কাজ সারিবে, আমাদের বস্ত্র-কন্যা কাপড় লইবে না? বিদেশের কাপড় আনিয়াছ, ভাল করিয়াছ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তাঁতের কাপড়

তোমাকে লইতে হইবে। গ্রামের শিল্পীর শ্রেষ্ঠ পারদর্শিতা না পাইলে যা সে পক্ষে অবহেলা করিলে যে রাজের পূজা সিদ্ধ হইবে না, তা ত তোমার একলার নহে।' মহারাজ নন্দকুমার তখন নূতন বড় মানুষ। তিনি গ্রামের তন্তুবায়দিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফলে তন্তুবায়ের দল তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিল, ক্রমে সে ঘট উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিল; পশ্চিম বাঙ্গালার তন্তুবায়-সমাজ স্থির করিল যে মহারাজ নন্দকুমারকে কাপড় আর কাপড় যোগাইবে না; ক্রমে অন্য শিল্পী-জাতি সে ধর্মঘটে যোগ দিল। বহুদেবের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের এমন দশা ঘটিল যে, পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার কোন হাটে বা গঞ্জে তাঁহাকে কেহ কাপড় যোগাইত না, গ্রামে প্রবেশ করিতে তিনি পাল্কিগুলি না; ঘুট মোট বহিত না, নাপিত তাঁহার না, ধোপা কাপড় ধৌত করিত না। অথচ তখন মহারাজ হুগলীর ফৌজদার এবং মুর্শিদাবাদের নিজামতীর নায়েব দেওয়ান। শেষে মহারাজকে বশ্যে হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। মহারাজের উপর প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা এই হইল যে, তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন এবং নবদ্বীপ ও অন্য শিল্পীজাতি সকলকে জন্মাবধেরের আটকে কোপ খাওয়াইবেন। মহারাজ নন্দকুমারের এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে একটা বড় রঙ্গের ব্যাপার হইয়াছিল; নানা প্রকারের ছড়া এবং পাঁচালী এই উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। একটা শ্লোক মনে আছে, —

"তাঁতুরের নন্দকুমার,
লক্ষ ব্রাহ্মণ করলে তুমার।
কেউ খেলে মাছের মুড়া,
কেউ খেলে বন্দুকের গুড়া।"

মোট কথা এই, 'বর্ণ' হিসাবে জাতির প্রয়োজন বাঙ্গালায় কখনই হইত না। জাতি বলিলেই বৃত্তি বুঝাইত, ব্যবসায় বুঝাইত। এক জাতি হইতে একবারিয়া হইলে লোকে সোজাসুজি বাহিরা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্য জাতিভুক্ত হইয়া থাকিত। সেকালের জাতিবিষয়ক প্রবচনগুলির আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত-কথাই প্রমাণ হইবে। একটা উদাহরণ দিব, —

"তার হাতের কাজে"

ইহার প্রকৃত অর্থ এই, শিল্পী যদিক-জাতীয় কেহ বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে তন্তুবায়-সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিত। যৌলিক কারণ তাহারাই যাহারা মূলতঃ কারুজাতির পুষ্টি-সাধন করিত, যাহাদের হাতিয়া থাকিয়া কুলীন পলাইত। এই যৌলিক তন্তুবায়সমাজের বিশ্লেষণ করিলে এখনও বেশ বুঝা যায় যে অনেক বণিক, শিল্পী, শ্রেষ্ঠী এই যাহারের ঘরের আবরণে আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহা ছাড়া জাতি অর্থে বৃত্তি, কারুজাতির কোন নির্দিষ্ট শিল্পের বৃত্তি নাই। কারুর লেখক, করণ, জমীদার, পাটোয়ারী, ঠাকুরে, যৌলিক — কারুর ঘরে না কি, হয় না কি? কারুর মধ্যে রাজপুত আছে, কক্ষিয় আছে, বৈশ্য আছে, বণিক আছে; অথচ জাতির হিসাবে কারুর কোন নির্দিষ্ট বৃত্তি নাই। তাই কুলজীর বচন হইল— তার হাতের কাজে! আর একটা প্রবচন আছে, —

"যানে জাবন, ছেতে যাবন।"

ইহার অর্থ এই নহে যে, যানের মধ্যে যেমন আছে যবন শ্রেষ্ঠ, জাতির মধ্যে তেমনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। আহ্মণের চাষে যেমন অতি পবিত্রতা রক্ষিত হয়, রোয়া, যোয়া, নিড়েন প্রভৃতি তত কি করিতে হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ জাতির চাষে যা পরিচয় বিশুদ্ধিতে ও পুষ্টিতে বহু পবিত্রতা স্বীকার করিতে হয়। পুরাতন কুলজী গ্রন্থে, বিশেষতঃ এই, মিত্রের পাতড়ায়, এই সিদ্ধান্ত-কথা স্পষ্ট ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মোটা একটি প্রবচনে কত বড় সামাজিক তত্ত্ব লুকান

আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :

আমাদের এই বিশ্বিত জাতিতত্ত্বের মূলে পণ্ডিতের বা ডিমক্রাসি প্রকট হইয়া আছে। জাতির গণ্ডীর মধ্যে ধনী-নির্ধনের বিচার নাই, পণ্ডিত-মূর্খের বৈষম্য নাই, সবাই সমান অধিকারে অধিকারী। আমার কোন জাতিই অপর কোন জাতি হইতে ন্যূন নহে ; প্রত্যেক জাতিই self sufficient and self contained ; এমন কি ব্রাহ্মণ জাতিকেও অপর জাতি, জাতির হিসাবে বড় বলিয়া মান্য করে না ; ব্রাহ্মণ যজন যাজন করেন, গুরু পুরোহিতের কাজ করেন, তাই পূজনীয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যে জাতির হিসাবে ব্রাহ্মণ জাতিকে খুব বড় করিয়া দেখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার অন্য সকল প্রদেশে ও যুগে ব্রাহ্মণের, জাতির হিসাবে, এতটা মানের ছিল না। এমন কি মার্শ্ব ওয়ার্ডের প্রত্নতত্ত্বের ব্যবস্থা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র খাটে নাই। সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা উঠিতে আমি বলিলাম। সে সমাজ নাই, তাহার মতিও নাই, সকল কথা খোলাইয়া বলিতে হইলে একখানি বিরাট সামাজিক ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। আমি বিলিয়ার কাহিনী শুনাইলাম, সেই জাতী ও জাত্য ইতিহাসের অল্প কোটিরেখ উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাই। তোমরা যাহে যাহে একটা "ধ্বি" বলিলে আমি আশ্বস্ত হইব।

ভীরু

(মোপাসাঁর ফরাসী গল্পের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে)

শ্রীঅমুরেন্দ্রনাথ নন্দী, এম-এ

'ভদ্রলোক সিঞ্জোস' বলিয়াই সমাজে সকলে তাঁহাকে জানিত। কিন্তু তাঁহার পুরা নাম ছিল ভাইকাউন্ট গোঁহাম ডোলেক দ্য সিঞ্জোস।

হালভোলে পিতৃমাতৃহীন হইয়া সিঞ্জোস প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ায় তিনি সমাজে লক্ষপতির একজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চেহারা-খানি সুশ্রী ছিল, রসিকতা করিবার মত বাকপটুতাও ছিল, চালচলনে পালিশটা এবং একপ্রকার আভিজাত্য গর্ব ছিল; ইহার উপর ভদ্রলোকমাত্রেরই এক জোড়া খুব বড় এবং সুন্দর গোঁফও ছিল।

তেলুনেও ছিল তাঁহার জন্মস্থান; নাচের ঘরে সুন্দরী যুবতীরা তাঁহার সঙ্গ কামনা করিত সবচেয়ে বেশি। উচ্চাশী সুন্দরীরা যেমন লোকের ঈর্ষার উদ্রেক করে, তাঁহার যখন প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহাকে দেখিয়া তেমনই একপ্রকার ঈর্ষার হাসি হাসিত। যাহা অবশ্যই সুখের পক্ষে শোভন ও সম্মানজনক এবং যে প্রেমঘটিত ব্যাপারে অধিক আদান বলিয়া লোকে তাঁহাকে সন্দেহ করিত — তথাপি সিঞ্জোস যেন একটা নিষ্ক্রিয়তার মানসিক বাক্যব্যয়ে অযথাই জীবন যাপন করিতেছিলেন। অশ্বারোহণ, শিকার করিয়া বিস্তরের খেলাতেই তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি ছিল।

তিনি বলিতেন, "আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কখনও প্রেরণ করা হয়, তখন নিশ্চয় হইবে আমার অন্ত, কেননা ঐ অস্ত্রেই আমি শত্রুকে নিঃসন্দেহ হত্যা করিতে পারিব।"

একদা এক সন্ধ্যায় তাঁহার দুইজন মহিলাবন্ধু ও তাঁহাদের স্বামীর সঙ্গে তিনি থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। অভিনয়ের শেষে ড্রপসিন বিখ্যাত কোজেনস্যালায় তিনি তাঁহাদিগকে কুলপি-ঘরক খাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। কোজেনস্যালায় প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরে তিনি দেখিতে পাইলেন — অদূরে একটা টেবিল হইতে একটি লোক তাঁহার সুন্দরী সঙ্গিনীদের একজনের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে, মহিলাটি অস্বস্তির বিরক্তি ও অস্বস্তির সহিত তাঁহার চোখ দুইটি নামাইয়া লইলেন। পরে তাঁহার স্বামীকে বলিলেন:

"লোকটা কিরূপ একদৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখ, কি লজ্জা! আমি কিন্তু উহাকে চিনি না, তুমি চেন কি?"

স্বামীর কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই নজরে পড়ে নাই, এখন, চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন — 'না তো, মোটেই না।'

স্ত্রী ঈষৎ বিরক্তির সহিত মৃদুস্বরে বলিলেন:

'কেমন যেন অস্বস্তি লাগে; লোকটা আমার বড় খারাপ ধরণের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।'

স্বামীর গুরুমুখ একবার নড়িয়া উঠিল মাত্র, ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। তারপর তিনি বলিলেন, "ছিঃ; ওদিকে তাকাও কেন — চোখ কত অজ্ঞ লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তাহাদের লইয়া মাথা ঘামাইতে হইলে ত' নাচায়!'

কিন্তু ইহা শুনিয়া ভাইকাউন্ট সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাকার অজানা একটা লোক অভিজাত এই সন্ধ্যার সবের খাওয়াটা তাঁহাদের

বাটী করিয়া দিবে, তিনি উহা বরদাস্ত করিতে পারেন না। কেননা এই অপমানে তাঁহারই, তাঁহার আত্মীয়েরই ত' বন্ধুরা ভোজনশালায় আসিয়াছেন। এই ব্যাপারে বাহির তাঁহার একার, সুতরাং খাদেমারও তাঁহাকে একলাই পোহাইতে হইবে।

তিনি লোকটার দিকে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, 'দেখুন, কোন অন্যবিধায়, দিকে ঐভাবে চাহিয়া থাকাটা মোটেই সভ্যতা-সঙ্গত নয়। অনুগ্রহ করিয়া ঐ কাজটা বন্ধ করুন।'

লোকটা ভাঁহার সঙ্গে বলিয়া উঠিল — 'কে মহাশয়! আপনি? আপনার চক্ষু নাকি!'

ভাইকাউন্ট দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন; "সাবধান! নহিলে আমার মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিব না।"

লোকটা একটা মস্ত কথার মৌরি ফোড়ন দিল। কথাটা ভদ্রসমাজে অশ্লীল—ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়া গেল। ভোজনশালার প্রত্যেক মহমানী এমন চমকিয়া দাঙ্গাবাজ উঠিল যেন তাহাদের আসনের নীচে একটা করিয়া স্প্রীং লুকান ছিল। যাহারা পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহারা ঘুরিয়া বসিল, বাকী সকলে ঘাড় তুলিয়া চাহিল। মস্ত তিনজন লাট্টুর মত সোফাগুলির উপর একবার ঘুরিয়া গেল।

তারপর সব নিস্তব্ধ। হঠাৎ এক সময়ে ঘরের মধ্যে একটা তীব্র কঠিন শব্দ শোনা গেল। ভাইকাউন্ট প্রতিপক্ষকে প্রহার করিয়াছেন। সকলে দুইজনকে থামাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ মার্যাদাজ্ঞানযুক্ত কার্ড আবার প্রদান করিলেন।

ভাইকাউন্ট ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মেঝের উপর দীর্ঘ ও দ্রুত পাচারী করিতে লাগিলেন। তিনি এখনই উত্তেজিত হইয়াছেন যে ধীরভাবে ভাবিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। শুধু একটি মাত্র চিন্তা তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া আছে — 'অপমান' — আর কোন চিন্তারই অবসর নাই। ঐ অবস্থায় মানুষ যাহা করিতে পারে — করা উচিত — তিনি তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার আচরণ লইয়া সকলেই আলোচনা করিবে এবং অনুমোদনও করিবে নিশ্চয়। হাঁ, সকলে তাঁহার সাধুবাদ করিবে। অতিশয় এলোমেলো চিন্তায় মানুষ যেমন আপনা আপনি চেঁচাইয়া উঠে, তিনিও তেমনিই উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন — 'লোকটা কি ভীষণ বর্বর'!

তারপর তিনি বসিয়া পড়িয়া স্থির হইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিলেন! কথা প্রহারেই অপমানের সমতা হয়! কাহাদিগকে ডাকিবেন? সর্বপ্রথম প্রশ্নের অমঙ্গল বন্ধুর কথাই সর্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়িল। মাথাকুটন দু'জন মুষ্টিযোদ্ধার এবং তর্কেল যুদ্ধে-যেই তিনি মনোনয়ন করিলেন, তাঁহাদের একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত, অপর ব্যক্তি বিখ্যাত যোদ্ধা। অবশ্যই তাঁহাকে ঐ নামগুলিও বেশ শুনাইবে। তাঁহার মনে হইল বড় কৃপা পাইয়াছে, তিনি তখনই পর পর তিন খণ্ড কার্ড বাহির করিয়া ফেলিলেন। পুনরায় মেঝের উপর পাচারী সুরু করিলেন। তাঁহার ভারী উৎসাহ বোধ হইতেছে। যদি খুব শীঘ্র মেজাজ এবং সর্দারিয়ের দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন এবং যুদ্ধের সর্তগুলা খুব সাংঘাতিক রকমের হওয়া চাই বলিয়া জোর করেন, অর্থাৎ, যুদ্ধটা খুব গুরুতর হওয়াই চান, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িবে।

পকেটের ভিতর হইতে তাঁহার কার্ড বাহির করিয়া তিনি টেবিলের উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, পুনরায় তুলিয়া লইয়া উহা একবার পাঠ করিলেন; ভোজনশালায় একটি পলকে, বাড়ী ফিরিবার পথে রাস্তার প্রত্যেক বাতির মৃদু আলোকে, এবং নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া যেমন পাঠ করিয়াছিলেন! — মাত্র এই কার্ডে কথা তাঁহাতে ছিল — 'লর্ড লাবিন, ৩১ মঁসী ষ্ট্রীট।'

সাধ্যমত ঐ অক্ষরগুলি তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা

করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল অক্ষরগুলো যেন রহস্যময়, স্পষ্টই উহাদের অর্থ। 'অর্ধ লাখিত!' কে এই লোকটা? সে কি করিয়াছিল? এমন করিয়া মহিলাটির দিকেই বা সে তাকাইয়াছিল কেন? কি বিশ্রী এই ব্যাপার! কোথাকার কে এক অন্ধ একটা স্ত্রীলোকের দিকে ঐরূপ অবজ্ঞার মতো চাহিয়া থাকিবে এবং তাহার ফলে সম্পূর্ণ অপরিচিত আর এক জনের জীবনে এমন বিপত্তি ঘটিবে!

ডাইকাউন্ট পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কি ব্যাপার?'

তারপর একেবারে শান্ত স্বরভঙ্গীতে হাসিয়া তিনি তাকিয়ে থাকিলেন, তাঁহার চোখ দুইটি তখনও সেই কার্ডের উপরে নিবদ্ধ। ঐ কাগজের টুকরাটার উপর কিসের ছিদ্রের তাঁহার তীক্ষ্ণ ক্রোধের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে — সেই বিষয় আর কাহারো সঙ্গে যেন একটা অন্তর্নিহিত — ঐক্য রহিয়াছে! হঠাৎ সেই ছাপা লাইনটার উপরে হাতের সুবিধামত আঙুল স্থির করিয়া দিলেন, যেন একটা ভাঙ্গা আয়নাকেই তিনি জোড়া দিতেছেন।

হাঁ, তাঁহাকে লড়িতেই হইবে, সে যে তাঁহাকে অপমান করিয়াছে। কিন্তু অসি না পিস্তল? অবশ্য অসিতে তেমন বিপদ নাই, পিস্তলের প্রত্যেক প্রতিপক্ষ হয়তো জন্ম দিয়াই যাইবে। অসিযুদ্ধ অধিক ব্যয়সাধ্য হইয়া থাকে, প্রতিদ্বন্দ্বীরা এমন একটা সুযোগ খুঁজিয়া যুদ্ধ করে যাহাতে অন্য কেহ গভীর-বিদ্ধ না হইতে পারে। পিস্তলে রীতিমত জীবনের আশঙ্কা আছে, তাই উহাতেই তাঁহার মান রক্ষা হইবে; এমন কি, সেও পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে নাও হইতে পারে।

'আমার রীতিমত শত্রু হওয়া চাই, বেজন্মা পাইবে।'

আপন কণ্ঠস্বরে তিনি আপনিই শিহরিয়া উঠিলেন, চারিদিকে একবার তাকাইলেন। চিত্তের স্থৈর্য যেন একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; চঞ্চল করিয়া এত রাত্রে জল খেয়া করিয়া ওপারে যাইবার জন্য তিনি বেশপরিবর্তন করিতে লাগিলেন।

আলো নিভাইয়া দিয়া চোখ বুজিলেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কাল সারাদিন আমাকে সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া লওয়া চাই, যাহাতে কাল সুস্থির হইয়া সব কাজ করিতে পারি।"

বিছানার চাদরের নীচে বেশ একটা উষ্ণতা বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু চোখে ঘুম কিছুতেই আসিতেছে না; পা ঝোলা দিয়া পাশ ফিরিলেন, চিৎ হইয়া পাঁচ মিনিট শুইয়া রহিলেন; তারপর বাঁ পাশ ফিরিয়া শুইলেন, আবার ডান পাশ।

আবার তৃষ্ণা পাইল, জল পান করিবার জন্য তিনি পুনরায় জাগিয়া উঠিলেন। তখন এক রকম চলিয়া ঐ ঘরে পারেয়া বসিল। —

"তবে কি আমি তা পাইয়াছি?"

মনের ভিতরকার পরিচিত প্রত্যেক পথে তাঁহার চৈতন্যলব্ধ এমন প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন? ঘড়ি বাজিবার পূর্বে ভিন্নের ঘড়ঘড় শব্দে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। তারপর বাঁ করিয়া খাস লইতে করিতে দেখিতে পাইলেন, রাত বড় হয় আর কি।

কেন এমন হইল, ইহার কারণ কি — তিনি মনে মনে যোঝাপড়া সুরু করিলেন।

'আমি কি তা পাইয়াছি!'

নিশ্চয় নহে, তা তিনি পান নাই। এই ব্যাপারের সুরাহা করিবার জন্যই ত' তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবে কাঁপিলে তাঁহার চলিবে কেন! কিন্তু সর্ব দেহে কিসের একটা গভীর আলোড়ন আরম্ভ হইল, তিনি নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন —

'ইহার বিরুদ্ধে কেহ কি তা পায়!'

এই সংশয়, উদ্বেগ — এই ভীতি তাঁহাকে পাইয়া বসিল; যদি তাঁহার ইচ্ছাশক্তির জোরে প্রবলতর কোন শক্তি তাঁহাকে জয় করিয়া বসে তবে কি হইবে? তাই তো, তাহা হইলে কি হইবে? তিনি মুহূর্তকাল যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহাকে উপস্থিত হইতেই হইবে। কিন্তু তাঁহার হাত যদি কাঁপিয়া যায়! যদি তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার এত প্রতিজ্ঞা, এত সন্ধান — তাঁহার দাম! তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।

হঠাৎ এই অদ্ভুত খেয়ালের বশে তিনি আয়নার মুখ দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মোমবাতির আলোকে স্বচ্ছ দর্পণে যে ছায়াখানি পড়িল, তাহাকে যেন চেনাই যায় না; মনে হইল, ঐ মূর্তিটাকে তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই। চোখ দুটি ভয়ানক বড় দেখাইতেছে, অথচ মুখখানা যেন বড় কাকাশে, সাদাই, যত যদিন দেখাইতেছে।

আয়নার মুখামুখি দাঁড়াইয়া থাকার অবসর মুহূর্তটির জন্য তিনি জিহ্বা বাহির করিলেন। হঠাৎ, শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়া এই চিন্তা তাঁহার মাথায় প্রবেশ করিল।

'কাল রাতে পরশু এই সময়ে আমি হয়ত আর বাঁচিয়া থাকিব না।'

তাঁহার সমস্ত জীবন বাহিয়া উঠিল।

'পরশু, এই সময়ে আমি হয়ত আর থাকিব না। সম্মুখের ঐ মানুষটি, ঐ যে আমি দর্পণে যাহার ছায়া দেখিতেছি, সে-আমি এখনও বাঁচিয়া আছি — সেই আমি যার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ বিছানার উপরে পড়িয়া থাকিব — মরাহত, চক্ষুদুইটি মুদিয়া যাইবে, এই দেহ হইবে শীতল, প্রাণশূন্য, সব শেষ!'

তিনি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন সন্তর্পণে ঐ বিছানার উপরে তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন, মৃতদেহের মত শক্ত দুইটি পা দিয়া দিয়াছে, হাত অসাড়, আর কখনও উহা নড়িবে না।

শরীরে রীতিমত একটা অবশ ভাব হইয়া দাঁড়াইল, উহাকে এড়াইবার জন্য তিনি তখনই ধূমপানের ঘরে ছুটিয়া গেলেন। বহুদিনের একটা সিগারে অগ্নি সংযোগ করিয়া তিনি পুনরায় পায়চারী সুরু করিলেন। বেশ অবসর হইয়া পড়িল; বৃদ্ধাকে জাগাইবার জন্য ঘণ্টার দিকে আগাইয়া গেলেন, কিন্তু মাঝপথেই তাঁহার হাত থামিয়া গেল।

"সে দেখিয়াই বুঝিবে, আমি ভয় পাইয়াছি।" ভয়ানক বাড়াবাড়ি হইল; যাহা কিছু স্পর্শ করিতে যান, অমনি মাথা ঘুরিয়া উঠে। চিন্তাগুলা যেমন অসংবদ্ধ, তেমনই আকস্মিক ও অবসাদকর। একটা বিশ্রী মতলব তাঁহার সারা চৈতন্য আসিয়া ভরিয়া ফেলিতেছে, মনে হইতেছে তিনি উহার হইয়া যাইতেছেন।

বার বার নিজেকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন —

"এ কি করিতে যাইতেছি আমি! আমার সাধ কি হইবে?"

যেন একটা প্রবল সংক্রামিতে তাঁহার সর্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জানালার কাছে গিয়া পর্দাটা একপাশে সরাইয়া দিলেন। বাহিরে ভোর হইতেছে, — প্রীষ্ম-দিনের প্রভাত। সোনালী আকাশ নীল সরণীর উপরে, — বাড়ীর ছাদগুলি, দোকানগুলির উপরে একটা সোনালী আভা ছড়াইয়া দিতেছে। প্রভাতসূর্যের সুকোমল করস্পর্শে সারা পৃথিবীটি যেন জাগ্রতোন্মুখ হইল। সেই ক্ষীণালোকে, অতিমন্দ আকস্মিকতায় একটা দুরন্ত আশা তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। অস্থিমজ্জার উল্লাসের মত এখনই তিনি এমন ঘুমড়াইয়া পড়িতেছেন কেন? এখনও তো কিছুই স্থির হয় নাই, ওষুধের বন্ধুরা এখনও নাকিসের সঙ্গীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই; প্রতিপক্ষ আগে লড়িবে কিনা জানা

যায় নাই তো।'

তাহাদের প্রস্থানের পর তিনি পোষাক পরিয়া নিতান্ত পরিপাটি হইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পথ চলিতে চলিতে মনে মনে তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন — 'আমি চাই অবিচলিত সাহস, কাজ নয়। তাহারা জানুক, ভয় পাইবার লোক আমি নই।'

তাঁহার বন্ধুদ্বয় — মারকুইস এবং কর্ণেল — তাঁহার নিমন্ত্রণ পালন করিবার জন্য আসিয়া হাজির হইলেন এবং পরম আগ্রহে তাঁহার কয়জন করিয়া সঙ্গী-সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণেল প্রশ্ন করিলেন —

'তাহা হইলে রীতিমত কয়জন তুমি চাও?'

ডাইকাউন্ট জবাব দিলেন —

'তিনজন'।

'সিক্সটই ঠিক?'

'হাঁ'

'বাকি যাহারা আসিবে তাহাদের তুমি বিদায় করিবে — কেমন, আপত্তি নাই তো?'

ডাইকাউন্ট অতিশয় বিনয়ের সহিত জানাইলেন, তাঁহার কর্তব্য শুধু একান্ত নীরব।

এক গ্লাস ব্যাণ্ডি হইতে, ইতিমধ্যে হাত না নামাইয়া, উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিতে হইবে— যে পর্যন্ত না একজন শত্রুতার আরম্ভ হইয়া পড়ে।

কর্ণেল খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ বেশ, চমৎকার কর্তা! তোমার বিদ্যার জ্ঞান, সবই তোমার অনুকূলে দেখিতেছি।'

বন্ধুরা এখন বিদায় লইলেন। তাঁহাদের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া ডাইকাউন্ট গৃহে আসিলেন। যতক্ষণ ধরে তাঁহার চিত্তের অস্থিরতা কমিয়া প্রশমিত হইলেও যতই সময় কাটিতে লাগিল প্রতি মুহূর্তে অস্থিরতা বাড়িতে লাগিল। হস্ত, পদ ও মুখের একটা কম্পন একটা অস্বস্তিময় লক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। কি বলিয়া, কি ধরিয়া, কি ছাড়াইয়া কিছুতেই আর মতি পাইতেছেন না। মুখের কিনারটা যেন আগুনের মত চটচটে, পায়ে তালুতে কাঁটিয়া যায়, তাই কিছুতে বার বার নাড়িতে লাগিলেন, তাহাতে একটা যেমন বল হইতে লাগিল।

ডাইনার সমাধা-ভোজনের চেষ্টা করিয়াও তিনি কিছুই খাইতে পারিলেন না। ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, সাহস পুরুষত্বের জন্য মদ চাই। তিনি একপাত্র মদ চাহিলেন। দুটী ছোট ছোট গ্লাস ঢক ঢক করিয়া চক চক করে দুটী গ্লাসই নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। পোড়া-ঘায়ের মত একটা জ্বালা তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া ধরিল, পরমুহূর্তেই পূর্বের ন্যায় চিত্তের অস্থিরতা দেখা দিল।

তখনি ভাবিলেন, এইবার উপায় মিলিয়াছে, এখন সব ঠিক হইয়া যাইবে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মনের পারম্পর্য নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। এইবার চরম অস্থিরতা উপস্থিত হইল; বুঝিতে পারিতেছেন এখনই সেই মুহূর্ত আসিবে যখন ঐ জেলের উপরে লুটাইয়া পড়িবার, কাঁদিবার, এবং একটা কিছু করুণ করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহাকে পাইয়া বসিবে। লজ্জা নাশিল।

বাহিরের ঘণ্টাটা বাজিয়া উঠিবেই তাঁহার এমন সব বন্ধু হইবার উপক্রম হইল যে, উঠিয়া গিয়া বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিবার শক্তিও আর রহিল না।

তাহাদের সঙ্গে আলাপ করা দূরে থাক, শুধু একটা কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার — 'ভাল তো?' — উচ্চারণ করিবারও সাহস হইতেছে না। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাঁহাদের যে জানিবার কিছুই বাকি থাকিবে না!

কর্ণেল বলিলেন, 'তোমার পক্ষের সব ঠিক করা হইয়াছে। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সে কিছু ঘুষিয়া চাহিয়াছিল কিন্তু যেমি পীড়াপীড়ি করে নাই, সব কথাই সঙ্গে রাজী হইয়াছে।

তাহার সাক্ষী হইবে দুইজন সামরিক কর্মচারী।

ডাইকাউন্ট কোনমতে উচ্চারণ করিলেন — 'বহুবার'।

মারছুইস পুনরায় বলিলেন — 'মাত্র আর এক মিনিট, কিছু মনে করিও না — এখনও আমাদের অল্প কাজ বাকী আছে। প্রথমতঃ, একজন ভাল ডাক্তার চাই, কেননা তোমাদের কেহ গুরুতর আহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকিবে এবং পিস্তলের যুদ্ধ যে সহজ ব্যাপার নহে তাহা তুমি ভালই জান। তারপর একটা স্থান ঠিক করিয়া লইতে হইবে। ঐ স্থান এমন হওয়া চাই যেন প্রয়োজন হইলে আহত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী গৃহে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। এমন আরও অনেক কাজ আছে। প্রায় তিন চারি ঘণ্টার কাজ।'

ডাইকাউন্ট দ্বিতীয় বার যাচাইবুঝি করিলেন — 'বহুবার'।

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন —

'তুমি ঠিক আছ তো? যেন বীর স্থির!'

'বহুবার, আমি ঠিক আছি।' অতঃপর বন্ধুর বিদায় লইলেন।

সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় ডাইকাউন্টের মনে হইল তিনি পাগল হইয়াছেন। তৃষ্ণা আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল; তিনি কয়েকখানি চিঠি লিখিবার জন্য টেবিলের সামনে গিয়া বসিলেন। এক টুকরা কাগজের শিরোদেশে 'আমার উইল' শব্দ কয়টী লিখিয়াই তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, চিন্তার ধারা ঠিক রাখিবার, স্থিরচিত্তে কিছু ভাবিবার, কোন প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছিবার কোন শক্তিই আর তাঁহার অবশিষ্ট নাই, তখন তিনি টেবিল হইতে এক লাফে উঠিয়া পড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কিন্তু যুদ্ধ তাঁহাকে করিতেই হইবে, ফিরিবার আর পথ নাই। [illegible] আছে কে জানে! তিনি যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, উদ্যমেরও ছিল অভাব। তথাপি, মনের স্থিরশক্তি, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সত্ত্বেও, সম্মুখে গিয়া পৌঁছিবার সেই শক্তি যে আর নাই!

প্রতিদ্বন্দ্বীর আচরণ এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন তিনি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিলেন।

তারপর মাঝে মাঝে বাতাসে ঠাণ্ডা ঢুকিয়া যাওয়ার একটা শব্দ হইতে লাগিল। মারছোঁয়াজ-প্রণীত ভূমণ্ডলের নিয়মাবলী টানিয়া বাহির করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন। তখন তাঁহার মনে একটা প্রশ্ন জাগিল —

'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায়ই গুলি: খালারীতে যায় কি? লোকটার বোধ হয় নাম আছে কিন্তু তাহার আসল পরিচয় কি? — এ সকল সংবাদ জানা যায় কেমন করিয়া?'

যাহোক ডাক্তার পিস্তল-ভরা বাক্স দুইখানির তথা তাঁহার সম্মুখে রাখিল। বাক্সের আড়োপায় পড়িয়াও কর্ণেল লাফিয়ের মাথেরেল কোথাও দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু লোকটা উপস্থিত হওয়া না হইলে এমন ভয়ানক সর্তে রাজি হইবে কেন! তিনি তখন টেবিল হইতে উঠিয়া পড়িয়া একটা দেরাজ খুলিয়া পিস্তলটি বাহির করিয়া লইলেন। তারপর হাতটী উর্দ্ধে এমন ভঙ্গিতে তুলিয়া ধরিলেন, যেন এখনই গুলি ছুঁড়িবেন। কিন্তু তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল, পিস্তলের নলটা এদিক-ওদিক টলিতে লাগিল।

তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন — 'অসম্ভব! এই অবস্থায় কিছুতেই লড়িতে পারিব না।

তিনি বুঝিলেন, পিস্তলের নল তাঁহার ঐ সঙ্গীন অন্ধকার দুঃখলোক হইতেই, খুন নিক্ষেপ করার মত, নূতন নিক্ষেপ করে। লাঞ্ছনা অপমান, ঘৃণার কাণ কড়ি, সেলুনের উপহাস, স্ত্রীলোকদের ঘৃণা,

ঘরের ভাড়ার ভাড়াতে হইবে, — কাপড়ওয়ালা দর্জি তাহার নামে যে মকদ্দমা রুজু করিবে — এক এক করিয়া সকল কথাই মনে পড়িতে লাগিল।

পিছনটায় দিবার অপরাজিত ফুটিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন, ফোঁটাটা তুলিয়া ধরিয়া দেখিলেন ফড়িঙের নীচটা লাল সিঁদুর মত টকটকে করিতেছে। সৈদাৎ একটা দুরবস্থা সেই সময়ে পিছনটা তুলিতেছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে কেমন এক অদ্ভুত আনন্দের উদয় হইল।

উপস্থিত ব্যাপারে যদি তাহাদের সম্মুখে লজ্জিত থাকা অথবা উহার মনোভাব তিনি বুঝা করিতে না পারেন তবে তিনিদের জন্য একটা লজ্জা থাকিয়া যাইবে। নিরানন্দ সাধনা আর চিরকালের হাড় হইতে অব্যাহতি নাই, অন্তঃপুরবাস হইতে তাঁহাকে নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, সেই অখিল নির্ভীক মনোভাব বুঝা করা আর সম্ভব নহে। কিন্তু অর্থ সাধনের অভাব তো তাঁহার হয় নাই; তাহাই যদি হইবে, তবে তিনি সুখী করিতে চাহিবেন কেন? তিনি সত্যই অসুখী, কেননা — ইহার পর তাঁহার মনের ভাবনাগুলা আর শেষ হইতে পারিল না। মুখ খুব ঢাকা করিয়া তিনি শিল্পের মলাটা গলার তলা পর্যন্ত পুরিয়া দিলেন, তারপর ঘোড়া টিপিলেন।

শব্দ শুনিয়া কুয়া ছুটিয়া আসিল; ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তাহার প্রভু মেঝের উপরে পড়িয়া আছেন, প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। টেবিলের পাশে কাগজখানায় অক্ষরে ছিট লাগিয়াছে — এবং "এই হইল আমার উইল" এই চারিটা কথার নীচে একটা অক্ষরের দাগ টানা রহিয়াছে।

"জাগিতে হয়েছে শান্তি,
জীবনের ফুলরাশি
সব গেছে ঝুরে।
রাত্রিদিন ধুকধুক
জাগিয়াছে দুখ সুখ
থামিয়াছে ঘুমে।"
যত কিছু ভালমন্দ,
যত কিছু বিদ্যাবুদ্ধি
কিছু আর নাই।
বল শান্তি, বল শান্তি,
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক্ ছাই!"

"নিজেরে কি আছে ব'লে,
জানিল কি ঘুমাল সে
কে দিবে উত্তর?
পৃথিবীর প্রান্তি তারে
ডাকিল কি একেবারে —
জীবনের জয়?
এখনি কি দুঃখ-সুখে
কর্মপথ-অভিমুখে
চলেছে আবার?
অস্তিত্বের চক্রতলে
একবার বাঁধা প'লে
পায় কি নিস্তার?"

গুল্-দাউদী

শ্রীতারাচরণ বসু

চাই না মোহানী মেনা, মেরা বিবিজী —
আয় গুল্-বাউনী লো, আয় তুই ফিরা !
বেন্-মোতিয়ার গোড়ে যে চায় সে নিক্ না ;
পাতা-আড়ে আঁখি ঢাকে চম্পক টীকা।
সরবী পরবী যত, উঁচু ডালে রয় সে ;
পিটলি খোয়ালো ফুল আহা কতি মরমে !
ছুঁই-ছুঁই করে ধুই, আলো ধরে দিবি ;
টগর ডালর ঘটে — যত্ন, তবু ধরে নি !
যত্ন-মহলের দিল গোলাপ কি ভাঙ্লে,
আধ্ফুল খোয়াবে, ছিঁ-ছি, লাজে মুখ ঢাক্লে ?
তাই নাই এ সবায়, আয় চাঁদ-মল্লি !
এ ডালিমে এত কাল বিঁধে কেন হুল্লি ?
যোগিনী অপরাজিতা, বিয়োগিনী টাঁপো —
ফুল-মুহূরতে চাঁদ-মুলতানা তুই লো ?

* * *

দাউদ-রাজার ফুল, গুল্-দাউদী লো, আয় ;
স্বপনের পরী তুই কো'ন্ কথা ইসারায় ।
নিরেনব্বুই বাঁশী হারেম যে জাগল,
শুভের লাগিয়া তবু অসতে না ভরল ;
লোহা হ'ল মোম যার সুর-সাধা আঙুলে,
যাদুর 'জিরোবা'র দিল যায় যেটলে :
প্রাণপণা তান তার 'অরফু'-দীক্ষিকা —
ফুল হয়ে ফুটলি কি 'জরে' বন-বীথিকা ?
আমি ছেলে সুলেমান্, জ্ঞানীদের চূড়া যে, —
পাখি দিত আস্মান কোন দূর দুরাশে ?
পরেলি দেহেলি তার তুই, লীলা-লাস্যে
মাতালি কিশোরে, হাই হল রূপ-দাস যে !
বাবিল-ফুলন-বাসে মাটি তোর বিরাজে, —
হারুনের রোশ্নাই, মন্তর শিরাজে ?
তোর সাথে মোর দেখা, বিধির বিধান, না ?
ফুবিষ্ট ইস্রাফেলে কে তোমায় 'জানা' ?
জাহানের দেশে দিল্ 'ডাকাতে'র ঢেঁটরা —
কাস্তি-মুদ্রিত-আলো ফুল-ক্রিওপেট্রা ?

আহাহা ! অবাক ! তুই কবে এলি বঙ্গে !
ফুল্লা বিলিল কবে গন্ধ-তরঙ্গে !
নিশাসে 'জেনানে'র তুলনীয় গন্ধ ।
হেনোরের 'লায়রে' কি 'লাচাড়ি'র ছন্দ ?
আজমীর জাত যে, অমে' কত আদর —
আরবী-হরকে লেখা পদ্মিনী-কাব্য !
আয় লো বিদেশী আয়, অপরূপা, আয় না ;
দেখ্ দেখি মুখখানি, — চোখ যেন জায়না ।
ছদের দোহাই মোর, হোস্ ফুটে রোজ লো —
শিরীন্ শিরীন্ হাসি ! — কয়ুবাদ মজলো ।
তুই যে শাহারজাদী, সাহসের ভরে
খুনীরে করিয়া সখী ভুলাইলি গল্পে ?
মরুর দুলালী তুই তরুময় দেশে আয়,
আরব-সাগর-নীরে রাগে মুখ ভেসে আয় !

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা এক করিয়া যাহা আমরা বিতরণ করা হইবে—যে-সব সর্বকালের ইতিহাসমাত্র উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাভাষার কাম্যবস্তুও বটে। এদেশের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার যে কবিদের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সত্যকার পরিচয় নাই। 'মর্মবাণী'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাটি পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে বর্ণ-পরিচয়ের নামের উল্লেখ থাকিবে।

গঙ্গা

(১)

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
ত্রিপথগামিনি শুভে বিভাবিনি,
মুনিমনোরঞ্জিনি!

কত নদ নদী তীর্থ হইল তব
চুমি চরণযুগ, মাগো,
কত মহানারী ধন্য হইল মা
তব পরশে অবগাহি,

বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে
— কত শত যুগ ধরি'
কবি চূড়ামণি কত মহাপ্রাণের
নিত্য পুণ্য তরঙ্গে।

মায়ামরীচিকাপুলকিতমানব-
বিপথিক করুণা জাগিয়া,
মরুকমণ্ডলু উছলি' ধূর্জটী-
জটাজটে পথ ভরিয়া,
অমর হইতে নর আসিবারে
জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে —
আসি' ধরার হিমাচলমূলে
— মিশিলে সাগর সঙ্গে।

শরিছি তব-দুখ-সুখ যেথা যা
শান্তির অস্থির শরণে,
ধরিব হরষে মম তব জন্মমরণ,
ধরিব শান্তি মম মরমে।
ধরিব শক্তি মম কল্পিত প্রাণে
ধরিব অমৃত মম অঙ্কে,
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি!
জয় জয়োল্লিনি গঙ্গে।

(২)

গঙ্গা-স্তোত্র

চির-ক্ষেম-নয়ী গঙ্গে!
কূলু কূলু জল কল প্রবাহিত মা,
স্নেহ-জাহ্নবের এসরঙ্গে!

বিশ্বের ক্রন্দনে কিঞ্চিত্ মাতাল,
আঁখি তার অশ্রুত ভরিল, —
গোলোকে হ'ল না ঠাঁই, শিবজটা বাহি' তাই
পতিতা ধরণীতে ঝরিল।
হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন সুরু —
বিধা যা বিধা এ কাহিনী;
যুগে যুগে নর-নারী অনুরাগ আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।
তব তীর-বীর-বায়ু ধরিল কত না আয়ু,
কত আলো তোমাতেজলে মিলালো!
করি' তব ভাঙা পার কত কোটি হাহাকার
ভাঙা বুক যাওা আঁখি ঘুমালো।
তবা কোল করি' খালি জননীরা মানে জালি
যুগে যুগে মাগো তোমি অঙ্কে, —
কত মা বাসুর চর সে বাথার উর্বর
বলি-অঙ্কিত তট পঙ্কে! —

অশ্রুপূত ও জল- পূত তব তটতল
শুধু কহিয়া কত কীর্তি;
কত মা চিতার ছাই মিশাইয়া আছে, তাই
পবিত্র তব তট-মৃত্তি।
তাই আসি' তব বারি পতি' নিজ স্নেহবারি
তোমারি সলিলে হবে পুষ্টি মা!
যুগে যুগে যত বাথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি মা।
তাই পাছি তব তীরে, তাই বাহি তব নীরে,
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে মা!
জলো জল্ কুলু কুলু এ ধরার কোথা ঘুম
কোথা ঘুম — ঘিন্ যদি ঘ'লে মা!
বন্দি ত্রিকালজয়ী গঙ্গে — মূর্তিমতী
অমৃত-জীব-ধাত্রী-প্রয়াগ!
অনাদি ও ক্রন্দনে মিশাইছ ক্রন্দন ও,
দুখে নে মা এ প্রাণের বি ভাগ!

গঙ্গার প্রতি

সহীরিয়া উত্তরীয়, সকারিয়া ভাম-পত্র-ধারি,
তরঙ্গে নর্তন তুলি' ছড়াইছ ফেন-পুষ্প-রাশি
অয়ি সুরধুনী-ধারা ! অঞ্জোষ তোমার আশীর্ব্বাদ !
পাপিষ্ঠ হেরায় তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর প্রসাদ !

অমর পরশ তোর বহু স্নিগ্ধ মাখো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্তজনে বুলাও গো অমৃত-হিল্লোল।
কত জননীর শিরি লঙ্ঘিত হয়েছে ওই বুকে ;
তোরে সঁপি পুত্রকন্যা, তোরি কোলে ঘুমাইবে সুখে

ঢিকে ছিল মহী, তারে তব ঘর করিল উর্ব্বর,
ভক্তজ মানব তাই কীর্ত্তি তোর গাহে নিরন্তর,
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি' যেন-ঘর গাথা,
হয়-অমঙ্গল-ধারা ! সর্ব্বতীর্থময়ী তুমি মাতা !

একদিন তারো সবে, যেমনার বহে প্রতীক্ষায় !
আজার মিলন-স্বর্গে, তোর জলে কারে মিলে যায়,
তত মিলে তত সবে, — এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার !
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি যা আধার।

তোরে ঘিরি' উর্ব্বরতা, তোরে ঘিরি' তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি' চিরানন্দ উল্লাসের ধরিছে কামনা
তীরে তীরে প্রেমভূমে ; অয়ি তব ভক্তি-বিলাসিনী !
শরতে হরিত শিব তুমি দেবী অমিয়-বাহিনী।

সর্ব্ব রচি' তাই মোরা তোমি তীরে মিলি বারবার,
পরশি তোমারে — অয়ি পিতৃ-পুরুষের তরণায় !
চক্ষে হেরি পূত বিশ্ব সকলের মিলিত সমাধি,
অয়ি গঙ্গা ভাগীরথী ! তাদের অমর মমা, আমি !

---

(৪)

গঙ্গা

নমি সুরধুনী পতিতপাবনী
তুমি স্বর্গবতী শান্তিধারা,
নমি মা অমলা, কমলা-পরিক্ত
চরণ-কমল-অমুর ধারা।
অয়ে কোটি কোটি তৃষিত কণ্ঠ
পাইল তোমার আশ্রয়ী,
স্নেহে এলে ফেলে দুর্গার বেশে
তুমি কেবে মেয়ে কলমনি।

এক কণা তব অমৃত-পরশে
স্বর্গপথের পাথেয় পাবি'
কেন কেন হ'তে এসেছে মানব
চাতকের মত, কেন মা মানি'।
কত ঘট ভিরে কোলী-ঘট হ'তে
পুণ্যবি-ঘটে যাত্রী চলে,
তব মহিমার এই চিত্রের
তুলনা মিলে মা বহুধাতলে।

হেরি তব মুখে ঘনসনেহে
সার্থকতা কৃতাঞ্জলি,
কল্পনায় মোরে ধরণীটা ধ'রে
নীরে তারার পড়িবে গলি'।
শান্ত নীরে হেরি, তব তীরে
বিস্ময়ে আকাশ চাহিয়া আছে।
হেরি পরশনে তমিস্রিনী নীচারে,
তোমার অঙ্গে সরণ যাচে।
অস্তি-কাকারে হেরি, তমোঘোরে
আত্মারে তোমা আনিছে টানি,
হেরি তীরে তীরে লতীরেখা ঘিরে
ঘিরে লতীরেখা নিশাকশাখি।
মরণের মুখে হেরি নৈরাশ্যে
তব তটে পতি-চরণধূলে,
তীর তোমার পুণ্যে এক কূলে,
ধরণীতি পুণ্যে অকূলে।

কত জন তব অমল-অঙ্কে
তুলিয়া দিয়াছে প্রাণের ধনে,
তাহাদের শেষ স্মৃতিটুকু যাবো
তুমিই স্নেহের সংগোপনে।
পতিরে হারায়ে মূর্ছিত হ'য়ে
পড়িয়াছে সতী তোমার কোলে,
শোকাতুরা মাতা ঝাঁপায়ে পড়েছে —
'আমারেও টেনে লও মা' ব'লে।

মাতৃহারা বালিকা
তোমার পুলিনে হারায় দিশা,
প্রিয়তমা-হারা ফিরে ফিরে আসে,
তোমার ফুলেই কাটায় নিশা।
সব দুখ বুকে নিয়ে যাও, দিতে
হয় যে প্রিয়ার জন্য পুঁজে।
কাঙা ঘট আর পোড়া কাঠ ফুরে —
তীরে যে মানুষ দুর্লভ খুঁজে।

কতজনে ফেলিতেছি আজি
লক্ষিত মোর অপূর্ণ চিতা,
অনলে ও তনু আহুতি দিতে
আমৃত্যু বহু যতন বিতা।
ইহ-জীবনের ক্রটিত্রুটি-ক্লেদ,
মোহমোর মোর এ দেহ ঘিরে,
থাক্ যা সে কথা,— কত না চিন্তা
জাগে মনে আজ তো!
পূর্ণপুণ্যে তোমার পুলিনে
জনমেটি যবে অকালে,
আসে যা তরঙ্গ লহ বহিয়া
অঙ্কে তুলিয়া লইবে মোরে।
তব সিকতায় যার মমতায়
অনলশয্যা পাতিয়া রেখো,
তারকত্রহ্মনাম কাণে দিও,
জননি, আমার শিয়রে থেকো।
ইহ-জীবনের শেষ লগন
চিতায় তখন অগ্নি দিও,
তব তীরে নীরে ধীরে ধীরে ছোরে
ভূমিকীটও, মোরে দিও তা দিও।

(৫)

গঙ্গাতীরে

কতদিন পরে দাঁড়াইনু আজ
এখায় এই কূলে —
পশ্চীগ্রামের পথ হ'তে আমি
নিমের ডালটা তুলে'।
জীবনের নিধি, যৌবন-বিভা —
নীল-নীহার-স্নান,
আজ পথিকের তাই এ তীর্থ
করিল কি আহ্বান!

উঁচু পাড় বেয়ে নামিনু শিহরি
পদরেখা-পথ ধরি'—
একটি অশথ নুঁয়ে আছে যেথা
দাঁড়াইনু ছায়া করি'
দু'জনের মুখে জমে' গেছে মাটি—
নয় বিপুল ধূল,
তবু সে যেমনি আলো-ঝিলমিল্,
পল্লব-সমাকুল!

সম্মুখে মেরি ধারা অবিরাম
ঘুরে চলে দুই কূল—
তার বহিয়ার লাগা উতরোলি
ধারাজলী-সমতুল!
শিরসের পরাণের তৃষা —,
তর্পণ-অঞ্জলি—
এই অমল সলিল-অর্ঘ
নিতি উঠে উছলি'।

নদী-কূলে ঘোমা পড়িয়াছে চর—
চাষীরা দেখে না চেয়ে,
তাই তাম্রচূলে শিবরা-বেলিনী
যেন সে কুমারী-মেয়ে!

উপরে নিবিড় নীলের বিথার,
নিম্নে তা'হার টান
নীরবে বহিছে খরস্রোতে, শুধু,
তেই আছি কোনখানে!

পা' দুটি ডুবায়ে বসিনু বিজনে
বালুকার বৈঠায়;
দেখি, খেয়াতরী— দূর পরপারে
যাইতেছি দেখা যায়।
ছোট ছোট পথ বাহিয়াছে জলে
তীরতরু-ঝাঁকে-ঝাঁকে,
উঁচু নীচু সোপান-পঙ্‌ক্তি
উঠিয়াছে থাকে-থাকে।

বেলা বেড়ে উঠে, ছায়া ম'রে যায় —
ফেরে আসি পরপারে,
আজ নদীকূলে সফলা মহিমা,
জীবনের দেবতারে!
দিনের মাঝ বিলায়ে দিয়াছি
যৌবন সুমধুর —
সুখের আশ সাঙ্গের লাগি'
ফিরা সে বিধুর!

সেই বৈরাগী আজি ও এখানে
তেমনি ধরণের
গাহন করিছে তারে তেই নীরে,
আজ বুঝি শুধু সেই!
আর কিছু নয়, শুধু মায়াময়
এই অমরের ছল —
ওতপ্রোত নিবিড় নীরব
ছায়ালোক সুশীতল!

দিনান্তের রথ আসিবে তোমার,
　　যদি সেই ক্ষণমাঝে
মন্দা না টুটে, ঘুম যাই তবে
　　অতলের অবসাদে!
তলাইয়া যাই কিছু না জানিতে
　　আহরী-হলাহলে!
হায় রে, এমন দুখ-পরিণাম
　　আছে তাহলা তলে?

'অকূল শান্তি বিপুল বিরতি'
　　আছিল যাহার প্রাণ,
আজ তব ঐ গানার সুরে
　　আছে তারি সন্ধান।
আজ খুঁজিয়াছি, কেন আছিনে
　　ঐ বাহু-বন্ধনে
আমার দেশের যত মহাজন
　　সকল খুঁজিতে চায়!

সেই　চির-কলতান উঠায় যারা
　　ধরিত্রী আজিকার আলোকে,
সেই　তাঁরে চিনিবি খেলিয়া বালিকা!
　　বালকে।
তাঁরে　দাদা বেহ যেন ঘুরিয়া আসিছে
　　নব-শাখীর পালকে।

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

(৫)

রাজলক্ষ্মী

রাজলক্ষ্মীর দীর্ঘ কাহিনী আমি সংক্ষেপ করিয়া লইব, কাহিনীর সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা আমার অভিপ্রায় নয়। আমি কেবল ঐ নারীর জীবনে রূপের মধ্যে ও মনের মধ্যে যা কতকগুলা সংস্কারের যে বিরোধ, এবং তাহার ফলে, নর-নারীর প্রেমে যে একটি অভিনব রস-রূপের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যে জীবন ব্যর্থই হইয়াছে, তাহাকে কোনরূপে — বাহিরে না হউক, নিজের অন্তরে একটু কিরাইয়া পাইবার, আত্মিকতাবোধে সার্থক করিয়া তুলিবার — যে অন্তর আকিঞ্চন : যে-ব্যথা শুধু বাহিরের নয়, অন্তরের জন্মগত সংস্কারবেশে বিরাজ করিতেছে ; জীবনের যে আপ্তি-প্রোতোমুখ কিছুতেই ফিরাইবার নয় — সেই ধারা হইতে পারিত, কিন্তু কিছুতেই আর হইবে না, সেই চির-দীর্ঘশ্বাসময় 'might have been' — রাজলক্ষ্মীর মত প্রখরবুদ্ধিমতী নারী মর্ম্ম জানিয়াও, সেই অসম্ভবের দুয়ারে মাথা কুটিতেছে, — ইহাই এ কাহিনীর মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি ; এমন তরুণ-কোমল, এমন অনুভূতি-প্রবণ গীতিকাব্যধর্ম্মী ট্র্যাজেডি সাহিত্যে অতিশয় বিরল — ইহাও বাংলা সাহিত্যেই সম্ভব।

আমি উপন্যাসের সমালোচনা-বিচারের কথা ভূমিকায় বলিয়াছি ; এইরূপ চরিত্রের বাস্তব-সিদ্ধি কতটুকু তাহার আলোচনাও করিয়াছি। এখানে

পুনরায় বলি, এই যে চরিত্র ইহার একটা রক্তমাংসের বাস্তব সত্তা আছে। শ্রীকান্ত এই যে নারীকে দেখিয়াছে ও দেখাইয়াছে, তাহাকে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবের অংশই অধিক, ইহার প্রমাণ — ঐরূপ নারী-চরিত্র কোন পুরুষের নিছক কল্পনার এতখানি দাক্ষিণ্য লইয়া উঠিতে পারে না; নারী-প্রকৃতির যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি উহাতে আছে তাহা কোন পুরুষের বুদ্ধিগম্য নহে; তাই শ্রীকান্তের বুদ্ধিও বারম্বার পরাস্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ নারী-প্রকৃতি এমনই অকৃত্রিম যে, পুরুষের চক্ষে তাহা একটা প্রহেলিকা — তাহাকে সে দেখে মাত্র, বুঝিতে পারে না, মন দিয়া পরিচয় পাওয়া ত' দূরের কথা। শ্রীকান্ত তাহার প্রেমের পাত্র হইয়া যে-রূপ আচরণ করিয়াছে, তাহাতেও রমণীর মন ও পুরুষের আত্মাভিমান, এই দুইয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া আছে; তাহাতেই প্রতীতি হয় যে, শ্রীকান্ত এই নারীকে — ষোল-আনা না হউক, বারো-আনাও — সংসারের জনারণ্য হইতেই আবিষ্কার করিয়াছে, এবং ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর জীবন একটা নীতিবিগর্হিত ও সমাজ-বিরুদ্ধ যে, তাহাকে নারীর সম্মান দেওয়াই — কি সাহিত্যিক কি সামাজিক সুনীতির দিক দিয়া — একরূপ অপরাধ বলিলেই হয়। শ্রীকান্ত তাহা জানে, তাই তাহার প্রথম পরিচয়-কালে, সে তাহাকে যথাযথ রূপেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। আমাদের দেশে ঐরূপ কুলটানা বৈষ্ণবিতার, কলাবতী কামিনী হিসাবে, এক প্রকার প্রতিষ্ঠা আছে; কিন্তু সেই বৃত্তিটার প্রতিও কিছুমাত্র সম্ভ্রম উদ্রেক না করিয়া, এমন স্থানে ও এমন উপলক্ষে এবং এমন শ্রেণীর রসিক-সমক্ষে তাহাকে সে টানিয়া আনিয়াছে যে, ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতি পাঠকের যতটুকু শ্রদ্ধা হইতে পারে সে যেন তাহার বেশি আবশ্যক মনে করে না। ঐ সঙ্গে পাঠকের মনে আরও একটা খটকা, সে অভিনব অলঙ্কারে, একরূপ বেপরোয়া ভাবে দিয়াছে — সেই যাদুক শ্রীকান্তের এই অভিনব চরিত্র-বিকাশ! স্থান, কাল, পাত্রের কি অপূর্ব যোগাযোগ! পিয়ারী-নারী বাইজী ও তাহার অনুগ্রাহক বর্মী অভিধান, অথবা তাহার সেই সাজোপাঙ্গ আমাদিগকে ততটা চমকিত করে না, যতটা করে শ্রীকান্তের এই যুবক-জীবন। তথাপি, শ্রীকান্ত সেই ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির শ্রীকান্তই বটে, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না, তাহার কথা পরে বলিব। এখন কেমন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার হঠাৎ মুখামুখি হওয়ার ঘটনাটা সম্ভবপর দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব। শ্রীকান্ত ঐ কুলটানা বিশ্বযাত্রাসহচারিণী রমণীকে, প্রথম দর্শনে, তাহার মনের যথাস্থানেই বসাইয়াছে; আমাদিগের নিকটেও সে নিজের বা সেদের — কাহারও জন্য এতটুকু খাতির চায় না। ইহাই হইল এ নাটকের প্রস্তাবনা ও প্রথম দৃশ্য।

কিন্তু ঐরূপ ভূমিকা যে বিপুল শিল্পীর কলমটানি শিল্পচাতুর্যের পরিচায়ক একটু পরেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। ঐরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে যে সাধারণী নারীকে অবতীর্ণ করিয়াছে, তাহার মধ্যেও যে একটা অসাধারণত্ব আছে — শ্রীকান্তের নিজেরই সেই বিষয়-বিমূঢ়তা এমন ধীরে ধীরে বুদ্ধি পাইয়াছে, এবং তাহার বিবরণ এমনই যে, আমরাও যেমন চকিত তেমনই কৌতূহলাক্রান্ত হই — অভিনেত্রী পিয়ারী বাইজী রহস্যময়ী হইয়া উঠে; সে যে শুধু বাইজী নয়, আরও কিছু, এ-সম্বন্ধে ক্রমেই প্রবল হয়। শেষে তাহার মধ্যে যে এক স্নেহময়ী ও উচ্চাশয়া নারী স্বমর্যাদার প্রতিষ্ঠার আছে, তাহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কিন্তু সেই নারী কি সতী? অর্থাৎ তাহার চরিত্র কতটা দৃঢ় হইলে, ঐরূপ জীবন-যাপন সত্ত্বেও, তাহার দেহ-মন কি এমনই সংস্কারমুক্ত যে, সে সম্পূর্ণ স্বস্থ থাকিতে পারে? কল্পনায়, ভাব-চিন্তায় উদার-উচ্চ মার্গে সকলই সম্ভব; কিন্তু দেহের

কোথা — বলিতে পারি না। এই প্রশ্ন প্রথম হইতেই উদিত হইয়া উঠে — ইহাই যেন এ কাহিনীর একটি মূল সুর। এ প্রশ্নের উত্তর রাজলক্ষ্মী তাহার সমগ্র জীবন দিয়াও দিতে পারে নাই; শ্রীকান্ত নিজে সে বিষয়ে একটা কঠিন মৌন রক্ষা করিয়াছে, রচনাটিও যেমন কঠিন, কাহিনীতেও তেমনই দৃঢ়বন্ধন করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীকান্ত তাহার সেই যাযাবর-জীবনের ইতিহাস মাঝে মাঝে টুকিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে কালে তাহার সহিত শ্রীকান্তের ঐ আকস্মিক পুনঃ-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তখন সে অনেকটা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে; তার কারণ বোধহয় এই যে, তখন সে আত্মবিক্রয়ের প্রয়োজন বা বাধ্যতা হইতে প্রায় মুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্বে তাহার জীবন যে পঙ্কিল স্রোতে বহিয়াছিল, সেই অজস্র জীবনের অন্তরঙ্গতা বাহির আচারে সে এখনও ত্যাগ করে নাই। তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই; সে যে এখনও তাহার বুদ্ধিতে সেই পৈতৃকান্নের অন্তরঙ্গতা ত্যাগ করে নাই, তাহার একাধিক কারণ ছিল। একটা বড় কারণ এই যে, ঐ সঙ্গীতকলার অনুশীলনই রূপোপ-জীবিনী বাইজীর জীবনে আত্মমর্যাদাবোধের একমাত্র সম্বল — ঐ সঙ্গীতই ছিল তাহার প্রেমের ভাষা; সে প্রেমাস্পদ শুধুই রাজকুমার-বিলাসপুর নয় — পরম-পুরুষের আরাধনার অন্তরে পিপাসা-তৃপ্তি ও সাধিপ্রাপ্তির লক্ষ্য ঘটে।

কাহিনীর ভিতরে আর-একটু অগ্রসর হইলেই আমরা দেখিতে পাই, এতদিনে রাজলক্ষ্মী একটা সংসার পাতিবার আয়োজন করিয়াছে; সেই সংসারের সে যেমন গৃহিণী, তেমনই উপার্জনকারী পুরুষের কাজও তাহারই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সে জীবনটাকে এক রকম গুছাইয়া লইয়াছে। পতিতা নারী — সমাজে তাহার স্থান নাই; তথাপি সে যে ঘরসংসারের অধিকারিণী হইয়াছে (বোধ হয়, এই জন্যই ঐ দুইটা এখনও ত্যাগ করে নাই) — সে জানে সেও একটা শক্তি; সেই শক্তির অতি-সতর্ক ও মমতাপূর্ণ ব্যবহারে সে সমাজকে বশীভূত করিয়া, তাহারই এক কোণে একটুখানি সংসার পাতিয়া লইবে — নারীজীবনের একটা স্বাভাবিক পিপাসা মিটাইবে। তাই সে তাহার বহু বিবাহ-কারী কুলীন স্বামীর অন্তরমা এক বিধবা পুত্রকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, নিজে ও রূপ দুইজনেই সমর্থনে, তাহার উপরে যাবতীয় অধিকার ন্যস্ত করিয়া, তাহাকে লইয়াই সংসার পাতিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর মত অবস্থায়, নারীত্ব-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কি হইতে পারে? ঐ একটিতেই তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় মিলিবে। জীবনের একটা ভাগ সে ক্রীত-দাসীর মত পণ্যরূপে বিলাইয়া দিয়াছে, তাহার দেহের রূপ ও মনের কলানুশীলতা পরের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছে; তখন আত্মবিস্মৃতি ছিল তাহার একমাত্র সম্বল। সে জীবনে যে কি, তাহা সে জানিত; বোধ হয়, সেই নিদারুণ সত্য ঐ শ্রেণীর সকল নারীই অন্তরের অন্তরতমে অনুভব করে, সেখে সেই চেতনাকে রুদ্ধ করিয়া বা একেবারে হত্যা করিয়াই পরিত্রাণ পায়। রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যদেবতা এ বিষয়ে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন — সেই আত্মচেতনা মুক্ত হইলেও মুক্ত হয় নাই। অতঃপর রাজলক্ষ্মী তাহার তাহা জীবনটাকে কোনরকমে জোড়া দিয়া কাহিনীর জন্য একটা ছক তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সে প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে; সে বিশ্বাস করে, পুরুষের মত নারীর পরজন্মেরও কথা আছে; নিজের জন্মকে সে নিজেই উদ্ধার করিবে।

কিন্তু সে কাজ ত সহজ নয় — সহজ হয়, যদি হৃদয়ের ভিতরে কোন উৎপাতের ভয় না থাকে। অতি কঠিন মনোবল বা আত্মশক্তির দ্বারা, একটা চমৎকারচিত্ত নীতিমার্গে জীবনকে বশ করা দুঃসাধ্য

নয়; কিন্তু প্রেম যে বাঁধন মানে। যে প্রাণকে বাঁধিতে পারে না, সেই প্রাণের প্রাক্তন স্বামী যদি প্রেমের খাতিরে মৃত্যুকিংবদন্তী হয় — তাহা হইলে জীবনের জয়-পরাজয় এমন নির্মমভাবে হিসাব করিতে গেলে, আমরা বিবাগী হাসিয়া উঠি। রাজলক্ষ্মী পুরুষের চেয়েও বুদ্ধিমতী, তথাপি সে নারী; সেই নারী-প্রকৃতির ঐরূপ একটা কিছু যদি না-ই থাকিবে, তবে এমন কাহিনীর সৃষ্টি হয় কেমন করিয়া? শিবাজী নাটকীয় সর্বনাশ করিয়া প্রস্থান যে যদি চতুর্দিকে পুলিস বিসিয়ন করিতেছিল, তাহাকে কে যে আগেকার অফিসে ঐরূপ করিয়াছিল! সেই অফি অফিসার হইয়া আসে। কেহ তখন যৌবন অবসানে তখন তাহার বিদেশী-জীবনে সেই যে আকাঙ্ক্ষার অনল জ্বালিয়াছিল — সে যে তীব্র-যৌবনের অমৃত অনল! সে অফির পরম এমনই গোপনে ঘটিয়াছিল যে দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে নাই। সে যেন একান্তই তাহার নিজের; সমাজের নয়, সমাজ নয়, বোধ হয় ভগবানও নয় — কেহই তাহার সাক্ষী ছিল না। সেই প্রেম এমনই যে, তাহার মরণটাই রাজলক্ষ্মীর শুরু হইয়াছে, আর কোন শুরুর আবশ্যক হয় নাই। তাই সে এমন নিশ্চিন্ত হইয়াছিল! ভিতরের সেই শুরু এবং বাহিরের ঐ সংসার, এই দুইয়ের পূর্বের নারী এক নূতনতর সাধনায় সে দিনাইয়া লইয়াছে। অন্তরে কোন অভাব নাই, কোন বন্ধন নাই, তাহারও মূল্যাপেক্ষা নাই; বাহিরের ঐ কর্মবন্ধনও একদল বজায়ুষ্ঠান; সেই যজ্ঞকালীন যে নিত্যস্নান, তাহাতেই সে তাহার স্নেহধারা যত কিছু অশুচিতা ধৌত করিয়া ফেলিবে; রাজলক্ষ্মী তাহাই মনে করিয়াছিল।

কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভুল করিয়াছিল — সে তাহার হিসাবে প্রাক্তনকে বাদ দিয়াছিল! কাব্যে নাটকে যেমন, জীবনেও তেমনই, দৈবের মত শক্তিমান আর কিছুই নয়; কিন্তু যাহাকে প্রাক্তনের ছলনা ও বঞ্চনা-প্রবঞ্চনা পরিণামে বলে — দৈব তাহাই। রাজলক্ষ্মীর জীবনে দৈবের লীলা আজ নহে! তাহার কিশোরীবয়সে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও যেমন অতিমুখর প্রাক্তনের জন্য, তেমনই এতকাল পরে আবার যাহা ঘটিল তাহাও সেই বিধানের বহির্ভূত নহে। এমন ঘটনা দৈব বলিয়া মনে হইলেও, তাহা অতিশয় সুবিহিত, তাই আমরা তাহাকে নিয়তি বলি। তাহার সেই অপ্রবুদ্ধ যৌবনের অতিপ্রবুদ্ধ প্রেম যে মিলিয়া হইয়া অন্তরে ও বাহিরে, তাহা সে তখনই বুঝিয়াছিল, পরে এতদিনের অন্তরে বিলয় হয় নাই। সেবার একটা বড় ভুল সে করিয়াছিল, — তাহার ঘর সংসার ও জীবন তাহার জীবনে আর কিছুই নহে, তবে তাহা প্রাক্তনের ঘরই বটে, তাহাকে সে শ্রোতস্বিনীর মতই আপনার ছন্দস্রোতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে; সে আর ডানা মেলিবে না, অন্তরের আকাশের তার কর্ম-বিহঙ্গের স্বাধীন-বিচরণে তাহাকে আর নিরাশার হইতে হইবে না; তাহার ডানা ভাঙিবে না, বুকে আর আঘাত লাগিবে না। এমন করিয়া নিষ্কৃতি-লাভের উপায় যে নাই! তাই এতদিন যাহাকে সে মনের কোণায় রাখিয়াছিল, যাহার অস্তিত্বও সে ভুলিয়াছিল, সহসা সে একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবনের সহিত রাজলক্ষ্মীর ঐ কালে ঐরূপ সাক্ষাৎ মানুষের জীবন লইয়া বিধাতার লীলা বই আর কি!

তথাপি বাহিরের ঘটনা যতই বিস্ময়কর হউক, ভিতরের ঘটনা আরও অভূতপূর্ব। সে তাহার জীবনের এতখানি অধিকার করিয়া আছে, সে তাহার পরম সুখ ও চরম দুঃখের উৎস, সে তাহাকে জানে না? প্রেমের সেই মহীয়সী তাহার মন নয় — সে ছিল নিমিত্ত মাত্র। রাজলক্ষ্মী তাহাকে জানে — তেমন জানা আর কেহ তাহাকে জানে না; জানিয়াও সেই উদাসীন সর্বস্বার্থবিমুখ দুর্জয়বীর প্রকৃতির

মানুষটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছিল; তাহাতে এমনই আত্মবিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর প্রেম অন্ধ বলিয়া মনে হয় না — শ্রীকান্ত সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র ভুল করে নাই। তাই এ ভালবাসার একটা হেতু নির্ণয় করিতে ইচ্ছা হয়। এমন বলা যাইতে পারে, ঠিক ঐ চরিত্রের ঐ মানুষটিই তাহার জন্য তপস্যা করিবার উপযুক্ত; এই অর্থে ঐ প্রেম উপরি পাওনা — সে তাহা অন্বেষণ করুক, বা নাই করুক। হয়ত সেই পরীক্ষা মনে হইত, ইহাদের মূলেও একটা সত্য আছে। রাজলক্ষ্মী কি তাহাকে ভুধু বুদ্ধি দিয়া চিনিয়াছিল?—তাহার সেই চরিত্র সে ঠিকই বুঝিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাই ত সব নয়। প্রেমের সৃষ্টিতত্ত্বে অনেক যায়গা পড়া আছে যেখানে তাহা কেবল সেই একজনই জানে, ঐ মানুষটাও তাহা জানে না। সমস্ত মানুষটাকে দেখ করিয়া লইতে পারাই ভালবাসা। শ্রীকান্তের স্বভাবে রাজলক্ষ্মী এমন একটা নিভৃত সান্ত্বনা পাইয়াছিল যাহা মুখ ফুটিয়াও বলা — বুঝিলেও বা বুঝাইবার আবশ্যকও নাই, প্রাণে প্রাণেই দেওয়া। সম্ভবতঃ প্রেম বলিতে আমরা মুখ-শ্রীতিই বুঝি, তাহাই স্ত্রীপুরুষ-প্রেমের রূপ সাহিত্যের দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাও সত্য যে, বিবাহিত হউক, বা বিবাহের বাহিরেই হউক, পারস্পরিক প্রীতি বা সাদরতাই প্রেমের আদর্শ। কিন্তু এমন প্রেম বড়ই বিরল, আধখানা বা এক-তরফা প্রেমই অধিকতর বাস্তব। সেই প্রেমের স্থলে, পুরুষ অথবা নারী, একজনেই মগ্ন হয়: অপর পক্ষ যেন নিমিত্ত মাত্র — সেই প্রেমের উপলক্ষ। প্রেম জিনিসটা যেন নিজেরই একটা আত্মগত ব্যাপার — অপরের অপেক্ষা রাখে না। ইহাও সর্বত্র সত্য নহে। আমরা অন্যত্র যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা যেন ঐ নারীরই একার তপস্যা, পুরুষটা সেই তপস্যার অবলম্বন মাত্র। সেখানে ঐ প্রেম — যদি তাহা প্রেমই হয় — সম্পূর্ণ আত্মগত বটে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর প্রেমও কি অমনতর? তুলনা করিলে দেখা যাইবে, এই প্রেমও আধখানা, বা এক-তরফা হইলেও, অপর পক্ষ নিমিত্তমাত্র হইলেও, সেখানে একটা বড় পার্থক্য রহিয়াছে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে আমিয়া গড়িয়াই বরণ করিয়াছে — সেদিন সমস্ত তাহার সেই ব্যক্তিটার অনুরাগিণী হইয়াছে। একেবে, প্রেম যদি একতরফাও হয়, অপর পক্ষের একটা গৌণ, এমন কি, মূলাধার দাবীও রহিয়াছে! অতএব আমি পূর্বে মানব জীবনে প্রেমের যে একটা নিজস্ব উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সাধারণ অর্থেই সত্য — সর্বাংশে সত্য নয়। ঐরূপ একতরফা প্রেমে সর্বত্র এতটা উচ্চতর ও গভীরতর আকর্ষণ-হেতু না থাকিলেও, অনেকক্ষেত্রে একরূপ নিছক বা মূলতর আকর্ষণ থাকাই সম্ভব; পুরুষ ও নারীর অন্তিম বাস্তবিকই যৌন প্রকৃতিতে সেই কারণ প্রকট করিতে পারে।

কিন্তু থাক, বলিতেছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার আত্মদানে গভীর নিশ্চাসনে, নিজ অপরে আসন করিয়া, চিরকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছিল। সেই প্রেম একটা শক্তিরূপে — রূপান্তরের মন্ত্র — প্রথম অনাদর ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও তাহাকে প্রেমের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই। সেই প্রেমই তাহার ভরসা, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই; তাহার প্রাণ সেই ভরসা, চরণে, 'একটি নমস্কারে' চির-প্রণত হইয়া আছে। আমি সেই পুনঃ-সাক্ষাৎকারের পূর্বাবস্থার কথাই বলিতেছি — সেই অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া না লইলে, ঐ নাটক ও তাহার পরিণাম হৃদয়ঙ্গম হইবে না। আমি বলিয়াছি, সমাজ ও সংসারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া সে করিয়া লইয়াছে। শুকুকে সে মাথার উপরে রাখিয়াছে, কিন্তু সংসারও তাহার চাই — নারীর জন্মগত সংস্কার যাইবে কোথায়? আর একটা বড় সংস্কার তাহাকে পীড়িত করিয়াছে — নারীজাতির পক্ষে তাহা দুর্লঙ্ঘ্য — নৈতিক শুচিতার সংস্কার; হিন্দু সমাজে উহাই নারীর

সহীকরণের। রাজলক্ষ্মী অসতী কি সাধ্বী সে চরিত্রের পরিচয় ইতিপূর্বে আমরা করিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ শুচিতার প্রতি তাহার লোভ যে কত প্রবল হওয়া স্বাভাবিক তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। আমি এ বিষয়ে তাহার মনোভাবের কথা পূর্বে বলিয়াছি।

যেমনই অবস্থা, তখন রাজলক্ষ্মী কিশোরের পড়িবার ঘরেই, তাহার সেই অন্তরবাসী মূর্তির সম্মুখে — সেই কল্পীভূত অন্ধকারে — সহসাই পূর্ব-আত্মচরণে সহসা বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিল। এ সেই কিশোর-বিলোকীর সাক্ষাৎ নয়; এখন দুইটি মানুষই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নারী তিলিল, পুরুষ তিলিল না। পিয়ারী-বাইজী তাহাদের দেখিবামাত্র এক মুহূর্তে যেন অভিভূত হইল; সেই অন্ধকার সৌন্দর্য নয় — তেজ তাহাতেও বেশি। ইহার কারণ, দুইজনেই এখন পূর্ণবয়স্ক হইলেও — একজন নারী, আরেকজন পুরুষবয়সী বালক। রাজলক্ষ্মী যে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল, তাহার কারণ উহাই। সেই কিশোর শ্রীকান্ত তেমনই আছে, রাজলক্ষ্মী তাহার মুখটা নিজের দেখিতে পাইল; যৌবনের আনুষঙ্গিক উজ্জ্বলতা কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই ছাঁদ যেমন ঠিক তেমনই আছে। রাজলক্ষ্মী বুঝিতে পারিল, বয়সে ও বুদ্ধিতে সেই এখন জোর; তাহার সেই ঠাকুরঝির বয়স কখনও বাড়িবে না, বুদ্ধি বাড়িবে না — সে তেমনই অসহায়, তেমনই অবলা। সে যেন আবার তাহার সেই কিশোরী-জীবনে ফিরিয়া গেল — তাহার যৌবন, তাহার বাইজী-জীবন অতিক্রম করিয়া, অতীতের সেই কুঞ্জবনে, মনে-মনে, আবার তেমনি করিয়া মালা গাঁথিবার জন্য বৈটি তুলিতে লাগিল, কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া তেমনই আনন্দে অধীর হইল। প্রেমের সেই এক বিস্ময়কে — তাহার অন্তরের সেই আত্মবিস্মৃতিকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়া — সে তেমনই মুগ্ধ, তেমনই নির্বাক — তেমনই আত্মহীন আত্মহীন অর্চনা করিল। অন্ধকারে সে আবার বাস্তবে ফিরিয়া আসিল, তখন সেই প্রেম আরেক রূপ ধারণ করিল — সে যেন দুর্বিনীত বালকের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠা নারীর স্নেহ, রাজলক্ষ্মী এখানে তাহার অভিভাবিকার আসন গ্রহণ করিল। স্নেহের, মোহের, সেবার বল যে কত — কোন বন্ধন সে মানিবে না। তাহার অসহায় জাগিয়া প্রাণ যে জাগিয়া উঠে; যে এমন আত্মবিস্মৃতিপ্রবণ, অন্ধ এমন অবস্থায়, সে আজ তেমনই ভাবে তাহার পথে দেখা দিয়াছে। কিছুই ভাবে না যে, তথাপি সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় এমি বন্ধন যে আরেক জনের উপর চাপাইতেছে! রাজলক্ষ্মীর প্রাক্তন আবার তাহাকে পাইয়া বসিল — তাহার এই চিরন্তন এই ঘরের এমন সুখবঞ্চিত জীবনে এ কোন দুর্গতি থেকে হইতে আসিয়া উদয় হইল! অতীত যদি সত্যই অতীত হইয়া যাইত, তবে মানুষ কত দুঃখ হইতেই না পরিত্রাণ পাইত! রাজলক্ষ্মীর অতীত তাহার বর্তমানকে ঘোলাটে করিয়া তুলিল; সত্যবাদিনী জীবনে যে শান্তির আশা করিয়াছিল তাহা ঘুচিল; পিয়ারী বাইজীকে আবার রাজলক্ষ্মী হইতে হইল। তাহাই ঘুচিয়া সে বড় কম পাইল। অতঃপর, সেই ব্যর্থপ্রেমের বিষ-জলকেই শোধন করিয়া, তাহাতেই অমৃতপান করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায় — কখনো বা সেই বিষপাত্র সবটুকু নিঃশেষ করিয়া, এই অসহায়া, প্রেমবিচ্ছিন্না নারীর অন্তর-মনের যে অতুলনীয় শোভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই আমরা বিশ্লেষণ করিব।

(ক্রমশঃ)

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি—প্রথম, যে রচনা 'ক্লাসিক' বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায় অভিনব মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী—বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক দিবা-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব

[এক প্রকারী জার্মানির ফরাসীস্ লেখকের অদ্ভুতম প্রসিদ্ধ কবি শোপেনহাউয়ের (Schopenhauer) এক রচনার ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত হইল। ইংরেজীতে উহার নাম — Metaphysics of Love। আসল ইহার নাম লিখিত — "প্রেমতত্ত্বাদি তত্ত্বপর্ব"; প্রবন্ধটি পাঠ করিলে উহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। শোপেন হাউয়ের [illegible] যাহাতে একটি বিশেষ ধারণা বা বিশ্ব চিত্ত ভাবা রচনা করিয়াছেন। শোপেনহাউয়ের দার্শনিক চিন্তার মূল সূত্রগুলি যাঁহাদের জানা আছে তাঁহাদের পক্ষে প্রেম সম্বন্ধে উক্ত মনীষীর এই আলোচনা অধিকার সহজবোধ্য হইবে; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এইরূপ আলোচনা কম চিত্তাকর্ষক হইবে না, বরং চিন্তা-বিলাসে বড়ই নূতন বলিয়া আরও মনোজ্ঞ হইবে। জীবনে আমরা প্রেমকে যে ভাবে দেখিয়া থাকি — এবং কাব্যে নাটকে তাহা যে রূপে চিত্রিত হইয়া থাকে — শোপেনহাউয়ের সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন; কেবল সেই প্রেমের অন্তরালে তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টি দিয়া যে তত্ত্ব বা নিয়মের লীলা দেখিতে পান, তাহাই অতিশয় সুস্পষ্টরূপে এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতদূর দার্শনিক হইয়াও শোপেনহাউয়েরের রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ এমনই যে, অনেকের মতে, তিনি ও তাঁহার পরবর্তী দার্শনিক লেখক নিট্‌শে (Nitzsche) এই দুইজনেই নাকি সর্বপ্রথম জার্মান ভাষার কৃত্রিমতাকে দূরে ফেলিয়া সরলতর-শ্রী (ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষার) যোজনা করিয়াছেন।]

কবিরা প্রায়শঃ নর-নারীর প্রেম লইয়াই সম্পূর্ণ [illegible] থাকেন — ইহাই সচরাচর দেখা [illegible] নাটক বা ক্লাসিক, ভারতীয় বা য়ুরোপীয় — যাহাই হউক

না তেব — ঐ প্রেমই প্রথম ভালবাসা। মহাকাব্য বা ঐতিহাসিক, কিংবা যতপ্রকার কাব্য ও রোমাঞ্চকর কাহিনী এই পৃথিবী ধরিয়া, প্রতি বৎসর পৃথিবীর কলমের মত মুরোপের সভ্য দেশগুলিতে উৎপন্ন হইয়াছে — তাহাদের অধিকাংশের খোরাক যোগাইয়াছে ঐ এক নরনারী-ঘটিত প্রেম। সেগুলি আর কিছুই নয় — এই প্রথম ভালবাসার দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা — তাহারই নানা ভঙ্গি ও নানা ভাবের কাহিনী। আমার ঐ প্রেমেরই কাব্য-কথা যে সকল রচনার সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে সেই সকল কাব্যই পাঠক-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে — যথা, 'রোমিও ও জুলিয়েট', 'লা নুভেল এলোইজ' ও 'ফের্থার'।

রোশফুকো (Rochefoucauld) বলেন, প্রেম ভূত-প্রেতের মতই একটা কিছু, তাহার কথা সকলেই বলে বটে, কিন্তু কেহই উহাকে দেখে নাই; মিস্ট্রেসমের্ত তাঁহার এক প্রবন্ধে প্রেমের সত্যতা ও স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু উভয়েই ভুল করিয়াছেন। কারণ, ইহা যদি মনুষ্য-প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য না তাহার বিরোধীই হইবে, এবং সেই কারণে উহা যদি একটা আবাঢ়ে-গল্পও মাত্রই হয়, তাহা হইলে, সর্বযুগের কবিরা এবং একাগ্র আগ্রহে উহার চিত্র অঙ্কিত করিলেন না, সে চিত্রও মানুষ মনে প্রাণে চিরদিন এমন সমান বিশ্বাসে বরণ করিয়া লইত না; একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, কাল্পনিক, কাব্যে-আইডিয়া — যাহা সুন্দর হইয়া উঠে, তাহা সত্য না হইয়া পারে না।

প্রতিনিধির ঘটনা না হইলেও, এমন প্রায় দেখা যায় যে, মানুষের একটা ইচ্ছা প্রথমে অতি প্রবল কিন্তু সংযত থাকিলেও, কতকগুলি অবস্থার যোগাযোগে সেই এমনই দুর্দমনীয় হইয়া উঠে যে, তাহার নিকট আর সকল বাসনাই তুচ্ছ হইয়া যায়। তখন সেই এক কামনা-পরিতৃপ্তির জন্য, সে আর কোনদিকে তাকাইতে না। আকর্ষণ শক্তি ও এলাএলার লক্ষিত সকল সাধা বিঘ্ন সে জয় করে; সেই প্রেমকে সফল করিবার জন্য জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে; যদি কোন আশা নাও থাকে, তবে প্রাণান্তেও সেই নিষ্ফলতার সঙ্গে বিসর্জন দেয়। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের পুলিশ-রিপোর্টের সংবাদ যাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার এই কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন। আমাদের অনেকে ঐ প্রেমের তাড়নায় উন্মাদ হইয়া যায়। প্রতি বৎসর কোন না কোন এমন ধরণের ঘটনাও ঘটে যাহাতে, প্রেমিক-প্রেমিকা দুইজনেই আত্মহত্যা করে — সমাজ, রাষ্ট্রিতির অবস্থা তাহাদের বিবাহের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া ই দাঁড়ায়াছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটু আশ্চর্য বোধ হয় এই ভাবিয়া যে, এইরূপ প্রেমিকযুগল — যাহারা পরস্পরের ভালবাসা সম্বন্ধে এতই নিঃসংশয় এবং সেই ভালবাসার অনুরোধেও সুখ ভোগ করিবার আশা ছাড়ে — তাহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা না করিয়া সেই জীবন সুখের জন্য সকলের চোখেও ধুলা দিয়া গোপনে ঘর করে না কেন? যে টমাসো ভালবাসার দুইজন আমরা দু' পথে যাই নিত্যই দেখিতে পাই, এমন কি, যদি ধরা খুব বেশি না হইয়া থাকে, তবে আপনাদের জনের মধ্যে তাহা অনুভব করিয়া থাকি।

এই যে কথাগুলি এ পর্যন্ত উত্থাপন করিয়াছি, ইহার পর প্রেমের বাস্তবতা বা গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন তর্কের কথা চলিবেনা। অতএব, যে বিরাট যাঁহার সম্বন্ধে এতদিন এত কথা বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে, একজন দার্শনিক যে কিছু বলিতে চাহিবেন, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত না হইয়া বরং উল্টা কারণেই বিস্ময় বোধ করা উচিত; তাহা এই যে, মানুষের জীবনে যে সত্যটির প্রভাব ও প্রাধান্য এত অধিক, যাহা অনেক

...ষের মানুষের ভাগ্য বিধাতা হইয়া থাকে — সেই প্রেমের তত্ত্ব ও স্বরূপ কোন দার্শনিক আলোচনার বিষয় হয় নাই।

দার্শনিক প্রবর রোঁসো অবশ্য এই প্রেমের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহার দুইখানি গ্রন্থে - Symposium ও Phaedrus; কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই গল্প-গল্প, কিছুটা যেন বিতণ্ডাপ্রিয় শিক্ষার শ্রেণীতেই পড়ে — তাহাও গ্রীক দুইখানির সম্পর্কে। কাণ্ট (Kant) তাঁহার এক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহা যেমন হয় নয়, তেমনই যুক্তিপূর্ণও নহে। অন্যান্য কাণ্ট তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে প্রেমের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ভুল, তবুও প্রথমে যে তিনি ঐ বিষয়টির কিছুতে প্রবেশ করেন নাই, এজন্য তাঁহার ঐ বিচার কতকটা অসার্থক হইয়াছে। সর্বশেষে, প্লাটনের (Platner) তাঁহার Anthropology-নামক গ্রন্থে ইহার যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যেন নীরস তেমনই পাণ্ডিত্যহীন।

পাঠকের কৌতূহল উদ্রেকের জন্য আর এক দিক দিয়া আমার সেই মতটি স্মরণ করিতে বলি — Amor est titillatio, concomitante idea causae externae'।* তিনি ইহাতে প্রেমের যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার সরলতা প্রায় বালকোচিত।

আমার অভিপ্রায় অন্যরূপ — আমি পূর্ববর্তীগণের কথার প্রতিবাদও করিব না, তাহার দ্বারা আমার মতের সংশোধন বা পরিবর্তন করিব না। বিষয়টি সম্পূর্ণ বাহির হইতেই আমার মনের উপরে ক্রিয়া করিয়াছে এবং আপনা হইতেই আমার মূল দার্শনিক চিন্তাধারার একটা অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমার এই আলোচনা সেই সকল পাঠক ও পাঠিকার মনঃপূত হইবে না — যাঁহারা এইক্ষণে ঐ প্রেমের নামের রোমান্স খাইতেছেন এবং সেইহেতু অতি মহান ও বিরাটমনার জন্যই তাহা প্রত্যাশা করিতে চাহিবেন। তাঁহাদের নিকটে আমার এই তত্ত্বকথা অতিশয় স্থূল দেহসর্বস্ব বলিয়াই মনে হইবে — সেই তাঁহা অতীন্দ্রিয় ও পারিবত্রাধ্যক্ষিক হউক।

আমি প্রথমেই তাঁহাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই; ঐ যে মানব বা মানবীটিকে আপনারা এত গানে, এত কবিতায় বন্দনা করিতেছেন না — আচ্ছা, যদি তিনি আঠারো বৎসর পূর্বে জন্মিতেন, তবে আপনারা কি এমনই করিয়া তাঁহার বন্দনায় মাতিয়া উঠিতেন?

প্রেম যেমনই হউক — আদৌ সেই এক যৌন-প্রবৃত্তির সহজাত সংস্কার হইতেই তাহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রেম ঐ প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে; তফাৎ এই যে, সেই যৌন-প্রবৃত্তিই একটু বিশিষ্ট কারণের, একটু বিশিষ্ট প্রকারের — এবং সম্ভবতঃ, আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে — ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বারা অভিমাত্রায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকাশ পায়। এই কথাটি মনে রাখিয়া, এখনে মানুষের জীবনে প্রেমের স্বরূপের কলাকল ও বিচিত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। শুধু কাব্যে নাটকে নয়, বাস্তব জীবনেও বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন ধারায় ইহার কারসাজির কি শেষ আছে? যখন ভাবি যে, অনুরাগীর সমগ্র মুগ্ধ-আশাতীর ভাবনা-কামনা, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে এই প্রেমই অনুক্ষণ অধিকার করিয়া আছে, এবং ইহাই মানুষের সর্ববিধ কর্ম-প্রচেষ্টার শেষ বিশ্রামস্থল; জগতের বৃহত্তম ব্যাপার হইতেও ইহার অন্তত প্রভাব পড়ে; অতিবড় মনীষিদের মস্তিষ্কও ইহার বশে

---

* অর্থাৎ 'প্রেম একটা কণ্ডুয়ন, সহিত্ত কারণের অনুরূপ অন্তঃ-সংবেদনা'।

সাময়িকভাবেও বিকারগ্রস্ত হয়; দার্শনিকের তত্ত্ব চিন্তাপূর্ণ পাণ্ডুলিপির মধ্যেও যেমন, রাজমন্ত্রীর অভিসন্ধি জরুরী সরকারী কাগজপত্রের মধ্যেও তেমনই, প্রেমপত্র বা প্রেমিকার কেশগুচ্ছ লুক্কায়িত থাকে; অভিসন্ধি কুটিল চক্রান্ত, তীক্ষ্ণ অন্তর্দাহের কেমন করিয়া দমন করিতে হয় তাহাও সে জানে, আবার ঘুমিবিড় ও দুরূহ আত্মীয়তাবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়াও তাহারই নিত্য কর্ম; মানুষ তাহারই কাছে, তাহার জীবন, প্রাণপ্রিয়, ধনসম্পদ, পরমবাসনা এবং অন্তরের সুখ অনায়াসে বিসর্জন করে; যে স্বভাবতঃ দাসুই ছিল, তাহাকে ঐ প্রেম শাসিত করিয়া তোলে; যে কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করে নাই, সেও উহার প্রয়োজনের মোহময় বিশ্বাসঘাতকতা করে; উহা যেন একটা দৈশোচিক শক্তি, উহার একমাত্র কাজ — জগৎসংসারের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করিয়া দেওয়া, যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই ধ্বংস করে; এই সব কথা ভাবিয়া দেখিলে, স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে, "এই তোলপাড় কেন? এই ছিঁড়, এই হানাহানি, এই হুঙ্কার ও হাহারব, এই দৈব-দুর্ঘটনা কিসের জন্য? একটা অভিসামান্য বস্তু মানুষের সুখময় জীবনে এমন সব বিপ্লব ঘটাইবে কেন?" এ জিজ্ঞাসা যদি গভীর ও আন্তরিক হয়, তবে জিজ্ঞাসুর মনে উহার উত্তরও ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইবে। ব্যাপারটা আদৌ তুচ্ছ নয় — বরং সর্বাপেক্ষা গুরুতর। প্রেমের তাড়নায় যাহারা এমন সকল দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসিক কর্ম করিয়া থাকে, তাহাদের সেই আচরণ ঐ প্রেমনামক প্রবৃত্তির স্বভাবের তুলনায় কিছুমাত্র অতিরিক্ত নয়। কারণ, প্রেম-ঘটিত যতকিছু ব্যাপার — বিয়োগান্তই হৌক, বা মিলনান্তই হৌক — তাহার মূলে যে উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনসাধনের অভিপ্রায় আছে, তাহা মনুষ্য-জীবনের আর সকল উদ্দেশ্যের উপরে; অতএব উহার অনুসরণে মানুষ যে প্রাণান্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা কিছুমাত্র অকারণ বা অসঙ্গত নহে।

আসলে প্রেমের কাজ বড় সহজ নয়, সে কাজ — পরবর্তী বংশধরগুলির জন্ম ও জাতি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। আমরা যখন এই কথাটুকু স্মরণ করিয়া যাইব, তখন এই ব্যাপারটিকথানির পাছে-পাছে আসিয়া হাজির হইবে, এত বড় সমস্যার সমাধান করিয়া দেয় — ঐ অতিসম্ভব তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র একটা প্রেমের আত্মারাতি? ঐ সামান্য যৌন-সংস্কারই যেমন ভবিষ্যৎ বংশের সম্ভাবনার কারণ, তেমনই, সেই বংশের ব্যক্তিগুলির প্রকৃতি বা চরিত্র কেমন হইবে তাহা নির্ভর করে ঐ প্রেমের উপর; অর্থাৎ প্রেমের ব্যক্তিগত পিপাসা-নিবারণের জন্য যে কেমন সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছিয়া লয়, তাহার উপর। অতএব ঐ প্রেমই সেই ভবিষ্যৎ সন্ততির চরিত্র, নিয়তির মত নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহাই হইল সমস্যাটির একেবারে গোড়াকার কথা।

প্রেম যে এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হইয়া বোধ হয়, তার কারণ, যে ব্যক্তিটি প্রেমাক্রান্ত হয়, তাহার নিজের সুখদুঃখের সঙ্গে ঐ ঘটনাটির কোন সম্পর্কই নাই — আর সকল ব্যাপারেই সেই সম্পর্ক থাকে, কেবল ঐ একটা ব্যাপারে ব্যক্তির নিজস্ব কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ভবিষ্যৎ কালের মানব-মানবীর জন্ম ও তাহাদের জাতি-প্রকৃতির ব্যবস্থা করাই প্রেমের একমাত্র অভিপ্রায়; এই জন্যই ব্যক্তির ব্যক্তিগত কামনাকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর গোষ্ঠীর কামনা তাহাতে প্রবল হয়, ব্যক্তির কামনাই একটা বৃহত্তর আকার ধারণ করে। এইজন্যই প্রেমঘটিত সুখ দুঃখ এমন বিরাট, এমন সর্বাশ্রয়ী হইয়া উঠে — সে সুখও যেমন, সে দুঃখও তেমনই একটি অসীমতার ব্যঞ্জনা লাভ করে; এবং কবিগণ দুহাতে ধরিয়া সেই অপূর্ব রসাস্বাদের বিচিত্র রাগিণী গাহিয়া শেষ করিতে পারেন না। আর কোন রস মানুষের প্রাণকে এমন আবেশ-বিহ্বল করিতে পারে

না ; এই জন্যই যে-নাটকে প্রেমের প্রতি কোথাও নাই সেই নাটক নীরস হইতে বাধ্য ; আবার অনেক নাটকে প্রেমের এত ছড়াছড়ি দেখও, ঐ জিনিষটা কিছুতেই পুরাতন হইয়া উঠিল না।

মানুষের সাধারণ কামনাকে যদি বাঁচিবার কামনা বলা যায় এবং সেই কামনাই যৌন-ক্ষুধা-প্রবৃত্তির আকার ধারণ করে, তবে যে-কামনা শুধু বাঁচিবার কামনাই নয় — যাহাতে ঐ যৌন-লিপ্সাই একটা নির্দিষ্ট অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তির রূপে আবির্ভূত হইবার প্রবল কামনায় পরিণত হয় — সেই কামনাই প্রেমের রূপ ধারণ করিয়া কোন একটিমাত্র ব্যক্তির দিকেই ধাবিত হয়। অনির্দিষ্ট একটা নারী বা নারীকেই কামনা করে নাই, যেন তাহারই রূপে রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, যেন নিজের জন্য পূর্ণ হইতে কোন প্রয়োজন ছিল না — ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পর-ঘটিত, কিছুতেই আত্ম-ঘটিত নয় — এইরূপ একটা ভাব প্রবলভাবে প্রেমিকদম্পতীরই প্রেমের আকৃতি করে ; কিন্তু আসলে, প্রয়োজনটা সম্পূর্ণ আত্ম-ঘটিত তাহার নিজের জিনিষটা একটা খুব বড় প্রয়োজনের তাগিদে রহিয়াছে। সেই তাগিদটা কিসের ? একটা বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট সন্তানের জন্মদাতা হইতে হইবে — নিজের অগোচরে এই প্রয়োজন-বোধটি অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। ইহার লক্ষণের বড় প্রমাণ এই যে, কেবল উহাকে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত হয় না, সেটার উপরেও স্বত্বাধিকার চায়।

প্রণয়িনীকে যৌতুক অধিকারে না পাইয়া অনেক প্রণয়ী আত্মহত্যা করিয়াছে। অপর পক্ষে, এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন প্রণয়ী তাহার প্রিয়তমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, কিন্তু সেই ভালবাসার প্রতিদান সে পায় নাই, তবুও তাহাকে পত্নীরূপে অধিকার করিতে পারিয়া সে কৃতার্থ হইয়াছে (জোর করিয়া বিবাহ, অথবা নানাপ্রকারে ভুলাইয়া নারীকে স্বপথবর্তিনী করার কারণ ঐ একই প্রেম দেখা যায়, সেখানে মেয়েদের পুরুষের ভালবাসা গ্রহণ করে নাই, সেখানে পুরুষ তাহার প্রণয়প্রার্থীর বিরক্তি সত্ত্বেও নানাবিধ উপঢৌকন — বেশভূষা ও অলঙ্কারের দ্বারা, এবং তাহার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, সেই রমণীর প্রেমে লাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকে।

প্রেমের বহুবিধ রোমাঞ্চকর মাহাত্ম্যলীলা—তাহার মূলে আছে (অবশ্য প্রেমিক-প্রেমিকার অজ্ঞাতসারে) দৌ- এক উদ্দেশ্য — একটি অতিশয় বিশিষ্ট প্রকৃতির মানবসন্তানকে এই মর্ত্যের সংসারে ভূমিষ্ঠ করা। কেমন করিয়া, কি উপায়ে তাহা হইবে, সে সকল ব্যাপার অতিশয় গৌণ। যাহারা প্রেমের গোপনীয় খেলায় বিভোর হইয়া আছেন, এবং প্রেম-সম্বন্ধে যাঁহাদের হৃদয়ে ও কণ্ঠে যথা যথা কবিত্বময় ভাবের উৎসার হইয়া থাকে তাঁহাদের নিকটে আমার এই কথা যদি অশ্রাব্য ও রুক্ষ হইত — তাঁহারা নিজেরাই জানেন। আসল কথা, ভবিষ্যৎ মানবের ঠিক-ঠিকানার সন্ধানটা — তোমাদের ঐ ভাবের ঘোরে বুদ্ধিদানবটা, আকাশের গায়ে অঙ্কের তুলি বুলানোর চেয়ে ঢের বেশি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বেশ দেখি, মরতে হইবে চের বড় প্রয়োজন আর কি থাকিতে পারে ! যদি উহার মূলে ঐ মহত্তম অভিপ্রায়টি না থাকিত, তবে প্রেম বলিতে যে গভীর দুর্বোধনীয় ভাবনা বুঝায়—তাহাতে বেপ্রয়োজনিক আকুলতা প্রকাশ পায়, এবং অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তুও অসাধারণ বলিয়া মনে হয় — তাহার কি কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত ? প্রেমের জন্য মানুষ যে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, এত বিপদ মাথায় পাতিয়া লয় — তাহার একমাত্র কারণ প্রেমের প্রকৃত প্রয়োজন অতি গভীর, অতিশয় মহৎ। দুইজনের মধ্যে যে অনুরাগ ক্রমেই গভীর হইয়া উঠে, তাহা আর কিছুই নয় — একটি নূতন জীবের জন্য কামনা ; সেই জীবটির জনক ও জননী হইবার জন্য

কিন্তু হইতে যে অজ্ঞান-আলো, তাহাকে কবি-প্রতিভা সজ্ঞান আলোকের নাম দেয়। ঐ যে দুইটে চা চোখের আকুল দৃষ্টি-বিনিময়, উহাতেই একটি নূতন জীবের জীবন-পুতলি মূর্তি হইয়া উঠে — সেই জীব একটা বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করে। প্রেমিক-প্রেমিকার বড় ইচ্ছা হয়, দুই দেহ এক হইয়া এই জীবন যাপন করে; সে কামনা ঐ সন্তানের দ্বারাই পূর্ণ হয় — উভয়ের শুভ-লোভ সন্তানের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়, এবং তাহার লাভ করে। যদি অবশ্যটা ইহার বিপরীত হয়, অর্থাৎ ঐ নারী এবং পুরুষ কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়, পরস্পরের মধ্যে একটা বড় বিদ্বেষ বা মনের অমিল পড়ে, তাহার অর্থ আর কিছুই নয় — সন্তানটির প্রকৃতি বড় একটু বেয়াড়া রকমের হইবে, কিম্বা কিছুর স্বভাবের ঠাকাঠুকি লাগিবে, বেয়াড়া জীবনে বড়ই অসুখী হইবে।

ঐ যে প্রতিটি একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে উহার চরিত্র ও চিত্তের দুইটা পিতার অনুরূপ হইবে, এবং বুদ্ধি ও হৃদ্যতির যেটিকু দোষ-গুণ মায়ের মত হইবে। যেমন আকারটা ছোটবেলা মত; কিন্তু দেহের গঠনটা পিতার মত এবং উচ্চতা মায়ের মত হওয়াই নিয়ম — পশুদের মধ্যেও ঐ নিয়ম দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি তাহারই মত — আর কেহ সেরূপ নয়; এই ব্যক্তিত্বের রহস্যও যেমন কেহ কখনো বুঝে, তেমনই দুইজন নর-নারীর পরস্পরের প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ হয়, তাহারও কারণ কেহ নির্ণয় করিতে পারে না, তাহাও তেমনই ব্যক্তিগত, তেমনই অসাধারণ।

ঠিক যে মুহূর্তে, একজন পুরুষ ও একজন নারী পরস্পরকে বড়ই মিষ্ট মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে — ইংরেজরা তাহাদের ভাষায় যাহাকে বলে — to fancy each other, — ঠিক সেই মুহূর্তে একটি নূতন ব্যক্তি-জীবের অঙ্কুরলীলা সুরু হইয়াছে মনে করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যখনই দুইজনের পিপাসা-তাড়িত আত্মা মিলন হয়, তখনই সেই নূতন মানবজীবটির জীবোদ্গম হইয়াছে বুঝিতে হইবে; অন্যান্য জীবরাশির মত সেই জীবও প্রায় বিনাই হইয়া যায়। এই নূতন ব্যক্তি-সৃষ্টি কতকটা প্লেটোর সেই এক-একটা পূর্ণত ভাবময় সত্তার মতই (Platonic Idea); ইহাও সত্য যে, অনন্তকাল রূপের জগতে প্রবেশ করিবার জন্য সকল প্রাণীরা ঠেলাঠেলি করিতেছে; এবং বিশ্বশিল্পের মহাযন্ত্রে যে হাতুড়ি চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে — ঐ জীবগুলি কি আকুল আকাঙ্ক্ষায় তাহার একটা আঘাত আসিয়া শরীরী হইতে চায়! সেইজন্য এই অসীমের বিশিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রই বলিতে গেলে ভাবময়-মূর্তি (Idea) বৈকি। তাহাও সকল হইতে রূপের জগতে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তেমনই ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই যে আকুল বাসনা বা উগ্র আকাঙ্ক্ষা — ইহাই জীবী জগৎ-জননীর চিত্তে ঐ প্রেমের চক্ষুরূপ ধারণ করিয়া মেন মাতামাতি করিতে থাকে।

এখন বুঝিয়া দেখ, এ যে কিরূপে যাহাকে আমরা প্রেম বলিয়া থাকে; ঐ আসক্তির ব্যক্তির ব্যক্তির অর্থাৎ তাহার স্বতীয় প্রকৃতি যত অসাধারণ বা অসাধারণ হইবে — তত্ই ঐ প্রেম প্রবল আকার ধারণ করিবে; অর্থাৎ, প্রেমের পাত্র বা পাত্রীটি প্রেমিকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বাসনা চরিতার্থ করিবার পক্ষে যতই উপযোগী হইবে, ততই সে তাহার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। আর একটু চিন্তা করিলেই, একথার অর্থ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অনুরাগ মাত্রেই এই দুইটি বস্তুর উপরে নির্ভর করে — স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য; অর্থাৎ যৌবন চাই। ইহার কারণ, সৃষ্টির মূলে আছে যে কাম রহিয়াছে, তাহাকে ভক্ত-বাসনা বা বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বলা যায়, তাহা জীবের আত্মিক শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের

আকার করিতে চায়। উৎসবের, আমাদের যে প্রেম-বিকার, তাহাতে দুই পক্ষের দুই ব্যক্তির অর্থাৎ প্রেমিকের যেগুলি বিশেষত্ব গুণ — সেইগুলিই যেন ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়, অর্থাৎ একে অপরের পূর্ণতা সাধন করে। মানুষের বুদ্ধি ও বয়সের চরিত্র হিসাবে মিলিয়া সেই ভবিষ্যৎ মানুষটির ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া তোলে। সৃষ্টির সেই সার্বজনীন তৎপরতাই ব্যক্তির রূপে এমন চরিতার্থ হইবার সুযোগ চায় বলিয়াই, ঐরূপ স্থলে প্রেমীর প্রেমাবেগ অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে; আবেগে, ব্যাপারটা ত ব্যক্তির সুখদুঃখের ব্যাপার নয়, সেখানে একটা বৃহত্তর শক্তি, সৃষ্টির বৃহত্তর অভিপ্রায় মূর্তিমান হইয়া উঠে বলিয়া, ঐ প্রেম এমন মহান ও অভিজাতীয় রূপ ধারণ করে — মানুষের ক্ষুদ্র লাভ-লোভ, বিদ্যা জ্ঞান-বুদ্ধির হেতাহেতু বিবেচনা সহজেই পার হইয়া যায়। তাহা হইলে, প্রেম যেখানে সত্যই একটা সর্বগ্রাসী কামনা হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে তাহার কারণ আর কিছু নয় — ব্যক্তির কামনাতে একটা বৃহত্তর কামনা অভিভূত করিয়াছে। দুইটি নর-নারীর একজন অপরের প্রাণ-মন-দেহের প্রয়োজন যত বেশী করিয়া মিটাইবার উপযুক্ত হয় — একে অপরের 'রাজ-যোটক' হয় — তবেই পরস্পরকে পাইবার কামনা প্রবল হইয়া উঠে। দুইটা মানুষ কখনও সর্ববিষয়ে সমান হইতে পারে না, কাজেই একজনকেই চাই; এক নারীর পুরুষও একটি আছে, দুইটি নাই; ঐরূপ না হইলে সেই কাঙ্ক্ষিত সন্তানটির ব্যক্তি-রূপে জন্মলাভ নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত হইতে পারে না। দুইজনের এমন 'যোটক' প্রীতিই যেন না বলিয়াই, সহজাত — অভিনব ও দুর্লভ — প্রেমের দৃষ্টান্ত এমন বিরল। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া রাখি — ঐরূপ প্রেমের সংঘটন বাস্তব জগতে সর্বদা সম্ভব না হইলেও, আমাদের হৃদয়ে ঐরূপ প্রেমের বাসনা সকলেরই আছে, এই জন্যই কবিরা নাটক-নভেলে যে সব প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

আমার শেষ, ঐরূপ সন্তান-জন্মের প্রয়োজন বা তাগিদ যেখানে নাই, সেখানে সহজাত ঐ প্রেমের আবেগও বিদ্যমান না থাকাই স্বাভাবিক। এইজন্য যৌন-আকর্ষণ ব্যতিরেকেও পুরুষ ও নারীর অন্য একরূপ বন্ধুতা জন্মিতে পারে; দুইজনেই যুবক এবং যুবা বয়সী — আনন্দ-প্রকৃতি এবং ভাবুকতা বা চিন্তা-শক্তিতে দুইয়ের মধ্যে যেন একটা সমপর্যায়তা আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ যৌন-আকর্ষণের উদ্রেক হয় না; যদি সে বিষয়ে পরস্পরের প্রতি যেন একটা বিরাগই সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাও আমার ঐ প্রেম-তত্ত্বের পরিপোষক। ঐ যে প্রেম-তত্ত্বের সঞ্চার হয় না, তাহার কারণ, মনের একরূপ মিত্রতা থাকিলেও উভয়ের পুরুষ প্রকৃতিতে সেইরূপ গুণময়ী নাই যেগুলির সমন্বয়ে আর একটা নূতন ব্যক্তির জন্মলাভ হইতে পারে।

আমার ইহার বিপরীত দিকটাও আছে, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে মানসিক বা চারিত্রিক কোন প্রকার মিল নাই, এবং সেজন্য প্রীতির অভাব, এমন কি বৈরভাবও অসম্ভব নয় — কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও প্রেম জন্মিতে পারে। এই প্রেম সর্ববিষয়ে অন্ধ; তাহার ফলে যদি বিবাহ হয়, তবে তাহা অতিশয় অসুখকর হইবারই কথা।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ-দর্শন

এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। যেটি যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায়পূর্ব্বক তাহা অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ত্তার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপূর্ব্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এতদিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুঃখে ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্ত্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্য সদুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য। সেখানে বলই ধর্ম্ম।

— বঙ্কিমচন্দ্র (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

বাংলা ও বাঙালীর দর্শনীয় উদ্যানসমূহের ভগ্ন দেউল তাঙা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে, এখনে আর নিস্তার নাই, উদ্ধার হইতেই হইবে। সবার পিঠেরটা হইয়া উঠিবে না, কিন্তু তাহা ত' বাঙালী মিছেই দিতে পারে না — বিধির ভয় পিঠোয়ার মনহারীর অভাব হইবে না। উহাদের যতগুলি সঙ্কট ছিল তাহার প্রায় সবগুলিই কাবার হইয়াছে — অন্নসঙ্কট, বস্ত্রসঙ্কট অবশ্য সঙ্কটের মধ্যেই গণ্য নয়; বিদ্যা-সঙ্কট বহুদিন পূর্ব্বেই ঘুচিয়াছে; স্বাস্থ্যেরও যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে চিকিৎসা-সঙ্কট আর থাকিবেই না। এ সকলের জন্য আমাদের কুল-পুরোহিতগণ অহর্নিশ স্বস্ত্যয়নে রত আছেন, জলাপড় উদ্বন্ধ উদ্যম মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। কৌশিক মন্ত্র, কৌশিক উদ্যমীর — তালে চলনের কৌটা; মধ্যে কুশনের আসন, অর্থাৎ কুশাসন, যোগ-পট্ট সাধী ও সরল ছাদা সুবর্ণের দক্ষিণা— সঙ্কটত্রাণ-যজ্ঞের আয়োজন উপকরণে কিছুমাত্র ত্রুটি কোথাও নাই। কিন্তু এই স্বস্ত্যয়নের দ্বারা সাম্প্রতিক নবজন্মলাভ ও নবসংসেবক-দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া উঠিলেও, একটা সঙ্কট যেন সহসা দেখা দিয়া উঠিয়াছে। সঙ্কটমোচনে তাহাকে রাখা যাবে, এ সঙ্কট কিন্তু একপ্রকার সুখ সঙ্কট — তেমন উহা দূর করিতে একটু সময়ের প্রয়োজন। কোথা সঙ্কট কিনা? সঙ্কট হইলে কি হয়, বড় আরামের সঙ্কট! আপনারা ভাবিতেছেন সে আবার কি? সে নিজেরাই বোঝানীর মত হইব! একটু মনুর কথা, অত ভাঁজিতে হইলে চলে কি! আপনারা কি দুঃখে কাঁদেন নাই, সুখে কাঁদেন নাই! সুখও যে কতখানি বিপজ্জনক হইতে পারে, এত নাটক-নভেল পড়িয়া, এত সিনেমার ছবি দেখিয়া এখনও তাহা বলিয়া দিতে হইবে?

...ছাই। ...ছাড়ে ...ছাড়ে ...ছাড়ে

হইবে ঐক্য চাই : সে ঐক্য, আর কোনখানে নয় — ঐ থাকো বসতি করে। বাঙালী সেই ঐক্যের জন্য তাহার বাঙালীত্বের সমস্ত বিসর্জন দিয়াছে, তবু ঐ একটা এখনও বাকী আছে। সেই ঐক্য — মহাভারতীয় ঐক্য — কেবল একটির জন্য বাধা পড়িতেছে. অমিল আর সবদিকে উহাকে ঐক্যটিকে যাবে কার সাধ্য! সাম্রাজ্যতন্ত্র উহার যে তাণ্ডব সুরু হইয়াছে তাহাকে ঐক্য-তাণ্ডব নামে নটরাজের এক নূতন তাণ্ডব বলা যাইতে পারে। এখন সেই ঐক্যটি বজায় রাখিবার জন্য বাংলাভাষা লইয়া পণ্ডিতদের ভাবিবার জন্য নাই। উঁহাদের মধ্যে একজন আমেদ যাঁহার ভারত-সত্য প্রায় একটুতেই ক্ষেপিয়া উঠে; 'হিন্দু-হিন্দু-হিন্দী' — ইহাই হইল তাঁহার ইষ্টমন্ত্র। বাঙালী হইয়াও তিনি তাঁহার বাঙালীত্বের জন্য মনে মনে বোধ লজ্জিত; বাংলাকে কিছুই তিনি প্রকাশ্য মোক্ষ বলিয়া মনে করেন না; তাহার সব-কিছুই — এমন কি পাক-দিয়াঁ পর্যন্ত — যতটুকু ভারতীয়ত্বের, ততটুকুই তিনি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন, ততটুকুই তাঁহার নিকট উপাদেয়। তাঁহার এই মনোভাবের কথা আমরা জানি, এবং ঐরূপ মতাবলম্বীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মানিয়া লইয়াছি। ইহাও জানি যে, ঐরূপ মতাবলম্বী তাঁহার অন্যান্যদের সাথে, তাহাতে কোন সরকার মাথাব্যথা নাই। বাঙালীর অনেই এখন পিতৃদর্শনকারী পুত্রের জন্য হয়, যেমন পুত্র প্রয়োজনও হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া, তিনি যে তাঁহার ঐ মনোভাব এমন করিয়া, হিন্দীর হিতার্থে বাঙালীর উপরে চাপাইবেন, ইহা সহ্য করি কেমন করিয়া! প্রথমতঃ, হিন্দীই যে এতবড় রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত — এতবড় একটা বিশাল মহাদেশের যুক্তরাষ্ট্রে. অর্থাৎ সমবায়-যুগের (Federal) রাষ্ট্রে, একটার বেশি রাষ্ট্রভাষা থাকিতে পারিবেনা, এ কেমন যুক্তি! যাহারা ছুতা মানিয়া হিন্দী চাপাইবে তাহাদের কথা ধরুন তাহারা ত' একটা হিন্দী বা মেকি-রাম স্বার্থের জন্য, অমিলের নির্লজ্জভাবে তাহাদের কুতার্থতা-লাভের জন্য, অমিলের অপব্যবহার করিতেছে। তাহাদের প্রতি প্রত্যেক ইজ্জত-সম্পন্ন ভারতীয় তাহার (অর্থাৎ, প্রাদেশিকতা) অশ্রদ্ধা হইবারই কথা। বাঙালীর প্রতি ঐ বিহারী ও যুক্তপ্রান্তী—ভগবানের 'chosen people' — যে ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে, এবং তাহারই সমর্থনে, কেন্দ্রীয় সরকারও তাহার প্রতি যেমন ঔদাসীন্য করিতেছে, তাহাতে, বাঙালীর মেরুদণ্ড বলিয়া যদি এখনও কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা একটু খাড়া হইবারই কথা; যদি না থাকে, তবে অবশ্যই 'সবকো সন্মতি দে ভগবান' বলিয়া সে মহাকাব্যে ঢুকিয়া থাকিয়া স্বচ্ছন্দের মত ছটফটি করিবে। সত্যই সে যেমন ঐক্য—যেমন সমানাধিকার যা দান কিংবা সমমর্যাদা — যাহার জন্য সে তাহার রাজেন্দ্রাণী-তুল্য ভাষার শাখী, কিংবা তাহার প্রাচীন ও গুরুতর বর্ণলিপি পরিত্যাগ করিবে! কেন করিবে! কাহার জন্য করিবে! হিন্দীর আছে কি! তাহার ত' ভাষা-স্বরূপও এখনও ঠিক হয় নাই। কয়লী তাহার মত lingua franca হইবার যোগ্যতা তাহার আছে! আসল বুলির খানে-আনা ত' আরবী-ফারসী; তাহাকেই এখন সংস্কৃত-ঘেঁষা করিয়া এবং সংস্কৃতের মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে সে যে রূপটি খাড়া করিতেছে, তাহাই তাহার ভারতীয়ত্ব, এবং পরে আর্দ্ধ ভাষা হইবে! যে 'বাজারে' বা 'চালু' হিন্দীর দোহাই দিয়া উহাকে এখন রাজপাটে বসানো হইতেছে, তাহা ত' একটা সাময়িক সুবিধার মাত্র; পরে যখন তাহার ঐ সংস্কৃত-ঘেঁষা চেহারাখানি বাহির করিয়া সে তখন 'চালু' থাকিবে না, সকলের তালুতে — ব্রহ্মতালুতে — উঁকোটিয়া বসিবে, তখন তাহাকে ঠেকাইবে কে! যে রূপের আস্বাদেই শিখিতে হয়, সেই রূপের পরিশ্রম করিয়া আর সকল ভাষার সেরূপই চেষ্টা হইবে, বাংলাভাষার

যে সর্বনাশ হইবে! তার চেয়ে উর্দু যে ঢের ভালো, তার একটা ঐতিহ্য আছে।

• • •

তারপর লিপির কথা। বাংলালিপিটা বেখাপ্পা ও অবৈজ্ঞানিক কিনা? তাহার চেহারাও অমন খুড়ির নয়। বাংলার এত বড় একটা গৌরব — তাহার ঐ লিপির প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য এইবার এতদিন পরে বর্জন করিতে হইবে? ভারত-প্রাণ পণ্ডিতটি, এ বিষয়ে আরও উচ্চ মার্গে উড্ডীন হইয়াছেন: 'ফোনেটিক্স্' বা উচ্চারণতত্ত্বের মহা-সমস্যাটিকে বাগ্‌যন্ত্রে বন্দী করিয়া তিনি প্রজাপারমিতার অবস্থা লাভ করিয়াছেন। এই ভূমা তিনি বহুদিন যাবৎ ধরিয়াছেন, ইহাও একজন বৈজ্ঞানিক মহামানব-বাক্যের 'ফোনেটিক্'-কেবা; পণ্ডিতজীর যে একটা ইয়োপ-ইণ্ডিয়ানের আশ্চর্য্যে-পনা আছে, উহা তাহারই একটা উপসর্গ। ঐ লিপি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক লিপি; মাত্রাচিহ্ন চিহ্নে কণ্টকিত করিয়া উহার দ্বারা সকল ভাষার সকল উচ্চারণ প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহাতে সন্দিহানদিগের কি উহার? যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সেই চিহ্নগুলি দেখিয়া সেই সেই উচ্চারণ সকল জাতির পাঠক তাহাদের কণ্ঠে আয়ত্ত করিতে পারিবে কি? অর্থাৎ, ফরাসীদের পাশে মৃদু এবং আমার নানা চঙের পাগড়ী পরাইয়া 'ঁ'-এর বলে 'ত' উচ্চারণ করানো যাইবে কি? এমন একলিপীকরণে মূল মানব-সমাজের কি লাভ হইবে? যা হউক, আন্তর্জাতিক পণ্ডিতসম্মেলনে সকলেই দেখিতে পাইবে, ভারত কেমন সেয়ানা ও সাবালক হইয়া উঠিয়াছে! ঐ লিপির দ্বারা সকলের বাগ্‌যন্ত্র কি বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধি লাভ করিবে? না, নিজ নিজ সংস্কার বর্জন করিয়া সকলের মুখে একটা রাষ্ট্রীবিতি লাভ করিবে? তাহার উত্তরে পণ্ডিতজী হয়তো বলিবেন — এমনটা তা না করিলে একদিন করিবে, এবং সেইদিন মানবজাতি এক-বাক্য-ভাষিতে পরিণত হইবে। এখন তাঁহাদের মত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-পূত চরিত্রার্থ করিবার জন্য, সকলকেই ঐ লিপি অভ্যাস করিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, এখানে তাঁহার এক দায়ের সেই হিন্দীর — সেই দেবনাগর-লিপির তাঁহার ভারত-সত্ত্ব প্রাপ্তের বাঁচাইতে পারিল না। কিন্তু হিন্দীই হোক, আর রোমান লিপিই হোক — বাঙালী আমরা, আমাদের বিষয়টে দুই-ই সমান। আমরা কেবল ইহাই ভাবিয়া দুঃখ পাই যে, পণ্ডিতজী ভুল করিয়া এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছেন; যদি তাঁহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে কামনা করি, তিনি যেন এই হতভাগা বাংলাদেশে জন্মিয়া স্বজাতি ও জন্মভূমির প্রতি এতখানি কৃপাপরবশ হইতে বাধ্য না হন।

• • •

এই যে রোমান-লিপিতে বাংলাসাহিত্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব, ইহা কলিকাতা-বর্ষসূচীর দুঃস্পতিত্বের ফলে আপত্তিকর নয়, তবে, অনেকেই তৎপরিবর্তে, দেবনাগর-লিপির গুণগান করিয়াছেন। উহাও আর কিছু নয়, সেই হিন্দীরই পক্ষসমর্থন; বলিলে যে ঐক্য থাকে না! বাঙালীর বাঙালীত্বের যদি সকল চিহ্ন লুপ্ত না হইল (আমাদের অবস্থা ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে তাহা পূর্বে বলিয়াছি), তবে আজকের ঐক্যবিধান হয় কেমন করিয়া? দেবনাগরের ঐ লিপিটি পাইয়া সারা ভারত যখন বড় হইয়া গিয়াছিল, তাহার পূর্বেই বাঙালী তাহার নিজের লিপি নিজেই গড়িয়া লইয়াছিল। এ আস্পর্দ্ধা কি আধিকার বিনেও সহ্য করা যায়! প্রভুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত তাহার এই রাষ্ট্রপ্রাণে বাঙালীকেই যে অগ্রণী হইতে হইবে! ধর্মবৃত্তি তাহাকে করিতেই হইবে, কারণ, সমাজ যখনসবটা কেন ভাঙ্গিয়া আসিতে হইয়াছে, এবং উহিই ছাড়া আর কিছুই তাহার ছুটিবে না। তাই,

ঐক্য প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের সাধনার যে তাহাকে চতুষ্পথ বদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। হিন্দী হইবে তাহাদের রাষ্ট্রভাষা, অর্থাৎ রাজভাষা, অর্থাৎ পিতৃভাষা। বাংলাভাষার মারফতে কোন দেবকর্ম, অর্থাৎ পিতৃকর্ম, অর্থাৎ প্রভুকর্ম করা আর চলিবে না — ঐ ভাষা রাষ্ট্র-সভায়, বা রাষ্ট্রিক শাসন-বিভাগের উচ্চপদ অধিকারে, কোন কাজে লাগিবে না। না লাগুক, বাংলাভাষা ও সাহিত্যটাকে যদি ঐ বাঙ্গেরী লিপিতে ছাপানো হয়, তবে তাহাদের সকল জাহিটে উহার রূপ মুছ হইয়া যাইবে, তুয়োরও একটু খাতির মিলিবে। কিন্তু সে কেমন করিয়া? লিপি বুঝিলেই কি ভাষা বুঝিতে পারা যায়? তবশ্যই যায়; তবে আর ঐ লিপির মাহাত্ম্য কি? তা' ছাড়া বাংলা ভাষাটা যে 'চাপু' হিন্দীর চেয়ে সহজ। তবং বাঙালীর ছেলের মাতৃভাষাটাকে ঐ লিপির প্রসাদে একটু সস্তা ও সুলভ করিয়া লইতে পারিবে, সে তখন পড়িবে — "বৈরাগদাহনে মুক্তি লো হমায় মহি"। তামাসার কথা নয়; হিন্দী রাষ্ট্রভাষা, এবং বাংলার লিপিও হিন্দীর লিপি হইলে, বাঙালীর ধাত-অনুযায়ী যে কিরূপ পাকা হইয়া উঠিবে, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু উহা তো ধাত-মনোভাব নয় — উহা যে স্বাধীনতার খাঁটি দেব-অনোভাব! এতদিন বাঙালী প্রভুরই পরাধীন দাস-জাতি ছিল, তাহার জাতি-মন বড়ই নীচ ছিল, ঐশ্বর্য যে যতলোকের খানদানীগিরি করিয়া বেড়ান স্বাধীন, তেমনই উচ্চমনা হইবে।

* * *

হিন্দী হইবে রাজভাষা, আবার বাংলাভাষার অক্ষরগুলি হইবে হিন্দীর। ইংরেজী যখন রাজভাষা ছিল, তখন বাঙালীর কথাবার্তায় যদি অনেকটা পাকা ইংরেজী কথা আসিয়া পড়িয়া যাইত, তবে এবার যে তাহাতে শতকরা আশীটা হিন্দী শব্দ একেবারে অবাধে কলমে ঢুকিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই প্রসঙ্গে একটা সত্য-ঘটনার কথা বলি। সকলেই জানেন, ঢাকা-সহরে বহুদিন হইতে হিন্দুস্থানী (উত্তর পশ্চিমের) প্রভাব বিদ্যমান, তাহারও ঐতিহাসিক কারণ আছে। এজন্য ঢাকার বাঙালীর, অন্যান্য কোন কোন বিষয়ও যেমন, চেহারাই তাহাদের হিন্দুস্থানী-ছাপ আরও স্পষ্ট। উদাহরণ-স্বরূপ: সেখানকার বাঙালীরাও বাংলাভাষার মোক্ষ-বিরুদ্ধ অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, যেমন — 'মুড়ি'র স্থানে 'মুক্তি', 'কুকুর'র স্থানে "কুত্তা", 'লাড়ু'র স্থানে 'লাড্ডু', 'পায়রা'র স্থানে 'কবুতর'; এরূপ আরও অনেক। এ শব্দগুলি যে অতিশয় বিজাতীয়, তাহা বোধহয় বাঙালীমাত্রেই স্বীকার করিবেন; উহারা বাংলার প্রাদেশিক বুলি নয়, বাংলাই নয়। আবার, লিখিবার সময়ও ঐ শব্দকে লিখিতে হয়, তবে সেই লেখাতেও কোন্ না হিন্দী-ভাষা বিনা-দ্বিধায় ভাঁজিয়া বসিবে! ইহার পর, ঐ অক্ষরগুলির হিন্দী উচ্চারণ একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইবে, অর্থাৎ 'ই' 'ঈ' 'ব' প্রভৃতির হিন্দী-উচ্চারণ — শুধু বাগযন্ত্রিক নয়, দেহ-বাগযন্ত্রিক হইয়া উঠিবে; বাংলাভাষাকে লিপিগতভাবে সমাধা হইবে। এখন পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানে যেমন উর্দু-বাংলা তৈয়ারী হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গেও তেমনই হিন্দী-বাংলা গড়িয়া উঠিবে। বাংলার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের জ্ঞানালোকে এমন কথা লেখে না বটে, কিন্তু মানব-স্বভাব-ধাতে, এবং বিশেষ করিয়া, পরানুচিকীর্ষা যাহাদের অভ্যাসের সেই বাঙালীর চরিত্রে, ইহার মত ঘটিবার আর কিছু নাই। বস্তু, আমরা বাঙালীমাত্রকেই এই সর্বাপেক্ষা ভাবহ আক্রমণ হইতে এখনই আত্মরক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইতে বলি। স্বাধীনতা ভালো, হক-রাষ্ট্রও ভালো; কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ ভূখণ্ডের মতই একটা মহাদেশ, ইহাতে বহু জাতি

ধরে করে, তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে ; ভারতবর্ষ একজাতি হইতেও বেশী এককাতি-রাষ্ট্র নহে। বাঙালীকেও জানিতে হইবে, ফরাসী ইতালীর জাতির মত তাহার জাতিসত্তাও রক্ষা করিতে হইবে। কংগ্রেস এখন আসরে নামিয়াছে, বুটিশ দূর হউক — এই জাতি-মুক্তির জন্য একদফা করিয়াই সে সাম্রাজ্যবাদের বেতুক-গাছ করিয়াছিল। আজ যদি সে সর্বপ্রকারে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যনাশ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে, তবে বাঙালীকে তাহার স্বাতন্ত্র্য নিজেই রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা ও একরাষ্ট্রের জোর মুলাই তাহার পক্ষে আর নাই, সে ক্রমেই একটা দাস-জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ঐ দাসত্ব বা পরাধীনতা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় — তাহার 'স্বাতন্ত্র্যরক্ষা'। এ বিষয়ে একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের এই উক্তি স্মরণ করিতে বলি। ফ্রেঞ্চেমি যখন ফ্রান্সের Alsace Lorraine-কে লইয়া ঐ অঞ্চলের ফরাসী-ভাষে জোর করিয়া তাহাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করাইতে এবং জার্মান ভাষা শিখাইতে (এখন যেমন বিহার-কবলিত বাংলা অঞ্চলগুলিতে করা হইতেছে) চাহিয়াছিল, তখন সেই সঙ্কট-স্বাধীনতারক্ষার ব্যাপারে উক্ত লেখক এই কথা-সত্য বলী অমর করিয়াছিলেন — "When a people is enslaved, so long as it retains its language, it is as if it had the key of its prison", অর্থাৎ "কোন জাতির যদি স্বাধীনতা যায়, তবে যতদিন সেই জাতি তাহার মাতৃভাষাকে ধরিয়া থাকিতে পারে, ততদিন ঐ কারাগার খুলিবার চাবিটা তাহার হাতেই থাকে।" অতএব, এ সঙ্কট যদি আমরা এখনই ঠেকাইতে না পারি, তবে বাঙালীর আর কিছুই থাকিবে না। ইহার বড় বিপদ আর কি হইতে পারে? যে বাঙালী — তিনি যত বড় পণ্ডিত, বা যত বড় নেতাই

ঐ সম্পর্কে ঐ মহাপণ্ডিত-সভাতে একটা বড় উঁচু কথা শোনা গিয়াছিল — মানুষের ঐ সকল ঐতিহ্যের ব্যাপারের 'sacred' বা পবিত্র বা অন্যান্য বলিয়া কিছুই নাই। এরূপ বেপরোয়া মনোবৃত্তির লক্ষণ! যে বড় পণ্ডিত যাহারা তাহাদের নিজেই 'sacred' বলিয়া কোন বস্তুর যে কিছুমাত্র মূল্য থাকিতে পারে না। আহা, এমন পণ্ডিত যা ভক্তিলে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" হইবে কেন? এমন কথা কি করি, তাহি বা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিতে পারিয়াছে! পণ্ডিতও আবার কেমন পণ্ডিত! আফিকার এই বাঙালী-সভাতেই অবশ্য! যাহারা মনোবিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, ও অন্যান্য বিজ্ঞানের পথে পুরুষকারের মত ঠেলিয়া দিয়াছে; ও মানুষের চরম আত্মবিশ্বাস যাহাদের অন্তরীক্ষে; পরাধীনতাকীর্ণ হইয়া, ধনাঢ্যতন্ত্রের যাহারা পবিত্র-অপবিত্রের সকল সংস্কার বর্জন করিয়াছে; যাহাদের বেশভূষা ও অন্নসেবা বিলাস অপরা সাধনার বস্তু — এই সকল পণ্ডিত তাহাদেরই গুরু ও আচার্য। এমন যজমানদিগের যজ্ঞকর্ম-উপলক্ষে পবিত্রতার কথাটা অমন করিয়া না বলিলে দক্ষিণায় টান পড়িতে পারে। কিন্তু সে কিসে গুরু-উপদেশ বিভাষাই অনাবশ্যক — শিক্ষিত্রী গরীয়সী হইয়াই আছে। পবিত্রতা ত পরের কথা — ধর্ম-নামটাও আর উচ্চারণ করিতে হয় না, বিজ্ঞান প্রভাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তবু পণ্ডিতেরা পণ্ডিতের কাজ করিবেন নয় কি! দেশ, জাতি, ও ধর্ম চুলায় গিয়াছে; জাতির অভি-মজ্জা যে-মাংস গিয়াছে পচিয়া গলিয়া ঝরিয়া যাইতে; এখন তাহার মাথায় চুলে ঐক্যের টোপী কাটা হইয়াছে!

বাংলাদেশে যে সকল ভাগ্যবান বাঙালী 'স্বাধীন' হইয়াছেন, তাঁহারা যে সেই স্বাধীনতার সন্ধানে এখন ঐকান্তিকভাবে ও অবিচ্ছেদে গাহিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সন্ধানে অপলিত হতভাগ্য-সম্বন্ধে গোপনে সকলেরই এই প্রবল চেষ্টা কেন? তাহার অবশ্য আছে; যাহারা সেই পকেট-ভরা স্বাধীনতা পায় নাই, তাহারা যদি গোপনে হইয়া উঠিতে না পারে! তাই পরে-পরিচয়ে প্রত্যহ ঐ স্বাধীনতার ধারাবাহী ও আছেই, এমন কি প্রয়োজন সম্বন্ধে — বিশেষ করিয়া স্বাধীন-দৃষ্টি-সম্পন্ন ছাত্রদিগে — ঐ স্বাধীনতার একটা গৌরচন্দ্রিকা না করিলে চলাটাই অসম্ভব হইয়া যায়। গৌরচন্দ্রিকাটির একটি মহড়া মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যথা — "আমরা স্বাধীন-ভারতে প্রথম এই উৎসব করিতেছি, এমন উৎসব আর কখনো করিতে পারি নাই — আপনারা সকলে নিজের নিজের বাটীতে হাত দিয়া দেখুন, সেখানে কিরূপ হৃদয়াবেগে এই উৎসব হইতেছে! অহো, আমাদের কি সৌভাগ্য!" যাহারা উৎসব করেন, অথবা উৎসব সভায় সমবেত হন — তাঁহারা নিশ্চয় সেই মুহূর্তে নারায়ণের বিশ্বরূপদর্শনের মত একটা পুলক-শিহরণ অনুভব করিয়া থাকেন। সেটাই আসল রস! — স্বাধীন ভারতের সেই 'উৎসব-শিহরণটা কেমন তাহা কোনক্রমে — ভাষায় না পারিলেও — ঠাট্টে-ঠমকে, মুখ-ভঙ্গিমায় বা একটা 'পোজে'র সাহায্যে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন না! আমাদের পলা যে কাঁই হইয়া উঠিল; স্বাধীনতার পিপাসায় কণ্ঠাগত-প্রাণ, তবু কোন উপায়ে একবিন্দু পান করিতে পাই না। আপনারা আকণ্ঠ পান করিয়া মত্ত হইয়া ঢেঁকুর তুলিবেন, আর আমরা কি চিরান-কালের বাহিরে দাঁড়াইয়া নাকে একটু গন্ধও পাইব না!

ভারত স্বাধীন হইয়াছে — বাংলাদেশও ভারত, কাজেই বাংলাদেশও হইয়াছে। স্বাধীন মানুষগুলির একটা 'সমুদায়' আমরা প্রস্তুত করিয়াছি; তাহাতে স্বাধীনতার স্বরূপ বা শ্রেণীভাগ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এদের শ্রেণীর 'স্বাধীন' যাহারা তাহারা অতিশয় চতুর: কোন-কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করে না — গান্ধীবাদেও নয়, স্বাধীনতা-বাদেও নয়; তাহারা কেবল একটি বস্তুতে বিশ্বাস করে — ধন-মান-প্রতিপত্তি; ইহাদের জন্য, যখন যে-কর্মের তদীয়ারি করেছে জনসাধারণ ও যন্ত্রপুর বলিয়া মনে হয়, তাহাতেই ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং সমস্বরে ও উচ্চকণ্ঠে সেই দিকের জয়ধ্বনি গাহিয়া থাকে। ইহারাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে: বড় বড় নামের নামাবলি সঙ্গে রাখিয়া স্বাধীনতার ঝটিকাবাহী করিয়াছে। স্বাধীনতার মাতামাতি ব্যাপিটাবিই ইহারাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাহারা, তাহারা মোটের মুখস্বাচ্ছন্দ্য ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছে — একটু ভালো, চাকরী, কিন্তু উপরি-উপার্জন, এবং তাহার সঙ্গে বন্ধুদের একটু পিঠ-চাপড়ানি, অথবা না হলাইবার মত মনের মধ্যে একটু আত্মতুষ্টি — অর্থাৎ, ঐ দেশব্যাপী হাজা-শুখার মধ্যে জিহ্বাগ্রে একটু রস-আস্বাদন যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণী; ইহারা ঐ প্রথম শ্রেণীর পো ধরিয়া থাকে। যাহারা তৃতীয় শ্রেণীর তাহাদেরই সবচেয়ে রুপণ পাত্র। ইহাদের খাওয়া-পরাটা, এক-এক জনের এক-এক কারণে একরূপ চলিয়া যাইতেছে; ইহাদের অভাবই এখন যে, তাবের ঘোরে আজন্ম হওয়া সহজ; ইহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে উপকার ঐ উদ্দেশ্যে কথা মানিয়া লয়, এবং 'স্বাধীনতা'টা অন্তে ভোগ করিয়াই যেন আরও তৃপ্তি পায়। ইহাদের বয়সও কম। চতুর্থ এক শ্রেণীর উদয় হইয়াছে, ইহারা স্বাধীনতার কোন মর্মই বোঝেনা, কেবল তাহার একটি লঘু-সুন্দর তাল

করিয়া ভোগ করিয়া লইতেছে। যদিও সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা আছে, তথাপি ইহাদের একটা নিজস্ব গুণ আছে, এক সংসারে ইহারা কিছু বেশি। ইহারা চুরি, ডাকাতি, ঘাটপাড়ি, খুন ও ব্ল্যাকমার্কেটের বন্যা-স্রোতে ভুলিয়া, ভাসিয়া, পাঁতার দিয়া—তুলনা তাহার নির্জলা উপবাস হইতে চলা পাইতেছে। ইহারা ধর্ম, সমিতিকৃষ্ণ প্রভৃতি সর্বসংস্কার-বর্জিত মুক্ত-পুরুষ। ইহারাও একেবারে 'স্বাধীন' হইয়াছে। সকল শ্রেণীর কথা সকলেই জানেন, ইহারা স্বাধীনতার কোন কথা —ব্যবসায়ের, চাকরির, ব্যবসার বা উৎপাদন—সংগ্রহ করিতে পারে নাই বলিয়া বড়ই উপদ্রব করিতেছে। স্বাধীনতার বড় শত্রু ইহারাই; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহারা আছিদ্র, সমাজকর্ম, নীতিবোধ সকল কিছুই নাশ করিতে চায়। তাহা হইলে, যে-স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে তাহার সকলেরও বেশ, পরিমাণ-কণাও কেহই প্রাপ্তুকর। ইহার উপরে, যাহাদের যাহা উপরি-লাভ হইয়াছে, তাহার তুলা ত' আমরা প্রতি মাসেই মনোহরণারী কীর্তনের সুরে গাহিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না।

চিত্র-পরিচয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

(১৮৮২—)

বর্ধমান জেলার 'উজানী' গ্রামে বৈষ্ণবংশে জন্ম হয়। ইনি দীর্ঘকাল মাধবকর (বর্ধমান জেলা) উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কবিহিসাবে ইঁহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের আধুনিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে। ইঁহার প্রাণ স্নেহ-প্রেম ও ভক্তিরসে পূর্ণ। তাঁহার কবিতার প্রধান লক্ষণ তিনটি, — (১) অতিসরল অথচ চমৎকার চিত্র-গভীর অনুভূতি; খাঁটি খাঁটি-কবিতার মত তাহারা একটিমাত্র ভাবের উদয়ের নিঃশেষ হইয়া যায়। (২) তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতি সর্বত্র ভক্তি অথবা প্রীতির আবেগে অশ্রুসজল হইয়া উঠে; কুমুদরঞ্জন বাঙলার পল্লীকেই তীর্থমহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার কবিতাকে খাঁটি বাঙালী-প্রাণের উৎসার বলা যাইতে পারে। (৩) তাঁহার ভাব-প্রকাশের প্রায় একমাত্র ভাষা — উপমা; এই উপমা তাঁহার কবিতায় কেবল অলঙ্কারই নয়, উহাই তাঁহার হৃদয়ের অতি গভীর ও অকপট অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র উপায়, এবং উহার মধ্যেই তাঁহার কাব্যের সহজিয়া কৌশল ও কবিশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি 'অঞ্জন', 'উজানি', 'একতারা', 'ঘুঘুর', 'বনমল্লিকা', প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন; কাব্যগুলির নামেও তাঁহার বিশিষ্ট কবি-ভাবের পরিচয় রহিয়াছে।

—'কাব্যমঞ্জুষা' হইতে

দ্রষ্টব্য :— সম্পাদকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পত্র ব্যবহার করিতে হইলে, ঠিকানা এই —
কৈলাস ঘোষের বাগান, পোঃ বজবজ, ২৪ পরগণা।

২৪ এ কৈলাস বোস, "প্রবেশ প্রেসে" শিবদাস পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সকল বৃত্তিগুলির বিষয়ে অনুশীলনই মানুষের ধর্ম। —

অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধর্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠান করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম হইত। কিন্তু মনুষ্যসমাজের অবস্থাবৈষম্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। কেহ কেবল জ্ঞানেরই প্রধানতঃ আবশ্যকতা বোধ করেন, কেহ কর্মকে উহার প্রধানতম অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন।

যে যাহা হউক, মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞান বা কর্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শিল্পী, কৃষক, বা শূদ্রত্বাদিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। মূল কথা এই যে, এই ছয় বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্বিধ কর্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্মান্তর নাই। যদি থাকে তাহা কুকর্ম। এই ছয়টি কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার তার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাঁহার Duty; তাহাই তাঁহার স্বধর্ম।

যাহা অনুষ্ঠেয়। — গীতাই হউক, Bible-ই হউক, বা অন্য কোন ভাষার যে কোন গ্রন্থই হউক, যা তাঁহার অনুষ্ঠাতার মনুষ্যের মূলনির্দেশই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার উপযোগী হইয়া থাকে, এবং তখনকার সমাজের এক লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুরূপ যে ধর্ম উহাতেই তৎকালে সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তখন ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যারও সংস্কারের আবশ্যক হয়। কেন না, ধর্ম নিত্য; গ্রন্থ মনুষ্যের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত গ্রন্থে যেরূপ একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সাময়িক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এরূপ সমাজের পূর্ণাবস্থাতে খাটিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সাময়িক প্রয়োপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণোক্ত গ্রন্থেরও অর্থের কিরূপ অর্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটে; আমি যাহা বুঝাইলাম তাহাও আছে, কেন না, উহা বর্ণাশ্রম-ধর্মের সঙ্গেসঙ্গেই যায়। ঐরূপ কুরানেরও বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুরোধিত ব্যাখ্যা করা হয়।

এই নিত্যোক্ত ধর্ম সমস্ত মনুষ্যের পক্ষে। ঈশ্বরকে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে ঐশ্বরিক ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কেন না, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাহার বস্তুতত্ত্বে অধিকার, তিনি তত্ত্বতত্ত্ব গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। যাহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা হইতে পাইবেন।

অনেকের বিশ্বাস যে, এই গীতাগ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য —যুদ্ধের নূতন ব্যাপারে মনুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়া। যাঁহারা যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। গীতা, বাজারের উপন্যাস-গ্রন্থ নহে যে, একবার পড়িলেই উহার সমস্ত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। বিশেষরূপ উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। গীতার প্রচারের উদ্দেশ্য — স্বধর্ম-পালনের অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন করা। অবশ্য যদিদ্বারা নিকৃষ্ট সম্প্রদায় দুর্নীতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ — Duty. — তাহাতে বোধ হয় যে কষ্ট পাইবে না; গীতার প্রচারের উদ্দেশ্য —

Duty-বোধের অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপন্ন করা। সকল মানুষের ধর্ম একপ্রকার নহে — কাহারও ধর্ম দস্যুতা; কাহারও ধর্ম ক্ষমা। পিপাহির ধর্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের ধর্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা। মানুষের যত প্রকার কর্ম আছে; তত প্রকার ধর্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার ধর্ম মধ্যে যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার। যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, ওই নৃশংস কার্য অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। বৈমানিক বা বাঘের মেশ ধ্বংস ও সৃষ্টির করিতে আসিয়াছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য ও অবশ্য-সম্পাদ্য ধর্ম। অতএব যীশুখৃষ্টের অহিংসাতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে Crucial Instance বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্মের অবশ্যম্ভাবিতা এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ধর্মেরও বিষয় গভীর ব্যাখ্যান করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, ও যাহাতে মানুষমাত্রই স্বতঃ অপ্রবৃত্ত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে — যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, তাহাই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। Crucial Instance বটে। যীশুর উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপাদন করা যে ধর্ম এমন নৃশংস, ভয়াবহ এবং মানুষপ্রবৃত্তির আপাতবিরোধী হইলেও তাহা অবশ্যপালনীয়।

যুদ্ধই যদি ধর্ম, অতএব অপরিহার্য, তবে তাহাতে সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেন না, ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা অবশ্য-কর্তব্য — কতদিনে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ 'কর্মযোগ' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত পুষ্টি ও সামঞ্জস্য ধর্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম অধর্ম। বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদসাধ্য অধর্ম। সন্ন্যাসী বা সেটুক অধার্মিক, কেন না তাঁহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটীর সবিশেষ অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্মিক, কেন না তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, দুই একটীর সবিশেষ অনুশীলন করেন। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সাহস করি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? অনীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডারে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কেহ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সব কার্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। কখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। ক্রমশঃ যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিব যে, আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সম্বদ্ধ। বিধির বিধের সর্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়।

— কৃষ্ণচরিত্র

হিন্দুর ব্যথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

(১)

এ নবম আমের আমার
প্রাণ যে ব্যাকুল করে,
দূরে বাথার অশ্রু আমার ঝরে।
আমার সকল মর্ম্মে যাতনা জাগে,
আমার সকল অঙ্গে বেদনা লাগে, —
বুঝিবে, কেমনে নয় পরাণী
এত কাছে এলো সরে' ?

(২)

আমি ভাষা-গড়া ছেলেরে চিনিনে,
ওগো অমরের রীতি,
জানি এরা নারিকা করে কিতি।
ভাষিয়াছে — তবে ভরিনা অধিক রোষে,
দুখে — পড়ায় শক্তি করেছে লোপ,
আছির জীবনে আপনারে দেখেছে
বাপুরেছাড়া বুড়ি।

(৩)

নবমেরা বহু এলো গেলো দেখে'
সেই অমরত্ব।
অনাপত্তিত আছিলো রহেছে চুপ।
মর্ম্মাদোজান বুঝি জানিবে না আর ?
নিপীড়ন লেহে ধরণিরে যাদু তার,
চাহেনা আর সে দেবা-অধিকার —
সম্পদ অমরত্ব।

(৪)

ধর্ম্মক্ষেত্র, শক্তিক্ষেত্র —
নহিক শুধু নয়,
আমরা দেশের ওই 'সোমনাথে' নয়।
ওইখানে আছে অমৃত-প্রস্রবণ
কর সন্ধান — পাষাণ-উন্মোচন,
চুমিয়া অমৃত সুধাপানে হবে
আমার অধিষ্ঠান।

(৫)

মহাকাল সে কি কারো চেনা না ?
জানো না তাহারি ভয় !
তোমরা নবীন ভারতের অঙ্কুর।
তুমি' আসবে শাশ্বত নয় সবে,
হবে অক্ষয় অপরাজেয় এ ভবে,
পূর্ণ আকাশে মেহ যাহা হবে
উদিয়াছে নবারুণ !

ওগো নাই, তার আছে — অমর চুম্বা দু'টি বিহ্বলা,
মরণ যে হওয়া শুধু, বেঁচে-থাকা মিথ্যার গ্লানি !
শাশ্ব আছে — লিখিয়াছি আলোমন্ত্রে কবিতে বরণা
মানুষের মহত্ত্বে, স্বার্থত্যাগে অতি-সাধারণী।

নিখিলে তারকা খুঁজি নীড় ধরিত্রি পরিহরি'.
ধর্ম জানে সুধাহীরে — মোরা জানি তাহারি অর্চনা।
দুর্গেহি ওজঃ-নাদ, আমার সে আদি-ব্রহ্মবাণী,
মৃত্যু নাই, শুকি আছে — মৃত্যু নয়, মহা ছল করি !

— বিজয়ী

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রাজলক্ষ্মী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজলক্ষ্মীর কথা আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহাতে সাধারণভাবে তাহার চরিত্রের ও তাহার নারী-হৃদয়ের একটা পূর্ব্বাভাস দিয়াছি। কাহিনীটি হৃদয়ের কাহিনী বলিয়া বেশ একটু জটিল, বাহিরের ঘটনাগুলিও নাটকের মত সুবিন্যস্ত নয়— বিক্ষিপ্ত; সেই জন্যই বাহিরা গুছাইয়া অন্তরের একটা সহজক্রম নাটকের আকারে গড়িয়া না লইলে এই চরিত্র ও তাহার জীবনের বিশিষ্টতা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে না। পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয় ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই উপন্যাস আমি শুধু উপন্যাস হিসাবেই পাঠ করিতেছি না, আমার অভিপ্রায় আরও ব্যাপক ও গভীর। এই উপন্যাস এক হিসাবে একটি উৎকৃষ্ট 'human document'— বা মানুষের সম্বন্ধে মানুষের হৃদয়ের সাক্ষ্য; অবশ্য মানুষ বলিতে এখানে একটি বিশেষ সমাজের বিশেষ জীবনযাত্রার সম্বন্ধ; এবং তাহাতেও পুরুষ অপেক্ষা নারীর জীবনই অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাতেও একটা বড় সুবিধা হইয়াছে এই যে, যে পুরুষটি এই নারী-কাহিনী লিখিয়াছে, ও তাহাতে পুরুষের ভূমিকা লইয়াছে, সেও এক হিসাবে খাঁটি পুরুষ নয়; যাহাকে আমরা ইংরাজীতে সাধারণ পুরুষ বলি সে তাহা নয়; অন্ততঃ সে হৃদয়ের-বিরোধী; কবির ভাষায় 'কিছু বুঝ, কিছু না বুঝিয়া'-ও নয়, একেবারে বুঝ। এ পুরুষ কিছুই গ্রাহ্য করিবে না- নিজেকে সম্পূর্ণ বুঝ রাখিয়া অতিশয় স্বচ্ছন্দে যাহা সত্য করিতে পারে তাহাই করিবে। এই যে পুরুষ-চরিত্র, ইহা নারী-চরিত্রের বিপরীত; এইজন্যই উহার ঐ কঠিন নিষ্করুণতার নারী-হৃদয় যেরূপ ঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই — পরিণামে সম্পূর্ণ উদাসীন করিয়াই — স্বর্গের স্বর্গত্ব অধিকতর ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যেহেতু উপন্যাস প্রধানতঃ নারীহৃদয়েরই কাহিনী, এবং সেইজন্য তাহাতে প্রেমেরই সর্ব্বাবয়ব রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং যেহেতু ঐ প্রেম যেমন মানবজীবনের একটি উচ্চতম

নিষ্পত্তি — অন্তরঙ্গের কত ছলে ও ছলনায় উহার প্রকাশের শেষ নাই — ভাবে-অভাবে, স্বভাবে ও বিভাবে উহা প্রত্যেক নর-নারীর সুখ-দুঃখের মিলনস্থল হইয়া আছে। এবং সেইহেতু উহাকে একটা আবাসত্ত্ব বস্তু-সামগ্রী বলিয়া আমাদের সুবিধাবাদ কেবিনেটে স্থান দেওয়া যায় না। — অতএব, এই উপন্যাস-পাঠে ঐ প্রেমের রহস্য-চিহ্নটি এমন হইবার কথা। আমিও তাহাই অন্বেষণ করিয়াছি, এবং তাহার দিশা কিরূপ পাওয়া গিয়াছে, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা দেখিতে পাইবেন। সকল প্রেমের মত প্রেমের রহস্যও এক, — উহাও সেই "এভেমেরাবিডীজ্"; কিন্তু সেই রহস্য ধরা কি সহজ? যে ধরিয়াছে সে কথা বলেনা, বলিতে পারে না; তাহার কাছে উহা আর তত্ত্ব নয়, একেবারে সাক্ষাৎ-উপলব্ধি। যাহাদের সেই উপলব্ধি হয় নাই তাহাদের নিকটে উহার রহস্য আরও গভীর হইয়া উঠে, তাই তত্ত্ব-চিন্তা চলনশীল হয়। যাবন-যাবনীর যে প্রেম তাহা রক্তের মধ্যে সত্য, সর্ববাদি ও অবিরোধ —

বৈরিরক্ত বৃত্তান্তোমধ্যে চক্রবেব চ।

সুতরাং তদবিরোধে বুদ্ধ্যা চাস্তিকে চ তৎ।

—তাহাও "সর্ব-মানবের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান; তাহা চল এবং অচল; সুদূরতাবশতঃ তাহা অবিজ্ঞেয়; এবং বুকে থাকিয়াও নিকটে স্থিত।" ব্রহ্মকেও যেমন কেবল তত্ত্বরূপে জানা নয় — তাহাকে চরাচরে সর্বত্র বস্তুগত-রূপে দেখা চাহি, প্রেমও তেমনি। কাব্যে-নাটকে তাহাকে কেবল আমাদের চোখের সম্মুখে টানিয়া আনা হয় মাত্র — সেই জন্মবাদী অবিজ্ঞেয়কে আমাদের জ্ঞানগোচর করা হয়, অন্ততঃ সেই ঘটনাটির মধ্যে আমাদের প্রাণে একটা সাড়া জাগে; তথাপি, সে যে আমাদেরই হৃদয় হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না — এমনই ছলনা তাহার, এমনই সে অবিজ্ঞেয়!

অতএব আমি যে এই উপন্যাসখানির প্রসঙ্গে সেই প্রেমের তত্ত্বটি লইয়া এত বক বকিতেছি, তাহাতে কেহ অবৈধা হইবেন না; এই উপন্যাসখানিতে ঐ তত্ত্ববিচারের যে সুযোগ মিলিয়াছে তেমন কচিৎ মিলিয়া থাকে। রাজলক্ষ্মী এবং অপর দুই একটি নারীর যে কাহিনী এই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, তেমন করিয়া বাংলা-উপন্যাসে আর কোথাও নারী-হৃদয়ের অন্তস্তল উন্মোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; তার কারণ, অন্যত্র উপন্যাসের প্রয়োজনটাই বড় হইয়াছে, এখানে সেই প্রয়োজন গৌণ। নারী-হৃদয় বলিতেও বিশেষ করিয়া এই দেশের, এই জাতির, এই সমাজের নারী-হৃদয় বটে, ইহাও সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রেমের সার্বভৌমিক তত্ত্বও যেমন, তেমনই তাহার ঐ বিশেষ অভিব্যক্তিও বার বার স্মরণ করিয়া আমাকে একটা কথা দুইবার করিয়া বলিতে হয়।

এখন রাজলক্ষ্মীর কথা। ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে রাজলক্ষ্মীর জীবনকাহিনীর কয়েকটি মূলসূত্র নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকার মনোগত হইয়াছে। কিন্তু আমার এই আলোচনা ত' কেবল সিদ্ধান্তমূলক নয়, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাখ্যার পর আর কিছুই বলিবার থাকিত না। আমার কাজ এক হিসাবে অতিশয় দুরূহ। উপন্যাসটি আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন — কাহিনী ও ঘটনা সকলেরই জানা আছে। সেখানে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-চিত্রণে কিছুই বাকি রাখেন নাই, বস্তুতঃ কাব্য-হিসাবে সেই চিত্র অতুলনীয়। তথাপি উপন্যাসের ঐ ঘর ও বেরাগুলির অন্তরালে একটি যে রহস্য ঘনীভূত হইয়া আছে, তাহা পাঠক-পাঠিকার অন্তরকে অতিশয় তাবেই স্পর্শ করে, একটা কি যেন বলা বলাও হয় না; আমাকে তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইবে। তখন সেই রহস্যটিকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় ঐ কাহিনীকে নিজের মত

করিয়া গড়াইতে হইবে। কেমন করিয়া সাজাইলে সেই বহুত এবং কারাময়, দুইই — একটি অপরূপকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, ইহাই ভাবিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, রাজলক্ষ্মীর জীবন, চরিত্র এবং তাহার ঐ প্রেম — এই তিনের মধ্যে যে নাটক মূক হইতে মূর্তরূপে প্রকটিত হইয়া চলিয়াছে, আমি সূত্রধাররূপে, হয়তো বা গ্রীক নাটকের 'কোরাস'-রূপে, তাহার প্রয়োজনা ও বস-প্রকটন — দুই কার্যই করিব। ঐ কাহিনীর প্রবাহ হইতে কয়েকটি ধারা ও তত্ত্বসার বিশ্লিষ্ট করিয়া এমন ভাবে সাজাইয়া দিব, যাহাতে তাহার অন্তঃসোত সহজেই বুঝিয়োজ্য হয়; চিত্তের যে কারণে বাহিরে নব নব ভাববিকাশ বা ভাবান্তর ঘটিতেছে তাহা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়। একদিকে প্রবল বুদ্ধি অপর দিকে অতিস্ফীত সংযম, এই দুই শুষ্কের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও, যে বেদনা, সংশয়, সঙ্কোচ এবং আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ রাজলক্ষ্মীর হৃদয় মথিত করিতেছে — যদিনী যামিনীর মতই তাহাকে অতি অসহায় ভাবে যাতনা ভোগ করাইতেছে, সেই শক্তি ও সেই অসহিষ্ণুতা যে নিরন্তর নিষ্ফল, তাহারই কালানুক্রমিক মূক-সাক্ষ্যরূপে আমি ঐ কাহিনী হইতে সংকলন করিব — ঐ কাহিনীর জবানীতেই। অতএব, এখন হইতে আমার কাজ হইবে — মুখ্যত তাহাই; অবশ্য সেই সঙ্গে সূত্রধার রূপে প্রচুর টীকাভাষ্যও যোজনা করিতে হইবে — যা করিলে রসবস্তুটির বিশ্লেষণ করা যাইবে না। এ কাজ যে কত দুরূহ তাহা জানি — আরও দুরূহ এইজন্য যে, ঐরূপ টীকাভাষ্য পাঠক-পাঠিকাদেরও সুখপাঠ্য হইতেছে না বুঝিয়াও তাহা করিয়া যাইতে হইবে।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি, আর কৈফিয়ৎ বলিয়াছেন কিনা জানি না — তাহা এই যে, শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত'-কথা শেষ করেন নাই। শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল না, বা শেষ হইয়া উঠে নাই, অথবা উহাই শেষ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। হয়তো এরূপ কাহিনী শেষ না করিলেও ক্ষতি নাই, ইহার হয় বা সাহিত্যিক অভিপ্রায় থাকে, এমন একটা ধারণা তাঁহার ছিল। এ যেন একটা 'Journal' বা 'রোজ-নিশি'; একটা মানুষ তাহার জীবনে যাহা কিছু দেখিয়াছিল, তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছে। কাহিনীর সূত্র সে নিজে। সেই জীবনের একটা ধারা — যেধারা তাহার নিকটে সবচেয়ে গভীর ও মূল্যবান — তাহারও যতটুকু লিখিয়া রাখার যোগ্য সে তাহাই লিখিয়াছে; তাহার পরের কথা তেমন মূল্যবান বলিয়া মনে করে নাই। এ যেন সৃষ্টির একটা আল-বরন; সেই ফাঁক দিয়া কতকগুলি পরিচিত নর-নারী — কতকগুলি ঘটনা, এবং কয়েকটি চরিত্রের চমৎকার চিত্র — উঁকিঝুঁকি দিয়া লেখক আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল গল্প করিয়া চলিয়াছেন, যতক্ষণ তাহা চলে তিনিও চলিয়াছেন, ফুরাইলে তিনিও চুপ করিয়েন। তথাপি, কি অর্থে এইরূপ গল্পেরও একটা বিন্যাস-প্রণালী আছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে বিশেষ করিয়া এই রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গে কথাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। 'শ্রীকান্ত'-কথার যে একটু আখ্যান-বস্তু আছে সে ঐ রাজলক্ষ্মীর জন্য — শ্রীকান্তের আত্ম-কথাকে এই রাজলক্ষ্মীই একটা গল্পের গাথনি দিয়াছে। অতএব রাজলক্ষ্মীর জীবনের পরিণাম, কিম্বা সেই পরিণামের একটা স্পষ্ট আভাস ইহাতে থাকিবার কথা; কিন্তু তাহা নাই, যাই বলিয়াই উহা অসমাপ্ত মনে হয়। আমরা আর সকলের শেষ না চাহিলেও, রাজলক্ষ্মীর একটা শেষ চাই; সেই শেষ যে একটা আছেই — ঐ কাহিনী পাঠ-কালে এমন ধারণা জন্মে মূল হইয়া উঠে; যেন রাজলক্ষ্মীর শেষ না হইলে এ কাহিনী শেষ হইতে পারে না। এরূপ বিশ্বাস বা

প্রেরণা ও একটা ভাবের ঐক্য আছে যে, শ্রীকান্তের ঐ পর্বগুলি যেন তারে পর পর গ্রথিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক পর্বের পর আরও আছে, ইহাই মনে করা স্বাভাবিক। যেন শেষ-পর্ব প্রকাশিত হইল, তখন অন্য পর্বগুলির মতই তাহারও সমাপ্তির কোন চিহ্ন নাই। উহাই যে শেষ নয়, এমন বিশ্বাসের আরও কারণ — যে-স্থানে ঐ পর্ব শেষ হইয়াছে, তাহার পরে শ্রীকান্তের জীবনেও যেমন, রাজলক্ষ্মীর জীবনেও তেমনি, একটা আকস্মিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে; সেই পরিবর্তনেই রাজলক্ষ্মীর সকল আশা-নিরাশা চিরবিশ্রাম লাভ করিবে। ঘবনিকা-পাত আর যেখানেই হোক, এখানে হইতে পারে না; এ যেন ঘাটে আসিয়া তরী ভিড়িল না; যেন রবি অস্ত যাইবার কালে আকাশপ্রান্তে তাহার সেই অন্তরাগটুকু পূর্ণমহিমা উদ্ভাসিত হইবার পূর্বেই সন্ধ্যা যেন অন্ধকার নামিয়া আসিল। শ্রীকান্ত তাহার বিচ্ছেদ কথা ইহার পরেও আর টানিয়া চলিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই, সম্ভবতঃ ঐখানেই ঘবনিকা-পাত করা অনেক কারণে উচিত মনে করিয়াছিল; কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কথা ঐখানে কিছুতেই ফুরায় না — তাহার সহিত চির-বিচ্ছেদ যা তাহার প্রকৃত মানুষের পক্ষে উহা শেষ হইতে পারে না; ইহাও ঠিক যে, অন্নদা-মোহিনীর মত রাজলক্ষ্মীকে হারা সকলের পাওয়া অসম্ভব। এই পরিসমাপ্তি ইঙ্গিতে আভাসে আমরা যেটুকু বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করি, তাহা নির্ভুল বা নিশ্চিত হইতে পারে না, সাধারণ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। এইজন্য আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র ঐখানে শেষ করিতে চাহেন নাই — কোন একটা কারণে লেখা আর হইয়া উঠে নাই। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু পর্যন্তই এ কাহিনীর সীমা, এবং আর একটি পর্বে তাহা আসিয়া যাইত, কাহিনীও সুসম্পূর্ণ হইত।

অন্ততঃ রাজলক্ষ্মীর প্রেরক-পত্রিকার ছাড়া, তাহার চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধেও ইহাতে বিশেষভাবে সন্দিহান হইবার কারণ আছে। যেমন ধরুন — মিথিলার জনপদের পাতাগুলি যেমন বিবর্তিত হইয়াছে, তেমনি তেমনই একজন চরিত্রকে সেখানে দিয়াছে। কিন্তু আমি এ সকল বিশেষণ অতিরিক্ত মনে করি। রাজলক্ষ্মী যে হইয়াছিল — সেই যেমনই শ্রীকান্তের জন্যে অতি মহীয়সী হইয়া আছে; তাহার প্রমাণ শ্রীকান্তের কথার ভঙ্গিতেই পাওয়া যায়। মানুষকে তাহার জীবনে আমরা যত ভাল করিয়া, যত অন্তরঙ্গ ভাবেই দেখিনা কেন, সেই অতি-নিকট, অতি-পরিচিত, অতি-আপনের বিশ্লেষণকেও — অতি-নিকট বলিয়াই — তেমন করিয়া দেখিতে পারি না, যেমন দেখি দূরত্বের অন্তরালের আলোকে। নিকটে যতখানি দেখি তাহা সব নয় — ঐ দূরত্বই তাহা পূরণ করিয়া দেয়। এমন কি, জীবনে যে নিকটে থাকিয়াও দূরে থাকে, মৃত্যুতে সে দূরে গিয়াও নিকটে সরিয়া আসে। এই কাহিনীতে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে যে-ক্ষণে, যে-দৃষ্টিতে দেখিয়াছে তাহাতে সেই দূরত্বের আভাস আছে, ঐ দূরত্বই রাজলক্ষ্মীর মূর্তিটিকে এমন মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ইঙ্গিতও স্থানে স্থানে আছে — অবশ্য ইঙ্গিত মাত্র, আমি তাহার কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি। —

(১) শ্রীকান্ত বলিতেছে —

"এত-এতটা কথা যেখানটায় সমাপ্তীকরণে তুলিয়া পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে — তাহার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাদের জন্যে ব্যথিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও ভোলেনি। আজও আমি তাহার কেন শুনিতে পাই!" [২য় পর্ব, পৃঃ ২২]

এখানকার ঐ "শেষ কথাগুলা" অবশ্য শেষ বিদায়ের কথা নয়, ইহার পরে আরও অনেক বিদায় ঘটিয়াছে। তথাপি মনে হয়, শ্রীকান্তের এখানকার ঐ কথাগুলিতে একটা গভীরতর সুর —

পরবর্তীকালের চির-বিদায়ের সুরও শোনা যাইতেছে : শ্রীকান্ত যখন এ কাহিনী লিখিতেছে তখন ঐ বিদায়ের প্রসঙ্গে সে যেন একটা বড়-বিদায়ের ব্যথাও স্মরণ করিতেছে।

(১) রাজলক্ষ্মী বলিতেছে —

"এ জীবনে তোমাকে ভুলব না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন — এক প্রকার বিবশা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, ঘন-প্রশ্বাস বহিয়া আসিতেছে, — বহুদা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম — ও কি! রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, ভৈরবী, — কিছু নয়।

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমন ব্যথা লাগিল।" [৪র্থ পর্ব, পৃঃ ১৯১]

এখানে আমরা শ্রীকান্তের ঐ কথার মর্মে বুঝিতে পারি, সে রাজলক্ষ্মীর দেহিনের সেই আচরণে ভয় পাইয়াছিল — সে যেন একটা presentiment, অর্থাৎ ভয়-দর্পণে ভবিষ্যতের ছায়াপাত।

(২) এক স্থানে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর জবানীতে নিজেকেই যেন ধিক্কার দিতেছে। এখের চূড়ান্তে অপরে কি করিবে সেই কথা হইতেছিল; রাজলক্ষ্মী তাহার নিজের ভালবাসার গর্ব করিয়া বলিল, সে যাহা পারিবে, শ্রীকান্ত তাহা পারিবে না — সে যত জোর করিয়া করিয়া একখানা বই লিখিবে। — "রাজলক্ষ্মী বলিল, এ তো শুধু কথা লেখা ছবি নয় গোসাই, এ যে সত্যি। তফাৎ ঐখানে। আমি পারবো তুমি পারবে না! তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হ'য়েই থাকবে।" [পৃঃ ২০৬, ঐ]

ছঁ — এই পারাটা কিন্তু চূড়ান্ত নয়। শ্রীকান্ত সেই কথায় ছবিই আঁকিতেছে : রাজলক্ষ্মীর কথা যে সত্য হইয়াছে, শ্রীকান্ত যেন গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাহা স্বীকার করিতেছে।

(৩) শ্রীকান্ত বলিতেছে, "নিজেদের ভাল-পরিণামের অন্বয়ণেও কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার (রাজলক্ষ্মীর) মন হইতে কিছুতে ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে বলিলাম, আগে তুমি না মরলে আমি মরচি নে, এ নিশ্চয় —

কথাটা সে শেষ করিতে দিল না, বল করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তুমি স্থির শপথ করো! বলো, এরপর কখনো মিথ্যে বলে না। বলিতে বলিতে উদ্বেল অশ্রুতে তাহার দুই চক্ষু উপচাইয়া উঠিল।" [ঐ, পৃঃ ১৯১-৯২]

রাজলক্ষ্মীর এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবারই কথা। শ্রীকান্তও এই ঘটনার এমন উল্লেখ করিত না, যদি তাহা ঐ কাহিনী লিখিবার পূর্বে সত্য হইয়া না উঠিত।

(৪) আর এক জায়গায় সে শ্রীকান্তের নিকটে একটি ভিক্ষা চাহিতেছে, সেই ভিক্ষার কথাগুলিতে শ্রীকান্ত যে এমন মর্মান্তিক করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ হয়, লিখিবার কালে তাহার বুকের ভিতরটা কি কারণে এমন বেদনাতুর হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী বলিতেছে —

"এবার যেদিন সত্যি সত্যিই মরব, সেদিন কিন্তু দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলো। বোলো পৃথিবীতে অনেক বন্ধু-বন্ধু অনেক ভালো বাসা বদল করেছে, তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র, পরিপূর্ণ হয়ে আছে; কিন্তু তোমার দুঃখটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বয়সটিকে একমনে বড় ভালবেসেছে, এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন বাসে নি। আমার কানে-কানে তখন বলবে বলো এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাবো।"

[ঐ, পৃঃ ১৯৯-২০০]

সাঁঝের তারা চোখ-বুজে
হাঁস ভেবে ঘুমের পানে,
স্থির অপলক দৃষ্টি তাহার
মন যেন কিসের মানে!
চাঁদের আলো—তোমার ভবে
ঐ কথাটি বলতে হবে;
চাঁদের আলোও হয় নীরব,
এলিয়ে পড়ে ঝিলিয়ে নেশায়!

ঝিঁ ঝিঁ র পাঁজোর বাজিয়ে পায়ে
আঁচল বায়ে মিলিয়ে যাচি—
কে এলো রে! কে এলো রে?—
নিঝুম রাতি — নিঝুম রাতি!
ওরে — ওরা, এই আঁধারে
খুঁজে খুঁজে মরিস কারে!
সে যে নদীর অপর পারে
হৃদয়ে তোর আশায় আশায়!

---

(৩)

হারানো প্রেমপত্র

ওগো যেন ঈষৎ হেসে হলুদবনি, বাজনা, শাঁখ
দিয়ে দিয়ে কে আনলে ডেকে হারানো মোর পরেতা
কি?

ওধুনো ভাবে ঈষৎ যেন কুসুম-কোরক মুরছি,
পাপড়ি-ভরা কুঞ্জে এলো মধু ভ্রমর ভরছি!
রোদের আবির ছড়িয়ে দিলে তরু ঝিলির-মুখে যে!
আজকে ভাঙা নাট্যশালায় নূতন দীপপুর রে!
যৌবনেরি লজ্জা হাসি, চুমনেরি দ্রাক্ষারস
কেমন করে' হারাল হরে' শুক্ল কালির কৃষ্ণ কস্!
কাল বাজারে হাতের বাজে কালী তারে রাখলে সো,
যৌবনেরি যৌতুকেরে বরণ করে আনলে সো!
হারা-তরীর পসারাশি বালির হারা নদীতে
কিনারে কে আনলে আজি অমনি আঁখির ইঙ্গিতে!
কোন্ অতলের রত্নমালা লক্ষ তুমি, মোর প্রিয়ে, —
রাখলে প্রেমের মণি-মানিক এমন করে' বশ্ দিয়ে!

---

(৫)

উদ্দেশে

বহুদূর ছায়া-চিকের ওপারে
লুটায়ে তব নীলাম্বরী,
হায় ধরা'ইবে পাইনে নাগাল,
সহসের আগে যাওনো সরি'।
কথা ছিল এই, আমৃত যাবে যে-ই,
কহিয়ে পাঠাবে বিবরণ,
সেই দুঃ ঠাঁই, খবর না পাই,
একা-একা — ওগো, আহা কেমন !
আসি পাশকির দুয়ারে ব্যাকুল
নিশুতি-সদনে লুটায়ে শির,
তব কুশলে পরাণ বিকল'
গেঁথেছি নিখর বৃক্ষতা-নীর !
দাসিকার মত ছিনু তব দ্বারে,
নীলা-কৌতুকে চকলী-প্রাণ,
খেলিতে খেলিতে একি সাজা দিলে,
এ কি অকরণ সব অবসান !
আর তত জোর, অভিমান-গুরু,
নাহে কিছো মোর কাহারো কাছে ?
এস, এস ফিরে, — এই উদাসীরে
আপন বলিতে কে আর আছে ?

আমি চারুচন্দে চিরসখি মোর,
যারা জানে না অন্য-জীবন,
তবে কিসরে সরি পরবাস,
জনতার মাঝে নির্বাসন।
ফুরাতে গিয়াছে প্রয়োজন মোর,
সব আজ হয়েছে শেষ,
আশার অধিক আপায়িয়া স্নেহ
আলতায়-লাল স্নেহের বেশ !

কিনার দূরের প্রান্ত-সীমায়
পরশিতে গিয়া কিছিনু নাকে,
আমিনু তুহার করুণ মিনতি,
না ছুঁইয়ে তব চরণজনার মাঝে।
লাজ হ'লো মা স্নেহের কথাটি,
খুলিল না আহা অমর-দ্বার,
অমনীর এই ঘাটোয়ন থেকে
ফেরে ফেরে নাড়া মেলে না আর !
মেলি' অপলক ঘুম-হারা চোখ
রাত-দুয়ারের তারার পথে,
গুণ'ণ করি' মুহূর্তগুলি : —
বক্ষ ছুটে গো ললাট-রথে।

হিমগিরি-কোলে শুভ-ভবনে —
যাবে যরি' তোলা মনোহরে
দেখেছি মূরতি বিরহাকের,
লোটে সতী-শব বীরের 'পরে।
জটা-জলাপের সুরধুনী-প্রপাত পড়ি ঝরঝর,
তাতে শশি-কলা শুভ্র চপলা
কভু ভাসে, পুনঃ ডুবিয়া যায়।
বুঝিনি সে চির তত্ত্ব তখন
মেরু-সমুদ্র-সম গভীর,
পারিনি বুঝিতে কেন মোহিত
শিবরের সে তাণ্ডব।
ওই শুনি সেই বামদেব-ভেরী,
প্রতিধ্বনিত গিরি-শেখর,
'কৈলাস' থেকে 'কুমারী' অবধি
সমীরিত সতী-প্রেম অমর !

বন্ধুর গেহ, বাসীও তাঁহার—
ঘুচিয়াছি এই শেষ-বেলায়;
'একাকের' সে মন্ত্র জপিয়া
তাঁরই পদে চিত্ত শান্তি চায়!

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যার 'অনি-বন্ধুরা'র প্রথম কবিতাটিতে কয়েকটি গুরুতর ভুল ঘটিয়া গিয়াছে। ৮৭৯ পৃষ্ঠায়, বাঁ-দিকের পঞ্চম পংক্তিতে 'পরাণে' না হইয়া 'পরাণে' হইবে; ডাহিনের চতুর্থ পংক্তিতে 'শান্তি'র স্থানে 'মুক্তি' হইবে, এবং পঞ্চম পংক্তির পাঠ এইরূপ হইবে—'অনি শান্তি সব পরিত প্রাণে'। এই ভুলের জন্য আমরা অতিশয় লজ্জিত—এখন ভুলটি মার্জনীয়।

ঐ পৃষ্ঠার শেষবর্তী কবিতার দুইটি ছাপার ভুল আছে; 'ভট-ভূমি'র স্থানে 'ভট-ভূমি' হইবে, এবং 'কলো কল্ কুলু কুলু' না হইয়া—'কলো কল্ কুলু কুলু' হইবে। —ব: স:

আর্যোদয় *

শ্রীযটকৃষ্ণ ঘোষ, ডি-ফিল্ (মিউনিক্), ডি-লিট্ (প্যারিস্)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই 'যশ্‌ত্' হইতে যে ইরানীয় সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই ভারতীয় বৈদিক সমাজের অনুরূপ। জরথুস্ত্রীয় 'গাথা'তে অথবা সোমযাগের উল্লেখ পর্যন্ত নাই, এবং জরথুস্ত্র পরোক্ষভাবে সোমপানের নিন্দাই করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু একটী বিখ্যাত যশ্‌তের নামই হইল 'হওম যশ্‌ত্' (হওম = সোম), এবং ইহা সোমেরই স্তুতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। জরথুস্ত্র কেন যে প্রত্যক্ষভাবে সোমপান ও সোমযাগ নিন্দে করেন নাই তাহাও সুস্পষ্ট। তিনি যখন ইরানের আর্যধর্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন তখন দেখিলেন যে সোমাচার সাধারণের — বিশেষতঃ পুরোহিত সম্প্রদায়ের অথবা — এমনই বদ্ধমূল যে তাহা রোধ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। সৌভাগ্য সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার তীব্র ভাষায় নিন্দে করিয়াও কোথাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই যে সোমপান করা অন্যায়। জরথুস্ত্র যখন সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য নিন্দে করিয়া গিয়াছেন তখন সোমপানও বিধিবদ্ধ কিনা এই প্রশ্ন পরবর্তী যুগে জরথুস্ত্রীয়গণ আলোচনা করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে স্পষ্টাক্ষরে জরথুস্ত্র যখন সোমপান নিন্দে করেন নাই তখন সোমপান চলিতে পারে। এই যুক্তি যথাযথরূপে প্রয়োগ করিলে অবশ্য ফল এই দাঁড়ায় যে বাহোত্রেণ পূর্বক জরথুস্ত্র যে সকল মাদক দ্রব্য নিন্দে করেন নাই সে-গুলির কোনটীই অবৈধ নহে! ইহা অবশ্য জরথুস্ত্রীয়দিগের মত নহে। হওম্ যশ্‌তের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। জরথুস্ত্র কর্তৃক সংস্কৃত ইরানীয় আর্যধর্মে পশুযাগের কোন স্থান নাই। কিন্তু জরথুস্ত্রের আপন গাথা হইতেই জানিতে পারা যায় যে তাঁহার যুগে ইরানে যজ্ঞে পশুযজ্ঞ আর্যধর্মের অঙ্গস্বরূপ ছিল। মেধে প্রধান দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ। ইরানীয় আর্যগণ যখন বৈদিক আর্যগণের ভ্রাতৃস্বরূপ তখন ইরানীয় অথর্ণও এই দুই শ্রেষ্ঠ দেবতার উচ্চ সম্মান পাওয়া উচিত। কিন্তু সকলেই জানেন যে অবেস্তায় বরুণের নামও কোথাও উল্লিখিত হয় নাই, এবং ইন্দ্র অবেস্তায় একজন 'দএব' অর্থাৎ মৈত্যে পরিণত হইয়াছেন। ইন্দ্র ও বরুণ প্রথমে মৈত্যই ছিলেন এবং পরে ভারতীয় আর্যগণের নিকট হইতেই ঔহারা দেবত্ব লাভ করেন — এ-কথাও বলা চলিবে না, কারণ পূর্বালোচিত যোষাজ্-মন্ত্র প্রভৃতি হইতে জানিতে পারা যায় যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি অবিভিন্ন ইন্দো-ইরানীয় আর্য সমাজে ইন্দ্র ও বরুণ উভয়ে দেবতা রূপেই পূজিত হইতেন। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে যেসব ইন্দ্র ও বরুণ যে উচ্চ পদের অধিকারী সেই উচ্চ পদে ঔহারা ইরানীয় আর্য সমাজে বিভিন্নরূপে উন্নেষিত হইবার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অবেস্তায় ইন্দ্রের এই অদ্ভুত ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ একমাত্র জরথুস্ত্রের ধর্মসংস্কার ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবং ইরানীয় আর্য সমাজ হইতে বরুণের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হওয়ারও অপর কোন কারণ নির্দেশ করা কঠিন।

কিন্তু বাস্তবিকই কি অবেস্তায় প্রকৃত ইন্দ্র ও বরুণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না? অবশ্যই

* যাদবপুর-আচার্য-শিক্ষা-পরিষদ্ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রবোধ চন্দ্র বসু-মল্লিক বক্তৃতা, নং ৩।

যায়, তবে "ইন্দ্র" ও "বরুণ" এই নাম দুইটির প্রকাশ করিতে বলিলে সকলেরই পরিমিতি ও বিকল্পবোধ হইতে হইবে। বেদের ইন্দ্রের আর একটি নাম হইল "পুরন্দর"; এবং অবেস্তার প্রাক্-জরথুস্ত্রীয় খণ্ডে অনেক অতি জনপ্রিয় বীরদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁহার নাম "থ্রঘ্ন"। কেবল ইন্দ্র ও অবেস্তার থ্রঘ্ন যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাতে মূলা সাহেবের যে ইরান ও ভারত ইজনেই ইন্দ্র সমভাবে জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু জরথুস্ত্র যেহেতু ইন্দ্রকে দানবরূপে অবনীত করিবার প্রয়াসী ছিলেন সেই জন্য জরথুস্ত্রীয় ধর্মসংস্কারের পর ইরানীয় আর্যদের প্রাক্-জরথুস্ত্রীয় খণ্ড-অংশ হইতে 'ইন্দ্র' এই নামটি অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কারক জরথুস্ত্রের শত নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁহারা মন হইতে শতীপতি(১) ইন্দ্রকে অপসারিত করিতে পারেন নাই। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরে আধুনিক যুগে আমাদের দেশের অনেক লোক যেমন একসঙ্গে দুই নামে পূজা করিতে থাকে, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। বাস্তবিক থ্রঘ্নকে কেন্দ্র করিয়া অবেস্তার খণ্ড-অংশে প্রাক্-জরথুস্ত্রীয় আর্য ইরানের যে-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সহিত জরথুস্ত্রীয় ইরানের পার্থক্য অতি অল্প। খণ্ডের অন্য যে-যুগের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা একটি অন্যোপায়ী Heroic Age — বীরের যুগ। সে-যুগে ধর্ম বাস্তব ও ব্যাবহারিক জীবন হইতে পৃথক একটি অন্যোপায়ক পদার্থরূপে পরিলক্ষিত হইত না, এবং সে-যুগে জীবনকে সাহস ও সমুচিত করিয়া দুঃখের আঘাত অনায়াসে নিয়া কেবল বস্তুর প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে তাহা দেবীর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে মানুষ লজ্জা পাইত, ধর্মনীতি অপেক্ষা ভিন্নমূর্তি ও উদার আদর্শ সে-যুগে মানুষকে সর্বপ্রকার কুণ্ঠতার বহু উর্ধ্বে কর্মপথে পরিচালিত করিত, এবং সে-যুগে বহুজনা বাস্তবিকই যীশুখৃষ্টা ছিল — ইরানের সেই বিস্মৃত গৌরবময় বীরযুগের চিত্র প্রাক্-জরথুস্ত্রীয় খণ্ড হইতে পাওয়া যায়।

কিন্তু খণ্ডের এই ইরানেও অর্ধ সমাজ প্রধানতঃ দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরিচালিত বলিয়া মনে হয়। এক দিকে দেব-পূজা এবং অপর দিকে অসুর-পূজা এই ভেদেরই লক্ষ্য প্রদান করে। অতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় যুগ হইতে পূর্বিত নৈসর্গিক দেবতাগণই "দেব" এই নামের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অবেস্তা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে প্রাক্-জরথুস্ত্রীয় যুগেই ইরানীয় আর্যগণ "দেব"-পূজার সঙ্গে সঙ্গে "অসুর"-পূজাও করিতেন। সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই প্রকার দেবতার পূজা হইতে দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার সম্ভাবনাই ঘটিত হয়। "অসুর" এই নামটি ভারতের বৈদিক সাহিত্যেও সুপরিচিত। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে অসুর বলিতে দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রেত এই সবই বুঝায়। কিন্তু প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা আদৌ খাটে না। ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতা অনেকে "অসুর" নামে অভিহিত হইয়াছেন। অবেস্তায় বরুণ যে-নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল "অহুর" (= অসুর) অথবা "অহুর-মজ্দা" (= অসুর-মেধা = অসুর-মনস্বী ?)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে "অসুর" এই নাম যা

১। "শতীপতি" কথাটির প্রাথমিক অর্থ হইল "শক্তিমান"; এই অর্থেই কথাটি এখানে ব্যবহার করিয়াছি। মধ্যেকারও পরবর্তী যুগে "শতীপতি" কথাটি হইতে লোকে মনে করিতে থাকে যে ইন্দ্রের পত্নীর নাম "শচী"। এই ভ্রান্তি বিলাসের কারণ এই যে প্রথম হইতেই "পতি" কথাটি husband এবং owner এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইত।

পরবর্তী প্রথমে নিন্দাবাচক শব্দ ছিল না, পরিণত অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে বৈদিক যুগের মধ্যেই এই কোন কারণে নিন্দাবাচক শব্দে পরিণত হইয়াছিল। "দেব" এই শব্দটির ইতিহাসে একটু স্বতন্ত্র। বেদে ইন্দ্রাদি সর্বত্রেই "দেব"-ও অসুর নামে অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু অবেস্তার কোন "অসুর" দেব নামে অভিহিত হ'ন নাই। এই সকল অবিদংবাদিত কথা পর্যালোচনা করিলে মনে না হইয়া পারে না যে ইন্দো-ইরানীয় যুগেই আর্য সমাজে দুই বরুণের দেবতার পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এক বরুণের দেবতা সেই প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় নৈসর্গিক দেবতা, আকাশ, দ্যুলোক, বজ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতির বিবিধ শক্তি আশ্রয় করিয়া যাঁহাদের পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং এই সকল শক্তির সহিত অল্পবিস্তর সম্বন্ধ যাঁহারা কোন দিন বিস্মৃত হ'ন নাই। সুপ্রাচীন "দেব" কথাটি ইন্দো-ইরানীয় যুগে এই সকল নৈসর্গিক দেবতা সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এই "দেব"-গণের সঙ্গেই আমরা ঐ যুগে আর এক বরুণের দেবতার পরিচয় পাই যাঁহাদের হয় কোন নৈসর্গিক ভিত্তিই ছিল না, অথবা নৈসর্গিক ভিত্তির সহিত সম্বন্ধ যাঁহাদের এতই বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল যে তাঁহাদের পরিকল্পনার প্রধান ভিত্তি হইয়া পড়িয়াছিল মানুষেরই নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ। এই বরুণের দেবতা ছিলেন মিত্র — যাঁহার সম্বন্ধে নৈসর্গিক ভিত্তির কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু বরুণও ছিলেন এই বরুণের দেবতা। বরুণের প্রাথমিক নৈসর্গিক ভিত্তি ছিল অবশ্য বিস্তীর্ণ আকাশ — যাহা স্বভাবতই মানুষের মনে বিরাটত্বের, মহত্ত্বের, শুচিতার ও বিস্ময়ের প্রেরণা জাগায়। কিন্তু বরুণকে বেদে আমরা যে রূপে দেখিতে পাই তাহাতে তাঁহাকে নৈসর্গিক আকাশের প্রতীক বলিয়া মনে হয় না, — মনে হয় যেন তিনি সেই সকল রূপেরই প্রতীক, যে-গুলি মানুষের মনে আকাশের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। আকাশ অপেক্ষা আকাশের বিরাটত্বের মহিমাই যে বরুণের সঙ্গে নিকটতর তাহা বোধ হয় ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে ঋগ্বেদেই বরুণ আবার জলরাশির দেবতা রূপেও পরিকল্পিত হইয়াছেন। মানবোচিত মহৎ চরিত্রের কোন গুণ কিন্তু ইন্দ্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি পুরুষ সোমপায়ী ও ত্রিশিরস্ক বলিয়া যাস্কের নৈরুক্তিক প্রাচারণের অনুবর্তন ছিল (ইন্দ্র সম্বন্ধে অবশ্য বাস্তবিকই এই কথা আছে!) তাঁহার নিকট হইতে মানুষ উচ্চ নীতি ও সত্য বিচার আশা করিতেও পারে না। এমনকি যে ইন্দ্র, চরিত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিসর্জন দিয়া তিনি ইন্দ্রের মনের প্রিয়পাত্র হইবার প্রয়াসী ছিলেন, — তাঁহার সহিত বরুণের মত দেবতার মৈত্রী কখনও সম্ভব হয় না। বরুণ সর্বদাই মানুষকে কর্তব্যের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কর্তব্যচ্যুত মানুষকে তিনি "বরুণপাশের" ভয় দেখাইয়াছেন এবং স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রকৃতিস্থ আদিম মানবকে সত্য ও ধর্মনীতির ভাবে পরিচালিত করাই তাঁহার মনের বাসনা ছিল। ইন্দ্র ও বরুণ যেন দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার প্রতীক। সাধারণ মানুষ যে এই বরুণকেই সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। এবং ইন্দ্রের প্রতি অনুমাত্রের বিমুখের কারণও বেশ বুঝা যায়। ইন্দ্র যে-সভ্যতার প্রতীক সেই সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিম্নতর, এবং যে-সকল আর্য ইন্দো-ইরানীয় সাধনাভূমি হইতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ভারতভূমি অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহারা যে এই নিম্নতর আর্য সভ্যতারই প্রতিনিধি ছিলেন তাহাও অনস্বীকার্য, কারণ তাঁহাদের আরাধনার মধ্যে ইন্দ্রই সর্বোচ্চ দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প সত্য ইন্দ্রপূজক আর্যগণ বেদে যে যাযাবর বৃত্তি তখনও সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করেন নাই, কারণ

যে ইন্দিরা একই মানে ব্যবহৃত হওয়া যদি তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ইহাই সর্বপ্রাচীন রূপ তাহা হইলে ইহাও সম্ভব যে ইন্দ্র-পূজকদের সহিত বিরোধ সত্ত্বেও আর্যদের একটি শাখা পূর্ব দিকে আরও অগ্রসর হইয়াছিল কি না দেখা। ঋগ্বেদে ইন্দ্র হইতেও এই সম্বন্ধে অনেকটা প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদে "গ্রাম" কথাটির অর্থ যে গ্রাম বিশেষ বসতি তাহা নহে। একটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া নিয়া এক জায়গায় লুকাইয়া রাখিল—এরূপ ঘটনার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। এবং আপন "গ্রাম" লইয়া ভ্রমণরত পথিক যাযাবর গরু অশ্বারোহণের বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

ইন্দো-ইরানীয় ইন্দ্র-পূজক আর্যদলই ভারত ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া যদি সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তবে তৎসঙ্গেই স্বীকার করা হইয়া যায় যে ইরানে আর্যদলের যে অংশ রহিয়া গিয়াছিল সেই অংশের প্রধান দেবতা ছিলেন বরুণ। এই বরুণকেই যে অসুর "অহুর মজ্দা" নামে অভিহিত করিয়া ইরানে সর্বোচ্চ দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে আজ সকলেই প্রায় একমত। কিন্তু বরুণ যখন ইন্দ্রের ন্যায় দুই দেবতা ছিলেন না তখন তাঁহার নামও বর্জন করিতে অসুর প্রথানী হইয়াছিলেন কেন? এবং অহুর কথাটিরই বা প্রকৃত অর্থ কি, এবং কোথা হইতেই বা কথাটির উৎপত্তি? আবেস্তা "দেব" এই শব্দের ন্যায় "অসুর" এই শব্দটি ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের নয় নহে। শব্দটি ইন্দো-ইরানীয় আর্যদলের নিজস্ব সম্পত্তি।

এই প্রশ্ন দুইটির প্রত্যেকটিই বহুবার আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোনটিরই একটি সর্বজনী-সম্মত উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। যে-ব্যক্তিই এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করিয়াছেন তিনিই অংশতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তরূপে প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্তমান লেখকের সিদ্ধান্তও অংশতঃ একটি অভিমত মাত্র। তাহার প্রত্যেকটি প্রমাণ এত দৃঢ় যে অবিসংবাদিত ভিত্তি হিসাবে উহাকে কোন সন্দেহের অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে যাহা বলিবার আছে তাহা এই যে প্রাক্-অসুরীয় ইন্দো-ইরানীয় যুগে ইন্দ্রপূজক ও বরুণ-পূজক আর্যদলের মধ্যে কোন সত্যের প্রকৃত বিরোধ কিছু ছিল না বলিয়াই মনে হয়, কারণ দেখা যায় যে পূর্বালোচিত মোয়াজ্-কয় প্রশস্তিপিতে ইন্দো-ইরানীয় আর্যদল সন্ধিপত্রে একই সঙ্গে ইন্দ্র ও বরুণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। আর্যসমাজ তখনই (অর্থাৎ পূর্বপুরুষ বিভীয় সহস্রকের মাঝামাঝি) ইন্দ্রাদি দেব-পূজক এবং বরুণাদি অসুরপূজক এই দুই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িলে ইহা সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। কাজেই বলিয়া লওয়া অযৌক্তিক হইবে না যে যদিও এই সময়ে ইন্দো-ইরানীয় আর্য সমাজে দুইটি বিভিন্ন ছন্দী ও ধর্মীয় প্রতিনিধিরূপে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ইন্দ্রপ্রমুখ দেব-গণ ও অর্বাচীন বরুণপ্রমুখ ইন্দো-ইরানীয় "অসুর"গণ পৃথক ভাবে পূজিত হইতেন, তথাপি কোন পক্ষের পূজা দেবতা ও পূজক সম্প্রদায় অপর পক্ষের পূজা দেবতা ও পূজক সম্প্রদায়ের সহিত যথাযথ চলিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে নাই। সংস্কারক অসুর কিন্তু দেব-পূজকদের সহিত সকল সম্পর্কের ছিন্ন পর্যন্ত লোপ করিয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবিত সংস্কৃত আর্যদের অনেকেই হয়ত একথা জানে স্বীকার করিবেন, কিন্তু ইন্দো-ইরানীয় সমবায় যুগে বরুণ যে ঋগ্বেদিত ইন্দ্রের সাহচর্যেই পূজিত হইতেন—যাহা মোয়াজ্-কয় প্রশস্তিপিতে প্রমাণিত হয়—এ-কথা অসুর ভুলিতে পারিলেন না। সেই জন্য আর্যোচিত সভ্য পথা অবলম্বন করিয়া তিনি বরুণকে ব্যক্তিরূপে অসুরদের দেবলোকে সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু বরুণের নাম উচ্চারণ করিলেন না, এবং অনুচর-দিগকেও শিক্ষা দিলেন যে বরুণের নাম উচ্চারণ করা

উচিত নয়। অসুরীয় ধর্মে বরুণের নাম কেন উল্লিখিত হয় নাই তাহা এইভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা বর্তমান লেখকের অনুমান মাত্র; প্রাচীন ইতিহাস হইতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যাহার বলে এই অনুমানকে কিছু সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বরুণ নামক দেবতাটিকে বরুণ এবং "অহুর" এই নামটিকে বর্জন করাই যদি অসুরদের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহা প্রয়োজন ছিল তাহা হইল বরুণের নূতন একটি নামকরণ করা। অসুর প্রবর্তিত বরুণের এই নূতন নাম হইল "অহুর মজ্‌দা"। এই নাম কোথা হইতে আসিল? অসুরদের পূর্বেও ইরানে এই নাম প্রচলিত ছিল কি? খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক ৭০০ অব্দের একটি প্রত্নলিপিতে অসুর (Assyria) সম্রাট অসুর-নাসিপাল "অসুর-মজ্‌দা" নামক একজন দেবতা (১) ও তাঁহার সাত জন শিষ্ট ও সাত জন দুষ্ট উপদেবতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই "অসুর মজ্‌দা" ও "অহুর মজ্‌দা" যে একই নাম তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং ঐ প্রত্নলিপিতে উল্লিখিত শিষ্ট ও দুষ্ট উপদেবতাগণ যে অসুরীয় ধর্মের সমসাময়িক উপদেবতা হইতে অভিন্ন তাহাও অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে অসুর কর্তৃক সংস্কৃত ইরানীয় আর্য ধর্ম খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের পূর্বেই অসুর-সাম্রাজ্যে সুপরিচিত ছিল। অসুরদের জীবিতকাল সম্বন্ধেও এই অসুরীয় প্রত্নলিপি হইতে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লাভ করা যায়। সকলেই জানেন, যে ইরানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী অসুর খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং এই কারণে অনেকের অসুরদের আবির্ভাবকাল রূপে যে কবি কিন্‌তেসের উল্লেখ আছে তাঁহাকে অধিকাংশ ঐতিহাসিক হখামনিষ্‌ বংশীয় প্রথম দরায়বেশ্‌ (Darius I) পিতা হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের পূর্বেই যদি অসুর-প্রচারিত ধর্ম ইরানের বাহিরে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে তবে অবশ্যই যে কিন্‌তেস অসুরদের আবির্ভাবকাল রূপে বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহাকে আর হখামনিষ্‌ বংশীয় সম্রাট কিন্‌তেস হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করা চলিবে না। এই সকল তথ্য আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক এডুয়ার্ড মেয়র যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এই যে ইরানীয় ঐতিহ্য যাহাই বলুক না কেন অসুর কিন্‌তেসের সাহায্য ও সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন তিনি সেই ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধ হখামনিষ্‌ বংশীয় সেই পূর্বোক্ত প্রতাপশালী কিন্‌তেস নহেন, এবং অসুর সম্রাট পক্ষে হখামনিষ্‌ বংশ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই ইরানে তাঁহার সংস্কৃত আর্য ধর্ম প্রচার করেন। সুতরাং অসুর-নাসি-পালের পূর্বোল্লিখিত প্রত্নলিপি হইতে অসুর প্রচারিত ধর্মের পরিচয় পাওয়া আদৌ আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে।

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে "অহুর" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধেও একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। আলোচিত অসুরীয় প্রত্নলিপি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে অসুর রাজ্যের বহির্ভাগে ইরানীয় আর্যগণের রাষ্ট্রগত বা ধর্মগত কোনও সংহতি ছিল না। কারণ যদিবা অসুরীয় রাজ্যের প্রত্নলিপিতে অসুরীয় ধর্মের উল্লেখই না থাকিবে কেন? তাহার উপর বলা যাইতে পারে যে অসুরীয়গণ খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতকের মাঝামাঝি হইতে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্যান্য কোন পর্বের এই পূর্ব হই সহস্র বৎসর সময় পশ্চিম এশিয়া প্রভাবিত

১। See Cambridge History of India, Vol. I, p. 70.

করিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের যে অসুরের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পায় নাই তাহার প্রমাণ আছে। সংস্কৃত "অসুর" শব্দ এবং গ্রীক asiloi শব্দ অতিরিক্ত ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের উপর অসুরীয় প্রভাবের একটি প্রমাণ, কারণ ভাষাতত্ত্বের অবিসংবাদিত রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে যে এই দুইটি শব্দই অসুরীয় "সিসু" শব্দ হইতে লব্ধ, যে-শব্দটি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেই অতি প্রাচীন যুগে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। অতিরিক্ত ইন্দো-ইরানীয় আর্যকালের সহিতও যে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে অসুরীয়দিগের সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল সে-বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে অসুরগণ ইন্দো-ইরানীয় আর্যকালের নিকট "সুর" শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিল। এই অসুরগণই খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথমার্ধে অসুর রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কাজেই অন্ততঃ ইন্দো-ইরানীয় আর্য সভ্যতায় অসুর প্রভাব প্রবেশ করার যথেষ্ট দিন উদ্বৃত্ত। যদি বলা হয় যে ঐ যুগেই অসুরীয়দিগের শ্রেষ্ঠ দেবতা অসুর-এর নাম "অসুর" (= অসুর) রূপে ইন্দো-ইরানীয়দিগের দ্বারা গৃহীত হইয়া তাহাদের নিজেদের যে-সকল দেবতা অপেক্ষাকৃত উচ্চ সভ্যতার প্রতীক স্বরূপ ছিলেন তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল — তবে তাহা অসঙ্গত অযৌক্তিক হইবে কি? উচ্চতর অসুরীয় সভ্যতায় যাহা একটি মাত্র দেবতার নাম ছিল, নিম্নতর ইন্দো-ইরানীয় সভ্যতায় তাহাই এক শ্রেণীর দেবতার সাধারণ নাম হইয়া উঠিল। এইরূপ ঘটনা ইতিহাসে বিরল নহে। রোমান সভ্যতার প্রভাবে গত জার্মান উপজাতির প্রধান দেবতা যে ওডিন বা যে নামে পরিচিত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জার্মান শব্দ "Kaiser" এবং রাশিয়ান শব্দ "Czar" রোমক নাম "Caesar" হইতে জাত। (৩) Julius Caesar-এর গোত্র নামটি তাঁহার মৃত্যুর পর রোমেই একটি সাধারণ নামে পরিণত হইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহার পরবর্তী প্রত্যেক রোম-সম্রাট Caesar নামে অভিহিত হইতেন; এবং পরে রোম-সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত জার্মানিদের মধ্যে "Caesar" এই নামটি রাজবাচক শব্দে পরিণত হয়; এমন কি ভারতের কুষাণ সম্রাট কণিষ্কও "কৈসর" (= Caesar!) এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন "কৈসর" এই কথাটি যেমন একজন বিখ্যাত পুরুষের নাম হইতে বিভিন্ন অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক জাতির মধ্যে একটি সাধারণ নামে পরিণত হইয়াছিল, আমার মনে হয় ঠিক সেই রূপেই মূলতঃ অসুরীয়-গণের শ্রেষ্ঠ দেবতা অসুরের নাম অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক ইন্দো-ইরানীয়দিগের মধ্যে তাহাদের উচ্চতর শ্রেণীর দেবতাগণের সাধারণ নাম রূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, এবং এই উচ্চতর শ্রেণীর দেবতাগণের মধ্যে যিনি উচ্চতম (অর্থাৎ বরুণ!) তাঁহাকে—হয়তো অসুরদের উপদেশ ও প্রেরণার ফলেই — অসাধারণ কেবল "অসুর" নামেই অভিহিত করিতে আরম্ভ করিল। অসুরীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ দেবতার নাম কেবল 'অসুর', 'মহৎ' এই কথাটি অসুরীয় ভাষায় "অসুর" শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং "মহৎ"-শব্দের অনুরূপ কোন শব্দ বৈদিক দেবতা বরুণের নামের অংশীভূত না

৩। মনে রাখিতে হইবে যে খৃষ্টপূর্ব যুগে লাতিন ভাষায় C এই বর্ণটির শব্দমূল্য সর্বত্র ছিল ক্; Caesar = কএসর, Cicero = কিকেরো, ইত্যাদি। খৃষ্টজন্মের পর এক শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই লাতিন ভাষায় তালব্য স্বরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ক্-বর্ণ স্-এ পরিণত হয়। এই জন্যই পরে "সীজার", "সিসেরো" প্রভৃতি উচ্চারণ সম্ভব হইয়াছিল।

বলিয়া বিশিষ্ট হওয়ার কোন কারণ নাই। (৫) অবশেষে নাম বিসর্জন দিয়া এবিষয়ে ইঙ্গিত দানের পরিচয় করিয়াই যে অহুরমজ্দা [illegible] হইয়াছিল তাহা নহে। ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের দেব-বাচক সকল শব্দই পরিবর্তে কুরিয়া চলিতে তিনি সমর্থ ছিলেন। "দেব" (=সংস্কৃত "দেব") এই শব্দটিও ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের একটি দেবতা-বাচক শব্দ। কিন্তু লক্ষ করিবার বিষয় এই যে অবেস্তার প্রাক্-জরথুস্ত্রীয় অংশে এবং প্রাচীন পারসিক শিলা-লিপিতে এই "দেব" শব্দের উল্লেখ থাকিলেও অবেস্তার জরথুস্ত্রীয় অংশে এটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। (৬)

"দেব"-পূজকদের অবমাননা এবং "দেব"-জাতীয় দেবতাদিগকে দানব প্রতিপন্ন করাই যে সংস্কারক জরথুস্ত্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইরান হইতে "দেব"পূজা কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল? পূর্বে এই কথা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ রূপেই ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু এখন বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে এই সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ দেখা যায়। এমন কি হখামনিষ্ সম্রাট্গণ নিজেরা যে জরথুস্ত্রীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও অনেকে আজ বিশ্বাস করিতে নারাজ, ঠিক যেমন সম্রাট্ অশোক যে কোন দিন বৌদ্ধ সম্রাট্ ছিলেন তাহা আধুনিক যুগে অনেক অস্বীকার করেন। অশোক সম্বন্ধে এই সন্দেহের প্রধান কারণ অশোক তাঁহার শিলালিপিতে কোথাও বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ করেন নাই, অথচ আজিকার দিনে যাহা বৌদ্ধধর্ম রূপে পরিচিত তাহা যে অন্ততঃ আংশিক ভাবে অশোকের পরিচিত ছিল সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বাস্তবিক ইহা কথঞ্চিৎ বিস্ময়ের বিষয় যে হখামনিষীয় সম্রাট্গণ তাঁহাদের শিলালিপিতে কোথাও জরথুস্ত্রের নামোল্লেখ করেন নাই, অথচ অহুর-মজ্দার নাম তাহাতে সর্বত্রই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে অহুর-মজ্দা যে-জরথুস্ত্রীয় ধর্মের প্রধান দেবতা সেই জরথুস্ত্রীয় ধর্মের একটি প্রধান অনুশাসন হইল এই যে দুষ্টকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া বা কৃমিতে প্রোথিত করিয়া অগ্নি বা ভূমি দূষিত করা একটি মহাপাতক; সেই জন্যই আজ পর্যন্ত জরথুস্ত্রীয় সমাজে দুষ্টদের অগ্নিদাহ বা কৃমিদাহ করা হয় না; অথচ হখামনিষীয় সম্রাট্গণ যে দুষ্টের শব শাস্তিতে কৃমিদষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই তাহার অকাট্য প্রামাণ্য রহিয়াছে। ইহা হইতে কি সন্দেহ হয় না যে জরথুস্ত্রের বহু শতাব্দী পরেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজবংশটি তাঁহার প্রচারিত New Testament পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই? তাহার উপর আরও বিচার্য এই যে "অহুর-মজ্দা" এই নামের উল্লেখ হইতেই হখামনিষীয় সম্রাট্গণের জরথুস্ত্রীয় অনুরাগ করার সমাক্ কোন কারণ নাই, কারণ ইহাও অসম্ভব নহে যে মজ্দা-বাচক এই নাম জরথুস্ত্রের পূর্ব হইতেই ইরানে প্রচলিত ছিল। এই তো গেল ইরানের রাজবংশের কথা। জনসাধারণের মধ্যেও যে ইরানে হখামনিষীয় যুগে জরথুস্ত্রপ্রচারিত অহুর-ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, কারণ ১২৩৮ সালে হখামনিষীয়

৫। ইরানীয় "অহুর"-শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। সংস্কৃত "মেধা" শব্দটির সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ইন্দো-ইরানীয় "অসুধা" হইতে ছাঁটা শব্দেরও উৎপত্তি সম্ভব। এতদনুযায়ী শব্দটীর অর্থ হইবে "অসুর অধিষ্ঠাতা"।
See Herzfeld, Altpersische Inschriften, p. 106.

রাজবংশের যে-নিদর্শনটি আবিষ্কৃত হইয়াছে(৬) তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পুরুষানুক্রমে পঞ্চম শতক পর্যন্ত এখানে বেদ-অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম যাহাতে কোনও রূপে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে "বেদ"-পূজকদের সকলেই যে ইরান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহা নহে। একটি সংখ্যালঘু "বেদ"-পূজক সম্প্রদায় ইরানে রহিয়াই গিয়াছিল। ধীরে ধীরে কত দিনে যে ইরানের এই সংখ্যালঘু "বেদ"-পূজক আর্য সম্প্রদায় আপনাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া "অসুর"-পূজকদের সমাজে বিলীন হইয়া গিয়াছিল তাহা আর নির্ণয় করার কোন উপায় নাই।

এইবার ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। গ্রীক-ইরানীয় "বেদ"-পূজক আর্যদলের অধিকাংশই যে ভারতে আসিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিলেন এই সিদ্ধান্তে আমরা পূর্বেই উপনীত হইয়াছি। কিন্তু অসুর-পূজক আর্যদলের কোন অংশই কি ভারতে আগমন করে নাই? এই কথা বিশ্বাস করা শক্ত। মনে রাখিতে হইবে যে বেদ-পূজক ও অসুর-পূজক আর্যদলের মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য আধুনিক যুগের শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাপেক্ষা অধিক কখনই ছিল না। দুই সম্প্রদায়ই ছিল একই সমাজের অন্তর্গত, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ, শিয়া ও সুন্নি, Catholic ও Protestant-এর মধ্যে যে-ধরণের পার্থক্য আজও পরিলক্ষিত হয়, খুব সম্ভব অসুর-পন্থী ও বেদ-পন্থী আর্যদলের মধ্যে পার্থক্য বা বিরোধ সেই ধরণেরই ছিল। অর্থাৎ মূলতঃ ধর্মগুরুটি ছিল অভিন্ন, যদিও আনুষ্ঠানিক আচারাদিতে এতদ্ব্যতীত অন্য নানা গৌণ ভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এ-অবস্থায় ভারতে যে অসুর-পূজক সম্প্রদায়ের আগমন একেবারেই ঘটে নাই তাহা কল্পনা করা যায় না। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে যে অসুর-পূজক আর্যদল অপেক্ষাকৃত উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিলেন, সুতরাং বৈষম্য সত্ত্বেও যে তাঁহাদের প্রতি বেদ-পূজকদিগের কোন শ্রদ্ধা ছিল না তাহা সম্ভব নহে। ভারতীয় বেদ-পূজকগণ যে তাঁহাদের আপন সম্প্রদায়ের ইরানিকদের "অসুর" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইতে বরং অনুমান হয় যে অসুর পূজকদিগের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা অতিরিক্ত মাত্রাতেই বর্তমান ছিল। হয়তো ঐ শ্রদ্ধা সম্ভ্রান্তের সকল প্রতি শ্রদ্ধা ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু সম্ভ্রান্তের সকল নিদর্শন হইতে যখন শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় তখন সেই সকল প্রতি শ্রদ্ধা মৌখিক হইলেও তাহার মূল্য আছে। বাস্তবিকই অসুর-পূজকদিগের নিকট হইতে বেদ-পূজকগণ যে বহু বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বিবিধ লক্ষিত বৈদিক সাহিত্যে পদে পদে পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে যে প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে অসুরদল সম্বন্ধে এমন কোন কথা নাই যাহা হইতে মনে হইতে পারে যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতীয় কোন নিম্নশ্রেণীর জীব রূপে পরিলক্ষিত হইতেন। অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও অসুরদিগের সম্বন্ধে যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক আর্যগণ অসুরদিগকে বেদজ্ঞ অপেক্ষা সর্ববিষয়ে সমকক্ষ বলিয়াই মনে করিতেন। অসুর সম্বন্ধীয় উপাখ্যানগুলির মধ্যে বিষয় বস্তুর কোন বৈচিত্র্য নাই। সকল-বিষয়-প্রধান সমস্যা এই যে অসুরগণ এমন একটি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল বা এমন ধরণের একটি যজ্ঞ সম্পাদন করিল যাহা সম্পূর্ণ বেদসম্মত নহে; তখন বেদজ্ঞ আক্ষণগণ বিসর্জন দিয়া কোন নীচ পন্থা অবলম্বন পূর্বক অসুরদিগের প্রদত্ত সেই শ্রদ্ধাটি অপহরণ করিল

৬। See Sukumar Sen, Old Persian Inscriptions, pp. 148-156.

যা তাহাদের বন্ধুটি নষ্ট করিয়া দিল। পরবর্তী যুগের সাহিত্যে দেখা যায় যে এই সব ব্যাপারে অসুরগণই সাধারণতঃ অপরাধী; কিন্তু প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যে অপরাধী প্রায় সর্বত্রই এই দেবগণ। বরুণ, মিত্র এবং আদিত্যগণ দেব ও অসুরের পার্থক্য বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থানেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত উল্লেখ একত্র করিয়া পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা এই যে অসুর-সভ্যতা ও দেব-সভ্যতা (অর্থাৎ অসুর-পূজক ও দেব-পূজকদিগের সভ্যতা) একই সভ্যতার দুইটি রূপ। বৈদিক সাহিত্যে "অসুর" বা "আসুরিক" শব্দের প্রকৃত অর্থ "abnormal" "supernormal"; কোথাও যে এই শব্দ দুইটী প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে "অসংযোচিত" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমার জানা নাই।

প্রথম প্রশ্ন এই যে কোন অসুরপূজক আর্য সম্প্রদায় ভারতে স্থায়ীরূপে বর্তমান না থাকিলে অসুর-সভ্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় আর্যদিগের এই সুস্পষ্ট ধারণা সম্ভব হইত কি? অবশ্য ভারতে আর্যোপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর ইরানের সহিত ভারতের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকিলে এই প্রশ্ন উত্থাপন করারই প্রয়োজন হইত না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ভারতে আর্যোপনিবেশের পর ভারতের সহিত ইরানের পূর্ব সম্বন্ধ এমন ভাবেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল যে বিস্তীর্ণ বৈদিক সাহিত্যে ইরান সম্বন্ধে পরোক্ষ উল্লেখও প্রায় পাওয়া যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে বেদ-পূজক আর্যগণ যখন সদলবলে ভারতে আসিয়া এই দেশ অধিকার করেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে অসুর-পূজক আর্য সম্প্রদায়ের এক অংশও আসিয়া করিয়াছিল এবং ভারতে এই বিরুদ্ধপক্ষীয় অসুর-পূজক আর্যদিগের অবস্থিতি বশতই অসুর-বর্মের স্মৃতি এখানে ম্লান হইয়া যায় নাই। ইহা অবশ্য বর্তমান লেখকের অনুমান মাত্র। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, এবং কোনদিন যে এমন একটি প্রত্নলিপি আবিষ্কৃত হইবে যাহা হইতে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে ইরানে যেমন ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বেদপূজকগণ তাহাদের পূর্বস্মৃতি ও আচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল ভারতেও সেইরূপ অন্ততঃ বৈদিক যুগে অসুর-পূজক আর্যদিগের পূর্বস্মৃতি আচার ও সভ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল — তাহারও বিশেষ কোন আশা নাই। কিন্তু বেদ ও অবেস্তার তুলনামূলক আলোচনা করিলে এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত এতই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে তাহার উল্লেখ না করাই একটা অস্বাভাবিক ঔদাসীন্যের লক্ষণ রূপে বিবেচিত হইতে পারে।

অসুর সম্বন্ধে আর একটি লক্ষণের আলোচনা করিয়াই এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। "অসুর" এই কথাটি যে প্রথমে একটি দেবতাবাচক শব্দ ছিল তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এবং পরে ইহা যে ক্রমশোভাবে একটি মূল্যার্থক শব্দে পরিণত হইয়াছিল তাহাও প্রদর্শনবিধিত। এই পরিবর্তন কেন ও কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? অসুরদিগের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল মায়া। বেদে এই কথাটির প্রাথমিক অর্থ হইল অলৌকিক শক্তি। কিন্তু মায়া বলিতে সর্বত্র অলৌকিক শক্তি বুঝাইত না। যে-অলৌকিক শক্তি হলে ইন্দ্রজালের রূপ পরিগ্রহ করা যায় মায়া বলিতে প্রথমতঃ কেবল সেই অলৌকিক শক্তিই বুঝাইত। এই মায়া সকল দেবতারই আভাবিক বস্তু ছিল, কিন্তু ইহার প্রকৃত অধিকারী ছিল অসুরগণ। অবেস্তে 'অসুরমায়া', 'দেবমায়া', 'তুরমায়া' প্রভৃতি শব্দ আছে, কিন্তু 'দেবমায়া' বলিয়া কোন শব্দ নাই। অথচ ইন্দ্রাদি দেবগণ যে অসুরদিগের এই মায়া নিজেরা প্রয়োগ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না তাহা 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' ইত্যাদি বিখ্যাত মন্ত্র হইতে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয়। বহু স্থলে আবার

যারা অর্থটির অর্থ হইল অলৌকিক শিক্ষাগুরু, যারা অসুরদের ধর্মটি নির্মূলে প্রয়াস করিয়া দেবতাদিগকে ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিত। সুতরাং যারা-বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও তৎপ্রতি দেবতাদের মনে তীব্র বিদ্বেষও একটা ছিল, এবং যারা যেহেতু ছিল অসুরদের নিজস্ব সম্পত্তি সেই জন্য ঐ বিদ্বেষ "অসুর" শব্দেও সংক্রামিত হইয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় "অসুর" শব্দটি ক্রমে নিন্দাবাচক শব্দে পরিণত হয়। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে এই শব্দটি ভারতের অনার্য আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইত বলিয়া মনে হয়। ঐতরেয়, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে একটি অদ্ভুত বাক্য বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে। সেটি হইল "অসুরা বৈ দেবা ইতি পরাবভূবুঃ"। বাক্যটির অর্থ বোধ হয় এই যে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অসুরগণ "হে অসুর" এই সম্বোধনের দ্বারা বিজেতা দেবতাদের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মুখ দিয়া "অসুরঃ" শব্দ বাহির হইল না; যাহা বাহির হইল তাহা "অসুরঃ"। অথবা এই বাক্যের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে "অসুরঃ" কথাটি শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে না পারায় অপরাধেই অসুরগণ দেবতাদের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠে নাই। ইহার মধ্যে যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় তাহা হইল ঽ-স্থানে ল-এর প্রয়োগ। ইহা ছিল পূর্ব-ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ — যে লক্ষণ পুণ্ড্রোদ্ভব কথিত প্রাকৃত ভাষাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। মনে হয় যেন পূর্ব ভারতের যে-সমস্ত অনার্য জাতি আর্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহাদের উচ্চারণ করিয়াই এই বিশেষত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু ঽ-এর স্থানে যাহারা ল উচ্চারণ করিত তাহারা যে অসুর-পূজক ইরানীয়দের জ্ঞাতিস্থানীয় ছিল তাহা স্বীকার করা যায় না, কারণ ইরানীয় আর্য ভাষায় যাহা বাস্তবিক ঘটে তাহা হইল র-এর স্থানে ঽ-এর উচ্চারণ। সুতরাং বলা যাইতেছে যে বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ভারতীয় আর্যগণ অনার্যনিবাসকেও "অসুর" নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যুগের প্রথম ভাগে কিন্তু "অসুর" বলিতে যেমোটেই অনার্য বুঝাইত না। "অসুরবিদ্যা" ও "যারা" তখন সমার্থক শব্দ ছিল, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও এই অসুর-বিদ্যার প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, ইন্দো-ইরানীয় যুগে অসুর-পূজক আর্যগণ যে উচ্চতর সভ্যতার অধিকারী ছিলেন তাহার স্মৃতি ভারতীয় আর্যদলের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, এবং খুব সম্ভব অসুর-পূজক আর্যগণ কিয়ৎপরিমাণে ভারতেও আসিয়াছিলেন বলিয়াই অসুর-সভ্যতা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ সর্ব-বিষয়ে এত সচেতন ছিলেন।

ইন্দো-ইরানীয় যুগের আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই বলিবার ও আলোচনা করিবার আছে। তবে ভারতীয় আর্য সভ্যতা সম্পর্কে এই সম্বন্ধে যাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য তাহা এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য আলোচিত হইয়াছে আশা করি। এইবার বিশেষ ভাবে ভারতীয় আর্য সভ্যতার আলোচনা আরম্ভ করিতে হইবে।

ডাক্তারের কীর্তি

(ফরাসী গল্পের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে)

শীঘ্রই ডাঃ হার্লিঙ্গ-হিলের অদ্ভুত মোকদ্দমার বিচার হইবে — লণ্ডনের পৃথক বিচারালয়ে। ঘটনাটা এই।

ফলফুল-শোভিত ঘর যাহার তাহার বিশেষত্ব বলিয়া উক্ত ডাক্তারের অগাধারণ পসার হইয়াছিল। গত যে মাসের কিস তারিখে তাঁহার ঘরে ভাবনা-সংলগ্ন ছইটি বৃহৎ কক্ষে রোগিদের ভিড় কিছু বেশিই হইয়াছিল — প্রত্যেকে আপন-আপন সময়-নির্দেশ-করা কার্ড হাতে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

প্রবেশ-দ্বারে কালোমুখের পরা ব্লক-কোট-পরা, ডাক্তারের একজন কর্মচারী দাঁড়াইয়াছিল — দর্শনীর টাকা আদায় করিবার জন্য। সে প্রত্যেকের নিকট হইতে গিনি লইয়া একটি ক্ষুদ্র ও সুদৃশ্য বেসিনের উপর একবার মাত্র বাজাইয়া, এবং 'ঠিক আছে' বলিয়া, যথাস্থানে তাহা ফেলিয়া দিতেছিল; ফাটো ঠিক ঘড়ির মত করিয়া যাইতেছিল। ডাক্তার দেখিবার তাঁহার ডেস্কের সম্মুখে খাড়া হইয়া আসন লইয়াছেন। অফিস-কক্ষটি ফাঁক দিয়া দেখা; আপনী টবে বসানো নানা আকারের উদ্ভিদ চারিদিকে জানালার পাশে সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট টেবিলে তাঁহার সেক্রেটারী বসিয়া আছে — সে পড়িবামাত্র ডাক্তার অতি-সংক্ষিপ্ত মৌখিক প্রেসক্রিপশন তাড়াতাড়ি লিখিয়া লইবে। ঘরের বাহিরে লালে বসন্তের পর্দা ঝুলিতেছে, তাহার আংটাগুলি ধাতুনির্মিত। দ্বারের মুখে একজন ভীমকায় আরদালি দাঁড়াইয়া: ডাক্তার সাহেবের মুখে যেমনই 'এর পর কে?' — এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, অমনি সে চলৎশক্তিহীন রুগ্ন-রোগীটাকে ধরিয়া একেবারে বাহিরের সিঁড়ি-পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে, সেখান হইতে একটা শক্তিমান-যুক্ত 'এলিভেটার'-এর সাহায্যে তাহাকে একেবারে নীচে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রত্যেক রোগীর চক্ষু জ্যোতির্হীন; কোমর হইতে দেহের উপরিভাগ অনাবৃত — সাহায্যকারী দ্বারের উপরে রাখিয়াছে। নিকটে আসিবামাত্র তাহাদের বুক ও পিঠে গেলিসিটার এবং একটা নল-যন্ত্র লাগানো হইতেছে।

"টিক্! টিক্! ব্লাক্! — জোরে নিশ্বাস লও — ব্লাক্! আচ্ছা, হয়েছে।"

ইহার পর, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে যাবতীয় মুখ-দুখই দেখা হইয়া গেল, এবং তাহার পরেই আবার সেই বহুপরিচিত হুঙ্কার — "এর পর!"

তিন বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন সকালে, ঠিক এমনই ভাবে, ঐ এক রোগীর দল, নয়টা হইতে ঠিক বারোটা পর্যন্ত, সারিবদ্ধ ভাবে ডাক্তারের ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

হঠাৎ সেই দিন — সেই ২০শে যে তারিখে — ঠিক যখন নয়টা বাজিতেছে, একটা ফড়ালসার বিরাট মূর্তি ডাক্তারের সেই রোগি-দর্শন-কক্ষে সহসা আবির্ভূত হইল। তাহার চোখের তারা ছুটা কিছু বিস্ফারিত, গাল ছুটা গর্ত হইয়া আরও ভিতরে ঢুকিয়াছে; তাহার নগ্ন বক্ষ-পঞ্জর ঠিক একটা খাঁচার মত, সেই খাঁচার উপরে যেন একটা পাতলা পার্চমেণ্ট জড়ানো রহিয়াছে; কাশি চাপিয়া রাখার জন্য কণ্ঠ ঘাড়-বাহুতে সেই মুখও একটু ঢেলিয়া উঠিয়াছে। এক কথায়, তাহাকে দেখিলে মনে হয়

না যে, এ একটা ভীষিত প্রাণী। তাহার বিবর্ণ হাত দুটোর একটাতে একটি পক্ষলোমবিশিষ্ট বহুদূরা বীভৎসের অস্ত্র তাঁক্ষ-ফলা ধরিয়াছে। মুখের ভিতরকার সেই তীব্র-কালো একটা গর্তের প্রকাণ্ড গহ্বর মেলিয়া সে কোন ভয়ে খাড়া হইয়া রহিল।

"টিক্! টিক্! টাক্! না, করিবার আর কিছু নাই?" — ডাক্তার যেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন। "আমাকে কি ওদেশের ডাক্তি করিতে হইবে? দুদুর পরে ইহার যে পরীক্ষা করিয়া রায় দিতে হইবে! কার এক সন্তানের মাথা ঐ কিটার পড়ে খরিয়া যাইবে, আর একটিকিটা তাঁ আঁখুড়া বইয়া দিয়াছে! ... এর পর?"

দুজন রোগীকে পাচার করিতে বলিতেছিল; এবার সেই অধিকন্তু চিকিৎসক নিজের কপালে একটা হাত দিয়া কম্পিত স্বরে আরও একটা কথা বলিলেন — মুখ যেমন একটু ঘুরাতে দেখা গেল।

"যদি টাকার জোর আছে"

হাসাহীন রোগিটি অকস্মাৎ টীৎকার দিল,

"আমি একজন মহা-কোটিপতি।"

এমন ব্যক্তিকেও ডাঃ ছাদিয়ম-হিল একটু আগে পৃথিবী হইতে এক কথায় বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন!

"তাহা হইলে, এখনই তুমি তোমার গাড়ী করিয়া ফিরোরিয়া ষ্টেশনে চলিয়া যাও। তোমার-এক্সপ্রেস ধরিতে পারোচোর। তারপর টীয়ার — 'ক্যাসে' হইতে 'মাদ্রিদ' পর্যন্ত ট্রেন। পুরাইবার কামরায় উঠিবে — তাহাতে যাতায় গরম রাখিবার জন্য ষ্টোভ থাকে। তারপর একেবারে 'সীল্'-পয়ন্ত। সেখানে দুটি মাস কেবল দিবারাত্র — water cress; আর কিছু নয় — রুটি, মদ, ফল, মাংস — কিছু নয়। একদিন অন্তর এক 'চামচ দুধির জল — তাহা করিয়া আটদিন খাইয়া যাইবে। আর কেবল ঐ ওয়াটার-ক্রেস্, ওয়াটার-ক্রেস্। ছাড়িয়ে ওর অন্য খেতে — বুঝলে? ঐ একটা জন্তুর মাংস, যদি তা'তেও! — এই যে এক চিকিৎসার ফল উঠিবে, ওর রীক-তাকে তার কালাপালা হয়ে যেতে! ওটা কি আবার একটা চিকিৎসা! তোমার বাড়ি আর কোন আসাই নেই, তাই তোমাকে ওটাও করে দেখতে বলছি — যদিও আমি নিজে একবিন্দুও বিশ্বাস করি নে। হ'তেও বা পারে! জগতে অসম্ভব বলে' ত কিছু নেই! — এর পর?"

সেই মন্ত্রাহতী ধন-কুবেরটিকে অতি সন্তর্পণে সেই এলিভেটারের ছাউনির মধ্যে বসাইয়া দেওয়ার পর আবার সেই রোগির দল স্রোতের মত প্রবেশ করিতে লাগিল।

* * *

'ছয়মাস পরে, ওরা মাসের তারিখে আবার ঠিক দশটায় ঘড়িতে নটা বাজিতেছে এমন সময়ে একটি মহীয়াবলের মত পুরুষ, প্রবেশপথে মা দেখাইয়াই, সেই দুর্ভাগা রোগীদের ভিড় ঠেলে করিয়া যেন একটা মানুষ-বোঝাই ঘর সবেগে ডাক্তারের সেই দেবমন্দির-তুল্য কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠস্বর এমন বিপুলকণ্ঠ হর্ষোচ্ছ্বাস যে, তাহার আওয়াজে দেয়ালের কাচগুলা ঝাঁঝিয়া উঠিল, টেবিল পায়াগুলা কাঁপিতে লাগিল। বিরাট বপু, গালভরাট টাবা-ট্যাবা, মূল্যবান পশমেরের পরিচ্ছদ — সে এক অপরূপ মূর্তি। বিজ্ঞানের বরপুত্রটি, তাঁহার সেই কালো-জরির পোষাকটিতে দীর্ঘ নিমাবন করিয়া টেবিলের সম্মুখে খাড়াটি আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আগন্তুক দুই বাহু দিয়া তাঁহার সেইটা ধরিয়া একটা পালকের মত তুলিয়া ফেলিল, এবং ডাক্তারের বিবর্ণ বিবর্ণ গাল দুটা অজস্রধারে চুমাইয়া দিয়া, নীরবে তাহাকে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল। অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেও তাহাকে তখন যেন একজন 'মর্যাদান বাবে'র মত দেখাইতেছিল — তাহারও ঠিক এই রকম

করিয়া রোগীদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতঃপর সে ডাক্তারদের প্রায় ডিক্টিশনারী অবস্থার চেয়ারে বসাইয়া দিল।

ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে বলিল, — "হিপ্ হিপ্! না হিপ্ হিপ্! বলুন, কয় চাম?"

সে যেন একটা জীবন্ত বিজ্ঞাপন — যেমন প্রহার তেমনই ভাল! "শুনুন, আমি আপনার সামনে অবশ্য এসে বসি! আজ যে আমি এই অবধি আজ এই মাত্রায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, পরিপূর্ণ আহার, প্রাণে যেন স্ফূর্তি, যেন থাকার এই আরাম — এসব কিসে পেয়েছি জানো কৌস্তুভ? আপনি বলুন কি চান? এর একটা টাকার নাম করলে আপনি মনে করতেও পারেন না। এ উপকারের প্রত্যুপকার করবার জন্যে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে।"

অনেক বিনিট মিনতি করিয়া পায়ের ধূলা ডাক্তারের পীত কণ্ঠে বলিলেন —

"আরে, ডাইনো! এ সোণাচাঁদ পাগলা একটা! বাড়ীওয়ালার কাছে!"

ডাক্তার তখন দুইবেলার মত ঘুমি পাকাইয়া ধমক দিয়া উঠিল "আ, খবরদার! কথা বলো না!"

চাট গুটিয়া কুণ্ঠা করে বসিয়া গেল।

"এ যে দেখছি, আমার জীবনদাতাও আমাকে চিনতে পারেন নি! আমি সেই water-cress-এর ঝোলী — সেই অজান, যার আর কোন আশা-ভরসাই ছিল না! আমি আপনার চিকিৎসার জোর পেয়েছি — শুনুন, আপনি কি অসাধ্য-সাধন করেছেন! এই দেখুন, কাল পেতে শুরু একবার —"

বলিয়াই আপনার বক্ষে এমন জোরে মুষ্টাঘাত করিলেন, তাহাতে একটা বিলাতী মুরগ যন্ত্রণা চূর্ণ হইতে পারে।

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন,

"আঁ! তুমিই সেই — সেই মুতপ্রায় রোগী যাকে —"

বৈদ্য চীৎকার করিয়া বলিল,

"হাঁ আমিই — একলো-বার! আজার বাজে কাল সকাল সময় টাকার থেকে মেরে প্রথমেই আমি আপনার একটা রোগের মূর্তি গড়ে দেবার জন্যে অর্ডার দিয়ে এসেছি: আসবার, যাতে প্রফেসিয়ালিটীর আপনার কষ্ট হয় তার জন্যে একখণ্ড ফিরির ব্যবস্থা আমি নিজের খরচে করেই।"

একটা প্রকাণ্ড লোকার উপরে বসিতেই লোকার স্প্রিংগুলা বেশ দোলাইয়া উঠিল। একটা পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, চারা মুখখানা সভীর আনন্দের হাসিতে ভরিয়া অতঃপর সে বলিল, "আঃ, বেঁচে থাকার মত সুখ আর আছে!"

ডাক্তার অভিনিবেশ করে আরোগ্যটি কি ভাবিয়া তথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার সেক্রেটারী মহাশয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘটা নির্জ্জন হইলেই, ডাঃ ডালিয়ন-হিল অনেক লেকচার তাঁহার এই রোগীটির দিকে নীরবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার চোখ আজই এত সুখ আলোকে হইয়া গিয়াছে — চোখের চাহনি যেন অন্যরূপ! তারপর, তাঁহার অস্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে প্রায় অস্ফুট ভাবে বলিলেন, "হেলো, তোমার কপালে একটা মাছি বসিয়াছে, আলো ওঁকে তাড়াইয়া দিই" — বলিয়াই তাহার দিকে সবেগে ঝুঁকিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হইতে একটা ছোট 'ঘুস-ঘস' বিকটশব্দ বাহির করিয়া, নিমেষের জন্য তাহার ডানদিকের গণ্ড চাপিয়া ধরিলেন, খুব জোর ঘুষিবার আওয়াজ করিলেন। রোগীটা লাফিয়া পড়িয়া গেল, আঘাত খুলিটা চূর্ণ হইয়া তাহা হইতে অমেকখানি রক্তস্রোতপূর্ণ মিশ্র কার্পেটের উপরে চারিপাশে ছিটকাইয়া পড়িল। হাত দুইখানা একবিনিটকাল বেগের উপর তুলিয়া রোগটা স্থির হইয়া গেল।

মস্ত বার শেক ঝাঁচি চালাইয়া তাহার অঙ্গের কোট ওয়াস্কোট প্রভৃতি যতকিছু পোষাক আসিয়া

কেবল সব, বুড়োমানুষ একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছে। সাহেব মহাশয় অতি গম্ভীরমুখে তাঁহার 'বিরতি'-খানা লিখা একটানে উপর হইতে তলা পর্য্যন্ত টানিয়া কেলিলেন।

মিনিট পনেরো পরে পুলিশ যখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাক্তারকে অতি সন্তর্পণে তাহাদের সহিত যাইতে অনুরোধ করিল, তখনও ডাক্তার অতি ধীর বিরক্তভাবে তাঁহার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছেন; হাতে একটা বড় শক্তিশালী ম্যাগ্‌নিফাই-গ্লাস; একখানা টেবিলের উপর একজোড়া সুদৃশ্য চশমা পড়িয়া রহিয়াছে; ঐ কাচের ভিতর দিয়া অতিশয় মিনিট মনে তিনি তাহা পরীক্ষা করিতেছেন — যেন বিজ্ঞান-সেবক এই মানব-মহাপুরুষের চক্ষে একটা বড় রকম কেস করিতে যাপৃত আছেন। সে সব কিছুই নয় — দরকারীয় কুলহুসের উপরে water proof-রাখক কেরের ঐ বিষয়কর ক্রিয়ার স্বরূপ-উদ্ঘাটন।

পুলিসের কথায় তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং তাহাদেরই সম্বোধন করিয়া বলিলেন —

"দেখ, ঐ লোকটাকে যদি ফেরত দেওয়া বড়ই আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম, — মনুষ্যজাতির কল্যাণ-নিমিত্তের একটি উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য উহার ঐ রোগযুক্ত দেহটা অবিলম্বে জীবন্ত থাকা না করিলে কোন কথাই হইত না। এই জন্য — আমার স্বীকার করিতে আপত্তি নাই — আমি এ কেসে হস্তক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।"

* * *

বলা বাহুল্য, এরোন ব্যারোমাস ডাক্তারকে নামমাত্র জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ, তাঁহার মত মহাপুরুষকে আটক না রাখিয়া মুক্ত রাখিলেই কাজের সুবিধা হয়। এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এখনে ব্রিটিশ বিচারপতির বিচারাধীন আছে। অহো! এই সম্পর্কে আইনের কত সূক্ষ্ম ধারা নানা ভাষাদের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইবে!

সবদিক দিয়াই আমাদের আশা হইতেছে, এমন একটি মহৎ অভিপ্রায়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছে যে অসম-সাহসী বীর, ইংরেজ জাতি তাহাকে কখনই ফাঁসি যাইতে দিবে না। কারণ, তাহারা ইহা নিশ্চয় বুঝে যে, মানবজাতির প্রতি ঐকান্তিক প্রেমবশতঃ, তাহাদেরই তনিষ্টে অমঙ্গলবিধানের জন্য, বর্ত্তমানে কোন একটা ব্যক্তির জীবন তুচ্ছ মনে করা আজিকার দিনে এমন একটি উৎকৃষ্ট রীতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিকের এরূপ নৈশাচিক আচরণ অসাধারণই পরিচায়ক।

বৈকালের আকাশে নীড় হইয়া মরকুমার দেখিলেন, চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়াছে; তাহারা নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে — কিন্তু সব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকে সব হইতে হইবে। ··· কাপালিক মরকুমারকে দূর হইতে করিতে আহ্বান করিল। মরকুমারকে অগ্রসর করিতে দেখিয়া কাপালিক কহিল,

"দূর্ব্ব! কি জন্য বল প্রকাশ কর? তোমার জন্য আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

— কপালকুণ্ডলা।

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে ; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গতযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

হিন্দুর একনিষ্ঠা

[এই প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক — স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়। প্রবন্ধটি ঠিক এই সময়ে পুনর্মুদ্রিত করার একমাত্র কারণ, ইহাতে ভারতীয়তা, অর্থাৎ হিন্দুত্বের একটি বিশেষ পরিচয় আছে। যাহারা দার্শনিক ভাষা পাঠক-সাধারণের পক্ষে অপরিচিত বলিয়া মুখ ফিরাইবেন, তাঁহারা যদি ইহার মূল-কথা বা তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সে তাৎপর্য এই যে, হিন্দু কখনো 'বহু'কে ত্যাগ করে না — তাহার একনিষ্ঠা এমনই দুর্ধর্ষ। তাই হিন্দুস্থানের কখনো কোন বিদেশী ভূখণ্ডের একীকরণের ঐকান্তিক কামনা করে নাই। আজ পলিটিক্সের পাল হিন্দুর সেই হিন্দুত্বকেও যেমন অস্বীকার করিতেছে, তেমনই, ভারতের ভাষাগুলি যদিও সংস্কৃত ভাষাকে ত্যাগ করিতেছে। এই এক কথাই বাংলার আরও দুইজন মনীষী — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বিপিন চন্দ্র পাল — বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধগুলি আমরা ইতিপূর্বে 'শ্রুতি-স্মৃতি'তে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই সম্পর্কে, আমরা পাঠক-পাঠিকাদিগকে একটি মহাকথা স্মরণ ও মনন করিতে বলি — আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর সেই দিব্য-অবদানের কথা। এই বাঙালীই আধুনিক কালে ভারতের সেই শাশ্বতী সাধনা — ভারতের সেই আত্মাকে আবিষ্কার করিয়াছিল, আর কেহ তাহা পায় নাই। রামমোহনে তাহারই সূচনা, বঙ্কিমচন্দ্রে তাহার আবর্তনা, এবং বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথে তাহার শেষ অভ্যর্চনা। আজ যেমন বাঙালীর জাতি গিয়াছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও জাতি গিয়াছে ; তাই হিন্দু-সাধনাও আজ ভারতবাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। ব: স:]

কতকগুলি চটুলচাটুবাক্যে-মুখরিত সভাগৃহে হিন্দুজাতির মহিমা, সময়ে অসময়ে, পরিকীর্তিত হইয়া থাকে। চাটুবাক্যোপজীবী বাগ্মিগণ "আমরা হিন্দু," "আমরা আর্য," "আমরা শ্রেষ্ঠ" প্রভৃতি গৌরবমন্ত্র শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আর্যদিগের শ্রেষ্ঠত্ব

কোন্ প্রতিষ্ঠান, কোন্ মতে পরিচালিত, তাহা হইতে বেশ একটা ব্যক্তিনির্বিশেষ সমষ্টিগত পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন বিষয় বর্ণিতে গেলে, দুই প্রকারে বলা যায়। "নেতি" "নেতি" — ইহা নয়, উহা নয়, তাহা নয় — ইহাকে বলে বস্তুর লক্ষ্যলক্ষক পরিচয়। আবার বস্তুটি এইরূপ, ওইরূপ, — ইহাকে বলে স্বরূপ-পরিচয়।

হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা অগ্রেই বলা হইয়াছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন ধর্মমতের অপেক্ষা রাখে না। ব্রাহ্মধর্মের বেদান্তের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তত্রাচ ব্রাহ্মগণ কেহই খাঁটী হিন্দু নহেন। বৈষ্ণব-চূড়ামণি রামানুজ বেদান্তের অদ্বৈতবাদী আচার্যদিগকে মায়াবাদী ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখনও দাক্ষিণাত্যের কোন বৈষ্ণব শিবমন্দিরের দ্বারস্পর্শ এবং শৈবদিগের সহিত আহারাদি করেন না। মধ্বাচার্য্য তাঁহার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চ-মকারসাধক ছাগমহিষভক্ষণকারী শাক্তের সহিত নিরামিষাশী বৈষ্ণবের এক প্রকার সে, ধর্ম্মায় মিলাইয়া উঠে না। কিন্তু সৌর ও হিন্দু-শাক্ত ও হিন্দু বৈষ্ণব ও হিন্দু—এবং জৈনকেও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। যদি মতামত লইয়া হিন্দুর গঠিত হইত, তাহা হইলে হিন্দু-সংজ্ঞা অনেকদিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

হিন্দুর হিন্দুত্ব আহার-পান-বিহারের উপরেও নির্ভর করে না। এক মহাম্মাদ-ভক্ষণ ব্যতীত খাদ্যাখাদ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। শিবেরা শূকরমাংস ভক্ষণ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কুকুটমাংস ভোজন করে। শিবেরা তামাকু সেবন করে না, কিন্তু মদিরা পান করে: দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা মদ্যপায়ী বলীয় ব্রাহ্মণদিগকে পতিত ও নষ্ট মনে করে। এমন কি পুরাতন সাহিত্যকারগণ মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণদেরও বিধি নিষেধ দিয়াছেন। এখন তাহাকে হিন্দু বলিব, এবং তাহাকে হিন্দুর হইতে অপসারিত করিব! মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বা শিখদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুজাতি যে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-শূন্য হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যদি হিন্দুর ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এবং জন্মাবচ্ছিন্ন বিধিনিষেধের উপর নির্ভর না করে, তবে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? কোন্ আদর্শে হিন্দুর জাতীয়তা আদর্শিত আছে?

হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং তৎসম্পর্কিনী একনিষ্ঠতা। এই প্রবন্ধে হিন্দুর একনিষ্ঠতা সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। কিন্তু কিরূপে সেই একমুখীন আধ্যাত্মিক বর্ণাশ্রমবিধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে রক্ষা করিয়াছে ও এখনও রক্ষা করিতেছে, তাহা যথাসময়ে পর্য্যালোচিত হইবে।

স্পেন্সার বলেন, মানুষ নিজের বিধি অনুসারে চিন্তা করে। সেই সকল অপরিবর্ত্তনীয় বিধি অতিক্রম করিলেই ভ্রম-প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক — বর্ণনচিন্তাবিধি একই। এই নির্দ্ধারণ কেহই অস্বীকার্য্য। তথাপি হিন্দু-চিন্তাপ্রণালীর বিশেষ আছে। এই বিশেষত্বের উপরে হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-বর্ণনে বিষয়ের পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু প্রণালীগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দুইটী পক্ষী এক নীড়ে বাস করিত। একটি পক্ষপুট বিস্তার করিয়া উড়িয়া অনন্তের দিকে উঠিল, অবাকাশ ছাড়াইয়া প্রত্যাবর্ত্তনশক্তি অতিক্রম করিয়া ছায়াপথে পড়িল। ঐ নিবিড়ীন শূন্যে আনন্দের গভীরতায় ডুবিয়া বলিল — অনন্ত পরমেশ্বরে ভূমানন্দ, অসীমানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আর একটী পক্ষী উড়িল বটে, কিন্তু পক্ষিণী বিশ্বনিয়ন্তা

পরিক্রমা করিল, অবশেষে আষাঢ় অনুসন্ধানে। কত সৌন্দর্য, কত সম্ভব, কত কার্যকারণঘটিত ঘটনা দেখিল। প্রকৃতির মায়াপুরী-দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্থির করিল — অনন্তের অখণ্ড সময়ে, লোকে, সমস্যে বিহিত আছে। প্রথমটি আর্ষ ঋষি, দ্বিতীয়টি ঘুরোপী বা গ্রীক দ্রষ্টা।

দুইটি বন্ধু একদিন অজানা-নির্দেশোদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিল। একটি বুঝিল, পরীরেখা হইতে পরীরেখার প্রবেশ করিল; সেখে অজর-চলনের আগত এবং পুরীভূত। অপরটি পারমুখ-জ্যামিলাভ-বাসনায় ক্রম-সঞ্চয় করিল। প্রথমশ্রেণ্যপ্রতিরোধী বলের সহিত উহার দুরন্তাবাসনকে যুক্ত করিয়া সম্বন্ধ করিতে করিতে অকূল পাথারে হারাইয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া অনন্তের বিস্তারহীন এই নিষ্কারে উপনীত হইল। প্রথমটি প্রাচ্য হিন্দু, দ্বিতীয়টি প্রতীচ্য দর্শন।

কোন একটি বস্তুর অবলম্বনে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা হিন্দুর বিশেষত্ব। আর, একের সহিত অপরের সম্বন্ধ জানা এবং সম্বন্ধের ভিতর দিয়া দেখা দর্শন করা ঘুরোপীয় দর্শনের বিশেষত্ব। প্রথমের লক্ষ্য একনিষ্ঠতা বা অন্তর্ধান, দ্বিতীয়ের বহুনিষ্ঠতা বা সমাধান। হিন্দু সূর্যের স্বপ্রতিষ্ঠাটি উপলব্ধি করিয়া সূর্যের সাযুজ্য লাভের বিষয় হিরণ্ময় পুরুষকে দেখেন। আর ঘুরোপীয়েরা সূর্যের সহিত গ্রহের উপগ্রহের সম্বন্ধ দর্শন করিয়া বহুনিষ্ঠিত সূত্রের আবিষ্কার করেন।

অনেকে হিন্দু-চিন্তার সহিত হিন্দু-দর্শনসমূহ মিলাইয়া দেখেন। তখন ঘুরোপীয় চিন্তা বলিতে ঘুরোপে প্রচলিত দর্শনই বোঝেন। এইরূপ অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো প্রয়াস কিন্তু আদৌ নয়। ঘুরোপীয় চিন্তা-প্রণালীর প্রকৃত-স্থান পুরাতন গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্তমান ঘুরোপীয় ও প্রাচীন গ্রীক মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ইহাদেরই প্রবাহিত হইতেছে যে, চিন্তাপ্রণালী দর্শনমত হইতে পৃথক্। বিশ্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে :—

কেহ বিচিত্রা: মতয়ো বিলিয়া
নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং —

কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সমাকরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, একটি চিন্তাস্রোত সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠ চিন্তার গতি নির্দেশ করা যাউক।

বৈদিক কালে যখন যজ্ঞশালায় কালী করালী মনোজবা প্রভৃতি সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশন আহুতি ভোজন করিত, তখন সেই জ্যোতির্ময় প্রকাশের অন্তর্হিত কারণরূপ সূর্যোপা অভিপ্রেতকে "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঋষিরা পূজা করিতেন। যখন মহাবিক্রমশালী প্রভঞ্জন ঘটিকীতে আলোড়িত করিত তখন সংবলনকে "নমো বাতু" — বায়ু আমাদের মঙ্গল করুন — এরূপ প্রার্থনা করিতেন। পরীরবিরোধী ওজস্বান্ সিন্ধুনদের বীচিবিক্ষোভে বরুণদেবের ক্রীড়া দেখিতেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, বালক যেরূপ চলনশীল জড়বস্তুতে জীবন আরোপ করে সেইরূপ ঋষিরা জড়শক্তি ও চৈতন্যের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চভূতকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। আর্য ঋষিদের আধ্যাত্মিক-দর্শনে একনিষ্ঠতার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহারা কার্যকারণ-পরম্পরার সুদীর্ঘ সূত্র ধরিয়া আদি-কারণে উপনীত হইতেন না। কোন শক্তিশালী বা জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিলে সেই প্রকাশের অন্তরে প্রকাশ-কর্তাকে দেখিতে পাইতেন। যোড়শ জ্ঞানজালের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে যদি বলা যায় যে, তখনকার জলবায়ুর সহযোগে এই পরোবাদের জন্ম

হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাদিগের কোন ব্যবস্থা হয় না। প্রশ্নের ত্রুটি এই — যাহা ছিল না তাহা কিরূপে হইল? কেন ছিল না কেন হইয়াছে, কোন উৎপাদক পূর্ববর্তী জড়-প্রক্রিয়া ছিল, না হইয়াছিল? প্রকৃতপক্ষে যেই আমরা পশ্চাদ্ধাবনে উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাই না কেন, অন্তের হাত এড়াইতে পারিব না। যদি কোটি-যোজন ভ্রমণ করি, বা কোটি-যুগের অতিক্রম করি, তথাপি নাস্তির দ্বারা অনুসরণীয়। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে, আমি ছিলাম না হইয়াছি; আমি আসিতে অন্য, আসার অন্য, কেবল মধ্যাহ্নে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। কার্য-কারণশৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া চলিলে এক ঘটনা অন্য ঘটনার মধ্যে হারাইয়া যাইতে হয়। অন্ধকে চলিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান্ চলকের অনুসন্ধান করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অন্ধের সম্বন্ধে চক্ষুষ্মত্তার উৎপত্তি হয় না। অন্ধ অন্ধ, অন্ধবৎ, নাস্তিপদবাচ্য প্রশ্নের অনুসারে সৎ ছিল, ভাবব, অন্যান্য অন্ধ, দাহত্ত্ব লাভ করে। কবিরা ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের অপেক্ষা না করিয়া পুরুষত্বের সঙ্গে একেবারেই অন্ধত্ব মিলাগর্ভকে দেখিতেন। এই দৃষ্টিকে কেনিজিয়া বলে। আর্য-কেনিজিয়ার আর একটি গভীরতর লক্ষণ আছে।

অন্ধের দেবতা অন্ধিনাকে কেন অভিহিত হইল? বাহু বস্তুর উপলব্ধি দেবতা কর্তা হইলেও কার্যের সাথে সংজ্ঞিত কেন হইল? কার্যেরও যে নাম কর্তারও সেই নাম। এই সম্বন্ধাবস্থা দেখিয়া অনেকে মনে করেন, আর্য কবিরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতিপূজক ছিলেন না, প্রকৃতি ও পুরুষের অভিন্নতার দ্রষ্টা ছিলেন। তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে ঋষি (দৃষি) বলা হইত। কর্তা কোন অপূর্ব মায়াশক্তি বলে কার্যাকারে প্রতিভাত হয়, কার্যাকারেও ব্যবহারতঃ কেন থাকিলেও পরমার্থতঃ তাহারা অভিন্ন — এই অদ্বৈত-তত্ত্বের সম্যক্ বেদনাধারা গীত হইয়াছে। কর্তা এবং কার্যের অভেদ-জ্ঞান বিজ্ঞানী দ্রষ্টার প্রতিবিম্বরূপী সৃষ্টিতে প্রতিভাত, অধিষ্ঠাতার মানিক বহন, বৈদিক অধিবিদ্যের একমুখীন অন্তর্দৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই একনিষ্ঠ দর্শন ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিয়া বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাংখ্য-দর্শনে দেখা যায় যে, সমস্ত জড়তত্ত্ব এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। বিশ্ব চিন্তা অগ্রসর হইতে হইতে এই প্রকৃতিবাদের একত্বে উপনিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা যে অদ্বৈত দেখিয়াছিলেন তাহা সাংখ্যে পূর্ণতা লাভ করে নাই। সাংখ্যের একত্ব দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক। প্রকৃতি এক পুরুষাতিরিক্ত বস্তু, আপনাতে আপনি অবস্থিত, অস্তিত্বের জন্য সম্বন্ধী পুরুষের অপেক্ষা করে না। সমস্ত জড়-প্রপঞ্চকে সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতিতে একীভূত করা একনিষ্ঠার ফল বটে, কিন্তু দ্বৈতাপত্তি ইহাতে মেটে না। পুরুষ ভিন্ন — প্রকৃতি ভিন্ন, এই দ্বয় বিশ্ব-আত্মিকে সম্যক্ বহিতে পারে নাই। আজ বিশ্ব-স্থানে সাংখ্যদর্শনের সম্মান আছে বটে, কিন্তু সাংখ্যমতের পোষক একেবারেই নাই বলিলে হয়।

প্রকৃতিবাদের একত্ব অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের একত্ব গভীরতর। তত্ত্ব একনায় জগতের কারণ। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। তত্ত্বের একতার মধ্যেই অনেকতা নিহিত। যেমন বৃক্ষ এক, কিন্তু মূল ও শাখা-প্রশাখে বহু; সমুদ্র এক, কিন্তু লহরীলীলা বহুতর; ইষ্টিকা এক, কিন্তু ঘট সরাবভেদে বহু; দৌষ্টপ তত্ত্ব এক, অথচ বহু। রামানুজের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যের একত্ব হইতে উচ্চতর সন্দেহ নাই, তথাপি আর্য একনিষ্ঠার উচ্চতম বিকাশ নহে। তত্ত্বের স্বরূপে যদি বহুত্ব অন্তর্নিহিত থাকে তাহা হইলে একত্বের কেবলতা বা শুদ্ধতা থাকে না। তত্ত্বের সত্তায় যদি বহুতার অপেক্ষা থাকে, অনেকতার আকাঙ্ক্ষা থাকে,

সম্বন্ধের প্রয়োজন থাকে। — যদি ভূমানন্দে কামনা থাকে, তবে সেই অপেক্ষার নিধি, আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, কামনার পরিতৃপ্তি কে ভঞ্জিবে? আবার যদি ব্রহ্মের বীজ পূর্ণব্রহ্মে পারমার্থিকভাবে নিহিত থাকে তাহা হইলে সেই বীজের ক্রমবিকাশ হইলে সম্বন্ধ পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। পরিণামী ব্রহ্ম—ইহা এক অসঙ্গত কথা। ব্রহ্ম যদি পরিণামী হন, তাহা হইলে সেই পরিণামের কারণ কোথায়? ব্রহ্মের বাহিরে ত কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মই আপনার পরিণামের কারণ। কিন্তু কারণের যোজনা হইলে ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে ব্রহ্মপরিণাম বহুত্বের সম্ভাবনা চরমরূপে হওয়া চাই। ক্রমাগতের কাম থাকিতে পারে না। অবিকৃত পরিণামের চূড়ান্তরূপই পূর্ণতা বা অপরিণামিতা। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্ম যদি নিজের ভিতির নিজে কারণ হন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বহুত্ব-পরিণামের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতে একনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু শ্রুতি-প্রশোদিত বিশ্বের একত্বগীন বৃদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। বিশ্বতানে শতকরা দশজনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রদ্ধাপূ।

শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে বিশ্বের একনিষ্ঠতার চরম তৃপ্তি হইয়াছে। বহু এক ভিন্ন পারমার্থিক: হইতে পারে না। এবং সেই বহুর মধ্যে বহুত্বের বীজ অসম্ভব। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, অবয়ব, অপরিণামী, অনেকাম; সত্যজ্ঞানস্বরূপ, আত্মরত, আনন্দ, শুদ্ধ, কৈবল্যময়। তিনি জগতের কারণ বটেন, কিন্তু সেই কারণ-বীজ তাঁহার সত্তাতে পাওয়া যায় না। তাঁহার জগৎকারণত্ব বা ঈশ্বরত্ব স্বরূপগত নহে। তাঁহার স্বরূপ কেবল সচ্চিদানন্দময়। তিনি চিদ্বিহীন হইলে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যান, কারণ চিৎ এবং অস্তিত্বে কোন ভেদ নাই। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বর বা কারণত্ব একটা শাসনত্ব বা ঐশ্বর্য মাত্র। তাঁহার স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরকে অপসারিত করিলে তাঁহার সত্তার উপর বা অপচয় হয় না। বাস্তবিকই বেদান্ত একত্বের উচ্চতম আকাশে আরোহণ করিয়াছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, যতদিন ব্রহ্মের ঈশ্বর দৃষ্টিতে অপসৃত না হয়, ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই জগৎ মায়াময়, অনৃত, অসীক, লক্ষণে প্রতিবিম্বিত মাত্র। ইহার অস্তিত্বের ভিত্তি কোথাও দেখা যায় না। বিবর্তন-বাদ মূলতত্ত্বের নিজেতে ত অবস্থিত নহেই, আর ব্রহ্মসত্তার মধ্যেও ইহার অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহা মরীচিকার ন্যায় এক অঘটন-পটীয়সী যোগশক্তির দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। সেই যোগশক্তি ব্রহ্মতে অবস্থিত, কিন্তু স্বরূপতঃ নহে, বাহ্যাকারে ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছে। একটা বস্তু হইয়াছে, কিন্তু কেবল ব্যবহারতঃ। ব্রহ্মের পরিবর্তন হয় না, পরিণাম হয় না, অথচ বহুরূপে প্রতিভাতি হয়। ঋষিরা যে অদ্বিতীয়তাকে অগ্নি বলিয়াছেন, কার্যের নামে কারণকে অতিরিক্ত করিয়াছেন, সেই ভ্রমের পরাকাষ্ঠা বৈদান্তিক মায়াবাদেই দৃষ্ট হয়।

একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণতা, সত্তার সত্যস্বরূপত্ব, কর্তা এবং কার্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা-জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে ইহার পরিসমাপ্তি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ চিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, সেইদিন হইতে জাতিভেদের অবঃপতন। আজ কোথায় সেই একনিষ্ঠতা। পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্য সন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের অন্তর্দৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব। অনুকরণে বহুদূর উন্নতি হইতে পারে হইবে, কিন্তু অধিমজ্জাগত উন্নতি হইবে না।

এরিস্টোর অনুসরণে করিতে গিয়া আমরা যেন য়ুরোপীয় বর্বরিতার শিকারী না হই। এই বর্বরিতা আমাদের জাতীয়তাকে শোষণ করিবে। যেমন আমাদের দেশে মুসলমান য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-প্রভাবে পরম শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে, সেইরূপ আমাদের চিন্তা-প্রণালী প্রতীচ্য চিন্তার সংস্পর্শে বলীয়সী হইবে। কিন্তু তুমি হারিলে জীবন ও ভেদ শুরু হইয়া যাইবে। অন্যকে ঈসাতে রোপণ করিলে বিজ্ঞানের সহায়তা তাহার কোন কাজে আসে না হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, এরিস্টোক্রাসীর উপর, বর্ণাশ্রমধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে, তাহা হইলেই তাহাদের দ্বি-পরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ভাঙিবে না, অপ্রীতিকর হইবে না। মূলের হইয়া অন্যান্যদিগকে সমাদর করিবে। তবেই হিন্দুর হিন্দুর পরিবর্দ্ধিত হইবে, সংবর্দ্ধিত হইবে, এবং পুরুষসত্তার হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে — আহা, আমাদের কি সৌভাগ্য! যেহেতু প্রভৃতি যে ভারতভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, আমরা সেই বঙ্গদেশে জন্মলাভ করিয়াছি, এবং আমরা সেই সকল মহাপুরুষের বংশধর; বড় আমাদের বংশমর্য্যাদা, বড় আমাদের! এরূপ অভিমিথ্যার মাঝে আত্মসম্মান কোনও কল নাই; ইহাতে বুদ্ধিমান্দ্যই প্রকাশ পায়! যেহেতু প্রভৃতি মনীষিগণ অসত্যের মাঝেই কিয়া কৃতার্থ বা অকৃতার্থ যাহা হইক হইয়াছিলেন। আমাদের তাহাতে অভিবৃদ্ধি নাই। আমাদের প্রত্যেকের নিজে নিজে তত্ত্বটি বুঝিয়া লইতে হইবে। পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া সহজ নহে; কিন্তু পৈত্রিক বুদ্ধি-বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না; তাহা নিজে নিজে অর্জ্জন করিতে হয়।

— অন্যের কথা

স্বাধীন ভারত

[স্বাধীন ভারতের এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমার দায়েরিতে উৎসব-দিন সমাগত। আমরা সে উৎসবে যোগ দিতে পারিব না,— তার কারণ, শক্তি ও বিশ্বাস আমাদের স্বেচ্ছাকৃত। তাহার আমরা আছিলাম, সন্ত্রাসভূত হইয়া আছি। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের সেই মনোভাব ও ব্যবহার উৎসবস্থলে অনুপস্থিত আছেন ; ইহাও জানি, তাহার আমাদের অনেকের, 'হিংসা' না হউক — ঈর্ষার পাত্র হইয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আমাদের সেই মনোভাবের একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষ — যা শিশু শুধু আছিলাম তা, বয়স্কদের অবোধ্য হইতে পারে। তাহারা বোধহয় যথার্থ জানিতেন, অর্থাৎ 'নেশন'-নামক পৌলিটিকাল দেবতাকে পূজা করিবার পূর্বে, নিজের গ্রাম-নিষ্ঠা, আঞ্চলিক-স্বজনকে ভুলে ভরাইয়া, তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার অভ্যাস হয়, আমি তাঁহাদের উদ্দেশেই এই কথাগুলি লিখিয়াছি ; যেমন বাক্তির নহিত মতের অনৈক্য হইতে — আশা করি, হৃদয়ের অনৈক্য হইবে না। যঃ পঃ]

ভারত স্বাধীন হইয়াছে, এই বাক্যটিকে হজম করা এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য হইয়াছে ; তাহারা পলিটিকস্ ও ধর্ম দুয়েরই চরমোৎকর্ষ লক্ষ্য হইয়াছে, কারণ, তথায় আছে — "স্বরাজ সিদ্ধি" ; শ্রীঅরবিন্দও শ্রীরাম বলিয়াছেন — "যতোধর্ম স্তুতোজয়ঃ" ধর্মরাজ্য হিমালয়ে"। একজন মীমাংসাবাদী পণ্ডিত ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ঐ বাক্যটির মুখ-দর্শন তরুণদের আমার উপায়ে হইবারই কথা। তিনি বলেন, ঐ যে 'জগদ্ধিতায়' পদের জগদ্ধনের মুখে 'স্বায়ত্ত' কথাটি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে বুঝিতে হইবে, যাহারা 'জগ' করিয়া থাকে তাহারা স্বায়ত্ত-শ্রেষ্ঠ হিমালয়ের জন্য মহামহিমার অবতারণা প্রয়োজন হয়। আধুনিক পণ্ডিত ও মহাপুরুষের মুখে হিন্দুর আত্মতন্ত্রিক ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা যে কিরূপ আশাজনক হইয়া থাকে, তাহা সকলে অবগত আছেন। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। ঐ 'স্বাধীন হইয়াছি' অর্থাৎ 'ভারত স্বাধীন হইয়াছে' — এই বাক্যটি জপ করিবার ও জপাইবার যত সুযোগ আমরা এক্ষণে পাইয়াছি — সহস্র সহস্র বক্তৃতাকে উহা যেমন বাক্তি হইয়া থাকে, তেমনই সহস্রাধিক সংবাদপত্র ও পত্রিকায় উহা ছাপিত হয়। কাজে যা হয় না হউক, বাক্যে উহার সংখ্যা বহুই বৃদ্ধি হইয়াছে। আরও সুবিধা এই হইয়াছে যে, অনুরূপ মাতৃপত্তি ও গুরু দুইয়ের মধ্যে কোন বৈরভাব না থাকায়, ঐ দুয়েই জপ করা বড় সহজ হইয়াছে, কারণ, শক্তির অভাব তা পূরণ করিয়া দিতেছে।

আমরা কিন্তু নাস্তিক, আমাদের জপ তো নাই-ই, শক্তি একেবারেই নাই। তাই ঐ বাক্যটিকে একটু পরীক্ষা করিতে চাই, অর্থাৎ ঐ বাক্য-ব্রহ্মটি সত্তর তা নির্ণয়, তাহাই একটু বুঝিয়া লইতে চাই। আমাদের প্রশ্ন — ভারত কি সত্যই স্বাধীন হইয়াছে ? সে স্বাধীনতার অর্থ কি ? তাহার কোন বাস্তব লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি ?

স্বাধীনতা-লাভের ফলে যে শত-শৃঙ্খলার ঘর তাহা হয় নাই, অন্তরে স্বাধীনতাটা বিষম, এমন যুক্তি আমাদের নয়। দেশে যে সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, বিশেষ করিয়া, ছোরা-কারবারের যে দুর্ধর্ষ অসুর সম্প্রতি মোটা আস্তিনকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং ঐ একটাতেই 'কর্তৃত্ব ভয়াদানি ভয়নাশনি' দিয়া সকলকে ত্রাস করিয়া ফেলিয়ে

— তাহাতে অন্তত স্বাধীন ভারতকে দর্শনাশে দায়ী করিব না। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যাহা অনিবার্য তাহা আমরা মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু তথাপিও, স্বাধীনতা বলিতে যে অবস্থা বুঝায়, জনসাধারণের কি সেই অবস্থা হইয়াছে? প্রজাতন্ত্রের সেই মূল-তত্ত্ব কি পরিবর্তিত হইয়াছে? প্রজাতন্ত্রের কি একটা প্রাথমিক ভিত্তিও স্থাপন করা হইয়াছে? আমি ভবিষ্যৎ-অভিপ্রায়ের কথা বলিতেছি না — রাষ্ট্রবিধির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতায় উপনীত হইবার সঙ্গে যে একটা বাহ্য-পরিবর্তন অনুভব করা যায় — সেরূপ কিছু কি আমাদের এ পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে? বেসরকারি কোনো কোনো কর্মীর কথা, বা জনসাধারণকে খুশী রাখিবার জন্য কয়েকটা ঘোষণা, বা শিক্ষা-সংস্কার বা উৎপাদন-আয়োজনের কথা বলিতেছি না। যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা যে প্রজাদের-প্রাণ, কার্যতঃ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে? যে দুঃখ যে দারিদ্র্য, যে অপরিসীম ক্লেশ প্রজারা সহ্য করিতেছে, তাহার প্রতিকার সম্ভব না হইলেও, সেই দুঃখ-দুর্দশার প্রতিটুকু ভারও কি ঐ সাধারণতন্ত্রের রাজপুরুষগণ গ্রহণ করিয়াছেন? মহাত্মা গান্ধী যে অর্থে সাধারণতন্ত্রের প্রজাদের জন্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আর কিছু নয়, তাঁহার সেই সাধিয়াসঙ্গ — সেই কটি-বসন ও অর্ধাসন দেখিয়াই তাহারা নিজেদের সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এখন কি দেখিতেছি? সেই গান্ধী-শিষ্যগণ, এখনো রাষ্ট্রনায়ক একটি সেনা ও তাহার অধিক স্থাপন করিয়া, সেই সেনার পাতা-সুরোহিত-পদ অধিকার করিয়া, তাহারই সৌষম ঢঙের অনুকরণে —রাজপাটের পোষাকটির জন্যও যেমন, নিজেদের বিলাস-বাসনার জন্যও তেমনই, অর্থাৎ হইয়া উঠিল নাই কি! যখন দেশের জনসাধারণের এই অবস্থা, তখন দেশপাল, প্রদেশপাল, মন্ত্রীমন্ত্রী এবং উপদেষ্টাদের নিজেদের যে-দুঃখের সম্পর্কমাত্র পান না, সেই দুঃখে দেশবাসীকে ঘিরে থাকিয়া হাড়-দুঃখে তাঁহাদের আনুকূল্য সাধন করিবার যে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা রাজপুরুষের মুখে শোভন হইলেও — যে-মনুষ্যত্বের মর্মমূলে, ধর্ম ও পরিষ্টিপ্রসূত অভিজ্ঞতা করিয়া, স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, সেই মনুষ্যত্ব কি তাহাতে আহত হইতেছে না? তারপর, এই যে রাষ্ট্রের দ্বিতীয়াসন ও তাহার নিরাপত্তা-বিধান, ইহাও যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতেও কি মনে হয় না যে, প্রজাসাধারণের দ্বিতীয়াসন ও নিরাপত্তার সহিত রাষ্ট্রের ঐ ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নাই? প্রজার সর্বস্বিধ অনুবিধা এখন কি অতি করিয়াও রাষ্ট্রটাকেই বাঁচাইতে হইবে! বাক্যের ঘর-পাঁচ অবশ্য আছে, কিন্তু কার্যতঃ কি তাহাই ঘটে। উহাই কি Fascism, Totalitarianism, বা Dictatorship-এরই একটা রূপভেদ না? ঐ যে হিন্দুস্থানী খোঁয়াবার প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে — উহার মূল অভিপ্রায় কি ইহাই নয় যে, সাধারণতন্ত্রকে একটা এক-প্রকৃতির বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে! উহার জন্য 'সেবন' কথাটার উপরে যে এক ঝোঁক দেওয়া হয়, তাহা কি একটা ফেক্, ফাঁকতা নয়? ভারত কখনও এমন 'সেবক' ছিল না বলিয়াই, 'ভারত' হইতে পারিয়াছিল; সে যেমন আত্মায়, তেমনই, দেহের — অর্থাৎ বস্তু সোশিয়ালিজমেরও — এক অপূর্ব স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল; সেইজন্যই তাহার সাধনা ও সংস্কৃতি জগতে এমন অসাধারণতা লাভ করিয়াছে। আমিকার ঐ স্বাধীনতা তাহার তুলনায় কিরূপ স্বাধীনতা! এত বড় বন্ধন সে 'ভ' কখনও বহন করে নাই। সোশিয়ালিজমে স্বাধীনতা যে কখনও ভোগ করে নাই বটে, কিন্তু আজ প্রজাতন্ত্রের নামে যে তন্ত্রের স্থাপনা হইতেছে, তাহাতে

প্রজার স্বাধীনতা কোথায়? একটা এক-রাষ্ট্রের মুখবন্ধন বন্ধ হইয়া সে একটা বার অধিষ্ঠান চরিতার্থ করিতে পারে, তাহা এই যে — ভারতও অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সমবর্যাদায় লাভ করিয়াছে; এই অর্থে সে স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু কিসের? — সে কি সত্যই স্বাধীন হইবে? না, ঐ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-গৌরব কথা কয়টির জন্য সে তাহার ধর্ম, তাহার বিবেক, তাহার বুদ্ধি, — এক কথায়, তাহার ব্যক্তিগত যাহা-কিছু অধিকার সবগুলি জলাঞ্জলি দিবে? রাষ্ট্রপরিষদে প্রজাসাধারণের যে প্রতিনিধিরা, তাহার মত বিদ্যা আর কিছু আছে? এই যে আইনের বেড়াজালে ত্রিসংকোটি মানুষকে শতপাকে বাঁধা হইতেছে, সেই আইন-প্রণয়নে প্রজাসাধারণের যে সম্মতি লওয়া হইয়াছে — তাহা কি উপায়ে? কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই যে ইলেক্‌শনগুলা দেশের প্রতি জেলায়, সবডিভিশনে, ও থানায় সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা কিরূপ অনুসৃত হয়, সে কথা কে না জানে? শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদও বিহার-বাংলা বিভাগের নিষ্পত্তির জন্য যে গণভোটের আয়োজন করিতেছেন, তাহাতেও সেই নব-রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদাক্ষ কোন্ কর্ম আশ্রয় করিয়াছেন তাহা ত' কাহারও অবিদিত নাই! অবশ্যের প্রতিনিধির বলিতে কি বুঝায় তাহা কি আজও আমরা চাক্ষুষ করিতে পারি নাই? তাহা হইলে, স্বাধীনতার স্বরূপ যে কি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। অর্থাৎ প্রজার সুখ-দুঃখের সহিত উহার সাক্ষাতের সম্পর্ক থাকিলেও, অর্থতঃ কোন সম্পর্ক নাই।

এইজন্যই স্বাধীনতার গৌরব-কীর্তন করিবার জন্য কতকগুলি বিদ্যার আশ্রয় লইতেই হয়। সেই বিদ্যাকে সত্যরূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার একটা বড় সুযোগ আছে। উপরে আমরা যে অভিযোগগুলি করিয়াছি, তাহা চাপা দিবার, অথবা কাটাইয়া দিবার শক্তিও তাহাদের আছে। প্রথমতঃ, ঐ নীতি ও আচরণের সংশোধন দেশের বড় দীর্ঘস্থানীয় (পক্ষে, প্রক্রিয়ার ও অর্থে) ব্যক্তিদল যোগ দিয়াছেন, তাহার কারণও খুব স্পষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, ঐ এক পক্ষ ছাড়া অপর পক্ষের কথা প্রকাশ বা প্রচার করিবার পথটি সর্বতোভাবে রুদ্ধ করা হইয়াছে। দেশে যত পত্র-পত্রিকা আছে তাহা ঐ এক-পক্ষেরই মুখপত্র; আর কোন মুখও নাই, পক্ষও নাই — থাকিবার জোও নাই। কেমন করিয়া ইহা চলে তাহা একটু বিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাও ঐ স্বাধীনতা-লাভের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব প্রশ্ন এই যে, ইহা কোন্ প্রকার স্বাধীনতা? তাহাতে মানুষ কি স্বাধীন হইয়াছে?

কিন্তু আমি স্বাধীনতার এই লক্ষণ বা স্বরূপটার কথাই বলিতেছি না, তাহার প্রতি আমার মূলদৃষ্টি। না হয় মানিলাম যে, তাহাতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এখনই তাহা হইতে পারে না; এইরূপ সামাজিক, নৈতিক ও মৈত্রিক অবস্থাপরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যাহারা জানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও অর্থে শ্রেষ্ঠ তাহারাই এখনে ভারতবাসীর অধিকারবক্তা, তারা ভারত-শাসন করিবার স্বাভাবিক অধিকারী। ইহাই যা সেই মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র (আমি অবশ্য 'রাজা'র কথা বলিতেছি না, তন্ত্রটার কথাই বলিতেছি), সেই রাজতন্ত্রই ত' দেখিতে পাইতেছি—ভারতবাসীর সম্মোহন। তাহাতে অন্ততঃ দুইটা সান্ত্বনা আছে, এক — পরাধীনতার কলঙ্ক-কালিমা; দুই — যতই অনাচার অত্যাচার করুক না কেন, দেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিক যোগ পাইবে কোথায়? দেশরক্ষার ভাবনা ত' ভাবিতেই হইবে, পরজাতির মত পলাইয়া যাইবার উপায় ত' তাহাদের নাই! উপরিউক্ত ঐ অর্থে ঐটুকু যে স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া গিয়াছে, তাহাই বা কম কি? তাহাদের নিকটে একটা আধুনিক কি

ছেড়ে দাও ? আমি প্রজাপতিদের কথাই বলিতেছি — সেই যাহারা চোর-ডাকাতের ভয়ে ; যেখানে, প্রয়োজনের প্রকৃতি যাহাই ; ছোট-বড়-মাঝারি অনেক সুখকর চাকরী ; নানাপ্রকার রাজ-প্রসাদ ; এবং সেই স্বাধীনতা-সুখের খরচাদের ধার শুধাইবার, বা তাহার সুখাঙ্ক কিরূপে ঠোক পোছাইবার কোন ঝঞ্ঝাটই করিতে পারে নাই, অর্থাৎ যাহারা ঐ স্বাধীনতার সঙ্কট হইতে বঞ্চিত আছে। তাহাদের অন্তরে ঐ একটা লালসা আছে — তাহারই মর্মে, পুরু চর্মের পাশ দিয়াইয়া স্বাধীনতার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

তাহা হইলে তেমন স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে কি ? কিন্তু তাহাদের, ঐ যাহাদের শাসন-কার্য — চাহিয়া দেখিবার সময় ঐ রাজপুরুষ — কি সকলেই স্বাধীন হইয়াছেন ? এইবার বড় কঠিন প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছি, আসমাবিদ্যকে একটু ধীরভাবে আমার বক্তব্যটি বুঝিতে হইবে। ঐ যাহারা রাজপুরুষশ্রেণী যে এখনই প্রজার দুঃখ মোচন করিতে পারিতেছেন না, তাহার অনেক কারণ আছে বলিলাম — বলিলাম, তাঁহাদের হাত পা কতকগুলি অনিবার্য আমলাতন্ত্রীয় কারণ উপস্থিত থাকা হইয়াছে, তাই এই স্বাধীনতা তাঁহারা প্রজার জন্য করিতে পারিতেছেন না। তথাকের তাহার ঐ স্বাধীনতা-প্রবণ — কিন্তু ; উহাকে এখনই কোন ভার দিতে সেওয়া যাইবে না, দিলেই উহা পঙ্গু প্রাপ্ত হইবে। অতএব উহাকে এখন সম্বন্ধে শাসন করিতে হইবে। তাহার অর্থ এই যে, ঐ স্বাধীনতার ভাণ্ডারী হইয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকার ভুলিয়া দিতে হইবে ; রাজশক্তিকে সমস্ত পথ হইতে বিদায় করা, তাহার সুখসুখ পঙ্গুত্ব করিতে হইবে, সোনাযাদিতে চড় মার সোল দিতে হইবে। মন্ত্রীদলের আজ্ঞা যাহাতে তাল থাকে তাহার দিকে সতত দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; সেজন্য তাঁহাদিগকেও টেবিল, ম্যাচ মিটিন হইতে, ফুটবল-গোলো এবং রাজনৈতিক সৌজন্য বিহার — সর্বপ্রকার ক্রীড়ায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। না খাইয়া নিজের খাওয়াইতে হয়। যে যাহাতে আপন ইচ্ছামত হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতে পায়, তাহার জন্য লোহাযাদির উপরে, যেন একটু উঁচুতে, জং-ধরিবার বন্দ্য — কাজের ফুল প্রভৃতি ঝুলাইয়া দিতে হয়, নহিলে তাহার দৃষ্টি উর্ধ্বগামী এবং মন উচ্চ হইবে কেমন করিয়া ? তাই ঐ শিক্ষক উপমাটি বড় সার্থক হইয়াছে। এই উপমা দর্শন দেওয়া হইয়া থাকে, তাই আমরা তাহার একটু বিশদ ব্যাখ্যা করিলাম।

তাহা হইলে, স্বাধীনতাটি অবশ্যই অন্তর্ধান করিয়াছে, এখনও উহার সকল আতঙ্কও দূর হয় নাই। তাই একেই উহার দ্বারা কোন বীরত্বের বা বিপদে-উদ্ধার আশা করাই অন্যায়। কিন্তু আরও দুইএকটি উপমা আছে ; এ স্বাধীনতার অবমান করিতে হইলে উপমার বড় আর কি আছে ? উহা এমনই অঠীন্দ্রিয় বস্তু যে, উহাকে আমলসোচর করিতে হইলে — অবোধ অন্ধকারে উহার যাহারা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইলে — এক-একটি উৎকৃষ্ট উপমা প্রয়োগ করিতে হয়। এক সম্প্রদায়ের মতে, আমরা স্বাধীনতার সিংহাসনে পৌঁছিয়াছি বায় ; দীর্ঘকাল অবিরাম যুদ্ধ করিয়া দুর্গদ্বারে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াছি, এখন ঐ দ্বারটা খুলিতে পারিলেই হয় ; আসল কাজ শেষ হইয়াছে, এখন ঐ দ্বারটুকু — সে আর কতটুকুই বা — হাসিল করিতে পারিলেই আর পায় কে ! কত বড় সমস্যার যাহারা এই সুন্দর সমাধান করিয়াছে তাহাদের কাছে শেষ হইয়াছে, সিংহাসনে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহারা এখন ছুটী পাইবে নাই কি ! এখন ঐ দুর্দ্বারে বীরদলকে সর্বপ্রকারে সজ্জিত করাই এ জাতির প্রথম কর্তব্য। তারপর ঐ সিংহাসনটা খুলিয়া ফেলা ; এখন প্রজা-সাধারণ একটুখানি জোরে ঠেলা দিলেই ঐ দ্বার

সম্মত খুলিয়া যাইবে। বেশি কিছু নয় — খুব সামান্যই! যে অহিংসার দ্বারা মুক্ত-দ্বার হইয়াছে তাহার তুলনায় — সেই বীরত্বের তপস্যার তুলনায় — ইহা এমন কি বেশি? দ্বারে পৌঁছাইয়া সেলাম আর দ্বার খুলিয়া দেওয়া — কোন ঝামেলা করিবার? এখন আর অহিংসা-যুদ্ধের মত ভেজাল শক্ত কাজ করিতে হইবে না, কেবল অনশন-ব্রত করিলেই চলিবে — সোটা আমিকে প্রয়োপবেশনে বসিতে হইবে। অহিংসার দ্বারা সিংহদ্বারে পৌঁছানো গিয়াছে, এখন ঐ প্রায়োপবেশনের দ্বারা অনুরোধ করিলেই স্বাধীনতার বৈকুণ্ঠ-স্বর্গে প্রবেশ করা যাইবে। না, আমি পরিহাস করিতেছি না; অথবা যাহা ইতিহাসের, তৎসম্বন্ধে অবশ্যকে তাহাদের সম্বন্ধে যেরূপ ধর্মোপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাকে, অর্থাৎ ঐরূপ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। যাহারা স্বাধীনতার মূল্যাঙ্কনে অবশ্য করিয়াছে, তাহারাই ঐ সিংহদ্বার প্রকৃতির বড় বড় উপমা-বিশেষে ইহার অবশ্যকে ভূষার্থ করিতে চায়।

কেহ বলেন, 'আহতী'-নামী অগ্নি-দেবতাদের এক ভক্তাকে মহাপুরুষের রক্ত-পড়া জল খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া তোলা হইয়াছে; এখনও সে বড় কাহিল, তবু তার মুখখানিতে কি অপূর্ব হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে! আহা, এখনই তাহাকে রোগ-ব্যথা ভাগ করিয়া গৃহকর্ম করিতে বলিও না! ওরে নিষ্ঠুর, ওরে অবিশ্বাসী, ওরে ঈর্ষাকাতর হিংসুক! — এমন করিয়া যে বাঁচিল তাহার ঐ বাঁচাটাই কি একটা মহা-অনুষ্ঠানের কারণ নয়? আবার কি চাস তোরা? দয়া বাঁচিয়াছে যে! এখন ভাল করিয়া সেবা কর — ব্যস্ ব্যস্!

তাহা হইলে স্বাধীনতা ঠিকই; তবে উহা অনেকের সৃষ্টি হইয়াছে; অথবা আমরা স্বাধীনতার সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি — দরজাটা এখনও খুলিতে পারি নাই; অথবা, স্বাধীনতাদান আর কিছু নয় — একটা ভৈষজ্য-প্রলেপ, অবশ্য বাঁচিয়াছে, দয়া বাঁচিয়াছে; উহাই যথেষ্ট, সেই আনন্দেই সকল দুঃখ দূর হইয়াছে।

কিন্তু এই সব ভক্ত, উপমা — মিস্ত্র, মোশী, বুদ্ধ সিংহদ্বার — ইহার কোনটাতেই সেই মূল প্রশ্নের উত্তর নাই — ভারত কি সত্যই স্বাধীন হইয়াছে? অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে — স্বাধীন ভারতের শাসন-কর্তৃত্বের ঐ ভাগ্যবিধাতা প্রজাদের সম্পর্কে যে উদ্ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার মূলে কি সত্যকার স্বাধীনতা আছে? ঐ যে শাসন-অধিকার তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাহাকে কোন যজ্ঞ স্বীকার করিতে হইয়াছিল কি না?

তাঁহারা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন — তাহা অহিংসার দ্বারা, বিনা যুদ্ধে; অর্থাৎ কিনা, বিনা রক্তপাতে। ব্রিটিশের হাত হইতে তাহা যে কাড়িয়া লইতে হয় নাই — তাহাতেই বিদিত, ঐ কথাটা স্বীকার করিতেই হয়: কাড়িলে কিন্তু খেয়ের খুন হয়, তাই ইহাও বলিতে হয় যে, ব্রিটিশ উহা চোখে পড়িয়া দাদা হইয়া দিয়াছে। কথাটা সত্য, কিন্তু কোন্ অর্থে? দাদা তাহারা হইয়াছিল, কিন্তু সে কি অনুরোধের জন্য, না তাহাদেরই একটা আপাত-প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য কূটনীতির অনুরোধে? যে দুষ্টের বিনাশ হইলে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা পৃথিবীময় একটা বিরাট রাজনীতিক প্যাক্টের খেলা খেলিয়াছে — ইহাও যে সেই প্যাক্টের একটা বড় খেলা, তাহা জগতের সকলেই জানে; আমাদের তাহা জানাও দরকার, জানিলে ভারতকে তাহাদের ঐ স্বাধীনতা-দান বস্তুই মূল্যহীন হইয়া পড়ে — আমরাও স্বাধীন হইয়াছি বলিয়া গর্ব করিতে পারি না। ইংরাজ-দান এই যে ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়াছে — তাহা ফেরার না দাদা হইয়া? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এমন অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা হইতে হয় যে, তাহা প্রায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কাছাকাছি! ব্রহ্ম সত্য

হইল, অবশেষে বলিল ('সিস্টার-চাইল্ডস্ !') — প্রায় দেউলিয়া। অর্থাৎ ব্রিটিশজাতি যাহা ফেলিয়া দান করিয়াছে, ইহাও যেমন সত্য, বাধ্য হইয়া দান করিয়াছে, ইহাও তেমনই সত্য। তাহাতে ব্রিটিশেরও যেমন মান রহিল, তেমনই আমাদেরও মান রহিল। অহিংসাধর্মী যাহারা তাহারা কাহাকেও মানহানি করিতে চায় না বলিয়াই, যাহা তাহারা বাধ্য করিয়া আদায় করিয়াছে, তাহাই স্বেচ্ছায় দান বলিয়া স্বীকার করে। ব্রিটিশজাতিও ভারতকে ঐ স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় দান করিয়াছে, এই কথা জগতের সমক্ষে গর্বসহকারে ঘোষণা করে; কংগ্রেসও তাহার সেই সাধুতা ও উচ্চাশয়তার প্রশংসা করে, — অথচ ভারতবাসীর নিকটে সর্বদাই বলিয়া থাকে যে, এই স্বাধীনতা তাহারা ব্রিটিশের নিকট হইতে, অহিংসা-যুদ্ধের দ্বারা, ছিনিয়া লইয়াছে। ইহাকেই আমি ভণ্ডামি বলিয়াছি। কিন্তু এই স্বাধীনতা-দান যে ব্রিটিশেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া করিয়াছে, ইহা যে তাহার 'হৃদয়-পরিবর্তন' — 'change of heart'-এর প্রমাণ, সে কথা স্বয়ং গান্ধিজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন; এমন কথাও তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা যদি ব্রিটিশকে এখনও অবিশ্বাস করি, তবে আমরাই পাপী। ইহার উপরে ত' আর কথা চলে না। অতএব ঐ স্বাধীনতা যে একরূপ ভিক্ষালব্ধ তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সেই ভিক্ষা যে চাহিয়াছে, এবং যে দিয়াছে, উভয়পক্ষই যে সমান মহত্ত্বের অধিকারী — সে কথা সত্য।

ঐ স্বাধীনতা-দান যে সত্য, তাহাতে যে কোন ছেলান নাই, জগৎকে তাহা বিশ্বাস করাইবার জন্য, ঐ দুইটাই সত্য হওয়া চাই। একটা — ঐ স্বাধীনতা আমাদের স্বোপার্জিত; আর একটা — উহা ব্রিটিশের স্বেচ্ছাকৃত অকপট-চিত্তের দান। প্রথমটির দ্বারা ভারতবাসীকে খুশী করা যায়, দ্বিতীয়টির দ্বারা ব্রিটিশকে খুশী রাখা যায়। দেশজাতি ব্রহ্মকেও ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার পক্ষে — স্বাধীনতা কোন্ ছার!

তাই স্বাধীনতা-লাভের পর আজ পর্যন্ত, ভারত-কাদোবিবাসগণ একটা বিষয়ে বড় সতর্ক, বড় সজাগ, — ব্রিটিশের প্রতি অবিশ্বাস তাহারা কিছুতেই হইতে দিবেন না; ব্রিটিশের সহিত বন্ধুত্ব-রক্ষা, সর্বপ্রকারে তাহাদের মনস্তুষ্টি-সাধন — তাহাদের যেন জপমন্ত্র হইয়াছে। প্রজাসাধারণের নিকটে ঐক্য ইজ্জত-রক্ষার যত উপায় আছে তাহার কোনটি যেমন বাদ যায় না, তেমনই ব্রিটিশবন্ধুদিগের স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইবার জন্য তেমনও ত্রুটি নাই। এ বড় খুব ভরসার নহে, ঐ স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসটা একটু উল্টাইয়া দেখিলেই হয়।

অগ্রপূর্ব, সর্বাগ্রে ব্রিটিশের ঐ সাধুতার কথাটা অবিশ্বাস করিতে হয়; কারণ, তাহারা যে স্বেচ্ছায় অকপট হৃদয়ে ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করিবে, এমন বিশ্বাস কিছুতেও করিতে পারে না। ব্রিটিশ-জাতির চরিত্র ও তাহার ইতিহাস কি? যে ব্রিটিশ-জাতি আজ সিরিয়া হইতে পাকিস্তান পর্যন্ত তাহার সেই ডিপ্লোম্যাটিক জাল বিস্তার করিয়াছে, সম্প্রতি মালয়-দেশে ঐ জাল করিয়াছে, সে কি কেবল ভারত সম্পর্কেই এমন সাধু বনিয়া গিয়াছে? যদি বাধ্য হইয়াই বনিয়া থাকে, তবে সে সাধুতার মূল্য কি? সে সাধুতা কতদিন? তবেই স্মরণ করিতে হইবে, সেই সাধু ব্রিটিশ-গবর্মেণ্টই কোন্ সর্তে এমন সাধুতার কাজ করিয়াছিল — ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়াছিল? কংগ্রেস কি তাহার সেই সাধুতায় বিশ্বাস করিয়া ঐ সর্তে রাজী হইয়াছিল? না, আর কোন উপায় ছিল না বলিয়াই করিয়াছিল? হাসে-পাওয়া জিনিসের দাম যাচাই করিলে চলিবে কেন? চোখ বুজিয়া বিশ্বাস যে করিতেই হইবে। নহিলে, আর্মাগেডন মত, সে যে ভারতকে দুই-ভাগ করিতে চায়, এমন কি, সে যে সারাভারতটাকে

ইয়োরোপের রাষ্ট্রকার-গ্রহণের মত অনেকটা পরস্পর-বিরোধী শব্দ-যোজনা বিচক্ষণ করিয়াছে, কংগ্রেস তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে নাই কেন? ভারতকে স্বাধীনতা-দানের ঐ সর্ত-গুলির কি কোন অর্থই ছিল না? ঐরূপ সর্ত কি অ্যাটলি মাউন্টব্যাটেনের ভারতপ্রীতির অকাট্য নিদর্শন? আজ যাহা ঘটিতেছে, তাহা কি কেবল চার্চিল-প্রমুখ কয়েকজন ভূত ইংরেজের প্রয়োচনায়? ব্রিটিশ জাতির সর্বজনপূজ্য নেতা কে? চার্চিল, না অ্যাটলি? ভারতীয় মুসলমানের আরাধ্য নেতা কে? জিন্না, না আবুল কালাম আজাদ? ভারতকে ঐরূপ সর্তে স্বাধীনতা-দান কি চার্চিলেরই অনুমোদিত, এমন কি তাহার অনুপ্রেরিত ছিল না? জোর করিয়া চোখে চুলি পরিয়া এই আত্মপ্রবঞ্চনার লাভ কি? উহা কতদিন টিকিবে? মহাত্মা গান্ধী তাঁহার চিরাভ্যস্ত অহিংসের নির্মল বিশ্বাসে ব্রিটিশের ঐ 'হৃদয়-পরিবর্তন' সত্য মনে করিয়াছিলেন। কংগ্রেস-নেতারা কি গুরুর সেই বর্ম-বিশ্বাস বাঁচিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? ইহাকেই বলে, রাজনীতিক ধর্মনীতির দ্বারা শেষন করিয়া লওয়া। অর্থাৎ, যে কুঠারের দ্বারা গাছ কাটিতে হইবে তাহার ইস্পাতটাকে সোনা করিয়া লওয়া। তাহার ফলে অবস্থা এখনে এমন দাঁড়াইয়াছে যে, একটা মিথ্যাকে (অর্থাৎ ব্রিটিশের বিপরীতকে) সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে, একেবারে বলিয়া পড়িতে হয়; ব্রিটিশ যে তাহার ভারত-সাম্রাজ্য স্বেচ্ছায় ও অকপট-হৃদয়ে ছাড়িয়া দিয়াছে এ বিশ্বাস যেমন করিয়া হৌক বজায় রাখিতেই হইবে, না রাখিলে ভারতবাসীর নিকটে একটা গুরুতর মুখের অবাবদিহি করিতে হয়। আসলে, স্বাধীনতা জয় করিয়া লইয়াছি, সে কথা তেমন জোরের নয় — ব্রিটিশ তাহা স্বেচ্ছায় দান করিয়াছে, ইহা যদি সত্য না হয়, তবে স্বাধীনতা-লাভ মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়।

এইবার ঐ স্বাধীনতার আরেকটা স্বরূপের কথা বলি। ভারতের স্বাধীনতা বলিতে যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাই বুঝায়, ইহা, বেন্থিম হইতে ভারতের স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে সেইদিন হইতেই সকল চিন্তাশীল ভারতপ্রেমিক বুঝিয়া-ছিলেন। উহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, উহাকে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক-খ ও বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে, ক্যাবিনেট-মিশন যখন ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-বিভাগীকরণের প্রস্তাব করিল, অর্থাৎ এক হস্তে ভূলোপাত্ত ও অপর হস্তে বিষভাণ্ড লইয়া কংগ্রেসকে আহ্বান করিল, তখন কি এতবড় রাজনীতিক ধুরন্ধরেরা সহজেই তাহার মতলব বুঝিতে পারেন নাই? জানিয়া শুনিয়াও এমন কাজ করিলেন কেন? ইহার উত্তর যিনি দিতে পারিতেন তিনি আর নাই। একমাত্র তাঁহার মুখেই সে উত্তর মানাইত, আমাদের মুখে মানায় না। তথাপি, তাঁহাদের পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে, তাঁহারা হয়ত অন্তরে বিশ্বাস করিতে চাহিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশজাতি এতদিন পরে অনুতপ্ত হইয়াছে — সম্ভবতঃ মহাত্মাই তাঁহার নিজের অসাধারণ চরিত্রবলে, ব্রিটিশকে তাহার এতকালের বাঘত্বখানি হইতে উদ্ধার করিলেন। ইংরেজ সত্যই ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবে (সত্যই ত' দিয়াছে), জগৎ-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ 'বিসর্জিং'-নাটক করিয়া একটা অভাবনীয় কীর্তি স্থাপন করিতে তাহারও খুবই বাসনা হইয়াছে। ইংরেজ যদি চলিয়াই গেল, তবে আর তেমন শত্রু কে রহিল? থাকে এক শত্রীকী ভাবনা — জিন্না সাহেবের সঙ্গে একটা রফা করা যাইত যদি। তাহা ভালো করিয়াই করা যাইতে পারে। তাহার জন্য পাওনা ত' কিছুই নাই, নাই বলিয়াই এত উৎপাত, এত জোর-জবরদস্তি। আচ্ছা, তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্যের অনেক বেশি ছাড়িয়া দিলে তিনি নিশ্চয় কৃতার্থ হইয়া যাইবেন,

কলঙ্কিত করিয়া পরিবেন, আর কেহ সেদিকে লক্ষ্য করিবেন না। অথচ কিছু নয়, আমাদিগকে একটু ঠিক হইতে হইবে, আমাদের অহিংসা-ধর্ম্মে তা' হারাই কর্ত্তব্য। একজন ঠিক ভারত-ভাগ্য — পরাধীনতা ত' বুঝিবে; তখন দুই পক্ষকে নিজ নিজ ভার নিশ্চিন্ত হইয়া ছেড়ে দেওয়া যাইবে। আমার মনে হয়, ভারত-বিভাগীকরণে লক্ষ লক্ষ হত্যার চেয়ে প্রধান কারণ। যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হইবে যে, কংগ্রেস যে ভুল করিয়াছে তেমন ভুল বোধ হয় জগতের ইতিহাসে আর কোন স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা কখনো করে নাই। এখন অবশ্য তাহার কি, তাহা ঐ নেতৃবর্গ নিজেদের অন্তরের মধ্যে দুইপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আর বুঝিয়াছিলেন মুক্তাত্মা। আজ ওঁহারা দুর্ব্বলপ্রকারে বিপন্ন হইয়া দেশবাসীর নিকটে যে অভিবিত্ত করিয়াছেন তাহা সমস্ত হইতেছে, বিলম্বটা ঐ জনসেবা — যদি মন্ত্রিত্বেই হয় তবে তাহাতেই মিটিবে।

আর একটি কথা বিদেশে ইহার করিয়া আমি এই অধিবেশন শেষ করিব। এই স্বাধীনতার গৌরবধ্বনির মধ্যে যে আনন্দটুকু ক্ষণ-অন্তরাত্মক ধারে ধারে সমস্ত অন্তরকে ভরে তাহা এই যে, ভারত বিনা রক্তপাতে স্বাধীন হইয়াছে। রক্ত-পাতটা স্বাধীনতা-লাভের জন্য আবশ্যক হয় নাই বটে, কিন্তু পরে অর্থাৎ স্বাধীনতার স্বরূপরূপ টীকা কিছু বেশিমাত্রায় হইয়াছে ও হইতেছে। পাছে হইলে তাহাকে বোধ হয় রক্তপাত বলা যায় না। অহিংসা-সংগ্রামে রক্তপাত করে পড়িয়াই, সুতরাং যে কারণেই ও যে অবস্থায় লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ত-স্রোত বহিয়াছে তাহাতে অহিংসার স্বাধীনতা কিছুমাত্র কলুষিত হয় না। একথা যদিও সত্য যে, যদি যুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ রক্তপাত করিয়া, স্বাধীনতা লাভ করিতে হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এত লোক এমন ভাবে নিহত হইত না, এক নরনারীর এমন অচিন্তনীয় দুর্গতি হইত না; কিন্তু তাহাতে হিংসার মহাপাপ স্পর্শ করিত। এখন এই যে রক্তপাত হইয়াছে ইহাতে অহিংসাব্রতীর কোন পাপ হয় নাই, বরং সেই কঠিন অহিংস-আচরণের দ্বারা ঐরূপ রক্তপাতে অবিচলিত থাকাই জগতকে শিক্ষা দিবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহার পর আর কি বলিবার আছে?

সত্যই বলিবার কিছু নাই। ভারত কি স্বাধীন হইয়াছে? — এখন প্রশ্ন মূর্খ করিয়া থাকে; কিন্তু আমরা যে বাক্যপূজা ও মন্ত্রজপ করিতে শিখি নাই।

বড় আশায় ঘর-পোড়া ছোড়া
বাস তুলিতে ঘাটের কাছে এল,
ঘরামানের সাত পুরুষে
চুলোচুলি বাঁধছে অকারণে।
মুরুল-পর্ব্ব লিখছে অশেষ
বাঁ-হাত দিয়ে বাঁশের অনাদরে,
শেষ না হ'তে সাক্ষি-পর্ব্ব
ইঁদুরে তার কাটছে সাতে পাতে।

— সত্যেন্দ্রনাথ

মাধুকরী

এই বিভাগে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিব। এই অনুবাদের প্রধান বস্তু হইবে দুইটি – প্রথম, যে রচনা 'ক্লাসিক' বা সুযোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে; দ্বিতীয়, যাহা ভাবে ও চিন্তায় অতিশয় মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বিদেশীয় কবি ও মনীষিগণের বাণী — বিশেষ করিয়া সাহিত্যবিষয়ক চিন্তা-চিন্তাও এই অনুবাদ-বিভাগে স্থান পাইবে।

প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রেমের এই তত্ত্বটিকে উপযুক্তরূপে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। ব্যক্তিমাত্রেরই স্বভাবে, 'অহংভাব' — অর্থাৎ 'আমি ও আমার', এই রকমের আত্মপরতা এতই মূলগত যে, মানুষকে কোন অর্থে প্রেমিক হইতে হইলে তাহার ঐ 'আমি'কে চরিতার্থ করিবার মত একটা কোন প্রয়োজন থাকা চাই।

যেহেতু, মানুষের ব্যক্তি-জীবনের আত্ম-অভিব্যক্তির সুযোগ ও অবসর, এবং তাহার তুলনায় জাতি ও গোষ্ঠির স্বার্থ অনেক বড়, অতএব তাহারই দাবী আগে সকলের উপরে। তথাপি, মানুষ যখন ব্যক্তিবিশেষে তাহার সেই [illegible] করে, তখন সেই মুহূর্তে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে তাহার প্রয়োজন হয় না, তাহার, মানুষের সেই ব্যক্তিগত বোধশক্তি এমনই হয়, তাহা সকল ব্যক্তিতে স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে।

এই কারণে, প্রকৃতি-দেবী তাহার সেই ব্যক্তি-চেতনার মধ্যে এমন একটা মোহ বেশ পাকা করিয়া বসিয়া-ছেন, যাহার বশে সে গোষ্ঠির কল্যাণকে নিজেরই কল্যাণ বলিয়া মনে করিয়া অনুপ্রাণিত হয়; সে যখন বলে: প্রকৃতির সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে, তখনও

তাহার মনে অভিমান হয় যে সে যেন নিজেরই সুখ-নিরাপত্তার ঐরূপ করিতেছে। এই যে বোধ, ইহাও একটা সংস্কার সন্দেহ।

সত্য বটে, উচ্চ শ্রেণীর তুলনায় মানুষের যেমন সহজাত অন্ধ-বুদ্ধি প্রায় নাই বলিলেই হয়—বুদ্ধিই হইয়াছে সেই যে অন্ধকূপ খুঁড়িয়া তাহাতে ঐ সংস্কার করে, কেবল, সেইসঙ্গে ঐ একটা সংস্কার বুদ্ধি প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আছে একটি অতি সূক্ষ্ম সত্তার এবং জটিলতাপূর্ণ অজ্ঞান-বুদ্ধি তাহার আছে — সে-বুদ্ধির খেলা দেখিতে পাওয়া যায় তখন সে তাহার রোগ-নিরাময়ে তৃপ্তি করিবার জন্য, অভিনয় করার তাগিদে ছোক, যা বাদশেষাদীর বশেই ছোক — একটি লক্ষিনী নির্বাচন করে। কেবলমাত্র নিপাদাতৃপ্তির পক্ষে সেই অপর পাত্র বা পাত্রীর তুষ্টি বা কুষ্টি হওয়ায় কিছুমাত্র যায় আসে না; অতএব, ঐ নির্বাচন-কর্মে সে যে এত যত্ন, এত নির্বন্ধ, এত একাগ্রতার পরিচয় দেয়, তাহার অর্থ কি? আমাদের উহাই একটি মোহ — মনে করে, সেই তাহার ও সেই কামনা তাহারই। কিন্তু তাহা নয়, — অপর একটি ব্যক্তির ভিতরেই ঐরূপ সাধনা। ঐ প্রেমের ফলে সে সন্তানটির জন্ম হইবে, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে — তাহার একটি ব্যক্তি-রূপের মধ্যেই — জাতি বা গোষ্ঠীর আদিম্ চাই বস্তুর সঙ্গম নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আমরা জানি, বহু দৈহিক ও চারিত্রিক কারণে, মানুষের আকৃতি-প্রকৃতির সেই আদি-আদর্শটি কালক্রমে অনেকটা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তথাপিও, নিরন্তর সেই আদি-রূপটি ফিরিয়া পাইবার চেষ্টাও চলিয়াছে। আমরা জানি যে, সেই আদি রূপ ফিরিয়া পাইবার প্রধান উপায় — সৌন্দর্য-প্রীতি; যৌন-প্রবৃত্তিও ঐ সৌন্দর্য-প্রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহা না হইলে, ঐ প্রবৃত্তি একটা অতি ক্ষুদ্রিত ও আবর্জিত ক্ষুধানিবৃত্তিতেই চরিতার্থ হইত।

ঐ কারণে, প্রত্যেকে ঐ অবস্থায় প্রথমতঃ সুন্দরীতমাকেই একান্তভাবে কামনা করিবে। এখানে সৌন্দর্য অর্থে আর কিছুই নয় — তাহার আকারে-গঠনে, জাতি বা গোষ্ঠীর সেই আদর্শ-আকৃতির লক্ষণগুলি বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকে অপরের সেই লক্ষণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্যশালী হইবে — যাহা নিজের নাই; আবার, তাহার নিজের যে দোষগুলি আছে অপরের মধ্যে তাহার বিপরীতগুলিকে খুঁজিয়া সুখবোধ করিবে। এইজন্য যেটি পুরুষ নয় স্ত্রীলোক পছন্দ করে; অভিনয় কর্মে যাহারা তাহারাই প্রায়শঃ পছন্দ করে, পক্ষকন্যা এই ধরনের। যখন কোন পুরুষ কোন অনিন্দ্যসুন্দরী কামিনীকে দেখিয়া প্রবল রূপমোহে অভিভূত হয় এবং মনে করে যে, তাহার সহিত মিলন হইলে সে অসীম সুখসাগরে সন্তরণ করিবে, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার ভিতরে সেই জাতি বা গোষ্ঠী-চেতনা অভিনয় প্রথম হইয়া উঠিয়াছে। জাতির আদর্শ-দেহটি বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় — ঐরূপ সৌন্দর্য-প্রীতি; এইজন্য প্রেমের ব্যাপারে সৌন্দর্যের প্রভাব এত অধিক।

আমরা পরে, এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিব। পুরুষমাত্রেই যে সুন্দরী স্ত্রী কামনা করে, সে তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন-বুদ্ধির বশে নয় — একটা গুরুতর জৈব-সংস্কারের বশেই সে ঐরূপ করিয়া থাকে, জাতি ও গোষ্ঠীর হিতসাধনই তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়; অথচ পুরুষ মনে করে, সে নিজেরই সুখের জন্য সুন্দরী নারী কামনা করে। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যাপারেও, আমরা প্রাণীজগতের সর্বত্রই সহজাত সংস্কার বা অজ্ঞানবুদ্ধির গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারি। সর্বত্রই ওই এক অভিপ্রায়, — ব্যক্তিকে দিয়া জাতির কাজ করাইয়া লওয়া। যেখানেই ব্যক্তি-জীব জাতির ইষ্ট-সম্বন্ধে অজ্ঞান, অথবা জানিলেও তৎসাধনে অনিচ্ছুক, — প্রকৃতিদেবী সেইখানেই ঐরূপ একটি সহজাত, অর্থাৎ

জ্ঞান-বুদ্ধিকে তাকি-তহবা — প্রবৃত্তি রোপণ করিয়া দেয়; এখানেও তাহাই, — বাহিরে মানুষের সজ্ঞান উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ভিতরে নিজের মতলব হাসিল করে।

মানুষের জ্ঞান-ক্রিয়া অতিশয় প্রবল বলিয়া, উহার প্রাবল্যের তুলনায় তাহার অন্য ঐরূপ সহজ সংস্কার সংখ্যায় বেশি নয়। যাহাও আছে, তাহা সব সময়ে অব্যাহত থাকিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, বলা যাইতে পারে, সৌন্দর্যপ্রীতি তাহার একটা স্বাভাবিক সংস্কার বটে, সঙ্গিনী-নির্বাচনে সে তাহারি অনুসরণ চালিত হয়; তথাপি ঐ সহজাত সংস্কারও তাহাকে ভুল করায় — সে নারীর পরিবর্তে পুরুষের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সৌন্দ-প্রবৃত্তিবশতই এই যে প্রেম, ইহার মূলে ঐরূপ একটা সর্বনাশী অন্ধসহজ সংস্কারই বিদ্যমান। ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, বিষয়টি আর একটু সবিস্তারে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, প্রেমে পড়িয়া পুরুষ যেমন চঞ্চল-চিত্ত হয়, নারী তেমন হয় না, নারীর একনিষ্ঠা আছে। একটা নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলেই পুরুষের প্রেমে ভাঁটা পড়ে, তখন যে-কোন অপর একজন মেয়েমানুষকে পূর্বের সেই প্রেমাস্পদিনী মেয়েটির অপেক্ষা তাহার সুন্দরী বলিয়া মনে হয়। সে সর্বদাই নূতনের চায়, — নিত্যনূতনের অভিলাষী। অপর পক্ষে, স্ত্রীলোকের প্রেম প্রতিদান পাওয়ার মুহূর্ত হইতেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার কারণ, প্রকৃতিদেবী বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই চান না। এজন্য একদিকে সেই বংশ যত বৃদ্ধি পায় ততই ভালো; পুরুষ যে কেবলই একটিকে ছাড়িয়া অপর আরেকটিকে কামনা করে, তাহার দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হয়; এবং স্ত্রীলোক যে একটা পুরুষকেই ধরিয়া থাকে, তাহার মূলে আছে একটা নিজ্ঞান সংস্কারের তাড়না — ভবিষ্যৎ সন্তানের পালক ও রক্ষক যে পুরুষ সেই পুরুষের পরিচর্যা তাহাকে করিতেই হয়। এই কারণে, বংশরক্ষা-নিষ্ঠা পুরুষের পক্ষে একটা কৃত্রিম সংস্কার, অর্থাৎ অভ্যাসের ফল; নারীর নিষ্ঠা প্রকৃতিসিদ্ধ। এইজন্যই নারীর অসতীত্ব — পুরুষের তুলনায় — এমন লোমহর্ষক ও অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; কারণ, বাহিরের নিত্য নিয়া তাহার কলাকল দেখেন বলে, ভিতরের নিত্য নিয়া তাহা অতিশয় অস্বাভাবিক।

পুরুষের প্রতি নারীর, এবং নারীর প্রতি পুরুষের এই যে অন্ধ আকর্ষণ, ইহা দেখিতে একটা মানসিক অভিলাষ, যা অনিবার্য কারণে ঘটে বলিয়া মনে হইতে পারে, আসলে উহা যে একটা সার্বজনীন ও সহজাত সংস্কারের প্রভাবেই ঘটে, তাহার কোন নিশ্চয় ইষ্ট উহাতে নাই, — কাম বা আত্মার ইষ্টসিদ্ধিই উহার একমাত্র অভিপ্রায় নয়। উদাহরণে বুঝাইতে হইলে, যে বিষয়ে বিশেষ কারণে ঐ প্রেমের পুষ্টিসাধন হয় তাহা নির্দেশ করা আবশ্যক। সেইগুলি সংগ্রহ করা যাক।

ঐ নির্বাচন-ব্যাপারে প্রেমিক-প্রেমিকার মস্তিষ্কই সর্বাগ্রে ধরিবে — তাহার পরেই আত্মা। খুব কঠিন কোন ব্যারাম হইলে সাময়িক একটা জ্বর হয় মাত্র; কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী রোগ — যাহাকে ঘাগ্ ঘাপি বলে, তাহার সম্মুখে প্রেম পলাইতে বাধ্য হয়, কারণ ঐরূপ ব্যাধি সন্তানেও সংক্রামিত হওয়া সম্ভব।

পঞ্চমের তৃতীয় হেতু — দেহের কাঠামো, অর্থাৎ অস্থি-পঞ্জরটা; কারণ উহাই আকৃতি বিশিষ্ট দেহাকৃতিটা বাহির করিয়া আনে। বাহ্যি ও বাহ্যিকের পরেই যাহা সর্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক, তাহা ঐ আকৃতির বিকৃতি; এমন কি, যদি খুব খুব সুন্দরও হয়, তথাপি ঐ রোগ তাহার দ্বারা পূরণ হয় না; বরং কুৎসিত মুখের সহিত যদি সেটা পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত হয়, তবে তাহাও চলনসই বলিয়া বরদাস্ত হইতে পারে। শুধুই গঠনের নয়, ঐ অস্থি-সংস্থানের ত্রুটিমাত্রেই আমাদের চক্ষে বড় লাগে — যেমন, দেহের অতিরিক্ত

• ধরিয়া থেকে অনুপাতে পশ্চাতের দৈর্ঘ্যের অনুরূপ হইয়াছে; কিন্তু, চরণে যদি এমন কোন পেশী থাকে যাহার কাজ কেবল দৃষ্টিগোচর নয়—তবে ইহাই ঐরূপ। অপর পক্ষে, যদি ঐ আকারটা, ঐ সামঞ্জস্য পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন হয়, তবে তাহাতেই সকলের দেখা কাটিয়া যায়—তেমন চরণে কেহ দেখিলে মন খুশী হইয়া উঠে। আরও আছে: পশ্চাদ্ভাগের ক্ষুদ্রতাও তত প্রার্থনীয় নয়; ইহার কারণ, পশ্চাদ্ভাগের ঐ আকারটা মনুষ্যজাতিরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—যেহেতু আর কোন জন্তুর অধিকাংশস্থানে tarsus ও metatarsus-নামক অস্থির মেল ক্ষুদ্রাকারে দৃষ্ট হইতে পারে নাই; এইজন্যই মানুষ খাড়া হইয়া চলিতে পারে—জীবদেহে যেমন তাহাকেই Plantigrade বলা হইয়া থাকে। পীত ভিয়াক-নামক বিখ্যাত লেখক উঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন (ক্লাউন-কৃত ভিয়াকের অনুবাদের তাহার), "যে স্ত্রীলোকের দেহাবয়ব সুগঠিত, এবং যাহার পশ্চাদ্ভাগ দেখিবার—যে রেখা-পরিক্রমণ উপরে প্রস্তাবনার সুবর্ণসূত্রের মত।" পশ্চাদ্ভাগের মূল্য কম নয়, কারণ, দেহের পুষ্টির জন্য যে যন্ত্রগুলি—তাহা ঐ স্থানের দৃঢ়তা ও বিস্তার-শক্তির উপরে নির্ভর করে, এবং স্থানের দোষ-গুণ অস্থিসমূহের কারণেই।

পশ্চাদ্ভাগের চতুর্থ কারণ—একপ্রকার কোমলতা, ইহাও আর কিছু নয়, যাহাকে 'Vegetative function' বলে তাহারই প্রভাব—সর্বাঙ্গীন সুন্দরতা। এইজন্যই দেহের অন্যান্য ভাগের এমন পুষ্টিকর হইয়া থাকে।

পশ্চাদ্ভাগের সর্বশেষে কেবল বলিয়া রাখিতে হইবে—স্তনের মুখমণ্ডল। এখানেও আর সকলের আগে স্তনের অস্থিপ্রধান অংশগুলিই বিচারের বিষয় হইয়া থাকে; যথা—নাসিকাটি সুন্দর হইলে আর সব সুন্দর হইয়া উঠে; আর যদি ঐ অঙ্গটি খাদা বা ক্ষুদ্র হয়, তবে অন্যান্যগুলির শোভা মাটি হইয়া যায়। স্তন কুমারী যুবতীর জীবনে তাহার সুখ-সৌভাগ্যের নিয়ামক হইয়াছে—নাসিকার উচ্চ বা উচ্চ বা উচ্চ নিম্নমুখী বক্রিমতা, এবং তাহাই হওয়া উচিত; কারণ, নাসিকার দোষে কান্তির সৌ আকৃতিরও বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইয়া পড়ে।

মুখবিবরটিও ক্ষুদ্র হওয়া চাই, কারণ মানুষের মুখ পশুদের মত বিকট হইতে পারে না; এজন্য মানুষের মুখ-কান্তির উহাও একটি অধিকের লক্ষণ। থুঁতিটা যদি কাটিয়া বসা-রেখায় মত, অর্থাৎ যেন পিছন দিকে হইয়া-যাওয়ার মত হয়, তাহার চিবুকে বিমুখ করিয়া দেয়; তার কারণ, ঐ থুঁতিটা মানুষের মনঃশক্তির পরিচায়ক ঐ মনঃশক্তিই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে।

অতঃপর, মুখের চক্ষু ও মুখের ললাটের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ সৌন্দর্য মানুষের চিত্তের —বিশেষ করিয়া, তাহার বুদ্ধির—বিকাশ যা পরীক্ষা নির্দেশ করে; ও দুইটাই মানুষেরও যে জননী হইতেই প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মনোযোগের সাহায্যে আরও যে সকল অভ্রান্তিত বা অন্তর্ভুক্ত কারণে প্রভাবিত হয়, সেগুলি এমন নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত করা যায় না। সে বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে এই কয়টি কথা বলিতে পারি।

যে-বয়সে পুরুষ তাহাদের মনোযোগ করে তাহা ভিন্ন হইতে পারিবে। বিবাহ যৌবনা-বয়স তাহারা পছন্দ করে না, তৎপরিবর্তে ঐ বয়সের পক্কতাই অধিকতর আকৃষ্ট করে—এমনই দেখা যায়। ইহার কারণ, ঐ বয়সেই পুরুষের যৌবনোচিত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অতএব, এখানে রুচি বা সজ্ঞান ইচ্ছাটাই বড় নয়, একটা অজ্ঞান-বুদ্ধিই তাহাদিগকে চালিত করে। যেই বুদ্ধিই বলিয়া দেয় যে, ঐ বয়সেই পুরুষের সন্তান-উৎপাদন-শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। সাধারণতঃ মেয়েরা পুরুষের সৌন্দর্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে না—অর্থাৎ, ঐ মুখের সৌন্দর্য; সন্তানকে

সৌন্দর্যদান করিবার দায়িত্ব তাহারা যেন একাই গ্রহণ করে। প্রকৃতিও পুরুষের দুইটা গুণ তাহাদিগকে মুগ্ধ করে,—তাহার চৈতন্যিক বল, এবং তদনুরূপ মনের সাহস। ঐ দুইটারই প্রয়োজন আছে, একটি—সুস্থ ও সবল সন্তানলাভের জন্য; অপরটি—সেই সন্তানের উপযুক্ত রক্ষক হইবার জন্য। সন্তানের আকৃতিগত বহুকিছু ত্রুটি, বা সে বিষয়ে বহুজাতির আদর্শ হইতে যে সকল বিচ্যুতি—তাহা নারীই দূর করিতে পারে, যদি সেই সেই সম্পর্কে সে নিজে নির্দোষ হয়, অথবা সেই দোষগুলার ঘারা বিপরীত সেই গুণে গুণান্বিতা হয়। তেমন যে গুণগুলা পুরুষের নিজস্ব, এবং সেইহেতু জনয়ীর নিকটে প্রাপ্য না, সেই গুণগুলার স্পর্শে নারী নিরুপায়। ঐগুলির কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে, যথা—মেয়ের কন্যালঘনার পুরুষসুলভ গঠন; স্কন্ধের প্রশস্ততা; কটির নিম্নভাগের সংকীর্ণতা; পায়ের গুল্ফতা ও উচ্চতা; পেশীর দৃঢ়তা, লাবণ্য, শক্তি, ইত্যাদি। ঐইসব মেয়েরা সন্তানের দুর্বলচিত্ত পুরুষের অনুরাগিণী হয়, তেমন পুরুষোচিত গুণ থাকিলেই হইল; পুরুষবর্জিত পুরুষকে তাহারা কখনও পছন্দ করে না—তার কারণ, সেই ত্রুটি নিজেরা পূরণ করিয়া দিতে পারে না।

দ্বিতীয় যে একপ্রেণীর গুণ প্রেমের উদ্দীপক হইয়া থাকে—সেগুলি অনুকরণ-সম্ভবীয়। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, মেয়েরা, সর্বদেশে ও সর্বকালে, পুরুষের ভাব ও চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হয়—এই দুই গুণ সন্তান তাহার পিতা হইতেই প্রাপ্ত হয়। নারীচিত্ত জয় করিবার পক্ষে পুরুষের থাকা চাই—চিত্তের দৃঢ়তা, সংকল্পনিষ্ঠা, সাহস, এবং বহুলতা তাহার সহিত সরলতা ও মনের উদারতা; ক্ষমা, বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা প্রভৃতি যন্ত্রিষ্কের গুণ নারীর উপরে সহজ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে না; অর্থাৎ, পুরুষের বিদ্যা, ধনীয়া প্রভৃতি গুণ নারীকে আকৃষ্ট করে না। ইহার কারণ তা' পড়িয়াই রহিয়াছে—ঐ যন্ত্রিষ্কের যাহা কিছু গুণ, যাহার তাহার জনক নয়—জননী হইতেই লাভ করে। পুরুষের জ্ঞানশক্তির অভাবে নারীর কিছুই যায় আসে না; যাহা অত্যাবশ্যক জ্ঞানশক্তি, এমন কি প্রতিভা—একটা ব্যাধি বা অস্বাভাবিক কিছু বলিয়া ঠিক বিপরীত ভাবের উদ্রেক করে। এই কারণে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, স্ত্রীলোকে সুবিধিত-বীর্যশক্তিসম্পন্ন ও মৃদুপ্রকৃতি পুরুষকেও ত্যাগ করিয়া, অতিশয় বুদ্ধিহীন, কুৎসিত ও দুরাচারপূর্ণ পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। অতএব, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মাদের নর-নারীও প্রেমের বলে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়; অর্থাৎ, পতি হইবে অতিশয় নিষ্কর্মণ্য, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি এবং বলবান; আর পত্নী হইবে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, মার্জিতরুচি, ভাবগ্রাহী, সৌন্দর্যপ্রিয়,—এই সকল গুণের অধিকারিণী। অথবা, পতি হইবে—বুদ্ধিমান ও দুর্বলচিত্ত, আর পত্নী হইবে—একটি অতিশয় বুদ্ধিহীনা, অসহ্য স্ত্রীলোক।

ইহার কারণ, মেয়েমানুষ বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হয় না, তাহার মুগ্ধ হওয়ার মূলে আছে—স্বাভাবিক বা সহজাত-সংস্কার (instinct)। বিবাহটা দুইজনে মিলিয়া বড় বড় ভাব-চিন্তা চর্চা করিবার জন্য নয়; সন্তানের জন্যই বিবাহ—ইহাই ঐরূপ মিলনের একমাত্র অভিপ্রায়; আসলে উহা হৃদয়ের মিলন, মস্তিষ্কের মিলন নয়। কোন স্ত্রীলোক যদি বলে যে, সে কোন পুরুষের আত্মিক উৎকর্ষ দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে, সেটা তাহার একটা অতিশয় হাস্যকর আত্মপ্রবঞ্চনা, যা নিজের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের চৌহদ্দির মধ্যে; অথবা, তাহার নারী-প্রকৃতির বিকৃতি হইয়াছে বলিয়াই সে ঐরূপ অনুক্তি করিয়া থাকে। পুরুষের আচরণ অন্যরূপ; যদি কোন পুরুষ কোন নারীর প্রতি সহজাত সংস্কারের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়, তবে সে তাহার মনোহরণ বা চরিত্র-বলের

যাবেই আকৃষ্ট হইবে না। এইজন্য কত লক্ষ্মীটের কত ভাস্কর্যে ফুটিয়াছে; মেকল্‌পীয়ার, আল্‌ব্রেখ্‌ট্ ডুরের (Albrecht Durer), বায়রণ প্রভৃতির লৌকায়ও সরণীয়। এ সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিমত্তার আকর্ষণটাই অধিক বলিয়া মনে হয়, ইহার কারণ, ঐ গুণ অর্জনী হইতেই সন্তানে বর্তিবে। তাহাড়া, ঐরূপ বুদ্ধিমতী নারীর সৌন্দর্যের আশা কিছুই নয়, কারণ, ঐ সৌন্দর্যের প্রয়োজন আমার ফুরাইয়া যায়। তাই তাহার প্রভাব আমার প্রত্যক্ষভাবে ঘটিয়া যাবে। প্রসঙ্গক্রমে, এইখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুষের উপরে ঐরূপ মানসিক প্রভাবশীলতা (শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার) প্রভাব সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে — সেই জননীরা তাঁহাদের কন্যাদিগকে ভাষা, সাহিত্য ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী করিতে চান, — উহার দ্বারা পুরুষের চিত্ত জয় করিতে পারিবে। এমনই করিয়া কৃত্রিম উপায়ে যাহারা কন্যার মুক্ত মস্তিষ্কটির আমদানি বাহিরের দুইতে বড় করিয়া তোলে, — ঠিক যেমন, আবহমান হইতে চুলা ও বন্ধনের সাহায্যে তাহার দৈর্ঘ বন্ধ ও কৃশ কটিদেশের ছন্দে সম্পাদন করে। মনে রাখিতে হইবে, আমরা কেবল সেইরূপ আকর্ষণের কথাই বলিতেছি, যাহা সম্পূর্ণ অপরোক্ষভাবে, স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে — এবং যাহা হইতে প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তি হয়। কোন বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মহিলা যে পুরুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও মস্তিষ্কশক্তির পক্ষপাতী হইবে; কিম্বা, এমন পুরুষও আছে — যে তাহার ভাবী-পত্নীর চরিত্র চিত্রের দৃঢ়তা প্রভৃতি লক্ষণগুলি উচ্চমূল্যে বিচার করে এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে, — সে সব দৃষ্টান্ত আমার বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। তেমন হিসাব কেবল সেইরূপ বিবাহেই হইয়া থাকে, যেখানে বর-কন্যার নির্বাচন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা প্রেমমূলক যে প্রকার বিবাহের আলোচনা করিতেছি, সেরূপ প্রেমে এরূপ বিচার-বুদ্ধির স্থান নাই।

(ক্রমশঃ)

এরোপ্লেন পরে

বুদ্ধিমান নারী হ'য়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি, বৃথা বিদ্যা ধন।
অবলার কোমল দুর্বল হাড়গুলি
এ যাহার ভেঙে করে শতখণ্ড ধূলি।
যার সেই মৃদু দুর্বল কীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা, সন্ত্রাসের লীলাদিনী
সাহস সরলা, যার ভয় আশিপাশে

সদনে পরাভব বীর্যবল, তপস্যায়
ক্ষেম! —
হে অনন্তদেব, সব ধন তোর
এক হতে সহেছ ছিনিয়া — সব বিদ্যা
সব বল ক'রেছ তোমার পরাভব।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র বল।

— চিত্রাঙ্গদা

বঙ্গ-দর্শন

যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে, রাজপুরুষদের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। অতএব, যে-দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুর্বল, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যগ্র, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজার দুর্গতি দেখিলে তাহারা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। বিরোধে মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়। নির্ব্বিরোধে তৎসমুদয়ের লোপ; পূর্ব্বে দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের বল ও ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল।

— বঙ্কিমচন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ

আমরা এখনও 'বঙ্গ-দর্শন' লিখিতেছি, অথচ 'বঙ্গ-দর্শন' হইতে আর বিলম্ব নাই। বঙ্গজননীর তনয়তনয়া মাসের প্রাবণটা খুব ঘটা করিয়াই কলিয়েছেন; দেশে যতগুলি বই ছিল সবগুলিই এবার উৎসর্গ করা হইবে। উৎসর্গ করার পর তাহারা 'উৎসর্গ বাঁড়' নামে অভিহিত হইবে। কোন গোষ্ঠে আর থাকিতে হইবে না; স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে। তখন সেই ইতস্ততঃ ধাবমান বৃষগুলিকে কেহ লালসাও যেন খোঁয়াড়ে দিবে, গোপতিরাও তেমনই তাহাদের গোচারণ বন্ধ করিবে। তাহাতে ঐ অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত বৃষদলের প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইবে। তা' হউক, সেটা সে কষ্ট দূর হইবে; বড় বড় শহরে মহলাদারী টানিবার ভার তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। ঐরূপে বৃষকুলের নিঃসাধন করিয়া, শেষে বৃষভগণ পরিত্যাগ করিয়া, তাহারা প্রেতলোকে গো-কুল স্থাপিত করিতে পারিবে। বঙ্গজননীর কৃতসন্তানগণ এইরূপে বাকুড়াকে সুসজ্জিত করিয়া মহাপুণ্য অর্জ্জন করিবেন। তাই বলিতেছিলাম, 'বঙ্গ-দর্শনে'র পাঁচে-বাড়ি আর আবশ্যক হইবে না, আমরাও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।

* * *

প্রায় একবৎসর ধরিয়া আমরা আমাদের জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা দেশবাসীকে আমাদের প্রাণের কথা শুনাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই কথা যে সকলের প্রীতিকর হয় নাই, হইতে পারে না — তাহা জানিয়াও আমরা বিরত হই নাই। তার কারণ আমাদের বিশ্বাস, যে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছে, তাহাকে সেই সত্য অকপটে প্রকাশ করিতে হইবে,

না করিলে প্রত্যবায় হয়। সত্য যেমন কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, তেমনই তাহাকে আগলে-রাখার ভার। ঐ আগলে-রাখার ধারাই সত্যের একটা রূপ ফুটিয়া উঠে। আমার সত্য অপরের সত্য না হইতে পারে, কিন্তু অপরের সত্যও যেমন, আমার সত্যও তেমনই, মিথ্যা না হইতে পারে। অতীত উপরে কোন ব্যক্তির ছাপ বা মার্কা থাকেনা বটে, কিন্তু সকল ব্যক্তিরই সত্যের একটা রূপ থাকা চাই, সে আর কিছু নয় — আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কি আমার অন্তরের বিশ্বাস? মানুষের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ঐ অন্তরের বিশ্বাস বলিতে কি বুঝায় তাহাই বলিব। আমি যাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহা কি আমার কোন স্বার্থের সহিত জড়িত? যদি তাহা হয়, তবে তাহাকে অন্তরের বিশ্বাস বলা যাইতে পারে না — তাহা বাহিরের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনই বড়, সত্যের কোন চিহ্নই সেখানে নাই: অথবা যদি থাকে, তবে তাহাকে স্পষ্টই সেই প্রয়োজনের রূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এইরূপ বিশ্বাসের দুইরূপ হইয়া থাকে — সত্যের বিশ্বাস একরূপ, স্বার্থের বিশ্বাস অন্যরূপ।

* * *

সত্যের আর কোন কষ্টিপাথর নাই। এর উপরে, স্বার্থকে ও সত্যকে পৃথক ভাবা যায় কিনা, অর্থাৎ, আমি যাহা বলি তাহাতে সত্য-মিথ্যা না থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা বলি, তাহা সত্য বলিয়াই জানি। না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, সত্য একটা তত্ত্ব বা ভাববস্তুই নয়: তত্ত্ববিচারে সে একটা তর্কের বস্তুমাত্র, সে তর্কেরও শেষ নাই। তথাপি, তাহারই কোন-একটা যখন আমার বিশ্বাসের বস্তু হইয়াছে, তখনই তাহা আমার সত্য হইয়া উঠিয়াছে, — এই অর্থে সত্য ব্যক্তিগতই বটে। তখনই সত্য জীবন্ত হইয়া উঠে, এবং তখনই কথায় ও কাজে কোন ব্যবধান আর থাকেনা। যে ব্যক্তি বলে, 'আমি যাহা বলি তাহা করো, যাহা করি তাহা করিও না', সেও একটা অসত্যের দাবী করে, তাহা, তাহার সেই কথা কেহ শুনিবে না, কেহ তাহা পালন করিবে না — পালন করাইবার মত শক্তি তাহাতে নাই; সে একটা কথামাত্র, তাহার মূলে সেই বিশ্বাসের জোর নাই, যাহা পরের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে। মানুষ যদি তেমন করিয়া সত্যকে পাইয়া থাকে, তবে সে বড় ক্ষুদ্র লোক, তাহার কথায় ধূলা আছে; আর যদি সেই সত্য-বিশ্বাস তাহার কার্যেও ফুটিয়া না ওঠে, তবে সে বড় বড় বক্তিই হোক — তাহার মাথায় কোন ধূলা নাই; কারণ, মস্তকটাই ত' সত্য নয় — সে একটা তত্ত্বমাত্র; সত্য ঐ মানুষের বিশ্বাস। যাহারা সেইরূপ সত্যনিষ্ঠ, তাহারা বিরুদ্ধবাদীকে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে, ভয় করে। আমরা সেই সত্যের দোহাই দিয়া দেশবাসীকে আমাদের প্রাণের আবেদন জানাইয়াছিলাম। আমাদের সত্যটাকেই প্রাণ দিয়ে বলি নাই, কেবল অকপটে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার প্রয়োজন ছিল, কারণ, তাহাতেই পরস্পরের সত্য-চিন্তা, অনুকূলে বা প্রতিকূলে, মুখর হইয়া উঠে, অকপটের আন্তরিকতা অপর পক্ষকেও উদ্বুদ্ধ করে, — যদি সেই পক্ষেরও সত্য-পিপাসা থাকে।

* * *

'অকপট' হইয়াই কথিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ইহারও যদি তাহার স্পর্ধা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা যে পলিটিক্সের স্পর্ধা — আত্মাভিমানের স্পর্ধা নয়, তাহা আমরা আমাদের অন্তরে জানি বলিয়াই লিখিতে আসি। এই প্রয়াস যে সর্বৈব ব্যর্থ হইয়াছে তাহাও মনে করি না; যদি পাঁচজন পাঠকও আমাদের কথায় সায় দিয়া থাকেন — আর কিছু নয়, যদি কেবল এইটুকুও তাঁহারা চিন্তা করিতে রাজী হইয়া থাকেন যে, এখনে যাহাদীয় জীবনে — সকল ক্ষেত্রে — যে ধারণা বসিয়াছে তাহা

সঙ্কীর্ণ নয়, বাস্তবিকও নয়, যদি তাহাতে যথার্থ মানবীয়তা রহিয়াছে, তবে তাহাতেই আমরা কৃতার্থ হইব। তাহা, আমরা জানি, আমাদের এই প্রথম সংখ্যা কীট বা দুষ্ট হইবে, ইহার মূলে সেই প্রেরণা ছিল যাহার জন্য — "যত্নবানায় পর্বত আক্রমতে মহতো ভয়াৎ"। সেই লক্ষ্যানুসন্ধানে সফলের সম্ভাবনা নৈরাশ্যের কারণ নয়, তাই আমরাও ব্যর্থ হইয়াছি মনে করিব না।

•

কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' মুখ্যতঃ সাহিত্য পত্রিকা; এজন্য সাহিত্যিক আদর্শ-লক্ষ্য এবং সাহিত্যিক ভাব-চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাঠক-পাঠিকার চিত্তোৎকর্ষ-বিধানে ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই কাজ একার নহে — সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আমরা পত্রিকা-প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বেই বাংলার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে কয়জনকে প্রতিষ্ঠাবান বলিয়া মনে করি — এবং সাহিত্যপ্রেমিক ও সাহিত্যকর্মিমাত্রই বলিয়া মনে করিতাম, তাঁহাদের পত্র লিখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, আর কিছু না হোক, বাঙালীর নৈবেদ্যের বহু সাধনার ধন এই বাংলাসাহিত্যের রক্ষায় — তাহারই শুচিতা ও মর্যাদারক্ষার জন্য, সেই বাণীসেবকগণ আমাদের এই ডাকে সাড়া দিবেন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম, বাংলার প্রতিভাবান সাহিত্যিকগণও, সরস্বতীর পূজা অপেক্ষা আত্মপূজায় অধিকতর নিষ্ঠাবান। বাংলার বাণীপ্রাঙ্গণে এখন ক্রয়বিক্রয়ের হাট বসিয়াছে, সাহিত্য এখন রীতিমত পণ্য-সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। তার উপর, যে সাহিত্যিক সেই হাটে যত বেশি চাহিদার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তাঁহার অভিমানও তত বেশি; বাজারে যাহার যত বেশি বিক্রয় বা কিনিই তত বড় সাহিত্যিক; নিজেদের পেশার এই মূলমন্ত্র যা ব্যবসা-বাদ অনেককেই অভিনব আত্ম-সচেতন করিয়াছে। আমাদের ঐরূপ অবস্থায় দুই-একজন নিতান্ত কৃপা করিয়া এক-আধটি লেখা দিয়াছিলেন, তাহাদেরই যত্ন দেখ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই সময় ও সুযোগের যার যার খুশিমত করিয়াছিলাম। কেহ বা লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়া — কাহারও পাকের কেহ দেখাইয়া — অনুমোদন আদায়টা ভালো করিয়া উপভোগ করিবার ও তজ্জন্যই জন্য, প্রকাশে বৃথাসূচী দেখাইলেন। কেহ বা, বাহারা আমাদের প্রতি অহেতুক-সঞ্চিত বিদ্বেষ বিষটাকে এই অবসরটায় মুখে, অনেক মুখোশের আবরণ করিলেন, পরের উপর দেখাইবার সৌজন্যও আবশ্যক মনে করিলেন না। অথচ, ইহাতো আমাদেরই ভুল; উহা থাকিলে কিছু নয়, অসৌজন্যও নয় — ইহাদের আভিজাত্য-বোধে এত অধিক যে, আমাদের মত বিদ্রোহীর লিখিত নিমন্ত্রণপত্র ফিরিয়া যাবে। যে কয়জন সাহিত্যিক ও কবি-বন্ধু আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে আমরা — আমাদের পক্ষ হইতে নয়, আমাদের আরাধ্য ঐ কল্যাণীয় পক্ষ হইতেই, ঋণ স্বীকার করিতেছি; কারণ, আমরা ঐকান্তিকভাবে আমাদের উপলব্ধার্থে 'বঙ্গদর্শনে' নিবেদন করি নাই, তেমন দাবী আমরা কখনও করিতে পারি না। 'বঙ্গ-দর্শনে'র অবস্থাও তেমন নয় যে, আশিকারে এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে যে নামগুলির ডাকে আসে কোন প্রকার দাবী করিতে পারে।

• •

বর্তমান বাংলাসাহিত্যের বাহারা কৃতকর্মী তাঁহাদের কর্ম ও কর্ম সম্বন্ধে ঐ জানাশোনাটুকুই থাকিবার; জানা যে একেবারে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু অনুমান ও প্রত্যক্ষের মধ্যে যে অনেক তফাৎ! আমাদের সেই অনুমানটুকুও যখন মূলিদাৎ হইল, তখন আমরা প্রায় সম্পূর্ণ একক ভাবে 'বঙ্গদর্শনে'র ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলাম। বেশুনের মানুষ আমরা — যে মূল বাংলাদেশে আর কখনো আসিবে কিনা

তাহিনা — সেই সুদূর ভাষা এখনও আমাদের গায়ে লাগিয়া আছে। একালের সেই বাণী-অনুষ্ঠানীদের সর্বশেষ আসরের একজনের আমরা বন্দিতে পারিয়াছিলাম; বন্দনাকারীর সেই দৃষ্টি এখনও মনে আছে, তাহা সেই মহিলা কিছুতেই লুকাইতে পারিত না। তাই যখন বেথিলাম ইংরেজ বড় কবি- তখন সেই কবির অনুরোধিতা প্রাপ্ত না করিয়া ইংরেজ আমরা প্রতিনিধি করিতে চাহিলাম যে ইংরেজ মহরোধিতা যাহিলেকেও বাঙালীকে সাহিত্যের তুলনা বিষয়ে কথা যায়। বাংলাসাহিত্যে যথা শক্তির আছে, আজিকার এই সাহিত্যের তুলনায় তাহা অফুলা; সেই সাহিত্যের সঙ্গে আমরা করিয়া চর্চণ করিলে বাঙালী এখনও তাহার সাম্প্রতিক জীবন, ও সাহিত্যের প্রাণধারাটি ফিরিয়া পাইতে পারে। সেইরূপ পত্রিকার সাময়িক সাহিত্যালোচনায় কোন গৌরব না থাকাই বাঞ্ছনীয়; তাহাতে কেবল সাময়িকপত্রেরই সম্মান-হানি হইতে পারে, কিন্তু বাংলাসাহিত্যের গৌরব তাহাতেই বৃদ্ধি পাইবে- এবং বাঙালী শিক্ষিত-সাধারণের কল্যাণও তাহাতেই হইবে। এই এক বৎসরে 'বঙ্গদর্শন' যদি সেই পথের একটা নির্দেশও দিয়া থাকে, তবে তাহাতেই তাহার অস্তিত্ব সার্থক হইয়াছে।

* * *

কিন্তু এতক্ষণ এ কি বকিতেছি! এ যে 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাওয়া গেল! ধান ভানিবার কালে গ্রামের গানই প্রশস্ত। একটা বড় ধান-ভানার-পালক যে আসিয়া পড়িয়াছে, আমাদের তাহা মনেই ছিল না। তারপর আবার সেই 'পনেরোই আগষ্ট' আসিয়াছে! পনেরোই আগষ্ট!—আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্মদিবস যে! না, 'জন্মদিবস' বলিলে 'জন্ম'টা ঠিক থাকে বটে, কিন্তু 'দিবস'টা ঠিক থাকে না — 'Name-day' বলিতে হইবে; মহিলে রাষ্ট্রভাষার যেমনই হোক — রাষ্ট্রের ইজ্জত থাকে না। আপনারা বলিবেন, কেন? আগষ্টকে কি 'আগষ্ট' করিয়া বলা যায় না? তা যায় — ঠিকই ত। ঐদিন আমরা অনেক-কাণ্ড করিয়াছি।

* *

তা' সে যাই হোক — মহাসমারোহ হোক, আর অনুষ্ঠানাড়ম্বরই হোক, আপনারা কিরূপ উৎসব করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন? হইবেন বই কি। তা' ছাড়া, জন্মদিনের ব্যাপারটাও এবার যেন একটু জরুরী— নয়? কেন বলুন তো? আনন্দটা যত আপনার হইতে, আপনার যত করিয়া প্রকাশ পায় ততই তাহা খাঁটি, এবং প্রাণেরও পুষ্টিকর নয় কি? এই দেখুন না কেন — গাইয়ের সামনে ঘাসটা না রাখিলে, এমন কি প্রসবে তাহার ধারা একটু পান করাইয়া না লইলে, বাঁটে দুধের ধারা বয় কি? তাহা না করিয়া, যদি গাইয়ের বাঁটগুলাতে একটা বড় লাগাইয়া ফুঁকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে, দুধ অবশ্য বাহির হয়, এবং বাজারে তাহা লইয়া কারবারও চলে, কিন্তু আপনারা কি সে-দুধকে খাঁটি বা স্বাস্থ্যকর মনে করেন? বিজ্ঞানের মতে, তাহাতে দুধের সকল উপাদানই আছে, অতএব, তাহাতে ও দোষারোপ সেই বাৎসল্য-বিগলিত স্তন্যধারায়, কোন তফাৎ নাই। কারণ, বিজ্ঞান ও সব মানে না, অত ছাড়া ছিঁচ বলিয়া কোন বস্তুকে স্বীকার করে না। ঐ যে উৎসব আপনারা করিবেন, উহা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে — রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'law' বা বিধান-অনুসারে। এখন আমরা যত-দূরে বাস করিতেছি — সর্বত্রই মহদেবতার অধিকার। মনের দ্বারা উৎসব-রস নির্জন করিতে হইবে — আহা, যেন আক-মাকাইয়ের ফল! মহাপতিরা যেমন হুকুম করিলেন, অমনি দেশের সংবাদপত্রগুলি উৎসবের ঢক্কা বাজাইতে লাগিল, উহাদের যে ঐ কাজ! — "পনেরোই আগষ্ট এলো! হে ভারতের, তথা বাংলাদেশের স্বাধীন নর-নারী! তোমরা মনোরাজ্যের স্বাধীনতা-কমল ফুটাও, গন্ধ করিয়া, সোনার তরিয়া তোল।

দেব, এই প্রথম বৎসরেই — মাঠে মাঠে ধান ধরে না গো আর! আনন্দের কি সীমা আছে! সীমা যাই থাকিবার হইবার তবু আছে। আনন্দটা একটু বুঝিয়া সুঝিয়া করিবে; বলাবাহুল্য, অতিরিক্ত আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিও না, সে বড় বিশ্রী দেখাইবে।" তাই এবার উৎসব ঠাঁইতে শুরু হইয়াছে, উৎসবটা যেন বিধিবদ্ধ ভাবে করা হয়, বেশি চড়াচড়ি করা যায়ন।

স্বাধীনতার যেমন অবশ্য, উৎসবটাও তেমনই অবশ্য হইবে তো? তাই তাহাদের দিকে দিকে উৎসবের একটা তলোয়ার উঠিয়াছে। কেবল, যাহারা বুদ্ধির দোষে এই স্বাধীনতা পাইয়াও হারাইল, সেই পালিটারা বড় গোলমাল করিতেছে। তাহাদিকে কিছুতেই সমর্থন দেওয়া যায় না; ঈশ্বরও যে আমাও সে, টাঁয়া কিছুতেই তাহারা বুঝিল না, তাই দুর্গতির চরম হইবে না তো কি? তোমরা ও দিকে তাকাইও না, তোমাদের আমারও যে, ঈশ্বরও সে; অর্থাৎ, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউন, অথবা কিছুই না হউন — সে আমরা ভালো, তোমরা কেবল এই গানটি গাও — "জয় —মেয়েকলঙ্কন, জয়-ছলিয়ন, জাতিকুলভঞ্জন, আতঙ্কারীরঞ্জন — দক্ষকাঙ্কিনন হে!" আরেকটু ঝোয়ালো করিয়া গাহিতে পারো — "জাতক-বিধেয়-বরবর-ধূর্জটি-চক্রচূর্ণিশালী!" কেমন? কেন একটু গলা-ভরা, গলা-ভরা হইল না? ইহার পর, "জা তব করুণা করতে পূরঃ" জুড়িয়া, একে কে ঘরিল, কে কাঁদিল — কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, সকলে এই উৎসবে ঝাঁপাইয়া পড়ো; কোন দিকে না চাহিয়া, চক্ষু বুজিয়া, দুই কর্ণে দুই অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া ডুব দাও; ভাসাইয়া যাইতে পারিলে আরও ভালো — চরকম আর থাকিবে না।

উৎসবই বটে! কোন দেশে, কোন জাতি এমন দিনে উৎসব করে, বা করিয়াছে? আজ ভারতবর্ষের যে অবস্থা, যেমন অবস্থা, সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে আর কখনো ঘটিয়াছে? ভারতের ভাগ্যবিধাতার — অর্থাৎ হিন্দুজাতির এমন দুর্দিন আর কখনো হইয়াছে? হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা পর্যন্ত ভুলাইয়া, একটা বিজাতীয় রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্র এমন করিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা কেহ কখনো করিয়াছে? সে অস্ত্রবলে কি কোন ভাগ্যবিধাতাকে কখনো করিয়াছিল? বিলাতী 'রেশন' কথাটা ধার করিয়া, অথচ তাহার অর্থটা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া, 'রেশনের পাথর-বাটি'র মত একটা উদ্ভট দুরভিসন্ধির দ্বারা সমস্ত দেশকে ভয়-চকিত করিয়া, এবং একটা অভিনব অবাস্তব স্বাধীনতার লোভ দেখাইয়া, এই যে হিন্দুকোটী ঘর-সংসারের জীবন-মরণকে তুচ্ছ করা হইতেছে — ইহাতে রাষ্ট্রধর্মের যে আহাম্মুকি আছে, মানুষের মনুষ্যত্বকে পদদলিত করা হইতেছে না! আজিকার দিনে কোন্ মানুষ উৎসব করিতে পারে? হিন্দু না হয় আর হিন্দু হইতে পারিবে না — হওয়াটা কেবল রাষ্ট্রদ্রোহ, কিন্তু সে কি মানুষ হইতেও পারিবে না? আজ ভাগ্যবিধাতার অবস্থাপের যে অবস্থা — ঐ হিন্দু হাজরাবাদ ও পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ নর-নারী — সে-একটা মরুঝড়-সমাজ — সেখানে উৎসাটিত ও উৎপাদিত হইয়েছে, তাহাতে রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রধর্মে কোন প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু সেই রাষ্ট্রমুক্ত 'স্বাধীন' মানুষগুলা, শুধু স্বাধীনতার গৌরবরক্ষার জন্য, আপনাদের সেই সৌভাগ্য-সুখের উৎসব করিবে? মানুষের জন্য মানুষের প্রাণ কাঁদিবে না? না, এক চোখে হাসিবে, আর-এক চোখে কাঁদিবে! অর্থাৎ, তাহারা মনুষ্যত্বের জলাঞ্জলি দিয়া কেবল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রধর্মের জয় গাহিবে? মানব-সমাজকে তুচ্ছ করিয়া দলাদলিগুলার ঘরিবারা ভিত্তিস্থাপন করিবে? ইহারই নাম — স্বাধীনতা! মানুষ যদি

হয়তো আর যে কবিব, তবে স্বাধীন হইয়া কি হইবে? আর কি ঐ হাইলণ্ডিয়ারের ইউনিফর্ম ছিল না — যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে সৈনিক কুকুর বীরত্বের সহিত? হয়তো ইউনিফর্ম ছিল না যে — তাহাই আসল কথা নহে; যে সৈনিক আত্মাভিমানকে বড়ই খাটো করিয়াছে; যে সেই আদিম যুগের কবিদিগকে হয়, আজ ঐ দিন সমূহে উপস্থিত হইলে, পাগলিত করিবে, — সেই মহা-অন্তরালের দিনকে ঘরোয়ানার মধ্যে করিবে! কবিতা সত্যসত্যই যদি আমাদের একালের অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন কবিতার লক্ষিত হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'স্বাধীনতার অভিষেক' নামক কবিতাটি যে কোন্ দিন, কোন্ দিন হইতে কোন্ দিন-দিনের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইতে হয়; ঐ একটি কবিতায় তিনি যেন স্বাধীনতার মূল দিয়া — তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি ও চরম শান্তির কথা শুনাইয়াছেন; তাহাতে স্বাধীনতা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া যাহা করিয়াছে, আজ আমাদের ঐ ইংলণ্ডবাসীদের সম্বন্ধে অনুরূপ করা! —

"আজিকার দিন নহে আজি।
অনন্ত-ভূতাগ্রা গাঁথে সর্ব-অঙ্গ আসি'
স্পর্শ করিও না, হায়ঃ। ক'রে মুক্তমন
আজ হ'তে শুভদিনে ইতিহাস-ব্রত
করো আচরণ; বেদী করি' উদ্ঘাটন
পাষাণের করো, বৎসে, দেবতা-বর্জন।
এ পাপ-সৌভাগ্য-দিনে গর্ব-অন্ধকারে
প্রতিকূলে দাঁড়া গিয়া একাকী বিশ্বারে।
খুলে ফেলো অলঙ্কার, নব-রক্তসাজ,
ধারাও উৎসব-গান, রাঙ্গ-অলঙ্কার।
অভিনয়ে যাও পুনি তপস্বিনী সুবাসিনে,
কাজের প্রতীক্ষা করো শুভ্র স্থির চিতে।"

— উহার ঐ শেষ পংক্তিটির অর্থ যেমন গভীর, তেমনই উহা একটি অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এ সব কথা কবিদের মনে আসিবে কেমন করিয়া? মনে আসিলেও মুখে আসিবেনা যে! উহা যেমন বাড়ী-ভাব নয়, তেমনই বাড়ী-ভাবও নয়। যাহা বাড়ীভাবের নহে, তাহা ভাবের নাই। অতএব তাঁহাদের শেষ কি? বাংলা বাড়ীভাবা হইলে, আধুনিক ভাবের এই যে-ইংলিশের স্বাধীনতা ভাবপ্রবণতাকে কৃত্রিম হইতে অকৃত্রিমতার পথ দেখাইত; কিন্তু তাহা তো হইবে না — 'মিরতাঃ পূর্বমেব' কিনা! আহাহা, কতকগুলা বাঙ্গালী ঐ ভাবের সন্তাপিত হইয়া-পাড়া দিয়া — কিসের পক্ষে ওকালতী করিতেছে!

* *

ভারতবাসীর যদি বা স্বাধীনতা-উৎসবের কোন হেতু থাকে, বাঙ্গালীর কোন হেতু আছে? বাঙ্গালীকে উৎসব করিতে বলার মত নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালী তো ভারতবাসীর মধ্যেকার উপস্থিত একটা শব-কঙ্কাল। ঐ স্বাধীনতা-লাভের জন্য — ভারতবাসীর ঐ প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য-ভোগের জন্য বাঙ্গালীকে প্রায় সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে; ধন, মান, প্রাণ, স্নেহ বুদ্ধিটাও যাইতে বসিয়াছে। শব-কঙ্কাল বলিয়াছি এই জন্য যে, ভারত-ভাগ্যের প্রভাধিকার তাহার নাই, — কোথাকার প্রভেদের অধিকার তাহার নাই, সবদিক হইতে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলা হইতেছে। তাহার নিজের ভূমিতেও তাহার অধিকার নাই — বিহার তাহা কাড়িয়া লইয়াছে; প্রভুদের নিকটে ভিক্ষাপ্রার্থী হইতে গিয়া সে চপেটাঘাত পাইতেছে। ইহারও পর শোনা যাইতেছে, তাহার ঐটুকু অবশিষ্ট ভূমিতেও যেসব আল খনিজ-সম্পদ আছে সেগুলি প্রভুদের স্বজাতীয় প্রজাদের অধিকার-ভুক্ত করা হইবে; ইহাও মিশ্চিত। যাবা নিজের কিছু নাই, তিনেও কোন ফল হইবে না। কলিকাতা মাড়োয়ারী অনশনিকদের একটি এজেন্সীর

পেরোন-ক্ষেত্রে পড়িতে হইয়াছে; চতুর্দিকের বড় বড় ভূমিখণ্ড ইতিমধ্যেই কল-কারখানা-স্থাপনের জন্য বন্দরে অধিকৃত হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে নিছক হাজমুরি বা ফিকারুরির উপরে নির্ভর করিতে হইবে। তাহলেও যদি আরও কিছুদিন প্রতিকূল দৈবকে প্রসন্নে আরাধনা করিতে থাকে, তবে বাঙালীর কি অবস্থা হইবে, তাহা কি এখনই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই? কিন্তু আমি ঐ পদ্মপুকুরের অবস্থাটাই ভাবিতেছি। যেখানে যায়, সেইখানেই মার খায় — ঘুরুক-খেলোয়ার মত! প্রভুদের বিচারালয়ে ভূমিচ্যুতের প্রত্যাপণও তাহার নাই। এই বাঙালী স্বাধীনতা-উৎসব করিবে! হাঁ, করিবে বই কি; বড়লোকের বাড়ীতে উৎসবও তো দাস-দাসীরাও উৎসব-বেশ পরিধান করে; করিতে হয় — নহিলে মনিবের মান রক্ষা হয় না: ইহাও সেইরূপ।

* *

কিন্তু বাঙালীর আবার সুখ নাই। আচ্ছা আমুকের ক্ষুধা আছে কিনা — সবার কিলবরণ; 'hunger' এবং 'philosophy' দুইটি সমভাবে সত্য, — দার্শনিকটা এবং অনশনের এমন বাজারই আর নাই! বাঙালীর মনোভাব চিরদিনই বড় উচ্চ, এখন উচ্চতর হইয়াছে। সে ইচ্ছা করিয়াই কান্না চাপিবে, কাঁদিলে যে ছোট হইতে হয়! সে ছোট হইবে না, ঐ আমুক-মাড়োয়ারীর পা চিরি বুকে ধরেও করিয়া সে জলযোগ করিবে। তা ছাড়া, সে তো আর বাঙালী নয়, সে যে হিন্দুস্থানী হইয়াছে — বাঙালী হওয়া যে বড়ই লজ্জার কথা! বিহার বিহারীর, উড়িষ্যা উড়িয়ার, আসাম আসামীর — কিন্তু বাংলাদেশ হিন্দুস্থানীর! তাই, উৎসব করিতে বাঙালীর বড়ই উৎসাহ — ঢাক-ঢোলে ও শঙ্খধ্বনিতে আর সব আওয়াজ ডুবিয়া যাইবে। আমাদের সেকালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল — সেই 'সতী'র সহমরণের কথা। সেকালে পতিপরায়ণা রমণীরা স্বামীর চিতায় উঠিয়া যখন অনল-স্পর্শ করিতেন, তখন পাছে দুর্বলতাবশতঃ তাঁহাদের মুখে কোন যাতনার শব্দ নির্গত হয়, তাই তাঁহাদের কানেকানে জন্য খুব জোরে বাজনা বাজানো হইত। বাঙালীও সেইরূপ 'সতী' হইয়াছে, তাই উৎসবের বাদ্যোদ্যমটা বরং একটু বেশি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উপমাটা সব দিক দিয়া ঠিক হইল না? আপনারা যে নিখুঁত উপমাই ভাল বাসেন, তাহা ঐ 'সহমরণ' কথাটা কেমন যেন খাপ খাইতেছে না — নয়? আরে ধ্যাৎ, আমরাও কালিদাস পড়িয়াছি, উপমা কেমন হওয়া চাই, তাহা জানি। আর একটু সবুর করুন না — দেখিবেন, 'এটিও' 'উপমা কালিদাসস্য'।

* * *

যাক্, স্বাধীনতা তো হইল! কিন্তু স্বাধীন হইতে হইলে 'বেশন' হইতে হয়, অর্থাৎ "স্বাধীন" হইয়াছে অথচ 'বেশন' হয় নাই — ইহা স্যাকরা-স্কুলের মতন একটা কথার কথা! অতএব 'বেশন' হইতেই হইবে। কিন্তু 'বেশন' কি পদার্থ? তাহা মনুষ্য, পশু, বা সরীসৃপজাতীয়? একটু সংস্কৃতায়া করিয়া বলা যায়— "বেশনস্য কা ভাষা, কিং প্রয়োজনং, কিমাকারং, ভক্ষ্যং কিম্!" কিন্তু — বাঙ্গালার এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। সে ভাষায় একটা মাত্র প্রশ্ন আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন — "বেশন তো দিয়া কোন হয়?" তাহলেই বেশনের ঘর-বাড়ী, কুলশীল, জাতিবর্ণ, সব জানিতে পারা যাইবে — জানা করিয়া জবাব দিতে পারিলে রাজেন্দ্রসঙ্গমের প্রয়োজনও মিলিবে। আপনারা বেশনকে না দেখিলেও বেশনের পিতাকে নিশ্চয় দেখিয়াছেন? অবশ্য বেশনকেও দেখিয়াছেন। কারণ, ও দুইই এক; যীশু বলিয়াছেন — "Myself and my Father in Heaven are one"। আপনারা বোধ হয় বলিবেন — যুক্তিটা ঠিক হইল না: বাপ হইতে হইলে ছেলেকে আগে দেখানো চাই; ছেলের বাপকে না দেখাইলেও

হয়ে, কারণ, ছেলেকে দেখিলেই বুঝা যায় তাহার একটা বাপ আছে। আপনাদের এইরূপ হুঁশ শুনিয়া বুঝিয়াছি, আপনারা নিশ্চয় সংবাদপত্র পড়েন না, তাই আপনাদের শ্রবণ-শক্তি এমন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ পত্র অনুসারে প্রমাণ করা যায় যে, খাকা ও বাঘাকার মধ্যে কেহ প্রকৃত নাই। যাহা নাই তাহারও যেমন আছে, ছেলেরও, যাহা আছে তাহারও নাই। সেই যে 'অনাদিরং পদং ত্বস্য ন বয়ং তত্ত্বতো বিদ্মঃ'! 'মেসন'ও সেইরূপ একটি অনির্বচনীয় বস্তু। হইলে

এ কি আনন্দের মেসন! — এ যে খাঁটি 'ব্রহ্মের' মেসন! অতএব, রসাতলের মেসন রসাতলেরই ধোপানীর পিঠা হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

* * *

তবুই 'Father of the Nation' নয়, আপনারা সমস্বরে আরও বলুন — 'Mother of the Nation' বলিয়া কেহ তাহাও শোনেন নাই কি? — হবে! মেসনটি কেমন পাকা-পোক্ত বলুন দেখি? মেসনের কেবল অনুস্বারটি নয়, একাধিপত্যেও পাইয়াছেন! এত বড় প্রমোশনের আরজবাদী 'মেসন' হয় নাই? না হইলে, আপনারাই বা ঐ ভাবে এমন উদাসীন হইবেন কেন! ঐ 'আপাত-মধুর'-এর সম্বন্ধটির গুণ-ব্যাখ্যার কথা পরে বলিতেছি, এখন আপনাদিগকে একটু বুঝাইয়া দিই। আপনারা কখনো যাত্রা শুনিয়াছেন? আধুনিক যাত্রা নয় — খাঁটি সেই যাত্রা! সে যাত্রার পালা যেমনই হোক — 'জয়াদেবের'ই হোক, আর 'গ্রাহুদের হরিপাদপদ্ম-লাভ'ই হোক, আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতে মাঝে মাঝে একবার নারদের দেখা চাই-ই, নহিলে কিছুতেই যাত্রা জমে না; সেই নারদকে এক-একবার 'হরিবে, তোমার কি আসার বহিবে!' বলিয়া হাট-মাঠ করিয়া উঠিতে হইবে; আর চারিদিকে সে কি আনন্দোল্লাস! আসরের চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া সে কি হরিধ্বনি! —"একবার বল হরি হরি বল ভাই!" উহার চেয়েও। ঐ যাত্রার আসরটি এখন উঠিয়া আসিয়াছে আপনাদের ঘরের দাওয়াগুলিতে; সম্পাদক হইয়াছেন নারদ; তাই তাঁহাকেও মাঝে মাঝে, সব ভুলিয়া, 'Father of the Nation!'-টাকেই ডাকিতে হয়; তাহাতেই বাঙ্গালীর! ঐ ধাক্কাটি চাঁদাতেই ভাল শোনায়, চাঁদাতেই ভক্তি আরও উথলিয়া উঠে; তাই আমি আর যাত্রাওয়ালার অনুবাদ করিয়া আপনাদের ভাবস্রোত কাঁটাইয়া দিব না। আপনারা বোধ হয় হাসিতেছেন — ভাবিতেছেন, আমি যাত্রাওয়ালা জানিলাম! কোথায় আপনারা! এমন অপবাদ দিবেন না, তাহা হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইব। আমি প্রত্যহ যাত্রাওয়ালার ধ্যান করি, পূজা করি, —ছাতুর নৈবেদ্য দিয়া দক্ষিণাকে বলি —"মা, তুমি যাত্রাওয়ালাকে আমার কণ্ঠে আসিয়া ভর কর! আমি মেসন হইব, এ বাঙ্গালী-জন্ম সফল হইয়াছে!"

*

আপনারা বিশ্বাস করিতেছেন না? আমার মত পাপিষ্ঠ 'মেসন' হইতে চাহিবে! 'মেসন'কে কখনো দেখিয়াছে! তাহার সেই 'অনন্ত নিরঞ্জন'-মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারে? তা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া আপনাদের দেখা-দেখিও কি আমাদের প্রাণে একটা আকুল পিপাসা জাগিতে পারে না! 'মেসন' যে পরব্রহ্মের মতই একটা নিরাকার বস্তু, তাহা আমি আমাদের পাড়ার বেলবরণীশ মহাশয়ের নিকটই উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছি! তিনি উপদেশ করিলেন, "হে বৎস! হে ধর্ম্মপথ-যুবক! তুমি ঐ 'মেসন'কে নেতি-মুখে বিচার করিয়া উহার সেই অচিন্ত্য-স্বরূপ ধ্যান করিতে থাকো।" তাহাই করিলাম। অমনি অল্পে অল্পে চোখের অন্ধকার দূর হইতে লাগিল। 'নেতি-নেতি' করিয়া বুঝিতে লাগিলাম — প্রথমতঃ, মেসনে'র কোন বর্ণ নাই, বর্ণ থাকিলেই তাহা 'মেসন'

নহে। মেসনের কোন সমাজ নাই, সমাজ থাকিলেই 'মেসন' হারাইয়া যাইবে। মেসনের কোন ভাষা নাই, অর্থাৎ 'মেসন' হইতে হইলে সকলকে স্ব স্ব ভাষা ত্যাগ করিতে হইবে — এক ব্রহ্মভাষায় সব ভাষা লীন হইয়া যাইবে। 'মেসনের' কোন নির্দিষ্ট বেশ বা পরিচ্ছদ নাই, অর্থাৎ, যে যেমন-ইচ্ছা পোষাক করিতে পারিবে, তবে এক-রকম হইবে; সিলের হইলে আরও ভালো. সেইজন্য কাহাকেও বস্ত্র কিনিতে দেওয়া হইবে না; ইহার পরে, পাইলেও কিনিতে চাহিবে না। সকলের বড় সমল — 'মেসন' হইলে কেহ কাহাকেও বলপ্রয়োগ করিবে না; মনের বিরুদ্ধে 'ঠ' নহেই, বাহিরে দেখিলেও দেখিবার করিবে। আরও দেখিলাম, মেসন হইলে, কোন দুইজন মানুষ সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের প্রবন্ধ বা চিঠি-পত্র-বিভাগে ছাড়া, পরস্পরকে আঘাত জ্ঞান করিবে না। 'মেসনে'র রাজত্বেও এমনই 'মেতি'-ভাবাপন্ন; রাজা-প্রজায় সদ্ভাব নাই, একে অপরকে বিশ্বাস করে না; তাই আইন-কানুন বড় কড়া; অস্ত্র ব্যবহার বারণ। 'মেসন' কিনা, তাই সর্বপ্রকার পেলব বস্তুই অধিক-দুষ্কর হইয়া উঠে! বেশ করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলাম, ক্রমে চক্ষুতারকা-দুইটি জ্যোতি-বিস্ফুরে সজল হইল! প্রায় সিদ্ধকাম হইয়াছি, এমন সময়ে হঠাৎ জোতিঃ-স্পন্দন করিলাম। অমনি, মাথা-জোড়া টনিতে টনিতে — বেতাজধারীর মহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া, উঁহাদের উপরেই ঘড়াস করিয়া পড়িয়া গেলাম। বৃদ্ধ চোখে-মুখে জল-আঁচড়া দিতে লাগিলেন, বোধ হয় জল পাইলেন — তাঁহার সেই মস্তকটী আমার মত সাধন-ভজন-হীন ব্যক্তির পক্ষে কিছু গুরুপাক হইয়া থাকিবে। আমি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে, অতি ক্ষুদ্র-কণ্ঠে বলিলাম, "গুরো, ক্ষমায় আমায় সর্বাঙ্গে আপনার পায়ের ধুলা মাখাইয়া দিন — আমি পাইয়াছি! আমার দিব্য-জ্ঞান হইয়াছে! 'মেসন' হারাইয়া আমাকে দিয়াছেন! উহার ঐ এ-কারটা আ-কার হইয়া আমায় সর্বনাশের মোহন করিয়াছে! আমার প্রাণ এখনে ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়াছে এবং ভাসিতেছে! আসলে, উহা 'মেসন' নয়—'না-শন'! হায়, হায়! ঐ এ-কারটাই তবে সেই মায়া, যাহা ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া আছে! আহা — গুরো! 'মেসনে'র এই স্বরূপ দেখিয়া এইবার আমি সমাধিতে প্রবেশ করিব! এতদিনে ভবযন্ত্রণা ঘুচিল!" শুনিয়া গুরু বলিলেন, "বৎস, তোমাকে আমি পায়ের ধুলা দিব কি, 'তুমিই মেসনে আমার গুরু হইয়াছ; এতদিন ধুলা পায়েরই করিয়াছি!" এই বলিয়া কপালে করাঘাত করিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণ, এই — গুরো, গুরুতর! — ব্যাপারটি আমি কেবল আপনাদেরই কানে কানে বলিলাম, দেখিবেন, যেন বাহিরে প্রকাশ হইয়া না পড়ে।

হাঁ, 'মেসন' ত' চাই-ই! 'মেসন' যে হইতেই হইবে; নহিলে বিলাতী আমদানী পক্ষাঘা-উত্তোলন, হুহুত বিলাতী-সুরে ও ছন্দে বেল-সাধা ও আরীয়-পাশ্চাত্য-গান গাওয়া যাইবে না যে! রাষ্ট্রের এমন ঠাট বজায় রাখা — এমন লোকারণ্যে—চলে কেমন করিয়া! 'মেসনে'র আর সবই আছে — 'আধার-আধেয়' পর্যন্ত আছে; নাই কেবল সেই জাতি, গোষ্ঠী, বা সমাজ; সেই ধর্ম, পৌরুষ ও মমতাও নাই — যাহা দ্বারা দেশ ও জাতির পূজাই মানুষের পূজা হইয়া উঠে। অর্থাৎ, পার্থীর পাখের বাহার আছে — কিন্তু আত্মবানটীর সব ফাঁক! 'মেসন' ত' যাউক! — যাহাকে খাঁটি, বিশুদ্ধ 'home-made' মেসন বলে! "এমন মেসন কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি!" —

এ যে আমার ভারত-মেসন, —
মেসার মেসন, পেসার মেসন,
সর্ব-নাশন এই মেসনে যত ভারত-ভূমি!

এই 'নেশনে'র মনের ও চলার প্রথম তরিকে বসিয়া, শেষের যে যেন পাকিস্তানে ছুটিয়া যাইতেছে — এ ছুটের শেষ নাই, সীমা নাই; মানুষকে যেন ছুটিয়া পাইয়া বসিয়াছে। এ সেই 'নেশনে'র বেগ! শেষোক্তে যাহারা ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবের এক-একটি কথা! জাতি-প্রেম ও পরের কথা — মানুষের প্রতি মানুষের দয়া পর্যন্ত নাই! ভাবটা 'নেশন' হইয়াছে কি না! এতদিন কিন্তু হিন্দু এমন হইয়াছে — 'নেশন' এমনভাবে হইয়াছে — তাই ঐ সম্বন্ধে বীক্ষিত হইয়া সকল কথা বিসর্জন দিয়াছে। মানুষের প্রতিও কি ভক্তি! — ইহা পড়াকা-উচ্চারণের ধর্মও নেশন — সর্বত্রের ইহার প্রতি প্রভাব দেখেনই। বহিরে, দেখুন না, পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্থানে একটি মুসলমান বাহির হইয়া আসিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুস্থান হইতে পাকিস্তানে মিছা বাড়ি পাঠান হইতেছে — একেবারে স্রোতের মত! কি পাকে-প্রকারে, অর্থাৎ ছোট-বড় রক্ত-কণিকারী — কি ধর্মিক, যা ছোট সমাজ — অথবা প্রজাসমাজের — এ বিষয়ে সকলেই সমবেগী, ঐব যাইতে পা উঠেছে! আর, 'নেশন' বা একজাতি-বোধের যে উগ্র-ধারা এই বাংলাদেশকে লইয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে — বিহার, আসাম, উড়িষ্যা যে নেশনের পরিচয় দিতেছে এবং তাহাতে 'নেশন'-কর্তারা যেরূপ প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহা বর্ণায় বলিলেও হয়! তবু 'The Nation,' 'Father of the Nation;' বলিয়া গলা ফাটাইতে একদল ভাড়াটিয়া তাহাতে একটুও লজ্জা-বোধ হয় না! লিখের পর লিখ ঐ বিদ্যা প্রচার করিতে যায় না! আমরা বলি, যে মহাপুরুষ এই পাপ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, এবং উপস্থিত তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া — এমন ভাবে জীবন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; যিনি বাঁচিয়া থাকিলে আজ এই অবিচারের দিনে, এবং অসহায়ের সহায়হীনের দেখিয়া নিজেই প্রায়োপবেশন অনশন করিতেন, তাঁহার নামে ঐ 'Father of the Nation'-উপাধিটা যোগ করিয়া, তাঁহাকেও এমন বাঙ্গোক্তি করা কি একটা মহাপাপ নয়? স্বর্গে গিয়াও কি তাঁহার নিষ্কৃতি নাই!

একটা শুভ উপায়ে — হায়দ্রাবাদের নিজাম যাহাতে আজি পাকিস্তানের যোগদান-প্রার্থী হইয়াছেন। শুনিতেছি নেহরুই লোক, ইহার বিরুদ্ধে যে অভিপ্রায় উঁকি দিয়াছে, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। তাহার কিরূপ 'নেশন' হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি, এখন পাকিস্তানের নেশনটাও একবার দেখা-চোখে, সকল বুদ্ধিকে বেচিয়া সেটা উচিত নয় কি? আমাদের ভারত-রাষ্ট্রের নৈয়ায়িকগণ — ভারতের-কর্তৃকারের ভেদীবাদকগণ, এ যাবৎ পাকিস্তান ও জিন্নাসাহেবকে কেবল হাসিয়া, তুড়ি দিয়া, অথবা উপেক্ষাভরে ধমকাইয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তথাপি, জিন্নার মুসলিম লীগ, তাঁহার [illegible] তাহার দ্বি-নেশন, তাহার ভারত-বিভাগ, এবং ও সার্বভৌম অধিকার-দাবি, এবং তাহার পরে [illegible] ও এখনে হায়দ্রাবাদে — ইহার প্রত্যেকটি কথের পর এক জিন্নাসাহেবের অপ্রমিত ক্ষমতার এক-একটি গৌরব-স্তম্ভ নয়? ভারতের-আজমের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, এখন ঐ একটি বাকি আছে, মুসলিম-রাষ্ট্রের একজন রাজা চাই, তাহা হইলেই পাকিস্তান পাকা হইয়া যায়। জিন্নাসাহেব তাহারও মুসলমানের অনন্তর আশা প্রায় পূর্ণ করিয়াছেন; যে-নীতির অনুসরণে তিনি তাহা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ধর্মের নৈতিক-প্রতিষ্ঠার নীতি নয়; তাহা এমন একটা নীতি যাহা ইসলামের মূল আদর্শের অনুগত। সেই আদর্শ আধুনিক যুগের কতখানি উপযোগী, তাহা জিন্না-সাহেবের মত অতি বুদ্ধিমান

ভূগতিত ব্যক্তির যে জানেন না, তাহা কখনই সম্ভব নহে ; কিন্তু যে চিন্তা থেকেই করিলে আক্রমণকারীদের আক্রমণের আশঙ্কা থাকিবে না, তাহা তিনি উপলব্ধি করেন। তাঁহার ঐতিহাসিক একজনের কাজ, এবং অভিনব দুরূহ কাজ — তাহাদের বৃদ্ধিমাত্রকে তাহাদের স্বার্থ-অনুযায়ী একটা 'নেশা' করিয়া তোলা। তাহার প্রয়োগ, ঐ জনসাধারণ নিজেদের সমাজকে, তাহিংসাবিরোধী অতি উচ্চ নীতিকথা, যা সহজ মানবধর্মের প্রতিকূল এবং আত্মরক্ষাকর্মের ঘোর প্রতিবন্ধক, তাহাকে চিনি ভালবাসেন। আগে তাহাদের মধ্যে একটা একজাতিবোধ বা সমজাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় করা আবশ্যক — তাত্ত্বিক অনুকরণ পরিবর্তে মানসিক শক্তির ঐক্যসাধন করিতে হইবে ; পরে যখন তাহারা সংঘবদ্ধ হইবে, তখন আধুনিক যুগের সঙ্গে তাহাদের যোগ স্থাপন করিবার ভার নিজেরাই করিবে ; ক্রমে মানসিক বৃদ্ধিও উন্নত হইবে। মহাত্মাজনসাধারণকে তাহারা আশাতরু নিকায় তৃপ্তিয়া রাখিবে, এবং সকল জীবন্ত জাতিই তাহা করিয়া থাকে তাহাই করিবে ; অর্থাৎ, জাতুকরের খেলা দেখিতে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন পাটি পাতিয়া তাহাকে চা দিবে, — করিয়া দিবে, যত যত পার্থিব সুবিধা প্রদান করিবে ; তাহাতে তাহাদের বৈষ্ণবধারাভিত্তিতে তাহাদের ইজ্জত থাকিবে।

• •

ভিন্ন দেশের ঐ নীতি, আর কোথাও সফল হইল না, একমাত্র ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহাকে সফল করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। ঐ ভিন্নদেশ মোর প্রধান সমাজ, হিন্দু সমাজ — প্রাণহীন, চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। সেই চৈতন্যহীনতা-মোচনের চেষ্টা না করিয়া, তাহাকেই শক্তি মনে নিয়া — বহু বহু শতাব্দীর আড়ালে সেই ভয়ানক কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতাকে ঢাকিয়া, এবং সহজ পথে ইহা করিয়া— একজন আত্মসমর্পণ করিয়া — জগদ্বিজয়ের মত যে রাষ্ট্রীয়ভার ইংরেজরা তুলিয়া নিয়াছে — তাহার মত সুযোগ আর কি হইতে পারে? একজন ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে, তখন আর একজন সেই সুযোগে ধর্মরাজ্যটা স্থাপন করিয়া বসিবে না কেন? তাই বলিয়াছিলাম, আজ ঐ পাকিস্তান-আন্দোলন, ও তাহার পরের পর, মোসলেম-লিগারদের নিজের তাহাদের ইংরেজদের — অভিনব ধর্মরাজ্য অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব ও বুদ্ধিসঙ্গত ; ধর্মীয় কারণে উহাকে দূরে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু পার্থিব আর্থিকারে অভিনবিত্ত করিবার সম্ভাবনাও অল্প নহে।

আমরা ঐ রাজনীতির, আর কিছু না হউক, একজন হইয়াছি। হিন্দু-সমাজের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া গোটা যে ভারতীয়-পরিচালনা, যে অভিনব ধূর্ত ও হিংসক আত্মি বহুপূর্বে প্রথম করিয়াছিল, তাহাকে 'অন্যে কর্ম নিয়োজয়ে'-নীতির ছলা প্রথম ধাপে ধাপে পাড়িয়া ফেলা, — উহাকে 'আহম্মকি' না বলিয়া পারি না যে! আমরা তো স্বাধীন-ভারতের জাতীয়তাবাদী, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধিবাদী করিবার যোগ্যতা নই, কাজেই, মহাত্মা ও মহাত্মার উচ্চ মঞ্চে আসীন হইয়া বড় বড় বীরত্বের কথা বলিতে পারি না। আমরা সেই জাগিবেই-বিশ্বাসের অমূর্ত ভারসাম্য হইতেই বুদ্ধিবাদিনাম (সকলেই বুদ্ধিবাদিনী, কেবল না বুদ্ধিবার ভান করিয়াছিল) — কি ঘোর চক্রান্ত সুরু হইয়াছে : তাহারা সেই চক্রান্তের চক্রে চক্রে কোন্ অবস্থায় দিয়ে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহাও কোনো-চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। 'দুই নেশন' কথাটার যাহারা হাসিয়াছিল, এবং এখনও হাসিয়া থাকে, তাহারা কোনো নেশনই জানে না, যদি জানিত — যদি 'নেশনে'র কোন্ তালিকা আমার অজানা না করিত — যদি নেশন-গঠনে মনোবিজ্ঞান-তথ্যের

হোক না কেন — তবে আজ ঐ 'হুই-নেশন' কথাটা বিধিবদ্ধ হইল, — মেডালী সুলতানের ভায়াই প্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তৎপরিবর্তে হিন্দু-নামটাই মুছিয়া ফেলিয়া ভারতের জাতীয়তার মেরুদণ্ড ভাঙিয়াছে, তেমনই মুসলমানকেও সাবধান করিয়া দিয়াছে। তাহার মাঝে—ধর্ম হইতে বিচ্যুত নয়, তাহার ধর্মই তাহার মাঝে। অতএব হিন্দুর সহিত তাহার রাষ্ট্রিক সহযোগিতা সম্ভব নহে; সুতরাং এবং ধর্মকে যে প্রশ্রয় করিতে চায় সে বিশ্বাসের পাত্রও নয়। হিন্দু যদি হিন্দু না হয়, এবং মুসলমান যদি মুসলমান না হয়, তবে উভয়ের মধ্যে মুখ-দর্শনটাই যে বিষ হইয়া যাইবে! হিন্দু বিষ, মুখে না হউক, কাজে সেই যোগসূত্র মানিবে না — ভারত-রাষ্ট্রের অবলম্বনে কাহাকে সেই বর্বরিয়ানে ভাগ করাইতে চায়। ইহার ফলে ভারতের মুসলমান বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল — তাহারা ইহারই প্রতিবাদে নিজেদের দেশকে অনেক দূর করিয়া বসিল। অতএব, হিন্দুর ঐ ধর্মগতহীন রাষ্ট্রনীতিই ভারতীয় মুসলমানকে, তাহার ধর্মের ভিত্তিতে একটা 'নেশন' গড়িয়া তুলিবার মাহেন্দ্র-সুযোগ দিয়াছে। ঐ কথাটি বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন করিবার অবকাশ এখানে নাই, যুক্তিটা অনেকের পক্ষে অদ্ভুত মনে হইতে পারে। পরে পৃথক প্রবন্ধের আকারে ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে কেবল একটা কথা বলিয়া রাখি। কংগ্রেস যে অহিংসা-ধর্মকে রাষ্ট্রের ভিত্তি করিতে চায় — তাহা একটা অবস্তুসত্তি; ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় উহা তাহা নয়; বরং তাহারই একটা ঐকান্তিক প্রতিবাদ; উহা মানিতে হইলে মানুষকে সমাজ-ধর্ম, লোক-ধর্ম বিসর্জন দিতে হয়। মুসলমান তাহা পারে না। হিন্দু পারে কিনা, তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। যদি পারে, তবে জাতি-হিসাবে সে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

* *

ঐ মুসলিম নেশন যে কোন্ ভাব, কোন্ বিশ্বাস ও কোন্ শক্তির উদ্বোধনে জন্মেই এমন বাস্তব ও জীবন্তরূপ ধারণ করিয়াছে — ঐ নেশন-চেতনা আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা সঙ্ঘ ও অহিংসার ব্রহ্ম-কবাটাঘাত পাওয়া যা বিশ্ব-নেশন-বাদীরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিবে না, কাহাকেও বুঝিতে দিবে না! লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অগ্নি ও তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে; অহিংসার সুন্দরতর ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দিবে, প্রবন্ধ লিখিবে; মহাত্মা-চরিত্রের মাহাত্ম্য-কীর্তনে ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠিবে। আমরা অহিংসাও বুঝি, মহাত্মার মাহাত্ম্যও কিছুমাত্র অস্বীকার করি না; কিন্তু বিপ্লবে ও অহিংসার এক-সেক্রিফেটে এই যে একটা জাতি নির্মূল হইতে বসিয়াছে, তাহার উপায় কি? ঐ যে ধর্মহীন মহাধর্মটা ধর্মহীন ধর্মের দুর্বার আক্রমণে লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহার উত্তর কি? সেই ধর্মকে একটা ধর্মত-ধর্ম বলিয়া, চোখ-বুজ-নাসিকা মুদ্রিত, অথবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেই আপাততঃ রক্ষা পাওয়া যাইবে কি?

* *

ভারতের মুসলমান সমাজ সেই ধর্মকেই অতিশয় দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছে — এতদিন তাহা পারে নাই, আজ দ্বি-জাতিন-বুদ্ধিনীতির সহায় হইয়া, এবং তাহার সহায়তা পাইয়া, সে তাহার সেই বহুপ্রাচীন ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় মাতিয়া উঠিয়াছে। ভারতের হিন্দু-জাতির প্রাণহীন, ধর্মহীন, ধর্মহীন ঐ যে অসার ধর্মের বিলাস— তাহাই তাহার ধর্মকে আরও উজ্জীবিত করিয়াছে। গীতার সেই "ধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" মহাবাক্যটি সে-ই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছে। সেই ধর্মই যে 'নেশন' গড়িয়া তোলে, তাহার এমন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত বর্তমানকালে, পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। আজ ভারতে, হিন্দু-জাতির নেশন-

...মেয়ের দেখনহাসি তুলনা করিয়া দেখিলেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে। আমি পূর্বে হিন্দুর ...-মহিমা কীর্তন করিয়াছি, তাহাতে যে লক্ষণ ...ই আছাড় হইয়া উঠিয়াছে — পাকিস্তানের মুসলিম ...মের লক্ষণগুলি ঠিক তাহার বিপরীত। পাকি-...ানের 'কম্যুনিটি'-র নাই; উপদ্রব থাকিতে ...ছে, কিন্তু ভয়ের কারণ নাই; অন্তত এ পর্যন্ত ...মুসলিম-রাষ্ট্রে একটিও বিশ্বাসযাতক মুসলমান ধরা ...ড়ে নাই। চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত কোন ...মলমানের হাতে অস্ত্র দিতে পাকিস্তান-সরকারের ...ভূমাত্র দ্বিধা নাই! আর ভারত-রাষ্ট্রে? সে কথা না বলাই ভালো। ভারতরাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছে, তাহার কোন 'ধর্ম' নাই, পাকিস্তান বলিয়াছে—'ধর্ম'ই তাহার সব! সে ধর্ম যেমনই হোক, তাহাতে মানুষ মাতিয়া যায় — একেবারে একপ্রাণ হইয়া মাতিয়া যায়! অন্তএব তাহাই ধর্ম; মুখের ধর্ম নয়, বড় বড় বাক্যের ধর্ম নয়; তাহা বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, আত্ম-...দার ধর্ম (আত্মনাশের ধর্ম নয়), সমাজ-রক্ষার ধর্ম; — তাহা লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিকার-চিত্তে নিবন্ধ হইতে দেখার ধর্ম নয়।

• •

সেই ধর্ম ও সেই রাষ্ট্রের জন্য একজন রাজার বড় প্রয়োজন, তাহা যাহারা ঐ সমাজ আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। ভারতীয় মুসলমান কাজেকে-আবশ্যের নিকটে নিরুদ্যম থাকিলেও, ওঁহারা যারা ঐ অভাব পূরণ হইবে না। ঐ একটি অভাবই ছিল, এখনে যদি নিজাম বাহাদুরের দ্বারা সেই প্রতীকটির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ অভাব নিশ্চয় ও' ঘুচেই, বরং একপক্ষে ভাবনার কারণ ঘটে। উহাতে ঐ মুসলিম-সেনের যে কিরূপ প্রেরণা লাভ করিবে, এবং আরও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিবে, তাহা ভাববাদীরা বুঝিতে চাহিবে না, বস্তুবাদীরা বুঝিবে। যাহারা নিজাম মহামানবের উপাসক নয়, পরন্তু সাকার মানব-দেবে বিশ্বাস করে, তাহারাই, তাহাতে ঐ যে একটা সমাজ এমন দৃঢ় ও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহারও পশ্চাতে যে শক্তির সহায়তা রহিয়াছে, তাহা জানিয়া, এবং কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হতভাগ্য-গণের পরিণাম চিন্তা করিয়া স্থির থাকিতে পারিবে না।

• • •

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ঠিক 'স্বরাজ-ধর্মে'র কথা নয়, পাঠক-পাঠিকাদের সহিত দুই একটা ঘর কথার আলোচনা করিতেছিলাম; কারণ, বাংলার কথাই সাতক্ষীরের কিংবা আপনারা, যাঁহাদের মন 'ভারত-ছাড়া' হইতে চায় না — তাঁহারা যে ছি-ছি করিবেন! সেই ভয়ে ও' এতক্ষণ একটু 'ভাবচিন্তা' করিলাম, পাছে নেহাৎ বাঙালী হইয়া পড়ি। হায়, — একটা বড় ভুল হইয়াছে! বেশিদিন নয়, এই কয়েক মাস হইল, আমরা একজন ভারত-মন-ওয়ালার কাছে বড় গালি খাইয়াছিলাম, — আমরা নাকি কেবলই বাঙালী বাঙালী করিয়া কতকগুলা রদ্দি-কাগজে ছাপাইয়া দিতেছি। নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি বহুপুরুষ-সিদ্ধ আমরা বড়ই অন্যায় — এমন কি, ঈর্ষ্যা করি! কিন্তু আপনারা বলিলে না হয় যাইবেন, ইহারই মধ্যে সেই ভারতের মন-মাতি ওঁহার পাশী-খানি ঘুরাইয়া লইয়াছেন! পাকা মাতি কিনা, হাওয়া-মাফিক পাল না ঘুরাইলে হালেও পানি পাওয়া যায় না, তাই মাঝে মাঝে একটু 'বাঙালী-মন'ও চাই বই কি। এখন মাঝি-মহাশয়ের বুদ্ধি কেমন খেলিতেছে একটু ভাবিবেন? না, থাক; অমন একটু-আধটু হয়, তাই বলিয়া, ভারত-গত-প্রাণ এমন বিবাদী মহাজনের ইজ্জত নষ্ট করা উচিত কি? না, এমন অনুরোধ আপনারা করিবেন না, আমি তাহা পারিব না। তবু ছাড়িবেন না! এ তো বড় মুস্কিলে পড়িলাম দেখিতেছি। কথাটা তুলিয়াই বড় অন্যায় করিয়াছি। আচ্ছা, স্থির

হইল ; আমি এমন ভাবে বলিব যে, যেন বলিয়াও বলিতেছি না, আর আপনারাও এমন ভাবে শুনিবেন, যেন শুনিয়াও শুনিতেছেন না। কথাটা লম্বাই হউক বড়ই! ঐ ভারত-মন-ওয়ালা তখন বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষকে অক্ষয়ের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলে বাঙালী আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে। তখন আর সে মেহের-মাখেরপ্রসাদকে কর্তৃত্ব করিতে দেখিয়া 'ঈর্ষ্যাকাতর কুৎসা' করিবে না। বেচারী বাঙালী! অক্ষয় প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিয়াই তো সুভাষচন্দ্রের এমন দশা হইল! আবার, ঐ অক্ষয় করিতে যে পারিবে, সেই ভারতের সুসন্তান হইবে — বাঙালী কেমন সন্তানই তাহারা হউক — তখন তথাও উক্ত ভদ্রলোকের বাঙালীকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র কর্তৃত্ব করিতে পারিলেন না, তাই তাঁহার মত সন্তান হইয়া কাজ নাই'— ঐ অক্ষয়-প্রসাদের মত সন্তানই চাই। তাহলে সুভাষ 'ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব' করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহাকে ভক্তি করাইবার জন্য এমন সুগুরুর সদুপদেশ আবশ্যক হয় না। কিন্তু সে কথা থাক, সে সব বড় গভীর কথা, আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। এখন হইয়াছে কি জানেন? ঐ ভারত-আপাই বলিতে সুরু করিয়াছেন —

"ভারত-ভাগ্যবিধাতা পণ্ডিত জওহরলাল ... ..।"

"ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্ব নিয়াছে, কিন্তু দিল্লীর পুত দিংহাসনে এখন যিনি বসিয়াছেন — রাজা গোপালাচারী।"

— কেমন ভক্তিভাবে লুটাইয়া উঠিয়াছে! ও হও আছে—"লাপ হইয়া কামড়াইয়া ওঝা ...হবার' ছোঁপন যাহারা আদর করিতে চান ...তাঁহারা..... ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি..... ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট আবেদন করুন।"

তবেই বলিতে হয়, "একি কথা শুনি আজি মধুমায় মুখে!" কেহ বলিয়াছেন যাহারা, সেই মহাভারতীয় দীক্ষেক্ষণের প্রতি একি "ঈর্ষ্যাকাতর কুৎসা"! হে রাম! এতদিন তুমি নিজেই উল্টা বুঝিতে, এখন আবার অন্য উল্টা বুঝাইবার দুর্মতি হইল কেন? ইহার পর, বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথাও আছে! গলায় ধুতিদেও — দেখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! যথা — "সময়ের সাথে সাথে সাথে

— বাংলা ও বাঙালীর জন্য একটু বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার কারণ আছে। আমরা উদ্বেগের কথাই বলিতেছি, এখনই আতঙ্কিত হইবার হেতু নাই; এই উদ্বেগ আসন্ন পরিণাম হইতে যোজন দূরে [illegible] রাজার রাজার যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়— বাঙালীর হইয়াছে সেই অবস্থা। পাকিস্তানের [illegible] যে এখনও লাগে নাই, তার কারণ, আমাদের [illegible] পলিসি যে বিষয়ে বন্ধুর সাথে সাবধান হইয়া [illegible] হইবে। কিন্তু পাকিস্তানের হরুক-সরুক আশে [illegible] হয়, চুপ করিয়া থাকিবার জন্য মোটেই নয়। [illegible] জন্য, যদি অহিংসাধর্মের জোরে একটা [illegible] হইয়া যায়, তাহা হইলে অনেক [illegible] হয়তো চীন প্রাচীর অন্তত রক্ষা করিতে [illegible]। সম্প্রতি শ্রীরাজগোপালাচারী সেই আশ্বাস [illegible] — ও লাভের তিনিই যে আচার্য! কিন্তু [illegible] যুদ্ধ বাধে, অর্থে একখানি বিলাতী সংবাদ-[illegible] বলে, "war will break out on all [illegible]" (The New Statesman and [illegible]); অর্থাৎ, সকল সীমান্তেই একসঙ্গে [illegible]। অসম্ভব নয়, কারণ, উহাদের সিঙ্গেল [illegible] বল ও বুদ্ধি আছে, আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ [illegible] মনে হয়। তাহা হইলে, আমাদের দশা [illegible]? কাশ্মীরে যেমন হইতেছে? হায়দ্রা-[illegible] পার্বত্য অঞ্চলে যেমন হইতেছে? অবশ্য [illegible] এখনও যুদ্ধ-ঘোষণা হয় নাই। কিন্তু আমরা [illegible] কথা বলিতেছি তাহাতে যুদ্ধ-ঘোষণা এবং [illegible] সকল সহিত লড়াই করা (যেমন কাশ্মীরে [illegible])—দোনটাতেই আমন্ত্র হইবার উপায় নাই। [illegible]স্তান হইতে সশস্ত্র বাহিনী যদি হঠাৎ [illegible] মোটরের উপরে হানা দেয়, [illegible] সেনাবাহিনী যদি তাহার জন্য প্রস্তুত [illegible] — দিল্লী হইতে বড় বড় বড় আক্রমণটা [illegible] যা দেখে, সেই সহসা-উৎপতিত এবং দিগ্বিদিকে বিস্তারিত হওয়া ও সুদূরপ্রসারী আঘাত রুখিতে পারা যাইবে কি? তখন যে-যেটা সকলে মিলিয়া প্রভুর অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার, মুখোশটা [illegible] রাখা আছে কিনা কাশ্মীরে, এখনে, অথবা হায়দ্রাবাদের বিমানপথ মেটুকু খুলিয়াছে ও খুলিয়াছে তেমন খুলিবার শক্তিও বাঙালী গ্রামবাসীদের নাই। বাঙালীর আত্মরক্ষা-শক্তি অবধি পূর্বেই প্রতিপক্ষ বাজার আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহারও ঘরে কোন প্রকার অস্ত্র নাই — থাকিলে চালিতেও পারিবে না। তাহার উপর—সমাজ নাই, সংঘবদ্ধ হইবার মত চরিত্র-বল বহুদিন নষ্ট হইয়াছে; কোন গ্রামে দুইজন ব্যক্তিও একযোগে কোন কাজ করিতে চাহে না। ইহারও উপায়, পর যুদ্ধের সময় হইতে বাঙালীর মত অসহায় আর কোন জাতির হয় নাই — হয়ত শেষে অসহায়ে নীর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের যুব-শক্তিও স্বেচ্ছাসেবক অভাবে অমনে শিথ হইয়া উঠিতেছে — যুদ্ধ, অর্থাৎ 'হিংসা'র নামে মূর্ছা যাইতে শিখিয়াছে! এমতাবস্থায় — যদি ঐ যুদ্ধ বাধে, এবং 'war on fronts' লাগা হয়, তাহা হইলে বাঙালীর কি দশা হইবে? অতএব, আতঙ্কের কারণ না হউক, উদ্বেগের কারণ আছে। আজের বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্ত্রিরার অবসর কিছুই নয়; অপর পক্ষ যেরূপ বেপরোয়া, তাহাতে অঘটন ঘটাও আশ্চর্য নয়। আমরা আরও একটা কারণে মনে মনে প্রাণে জোর পাইনা, তাহা এই যে, বাঙালীর বিপদে কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্শ্বস্থ যে উদাসীন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখাইয়াছেন, তাহা আদৌ আশ্বাস-জনক নহে; বাঙালীর জীবন-মরণ-সমস্যা ভারত-বিভাগের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে — তবুও তাহার সীমা নাই; কিন্তু সোভাগ্যক্রমে সে একটু দম বা সুবিচার পায় নাই—পশ্চিম পাকাব মেটুকুও পাইয়াছে, পূর্বপক্ষ মেটুকুও পায় নাই। তাই আমরা কেবল ভগবানকে স্মরণ করি — ভগবান বাঙালীকে রক্ষা করুন।

...রচয়

...ভূনাথ সেনগুপ্ত

(১৮৮৭ —)

... সালে বর্তমান বেলার ... গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম হয়; নিবাস ... জিলার হাটখোলা গ্রাম। পিতার নাম ... সেনগুপ্ত। ষষ্ঠীচরণ এক বৎসর পাঠশালায় পড়িবার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন, ও তথা হইতে ১৯১১ সালে সি-ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল কলিকাতার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চাকরী করিয়া পরে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় যে ... ছাড়িয়া ঝরিয়া ব্যাসিনবাজার-এষ্টেটে ... চাকরীর পর প্রায় ... করেন; এখনও সেই কর্ম নিযুক্ত আছেন। কলেজের অধ্যয়ন কালেই তাঁহার প্রথম ... 'মরীচিকা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ... কবিতার মধ্যে ষষ্ঠীচরণের একটি বিশিষ্ট ... কবিতায় করিয়াছেন। ষষ্ঠীচরণের কবিতীবনে ... ও কবিজীবনে সাক্ষাৎ বিরোধ আছে বলে মনে করিয়া কৌতুক বোধ হয়। তিনি, কি ইঞ্জিনিয়ারী, কি ... নিয়ম; আর কোনু ব্যাপারে বোধ হয় এরূপ নিয়ম ও শৃঙ্খলা কর্মজীবনে সর্বত্র এমন অবিসংবাদিত পদ্ধতি বোধ নাই। কর্মক্ষেত্রে বেলা অতি কঠিনের মোহ আসনে কোমল কবিয়া তাহার বেদী অড়ানো রক্তবর্ণ শিরাগুলি ছাড়িয়া আঘাতে ... আঘাতে ... গ্রহণ বোধ — ষষ্ঠীচরণের কবিতায়, ... শিরের উপরে সেই ছাড়িয়া আঘাত, এবং তাহার ফলে ভাব ও ভাষার অমাট কুয়াশা ও ... পরিচিত হয়। ষষ্ঠীচরণ এই কয়খানি ... রচনা করিয়াছেন — 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', ... মায়া', এবং 'মায়া'।

— ভারতী

CALCUTTA UNIVERSITY

বিজ্ঞাপন

আগামী আশ্বিন হইতে 'ভারতবর্ষে'র দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে। নূতন বৎসরের চাঁদা পূর্বাহ্নেই মণিঅর্ডারযোগে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয় নতুবা ফাল্গুনি পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ভি. পি. পি.-যোগে পাঠাইয়া বার্ষিক চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে; ভি-পি ফেরৎ আসিলে আমাদিগকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

কার্যাধ্যক্ষ, 'ভারতবর্ষ'

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "ভারতী প্রেসে" শিবরতন ভাদুড়িয়ার নিমিত্তের পক্ষে
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমি-সম্পাদক

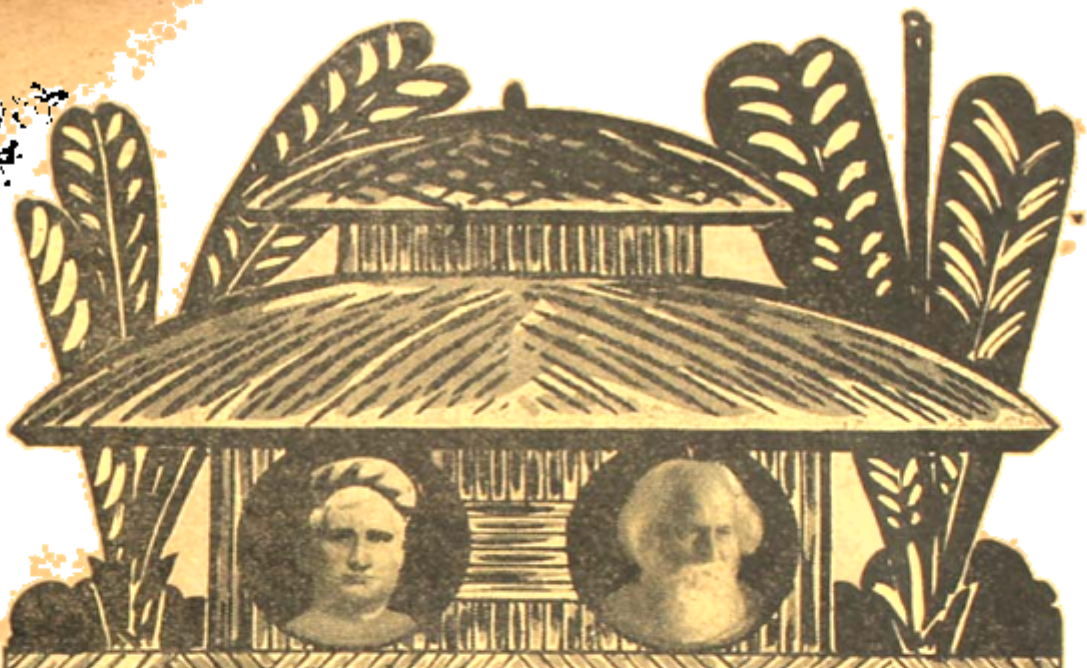

বঙ্গদর্শন

প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা | শ্রাবণ, ১৩৫৪

পত্র-সূচনা

প্রথমেই পত্রিকার এই নামকরণের একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তাহাতে আর সকল কথাও বলা হইবে। বাংলার আর এক যুগ-সন্ধিক্ষণে সেই যুগের যুগন্ধর মহাপুরুষ যে-নামে একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই ইংরেজী Bengal Review-এরই বাংলা অনুবাদ। কিন্তু তাহার যে অর্থ তিনি করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র সূচনায় এবং পরে তাহার সম্পাদনায় তিনি তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে বুঝা যায়, ঐ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ, এবং সেই পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আগামী যুগের জন্য বাঙালীকে প্রস্তুত করিয়া তোলা। তখন অবশ্য রাজনৈতিক সমস্যা এমন প্রাণান্তিক হইয়া উঠে নাই, — ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী-শিক্ষার যেটুকু সুফল এজাতির পক্ষে অর্জ্জনীয় হইয়া উঠিয়াছিল — জাতির প্রাণে ও মনে

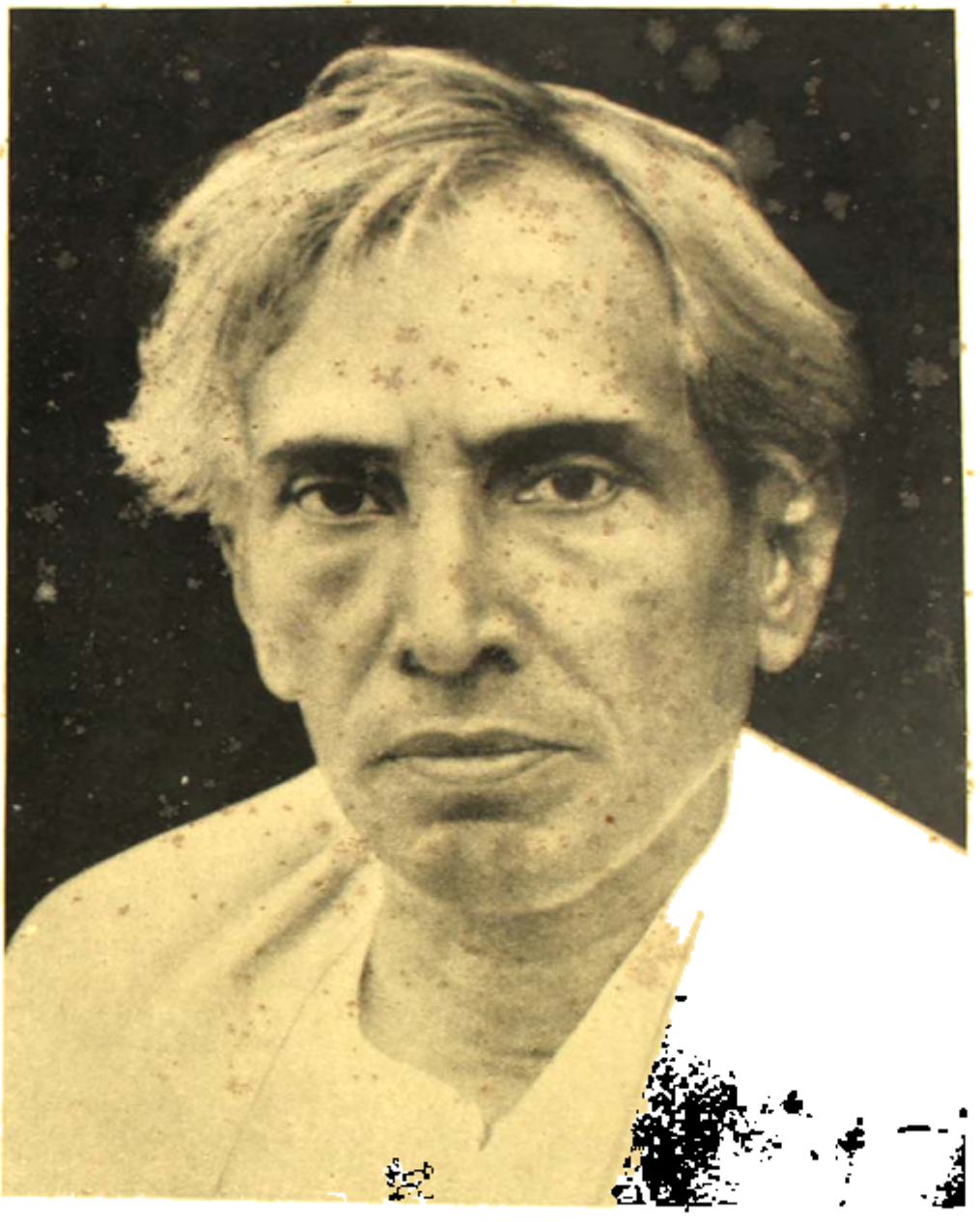

[illegible]

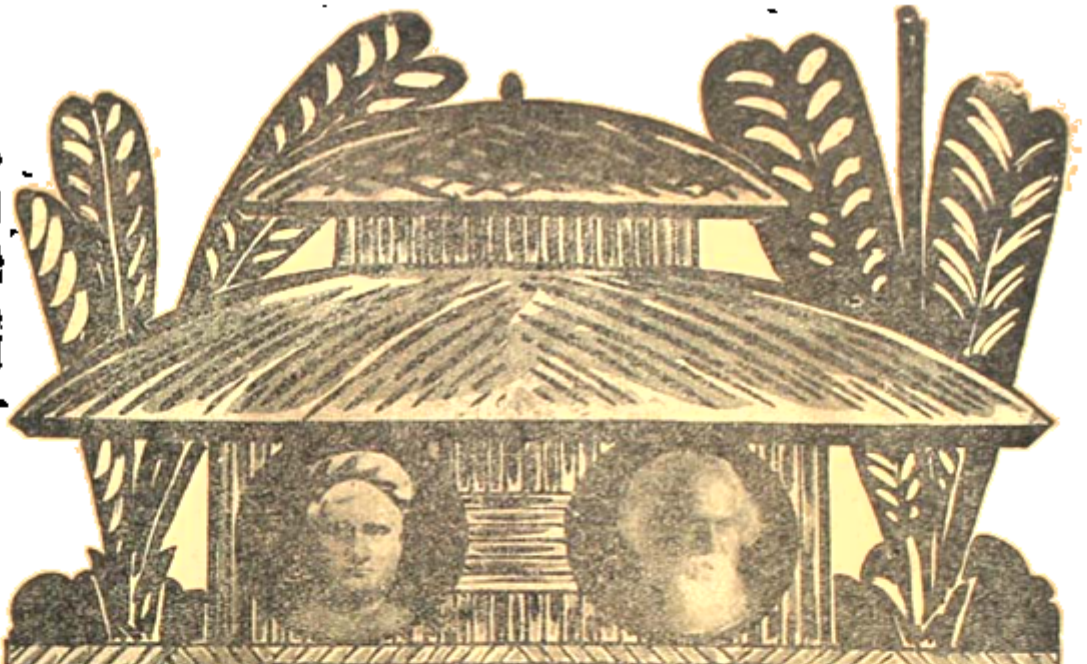

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

নব্য লেখকদিগের প্রতি

দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫৪]

বঙ্কিমচন্দ্র

যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখন সেদিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন, আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল-সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ

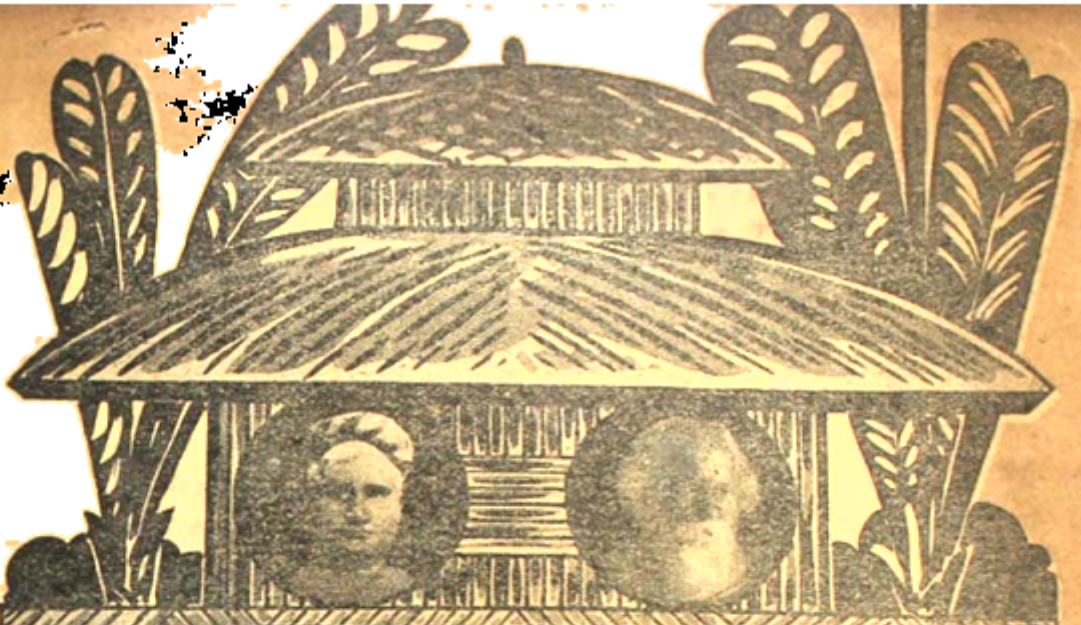

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড | তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৪

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল! . . .

দেখলাম — অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে — আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি! দেখিলাম — অনন্ত অকূল অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত — মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে — আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা — একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল — নিতান্ত একা — মাতৃহীন — 'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃ-সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি?

কাজেই পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, প্রশ্নোক্ত বিষয়ের প্রথম,—অর্থাৎ সত্যতা এই খৃষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতে এই সত্যতা খৃষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দীর। এখন শতাব্দীর পূর্ববর্তী না পরবর্তী ?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ঘুমন্তপুরী অন্ধকার হ'তে আর্যদেবের আসিলে জেগে,
পাখিরে ঘুমন্ত-নীড়-দুয়ারে যায় অমরার ডমরু বেজে।
দু'-দুবে ছাড়িল আশ্রম পথ, বর্ষিকা হ'তে অজবেশ,
তীর্থযাত্রায়, বঙ্গ বহিয়ে ধরিল অঙ্গে মণ্ডিবেশ।
কুশ, তার্থ, অক্ষি, গাদব, চামর, দনত তাপসলোকে,
হোমধূমে কেশ করিল সুরভি, অঙ্গে কাজল পরা'ল
চোখে।

小影

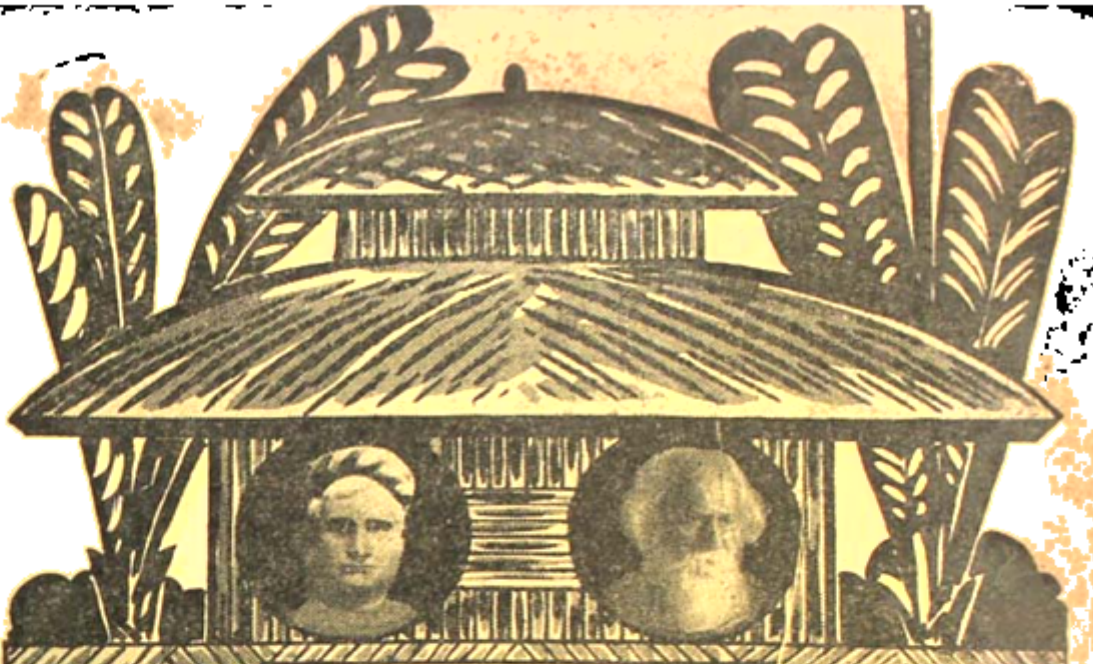

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

বাহুবল ও বাক্যবল

চতুর্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৫৪

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণ-ঘটিত। বাহ্যজগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে, কতকগুলি শক্তি কর্ত্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়মসকল উল্লঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্টভোগ করিতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিতে হয়।

(২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থ সকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার।

(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া

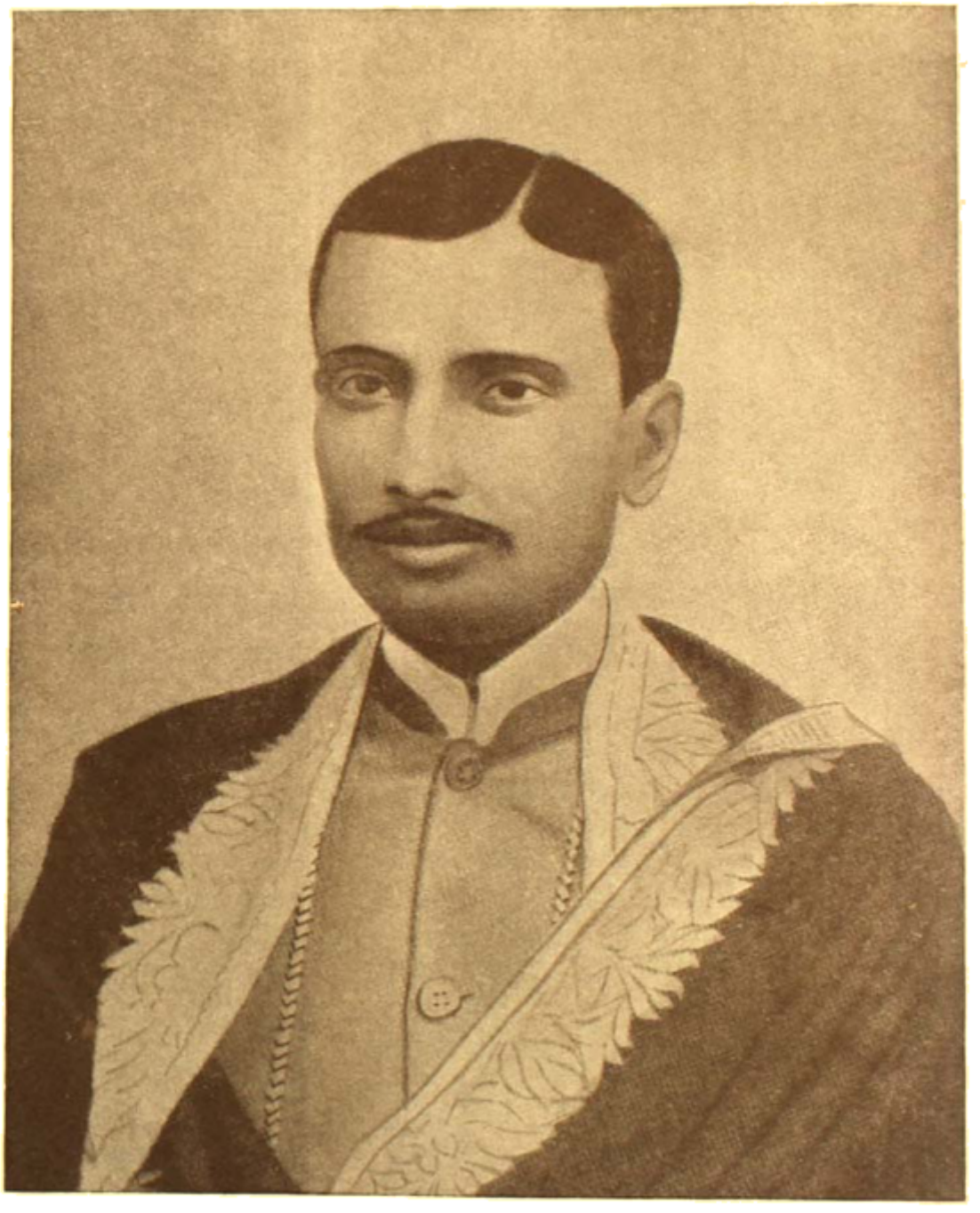

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

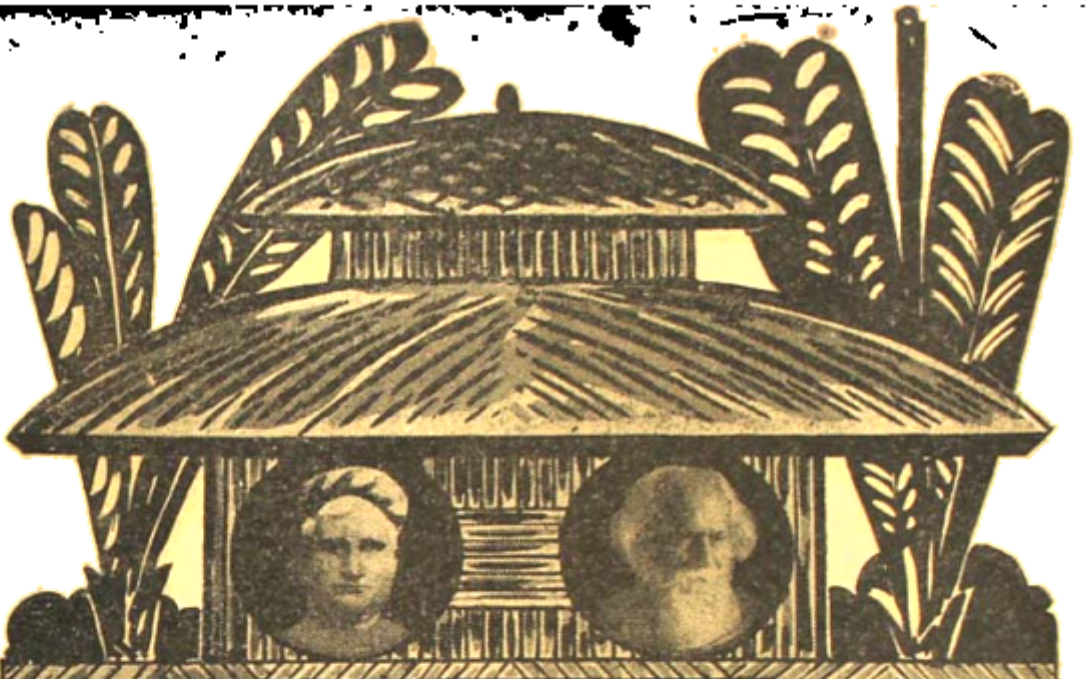

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড | পঞ্চম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

হিন্দু-আদর্শ

বঙ্কিমচন্দ্র

ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্ব্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে সকলই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্ম্মই তাঁহার "ব্যবসায়" নহে, অর্থাৎ অন্য কর্ম্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ-পুরুষ নহেন, কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাঁহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক "আদর্শ" শব্দটি "Ideal" শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দূষ্য হইবে না। এখন, একটা

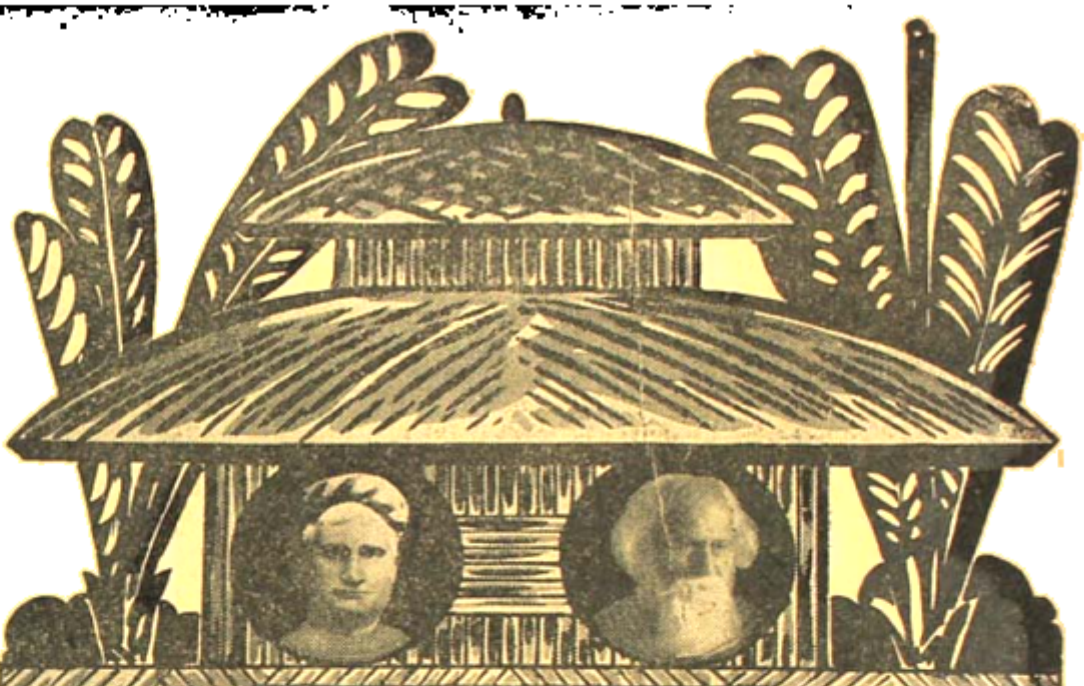

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড | ষষ্ঠ-সপ্তম (যুগ্ম সংখ্যা), পৌষ ও মাঘ, ১৩৫৪

অনুকরণ

বঙ্কিমচন্দ্র

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত, কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালি, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন। আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, কিন্তু অনুকরণ-সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

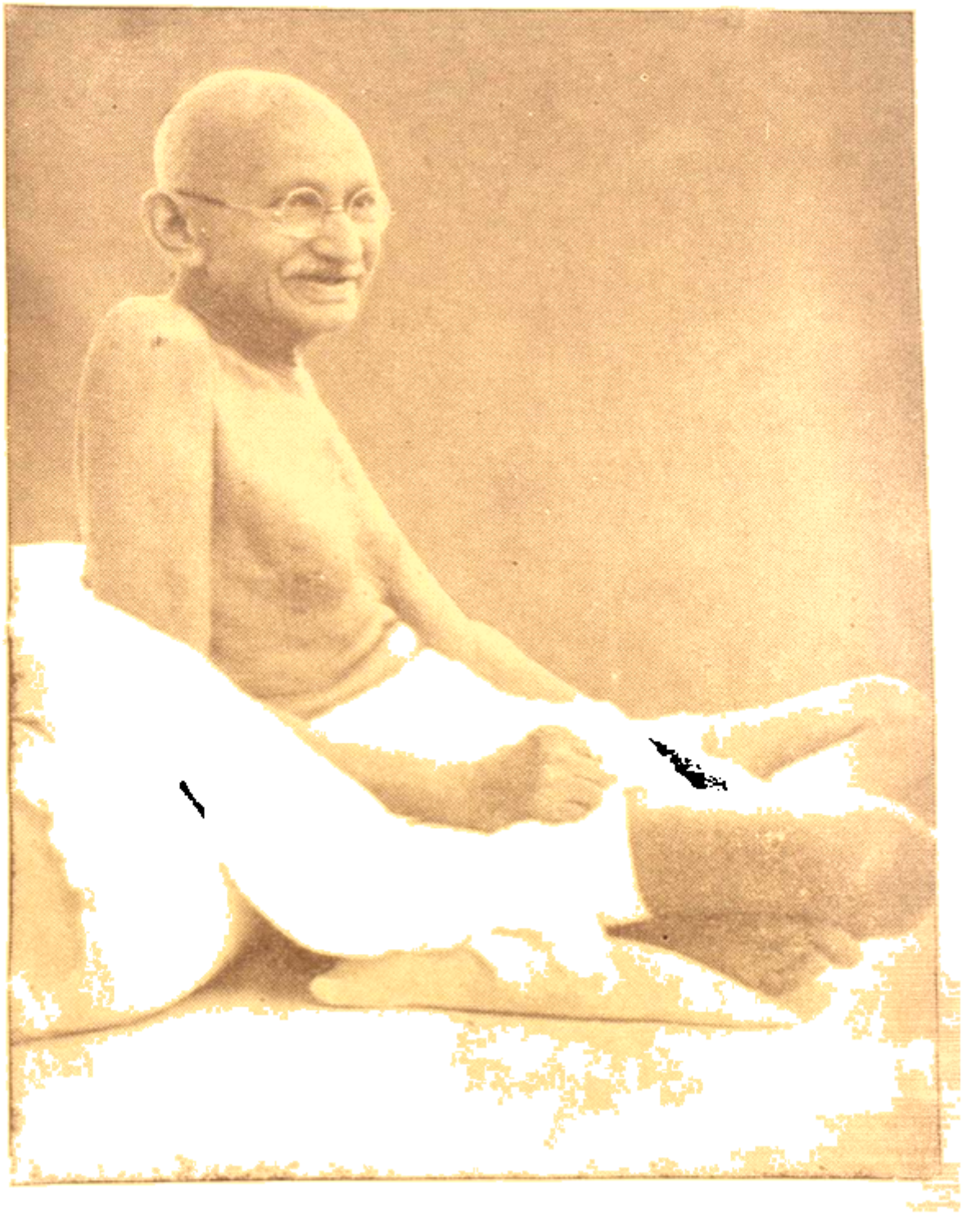

'ভারত'-এর সৌজন্যে]

মহাত্মা গান্ধী

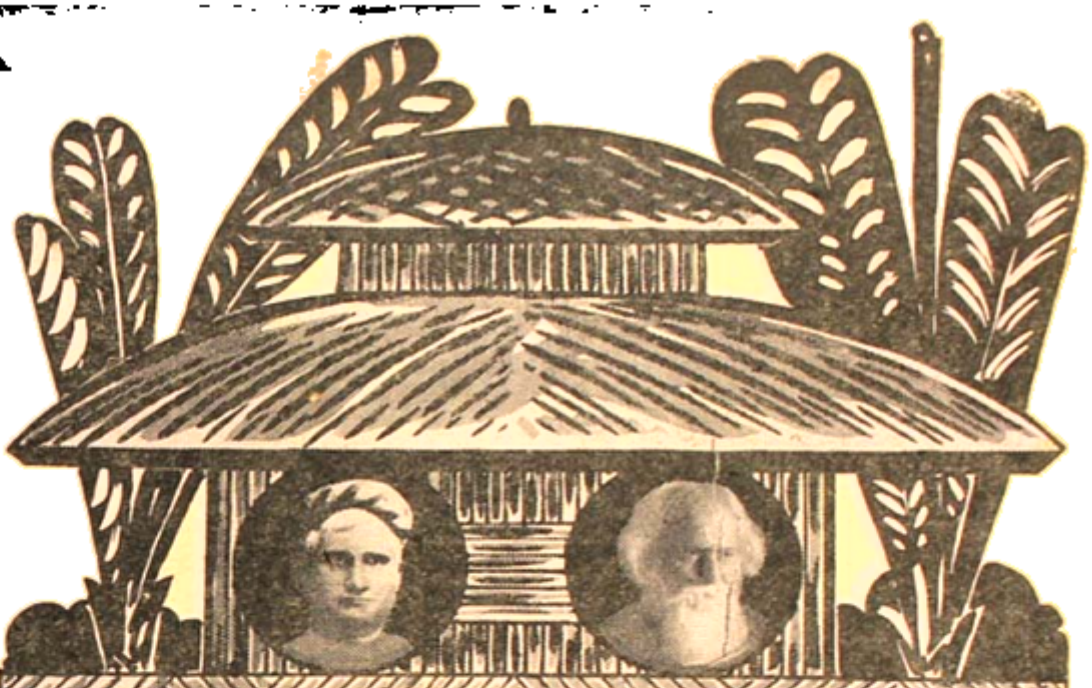

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

জ্ঞানার্জ্জন

বঙ্কিমচন্দ্র

অষ্টম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫৪

মূর্খের ধর্ম্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায় সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখা পড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জ্জিত হইতে পারে ; জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহারা প্রায় কেহই লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের মত ধার্ম্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু তাঁহারা বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জ্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

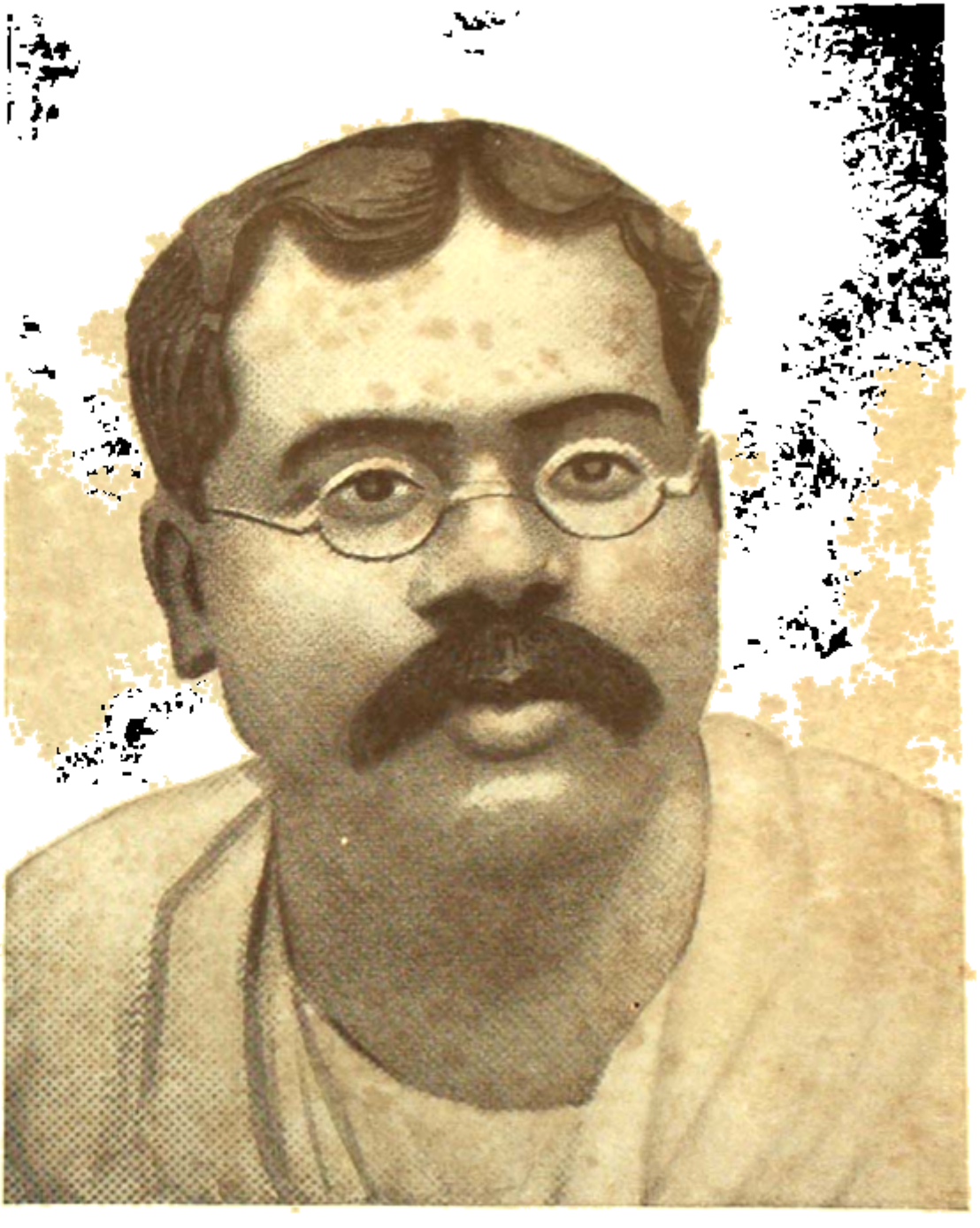

ডক্টর সতীন্দ্র মোহন সাহানি

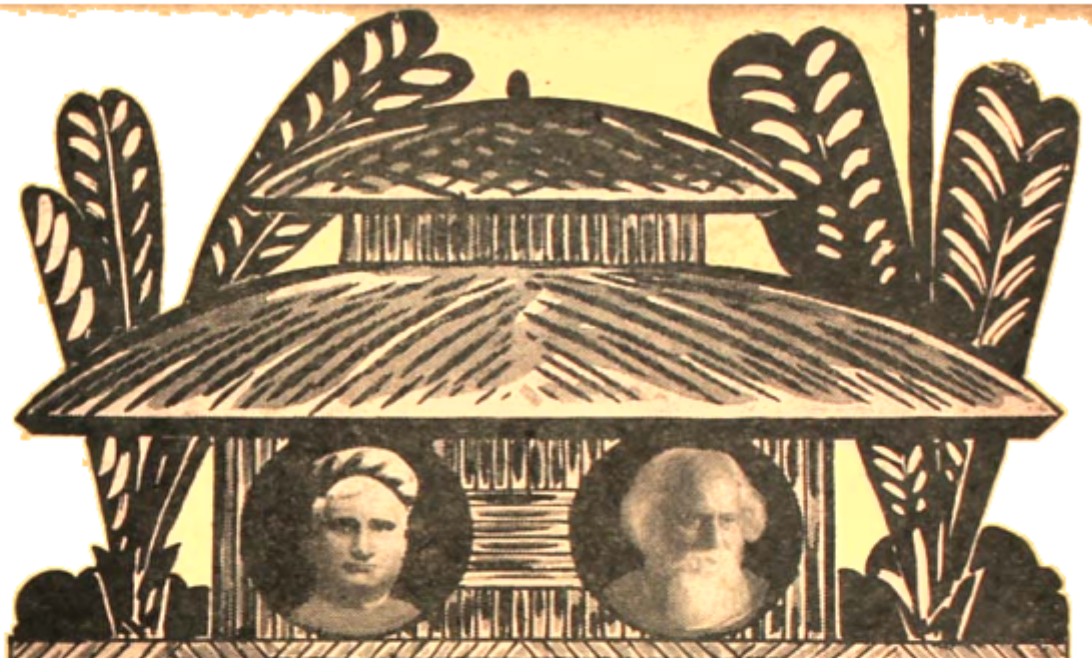

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

সুখ

বঙ্কিমচন্দ্র

নবম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫৪

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধর্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে ? আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব্ব করিয়া, কেন দয়া-দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই।

গুরু। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি সুখ ? ভাল, তাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি যত

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

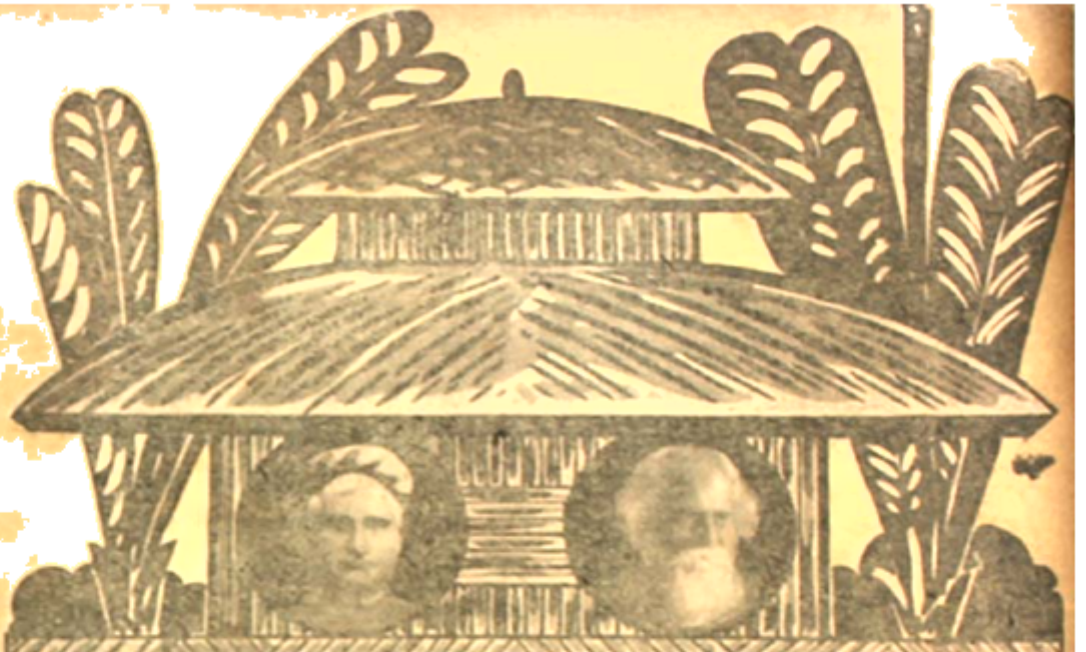

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

স্বাধীনতা ও পরাধীনতা

বঙ্কিমচন্দ্র

দশম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫৪

স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য — তারতম্য নির্দ্দেশ। আমাদের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী ?

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ, তাহাতে সংশয় কি ? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা

কবি সুলতান মহিত

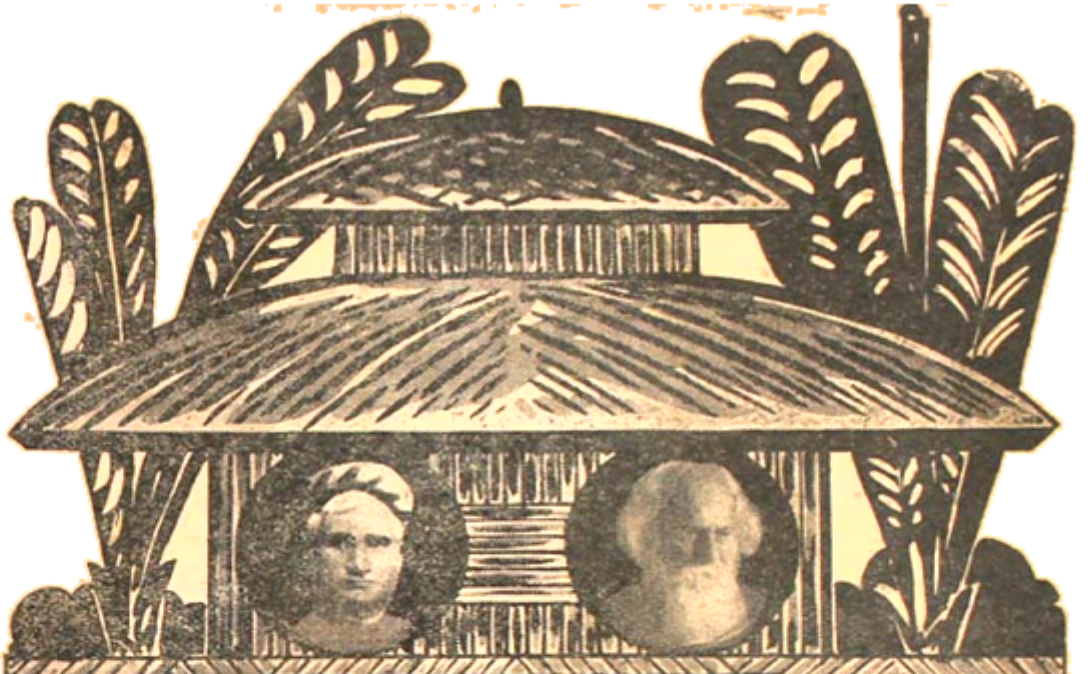

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

মনুষ্যত্ব কি ?

বঙ্কিমচন্দ্র

একাদশ সংখ্যা, জৈষ্ঠ, ১৩৫৫

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাঁহারা মুখে বলিয়া থাকেন যে পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কার্য্যে এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। যদি সত্যই পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় মনুষ্যজন্মের প্রধান কার্য্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই

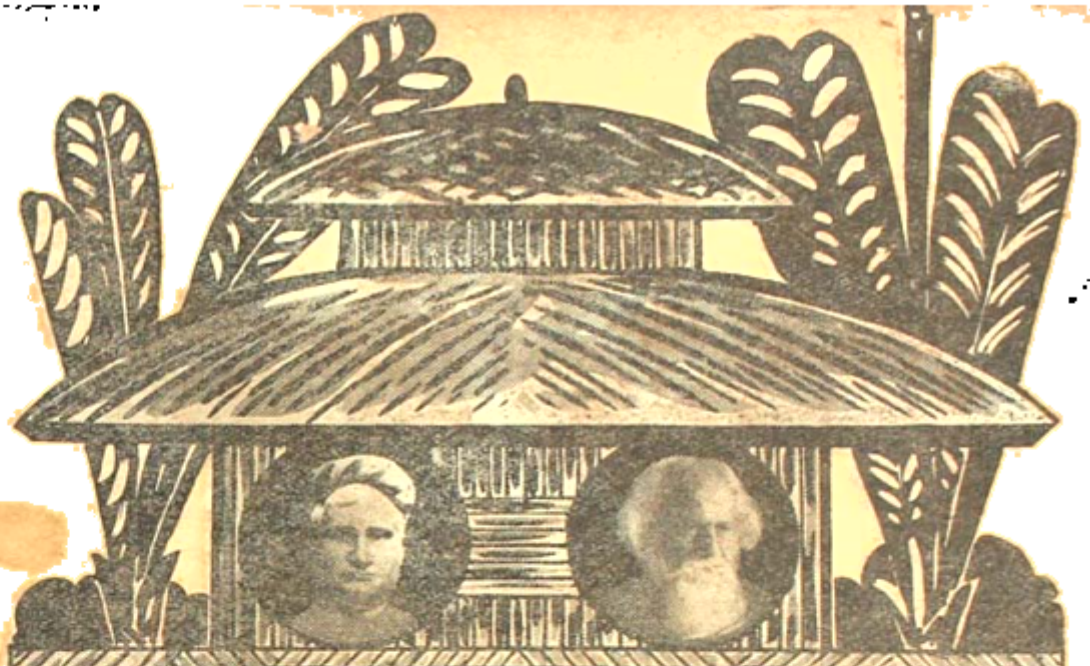

বঙ্গদর্শন

[প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

স্বধর্ম্ম

বঙ্কিমচন্দ্র

দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৫৫

যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাই স্বধর্ম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মন আছে। এই শরীরই বা কি? শরীর কতকগুলি জড় পদার্থের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে, মনুষ্যত্ব থাকে না; কেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। আমি স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি — "শারীরিকী বৃত্তি"। মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তিসমষ্টি। সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মানুষত্ব। যদি তাই হইল, তবে সেই